শ্রীশ্রী সদ্‌গুরু সঙ্গ —

(১২৯৩ হইতে ১৩০০ সালের ডায়েরী)

শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীউর দেহাশ্রিত
অবস্থায় কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত।

তদীয় কৃপাভাজন
শ্রীমৎকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক যথাযথভাবে লিখিত

:: ——— ::

পুরীধাম, ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের সেবাইত
শ্রী শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠাকুরবাড়ী, পুরী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৩৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভাদ্র, ১২৯৯।

]　　চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

আশ্বিন, ১২৯৯।

কার্ত্তিক, ১২৯৯।

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আশ্বিন

সূচীপত্র

কার্ত্তিক

সূচীপত্র

পৌষ

মাঘ

সূচীপত্র

ফাল্গুন

চৈত্র

চিত্রসূচী

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর দেহাশ্রিত অবস্থার ৮ বৎসবেব (১২৯৩—১৩০০ সাল পর্যন্ত) অলৌকিক ঘটনাবলীর, তদীয় একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্য ও নিত্যসেবক শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কর্ত্তৃক সযত্ন রক্ষিত ডায়েরী।

নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিভিন্ন পথচাবীর মনে যে সকল কঠিন প্রশ্ন জাগিয়া সমস্যা থাকে সে সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত সমধান এবং প্রশ্ন সকলের সর্ব্বতোমুখীন মীমাংসা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব কি গৃহী, কি যতি, কি ব্রহ্মচারী সকলেরই সকল প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধিব অপরিহার্য সহায়করূপে এই গ্রন্থ গৃহীত হইবার যোগ্য।

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর জীবনে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, নানক, কবির, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি অবতার এবং অবতারকল্প মহাপুরুষগণের আধ্যাত্মসম্পদ, আদর্শ ও শিক্ষার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সকল মত ও পথের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া তিনি সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে গুরুর দয়া, শিষ্যের ঔদ্ধত্য, গুরুর আদেশ, শিষ্যের আনুগত্য দেখাইয়া গুরুর মাহাত্ম্য প্রকট করা হইয়াছে। যাঁহারা সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে অভিলাষী, যাঁহারা প্রতি পদে আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক প্রবলতম শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া পুনঃপুনঃ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে সাধ্য ও সাধনে দৃঢ়তালাভ করিবেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানিকে নিত্য পাঠ্য ও নিত্য সঙ্গী না করিয়া পারিবেন না।

এই গ্রন্থে সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বীর্য্য ধারণ করিতে হইলে নানা প্রলোভনের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়া তপস্যা করিতে হয়। এই পুস্তকে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের সারগর্ভ বাক্যাবলী ব্রহ্মচারীজী জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। উচ্চ আদর্শকে দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে এত সহজ ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। যাঁহারা মানসিক দুর্ব্বলতার প্রবল তাড়নায় প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার অভীপ্সিত কর্ম্ম সাধন করিতে না পারিয়া দুঃখিত, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন লক্ষ্য স্থির হইবে, জীবনের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হইবে।

শ্রী মদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীশ্রীসদ্গুরু সঙ্গ

প্রথমখণ্ড

(১২৯৩ সালের ডায়েরী)

অবতরণিকা।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়, মানস-সরোবরনিবাসী পবমহংসজীর নিকটে পুরাকালের শ্রীমন্নারায়ণপ্রবর্ত্তিত দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরম আদরেব দুর্লভ যোগধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়া, নির্জ্জন পাহাড়ে-পর্ব্বতে কিছুকাল তীব্র সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিলেন। লোকালয়ে প্রত্যাগত হইবার সঙ্কল্প তাঁহাব একেবারেই ছিল না। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব, অকস্মাৎ একদিন আবির্ভূত হইয়া, বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজন সাধনার্থে, তাঁহাকে দেশে ফিরিতে আদেশ কবিলেন। তাহাতে গোঁসাই প্রভু বলিলেন—এখনও প্রচারাদি কার্য্যের ভার আমারই উপরে দিয়া আমাকে সংসারে রাখিতে চাহেন? এ সকল কার্য্য আপনি নিজে করিলে তো আরও ভাল হয়। তাহাতে পবমহংসজী বলিলেন—"ইহা আমাব কার্য্য নহে। এই কার্য্য তোমার দ্বারাই হইবে, তুমি আচার্য্য-সন্তান, স্বয়ং আচার্য্য। তেমাব উপদেশ লোকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে আমার বাক্য সেরূপ গ্রহণ কবিবে না। জগৎকে, দেশকে শিক্ষা দিবার অধিকার তোমারই, আমাব নহে। তুমি পূর্ব্বে যেরূপ পবিবাবমধ্যে বাস করিতেছিলে, এখনও সেইরূপই থাক্। তাহাতে তোমাব সাধন-ভজনেব কোনই ব্যাঘাত হইবে না।"

গোস্বামী মহাশয় গুরু-বাক্য শিবোধার্য্য কবিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নির্জ্জনে প্রাণায়ামসংযোগে যোগ-সাধন, অবিচারে গুরুবাক্যের অনুসরণ, শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক পাত্রবিশেষে নিভৃতে দীক্ষাদান এবং বিভিন্নপথাবলম্বী ধর্ম্মার্থীগণকেও সরলভাবে নিষ্ঠার সহিত আপন আপন ধর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মগণের ঘরে ঘরে ঘোরতর আন্দোলন ও আলোচনা হইতে লাগিল। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক মত প্রচার না করিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রচাব কবিলে ব্রাহ্মসমাজের লোকে আপত্তি ও দুঃখের কারণ হইবে জানিয়া, তিনি গত ১০ই চৈত্র (১২৯২ সালে) কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ কবিযাছেন। কিন্তু তখনই আবার ঢাকা

"পূর্ব্ব-বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের" সভ্যগণ তাঁহাকে আচার্য্যপদে মনোনীত করিয়া, অবিলম্বে ঢাকায় আসিবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ জানাইলেন। কিছুকাল হইল গোস্বামী মহাশয়, ঢাকাতে আগমন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাসে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে উপাসনাদি কার্য্য করিতেছেন।

আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে ব্রাহ্মসমাজে নিত্য উৎসবের স্রোত চলিয়াছে। প্রত্যহই অপরাহ্নে প্রচারক-নিবাস লোকে লোকারণ্য। নানা শ্রেণীর বাউল, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে আলাপাদি করেন, তাহা কিছুই বুঝি না; আর যাহা বুঝি তাহাও ভাল লাগে না। গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় নীতিমান, সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ সাধুপুরুষ রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ঘটিত সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রুধারায় ভাসিয়া যান, কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন—ইহা দেখিয়া আমি একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে, পথে ঘাটে মাঠে, চাষা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে এই সব ভাবেরই গান শুনিয়া, হাতে 'ঠেঙ্গা' লইয়া তাহাদের তাড়া করিয়াছি। হায়, হায় নীতির আদর্শস্থান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ভাব। দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেছি।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে গোঁসাই।

আজকাল পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্রই গোস্বামী মহাশয়ের কথা। হিন্দু-সমাজে, ব্রাহ্ম-সমাজে, দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে, যেখানে সেখানে কেবল গোঁসাইজীরই গুণ-কীর্ত্তন। ভদ্র-গৃহস্থদের পরিবারে, অফিসের বাবুদের ভিতরে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এখন শুধু গোস্বামী মহাশয়ের অসামান্য সাম্যভাব, অদ্ভুত ভাবাবেশ ও অপূর্ব্ব অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুশীলনেরই আলোচনা। হিন্দু-সমাজের সমাজপতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, স্বধর্ম্ম-নিরত আচারনিষ্ঠ টোলের পণ্ডিতগণ—যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বেও 'ব্রাহ্ম' শব্দটি পর্য্যন্ত শুনিলে অবজ্ঞার সহিত 'রাধামাধব', 'মহাভারত', উচ্চারণ করিতেন—এখন দেখিতেছি তাঁহারাও অনেকে, ঘরের পয়সা খরচ করিয়া, বিক্রমপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে প্রতি রবিবারে গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় যোগদান করিতে ব্রাহ্ম মন্দিরে আসিতেছেন। উপাসনার সময়ে অনেক মুসলমান এবং খৃষ্টানকেও সমাজে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা বলেন, "যারা বলে ব্রাহ্মসমাজে কিছু নাই, তারা একবার গোঁসাইকে দেখুক না? এমন একটি লোক হিন্দুসমাজে বা অন্য কোন সমাজে বের করুক দেখি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বস্তু, ব্রাহ্মসমাজে কি জিনিস তৈয়ার হয়, একবার এসে লোকে গোঁসাইকে দেখে বুঝে নিক্।" হিন্দুরা বলেন—"গোঁসাই আর ব্রাহ্ম নাই। বস্তু পে'য়ে জেনে শুনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন;

মাথা মুড়িয়ে, গৈরিক নিয়ে হিন্দু হয়েছেন। তিনি এখন সাকার উপাসনা করেন; রাধা কৃষ্ণ, কালী-দুর্গা নাম শুন্‌লে কেঁদে ফেলেন; হরি-সঙ্কীর্ত্তনে গৌর-কীর্ত্তনে গোঁসাইয়ের দশা হয়। এ কি আর ব্রাহ্মের লক্ষণ? ব্রাহ্মেরা কি হরি ব'লে নাচে?—না, তাদের মধ্যে কখনও এরূপ মহাভাবের আবির্ভাব হয়?" যাহা হউক, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থীরাই দেখিতেছি গোঁসাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁহার সঙ্গলাভে লালায়িত। ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যহই লোকের ভিড়। রবিবারে সমাজে স্থান পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া বসিবার স্থান অধিকার করে। ভিতর বাহির লোকে পরিপূর্ণ। বেদীর কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও নড়া চড়া নাই। অসাম্প্রদায়িক ভাবে গোস্বামী মহাশয়ের উদ্বোধন, প্রার্থনা, উপাসনা ও উপদেশ সকলকেই বিমোহিত করিয়া ফেলিতেছে। গোঁসাই বেদীতে বসিয়া কার্য্যারম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের ভিতরে এক অদ্ভুত ভাবের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই মহাকাণ্ড আরম্ভ হয়, অনেকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। ভূমিতে লুটাইয়া কেহ কেহ কাতরপ্রাণে রোদন করিতে থাকেন। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ।

গোঁসাইয়ের ব্রাহ্মসমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ।

ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রসমাজের কয়েকটি সমবয়স্ককে লইয়া, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কথা তুলিলাম; গোস্বামী মহাশয়ের আসন-ঘরে চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, হর-পার্ব্বতী, নন্দ-যশোদা প্রভৃতির ছবি কেন রহিয়াছে এবং তিনি বাউল, বৈষ্ণবাদি কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগকে, ধর্ম্মের নামে, শারীরিক বিকৃত ভাবের উদ্দীপক প্রেম-সঙ্গীতাদি করিতে কেন প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেন—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। কয়েক দিন ইহা লইয়া খুব আলোচনা চলিল। পরে উঁহারা বলিলেন—"প্রচারকনিবাস এখন গোস্বামী মহাশয়েরই বাস-ভবন; সুতরাং নিজের ঘরে কে কি করেন না করেন, আমাদের তাহা দেখ্‌বার আবশ্যক নাই। একখানা পঞ্জিকা ঘরে রাখ্‌লেও সেই সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ, কালী-দুর্গার ছবি থাকে। তা'তে আর দোষ কি? বাউল বৈষ্ণবেরা যে ভিক্ষা কর্‌তে এসে কত কি গান করে; তা'তে কি তাদের মুখ চেপে ধরার কা'রো অধিকার আছে? এ সবও সে রকম জান্‌বে। এ পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে চলিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজ সহিয়া লইতে পারেন। বেশী বাড়াবাড়ি হ'লে তখন প্রতিবাদ করা যাবে।"

কর্ত্তৃপক্ষের এ মীমাংসা শুনিয়া মনে বড়ই দুঃখ হইল। উঁহাদের মধ্যেই কাহারও কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলাম, "অশ্লীল টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান সংগ্রহ করিয়া প্রেম-সঙ্গীত

নাম দিয়া, দেশ বিদেশে, ঘরে ঘরে প্রচার করা যে সকল ব্রাহ্মেরা দোষ মনে করেন না; যাহার মূলই অসত্য এরূপ কতকগুলি জল্পনা-কল্পনা বা মিথ্যা ঘটনার ফাঁকা ছবি, উপাখ্যান ও উপন্যাস আকারে প্রচার করিয়া, যাঁহারা মানুষকে অসত্য হইতে টানিয়া সত্যের আলোকে লইয়া যাইতে চান, তাঁরা আর গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্যে প্রতিবাদ করিলে দাঁড়াইবেন কোথায়?" আমার কথা শুনিয়া অনেকেই একটু উত্তেজিত হইলেন। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এক গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"জাতিভেদ তুমি অপরাধ মনে কর, অথচ তার চিহ্ন ঐ উপবীত ধারণ করছ কেন? হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় তুমিও কি দিচ্ছ না"?

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যাকুলতা।

উঁহারা আমাকে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন বুঝিয়া, লজ্জিতভাবে, দুঃখিত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; সর্ব্বদা আমার ভিতরে ঐ কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। কিছুকাল যাবৎ আমার ভিতরের দুর্ব্বলতা ও কপটাচরণের জন্য নিজেই আমি অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম। এখন নবকান্ত বাবুর ঐ কথায় আমার অন্তরের আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিল। আমি আমার বন্ধুদের কাছে প্রচার করিলাম—আগামী অগ্রহায়ণ মাসের সাংবাৎসরিক উৎসবের সময়েই আমি উপবীত ত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব। আমার একথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্ম বন্ধুরা আমাকে খুব উৎসাহই দিতে লাগিলেন। কিন্তু চারিদিকে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিষম 'হৈ-চৈ' পড়িয়া গেল। আমার বিরুদ্ধে যতই আন্দোলন হইতে লাগিল, আত্মীয়-স্বজনেরা যতই আমাকে অত্যাচার উৎপীড়নের ভয় দেখাইতে লাগিলেন, উৎসাহ ও নির্ভীকতা আমার ততই বাড়িয়া উঠিল। গত ৪/৫ মাস হইতে, উপাসনার সময়ে, নিত্য দু'টি বেলা প্রাণের জ্বালায় কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি—"প্রভু, উপবীত ধারণ করিয়া এ অসত্যের আবরণে কতকাল আর নিজেকে ঢাকিয়া রাখিব? কপটাচার হইতে আমাকে উদ্ধার কর। তোমাকে লাভ করিবার যথার্থ পথ তুমিই আমাকে দেখাইয়া দাও। দয়া করিয়া, আমাকে নিষ্কপটভাবে সত্যপথে চলিবার শক্তি দাও।"

অপূর্ব্ব স্বপ্ন—গোঁসাইয়ের আহ্বান।

অন্যান্য দিনের মত, উপাসনার শেষে আজও এইভাবে প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলাম। শেষ রাত্রে (৩।। টার সময়ে) একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া, সহসা জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটি এই—দেখিলাম, ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বারে আমি উপস্থিত হইয়াছি। বাগানে শিউলি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া, গোস্বামী মহাশয় সস্নেহে ঈষৎ হাস্যমুখে আমাকে হাত নাড়িয়া ডাকিয়া বলিলেন—

২০ শে ভাদ্র, ১২৯৩ সাল।

ওহে, শীঘ্র এদিকে চলে এস। যে বস্তু তুমি চাও, আমি তোমাকে তাই দিব।

আমি তখন গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি ও মমতামাখা আহ্বানে আনন্দে বিহ্বল হইয়া, ভগবানকে লাভ করার মানসে, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে যাইয়া লুটাইয়া পড়িলাম; আর অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া উঠিয়াও গোস্বামী মহাশয়ের সেই সৌম্য-শান্ত, স্নিগ্ধ সকরুণ পবিত্রমূর্ত্তি চক্ষের সমক্ষে যেন কিছুক্ষণের জন্য দেখিতে লাগিলাম। কানেও যেন তাঁর সেই শব্দ বারংবার শুনিতে লাগিলাম। স্বপ্ন মনের সংস্কারেরই বিকৃত পরিণাম বা কল্পনারই একটা অলীক ফল, বহুকালের এই নিশ্চিত ধারণা আমার স্মৃতিতেও আর আসিল না। জাগরিতাবস্থাতেও কিছুতেই আমি কান্নার বেগ থামাইতে পারিলাম না। পুনঃ পুনঃ কেবলই মনে হইতে লাগিল, গোস্বামী মহাশয় আমার জন্য বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি কিছুকাল ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিলাম। প্রার্থনা করিলাম—"প্রভু, আমি তোমার সম্বন্ধে অন্ধ। তোমাকে লাভ করিবার যথার্থ পথে, দয়া করিয়া, তুমিই আমাকে লইয়া যাও।" প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্থিরতা আরও বাড়িয়া পড়িল। আমি অমনি শেষ রাত্রিতে ছুটিয়া ব্রাহ্মসমাজের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দেওয়াল টপ্‌কাইয়া বাগানে পড়িলাম এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানটি লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি ব্রাহ্মমন্দিরের পূর্ব্বদিকে, দেওয়ালের ধারে সেই শিউলি গাছের নীচে—স্বপ্নে যেমনটি দেখিয়াছি, অবিকল সেই ভাবে—মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক-বসন-পরিহিত পবিত্র মূর্ত্তি গোস্বামী মহাশয়, দণ্ড-হাতে, খড়ম পায়ে, প্রফুল্লদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেই তিনি আমাকে শেফালিকা ফুল দেখাইয়া বলিলেন—

দেখ, কি সুন্দর। দূর্ব্বার উপরে যেন খই ফুটে রয়েছে।

এতকাল আমি গোস্বামী মহাশয়কে, মস্তক অবনত করিয়া পায়ে পড়িয়া, কখনও নমস্কার করি নাই; উহা ঘোর কুসংস্কার ও অসভ্যতার কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি; শুধু হস্তোত্তোলন বা শিরঃ কম্পন করিয়াই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু আজ আর, কেন জানি না, সে বিষয়ে আমার মনোযোগ রহিল না; ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, 'আমাকে আপনি দয়া করুন।'

গোঁসাই বলিলেন—

আরও পূর্ব্বে তোমার আসা উচিত ছিল, এখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।

আমি। আমার এখনই সাধন নিতে ইচ্ছা হয়।

গোঁসাই। **সে তো খুব সুখের কথা। এই-ই তো সময়, এই সময়েই তো এ সব করতে হয়। এখন থেকে নিয়ম মত এ সব সাধন-পথে চললে' অনন্তকাল এর একটা সুফল ভোগ**

কর্‌বে। 'পরে কর্‌ব'—এ আশায় থাকা ঠিক নয়; পরে কত বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে। সম্প্রতি শীঘ্রই আমি পশ্চিমে যাচ্ছি। পশ্চিম থেকে ঘুরে আসি। আর তোমাদেরও তো স্কুল ছুটি—বাড়ী যাবে। বাড়ী থেকে এস, পরে সাধন হবে। সাধন নিলে এখন অন্ততঃ পনের দিন আমার কাছে তোমার থাকা আবশ্যক হবে। তাতে অসুবিধা আছে।

আমি। বাড়ী গিয়ে কি নিয়মে চল্‌বো?

গোঁসাই। নিয়ম আর কি? যেমন চল্‌ছ, তেমনই চল্‌বে। বেশ পবিত্রভাবে থাক্‌বে। মনে কোন প্রকার খারাপ চিন্তা আস্‌তে দিবে না—ওতে বড় অনিষ্ট হয়। মনটি সর্ব্বদাই পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখ্‌বে। চিত্তটি প্রফুল্ল না থাকলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হয় না। খুব কাতর হ'য়ে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করতে হয়; আর প্রার্থনার ভাবটি সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হয়। লেখাপড়া করার সময়ে, কথাবার্ত্তা বলার সময়ে, পথে ঘাটে চল্‌তে ফির্‌তে, সর্ব্বদাই ৫/৭ মিনিট অন্তর অন্তর একটু একটু অবসর নিয়ে, দু'এক মিনিট ভগবানকে স্মরণ কর্‌তে হয়। তিনি সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, আমাকে কত ভালবাসেন, প্রতিক্ষণে আমাকে কত প্রকারে দয়া কর্‌ছেন—এ সব মনে করে পুনঃ পুনঃ তাঁকে নমস্কার কর্‌তে হয়। এই ভাবে প্রতি কার্য্যে তাঁকে স্মরণ করে চল্‌লে অল্প সময়েই তাঁর কৃপা লাভ করা যায়। এ সময়ে লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য; লেখাপড়া অগ্রাহ্য কর্‌লে পরিণামে সকল দিকেই অনিষ্ট হয়। এখন এই সব কথা মনে রেখে চল্‌তে চেষ্টা কর; উপকার পাবে।

সাধনপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

কয়েকদিন পরেই পূজা উপলক্ষে আমাদের স্কুল বন্ধ হইল। ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার মধ্যাহ্নে আহারান্তে, প্রসিদ্ধ 'মীরের বেগে' মাঝিদের নৌকা ভাড়া করিয়া, মেজদাদা, ছোটদাদা প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ী রওনা হইলাম। তালতলার খাল ধরিয়া কিছুদূর যাইয়া মাঝিরা রাস্তা ভুল করিল। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে বাড়ী পৌঁছিলাম। এবারে বর্ষায় পদ্মা নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের প্রায় সকলেরই বাড়ী জলে 'ডুবু ডুবু'। আমাদের বাড়ীর উপরেও ৭/৮ ইঞ্চি জল উঠিয়াছে। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য ইতিপূর্ব্বেই উঠানের উপর বাঁশ পাতিয়া সাঁকো করিয়া রাখা হইয়াছে। পাড়ার প্রায় সকল বাড়ীতেই ডিঙ্গী নৌকা থাকায় পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে বিশেষ কোনও অসুবিধা নাই। প্রত্যহ অপরাহ্নে ১২/১৪টি সমবয়স্ককে লইয়া নবকান্ত বাবুর বাড়ীতে যাই। সেখানে সঙ্কীর্ত্তন উপাসনাদি করিয়া রাত্রি প্রায় নয়টায় বাড়ীতে আসি। আমার প্ররোচনায় দু'টি বন্ধু ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, উপবীত না থাকিলেও, তাঁহাদের লইয়া আমাদের সমাজে কোন গোলমাল নাই। পাড়ার বৃদ্ধেরা তাঁহাদিগকে উপবতী লওয়ার জন্য অনেক বুঝাইয়াও কোন ফল পান নাই। পাড়ার

আচার্য্যবর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(১২৯৩ সাল।)

বৃদ্ধেরা তাঁহাদিগকে উপবীত লওয়ার জন্য অনেক বুঝাইয়াও কোন ফল পান নাই। এখন তাঁহারা সে চেষ্টায় নিরাশ হইয়া বলিতেছেন, "ওহে আমাদের দুর্নীতির চিহ্ন গলার দড়ি—তা যেন ত্যাগই করেছ; তোমাদের ব্রাহ্ম সভ্যতার সুনীতির চিহ্ন জামা সার্ট সর্ব্বদা পরাটা ছাড়লে কেন? ওগুলো গায়ে রাখলেও যে বাঁচি।" আমি আজ পর্য্যন্ত উপবীত ত্যাগ করিতে পারিলাম না বলিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুরা বড়ই দুঃখিত; সর্ব্বদাই আমাকে সেজন্য তাঁহারা অনুযোগ করেন, সময়ে সময়ে কাপুরুষও বলেন। এবারে ছুটির পর ঢাকায় যাইয়া প্রকাশ্য ভাবেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিব, সকলে অনুমান করিতেছেন। মাও ভয়ে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তুলসীগাছের সম্মুখে নির্জ্জনে চুপ করিয়া বসিয়া মা কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীকে মনের দুঃখ জানান! মা'র বিশ্বাস, তুলসীর কৃপা হইলে আমি আর ব্রাহ্ম হইব না। ছুটি শেষ হইলে, ঢাকা রওনা হওয়ার সময়ে মা আমাকে বলিলেন, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রিয়া পৈতাটা ফেলিস্ না। ঠাকুর তোর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। গলায় পৈতাটি রেখে তুই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্—এই প্রার্থনা ক'রে প্রতিদিন আমি শিবের মাথায় বেলপাতা দিই।" এই বলিয়া মা তাঁহার হাতের তিনটি অঙ্গুলি নিজ জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া, পায়ের ধুলা তাহাতে লাগাইয়া আমার মাথায় ঘসিয়া দিলেন। মা'কে প্রণাম করিয়া আমি ঢাকায় রওনা হইলাম।

ঢাকায় আসিয়া শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় এ পর্য্যন্ত ঢাকায় ফিরেন নাই; তবে শীঘ্রই আসিবেন। আমি দিন রাত তাঁহার আগমনাকাঙ্ক্ষায় অস্থির হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলাম। উপবীতত্যাগ ও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করার ঝোঁক আমার কমিয়া গেল। গোঁসাই আমাকে কি সাধন দিবেন, অহর্নিশ শুধু তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম।

☆ ☆ ☆ ☆

অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগেই গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাত্রসমাজে মহা 'ধূমধাম' পড়িয়া গেল, ব্রাহ্মসমাজের আনন্দের আর সীমা নাই। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। গোঁসাইয়ের আগমনে আবার দলে দলে লোক ব্রাহ্মমন্দিরে আসিতেছেন। আবার ব্রাহ্মসমাজে নিত্য উৎসবের স্রোত। প্রত্যহ সন্ধ্যা-কীর্ত্তনে ভাবের বিচিত্র বিকাশে ও উচ্ছ্বাসে সকলেরই চিত্ত গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শুনিতেছি, এবারে গোস্বামী মহাশয় কাকিনিয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া, উপাসনা, বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনোৎসবে জীবন্ত ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব স্রোত প্রবাহিত করিয়া আসিয়াছেন।

সাধনপ্রাপ্তির বাধা—ছোটদাদা।

আগামী শনিবার ছাত্র-সমাজে গোস্বামী মহাশয়কে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম। বক্তৃতা, করিতে গোস্বামী মহাশয়ের আর তেমন উৎসাহ নাই, দেখিলাম। যাহা হউক শরীর সুস্থ থাকিলে চেষ্টা করিবেন, বলিলেন। আমার বন্ধুকয়টি একথার পর চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমি তাঁহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তখন ওখানে কেবল শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ ও অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয় বসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, "তোমার কি গোপনে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে? ঐ কথায় গোঁসাই আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, **কি বল্‌বে, বল না। এঁদের কাছে বল্‌তে কোন শঙ্কা নাই; স্বচ্ছন্দে বল।**

অগ্রহায়ণ, ২য় সপ্তাহ, ১২৯৩ সন।

আমি বলিলাম—স্কুল বন্ধের পূর্ব্বে আমি একবার বলেছিলাম।

গোঁসাই। **হাঁ, তাই? সাধন নিতে চাও? আচ্ছা, সাধনের নিয়ম-প্রণালী সব জান তো?**

আমি। যতটুকু প্রকাশ আছে ততটুকু মাত্র জানি।

গোঁসাই। **এই সাধন নিলে যিনি যে অবস্থার লোক তাঁকে সেই অবস্থার সব কাজ কর্‌তে হয়। সংসারীদের সংসারকার্য্যে অবহেলা কর্‌লে অন্যায় হয়। সেই প্রকার ছাত্রদেরও নিয়মমত মনোযোগ ক'রে পড়াশুনা কর্‌তে হবে; না হ'লে অনিষ্ট হয়। এটি গিয়ে বেশ করে বুঝ; পরে, কাল এসে আমাকে ব'লো। আরও যা কিছু বল্‌বার আছে কাল বল্‌ব।**

গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি প্রচারক-নিবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বুড়ীগঙ্গার পারে গিয়া, একটি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'একি হলো? সাধন পাওয়ার পূর্ব্বেই যে গোঁসাই একেবারে আমার মাথায় লাঠি মারিলেন! দু'মাস ধরিয়া প্রতিদিন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছি—একবার যোগ-সাধন পাইলে লেখা পড়ার বিষম উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব; কোনও নিভৃত পাহাড়-পর্ব্বতে যাইয়া, আপন মনে মুনি ঋষিদের মত দিনরাত উপাসনায় থাকিয়া এ জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু গোঁসাই আজ এ কি করিলেন? আমার এতকালের আন্তরিক সঙ্কল্প একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন! রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত এই সব ভাবিতে ভাবিতে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। পরে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, একান্তমনে গোঁসাইয়ের চরণোদ্দেশেই নমস্কার করিয়া জানাইলাম— "গোঁসাই, আমায় দয়া কর। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিব না। 'নিয়মিত', 'মনোযোগ'—এ সব কথায় আমি রাজী হইতে পারিব না। লেখাপড়া করিব, ইহাই মাত্র বলিতে পারিব। আমাকে এই আশায় তুমি নিরাশ করিও না। প্রাণের ক্লেশ বুঝিয়া দয়া কর—এই তোমার চরণে প্রার্থনা।" গোঁসাই মনের কথা বুঝেন—আমি ইহা একেবারেই বিশ্বাস করি না; কিন্তু অন্তরের আবেগে এই প্রকার প্রার্থনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল; চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না।

পরদিন সময় বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া বসিতেই, তিনি আমাকে বলিলেন—কি? হয়েছে?

আমি বলিলাম—আজ্ঞা, হ্যাঁ। লেখাপড়া কর্‌ব। গোঁসাই একটু হাসিয়া বলিলেন—

আচ্ছা। আরও একটি কথা আমার বল্‌বার আছে। এখন আর আমার কোনও আপত্তি নাই। শুধু, তোমার অভিভাবকের অনুমতি হ'লেই হলো। অভিভাবকের অমতে সাধন দেওয়ার নিয়ম নাই। এক-শ বছরের বৃদ্ধেরও যদি কেহ অভিভাবক থাকেন, তাঁর অনুমতি নিতে হয়। তোমাকে আর কিছুই বলবার নাই। অভিভাবকের অনুমতি পেলেই হবে।

একথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। ভাবিলাম—গোঁসাই এ যে আমাকে আরও বিষম সঙ্কটে ফেলিলেন। গোঁসাইকে বলিলাম—অভিভাবকের অনুমতি আমি কি প্রকারে লইব? আমার দাদারা তিনজনেই তো আমার অভিভাবক।

গোঁসাই বলিলেন—তা হোক্; এখানে তোমার যে দাদা আছেন তাঁর একখানা পত্র পেলেই, নিশ্চিন্ত হ'য়ে, সন্তুষ্ট মনে আমি তোমাকে সাধন দিতে পারি। অনেকে মনে করেন, ছেলেপিলেদের এই সাধন দিয়ে আমি নষ্ট করছি। অনুমতি না নিয়ে সাধন দিলে তাঁদের অভিশাপ আমাকে নিতে হয়।

গোঁসাইয়ের একটি শিষ্য উকিল শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি সাধন পাবে'?"

গোঁসাই বলিলেন—কাল দেখ্‌লাম ব্যাকুলতা সুন্দর আছে, এবার অবস্থা বেশ হয়েছে।

আমাকে বলিলেন—তুমি অস্থির হয়ো না; সাধন তোমার হবেই। কিছু সময় ধৈর্য্য ধর।

দাদাদের অনুমতি কখনও আমি পাইব না, ইহা নিশ্চয় জানি, কিন্তু গোঁসাইয়ের এই কথা দু'টি শুনিয়া আমার একটু আশা হইল। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিয়া, ছোট দাদা শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার অভিপ্রায় সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া, গোঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা-গ্রহণের অনুমতি-পত্র চাহিলাম। গোঁসাইয়ের নিকটে সাধন লইব শুনিয়াই তিনি খুব চটিয়া গেলেন এবং কখনও অনুমতি দিবেন না পরিষ্কার বলিলেন। ছোট দাদার কথা শুনিয়া ও ভাবগতিক দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে ভিতরের যাতনা আমার এত অসহ্য হইল যে আর আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। 'মেসের' ছেলেরা তখন "কি হ'ল? কি হ'ল?" বলিয়া, পড়াশুনা ফেলিয়া, সকলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছোট দাদাও আসিলেন এবং আমাকে ডাকিয়া বাসার বাহিরে রাস্তায় লইয়া গেলেন। তিনি খুব বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্, —আমাদের মতের বিরুদ্ধে কখনও কোনও কাজ করবি না, যতকাল লেখাপড়া করতে বলব, খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবি;

আমাদের পরিবারের যাতে অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কাজ কখনও করবি না।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা, অনুমতি পত্র দিন, যা যা বল্‌লেন তাই করব।" ছোট দাদা একটু থামিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কাল আরও কতকগুলি 'লিষ্ট' (ফর্দ্দ) ক'রে দিব; সেই মত চল্‌বি প্রতিজ্ঞা কর্‌লে অনুমতি দিব।" যেরূপেই হোক অনুমতি লইতে হইবে ভাবিয়া, আমি ছোট দাদার কথায় সম্মত হইলাম।

সকালে ছোটদাদার নিকটে অনুমতি পত্রের কথা তুলিতেই তিনি খুব রাগিয়া, আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"সে সব কিছু হবে না। যোগ কর্‌লে ভয়ানক রোগ জন্মে। মাথা তো একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যায়। ভাল ভাল লোক ওর ভিতরে গিয়ে চিরকালের মত একেবারে অকর্ম্মা 'ভেড়া' হ'য়ে গেছে। আমি তো অনুমতি দিবই না; দাদারাও কেহ অনুমতি না দেন, সেজন্য তাঁদের চিঠি লিখ্‌ব।" এই সব বলিয়া আমাকে তিনি খুব গালাগালি করিলেন। ছোটদাদার গালি খাইয়া ক্রোধে ও ক্লেশে আমার বুক জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কি আর করিব? উপায় আর না দেখিয়া গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম। গোঁসাইকে এই সমস্ত বিবরণ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম।

১৩ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১২৯৩ সাল।

গোঁসাই বলিলেন— তিনি নিজে অনুমতি নাই দিলেন। দাদাদের একটু লিখতে আর আপত্তি কি?

অকপট বিশ্বাসে অব্যর্থ শক্তি।

এই সময়ে প্রচারক-নিবাসে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। আর কোন কথাই হইল না। আজ রবিবার, সারাদিনই প্রচারক-নিবাসে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে লোকের ভিড়। অপরাহ্নে স্কুল-কলেজের ছাত্র, অফিসের বাবু এবং বাউল, বৈষ্ণব, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতির সমাগমে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের আসন-ঘরে কৃষ্ণকান্ত পাঠকের "যার যার যেরূপ ভাব উদয় হয় মনে, সময়ে সেরূপের দেখা মিলে কই?" এই গানটি অপূর্ব্ব জমাট ভাব ধারণ করিল। বাহিরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। নিয়মিত সময়ে বেদীর কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে অনুমানে সঙ্গীত থামাইয়া দেওয়া হইল; গোস্বামী মহাশয় চোখ-মুখ মুছিয়া, সমাজগৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে বসিলেন। ঘরে বাহিরে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, প্রথম হইতে বেদীর কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেই ভাবেই রহিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় একবার কিছুক্ষণের জন্য কেহ যোগ দিলে শেষ পর্য্যন্ত তাহার আর না থাকিয়া উপায় নাই। আজিকার 'উদ্বোধন' কালের উপদেশগুলি— আমার মনে হইল, যেন আমাকেই বলিতেছেন। সরল বিশ্বাসে, যথার্থ কাতর হইয়া, কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহার

প্রার্থনা পূর্ণ করেন, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। —"একবার ইউরোপে কোন দেশে দীর্ঘকালব্যাপিনী দারুণ অনাবৃষ্টি হয়। সর্ব্বত্র বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আরম্ভ হইল। সেই সময়ে একটি শহরে, সকলে সমবেত হইয়া বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবেন— এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগরবাসী সকলে গির্জ্জায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে একটি বালক, ছাতা হাতে, উপাসনার স্থলে আসিল। বালকের হাতে ছাতা দেখিয়া সকলে তাহাকে বলিলেন—"কি হে বালক, তুমি ত বড় বোকা দেখ্‌ছি। এই সময়ে ছাতা কেন?" বালক বলিল—"আজ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা হইবে। ভগবান্ বৃষ্টি দিবেন, তখন কি কর্‌ব? ছাতা না থাকলে যে ভিজে ভিজে বাড়ী যেতে হবে।" সকলে বালকের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। প্রার্থনার পরে যথার্থই বৃষ্টি হইল। তখন বালক সকলকে বলিল "ভগবানের উপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাক্‌তো, ছাতা ফেলে আসতে না। এখন দেখ, তোমরা প'ড়ে রইলে, আমি চলে যাচ্ছি।" এই ঘটনা অবলম্বনে গোস্বামী মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া, 'সরল বিশ্বাসে কাতরতার সহিত প্রার্থনা' বিষয়ে উপদেশ দিলেন; অতঃপর, উপাসনার শেষ ভাগে করজোড়ে সকলকে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন—

তোমাদের পায়ে পড়ে বল্‌ছি, একবার মা'কে ডাক। শিশু যেমন মা'কে ডাকে, একবার তেমনই ভাবে, কাতর হ'য়ে ডাক। মায়ের কত দয়া! আমার মত পাপীকেও যখন মা কৃপা করেছেন, তখন কেহই আর বঞ্চিত হবে না। বিশ্বাস ক'রে মা'কে ডাকলে নিশ্চয়ই মা'কে পাবে। আমি শোনা কথা বল্‌ছি না, কল্পনার কথা বল্‌ছি না, যথার্থ কথা বল্‌ছি, নিজ জীবনের দেখা কথা বল্‌ছি, নিজে প্রত্যক্ষ ক'রে বল্‌ছি। সরলভাবে মা'কে ডাক্‌লেই মা'কে পাওয়া যায়। একবার মা'কে ডেকে দেখ; একটিবার তেমন ভাবে মাকে ডেকে দেখ, নিশ্চয় দয়া করবেন। আমার মস্তকে পদধূলি দিয়ে সকলে আশীর্ব্বাদ করুন। জয় মা! জয় মা! জয় মা! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য।

সাধনপ্রাপ্তির বাধা—মেজদাদা।

আজ স্কুল হইতে আসার পরে ছোট দাদা বলিলেন—"মেজদাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) ঢাকায় আসিয়াছেন; তিনি একরামপুরে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছেন; কল্য বৈকালে তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়াছেন।" মেজদাদার কথা শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। নিশ্চয়ই সাধন সম্বন্ধে কথা তুলিয়া আমাকে গুরুতর শাসন করিবেন, বুঝিলাম। সারারাত ও পরদিন দুঃসহ উদ্বেগে কাটাইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'তাঐ' মহাশয়ের বাসায় গেলাম। মেজদাদার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চটিয়া গেলেন। অত্যন্ত

১৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১২৯৩ সাল।

তীব্রভাষায় কর্কশস্বরে গালি দিতে দিতে যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। চটিজুতা হাতে লইয়া আমাকে প্রহার করিতে দু'চার পা অগ্রসর হইলেন; ভাগ্যক্রমে তখন বৌদিদির বাধা পাইয়া থামিয়া গেলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন—"যোগ" শব্দটি ফের যদি কখনও তোর মুখে শুন্‌তে পাই, জুতিয়ে পিঠের ছাল চামড়া তুলে দিব। আমাদের তো যত প্রকারে অপমান কর্‌বার করছিস্‌; তুই মর্‌লে আমাদের সকল উৎপাতের শান্তি হয়"—ইত্যাদি। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপ গালি খাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে আমি সেই বাসা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। স্ত্রীলোকের সম্মুখে এই অপমান। ক্রোধে, অভিমানে ও ক্লেশে আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল। আরও একবার যোগসাধন লাভের চেষ্টা করিয়া দেখিব; বিফল হইলে পশ্চাতে যাহা হয় করিব, স্থির করিলাম। আজ ভগবানকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—'যদি তাঁহার কৃপায় এই সাধন জীবনে লাভ হয়, তবে আমার যোগশক্তি দারুণ বিরুদ্ধমতি মেজদাদার ও পরে ছোটদাদার উপরে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োগ করিয়া, ইঁহাদিগকে গোঁসাইয়ের চরণেই আনিয়া বলি দিব। দীক্ষালাভের পর প্রথমে আমার এই সঙ্কল্পেই সাধন-ভজন, তপস্যা আরম্ভ হইবে।'

হতাশায় আশ্বাস।

অভিভাবকদের সম্মতি লইয়া দীক্ষা-গ্রহণ আমার কখনও হইবে না বুঝিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের উপর আমার ভয়ানক অভিমান আসিল। স্থির করিলাম, আর একবার দীক্ষার জন্য বলিয়া দেখি; এবারেও যদি গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বের ন্যায় 'পাক দেন' বা ওজর করেন, দস্তুর মত দশ কথা শুনাইয়া আসিব। কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মে সহস্র সহস্র লোককে তিনি যে দীক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কি কখনও কাহারও অভিভাবকের মতামতের অপেক্ষা করিয়াছেন? তার পরে, যদি কোন এক পরিবারের কর্ত্তা নাস্তিকই হয়, তাহা হইলে কি সে পরিবারস্থ কাহারও আর ভগবানের নাম লওয়ার অধিকার থাকিবে না? অভিভাবকের সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন কি সর্ব্বসাধারণের জন্য, না, এব্যবস্থা শুধু আমারই পক্ষে?

স্কুল ছুটির পর, সোজা একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দাদাদের অনুমতি পাইলাম না জানাইতেই, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**তোমার বড়দাদা কোথায় আছেন?**

আমি বলিলাম—বড়দাদা (শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফয়জাবাদে য়্যাসিস্‌টান্ট সার্জ্জেন।

গোঁসাই। **আচ্ছা, তুমি অনুমতির জন্য তাঁকে লিখে দাও। তিনি তোমাকে অনুমতি দিবেন। ব্যস্ত হ'য়ো না, সব ঠিক হ'য়ে আসবে।**

"যদি বড়দাদাও অনুমতি না দেন তবে কি হইবে?" একথা বলিতে আরম্ভ করামাত্রই শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্য, আমার সে কথায় বাধা দিয়া, হাতে ধরিয়া আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন—"ও কি? গোঁসাইয়ের কথার প্রতিবাদ কর্‌ছিলে! ওতে যে অপরাধ হয়। উনি যা বল্‌লেন তাই কর, বড়দাদাকে লিখে দাও। উনি যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি অনুমতি দিবেন।" আমি একথা শুনিয়া অবাক হইলাম; হাসিও পাইল। ভাবিলাম—'হা ভগবান! এমন কুসংস্কারী লোকও আবার ব্রাহ্মসমাজে আসে!' যাহা হউক, কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম এবং অনুমতির জন্য সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া বড়দাদাকে লিখিয়া জানাইলাম।

সাধনলাভে বড়দাদার সম্মতি।

বড়দাদা আমার পত্র পাইয়াই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর দিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যোগসাধন গ্রহণ করিব শুনিয়া তিনি সন্তোষপ্রকাশ পূর্ব্বক আমাকেউৎসাহ দিয়া, অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তবে পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন—"ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তুমি যে পথ অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হইয়াছ তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, বরং সন্তোষের সহিত উৎসাহই দিতেছি। কিন্তু মা আমাদের বর্ত্তমান আছেন; সুতরাং এ বিষয়ে শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মা'রও অনুমতি লওয়া উচিত।" পত্রখানি পড়িয়া, তৎক্ষণাৎ আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম। দাদার পত্রের মর্ম্ম বলাতে তিনি উহা সকলের সমক্ষেই পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। শুনিয়া সকলেই দাদার খুব প্রশংসা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন—

অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ।

এই পত্রখানা তোমার দলিল, বেশ যত্ন ক'রে রেখে দিও। এবার তোমার প্রায় সমস্তই শেষ হ'য়ে এল। আর একটি কাজ বাকী আছে। সেটি হলেই সব হয়। তোমার দাদা তোমার মা ঠাকরুণের অনুমতি নিতে লিখেছেন। এখন তুমি একদিন বাড়ী যেয়ে মা'র অনুমতি নিয়ে এস। তা হ'লেই হয়।

আমি বলিলাম, "যোগের কথা শুন্‌লে মা আমাকে কখনও অনুমতি দিবেন না। একেই তিনি মনে করেন, আমি 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' ক'রে সংসার ছেড়ে চলে যাব।"

গোঁসাই বলিলেন—**তোমার মা'কে যোগ টোগ ব'ল না; 'সাধন নিব'—এই শুধু ব'ল। তা হ'লেই তিনি অনুমতি দিবেন।**

গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এখন কি উপায়ে বাড়ী যাই? বাড়ী যাইতে চাহিলেই তো দাদারা, জিজ্ঞাসা করিবেন "কেন?" তাহা হইলেই তো সব কথা গোপন না

রাখিয়া বলিতে হইবে, বাড়ী যাওয়া যে এ সময়ে আমার পক্ষে কত শক্ত, একবার তাহা গোঁসাইকে জানাইতে ইচ্ছা হইল। এ সময়ে অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়াতে সে সুযোগ ঘটিল না। আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ব্রাহ্মসমাজে সাংবাৎসরিক উৎসব।

আজ বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীলোক পুরুষে পরিপূর্ণ। মন্দিরে ও চতুর্দ্দিকের প্রাঙ্গণে লোক আর ধরে না। গোস্বামী মহাশয় নিজ আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া উপাসনা করিতে বেদীতে বসিলেন। শারদীয়া পূজার আগমনে, পূজা আসিতেছে মনে করিয়া, দেশশুদ্ধ লোকের যে কেমন একটা আনন্দ উৎসব ও উল্লাসের উদয় হয় তাহা বর্ণনা করিয়া, তিনি উপাসনার পূর্ব্বেই সকলের ভিতরে একটা আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চার করিয়া দিলেন। উপাসনা করিতে বসিয়া দু'চার কথা বলিয়াই, ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

এই মা! এই যে আমার মা এসেছেন! মা আমার আজ তাঁর কাঙ্গাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন। মা আমাকে প্রসাদ নিয়ে সাধ্‌ছেন। মা, আজ আমি একা পাব না; সকলকে তুমি হাতে ধ'রে তোমার প্রসাদ দাও, তবে আমি পাব।

এই সব বলিয়া, ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন, গদ্গদ ভাবে করজোড়ে, কাঁদ কাঁদ স্বরে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথার, প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। অব্যক্ত একটা ভাবে সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মন্দিরের বাহিরে, ভিতরে, চতুর্দ্দিকে ভাবোচ্ছ্বাসের 'হুঁ হুঁ' শব্দ পড়িয়া গেল। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কান্নার রোল উঠিল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায়-প্রমুখ দু'চারজন গণ্যমান্য পদস্থ ব্রাহ্ম, গোলমাল থামাইতে "থামুন, থামুন, চুপ করুন, চুপ করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কে আর কার কথা শুনে? বেগতিক দেখিয়া শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় হারমোনিয়ামে সুর চড়াইয়া গান শুরু করিয়া দিলেন। এদিকে গোস্বামী মহাশয় 'জয় মা, জয় মা' বলিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, গোস্বামী মহাশয় নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বালক-বৃদ্ধ-যুবকেরা স্থানে স্থানে বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। হুঙ্কার গর্জ্জন ও বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে ব্রাহ্মমন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্ত্রীলোক-পুরুষ সকলেই আজ এই মহোৎসবে মাতিয়া গেলেন। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল, জানি না। অবশেষে গোস্বামী মহাশয় 'হরিবোল, হরিবোল। স্থির হও, স্থির হও'—বলিয়া হস্তদ্বারা সকলের মস্তক স্পর্শ করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার কর স্পর্শমাত্র যাঁহারা নৃত্য করিতেছিলেন, বসিয়া পড়িলেন, যাঁহারা চীৎকার করিতেছিলেন শান্ত হইলেন এবং যাঁহারা সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন তাঁহাদেরও বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য দৃশ্য! দেখিতে

মাতা ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী দেবী

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মচাবী মহাবাজেব
কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রথম সেবায়েত ঠাকুরবাড়ী আশ্রম, পুবী

দেখিতে ব্রাহ্মমন্দির পুনরায় শান্ত, স্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। আবার গোস্বামী মহাশয় বেদিতে উঠিয়া বসিলেন। অদ্যকার এই ভাষাতীত, নীরব উপাসনার ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে স্মরণার্থ এ ব্যাপারের অতি সামান্য একটু আভাস মাত্র এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। একরূপ ব্যাপার ব্রাহ্মমন্দিরে আমি আর ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

গোঁসাইয়ের উপদেশ—প্রার্থনার প্রকারভেদ।

আজ গোস্বামী মহাশয় বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন—

ধর্ম্মকে জীবনে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন না করিলে, উহা কখনও টেঁকে না, বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরমেশ্বরকে আমরা চার প্রকার অবস্থায় ডাকি। জল, বায়ু, আহার উত্তাপাদি দ্বারা যেমন এ দেহের রক্ষা হয়, পুষ্টি হয়; কোনটির অভাব হইলেই যেমন দেহ স্বভাব হইতেই তাহা চায়, না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে না; সেই প্রকার আত্মার কল্যাণের জন্য, আত্মার উন্নতির জন্য পরমেশ্বরের উপাসনাও প্রয়োজন হয়। আত্মা স্বভাবতঃই পরমেশ্বরকে ডাকে, তাঁর উপাসনা করে; না হ'লে স্থির হ'তে পারে না। পরমেশ্বরের কাছে কোন আশা নাই, প্রার্থনা নাই; মুক্তিও চাই না, ভক্তিও বুঝি না। তিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁকে না ডেকে পারি না, তাই তাঁকে ডাকি; এই প্রকার স্বভাব হ'তে যে তাঁকে ডাকা, ইহা বড়ই দুর্লভ এবং ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অভাববোধেও আমরা ভগবানকে ডাকি। কোনও একটা বিষয়ে তেমন অভাববোধ হ'লে, তাহা পূরণ করবার জন্য যখন কাহাকেও পাই না, নিজের অভাব ক্লেশ দূর করতে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, চেষ্টা-সামর্থ্য যখন একেবারে পরাস্ত হ'য়ে যায়, তখন চারিদিক্ অন্ধকার দেখে তাঁরই শরণাপন্ন হই, তাঁকেই ডাকি। এই ভাবে ভগবান্‌কে ডাকাও ভাল; ইহাতেও জীবনের যথেষ্ট কল্যাণ হয়। কিন্তু অভাবে পড়ে তাঁকে ডাকলাম, অভাব পূরণ হ'ল, আর তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রইল না; রোগের যন্ত্রণায় পড়ে ডাকলাম, রোগ আরোগ্য হ'ল, আর তাঁকে ভুলে গেলাম— এই প্রকার হ'লে, এই ভাবে ডাকায়, জীবনের কোন উপকারই হয় না। পরে কৃতজ্ঞতা থেকে গেলেই মঙ্গল, না হ'লে সমস্তই বৃথা।

জিজ্ঞাসুভাবে সংশয়নিবৃত্তির জন্যও আমরা ভগবান্‌কে ডেকে থাকি। 'শুন্‌তে পাই ধর্ম্ম ব'লে একটা বড়ই আশ্চর্য্য জিনিস আছে; ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌লে, ভগবান্‌কে ডাক্‌লে কোন ক্লেশই থাকে না, কোনরূপ অশান্তি নাকি অন্তরকে স্পর্শ করে না। আচ্ছা, একবার ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রে, জপ-তপ ক'রে, ভগবানকে ডেকে দেখাই যাক না কেন, সত্যই তাই কি না। হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম নাকি ভাল। আচ্ছা, দিনকতক সমাজে গিয়ে দেখিই না কেন? লোকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কত স্বার্থত্যাগ করছে, কত অপমান নির্য্যাতন যন্ত্রণা ভোগ করছে! এর

ভিতরে একটা কিছু আরামের বস্তু থাক্‌তেও পারে। আচ্ছা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক্ না কেন এতে কিছু আছে কি না'—এই ভাবের লোকই আজকাল অধিক। এদের প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই সন্দেহে পরিপূর্ণ। ভগবান্‌কে পরীক্ষা কর্‌তে যেন ইঁহারা আসেন। শ্রদ্ধা-ভক্তিশূন্য সংশয়াপন্ন মনে এসব লোক ভগবান্‌কে ডেকে কোন ফলই পান না।

অনুকরণের ভাবেও আমরা ভগবান্‌কে ডেকে থাকি। 'যারা ধার্ম্মিক, লোকে তাঁদের কেমন একটা সম্মান করে; ধার্ম্মিক লোককে সকলেই কেমন বিশ্বাস করে। একটু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌লে, ভগবানের নাম নিলে, লোকসমাজে যদি একটা প্রতিষ্ঠা হয়, ক্ষতি কি? মানুষ সম্মান লাভের জন্য কতই তো করে! আমি যদি একটু ধর্ম্মের অনুকরণই ক'রে, কীর্ত্তনাদিতে দু'চারবার 'হরিবোল' ব'লে, চীৎকার কর্‌লে ও লম্ফঝম্ফ দিলে বা উপাসনাতে একটু চোখের জল ফেলিলেই সেই সম্মান পাই, লাভ বই লোকসান তো কিছুই নাই। একবার দেখাই যাক্ না? করেই দেখি না?' এই প্রকার কপটভাবে ধর্ম্মের অনুকরণ করা অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে কল্যাণ তো কিছুই হয় না, বরং আত্মার অধোগতি হয়।

সাধনলাভে মায়ের অনুমতি।

উৎসবান্তে একদিন সন্ধ্যার পর ছোটদাদা বলিলেন—'কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ীতে লইয়া যাইতে মেজদাদা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আগামী কল্যই সে সমস্ত লইয়া তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।' আমার প্রতি ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৃপা! পরদিনই সকালে বাড়ী রওনা হইলাম। এদিকে বাৎসরিক উৎসবও শেষ হইল। এই উৎসবেই আমি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব, সর্ব্বত্র ইহা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, ডাক্তার পি, কে, রায় এবং নবকান্তবাবু প্রভৃতি অনেকে আমাকে উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্ম হইলে যদি দাদারা লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করেন, আমরা তোমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব।" মাতাঠাকুরাণীও মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবার আমি একটা কিছু কবিব। অকস্মাৎ অসময়ে বাড়ী পৌঁছিলাম দেখিয়া মা একটু বিস্মিত হইলেন। গলায় নজর করিয়া পৈতা দেখিতে পাইয়া ঠাণ্ডা হইলেন। অবসরমত, পরদিন মাতাঠাকুরাণীর আহ্নিকান্তে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম—"মা, আমি দীক্ষা নিব, আমাকে অনুমতি দাও।" শুনিয়াই মা কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তুই কি পৈতা ফেলে ব্রাহ্ম হ'বি? আমি বলিলাম—"না, মা; আমি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নিব। তুমি আশীর্ব্বাদ ক'রে অনুমতি না দিলে তিনি আমাকে সাধন দিবেন না।" এই বলিয়া, আবার লুটাইয়া পড়িয়া মা'র পা দু'টি জড়াইয়া ধরিলাম। মা তখন আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আমি তো নিজে আর ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই কর্‌তে পারলাম না। তোরা যদি করিস্, নিষেধ কর্‌ব

কেন? তুই ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর্, সাধন-ভজন কর, আমার তাতে খুব অনুমতি আছে, আমার তাতে খুব আনন্দ। তুই পৈতাটি ফেলিস্ না, আর আমি যতকাল জীবিত আছি, নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাস্ না—এইটি করিস্। সংসারে থেকেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর্। ভগবান্ তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। আমিও তোকে এই আশীর্ব্বাদ করি।" মাতাঠাকুরাণীর চরণ-ধূলি লইয়া আমি ঢাকা রওনা হইলাম। যথাকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে পৌঁছিয়া সমস্ত কথা জানাইলাম। তিনি খুব সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—

বেশ হ'য়েছে। তুমি বৃহস্পতিবার ভোরে স্নান ক'রে এস, তা হ'লেই হবে।

এই কথাটি গোস্বামী মহাশয়ের মুখ হইতে বাহির হওয়া মাত্র, 'পাছে আবার কোনও পাকচক্রে ফেলেন' এই ভাবিয়া, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আমার দীক্ষা।

২রা পৌষ,
বৃহস্পতিবার,
কৃষ্ণপঞ্চমী,
১২৯৩।

মনের উদ্বেগে সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রে ৩॥ টার সময়ে উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিয়া, ব্রাহ্মমন্দিরে প্রচারক-নিবাসের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিতে লাগিলাম—গোস্বামী মহাশয় করতাল বাজাইয়া ভোর-কীর্ত্তন করিতেছেন। **"জয় জ্যোতির্ম্ময়, জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন"**—এই গানটি গাইতে গাইতে, এক একবার ভাবাবেশে তিনি রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ দ্বারে বসিয়া রহিলাম। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী মহাশয় বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া হাসি-মুখে বলিলেন—

এত ভোরে এসেছ? তা বেশ হয়েছে। এখন সমাজে গিয়ে ব'সো। একটু বেলা হোক্; পরে, শুভক্ষণ বুঝে তোমাকে ডেকে নিব।

আমি সমাজ-ঘরে আসিয়া বসিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গোস্বামী মহাশয় আমাকে ডাকিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—**"চল উপরে যাই, সেইখানে কাজ হবে।"** আমি গোস্বামী মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক, শ্রীধর ঘোষ, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। দোতলার পূবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঐ ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দু'খানা আসন পাতা রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় দেওয়াল ঘেঁসিয়া পশ্চিমমুখো হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে প্রায় ৩॥ ফুট অন্তরে অন্য আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা এই সময়ে ধুনুচিতে করিয়া আগুন আনিয়া দিল। গোস্বামী মহাশয় ধুপ-ধুনা-গুগ্‌গুল-চন্দনাদি অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া, করজোড়ে বারংবার নমস্কার করিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। অবিরল ধারে তাঁহার গণ্ড

বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। এখন কিছুক্ষণের মত গোস্বামী মহাশয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকিবেন অনুমানে, ব্যাকুল অন্তরে. কাতরভাবে, আমি মনে মনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে জ্ঞানস্বরূপ, জাগ্রতপুরুষ, হে স্বর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী, দীন-জনের একমাত্র গতি পরমেশ্বর, হে পতিতপাবন দয়াময় প্রভু, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি আর না করি, তুমি এখানে আছ, আমার অন্তরের সমস্ত অবস্থাই দেখিতেছ। বহুকাল হইতে তোমার চরণলাভ করিবার আকাঙ্খা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, দিন দিন তুমি আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছ, নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপদ সৃষ্টি করিয়া. তুমিই দয়া করিয়া তাহা হইতে আবার আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। প্রভু, যেমন আশা দিয়াছ, ফলও তেমনই দিও। তোমাকে লাভ করিবার উপায় আমি কিছুই জানি না। প্রভো, তুমি সর্ব্বঘটে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। আজ গোঁসাইয়ের ভিতরে তুমি থাকিয়া আমাকে দীক্ষা দাও। তোমার শ্রীচরণ লাভ করিবার পথ তুমিই আমাকে বলিয়া দাও। এখন আমি আমাকে তোমার শান্তিপ্রদ অভয় চরণে সমর্পণ করিলাম। হে সর্ব্বশক্তিমান্, সত্য-স্বরূপ, পুরাণপুরুষ, এ সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের মুখে তুমিই আমাকে সাধন দাও। তাঁর ঐ মুখে তুমিই আমাকে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নাম বলিয়া দাও। এখন গোঁসাইয়ের মুখের প্রত্যেকটি শব্দ তোমারই অভ্রান্ত বাণী বলিয়া আমি গ্রহণ করিব। তোমার শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা বিষয়ে তুমিই আমার একমাত্র সাক্ষী রহিলে। স্বয়ং তুমিই আমাকে আজ দীক্ষা না দিলে গোঁসাইয়ের মুখ অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া পড়ুক । আর কি বলিব, তুমিই আমাকে দয়া কর।"

প্রার্থনান্তে, নমস্কার করিয়া চাহিয়া দেখি গোস্বামী মহাশয় পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন, তাঁহার কলেবর কণ্টকিত হইতেছে। করজোড়ে গদগদ স্বরে—"**নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ। যো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতঃ**"--ইত্যাদি স্তোত্র পড়িতেছেন। পরে, কয়েকবার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিলেন। অতঃপর "**জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু**" কয়েকবার বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন; কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া, ভাব-সংবরণ পূর্ব্বক, মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন—

পরমহংসজী* দয়া ক'রে তোমাকে এই মন্ত্র দিচ্ছেন—তুমি গ্রহণ কর! এই বলিয়া আমাকে অপ্রাকৃত দুর্লভ মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং নামের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে, শাস্ত্রসম্মত গুরুমুখী প্রাণায়াম দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, **এইরূপ করতো**। আমিও ঐ প্রকার করিতে লাগিলাম। গোঁসাই তখন উচ্চৈঃস্বরে "**জয়গুরু, জয়গুরু**" বলিতে বলিতে,

---

*'গোঁসাই'-এর গুরুদেব, কৈলাসসমীপস্থ মানসসরোবরবাসী শ্রীশ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী।

ভাবাবেশে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। সংজ্ঞালাভের পর বলিলেন—**"প্রতিদিন দু'বেলা এইরূপ কর্‌তে চেষ্টা ক'রো।"**

আমাকে আর সাধনের কোন উপদেশই দিলেন না। আমিও মনে মনে নাম জপ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। শুনিলাম, এ পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমাঅপেক্ষা বয়সে ছোট কেবলমাত্র ফণিভূষণ ঘোষ (শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) ও গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যাগণ মাত্র দীক্ষালাভ করিয়াছেন। শুনিলাম আমার দীক্ষার সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীধর ঘোষ মহাশয়, "আমি যেন বীর্য্যধারণ করিতে সমর্থ হই", এই সংকল্পে অতি ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা প্রদানকালে দীক্ষার্থীর ভিতরে অব্যক্ত এক শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন, সর্ব্বত্রই এই কথা প্রচারিত আছে; কিন্তু আমার মধ্যে কোনও শক্তি সঞ্চার করিলেন এইরূপ কিন্তু আমি কিছুই বুঝিলাম না। আমার নিজের মত, সংস্কার ও ভাবের অনুযায়ী মন্ত্র লাভ করিয়া আমার একটা খুব আনন্দ হইল।

সাধনের বৈঠক।

দীক্ষা গ্রহণের পরে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে ঘন ঘন যাইতে লাগিলাম। স্কুল-কলেজের ছাত্র ও অফিস-আদালতের বাবুরা অনেকেই প্রত্যহ অপরাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রচারক-নিবাসে পূবের 'কোঠা'র উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গোস্বামী মহাশয়ের আসন। মধ্যাহ্নে ও বিকালে যখনই যাই গোস্বামী মহাশয় স্বীয় আসনে সম্মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া, কখনও বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ অবস্থায়, নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন, দেখিতে পাই। শ্রীযুক্ত আশানন্দ বাউল ও শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস মহোদয়ের অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত কেদারবাবু প্রতিদিনই বিকালে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসেন। গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে উঁহাদের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন আছে। গোঁসাই ধ্যানস্থ থাকিলেও উঁহারা কৃষ্ণকথা আরম্ভ করিয়া দেন; কখনও বা রাধাপ্রেমের গান বা গৌরকীর্ত্তন জুড়িয়া দেন। ক্রমে গোস্বামী মহাশয়েরও ধ্যানভঙ্গ হয়। বাউল বৈষ্ণবদের এই সব গানে গোস্বামী মহাশয়ের ভাবোচ্ছাস দেখিলে, আমাদের তাহা ভাল লাগে না; সুতরাং একটু ফাঁক পাইলেই আমরাও অমনই উচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেই। বাউল বৈষ্ণবেরাও ঐ সময়ে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়ে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ভাবেই যায়। সন্ধ্যার পরে গোস্বামী মহাশয় কয়েক মিনিটের জন্য শৌচে যান। পরে আসনে আসিয়া ধূপ ধুনা জ্বালিয়া নিজে করতাল বাজাইয়া সন্ধ্যাকীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনের পরেই দরজা বন্ধ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের অনুগত শিষ্যগণ ব্যতীত তখন প্রচারক-নিবাসে অপর কোনও লোক থাকিতে পারেন না। গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে

১২৯৩ সালের ৩০ শে পৌষ পর্য্যন্ত।

আমাকে বৈঠকে* যোগ দিতে বলিয়াছেন; তদনুসারে আমিও 'বৈঠকে' বসি। প্রাণায়াম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই গোঁসাই আমাকে তাঁহার সম্মুখে দু'হাত অন্তরে বসিতে বলেন। প্রায় সাতটা আটটার সময়ে প্রাণায়াম আরম্ভ হয় এবং অবিচ্ছেদে এক ঘণ্টা প্রাণায়ামের পর একটি সঙ্গীত হয়। ইহার পরে আবার প্রাণায়াম চলে। এই প্রকার তিনবার প্রাণায়াম করিতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যায়। শুধু প্রাণায়ামে মনোযোগ পড়িলেই গোঁসাই আমাকে নামে চিত্ত স্থির রাখিতে বলেন। বাহিরে প্রাণায়াম, অন্তরে নাম—ইহা কিছুতেই আমার হইতেছে না। 'বৈঠকে' গোঁসাই শিষ্যদের নানাপ্রকার ভাবোচ্ছ্বাস এবং গোস্বামী মহাশয় যে অশ্রুপূর্ণনয়নে ও গদগদ স্বরে **জয় বারদীর ব্রহ্মচারীজী! জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসজী! জয় মাতাজী! জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব!**—বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন তাহা দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। 'বৈঠকে'র সময়ে ঐ সব মহাত্মাদের নাকি আবির্ভাব হয়; গোঁসাই শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহা দর্শন করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হন। আমি কিন্তু কিছুই দেখি না; তবে গোস্বামী মহাশয়ের মুখের প্রত্যেকটি শব্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ; ভিতরে কেমন যে একটা অবস্থা হয় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। যথার্থই মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয় কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতে প্রবল কৌতূহল জন্মিল। এই সময়ে কয়েকদিন উপর্য্যুপরি আমাকে 'বৈঠকে' উপস্থিত হইতে দেখিয়া, গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—**ছাত্রাবস্থায় মনোযোগ ক'রে পড়াশুনা করাই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। সপ্তাহে একদিন তুমি বৈঠকে যোগ দিও, তা হ'লেই হ'বে।** গোস্বামী মহাশয়ের কথামত সপ্তাহে একদিন মাত্র বৈঠকে যোগ দিতে লাগিলাম।

ইহা কি যোগশক্তি?

ছোটদাদার একটি বন্ধুর মাতৃবিয়োগ হইল। তাঁহার নিকট ঘটনাটি গোপন রাখিয়া তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছান আবশ্যক হইল। আমি তাঁহাকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মাতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। বাড়ীর সকলের মরা-কান্নার রোলে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আমার মাও যদি অকস্মাৎ মরেন, কি করিব? মা আমার মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছেন, এই প্রকার একটা উদ্বেগে আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম এবং মা'কে দেখিতে অমনি বাড়ী রওনা হইলাম। প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি, বিষম ব্যাপার' পাড়ার প্রায় সমস্ত লোক আমাদের বাড়ীতে আছেন; এক এক স্থানে দু'চার জন বসিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া কাঁদিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই

* সতীর্থগণের সঙ্গবদ্ধ হইয়া সাধন-ভজন।

তাঁহারা বলিলেন—"মা তো চল্‌লেন। এসেছিস, ভাল হ'য়েছে। একবার গিয়ে মা'কে এ সময়ে দেখে নে।" রাস্তার ক্লেশে শরীর আমার অবসন্ন, তার উপরে মা'কে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, এ সময়ে গোঁসাই যদি মা'কে আমার রক্ষা করেন তবেই ভরসা' না হ'লে আর আশা নাই। আমি গোঁসাইকে স্মরণ করিয়া আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। গোঁসাইয়ের নিকটে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীরও ভেদ-বমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—"মা'র আর আশা নাই, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর এখনও জীবনের আশা আছে।" কলেরা রোগের কতকগুলি ঔষধের ফর্দ্দ তিনি করিয়া দিলেন, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তাহা জুটিল না। গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হওয়ার এই সুযোগ বুঝিয়া, ঔষধ আনার উপলক্ষে মা'কে ফেলিয়া আমি অবিলম্বেই ঢাকায় রওনা হইলাম। ঢাকায় পৌঁছিয়া, সোজা একেবারে ব্রাহ্মসমাজে গোঁসাইয়ের নিকটে গেলাম। গোঁসাই আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন— **কি? তুমি এ সময়ে এখানে? বাড়ী যাও নাই? ওঃ, বাড়ী থেকে এলে বুঝি?**

আমি বলিলাম—এইমাত্র বাড়ী থেকে আস্‌ছি।

গোঁসাই—**কেমন, অবস্থা কি রকম?**

আমি বলিলাম—মা'র ও একটি ভাইঝির কলেরা হ'য়েছে।

গোঁসাই । **তুমি ঔষধ নিতে এসেছ?**

আমি । হ্যাঁ।

গোঁসাই । **তা হ'লে তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়। মেয়েটি কি ছোট?**

আমি বলিলাম—সাত আট বৎসরের হবে।

গোঁসাই শুনিয়া 'আহা আহা' করিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক চোখ বুজিলেন এবং ক্লেশসূচক 'উঃ! উঃ!' শব্দ করিয়া দু'তিন মিনিট স্থির হইয়া রহিলেন। আমি এই অবসরে মাতা ঠাকুরাণীর আরোগ্যলাভের জন্য মনে মনে গোঁসাইয়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম। গোঁসাই চোখ মুছিয়া, সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

মা'র জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না। ওষুধ নিয়ে যাও; ওতে গ্রামবাসীদেরও উপকার হবে।

আমি তাড়াতাড়ি ঔষধ লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। সমস্ত পথটি কেবল গোঁসাইয়ের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। এ সময়ে আমি বাড়ী ছাড়িয়া রহিয়াছি দেখিয়া গোঁসাই বিস্ময় প্রকাশ করিলেন কেন? আর, আমি যে বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহাই বা তিনি জানিলেন কি প্রকারে? 'কেমন? অবস্থা কি রকম?'—কিছু না জানিলে, এরূপ প্রশ্নই বা করিবেন কেন? মেয়েটির কথা শুনিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে তো মনে হয় মেয়েটি আর নাই। 'ঔষধে পাড়ার লোকের উপকার হবে' বলিলেন অথচ মেয়েটির কথা বলিলেন না। ইহাতে এই

ঔষধ যে মেয়েটির আর প্রয়োজনে লাগিবে না, তাহাই তো প্রকারান্তরে জানাইলেন। মা'র জন্য ব্যস্ত হইতে বারণ করিলেন। তবে কি মা আমার ভাল হইবেন? দেখা যাক্ এসব কথা কতদূর ঠিক হয়। আমি দ্রুতগতিতে বাড়ী পৌঁছিবামাত্রই শুনিলাম, সকালেই মেয়েটি মারা গিয়াছে আর মা'র অবস্থা এখন ভালর দিকে ফিরিয়াছে।

ক্রমে মা সুস্থ হইলেন। এই ঘটনাটিতে গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার চিত্তে একটা তোলপাড় অবস্থা উপস্থিত হইল। ভাবিলাম—'গোঁসাই কি তবে জ্যোতিষ জানেন? কিন্তু তাহা জানিলেও তো গণনা করিতে একটু সময় লাগে; কই, তা' তো দেখিলাম না। তবে বোধ হয় গোঁসাই যোগশক্তি লাভ করিয়াছেন। যোগ-শক্তির দ্বারা চৈতন্যময় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইলে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা—এমন কি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর প্রত্যেকটির তত্ত্ব পর্য্যন্ত—প্রকাশ পায়। বোধ হয়, সেই শক্তির প্রভাবেই গোঁসাই মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ দেখিয়া বলিতে পারেন।' আবার ভাবিলাম—'তাহা কি আর এতই সহজ? গোঁসাইয়ের এত অল্পকালের মধ্যে ঐ প্রকার অবস্থা লাভ করা কি সম্ভব? গোঁসাই বড় ভাল মানুষ, তাই স্বাভাবিক ভাবে সহানুভূতি করিয়াই এসব কথা বলিয়াছিলেন; খাপে খাপে আমার লাগিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাঁহার উপরে আমার অন্ধ বিশ্বাস জন্মিতেছে।' যাহা হউক, আমি কিছু মীমাংসা করিতে না পারিলেও, এ ব্যাপারে আমার মনে কেমন একটা চমক লাগিয়া গেল; এবং আপনা আপনি গোঁসাইয়ের উপরে একটা শ্রদ্ধা আসিয়া পড়িল। মাতা ঠাকুরাণী একটু সুস্থ হওয়ার পরেই আমি গোঁসাইকে দেখিতে ঢাকায় রওনা হইলাম।

মাঘোৎসবে অভিনব ব্যাপার।

মাঘ মাসের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মসমাজে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। মাঘোৎসব যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সমাজেও ততই লোকের ভিড় বাড়িতেছে। ময়মনসিংহ, বরিশালে, ফরিদপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহু গণ্যমান্য লোক এই উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দিতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও অনেক ব্রাহ্ম ঢাকাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের (হরিনাথ মজুমদার ও প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়ের) গান আজকাল বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই উঁহাদের কথা। সকল সম্প্রদায়ের লোকই উঁহাদের গানে মত্ত। কয়েকদিন হইল তাঁহারাও, গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া উৎসব করিতে, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের আবাসেই অবস্থান করিতেছেন।

১০ই মাঘ, শনিবার, ১২৯৩ সন।

সকালে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া দেখি— প্রচারক-নিবাস লোকে পরিপূর্ণ। গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির, খুব উৎসাহের সহিত, ভাবে উন্মত্তবৎ হইয়া

উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছেন— 'মা, নই আমি সে ছেলে। যা'র আছে সাধনের জোর, সে কি মা তোর ভয় করে তুই ভয় দেখালে?' ঘরের ভিতর বাহিরে সমস্ত লোকগুলি নীরব নিস্তব্ধ ভাবে এক অবস্থায় উপবিষ্ট; কেবল একা গোস্বামী মহাশয়ই স্বীয় আসনের উপর দণ্ডায়মান;—দৃষ্টি সম্মুখের দিকে স্থির, চোখে পলকমাত্র নাই, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল চক্ষু দু'টি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। মুখটি ফুলিয়া গিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতেছে; দু'টি গণ্ড বহিয়া অবিশ্রান্ত দর দর ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার বাম হস্ত বক্ষঃস্থলে, দক্ষিণ হস্ত করমুদ্রাবদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মতালুতে। তিনি পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। এক একবার উচ্চকণ্ঠে **'হরিবোল', 'হরিবোল'** বলিয়া, উর্দ্ধদিকে লম্ফ দিয়া প্রায় দেড় হাত দুই হাত উঠিয়া পড়িতেছেন, আবার স্থিরভাবে মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইয়া আপাদমস্তক থর থর কাঁপিতেছেন। পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ধরিয়া ফেলিতেছেন। একটু পরে গোস্বামী মহাশয় খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই হাসিও এক চমৎকার ব্যাপার। উচ্চ হাসির অদ্ভুত খল্ খল্ ধ্বনিতে ঘরটি যেন কাঁপিতে লাগিল। উত্তরোত্তর হাসির বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দীর্ঘকালব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন হাসির খল্ খল্ শব্দে শরীর আমার কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। এইপ্রকার হাসি জীবনে আমি আর কখনও শুনি নাই। ক্রমাগত সাত আট মিনিট ধরিয়া গোস্বামী মহাশয় এইরূপ হাসিলেন কিন্তু এ অবস্থায়ও তাঁহার চোখের জলের বিরাম নাই; বরং আরও অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতে লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ হাসি থামিয়া গেল। সতৃষ্ণ নয়নে সম্মুখের দিকে চাহিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। পরে, মস্তকস্থিত দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে রাখিয়া, তর্জ্জনীসঙ্কেতপূর্ব্বক গদগদ ভাবে, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

ঐ দেখ, ঐ দেখ— তোমরা সকলে দেখে নাও— ঐ দেখ পাগ্‌লা এসেছে। ঐ যে পাগ্‌লা দাঁড়ায়ে র'য়েছে। পাগ্‌লা যেতে চায়। (দু'চার পা অগ্রসর হইয়া, খুব ব্যস্ততার সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন) **ধর্, ধর্, ধর্। না, আবার ফিরেছে। দেখ,— দেখ, পাগ্‌লা যে এদিকে আস্‌ছে; ঐ দেখ, ঐ ঐ। বাব্বা, কত বড় গরু। ওটা কেমন দেখ,—বাঃ ওর কপালে একটা চোখ, সেটার জ্যোতিঃ কত। সূর্য্যের মত— এ যে সূর্য্যই দেখ্‌ছি। বাঃ, এ আবার কি? উঃ, কত বড় শিং। আহা, ঐ দেখ নন্দী ভৃঙ্গী। মনে করেছিলাম, ওরা কেউ নয়। পাগ্‌লার সঙ্গে ওরা যে এদিকে আস্‌ছে।** চমকিত ভাবে দু'চার পা পশ্চাতে সরিয়া, সম্মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, করজোড়ে কম্পিত কলেবরে, নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—**জয় মা! জয় মা! সকলে দেখ আমার মা এসেছেন। ধন্য মা, ধন্য মা! আহা, কত যোগী, কত ঋষি মা'র চার দিকে নাচ্‌ছেন! ঐ দেখ, শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠাদি; আরও কত!— নাম জানি না। আহা, বাড়ীর সামনে সবটা যে ভরে গেল। এঁরা কত আনন্দ করছেন! আমার মা'কে নিয়ে আনন্দ কর্‌ছেন! আহা, ওখানে সকলেই ত আছেন; আমার পরিচিত**

কত লোকও যে আছেন। বাঃ, আবার তামাসা দেখ— মাও যে আমার সকলের সঙ্গে নাচ্‌ছেন! ঐ দেখ, মা আমাকে ডাক্‌ছেন।—এই বলিয়া, খুব বড় বড় লম্ফ দিতে লাগিলেন। পরে মাটিতে পড়িয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দর্‌ দর্‌ ধারে অবিশ্রান্ত চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্ববৎ খল্‌ খল্‌ শব্দে উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত লোক অবাক্‌, স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এগারটা পর্য্যন্ত গোঁসাইয়ের সমাধিভঙ্গ হইল না দেখিয়া, ধীরে ধীরে সকলে ক্রমে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বাসায় আসিবার পর কয়েক ঘণ্টা চিত্তটি বেশ সরস ও প্রফুল্ল রহিল; পরে ধীরে ধীরে মনের ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত হইল। মনে হইল—"গোঁসাই এসব কি করিতেছেন? নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রধান আচার্য্য হইয়া অনায়াসে ব্রাহ্ম-মন্দিরে দাঁড়াইয়া পৌত্তলিকতা প্রচার করিতেছেন! নন্দী ভৃঙ্গী, বাল্মীকি নারদাদির দর্শন ও সময়ে সময়ে তাঁহাদের স্তব স্তুতি—এসব কি? শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিকটে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের সমাজে বসিয়া, তাঁহাদেরই সমক্ষে, এ সকল আবোল তাবোল বলা কি স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্য্য? এরূপ ব্যাপারে ব্রাহ্মেরাও কিছু বলিতেছেন না কেন?" আমি অত্যন্ত উত্তেজিত, অধীর হইয়া নবকান্তবাবু, রজনীবাবু প্রভৃতির কাছে যাইয়া তখনই এসব কথা তুলিলাম। তাঁহারা বলিলেন— 'মাঘোৎসব হ'য়ে যাক্‌, এসব নিয়ে এবার বিষম আন্দোলন হবে। এখন একটা গোলমাল না করাই ভাল।'

ভোজনকালে ভাববৈচিত্র—অপূর্ব্ব উপাসনা।

১১ই মাঘ, রবিবার, ১২৯৩।

আহারান্তে বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। প্রচারক-নিবাসে গিয়া আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অবাক্‌ হইলাম! গোস্বামী মহাশয়ের যোগ-পথাবলম্বী বহুলোক, ফিকিরচাঁদের কয়েকটি এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেকে বসিয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আহার করিতে বসিয়াছিলেন। ডাল, ভাত, তরকারী ইত্যাদি আহারের সামগ্রী সকলেরই সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেহই আহার করিতেছেন না,—সকলেই ভাবে মগ্ন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় একাকী গান করিতেছেন, আর নিজেই খোল বাজাইতেছেন। তাঁহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। সমানে দু'হাতে তালি খোলের উপরে পড়িতেছে, দৃষ্টি গোঁসাইয়ের দিকে স্থির, উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন, আর মত্ত হইয়া লাফাইতেছেন; খোলে আজ এক অপূর্ব্ব শব্দ বাহির হইতেছে, গানের তো কথাই নাই। বোধ হইতে লাগিল, যেন বহু খোল একতালে বাজিতেছে, আর বহুলোক এক স্বরে গান করিতেছে। এপ্রকার চমৎকার ব্যাপার আর কোথাও দেখি নাই। যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছিলেন,

দু'চার গ্রাস খাইতে না খাইতে, তাঁহারাও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। কাহারও ভাতের গ্রাস হাতেই রহিয়াছে; কেহ আবার পাতের উপর পড়িয়া আছেন; মুখের ভাত মুখে রাখিয়া কেহ কেহ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছেন; আবার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইতেই কেহ কেহ সেই সব ডাল, ভাত, তরকারী স্বচ্ছন্দে সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন। কাহারও অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহিতেছে; কেহ বা কম্পিত কলেবরে পুনঃ পুনঃ চমকিয়া উঠিতেছেন। কোন কোন ব্যক্তির ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে; আবার কাহারও কাহারও মুখ হইতে এক-প্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে। শিক্ষিত ব্রাহ্মদেরও এপ্রকার অসম্ভব ভাব দেখিয়া ভূতের কাণ্ড মনে হইতে লাগিল। উচ্ছিষ্ট থালা ও পাতার উপরে কেহ কেহ গড়াইতেছেন দেখিয়া, তাড়াতাড়ি থালা পাতা সমস্ত সরাইয়া ফেলিলাম। মহাভাবের তরঙ্গ আরও বাড়িয়া পড়িল। খোলের ধ্বনি ও গানের শব্দ আরও যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। পার্শ্ববর্ত্তী কোঠার ভিতরে মেয়েরাও মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কান্না, চীৎকার, 'আহা', 'উহু' এবং প্রবল ফোঁসফোঁসানিতে এক অদ্ভুত ধ্বনির সৃষ্টি হইল। মুহুর্মুহুঃ প্রাণায়ামের শব্দে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আজ আর ভিতর বাহির নাই—সব একাকার। প্রকাশ্য স্থানে সর্ব্বসমক্ষে প্রাণায়ামের 'দম' চলিতে লাগিল। বারান্দা ও আঙ্গিনার লোকগুলিরও নানাপ্রকার অবস্থা। কাহারও বাহ্যজ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ বিকট চীৎকার করিতেছেন। আবার কতকগুলি লোক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন। গোস্বামী মহাশয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ প্রভৃতিও সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কুঞ্জ বাবুর ভিতরে অসামান্য শক্তি প্রবেশ করিল। তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া উচ্চ লম্ফ দিতে দিতে, খোল বাজাইয়া গানই করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে খোলের বা গানের শব্দ কিছুই আর বুঝিতে পারিলাম না। একপ্রকার একটা অদ্ভুত, দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী ধ্বনির প্রবল তুফান বহিতে লাগিল এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহারই ঝাপটায় আমারও শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ভিতরে বাহিরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আমিও আর কোন দিকে নজর করিবার অবসর পাইলাম না। এ ভাবে কত সময় চলিয়া গেল জানি না। কতক্ষণ পরে দেখি, বেলা শেষ হইয়াছে, গানও থামিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় নিজ আসনে বসিয়া আছেন, মাতালের মত শরীর ছাড়িয়া দিয়া, এক একবার দক্ষিণে, বামে এবং সম্মুখে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন; সময়ে সময়ে চোখ মেলিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইতেছেন। সমস্ত নিস্তব্ধ। গোস্বামী মহাশয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন— **অতলস্পর্শ মহাসাগরে একগণ্ডুষমাত্র জলে আজ গিয়ে পড়েছিলাম। সাগরের যে ঢেউ। এক ধাক্কায় আবার তীরে এনে ফেলেছে। আহা, এই মহাসাগরে যাঁরা একবার গিয়ে পড়েছেন, তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কত নৃত্য কর্‌ছেন ! কত আনন্দ কর্‌ছেন।**—ইত্যাদি।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে ব্রাহ্মমন্দির ও উহার চতুর্দ্দিকের বারান্দা লোকে লোকারণ্য হইয়া

গেল। গোস্বামী মহাশয় যথাসময়ে প্রচারক-নিবাস হইতে, ভাবে বিভোর হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে, ব্রাহ্মমন্দিরে বেদির উপরে যাইয়া বসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাজাইয়া সুমধুর স্বরে গান করিলেন। 'উদ্বোধন' আরম্ভ করিয়া ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রনাথবাবু আবার গান ধরিলেন। প্রার্থনার সময় গোস্বামী মহাশয় ভগবান্‌কে অতি কাতরভাবে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে সমস্তগুলি লোক যেন অসাড় হইয়া রহিল। মনে হইল যেন ভগবানের আবির্ভাব জনিত জীবন্ত ভাবে সমগ্র ব্রাহ্মমন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল! গোস্বামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

মা, এসেছ? আহা, তোমার সঙ্গে কত লোক! ঐ যে কত মুনি, কত ঋষি, কত সাধু মহাত্মারা র'য়েছেন! মা, তোমার চারদিকে কত আনন্দে এঁরা নৃত্য কর্‌ছেন! ওখানে আমার পরিচিতও তো কতলোক দেখছি! মা, আমাকে ডাক্‌ছ কেন? আমি কি ওখানে যেতে পারি? তুমি দয়া ক'রে আমায় হাতে ধরে নিবে? আমার যে যাবার ক্ষমতা নাই। আর, আমি যাবই বা কোথায়? ওখানে? না, তা কি হয়? কেন মা, আমায় ফাঁকি দিচ্ছ? আমার কি সাধ্য ওখানে যেতে পারি, ঐ স্থানে বস্‌তে পারি? মা, আমাকে ওখানে বস্‌তে দিবে, বার বারই বল্‌ছ কেন? আমি যে নিতান্ত পাপী। ঐ সব মুনি ঋষিদের সাম্‌নে আমি কি ক'রে বস্‌ব মা?— এই প্রকার কতক্ষণ বলিয়া গোস্বামী মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গানের পর গান হইতে লাগিল, গোস্বামী মহাশয়ের আর চৈতন্য হইল না। ক্রমে সমাজের কার্য্য বন্ধ হইল, একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয় বেদির উপরে একই ভাবে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। কতরাত্রি পর্য্যন্ত এভাবে থাকিলেন, জানি না।

এবার মাঘোৎসবে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছি। সমাজাঙ্গনে অগণ্য লোকসঙ্ঘের স্থান সংকুলান হইতেছে না। সকল শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীরাই গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে মনে করি, দশটি লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনাতেও আমরা গোঁসাইকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজের গর্ব্ব করি। কিন্তু আজকাল গোস্বামী মহাশয় যে কি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সাকার কি নিরাকার কোন্ মতের যে পক্ষপাতী, ঠিক পরিষ্কাররূপে তাহার কিছুই বুঝিতেছি না। প্রকাশ্য সভাতে তিনি একবার দাঁড়াইয়া তাহার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিলে, এ সম্বন্ধে সকলেরই মনের খট্‌কা চুকিয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে, আমরা 'সাকার ও নিরাকার-উপাসনা' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গোস্বামী মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন বক্তৃতা করিতে রাজী হইলেন না। 'পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান' সম্বন্ধেও কিছু বলিতে রাজী নহেন। অবশেষে 'ব্রহ্মোপাসনা' সম্বন্ধে তাহার মত বলিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমরাও অবিলম্বে শহরের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া দিলাম। অদ্যই সন্ধ্যার সময়ে বক্তৃতা হইবে।

১২ই মাঘ, সোমবার।

অব্যক্ত বক্তৃতা।

অপরাহ্নে সমাজে যাইয়া দেখি, মন্দিরে ও বারান্দায় আর স্থান নাই। চতুষ্পার্শ্বের বিস্তৃত ভূমিও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে অনেকে বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, সমাজ হইতে চলিয়া যাইতেছেন। রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জ্জার সুবিখ্যাত পাদরী বার্ণার্ড সাহেবও আসিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে গোস্বামী মহাশয় বক্তৃতাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলকে করজোড়ে অভিবাদন করিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—

পুরাকালে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, সনক-সনাতনাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন,—শাস্ত্র-পুরাণ-বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদাদি, যে ব্রহ্মের মহিমার কণিকামাত্র বর্ণন করিতে গিয়া, পার না পাইয়া 'অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছেন,—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ অজ্ঞান আমি—আমার মুখে আজ আপনারা সেই মহান্ ব্রহ্মের কথা শুনিতে আসিয়াছেন! ইত্যাদি বলিতে বলিতে বালকের মত 'হাউ-হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে গিয়া কান্নার বেগ চাপিতে পারিলেন না, পরে বসিয়া পড়িলেন! পাঁচ ছয় মিনিট পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। এবারেও মহর্ষিগণের ধ্যানগম্য, পরাৎপর পরব্রহ্মের বিষয়ে দু'চার কথা বলিতেই কান্না আসিয়া পড়িল। এক একবার চেষ্টা করিয়া, বলিতে গিয়া থামিয়া থামিয়া যাইতে লাগিলেন; পরে ভাবের অদম্য আবেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে, উপবিষ্ট অবস্থাতেই কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে সকলকে কহিতে লাগিলেন—**আজ আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনারা সকলে দয়া ক'রে আমার মস্তকে পদাঘাত ক'রে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আমি ভয়ানক অভিমানী—আমি তাঁর কথা ব'ল্‌ব? আমি কি জানি? আমি ছাই! আমি ছাই!** এই প্রকার বলিয়া, সেই অনাদি, অনন্ত, একমাত্র অদ্বিতীয়, পুরাণপুরুষের স্তবের কয়েকটি শ্লোক পড়িয়াই ভাবাবেশে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। অস্ফুট ভাষায় ভাবমগ্নাবস্থায় শুধু **'ত্বং হি', 'ত্বং হি'** বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইলেন।

জনতাপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজ একেবারে নিস্তব্ধ। গোস্বামী মহাশয়ের ঐ 'ত্বং হি', 'ত্বং হি' বলার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা হইয়া গেল। সকলেই গোস্বামী মহাশয়ের দিকে উল্লসিত প্রাণে তাকাইয়া কতক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। এই ভাবে ৫/৭ মিনিট অতীত হইল। পরে চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের চৈতন্য হইল না। ধীরে ধীরে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। দলে দলে লোক সমাজ-পরিবেষ্টনীর স্থানে স্থানে একত্র

হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া যে উপকার হইত, আজ গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আমরা অধিক উপকার লাভ করিলাম। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ!

আসন-নমস্কারে কুসংস্কার।

গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহ ঘুরিয়া ঢাকায় ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম; শুনিলাম তিনি তখন শৌচে গিয়াছেন। আমি ঐ ঘরে বসিয়া রহিলাম। একটু পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ও আসিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের শূন্য আসনটির সম্মুখে গিয়া কপাল ঠুকিয়া নমস্কার করিলেন। মনোরঞ্জনবাবুকে উৎসাহী ব্রাহ্ম বলিয়াই আমরা সকলে জানি। তাঁহাকে আজ এভাবে শূন্য আসনকে নমস্কার করিতে দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি না আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম? ওখানে নমস্কার করিলেন কেন?' তিনি বলিলেন—'আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হ'লে কি গোঁসাইকে নমস্কার করিতে নাই?'

২০শে মাঘ,
মঙ্গলবার।

আমি। ওখানে গোঁসাই কোথায়? তিনি তো পায়খানায়।

মনোরঞ্জনবাবু। তা হউক্। ওখানে আমি গোঁসাইকেই স্মরণ করিয়া নমস্কার করিয়াছি। এতে কোন দোষ হয়, আমি মনে করি না।

আমি। এ কথা আপনি ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া বলিতে সাহস করেন? তা' হলে হিন্দুদের আর 'অন্ধ-বিশ্বাসী, কুসংস্কারী' বলেন কেন? এ সকল কথা লইয়া মনোরঞ্জনবাবুর সহিত আমার তর্ক বাধিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয় শৌচ হইতে আসিয়া, পাশের ঘরে জলযোগ করিতে ছিলেন। তিনি আমাদের এই সব কথা-কাটাকাটি শুনিয়া স্বীয় শাশুড়ী (শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী) 'বুড়ো ঠাকরুণ'কে বলিলেন—**'শূন্য আসনের সাম্‌নে আর কেহই নমস্কার না করেন, আপনি এদের জানিয়ে দিবেন। এই নিয়ে আবার আলোচনা অশান্তি হবে।'** আমার আর ওখানে থাকিতে ভাল লাগিল না। নবকান্তবাবুর বাসায় চলিয়া আসিলাম। কয়েকটি ব্রাহ্মকে ওখানে পাইয়া, তাঁহাদের নিকটে ঝগড়ার বিবরণ জানাইলাম এবং আরও দশ কথা তুলিয়া, প্রচারক-নিবাসে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে তাহাও জানাইলাম। 'গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যোগধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিলেই ভাল ভাল লোকগুলিও বিগড়াইয়া যায়, তাঁদের এই রকম দুর্দ্দশা ঘটে'— এইরূপ বলিয়া তাঁহারা আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন—গোঁসাইয়ের পদত্যাগসঙ্কল্প।

এবার দেখিতেছি, সভা-সমিতি করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য-কলাপ, সাধন-ভজন-সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। "গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে তাঁহার দ্বারা আর প্রচারকের কার্য্য চলে না। নির্জ্জনতা প্রিয় গোস্বামী মহাশয়ের ধ্যান ধারণা সমাধি ব্রাহ্মসমাজের কোন উপকারেই আসিতেছে না। উঁহা দ্বারা সমাজের আর উন্নতির আশা নাই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যাহাই করুন না কেন; প্রকাশ্য ভাবেও যখন তিনি গুরুবাদ স্বীকার করিতেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত সমাজের নেতা হইয়াও যখন তিনি নিতান্ত অজ্ঞানের ন্যায় 'শাস্ত্র অভ্রান্ত' এই কুসংস্কারাপন্ন মতও প্রচার করিতেছেন, তখন তাঁহার দ্বারা এই সমাজের শ্রীবৃদ্ধির আশা কোথায়? অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিলে আর 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক' নাম কেন? হিন্দু দেব দেবী, হিন্দুদের আচার-পদ্ধতি এবং হিন্দুদের প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া, এখন বরং তিনি সময়ে সময়ে ঐ সকলের প্রশ্রয়ই দিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্টই হইতেছে।" এইরূপ অনেক কথা ব্রাহ্মদের ঘরে ঘরে, প্রকাশ্য সভাস্থলে এবং বহুল প্রচারিত ব্রাহ্ম-সংবাদ পত্রসমূহে আলোচনা হইতেছে। প্রচারকের কার্য্য গোস্বামী মহাশয় না করেন, অধিকাংশ ব্রাহ্মেরই এখন এইপ্রকার ইচ্ছা জন্মিয়াছে।

মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত।

শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় নাকি প্রচারকপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে, উদাসীনের মত, অবশিষ্ট জীবন নির্জ্জনে সাধন-ভজন করিয়া কাটাইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। অনতিবিলম্বেই তিনি গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে চলিয়া যাইবেন।

বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা

আজ রাত্রিতে সাধন-বৈঠকে যোগ দিব মনে করিয়া স্কুল ছুটির পরেই প্রচারক-নিবাসে উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের আসনের ধারে একজোড়া খড়ম রহিয়াছে দেখিলাম। গোস্বামী মহাশয় তখন আসনে ছিলেন না। খড়ম জোড়া খুব বড় ও পুরাতন দেখিয়া, হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ খড়ম কার? গোঁসাইয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন—'ব্রহ্মচারী গোঁসাইকে দিয়াছেন।' আমি বলিলাম— 'ব্রহ্মচারী আবার কে?' তিনি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি ব্রহ্মচারীর কথা শুন নাই? সমাধির অবস্থায় গোঁসাই জান্‌তে পান যে বারদীতে একজন মহাপুরুষ গোপনে র'য়েছেন। গোঁসাই তারপর তাঁকে দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলেন। তাঁর বয়স এখন ১৫৬ বৎসর। ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, তিনি গোঁসাইয়ের পিতামহের

ফাল্গুন ১২৯৩ সাল।

খুড়ো হন। পূর্ব্বপুরুষের চিহ্ন ব'লে তিনি এই খড়ম জোড়া আর ঐ কম্বলখানা গোঁসাইকে দিয়েছেন।'' ব্রহ্মচারীর বিষয় জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। সাধন বৈঠকে বসিয়া রাত্রে শিষ্যদের সঙ্গে প্রাণায়াম করিবার সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রায়ই গদ্‌গদ্‌ভাবে 'জয় ব্রহ্মচারী! জয় রামকৃষ্ণপরমহংস! জয় মাতাজী! জয় পরমহংসজী! জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব'— এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। মহাপুরুষদের আবির্ভাবে তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরে আশ্চর্য্য ভাবোচ্ছ্বাস ও অলৌকিক অবস্থাদির বিকাশ হইতে দেখি। এই ব্রহ্মচারীই কি সেই সব মহাপুরুষদের মধ্যে একজন? একজন ভজনশীল গুরুভ্রাতাকে ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—কিছুদিন হইল, সমাধির অবস্থায় গুরুদেব বারদীতে একটি মহাপুরুষ আছেন জানিতে পান। সেই সময়ে ব্রহ্মচারী মহাশয়ও গোস্বামী মহাশয়ের বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদেরই কোন কোন গুরুভ্রাতাকে বলেন— 'গোঁসাই একবার এসে আমাকে দর্শন দিবেন না? তিনি না এলে আমাকেই যেতে হবে। ভাল লোক বলে শুনেছি, কোনও বিশেষ সম্বন্ধও থাকতে পারে। তা না হ'লে তাঁর দিকে প্রাণ এত টানে কেন?' গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদের মুখে এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ের বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে আমি একান্ত উৎসুক রহিলাম।

বারদী হইতে আসিয়া গোস্বামী মহাশয় এই গুপ্ত মহাপুরুষ ব্রহ্মচারীকে সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন। ঢাকা, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এখন ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে বারদী যাইতেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মচারীর নাম প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যে সকল ঘটনা শুনিতেছি, আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যদি কখনও তাঁহার দর্শন পাই, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার মুখেই তদীয় জীবনের অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া 'ডায়েরীতে' লিখিয়া রাখিব আকাঙ্ক্ষা রহিল।

দ্বারভাঙ্গায় গোঁসাইয়ের প্রাণসংশয় পীড়া।

স্কুল ছুটি হইতেই বাড়ী আসিয়াছি। অনেকদিন গোস্বামী মহাশয়ের কোন খবর পাই নাই। গুরুভ্রাতাদের নিকটে যাইতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। ঢাকা রওনা হইলাম। শঙ্করটোলায় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাসার বিপরীত দিকে আমার একটি বন্ধুর বাসায় আসিয়া উঠিলাম। ভোরবেলায় জানালা খুলিয়া বসিয়া আছি, প্রসন্নবাবুর বাসায় বহু লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলাম। রাম মজুমদার মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার। ১২৯৪
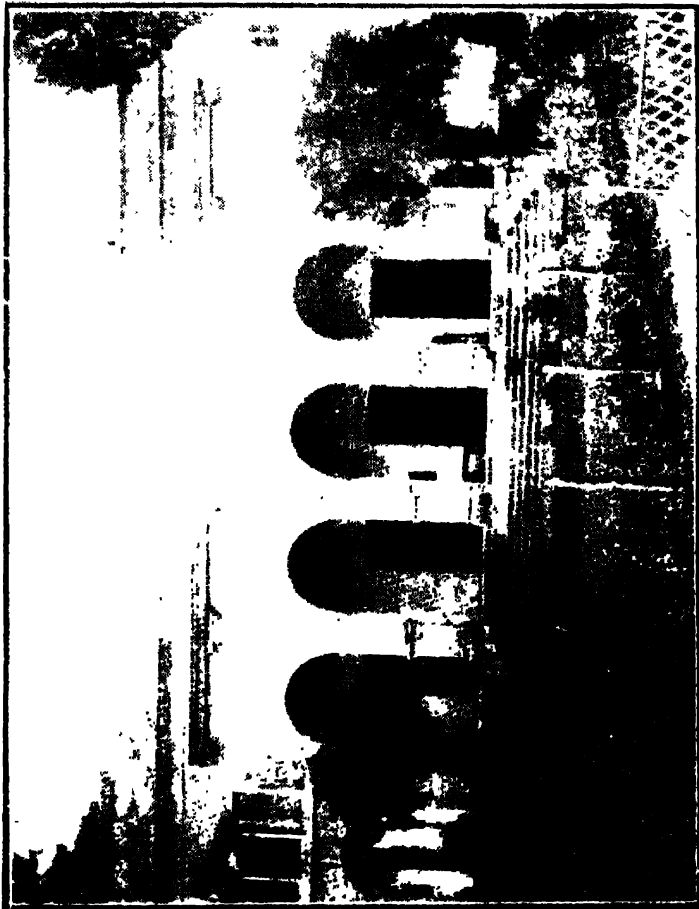
ঢাকা ব্রহ্মসমাজ

শ্রী শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ

অযোধ্যায় হনুমান গৌরীর মন্দির

বলিলেন—'আপনি গোঁসাইয়ের কোন খবর রাখেন? তাঁর যে বিষম অসুখ।' কথাটা শুনিবামাত্র আমি ছুটিয়া ডাক্তারবাবুর বাসায় গেলাম। পৌঁছিয়া দেখি—অনেক গুরুভাইভগিনী সে বাসার নানাস্থানে দলে দলে গোঁসাইয়ের কথা বলিতেছেন, কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে ব্যস্ত হইয়া রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'দ্বারভাঙ্গাতে গোস্বামী মহাশয়ের ডবল নিউমোনিয়ায় দুইটি ফুসফুসই পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবস্থা খারাপ। গোঁসাইয়ের পরিবার, যোগজীবন, কুঞ্জ ঘোষ, প্রসন্নবাবু, ইঁহারা গতকল্যই দ্বারভাঙ্গায় গিয়াছেন। কাল সকালে আমরা এখান হইতে আরজেন্ট ('জরুরী') টেলিগ্রাম করিয়াও এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাইলাম না। কি হইয়াছে জানি না।' গোঁসাইয়ের অবস্থা শুনিয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। 'হু হু' করিয়া কান্না আসিয়া পড়িল। বাসায় আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সাতটা হইতে বেলা প্রায় একটা পর্য্যন্ত অবিরাম কাঁদিয়া, ভগবানের চরণে ও গোঁসাইয়ের গুরু পরমহংসজীর নিকটে তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিলাম। প্রাণটা জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সংসার অন্ধকার মনে হইল। গোঁসাইয়ের আরোগ্য সংবাদের জন্য দিনরাত ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইতে লাগিলাম।

আকাশপথে ব্রহ্মচারীর দ্বারভাঙ্গায় গমন।

দ্বারভাঙ্গায় এবার যেভাবে গোস্বামী মহাশয় আরোগ্যলাভ করিলেন, সে এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত। শুক্রবার সকালে টেলিগ্রাম আসিল—"গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থা খারাপ, ডবল নিউমোনিয়া হইয়া দু'টি ফুস্‌ফুস্‌ই পচিয়া যাইতেছে; জীবনের আশা নাই।" 'তার' পাইয়া সেই দিনই গোঁসাইয়ের সমস্ত পরিবারসহ কয়েকজন গুরুভ্রাতা দ্বারভাঙ্গায় রওনা হইয়া গেলেন। এদিকে আমাদের গুরুভাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় এই কুসংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট বারদী চলিয়া গেলেন এবং ব্রহ্মচারীর পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমার গুরুদেবকে আপনি দয়া করিয়া রক্ষা করুন। আমার জীবনের অর্দ্ধাংশ লইয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিউন।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তিনি গেলেনই বা; আমি তো রয়েছি।" সরল গুরুগত প্রাণ বক্সী মহাশয় বলিলেন, "আমরা আপনাকে চাই না, তাঁকেই চাই।" তাঁর অকপট গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইলেন, পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সময় শেষ করে এসেছিস্‌। এখন আর কি হবে? আমি তো তাঁকে ঘরে দেখ্‌তে পেলাম না। হয়, হয়ে গেছে অথবা তাঁর গুরু তাঁকে দেহ ছেড়ে থাক্‌বার শক্তি দিয়েছেন। আচ্ছা, তুই যা ; মঙ্গলবারের মধ্যে যদি 'তার' আসে তবে বুঝ্‌বি ভয় নাই। চিন্তা করিস্‌ না। আমি সেখানে যাচ্ছি।" ইহার পর ব্রহ্মচারী মহাশয় আসন হইতে উঠিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"যত দিন ভিতব হইতে দরজা না খুলি, কেহ এ দরজায় ঘা দিও না বা ইহা খুলতে চেষ্টা ক'রো না।" ব্রহ্মচারী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিলেন।

সে দিন ঢাকা হইতেও পূর্ব্বোক্ত সকলে দ্বারভাঙ্গা যাইতেছিলেন। গোয়ালন্দের জাহাজে উঠিয়া সকলে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন, কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। অকস্মাৎ যোগজীবন আকাশের দিকে তাকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ও দ্বারভাঙ্গায় যাচ্ছেন। আমাকে তিনি হাত নাড়িয়া বলিলেন—'আমিও দ্বারভাঙ্গায় যাচ্ছি। তোরা আর ভাবিস্ না, কোনও ভয় নাই।" বুড়োঠাক্‌রুণও দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, পাশের ঘরে ব্রহ্মচারী, গোঁসাইয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকার গুরুভ্রাতারা টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটাছুটি করিতেছিলেন। খবর আসিল গোস্বামী মহাশয় ভাল হইতেছেন।

গোঁসাইয়ের দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি।

গত ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার এই সময়ের কোন বিবরণই আমার ডায়েরীতে রহিল না। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় তাঁহাদের ডায়েরীতে গোঁসাইয়ের এই সময়ের অদ্ভুত ঘটনাবলী বিশদরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ সময়ে গোস্বামী মহাশয় কোথায় কি ভাবে ছিলেন, উঁহাদের ডায়েরীদৃষ্টে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস এই স্থলে লিখিয়া রাখিতেছি।

১০ই ফাল্গুন গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমে যাওয়ার অভিপ্রায়ে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় এক দিবস অপেক্ষা করিয়া পরদিন শ্যামনগরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে নৌকাযোগে চুঁচুড়াতে পৌঁছিয়া, বুধবার শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন; মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আহা! সকলে বলে 'গোঁসাই পাগল হয়েছেন, পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করেন'; কিন্তু কই? আমি তো এঁকে ধূপ ধুনার সুগন্ধ-ধূমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় দেখ্‌ছি।"

এই সময়ে মহর্ষির নিকট একখানা চিঠি আসিয়া পড়িল। কোনও একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম কতিপয় প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়াছেন, "আপনি নির্জ্জনে অনেক দিন ধরিয়া ধর্ম্ম সাধন করিলেন—কি লাভ করিলেন? এবং এই সম্বন্ধে আপনি কি উপদেশ দেন?" ইত্যাদি। মহর্ষি পত্রখানার উত্তর দিতে, তাঁর অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন—"লিখে দাও এখন হতে *** গোঁসাই যাহা বলেন, তাহা আমারই কথা।"

মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোস্বামী মহাশয় বর্দ্ধমানে গেলেন। তথায়, ব্রাহ্মসমাজের সন্নিকটে সমাজের সেক্রেটারির বাসায় অবস্থান করিয়া, নিত্যই সংকীর্ত্তনে মহা আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ, কলিকাতা এবং বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও আসিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াস্ত গোঁসাইকে লইয়া সকলে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। একদিন গোস্বামী মহাশয় একটি পলাশ বৃক্ষ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পরে উহার প্রতি পুষ্পে পুষ্পে ভগবতীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! আর একদিন মহারাজার গোলাপবাগে যাইয়া গোলাপফুলের শোভা দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ হইলেন। বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে তিনি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত প্রভৃতিকে দীক্ষা প্রদান করিলেন তৎপরে, শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইয়া, দ্বারভাঙ্গার দিকে রওনা হইলেন।

চৈত্র মাসের মধ্যভাগে গোস্বামী মহাশয় দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিলেন। কয়েক দিন পরেই তাঁর বুকের নিম্নভাগে এক প্রকার বেদনা আরম্ভ হইল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে 'নক্স বমিকা' সেবন করিয়া কয়েক দিন একটু ভাল থাকিলেন। কিন্তু পরে আর তাহাতে কোন উপকার হইল না। তখন সমস্তিপুর হইতে বিখ্যাত ডাক্তার নগেন্দ্র বাবুকে আনা হইল। এদিকে বাঁকি-পুরের উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় তথাকার সুপ্রসিদ্ধ দুইটি ডাক্তার পাঠাইয়া দিলেন। চারজন বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ডাক্তার প্রিয়বাবুও ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের চিকিৎসাতে গোঁসাইয়ের বেদনার কোন উপশমই হইল না; বরং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তিও রহিত হইল। শয্যায় শয়ান অবস্থায় থাকিয়াই তিনি বাহ্যে-প্রস্রাবাদি করিতে লাগিলেন। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়ার শোচনীয় পরিণামে, গোঁসাইয়ের জীবন বিষয়ে সকলে একেবারে নিরাশ হইলেন। পরে একদিন গোস্বামী মহাশয়ের মুমূর্ষুকাল উপস্থিত হইলে, অকস্মাৎ তাঁহার গুরু মানস-সরোবরনিবাসী শ্রীযুক্ত পরমহংসজী কয়েকটি মহাপুরুষের সহিত সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়া, অলৌকিক শক্তি প্রয়োগে গোস্বামী মহাশয়কে আরোগ্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

গোস্বামী মহাশয় সুস্থ হইয়া ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবসে, পরিবারবর্গ ও শিষ্যগণের সহিত দেওঘরে রওনা হইলেন। রাস্তায় মোকামাঘাটে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই সময়ে জ্ঞানবাবু টিকেট করিতে বুকিং অফিসে গেলেন—আসিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি লিচু গাড়ীতে রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"লিচু কোথা হইতে আসিল?" গোঁসাই বলিলেন—**"দ্বারভাঙ্গায় থাক্‌তে লিচু খেতে ইচ্ছা হয়েছিল, তাই পরমহংসজী দিয়ে গেলেন।"** সকলেই খুব আশ্চর্য্য হইলেন। কে যে কখন লিচু দিয়া গেলেন উঁহারা কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ দিকে এখনও লিচু পাকে নাই—এই প্রকার সুপক্ক লিচু কোথা হইতে সংগ্রহ হইল?

দেওঘরে পৌঁছিয়া গোঁসাই স্কুলগৃহে বাসা লইলেন। নানাস্থানে বেড়াইয়া এবং বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া, পরদিন সকালে আদর্শ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। সেই দিবস ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবুর সহিত ধর্ম্মালাপে এতই আনন্দোচ্ছ্বাস হইল যে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, কাহারও ক্ষুধা তৃষ্ণা স্নান আহারের দিকে একবারও লক্ষ্য

পড়িল না। দেওঘর হইতে গোঁসাই কলিকাতা আসিলেন। কলিকাতা হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে সকলকে লইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হন। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় শিষ্যবর্গের সহিত শান্তিপুরের অনতিদূরে বাবলায় গিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পাট দর্শন করেন। স্থানটি অতি নির্জ্জন ও রমণীয়, তপস্যার পক্ষে বড়ই উপযুক্ত। এই স্থানে গোস্বামী মহাশয় সকলকে বলিলেন—**"দেবতার স্থানে যেয়ে বিগ্রহের প্রতি দৃষ্টি স্থির ক'রে একাগ্রভাবে নাম কর্‌তে থাক্‌লে, আসল দেবতার দর্শন লাভ হইতে পারে।"** অদ্বৈত প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া গোঁসাই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় চুয়াডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কুমারখালি চলিয়া গেলেন। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই সকলে এক সঙ্গে ঢাকা পৌঁছিলেন। পরে, দু'চার দিন বিশ্রাম করিয়া সকলকে লইয়া গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে বারদী যাত্রা করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, 'তোমাকে তো আমি, দ্বারভাঙ্গায় যাইয়া, ঘরে দেখিতে পাইলাম না। গোঁসাই বলিলেন—**"আমার গুরুদেব আমাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া নিয়া রাখিয়াছিলেন।"** বারদীতে কয়েক দিন অবস্থানপূর্ব্বক এখন তিনি ঢাকায় আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক-নিবাসে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেছেন।

ব্যাধিমুক্তির অদ্ভুত বিবরণ।

গোস্বামী মহাশয় ঢাকা আসিয়াছেন। অপরাহ্ন ৫।। টার সময়ে গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে সমাজে গেলাম। গোস্বামী মহাশয়ের পত্নীকে আজই প্রথমে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। প্রচারক-নিবাসে আজ লোক ধরে না। গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। একটি কথাও বলিবার অবসর পাইলাম না। গোঁসাইয়ের চেহারা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শরীর অত্যন্ত কাতর। মাথায় চুল নাই—নেড়া। বর্ণ একেবারে কাল, দেহ অতিশয় দুর্ব্বল এবং শীর্ণ। হাত পা—এমন কি, মাথাটি পর্য্যন্ত—শুকাইয়া গিয়াছে। খুব চেনা লোকেরও গোঁসাইকে এখন দেখিলে ভ্রম হয়। তিনি স্থির অনিমেষ নয়নে শুদ্ধাসনে একভাবে বসিয়া আছেন। সাধন ছাড়া আর কর্ম্ম নাই। কেহ কোনও প্রশ্ন করিলেই চমকিয়া উঠিতেছেন; অতি সংক্ষেপে একটু উত্তর দিয়াই আবার নিজের ভাবে মগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

গোস্বামী মহাশয়ের আরোগ্যের বিষয় শুনিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিল। তাঁহার শিষ্যদের মুখে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিতেছি, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ২/৪ দিন প্রচারক-নিবাসে যাতায়াত করিয়া পণ্ডিত মহাশয় শ্রীধর প্রভৃতির মুখে গোঁসাইয়ের রোগারোগ্যের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিলাম; গোস্বামী মহাশয় নিজেও সময়ে সময়ে ওবিষয়ে যে

প্রকার পরিচয় দিলেন, তাহাতে ইঁহাদের কথার কোন অমিল পাইলাম না। যথাশ্রুত আশ্চর্য্য ঘটনাটি লিখিয়া রাখিতেছি।

গোস্বামী মহাশয়ের রোগ খুব সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়াইলে তাঁহার নিত্য-সঙ্গী শিষ্যগণ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডাক্তার সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া যথাসাধ্য গোঁসাইয়ের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, গোঁসাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ একেবারেই খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। সকলে তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বিছানার দিকে তাকাইয়া এক একবার চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। উঁহারা দেখিতে পাইলেন চারিজন সূক্ষ্মদেহধারী—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক, কেহ পক্কশ্মশ্রু ও জটাধারী, কেহ শ্যামবর্ণ, কেহ বা তেজঃপূর্ণ গৌরকায় স্থূল ও দীর্ঘাকৃতি—প্রাচীন মহাপুরুষ গোঁসাইয়ের চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার অমনই লয় পাইয়া যাইতেছেন। উঁহারা কে, কেনই বা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতেছেন আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইতেছেন— তাঁহাদের ভিতরে সেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশু বিপদাশঙ্কায় অতীব ভীত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কেহ কেহ উঁহাদের মধ্যে সুপরিচিত বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিয়া শুভাদৃষ্ট মনে করিয়া হৃষ্ট ও আশ্বস্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে, গোস্বামী মহাশয়ের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল; নাড়ীর আর স্পন্দন নাই। ডাক্তার বাবুরা আসিয়া, একবার দেখিয়া, বাহিরে যাইয়া বলিয়া গেলেন—"আর বিলম্ব নাই, এবার হ'য়ে এল।" তখন রাধাকৃষ্ণবাবু, একতারা লইয়া, আকুল হইয়া একান্ত কাতরপ্রাণে ভগবানের নাম গাইতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শরীর স্থির, অসাড় ছিল। জানি না কি প্রকারে, কি শক্তি-সঞ্চারে তিনি দু'একবার মাথা নাড়া দিয়াই, অকস্মাৎ চকিতের মত লাফাইয়া উঠিলেন এবং উচ্চ "**হরিবোল, হরিবোল**" বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। এ কি! এ কি হইল, এ কি দেখিতেছি, এ যে ভগবানের অসাধারণ কৃপা সাক্ষাৎভাবে অবতীর্ণ। গুরুগতপ্রাণ গোঁসাই-শিষ্যেরা, ভাবে দিশাহারা হইয়া, "জয় দয়াল ঠাকুর", "বোল হরিবোল" বলিয়া, ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনের মহারবে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয়ের বিপদ গণিয়া বহুলোক ছুটাছুটি করিয়া কীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তখন অদ্ভুত ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়কে নৃত্য করিতে দেখিয়া এবং হুঙ্কারগর্জ্জনসংযোগে উচ্চ "হরিবোল" বলিতে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ডাক্তারবাবুরা সংকীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন, গোস্বামী মহাশয়কে উচ্চলম্ফপ্রদানপূর্ব্বক "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে কীর্ত্তন থামিয়া গেল। গোস্বামী মহাশয়ও মাটিতে পড়িয়া, ভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। তখন ডাক্তারবাবুরা বলিলেন—"মহাশয়, আমাদের ডাক্তারীশাস্ত্র মিথ্যা। আমরা যে

কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না—আজ আপনার জীবনলাভে তাহাই পরিষ্কার প্রমাণ হইল।"

গোস্বামী মহাশয় অতঃপর একবার সপরিবারে বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানেও নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল।

২৩শে আষাঢ়।

ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ।

২৬শে আষাঢ়, শনিবার।

আজকাল সর্ব্বত্র গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া যে ভাবে আলোচনা হইতেছে তাহা আর আমাদের সহ্য হয় না। কোন প্রকারে গোস্বামী মহাশয়ের মুখ দিয়া প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার ও হিন্দুসমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দু'চারটি কথা পাইলে আমরা গোঁসাইকে আমাদেরই মত ব্রাহ্মমতাবলম্বী বলিয়া দশজনের মুখ বন্ধ করিতে পারি। কিন্তু তিনি ধর্ম্মবিষয়ে কোন কথাই কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলেন না, এ এক বিষম মুস্কিলই হইয়াছে। আজ গোস্বামী মহাশয়কে "ধর্ম্ম ও নীতি" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হইল। শরীর অতিশয় কাতর হইলেও, তিনি ইহাতে রাজী হইলেন। অপরাহ্ন ৫॥ টার সময়ে তিনি ব্রাহ্মমন্দিরে আসিয়া সামান্য একখানা বেঞ্চের উপরে বসিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন। আমি নোট করিতে লাগিলাম, যথা—

আজকার বলিবার বিষয়—'ধর্ম্ম ও নীতি'। ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝিব? যেমন আগুনের ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম্ম শীতলতা, ধর্ম্মও সেইরূপ মানবের স্বভাব। যাহা সভ্য অসভ্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী, শিশু বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলপ্রকার-অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যেই সাধারণভাবে আছে, তাহাই মানবের স্বাভাবিক গুণ। এই গুণ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা। এই তিন গুণের উৎকর্ষ সাধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ইহাই মানবের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সত্য বস্তু। যে সত্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, যাহা প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষেরও মতবিরোধ নাই, যাহা সকলের পক্ষেই সত্য, তাহাই মানব প্রকৃতির ভোগ্য—স্বভাবের সত্য।

জগৎকে কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ আছে, আমি একজন আছি। এই তিনটি জ্ঞান সমস্ত মানবের স্বাভাবিক। ইহা কোথাও শিখিতে হয় না। সত্য কথা বলা উচিত, অন্যের প্রতি অত্যাচার করা অসঙ্গত, ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ও স্বভাবের সত্য। যেখানে মনুষ্য আছে সেখানেই এ সকল সত্য; সত্যবোধ স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে আছে। মনের এ সকল সরল সত্যকে যিনি যে পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন, জ্ঞান তাঁর নিকটে সেই পরিমাণে প্রকাশিত হইবে। সরল সত্যের অনুসরণ করিলেই ধর্ম্মলাভ করা যায়। মানবের যথার্থ প্রকৃতি বা সরল

সত্যই মানবের ধর্ম্ম। সন্তুষ্ট-চিত্ত না হইলে ধর্ম্ম কখনও লাভ হয় না। সরলভাবে সত্য পালন করিলেই চিত্তে সন্তোষ লাভ হয়। অসত্য কার্য্য, অসত্য চিন্তা করিলে চিত্তে অসন্তোষ জন্মায়, সন্তুষ্টচিত্ত হইতে হইলে সর্ব্বদা সরলভাবে সত্যের অনুসরণ করিতে হয়।

সরল সত্যের যিনি অনুষ্ঠান করিবেন তিনি প্রাণের স্বাভাবিক বৃত্তির অনুরোধেই করিবেন; কিছুরই অপেক্ষা রাখিবেন না; দশের দিকে, সমাজের দিকে, কারও উপকার বা অনিষ্টের দিকে—এমন কি, নিজেরও মঙ্গল অমঙ্গলের দিকে—দৃষ্টিশূন্য হইবেন; আপন কর্ত্তব্য আপন মনে করিয়া যাইবেন। তাঁর কার্য্য লোক-দেখান হইবে না। কারও দিকে না তাকাইয়া, চন্দ্র সূর্য্যের মত, আপন কাজ নীরবে করিয়া যাইবেন। এইরূপে কেহ চলিলে, চতুর্দ্দিকে লোকে তাঁর জীবন দেখিয়া জীবন পাইবে, ধন্য হইবে।

নীতি কি? যে সকল সরল সত্যের কথা বলা হইল—অর্থাৎ সত্যকথা বলা, কারও অপকার না করা, অশ্লীল ও অনিষ্টকর ব্যবহার হইতে বিরত থাকা ইত্যাদি,—তাহাই সাধারণ নীতি। এই সাধারণ নীতি সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাকৃতিক ও মানবজাতির স্বাভাবিক নীতি—ইহা সকলেরই পালনীয়। ইহা-ভিন্ন, আরও অন্য প্রকারের নীতি আছে। তাহা দেশভেদে, কালভেদে ও পাত্রভেদে কখনও আবশ্যক হয়, আবার কখনও বা হয়ও না। এই নীতি সকল স্থানে সমান নয়। এক দেশের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবলম্বন করিতে হয়, অন্য দেশের পক্ষে তাহা ঘোরতর পাপ বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। কোথাও লোকে মৎস্য-মাংসাহার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, আর কোথাও বা জঘন্য পাপ বলিয়া বিষবৎ ত্যাগ করেন। কোন স্থানে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে দূষিত জলবায়ু ও স্থান সংশোধনের জন্য, সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্য, নূতন কতকগুলি নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়; কিন্তু ম্যালেরিয়া কমিয়া গেলেই আর সেই নীতি নিয়া কাজ করা প্রয়োজন হয় না; কালভেদে যে নীতির প্রয়োজন, কালেই আবার তাহা অনাবশ্যক বোধ হয়। ইহার সঙ্গে খুব কম লোকেরই সম্বন্ধ থাকে। হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের লোকের পক্ষে এই নীতি ; কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি বহুস্থানে এই নীতি অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং দেশভেদে নীতি এ দেশে আছে, অন্য দেশে নাই; কালভেদে নীতি আজ আছে, কাল নাই; আবার পাত্রভেদে নীতি আমার পক্ষে আছে, তোমার পক্ষে নাই। কিন্তু সহজ ধর্ম্মনীতি যাহা দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয় নাই, তাহা সর্ব্বত্র চিরকালই একভাবে আছে। তাহা আত্মার কল্যাণ সম্বন্ধে আত্মার উন্নতি বিষয়ে সকলের পক্ষেই সমান। কিন্তু অবস্থাভেদে মনুষ্যের সাধারণ নীতি ও কর্ত্তব্যের পার্থক্য থাকিবেই।

একটি আমগাছের পাঁচটি আম খাইয়া উহার আঁঠি দুপাঁচ হাত অন্তর অন্তর পুতিলেও তার বৃক্ষগুলি ঠিক একরূপ হয় না। আবার একই গাছের পাঁচটি আম সর্ব্বাংশে কখনও

ঠিক একই প্রকার দেখা যায় না। স্বাদে, ওজনে, অবয়বে একটির সঙ্গে অন্যটির একটু প্রভেদ থাকিবেই। বীজের প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে জলবায়ু উত্তাপাদি আকর্ষণ করিয়া ভিন্ন প্রকার হয়। সেইপ্রকার একই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাঁচটি সহোদর ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যের অধীন হয়। মানবশরীরে যে সব মাংসপেশী, যতখানা হাড়, শিরা, নাড়ী, অস্ত্র, অবয়বাদি থাকা আবশ্যক, তাহা প্রত্যেকের একমত থাকিলেও, রুচি, অনুভব ও কার্য্য ঠিক একপ্রকার দেখা যায় না। সেইপ্রকার কর্ত্তব্য ও মূল ধর্ম্মনীতি যদিও সকলেরই এক তথাপি উহার আচরণ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য সমান নয়।

মানুষের কর্ত্তব্য সকলেরই এক না হইলেও দেশগত, সমাজগত, কালগত নীতি এবং যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নেয় তাহা পরিষ্কার অন্যায় বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইব, তাহাই আমার ধর্ম্ম। মূল ধর্ম্ম-নীতি প্রতিপালন না করিলে যে প্রকার অনিষ্ট হয়, অপরাধ হয়, দেশগত, সমাজগত ও কালগত স্বীকৃত কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে চলিলেও ঠিক সেই প্রকার পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে, সরল প্রাণে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহার তাহাই ধর্ম্ম, তাহার তাহাই অবশ্য পালনীয়।

শরীর অতিশয় কাতর বলিয়া গোঁসাই আর বেশী বলিতে পারিলেন না। গোঁসাইয়ের বক্তৃতা খুব ভালই লাগিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য-মত কিছুই তিনি বলিলেন না; এজন্য একটু দুঃখিতও হইলাম।

ত্রাটক সাধনের প্রণালী।

প্রতিদিন অপরাহ্নে যেমন ব্রাহ্মসমাজে গিয়া থাকি, আজও সেই প্রকার গেলাম। শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাকে দেখিয়া বলিলেন —"সাধনের একটি নূতন অঙ্গ গোস্বামী মহাশয় আমাদের ব'লে দিয়েছেন। তোমাকেও ব'লেছেন কি? না ব'লে থাক্‌লে, এখনই গিয়ে তুমি গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা কর।"

১লা শ্রাবণ।

আমি তৎক্ষণাৎ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। দেখি, সেখানে অন্য কেহ নাই। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন? সাধন কিরূপ চলছে? আমি প্রাণায়াম করাকেই প্রধান সাধন ভাবিয়া রাখিয়াছি। তাই বলিলাম—'বাড়ীতে সাধন হয় নাই। এখন একরূপ চলছে।'

গোঁসাই বলিলেন— **'নাম কর তো? নাম ক'রে কেমন বুঝ?'** আমি বলিলাম— 'নাম ক'রে সময়ে সময়ে আনন্দ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভগবানের উপর নির্ভর কর্‌তেই ভাল

লাগে।' গোঁসাই বলিলেন,—'**বেশ! অল্প বয়সে সাধন নিয়েছ, জীবনে খুব উন্নতি করে যেতে পারবে। আমি দিন শেষ করে' সাধন পেয়েছি; বুড়ো বয়সে এখন আর কি কর্‌ব? তুমি কোন্ ক্লাশে পড়? লেখাপড়া ভাল চল্‌ছে তো?**'

গোঁসাইয়ের কথায় আমি 'হাঁ' মাত্র বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি নাকি কি এক নূতন সাধনের কথা বলে দিয়েছেন? পণ্ডিত মহাশয় তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বল্‌লেন। আমিও কি তা করতে পারি?

গোঁসাই বলিলেন—**হাঁ তুমিও।**

এই বলিয়াই চোখ্ বুজিলেন। আমি আবার সাহস করিয়া বলিলাম—'নিয়মাদি আমি তো কিছুই জানি না।' গোঁসাই মাথা তুলিয়া আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—"**পণ্ডিত মহাশয়ের কাছ থেকেই জেনে নাও গিয়ে।**" এই বলিয়া আবার চোখ বুজিলেন। আমিও অমনি পণ্ডিত মহাশয়কে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশানুরূপ যোগক্রিয়ার 'ত্রাটক সাধনের' বিষয়টি বলিয়া দিলেন।

অবসরমত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে এই সাধনের অনুষ্ঠান প্রণালীগুলি বেশ পরিষ্কাররূপে জানিয়া লইলাম। ক্রম-অনুসারে পঞ্চভূতেই এই সাধন করিতে হয়। প্রথম অভ্যাস ক্ষিতিতে; তাহার প্রণালী বলিয়া দিলেন। সবুজবর্ণ ক্ষিতিজ সম্মুখে রাখিয়া, অনিমেষে উহার স্থান বিশেষে চেষ্টাদ্বারা দৃষ্টি একাগ্র করিতে হয়। গুরুর সঙ্কেত অনুসারে, ভিতরে ও বাহিরে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে মনঃসমাবেশপূর্ব্বক গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র সাধন করিতে হয়। পুনঃপুনঃ চেষ্টা দ্বারা অবিকারে, বিনা অশ্রুপাতে, অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল স্থির একাসনে উপবিষ্ট থাকা অভ্যস্ত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যভূতে সাধন করিতে হয়। সমস্ত ভূতেরই সাধনকালে দর্শনের বিচিত্র অবস্থা গুরুকে জ্ঞাত করিয়া, তাঁহার আদেশমত উপযোগী ক্রম-কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। সঙ্কেত জানিয়া আমিও 'অনিমেষ সাধন' আরম্ভ করিলাম।

গোঁসাইয়ের বক্তৃতাদানে অসম্মতি।

অনেক কাল যাবৎ ব্রাহ্মসমাজে আমার যাতায়াত খুব বেশী; ব্রাহ্ম-পরিবারেও আমার আনাগোনা অতিরিক্ত; উৎসবাদি ব্যাপারেও আমার দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি সকলের উপরে,—

৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া সকলেই আমাকে খুব একজন উৎসাহী ব্রাহ্মযুবক বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তারা, গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যোগধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মমত-বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানাদির খোঁজ খবর আমার নিকট হইতেই লইতে চেষ্টা করেন। আমিও অনেক কথা বলিয়া থাকি। আজ, রজনীবাবু প্রভৃতির কথামত, কয়েকটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী

মহাশয়কে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আগামী কল্য শনিবার সন্ধ্যার সময় আপনি "অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুবাদ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন সাধারণ ব্রাহ্মেরা এই অনুরোধ আপনাকে জানাইতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন— **"এর বিরুদ্ধে আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ব না। আমি যা' বল্‌ব গ্রহীতব্য, ব্রাহ্মসমাজ ব'ল্‌বেন তাহা পরিত্যাজ্য। বক্তৃতা কিরূপে হবে?"** আমরাও ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তাদের নিকটে যাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের কথা জানাইলাম। এই কথা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোস্বামী মহাশয় আর বেশী দিন বেদির কার্য্য করিতে পারিবেন না, অনেকেই এই প্রকার বলিতে লাগিলেন।

সাধু-অবজ্ঞার সাজা।

৯ই শ্রাবণ।

এবারে দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রত্যাগমনের পর নানাশ্রেণীর সাধক ও নানাভাবের লোকেরা প্রায়ই সর্ব্বদাই গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিতেছেন। মণিপুরের ভীষণ অরণ্যে ও পুরাতন রম্‌ণার নিবিড় জঙ্গলে ভাঙ্গা মস্‌জিদের মধ্যে লোকালয়ত্যাগী যে সব প্রাচীন মুসলমান ফকিরেরা আছেন, তাঁহারাও কেহ কেহ সময়ে সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিতেছেন। হিন্দু জটাধারী সন্ন্যাসীরাও নির্জ্জনে ও গোপনে আসিয়া গোঁসাইয়ের সঙ্গ করিয়া যাইতেছেন। আজ অপরাহ্নে সমাজে যাইয়া শুনিলাম, একটি জটিল উদাসী সাধু, বহুক্ষণ হয়, গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন। গোঁসাই তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছেন। গোঁসাইয়ের শিষ্যেরা নাকি তাঁহাকে প্রচারক-নিবাসেই গঞ্জিকাসেবনের যোগাড় করিয়া দিয়াছেন এবং তিনিও স্বেচ্ছামত, গাঁজায় দম্‌ মারিতেছেন। সন্ন্যাসীটি দেখিতে বেশ তেজস্বী, ভজনানন্দী ও সৌম্যমূর্ত্তি। তাঁহার এ কার্য্যে বাধা দিতে কেহই সাহস করেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ও দেখিয়া শুনিয়া এ গর্হিত কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। সমাজগৃহে বসিয়া ব্রাহ্মেরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন।

শুনিয়া আমার ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। আমি সকলকে বলিলাম—"আপনারা অপেক্ষা করুন। এ গাঁজিয়ালটাকে একটিবার গাঁজা খাইতে দেখিলে, এখনই আমি উহাকে সমাজ 'কম্পাউন্ড' হইতে চলিয়া যাইতে বলিব।" এই বলিয়া খুব দম্ভের সহিত যেমন চলিলাম, অকস্মাৎ শূন্যস্থানে সিঁড়ি অনুমানে পা ফেলিয়া, 'দড়াম্‌' করিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। পায়ে বিষম আঘাত লাগিল। প্রায় একঘণ্টাকাল একই স্থানে থাকিয়া, যন্ত্রণায় 'আহা উহু' করিয়া কাটাইলাম। একটু অন্ধকার হইলে, আমার একটি বন্ধু কোলে করিয়া আমাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল। দু'তিন দিন চলচ্ছক্তিশূন্য হইয়া রহিলাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া গুরুভ্রাতাদের মুখে শুনিলাম—ঐ সন্ন্যাসী একজন উচ্চদরের মহাত্মা. পরিচয় অজ্ঞাত। লোকালয়ের বহু সৌভাগ্যেই নাকি ঐ প্রকার সিদ্ধ পুরুষদের সেখানে আগমন হইয়া থাকে।

গোপনে প্রাণায়াম এবং উচ্ছিষ্টের আপত্তিতে উপদেশ।

গুরুভ্রাতাদের অনেকেই মনে করেন, সাধনের ভিতরের অনেক বিষয় আমি ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের কাছে বলিয়া দিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আমার অতিরিক্ত তর্ক ও প্রকাশ্য আলোচনা সভাতে সাধন সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি করাই তাঁহাদের এইপ্রকার সংশয়ের হেতু। আজ গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন— **"প্রাণায়াম লোকের নিকট ক'র না। লোকে ওসব নিয়ে তোমাকে ঠাট্টা উপহাস করবে, ক্ষেপাবে। আর এসব যত গোপনে হয় ততই উপকার।"**

১৮ই শ্রাবণ।

গোঁসাইকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের নাকি উচ্ছিষ্ট খেতে নাই? ভুক্তাবশিষ্টই তো উচ্ছিষ্ট? তবে অন্যের সঙ্গে এক পাত্রে ব'সেতো খেতে পার্‌বো?

গোঁসাই বলিলেন— **না, তাও নিষেধ আছে।**

আমি। আমাদের পাড়ায় আমার একটি বন্ধু আছে—ভুবন*। সে ব্রাহ্ম হ'য়েছে। শিশুকাল থেকে তার সঙ্গে আমার অত্যন্ত প্রণয়। আমার কোনও অসুখ হ'লে বহুদূরে থেকেও সে তা টের পায়—অস্থির হ'য়ে পড়ে। তারও তেমন কিছু আপদ বিপদ ঘট্‌লে আমি প্রাণে তা অনুভব করি। শিশুকাল থেকে এক থালাতে আমরা আহার ক'রে আস্‌ছি। এখন কি আমি আর তার সঙ্গেও এক পাত্রে আহার কর্‌তে পার্‌ব না?

গোঁসাই একটু হাসিয়া বলিলেন— **"হাঁ, হাঁ, শুধু তার সঙ্গে পার্‌বে। তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। তোমাদের পরস্পরে যে সদ্ভাব, তা'তে উচ্ছিষ্টের কোনও দোষ তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে না।"**

কুম্ভক।

কয়েকদিন যাবৎ গোস্বামী মহাশয় পীড়িত। কারও সঙ্গেই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেদির কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে বলিলেন—"সাধনের আর একটি নূতন অঙ্গ অবলম্বন করিতে আদেশ হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় উহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিতে বলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া লও।" এই বলিয়া তিনি একপ্রকার অদ্ভুত প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহাকে কুম্ভক বলে। প্রত্যহ সাধনের সময়ে প্রথমে ও শেষে তিনবার করিয়া এই কুম্ভক করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে নাক টিপিয়া বাহিরের বায়ু টানিয়া লইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক যে প্রণালীতে কুম্ভক করেন দেখিয়াছি, এই কুম্ভক সে প্রকার কিছুই নয়। আমাদের গুরুপ্রদত্ত প্রণালী মত

৩০ শে শ্রাবণ, রবিবার।

---

* ভুবন—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় (Mr B. M Chatterji, Bar-at-law) ব্যারিষ্টার।

প্রাণায়াম দ্বারা কৌশলপূর্ব্বক শুধু প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া উহা একেবারে মূলেতে নিয়া স্থাপন করিতে হইবে। পরে ঊর্দ্ধ অধঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ও সাধারণ বায়ুর অন্তর্গতি সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়া, নামে চিত্তসংযোগপূর্ব্বক, দৃঢ়তার সহিত উহা সাধ্যমত ধারণ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত স্মৃতি—এমন কি, দেহের সংস্কার পর্য্যন্ত—ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তখন নামের অস্তিত্বমাত্র অনুভূত হইতে থাকে । কতকটা তাহার আভাস পাইলাম। শুনিলাম, এই প্রাণায়াম সংযোগে কুম্ভকের বিষয় মাত্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় সংক্ষেপে উক্ত আছে। সাধারণ্যে ইহার প্রচার নাই। ইহা "গুরুমুখী"। এজন্য আমিও ইহা সঙ্কেতেই উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল।

আজ জন্মাষ্টমীর মিছিল (শোভাযাত্রা)। কত দেশের কত লোক আজ এই মিছিল দেখিতে ঢাকাতে আসিয়াছে। শহর আজ লোকের ভিড়ে তোলপাড় । স্কুল, কলেজ এবং আদালতাদি প্রতি বৎসরেই মিছিলের জন্য ছুটি হয়। নবাবপুর একদিন ও ইসলামপুর একদিন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া মিছিল বাহির করে। লুটপাট, দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও নানাপ্রকার উৎপাত উপদ্রবের শান্তি বিধানার্থ প্রতি বৎসরই গভর্ণমেন্ট এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে পুলিশের সুব্যবস্থা করেন।

এ বৎসরেও প্রতি বৎসরের ন্যায় অপরাহ্নে তিনটার সময়ে এই মিছিল বাহির হইল। প্রশস্ত পথ ধরিয়া আণ্টাঘরের ময়দান, বাঙ্গলাবাজার, পটুয়াটুলি প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অদ্যকার মিছিল চলিতে লাগিল। উল্লসিত নবাবপুরবাসীদের সমবেত চেষ্টা ও দক্ষতায় মিছিলটি আজ এত দীর্ঘ হইল যে প্রায় ৩ মাইল রাস্তা মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া একদিক শেষ না হইতেই উহা খালপার ধরিয়া আরম্ভ স্থলে আসিয়া উপনীত হইল। ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

সর্ব্বাগ্রে একদল মল্ল খেলোয়াড় দুই তিন দল দেশী বাজনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডন, কুস্তি ও লাঠি খেলায় বিবিধ প্রকার কৌশল দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইল। তৎসঙ্গে গোপেরা নন্দোৎসব করিতে করিতে চলিল। নানা রঙ্গের উচ্চ নিশান ও নানাপ্রকার মূল্যবান আসাসোটা লইয়া বহু লোক উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। পরে বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় বহুমূল্য স্বর্ণখচিত, বিবিধ কারুকার্য্যরচিত বিচিত্র বর্ণের মখমলের চাদর (ঝুল) দ্বারা সজ্জিত হইয়া ধীরে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। উহারা ললাটোপরি উজ্জ্বল ও বৃহৎ সুবর্ণ ও রৌপ্যের ঢাল লইয়া, যখন সগর্ব্বে মস্তক হেলাইয়া দোলাইয়া, ইংরাজী বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চলিতে লাগিল, তখন দর্শকমণ্ডলীর চিত্তও কৌতুকোল্লাসে নাচিয়া উঠিল। হস্তিসজ্জা শেষ হইলে, তৎপশ্চাতে বহুসংখ্যক অশ্বও, ঐরূপ শোভন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া চলিল। ইহার পর ঢাকার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের

আদর্শ 'চৌকি' সমূহ একে একে বাহির হইতে লাগিল। ইহাতে রাং ও অভ্রদ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ ও রৌপ্যপ্রতিমা ঝল্‌মলায়মান, নানা আয়তনের মন্দির, মঠ, নৌকা ও অট্টালিকার মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক পৌরাণিক ও অন্যবিধ ঘটনার দৃশ্যসমূহ পরিদৃষ্ট হইল। কোথাও কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের অত্যাচারে ভীমের আস্ফালন, যুধিষ্ঠিরের অমানুষিক ধৈর্য্য এবং অসহায়া বিপন্না শরণাগতা দ্রৌপদীর ভগবৎকৃপাবলে বস্ত্রলাভ; কোথাও পিতৃ-সত্য পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে পুনরায় রাজ্যে আনিতে ভরতের আকুল রোদন ও প্রার্থনা; কোনটিতে জন্মেঞ্জয়ের সর্পসত্র, তাহাতে জ্বলন্ত হুতাশনে ঋষিদের সর্পাহুতি; কোনটিতে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের পূরাণশ্রবণ—এই প্রকার বহু পৌরাণিক দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে 'চৌকি' সকল একটির পরে একটি শৃঙ্খলামত যাইতে লাগিল। এই সকল 'চৌকির' অগ্র-পশ্চাতে হরিসংকীর্ত্তন, বাউল বৈষ্ণবদের সঙ্গীত, মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান প্রভৃতিও চলিতে লাগিল। অতঃপর নানা প্রকারের স্থানীয় ব্যঙ্গ-চিত্রাদি প্রদর্শিত হইল। ইহাতে 'মিছিলের' একদল প্রতিপক্ষ অপর দলের গৃহচ্ছিদ্র ও দুরাচার বা দুর্ব্ব্যহারের বিষয় সকল চিত্রসাহায্যে জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ বা প্রচার করিতে সঙ্কোচ করে না। এই সমস্ত শেষ হইয়া গেলে পর, আবার খুব বড় বড় 'চৌকি' বাহির হইতে আরম্ভ হয় । কি কৌশলে, কিরূপ আশ্চর্য্য হিসাবে উহারা এই সকল বড় 'চৌকি' তৈয়ার করে, ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। ২০/২৫ ফুট চতুষ্কোণ কাঠের 'মাচাং' প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপরে প্রায় ৪০/৫০ ফুট উচ্চ, তেতলা চৌতালা মন্দিরের মত কোঠার কাঠাম বাঁধিয়া রাখা হয়। মিছিল বাহির হওয়ার দু'তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে লোকেরা শত শত ভিন্ন ভিন্ন বাঁশের 'টাট্টি' আনিয়া উপস্থিত করে। সকল 'টাট্টি'র বাহিরের দিক অতি সুন্দর বিচিত্র কাগজের দ্বারা আবৃত থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐগুলি যখন 'মাচাং'-এ একটির পর একটি সংযুক্ত হয়, তখন সেগুলি ঠিক 'খাপে খাপে' লাগিয়া যায়— কোন স্থানের মাচাং বা টাট্টি দুই তিন ইঞ্চিও ছোট বড় বা বেসমান হয় না। এইভাবে 'চৌকি'তে ক্রমে ৫০/৬০ বা ততোধিক 'টাট্টি' সংযুক্ত হইলে, শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ বহু কারুকার্য্য-খচিত, অতি অপূর্ব্ব ও নিখুঁত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির, মঠ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি প্রস্তুত ও প্রাচীন কোনও কীর্ত্তি প্রদর্শিত হইল দেখা যায়। এই প্রকারের 'চৌকি' পাঁচ ছয় খানার অধিক হয় না। 'মিছিল' শেষ হইয়া গেলে, প্রায় প্রতি বৎসরেই এই সব 'চৌকি' ফটো তোলার জন্য, কোন কোন প্রশস্ত রাজপথে কিংবা আণ্টাঘরের ময়দানে কি খালের ধারে কয়েকদিন রক্ষা করা হয়। সন্ধ্যার পর সুন্দর 'রোশনাই' হয়।

রাত্রে লোকের গোলমাল কমিলে পর, জন্মাষ্টমী মিছিলের বড় চৌকি দেখিতে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বাহির হইলাম। গজ-কচ্ছপ লইয়া গরুড় শূন্যমার্গে উড়িয়া গিয়া একটি বৃক্ষের ডালে বসিতে চেষ্টা করিতেছে, এই দৃশ্যটি এত সুন্দর কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে

গোস্বামী মহাশয় প্রায় বিশ মিনিটকাল উহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কনষ্ট্যান্টিনপলের দুর্গও অতি অদ্ভুত হইয়াছে। এই সব দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"**ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের মত মিছিল, এমন অদ্ভুত কারুকার্য্য, বর্ত্তমানে আর কুত্রাপি নাই। শান্তিপুরের রাস, ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল খুব দেখবার জিনিস, দেশের একটা গৌরব।**"

বড় চৌকি দেখার পর গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সমাজে গেলাম। আজ একটু অধিক রাত্রিতে সাধনে যোগ দিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে বাসায় আসিলাম।

আশ্চর্য্য ফকির।

বিকালবেলা প্রচারক-নিবাসে যাইয়া দেখি, লোকে ঘর পরিপূর্ণ; একটি ফকির গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া আছেন। ফকির সাহেবের বেশ-ভূষা কিছুই নাই, 'নেংটি' মাত্র পরিধান, কাল একখানা জীর্ণ কম্বল গায়ে জড়ান। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে 'ঠারে ঠোরে' কি সব আলাপ করিতেছেন। উহাদের সে ফকিরি ভাষা ও ভাবের কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না। সমাজের আঙ্গিনায় ও এদিকে সেদিকে অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ফকিরটি খুব উন্নত অবস্থার লোক।" মনে হইল, "এ মন্দ নয়! অর্থশূন্য কতকগুলি শব্দের 'এলো মেলো' যোজনা করিলেই তাহা ভাবের কথা হইল, আর, মুসলমান হইয়া গুরুতত্ত্বের কথা পাড়িলেই তিনি একজন মহাত্মা হইলেন।" সে যাহা হউক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি ফকির সাহেবের কোন বিশেষত্ব পাই কি না, অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ঘরে সামান্য একটি 'মিটমিটে', আলো জ্বলিতেছিল। ফকির সাহেব কয়েকবার আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়াই আমি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলাম। ঠিক যেন দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকারে চক্ষের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়, ইহা কখনও ইতিপূর্ব্বে আমি দেখি নাই। লোকের ভিড় দেখিয়া, ফকির সাহেব গোস্বামী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া উঠিয়া চলিলেন। আমি তাঁহার পিছু লইলাম। ফকির সাহেব রাস্তায় হাঁটিয়া চলেন না; অতি-দ্রুত লম্বা লম্বা পদবিক্ষেপ-পূর্ব্বক বক্রগতিতে লাফাইতে লাফাইতে প্রকাশ্য বাজপথ দিয়া ছুটিলেন। পটুয়াটুলির কতক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতিকষ্টে চলিয়া, ফিরিয়া আসিলাম। তিনি কোন্ দিক দিয়া যে হঠাৎ চলিয়া গেলেন, ঠিক করিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও হরিসংকীর্ত্তন।

ব্রাহ্মগণের আন্দোলন।

গোস্বামী মহাশয় আজকাল যে ভাবে বেদির কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে সকলেই খুব সন্তুষ্ট। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ গোঁসাইয়ের এরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাবের উপদেশ ও বক্তৃতাতে

বিরক্ত। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, গোঁসাই তাঁহাদেরই ভাব ও ইচ্ছামত উপদেশ ও বক্তৃতাদি দেন। বেদিতে বসিয়া উপদেশ দিবার সময় অনেক সময়েই গোস্বামী মহাশয় শাস্ত্রাদির কথা বলেন। পুরাণের এক একটি আখ্যায়িকা লইয়া তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। পুরাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গোস্বামী মহাশয়ই প্রথম আরম্ভ করিলেন; শুনিতেছি, ইতিপূর্ব্বে এভাবের ব্যাখ্যা নাকি আর কখনও হয় নাই। এই প্রকার রূপক ব্যাখ্যা শুনিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন অনেকেই মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছেন। আমার কিন্তু মনে হয় ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রপুরাণাদি প্রচলনের জন্য গোস্বামী মহাশয়ের ইহা একটি পাকা চাল।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে নিত্যই সন্ধ্যার সময়ে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। শনি ও রবিবারে প্রচারক-নিবাসের সম্মুখস্থ আঙ্গিনাতেই অনেকক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হয়; কখনও বা সমাজের সম্মুখের উঠানেও হইয়া থাকে। এই কীর্ত্তনে বিস্তর লোকের সমাবেশ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যদের ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যান। সঙ্কীর্ত্তনের রব ও খোলের ধ্বনি শুনিলেই গোঁসাই কি রকম হইয়া পড়েন। উচ্চ উচ্চ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক "হরিবোল", "হরিবোল" বলিতে বলিতে জ্ঞানশূন্য হন, কখনও একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। গোঁসাইয়ের এইরূপ মত্ততায় বহুলোকের ভাব জাগাইয়া দেয়। সাধারণতঃ গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্যদের মধ্যেই মাতামাতির ভাবটা বেশী দেখা যায়। আমরাও অনেকে ভাব করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু খাঁটি ভাব হয় না; 'মেহনৎ' মাত্রই সার; এজন্য মনে বড়ই দুঃখ হয়।

আজ প্রচারক-নিবাসের আঙ্গিনায় সঙ্কীর্ত্তনে মহাহুলস্থূল ব্যাপার। আনন্দ-কোলাহলে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গন পরিপূর্ণ। অনেকেই আজ ভাবাবেশে 'ডগ মগ'। চারিদিকে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তন শুনিতেছেন। শ্রীধরবাবু মাতিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরবাবুর নৃত্য দেখিয়া মনে হইল যেন একটি পুতুল নাচিতেছে। বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়াও, এমন শৃঙ্খলার সহিত নৃত্য করা বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবে ভিন্ন হয় না। শ্রীধর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে খুব উচ্চৈঃস্বরে "আল্লা হো আকবর", "আল্লা হো আকবর" বলিতে বলিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আমাদের কোনও শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম শ্রীধরের ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া, 'ভাইরে', 'ভাইরে' বলিয়া শ্রীধরকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের চক্ষের পলক নাই। অকস্মাৎ উচ্চলম্ফ সহকারে, শূন্য আকাশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন— "ঐ দেখ্ কালী, ঐ দেখ্ কালী"। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মটি শ্রীধরকে জড়াইয়া বড়ই আনন্দ করিতেছিলেন; কিন্তু ঐ কালী শব্দটি যেমনই শুনিলেন, অমনি শ্রীধরকে ধাক্কা দিয়া আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন—"দূর শালা! বল্ পরব্রহ্ম, বল্ পরব্রহ্ম"। তিনি "বল্ পরব্রহ্ম, বল্ পরব্রহ্ম" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীধর "জয় কালী! জয় কালী!" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সঙ্কীর্ত্তনান্তে কতিপয় ব্রাহ্ম এই বিষয় লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন —"গোঁসাই হরিনাম ব্রাহ্মসমাজে চালাইয়াছেন, তাঁর শিষ্যেরা এখন কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামও চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এ অতি ভয়ানক! প্রতিবাদ হওয়া উচিত। উনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম। ভাবের সময়ে কালী নাম শুনাতে উঁহার বিবেকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে; তাই হঠাৎ 'শালা' বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে কখনও উঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।"

গোস্বামী মহাশয়ের দৈনন্দিন আচরণ ও সাধনের 'বৈঠক'।

প্রত্যহ প্রাতে প্রায় সাতটার সময়ে গোস্বামী মহাশয় চা খাইয়া থাকেন। চা খাওয়ার পরে আসনে বসিয়া অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ প্রাঙ্গণস্থ শেফালিকা গাছের দিকে চাহিয়া থাকেন। একটু বেলা হইলে পাঠ আরম্ভ হয়। প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ চলে।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে 'আনন্দ মাষ্টারের বাগানে' যান। সেখানে পূর্ব্বপ্রান্তে একটি পুরাতন আম গাছের তলে সাধনে তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন।

বিকালে আবার সমাজে আসেন। চারিটার পর প্রত্যহই প্রচারক-নিবাসে বহুলোকের সমাগম হয়। কেদারবাবু (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুগত ভক্ত) ও আশানন্দ বাউল প্রত্যহই আসেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও অপর অনেকে এই সময়ে উপস্থিত হন। বিকাল বেলা বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের পর নিত্যই সঙ্গীত হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার সময়ে প্রায় একঘণ্টা সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়। তখন কেবলমাত্র সাধনের লোকেরাই ঘরের ভিতরে থাকিতে পারেন। রাত্রি প্রায় ৯৷৷ টা ১০টা পর্য্যন্ত সাধন চলে। সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে মাত্রা ও ক্রম সমান ও একপ্রকার রাখিয়া একঘণ্টা কাল প্রাণায়াম করেন। পরে একটি বা দুইটি গান হয়। এই গানের পর আবার একঘণ্টা পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম চলে। মহিলারাও পার্শ্বের ঘরে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া প্রাণায়াম করেন। 'বৈঠক' সাধনের কালে পৃথক্ পৃথক্ আসনেব কোনও নিয়ম বা বন্দোবস্ত নাই। সাধন করিতে করিতে এই সময়ে অনেকের ভিতরে পারলৌকিক আত্মারা আসিয়া পড়েন। কাহারও ভাবাবেশে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়; কেহ কেহ বিকট চীৎকার করিয়া উঠেন; আবার কোন কোন সাধকের ভীষণ অট্টহাসি আরম্ভ হয়। এই সময়ে নানাপ্রকার ভাবোচ্ছ্বাসে নানাপ্রকার অবস্থা অনেকের ভিতরে ঘটিতে থাকে। গোস্বামী মহাশয় ক্রমে এসব উদ্দাম উচ্ছ্বাসের বেগ সংবরণ করেন। তিনি এই সাধন-বৈঠকে কখনও কখনও ভাবাবেশে অনেক কথা বলেন; দেবদেবী, মুনিঋষি ও মহাত্মাদের প্রকাশ দেখিয়া স্তবস্তুতি করেন। যাঁহারা বৈঠকে যোগ দেন— অনেকেই কিছু না কিছু দর্শন পান। এক দৃশ্যই যে সকলে দেখেন, এমন নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেব-

দেবী, ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিঃ, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বা রূপ—এক এক জনে এক এক রকম দর্শন করেন। আমার কিন্তু ফোঁস-ফোঁস মাত্রই সার—কিছুই দর্শন হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় সাধনকালে প্রায়ই উপস্থিত হন। গোস্বামী মহাশয় আরও যে সকল মহাত্মাদের নাম করেন তাঁহাদের কাহাকেও আমি জানি না। সূক্ষ্মশরীরে সমাগত মহাপুরুষদের দর্শনলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তবে অলৌকিক একটা কিছু ঘটিয়াছে ইহা বুঝিতে কাহারও আর বাকি থাকে না। গোস্বামী মহাশয়ের নিজের অবস্থাদির সম্বন্ধে লোকের মুখে যাহা শুনি, তাহা আমি সব বিশ্বাস করিতে পারি না। আবার যে সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া চমৎকার মনে হয়, তাহাও লোকের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস পাই না। সুতরাং সর্ব্বসাধারণে যাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহাই স্মৃতিতে রাখিবার জন্য আভাসে লিখিয়া যাইতেছি।

আজকাল গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বা নিয়ম নাই। কোনও কোনও দিন আহার করিতে বসিয়া, হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন— মুখের ভাত মুখেই থাকে। দেড় ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা একই অবস্থায় কাটিয়া যায়। পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতেও তিনি অকস্মাৎ আত্মহারা হইয়া পড়েন; বহুক্ষণ আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ভিতরে যে কি ব্যাপার হয়, তাহা তিনিই জানেন। পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া পড়েন, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন; দীর্ঘকাল এই অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। সংকীর্ত্তনের সময়ে ভগবানের নাম শুনিলেই লাফাইয়া উঠেন, নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। শরীরটি জড়বৎ অসাড়, অবশ হইয়া যায়। তখন বহুক্ষণ সম্মুখে বসিয়া কেহ ভগবানের নাম করিলে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়।

প্রচারক-নিবাসে নানা ভাবের লোকই আসেন। তাঁহারা গোঁসাইকে শুনাইয়া নানা ভাবের আলাপ আলোচনাদিও করেন। গোঁসাই সকলের কথাতেই 'হুঁ' দিয়া যান এবং আপন ভাবেই বিভোর থাকিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে থাকেন। সর্ব্বদাই মনটি যেন অন্য একদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। যে সকল গানে ভগবানের নাম গন্ধও নাই, পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ঘটিত ভাবের উদ্দীপনা হয়, সে সকল গানেও গোঁসাইয়ের ভাব। প্রেম-সঙ্গীত, 'টপ্‌পা' প্রভৃতিও তিনি খুব আগ্রহের সহিত শুনেন এবং তাহাতেও 'আহা', 'উহু' করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হন। রাধা-কৃষ্ণ বা গৌর-নিতাই সম্বন্ধে গান হইলেই অমনি গোঁসাইয়ের বংশগত ভাব জাগিয়া উঠে। ব্রাহ্মসঙ্গীত অপেক্ষাও ঐ সকল গানে গোঁসাইয়ের রুচি অধিক এবং ভাবের স্ফূর্ত্তি বেশী দেখিতে পাই। কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গান গোঁসাই বড়ই ভালবাসেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্নে একবার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসেন। তিনি বেশ গাইতে পারেন। গোস্বামী মহাশয়ের রুচি বুঝিয়া, অনেক সময়ে তিনি কৃষ্ণকান্ত

পাঠকের গান গাহিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্কলিত সঙ্গীত মুক্তাবলী ও প্রেম-সঙ্গীত হইতেও মাঝে মাঝে তিনি নিম্নলিখিত গানগুলি গাহিয়া থাকেন, যথা—"জলে ঢেউ দিও না গো সখি; আমি কালরূপ নিরখি", "তারে দিয়ে প্রাণ কুলমান চরণ পেলাম না স্বজনি, আমি হলেম গৌরকলঙ্কিনী!" —ইত্যাদি। গোঁসাই এই সকল গান শুনিয়া ভাবে 'ডগ মগ' হইয়া পড়েন। গোঁসাইয়ের ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলেও বিমুগ্ধ হইয়া যান। গানগুলি যে কি ভাবের, আশ্চর্য্য এই যে ব্রাহ্ম মহাশয়েরাও তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। যাহা হউক, অতঃপর সন্ধ্যার সময়ে, ছাত্রসমাজের সমবয়স্ক আমরা সকলে সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করি—"গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়"। গোঁসাই ভালবাসেন বলিয়া, "জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল"—বৈরাগীদের এ গানটিও আমরা প্রায় প্রত্যহই গাহিয়া থাকি । সংকীর্ত্তনে গোঁসাইয়ের যে প্রকার অবস্থা হয় তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। দিন রাত অবিচ্ছেদে গোঁসাই যেন একটা ভাবে 'ঢুলু ঢুলু' রহিয়াছেন— ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া ইহাই বুঝিতেছি। তবে, ভক্তিভাবের আধিক্যবশতঃ, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমত ছাড়িয়া গোঁসাই অনেকটা প্রাচীন ভ্রান্তমতে পড়িয়া গিয়াছেন, গোঁসাইকে খুব ভালবাসিলেও তাঁহার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা।

গোঁসাই-শিষ্যদের কথা।

যাঁহারা গোঁসাইয়ের নিকটে যোগ-সাধন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতরকার অবস্থা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই। তবে, মিলিয়া মিশিয়া, 'আলাপে সালাপে' যতটুকু বুঝিতেছি তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ গোস্বামী মহাশয় পাত্রবিশেষে এই সাধন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এই অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভিতরে আশ্চর্য্য ভাব, অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংকীর্ত্তনের ভাবোচ্ছ্বাস ইঁহাদের মধ্যে যাহা দেখিতে পাই তাহা এক নূতন রকমের, পূর্ব্বে কোথাও এরূপ ভাব কাহারও ভিতরে দেখি নাই। সাধারণ লোকেরা এই সব অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়, কেহ কেহ আবার ভূত প্রেতের কাণ্ড ভাবিয়াও হতবুদ্ধি হয়। সংকীর্ত্তনে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, মত্ততা বা ভাবাবেশ ইঁহাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের, তাহা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থাও অন্যপ্রকার। সর্ব্বদাই ইঁহারা সাধনে তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, প্রফুল্লচিত্ত ও বিনয়ী। গোঁসাই-শিষ্যেরা পরস্পরকে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও নাকি অধিক ভালবাসেন শুনিতে পাই। দিবসে যে কোন সময়ে একবার সকলেরই দেখা সাক্ষাৎ হওয়া চাই। মান মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া সমবয়স্কের মত, ছেলে বুড়োতে এত মেশামেশি, এমন ভালবাসা, এই গোঁসাই-শিষ্যদের ভিতরে যেমন দেখিতেছি, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। ভবিষ্যতে এ সদ্ভাব ইঁহাদের কত কাল স্থায়ী হইবে তাহা

বিধাতাই জানেন; এখন কিন্তু ইঁহাদের এই দুর্লভ অবস্থা দেখিয়া মনে হয়—কখনও ইহার আর ভাবান্তর হইবে না। ক্রমে এখন আমারও এমন হইয়াছে যে, নানাপ্রকার উদ্বেগ অশান্তির সময়েও একটি সাধনের লোকের সঙ্গ পাইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অন্তরের সমস্ত দুঃখ দূর হয়। ইঁহাদের দর্শনমাত্রই একটা সরস সন্তোষ-ভাবে ভিতরটি ভরপুর হইয়া উঠে। ইহা যে কেন হয়, তাহা বুঝি না।

অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য কোনও কোনও সাধননিষ্ঠ ব্যক্তির ইতিমধ্যেই জন্মিয়াছে । আবার কাহারও কাহারও উহা ধারণা বা বিশ্বাস করিবারও অধিকার হয় নাই। অন্নময়, প্রাণময় কোষ অতিক্রমপূর্ব্বক মনোময় কোষে প্রবেশ করিয়া, সূক্ষ্ম শরীরে যথায় তথায় কাহারও কাহারও বিচরণ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে। শুধু পৃথিবীতে নয়, লোক-লোকান্তরেও ইঁহারা সময়ে সময়ে গতায়াত করিয়া থাকেন। দূরস্থ কোনও অজ্ঞাত বা গোপনীয় ব্যাপার জ্ঞাত হওয়ার মানসে, কোনও ব্যক্তি ধ্যানস্থ হওয়া মাত্র, চিত্রপটের ন্যায় ঐ ঘটনা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে । কোনও প্রয়োজনীয় দুর্লভ বস্তু পাওয়ার মানসে কেহ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়া আসনে ধ্যানস্থ থাকিতে থাকিতেই, ঐ বস্তু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেছে। কোনও মনুষ্য বা জীব-জন্তুর সাহায্যে নহে, সম্পূর্ণ ধ্যানপ্রভাবে, অপ্রাকৃতরূপে এ সব ঘটিতেছে।

ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ও অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোন এক ব্যক্তি ইষ্টমন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া, খুব কৌতূহলাক্রান্ত মনে, সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কতকগুলি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। গোস্বামী মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে সে চেষ্টা হইতে অমনি বিরত করেন এবং তাঁহাকে কঠিন শাসন করিয়া বলেন—ভগবচ্ছক্তি ভগবানের ইচ্ছায় প্রয়োগ না হ'লে উহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইতে পারে। এ বিষয়ে অত্যন্ত সংযত ও সাবধান থাকিতে হয়।

কাহারও চঞ্চলতা ও অসতর্কতাবশতঃ অলৌকিকশক্তি প্রয়োগের ফলে, আকস্মিক কিছু কিছু দুর্নিমিত্ত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রাকৃতিক কোন প্রকার ব্যতিক্রম বা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোন প্রকার অসম্ভব ঘটনা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাশক্তিতে বা সাধন-প্রভাবে সম্ভব হয় বলিলে, আজকাল লোকে তাহা গুলিখোরের গল্প ভাবিয়া নিতান্তই উপহাসের কথা বলিয়া মনে করিবে, এইজন্য আমি সে সকল ঘটনা আর আমার ডায়েরীতে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম না। শুনিতেছি, গোস্বামী মহাশয় নাকি শিষ্যদের এই সব হঠকারিতা ও সাংঘাতিক খেয়ালের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যলাভ ও শক্তিপ্রকাশের দিকটা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন!

বিলুপ্ত মন্ত্র-শক্তি উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ।

ঢাকার নর্ম্মেল স্কুলের হেড্ পণ্ডিত বিকালবেলা জগন্নাথ স্কুলের একটি ষোল সতেরো বৎসরের ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিলেন। ছেলেটির মাথা বিষম গরম হইয়াছে—অর্দ্ধ ক্ষিপ্তপ্রায়। গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ হইবে, এই বিশ্বাসেই পণ্ডিত মহাশয় উহাকে আনিয়াছেন। ছেলেটি তাহার অবস্থা যাহা বলিল তাহা এই—"কিছুদিন পূর্ব্বে একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ঢাকাতে আসিয়া রমণার জঙ্গলের ধারে একটি গাছের নীচে আসন করিয়াছিলেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আমার খুব ভক্তি হইল। সন্ন্যাসী অল্পদিন থাকিবেন জানিয়া, স্কুল বন্ধ করিয়া কয়েকদিন তাঁহার খুব সেবা করিলাম। সন্ন্যাসী যাওয়ার সময়ে আমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ওহে, তুমি আমার খুব সেবা ক'রেছ, তোমার উপরে আমি খুব খুসী হয়েছি, তোমাকে আমি একটা বিদ্যা দিচ্ছি। তুমি বিনা প্রয়োজনে যেখানে সেখানে লোকের নিকট এই শক্তি প্রয়োগ ক'রো না।' এই বলিয়া তিনি আমার কানে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া কোন বৃক্ষ লতাতে ছিটাইয়া দিলে উহা অমনি মরিয়া যাইবে। আবার এই মন্ত্রে জল দিলে উহা পুনর্জ্জীবিত হইবে।' সন্ন্যাসীর কথামত আমি তৎক্ষণাৎ মন্ত্র-শক্তি পরখ্ করিয়া দেখিলাম উহা সত্য। এই মন্ত্র যেখানে সেখানে লোকের নিকট প্রয়োগ করিতে সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহার পর একদিন বাঙ্গলাবাজারে রুদ্রবাবুর 'ডিসপেন্সারি'তে কয়েকটি ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত মন্ত্র শক্তি লইয়া আমার খুব তর্ক বাধিল। তাঁহারা উহা বিশ্বাস করেন না; সুতরাং আমাকে কুসংস্কারী বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। আমি তখন জেদে পড়িয়া, মন্ত্র-শক্তি দেখাইতে একটি টবের ফুলগাছে মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিলাম। গাছটি দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল; পরে আবার মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিতেই বাঁচিয়া উঠিল। বন্ধুরা সকলেই অবাক্ । তখন তাঁহারা ঐ মন্ত্র তাঁহাদের শুনাইতে জেদ করিতে লাগিলেন। আমি অস্বীকার করিলেও, তাঁহারা আমাকে ছাড়িলেন না; বুঝাইলেন যে ঐ মন্ত্র-শক্তি যখন আমার আয়ত্ত হইয়াছে, কখনও আর নষ্ট হইতে পারে না। আমি তাঁহাদের কথায় পড়িয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া শুনাইলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আর মন্ত্রে কোনও ফল হইতেছে না, দেখিতেছি। এমন একটা আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিয়া আমি হারাইলাম, এই চিন্তায় ও ক্লেশে আমি পাগলের মত হইয়াছি। আবার ঐ মন্ত্রে যাহাতে আমার সেইমত শক্তি হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দিন।"

গোস্বামী মহাশয় ছেলেটির সাতিশয় আকুলতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—**"মন্ত্রটি তোমার মনে আছে?"**

ছেলেটি বলিল— আগে ছিল, এখন একটু গোলমাল হ'য়েছে।

গোঁসাই—এক অক্ষরও ত মনে আছে? যাক্, তোমার গুরুর রূপ মনে আছে তো?

ছেলেটি—হাঁ, তা আছে। তবে, খুব পরিষ্কার নাই।

একথা শুনিয়া গোঁসাই উহাকে একটি প্রণালী বলিয়া দিয়া বলিলেন—আচ্ছা, এক রাত্রি তুমি নির্জ্জনে ব'সে এই কর গিয়ে। মন্ত্রও স্মরণ হবে, মন্ত্রশক্তিও লাভ হবে।

শুনিলাম, ছেলেটি অতঃপর গোঁসাইয়ের কথামত চলিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছে। এখন তাহার মাথার সে অসুখও সারিয়া গিয়াছে।

শক্তি-হরণ।

আজ একটি শক্তিসম্পন্না বাউলনীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। অসংখ্য লোকের গতায়াত গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে নিয়তই হয় বলিয়া, বাউলনীর উপরে আমার তেমন বিশেষ লক্ষ্য পড়ে নাই। কথায় কথায় গোস্বামী মহাশয় তাহার বিষয়ে বলিলেন— আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। একটি বাউলনী এসে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমি তখন লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ বাউলনী আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি চোঁ চোঁ ক'রে চুষ্‌তে লাগ্‌লেন। তখন আমার হুঁস হলো। একটা ভয়ানক শক্তি অকস্মাৎ আমার শরীরে প্রবেশ ক'রে আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌লে। আমি উহা একটা উপরি শক্তি বুঝ্‌তে পেরে, গুরুদেবকে স্মরণ কর্‌লাম, তাঁর চরণে ঐ শক্তি অমনি অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'লাম। বাউলনী তখন মাটিতে পড়ে ছট্ ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লেন ; আর চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"প্রভু, আমার বস্তু আমাকে ফিরিয়ে দিন। আর আমি কখনও ওরূপ কর্‌বো না।" আমি বল্‌লাম 'সে আর হবার উপায় নাই ; আমার ভিতরে উহা আসামাত্রই আমি উহা গুরুদেবকে দিয়ে ফেলেছি। যা দিয়েছি তা তো আর চাইতে পারি না।' বাউলনী সমাজে দু'দিন থেকে ঢের কান্নাকাটি কর্‌লেন ; পরে যখন বুঝ্‌লেন আর ও জিনিস পাল্‌টে পাবেন না, তখন আধমরার মত নিস্তেজ হয়ে চলে গেলেন।

প্রশ্ন। কি প্রণালীতে ইহারা শক্তি চুরি করে? আঙ্গুল না চুষিয়াও কি পারে?

গোঁসাই। আঙ্গুল চুষে' সহজে পারে; তা ছাড়া, পদধূলি নিতে নিতে পারে, জড়িয়ে ধ'রে পারে। কেহ বা দৃষ্টি করেও পারে। নিজের শক্তি ও ভাব অন্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, সেই শক্তি ধ'রে যখন টান দেয়, অন্যের শক্তি ও সদ্‌ভাব সেই সঙ্গে আকর্ষণ ক'রে নেয়।

প্রশ্ন। এসব উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়?

গোঁসাই। অভিমান ত্যাগ ক'রে নিজেকে খুব ছোট মনে কর্‌তে হয়। তা হ'লেই নেবার আর কিছু পায় না। আর নিজ ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যানে রাখলে, সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায়।

প্রশ্ন। বুঝতে পারলে, তবেই ত এসকল উপায় অবলম্বন করা যায়। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে যদি কেহ এরূপ করে, তখন কিসে রক্ষা পাওয়া যায়?

গোঁসাই। **যোগৈশ্বর্য্য লাভ হ'লে যোগীরা গুরুদত্ত ত্রিশূল ধারণ করেন। তা'তে নিজের তেজ রক্ষা হয়; অন্যের কোন অসদ্‌ভাবও সাধকের ভিতরে সঞ্চারিত হ'তে পারে না।**

প্রশ্ন। বড় বড় ত্রিশূল নিয়া গৃহত্যাগী-সন্ন্যাসীরাই চলিতে পারে না। সাধারণ লোক তো আর তাহা পারে না!

গোঁসাই। **৩/৪ ইঞ্চি ছোট একটি ইস্পাতের ত্রিশূল রাখ্‌লেও হয়।**

আমাদের দেশে খুব ছোট ছেলেপিলেদের ভূত-প্রেত ও ডাইনির দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কোমরে লোহা বেঁধে দেয়। গুরুদশা কালেও অশৌচান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত উপরি উপদ্রব হইতে নিরাপদ্ থাকিতে লোকে লোহা ধারণ করে—এ সকল তো ভয়ানক কুসংস্কার বলিয়াই মনে করি। জানি না যোগীদের ত্রিশূল ধারণের মত এ সকল নিয়মেরও কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা।

সাংবাৎসরিক উৎসবে মহাসংকীর্ত্তন-ভাবাবেশের কথা।

আজ সাংবাৎসরিক উৎসব। দেখিতেছি ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব ক্রমে সকল সম্প্রদায়েরই উৎসব হইয়া দাঁড়াইল। ছোট লোক, বড় লোক, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির আসিয়া আজ ব্রাহ্মসমাজ 'কম্পাউন্ড' পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দলে দলে লোক ১৫/২০ জন এক একটা স্থানে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। শত শত লোক নানাস্থানে দাঁড়াইয়া বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। প্রকাণ্ড সমাজাঙ্গনের সম্মুখে গোস্বামী মহাশয় ধ্যানস্থ ছিলেন। জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়, অধ্যাপক প্রসন্নবাবু ও ডাক্তার প্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে, খোল বাজাইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের এই কীর্ত্তনের আরম্ভ হইতেই ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা আসিয়া পড়িল। স্কুল কলেজের ছেলেরা. কুঞ্জবাবুর সঙ্গে পরম উৎসাহে গোঁসাইকে বেষ্টন পূর্ব্বক, ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঢুলু-ঢুলু নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। পরে, ভাবাবেশে দিশাহারা হইয়া, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিলেন। জানি না কোথা হইতে ঠিক এই সময়ে একজন অপরিচিত, পরমতেজস্বী সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রপদসঞ্চারে কীর্ত্তনস্থলে আসিয়া পড়িলেন এবং এক একটি গানের দলে প্রবেশ করিয়া, হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনে দুই এক 'পাক' নৃত্য করিয়া সমস্ত কম্পাউণ্ডে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ সাল।

দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব মহাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া ছেলেবুড়ো সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয় 'হরিবোল', 'হরিবোল' বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্ত্তনের দলগুলি অলক্ষিতভাবে সম্মিলিত হইয়া পড়িল। বহু খোল করতালের ধ্বনি সংকীর্ত্তনের রবে মিলিত হইয়া ঝম্ ঝম্ আওয়াজে সমাজ-প্রাঙ্গণ কম্পিত করিতে লাগিল। দর্শকগণের মধ্যে বহুলোক গাছতলায়, রাস্তায় উপরে, সিঁড়ির ধারে ও ঘাসের উপরে মাটিতে পড়িয়া হাত পা আছড়াইয়া নানা অবস্থায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। এই ব্যাপার কতক্ষণ চলিল জানি না। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে, ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তারা কেহ কেহ আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনারা একটু উঠুন; উপাসনার সময় হইয়াছে'। গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে চোখ মেলিলেন এবং চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া একটু সময় স্থির হইয়া রহিলেন। তৎপরে প্রত্যেকটি সংজ্ঞাশূন্য লোকের নিকটে যাইয়া, কাহাকে স্পর্শ করিয়া, কাহাকেও বা কানের কাছে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া চৈতন্য-সঞ্চার করিতে লাগিলেন। সমাজের বারান্দায়, সিঁড়ির ধারে ১৩/১৪ বৎসরের একটি ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, গোস্বামী মহাশয় তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বারংবার নাম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার চেতনা হইল না। অবশেষে গোঁসাই তাহাকে নিজে কোলে তুলিয়া লইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ছেলেটি অব্যক্ত ক্লেশসূচক একটা করুণস্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে, ধীরে ধীরে তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল। গোঁসাই তখন বলিলেন—"**ছেলেটি সহস্রারে গিয়া বসিয়াছিল।**" এ কথার যে কি অর্থ, জানি না। ছেলেটি কুঞ্জবাবুর আত্মীয়, আমার বিশেষ বন্ধু—নাম বসুধা।

সকলকে সুস্থ করিয়া, গোস্বামী মহাশয় বেদীতে গিয়া বসিলেন। গোঁসাই আজ বেদিতে বসিয়া, প্রণালী ধরিয়া উপাসনা করিতে পারিলেন না। নারদ, বাল্মীকি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির প্রকাশ দেখিয়া, তাঁহাদেরই স্তব-স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন। কথা বেশী না বলিলেও, গোঁসাইয়ের ভাবেই সকলে অভিভূত হইলেন। সর্ব্বশেষে, গোঁসাই ভাবাবেশে এই কয়টি কথা বলিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। গোঁসাই বলিলেন—**ঐ দেখ, মা আস্‌ছেন। আজ মা থালা ভ'রে প্রসাদ নিয়ে আস্‌ছেন। দেখ, মা আমাকে এ কথা বল্‌তে নিষেধ করছেন। কেন মা, বল্‌ব না কেন? রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও; আজ তোমার সকল ছেলেকেই দিতে হবে। শুধু আমাকে দিলে খাব না। তুমি সকলেরই তো মা। এঁদের কেন দেও না? এঁরা যে উপবাসী থাকেন। মা, তোমার এ কি ব্যবহার? আজ মা, তোমার সব চালাকী সকলকে ব'লে দিব। বিক্রমপুরের সেই 'পাতক্ষীরের' কথা ব'লে দিব, রামবাবুর কথা ব'লে দিব, শিকল খুলে দিয়েছিল সে কথাও ব'লে দিব, তোমার ঘরের সব কথাই ব'লে দিব। যে ভাবে চল্‌লে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, তা সব আজ ব'লে দিব। দেখুন,**

আপনাদের বলে দিচ্ছি—আপনারা এই তিনটি নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌লে মায়ের প্রসাদ পাবেন। যখন যা কিছু গ্রহণ কর্‌বেন, আহার কর্‌বেন, মা'কে নিবেদন ক'রে নিবেন; অনিবেদিত বস্তু কখনও গ্রহণ কর্‌বেন না। অন্যের কুৎসা নিন্দা কখনও কর্‌বেন না। দেখুন, মা আমার মুখ চেপে ধর্‌ছেন,—আর বলতে দিচ্ছেন না। মা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধর্‌ছেন। জয় মা! জয় মা! জয় মা!

অস্ফুটস্বরে এই সব বলিতে বলিতে গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া পড়িল ; বহুচেষ্টা করিয়াও, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। চারিদিকে হিন্দু ব্রাহ্ম সকলেরই কান্না ও ভাবের মহাধূম পড়িয়া গেল। চন্দ্রনাথবাবু একটু পরে গান ধরিলেন। আজ বেদির কাজ গোস্বামী মহাশয় আর করিতে পারিলেন না। ক্রমে নিস্তব্ধ হইলে, সকলে আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন, আমিও সেইসঙ্গে চলিয়া আসিলাম। গোস্বামী মহাশয় কতক্ষণ বেদিতে বসিয়া রহিলেন, জানি না।

কতিপয় আশ্চর্য্য ঘটনার সূত্র।

গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় আসার পর, এই দুই তিন বৎসরে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহা লইয়া হিন্দুদের মধ্যে, ব্রাহ্মসমাজে, যথায় তথায়, আলোচনাও অনেক সময় হইতেছে। ঐ সকল ব্যাপার যদি যথার্থই সত্য হয় তাহা হইলে বাস্তবিকই বড় আশ্চর্য্যের কথা। গোস্বামী মহাশয়ের নিজ মুখে ওসকল কথা না শুনিয়া, আমি উহা আর "ডায়েরীতে" লিখিতে ইচ্ছা করি না। কথার ছলে বা প্রশ্ন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যখন ঐ সকল ঘটনা-বিষয়ে পরিষ্কার জানিব, তখন ঐ সকল বিবরণ যথাযথ লিখিয়া রাখিব। স্মরণার্থ, এখন শুধু এ স্থলে সূত্রাকারে একটু উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি।

(১) গোস্বামী মহাশয়ের কন্যাদ্বয় একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পদ্মাদেবীর দর্শনাকাঙ্খা সাগ্রহে গোস্বামী মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহার আদেশ মত চাউল, কলা, নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া কন্যাগণের পদ্মাগর্ভে পদ্মাপূজা এবং সেই সময়ে অকস্মাৎ পদ্মাদেবীর আবির্ভাব।

(২) বিক্রমপুর, চাঁচরতলায় কালী-স্থানে আশ্চর্য্য প্রকারে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তৎকালে আকাশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি।

(৩) ৺কামাখ্যা তীর্থে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর অদ্ভুত দর্শন ও ৺কামাখ্যা দেবীর রজোনিঃসরণ প্রত্যক্ষ করা। তৎসহ সেখানে অচলানন্দ স্বামীর বিশ্বাসপ্রভাবে চাউল বুনিয়া ধানগাছ উৎপাদন।

(৪) গেণ্ডারিয়ার আনন্দবাবুর নির্জ্জন বাগানে কঠোর সাধন, দুর্জ্জয় পরীক্ষা ও ভয়ঙ্কর বিভীষিকাদি দর্শন।

(৫) ধর্ম্মার্জ্জনে হতাশ হইয়া বুড়ীগঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে উদ্যত জনৈক ব্যক্তিকে অকস্মাৎ গভীর নিশীথে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা।

(৬) প্রচারার্থ গমন করিয়া বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজে অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব-বিস্তার ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে মহাভাবের উচ্ছ্বাসে জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করা।

(৭) ব্রাহ্মসমাজে তুমুল বিরুদ্ধ আন্দোলনের সময়ে প্রশ্নচ্ছলে মন্মথবাবুর দ্বারা "যোগ-সাধন" প্রণয়ন ও প্রচার।

আমার অসাধ্য ব্যাধি।

অগ্রহায়ণের শেষ, ১২৯৪ সাল।

কফাশ্রিত বায়ুতে ও পিত্তশূল বেদনায় মরণাপন্ন হইয়া স্কুল পরিত্যাগপূর্ব্বক কবিরাজী চিকিৎসার জন্য বাড়ী আসিয়াছি। এই দুইটি রোগই আমি পিতামাতা হইতে পাইয়াছি, আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই এরূপ অনুমান করেন। আমার কিন্তু বিশ্বাস শরীরের উপরে অতিরিক্ত অত্যাচারে আমিই ইহা সৃষ্টি করিয়াছি। খুব ছোটবেলা হইতে "ধর্ম্ম-ধর্ম্ম" করিয়া আমার একটা বিষম অস্থিরতা রহিয়াছে। গত তিন চার বৎসর হইতে তাহা আবার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোথায় গিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিব, কিরূপে চলিলে কি ভাবে সাধন করিলে তাঁহাকে পাইব—সর্ব্বদাই প্রায় এই ভাবনা আসে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কোনও দুর্গম, নির্জ্জন পাহাড়-পর্ব্বতে থাকিয়া, আকুল প্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিবেন, এই সুদৃঢ় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছামত জীবন-গঠন করিতে গিয়াই আমি এমন পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি।

আমাদের কুলের গুরু একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তাঁহার ধীর-গম্ভীর প্রকৃতিতে ও সুমধুর ব্যবহারে আমি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। আমার আশানুরূপ অবস্থা, তাঁহার ব্যবস্থামত চলিলে, আমি সহজেই লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া, একদিন তাঁহার চরণ দু'টি জড়াইয়া ধরিলাম। খুব কাতর হইয়া তাঁহাকে ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়া বলিলাম, 'যাহাতে জিতকাম ও আহার-ত্যাগী হইতে পারি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে তাহা বলিয়া দিন ; আমি পাহাড়ে গিয়া সাধন করিব।' তিনি আমাকে দৈহিক উত্তেজনা নষ্ট করিবার জন্য পঞ্চনিম্ববটিকা ও আহার-ত্যাগের জন্য বিশ্ববটিকা যথারীতি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে বলিলেন। এ সব কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের অজ্ঞাতসারেই হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমি স্ত্রীলোকের মুখপানে দৃষ্টি করিব না ও জিহ্বার লালসায় কোন বস্তুই

আহার করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া গত দুই বৎসর যাবৎ প্রত্যহ উক্ত ঔষধ দু'টি সেবন করিয়া আসিতেছি। নিম্ববটিকার অদ্ভুত গুণে দুর্ব্বার কামভাব আমার অনেকটা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে এবং বিল্ববটিকা সেবনে আশ্চর্য্যরূপে ক্ষুধা-বোধ নষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে চেষ্টা দ্বারা মাত্র এক মুষ্টি অন্ন আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছি। এই সকল চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার কুম্ভকও অনেক দিন করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, বহুকাল এই নিম্ব ও বিল্ব-বটিকা সেবনে ও আহারের অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতার দরুণই আমার এই দুঃসহ ও দুরারোগ্য পিত্তশূল রোগের উৎপত্তি হইয়াছে এবং শ্বাসরোধের অস্বাভাবিক উৎকট চেষ্টাতেই এই দারুণ কফাশ্রিত বায়ু জন্মিয়াছে। সে যাহা হউক, এবার পীড়িত অবস্থায় বাড়ীতে আসিয়া ঔষধ দুইটি ত্যাগ করিয়াছি। বায়ুরোগের সূচনামাত্রই শ্বাসরোধের চেষ্টা ছাড়িয়াছি ; আনুষঙ্গিক অন্যান্য নিয়মানুষ্ঠানও সমস্ত ছুটিয়া গিয়াছে ; কেবল আহারের পরিমাণটা পূর্ব্ববৎ এখনও এক মুষ্টি অন্নই নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাড়ীতে আসিয়া দেশের প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজের দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা লইলাম। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত কালী কবিরাজ মহাশয়ের আদেশমত, তাঁহারই ব্যবস্থাপত্রের নির্দ্দেশানুসারে বাড়ীতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া যথারীতি এখন সেবন করিতেছি। কিন্তু কোন উপকারই হইতেছে না ; বরং বায়ু ও বেদনার প্রকোপ আরও যেন ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতেছে মনে হয়। চিকিৎসকগণ অনেকেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, রোগ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, আরোগ্য কিছুতেই হইবার নয়; তবে, সোনা, লোহা, মুক্তা প্রভৃতি 'জারিত' করিয়া, ভাল কবিরাজ দ্বারা খুব যত্নের সহিত ঘরে বহুমূল্য ঔষধাদি প্রস্তুত করাইয়া রীতিমত সেবন করিলে, রোগের সাময়িক একটু উপশম হইতে পারে মাত্র। আমিও মনে মনে একপ্রকার জানিয়া নিয়াছি যে অধিক দিন আর এ যাতনা ভোগাইতে ভগবান্ আমাকে এ সংসারে রাখিবেন না। সুতরাং আসন্ন মরণাশায় সাধন ভজনের দিকে মনটা আমার আরও ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। রোগের চিকিৎসা যেন একটা অনাবশ্যক বাহুল্য কার্য্য বলিয়াই মনে হয়। সূর্য্যোদয় হইতে বেলা ৯।। টা পর্য্যন্ত একটি লোক প্রত্যহ আমার সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে তৈল মালিস করে। সকালে দুইবার ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই সময়টা আমি বেশ নাম করিয়া কাটাই। মধ্যাহ্নে আহারান্তে বাড়ীর পশ্চিম দিকে গ্রামের শিশুদের কবরস্থানে 'ছকির বাড়ী'র ভয়ঙ্কর জঙ্গলে যাইয়া বসি; অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত নির্জ্জনে ভগবানের নাম করিয়া বড়ই আনন্দ পাই। কোন দিন কোনও কারণে আমার এই নির্জ্জন সাধন না হইলে মনে বড় কষ্ট হয়।

অযোধ্যাগমনের সঙ্কল্প ও গোঁসাইয়ের আদেশ।

বাড়ীতে অনেকদিন হয় আসিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে প্রাণ বড় আকুল হইয়া

উঠিল। শুনিতে পাইলাম—ঢাকাতে গোস্বামী মহাশয়কে লইয়া বিষম গোলযোগ। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য ও প্রচারক-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাস ছাড়িয়া, (লক্ষ্মীবাজার শিকওয়ালা বাড়ীর পরে) একরামপুরের কদমতলায় একটি পৃথক্ বাসা ভাড়া করিয়া, সপরিবারে সেখানে বাস করিতেছেন। সংবাদটি পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ! ব্যাপারটা কি, পরিষ্কার কিছুই বুঝিলাম না। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল।

এদিকে কবিরাজের ঔষধ-সেবনেও রোগের কিছুই উপশম হইল না। রোগ বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অধিকন্তু, চক্ষেরও রোগ জন্মিল। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনেরা শীঘ্রই আমাকে বড়দাদার কাছে অযোধ্যা পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। অযোধ্যা যাওয়ার পূর্ব্বে একবার বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সম্মতির জন্য সমস্ত অবস্থা শ্রদ্ধেয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়কে লিখিলাম। পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই পত্রের উত্তর আসিল। গোস্বামী মহাশয় যেমন যেমন বলিয়াছেন, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক তেমনই লিখিয়া পাঠাইলেন—

১। অযোধ্যা যাওয়ার পূর্ব্বে একবার ঢাকায় এসে সাক্ষাৎ করিও।

২। চক্ষুর পীড়া, সুতরাং দৃষ্টি-সাধনের প্রয়োজন নাই।

৩। ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে পার ; আপত্তি কি?

নিঃ—শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। একরামপুর, ঢাকা।
৫ই পৌষ, ১২৯৪।

পত্রখানা পাইয়া আমি দৃষ্টিসাধন ছাড়িয়া দিলাম। প্রত্যহ বা তিন বেলা খুব কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। নামও করি বটে; কিন্তু নাম অপেক্ষা প্রার্থনা করিয়াই আমার অধিক আনন্দ হয়। উপকারও প্রার্থনাতেই বেশী হইতেছে মনে করি। শুনিয়াছি— সাধনপথে চলিতে সর্ব্বপ্রথমেই নাকি 'আদৌ শ্রদ্ধা' গুরুভক্তির প্রয়োজন ; গুরুতে ভক্তি না দাঁড়াইলে গুরুতে বিশ্বাস ও নামে রুচি হয় না। কিন্তু আমার তো দেখিতেছি গুরুভক্তির অত্যন্ত অভাব। গোস্বামী মহাশয়কে সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করি বটে; কিন্তু, তা' বলিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বা অসাধারণ একটা কিছু ভাবিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে, যাহা আমি জানি না বা বুঝি না এমন কোন অলৌকিক বা অস্বাভাবিক গুণ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে অযথা কল্পনা করাও আমি দোষ মনে করি। গোঁসাইকে নিষ্কপট ভাল মানুষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করি ; তিনি বলিয়াছেন এই সাধন করিলে উপকার হইবে, তাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, নাম ও প্রাণায়াম করিয়া যাইতেছি মাত্র।

স্বপ্ন—অদ্বৈত ভাব—গোঁসাইয়ের কৃপা।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধনে আমার কোনই উপকার হইতেছে না, মনে হয়। তাঁহার উপরে নিষ্ঠা বা ভক্তি না জন্মিলে, তাঁহার বাক্যেই বা আমার তেমন শ্রদ্ধা হইবে কেন? সতত সঙ্গ করিয়া তাঁহার ঐ সব 'অসাধারণ' অবস্থাগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহার উপরে আমার ভক্তিই বা জন্মিবে কি প্রকারে? তাহা ত আমার পক্ষে অসম্ভব ; সুতরাং এ সাধন-গ্রহণ আমার বিড়ম্বনা হইল। এজন্য আমার প্রত্যহই এখন কষ্ট বোধ হইতেছে। একদিনও উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না।

৯ই পৌষ, ১২৯৪; শুক্রবার

আজ মনোদুঃখে আকুল হইয়া প্রার্থনা করিলাম— "হে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, আমার অন্তর তুমি দেখিতেছ। প্রভো, এ জীবনের যাহাতে কল্যাণ হয়, যে ভাবে চলিলে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়, কিছুই বুঝি নাই। তুমি দয়া ক'রে জানিয়ে দাও। কি করিলে নামে রুচি হইবে, তোমাতে ভক্তি হইবে, বুঝাইয়া দাও। গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নিয়াছি। তিনি এখানে নাই। আমার যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, দয়া করিয়া তুমিই তাহার ব্যবস্থা কর।" প্রার্থনান্তে রাত্রে প্রায় ১১টার সময়ে, বিছানা হইতে নামিয়া মনের বিষম উদ্বেগে হতাশ হইয়া, গোঁসাইয়ের চরণোদ্দেশে মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, ব্যাকুল ভাবে বলিলাম—"গোঁসাই, এ জীবন তোমার হাতে অর্পণ করিয়াছি। কিন্তু কই, তোমার প্রদত্ত সাধনে আমার তো রুচি হইল না, তোমাতেও ভক্তি জন্মিল না! দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। গুরুদেব, তুমি দয়া না করিলে আমার উপায় আর কে করিবে?" খুবই কাতরভাবে কিছুক্ষণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলাম।

১০ই পৌষ, শনিবার

ভোর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম—বহুদিন ব্রাহ্ম-মতে উপাসনাদি করিতে করিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্যের ভাব ও মর্ম্ম হৃদয়ে আসিয়া পড়িল। তখন প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন দেখিতে লাগিলাম। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গমসহ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিকাশ ভাবিয়া, সর্ব্বত্র মাথা নোয়াইতে লাগিলাম। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন! আমার ভিতরে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া বলিলেন— **'বাঃ' এ তো বেশ সাধন কর্‌ছ! যদি সকলই ঈশ্বর, তবে নিজেকে বাদ দিচ্ছ কেন? আমি তুমিও তো ঈশ্বর। তোমাকেই তুমি ঈশ্বর ভেবে সন্তুষ্ট থাক না কেন?'** আমি বলিলাম— 'ইহাতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আমি গুরুতে ভক্তি ও নামে রুচি চাই। আপনি আমাকে দয়া করুন। গোঁসাই বলিলেন—**'বেশ! তা'হলে প্রত্যহ সাধনের পূর্ব্বে *** এই নামটি সহস্রবার জপ ক'রে নিও!'** এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমারও অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গোঁসাইকে

নমস্কার করিয়া ঐ নামটি হাজারবার জপ করিলাম। এই ব্যাপারে আমি বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। বহুদূর হইতেও প্রার্থনা করিলে গোঁসাই তাহা জানিতে পারেন, এইপ্রকার একটা সংস্কার আমার ভিতরে আসিয়া পড়িল। গোঁসাই-ই যে স্বয়ং স্বপ্নযোগে আমাকে এইরূপ বলিয়া গেলেন এ বিষয়ে আমার আর কোন রকম দ্বিধা আসিল না।

প্রার্থনার ব্যর্থতা বোধ।

স্বপ্ন দেখার পর হইতে তদনুসারে কার্য্য করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থার দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী-অনুযায়ী উপাসনাদি বহুকাল যাবৎ করিয়া আসিতেছি। প্রার্থনা করিয়া বড়ই আনন্দ পাই। যে দিন প্রার্থনা করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া না যাই, সেদিন যেন প্রার্থনাই হইল না মনে করিয়া, সারাদিন একটা উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করি। নিত্য তিন বেলা আমার প্রার্থনা করার নিয়ম। কিন্তু, কেন জানি না, স্বপ্নদর্শনের পর আমার প্রার্থনাতে পূর্ব্বের ভাব আর রহিল না। গতি একেবারে ফিরিয়া গেল। প্রার্থনার ভিতর দিয়াই, 'প্রার্থনা অসার' ভগবান্ আমাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে লাগাইলেন। দেখিতেছি, যখনই যে ভাব লইয়া প্রার্থনা করি তখনই সেই ভাবে ডুবিয়া যাই আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া পড়ি। মনে করি—এইতো ঈশ্বরকে অনুভব করিলাম; কিন্তু প্রার্থনা ছাড়িয়া উঠিলেই, কিছুক্ষণ পরে আর সে ভাব, সে আনন্দ, সে উৎসাহ থাকে না, সমস্তই যেন নিবিয়া যায়। ইহা পুনঃপুনঃ ভোগ করিয়া বিচার আসিল, 'এ প্রকার হয় কেন? যদি সত্যস্বরূপ সেই নিত্য আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রার্থনার সময়ে উপলব্ধি করি, তবে তাহা স্থায়ী থাকে না কেন? তাঁহাকে তেমন ভাবে একবার যথার্থ অনুভব করিলে আর কি অন্যভাব হৃদয়ে আসে, ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, না আনন্দশূন্য অবস্থা অন্তরে আসিতে পারে?' কয়দিন ধরিয়া এই বিষয়ে বিচার করিলাম। শেষে, একদিন প্রার্থনা করিতে করিতেই বুঝিলাম— স্পষ্ট বোধ হইল যে—আমার অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে প্রার্থনাদ্বারা জাগ্রত করাইয়া নিয়া, যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাই ঈশ্বরের প্রকাশজনিত আনন্দ মনে করিতেছি ; বাস্তবিক ঈশ্বরের উপাসনা করি না—অন্তরের ভাবেরই উপাসনা করিতেছি মাত্র।

পরমেশ্বরে এক-একদিন এক-একটা সদ্‌গুণ আরোপ করিয়া, তাঁহাকে সেই গুণের একমাত্র আধার ভাবিয়া আমি উপাসনা করি। ভগবান্ সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলময়, আনন্দময়, পরম দয়াল ইত্যাদি বলিয়া স্বীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি-জল-বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুতে তাঁহারই প্রকাশ বা গুণ দেখিয়া স্তব স্তুতি করি। ক্রমে উহা ধ্যান করিতে করিতে একাগ্রতা হইলেই ঐ সকল ভাবে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি , তখন 'এই পরমেশ্বর' 'এই পরমেশ্বর' জ্ঞানে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে মুগ্ধ হইয়া যাই। প্রার্থনার দ্বারাই এখন

সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি—উহা ঈশ্বর নয়। বাক্যদ্বারা, ধ্যানদ্বারা, একগ্রতা দ্বারা উহা আমারই অন্তর্নিহিত ভাববিশেষের স্ফুরণ মাত্র ; ধ্যান-ধারণাজনিত বা একাগ্রতালব্ধ এরূপ কোন ভাবকেই আমি আর ঈশ্বর বোধ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে চাই না। আমি বাক্য-কল্পনা-বিনির্ম্মুক্ত, ভাব-সংস্কার-বর্জ্জিত, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্যপ্রকাশেরই অভিলাষী। আমি প্রার্থনা করিয়া নিজের বাক্য নিজে শুনিয়া অথবা আপন সংস্কার বা ভাবানুরূপ ধ্যান করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আরাম লাভ করিয়া থাকি, তখন আনন্দহেতুক মোহবশতঃ তাহাকে সত্যস্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বরের প্রকাশ বই অন্য কিছু ভাবিতে পারি না, সত্য; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উহা ছুটিয়া গেলে পরিষ্কার বুঝি, উহা আমারই অন্তরের একটি ভাবের উচ্ছ্বাস বা কাল্পনিক একটি সুখানুভূতি মাত্র। ঈশ্বরের অনুভূতি হইলে অবশ্যই তাহা স্থায়ী হইত এবং সে সম্বন্ধে এরূপ কোন সংশয় সন্দেহও কোন কালে আমার মনে কিছুতেই উঠিত না। পরমেশ্বর সত্য বস্তু ; তাঁহার অনুভব বিন্দুমাত্র হইলে সে বিষয়ে বিস্মৃতি বা সংশয় কি কোনও কালে হইতে পারে? অগ্নি যদি কোন লোকের শরীরে লাগে, সে জাগরিতই থাকুক আর নিদ্রিতই থাকুক, লাফাইয়া উঠিবে; অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও শরীরে জ্বালা থাকিবে ; জ্বালাও যদি যায়, ক্ষতটা কিছুকাল স্থায়ী হয়; ক্ষত সারিলেও তাহার একটা চিহ্ন থাকিয়া যায়, অন্ততঃ একটা স্মৃতিও থাকে। কিন্তু আমার এবেলার ঈশ্বরানুভূতির লেশটুকুও তো ওবেলা অন্তরে খুঁজিয়া পাই না। সুতরাং কখনও আমি ঈশ্বরোপাসনা করি না; কল্পনার, বাক্যের ও ভাবেরই উপাসনা করিতেছি মাত্র। প্রার্থনা করিয়া খুব আনন্দ হয়। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল থাকে না। উহা ছুটিয়া গেলেই যেন শতগুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রার্থনাতে এ প্রকার অস্থায়ী অসার আনন্দ অনুভব হওয়াতে প্রাণ আমার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। প্রার্থনার উপরে বিরক্তি ও ক্রোধ জন্মিল। আর প্রার্থনা করিব না—অস্থায়ী অসার আনন্দকে আর কখনও ঈশ্বর-সম্ভোগ-জনিত আনন্দ মনে করিব না,—স্থির করিলাম। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিলে যে তাঁহার উপাসনা হয় না, এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল।

বহুকালের অভ্যস্ত প্রার্থনা বিসর্জ্জন দিলাম। ভাবিলাম—'এখন আর কি লইয়া থাকি? অগত্যা পরমেশ্বরের নামই জপ করি ; এখন যা' করেন ভগবান্'।

কিছুকাল হইল প্রার্থনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। গোঁসাই যে সাধন দিয়াছেন, তাহাই করিতেছি। দু'বেলা প্রাণায়াম করি, আর সর্ব্বদা মনে মনে নাম স্মরণ করিতে চেষ্টা করি। নাম করায় কিন্তু কোন উপকার বুঝিতেছি না, আনন্দও পাইতেছি না। দিন দিন দারুণ শুষ্কতায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়া পড়িল।

ভগবানের নাম করিতেছি, কখন কখন এই ভাবটি গাঢ় হইলে একটু আনন্দ পাই ; তাহাও স্থায়ী হয় না বলিয়া, উহাতে আর তেমন আমার চেষ্টা নাই।

ইষ্ট নামের উৎপত্তি-অনুভূতি।

কিছুদিন যাবৎ নাম করিতে করিতে মনে হইতেছে—'এই নাম কে করে? কোথা হইতে এ নাম উঠিতেছে? আমিই বা কোথায় আছি?' নাম করার সঙ্গে সঙ্গে এ সব সম্বন্ধে প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া থাকি। প্রত্যেকটি নাম করার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক কোথা হইতে এই নাম আসিতেছে; তাহা তল্লাস করি। বোধ হইতেছে যেন অসীম সাগরে পড়িয়া বুদ্‌বুদের গোড়া খুঁজিতেছি, নামগুলিকে সাগরের বুদ্‌বুদ্‌বৎ মনে হইতেছে, বুদ্‌বুদ্‌ ধরিয়া পুনঃপুনঃ ডুব দিতেছি ; কিন্তু, অগাধ অতলস্পর্শ সাগরে ডুবিতে ডুবিতে, কিছুদূরে তলাইয়া গিয়া, আবার বুদ্‌বুদের সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিয়া উঠিতেছি । উদরের ভিতরে নানা স্থানে ঘুরিতেছি ; কিন্তু কোথাও গোড়া পাইয়া বসিতে ঠাঁই পাইলাম না। এই অনুসন্ধানে আমার চিত্তের ভিতরে একটা ব্যস্ততা থাকিলেও, বাহিরের কোন জ্ঞানই বড় থাকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যেন অন্তর্ম্মুখীন হইয়া পড়িতেছে। এ কয়দিন ক্রমে ক্রমে তলপেটে, নাভিমূলে, হৃদয়ে, কণ্ঠায়, অবশেষে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নামের উৎপত্তি অনুভূত হইল; কিন্তু খুব পরিষ্কাররূপে নয়।

এ সময় একবার গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। মাঘোৎসবও নিকটবর্ত্তী। গোঁসাইকে দেখিতে এবং এ সব বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে অবিলম্বেই ঢাকা যাইব, স্থির করিলাম।

ভাবুকতায় গোঁসাইয়ের শাসন।

গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে ঢাকায় আসিয়াছি। অদ্য সকালে কয়েকটি ব্রাহ্ম-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আহারান্তে একরামপুর কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। রাস্তার ধারের ঘরে উত্তরমুখ হইয়া নিজ আসনে গোঁসাই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, দেখিলাম। ঘরে অনেক লোক, সকলেই নীরব। আমি ঘরের এককোণে গিয়া বসিলাম।

বিক্রমপুরনিবাসী, জগন্নাথ স্কুলের একটি ছেলে রাধা-কৃষ্ণের একখানা চিত্রপট হাতে লইয়া, ঘরের সকলকে অতিক্রম করিয়া, একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া বসিল; পুনঃ পুনঃ গোঁসাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল ; রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি গোঁসাইয়ের মুখের কাছে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"গোঁসাই, ব'লে দাও, ব'লে দাও, কিরূপে পাইব, বল। আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি! আর কিছু আমি চাই না, আর কিছু চাই না। কিরূপে পাব ব'লে দাও।" গোঁসাই পুনঃ পুনঃ তাহাকে **'স্থির হও, স্থির হও'** বলিয়াও, কিছুতে তাহার সেই অস্থিরতা থামাইতে পারিলেন না। ছেলেটি যেন আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন গোঁসাই ধমক দিয়া বলিলেন—**'বটে? এখানে চালাকী! আর কিছু চাও না? নবাবের বাগানে নির্জ্জনে সুন্দরী একটি যুবতী পেলে চাও কি না, ভেবে বল তো। চালাকি কর্‌ছ?'** গোঁসাইয়ের কথা

শুনিবামাত্র ছেলেটির সমস্ত ভাব যেন শুকাইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ম্লানমুখে উঠিয়া পড়িল।

অনুগতের বিরুদ্ধতা।

গত বৎসর একদিন সমাধির অবস্থায় হঠাৎ গোস্বামী মহাশয়ের মুখ হইতে এই কথা কয়টি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—**সাধনের ভিতরের একটি কৃতবিদ্য, সুশিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য্যের আসন গ্রহণ কর্‌বেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলেমিশে আমাকে নানা রকমে অপদস্থ করতে চেষ্টা কর্‌বেন। পরে, বিষম বিপন্ন হ'য়ে ঢাকা ছেড়ে পালাবেন।**

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলে পরে অনেকেই বুঝিলেন, ঐ ব্যক্তি আর কেহ নহেন—গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রচারক-নিবাসে গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থানকালেই তাঁহার মধুর সঙ্গলাভ মানসে মন্মথবাবু ঢাকায় আসেন এবং ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে একত্র অবস্থান করেন। তৎকালে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশক্রমে তিনি কখন ছাত্রসমাজে, কখনও ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। ৪/৫ টি বক্তৃতাতে শহরে একটা 'হৈ হৈ' রব পড়িয়া গেল। 'কেশববাবুর পরে এমন বক্তা ঢাকাতে এপর্য্যন্ত আর কেহ আসেন নাই' অনেকেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত-সমাজে মন্মথবাবুর অসাধারণ প্রতিপত্তি জন্মিল। গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরও ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিয়া, মিশিয়া মন্মথবাবু স্বীয় অদ্ভুত শক্তি ও তেজস্বিতা, গোঁসাইয়ের অভ্রান্তশাস্ত্র-বাদ, অভ্রান্তগুরু-বাদ প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা করিয়া অতি তীব্রভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আসিলে, মন্মথ বাবুর উৎসাহ, উদ্যম ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের আকর্ষণ জন্মিতেছে। শহরের সর্ব্বত্র মন্মথবাবুর জয় জয়কার। ব্রাহ্মদের গৃহে গৃহে তিনি আদৃত হইতেছেন ; বয়ঃপ্রবীণ ব্রাহ্মগণও কেহ কেহ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মাঘোৎসবে উপাসনা।

আজ মাঘোৎসব। প্রতি বৎসর এই মাঘোৎসবে ভগবানের নাম লইয়া কতই আনন্দ করি। সকালবেলা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট না যাইয়া ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। মন্মথবাবু উপাসনা করিতেছিলেন। বিপুলজনতাপূর্ণ, বিস্তৃত সমাজঘরের এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। উপাসনা খুব ভাল লাগিল। মন্মথবাবুর তেজঃপূর্ণ ভাষায় অন্তরের নিদ্রিত ভাবগুলিও যেন জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমি খুব শক্ত হইয়া বসিলাম, ভাবিতে লাগিলাম 'এ তো কেবল ভাবের উপাসনা, বাক্যের আড়ম্বর ও কল্পনার ছড়াছড়ি

১১ই মাঘ

মাত্র। পরমেশ্বর কোথায়?' এইপ্রকার চিন্তার দ্বারা মনটিকে খুব কঠোর করিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়েই মন্মথবাবু হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা আনন্দময়ি, আজ মাঘোৎসবে সকলেরই হৃদয় তুমি উজ্জ্বল করিয়াছ, কিন্তু মা, একটি ছেলে তার শূন্য অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়া দেখ কি ভাব্‌ছে। মা আনন্দময়ি, আজ তার অন্ধকার ঘর কি তুমি তোমার আলোকে উজ্জ্বল করিবে না?" ইত্যাদি। শুনিয়া আমার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল ; ভাবিলাম—'বুঝি মন্মথবাবুর অন্তরের ভাব অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, এবার তিনি আমার শুষ্কতা টের পাইয়া তাঁর ভাবুকতায় আমাকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিবেন।' আমি তদ্দণ্ডেই আসন হইতে উঠিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে একরামপুর কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। দোতলায় গিয়া দেখি, গোস্বামী মহাশয় ২০/২৫টি শিষ্য লইয়া একটি বড় ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন ; শ্রীযুক্ত রজনীবাবু, আনন্দবাবু প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্রাহ্মগণও অনেকে রহিয়াছেন।

প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল ভাবের ধার ধারি না। ভাব হইলে তাহা স্থায়ী হইবে না, কিছুক্ষণ পরেই ছুটিয়া যাইবে, এই ভয়ে ভাবের কথা শুনি না। ভাবের গান ভালবাসি না, ভাবুকদের নিকটে বসিতেও প্রাণ চায় না। ভিতরটি শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়া আছে। গোস্বামী মহাশয় ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া উপাসনা করেন, আমার এ বিশ্বাস আছে। তাই, আমার শুষ্কতা দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনায় যোগ দিলাম। ঠিক ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীমত এখানেও তিনি উদ্বোধন করিয়া, প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মা অন্নপূর্ণা, আজ ছোট-বড়, কাঙ্গাল-ফকির্, সকলকেই তুমি পেটভরা অন্ন দান কর্‌ছ। দেশে-বিদেশে আজ কত লোক তোমার প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। আমাকেও পেটভরা অন্ন দিচ্ছ। ছেলে-বয়স থেকে এই দিনে, মা আমাকে তুমি বিশেষভাবেই তোমার প্রসাদ দিয়ে আস্‌ছ। এ বছরেও, মা আজ আমাকে তুমি বিশেষভাবে দয়া কর।

এই কথা কয়টি বলার পরেই গোস্বামী মহাশয়ের অপূর্ব্ব অবস্থা দেখিলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—**হ'য়েছে, হ'য়েছে ! হ'য়েছে! মা ; উঃ। উঃ। উঃ। আর না, আর না, মা। কাণাকড়ি—একটি কাণাকড়ি, মা, আমি তোমার কাঙ্গাল ছেলে তোমার হাতে একটি কাণাকড়ি চাই মা। তাই আমার যথেষ্ট। মা আমার কি সাধ্য এত হজম করি? রোজ রোজ দিও, মা একটি ক'রে কাণাকড়ি দিও। আর না, আর না।** এই বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া নীরব হইলেন। শরীরের নানাস্থান থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। এক একবার কাঁদো-কাঁদো স্বরে, 'জয় মা, জয় মা' বলিতে লাগিলেন। এ সময়ে, জানি না কেন, দয়াময়ীর গুণেই হউক অথবা গোস্বামী মহাশয়ের

সঙ্গগুণেই হউক, আমার শুষ্ক কঠোর প্রাণও অকস্মাৎ কেমন হইয়া গেল। শরীরটি পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে লাগিল। আমি একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মেজেতে লুটাইতে লাগিলাম। কয়েকজন কাঙ্গালের গান ধরিলেন—"মা, আমি তোমার পোষা পাখী।" ঘরের ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। গুরুভ্রাতারা প্রায় এক ঘণ্টারও অধিককাল ভাবাবেশে মগ্ন থাকিয়া পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

অবিচারে ব্রাহ্মদীক্ষাদানে প্রতিবাদ।

অপরাহ্নে ২/৩টি গুরুভ্রাতার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছি, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া বলিলেন—চিত্রপট নিয়ে সে দিন যে ছেলেটি এসেছিল সে নাকি আজ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা নিবে। গোঁসাই শুনিয়া খুব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন— **'কি? সেই ছেলেটিকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌বে? এ সব কি? কাল যে আমার কাছে এসে রাধা-কৃষ্ণের পট নিয়ে এত কাণ্ড কর্‌লে, কত ধমকিয়ে দিলাম,— আজই তাকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা? এরকম সব লোককে দীক্ষা দিয়েই তো ব্রাহ্ম-সমাজ এত ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন। কাল এক মত ছিল, আজই অন্য মত হ'ল ; আবার, কালই যে সে আর এক মত ধরবে না', তা' কে বল্‌তে পারে? কেবল কি দলবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য? লোকবৃদ্ধি হ'লেই হ'ল। তা' হ'লে পাগলগুলোকে নিয়েও তো দীক্ষা দিতে পারে। উঃ, কি ভয়ানক। এসব খবর হয় তো ওঁরা জানেন না। একবার জানানো দরকার। তোমরা কেহ যেতে পার?'**

আমি অমনই যাইতে রাজী হইয়া বলিলাম—"আমি যাব। কা'কে কি বল্‌তে হবে বলুন!" গোঁসাই বলিলেন—**তুমি গিয়ে নির্জ্জনে মন্মথকে আমার কথা বল্‌বে যে, কাল যে মূর্ত্তি নিয়ে ঘুরেছে আজই তাকে ব্রাহ্ম-সমাজ দীক্ষিত কর্‌তে পারেন না। ঐ ছেলেটিকে অন্ততঃ ১৫ দিন দেখা আবশ্যক**। আমি ছুটিয়া ব্রাহ্মসমাজে গেলাম। মন্মথবাবুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া গোস্বামী মহাশয় পাঠাইয়াছেন জানাইয়া, সমস্ত কথা যথাযথ তাঁহাকে বলিলাম। মন্মথবাবু বলিলেন—"এ সব আমি কিছুই জানি না। আচ্ছা, তুমি যাও। আমার অজ্ঞাতসারে কেহ দীক্ষা নিতে পারবে না, এই কথা গিয়ে গোঁসাইকে ব'ল।" আমি অমনি একরামপুরে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত বলিলাম।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে আমার জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনকে আমার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে লইয়া যাইতে জেদ করিতে লাগিলাম। পটুয়াটুলির রাস্তার ধারে রেবতীবাবু গোস্বামী মহাশয়ের সাধন সম্বন্ধে আমাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রেবতীবাবু গোঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে বড় আহ্লাদিত হই। রেবতীবাবু অতি সুগায়ক—গোঁসাই রেবতীবাবুর কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া পড়েন। দীক্ষাগ্রহণ করিতে রেবতীবাবুকে বারংবার বলিলাম। রেবতীবাবু বলিলেন—"দীক্ষা নিতে আমার খুব

ইচ্ছা আছে ; তবে আরও কিছুদিন দেখে শুনে নিতে চাই। আর আমি দীক্ষা নিতে চাহিলেই কি তিনি দিবেন?" ইত্যাদি—

সাধনানুভূতিতে উৎসাহদান। ভক্ত মালাকারের বাঞ্ছাপূরণ।

সকালে উঠিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। গোস্বামী মহাশয়কে ধ্যানস্থ দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তনে গোঁসাইকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন। তিনি, আমাদের বাধা না মানিয়া, গোস্বামী মহাশয়কে আসন হইতে ডাকিয়া তুলিতে গিয়া অকস্মাৎ পড়িয়া গেলেন। তাঁহার নূতন পরিহিত বস্ত্রখানা স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গেল। পায়েও খুব আঘাত লাগিল। গোঁসাইয়ের ধ্যানভঙ্গ না করিয়া ভদ্রলোকটি মনোদুঃখে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গোঁসাইয়ের চৈতন্য হইল। সকলে চলিয়া গেলে পর আমি গোঁসাইকে বলিলাম—কাল আমি বাড়ী যাব।

১৩ই মাঘ
বৃহস্পতিবার

গোঁসাই—**তোমাদের দেশে ইছাপুরায় কাল আমরাও তো যাব। মধ্যাহ্নে আহার ক'রে এস, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। এখন কেমন? তোমার শরীর ভাল আছে তো? তোমার না দাদার কাছে যাবার কথা ছিল? পশ্চিমে যেতে পার্‌লে বেশ সুবিধা ছিল। কবে যাবে?**

আমি। দাদার শীঘ্রই বাড়ী আসিবার কথা আছে। তাই, যাওয়া হইল না।

গোঁসাই। **লেখাপড়া বুঝি হচ্ছে না? যাক্, শরীরটি আগে সুস্থ করে নাও। লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। সাধন কেমন চল্‌ছে? নাম কর তো?**

আমি। দেশে ভাল সঙ্গ নাই। কুচিন্তা কুকল্পনায় সময়ে সময়ে চিত্ত বড়ই অস্থির করে রোগও সারিতেছে না। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। নাম তো করি, কিন্তু শুষ্কতায় দিন দিন কাঠ হইয়া যাইতেছি। বড়ই কষ্ট হয়। প্রাণে নৈরাশ্য আসে।

গোঁসাই। **হাঁ, সব বুঝছি। সাধন কর্‌তে থাক, সমস্ত পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। একটু একটু দৃষ্টিসাধনও ক'রো। প্রাণায়াম কর্‌তে যদি কষ্ট হয়, নাই কর্‌লে। কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু প্রাণায়াম করতে পার্‌লে দেখবে এ অসুখ থাক্‌বে না। এই প্রাণায়াম একবার বেশ অভ্যস্ত হ'লে কোন রোগই থাকে না। আর প্রাণায়ামের সময়ে একটু একটু নিশ্বাস রোধ ক'রে নাম ক'রো। শুষ্কতায় কোন ক্ষতি নাই। নাম কর্‌তে কর্‌তে এ শুষ্কতাও দূর হ'য়ে যাবে। এতে নৈরাশ্যের কোনও কারণ নাই।**

আমি। আমি যাদের খুব ভাল ব'লে জানি, শ্রদ্ধাভক্তি করি, সাধনের পূর্ব্বে এরূপ কয়েকটি লোককে আমি প্রত্যহ স্মরণ ক'রে থাকি। এ প্রকার কল্পনায় কোনও ক্ষতি হয়?

গোঁসাই। **এতো খুব ভাল। এতে ক্ষতি কিছুই হয় না ; উপকারই যথেষ্ট হয়। বেশ। ও**

রকম খুব কর্‌বে। আমিও ওরূপ ক'রে থাকি।

আমি। সাধনের সময়ে নামটি কোথা হইতে আসে, অনুসন্ধান কর্‌তে ইচ্ছা হয়। তলপেটে, নাভিতে, কণ্ঠায়, এইরূপ নানাস্থানে অনুভব করি। এখন মাথার পিছন দিকে একটা স্থানে ধারণা হচ্ছে। এইরূপ অনুসন্ধান ক'রে যে যে স্থানে অনুভব হয় ধারণা কর্‌ব?

গোঁসাই—**হাঁ হাঁ, খুব কর্‌বে। এই সব ধারণা অনেক স্থানে হবে।** কপালে ও ব্রহ্মতালুতে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—**ক্রমে এসব স্থানেও হবে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে এসব ধারণা আপনা হ'তেই হয়। এসব হওয়া খুব ভাল।**

এ সব কথাবার্ত্তার পরে গোঁসাই আবার চক্ষু মুদিলেন। আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই একটি হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল কদমতলার আসিয়া উপস্থিত হইল। গোস্বামী মহাশয়, দূর হইতে খোলের আওয়াজ শুনিয়াই, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে ছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন কদমতলায় আসামাত্রই তিনি আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং কীর্ত্তন মধ্যে যাইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সংকীর্ত্তন চলিল, তিনিও তৎসঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। ক্রমে আমরা বেনিয়াটোলার শ্রীযুক্ত বিহারী মালাকারের বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম। ওখানে গিয়াই গোঁসাই বেহুঁস হইয়া পড়িয়া গেলেন। কীর্ত্তনও একটু পরে থামিল। কিয়ৎকাল গত হইলে, গোঁসাই চৈতন্যলাভ করিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিলেন—**এ কি? আমি এখানে এলাম কিরূপে? আমি তো ভাবছিলাম কদমতলায়ই আছি।**

এ সময়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সম্মুখে দেখিয়া, গোঁসাই মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। মালাকার করজোড়ে গোঁসাইকে বলিলেন—"প্রভু, আজই আমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইল। বড় আশা ছিল, একবার এখানে আপনার শুভাগমন হয়, চরণধূলি পড়ে। আপনাকে বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে সাহস পাইলাম না; আপনি দয়াল, তাই আমার আকাঙ্ক্ষা জানিয়া পূর্ণ করিলেন।" এই বলিয়া মালাকার গোঁসাইয়ের পদতলে পড়িয়া লুটালুটি করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর আমি কখনও গোঁসাইকে প্রতিমূর্ত্তির নিকটে নমস্কার করিতে দেখি নাই। মনে বড় কষ্ট হইল। ভাবিলাম, হায় ভগবান! এই দৃশ্য আমাকে দেখাইলেন কেন?

ইছাপুরা গ্রামে গোঁসাই ও লাল। মহোৎসবে মল্লবেশে নৃত্য।

সকালবেলা মুখ হাত ধুইয়া বসিয়া আছি, ছোটদাদা আসিয়া বলিলেন—"এখনও ব'সে আছিস্ কেন? গয়নার (খেয়া নৌকার) সময় হইয়াছে। আজ না বাড়ী যাইবি?" আমি বলিলাম — আজ গোঁসাইও ইছাপুরায় হরিচরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাবেন; আমিও সেই সঙ্গে যাব ব'লে এসেছি। ছোটদাদা গোঁসাইয়ের সঙ্গে যাইব শুনিয়া খুব বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"গোঁসাইয়ের সঙ্গে না হইলে বুঝি বাড়ী যাওয়া হয় না? 'গোঁসাই! গোঁসাই!' কেবল গোঁসাই তা, হবে না। এখনই তুই গয়নায় চলে যা।" আমি আর কি করিব? ছোটদাদার কথা মতই রওনা হইলাম। গয়নায়

১৪ই মাঘ,
শুক্রবার

উঠিয়া আমার কান্না পাইল। মনে মনে গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া জানাইলাম যে, "ছোটদাদার কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই গয়নায় চলিলাম। আমার জন্য আপনি যেন আর অপেক্ষা না করেন। আর আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন।" সারাটি পথ আমার কষ্টে কাটিল।

সকালবেলা উঠিয়া গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে ব্যস্ত হইলাম। বাড়ী হইতে অর্দ্ধঘণ্টার পথ অন্তরে ইছাপুরা গ্রাম। উকীল শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে যথাসময়ে গিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম বাড়ীটি লোকে পরিপূর্ণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে আজ মহোৎসব হইবে। 'ছোট'লোক, বৈষ্ণব, বাউল ভিন্ন ভদ্রলোকেরা এদেশে বড় মহাপ্রভুর উৎসব করে না ; উহা ছোটলোকদের হৈ চৈ ব্যাপার বলিয়া আমরা জানি। আজ বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও এই উৎসবে আসিবেন ; গতকল্য গোঁসাইও আসিয়াছেন— এ খবর পাইয়া সম্ভ্রান্ত সমাজপতিরাও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

১৫ই মাঘ, পূর্ণিমা, শনিবার।

আমি একেবারে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া পড়িলাম। সে ঘরে তখন কোনও লোকের গোলমাল নাই, মাত্র গোঁসাইয়ের কয়েকটি শিষ্য রহিয়াছেন দেখিলাম। আমি যে কেন গোঁসাইয়ের সঙ্গে আসিতে পারি নাই তাহা তাঁহাকে বলিতে না বলিতেই তিনি আমাকে বলিলেন—**তুমি যে কাল সকালবেলা গয়নায় চ'লে এলে তা' আমি তখনই জান্‌তে পেরেছিলাম।**

আমি। আপনাকে কি কেহ খবর দিয়াছিল?

গোঁসাই। **না, তা' নয়।**

সংক্ষেপে এই উত্তরটুকু দিয়াই, আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করার অবসর না দিয়া, পুনঃ পুনঃ হরিচরণবাবুকে ডাকিতে লাগিলেন। হরিচরণবাবু উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—

'ঘরে মুড়ি আছে? দু'মুঠো মুড়ি এনে দিন তো । বুকে বেদনা বোধ হ'চ্ছে। পিত্তের বেদনায় মুড়ি উপকারী ; সময়ে সময়ে খাওয়া মাত্র দমন হয়।' শরীর আমার অতিশয় রুগ্ন। বুকের বেদনা প্রায় ২৪ ঘণ্টাই লাগিয়া আছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার পথ অতিক্লেশে দেড় ঘণ্টায় চলিয়া আসিয়াছি। গোঁসাইয়ের নিকট পঁহুছিয়া বেদনার যন্ত্রণায় বুক চাপিয়া বসিয়াছিলাম। হরিচরণবাবু মুড়ি আনিয়া দিলেন। দু' একবার মাত্র গোঁসাই তাহা মুখে দিয়া আমাকে অবশিষ্ট খাইতে বলিলেন। মুড়ি খাইয়া আমার বেদনা অনেকটা কমিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আমা অপেক্ষাও অল্পবয়স্ক একটি ছেলে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। ছেলেটিকে দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। উহার পরিচয় পাইবার জন্য শ্রীধরবাবুকে লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীধরবাবু বলিলেন—

"ইহার নাম লালবিহারী বসু, বাড়ী শান্তিপুর। বয়সে ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু ইনি একজন জাতিস্মর মহাপুরুষ। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ইনি ঘর হইতে বাহির হন্। সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ছয়জন সিদ্ধপুরুষের নিকটে ক্রমান্বয়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কঠোর সাধন ভজনে বহু যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন। কিন্তু কোথাও যথার্থ তৃপ্তি না পাইয়া এখন আশ্চর্য্য প্রকারে দৈব ঘটনায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। ইঁহার পরিচয় আর কি বলিব। ইঁহার সঙ্গ করিলেই ক্রমে সমস্ত জানিবে।" আমি শ্রীধরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ওদিকে মহোৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর বিস্তৃত উঠানের উত্তর প্রান্তে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমরা সকলে গোঁসাইকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। করজোড়ে সতৃষ্ণ নয়নে মহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া আপাদমস্তক থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। চারি দিকে বাউল বৈষ্ণবেরা গোঁসাইয়ের ভাব দেখিয়া মহা উৎসাহের সহিত, দলে-দলে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। বহু খোলকরতালের "ঝম্‌ঝম্" আওয়াজে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় কয়েকবার সঙ্কীর্ত্তনের তালে তালে তুড়ী দিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, হঠাৎ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; অমনই বাম হস্তে লালকে ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। লাল তখন ভাবাবেশে উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে হাত ছাড়াইয়া এক পাশে সরিয়া পড়িল। গোস্বামী মহাশয় লালের দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মল্লবেশে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। লালও অনিমেষে গোঁসাইয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিল। এ সময়ে গোস্বামী মহাশয় ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে করিতে মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিলেন এবং বাণযোদ্ধার ন্যায় দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী লালের দিকে সন্ধানপূর্ব্বক ঘন ঘন আকর্ণ আকর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েক পদ চলিয়াই পুনঃপুনঃ লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তির্য্যক্‌ভাবে বাম পদ অগ্রে প্রক্ষেপ করিতে করিতে দিগন্তস্পর্শী হরিধ্বনি করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে লালের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। লাল তৎক্ষণাৎ বাম হস্ত সম্মুখের দিকে ঢাল আকারে বিস্তার করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। ২৫/৩০ হাত সরিয়া গিয়া লাল অকস্মাৎ ভীম রবে 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অকস্মাৎ সম্মুখের দিকে প্রচণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুনঃ আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক গোঁসাইয়ের মত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। গোঁসাই তখন লালের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন, সম্মুখে হস্তাবরণ পূর্ব্বক ত্রস্ত ভাবে দ্রুতগতিতে পশ্চাদগামী হইতে লাগিলেন। ২৫/৩০ হাত সরিয়া গিয়া গোস্বামী মহাশয় আবার অধিকতর উদ্যমে প্রচণ্ড হুঙ্কার করিয়া, "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে লালের দিকে ধাবমান হইলেন।

লাল তখন আবার পূর্ব্ববৎ হটিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার একের প্রতি অন্যে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিয়া, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবেশে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অসংখ্য বাউল বৈষ্ণব-পরিবেষ্টিত, বহুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে শ্রীধর উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছিলেন। অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দিকে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া, অগ্নিপূর্ণ প্রকাণ্ড 'ধুনুচি' গ্রহণ করিলেন এবং 'বোল বোল' রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া, পুনঃপুনঃ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর নতশিরে গোঁসাইয়ের চরণে দৃষ্টি সম্বদ্ধ রাখিয়া সধূম ধুনুচি দ্বারা আরতি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। এ সময়ে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী মুহুর্মুহুঃ উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে লোক সকল বেহুঁস হইয়া পড়িতে লাগিল। বহু মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি কীর্ত্তনকোলাহলে মিলিত হইয়া সকলকে কাঁপাইয়া তুলিল। উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

কি শুনি, কি শুনি, সিংহ রবরে নদীয়ায়।
নিত্যানন্দ বাজায় ভেরী, ভোঁ-ভোঁ, ভোঁ-রব করি;
(হুঙ্কারিয়া) শ্রীঅদ্বৈত বগল বাজায় রে (নদীয়ায়);
জগা বলে, মাধা ভাই, পালাবার আর স্থান নাই;
সংসার ঘেরিল হরি নাম রে (নদীয়ায়)।
শ্রীচৈতন্য মহারথী, নিত্যানন্দ সারথি;
শ্রীঅদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ায় রে (নদীয়ায়)।

বহুক্ষণ এইপ্রকার নৃত্যের পর লাল অকস্মাৎ গোঁসাইয়ের চরণতলে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ও উচ্চ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কয়েকবার হরিধ্বনি করিয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। হরিচরণবাবু ও আমি গোঁসাইয়ের পদদ্বয় অন্যের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিলাম এবং বাতাস করিতে লাগিলাম। শ্রীধরও মূর্চ্ছিত। ক্রমে সংকীর্ত্তন থামিয়া গেল।

যথা সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের আদেশমত মহাপ্রভুর ভোগ দেওয়া হইল। অপরাহ্নে আহার করিয়া আমরা সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

চন্দ্রগ্রহণ।

লালের সঙ্গে আজই আমার প্রথম আলাপ ; উহার জীবনের অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আজ এই উৎসবে আসিবার কথা ছিল ; তিনি আসেন নাই। গোঁসাই নাকি আগামী কল্য বারদী যাইবেন। রাত্রে শ্রীধর ও লাল অন্য ঘরে গিয়া শয়ন করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও আমি গোঁসাইয়ের নিকট রহিলাম। আজ চন্দ্রগ্রহণ।

একটু বেশী রাত্রে গোঁসাই বলিলেন—**'আজ গ্রহণ। সারা রাত জেগে আজ অনেকে জপতপ কর্‌বে।'** আমি বলিলাম—'কেন? আজ জপ করলে কি কোন বিশেষ ফল লাভ হয়?'

গোঁসাই। **তা' তো বল্‌তে পারি না। তবে তিথির একটা গুণ আছে তা' জানি।** কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই কথায় কথায় বলিলেন—**সেরাজদিঘা নদীর পারে একটি আশ্রম হ'লে বড় ভাল হয়। শহরের গোলমাল থেকে সময়ে সময়ে এসে ওখানে নির্জ্জনে থাকা যায়।**

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে, গোঁসাই আমাকেও শয়ন করিতে বলিলেন। আমি রাত্রি আড়াইটার পরে শুইলাম। গোঁসাই সম্মুখে জ্বলন্ত ধুনি রাখিয়া সারারাত্রি একভাবে বসিয়া রহিলেন। এসময়ে একবার বলিলেন—**একটি পাহাড়ে এক সময়ে আমাদের সকলকে মিলিত হ'তে হবে। গুরুজী আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-সাধনার্থে এক একটি দল ক'রে সংসারে প্রেরণ করবেন।**

ঘুমের ঘোরে শুনিয়া এ কথায় আমি আর কিছু প্রশ্ন করিলাম না।

সাধনের সংকল্প।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধনে আমার আন্তরিক আস্থা তেমন আশাপ্রদ এখনও দাঁড়ায় নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে যতই মিশিতেছি ততই তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুসমাজে যে সকল ব্যক্তি এই সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যা' তা' একটা অবস্থা হওয়া বা ওরূপ একটা বলা কিছুই অসম্ভব মনে করি না। উহা আমি গণনার ভিতরেই আনি না, কিন্তু ব্রাহ্মভাবাপন্ন প্রত্যক্ষবাদী, ভয়ঙ্কর গোঁড়া গোঁসাইশিষ্যগণও যখন এই সাধন লইয়া সন্তুষ্ট আছেন দেখিতেছি এবং নানা অদ্ভুত অবস্থার পরিচয় দিতেছেন শুনিতেছি,—বিশেষতঃ আজন্ম সত্যবাদী, নিরপেক্ষ গোস্বামী মহাশয় এই সাধনের সাফল্য বিষয়ে যখন নিজ জীবনে পরিষ্কার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন, তখন আর ইহাতে সংশয় রাখি কি প্রকারে? আমার চেষ্টার ত্রুটি বশতঃই সাধনে উপকার পাইতেছি না মনে করিয়া, নিজের উপরে ধিক্কার আসিল। প্রাণপণে সাধন করিয়া, দেহপ্রাণ জ্বালাইয়া অঙ্গার করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্নানাহার ও নিদ্রা বাদে, ভোরবেলা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ অবিশ্রাম নাম জপ করিতে লাগিলাম। প্রাণায়াম, কুম্ভক এবং দৃষ্টিসাধনও যথাযথ চলিল। প্রায় মাসাধিক কাল এইভাবে সাধন করিয়া আসিতেছি।

ফাল্গুন মাস।

জ্যোতির্দর্শনে সংজ্ঞাবিলোপ।

আর আর দিনের মত আজও অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, নিজ আসনে বসিয়া স্থিরভাবে নাম করিতেছি, অকস্মাৎ দেখিলাম—একটি অদ্ভুত জ্যোতি ঝিকিমিকি করিয়া প্রকাশ হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ জ্যোতি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় আশ্চর্য্য

ছটা বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। ধীর তরঙ্গায়িত স্বচ্ছ জলাশয়ে চন্দ্র প্রতিবিম্বের ন্যায়, অত্যুজ্জ্বল, চঞ্চল জ্যোতি নিজ ললাটমধ্যে দর্শন করিতে করিতে, আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলাম। ৫/৭ মিনিট কাল এই জ্যোতি উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইয়া, স্থিরভাব ধারণ করিল। উহার বিমল মনোহর সৌন্দর্য্যে চিত্ত আমার উহাতে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল ; অন্য আর কোন জ্ঞানই রহিল না। ঐ সময়ে নাম করিতেছিলাম কি না তাহাও আমার স্মরণ নাই। এই দর্শনের পরে আচ্ছন্ন অবস্থায় কতক্ষণ যে ছিলাম, তাহাও কিছুই জানি না।

চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ

জাগরিত হইয়া ঐ জ্যোতির স্মৃতিতে এখন আমি যেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় গেলে, কি করিলে আবার আমি উহা দেখিতে পাইব, নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি।

আগামী কল্যই আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইব, স্থির করিলাম। আজ সমস্ত যেন আমার নিকটে বিষাদময় নীরস ও বিরক্তিকর বোধ হইতেছে। জ্যোতিটির স্মৃতি চিত্তে একটানা লাগিয়া রহিয়াছে।

ঢাকায় পঁহুছিয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ঘোষ ও শ্রীমান্ লালবিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিভৃতে লইয়া গিয়া আমার এই দর্শনের বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। তাঁহারা সকলেই এই দর্শনের যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—"উহাই ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দিব্যচক্ষু। উহা প্রকাশিত থাকিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দিব্যালোকে মধুময় দর্শন হয়। যে যবনিকার অন্তরালে পরলোক রহিয়াছে, এই আলোকেই তাহা স্বচ্ছ হইয়া যায়। তখন দেখা যায় জীবন ও মরণ, ইহলোক এবং পরলোক সমস্তই এক। গুরুর কৃপাতেই এ অবস্থা লাভ হয়। তাঁরই ইচ্ছায় ইহা স্থায়ী হয়।" লাল বলিলেন— "এই জ্যোতি ক্রমে হৃদয়ে আসিয়া পড়ে এবং অষ্টপ্রহর আনন্দরূপে বিরাজ করে। ইহা অদৃশ্য হইলে, নৈরাশ্যে ও শুষ্কতায় জীবন যেন শ্মশানতুল্য হইয়া যায় ; তখন নানাপ্রকার প্রলোভন ও পরীক্ষা আসিতে থাকে; জ্বালা যন্ত্রণায় হৃদয় ফাঁক করিয়া দেয়। নামেই ইহার প্রকাশ; আর, নামশূন্য হইলেই ইহা অন্তর্হিত হয়।" শ্রীধর বলিলেন—"আরে ভাই, এই ত জিনিস! একেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ বলে। এ অবস্থা স্থায়ী হ'লে কি আর রক্ষা আছে? বাসনা কামনা সমস্ত লয় পাইয়া, ঐ জ্যোতিতে লোক আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া যায়! সাধনে নিষ্ঠা ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে গুরুদেব চরম অবস্থার আভাসমাত্র সাধকদের নিকটে প্রকাশ করেন; আবার টানিয়া নিয়া যান। শুধু তোমার নয়, প্রথম প্রথম এরূপ এক একটা আশ্চর্য্য অবস্থা এক একজনার হয়। ইহা চেষ্টাসাধ্য নয়, সাধন সাধ্য নয়, শুধু গুরুর কৃপাতেই এই অবস্থা হয়। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার যো নাই।"

ইহাদের কথা শুনিয়া আমার একটা আনন্দ হইল বটে; কিন্তু অধিকক্ষণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম সত্য বস্তু পরিজ্ঞাত থাকিলে সহস্র লোকেও ঠিক একই প্রকার বলিবে।

ইঁহারা তো দেখিতে পাহ—এক একজনে এক এক রকম বলিলেন। ইঁহাদের কথায় পরস্পর বিরোধী বিশেষ কিছু না থাকিলেও, আমার সন্দেহ হয়—ইঁহারা বোধ হয় সকলেই 'আন্দাজী' কথা বলিলেন! আমি অন্যদিক্ দিয়া অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া, ব্রাহ্ম ডাক্তার কৈলাসবাবুর নিকটে গেলাম। তাঁহাকে আমার সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঐ দর্শন আমার চোখের দোষে বা মাথার কোন রোগের দরুণ হয় নাই তো?" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তা ভিন্ন আর কি বলিব, তোমার তো 'সর্ট-সাইট' আছেই। চোখের রোগে মানুষ দিন-দুপুরেও জোনাকিপোকা দেখে। আমাদের এ 'পারফেক্ট সায়েন্স', ডাক্তারী কেতাবে ওরূপ 'ঢের ঢের' প্রমাণ আছে। 'যোগ-টোগ' ক'রে চোখ মাথা নষ্ট হইলে, আরও কত দেখ্‌বে।"

ডাক্তারবাবুর কথায় আমার দর্শন-বিষয়ে বিষম একটা 'খট্‌কা' জন্মিল। সুতরাং, গোস্বামী মহাশয়কে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐ জ্যোতির্দর্শনের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ও অস্থিরতা আপনা আপনি হইতে লাগিল।

যাহা হউক, আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর উৎসাহে সাধন করিতে লাগিলাম। সর্ব্বদাই সে জ্যোতির একটা স্মৃতি আমার অন্তরে রহিয়া গেল। উহা আর ছাড়াইতে পারিলাম না।

ঢাকার টর্নেডো।

বেলা-অবসানে ঢাকার পশ্চিমাকাশে নদীর উপরে একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিল। নবাব গণি মিঞা সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণে অকস্মাৎ ঘূর্ণীবায়ু উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গার জল আলোড়িত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ হইতে হস্তিশুণ্ডাকৃতি জলস্তম্ভ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া, কাল মেঘে মিলিত হইল। তখন অসংখ্য অগ্নিগোলা উহা হইতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। ২০/২৫ খানা 'এঞ্জিন' এককালে চলিলে যে প্রকার শব্দ হয়, সেই প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দে শহরটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। হঠাৎ ঐ শব্দ শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় আসন ত্যাগ করিয়া ব্যস্ততার সহিত ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাঁদো কাঁদো স্বরে কালী ও মহাবীরের স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, মহাবীর ও মহাকালী ভীষণ আকারে প্রকাশিত হইয়া, গভীর গর্জ্জন সহকারে দিগন্ত কাঁপাইয়া, অগ্নি গোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক, নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন! কালীর অনুচারিকাগণ সম্মুখে যাহা পাইতেছেন লণ্ডভণ্ড করিয়া ভীমগতিতে কালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন! গোস্বামী মহাশয় ছল ছল চক্ষে কম্পিত কলেবরে, করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—**জয় মা কালী! জয় মা কালী! দয়া কর, দয়াময়ি, দয়া কর মা। প্রসন্ন হও, মা প্রসন্ন হও।** একটু পরে আবার ব্যস্তভাবে বলিলেন—**জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! ও সব অগ্নি গোলা আমার বুকে নিক্ষেপ কর। সকলের**

২৬শে চৈত্র, শনিবার

প্রতি দয়া কর, সকলকে রক্ষা কর। এইভাবে স্তবদ্বারা গোস্বামী মহাশয় উঁহাদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে ২/৩ মিনিটের মধ্যে যাহা হইবার হইয়া গেল। উপদ্রবেরও শান্তি হইল। কিন্তু সমস্ত শহরে লোকের মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঢাকা ও বিক্রমপুরে শত শত গ্রামে, যে সব অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহা বুদ্ধির অগোচর ও বিস্ময়জনক। একটা আশ্চর্য্য অলৌকিক শক্তির প্রভাবে যে কতকগুলি অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আর স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

১। বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে একটি বৃদ্ধাকে নদীর উত্তর পারে, শহরের মধ্যে বহু উচ্চ অট্টালিকা সমূহ অতিক্রম করিয়া নর্ম্ম্যাল স্কুলের দোতলায় একটি কোঠার ভিতরে আনিয়া রাখিয়াছে। ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধার কিন্তু কোন অঙ্গেই বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে নাই।

২। ''ঢাকাপ্রকাশ'' যন্ত্রালয়ের একখানা বড় টেবিল ৫/৬ মিনিট দূরের পথে একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে নিয়া ফেলিয়াছে। টেবিলটি যে ঘরে ছিল তাহাতে মাত্র একটি দরজা দিয়া কায়দামত 'কাত' করিয়া বাহির না করিলে, অন্য কোন উপায়ে উহা বাহিরে আনা যায় না। টেবিলটি প্রায় আড়াই মণ ভারি। উহার কোন অঙ্গই ভগ্ন হয় নাই।

৩। মুড়ি পরিপূর্ণ কলসী এক বাড়ীর কার (মাচাঙ্গ) হইতে তুলিয়া লইয়া ৩/৪ মিনিট দূরের পথে অপর এক বাড়ীতে আনিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। আল্‌গা সরা ঢাক্‌নি সমেত মুড়ি পরিপূর্ণ কলসীটি যেমন ছিল, ঠিক তেমনই রহিয়াছে।

৪। একটি ১৫/১৬ হাত লম্বা 'দস্তি' খামকে (বোধ হয় চড়ক পূজার) ৫/৬ ফুট পোতা স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া, ঐ গর্ত্তেই উহার মাথার দিক নীচে দিয়া উল্টাভাবে পূর্ব্ববৎ পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

৫। সুদৃঢ় বৃহৎ অট্টালিকার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ইষ্টকাদি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার ঠিক পার্শ্বে মাত্র ১২/১৪ ফুট অন্তরে অর্দ্ধশুষ্ক গোলাপফুলের একটি পাপড়িও বৃন্তচ্যুত হয় নাই।

৬। একটি যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ অক্ষত রাখিয়া, শুধু স্তন দুইটি ক্ষুর-কাটার মত সমান করিয়া তুলিয়া নিয়াছে।

৭। অঙ্গুলী পরিমিত স্থূল, প্রায় ১ হস্ত দীর্ঘ, আগাসরু একটি বাঁশের বাখারী দ্বারা একটা সুপারি গাছকে এপিঠ-ওপিঠ বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! খুব বলবান্ লোকেও উহা টানিয়া খুলিতে পারিতেছে না।

যে সকল স্থান দিয়া এই ঘূর্ণীবায়ু বহিয়া গিয়াছে সে সমস্ত স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাকা বাড়ীর দেওয়ালের, এমন কি ভূমিরও, রং পর্য্যন্ত পোড়া মাটির মত হইয়াছে। মাঠ ময়দানের দূর্ব্বাগুলিও যেন জ্বলিয়া গিয়াছে। বহু বলিষ্ঠ 'জোয়ান' লোকও নানাস্থানে এই ঝড়ে পড়িয়া

মারা গিয়াছে ; আবার বহু শিশু, বালক, গর্ভবতী স্ত্রী এবং বৃদ্ধেরাও এই ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া নিরাপদে সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইয়াছে! ক্ষণস্থায়ী একটা ঝড়ে কি প্রকারে যে এত সব কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, বুঝিতেছি না। জড়শক্তিতে ভগবদিচ্ছায় চৈতন্য মিলিত হইলে তাহাদ্বারা যে নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা না মানিয়া পারিতেছি না। কিন্তু দেবদেবী বা ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্বেই আমার অবিশ্বাস, সুতরাং এ সকল ঘটনা তাহাদের কোন কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গ । বিচিত্র জীবনকাহিনী; অজ্ঞাত ভূগোল-বৃত্তান্ত।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে বহুকাল যাবৎ যে মহাপুরুষ গুপ্তভাবে রহিয়াছেন তাঁহাকে সকলেই এখন বারদীর ব্রহ্মচারী বলেন। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে অনেকবার এই মহাপুরুষের অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য ও অসাধারণ মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছি। গোঁসাই বলিয়াছেন— **"বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া, বহু পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এপ্রকার উচ্চ অবস্থার একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন এ অবস্থার লোক আর নাই।"** গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যেরা অনেকেই বহুবার বারদী গিয়াছেন। ঢাকা ও বিক্রমপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সমস্ত ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গে আজকাল ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ। কথায় কথায় গোস্বামী মহাশয় আমাকেও একদিন বলিয়াছিলেন—**"ব্রহ্মচারীর চোখের পলক নাই। পাঁচ মিনিট তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌বে। হিমালয় ও তিব্বতাদি হ'তে প্রাচীন যোগিগণ যোগশিক্ষা করতে রাত্রিকালে এই ব্রহ্মচারীর নিকটে আসেন। এজন্যে রাত্রে কেহ সেই ঘরে যেতে পায় না। তিনি সন্ধ্যার সময়েই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেন।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আমি কি একবার ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিতে যাইব?

গোঁসাই—**হাঁ, হাঁ, খুব যাবে। গেলে উপকার পাবে। ওখানে গিয়ে নিজে থেকে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, চুপ্‌ ক'রে একটু দূরে ব'সে থেকো। তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজন নিজ হ'তেই তিনি তোমাকে ডেকে বল্‌বেন।**

গোস্বামী মহাশয়ের কথায় ব্রহ্মচারীকে দেখিতে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। বহুকাল পরে বড়দাদা (শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) বাড়ী আসিয়াছেন; মেজদাদা ও ছোটদাদাও ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ীতেই আছেন। বড়দাদা সকল সময়েই প্রায় আমার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কথা প্রসঙ্গে সুযোগ পাইলেই আমি তাঁহাকে গোস্বামী মহাশয়ের অসাধারণ ধর্ম্মজীবনের কথা বলি। গোঁসাইয়ের সত্যনিষ্ঠা, দয়া ও সরলতার দৃষ্টান্তে দাদা খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। আমিও তখন দাদাকে গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা লইতে অনুরোধ করি;

যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ নিতান্তই প্রয়োজন; দাদা কিন্তু গোঁসাইয়ের এ কথা স্বীকার করেন না। ছেলেবেলা হইতে তিনি কেশববাবুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কেশববাবুকে গোস্বামী মহাশয় অপেক্ষাও অনেক বড় মনে করেন। কেশববাবু কখনও দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই, দাদা ইহাই জানেন; সুতরাং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও পুরুষকার দ্বারা ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায়, কেশববাবুর দৃষ্টান্তে দাদা ইহাই স্থির বুঝিয়া বসিয়া আছেন। আমি ভাবিলাম, কোনপ্রকারে দাদাকে একবার বারদীতে নিয়া ফেলিতে পারলি হয়; ব্রহ্মচারী মহাশয় যদি একবার দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলেন, তাহাতে দাদার প্রত্যয় জন্মিবে। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এক গ্রামবাসী, দাদার সমবয়স্ক ও বিশেষ বন্ধু। তাঁহার দ্বারা অনুবোধ করাইয়া দাদাকে বারদী যাইতে রাজী করাইলাম। অবিলম্বেই আমরা বারদী যাত্রা করিব স্থির হইল।

ভোর রাত্রে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। আজ জাগরিত অবস্থাতেও প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার ন্যায় নিয়ত এ স্বপ্ন আমার স্মৃতিতে উদিত হইতেছে। এই স্বপ্নে পরিষ্কাবরূপে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দর্শনলাভ হইল। যে সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা এ স্বপ্নে আমি দেখিলাম তাহার সঙ্গে আমার জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ইহা নিশ্চিত মনে হয়। তবে গোস্বামী মহাশয়কে উহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা না করিয়া ডায়েরীতে উহা তুলিতে ইচ্ছা করি না।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫, রবিবাব।

সকালে আহার করিয়া বড়দাদা, মেজদাদা, তারাকান্ত দাদা এবং আমি বারদী রওনা হইলাম। দাদার শরীর অত্যন্ত স্থূল, ৪/৫ মিনিট চলিলেই তিনি হাঁপাইয়া পড়েন। তালতলা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা পথ হাঁটিয়া, স্থূল উরুদ্বয়ের সংঘর্ষণে ছাল উঠিয়া ঘা হইয়া গেল। সাধু-দর্শনে হাঁটিয়াই যাইবেন এই জেদেই দাদা এই উৎপাতের সৃষ্টি করিলেন। তালতলা হইতে নৌকা করিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই আমরা বারদীর বাজারে পঁহুছিলাম। সন্ধ্যার পরেই ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দরজায় খিল পড়ে, সকলেই জানে। কিন্তু দাদা চিত্তের আবেগে, রাত্রিকালেই দর্শনে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই চলিয়া গেলেন; আমার ইচ্ছা হইল না, আমি নৌকাতেই রহিলাম। একটু পরে উঁহারা আসিয়া বলিলেন, দর্শনলাভ হইয়াছে। উঁহাদের যাওয়া মাত্রই ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তোমাদের জন্যই আমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করি নাই; এখন যাও, গিয়ে বিশ্রাম কর, কাল এস।" এই বলিযা তিনি সকলকে নৌকায় পাঠাইয়া কপাটে খিল দিলেন।

ভোরবেলা স্নানাদি করিয়া আমরা ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাবান্দার সম্মুখে পৌঁছিতেই ব্রহ্মচারী মহাশয় উঠিয়া আসিয়া দাদাকে হাতে ধরিয়া স্বীয় আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন এবং দাদাকে বলিলেন—"তুমি মহাপুরুষ। ছদ্মবেশে বাবু সাজিয়া আমার কাছে আসিয়াছ।" দাদা বলিলেন—"আমি সর্ব্বদা এই বেশেই তো থাকি।" পরে বহুক্ষণ ধরিয়া দাদাব সঙ্গে

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫, সোমবার।

নানারূপ আলাপাদি চলিল। দাদার অবস্থা শুনিয়া খুব সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার কর্ম্ম প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। তুমি আবার আমাকে দর্শন করতে এসেছ? দশ বছর পরে শত শত লোক তোমাকেই দর্শন ক'রে ধন্য হবে।" দাদা বলিলেন—"আমার যথার্থ কল্যাণ কিসে হবে, আপনি ব'লে দিন।" ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন—"তা' হ'লে গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা লও। সত্যবস্তু তাঁরই নিকটে আছে। তিনি আশ্রয় দিলে খুব শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করবে।" আরও অনেক কথাই ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন। কিন্তু এই কথা কয়টি আমার ভাল লাগিল বলিয়া এখানে লিখিয়া রাখিলাম। মেজদাদাকেও অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে— "অর্থ উপার্জ্জন কর এবং নির্লিপ্তভাবে লোকের সেবায় উহা ব্যয় কর", এই কথাটিই খুব বিশেষ করিয়া বলিলেন। সকলের সঙ্গে আলাপ শেষ হইলে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে তুই এসেছিস কেন? দেবতা দেখ্‌তে এসেছিস?" আমি কোনও কথা বলিব না স্থির করিয়া, চুপ করিয়া বারান্দায় স্থির হইয়া বসিয়া ছিলাম। ব্রহ্মচারীর প্রশ্ন শুনিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলাম 'না'। ব্রহ্মচারী আমাকে 'কিল' দেখাইয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"মাথা ঝাঁকিস্! মাথা ভেঙ্গে দেব। কথা বল্!" পরে ব্রহ্মচারী তাঁহার আসনের পাশে আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি ঘরে গিয়া বসিলাম। ব্রহ্মচারী আমাকে কত কি উপদেশ দিয়া শেষকালে বলিলেন—"ওরে তুই তো নিত্য 'নোট' লিখিস্? (ইহা কি প্রকারে ব্রহ্মচারী জানিলেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।) তাতে তোর সম্বন্ধে আমার দুটো কথা লিখে রাখিস্— 'বিলাসিতা ত্যাগ কর্। বিদ্যা হবে না।' আচ্ছা, আমার এ কথার অর্থ কি বুঝ্‌লি বল্ তো?" আমি বলিলাম — 'সকল প্রকার সুখভোগ ত্যাগ করিতে বলিলেন ; তা'হলেই ধর্ম্মে মতি হইবে এবং ওরূপ হইলে লেখাপড়াও হইবে না।' ব্রহ্মচারী আবার ধমক্ দিয়া বলিলেন—"মুর্খু! আমি তাই বুঝি বলিলাম? অবিদ্যা কাকে বলে, বিদ্যা কাকে বলে—তাই তুই জানিস্ না? লেখাপড়া কর্‌বি না কেন? খুব গিয়া লেখাপড়া কর্। লেখাপড়া কর্‌লেই পাশ হবি। বিলাসিতা করিস্ না। পোষাক পরিস্ না। একখানা কাপড় একখানা চাদর মাত্র পরিস্। জুতার দরকার নাই—সাধারণমত একজোড়া চটীজুতা মাত্র রাখ্‌তে পারিস্। পিরাণ গায়ে দিস্ না। মন খারাপ হ'লে এখানে এসে উপদেশ নিয়ে যাস্। আমাকে চিঠি লিখিস্। ধর্ম্ম কর্ম্ম সব হবে। অস্থির হ'স্ না। কোন ভয় নাই। একটা বেদনায় তুই কষ্ট পাচ্ছিস্ না? কাছে আয়—আমি তোর বুকে হাত বুলিয়ে দি, এখনই সেরে যাবে।" আমি বলিলাম—'বেদনা সারায়ে দিবেন, এজন্য আমি আসি নাই। শুধু আপনাকে দর্শন কর্‌তে এসেছি। আমি স্বপ্নে আপনাকে ঠিক্ এইরূপই দেখেছিলাম।'

ব্রহ্মচারী—"স্বপ্নটি বল্ না?" আমি স্বপ্নটি বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"স্বপ্নটি লিখে রাখিস্। তোর পথ তো স্বপ্নেই তোকে দেখায়েছি। তুই আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলি না কেন, বল্ তো?" আমি বলিলাম—'আমার ভবিষ্যতে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত বিষয় আপনি

নিজে হইতেই আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, গোস্বামী মহাশয় এরূপ বলিয়াছিলেন। নিজ হইতে কোনও কথা বলিতে তিনিই আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন ; তাই, বলি নাই।' ব্রহ্মচারী এ কথার পর বলিলেন—"আচ্ছা, তোর সব কথা পেয়েছিস্ তো? আমি বলিলাম, 'হাঁ।'

ব্রহ্মচারী —"তবে যা। স্বপ্নটি 'নোটে' লিখিস্। বেদনা তোর প্রারব্ধের। হাত বুলা'য়ে দিলে সেরে যেতো বটে; কিন্তু আবার কখনও তা' ভোগ কর্‌তে হ'ত। ঔষধাদি কিছু খাস্ না ; তাতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ভোগফল শেষ হ'লে আপনা হ'তেই সেরে যাবে। (দাদাকে দেখাইয়া) ওদের ঔষধে কোন উপকারই হবে না। অসহ্য বোধ হ'লে, তাজা মাটি নিয়া ডলিস্; কমে যাবে।" আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বারান্দায় গিয়া বসিলাম। মধ্যাহ্নে আহারান্তে আবার সকলে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মচারী তাঁহার জীবনের অনেক কথা বলিলেন। যতটা স্মরণ আছে, লিখিয়া রাখিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন— শান্তিপুরে বিশুদ্ধ 'অদ্বৈতবংশে' তাঁহার জন্ম। গোস্বামী মহাশয়ের প্রপিতামহের তিনি সহোদর ছিলেন। আত্মজীবন সম্পর্কে তিনি বলিতে লাগিলেন— "আমরা চারি সহোদর ছিলাম বলিয়া, আমার পিতামাতা আমার উপনয়নের পরেই আমাকে একটি ষট্‌চক্রভেদী সন্ন্যাসীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি আমাকে দীক্ষা দান করিয়া সাধন শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং বহু যত্নে নিয়ত আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। যৌবনাবস্থায় ক্রমে আমি দুর্ব্বার রিপুর উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, গুরু তখন আমাকে লইয়া কোনও পাহাড়ের সন্নিকটে এক পল্লীতে গিয়া একটি কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। বিধির চক্র, উহারই সন্নিকটে একটি বিধবা সুন্দরী যুবতী বাস করিত। গুরু ভিক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট সামগ্রী সমস্ত আনিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন আমাকে রান্না করিয়া খাওয়াইতেন; আর সারাদিন কুটীর ছাড়িয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া নানাভাবে সেই যুবতীর সঙ্গে আমোদ করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। এই প্রকারে প্রায় তিন বৎসর আমার কাটিয়া গেল। ঐ দিকে স্পৃহাও ক্রমে আমার কমিয়া আসিল। এই সময়ে সহসা একদিন আমার মনে হইল, 'এ কি কর্‌ছি? চিরকাল এই কর্‌তেই কি আমি বাপ মা ছেড়ে মহাপুরুষের সঙ্গে এলাম?' ভিতরে তখন আমার ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হইল। আমি তখন অন্যত্র যাইতে গুরুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন তিনি আমার সে কথায় কাণই দিলেন না। পরে 'আজ যাই, কাল যাই' বলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। আমারও ক্রমেই অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খুব জেদ করিয়া যখন গুরুকে ধরিলাম, তখন তিনি অসুস্থ বলিয়া ভাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিতবের অসহ্য জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, একদিন গুরুকে বলিলাম—'আর আমি একটি দিনও এখানে থাকিব না। গুরু বলিলেন—"শরীর বড় অসুস্থ। আর দুই দিন এখানে থাক।" আমি

তখন হাতে মুদগর লইয়া গুরুর দিকে ছুটিলাম; বলিলাম 'সারাদিন কুটীর ছেড়ে ঘুরতে পার, রোজ রোজ ভিক্ষা ক'রে এনে নিজে রান্না ক'রে আমাকে খাওয়াতে পার, তখন তোমার কোন অসুখ থাকে না, আর এস্থান হ'তে যেতে বল্লেই অসুখ হয়। আজ তোমাকেও খুন কর্‌ব, নিজেও 'খুন হ'ব।' গুরু দৌড়িয়া পলাইলেন। পরে আসিয়া বলিলেন,—"চল, এবার ঠিক হয়েছে"।

পথ চলিতে চলিতে গুরুকে বলিলাম—'এত দিন আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই, আজ যে বড় শুনিলে? গুরু বলিলেন—"এত দিন তো বাবা, তেমন করিয়া বল নাই। তুমি ভোগকে ছাড়িয়াছিলে, কিন্তু ভোগ তোমাকে ছাড়ে নাই, আজ ছাড়িয়াছে।"

অতঃপর কোন এক নিভৃত পাহাড়ে লইয়া গিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল গুরু আমাকে হঠযোগ অভ্যাস করান। রাজযোগ শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলে, গুরু আমার হঠযোগের পরীক্ষা নিলেন, বলিলেন—"তোমার উরুদ্বয়ের মধ্যে হাঁড়ি চাপাইয়া মিষ্টান্ন রান্না করিয়া আমাকে খাওয়াইতে হইবে।" আমি তাহাই করিলাম। তার পরে রাজযোগের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই রাজযোগে কৃতকার্য্য হইতে বহুকাল লাগিল। তৎপরে গুরু অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম—'আপনি নাকি একবার উদয়াচলে গিয়াছিলেন?' ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু যেতে পারি নাই।" আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল—হিতলাল মিশ্র (ত্রৈলঙ্গ স্বামী), বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক মহাত্মা, আবদুল গফুর নামে একজন মুসলমান ফকির। আমরা এই চারজনে সূর্য্যলোকে যাইব সঙ্কল্প করিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। হিমালয়ের উপর দিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম। আহার আমাদের ফলমূল মাত্র ছিল। বরফের উপর দিয়া এইভাবে বহুকাল চলাতে শরীরের চর্ম্ম একরকম খড়্‌খড়ে হইয়া গেল। পরে সাপের যেমন খোলস্‌ ওঠে, আমাদেরও সেই প্রকার একটা খোলস্‌ উঠিয়া গেল, তখন শরীরটি ঠিক দুধের মত সাদা হইল। বরফের ঠাণ্ডা শরীরে লাগিত না। ছয় মাস দিন ছয় মাস রাত্রি যেখানে হয় আমরা সেস্থানও ছাড়াইয়া বহুদূরে গেলাম। সেখানে এখানের মত দিন রাত বা চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নাই।

প্রশ্ন। কতকাল আপনারা ঐরূপ স্থানে চলিয়াছিলেন?

ব্রহ্মচারী। যেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, দিন রাত্রি কিছুই নাই, সেখানে সময় বা বৎসরের হিসাব পাইব কি উপায়ে? তবে, বহুকাল চলেছিলাম এইমাত্র বলতে পারি।

প্রশ্ন। চন্দ্র সূর্য্য নাই, তবে পথ দেখিতেন কি প্রকারে?

ব্রহ্মচারী। ও সব স্থানে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চল্‌তে চল্‌তে চক্ষের উপাদানই অন্য প্রকার হইয়া গেল। চন্দ্র-সূর্য্যের আলো না থাকলেও চক্ষে দেখতে পেতাম।

প্রশ্ন। আপনারা কি উদয়াচলে উঠেছিলেন?

ব্রহ্মচারী। আমরা সকলেই উঠেছিলাম। বেণীমাধব বেশীদূর উঠতে পারলেন না। আবদুল

শ্রীশ্রীবারদিব ব্রহ্মচারী
(গোস্বামী প্রভুর খুল্ল পিতামহ)

গোস্বামীপ্রভুর দৌহিত্র
বৃন্দাবন চন্দ্র মৈত্র
ওরফে দাউজী

প্রভুপাদ
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র
দেবকুমার

গফুর বহুদূর উঠে ফিরে এলেন; আমিও তাই। হিতলাল মিশ্র কতদূর উঠেছিলেন জানি না। তাঁকেও নেবে আসতে হ'ল।

প্রশ্ন। উঠতে পারলেন না কেন?

ব্রহ্মচারী। উর্দ্ধদিকে বায়ু ক্রমেই হাল্‌কা। আমি যেস্থানে উঠেছিলাম সেখানকার বাতাস অতিশয় হাল্‌কা, স্থির; বাতাসের তরঙ্গ সেখানে নাই। কাজেই শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না। শুনিলাম হিতলাল মিশ্র আরও খানিক উঠে বাতাস না পেয়ে নামলেন।

প্রশ্ন। সে সব মহাত্মারা এখন কোথায় আছেন?

ব্রহ্মচারী। তখন আবদুল গফুর মক্কাতে গেলেন; এখনও তিনি জীবিত। বেণীমাধব চন্দ্রনাথের পাহাড়ে গিয়েছিলেন। আমি নীচে এসে দু'বার মক্কায় এবং এশিয়া ইউরোপের বহুস্থানে ঘুরে চন্দ্রনাথ যেতেছিলাম, রাস্তায় আমাকে পুলিশে ধর্‌ল। তার পর এখানে।

প্রশ্ন। আপনাকে পুলিশে ধ'রেছিল কেন?

ব্রহ্মচারী। কামাখ্যা (গৌহাটি) শহরের 'ম্যাজিষ্টার' সাহেব কয়েকটি সাধুর জটার ভিতরে টাকা মোহর পেয়ে চোর অনুমানে তাঁদের জেলে আটক রাখেন। জটাধারী পেলেই তা'কে ধরবার জন্য পুলিশের উপর হুকুম হ'ল। আমার জটা ছিল, তাই আমাকেও ধরলেন। সাহেব আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন; আমি উত্তর দিতে পারলাম না। শাকসব্‌জী বহুকাল খেয়ে এবং অনাহারে বহুকাল থেকে জিহ্বা অন্যপ্রকার হ'য়ে গিয়েছিল, বাক্‌শক্তি ছিল না, কথা বলতে পারতাম না। 'ম্যাজিষ্টার' সাহেবের দিকে একটু তাকাতেই তাঁর ভক্তি হ'ল—আমাকে ছেড়ে দিতে বললেন। 'অন্যান্য সাধুদের না ছাড়্‌লে আমিও জেলে থাকব, ইঙ্গিতে জানাইলাম; সাহেবের দয়া হ'ল। তিনি আমার মনস্তুষ্টির জন্য আর সকলকেও ছেড়ে দিলেন। পরে আমরা সকলে চন্দ্রনাথ চল্‌লাম। এখানকার একটি ভদ্রলোক পথে আমার খুব সেবা কর্‌তে লাগলেন। তিনিই আমাকে রাস্তা ঘুরা'য়ে বারদীতে নিয়ে এলেন। আমি এখানে এসে, সাধারণ লোকের মত, পাগলের মত থাকতাম। একটি ১০/১২ বৎসরের বালিকা নিত্য আমাকে কিছু কিছু খাবার এনে দিত, আমি তা কিছুই খেতে পারতাম না। পরে সেই মেয়েটিই একটু একটু দুধ, পরে মোহনভোগ, তারপর ক্রমে আরও শক্ত শক্ত জিনিস খাওয়াতে আরম্ভ করে। এই সময়ে আমার রক্তের রঙ লাল হ'তেছে দেখলাম— এতদিন ঘাসের রসের মত ছিল। ক্রমে ক্রমে কথাও ফুট্‌লো। পরে, প্রারব্ধ কর্ম্মটুকু শেষ করতে অনেক কাণ্ড করেছি। ''নাস্তা''—খেয়ে মুসলমান চাষীদের সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে ক্ষেত নিড়া'য়েছি; কান্ধে বাঁশ নিয়ে সারারাত জেগে শূকর তাড়া'য়েছি। বহুকাল আমি এইভাবে কাটা'য়েছি; কেহই আমার পরিচয় পায় নাই। শেষকালে জীবন কৃষ্ণই আমাকে মহাপুরুষ ব'লে প্রচার ক'রে সর্ব্বনাশ করবার যোগাড় করছে! এখন দিন-রাত এখানে লোকের ভিড় । একটু স্থির হ'তে পারি না।

মেজদাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তবে কি করব?" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"পূজা"। প্রশ্ন—"কি পূজা?" উত্তরে ব্রহ্মচারী মহাশয় অঙ্গুলিদ্বারা একটি বৃত্ত অঙ্কন করিয়া কহিলেন, "এই; বুঝলে না?" মেজদাদা—"না; শালগ্রাম?" ব্রহ্মচারী । "না; টাকা, টাকা। অর্থ উপার্জ্জন কর, আর ভোগ ক'রে কর্ম্ম শেষ কর।" মেজদাদা একথার উত্তরে বলিলেন—"আমরা তো পড়েছি 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে'।" একথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, ইহার বাঙ্গলা কর তো।" মেজদাদা—কাম কখনও কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় না; অগ্নিকে ঘৃত দিলে যেমন বাড়িয়া যায় তদ্রূপ আরও বৃদ্ধি পায়।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আমি তো ভোগ ক'রেই কর্ম্ম শেষ করতে বলেছি, উপভোগের কথাতো বলি নাই। ভোগ আর উপভোগে পার্থক্য আছে, যেমন পতি আর উপপতি! শাস্ত্র-বিধি অতিক্রম ক'রে স্বেচ্ছাচারে যাহা করা যায় তাহাই উপভোগ, তাতে শান্তি হয় না; বিধিপূর্ব্বক ভোগে হয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য লোক লোকান্তরে মানুষের গতিবিধির কোনও পথ আছে কি?"

ব্রহ্মচারী। "পথ একটা না থাকিলে সে সব স্থানে লোক যাতায়াত করলে কি ক'রে? যাতায়াত ক'রে দেখে শুনে না এলে সে সকল লোক সম্বন্ধে এত পরিষ্কার ক'রে বল্‌লেই বা কি প্রকারে? বহু ঋষি মুনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক রকমই তো ব'লে গেছেন! কোন্ লোক কি প্রকার; কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ; কোন্ লোকে কত পাহাড়, কত নদী; এমন কি—বড় বড় রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পর্য্যন্ত র'য়েছে। সে সব স্থানের অধিবাসীদের আকৃতি প্রকৃতি, তাহাঁদের কার্য্য কলাপ সমস্তই তো বিস্তারিতরূপে লিখে গেছেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের পরিষ্কার পথ আছে। বহুসংখ্যক মণি যেমন একসূত্রে মালার আকারে গাঁথা থাকে, তদ্রূপ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্য ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সমস্ত লোক পর পর শিকলে গাঁথার ন্যায় সংহত র'য়েছে। তবে সকল শরীরেই তো সকল স্থানে যাতায়াত সম্ভব নয়? দেহটিকে স্থানের ও পথের উপযোগী ক'রে নিতে হয়। তা নইলে হয় না।" প্রশ্ন করিলাম—"এই উপযোগী দেহ কি প্রকারে প্রস্তুত হয়?"

ব্রহ্মচারী । "যোগাভ্যাস দ্বারা। যোগ-ক্রিয়াতে মানুষ ইচ্ছানুরূপ দেহ পরিগ্রহ ক'রতে পারে। সে সব স্থানে যেতে হ'লে কোথাও জল-প্রবেশোপযোগী দেহ, কোথাও বায়বীয় দেহ, কোথাও তৈজস্ দেহ আবশ্যক হয়।"

প্রশ্ন । সে সব দেহে কি রক্ত, মাংস, হাড়, মজ্জা থাকে না?

ব্রহ্মচারী । তা থাক্‌বে না কেন? সেই দেহের প্রধানভূতানুরূপ সমস্তই থাকে ।

প্রশ্ন। আমরা তো এই পৃথিবীতে সর্ব্বস্থানে যেতে পারি না।

ব্রহ্মচারী। পৃথিবীর তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের সবস্থানে যেতে পারিস্ না। পাশ্চাত্য

ভূগোল প'ড়ে, সেই সংস্কারমত পৃথিবীকে যে তোরা বড়ই ছোট ক'রে ফেলেছিস! সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। তার এক দ্বীপের খবরও তো কেহ জানে না। এক একটা দ্বীপে সাতটা করে বর্ষ, তারও বিন্দু-বিসর্গ কেহ এখনও বিশ্বাস করে না। জম্বু দ্বীপের যে সাতটা বর্ষ, তার এক এই ভারতবর্ষকে তোরা পৃথিবী ব'লে জানিস্। লোহিতসাগর, কৃষ্ণসাগর, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, চীন, পারস্য, আরবাদি সমস্তইতো প্রাচীন ভূগোলমতে এক ভারতবর্ষের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের পর কিংপুরুষ বর্ষেরই তো আজ পর্য্যন্ত কারও কোনও খোঁজ নাই। সে দেশের লোকের মুখ ঘোড়ার মত। সেখানকার বিবরণ কয়জন এসে বল্‌তে পেরেছে?

আমি। গোল পৃথিবীকে তো শত শতবার মানুষ জাহাজে চ'ড়ে পরিক্রমা ক'রে এসেছে। তাদের চোখে তো এসব পড়ে নাই?

ব্রহ্মচারী। ওঃ! ওরে, পৃথিবী গোল কে বললে? সে সব স্থানে জাহাজ নিয়ে যাবে কি ক'রে? পূর্ব্ব-পশ্চিমেই গোল, তাই ঘুরে আসে। আর উত্তর-দক্ষিণের পার কি কেহ পেয়েছে? ঐ দু'দিকের খবর কেহ বলতে পারে?

প্রশ্ন। তবে এ পৃথিবী কি গোল নয়?

ব্রহ্মচারী । গোল নয় কেন? পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোল; কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে শঙ্খাকৃতির মালার মত, পরে পরে সাতটি। প্রথমটি হ'তে দ্বিতীয়টি দ্বিগুণ, এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে বড়; এইরূপ সাতটিকে একসূত্রে গাঁথলে যেমনটি হয়, পৃথিবী অনেকটা সেইমত । সপ্তদ্বীপের মধ্যে লবণ বেষ্টিত যে দ্বীপ তাহাই জম্বুদ্বীপ। তার পরে প্লক্ষ-দ্বীপ। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে সাতটি পরে পরে সংলগ্ন আছে। এখন মানুষে সে সব বিশ্বাস করবে কি ক'রে? দেখে নাই তো! কিন্তু যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা দ্বীপের অন্তর্গত পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী প্রভৃতির পরিমাণ ও বিস্তৃত বিবরণ পরিষ্কার রূপেই লিখে গেছেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে দাদাকে আবার তিনি গোঁসাইয়ের কাছে দীক্ষা-গ্রহণের কথা বলিলেন। দাদাও অতঃপর দীক্ষা-প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া, অবিলম্বেই ঢাকায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমরা অগৌণে ঢাকা রওনা হইলাম। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় বুঝি না। ঢাকায় পৌঁছিয়া শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় ২/৩ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। দাদার ছুটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম। দাদার অবকাশকাল উত্তীর্ণ হইল। তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থান অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন। দীক্ষা আর হইল না

আমার দৈহিক দুরবস্থা ও মানসিক দুর্গতি।

আমি কফাশ্রিত-বায়ু ও পিত্ত-শূল বেদনার চিকিৎসায় বহুকাল বাড়ীতে কাটাইলাম। বাড়ীতে

ভাল কবিরাজ রাখিয়া সোনা, রূপা, মুক্তা ইত্যাদি যথারীতি জারিত করিয়া, প্রচুর অর্থব্যয়ে ঔষধাদি প্রস্তুত করাইলাম। 'বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্র', 'বৃহৎ বাতচিন্তামণি', 'ধাত্রীলৌহ', 'নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস', 'ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি' প্রভৃতি বটিকা এবং 'মহাচৈতসাদি ঘৃত' বহুকাল ধরিয়া সেবন ও ব্যবহার করিলাম; 'কুব্জপ্রসারিণী', 'শূলগজেন্দ্র', 'ত্রিসূতিপ্রসারিণী', 'পুষ্পরাজপ্রসারিণী'— এই সকল তৈলেরও যথেষ্ট প্রয়োগ হইল। কিন্তু রোগের বিন্দুমাত্রও উপশম হইল না; বরং ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোগের সেই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রফুল্লতাও ক্রমে হ্রাস পাইল এবং তেজস্কর ঔষধ সেবনে ও নিয়মিত তৈলাদি মর্দ্দনে বোধ হয়, এ সময়ে আমার শারীরিক নিস্তেজ রিপুসমূহেরও পুনরাবির্ভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু, সাধন-ভজনে কখন কখনও বিশেষত্ব উপলব্ধি হওয়ায়, ঐ সকল দুরবস্থাকে আমি গণনার ভিতরেই আনিলাম না। ভাবিলাম—রিপু-দমন, ইহা তো যে কোন অবস্থায় আমারই ইচ্ছাধীন! নিজের উপরে এইরূপ অতিরিক্ত বিশ্বাস হওয়ায়, সাধারণ বিধিনিষেধেও আমার শৈথিল্য আসিয়া পড়িল। পরে দুইটি ঘটনাতে ক্রমে আমাকে একেবারেই রসাতলে ডুবাইবার উপক্রম করিল। ঘটনা দুইটি এই—

বাড়ীর অনতিদূরে ভিক্ষোপজীবিনী হীনজাতীয়া একটি বৈষ্ণবী অর্থলাভমানসে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীকে জুটাইয়া আনিয়াছে। কোনও অবস্থাপন্ন যুবক তাহাকে 'রক্ষিতা' রূপে রাখিয়াছে। পাড়ার মধ্যেই এরূপ বেশ্যার বাস জানিয়া, আমার ভিতর জ্বলিয়া উঠিল; অবিলম্বে একজন বলিষ্ঠ 'সর্দ্দার'কে (লাঠিয়ালকে) লইয়া উহাদিগকে যথোচিত শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ইঙ্গিতমাত্র সর্দ্দার লাঠি মারিয়া উহাদের উভয়ের পা ভাঙ্গিয়া খোঁড়া করিয়া ফেলিবে এই হুকুম দিয়া, সন্ধ্যার পরে আমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সর্দ্দার একটু অন্তরালে রহিল, আমার প্রবেশমাত্র সেই বৈষ্ণবী মেয়েটিকে কি যেন ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়িল। আমি বাবুটির অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া রহিলাম। তখন ধীরে ধীরে মেয়েটি আসিয়া আমার সঙ্গে রসিকতা আরম্ভ করিল। কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্য আমি উহার কথায় 'হুঁ হুঁ' দিয়া যাইতে লাগিলাম; মনে মনে স্থির করিলাম, কোনরূপ কুভাব ব্যক্ত করিলেই 'সর্দ্দার' ডাকিয়া উহাকে 'বেদম' প্রহার লাগাইব। মেয়েটি নানাপ্রকার হাবভাবে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখাইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে দু'এক পা অগ্রসর হইয়া, আমাকে একেবারে ধরিয়া ফেলিল এবং অনায়াসে টানিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিল। তাহার স্পর্শমাত্র আমার সমস্ত তেজস্বিতা, এমন কি—বিচার-বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল; মন সহসা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; আমি যেন 'ভেড়া' হইয়া গেলাম। পরে উহার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া ''ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, কাল আসিব' বলিয়া কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করাতে সে আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি অমনই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া, মাঠের মধ্যে কিছুদুর গিয়াই 'আছাড়' খাইয়া পড়িলাম; পায়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সর্দ্দার

আমাকে কান্ধে তুলিয়া লইয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। পরদিন প্রাতে গ্রামের সব সমবয়স্কদের লইয়া যুক্তি করিলাম, রাত্রেই উহার ঘরে আগুন ধরাইব। বৈষ্ণবী, লোকপরম্পরায় আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, ঐদিনই আসিয়া, আমার পায়ে পড়িয়া, কান্দিয়া বলিল, "আর তিনটি দিন শুধু আমাকে সময় দিন; আমি এগ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।" কার্য্যেও সে তাহাই করিল।

এই ঘটনাটিতে আমার মানসিক অবস্থা আর একপ্রকার হইয়া পড়িল। যদিও ইহাদিগকে কর্কশভাষা প্রয়োগপূর্ব্বক গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিলাম; তবু সেই কুলটার স্পর্শজনিত সুখের স্মৃতি একদিনের জন্যও মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। ঐভাবে যুবতীর অঙ্গস্পর্শ এ জীবনে আমার আর কখনও ঘটে নাই। এখন এই স্পর্শসুখ আমার সাধন-ভজন অপেক্ষাও মধুর বোধ হইতে লাগিল। সর্ব্বদাই উহার বাহুবেষ্টিত আলিঙ্গন অন্তরে উদিত হইয়া বর্ত্তমানের ন্যায় আমাকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। আমি সাধন-ভজনে অন্যমনস্ক হইয়া নিয়ত উহাই কল্পনা করিতে লাগিলাম। ইহার উপরে আবার আর একটি বিষম প্রলোভন উপস্থিত হইল।

বাড়ীতে একটি পিতৃমাতৃহীনা, বয়স্থা কুলীন-কুমারী আমাদের সংসারে রহিয়াছেন; ভবিষ্যতে তাঁহাকে সুপাত্রে অর্পণ করিবার মানসে, বর্ত্তমান রুচি অনুসারে তাঁহার অভিভাবকেরা লেখা-পড়া শিখাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং আমার বাড়ীতে থাকার সময় হইতেই তাঁহারা ঐ ভার আমার উপরে ন্যস্ত করিলেন। মেয়েটি খুব নিপুণতার সহিত সারাদিন গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিশেষ শ্রদ্ধা-যত্নসহকারে আমার রোগের সেবা করিতে লাগিল; সমস্ত দিন অনবকাশবশতঃ রাত্রি ন'টা দশটার সময়ে আমার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর সকলে নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রিত থাকিলেও মেয়েটি আমার নির্জ্জন ঘরে বিছানার এক পার্শ্বে বসিয়া রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিত। উহার সেবাতে শ্রদ্ধা, গৃহকার্য্যে দক্ষতা, লেখা-পড়ায় উৎসাহ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া, দিন দিন আমি উহাকে অধিকতর ভালবাসিতে লাগিলাম। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে শিকার-হারা কুকুরের মত আমার অবস্থা দাঁড়াইল। আমি অদম্য উত্তেজনায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে ঐ কুমারীর সৌন্দর্য্যে আমার শিথিল চিত্ত দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আমি ভীষণ দুরবস্থার আশঙ্কা করিতে লাগিলাম; কিন্তু, মোহবশতঃ, উহাকে পড়াশুনা করাইতে ক্ষান্ত হইলাম না। অনুকূল অবস্থা আমার অধীর চিত্তকে ধীরে ধীরে আরও প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, এদিকে মেয়েটি, আমার মর্য্যাদারক্ষাপূর্ব্বক, আমার ভাবে অনাদর দেখাইয়া, আমাকে সর্তক করিতে লাগিল। অবশেষে আমাকে 'নাছোড়বান্দা' বুঝিয়া একদিন আমার পায়ে পড়িয়া কান্দিয়া বলিল—"আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন কেন? আমি এতে বড় ভয় পাই। আপনি যোগসাধন করেন, আপনার মন কখনই খারাপ হইতে পারে না; শুধু আমাকে পরীক্ষা করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনি আমায় রক্ষা না করলে এ অবস্থায় আমার আর উপায় কি বলুন?" উহার পরিষ্কার কথা শুনিয়া আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। এক দিকে

ভিতরে আমার অদম্য উত্তেজনা, সম্মুখে আমার আয়ত্তাধীনে সুন্দরী যুবতী; অপর দিকে বাহিরে আমার ধার্ম্মিকতার ভাণ, 'সকলে আমাকে যোগসাধক বলিয়া মানুক' এই বাসনা, বিশেষতঃ যে আমাকে চরিত্রবান মহাসাধু বলিয়া শ্রদ্ধা করে তাহারই নিকটে কি প্রকারে আমি মর্য্যাদাশূন্য হই এই চিন্তা। এই অবস্থায় পড়িয়া আমি সঙ্কল্পিত অধ্যাবসায় হইতে বিরত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অহরহঃ সজনে নির্জ্জনে উহার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে, আমার বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে যখন বুঝিলাম, আমার ভিতরের অগ্নি ধীরে ধীরে উহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, মানের দায়ে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ঢাকা পলাইলাম, সকলে মনে করিল রোগ কতকটা উপশম হইয়াছে। আমি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।

ভিতরের দুরবস্থা গোপন করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ করিতে লাগিলাম। একদিন তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় বলিলেন—"**এবার যোগাবলম্বীদের ভিতরে যার যে ছিদ্র আছে প্রকাশ হ'য়ে পড়বে, সময় অতি ভয়ানক।**" এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম, খুব সাবধানতার সহিত চলিতে লাগিলাম।

গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা চলিলেন। এই সময়ে ঢাকাতে গোঁসাইশিষ্যদের নানাপ্রকার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। পরস্পরে ঝগড়া-ঝাঁটি, শত্রুতা, হাতাহাতি এমন কি চরিত্রহীনতা এবং গুরুদ্রোহিতা পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। আমি এসব দেখিয়া শুনিয়া খুব সতর্কতার সহিত নূতন উদ্যমে প্রাণপণে সাধন আরম্ভ করিলাম।

স্থিরোজ্জ্বলজ্যোতির্ম্মণ্ডল দর্শন।

কিছুকাল যাবৎ সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে সাধন-ভজন করিয়া আসিতেছি। শেষ রাত্রিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাদের উপরে গিয়া পূর্ব্বমুখে আসন করিয়া বসি। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম ও একান্ত মনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রটি সহস্রবার জপ করি; তৎপরে প্রাণায়াম ও ইষ্টনাম যথামত ঘণ্টাধিককাল করিয়া থাকি। ৮/১০ দিন হইল একদিন ধীরে ধীরে আমার ললাটদেশ কম্পিত করিয়া একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব জ্যোতির মনোহর সৌন্দর্য্যের এক কণাও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! ইহাকে চন্দ্র কি সূর্য্য বলে, তাহা জানি না। ললাটের ভিতরে বা বাহিরে—নীল আকাশে, বহুদূরে, চন্দ্র-সূর্য্যাকৃতি স্নিগ্ধ, অত্যুজ্জ্বল, শ্বেতজ্যোতি দর্শন করিতেছি। স্থির জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যস্থলে, ক্ষীণ তরঙ্গাকার উজ্জ্বল ঝিকিমিকির ছটায় এক এক সময়ে আমি দিশাহারা হইয়া পড়িতেছি। অবিরাম অষ্টপ্রহরই এই জ্যোতি আমার চক্ষে যেন লাগিয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য্য দেখিতেছি! যেখানে সেখানে যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই জ্যোতি একই প্রকারে প্রকাশমান! চক্ষু

বুজিয়া বা মেলিয়া এই জ্যোতি একই রকম দেখিতেছি। চন্দ্রকিরণের ন্যায় জ্যোতির রশ্মি শীতল, শুভ্র, বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় উজ্জ্বল এবং তদপেক্ষা অতীব মনোহর ও নির্ম্মল।

ইহার প্রথম দর্শনের সময়ে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন নিয়ত দেখাতে তাহা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই জ্যোতি একটু তরঙ্গায়িত ছিল; এখন চন্দ্রমার ন্যায় স্থির দেখিতেছি। এই জ্যোতি কোথায় যে দর্শন করিতেছি তাহা বহু অনুসন্ধানেও ঠিক করিতে পারিতেছি না। যখন চক্ষু মেলিয়া থাকি তখন দেখি বাহিরের আকাশে, ললাটের উপরে উর্দ্ধদিকে; যখন চক্ষু মুদিয়া রাখি, মনে হয়, কপালেরই মধ্যে নীলবর্ণ বিস্তৃত আকাশের মধ্যভাগে। এই জ্যোতি একই প্রকারে প্রকাশিত থাকায়. ইহার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তবে, বাহিরের কার্য্য ছাড়িয়া নামে ও গুরুতে চিত্ত নিবিষ্ট করিলে, ইহার মাধুর্য্যে আরও অভিভূত হইয়া পড়ি। গুরুর স্মৃতিতে জ্যোতির অপূর্ব্ব ছটা স্তরে স্তরে বিকীর্ণ হইয়া সময়ে সময়ে আমাকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিতেছে। গোঁসাইয়ের রূপ-ধ্যানে, এই জ্যোতির সৌন্দর্য্য এবং মনোহারিত্ব কেন যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহা বুঝিতেছি না। এখন এ অবস্থাটি আমার আয়ত্তাধীন ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে।

জ্যোতিহারা।

২৯শে শ্রাবণ, ১২৯৫; রবিবার।

'হায়! হায়!! আজ দু'দিন হয় আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। দুরদৃষ্টবশতঃ অকস্মাৎ অজ্ঞাত একটি অপরাধে পড়িয়া আমার অতুল আনন্দের অবস্থা হারাইয়াছি! এখন আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। শুষ্ক মরুভূমি-তুল্য উত্তপ্ত অন্তরে থাকিয়া থাকিয়া, সেই জ্যোতির স্মৃতি প্রত্যক্ষ অগ্নির ন্যায় আমার প্রাণটিকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। যে অপরাধে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল তাহা পরিষ্কার রূপে লিখিয়া রাখিতেছি।

শূদ্রবংশোদ্ভবা একটি বিধবা, আপদে বিপদে সর্ব্বদা সাহায্যকারিণী থাকিয়া, আমাদের বিশেষ আত্মীয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি সে রক্ষকাভাবে নিতান্ত অসহায়া এবং জীবিকানির্ব্বাহের ভবিষ্যচ্চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া সে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার বড় দয়া হইল। অবিলম্বে আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা বলিয়া দিলাম। সন্ধ্যার সময়ে নির্জ্জন গৃহে সে আমাকে একাকী পাইয়া হাতে ধরিয়া তাহার শয্যায় বসাইল। একটু পরে আমার বামপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক অস্বাভাবিকরূপে আমাকে আদর করিতে লাগিল। উহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, দৃষ্টি লোলুপ ও অস্থির—সর্ব্বাঙ্গ দক্ষিণে বামে ঘন ঘন হেলাইয়া পড়িতেছে; ইহা দেখিয়াই আমার উত্তেজনা আসিয়া পড়িল। আমি ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইয়া

পড়িলাম। এই সময়ে, অবিরাম যে জ্যোতি আমার নিকটে সমভাবে স্থিররূপে প্রকাশমান ছিল, অকস্মাৎ দেখি সেই জ্যোতি থর্ থর্ কাঁপিতেছে। আমি অমনি উহার শয্যা ত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। তখন বস্ত্রে উহার 'অশুচির' লক্ষণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম—'এ কি?' যুবতী পরিচয় দিল; আমি আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিলাম আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল; নামমাত্র বিন্দুপাতে পূর্ণ ইন্দু অস্তমিত হইল! দু'তিন মিনিটের মধ্যেই তরঙ্গায়িত জলাশয়ে চন্দ্র-প্রতিবিম্বের ন্যায় চঞ্চল হইয়া, আমার স্থির উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডল ধীরে ধীরে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল! হায়, হায়, এখন আমি কি করিব?

পতিত জনে অযাচিত দয়া।

গোস্বামী মহাশয় অদ্য ঢাকায় পঁহুছিবেন, সংবাদ পাইলাম। তাঁহাকে আনিবার জন্য কতিপয় গুরুভ্রাতাকে লইয়া 'দোলাইগঞ্জ' ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়া সকলের পশ্চাতে সঙ্কুচিত মনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। না জানি, গোস্বামী মহাশয় আমাকে কি বলিবেন, প্রতিক্ষণে ইহাই মনে হইতে লাগিল। এ দিকে আর একটি গুরুভ্রাতাও কোন একটি স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে গুরুভ্রাতাদের নিকট বিশেষরূপে অপদস্থ হইয়াছেন। সকলে তাঁহার নিন্দা কুৎসা রটনা করিয়া একরূপ তাঁহাকে একঘরেই করিয়া রাখিয়াছেন। লজ্জায় ও অনুতাপে ম্রিয়মান হইয়া, তিনি সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপন গৃহেই অতি গোপনে একাকী দিন রাত কাটাইতেছেন। গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইবেন না এই ক্লেশে তিনি আজ ঘরে বসিয়া কান্দিতেছেন।

৪ঠা ভাদ্র, ১২৯৫।

সন্ধ্যার সময়ে গোস্বামী মহাশয়, দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। গাড়ীর ভিতর হইতেই গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি আমাকেও দেখিতে পাইলেন। সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতারা গোস্বামী মহাশয়ের গাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বাগ্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন— **"কি কুলদা এসেছ? বেশ, বেশ! তোমরা সকলে বাসায় যাও—আমি ফুলবেড়ে স্টেশনে নেমে যাচ্ছি।"** এই বলিয়া তিনি এমনি সস্নেহ-দৃষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসিয়া আমার দিকে তাকাইলেন যে, আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিতে বলিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গোঁসাই ফুলবেড়ে (ঢাকা) ষ্টেশনে গিয়া নামিলেন। দোলাইগঞ্জে না নামিয়া প্রায় এক ঘণ্টার পথ তফাতে ঢাকা ষ্টেশনে গোস্বামী মহাশয় কেন গেলেন, কেহই কিছু বুঝিলাম না।

গোঁসাই ঢাকা ষ্টেশনে নামিয়া, গুরুভ্রাতৃগণের নিকটে নিন্দিত, অনুতপ্ত, সেই গুরুভ্রাতাটির বাসায় পৌঁছিলেন। বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ ছিল; পুনঃ পুনঃ ঘা দেওয়ায় সেই ভদ্রলোকটি আসিয়া

যেমনই দরজা খুলিলেন, গোস্বামী মহাশয় অমনই তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—**তুমি আমার নিকটে যাবে না, তাই আমি স্টেশনে নেমেই তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি।** গুরুভ্রাতাটি কান্দিতে কান্দিতে পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া, গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে যাঁহাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া দূরে রাখিয়াছিল, গোঁসাই ঢাকায় পৌঁছিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই আলিঙ্গন দিয়া অসিলেন! এই ব্যাপারে আমি বড়ই ভরসা পাইলাম ও ঠাণ্ডা হইলাম।

বিচিত্র স্বপ্ন—পথ-প্রদর্শন।

আজ মধ্যাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। দেখিলাম আমতলায় তিনি ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। দূব হইতে নমস্কার করা মাত্রই, তিনি চোখ্ মেলিয়া চাহিলেন এবং আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি 'ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়াছিলাম' ধীরে ধীরে জানাইয়া বলিলাম—ব্রহ্মচারী মহাশযের উপদেশমত দাদা আপনাকে দেখিতে ঢাকায় আসিযাছিলেন, আপনি তখন এখানে ছিলেন না। দাদা যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন—যদি আপনি পশ্চিমে যান, দয়া করিয়া একবার দাদার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার অনেক বলিবার আছে।

গোঁসাই। **শরীর সম্প্রতি বড় কাতর। সুস্থ হ'লে একবার যাবার ইচ্ছা আছে। তখন তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করব্।**

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময়ে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, গোস্বামী মহাশয় বিস্তারিতরূপে জানিতে চাহিলেন। দাদা ও মেজদাদার সব কথা বলিয়া, পরে আমার কথা সমস্তই আদ্যোপান্ত পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম। গোঁসাই শুনিয়া বলিলেন—**"বিদ্যা হবে না" ইত্যাদি যে সব কথা তিনি লিখে রাখ্‌তে ব'লেছেন, তা লিখে রেখো। ওঁদের কথা বুঝা বড় কঠিন। যা তোমাকে ব'লেছি তাই ক'রে যাও। আমি তো আছি; পরে যা কর্‌তে হবে আমিই ব'লে দিব। ব্যস্ত হইও না। স্বপ্নটি বল ত?**

আমি আমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলাম—"দেখিলাম, বেলা অবসন্ন-প্রায়, আপনি অকস্মাৎ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, **'আর সময় নাই, এখন চল।'** বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও আপনার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ও (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচারী মহাশয়, তৎপরে আপনি, তারপর তারাকান্ত দাদা এবং সকলের পশ্চাতে আমি চলিলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় আগে আগে যাইতেছেন অনুভব হইতে লাগিল ; কিন্তু দেখিলাম না। অন্ধকারে কাহারও সঙ্গে চলিলে তাহার একটা সত্তা যেমন অনুভবে আসে, ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেও আমার সেইরূপ জ্ঞান হইতেছিল। পথে চলিতে চলিতে কিছুদূরে গিয়া, বহুদূরে একটা ভয়ঙ্কর অরণ্য দেখিতে পাইলাম। উহা দেখিয়াই ভয় হইতে

লাগিল। কিন্তু যতই উহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, সবুজবর্ণ, নীলবর্ণ, ঘন ঘন বৃক্ষের শোভায় ততই আনন্দ হইতে লাগিল। বনের খুব সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখি, ওটি শুধু বন নহে—প্রকাণ্ড একটি পাহাড়। আমরা উহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ব্রহ্মচারী পথ ধরিয়া নিজের মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন; আপনি দণ্ডদ্বারা কাঁটা সরাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে করিতে চলিলেন। তারাকান্ত দাদা সশঙ্কিত মনে এপাশ-ওপাশ দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। আমি আপনার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা বহু উঁচু নীচু স্থানে ওঠানামা করিয়া, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটা সমতল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আপনি আমাকে একটি স্থানে লইয়া গিয়া তিনখানা আসন দেখাইলেন। আসন তিনখানার চারিদিকে বহু পুরাতন, বড় বড় ঝাপড়া গাছ। স্থানটি কতকটা অন্ধকারের মত, বৃক্ষচ্ছায়ায় আবৃত। আসন তিনটিই গৈরিক রং-এর লাল প্রস্তরে প্রস্তুত ও চতুষ্কোণ—পূর্ব্বমুখে পাতা রহিয়াছে, দেখিলাম। আসন তিনখানি ১, ২, ৩ অঙ্কদ্বারা চিহ্নিত। '৩' চিহ্নিত আসনটি দেখাইয়া আপনি আমাকে বলিলেন—**এই তোমার আসন। এখানে বসে কিছু কাল সাধন কর্‌তে হবে। আসনে ব'সো।** '২' চিহ্নিত আসনটিতে আপনি বসিয়া পড়িলেন। '১' চিহ্নিত আসনটি 'খালি' রহিল। কিছুকাল ওখানে বসিয়া আমি সাধন করিলাম। পরে আপনি উঠিয়া বলিলেন—**আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল।** তখন আমরা চারিজনেই আবার পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে চলিতে লাগিলাম। উঁচুনীচু স্থানগুলি জঙ্গলময় ও কণ্টকাবৃত থাকায়, পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল; স্থানে স্থানে হোঁচট লাগায়, দুই তিনবার আছাড়ও খাইলাম। আপনি তখন দুর্গম সঙ্কীর্ণ রাস্তার সঙ্কট আমাকে সঙ্কেতে জানাইয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; পুনঃপুনঃ আমাকে বলিতে লাগিলেন, **'খুব সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে পা ফেলে আমার পেছনে পেছনে এস।'** বহুক্লেশে অনেকদূর চলিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। ঘন ঘন সবুজ বৃক্ষ সকলের পাতার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সেই জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যের তেজ আসিয়া পড়িতেছে দেখিলাম। আমরা সেই রশ্মি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আপনি এক একবার মুখ ফিরাইয়া আমার পানে পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া খুব ভরসা দিতে লাগিলেন। তাহাতে আমার মনে হইতে লাগিল, সাম্‌নে উৎপাত আছে। আমরা যে অরণ্যে ছিলাম তাহা হইতে ঐ জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র দ্বার; অতিশয় অপ্রশস্ত। সমস্তটি রাজ্য ঘন কণ্টক-বেড়াদ্বারা বেষ্টিত। আমরা খুব উৎসাহের সহিত ঐ দ্বারের দিকে চলিলাম; দ্বারের নিকটে পৌঁছিয়া দেখি, একটা ভয়ঙ্কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, লম্বা সর্প ফোঁস, ফোঁস করিতেছে। সে আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত তেজের সহিত ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে আসিল। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া সর্পটি ফণা ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; অমনি আবার ফণা নামাইয়া সোঁ সোঁ শব্দে আপনার দিকে ছুটিল। আপনি কিন্তু উহাকে একেবারেই গ্রাহ্য করিলেন না। পশ্চাৎ দিকে আমার পানে চাহিয়া **"ভয় নাই, ভয় নাই"** বলিয়া পুনঃপুনঃ আমাকে আশ্বাস

দিতে লাগিলেন। সর্পটিও আপনার নিকট ফণা সঙ্কোচ করিয়া তারাকান্ত দাদাকে লক্ষ্য করিয়া চলিল। তাঁর হাতে মোটা লাঠি ছিল। তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া সর্পটিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্পটিও তাঁহার পা দু'টি জড়াইয়া ধরিল। উনি যতই আঘাত করিতে লাগিলেন, সর্পটি উঁহাকে ততই বেষ্টন করিতে লাগিল। আপনি তখন চীৎকার করিতে লাগিলেন—"**মেরো না, মেরো না, থাম, থাম। মেরে ওকে ছাড়াতে পারবে না। ওকে না মার্‌লে ও কখনও কামড়াবে না।**" আপনার কথায় তারাকান্ত দাদা স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভয়ে ও ব্যস্ততায় তিনি পুনঃ পুনঃ সর্পের উপরে লাঠি মারিতে লাগিলেন। সর্পও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইতে লাগিল। এই সময়ে চাহিয়া দেখিলাম—উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, একজটী ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া শ্বেতোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ; আপনি ঐ দ্বারের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার অর্দ্ধাঙ্গ, বেড়ার অপর দিকে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে, অপরার্দ্ধ এদিকে । আমাকে হাত নাড়িয়া অঙ্গুলি-সংকেত করিয়া কহিলেন, "**পাশ কেটে আমার দিকে লাফ দাও, সর্প কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।**' আমি ইঙ্গিতমাত্র লাফ দিয়া সর্পকে অতিক্রমপূর্ব্বক যেমনই আপনার নিকটে গিয়া পড়িলাম, অমনই সেই ধাক্কায় নিদ্রাভঙ্গ হইল।" ভোর রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিয়া আর ঘুম হইল না। স্বপ্নের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে কখনও আমি দেখি নাই। স্বপ্নে যেমনটি দেখিলাম, বারদীতে গিয়া দেখি, ব্রহ্মচারীর আকৃতি ও রূপ অবিকল সেই প্রকার।

স্বপ্নটি শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, '**এই স্বপ্নটি লিখে রেখো। অনেক সময়ে স্বপ্ন কাজে আসে। এখন গিয়ে লেখা-পড়া কর ; পরে আমি তো আছি, যা করতে হবে ব'লে দিব**'।

আমার কয়েকটি দর্শন বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'এ'সব বিষয় বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ কর্‌তে নাই; শ্রদ্ধাবান্ দেখে শুধু সাধনের লোকের নিকটে বল্‌তে পার।'

মহাপুরুষ চিনিবার উপায়।

৭ই ভাদ্র, ১২৯৫;
২২শে আগষ্ট,
বুধবার

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়া দেখিলাম, ঘর-ভরা লোক । নানা বিষয়ের ধর্ম্মালোচনা হইতেছে। অকস্মাৎ একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকায় মুসলমান ফকির গোস্বামী মহাশয়ের সেই আসন ঘরে প্রবেশ করিয়া নিঃসঙ্কোচে, প্রফুল্ল-মনে গোঁসাইয়ের সম্মুখে গিয়া বসিলেন; নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক ফকিরী ভাষায় গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কয়েকটি গান করিয়া গুরুর মাহাত্ম্য কিছুক্ষণ ধরিয়া বলিলেন; পরে গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

ফকির সাহেব ঘর হইতে বাহির হওয়ামাত্রই গোঁসাই আমাদিগকে বলিলেন, **"দেখ তো ফকির সাহেব কোন্ দিকে যান্।"** আমরা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া রাস্তার দুই দিকেই অনুসন্ধান করিলাম, ফকির সাহেবকে দেখিতে পাইলাম না।

গোঁসাই বলিলেন, **"তোমরা মানুষের দিকে লক্ষ্য কর না, মানুষ চেন না। ইনি একজন মহাপুরুষ এসেছিলেন। কত মুসলমান তো রাস্তা দিয়ে চলে যান, এস্থানে এভাবে কে আর আসেন? রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, দেব-দেবী বিষয়ে মুসলমানদের বল্‌লে তারা কানে আঙ্গুল দিবে। আর ইনি কেমন অসাম্প্রদায়িকভাবে সকলের উপাস্য দেবতাকেই ভক্তি করলেন! গুরুর প্রতি নিষ্ঠা জন্মাবার জন্য 'গুরুই সত্য' এই ভাবের উপদেশ কে আর দেয়? কত মহাত্মা এরূপ ছদ্মবেশে এসব স্থানে আসেন বলা যায় না। সময়, বুঝে, মানুষ দেখে এঁরা উপদেশ দিয়ে অদৃশ্য হন। মানুষ চিন্‌তে হয়। মানুষ চিন্‌তে হ'লে সকলকেই আপ্‌না অপেক্ষা বড় ব'লে মনে কর্‌তে হয়, নিজেকে অধম, আর সকলকে অধমতারণ ভাব্‌তে হয়। রাস্তার মুটে-মজুরকেও মহাত্মা ভেবে নমস্কার কর্‌তে হয়। এরূপ ক'রে তবে যথার্থ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ-লাভ হয়। ইহা অনুমানের কথা নয়, কল্পনা নয়, যথার্থ ঘটনা। কল্পনা কর্‌লে হবে না, বাস্তবিকই এইরূপ নিজেকে ভাব্‌তে হবে। তাহা হ'লেই মহাপুরুষদের কৃপা হয়, জন্ম সার্থক হয়।"**

ধর্ম্মের মহাস্রোত—আবার সেই সত্যযুগ।

১১ই ভাদ্র, ১২৯৫;
রবিবাব,
২৬শে আগষ্ট, ১৮৮৮।

অপরাহ্নে একরামপুরের কদমতলায় গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় গেলাম। রাত্রিতে বৈঠক করিব মনে করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যথাসময়ে সকলে আসিয়া একত্র হইলে সাধন আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয় কত দেব দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। **'বম্ মহাদেব! বম্ বম্ ভোলা!'** বলিতে বলিতে তিনি রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ একইভাবে রহিলেন। পরে আপাদমস্তক সমস্ত শরীরটি থর্-থর্ কম্পিত হইতে লাগিল, শ্বাস প্রশ্বাস কিছুক্ষণ অতি দ্রুত চলিয়া অবশেষে একেবারে স্থিরভাবে ধারণ করিল। গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—

এক মহালীলা হইবে, এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে। বেশী দিন বাকি নাই। মহাত্মারা সব বের হ'য়েছেন। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি স্থানে এক মহাকাণ্ড হইবে। আবার সেই সত্যকাল, প্রায় সত্যকালই হইবে। প্রত্যেক স্থানেই এক একটি মহাত্মা! সকলেরই হাতে পাখা আছে। এখন হইতেই তাঁহারা বাতাস কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ছেন, ক্রমেই জোরে বাতাস কর্‌বেন। কাশীর বাতাস অযোধ্যায়, ঢাকার বাতাস কলিকাতায়, এরূপ একস্থানের বাতাস অন্য

স্থানের বাতাসে গিয়ে মিল্‌বে। বাতাসে বাতাস মিশে বাতাসের বেগ আরও বৃদ্ধি হবে। ক্রমে ঝড় হবে, মহাঝড় হবে। মহাঝড় গিয়ে সাগরে পড়্‌বে। সাগরের জল বাতাসে আলোড়িত হ'য়ে গঙ্গা-যমুনা সহিত সমস্ত দেশটিকে ভাসাবে, প্রায় সকল ভারতবাসীকেই ভাসাবে। শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক ইংরেজও ভেসে যাবে। এ স্রোত, মহাস্রোত সকলকেই ভাসাবে। কলিকাতা, ঢাকা আরও দু' তিনটি স্থানে এখনই ধীরে ধীরে বাতাস উঠেছে। মহাস্রোত! কার সাধ্য এ স্রোতে বাধা দেয়? দেশের লোকের অবিশ্বাস সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাবে। তাতে কোন ক্ষতিই হবে না, উপকারই হবে। যাঁরা এই সাধনে আছেন, সম্পূর্ণ নিরাপদ হ'য়েছেন। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, কল্পনা নয়, নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ কর্‌বেন। ইহলোকেই থাকুন, আর পরলোকেই থাকুন, কেহই বঞ্চিত হবেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস, আরও কোনও কোনও মহাত্মা পরলোকে থেকেই সাহায্য কর্‌বেন। কিছু ভয় নাই, সম্পূর্ণ নির্ভয়, সত্য সত্যই নির্ভয়। এই সাধনে যাঁরা আছেন, ধন্য হ'য়ে যাবেন। নামে রুচি, গুরুতে ভক্তি হ'লেই হ'ল। এ সাধন যাঁরা লাভ ক'রেছেন, নামে রুচি, গুরুতে ভক্তি তাঁদের হবেই। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, হবে-ই। ব্রহ্মচারী মহাশয় এদিকে লীলা ক'র্‌ছেন। সেই মহাপ্রলয়ের দিন এল। ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই।

রাত্রে শুইবার সময়ে গোঁসাইয়ের নিকটে প্রার্থনা করিয়া শুইলাম যেন শেষরাত্রিতে ৩টার সময়ে সাধন করিবার জন্য তিনি আমাকে জাগাইয়া দেন। ঠিক সময়ে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটি এই—''ভয়ঙ্কর একটা দস্যু 'রুল' হাতে লইয়া আমাকে প্রহার করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি নিরুপায় দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সেই সময়ে হঠাৎ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত হইয়া দস্যুকে তাড়াইয়া দিলেন।'' ভয়ে ও ত্রাসে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেও গোঁসাইয়ের উপরে আমার একটা বিশ্বাস জন্মিল।

গেণ্ডারিয়ার আশ্রমে প্রবেশ। গোঁসাইয়ের হাতে প্রথম হরির লুট —।

১৩ই ভাদ্র, ১২৯৫;
মঙ্গলবার,
২৮ শে আগষ্ট, ১৮৮৮

আজ গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়ার নূতন বাড়ীতে আসিলেন। আশ্রমে যাইয়া দেখি মহা উৎসব চলিয়াছে। খোল করতাল ও সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে স্থানটি মহা আনন্দের ধাম হইয়াছে। বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত হরিসঙ্কীর্ত্তন গৌরকীর্ত্তন ও নামগান হইল। ব্রাহ্মদের অনেকে আসিয়াছিলেন। গৌরকীর্ত্তন শুনিতে কাহারও কাহারও অসহ্য বোধ হওয়ায় চলিয়া গেলেন ; কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম শেষ পর্য্যন্তই উৎসবে রহিলেন। একটা ধামাতে করিয়া কতকগুলি বাতাসা লইয়া গোস্বামী মহাশয় নিজ মস্তকোপরি ধরিয়া রহিলেন, পরে তাহা চারিদিকে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া ছড়াইয়া দিলেন। প্রকাশ্যভাবে 'হরির লুট' দিতে গোস্বামী মহাশয়কে আজই প্রথম দেখিলাম।

পরে গোস্বামী মহাশয় পূবের ঘরে দক্ষিণমুখো হইয়া আসন করিলেন। বহুক্ষণ এঘরেও কীর্ত্তনাদি হইল। শুনিলাম, আগামী কল্য গৃহসঞ্চার হইবে, মহা উৎসব হইবে। সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিলাম।

গেণ্ডারিয়া আশ্রম-সঞ্চার, উৎসব।

১৪ই ভাদ্র, ১২৯৫; জন্মাষ্টমী, বুধবার

প্রত্যুষে স্নানান্তে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণবাদি নানা সম্প্রদায়ের বহুলোক একত্র হইয়া আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে দেখিলাম। সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে আজ বহুলোক মাতিলেন। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া উৎসব হইল। ভিতরে বাহিরে ৩/৪ দলে কীর্ত্তন করিল। মুসলমান ফকির ও ভাবুক বৈষ্ণববৃন্দের যোগদানে উৎসবের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইল। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খুব ভাবোচ্ছ্বাস চলিল। পরে গোস্বামী মহাশয় স্বহস্তে হরির লুট বিতরণ করিয়া পূবের ঘরে আপন আসনে গিয়া বসিলেন। এ সময়ে অনেকে নিজ নিজ আবাসে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা আহার করিলেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া রহিলাম। গোঁসাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, **"তুমি খাবে না?"** আমি বলিলাম, প্রসাদ পাইব। বেলা প্রায় ২টার সময়ে গোস্বামী মহাশয় আমাকে লইয়া ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আমরা প্রায় ১০/১২টি গুরুভ্রাতা গোঁসাইয়ের দুই পাশে বসিলাম। গোঁসাই আমাদের প্রসাদ দিলেন। আজই গোঁসাইয়ের প্রসাদ আমি প্রথম পাইলাম। একটি গুরুভ্রাতা যথাকালে আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিতে পারেন নাই; তিনি আসিয়া গোঁসাইয়ের ভোজনপাত্র হইতে নিঃসঙ্কোচে নিজেই প্রসাদ তুলিয়া নিয়া খাইতে লাগিলেন। গুরুর প্রতি এই প্রকার নিঃসঙ্কোচ ভাব কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই।

দর্শনাদি সম্বন্ধে উপদেশ। অলৌকিকরূপে চরণামৃতলাভ।

২১শে ভাদ্র, ১২৯৫

সন্ধ্যাকালে কয়েকটি গুরুভ্রাতার সহিত গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পৌঁছিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে হরিচরণবাবু, প্রসন্নবাবু, শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোঁসাই বহুক্ষণ সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় অর্দ্ধ-স্ফুট-স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন— **"সাধনের সময় আপনারা যিনি যাহা দেখেন, কল্পনা মনে কর্‌বেন না। এ সাধন এমনিই জিনিস যে এসব দেখ্‌তেই হবে। প্রথম অবস্থায় এসব দর্শন চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী হয়; চিত্তের নির্ম্মলতা ও স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে এসব ক্রমেই স্পষ্ট ও দীর্ঘকালস্থায়ী হ'তে দেখা যায়। প্রথম প্রথম একখানা ছবির মত, পটের মত, ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে থাকে; পরে ধীরে ধীরে উহা পরিষ্কার মূর্ত্তিরূপে জীবন্ত দেখা যায়; কথাবার্ত্তাও শুনা যায়; উহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে**

উত্তর পাওয়া যায়। শুধু জীবন্তই দর্শন হয় তাহা নয়, উহাদের হাত পা নাড়া, ইঙ্গিতাদিও দেখা যায়। এ সাধনে শুধু আমাদের দেশের দেবদেবীরই যে দর্শন হয় তাহা নয় ; এ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে যে কোন দেশে যে কোনরূপে লোকে পূজা ক'রেছে, আপনারা জ্ঞাত থাকুন, আর নাই থাকুন—সাধনপ্রভাবে ধীরে ধীরে সে সমস্তই জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ হবে। পূর্ব্বে গ্রীসে, রোমে ও অন্যান্য দেশে, এমন কি পাহাড়ে-পর্ব্বতে অসভ্য লোকেরাও এ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে যিনি যে রূপে পূজা করেছেন ও কর্‌ছেন, সমস্ত প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে। এসব কল্পনার কথা বল্‌ছি না, এ সমস্ত বিষয় সত্য, প্রত্যক্ষ । প্রথম হ'তেই যদি এসব কল্পনা মনে ক'রে তুচ্ছ করা যায় একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সহজের পথ হারাতে হয়। কল্পনাই ভাবুন, আর যাই ভাবুন, এ সকল প্রত্যক্ষ হবেই। ওসব সদা সর্ব্বদা দেখা যায় না। তার কারণ, আমাদের চিত্ত সব সময়ে এক অবস্থায় থাকে না ; চিত্ত স্থির হ'লেই দর্শনটি পরিষ্কার হয়। চিত্ত স্থির রাখ্‌তে হ'লে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে হয়, পবিত্র আচার নিয়ে থাক্‌তে হয়। নামে রুচি হ'লে ও চিত্ত নির্ম্মল হ'লে একটি একটি ক'রে বাসনা কামনা ত্যাগ হ'তে থাকে। যে পরিমাণে বাসনা কামনা ত্যাগ হবে সেই পরিমাণে ওসকল প্রত্যক্ষ হবে। এই সকল দর্শনের অবস্থাই যোগের আরম্ভ । যোগের একবার আরম্ভ হ'লে আর বেশীদিন লাগে না। ক্রমে ক্রমে সব আশ্চর্য্য বিষয় প্রত্যক্ষ হ'তে থাকে, যাহা কখন কল্পনাও করা যায় না, সে সব প্রত্যক্ষ ক'রে মানুষ ধন্য হয়।"

অধিক রাত্রিতে বাসায় আসিবার সময়ে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্‌সী মহাশয়ের সঙ্গে চলিলাম। তিনি রাস্তায় গোস্বামী মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ দয়ার কথা তুলিয়া, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"দেখুন, আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক । ঠাকুরের চরণামৃত নিতে সাহস পাই না। প্রত্যহ রাত্রিতে শোবার সময়ে মাথার কাছে একটি খালি বাটি রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি যেন তিনি চরণামৃত রাখিয়া যান। আশ্চর্য্য তাঁর দয়া! প্রতিদিনই শেষরাত্রে উঠিয়া ঐ বাটিতে চবণামৃত পাই। এই ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে। আমি ব্যতীত আর কেহই এ বিষয় জানে না। আপনার ইচ্ছা হ'লে শোবার সময়ে খালি বাটি রাখিয়া শোবেন, নিশ্চয়ই পাবেন।" বক্‌সী মহাশয় চিরকাল নিষ্কপট, সত্যবাদী, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, ভাবিলাম—"এ আবার কি? এঁরও এই অবস্থা! যাহা কখনও হ'তে পারে না, তার পরখ্ কর্‌ব কি? বক্‌সী মহাশয়কে বহুকাল জানি—তাঁহার উপরে আমার শ্রদ্ধা কমিল না, মনে করিলাম, 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' অথবা অন্য কোন রহস্যও ইহার ভিতরে থাকিতে পারে।"

প্রারব্ধক্ষয়ের উপায় নির্দ্দেশ।

বিকালবেলা গোস্বামী মহাশযের নিকটে গেলাম। নির্জ্জন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'একটি নাম আমাকে জপ করতে বলেছিলেন, স্বপ্নে দেখেছিলাম।

গোঁসাই—**হাঁ, হাঁ, সেই নামটিও জপ ক'রো, উপকার পাবে।**

আজ শনিবার বলিয়া অনেক লোকের সমাগম হইল। প্রারব্ধ ও পুরুষকার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। গোঁসাই বলিলেন— **সংসারে সকলেই প্রারব্ধের অধীন। যে-ই যত চেষ্টা কর না কেন, প্রারব্ধ কার্য্যের গতি কেহই রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। পুরুষকারদ্বারা প্রারব্ধের উপর আধিপত্য অসম্ভব। লোকে পুরুষকারে সাময়িক উপকার পেতে পারে বটে; কিন্তু চিরকাল পারে না। ব্রহ্মচারী মহাশয় পুরুষকারের প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম্ম অতিক্রম ক'রে, সাধনের চতুর্থ অবস্থাও পেরিয়ে গিয়েছিলেন; অবশেষে, নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থানে পৌঁছিয়ে, আবার ঠেকে ফিরে এলেন। পরে তিনি নাস্তা খেয়ে, ক্ষেত নিড়ায়ে, শূকর তাড়ায়ে কত কাল কাটালেন! অবস্থায় না পড়লে এসব কথা বুঝা যায় না। প্রারব্ধের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শাস্ত্রে দুইটি উপায় ব'লেছেন—বিচার ও অজপাসাধন। যখনই যাহা কিছু করবে, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে করবে। উঠা, বসা, স্নানাহারাদি যাবতীয় কার্য্য নিষ্কামভাবে বা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হ'লেই শীঘ্র প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়। আর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌লে আরও সহজে হয়।**

২৪শে ভাদ্র, ১২৯৫; শনিবার।

গোস্বামী মহাশয়ের কথার অর্থ আমি বুঝিলাম না। প্রয়োজনে ঠেকিয়া, বাধ্য হইয়া অহরহঃ যে সকল কার্য্য করি, তাহাতে নিষ্কাম ভাব আনিব কি প্রকারে? আর বাহ্যি, প্রস্রাব, স্নানাহার ইত্যাদি কর্ম্ম ঠিক সাধন-ভজনের মত ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করিতেছি, ইহা মনে করিবই বা কিরূপে? শ্বাস-প্রশ্বাসে দশ মিনিটও নাম করিতে পারি না, ফাঁপর হইয়া পড়ি। অবিচ্ছেদে শ্বাস-প্রশ্বাস ধরিয়া নাম করিবই বা কি প্রকারে? এখন বুঝিতেছি, এ সাধন নেওয়াই আমার ভুল হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর অসাম্প্রদায়িক উপদেশ।

সশিষ্যে গোস্বামী মহাশয় আজ ব্রাহ্মসমাজে গেলেন। গোঁসাইকে দেখিয়া ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহা-উৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভাবোচ্ছ্বাসের মহা ধূম-ধাম পড়িয়া গেল। গোস্বামী মহাশয়ের কয়েকটি শিষ্য খুব মাতিয়া গেলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। শ্রীধর ভাবে উন্মত্তবৎ হইয়া 'ঐ দেখ্, ঐ দেখ্' বলিয়া ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই খুব আগ্রহের সহিত শ্রীধরকে দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ কুশারী মহাশয় ২/৪ লাফে শ্রীধরের সম্মুখে আসিয়া 'ঐ দেখ্; ঐ দেখ্ কিরে? ব্রহ্ম জগৎময়, ব্রহ্ম জগৎময়!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করিয়া উপদেশ দিলেন। তিনি সতেজ বাক্যে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়, খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন—'সাকার উপাসনাই কর, আর নিরাকার

উপাসনাই কর, এইমাত্র দেখিবে যে, নিজের ইষ্ট-দেবতাকে যথার্থ ব্যাকুলতার সহিত ডাকিতেছ কি না'—ইত্যাদি। ব্রাহ্মগণ আজ এভাবের উপদেশ শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অনেকে বলিলেন—গোস্বামী মহাশয় আজ সমাজে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই, নগেনবাবুর মুখ হইতে এপ্রকার উপদেশ বাহির হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

আজ তিন দিন যাবৎ নিয়ত মনে হইতেছিল—বড় দাদার ছোটকন্যা প্রিয়বালা জলে পড়িয়া মরিয়াছে। সময়ে সময়ে উহার মৃতদেহ কল্পনায় আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়িতেছিল। আজ খবর পাইলাম যথার্থই তাই। মনে বড় কষ্ট হইল। আমার অপর ভ্রাতুষ্পুত্রী সরযু নিতান্ত বালিকা, ঘটনার ২ দিন পূর্ব্বে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ হয় কেন? ইহাতে মনে হয় প্রারব্ধ একটা কিছু থাকিতেও পারে।

ভয়ানক বিপদে পড়িলাম। ভিতরে অদম্য কামের উত্তেজনা, বাহিরে একটার পর একটা ভীষণ প্রলোভন! এ অবস্থায় করি কি? ব্যভিচার করিয়া কামের বেগ শান্তি করিব, স্থির করিলাম। কিন্তু ব্যবস্থা পাইতে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গিয়া উপনীত হইলাম। একটুক্ষণ বসিয়া থাকার পর, তিনি নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—

উপদেশ শুনে কি হবে? শুধু শুনে গেলে কিছুই হয় না। জীবনে উহা পরিণত করতে হয়। ইচ্ছা করলেই সব-উপদেশ-মত চলা যায় না, সত্য। অনেকের ভাল হ'তে ইচ্ছা আছে, চেষ্টাও আছে ; কিন্তু পেরে ওঠে না। সকল রিপুর উপরে সকলের সমান আধিপত্য নাই, এ খুব সত্য কথা। কিন্তু সত্য কথা তো লোকে ইচ্ছা করলেই বলতে পারে ; তাই বা করে কই? সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, সত্য চিন্তা—সকলেরই প্রয়োজন । এ তিনটি অভ্যস্ত হ'লে আর বড় উৎপাত থাকে না। ধর্ম্মার্থিগণের প্রথমে এই তিনটি অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। পরে, সবই সহজ হয়ে আসে। এ কয়টি সহজেই অভ্যস্ত হয়। এই তিনটি আগে অভ্যাস কর, সব উৎপাতের শান্তি হয়ে যাবে।

এসব শুনিয়া আমি মনোদুঃখে বাসায় চলিয়া আসিলাম। ভাবিয়াছিলাম, গোস্বামী মহাশয় যোগাচার্য্য, এসব উৎপাত শান্তির কতপ্রকার প্রণালী জানেন, একটা কিছু মুষ্টিযোগ বলিয়া দিবেন। কিন্তু তিনিও তো দেখি ব্রাহ্মসমাজের সেই পুরাতন নীতির গৎ-ই আওড়াইলেন।

মন্ত্রশক্তির প্রমাণ।

আমাদের মাষ্টার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পাল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমরা ৮/১০ টি সমবয়স্ক তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আছি এমন

সময়ে একটি সাধুবেশধারী ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ ঐ বাসায় আসিয়া বলিলেন—"উপরি উপদ্রবে আপনাদের একটি ছেলে মারা পড়িতেছে। আপনাদের প্রবৃত্তি হইলে আমি একটি কবচ দিই, ছেলেটি ভাল হ'য়ে যাবে। দৈববলে আমি এই কবচ সংগ্রহ করিয়া দিব। আপনাদের অর্থব্যয় বেশী কিছু হ'বে না; একটি যজ্ঞ কর্‌তে যৎকিঞ্চিৎ খরচ হবে মাত্র।" মাষ্টার মহাশয় ভয়ানক গোঁড়া ব্রাহ্ম, তিনি একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"কবচ-টবচের কাজ নয়। ও-সব দৈব-টৈব আমি মানি না। যজ্ঞ কি হে, বাপু? কোন ঔষধ জান তো দাও। ওসব কিছু বিশ্বাস করি না।" আমরা সকলেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন, মনে করিলাম—'বেশ একটা বুজ্‌রুক্ আসিয়া জুটিল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ঠাকুর, দৈববলে আমাদের কিছু দেখাতে পার?' সাধুবেশধারী কহিল—"হাঁ, নিশ্চয় পারি। ছেলেটির মহাবিপদ্ দেখে কবচের কথা বলছিলাম। উহা নেওয়া না নেওয়া আপনাদের ইচ্ছা। ইহাতে আমার কোন স্বার্থ নাই।"

১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

দৈববলে কিছু দেখাইবার জন্য সাধুটিকে খুব জেদ করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ ঠাট্টা তামাসাও করিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আচ্ছা, আপনারা কি চাহেন বলুন।' আমরা সকলে তখন বলিলাম—'দৈববলে কিছু খাবার মিষ্টি আনিয়া দাও।' ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এক ঘটী পরিষ্কার জল দিন, আর ঘরটি পরিষ্কার করাইয়া দিন। আমি মন্ত্র পড়িয়া যখন 'আয় আয়' বলিব, তখন ঐ জল ঘরে ছিটাইয়া দিবেন।" আমরা তৎক্ষণাৎ ঝাড়ু দিয়া ঘরটিকে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম; ব্রাহ্মণকে নিজেদেরই একখানা কাপড় পরাইলাম এবং এক ঘটী জল ঘরের মধ্যস্থলে রাখিয়া আমরা প্রায় ১০/১২ জনে সেই ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া খুব সতর্কতার সহিত উহার হাত-মুখ নাড়ার উপরে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। বেলা ৩টা ৩।। টা হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে পৈতা ধরিয়া স্থির মনে জপ করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরেই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তিনি উর্দ্ধদিকে হস্তদ্বয় তুলিয়া বার কয়েক 'আয় আয়' বলিয়া কাহাকে যেন আহ্বান করিলেন! আমরা অমনি সেই ঘটীর জল ঘরময় ছিটাইয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ তখন শূন্য হইতে প্রকাণ্ড—প্রায় দুই সের পরিমাণ—একটা মিশ্রির ডেলা লুফিয়া নিয়া আমাদের কাছে ফেলিয়া দিলেন। এতবড় মিশ্রির খণ্ডটা কোথা হইতে যে কিভাবে আসিল একটানা স্থির নজর রাখিয়াও আমরা এতগুলি লোকে তাহা কিছুই ধরিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাতেও মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না। তিনি স্পষ্টই বলিলেন— "যজ্ঞ-টজ্ঞ ওসব কিছু নয়, কুসংস্কার! আমি কবচ চাই না।" সাধুটি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরেই ছেলেটির মৃত্যু হইল। মাষ্টার মহাশয়ের বিবেকের বল অদ্ভুত! এমন আপদেও স্বীয় ধারণা বা মতের বিরুদ্ধ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিলেন না। ইহা আমাদের পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত বটে! কতকগুলি মিশ্রি বাসায় আনিয়া আমি একটা শিশিতে পুরিয়া রাখিলাম, অন্য কিছু হয় কিনা দেখিব।

আহার সম্বন্ধে উপদেশ—আনুষঙ্গিক কথা।

মধ্যাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। নির্জ্জনে অবকাশ পাইয়া বলিলাম, 'সাধনের সময়ে যে সব দর্শন হইত, এখন আর তাহা কিছুই হয় না।'

১৩ই আশ্বিন, ১২৯৫; শুক্রবার।

গোঁসাই। **হয় না কেন? কোনপ্রকার অনিয়ম হয়েছে?**

গোঁসাইয়ের একথাটি শোনামাত্র মনে হইল—'যে অনিয়ম, অত্যাচারে দর্শন বন্ধ হয়, তাহা তো আমার জানাই আছে, উত্তেজনাই মূল।' এই উত্তেজনাই বা কেন হয়, উহার গোড়ার কথা জানিতে ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'অনিয়ম তো কতই হয়। দর্শন বন্ধ হবার মূল কি তা তো বুঝি না।'

গোঁসাই। **অনেক প্রকার অনিয়মে ওরূপ হ'য়ে থাকে। আহারাদির অনিয়মেও দর্শন বন্ধ হয়।**

আমি। মাছ মাংস কখনও খাই না। উচ্ছিষ্ট খাওয়ারও তো সম্ভাবনা নাই।

গোঁসাই। **তা বল্‌লে কি হয়? কারও আকাঙ্খার বস্তু, লোভের বস্তু, তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয়। কোনও তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক আসনে বসে আহার করলেও অনিষ্ট হয়; এমন কি, একস্থানে বসে খেলেও হয়। আহারের বস্তুতে তমোগুণীর দৃষ্টি পড়্‌লেও ক্ষতি হয়। এসব বিষয়ে যখন দৃষ্টিটি খুলে যাবে, পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে, ওসব লোকের দৃষ্টিমাত্র আহারের বস্তুতে কীটাণু ব্যাপিয়া পড়ে। এসকল পূর্ব্বে তো কিছুই বুঝতে পারতাম না, মানতামও না। কিন্তু প্রত্যক্ষ হ'লে আর অবিশ্বাস করি কিরূপে? আহারের বস্তুতে লোকের সংস্পর্শে ও দৃষ্টিতে বিশেষ অপকার করে। দরজা বন্ধ ক'রে আহার করা এখনও অনেক ব্রাহ্মণের নিয়ম আছে। এজন্য দেবতার ভোগও দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আহার্য্যে পড়লে উহা ভোগে লাগে না, নষ্ট হয়। এজন্য দরজা বন্ধ ক'রে ভোগ প্রস্তুত করারও নিয়ম আছে। ভাবদুষ্ট, স্পর্শদুষ্ট ও দৃষ্টিদুষ্ট বস্তু আহার করলে ক্ষতি করে; দেবতাকে দিলেও অপরাধ হয়। আহারের দোষে অনেক প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হয়, ওতে সমস্ত রিপুরই উত্তেজনা জন্মে। এইজন্য এই সব বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়।**

আমি। শুদ্ধাশুদ্ধ বস্তু পরিষ্কার না জেনে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করলে আমার অপরাধ হয় না? আর তাতে ইষ্টদেবতার কোনও ক্ষতি হবে না?

গোঁসাই। **না, কোন অপরাধই হয় না। কারণ উহা তো ব্যবস্থাই। ওরূপ না করলে যে রক্ষা পাবার উপায় নাই। ইষ্টদেবতারও কোন ক্ষতি হয় না। যথামত নিবেদন করলে ইষ্টদেবতা জানতে পারেন, সতর্কও হন। ওতে কোন দিকেই অনিষ্ট হয় না।**

আমি। ইষ্টদেবতার কৃপায় আহারের বস্তু শোধিত হ'লেও তো আবার দূষিত হ'তে পারে; এজন্য প্রতি গ্রাস নিবেদন ক'রে থাকি। উচ্ছিষ্ট বস্তু পুনঃপুনঃ নিবেদন করায় ইষ্টদেবতার অনিষ্ট হয় না?

গোঁসাই। না, কিছুই না। ঐ রকমই করতে হয়। এজন্য আহারের সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ কথাই বলেন না, মৌন থাকেন। দেশে এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে ঋষিগণ এসব খুব আবশ্যক বুঝেছিলেন; তাই আমাদের হিতের জন্য শাস্ত্রাদিতে লিখে রেখে গেছেন। বহু তপস্যাতে তাঁরা যে সকল মহাসত্য অভ্রান্ত বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন, তার তত্ত্ব অবগত না হ'য়ে, একেবারে কুসংস্কার ব'লে উড়ায়ে দেওয়া ঠিক নয়। ঋষিরা যা সত্য ব'লে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন তাই আমাদের কল্যাণের জন্যই রেখে গেছেন, মিথ্যা কথা কতকগুলি লিখে রাখায় তাঁদের তো কোনও স্বার্থ ছিল না। আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করি, এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা শাস্ত্রাদি লিখে গেছেন। যা সত্য বুঝ তাই এখন ক'রে যাও। সকল নিয়ম এখনই প্রতিপালন করতে পারবে না; সাধ্যমত যতটুকু পার, ক'রে যাও; তাতেই ঢের উপকার পাবে। সকল নিয়ম রক্ষা ক'রে চলা যদি সহজ হ'ত, তা হ'লে তো অনায়াসে সকলেই সিদ্ধিলাভ করতে পারত । আহারটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। প্রণালীমত আহার করতে পারলে তাতেই সব হয়, আর কিছুই করতে হয় না। তা তো কেহ কিছু করে না, জানেও না। আহার বিষয়ে নানাপ্রকার অনিয়ম চল্‌ছে, তাতে বড় অনিষ্ট হচ্ছে। এখন যা পার ক'রে যাও। ক্রমে সবই জানবে, করতেও পারবে।

চরণামৃতলাভ ও তদ্বিষয়ে উপদেশ।

আমার রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে; স্কুলও ছুটি হইল। বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। বাড়ীর নামে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া, আপদে পড়িলে কি প্রকারে রক্ষা পাইব, ভাবিয়া ব্যস্ত হইলাম। শ্যামাচরণ বক্‌সী মহাশয় বলিয়াছিলেন—'গুরুর চরণামৃত গ্রহণ করিলে শারীরিক ও মানসিক বিকারের শান্তি হয়।' আমি ইহার কিছুই বুঝি না, তবে বক্‌সী মহাশয় বড়ই খাঁটি লোক, তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করি। তাই, ভবিষ্যতে বিষম উৎপাতের ভয়ে, উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আমার প্রবৃত্তি হইল। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি ঘরভরা লোক; নির্জ্জনে চরণামৃত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে গোঁসাইকে জানাইলাম। তিনি একটু পরেই প্রস্রাব করিবার জন্য বাহিরে গেলেন। আমিও সেই সুযোগে গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলাম। গোঁসাই আমার নিকটে আসিবামাত্র প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিলাম। প্রার্থনা করিলাম, 'আমার যেন গুরুতে—সত্যবস্তুতে নিষ্ঠা হয়।'' অন্য প্রার্থনা আসিল না। চরণামৃত দিয়া গোঁসাই বলিলেন—**ইহা যত গোপনে ব্যবহার করবে, ততই উপকার পাবে। লোকের সামনে গ্রহণ ক'রো না, আর কাহাকেও জান্‌তে দিও না।**

২৪ শে আশ্বিন, ১২৯৫; মঙ্গলবার।

বারদীর ব্রহ্মচারীর সঙ্গ ঃ মহাপুরুষের বিচিত্র উপদেশ ও অসাধারণ আচরণ।

বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন বেশ কাটাইলাম। পরে নানাদিক্ হইতে নানারূপ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি প্রবল প্রলোভনে চিত্তকে বিষম বিক্ষিপ্ত ও প্রলুব্ধ করিয়া ফেলিল। ভাবিলাম, এবারে আর রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচারে গা ঢালিয়া ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রতিদিনই আমি চরিত্রস্খলনের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। দিবসের কু-চিত্র রাত্রিতে কল্পনায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। পড়াশুনা একরূপ ত্যাগই করিলাম। পরীক্ষার সুফলেও হতাশ হইলাম। সাধন-ভজনেও চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিল। দিবানিশি আমার ললাটোপরি নিবিড় নীল আকাশে নিয়ত যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দর্শন হইত, ধীরে ধীরে উহা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি অহর্নিশি 'হা হুতাশ' করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। কুচিন্তার ফল হাতে হাতে পাইয়াও ছাড়িতে পারিলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন সমস্ত অবস্থা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে লিখিয়া জানাইলাম। তিনি স্বহস্তে পত্রের উত্তর দিলেন—

অগ্রহায়ণের ২য় সপ্তাহ, ১২৯৫।

"নির্ব্বিঘ্নো ভব!"

মন খারাপ হ'লে এখানে এসে উপদেশ নিয়ে যাইস্। বেদনা অসহ্য হ'লে সার মাটি বুকে ডলিস্— কমে যাবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবা। পিরাণ জুতা পরিস্ না, শীতনিবারণার্থে সাধারণ। সব আপদ দূর হবে, কোন ভয় নাই।　　আঃ—ব্রহ্মচারী

পত্রখানা পাইয়া ব্রহ্মচারীকে দেখিতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। পাড়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি ব্রাহ্মণকে সঙ্গী পাইয়া বারদী রওনা হইলাম। সকাল বেলা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট পৌঁছিলাম; ব্রহ্মচারী প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পত্র পেয়েছিস্?" আমি বলিলাম—"হাঁ"। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"আজ কি খেয়েছিস্?" আমি—"কিছু না।" শুনিয়াই ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন "ভজলেরাম"কে ডাকিয়া কহিলেন—"ওগো, আজ যে নাড়ু প্রস্তুত করেছ সব নিয়ে এস।"

স্নেহময়ী সেবিকা তৎক্ষণাৎ থালাভরা নাড়ু আনিয়া ব্রহ্মচারীর সম্মুখে রাখিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিলেন—"এসব নিয়ে খা।" আমার সঙ্গের ব্রাহ্মণটিকেও অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনার প্রসাদ হ'লে খেতে পারি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—"প্রসাদ কি? ইচ্ছা হইলে খাইতে পার।" আমি ব্রাহ্মণটিকে বলিলাম—"উনি যখন দিতেছেন তখনই প্রসাদ হ'য়েছে। নিন না?" ব্রাহ্মণকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকেই সবগুলি খাইতে বলিলেন। সেবিকা নাড়ুর থালা রান্নাঘরে লইয়া গিয়া আমাকে আসন পাতিয়া বসিতে দিল এবং ব্রহ্মচারীর কথামত সমস্ত

নাড়ুগুলি খাইবার জন্য আমাকে জেদ করিতে লাগিল। আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। এক থাবা ভাত আমার পুরা আহার; অর্দ্ধসেরের অধিক পরিমাণ এই নাড়ু আমি খাইব কি প্রকারে? বিশেষতঃ পিত্তশূল বেদনায় নাড়ু বিষতুল্য। যাহা হউক, ব্রহ্মচারীর আদেশ মনে করিয়া সমস্তগুলি নাড়ুই খাইলাম। ভজলেরাম কহিল—"বাবা আজ মধ্যাহ্নে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, একটি ছেলে অনাহারে খুব পরিশ্রান্ত হ'য়ে আসছে। উৎকৃষ্ট নাড়ু বেশী পরিমাণে প্রস্তুত ক'রে রাখ, সে এলে খেতে দিবি।"

আহারান্তে ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়া বসিলাম। মিলিয়া মিশিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। অপরাহ্ন ৫।। টার সময়ে ব্রহ্মচারীর আহার্য্য প্রস্তুত হইল। আহারের পর তিনি আমাকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম— "এইমাত্র রাশীকৃত নাড়ু খেয়েছি। এত খাবার বহুকাল খাই নাই। এখন আবার খাব কিরূপে?" ব্রহ্মচারী বলিলেন—" খেতে বস না গিয়ে, ক্ষুধা পাবে এখন!" আমি আর প্রতিবাদ না করিয়া আহার করিতে বসিলাম। অদ্ভুত মহাত্মার কৃপা। প্রসাদের চমৎকার গন্ধে আমার লোভ হইল, ক্ষুধা পাইল। রুচির সহিত নিয়মিত আহারেরও প্রায় চতুর্গুণ খাইলাম। রাত্রে ব্রহ্মচারীর ঘরের পাশেই রান্নাঘরে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শুনিলাম ব্রহ্মচারী মহাশয় ভজন গাহিতেছেন—"প্রাণ গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ—জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ*।" গাহিতে গাহিতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সকাল বেলা উঠিয়াই প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে তোর কিছু বল্‌বার থাকলে এখন বল।"

আমি। কামের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি বড় অস্থির হ'তেছি। কি কর্‌ব?

ব্রহ্মচারী। কেন, রমণ কর্‌বি। তোর কি জুটে না?

আমি। ঢের জুটে; কিন্তু তাতে যে পাপ হয়!

ব্রহ্মচারী। আচ্ছা, যা; তোকে কোন পাপ স্পর্শ কর্‌বে না। সব পাপ আমার।

আমি। লোকে যে নিন্দা কর্‌বে।

ব্রহ্মচারী। কে নিন্দা কর্‌বে? জ্ঞানীরা নিন্দা কর্‌বে না—মুরুক্ষুরাই কর্‌বে। মুরুক্ষুর নিন্দায় কি হয়?

আমি। জ্ঞানীরা নিন্দা করবে না কেন? সকলেই তো ঐ কাজের নিন্দা করে।

ব্রহ্মচারী। দেড়বৎসর দুইবৎসরের একটি ছেলে যখন দৌড়িতে শেখে তা দেখেছিস্? ৮/১০ হাত দৌড়িয়ে গিয়ে দুড়ুম করে আছাড় খেয়ে পড়ে, আবার উঠে। ২৫ বৎসরের একটি যুবক যদি সেই শিশুর উঠা পড়া দেখে হাসে, ঠাট্টা করে, তাকে কি বল্‌ব? সে শালা মুরুক্ষু না? সে জানে না যে কত উঠা পড়া ক'রে এখন তার ঠ্যাঙ্গে জোর হয়েছে, সে দু'ক্রোশ দৌড়িতে

*ব্রহ্মচারী মহাশয় গোঁসাইকে "জীবনকৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেছেন।

পারে। শিশুর উঠা পড়ায় কি জ্ঞানীরা নিন্দা করে? কত আছাড় খেয়ে, পড়ে উঠে, তবে বলবান্ হয়— জ্ঞানীরা তা জানে।

আমি। আচ্ছা, আমি তা হ'লে আপনার উপদেশমতই গিয়ে চলি, নিবৃত্তির কথা তো আর আপনি বলছেন না?

ব্রহ্মচারী। "আমি তোকে নিবৃত্তির কথা বল্‌ব কেন? তোর কর্ম্মেই তোকে নিবৃত্ত কর্‌বে। আমি উৎসাহ দিলেই কি তোর সাধ্য আছে যে তুই করতে পারিস্? ইটি জেনেই তোকে বলছি। তুই গিয়ে দেখ না! এখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে অস্থির হইস্ না। কর্ম্মশেষ না করলে কিছুতেই হবে না। এখন গিয়ে লেখা পড়া কর, প্রারব্ধ শেষ কর। ধর্ম্ম পরে লাভ হবে। আমি আরও একশত বৎসর আছি ; শুধু তোদেরই জন্য, আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী আমাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম—এখন আমার যাইতে ইচ্ছা নাই; কিছুদিন আপনার নিকটে থাকতে ইচ্ছা হয়। ব্রহ্মচারী—তা বেশ থাক্‌তে পারিস থাক; কর্ম্মেই তোকে টেনে নিবে। এই বলিয়া তিনি গোঁসাইয়ের কথা তুলিলেন, বলিলেন— "গোঁসাই দেশবিদেশে আমাকে মহাপুরুষ ব'লে প্রচার ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করলে। ২৫ বৎসর কাল আমি এখানে বেশ ছিলাম; এখন রোগীর চীৎকার আর মামলা মোকদ্দমার কথা উদয়াস্ত আমি শুনি। এই জন্যই কি আমি এখানে আছি? শালা অন্ধ, মুরুক্ষু! কচি-কচি ছেলেগুলোকে যোগশিক্ষা দিচ্ছে আর বলে 'পরমহংসজী পরমহংসজী'!" এই প্রকার নানা কথা গোঁসাইকে বলিয়া, আমাদের সাধনের কুৎসাও করিতে লাগিলেন। আমি সেসব কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম; তখনই চলিয়া আসিতে প্রস্তুত হইলাম। ব্রহ্মচারীর কথায় বিরক্ত হইয়া অতঃপর আহারান্তে বেলা ১২টার পর ঢাকায় রওনা হইলাম।

ব্রহ্মচারীর সঙ্গ মানা।

গেণ্ডারিয়ায় আম গাছের নীচে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রহ্মচারীর বিষয় সমস্ত কথা বলিলাম। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন—

এখন তোমাদের যে কেহ ব্রহ্মচারীর নিকটে যাবেন, তাঁকেই তিনি একবার 'নাড়া-চাড়া' কর্‌বেন। আমাকে তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন—"মুনি-ঋষিদের 'কল্‌জে' তুই শেয়াল কুকুরগুলোকে বিলাচ্ছিস!" আমি বল্‌লাম, যেমন পরমহংসজী আদেশ করেন তেমনি আমি করছি। তিনি বললেন—"আচ্ছা, আমি একবার বেশ ক'রে দেখ্‌ব।" তাই এখন তিনি আরম্ভ করেছেন। এতে তোমাদের আর কি? আমাকেই পরীক্ষা কর্‌ছেন। তিনি বলেছিলেন—তোর 'নাড়ি ভুঁড়ি' আমি টেনে বের কর্‌ব। এখন তিনি তাই কর্‌ছেন। যত পারেন করুন! তবে, তোমরা এখন কেহ সেখানে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা সকলকেই বলে দেওয়া ভাল।

গোস্বামী মহাশয়ের একথা আমাদের সকলের ভিতরেই প্রচারিত হইল। প্রায় সকলেই অতঃপর ব্রহ্মচারীর নিকটে যাতায়াত ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু, যাঁহারা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত বন্ধ করিলেন না, তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই প্রারব্ধবাদী হইয়া সাধন ভজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিষম দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

বড়দাদার অযাচিত দীক্ষালাভে আমার আক্ষেপ। ঠাকুরের সান্ত্বনাদান।

২৩শে—২৬শে অগ্রহায়ণ

বড়দাদার নিকট হইতে একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—দীক্ষা লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের কৃপার উপর তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে একদিন শ্রীযুক্ত রামানন্দ স্বামী (রামকুমার বিদ্যারত্ন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়) হঠাৎ ফয়জাবাদে আসিয়া আমাকে পূর্ব্বে কিছুমাত্র না বলিয়া, গুপ্তার ঘাটে বেড়াইতে নিয়া গেলেন। সেখানে তিনি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কানে নাম দিয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে দীক্ষা দিলাম। এই নাম জপ কর।' আমি ইহা দৈবনির্ব্বন্ধ ভাবিয়া, দীক্ষা বলিয়াই মানিয়া নিয়াছি এবং নিয়মমত জপ করিতেছি, উপকারও পাইতেছি।''

দাদার পত্রখানা পাইয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রাণে অসহ্য যাতনা হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে পৌঁছিয়া পত্রখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া একটু হাসিমুখে আমাকে বলিলেন—**এ তো বেশ হয়েছে ! যাক্, হ'য়ে ত গেল ! ভগবান্ কতপ্রকারেই লোকের মঙ্গল করেন !**

আমি। আপনি আগে আশা দিয়া দাদাকে একটু জানালে বোধ হয় এরূপ হ'ত না।

গোঁসাই। **কেন? এ মন্দ কি হয়েছে? ঈশ্বরেচ্ছায় যা হয় তা কি কখন মন্দ হ'তে পারে? এ তো ভালই হয়েছে।**

আমি। তাঁকে যদি আপনি কৃপা না করেন, তা'হলে হবে না। আমি একাই আপনার কৃপা ভোগ করতে চাই না।

গোঁসাই। **কেন? তাঁর কাজ তিনি করুন্, তোমার কাজ তুমি কর। যাঁর যাঁর কাজ তাঁর তাঁর কাছে।**

আমি ইহার পর আর কিছু না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ মনে মনে গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—''দাদাকে যদি দয়া করিয়া শ্রীচরণে টানিয়া না আনেন তাহা হইলে আমাকেও ছাড়িয়া দিন, আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। দাদাকে ছাড়িয়া মুক্তিলাভেরও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।'' গোঁসাই আমার পানে একটু সময় তাকাইয়া থাকিয়া চোখ্ বুজিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবেশ অবস্থায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—**একটি বৈদ্য গাছের শিকড়ের সহিত কোনও বস্তু মিলায়ে রোগীকে ঔষধ দিয়ে থাকেন ; রোগী আরোগ্য হয়। লোকে ঔষধের মধ্যে মাত্র শিকড়টিই দেখে ; অন্য বস্তু দেখে না। এক ব্যক্তি ভাবল,**

'এত শিকড়েরই গুণ।' তিনি বস্তুটি বাদ দিয়ে একটি রোগীকে সেই শিকড় মাত্র সেবন কর্‌তে দিলেন। সুতরাং রোগের আরোগ্য নাই।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—এক ব্যক্তি ধানগাছ জন্মাবে স্থির কর্‌লে। অতি সুন্দর একটি উর্ব্বরা ভূমি পেয়ে মনে কর্‌লে চাষারা অনুর্ব্বর অপরিষ্কার ভূমিতে ধান ছড়াইয়া রাখে, তাতেই কেমন সুন্দর ধান হয়। আমি এই সুন্দর ভূমিতে ধান বুনিতে দিব না; যেমন সুন্দর সার মাটি, তেমনি সুন্দর ধানের সার বুন্‌বো। সে তুষ ফেলে চাল বুনল। ধান বুন্‌লে অতি সুন্দর ফসল জন্মাত । চালে তা কিছুই হবে না।

অস্পষ্টভাবে এই প্রকার আরও অনেক কথা বলিলেন। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া লিখিলাম না। এই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে চোখ মুছিয়া, মাথা তুলিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তোমার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নাই। তাঁকে আমার নিকটেই আস্‌তে হবে। এই সাধনে ফল পাবেন না; তৃপ্তিও লাভ করবেন না। এখন সাময়িক একটু শান্তি পেতে পারেন। এখন উনি ঐ সাধনই করুন; ওতে বেশ শিক্ষা হবে। পরে অল্প সময়েই বেশ ফল পাবেন। তুমি কখনও তাঁকে নিরুৎসাহ ক'রো না। খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লিখ।

আমি। দাদার আস্‌তে হবে, তবে অনেকটা সময় নষ্ট হইল।

গোঁসাই। না, এ নষ্ট নয়। এতে তাঁর উপকারই হবে। আর এ ঘটনায় তোমারও খুব উপকার হবে। তা তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে। নির্দ্দিষ্ট সময়টি অতীত হ'লেই বুঝবে, এ ঘটনায় তোমার দাদারও কত উপকার হয়।

বিদ্যারত্ন মহাশয় দাদাকে দীক্ষা দিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—'ছয় মাসে তুমি সিদ্ধ হইবে।'

একমাসে সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দ্দেশ।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৫; মঙ্গলবার; ১লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

খুব অল্প সময় মধ্যে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার একটি প্রণালী আজ গুরুদেব আমাদিগকে বলিয়া দিলেন। একমাসকাল কেহ ব্যবস্থানুরূপ নিয়মে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিলে নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেন। শীঘ্র দেহত্যাগ হইবে, যদি কাহারও প্রাণে এই রূপ আশঙ্কা হয়, সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ হইতে পারে বলিয়া যদি কাহারও অন্তরে আক্ষেপ আসে, অনায়াসে তিনি ইচ্ছা করিলে একমাসকাল নিয়মে থাকিয়া এই প্রণালী ধরিয়া সাধন করিতে পারেন; সিদ্ধিলাভ করিবেন। নিয়মগুলি অত্যন্ত শক্ত বলিয়া, কাহাকেও গুরুদেব জেদ করিলেন না; "যাহার ইচ্ছা হয় এই মত সাধন করিতে পারেন" ইহাই মাত্র বলিলেন। নিয়মগুলি এই—

১। লোকসঙ্গত্যাগ। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ ও চিন্তাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।

২। নির্জ্জনে শুচিশুদ্ধভাবে দিবসে একবারমাত্র স্বপাক আতপান্ন-আহার।

৩। শয়নত্যাগ। অত্যন্ত অবসাদ বোধ হইলে নিতান্ত আবশ্যকমত, বাহুমাত্র উপাধানে ভূমিশয়ন।

বাহিরে এই সকল নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে, নির্দ্দিষ্ট প্রকারে মুদ্রাবন্ধন এবং অহর্নিশি সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণায়াম, কুম্ভকসংযোগে প্রণালীমত নামসাধন করিতে হইবে।

এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া, একমাসকাল কেহ সাধন করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবেন। অন্ততঃ তিনটি দিনও যদি কেহ করেন, তিনি সাধারণের দুর্লভ কোনও একটি অবস্থা লাভ করিবেন, ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই।

মুদ্রাটি দেখাইয়া বলিলেন— **এই প্রকার মুদ্রাবন্ধ ক'রে আসনে বসা অভ্যস্ত হ'লে কামক্রোধাদি রিপুগণ নিস্তেজ হয় ; শরীর রসশূন্য, সাধনোপযোগী সবল ও সুস্থ হ'য়ে থাকে।**

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে ঠাকুরের কুটীর।

গেণ্ডারিয়ার আশ্রম সঞ্চারের কিছুদিন পরেই গোস্বামী মহাশয়ের আসন-কুটীর নির্ম্মিত হয়। গোঁসাইয়ের শিষ্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় ইহা প্রস্তুত করাইয়া দেন। আম্রবৃক্ষের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, ৮ হাত অন্তরে ঐ ঘরটি অবস্থিত।

ছোট কুটীরখানা দক্ষিণদ্বারী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দৈর্ঘ্য ১০ হাত, প্রস্থে ৮ হাত মাত্র। মৃত্তিকার প্রাচীরে নির্ম্মিত; চৌচালা, ছনের (খড়ের) ছাউনীতে আবৃত। কুটীরের মাঝামাঝি দক্ষিণদিকে মাত্র একটি দরজা এবং উহার পশ্চিমাংশে উত্তর-দক্ষিণের দেওয়ালে আড়াআড়ি ছোট ছোট দুইটি (১ ফুট প্রস্থ ও ১।। ফুট লম্বা আয়তনের) গবাক্ষ। কুটীরের ভিতরে দুইটি প্রকোষ্ঠ। দরজার পূর্ব্বধার ঘেঁষিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, একটি উচ্চ প্রাচীর সমস্ত ঘরখানাকেই পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বদিকের যোগ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশের একটিমাত্র ৪ ফুট লম্বা ২ ফুট প্রস্থ চৌকাটহীন সরু পথ; উহা ভিতরের দেওয়ালের উত্তরদিকে রাখা হইয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে বেলা দুই প্রহরের সময়েও আলো প্রবেশ করে না ; অন্ধকারময়। ইহারই দক্ষিণের দেওয়ালসংলগ্ন, উত্তরমুখে গোস্বামী মহাশয়ের আসন রহিয়াছে। সম্মুখে মাত্র ধুনী; ঘরে আর কিছুই নাই।

সাধারণতঃ, গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমদিকের ঘরখানাতেই বসিয়া থাকেন। পূর্ব্বদিকের অন্ধকারময় কুঠ্‌রীতে গোস্বামী মহাশয় পঞ্চমুণ্ড আসন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—আসন রচনার আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। শুনিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে—'পঞ্চমুণ্ডাসন করিয়া উহাতে একবার বসিলে, এইস্থান ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র আর কোথাও যাওয়ার উপায় থাকিবে না। সুতরাং উহাতে আর প্রয়োজন নাই।' কিন্তু পঞ্চমুণ্ডাসন না করিলেও দিবসের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া ঐ আসনেই বসিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রম কুটীরের উত্তরদিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রে স্বহস্তে তিনি নিশান আঁকিয়া তদুপরি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম এবং আসন-ঘরের ভিতরে ঐ দেওয়ালের গাত্রে কয়েকটি উপদেশ চকখড়ির দ্বারায় লিখিয়া রাখিয়াছেন।

(ক) কুটীরের উত্তর দেওয়ালের বহির্গাত্রে—

ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ।

(খ) কুটীরের অভ্যন্তরে দেওয়ালের গাত্রে—

এইছা দিন নাহি রহেগা।

আত্মপ্রশংসা করিও না।

পরনিন্দা করিও না।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

সর্ব্বজীবে দয়া কর।

শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

সাধকের পক্ষে প্রাত্যহিক প্রতিপাল্য বিধি।

২রা পৌষ, ১২৯৫; রবিবার।

আজ আমার সাধন-জীবনের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। অপরাহ্নে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয় সমাধিস্থ রহিয়াছেন, দেখিলাম কয়েকটি গুরুভ্রাতা তাঁহার সম্মুখে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি ধীরে ধীরে আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন—প্রাণায়ামের কাজ তোমাদের প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

১। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে প্রণালীমত দৃষ্টিসাধন অভ্যাস করবে।

২। শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের শমভাব। চিত্তের প্রশান্ততা সর্ব্বদা রক্ষা করে চল্‌বে।

৩। দম—ইন্দ্রিয়ের বিষয় হ'তে যে সমস্ত কুঅভ্যাস জন্মে, তা হ'তে মনটিকে নিবৃত্ত রাখ্‌বে।

৪। তিতিক্ষা—সকল প্রকার দুঃখের অবস্থায়ই ক্ষমা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবে।

৫। উপরতি— মৃত্যু ও পরলোক-চিন্তা করবে। দেহ, বিষয়, সংসারাদি সমস্তই অনিত্য অসার—প্রতিদিন ভাব্‌বে।

৬। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা—সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, নিন্দা, প্রশংসা—সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাতেও চিত্তের অবস্থা অবিচলিত, একই প্রকার স্থির রাখতে চেষ্টা কর্‌বে।

৭। স্বাধ্যায়—ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ-পাঠ। মহাভারতের মোক্ষ-পর্ব্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা— এসব হ'তে অন্ততঃ দু' একটি শ্লোকও প্রত্যহ পাঠ কর্‌বে।

৮। সাধুসঙ্গ—প্রত্যহ সাধু-দর্শন বা ধর্ম্ম-বিষয়ে একটু আলাপ কর্‌বে।

৯। দান—যার যেরূপ সাধ্য, অন্ততঃ একটি সৎকথাও দান কর্‌বে।

১০। তপস্যা—সাধন, যা ক'রে থাক।

প্রতিদিনই এ সকল নিয়ম রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করবে।

প্রত্যহ এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলা তো আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। প্রতিদিন এ নিয়মগুলি অন্ততঃ যেন একবার স্মরণও কর্‌তে পারি, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। কীর্ত্তনান্তে আজ রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাসায় আসিলাম।

স্কুলের পড়াত্যাগ ও পশ্চিমে যাওয়ার আদেশ।
ধ্যান ও আসনের উপদেশ।

কিছুকাল যাবৎ আমার বেদনা-রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিনরাত অবিশ্রান্ত দুঃসহ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। শরীরের বিষম দুরবস্থা দেখিয়া, শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া পশ্চিমে যাইতে বলিতেছেন। পড়াশুনায় আমারও একেবারেই উৎসাহ নাই। কিন্তু বহুকাল বাড়িতে থাকার পরে, কিছুদিন যাবৎ আবার লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছি। পড়াশুনা বন্ধ হইলে দাদারা কি বলিবেন—সর্ব্বদা ইহাই মনে হইতেছে। আজ অকস্মাৎ বড়দাদার একখানা পত্র আসিয়া পড়িল। বিদ্যারত্ন মহাশয় দাদার গুরু; জানি না, তিনি আমার সম্বন্ধে দাদাকে কি বলিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, দাদা আমাকে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া অবিলম্বে পশ্চিমে যাইতে লিখিয়াছেন। আমার বর্ত্তমান দুরবস্থায় ভগবানের আশ্চর্য্য সকরুণ ব্যবস্থা দেখিয়া আমি একেবারে অবাক্ হইলাম।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে দাদার দীক্ষাগ্রহণের সংবাদ শুনিয়া, মনে বড়ই দুঃখ পাইয়াছিলাম; গোস্বামী মহাশয় তখনই আমাকে বলিয়াছিলেন—'**এতে তোমারও খুব কল্যাণ হবে। তা তুমি শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বে।**' গুরুদেবের এই কথা পুনঃপুনঃ এখন স্মরণ হওয়ায়, আমার সংশয়পূর্ণ অবিশ্বাসী চিত্তকেও তাঁহার শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। গুরুদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে বারংবার প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম—'দয়াল ঠাকুর, একেবারেই যেন চিরকালের মত লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়া, স্কুল-কারাগার হইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং তোমার সঙ্গ সতত লাভ করিতে পারি, ইহাই করিও।"

দাদার পত্র পাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই লেখাপড়ার পুস্তকগুলি গুছাইয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া ফেলিলাম; বাসার সকলে স্কুল-কলেজে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল, আমি পশ্চিমে যাওয়ার অনুমতির জন্য গেণ্ডারিয়ায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে চলিলাম। শ্যামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পথে পাইয়া আমাকে বলিলেন—"এ সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের দর্শনলাভ সহজ হইবে না।" কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—"দিনরাতই আজকাল তিনি আসনের ঘরে বদ্ধ থাকেন। পঞ্চমুণ্ডাসনে একমাসকাল বসিয়া অতি তীব্র কঠোর সাধন করিবেন। এই সময়ের মধ্যে বাহিরের লোকে তাঁহার দর্শন বড় পাইবেন না। সাধনের ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও নির্দ্দিষ্ট সময়েই মাত্র দেখা পাইবেন।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোঁসাইয়ের আবার পঞ্চমুণ্ডাসনে সাধন করিবার প্রয়োজন কি?" শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"তিনি বলিয়াছেন, পরমহংসজীর আদেশ।" গোস্বামী মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই এখন সমাধিস্থ থাকেন। পঞ্চমুণ্ডাসনে সিদ্ধ হইলে, পাঁচটি পরলোকগত মহাত্মা গোঁসাইয়ের দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিনিয়ত নিযুক্ত থাকিবেন, ঐসকল আত্মা সকল প্রকার আপদ্ বিপদে ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দুর্দ্দৈব হইতে দেহটিকে রক্ষা করিবেন। বক্‌সী দাদার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। গোঁসাইয়ের এই অদ্ভুত সাধনচেষ্টা নাকি গুরুভ্রাতারাও সকলে জানেন না। গুরুদেবের গেণ্ডারিয়াবাসী ৩/৪ টি ঘনিষ্ঠ শিষ্যমাত্র অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে পরিষ্কাররূপে জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল রহিল।

আমি গোঁসাইয়ের দর্শন-প্রত্যাশা মনে মনে প্রার্থনা করিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ৫/৭ মিনিট ভজন-কুটীরের কাছে বসিতেই গোঁসাই ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া আপনা হইতেই ডাকিয়া বলিলেন—**তোমার শরীর তো খুব কাতর দেখ্‌ছি। এখন কি কর্‌বে স্থির করেছ?**

আমি। দাদা পশ্চিমে যেতে লিখেছেন। তাই কি কর্‌বো?

গোঁসাই। **হাঁ। এখন তোমার পক্ষে তাই তো করা উচিত। এবার বুঝি—পরীক্ষা? তা কি কর্‌বে? শরীর খারাপ ক'রে লেখাপড়াও তো ঠিক নয়।**

আমি। এবারেও যদি পরীক্ষা না দেই তাহা হইলে আর কখনও দিব না। এখন আপনি যা বলেন।

গোঁসাই। **স্কুলে প'ড়ে কি হবে? তুমিও যেমন! শরীরটি নষ্ট হ'লে পাশ দিয়ে কি করবে? বিদ্যালাভই উদ্দেশ্য; সেটি হ'লেই তো হ'লো। যত বড় বড় লোকের কথা শুনা যায়—মিল প্রভৃতি—অনেকেই স্কুলে পড়েন নাই। স্কুলে না প'ড়েও বিদ্যালাভ করা যায়; তুমিও তাই কর। স্কুলের পড়া তোমার পক্ষে সুবিধার নয়। যাদের শরীর সুস্থ নয়, স্কুলের পড়া তাদের পক্ষে আমি তো ভাল মনে করি না। আমাদের দেশে যেসব ছেলেপিলের ব্যারাম দেখা যায়, অধিকাংশেরই স্কুলে প'ড়ে। আহার ক'রে অমনিই 'ভাতে-মুখে' স্কুলে দৌড়ে, সারা দিন অনিয়মিত পরিশ্রম করে, তার উপরে পরীক্ষার চিন্তায় মাথা নষ্ট করে। এসব কারণেই এত রোগ, এত অকাল জরা। তুমি তোমার দাদার কাছে চলে যাও—সেখানে তোমার শরীর মন সবই ভাল থাকবে। ওদিকে মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের দর্শনও পাবে। তোমার তাই ভাল।** একটু থামিয়া পরে আবার বলিলেন—**তোমার দাদাকে এই সাধনের ভিতরের কোন কথা ব'লো না। ওসব বলতে নিষেধ আছে। আর তাঁকে আমাদের সাধনের ভিতরে আন্‌তে কোন চেষ্টা ক'রো না। তাঁর জন্য তুমি কোন চেষ্টাই ক'রো না। তাঁর সময় হ'লে তিনি আসবেন। তোমার কোন চেষ্টারই দরকার নাই। আমাদের এ সাধন প্রচারের বস্তু নয়। যাঁর প্রয়োজন, ভগবান্‌ই সময়মত তাঁর নিকটে প্রচার করেন।** এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি লোকের অলৌকিকভাবে দীক্ষাগ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেন। তাঁহাদের নিজেদের মুখে সে সব কথা সময়ান্তরে সুযোগমত বিস্তারিতরূপে শুনিয়া যথাযথ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রামকুমারবাবু কি রকম? তিনি কি ব্রাহ্মসমাজের সাধন ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাধন করেন?

গোঁসাই। **হাঁ, তিনি অন্য সাধন করেন। কিন্তু শক্তি পান নাই। শক্তি পেলে গোপন কর্‌তে পার্‌তেন না। তা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ত।**

আমি। রামকুমারবাবু সেদিন বলিলেন, "তোমাদের সাধনে কোন দোষই নাই, তবে বড় বেশী প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, এই যা। সাধন গোপনেই রাখ্‌তে হয়।"

গোঁসাই। **তা তো ঠিক কথা; কিন্তু শক্তি গোপনে থাকে না। আর সত্যের 'মার' নাই। সত্য বস্তু প্রকাশ করতে কাকে ভয়? সত্য যা তা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। উনি যখন শক্তি পাবেন তখন দেখবেন উহা গোপনে থাকে না। রামকুমারবাবুকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রো; তিনি ভাল লোক। আমাদের এ সাধনে সকলকেই ভক্তি করতে বলে। রাস্তার মুটে মজুরকেও ভক্তি করবে। সকলেই ভক্তির পাত্র। অবিচারে যিনি যত সকলকে ভক্তি করতে পারবেন তাঁরই তত উপকার।**

জিজ্ঞাসা করিলাম— সাধনের নূতন নিয়ম যা ব'লেছেন তা কি আমি করবো?

গোঁসাই। **হ্যাঁ, তুমিও করবে, আসন এইরূপ ক'রো ; আর এইখানে দৃষ্টি স্থির রেখে ধ্যান ক'রো।** এই বলিয়া, আসনটি করিয়া দেখাইলেন এবং ধ্যানের স্থানটিও বলিয়া দিলেন।

আমি। ধ্যান কি? ধ্যান কাহাকে বলে? আমি তো কিছুই জানি না। কি ধ্যান করবো?

গোঁসাই। **আচ্ছা, আসন ক'রে ব'সে ব'সে নাম ক'রো আর চোখ বুজে দৃষ্টিটি এখানে স্থির রেখো। পরে আপনি সব জানতে পারবে।**

জিজ্ঞাসা করিলাম—চোখ বুজে আবার ওখানে দৃষ্টি স্থির রাখব কি প্রকারে?

গোঁসাই। **চোখ বোজা থাকবে, মনটিকে ঐস্থানে স্থির রাখবে।**

আমি। কিছু না পেয়ে শুধু শুধু মন একটা স্থানে স্থির থাকবে?

গোঁসাই। **অভ্যাস করলেই কিছুকাল পরে নানারকম জ্যোতি ও রূপাদি দেখতে পাবে। মনটিকে একটা স্থানে এখন স্থির রাখতে চেষ্টা কর। পরে তোমার পক্ষে যা যা প্রয়োজন জানতে পারবে।**

ঐ প্রকার আসনে বসা অভ্যাস হ'লে কি উপকার হয় জানিতে চাহিলাম। গোঁসাই বলিলেন—**অম্ল, উদরী, শোথ, বাত, পৈত্তিকাদি এই আসনে বস্‌লে দূর হয়; আরও অনেক উপকার হয়। অভ্যাস করলে ক্রমে জানবে।**

গুরু শিষ্য সম্বন্ধ।

এক গুরুশক্তিই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত।

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার।

বড়দাদার আজ একখানি পত্র লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। আশ্রমে প্রবেশমাত্রই শ্রীধর ও লাল প্রভৃতি সকলে বলিলেন—'গোঁসাই খুব অসুস্থ। জ্বরে মাথা ধরায় প্রায় বেহুঁস অবস্থায় শয্যাগত আছেন। আজ দেখা হইবে না।' আমি কিছু না বলিয়া, বাহিরে আম গাছের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে মনে গোঁসাইকে স্মরণ করিয়া দর্শনের প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। গোঁসাই ভিতর বাড়ীতেই কোঠাঘরে ছিলেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ, মা-ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী মাত্র নিকটে ছিলেন। আমার খবর কেহই গোঁসাইকে দেন নাই। অথচ মা-ঠাকুরাণী অকস্মাৎ দরজা খুলিয়া শ্রীধরকে বলিলেন—শ্রীধর, গোঁসাই বল্‌লেন 'কুলদা বাহিরে অপেক্ষা করছে; তাকে ডেকে দাও।' আমি খবরটি পাইয়াই কোঠাঘরে গেলাম; গোঁসাই বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলেন। বাম হস্তে নিজের 'কপাটি' (কপালটি) টিপিয়া ধরিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**কি জন্যে এসেছ?'**

আমি দাদার পত্রখানা পড়িয়া শুনাইলাম। মোট কথা এই লিখিয়াছেন—''মহাত্মা ল্যাঙ্গা-বাবা আমাকে বড়ই ভালবাসেন। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি দূর হইতে

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—'বাবা, আমার বড় অবিশ্বাস। দয়া করিয়া আমাকে বিশ্বাস দিন।' ল্যাঙ্গা-বাবা তাঁর মাথার জটাগুলি সম্মুখের দিকে কপালের উপর দিয়া ফেলিয়া তাহার ভিতর দিয়া আড়ে আড়ে খুব সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া, আমাকে বলিলেন—'আচ্ছা, বাচ্চা, আব্ হো গিয়া। তুমহারা বিশ্বাস বন্ গিয়া। চলা যাও।' আমি অমনি বাবাজীকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঐদিন হইতে ভগবানের নাম পাওয়ার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করিতে লাগিল। আমি তো কত শত নামই জানি; কিন্তু তাহাতে কিছুই হইবে না, মনে হইল। কেহ আসিয়া যদি "আমাকে গাছ গাছ বলিয়াও জপ করিতে বলেন, তাহাই ভগবানের উদ্দেশ্যে জপ করিয়া আমি কৃতার্থ হইব, মনে হইতে লাগিল। এই সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিয়া অযাচিতভাবে নাম দিলেন। ভগবানেরই ইচ্ছা মনে করিয়া, উহা আমি গ্রহণ করিলাম। এখন নাম জপ করিতে গিয়া আমি বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজের দেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। এ রাজ্য ছাড়িয়া অন্য একটা রাজ্যে প্রবেশ করি, আর আনন্দে ডুবিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ি। ইহা কি নামেরই গুণ, না ল্যাঙ্গা-বাবার কৃপারই ফল, জানি না।" ইত্যাদি। পত্রখানি শুনিয়া গোঁসাই বলিলেন—**সুন্দর অবস্থা! শুনে বড় আনন্দ হ'লো। গতবারে তুমি তাঁকে বড় ভাল চিঠি লেখ নাই। ঐ চিঠি আমি তোমাকে যেভাবে লিখতে ব'লেছিলাম সেরূপ হয় নাই। ঐ সময়ে তোমার মন যে রকম ছিল তাতে ঐরূপ না লিখে পার না, তা ঠিক। যাক্, এখন গিয়ে তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়ে পত্র লেখ। তিনি যে সাধন করছেন তাই করুন, তাতেই তাঁর মঙ্গল হবে। ল্যাঙ্গা-বাবা একজন খুব উঁচু দরের সিদ্ধপুরুষ; তাঁর দৃষ্টির ফল অবশ্যই পাবেন। বিশ্বাস লাভ হ'লেই অনেকটা হ'য়ে গেল। বিশ্বাসে অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়। শেষ অবস্থায় শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তির আবশ্যকতা বোধ হ'লে তখন অন্যের কাছে যেতেই হবে। কিন্তু সে অবস্থাও তো সহজ নয়।**

গোস্বামী মহাশয়ের শিরঃপীড়ার ক্লেশ দেখিয়া আমি উঠিতে উদ্‌যোগ করিলাম। আমার কান্না পাইতে লাগিল। বলিলাম—ভিতরে দারুণ দুরবস্থা। এতকাল আপনার কাছে ছিলাম; এখন কোথায় কি অবস্থায় গিয়া পড়িব। কখন কি ক'রে ফেলব!'

গোঁসাই আমার কথা শেষ না হইতেই বলিতে লাগিলেন—**তুমি তো এখন গর্ভস্থ সন্তান তোমার আর চিন্তার কি আছে? মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা টের পান, সন্তান নড়াচড়া করলে অমনি বুঝতে পারেন, গুরুও সেই প্রকার শিষ্যের সমস্ত অবস্থা, সমস্ত চেষ্টা সর্ব্বদা জানতে পারেন। সন্তান যতকাল ভূমিষ্ঠ না হয়, ততকাল তার কোন ক্ষমতাই তো থাকে না। মা যা কিছু আহার করেন তারই একটু একটু রস নাড়ীর ভিতর দিয়ে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়; শুধু তাতেই গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি হ'তে থাকে। সেইরূপ গুরু যা কিছু লাভ করেন, শিষ্য শুধু তারই অংশ প্রয়োজনমত পেতে থাকে। গুরুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই**

শিষ্যেরও উন্নতি। তারপর ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেও মা-ই তাকে আহার দেন ; প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগাড় ক'রে মা-ই তাকে লালন পালন করেন। যে পর্য্যন্ত তার চলাফেরার খাওয়া-দাওয়ার তেমন ক্ষমতা না জন্মে, ততকাল মা তাকে চোখের আড় করেন না, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। কিন্তু শিষ্য সিদ্ধ অবস্থা লাভ করলেও সদ্‌গুরু তাকে ছাড়েন না, গুরু তাকে তখনও শিশুর মত কোলে নিয়ে থাকেন, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে গুরু শিষ্যের সুবিধা দেখেন।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—সংসারে যে সব মেয়ের সন্তান হয় তাদের গর্ভস্থ সন্তান আপন আপন মা'র গর্ভে থেকে সকলেই প্রয়োজনমত মা'র ভুক্ত বস্তুর অংশ পায়। ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লেও সকল মা-ই যত্নের সহিত সন্তানের প্রতিপালন করেন। এখন তোমার মা'র গর্ভে না জন্মালে কোন ছেলে আর বাঁচবে না, তার অসুবিধা হবে, অকল্যাণ ঘটবে—এরূপ যদি মনে কর, তা ঠিক হবে না। মা যদি তেমন হন, তোমাদের মা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ-যত্নে সন্তানকে লালন পালন করতে পারেন। তাহ'লে তোমাদের অপেক্ষাও ভালই হওয়ার কথা। মা'র শুশ্রূষায়ই সন্তানের বৃদ্ধি। মা'র গর্ভে জন্মে খুব ভাল শুশ্রূষা পেলে, সন্তান খুব ভাল হবে না কেন? সকলেরই যে এক মা হবে, এমন কিছু নয়। ভিন্ন ভিন্ন মা'র গর্ভে সন্তান জন্মে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক—ভগবানেরও এই ইচ্ছা। তুমি ফয়জাবাদে যাও, বেশ উপকার পাবে। মধ্যে মধ্যে খুব ভাল ভাল লোকের দর্শনও মিলবে; সকলকেই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রো। সাম্প্রাদায়িকভাব রেখো না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—গুরুতে তেমন নিষ্ঠা না জন্মান পর্য্যন্ত অন্য সাধুর সঙ্গ করা ভাল?

গোঁসাই। অন্য কি? অন্য ভেবে অন্যের সঙ্গ করবে না। এক গুরুশক্তিই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে—এই ভেবে সঙ্গ করলে, সকলের সঙ্গেই উপকার পাবে। রক্তাধারে রক্ত থাকে; তাই ব'লে কি শরীরের অন্য স্থানে রক্ত নাই? রক্তের আধার—মূল স্থানই—রক্তাধার। সেই স্থান হ'তে রক্ত সঞ্চারিত হ'য়ে, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে। সমস্ত শরীরে যে রক্ত তাহা ঐ রক্তাধারেরই রক্ত। কিন্তু এ ঠিক্ যে, রক্তাধারে রক্ত না থাকলে শরীরের কোথাও রক্ত থাকতে পারে না। সমস্ত বিশ্বব্যাপী এক গুরুশক্তি। সঙ্কীর্ণভাব কিছু নয়। সঙ্কীর্ণভাবে বড় অনিষ্ট হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—গুরুতে একনিষ্ঠতাও কি সঙ্কীর্ণভাব নয়?

গোঁসাই। না, ওকে সঙ্কীর্ণভাব বলে না। যে রক্তাধারটি ভাল ক'রে জানে সে ইহাও জানে যে, এক রক্তাধারেরই রক্ত নানা পথ দিয়ে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে। সে সর্ব্বত্র একই বস্তু দেখে।

গোঁসাই একটু থামিয়া আবার বলিলেন—

ওখানে গিয়ে সাধনটি গোপনে ক'রো। আর দাদাকে খুব উৎসাহ দিও। আপন আপন সাধন-ভজনে নিরুৎসাহ কাহাকেও করতে নাই। ওরূপ করা বড় দোষ। যিনি যে পথেই

চলুন না কেন উৎসাহই দিতে হয়; কারুকে এই সাধন গ্রহণ করতে অনুরোধ ক'রো না। তোমার দাদাকেও প্রয়োজনমত ভগবান্‌ই এর ভিতরে আনবেন।

আমি। সমস্ত সাধনই কি গোপনে করতে হবে?

গোঁসাই। **যতদূর পারা যায়। এসব গোপনেরই জিনিস। খুব সাবধানে থেকো।**

গোঁসাই এক হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টারও অধিক সময় আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন। দারুণ জ্বরে, অসহ্য শিরঃপীড়ায়, আশ্চর্য্য স্থিরভাব দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। বাসায় আসিয়া ঠিক্ করিলাম, শীঘ্রই বাড়ী যাইব।

স্বপ্ন—সাধন পাইতে মেজদাদার ব্যস্ততা।

৮ই পৌষ, শনিবার।

বাড়ীতে আসিয়া তিন দিন থাকিলাম। একটি স্বপ্ন দেখিলাম—যেন মেজদাদার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল তিনি অন্তরে দুঃসহ কোন যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলিয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'শান্তি কিসে হয়; বলতে পারিস?' আমি বলিলাম—'গোঁসাইয়ের আশ্রয় নিলে শান্তি হয়। তিনি দীক্ষা দিলে সমস্ত যন্ত্রণার মূল কাটিয়া যায়।' মেজদাদা গোঁসাইয়ের আশ্রয় লইতে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'তিনি কি আমার মত লোককে সাধন দিবেন?' আমি বলিলাম—'তিনি বড় দয়াল; প্রার্থী হ'লে নিশ্চয়ই দিবেন।' এইটুকু বলার পরেই নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মুঙ্গের যাইতে আদেশ।

১২ পৌষ, বুধবার।

আগামী কল্য পশ্চিমে যাইব। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে অনুমতি লইতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। গোঁসাই অসুস্থ। শুনিলাম, তৎকালে কোঠাঘরে ধ্যানস্থ আছেন।

আমি গিয়া দরজার বাহিরে প্রণাম করিতেই, তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন। নিজ আসনের একপাশ দেখাইয়া বলিলেন **'এখানে ব'সো।'** আমার সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় মেঝেতেই বসিলাম কিন্তু তিনি বারংবার জেদ্ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, আসনের একধারে অন্য একখানা আসন নিয়া বসিলাম। তিনি আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন, কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না। এ সময়ে আর কথাবার্ত্তা বলাও ঠিক নয় ভাবিয়া, আমি বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিলাম। প্রণাম করামাত্র ধ্যানভঙ্গ হইল। আমাকে বলিলেন—**কি? কবে যাবে স্থির ক'রেছ?**

আমি। আজ রাত্রে।

গোঁসাই। **তাহ'লে এখানেই এসে থাক না? দোলাইগঞ্জ স্টেশন খুব নিকটে; এখান থেকে যাবার সুবিধা হবে।**

আমি। একেবারেই টিকেট করিয়া যাইব। এখান হইতে সে সুবিধা নাই।

গোঁসাই। **এখান থেকে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে না হয় টিকেট কর্‌বে, সময় যথেষ্ট পাবে; তাতে আর অসুবিধা কি?**

আমি। আর কখনও ও রাস্তায় চলি নাই, তাই একেবারে সোজা টিকেট করিয়া যাওয়াই সুবিধা মনে করি।

গোঁসাই। **তোমার আশঙ্কা যখন হ'চ্ছে, তখন তাই কর। একটু তাড়াতাড়ি ফুলবেড়ে যেতে চেষ্টা ক'রো;—ট্রেন 'মিস্' হ'তে পারে। কলকাতা গিয়ে বেশীদিন থেকো না; একদিন বিশ্রাম ক'রো; না হ'লে রাস্তায় অসুবিধা হ'তে পারে। তোমার মেজ্‌দা বুঝি মুঙ্গেরে আছেন? মুঙ্গের বড় সুন্দর স্থান। এখন কিছুকাল গিয়ে তাঁরই কাছে থাক; সেখানেই এখন তোমার থাকা প্রয়োজন। বেশ থাক্‌বে, উপকার পাবে। পরে ফয়জাবাদ যেও। উৎসাহের সহিত সাধন-ভজন ক'রো; তা'হলে সব বুঝতে পারবে। কোন চিন্তা ক'রো না। ভয় কি?**

আমি এই সময়ে এক শিশি জলে গোঁসাইয়ের পদাঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া চরণামৃত করিয়া লইলাম। চরণামৃত দিতে দিতেই গোঁসাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। গোঁসাইকে সমাধিস্থ দেখিয়া, আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ফুলবেড়ে (ঢাকা) ষ্টেশনে রওনা হইলাম। নবাবপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল; ট্রেন 'মিস' হইল। গোঁসাইয়ের কথামত কাজ করিলে আর এ দুর্ভোগ ঘটিত না।

একটি মেমের মহত্ত্ব।

১৪ই পৌষ, শুক্রবার।

শেষ রাত্রিতে দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে একটি মেমের আশ্চর্য্য দয়া দেখিয়া অবাক হইলাম। ষ্টীমার সারাদিন পদ্মানদীর উপর দিয়া চলিয়া, সন্ধ্যায় সময়ে গোয়ালন্দ পৌঁছিবে। সহসা পথিমধ্যে একটি অসহায়া নীচজাতীয়া অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না বৃদ্ধার বিষম ওলাওঠা হইল। জাহাজের কর্ত্তারা তাহাকে চড়ার উপরে ফেলিয়া যাইতে পরামর্শ স্থির করিল। বাঙ্গালী বাবুভ্রাতারা অবিলম্বে সংক্রামক রোগীকে সরাইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একটি মেম তখন কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া, রোগিণীকে কোলে তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন। দাস্তবমিজড়িত ময়লা কাপড়-চোপড় ফেলিয়া দিয়া আপন মূল্যবান বস্ত্রাদি তাহার ব্যবহারে দিয়া, স্বহস্তেই সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। জাহাজের কর্ত্তাদের নানাপ্রকারে বুঝাইয়া, তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্কল্প হইতে বিরত করিলেন। মেমের সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধাদির ফলে রোগিণী ক্রমে অনেকটা সুস্থ হইল। দেশীয় লোকের যে অবস্থায় সহানুভূতি হইল না,

উচ্চবংশীয়া, অবস্থাপন্না খাসবিলাতী মেমের সে স্থলে এরূপ অসামান্য দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মেমটির সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমি উহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। রোগিণীর সেবা করিতে করিতে মেম আমাকে বলিলেন—'ভাই, তুমি যীশুখ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস কর?' আমি বলিলাম—'হ্যাঁ, তিনি মহাপুরুষ, মুক্তি দিতে পারেন। তাঁহার উপরে আমার খুবই উচ্চভাব আছে।' মেম বলিলেন—'তুমি যাহাকে উচ্চভাব বলিতেছ, তাহা অপেক্ষা নীচু ভাব যীশুখ্রীষ্টের উপরে কখনও মানুষের হওয়া সম্ভব কি? তুমি তাঁকে মহাপুরুষ বল!' যীশুখ্রীষ্টের প্রতি মেমের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু তবু আমি তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিলাম। মেমটি বিশেষ কোনও তর্ক না করিয়া কহিলেন—'ভাই, সত্য বুঝিবার জন্য বহুকাল আমি তর্ক করিয়া অযথা সময় নষ্ট করিয়াছি ; কিছুই বুঝি নাই ; শান্তিও পাই নাই। সত্য বস্তু কখনও শুধু তর্কের দ্বারা নিরূপিত হয় না। অসত্যকেও তর্কের দ্বারা সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই সত্যকে জানা যায়। যীশুকে বিশ্বাস কর। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে জানিতে পারিবে।' মেমের এই কথা কয়টি আমার খুব ভাল লাগিল।

সতীশের প্রতি গোঁসাইয়ের কৃপা।

১৫ই পৌষ, শনিবার।

প্রত্যূষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, কিছুকাল যাবৎ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে সাধন গ্রহণ করিয়াছেন। অল্পদিনের ভিতরেই গোস্বামী মহাশয়ের উপরে ইঁহাদের অসাধারণ নির্ভরতা ও ভক্তি জন্মিয়াছে, আলাপে জানিলাম। সতীশের ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনা তাঁহারই মুখে শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইলাম। সতীশ বলিলেন—'ভাই, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই রিপুর উত্তেজনায় পড়িয়া কত কাণ্ডই না করিয়াছি! সাধন গ্রহণ করিয়া ভাবিলাম, এবারে সকল উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কিন্তু কাজে তাহার কিছুই হইল না, বরং ওসব আরও বহুগুণ বৃদ্ধিই পাইল। গোস্বামী মহাশয়ের উপরে আমার ভয়ানক অভিমান আসিতে লাগিল। এই সময়ে একদিন সাধন করিতে বসিয়াছি, অকস্মাৎ অদম্য উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়িলাম। তখন 'সাধন আর করিব না,' গোঁসাইয়ের কাছেও আর যাইব না, এই প্রকার ভাবিতেছি, এমন সময়ে অন্য ঘর হইতে গোঁসাই পুনঃপুনঃ আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে যাইবামাত্র তিনি আমাকে খুব স্নেহের সহিত বলিলেন—**'সতীশ! আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দেও তো!'** আমি, নিজের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া, অভিমানের সহিত একটু তেজ করিয়া বলিলাম—'না, তা আমি পারবো না।' গোঁসাই একটু হাসিয়া

আবার বলিলেন—**'রাগ কর্‌ছ কেন? মাথাটা আমার জ্বলে যাচ্ছে, একটু তেল দিয়ে দেও না, এসো।'** আমি এক গণ্ডূষ তেল লইয়া গোঁসাইয়ের মাথায় দিতে লাগিলাম। মাথায় তেল দেওয়া গোঁসাইয়ের কোন কালে অভ্যাস নাই; অথচ, আমাকে বলিতে লাগিলেন—**'দেও, দেও। আমার মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে!'** সেই সময়ে আমার যে একটা কি অবস্থা হইল জানি না—শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, আজ পর্য্যন্ত যতগুলি স্ত্রীলোকের উপর আমার কুভাব হইয়াছে, একটি একটি করিয়া তাহারা কামোন্মত্তা হইয়া আমার দিকে আসিতেছে এবং পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। ভয়ে ও লজ্জায় আমি জড়সড় হইতে লাগিলাম। তখন গোঁসাই বলিতে লাগিলেন—**'দেও, বেশ করে দেও; যতটা তেল আছে সবটাই বেশ ক'রে ধীরে ধীরে ব'সিয়ে দেও।'** স্ত্রীলোকগুলি কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়া কোথায় যে গেল তাহা লক্ষ্য করিবারও অবসর পাইলাম না। একটা কেমন যেন নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম। সকলে চলিয়া গেলে পরে গোঁসাই বলিলেন—**'সবটা তেল শুষে গেছে? তা, হ'লে যাও।'** জাগ্রত অবস্থায় এই প্রকার অদ্ভুত স্বপ্নবৎ ব্যাপার দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তেলের দিকে বা গোঁসাইয়ের মাথার দিকে মনোযোগ একেবারেই তখন ছিল না। গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। তখন মাথার দিকে চাহিয়া দেখি—এক বিন্দুও তেল নাই! সেই দিন হইতেই কিন্তু আমার কামভাব একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কখনও যে ছিল তাহাও এখন কল্পনা করিতে পারি না। এই ঘটনা মনে পড়িলেই আমার কান্না পায়। কেবল ইহাই মনে হয়, আমার যন্ত্রণা দেখিয়া দয়া করিয়া গোঁসাই আমার সমস্ত কুভাবগুলি নিজেই মাথা পাতিয়া নিলেন।

আদেশ-লঙ্ঘনে দুর্ভোগ।

দুই দিন কলিকাতায় থাকিয়া হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া মুঙ্গেরের টিকেট করিলাম। অমনই গাড়ীর বাঁশী বাজিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গাড়ীর সম্মুখে গেলাম। গাড়ীর দরজা পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। ট্রেন 'ফেল' হইলাম বুঝিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটি ভদ্রলোক আমার সেই দুর্দ্দশা দেখিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন—'উঠুন, শীঘ্র উঠে পড়ুন; দরজা খুলে দিচ্ছি।' আমি অমনই চলন্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিলাম। রাত্রি ১২ টার সময়ে মুঙ্গের পৌঁছিলাম।

১৮ই পৌষ।

একখানা এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া মেজদাদার বাসায় চলিলাম। উপস্থিত হইয়া জানিলাম—মেজদাদা অন্য বাসায় উঠিয়া গিয়াছেন। শহরে এক ঘণ্টা কাল ঘুরিয়াও মেজদাদার নূতন বাসার কোনও খোঁজ-খবর পাইলাম না। এক্কাওয়ালা বিরক্ত হইয়া আমাকে জোর করিয়া পথের মধ্যে একটা স্থানে নামাইয়া দিল। তাহাকে আমি একটি পয়সাও দিলাম না। মোট, গাঁঠ্‌রী ও বিছানা ইত্যাদি লইয়া বড়রাস্তার উপরে, সেই অন্ধকার রাত্রিতে অর্দ্ধঘণ্টা কাল

একটা স্থানে বসিয়া রহিলাম। গুরুদেবের কথামত একদিন মাত্র কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়া আসিলে এই দুর্ভোগ হইত না, মেজদাদাকে পুরাতন বাসাতেই পাইতাম, পরে বুঝিলাম। যাহা হউক, রাত্রি ২টার সময়ে বিপন্ন হইয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার অপরিসীম কৃপায় গুণেই হউক অথবা আকস্মিক ঘটনাবশতঃই হউক, এই সময়ে একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল—'ক্যা বাবু! হিঁয়া কাহে বৈঠা হ্যায়? মজুরা চাহি?' আমি মেজদাদার নাম ও পরিচয় দিয়া তাহাকে বলিলাম—'আমাকে তাঁহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে পার? মুটে বলিল—'বাবুকো হাম্ পচান্‌তা হ্যায়। চলিয়ে।' অতঃপর আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া মেজদাদার বাসায় পৌঁছিলাম। মজুরকে পয়সা দেওয়ার সময় অনুসন্ধান করিয়া দেখি, টাকার থ'লেটি নাই! বুকের উপরে আঁটা কোটের পকেটে ৮টি টাকা ছিল; উহার উপরে দুইটি জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও থ'লেটি কি করিয়া যে হারাইয়া গেল বুঝিলাম না। মনে হইল, এক্কাওয়ালার উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করায় গুরুদেবই কৃপা করিয়া আমাকে এই দণ্ড দিলেন। সমস্তটি রাস্তায় অন্য একটা শক্তির খেলা হইয়া গেল দেখিয়া গোঁসাইয়ের উপরে আমার চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অবস্থায় ফেলিয়া যেভাবে তিনি তাঁহার চরণে এই চিত্তটিকে টানিয়া লইতেছেন, ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি।

১ম স্বপ্ন—কষ্টহারিণীর ঘাটের সংলগ্ন গুপ্ত পথের রহস্য।

২০শে পৌষ, বৃহস্পতি বার; ১২৯৫।

গতকল্য বিকালবেলা মেজদাদা আমাকে কষ্টহারিণীর ঘাটে লইয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে এমন সুন্দর স্থান চক্ষে না দেখিলে আমি কল্পনাও করিতে পারিতাম না। ঘাটটি যেন গঙ্গার মধ্যেই রহিয়াছে। ঘাটের দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে কল কল রবে নির্ম্মল জলরাশি বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বিশাল গঙ্গার অপর পারে কেবল কাল মেঘের মত পাহাড়শ্রেণী দেখা যায়। ঘাটে বসিয়া এত ভাল লাগিল যে রাত্রিটি ওখানেই কাটাইতে ইচ্ছা হইল। স্নেহবশতঃ মেজদাদা আমার সে সঙ্কল্পে সম্মতি দিলেন না। রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে বাসায় আসিলাম।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—'বেলাবসানে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম; ঘাটের ধারে বহুকালের একটা পুরান পাকা পথ গঙ্গার ভিতর দিয়া কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে, উপর হইতে দেখিলাম। নদীর তলা দিয়ে রাস্তা; উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিল। আমি ধীরে ধীরে ঐ পথ ধরিয়া চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অন্ধকারে কিছুই আর দেখিতে পাইলাম না। চন্দ্র-সূর্য্যের আলো ওখানে প্রবেশ করে না। হাতে একটি মশাল লইয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তা ভয়ঙ্কর দুর্গম; জল-কাদায় আমার উরু পর্য্যন্ত বসিয়া যাইতে লাগিল।

নানাপ্রকার ধ্বনি ও ভয়ানক গণ্ডগোল শুনিতে লাগিলাম। সম্মুখে কি যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতেছে, মনে হইল। বোধ হইল বিস্তৃত গঙ্গার এক-চতুর্থাংশ পথ আসিয়াছি। রাস্তার ক্লেশে ও বিভীষিকার আতঙ্কে আমার শরীর-মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। দুঃখিতমনে কষ্টহারিণীর ঘাটে আসিয়া বসিলাম। এই সময়ে বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিতে পাইলাম। তিনিও ঐ পথে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"তুই এখানে কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রাস্তাটি কোথায় শেষ হয়েছে আপনার সঙ্গে গিয়া দেখ্‌ব।" ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন—"তুই তা পার্‌বি কেন? বেশী দূর এ পথে যাওয়া যায় না—বন্ধ; আর ভয়ও আছে।" আমি বলিলাম —"এ পথ বন্ধ হ'ল কেন? কে বন্ধ করেছে?" ব্রহ্মচারী—"এই পথটি সোজা গঙ্গার মধ্য পর্য্যন্ত। তারপর ওদিকে গিয়েছে।" পথটি কোথায় গিয়েছে সমস্ত জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় তুলিয়া নিয়া ঘাটের সোজা গঙ্গার মধ্যস্থলে গেলেন। পরে পশ্চিমোত্তর কোণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, নৌকা থামাইয়া বলিলেন— "কয়েকটি মহর্ষি এবং প্রধান প্রধান যোগী পাহাড়ের পাশে গঙ্গার নীচে এইস্থানে একটি আশ্রম করিয়া রহিয়াছেন। আশ্রমটি খুব নিভৃত, বহুস্থান লইয়া বিস্তৃত। মহাপুরুষদের কয়েকজন শিষ্যমাত্র সঙ্গে আছেন। এই আশ্রমটির সহিত ঐ গঙ্গার ধারের পথটির যোগ আছে। এখান হইতে ভিতরে ভিতরে একটি গুপ্তপথ গিয়া ঐ স্থানে ঐ পথে মিশিয়াছে। পাছে কেহ সেই গুপ্তপথ দিয়া আশ্রমে আসিয়া প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় কর্ত্তারা বড় রাস্তার স্থানে স্থানে কাদা-জল দিয়া বিষম দুর্গম করিয়া রাখিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে ভয়ানক বিষধর সর্পের আবাসও হইয়াছে। ঐ বড় রাস্তা ধরিয়া, এই কারণে, কাহারও আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার যো নাই।"

আমি। আশ্রমে প্রবেশের কি অন্য পথ নাই?

ব্রহ্মচারী। আরও দু'টি পথ আছে, তা জেনে তোর লাভ কি? এপথে প্রবেশ করতে তোর, এখনও ঢের দেরী।

আমি। আপনি দয়া ক'রে একটি পথ আমাকে দেখা'য়ে দিন। আমি এখন প্রবেশের চেষ্টা কর্‌ব না; পথটা শুধু জানা থাকুক।

আমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী, নৌকা হইতে নামিয়া, গঙ্গার উত্তর পারে ঘাটের বিপরীত দিকে পাহাড়ে লইয়া চলিলেন; বলিলেন—"এই যে সুন্দর পাথরগুলি দেখিতেছিস্, ইহার নীচ দিয়া উহাদের আশ্রমেব দিকে একটা রাস্তা আছে। চল্, সেই পথে প্রবেশের দ্বার তোকে দেখাইয়া দি।" এই বলিয়া, কতদূর অগ্রসর হইয়া, ৮/৯ ফিট্ লম্বা অর্দ্ধ হস্তেরও কম প্রশস্ত,

একটি ফাটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে পাথরের চটাঙ্গের ভিতর দিয়া ফাঁক দেখ্‌ছিস্, এই একটি পথ।" আমি উহার ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, কোনও স্থান অত্যন্ত গভীর অন্ধকারময়, কোন কোন স্থানে জ্বলন্ত কয়লার মত অগ্নি জ্বলিতেছে ; আবার কোন কোন স্থানে অনবরত ধূম নির্গত হইতেছে। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"এই পথটি সহজে কাহারও নজরে পড়ে না। দিনের বেলায় সামান্য সামান্য ধোঁয়া উঠিতেই মাত্র দেখা যায়। যতই রাত্রি অধিক হয়, এই সমস্তটা চটাঙ্গের ফাঁক অগ্নিময় হইয়া যায়। বহুদূর হইতেও এই অগ্নি লোকের চক্ষে পড়ে। তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই আগুনের ভিতর দিয়া আশ্রমে গিয়া প্রবেশ কর্।"

আমি সেই অগ্নি দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিলাম—'এর ভিতরে আমি যাইতে পারিব না। অন্য পথ বলিয়া দিন। ব্রহ্মচারী আমার এ কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বটে? পথের না বড় খোজ নিচ্ছিলি? যা এখান হ'তে চলে যা।" এই বলিয়া তিনি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া গঙ্গার পারে যাইয়া নৌকায় চড়িলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। নৌকা যেদিকে যাইতে লাগিল, তীরে তীরে আমিও সেইদিকে ছুটিলাম। ব্রহ্মচারী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এখন চলে যা, চলে যা।"

এই শব্দ শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি পরিষ্কার যেন চক্ষে ভাসিতে লাগিল। সকালবেলায় উঠিয়া মেজদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কষ্টহারিণীর ঘাটের নিকটে কি কোন পুরাতন গুপ্তরাস্তা আছে?' মেজদাদা বলিলেন—"হাঁ নবাবী আমলের একটি পথ আছে। তা বহুকাল একেবারে বন্ধ ।" আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। পথটি দেখিতে বিকাল বেলা মেজদাদার সঙ্গে কষ্টহারিণীর ঘাটে গেলাম। দেখিয়া কতক্ষণ একেবারে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কষ্টহারিণীর ঘাটে প্রায় ৫০/৬০ হাত দক্ষিণে এই পথটি রহিয়াছে। ক্রমশঃ নীচু হইয়া রাস্তাটি একেবারে গঙ্গার ভিতরে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। জল এ সময়ে কম বলিয়া, রাস্তাটির উপরকার প্রকাণ্ড খিলান ক্রমশঃ যে লম্বাভাবে গঙ্গার গর্ভে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, ঘাট হইতে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু এই খিলান-রাস্তা কোথায় গিয়া যে শেষ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারিল না। শুনিলাম কিছুকাল পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ 'ডিয়ার' সাহেব বহু অর্থব্যয়ে এই পথটি খুলিতে চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হন। নানাপ্রকার ভয় ও বিভীষিকা দর্শন করিয়া এবং বহুবিধ বাজনার আওয়াজ শুনিয়া, মজুরেরা নাকি কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে। বড় বড় বিষধর সর্প উহার ভিতরে আছে মনে করিয়া, সাহেবও অসম্ভব সঙ্কল্পে ক্ষান্ত হন। অনেকেই বলেন যে, নবাবদের দুঃসময়ে পলাইবার জন্য ইহা গুপ্তপথ ছিল; আবার কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন যে খিলানের অন্দরে আবরণের ভিতরে থাকিয়া নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে বেগমদের স্নানের জন্য কোনও নবাব একটি নিভৃত ও গুপ্ত ঘাট করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সম্পর্কে নিশ্চিত কোন সংবাদ কেহই বলিতে পারিল না।

পীরপাহাড় ও সীতাকুণ্ড।

এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে মেজদাদার সঙ্গে প্রায়ই কষ্টহারিণীর ঘাটে যাইতেছি। সন্ধ্যার পরে ঘাটের বিপরীত দিকে, গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের উপরে, একটি চঞ্চল অগ্নি নিত্যই দেখিতেছি। অগ্নিটি স্থির নয়; মনে হয় যেন ৮/১০ হাত স্থান ব্যাপিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। শহরের বাবুদিগকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন,—'এ অগ্নি অধিক রাত্রে, অন্ধকার পক্ষে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। আমারা বহুকাল যাবৎ এই অগ্নি দেখিয়া আসিতেছি। কিসের অগ্নি, কোথায় অগ্নি, তাহা আমরা জানি না।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বপ্নে ব্রহ্মচারী মহাশয় ঠিক ঐ পাহাড়ের যে স্থানে ফাটা চটাঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, এই অগ্নি ঠিক সেই স্থানেই দেখিতেছি।

২৩শে পৌষ, রবিবার।

মেজদাদার সঙ্গে একদিন পীরপাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। মুঙ্গের হইতে পীরপাহাড় বেশী দূরে নয়। পীরপাহাড়ে উঠিয়া একটি কবর দেখিলাম। একটি মুসলমান ফকির ওখানে নামাজ পড়িতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে কবরটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন বহুকাল পূর্ব্বে এখানে কোনও একটি ফকির ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি গৃহ, পরিবার ও বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আসেন। এখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া তিনি কঠোর সাধন-ভজন করিয়া পীর হন। দেহত্যাগ করিলে এখানেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়; সেই অবধি তাঁহারই নামে এই পাহাড়কে পীরপাহাড় বলে। পীরসাহেব অদ্ভুতশক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। স্থানটি দেখিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল পীরসাহেবের কবরের পার্শ্বে বসিয়া নাম করিলাম। গুরুদেব একবার কথাপ্রসঙ্গে এই পীরসাহেবের প্রভাব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন— **'একদিন পীরপাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অকস্মাৎ চারদিক্ অন্ধকার ক'রে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি এল। বিষম বিপদ।** চেয়ে দেখি কোথাও মাথা রাখ্‌বার একটু স্থান নাই। **কি আর কর্‌বো? পীরসাহেবের কবরের পার্শ্বে স্থির হ'য়ে বসে রইলাম। ফকির সাহেবের অদ্ভুত প্রভাব। বৃষ্টিতে আমার চারদিক্ ভেসে গেল, কিন্তু আমার শরীরে এক ফোঁটা জলও পড়্‌ল না।'** পীরপাহাড়ের কথা গুরুদেবের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, এখন প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ফকির সাহেবের কবর প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিলাম। বড়ই ভাল লাগিল। এস্থানে ভগবানের নাম করিয়া একটু বিশেষত্ব অনুভূতি হইল। গুরুদেবকে একান্তমনে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম—যেন এইরূপ নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে থাকিয়া সাধন-ভজন করিবার সুযোগ তিনি ঘটাইয়া দেন।

পীরপাহাড় হইতে সীতাকুণ্ড অধিক দূর নয়। আমরা সীতাকুণ্ডে গেলাম। শুনিলাম সীতাদেবী এই কুণ্ডে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়াছিলেন বলিয়া কুণ্ডটির নাম সীতাকুণ্ড হইয়াছে। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আন্দাজ ১০/১২ ফিট্ হইবে। কত গভীর বুঝিলাম না। স্থানে স্থানে জলের নীচে প্রস্তর

দেখা যায়। অবিশ্রান্ত অত্যুষ্ণ ফুটন্ত জল টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিতেছে, হাতে স্পর্শ করিবার যো নাই। কুণ্ড হইতে অতিরিক্ত জল নিকাশের জন্য একটি বাঁধান নালা আছে। কেহ কুণ্ডে হঠাৎ পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু অবধারিত । এইজন্য সেই চতুষ্কোণ কুণ্ডের চারিধারে লোহার 'রেলিং' (বেড়া) রহিয়াছে। রামকুণ্ড ও ভরতকুণ্ড, সীতাকুণ্ডের কয়েক হাত তফাতে । এসব কুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হওয়ার পরই আমার পিতৃপুরুষ-দিগকে অকস্মাৎ মনে পড়িল। তাঁহারা যেন আমার হাত হইতে এই কুণ্ডের জল পাইবার প্রত্যাশায় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এই রকম একটা ভাবে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইহা কি স্থান-প্রভাব না অন্য কিছু জানি না। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি আমি চিরদিনই কুসংস্কার বলিয়া মনে করি; কিন্তু আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। রামকুণ্ডে ও ভরতকুণ্ডে অবগাহনপূর্ব্বক কিয়দ্দুরে সীতাকুণ্ডের নালায় গিয়া স্নান করিলাম। স্নানে বড় আরাম বোধ হইল। পিতৃপুরুষদের স্মরণ করিয়া ২।৪ গণ্ডূষ জল দিতেই হু হু করিয়া আমার কান্না আসিয়া পড়িল। ভিতরে একটা অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। যুগ-যুগান্ত হইতে সরলবিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ অসংখ্য লোকের যে ভাব-প্রভাবে এ স্থানের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও চতুঃসীমা পরিব্যাপ্ত, আজ বোধ হয় তাহাতেই আমার চিত্তকে এমন অভিভূত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এই স্থানে গুরুদেবের কৃপার বিশেষ নিদর্শনও পাইলাম।

স্বপ্নের সাফল্য । মুঙ্গের আগমনের সার্থকতা । মেজদাদার সাধন-প্রার্থনা ও গোঁসাইয়ের সম্মতি।

মুঙ্গেরে আসিয়া বড়ই আরামে দিন যাইতেছে। আজ মেজদাদা আমাকে কথায় কথায় কহিলেন—'প্রাণে একটা শান্তি কিছুতেই আসিতেছে না। কি করিলে প্রাণে শান্তি হয়?' আমি অমনই বলিলাম—'গোঁসাইয়ের আশ্রয় নিলে শান্তি হয়। তিনি যে সাধন দেন তাহা গ্রহণ করিয়া সেইমত করিতে পারিলে, অন্তরে কখনও অশান্তি আসে না।' মেজদাদা বলিলেন—'তিনি কি আমার মত লোককে দীক্ষা দিবেন?' আমি বলিলাম—'আপনি ভাল করিয়া একখানি পত্র তাঁহাকে লিখিয়া দিন। নিশ্চয়ই তিনি সাধন দিবেন।' আমার কথামত মেজদাদা গোঁসাইকে পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে উত্তর আসিল। গোঁসাই লিখিয়াছেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু!

আপনার পত্র পাইলাম। আপনাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি । আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যে পর্য্যন্ত দেখা না হয়, মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ জানাইবেন। কুলদাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গোঁসাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই মেজদাদার আশা পূর্ণ হইবে, গোঁসাইয়ের এই প্রকার আশ্বাসবাণী পাইয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নটি আমার এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ফয়জাবাদে যাওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত করিয়া গোঁসাই আমাকে তখন মুঙ্গেরে পাঠাইলেন কেন, তাহারও তাৎপর্য্য এতদিনে বুঝিলাম। এখন তো দেখিতেছি দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া গুরুদেব যেন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমার সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা করিতেছেন। ঘটনাবলীর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের অক্ষমতা নিবন্ধন বিস্ময়বশতঃই আমার এরূপ সংস্কার জন্মিতেছে—না, যথার্থই এসব ব্যাপারে গুরুদেবের কোনও হাত আছে, পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। চিত্ত কিন্তু গুরুদেবের দিকে আপনা আপনিই টানে।

মুঙ্গেরে আসিয়া জল-বায়ুর গুণে শরীর একটু সুস্থ আছে। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি; সাধন-ভজনেও উৎসাহ যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষরাত্রে উঠিয়া প্রাণায়াম ও কুম্ভক করি। অতি প্রত্যূষে হাতমুখ ধুইয়া আসনে বসি; বেলা ৭।। টা পর্য্যন্ত ত্রাটক্ সাধন করিয়া, মেজদাদার সঙ্গে চা পান করি। পরে ৯।। টা পর্য্যন্ত আবার নাম সাধন করিয়া কাটাই। ১০।। টার মধ্যে আমাদের স্নানাহার সব শেষ হইয়া যায়। তৎপরে স্থিরভাবে আসনে অপরাহ্ন ৪।। টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকি। স্কুলের কাজ সারিয়া মেজদাদা বাসায় ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় দিন শেষ হইয়া যায়। সন্ধ্যার পর রাত ৯।। টা পর্য্যন্ত বিশেষ আর কোন কাজ হয় না। আহারান্তে নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন করি। এইভাবে আমার সময় কাটিতেছে।

২য় স্বপ্ন— ফুলগাছের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

পৌষ সংক্রান্তি, ১২৯৫।

এই দুই বৎসরের মধ্যে আমি কোনও বৃক্ষের ডাল, পাতা, ফুল বা ফল ছিঁড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। জীবন্ত বৃক্ষের আমাদেরই মত অনুভব-শক্তি আছে— গোস্বামী মহাশয়ের মুখে ইহা শুনিয়া আমারও তদবধি ঐ বিষয়ে একটা দৃঢ়সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। গাছের ডাল-পাতা কাহাকেও ছিঁড়িতে দেখিলে ভাল লাগে না, বড়ই কষ্ট হয়। এমন কি, মেয়েরা যেখানে রান্নার জন্য তরকারী কুটেন সে স্থানেও থাকিতে পারি না। দেখিলে প্রাণে লাগে। মেজদাদা কতকগুলি ফুলগাছ বারান্দার ছাদে আমার কোঠার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই গাছগুলিকে আমি নিজ হাতে জল দেই। চাকরাণী জল দিতে চায়; কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর বারান্দার ছাদ আমাদেরই ছাদের একেবারে

সংলগ্ন; উভয় বাড়ীর এক ছাদ বলিলেই হয়; মধ্যে সামান্য ১।। হাত উচ্চ একটি প্রাচীর দ্বারা পৃথক্ করা আছে। পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টার শ্রীযুক্ত অধরবাবু পাশের বাড়ীতে থাকেন। তিনিও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ আনিয়া আমাদের ছাদের লাইন ধরিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুই ছাদের ফুলগাছের শোভা দেখিয়া বড়ই আহ্লাদ হয়। রাত্রি ৩টার সময়ে নাম করিতে করিতে একদিন নিদ্রাবেশ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম—আমাদের ফুলগাছে আমি জল দিতেছি; অধরবাবুর ছাদের ৩টি ফুলগাছ অকস্মাৎ নড়িয়া উঠিল এবং আমাকে ডাকিয়া খুব কাতরভাবে বলিল—'ওহে! আমাদের দিকেও একবার তাকাও। আমাদের অবস্থা দেখিয়া তোমার কষ্ট হয় না? জলপিপাসায় আমাদের যে প্রাণ যায়। তোমার হাতে একটু জল চাই। না হ'লে আমরা আর বাঁচিব না।' স্বপ্ন দেখিয়াই জাগিলাম। মনটি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। নাম করিয়া কোনমতে ভোর পর্য্যন্ত কাটাইলাম। সকালবেলা দেখি, সেই গাছ কয়টি বেশ সতেজ। ভাবিলাম 'এলোমেলো স্বপ্ন অনেক সময়েই তো দেখা যায়, ইহাও বোধ হয় তাহাই।' যাহা হউক, মনের ভিতরে একটা খট্‌কা লাগায় অধরবাবুর চাকরাণীকে সকলগুলি গাছেই খুব প্রচুর পরিমাণে জল দিতে বলিলাম। চাকরাণী তাহাই করিতে লাগিল। অপর বাড়ীর ছাদে যাইয়া নিজের হাতে জল দিতে আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইল। স্বপ্ন দেখার পর হইতে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া আমি ঐগাছ কয়টি দেখিয়া আসিতেছি। আজ চতুর্থ দিন, সকালে উঠিয়া দেখিলাম, আশ্চর্য্য ব্যাপার—এক রাত্রিতে সেই ৩টি তাজা গাছই একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে! এ কি অদ্ভুত ঘটনা, বুঝিতেছি না। কোন পারলৌকিক আত্মা আমার হাতে জলপ্রত্যাশায় এই ফুলগাছ কয়টি আশ্রয় করিয়াছিলেন কি না জানি না। গাছ কয়েকটির অবস্থা দেখিয়া অনুতাপে আমার অন্তর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমি গাছ ৩টির জীবনী-শক্তিকে উদ্দেশ করিয়া ৩ গণ্ডূষ জল উর্দ্ধদিকে ছিটাইয়া দিলাম। ইহাতে আমার প্রাণের জ্বালার কতক উপশম হইল।

৩য় স্বপ্ন— গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যাত্রা। গুরুনিষ্ঠার উপদেশ।

৮ই মাঘ, ১২৯৫, রবিবার।

আজ অধিক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বহুজনসমাকীর্ণ একটি বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। নদীর পারে, বাজারের ধারে, অসংখ্য নানারঙের ছোট বড় নৌকা দেখিতে পাইলাম। গোস্বামী মহাশয় একখানা প্রকাণ্ড বজরায় উঠিয়া সমস্ত শিষ্যবর্গকে তাহাতে তুলিয়া লইলেন। গঙ্গাসাগরে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য; গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্বকার বিশেষ বন্ধু কোনও একজন মহাত্মা আমাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার নৌকায় এস না? খুব আরামে যাবে। আমিও তো গঙ্গাসাগরেই যাইতেছি।' আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলাম না। তিনি শীঘ্র যাইবেন বলিয়া

ছোট নদীর সরল পথে নৌকা বাহিয়া চলিলেন। গোস্বামী মহাশয় সুবিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের অনুকূল স্রোতে বজরাখানা ছাড়িয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাতাসও আমাদের সহায় হইল। গোঁসাই, 'পাল'টি তুলিয়া দিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রকাণ্ড বজরাখানা শোঁ শোঁ করিয়া চলিল। গোঁসাইয়ের কথামত আমরা সকলেই এক একখানা বৈঠা হাতে লইয়া নৌকা বাহিতে লাগিলাম। কিন্তু অতি দ্রুতগামী নৌকায় বৈঠা ফেলিয়া চাপ দিবার আর অবসর ঘটিল না— বৈঠা জল স্পর্শ করিতে না করিতে নৌকা কোথায় ছুটিয়া যাইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় তখন খুব উৎসাহ দিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। বৈঠা তোলা-ফেলামাত্রই সার, ইহা বুঝিয়া আমরাও অবশেষে হাত গুটাইলাম। নদীর তীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই গঙ্গাসাগরের নিকটবর্ত্তী একটি চড়ায় পৌঁছিলাম। নৌকা সেখানে লাগান হইল। চড়ায় নামিয়া সকলে আনন্দের সহিত স্নানাহার করিলাম।

এই সময়ে দেখি সেই মহাত্মাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোজাসুজি শীঘ্র আসিবেন ভাবিয়া যে নদীপথ ধরিয়া আসিলেন, দুরদৃষ্টক্রমে তাহাতে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। প্রতিকূল স্রোতে ও উল্টা ঝট্‌কা বাতাসে তাঁহার নৌকাখানি বিষম বিপন্ন হইয়াছিল। গত্যন্তর না দেখিয়া, প্রাণপণে 'দাঁড়' টানিয়া, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি আসিয়া আমাদের বজরা ধরিলেন এবং তাঁহার সেই ছোট 'ডিঙ্গি' নৌকাটি উহাতেই বাঁধিয়া দিলেন। 'এখন নিশ্চিন্ত হইলাম' বলিয়া পরে তিনি আমার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ করিলেন। এদিকে গোঁসাইয়ের আদেশে আমাদের বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

আমি মহাত্মাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ভগবানকে লাভ করার সহজ উপায় কি?' সাধু বলিলেন—"ভগবানের যথার্থ নামে নিয়ত তাঁহাকে ডাক্‌লেই সহজে তাঁকে লাভ করা যায়"।

আমি। ভগবানের আবার যথার্থ নাম নকল নাম আছে নাকি?

সাধু। যে নামে ডেকে কেহ তাঁহার দর্শনলাভ করেছে তাঁর মুখে সেই নামই ভগবানের যথার্থ নাম।

আমি। বস্তু যত দিন অজ্ঞাত ছিল, তার একটা নাম হইবে কি প্রকারে? আগে, বস্তু, পরে তো নাম?

সাধু। কোন এক সময়ে ভগবানেরই বিশেষ কৃপায় এক শ্রেণীর লোক জন্মেছিলেন,যাঁরা তাঁরই কৃপায় তাঁকে লাভ করেছিলেন। তাঁরা সাধারণের জন্য, ভগবান্‌কে লাভ করার যে সকল উপায় নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন, আমাদের মাত্র তাই অবলম্বন। সহজে ভগবান্‌কে লাভ কর্‌তে হ'লে সে সকল প্রণালী অনুসরণ ব্যতীত আর উপায় নাই।

আমি। আমার এখন কি কর্ত্তব্য, ব'লে দিন। গুরুকরণ তো আমার হ'য়েছে; প্রণালীও পেয়েছি।

সাধু। তোমার আর চিন্তা কি? সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছ। তাঁর উপদেশ মত চল্‌লেই সহজে ভগবানকে লাভ কর্‌বে। তোমার গুরুদেবের কিছুই অজ্ঞাত নাই।

স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! মহাত্মারাও এইভাবে স্বপ্নযোগে দয়া করিয়া গুরুনিষ্ঠার উপদেশ দেন। জানি না কবে অবিচারে গুরুর আদেশ পালনে আমার মতি হইবে।

কষ্টহারিণী ও মুঙ্গের নামের সার্থকতা।

১১ই মাঘ,
বুধবার।

প্রায় প্রত্যহই মধ্যাহ্নে আহারান্তে কষ্টহারিণীর ঘাটে যাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া নাম করি। ঘাটটি বড়ই মনোরম। একটু সময় বসিলেই গঙ্গার হাওয়ার ও স্থানের প্রভাবে দেহমনের সমস্ত জ্বালাই যেন একেবারে নিবিয়া যায়, চিত্ত বিনা চেষ্টাতে আপনা আপনিই স্থির জমাট হইয়া পড়ে। গঙ্গার উপরে এমন সুন্দর ভজনস্থান আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ঘাটটি ঠিক যেন গঙ্গার মধ্যে রহিয়াছে। দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে গঙ্গার দৃশ্য অতি চমৎকার! সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকিবার জন্য ছোট ছোট ভজনালয় ঘাটের উপরেই রহিয়াছে। এ সব কুটীরে সর্ব্বদাই সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাটের উপরে কষ্টহারিণী প্রতিষ্ঠিতা। ইঁহারই নামে এই ঘাটের নাম কষ্টহারিণী হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও উদাসীনেরা এই স্থানে নির্ব্বিবাদে আপন আপন আসনে ভজনে নিবিষ্ট হইয়া আছেন। এই স্থানে আসিলে আর বাসায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। এ পর্য্যন্ত যে সব স্থান দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এই স্থানটি সাধন-ভজনের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। সাধু-সজ্জনদের ভজনগুণে এই স্থানে ভগবচ্ছক্তির এমনই একটি আশ্চর্য্য প্রভাব জাগ্রৎ রহিয়াছে যে, ঘাটে উপস্থিত হইলে যথার্থই অন্তরের সমস্ত সন্তাপ বিদূরিত হইয়া যায়। 'কষ্টহারিণী ঘাট' এই নামটি সার্থক বলিয়া অনুভূত হয়। শুনিতে পাইলাম, প্রাচীনকালে এখানে 'মঙ্গু' ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া শহরের নামও মুঙ্গের হইয়াছে।

৪র্থ স্বপ্ন— গুরুর আদেশ পালনে সঙ্কোচ।

১৭ই মাঘ,
১৯২৫

আজ ভোর রাত্রিতে আবার একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। সহস্র গুরুভ্রাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান স্নান করিতে একটি বাঁধান ঘাটে সমবেত হইয়াছি। সকলেই আপনার মনে স্নান করিতেছেন আমি ঘাটের সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এ সময়ে দেখি, গুরুদেব একদিক্‌ হইতে দ্রুতপদবিক্ষেপে শন্‌ শন্‌ করিয়া আসিতেছেন। উভয়

পার্শ্বে ও সম্মুখে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদেরই মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ধরিতেছেন ; তাঁহাদিগকে ধরিয়া কি বলিতেছেন বা কি করিতেছেন, কিছুই বুঝিলাম না। গুরুদেব ক্রমে যতই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, আমার ততই ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমাকেও ধরেন। অকস্মাৎ দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে সকলকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া আমাকেই ধরিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন—'শীঘ্র ন্যাংটা হও, তোমার সর্ব্বাঙ্গে আমি একবার হাত বুলা'য়ে দি। একটা দুর্লভ অবস্থা লাভ করবে।' গুরুদেব এই কথা বলামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, উপস্থ চঞ্চল হইল। হঠাৎ দুর্দ্দম কামের উত্তেজনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন গুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া বলিলাম—'আমাকে দু' মিনিট কাল একটু অবসর দিন, আমি স্থির হ'য়ে নি।' গোঁসাই পুনঃ পুনঃ ন্যাংটা হইতে বলিয়াও যখন দেখিলেন কথামত কাজ করিতে পারিলাম না, সঙ্কোচ করিতেছি, তখন বলিলেন—'এবার আর হ'লো না। তিন দিন পরে আমি আবার আস্‌ব।' এই বলিয়াই অমনি অদৃশ্য হইলেন।

আমিও জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্নটি দেখিয়া মন অত্যন্ত অস্থির হইল।

মুঙ্গেরের বিশেষত্ব।

প্রায় দুই মাস কাল মুঙ্গেরে বাস করিলাম। অনেক দিন হয় প্রচারক অবস্থায় গোস্বামী মহাশয় কিছুকাল এস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহের কন্যা সন্তোষিণীর মৃত্যু এই মুঙ্গেরে হয়। শুনিয়াছিলাম তখন তিনি শোকে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। "শোকোপহার" নামক একখানি পুস্তকে তিনি সেই সময়ের সমস্ত মানসিক অবস্থা বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছিলেন। এই মুঙ্গেরেই একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎকারে গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবনের আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। 'আশাবতীর উপাখ্যানে'ও গোস্বামী মহাশয় তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। এই স্থানের মহাতীর্থ কষ্টহারিণী যথার্থই যেন মানসিক সকল কষ্ট গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত করিয়া শান্তি প্রদান করেন। ঘাটের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। পশ্চাদ্দিকে কেল্লাটিও যেন একখানা সুন্দর ছবি মনে হয়।

দু'মাস কাল এখানে থাকিয়া সাধন-ভজনে বিশেষ উপকার অনুভব করিলাম।

ভাগলপুরে অবস্থান।

ফাল্গুন ও চৈত্র, ১২৯৫।

বি, এল্ পরীক্ষা দেওয়ার সুবিধার জন্য মেজদাদা মুঙ্গের হইতে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে বদ্‌লী হইলেন। আমি ভাগলপুরে আসিলাম। ভাগলপুরে এ অঞ্চলের স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার মদীয় ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় রহিলাম। ভাগলপুরও বড় ভাল লাগিল। মথুরবাবুর থাকিবার বাটীটি আরও মনোরম।

এই বাড়ী বর্দ্ধমানের মহারাজার, সুবিস্তৃতস্থানব্যাপী। খঞ্জরপুরে ঠিক গঙ্গার উপরে অবস্থিত। এইজন্য বাড়ীটির নাম 'পুলিনপুরী' হইয়াছে। পুলিনপুরীর সম্মুখস্থ রোয়াক্ প্লাবিত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনই আনন্দদায়ক। গঙ্গার উপরেই আমাদের থাকিবার ঘর হইল। কিছুদিন এখানে থাকিয়া খুব সাধন-ভজন ও সময়ে সময়ে সৎসঙ্গ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরে এখানেও আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল; বেদনাও অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।

অযোধ্যায় গমন। সাধুসঙ্গ।

বৈশাখ হইতে এক মাস, ১২৯৬।

সকলের পরামর্শমত আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া বৈশাখের প্রারম্ভে ফয়জাবাদে বড়দাদার নিকটে চলিয়া আসিলাম। অযোধ্যার ৫/৬ মাইল অন্তরে ফয়জাবাদে বড়দাদা শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী হাসপাতালের আসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন। প্রকাণ্ড হাসপাতাল ভূমির অন্তর্গত কম্পাউণ্ডের এক পাশে সুন্দর একখানা দোতালা বাড়ীতে দাদার বাসভবন। দাদার সঙ্গে আমি পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। হাসপাতালের কাজ বাদে অবশিষ্ট সময় দাদা ধর্ম্মালোচনা লইয়াই থাকেন। দাদার সঙ্গীরা সকলেই উচ্চপদস্থ ও ইংরাজী ধরণে সুশিক্ষিত হইলেও, সজ্জনাশ্রিত বলিয়া, নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মগতপ্রাণ। ইঁহারা ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বড়ই আনন্দ ও প্রাণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বড়দাদা কয়েকদিন ধরিয়া আমার রোগের অবস্থাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ঔষধাদিতে এ ব্যাধির উপশম অসম্ভব বুঝিয়া, সদাচারে স্বভাবের উপরেই থাকিতে পরামর্শ দিলেন। বেদনা একটু কম থাকিলে, সকালে-বিকালে আমি রাস্তায় একটু বেড়াইয়া থাকি। অযোধ্যা ফয়জাবাদে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্ত নাই। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—**মহাপুরুষেরা ছদ্মবেশে সর্ব্বত্রই বিচরণ করেন। কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যাদি তীর্থে অনেক সময়েই তাঁরা থাকেন। তাঁদের চেনা শক্ত। মুটে মজুরের বেশেও তাঁরা ঘুরে বেড়ান।** গুরুদেবের একথা স্মরণ করিয়া, প্রত্যহ দু'বেলা আমি পথে পথে ঘুরি এবং দু' পাশে ও সম্মুখে যাঁহাদের দেখিতে পাই মনে মনে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের কৃপায় ক্রমে এ সময়ে কয়েকটি মহাত্মার দর্শন পাইলাম। অযাচিতভাবে তাঁহাদের অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়া, অযোধ্যায় আগমন আমার সার্থক মনে হইতেছে। এখানে সাধন-ভজন করিতে খুব একটা ইচ্ছা হয়, মনটি যেন সর্ব্বদাই উদাস থাকে। এস্থানের সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ প্রভাবে, গুরুর প্রতিই চিত্তের আকর্ষণ ও নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়, দেখিতেছি।

কলিকাতায় গোঁসাই দর্শন । সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গবিবরণ।

কয়েক মাস এখানে থাকার পর গুরুদেবকে দেখিতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। এ সময়ে ভগবৎ কৃপায় পারিবারিক কোনও বিশেষ প্রয়োজনে দাদাও আমাকে বাড়ী পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। আমি বাড়ী রওনা হইলাম। কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায়ই আছেন। গুরুদেবের সঙ্গলাভের লোভে কয়েকদিন কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। ঝামাপুকুরে মেজদাদার বাসায় রহিলাম।

শ্রাবণ মাস, ১২৯৬

অদ্য অপরাহ্নে গোস্বামী মহাশয়ের দর্শন-মানসে বাহির হইলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীটের উপরে ছোট একখানা দোতালা বাড়ীতে তিনি রহিয়াছেন। শ্রীধর, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি শিষ্যগণ এবং গোস্বামী পরিবার সঙ্গে আছেন।

গোঁসাইয়ের কাছে পৌঁছিয়া দেখি, লোকে ঘর পরিপূর্ণ; ভক্তিভাজন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ গোঁসাইয়ের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। শিবনাথবাবু তাঁর একটি অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিলেন। গোস্বামী মহাশয় শুনিয়া বলিলেন,—**ষট্‌চক্রভেদী মহাত্মারা যে অবস্থায় থাকেন, শিবনাথবাবু উপাসনাকালে কখনও কখনও সহস্রারে অবস্থান ক'রে তাহা ভোগ করেন। এটি বড় সহজ নয়।**

গোস্বামী মহাশয় আমাকে দেখিতে পাইয়া, ডাকিয়া সম্মুখে নিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন,— **কি? তুমি অযোধ্যা থেকে এলে? ওখানে সময়ে সময়ে ভাল ভাল সাধু মহাত্মার দর্শন পেয়েছ তো?**

আমি। হ্যাঁ, কয়েকজন মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম।

গোঁসাই। **তাঁদের সম্বন্ধে যা যা তোমার জানা শোনা আছে বল।**

আমি সকলের সাক্ষাতে বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলাম।

ল্যাঙ্গা-বাবা।

ফয়জাবাদে আমি কয়েক মাস ছিলাম। এই সময় মধ্যে ৩/৪টি মহাত্মার দর্শন পাইয়াছি। আমার অযোধ্যা যাওয়ার পূর্ব্বে দাদার পত্রে ল্যাঙ্গা বাবার কথা শুনিয়া আপনাকে জানাইয়া ছিলাম। আপনি তখন বলিয়াছিলেন **"ইনি একজন খুব শক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ।"** ফয়জাবাদে যাইয়া আমি প্রথমেই এই মহাত্মাকে দর্শন করি। 'গুপ্তার ঘাট' হইতে ১।। কি ২ মাইল অন্তরে সরযূর পারে, জনমানবশূন্য সুবিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে ইনি থাকেন। রাশীকৃত মাটী পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত করিয়া দোলমঞ্চের ন্যায় তিনটি থাক্ করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ থাক্ সমতল ভূমি

হইতে প্রায় ৫০ ফিট্ উচ্চ হইবে। তাহারই উপরে মুক্ত আকাশের নীচে ল্যাঙ্গা-বাবার আসন। এই স্থান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত গাছপালার কোন সম্পর্ক নাই। চতুর্দ্দিকে ঘাসের ময়দান মাত্র দেখা যায়। গুপ্তার ঘাট বা ক্যান্টনমেন্টের নিকট হইতে ঐ দিকে তাকাইলে মোটা থামের উপরে বাবাজীকে একটি পক্ষীর ন্যায় দেখা যায়। উহার প্রায় দুই দিকেই সরযু নদী; অপর দু' দিকে ধূ ধূ প্রকাণ্ড মাঠ । এই মাঠ সরযূর চড়াও হইতে পারে। একটি সরু খাল সরযূর একদিক্ হইতে আসিয়া, ল্যাঙ্গা বাবার আসনস্থান বেষ্টনপূর্ব্বক অপরদিকে গিয়া আবার সরযূতেই মিশিয়াছে। উহাতে জল খুব অল্প থাকে। শুনিলাম—একবার এই খালের স্রোত বৃদ্ধি হওয়ায়, উহা, প্রশস্ত হইয়া ক্রমে ল্যাঙ্গা-বাবার আসনস্থানের নিকটবর্ত্তী হয়। তখন বাবাজী বারংবার খালটিকে বলিলেন ''মায়ি, ইধার মৎ আও।'' কিন্তু খালটি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে বাবাজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ! য়্যাসা? আচ্ছা, বন্ধ্ হো যাও।'. সেই হইতেই নাকি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শহরের লোকে সকলেই বলে, 'বাবাজী সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার বাক্যেই খালের ঐ দশা ঘটিয়াছে।'

শীত ও গ্রীষ্ম ফয়জাবাদে অত্যন্ত বেশী। পৌষ মাঘ মাসে কোঠাঘরের ভিতরেও শীতের সময়ে আগুন তাপিতে হয়; আবার গ্রীষ্মের সময়ে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা ৯টার পরে ঘরের বাহির হওয়া যায় না; ৫ মিনিট রৌদ্রে থাকিলেই মনে হয় যেন শরীর পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া গেল। ল্যাঙ্গা-বাবা ধূ ধূ ময়দানের মধ্যে অনাবৃত স্থলে দারুণ শীত গ্রীষ্মে কিছুমাত্র অবলম্বন না করিয়া কি প্রকারে উলঙ্গাবস্থায় অহর্নিশ থাকেন, ভাবিয়া অবাক হইলাম। লোকালয় হইতে এত তফাতেই বা কেন আসন করিলেন, জানিতে কৌতূহল জন্মিল। একদিন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার জীবনের অনেক কথা বলিলেন। শুনিলাম, তিনি বহুকাল তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে ফয়জাবাদে গুপ্তার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। লোকালয় হইতে দূরে থাকা তাঁহার নিয়ম বলিয়া এই ময়দানেই গিয়া তিনি আসন করিয়া বসেন। একদিন গভীর রাত্রে সম্মুখে ধুনী রাখিয়া নাম করিতে করিতে তন্দ্রাবেশে জ্বলন্ত আগুনের উপরে পড়িয়া যান, তাহাতে শরীরের কয়েকটি স্থান সাংঘাতিকরূপে দগ্ধ হইয়া যায়। বাবাজী পোড়া ঘায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাতরভাবে রামজীকে ডাকিয়া বলেন— 'হা রে রামজি, তোমার লিয়ে মৈঁ এৎনা কিয়া, আওর তু মেরা এহি হাল কিয়া!' বাবাজী এই কথা বলামাত্র দেখিতে পাইলেন আকাশপথে ভীষণাকার একটা কি যেন শোঁ শোঁ শব্দে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি বাবাজীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং বাবাজীকে সবলে ধরিয়া জ্বলন্ত আগুনের উপরে ফেলিয়া ঘষিতে লাগিল; অগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হইলে পর ধুনীর বিভূতি তুলিয়া বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিল। অতঃপর সেই শক্তিশালী নভশ্চর বলিল—'ইঁহাই রহ; আসন কভি মৎ ছোড় না। কোহি উপাধি পরশ নেহি করেগা। সিদ্ধ বন্ যাও।' বাবাজী সেই হইতে আসন ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। এজন্য বাবাজীর উপর ভয়ঙ্কর পরীক্ষাও গিয়াছে।

গোঁসাই বলিলেন—সে কি রকম?

আমি—বাবাজী যে ময়দানে থাকেন, ফয়জাবাদের ক্যান্টন্‌মেন্ট্ তাহারই এক পাশে। বিস্তৃত প্রকাণ্ড মাঠ বলিয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গোলন্দাজ সেনাদের গোলাবাজী সেই মাঠেই হইয়া থাকে। গোলাগুলি ছুঁড়িবার পূর্ব্বে ময়দানের সমীপবর্ত্তী গ্রামসমূহে নোটিশ দেওয়া হয়। দু'চার দিনের জন্য তখন সকলকেই অন্যত্র সরিয়া যাইতে হয়। একবার এইরূপ গোলাবাজীর পূর্ব্বে নোটিশ পড়িল। সকলে বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গেল, কিন্তু ল্যাঙ্গা-বাবা আসন ছাড়িলেন না। সরকারের তরফ হইতে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পুনঃপুনঃ বলা হইল। বাবাজী বলিলেন—"বাচ্চা লোক, খেলা কর্। আসন হামারা সিদ্ধ হ্যায়, ছোড়নে নেহি সেক্‌তে। কুছ্ হোগা নেই; তুম-সব খেলা কর্।" শুনিলাম অতঃপর সরকার হইতে অনেক ভয়ও প্রদর্শন করা হইল; কিন্তু বাবাজী আসন ছাড়িলেন না। পরে হুকুম হইল—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাবাজী না সরিলে তাঁহার মৃত্যুর জন্য সরকার দায়ী হইবেন না। যথাকালে গোলাগুলি ছোঁড়া আরম্ভ হইল—সমগ্র ময়দানটা অগ্নিময় হইয়া গেল, বাবাজী আপন আসনে স্থিরভাবে ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া রহিলেন। কর্‌নেল্ ক্রলী কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর দূরবীক্ষণদ্বারা এক একবার দেখিতে লাগিলেন বাবাজী জীবিত আছেন কি না। অসংখ্য গোলাগুলি ছোঁড়া হইতে লাগিল, এদিকে বাবাজী শুধু নিজের বামহস্তখানা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া রহিলেন। গোলাগুলি সমস্ত বাবাজীর দক্ষিণে, বামে ও মস্তকের উপর দিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু বাবাজীর কিছুতেই কিছু হইল না। ইহা দেখিয়া কর্‌নেল্ ক্রলী স্তম্ভিত হইলেন। পরে সব শেষ হইয়া গেলে, তিনি বাবাজীর নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে পুনঃপুনঃ সেলাম করিয়া বলিলেন—'বাবা, অলৌকিক শক্তির পবিচয় আজ তুমি যাহা দেখাইলে, এজীবনে তাহা ভুলিব না। আমি যতবার লক্ষ্য করিয়াছি ততবারই তোমাকে একই অবস্থায় স্থির থাকিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।' শুনিলাম, অলৌকিক ঘটনা সরকারের যে পুস্তকে লেখা থাকে তন্মধ্যে এই ঘটনাগুলি সাহেব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গোঁসাই। ল্যাঙ্গা-বাবা মহাশক্তিশালী পুরুষ; কামানের গোলায় তাঁর কি করবে? আজকাল ওরকম শক্তিশালী লোক বড় দেখা যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ওভাবে ল্যাঙ্গা-বাবার নিকটে কে এসেছিলেন? কে এসে তাঁহাকে সিদ্ধ করে গেলেন?

গোঁসাই। ভক্তরাজ মহাবীর এসেছিলেন। তাঁরই 'বরে' ল্যাঙ্গা-বাবা সিদ্ধ হন।

প্রশ্ন। মহাবীর এলেন কেন?

গোঁসাই। রামের নামে দীর্ঘনিশ্বাস। রামভক্ত মহাবীর কি স্থির থাক্‌তে পারেন? বাবাজী তোমাকে কিছু বললেন?

আমি। বাবাজীকে দর্শন করিতে আমি প্রায়ই যাইতাম। সাধারণতঃ বিশ্বাস ভক্তি লাভ হউক এই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিতাম। আশীর্বাদ চাহিলে বাবাজী চমকিয়া উঠিতেন; মাথায় হাত বুলা'য়ে খুব স্নেহের সহিত বল্‌তেন—"আরে তোম্ তো ভগবান্‌কা আশ্রয় লিয়া হ্যায়। গুরুজী তোম্‌রা বড়া দয়াল, বড়া দয়াল। মালিক তো ওহি হ্যায়। বিশ্বাস ভক্তি দেনেওয়ালা ওহি হ্যায়। পূরা বন্ যায়েগা। আনন্দ্, কর্, আনন্দ্ কর্।"

বাবাজীর শরীরের চর্ম্ম হাতীর চামড়ার মত দৃঢ় ও খস্‌খসে। দেখিতে কুস্তিগীর পালোয়ানের মত বীরপুরুষ।

পতিতদাস বাবাজী।

ফযজাবাদে যাইয়াই দাদার মুখে শুনিলাম—বহুকালের একটি প্রাচীন মহাপুরুষ অযোধ্যার পথে কোনও একটি নির্জ্জন কুটীরে আছেন; কিন্তু তাঁহার দেখা পাওয়া বড় কঠিন। পূর্ব্বে কখনও কখনও একক্রমে ছয় মাস কাল তিনি একাসনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ থাকিতেন; অপর ছয়মাসের মধ্যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণে তাঁহার দর্শন পাইত। আজকাল তিনি তিন মাস অন্তর তিন মাস সমাধিতে থাকেন। আমি লোক পরম্পরায় জানিলাম বাবাজী এখন সমাধিতে নাই; সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে ব্যস্ত হইলাম। দাদা আমাকে বাবাজীর দর্শনে যাইতে পুনঃপুনঃ বাধা দিতে লাগিলেন; কারণ বাবাজীর ভজন-কুটীরের দ্বার প্রায়ই বন্ধ থাকে এবং নিজ হইতে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক না হইলে সচরাচর কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। যাহা হউক, অতঃপর আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া দাদা আমাকে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং আমি উৎসুকচিত্তে বাবাজীর দর্শনে বাহির হইয়া পড়িলাম। ফয়জাবাদ হইতে অযোধ্যা যাইতে প্রকাণ্ড ময়দানের সম্মুখে রাস্তাটি দুই দিকে গিয়াছে। একটি দক্ষিণে দেওকালীর দিকে, অপরটি বামে রাণুপালীর দিকে। এই রাণুপালীর রাস্তার বামপার্শ্বেই বাবাজীর আশ্রম।

আমি ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখি বাবাজীর ভজন-কুটীরের দ্বার বন্ধ; বাবাজীকে উদ্দেশ করিয়া বাহির হইতে আমি একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মাথা তুলিতেই দেখি বাবাজী দরজা খুলিয়াছেন। আমাকে খুব সস্নেহে ডাকিয়া বলিলেন— 'আও বাচ্চা, আও, ইহাঁ বৈঠো। থোড়া আগাড়ী হামারা মালুম পড়া, তোম্ ইহাঁ আওগে, তব্‌সে হাম্‌ভি তোমারা ওয়াস্তে বৈঠা রহা!' বাবাজী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এক একবার শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ। ধন্য হো গিয়া! ধন্য হো গিয়া! দুর্লভ সদ্‌গুরুকা আশ্রয় পায়া! ধন্য হো গিয়া!" বাবাজীর উচ্ছ্বাস একটু কমিলে আমি বলিলাম—'বাবা, আমার কল্যাণ কিসে হইবে?' বাবাজী খুব উল্লাসের সহিত আমার মাথায়

হাত বুলাইয়া বলিলেন—'আউর্ ক্যা বাচ্চা? সব্ তো পূরণ হো গিয়া। ওহি কালাকো ধ্যান্ কর্।' অনেকক্ষণ বাবাজীর নিকটে বসিয়া ছিলাম। তিনি অবিশ্রান্ত, কেবল কাঁদিলেন, আর থামিয়া থামিয়া ঐ একই কথা বলিতে লাগিলেন। বাবাজীর শরীরটি খুব প্রাচীন, বয়স প্রায় দেড়শত বৎসর; আকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, মুখটি গোলাপের মত লাল, দাড়িগোঁফ চুল সমস্তই সাদা; হাতপায়ের নখগুলি লম্বা হইয়া বঁড়শীর মত বাঁকিয়া গিয়াছে। কথায় কথায় টস্ টস্ করিয়া চক্ষের জল পড়ে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

গোঁসাই বলিলেন— **"পতিতদাস বাবাজী তান্ত্রিক সাধন ক'রে সিদ্ধ। ইনি মহাপ্রেমিক। তান্ত্রিক সাধন করেও, দেখ লোক কেমন প্রেমিক হয়। এ সব লোকের দর্শন সহজ নয়। রঙ্গমহলে হনুমান গৌড়িতে কোন সাধুর দর্শন পেয়েছ?"**

গোপালদাস বাবা।

একদিন অকস্মাৎ একটি সাধু আসিয়া দাদাকে বলিলেন, "বাবু সাহেব, রঙ্গমহলে একটি সাধু কাণের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন। আপনাকে জানাইলাম; এখন তাঁহাকে দেখা না দেখা আপনার ইচ্ছা। সাধুর টাকা পয়সা নাই। আপনার 'ভিজিট' বা অযোধ্যা যাওয়া আসায় গাড়ীভাড়া তিনি দিতে পারিবেন না।" দাদা এ কথা শুনামাত্র সাধুর নিকট যাইতে অস্থির হইলেন; অমনি একখানা গাড়ী আনাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যা রওনা হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা যথাস্থানে পৌঁছিলাম এবং রঙ্গমহলে অনেকগুলি কামরা ঘুরিয়া আমরা একটা অন্ধকার কুঠুরীতে প্রবেশ করিলাম। ঐ ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী মাটীর নীচে একটি গোফা হইতে একজন বৃদ্ধ সাধু বাহির হইয়া আসিলেন। কাণের ভিতরে তাঁহার অনেক ময়লা জমিয়াছিল; দাদা তাহা বাহির করিয়া দিতে যন্ত্রণার উপশম হইল।

বাবাজীকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। শরীর অতিশয় কৃশ, মনে হয় যেন অস্থির উপর চর্ম্মমাত্র রহিয়াছে। চর্ম্মের রং অস্বাভাবিক সাদা—ঠিক দুধের মত। মুখশ্রী কিন্তু বেশ পুষ্ট, খুব উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ। সর্ব্বদা ঈষৎ হাসি মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, বাবাজীর বয়ঃক্রম দেড়শতেরও অধিক। কতকাল যাবৎ যে তিনি ঐ অন্ধকার গোফাতে আছেন, রঙ্গমহলের বৃদ্ধ সাধুরাও তাহা জানেন না। তিনি সমস্ত দিবসে একবারমাত্র, শেষ রাত্রিতে, শৌচার্থ বাহির হন। রঙ্গমহলের সাধুদের বৎসরে একবার দর্শন ঘটিয়া উঠে না। সর্ব্বদাই তিনি এই গোফার মধ্যে অবস্থান করেন। আসিবার সময়ে বাবাজীকে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিলাম। বাবাজী করজোড়ে গদ্গদভাবে কহিলেন, "রামজী বড়া দয়াল, বড়া দয়াল! উন্‌হিকা নাম লেকে উন্‌হিকা স্থানমে পড়া রহা হ্যায়। আব্ যো করে রামজী। বাচ্চা, বহুৎ ভাগ্‌মে রামজীকা আশ্রয় পায়া। আব্ নাম করো, আওর্ আনন্দ্ করো।"

তুলসীদাস বাবা।

আমি আবার বলিতে লাগিলাম—অযোধ্যাতে সরয়ূর তীরে একটি মন্দিরে বাবা তুলসীদাস থাকেন। অযোধ্যার বর্ত্তমান সাধুদের মধ্যে ইনি খুব প্রসিদ্ধ। দর্শন করিতে যাইয়া দেখি, বাবাজী নামজপে মগ্ন হইয়া আছেন। সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে বহু লোক স্থিরভাবে বসিয়া বাবাজীকে দর্শন করিতেছেন, কিন্তু বাবাজীর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এক একবার যেন তন্দ্রা হইতে চমকিয়া উঠিয়া সকলের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করিতেছেন, আবার ঢুলিয়া পড়িতেছেন। বাবাজী দাদাকে দেখিয়া খুব আদর করিয়া সম্মুখে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং খুব প্রসন্নমুখে 'আনন্দ্ হ্যায়?' জিজ্ঞাসা করিয়া আবার জপে মগ্ন হইলেন। বাবাজী মালা জপ করেন; কিন্তু মালার সঙ্গে মাত্র করেরই সম্বন্ধ, মনে হইল; মনটি যেন কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। বাবাজী কাহাকেও নাকি কোনও উপদেশ দেন না। শুধু 'নাম কর, নাম কর' এইমাত্র বলেন।

অন্ধ বাবাজী।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—**আর কোথাও কাহাকে দেখ্‌লে?**

আমি। ফয়জাবাদে বেগমগঞ্জে গোপনে একটি মহাত্মা আছেন—জেল দারোগা নন্দবাবু আমাকে জানাইলেন। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাধু বাবার নিকট লইয়া গেলেন। এই সাধুটিও খুব বৃদ্ধ; পূর্ব্বে তিনি এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষম অনর্থের সূচনা দেখিয়া ইনি পলায়ন করেন। পথে কোনও আকস্মিক বিপদে ইঁহার দুইটি চক্ষুই নষ্ট হয়। একটি ভদ্রলোকের কৃপায় পরে ইনি অযোধ্যাতে আসেন, তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া বহুকাল সাধন-ভজন করিয়া আসিতেছেন। শুনিলাম ইনি অগাধ পণ্ডিত। বহু শাস্ত্র-পুরাণ-দর্শনাদি ইঁহার কণ্ঠস্থ। বাবাজী আমাকে বলিলেন— 'কঠোর সাধন ও তীব্র বৈরাগ্য না হ'লে কিছুই হয় না। চর্ম্মচক্ষু না থাকিলে কোনও ক্ষতি নাই। সাধনপ্রভাবে দেবদেবীদর্শন, চিত্রদর্শন, জ্যোতিদর্শনাদি সমস্তই হয়। সদাচারে থাকিয়া গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রণালী অনুসারে কেহ সাধন-ভজন করিলে, গুরুর কৃপায় ইহলোক-পরলোক তাহার এক হইয়া যায়।' দর্শন-বিজ্ঞানদ্বারা বাবাজী এসকল কথার প্রমাণ দিতে লাগিলেন।

গোঁসাই বলিলেন—**অযোধ্যাতে হনুমান-গৌড়ি বড়ই জাগ্রত স্থান। ওখানে প্রায়ই মহাপুরুষেরা আসেন। কিন্তু তাঁরা আপনা হ'তে পরিচয় না দিলে কেউ তাঁদের ধর্‌তে ছুঁতে পারে না। গুপ্তার ঘাট, হনুমান-গৌড়ি এই দু'টি স্থানই এখন পর্য্যন্ত ঠিক আছে। প্রাচীন অযোধ্যার আর সবই সরযূ গ্রাস করেছেন।**

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে কতাবার্ত্তার পরে আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া, এইরূপে তাঁহার সঙ্গলাভ প্রত্যহ করিতে লাগিলাম।

যোগজীবন ও শান্তিসুধার পরিণয়োৎসব।

গত কয়েক মাস আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে ছিলাম না। সুতরাং তৎকালীন তাঁহার কার্য্যকলাপের বিবরণ আমার এ ডায়েরীতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও গেণ্ডারিয়ায় কিছুকাল থাকিয়া গুরুভ্রাতাদের মুখে যাহা যাহা শুনিলাম, তাহা সংক্ষেপে এস্থানে লিখিয়া রাখিতেছি। যদি কখনও গোস্বামী মহাশয়ের নিজমুখে ঐসকল কথা শুনিতে পাই, বিস্তারিতরূপে লিখিয়া যাইব।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পুত্র ও কন্যা শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর পরিণয়-কার্য্য শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্রের সহিত ১২৯৫ সনের ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার সম্পন্ন করিয়াছেন। আধুনিক ভাবের সুশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন কোন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে উহাদের বিবাহ দেওয়া গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু স্বীয় গুরু পরমহংসজীর আদেশে তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া স্বজন ও নিজ পরিবারবর্গের ঘোর প্রতিবাদ এবং আপত্তি সত্ত্বেও এ কার্য্য আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। জামাতা পূর্ব্বেই গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারেই এই বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গোঁসাইজীর ভক্ত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন, 'এখন আর অন্যমতে বিবাহ দেওয়া কেন? হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানে ঋষিদের গন্ধ আছে, অতএব হিন্দুমতে বিবাহ দিলে হয় না?' গোস্বামী মহাশয় তাহাতে বলিলেন, "ভাল কথা", কিন্তু দুই দিন পরেই তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, **আমি বুঝে দেখলাম যে হিন্দুমতে ইহাদের বিবাহ হ'তে পারে না। ব্রাহ্মণের একটি সংস্কারও যোগজীবনের হয় নাই; জগদ্বন্ধু নানারূপ অনাচার ক'রেছে। ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া কঠিন, আর তাহার সময়ই বা কোথায়? তোমারা কিছু মনে ক'র না। ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে, রেজিষ্ট্রী ক'রে ইহাদের বিবাহ দিতে হবে।**

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় যথাক্রমে গোঁসাইজীর পুত্র ও কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন; বিবাহস্থলে গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; গার্হস্থ্য ধর্ম্মসম্পর্কে তিনি যে সকল অপূর্ব্ব সারগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি একবৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনের আদেশ করিলেন। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে এতদুপলক্ষে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ের রঘুবর বাবার এবং অপর কয়েকজন সিদ্ধপুরুষের আগমন হইয়াছিল। বিবাহের পর দিন রেজেষ্ট্রী হয়। এই বিবাহে সাধু-সজ্জনের সমাগমে কয়েকদিন আনন্দোৎসব

চলিয়াছিল, এবং তাহাতে শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের কয়েকটি লোকবিস্ময়কর যোগৈশ্বর্য্য অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহা প্রমাণ সহিত ভবিষ্যতে লিখিতে আমার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীধরের পাগলামী ও ঠাকুরের শাসন।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অবস্থানকালে কিছুদিন শ্রীধরের পাগলামী অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে সময়ে গেণ্ডারিয়াবাসী সকলেই তাঁহার লোকাচারবিরুদ্ধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, গর্হিত অনুষ্ঠানে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছিলেন। অহর্নিশি উদ্বেগগ্রস্ত কতিপয় অসহিষ্ণু লোক শ্রীধরের উৎপাত একেবারে শান্ত করিতে বিষম ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। গোস্বামী মহাশয় সে সকল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিদারুণ চক্রান্ত স্বতঃই জানিতে পারিয়া, উহা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করিতে ভক্ত শ্রীধরের উপরে ভয়ঙ্কর কঠোর শাসন করিয়াছিলেন; এমন কি, শ্রীধরকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য, গেণ্ডারিয়ার সকলকে উহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে এবং আহার না দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীধর, কখনও বা অনাহারে, কখনও বা স্নেহময়ী শ্রীযুক্তা যোগমায়া ঠাকুরাণীর গোপনে প্রদত্ত দুই এক মুষ্টি অন্ন আহারে, গাছতলায় পড়িয়া থাকিয়া, কোনপ্রকারে দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন না। দণ্ড অতিশয় তীব্র হওয়াতেই শ্রীধর বাঁচিয়া গেলেন। শ্রীধরের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার শত্রুগণের দয়া হইল। তাঁহারাই শেষে গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া এ যাত্রা শ্রীধরকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ধূলটোৎসব।

(আমার অনবধানতা প্রযুক্ত নিম্নলিখিত ঘটনাটি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে পারি নাই।)

একরামপুরের বাসায় একদিন গোস্বামী মহাশয় কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'**এবার ধূলট উৎসব করিলে হয়।**' গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেই ধূলট উৎসবের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথি মাঘী-সপ্তমীতে শান্তিপুরে প্রতি বৎসর প্রায় একমাস কাল এই উৎসব হইয়া থাকে। দোলের সময় ফাগ যে ভাবে ব্যবহার হয়, এই উৎসবে সংকীর্ত্তনকালে রাস্তার ধূলিরাশি সেইরূপে উড়ান হয় বলিয়া ইহার নাম 'ধূলট' হইয়াছে।

কয়েকদিন পরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের একদিন নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ভোজনান্তে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় মহাশয় বলিলেন, 'ঠাকুর যখন ধূলটের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এই উৎসব করাই চাই। ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সকলে কিছু কিছু করিয়া দিন।' তখনই অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল এবং গোস্বামী মহাশয়কে জানান হইল

যে এবার ধূলট করা হইবে। এই সময়ে শ্রীহট্ট হইতে অন্ধ বাবাজী আসিয়া ঢাকাতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের আবাসেই অবস্থানপূর্ব্বক সুমধুর গান-বাজনার মাধুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী পদাবলী গান করিতে করিতে আশ্চর্য্য প্রকারে নিজেই খোল ও করতাল চিৎ করিয়া রাখিয়া অপর খানা বাহুতে ঝুলাইয়া দেন, পরে খোলের তালের সঙ্গে সঙ্গে বাহু নাড়ার কৌশলে করতালও তালে তালে বাজিতে থাকে। ধূলট উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই অন্ধ বাবাজীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-গানে আশ্রমে সর্ব্বদাই আনন্দোচ্ছ্বাস চলিতে লাগিল।

এদিকে মাঘী-সপ্তমী তিথি আসিয়া পড়িল। বেলা প্রায় আটটার সময়ে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু, বিধুবাবু এবং প্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি বাসার অপর পার্শ্বের কদমতলায়* গোঁসাইকে সম্মুখে রাখিয়া গান আরম্ভ করিলেন—

হরি বল্‌ব মুখে, যাব সুখে ব্রজধাম
কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম।—ইত্যাদি

গোস্বামী মহাশয় রাস্তায় পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়াই দুই হস্তে ধূলি লইয়া 'জয় সীতানাথ', 'জয় সীতানাথ' বলিতে বলিতে উহা চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শক্তি-সংযুক্ত ধূলির সংস্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেরই ভিতরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ভাবোন্মত্ত অবস্থায় হুঙ্কার, গর্জ্জন ও ধূলি উৎক্ষেপণপূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে গোঁসাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে কয়েকদল কীর্ত্তন অকস্মাৎ আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিল। তখন মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি সংকীর্ত্তন-কোলাহলে মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী মহাশয় উচ্চ উচ্চ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া চলিলেন কিন্তু ভাবাধিক্যহেতু কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই তিনি রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে উচ্ছ্বাস আনন্দের এক হুলস্থূল কাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রবল ভাবের প্রঘূর্ণ তুফান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অপূর্ব্ব ধূলিরাশির সংস্পর্শে দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মুটে মজুর, ব্যবসাদার প্রভৃতি যিনি যে অবস্থায় ছিলেন রাস্তার উভয় পার্শ্বে ভাবাবেশে তিনি সেই অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিয়া গেলেন। কোন কোন অট্টালিকার উপরে মহিলারা দিশাহারা হইয়া সংকীর্ত্তন স্থলে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, শিশুগুলিও স্থানে স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

---

* কথিত আছে যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীযুক্ত বীরভদ্র ঠাকুর ঐ স্থানে একটি কদমগাছের তলায় তাঁহার আসন স্থাপন করিয়া কিছুকাল সাধন-ভজন করেন। সময়ে ঐ পুরাতন কদম্ব বৃক্ষ নষ্ট হইলে সেই স্থানেই অন্য একটি কদম্ব বৃক্ষ জন্মিল। এই ভাবে অদ্যপি বীরভদ্রের আসন-স্থান রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

এই মহাসংকীর্ত্তন এতই ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, যে, পাঁচ সাত মিনিটের পথ শ্রীবিহারীলালজিউর মন্দিরে উপস্থিত হইতে তিন ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। এই প্রকারে সংকীর্ত্তন সূত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙ্গালাবাজার, পটুয়াটুলি, শাঁখারিবাজার এবং লক্ষ্মীবাজার ঘুরিয়া অপরাহ্ন তিনটার সময়ে একরামপুর আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বাটীর দ্বারে অন্ধ বাবাজী আসিয়া গান ধরিলেন—'নগর ভ্রমণ ক'রে আমার গৌর এলো ঘরে, আমার নিতাই এলো ঘরে'— এই সময়ে উদ্দীপিত ভাবের অভিনব উচ্ছ্বাসে সকলেই পুনরায় উন্মত্তবৎ হইলেন! এইভাবে বহুক্ষণ চলিয়া গেল। ক্রমে সংকীর্ত্তন থামিলে জনসমূহ ঢুলু ঢুলু অবস্থায় শান্তভাব ধারণ করিল।

এই বিচিত্র ভাবোন্মাদকারী ধূলটোৎসবের নগর-সংকীর্ত্তনে ঢাকাবাসীরা অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিল। একটি অল্পবয়স্ক বালক ১০।১২ ঘণ্টা কাল সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় থাকায় তাহার পিতামাতা উহার জীবনাশায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা গোঁসাইয়ের নিকটে আসিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় তখন তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া স্পর্শমাত্রে ছেলেটিকে সুস্থ করিয়া চলিয়া আসিলেন। আর একটি জগন্নাথ স্কুলের ১৪।১৫ বৎসরের ছাত্র ধূলটোৎসবের সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশে এতই মাতিয়া গেল যে ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত সে থাকিয়া থাকিয়া রাস্তায় রাস্তায় 'আমারই কৃষ্ণ কই', 'আমার কৃষ্ণ কই' বলিয়া কাঁদিয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত থাকিত। ছেলেটির নাম শ্রীঅশ্বিনীকুমার মিত্র। বাড়ী বিক্রমপুর। উহার আত্মীয়স্বজনগণ, দীর্ঘকালব্যাপী এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া কাতরভাবে উহার প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোঁসাই বলিলেন—**"ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকটে থাকিলে এই ছেলেটির ভাবের আদর হইত। সে যাক্; হুগলীজেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে একটি ভদ্রলোকের কুলবধূর হরিসংকীর্ত্তনে এইপ্রকার ভাব হ'য়েছিল। বাড়ীর সকলেই তাতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন কোন যাজনিক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট বউটিকে খাওয়াইয়া দিন, ভাব ছুটিয়া যাইবে। গৃহস্বামী ঐ প্রকার করাতে বউটির ভাবাবেশ ছুটিয়া গেল।"**

শুনিলাম অশ্বিনী সম্বন্ধেও নাকি ঐ প্রকার করায় তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় এই মহাসংকীর্ত্তনে প্রধান গায়ক ও বাদক ছিলেন। কি শক্তিপ্রবাহে তিনি অবিশ্রামে উৎসাহের সহিত ছয় ঘণ্টাকাল গান-বাজনা করিয়াছিলেন ভাবিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই কুঞ্জবাবুকে এক দিবস গোস্বামী মহাশয় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—**'সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন ক'রে মহাপ্রভু যে সুখ অনুভব করেছিলেন, আজ ইঁহার স্পর্শে আমি সেই সুখ লাভ করিলাম।'**

লালের যোগৈশ্বর্য্যে গুরুভ্রাতৃগণের মুগ্ধতা।

শান্তিপুরনিবাসী বালক সাধক লালবিহারী বসুর জাতিস্মরত্ব ও ধর্ম্মজীবনের আশ্চর্য্য উৎকর্ষ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে উঁহার প্রবীণতা ও যোগৈশ্বর্য্য চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। গুরুভ্রাতারা অনেকে উঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিও যেন দৃষ্টি করিতে তেমন অবসর পাইতেছেন না। গোস্বামী মহাশয় সাধনসিদ্ধ, আর লাল নিত্যসিদ্ধ—এইপ্রকার সংস্কারও কাহারও কাহারও মনে জন্মিয়াছে। লালের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিপত্তি গুরুভ্রাতাদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় কাহারও কাহারও গুরুনিষ্ঠার খর্ব্বতা ও শোচনীয় পরিণামের সূত্রপাত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পুনরাগমন।

অগ্রহায়ণের ১ম সপ্তাহ; ১২৯৬।

কলিকাতায় কিছুদিন থাকিয়া বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে আমার বেদনারোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং সেখানে আর অধিককাল বিলম্ব না করিয়া আবার ভাগলপুরে চলিয়া আসিলাম।

খঞ্জরপুর পুলিনপুরীতে ঠিক গঙ্গার উপরে আমার থাকার ঘর। যতকাল রোগ আরোগ্য না হইবে এই স্থানে থাকিব, সঙ্কল্প করিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়া হওয়াতে এত কালের ডায়েরী লেখার উৎসাহ একেবারে নিবিয়া গেল। আমার কুৎসিত জীবনের চিত্র আঁকিয়া কোন লাভই নাই; বরং যিনি তাহা দেখিবেন তাঁহার অপকারের আশঙ্কা আছে। যদি গুরুদেবের দুর্লভ সঙ্গ কখনও আমার আবার লাভ হয়, তখন প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সেই তীর্থস্বরূপ পাবন লীলা ডায়েরীতে লিখিয়া কৃতার্থ হইব। আজ হইতে আমার ডায়েরী লেখা বন্ধ করিলাম।

বহুদিন পরে ডায়েরী লেখার প্রবৃত্তি।

মাঘ মাসের প্রথম ভাগ, ১২৯৬।

আজ বহুকাল হইল নিয়মিতরূপে ডায়েরী লেখা বন্ধ করিয়াছি। এই এক বৎসরে কত প্রকার অবস্থা আসিল গেল, ভাবিলে স্বপ্ন মনে হয়। গুরুদেবও বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় ডায়েরী লিখিতে আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। এখন তাহা স্মরণ করিয়া কষ্ট হয়। আমার কলুষপূর্ণ জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা যে কি, তাহা আমি জানি না। তবে মনে হয় আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা আলোচনায় আমারই হয়ত কোনকালে কল্যাণ হইবে।

সময়ে সময়ে স্বভাবের বিশেষ বিকৃতি ও চরিত্রের চঞ্চলতা দেখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হয়। চারিদিকেও দেখিতেছি যাঁহারা পরম পবিত্র নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া এক সময়ে দেশমান্য ছিলেন, অবস্থায় পড়িয়া তাঁহারাও কালক্রমে অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গত জীবনের তুলনায় আমার এ জীবন কি ছার! অতি তুচ্ছ ভাবিয়া যে সকল সামান্য প্রলোভনকে সাধারণ লোকেও অগ্রাহ্য করে, দেখিতেছি মহাতেজস্বী পবিত্রাত্মা ব্যক্তিরাও বিধির চক্রে পড়িয়া তাহাতে ঘুরপাক খাইতেছেন। সুতরাং আমার আর ভরসা কি? যতই ভাল হই না কেন, পতিত হওয়া খুবই সহজ; অথচ পতিত হইলে আবার স্বস্থানে আসা সহজ নয়। আমি নিশ্চয় জানি, যতদিন আমার গুরুদেবের মমতাপূর্ণ পবিত্র মূর্ত্তি আমার অন্তরে জাগরুক থাকিবে, তাঁহার স্নেহদৃষ্টি আমার স্মৃতিতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন আমার পতন নাই; মহাত্মাদের বাক্যে অবিশ্বাস ও গুরুদেবের কৃপা-বিস্মৃতিই আমার অধঃপতনের হেতু হইবে। নিজেকে বড় মনে করিয়া যখন সকলকেই তুচ্ছ করিব, তখন আর আমার উন্নতি কি প্রকারে হইবে? কিছুকাল যাবৎ এইসব চিন্তায় আমি বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। কিন্তু এইরূপ দুর্গতি ও অবনতি ঘটিলে, হয়ত এই ডায়েরী আমার চেতনা সম্পাদন ও সদগতির হেতু হইবে। আমার নিজ জীবনের যথার্থ ঘটনা তো আর আমি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিব না। এই মলিন আবর্জ্জনাময় জীবন পঙ্কে আমার দয়াল গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টিতে সময়ে সময়ে যে মনোহর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, এই ডায়েরী তাহা এক সময়ে আমার চক্ষের সমক্ষে আনিয়া ধরিবে। দুর্দ্দিনে গুরুদেবের স্মৃতি এই ডায়েরীই আবার ফুটাইয়া তুলিবে, এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, আবার ডায়েরী লিখিতে সংকল্প করিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া, বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, এবারে আবার জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎসঙ্গলাভ। গঙ্গামাহাত্ম্য ও তর্পণে আস্থা।

ভাগলপুরে আসিয়াও আমার রোগের যন্ত্রণা কমিল না। মনে একটা ধারণা জন্মিল, আর অধিক দিন বাঁচিব না। সংসারে আসা আমার বৃথা হইল; আকাঙ্ক্ষামত ভগবানের নাম করিতে পারিলাম না। এইরূপ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় আমার বিষম অশান্তি হইতে লাগিল। আমি তখন নির্দ্দিষ্ট একটা নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া সারাদিন কাটাইতে লাগিলাম।

গুরুদেবের কৃপায় ভজনানন্দী সৎসঙ্গীও আমার সহজেই লাভ হইল। শুনিয়াছিলাম ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিমোহন চৌধুরী মহাশয় গুরুদেবের নিকটে সন্ন্যাসের কতকগুলি নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী উদাসীর

মত পদব্রজে বহুদেশে পর্য্যটন করিয়া, কিছুকাল হয় তিনি এই ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; পথে পথে তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তনে ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া জনসাধারণের প্রাণে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। ভাগলপুরের হরিসভায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে স্বামীজীর অসাধারণ ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সকলেই তখন স্বামীজীকে ভাগলপুরে কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। জনৈক প্রসিদ্ধ উকীল খুব আদর যত্ন করিয়া স্বামীজীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। ইংরাজীশিক্ষিত লোকের ভগবানের নামে মহাভাব হয়, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, ভাগলপুরের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহারা স্বামীজীকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া স্বামীজীর নাম সহরের সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এক দিবসের অধিককাল স্বামীজীর কোথাও থাকিবার নিয়ম নাই; তাঁহার উপরে গুরুদেবের এটি বিশেষ আদেশ। কিন্তু হরিসঙ্কীর্ত্তনের লোভে মত্ত হইয়া স্বামীজী ঐ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ফেলিলেন। "আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার বিধি-নিষেধ কি?" এইরূপ ধারণায় স্বামীজী গুরুবাক্য উড়াইয়া দিয়া উকীলবাবুর বাড়ীতে আসন করিলেন। একদিকে প্রত্যহ হরিসঙ্কীর্ত্তনে ভাবাবেশের উচ্ছ্বাসে যেমনই তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনই কুসংসর্গে পড়িয়া মাংস ও উচ্ছিষ্টাদির সংস্রবে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, ভিতরে ভিতরে দিন দিন মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন স্বামীজী অর্দ্ধক্ষিপ্ত অবস্থায় হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"ভাই, আমাকে রক্ষা কর। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সন্ন্যাসভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব আমাকে যে অবস্থা কৃপা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমার ছুটিয়া গিয়াছে। হায়, হায়! আমি একটি নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নিত্য আমার নিকটে নূতন নূতন দৃশ্য প্রকাশিত হইত। দর্শনের দিক্ আমার এতই পরিষ্কার হইয়াছিল যে, সারা দিনে আধ ঘণ্টা সময়ও দর্শনের একটা কিছু না পাইলে অস্থির হইতাম। সংকীর্ত্তনে এই দর্শন আরও পরিস্ফুট হইত; সুতরাং কোথায় সঙ্কীর্ত্তন? কোথায় সঙ্কীর্ত্তন বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'নিয়ত নাম করিও, এই নামেই সব হবে।' কিন্তু ইষ্টনাম অপেক্ষাও আমার সঙ্কীর্ত্তনের ঝোঁক বেশী হইল। এই সঙ্কীর্ত্তনের লোভেই গুরুবাক্য ও সন্ন্যাসের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া উকীলবাবুর বাড়ীতে আসন করিলাম। কীর্ত্তনে নিত্য নূতন দর্শন হইবে এই লোভে গুরুদেবের একটিমাত্র আদেশ লঙ্ঘনেই আমি বিপন্ন হইয়াছি। একটি আদেশ লঙ্ঘনেই সঙ্গে সঙ্গে দশটি নিয়মে শিথিলতা আসিয়া পড়িল। পরে, অনাচারে স্বেচ্ছাচারে সবই ক্রমে হারাইয়াছি। কিছুদিন যাইতে না যাইতে আমার সঙ্কীর্ত্তনের সে ভাব ভক্তিও শুকাইয়া গেল। এখন কীর্ত্তনে যাওয়া বন্ধ করিয়াছি; আমার সে ভাব নাই, আমার প্রতি এখন আর কাহারও শ্রদ্ধা নাই, বরং সাধারণের অবজ্ঞাই জন্মিতেছে। আমি এখন উকীলবাবুর ছেলেদের গৃহশিক্ষক হইয়া দিন কাটাইতেছি। আমার উপায় কর।"

স্বামীজী পাঠদ্দশায় ঢাকা কলেজে মথুরবাবুর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মথুরবাবুকে স্বামীজী অকপটে স্বীয় দুরবস্থার কথা বলায়, তিনি দয়া করিয়া স্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে রাখিবার জন্য নিজের ছেলেদের মাষ্টার নিযুক্ত করিলেন। বেতন মাসিক ২৫ টাকা; আহারাদির ব্যবস্থা আমাদেরই সঙ্গে হইল। সকালে সন্ধ্যার ৩ ঘণ্টা করিয়া ছেলেদের পড়াইয়া অবশিষ্ট সময় স্বামীজী নিয়মিতরূপে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা মাসান্তে স্বামীজীর বেতনের টাকা কয়টি তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইতে লাগিলাম। নিয়মে চলিয়া কঠোর সাধন-ভজনে কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী স্বীয় দুরবস্থা শোধরাইয়া লইলেন। এখন স্বামীজীর সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাই।

মথুরবাবুর কেরাণী শ্রীযুক্ত মহাবিষ্ণু যতি আমাদেরই বাসায় থাকেন। যতিবংশ বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রকৃতিটি স্বভাবতঃই সাত্ত্বিক। আফিসের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া, তিনি অবশিষ্ট সময় শুধু ধর্ম্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করেন। ত্রিসন্ধ্যাদি ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়া এবং গঙ্গাস্নান, স্বপাকে আহার বহুকাল হইতেই মহাবিষ্ণুবাবুর অভ্যস্ত। রাধাকৃষ্ণ বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসে। প্রায় প্রতিদিন রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ে তিনি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করেন। অফিসের কাজ করিতেও অহৈতুক ভাবোচ্ছ্বাসে কখনও কখনও অবশ হইয়া পড়েন; তখন অফিসের কাজ বন্ধ থাকে। এই মহাবিষ্ণুবাবু আমার সঙ্গে এক ঘরেই থাকেন। সুতরাং ভাগলপুরে আসিয়া, ভগবানের কৃপায়, আমার সৎসঙ্গীর অভাব রহিল না।

আমাদের বাসার পূর্ব্বদিকে সুবিস্তৃত গঙ্গা—আজকাল চড়া পড়াতে কিঞ্চিৎ অন্তরে সরিয়া গিয়াছেন। গঙ্গার ঠিক উপরেই রহিয়াছি, বিশুদ্ধ বায়ু সতত সম্ভোগ করিতেছি, কিন্তু গঙ্গাজলে স্নান করি না। বদ্ধ জল স্থির, সুতরাং অধিক নির্ম্মল—এই যুক্তি ধরিয়া আমি কূপোদকে স্নান করি। শ্রদ্ধেয় স্বামীজী ও মহাবিষ্ণুবাবু আমাকে পূণ্যতোয়া জাহ্নবীর কত মাহাত্ম্য বলেন। আমি তাহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। যাহা হউক, উঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলিতে না পারিয়া, একসঙ্গে সকলে অনুদয়ে, মাঘের শীতে গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিলাম। কয়েকদিন গঙ্গাস্নান করিয়াই শরীরটি বেশ হালকা, ঝরঝরে বোধ হইতে লাগিল; দেখিলাম অনুদয়ে গঙ্গাস্নানে শরীরের সমস্ত গ্লানি ও অবসাদ দূর করে এবং মনটিও যেন স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; প্রফুল্লতা ও পবিত্রতা স্নানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে আসিয়া পড়ে; ভগবানের নাম সরলভাবে আপনা-আপনি চলিতে থাকে। এই সকল পরিষ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। একদিন গঙ্গাস্নান করিতে করিতে অকস্মাৎ আমার জাতি ও বংশগত সংস্কার আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মনে হইল, এই গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া আমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ 'উদ্ধার হইলাম' মনে করিয়া কত আনন্দই করিয়াছেন। পুরাকালে যোগী ঋষিগণ এই গঙ্গাজলে ভগবানের কতই আরাধনা উপাসনা করিয়াছেন। না জানি কি গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা ইঁহাকে পতিতপাবনী মোক্ষদায়িনী বলিয়া স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে থাকিয়া, এই গঙ্গাজল পাইলে, এখনও তাঁহাদের কত আনন্দ হইবে! আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আজ অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাজল দেই। ইহা ভাবিতেই আমার কান্না আসিয়া পড়িল। মনে হইল যেন কত যোগী, ঋষি, দেব, দেবী এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমাকে আজ আকাশে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমি দু'হাতে জল তুলিয়া তাঁহাদের স্মরণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইল। দেব-দেবী, ঋষি-মুনি ও পিতৃপুরুষগণ আজ আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন—এই প্রকার কল্পনায় সারাদিন আমার উৎসাহ আনন্দে কাটিয়া গেল। কল্পনা হইলেও এই আনন্দের লোভ আমি ছাড়িতে পারিলাম না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের সময়ে উঁহাদের উদ্দেশ্যে জল দিতে লাগিলাম। পরে আর একদিন মনে হইল—জলই যখন দিতেছি তখন নির্দিষ্ট প্রণালী ধরিয়া দেই না কেন? শাস্ত্রোক্ত প্রণালীমত উঁহাদের নাম ধরিয়া জল দিলেই তো উঁহাদের অধিক তৃপ্তি ও আনন্দ হইবে। এই ভাবিয়া আমি নিত্যকর্ম্মের তর্পণপ্রণালী কণ্ঠস্থ করিলাম। সেই সময় হইতে আমি প্রত্যহ প্রণালীমত নিয়মিত তর্পণ করিয়া আসিতেছি।

তন্দ্রাবেশে চক্রশক্তির অনুভূতি।

রাত্রে আহারান্তে আজ স্বামীজীর সহিত একত্র এক বিছানায় শয়ন করিয়া গুরুদেবের প্রসঙ্গে তন্দ্রাবেশ হইল। দেখিলাম—স্বামীজী পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা আমার অধোদেশ টিপিয়া দিয়া বলিলেন—"এই স্থান মূলাধার; প্রাণায়ামদ্বারা এখান হইতে শক্তি আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে সহস্রারে লইয়া যাও; সমাধি হইবে।" আমি তাঁহার কথামত ২/৪ বার প্রাণায়ামে দম দিতেই মূলাধার চক্র খিঁচিয়া উপরের দিকে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অমনই ঐ চক্র হইতে একটা শক্তি মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া সর্ সর্ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে চলিল। সে শক্তির দুর্ব্বার গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা, ধমনী যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। এ সময়ে প্রাণায়াম থামাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। একটা অদম্য শক্তি আমাকে অবশ করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রাণায়ামের দম চালাইতে লাগিল। দমে দমে শক্তি ঊর্দ্ধগামী হইয়া উপর উপর কয়েকটা চক্রের আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিল। মনে হইল যেন নাড়ী-ভুঁড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরের যা কিছু সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। 'উহু উহু' ছাড়া আমার তখন আর কোন বাক্যস্ফুরণের শক্তি রহিল না। যাতনায় অস্থির হইয়া আমি ক্রমে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। একটু পরেই এই শক্তি, পথ না পাইয়া, পাক ঘুরিয়া হঠাৎ নীচে আসিয়া পড়িল। এ সময়ে খুবই আরাম বোধ হইল, কিন্তু এ অবস্থা মুহূর্ত্তকালমাত্র অনুভব করিলাম। পরক্ষণেই আবার সেই শক্তি আরও যেন অধিকতর প্রবলবেগে সর্ সর্ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে ছুটিল। পুনঃপুনঃ, কিছুকাল

মাঘ মাস, ১২৯৬।

ধরিয়া, এইভাবে শক্তির অধঃ-উৰ্দ্ধ গতাগতিতে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। অকস্মাৎ একবার মহাবেগে উত্থিত হইয়া, এই শক্তি স্বস্থানে গিয়া সহসা সম্পূর্ণ বিরাম লাভ করিল। তখন পরমানন্দ-সাগরে আমি যেন একেবারে ডুবিয়া গেলাম। ইহার পর আর কিছুই বলিবার নাই। কতক্ষণ যে এ অবস্থাটি স্থায়ী হইল জানি না। পরে, আবার এই শক্তি মূলাধারে নামিয়া আসামাত্র আমার জ্ঞান হইল। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। অতি সংক্ষেপে প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্রমটি মাত্র সঙ্কেতে লিখিয়া রাখিলাম। এই সময়ে হঠাৎ স্বামীজী জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"ভাই, এ কি স্বপ্ন দেখিলাম? গুরুজী যেন তোমার ভিতরে কি একটা প্রক্রিয়া করিতেছেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর, আপেক্ষ করিয়া, হাতের কব্‌জা নাড়িয়া তিনি বলিলেন—'আহা হা! সবটা হ'ল না, একটু র'য়ে গেল'।"

অপূৰ্ব্ব সূৰ্য্যমণ্ডল দর্শন।

এখন প্রত্যহ আমি রাত ৩টার সময়ে উঠিয়া শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তে, ৩।। টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত নাম, প্রাণায়াম ও কুম্ভক করি। স্নানের পর স্বামীজী ও বিষ্ণুবাবুর সহিত জলযোগ ও চা-পান করিয়া ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নির্জ্জন বাগানে বসিয়া 'ত্রাটক' সাধন করিয়া থাকি। আহারের পর বাসা হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, গঙ্গাতীরের জনমানবশূন্য শিবমন্দিরে গিয়া প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নির্জ্জন সাধনে কাটাই। বিকাল বেলায় আমাদের বাসায় বহু ভদ্রলোকের সমাগম হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাবিষ্ণুবাবু ও স্বামীজী তাঁহাদের লইয়া ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তন করেন। রাত্রে আহারান্তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বিরাম হয় না। মধ্যে মধ্যে আমরা রাত্রিতে বাগানে তমালতলায় যাইয়া বসি। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের ভিতরে সম্মুখে ধুনী রাখিয়া নাম করিতে করিতে বড়ই আরাম পাই। সারা দিন-রাতই আমাদের যেন একটা ধর্ম্মোৎসব চলিয়াছে।

পূৰ্ব্বোক্ত স্বপ্নঘটনার পর হইতে সাধন-ভজনে উৎসাহ আমার আরও বৃদ্ধি পাইল। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে গুরুদেবের রূপ মনে আসিয়া পড়িতে লাগিল। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'**কল্পনা কখনও করবে না। নাম কর্‌তে কর্‌তে সত্যবস্তু আপনা-আপনি প্রকাশিত হবে**'। আমি কল্পনা কখনও করি না। অথচ একটু স্থির হইয়া নাম করিলেই অমনি অজ্ঞাতসারে গুরুদেবের রূপটি আপনা-আপনি অন্তরে আসিয়া পড়ে। তখন উহাতে এতই আনন্দ পাই যে, কল্পনা হইলেও উহা আর ত্যাগ করিবার যো থাকে না।

ইতিমধ্যে একদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া, নাম করিতে করিতে স্বামীজীর সঙ্গে বাসায়

আসিতেছি মনটি গুরুদেবের মনোহর রূপে আবিষ্ট রহিয়াছে—অকস্মাৎ ললাটদেশে সুনীল আকাশে অসংখ্য বৈদ্যুতিক তেজোময় শুভ্র জ্যোতিঃসমন্বিত অপূর্ব্ব সূর্য্যমণ্ডল ঝক্-ঝক্ করিয়া উদিত হইল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র উহার দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমি 'জয় গুরু', জয় গুরু' বলিতে বলিতে অবশাঙ্গ হইয়া বালির উপরে পড়িয়া গেলাম। *** সাধনরাজ্যে কত কি আছে, জানি না। এসব দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

সাধনে অক্ষমতাহেতু কৌশলবুদ্ধি।

গঙ্গাস্নানের গুণে অথবা দর্শনের লোভে সাধনে উৎসাহ আমার বৃদ্ধি পাইল। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিশ্রান্ত নাম করা গুরুদেবের আদেশ; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও দেখিতেছি তাহা আমি পারিতেছি না। প্রত্যহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিব বলিয়া দৃঢ়তার সহিত লাগিয়া যাই; কিন্তু একটুকু সময় উহাতে লক্ষ্য স্থির হইতে না হইতেই দেখি অজ্ঞাতসারে মন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুনঃপুনঃ এই প্রকার চেষ্টায় হয়রান হইয়া পড়িতেছি। শ্বাস-প্রশ্বাস ধরিয়া নাম করা কিছুতেই অভ্যাস করিতে পারিতেছি না। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন উহা পারিলাম না, তখন অন্য এক কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিব, স্থির করিলাম। দিনে রাত্রে যত সংখ্যক শ্বাস-প্রশ্বাস হইয়া থাকে, তত সংখ্যক নাম করিব সঙ্কল্প করিলাম। পরে গুরুদেব কৃপা করিয়া প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাথায় উহা বসাইয়া নিলেই আমার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা হইবে। এইরূপ বুদ্ধি করিয়া ২১৬০০ শতনাম করিতে লাগিলাম। যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধিই হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নামের সংখ্যারও বৃদ্ধি করিয়া প্রায় ৩০/৩২ হাজার নাম করিতে লাগিলাম। কর ও মালার নাম জপ এত অভ্যস্থ হইয়াছে যে, নিদ্রিত অবস্থায়ও আপনা-আপনি আমার কর ঘুরিয়া আসে, অপরের মুখে শুনিতে পাই। সংখ্যা পূর্ণ করিতে গিয়া সারাদিনে কাহারও সঙ্গে এখন আর কথা বলিবারও অবসর পাই না। বাহিরে খুব স্থির থাকিলেও, সংখ্যাপূরণচেষ্টায় ভিতরে অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়ি। অনেক সময় এইজন্য মাথা গরম হইয়া যায়। গুরুদেব বলিয়াছিলেন—'আমাদের সাধনে শ্বাস-প্রশ্বাসই নামের জপমালা।' যখন কিছুতেই তাহা ধরিতে পারিলাম না, তখন সুবিধা বুঝিয়া বাহিরে মালা-গ্রহণ না করিয়া আর কি করিব? জানি না, গুরুদেব আমার এই কৌশল পূর্ব্বক সাধারণ প্রাণালীমত সাধনে অনুমোদন করিবেন কি না।

ত্রাটক সাধনে দর্শনের ক্রম।

ত্রাটক সাধন অনেক কাল করিয়া আসিতেছি। গত বৎসর হইতে এই সাধনের সময়ে নানাপ্রকার দর্শন আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার যাহা দর্শন হইয়াছে ক্রমানুসারে তাহা তুলিয়া এই স্থানে লিখিয়া যাইতেছি।

(১) সাধন সময়ে লক্ষ্যস্থলে ৪/৫ ইঞ্চি পরিমিত, ঘড়ির স্প্রিং-এর মত, বহুস্তরবিশিষ্ট গোলাকার, অতিশয় চঞ্চল, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ৪/৫টি চক্র অবিচ্ছেদ গতিতে বামাবর্ত্তে এবং তাহাই আবার মুহূর্ত্তকালমধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, কিছুদিন দর্শন করিলাম।

(২) দৃষ্টি স্থির করিতে করিতে পরে দেখিলাম উক্ত চক্রগুলির আয়তন কমিয়া গেল। পরে, উহারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একটিমাত্র স্থির মণ্ডলাকারে পরিণত হইল, এবং ঐ মণ্ডল মধ্যে সরিষার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিন্দু প্রকাশিত হইল। উহার চতুষ্পার্শে ৪টি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডবৎ খণ্ডজ্যোতি ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। মণ্ডলের মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিম্ব অবিরাম জ্যোতির্ব্বুদ্বুদ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। প্রায় ৩।৪ মাস কাল সাধন সময়ে এইরূপ দর্শন হইতে লাগিল।

(৩) মাঘ মাসের প্রথম হইতেই ঐ দর্শনটি অন্যপ্রকার হইয়া পড়িল। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ৬ ইঞ্চি পরিমিত একটা মণ্ডলের মধ্যস্থলে একটি শ্বেতোজ্জ্বল, তেজঃপূর্ণ বলয় প্রকাশ পাইল। অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ দ্বাদশটি শুভ্র জ্যোতিঃসমন্বিত অঙ্গুরী মণ্ডলাভ্যন্তরে সমান অন্তরে থাকিয়া উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রায় ৩ মাস কাল এইরূপ দর্শন করিলাম।

(৪) উহাতে দৃষ্টি স্থির রাখিতে রাখিতে বর্ত্তমানে উহা অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। চক্ষু কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটু স্থির ও পলকশূন্য হইলেই ৫/৬ ইঞ্চি পরিমিত, জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতোজ্জ্বল সমচতুর্ভুজ যন্ত্র বৃত্তাকার মণ্ডলের মধ্যে দৃষ্ট হয়; কিছুক্ষণ উহাতে তীব্র দৃষ্টি রাখিলেই উহা একটি মটরের আয়তন সঙ্কীর্ণ হইয়া অধিকতর ঘন ও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে । যেখানে সেখানে, যে কোন অবস্থায় দিনে ও রাত্রে যখন-তখন এই জ্যোতি একটু দৃষ্টিস্থির রাখিবামাত্রই দর্শন হইতেছে।

ত্রাটক সাধনের প্রথম স্তরে ক্ষিতিতেই এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি স্থির করিয়া আসিতেছি। গুরুদেবের ব্যবস্থামত সেই সঙ্গে এখন ব্যোমে দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলাম।

তর্পণে ছায়ারূপদর্শন। কুকুরের কাণ্ড।

অতি প্রত্যূষে যখন গঙ্গাস্নানে যাই, পথে প্রত্যহই আমার মনে হয় যেন দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃপুরুষগণ আমার হাতে গঙ্গাজল পাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। স্নান করিয়া

ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে তাঁহাদের আহ্বানেই আমার কান্না পায় পিতৃতর্পণকালে প্রতিগণ্ডূষ জল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জলের উপরে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতির চঞ্চল ছায়া দর্শন করি। দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ কালে এইরূপ ছায়া কল্পনা করিয়াও দৃষ্টিতে আনিতে পারি না। পিতৃতর্পণ শেষ হইয়া গেলে, মুহূর্ত্তকালও উহা আর থাকে না।

২০শে মাঘ, ১২৯৬

আজ দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ শেষ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতেছি, ৭/৮ হাত অন্তরে গঙ্গার পারে একটি প্রকাণ্ড কুকুর সতৃষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। ভয়ঙ্কর শীতে অনুদয়কালে কুকুরটি জলে নামিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতে লাগিল। স্বামীজী ও মহাবিষ্ণুবাবু উহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন; কুকুরটি তখন ক্ষীণকণ্ঠে অতি কাতরস্বরে এমন একটি ক্লেশসূচক শব্দ করিল যে, তাহা শুনিয়া উঁহারা আর তাহাকে বাধা দিলেন না। ভরা মাঘের ভোরের শীতে গঙ্গায় অবগাহনে মানুষ অবশ হইয়া পড়ে, আর অনায়াসে কুকুরটি গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া আমার দক্ষিণ দিকে জলমধ্যে প্রায় এক হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইল; তৎপরে তর্পণের জল গঙ্গার স্রোতে পড়িয়া যেমন বহিয়া যাইতে লাগিল, কুকুরটি মুখব্যাদান করিয়া পুনঃপুনঃ আগ্রহের সহিত তাহাতেই ছোঁ মারিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই প্রকার করিয়া কুকুরটি উপরে উঠিল। আমিও তর্পণ শেষ করিয়া তখনই পারে উঠিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনজনেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত বালির চড়ায় কুকুরটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। দ্রুতগামী অশ্বও এত অল্প সময়ে এই প্রকাণ্ড চড়া পার হইয়া অদৃশ্য হইতে পারে না। সমস্ত দিন কুকুরটির কথা মনে হইতে লাগিল।

ভাগলপুরে সাধু পার্ব্বতীবাবু। ইষ্টদেবকে সুস্থ রাখাই সাধন ও সদাচারের উদ্দেশ্য।

ভাগলপুরে বারোয়ারীতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন সদাচারসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আছেন; সহরে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে পরম ধার্মিক মহাত্মা বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করে। স্বামীজী ও মহাবিষ্ণুবাবুর সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। পুরাকালে ঋষিদের তপোবনের যে প্রকার বর্ণনা শুনিয়াছি, পার্ব্বতীবাবুর আশ্রমটি যেন তাহাই দেখিলাম। নিস্তব্ধ বাগানটি নানাপ্রকার ফলফুলে সুশোভিত; শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবিধপ্রকার বৃক্ষে পরিবৃত। উপস্থিত হওয়ামাত্রই ইচ্ছা হইল উহার যে কোন স্থানে বসিয়া নাম করি। বৃক্ষলতার সহিত সমস্ত আশ্রমটি যেন ভগবদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। লোকালয়ে এমন সুন্দর তপোবন কোথাও দেখি নাই। পার্ব্বতীবাবুর ভজন-কুটীরখানি বিস্তৃত বাগানের এক প্রান্তে। পার্ব্বতীবাবুকে দেখিয়াও মনে হইল যেন একটি ঋষিকে দর্শন করিলাম। রক্তাভ

গৌরবর্ণ তেজঃপুঞ্জ শরীরে তেজস্বিতা এবং পবিত্রতা যেন মাখা রহিয়াছে। তিনি বার মাস ত্রিশ দিন অনুদয়ে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যা তর্পণাদি করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করেন, পরে শালগ্রাম ও পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া চণ্ডী, গীতা, উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন; ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন; অতঃপর এক ঘণ্টা কাল বিশ্রামান্তে কুটীরের বারান্দায় বসেন; এবং ভগবদ্‌ভাবে অভিভূত হইয়া সারাদিন ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করেন। রাত্রিতেও অতি অল্প সময় নিদ্রা যাইয়া, অবশিষ্ট নিশা ইষ্টস্মরণে কাটাইয়া দেন। আজ ৪২ বৎসরকাল তিনি এই নিয়মে আছেন; শুনিলাম, একটি দিনের জন্য নিয়মিত কার্য্যে তাঁহার বাধা হয় নাই। ষড়দর্শনে ইনি অগাধ পণ্ডিত; পুরাণ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে ইঁহার অসীম বিশ্বাস: আবার বাইবেল, কোরাণাদিও ইনি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইঁহাকে থিয়োসফিষ্ট' বলেন। 'থিয়োসফীর' সংবাদপত্রাদি ইঁহার আসনের ধারে স্তূপীকৃত রহিয়াছে দেখিলাম। আপন ভজনাচারে নিরত ও নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থীদিগকে কিরূপে এমন শ্রদ্ধাভক্তি করেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। পার্ব্বতীবাবু ভক্ত কি জ্ঞানী, বুঝিলাম না। ভক্তির কথা বলিতে বলিতেও তিনি কাঁদিয়া আকুল হন। আবার জ্ঞানের আলোচনাসময়ে স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া বসেন। সরল প্রাণে, বিনয়ের সহিত জাতিনির্ব্বিশেষে করজোড়ে সকলকে নমস্কার করেন। পার্ব্বতীবাবুর সঙ্গ আমার বড়ই ভাল লাগিল। প্রতি সপ্তাহেই আমি দুই দিন করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে লাগিলাম। পার্ব্বতীবাবুরও অসাধারণ স্নেহ আমার উপরে পড়িল। তিনি আমাকে উপনিষদের মর্ম্ম বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া অতি সংক্ষেপে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতির মত, উপদেশ করিতে লাগিলেন।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের আলোচনায় আমার শাস্ত্র-সদাচারে নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। তাহারই ফলে, প্রতিপদে প্রত্যেক ব্যাপারে আমি বিচার করিয়া চলিতে লাগিলাম। শুদ্ধাচারে থাকিয়া নিয়মনিষ্ঠাপূর্ব্বক আগ্রহসহকারে সাধন-ভজন করার ফল গুরুদেবের কৃপায় আশ্চর্য্যরূপেই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম; কিন্তু কিছুকাল পরে এই দর্শনশাস্ত্রের ব্যষ্টি, সমষ্টি ও ঘটপটাদির বিচার-বির্তকে আমার অন্তর ধীরে ধীরে শুষ্ক ও সংশয়পূর্ণ হইয়া উঠিল। গুরুদেবের অসাধারণ কৃপার উপরেও আমার বিচার আসিতে লাগিল। তখন তাঁহার প্রদত্ত অপ্রাকৃত সাধনরাজ্যে ভূমিকম্প উঠিয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা করিল। নিজের স্মরণার্থে এসব অবস্থার আভাস লিখিয়া রাখিতেছি। দু'চারখানা পুরাণ পাঠ করিয়া ও দর্শনশাস্ত্রের একটু-আধটু আলোচনা শুনিয়া, 'সাধন করার প্রয়োজন কি?' এই সন্দেহ জন্মিল। 'পুরুষকারের অনুষ্ঠান বা প্রারব্ধের ভোগ লইয়াই এই সমস্ত সংসার চলিতেছে' পুরাণাদিতেও ইহাই তো দেখিতেছি। কিন্তু পুরুষকারের দ্বারাই যদি প্রারব্ধের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে উহার ফলাফল যে বড়ই অনিশ্চিত

হইয়া পড়ে। কারণ অসদনুষ্ঠানে দুর্ভোগ, সদনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইলে, প্রারব্ধের কোন ভোগ নির্দ্দিষ্ট বা স্থির নিশ্চিত হইতে পারে না। আবার এই প্রারব্ধই যদি কার্য্যের প্রবৃত্তি বা তদনুষ্ঠানের হেতু হয়, তাহা হইলে পুরুষকার তো সর্ব্বথাই অর্থশূন্য কথা হইয়া পড়ে। আবার পুরুষকার দ্বারা ভোগের সৃষ্টি হয় একথা স্বীকার না করিলে ভোগই বা আসিল কোথা হইতে? আর যদি প্রারব্ধই যাবতীয় কার্য্য ও ভোগাদির হেতু হয়, তাহা হইলে সেই প্রারব্ধের অর্থ মূলতঃ ভগবদিচ্ছা ব্যতীত আর কি বলিব? তাঁহারই ইচ্ছায় প্রারব্ধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কার্য্যও ভোগ হইতেছে। জীবের প্রারব্ধ ব্যতীত একটা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ইচ্ছা আর নাই। সুতরাং মনে হয় সমস্তই ভগবদিচ্ছায় হইতেছে; জীব শুধু দ্রষ্টা ও ভোক্তা মাত্র। তাহা হইলে সাধন-ভজন আর করি কেন; নিয়ম, নিষ্ঠায় এবং সদাচারে থাকিতে এত অশান্তি উদ্বেগই বা ভোগ করিতেছি কেন? গুরুদেব নিজেই বলিয়াছিলেন যে আমার আর কোন স্বাধীনতাই নাই, আমি তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান, শুধু তাহা হইলে যাহা আমার ভিতরে সঞ্চারিত হইতেছে তাহাই আমি ভোগ করিতেছি। গর্ভস্থ সন্তানের দেহপুষ্টি ও জীবনধারণ কিছুই তাহার স্বীয় চেষ্টাসাধ্য নহে; উহা সাধারণভাবে গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার উপরে নির্ভর করে। সন্তানের অঙ্গসঞ্চালনে গর্ভধারিণীর ক্লেশ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য; নিয়ম, সদাচার, সাধন-ভজন এবং গুরুবাক্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ-মন স্থির থাকে, সুতরাং গর্ভিণী তাহাতে শান্তিতে থাকেন; আর যেমন-তেমন চলিলে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে, দেহ ও মনের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভধারিণীর যন্ত্রণাভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখিতেছি নিয়ম সদাচারে থাকার এবং সাধন ভজন করার আর কোন প্রয়োজনই নাই; শুধু নিজে স্থির থাকিয়া আধারস্বরূপা জননীকে সুস্থ রাখাই এই সকলের উদ্দেশ্য। অনিয়মে স্বেচ্ছাচারে চলিয়া, উচ্ছৃঙ্খলভাবে হাত পা নাড়াচাড়া করিলে জননীর বিষম যন্ত্রণা হইবে, এই ভাবটি অন্তরে আসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সংস্কারও বদ্ধমূল হইল যে আমার প্রতি কার্য্য, প্রতি পদক্ষেপ শ্রীগুরুদেব অনুভব করিতেছেন। যতই নিয়মে ও সদাচারে থাকিব এবং সাধন-ভজন করিব ততই তিনি সুস্থ থাকিবেন ও আনন্দ পাইবেন। নিজের উন্নতির জন্য সাধন-ভজন নয়; গর্ভধারিণী জননীকে আরামে রাখাই নিয়ম-নিষ্ঠা ও সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মই ধর্ম্ম।

মাঘ মাসের ৪র্থ সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

আমার গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপাতে যে সকল কল্পনাতীত ভাব আমার ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া পরমোৎসাহে আমাকে তাহাতে নিযুক্ত করিতেছে, আমার ভ্রান্ত বুদ্ধিকে গুরুদেবের সেইভাবের অনুগামী করিয়া বিচারদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলাম, জ্ঞানের অঙ্কুর না জন্মিতে জন্মিতে তত্ত্বের নিরূপণ বা মীমাংসার প্রয়াস যদিও মূর্খতা বা বাচালতা বই

আর কিছুই নয়, তথাপি যে সকল এলোমেলো জল্পনা-কল্পনাতে, আমি আমার গুরুদেবের ইচ্ছামত চলিতে দ্বিধাশূন্য হইতেছি, সেই সকলের সহিত এই জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ হেতু এই স্থলে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতেছি; এখন আমার মনে হইতেছে— কর্ম্মই সার। কর্ম্মই ধর্ম্ম; কর্ম্ম না করিলে কিছুই হইবে না। কর্ম্মদ্বারাই জীবের বাসনা পূর্ণতৃপ্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেই পরিণামে জীবের স্বরূপ অবস্থা লাভে মুক্তি হয়। এখন কোন্ প্রকার কর্ম্মদ্বারা কাহার বাসনা ক্ষয় হইবে তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে? কর্ম্মেতে বন্ধন হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশও ত দেখিয়াছি। শাস্ত্রবাক্য যখন অভ্রান্ত, তখন তাহার সঙ্গে আমার এই সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কোথায়?

বাসনানুযায়ী কর্ম্মের ফলভোগেই যখন জীবের পূর্ণতৃপ্তিতে স্বরূপতাপ্রাপ্তি, তখন সেই বাসনানুরূপ কর্ম্মই তাহার পক্ষে কল্যাণকর বা স্বভাবধর্ম্ম! জীব বাসনানুরূপ ভোগের নিমিত্ত কেহ সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে সাধুকর্ম্ম দ্বারা ভোগের পরিসমাপ্তিতে স্বরূপাবস্থা লাভ করিতেছে আবার কেহ বা ভিন্নরূপভোগের কল্পনায় তদনুযায়ী 'রজস্তমঃ' সহায়তায় ভোগের তৃপ্তিসাধনান্তে মূল অবস্থায় উপনীত হইতেছে। কোন্ জীব যে কিভাবে কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপন বাসনাক্ষয়জনিত মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। সাধুকর্ম্ম দ্বারা যেমন সত্ত্বগুণাশ্রয়ীর কল্যাণ হইতেছে, অসাধু বা অসৎ কর্ম্ম দ্বারাও সেইপ্রকার 'রজস্তমোহধিকৃত' জীবের বাসনাক্ষয়ে উপকার হইতেছে। সন্ধ্যা, বন্দনা, যাগযজ্ঞ ও তপস্যাদি করিয়া যেমন একজনের পরম মঙ্গল সাধিত হইতেছে, সেই প্রকার হয়ত তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধানুষ্ঠানেও আবার অন্য কাহারও প্রভূত কল্যাণ ঘটিতেছে। কোনও জীবরে মুক্তির জন্য যেমন কেবল সৎকর্ম্মই প্রয়োজন, সেই প্রকার কোন জীবের মুক্তির নিমিত্ত অসৎকর্ম্মেরও আবশ্যকতা থাকিতে পারে। গীতায় বলিয়াছেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

বাসনানুযায়ী ভোগের জন্য যে সকল গুণকে অবলম্বন করিয়া জীব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম, জীবের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া জীব সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইয়াও যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা ইহলেও তাহা কল্যাণকর; কারণ, বাসনায় আংশিক তৃপ্তিতে জীব তাহার স্বরূপ অবস্থার দিকেই কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল; কিন্তু স্বাভাবিক গুণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধানুষ্ঠান মহাসাত্ত্বিক হইলেও, তদ্দ্বারা জীবের কোন কল্যাণই নাই। উহাতে জীবের বাসনানুযায়ী ভোগের তৃপ্তি হয় না, মুক্তিও হয় না। লোকে যাহাকে অধর্ম্ম বলে, পাপ বলে, অপরাধ বলে, কেহ তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া স্বরূপ চৈতন্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে; আবার প্রকৃতিবিরুদ্ধ সধর্ম্মে কালযাপন করিয়া, পূজা, বন্দনা ও পরোপকারাদি করিয়া, পরধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, তাহার স্বরূপ অবস্থা হইতে আরও দূরে যাইয়া, কর্ম্মরাশিতে আরও আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। জীববিশেষের পক্ষে সাধারণ পাপও ধর্ম্ম হয়, আবার সাধারণ

ধর্ম্মও পাপ হয়। সুতরাং পাপ পুণ্যের দিকে কোনরূপ সংস্কার না রাখিয়া শুধু অন্তর্নিহিত অদম্য বাসনারূপ কর্ম্ম করিয়াই যাই, তাহাতেই ক্রমে বাসনার পূর্ণতৃপ্তিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি হইবে, মুক্তিলাভ ঘটিবে। বারদীর ব্রহ্মচারীকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া শুনিয়াছি; তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বাসনানুযায়ী ভোগের নিবৃত্তি ঘটাইতে লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্যে কৌশলপূর্ব্বক নিয়োগ করিয়াছিলেন। অহর্নিশি তাহাতে যথেচ্ছ অনুরক্ত থাকিয়াও অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ঐ আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত আরও রহিয়াছে। বাসনা হইতেই দেহের উৎপত্তি; দেহ শুধু কর্ম্মেরই যন্ত্র; কর্ম্মের জন্যই আসা। কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং কর্ম্মেই মুক্তি।

সংস্কার-রহিত বুদ্ধিতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া অবিশ্রাম কর্ম্ম করার প্রবৃত্তি জন্মিল; তদনুসারে খুব কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। কি প্রকার কর্ম্মে আমার বাসনা স্ফূর্ত্তি পাইবে তাহা ধরিবার জন্য নানাপ্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করিলাম। মধ্যাহ্নে অফিসে যাইয়া কাজ শিখিতে লাগিলাম, অপরাহ্নে মথুরবাবুর প্রকাণ্ড সংসারের সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলাবিধানে নিযুক্ত হইলাম। ইহাতে এত কর্ম্মের চাপ আমার উপরে পড়িল যে, সারাদিনে আমার আর তিলার্দ্ধ সময় রহিল না। প্রাতে ও রাত্রে নামজপের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিতে লাগিলাম। অবিশ্রান্ত অপরিমিত শ্রমে আমার বেদনারোগ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে শরীরের অতিরিক্ত অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ম্মের স্পৃহাও কমিতে লাগিল, যে সকল কর্ম্মে আমার বলবতী আকাঙ্ক্ষা, প্রাণে উৎসাহ আনন্দ ছিল, তাহাতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ ভাব, বিরক্তি ও ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। আমি অফিসে যাওয়া বন্ধ করিলাম, সংসারের যাবতীয় কর্ম্মেও উদাসীন হইয়া পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একটি সাধুর নিষ্কাম অনুষ্ঠান দেখিয়া আমার ভিতরে কর্ম্ম সম্বন্ধে আর এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল।

পাগলা সাধুর নিষ্কাম কর্ম্ম।

আমাদের বাসার সম্মুখে গঙ্গার পারে বালুর চড়ায় একটি লোক সারাদিন পড়িয়া থাকে। সকলে তাহাকে 'পাগলা' বলিয়া ডাকে । পাগলা কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকে, কখনও উত্তপ্ত বালুর উপরে শুইয়া থাকে, আবার কখনও বা আপন মনে চড়ার উপরে দৌড়াদৌড়ি করে। পাগলা কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। রাত্রে গঙ্গাতীরে শিবমন্দিরে গিয়া পড়িয়া থাকে।

একদিন দেখি পাগলা একটি গাছের কাটা ডাল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। বালুর চড়াতে গঙ্গা হইতে ২/ ৩ মিনিটের পথ ব্যবধানে উহা পুঁতিয়া রাখিয়াছে; এবং বড়

একটা ঘড়া ভরিয়া গঙ্গা হইতে জল আনিয়া ক্রমাগত উহার গোড়ায় ঢালিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাগলার এ কার্য্যের বিরাম নাই। এক-একবার দম নিতে একটু বসিতেছে, আবার অমনই যেন পিছনে কাহারও তাড়া খাইয়া ঘড়া কাঁধে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে এবং গঙ্গা হইতে জল আনিয়া ডালের গোড়ায় ঢালিতেছে। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত তিন দিন এইভাবে কঠোর শ্রম করিয়া, পাগলা যখন দেখিল ডালটি আর বাঁচিল না, শুকাইয়া গিয়াছে, তখন ঘড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, পাগলা একদিকে ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইল। পাগলাকে আর চড়ায় দেখিতে পাই না; কোথায় যে গেল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। পাগলা আমার পানে বড়ই স্নেহভাবে তাকাইত! পাগলার ঐ কাটা ডালটির গোড়ায় জল ঢালা যেন বড়ই জরুরি কাজ, এই প্রকার ভাব দেখাইত । পাগলা যে একজন ভাল সাধু, তাহার কয়েকটি নিঃস্বার্থ কার্য্যে তাহার নিদর্শন পাইয়াছিলাম। চাউল, ছোলা বা ভুট্টা ইত্যাদি সে যাহা কিছু পাইত, পাখীদের ছড়াইয়া দিত; শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি যাহা তরঙ্গাঘাতে পাড়ে উঠিয়া আসিত, পাগলা তাহা খুঁজিয়া নিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিত ইত্যাদি। পাগলার উপরোক্ত কার্য্যটি দেখিয়া আমার ভিতরে কর্ম্ম সম্বন্ধে আর এক সমস্যা উপস্থিত হইল।

নিষ্কাম কর্ম্মই ধর্ম্ম।

মনে হইল, গুণত্রয়ের ক্রিয়া ভূত-সংযোগে সম্পাদিত হওয়ার নামই কর্ম্ম। এই কর্ম্মে ভোগাকাঙ্ক্ষা হইলে বা বাসনা জড়িত হইলেই তাহা সকাম; আর. ভোগলালসা-পরিশূন্য বা বাসনা-বর্জ্জিত হইলেই উহা নিষ্কাম হয় । জীব বাসনাকে গুণে মিলিত করিয়া গুণদ্বারা ভূতসম্পাদিত সকাম কর্ম্ম দ্বারা জীবের স্বরূপ অবস্থা লাভ বড়ই কঠিন ব্যাপার, সামান্য সুখের চেষ্টায় কত দুঃখ পাইতে হয়, কিঞ্চিৎ ভোগের পথে কত দুর্যোগ ঘটে—জীব ইহা দেখিয়া, যদি ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে আসক্তি-পরিশূন্য গুণত্রয় দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পাদিত হইবে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম; এই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জীব অন্তর্ম্মুখী হইয়া স্বরূপ অবস্থার দিকে উন্নত হইতে থাকিবে।

এইভাবে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মকেই আমি মুক্তিলাভের সহজ উপায় স্থির করিলাম। যে কার্য্যে আমার কোন প্রকার স্বার্থ বা আসক্তি নাই, বরং দারুণ বিরক্তি, উৎসাহের সহিত তাহা করিতে লাগিলাম। মথুরবাবুর বৃহৎ সংসারের যাবতীয় ভার আমার নিজের উপরে লইলাম। তাঁহার সেই মাতৃহীন কচি কচি ছেলে মেয়েগুলিকে দু'বেলা মৎস্যাদি দ্বারা নিজ হাতে আহার করাইতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নে আফিসের কাজে মহাবিষ্ণুবাবুর সাহায্য করিতে লাগিলাম। বাগানে মালীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সব কাজকর্ম্মের তদারক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অপরাহ্নে প্রত্যহ বহুসংখ্যক স্কুলের ছেলেদের 'জিম্‌ন্যাষ্টিক' শিক্ষা দিতে লাগিলাম। কিছুকাল এই প্রকার করার পর আমার বারংবার মনে উদয় হইতে লাগিল, যদি আমি নিষ্কাম কার্য্যই করি তাহা হইলে ইহাতে এত উৎসাহ কেন? উৎসাহের মূলে, বাসনা ক্ষয় করা, কর্ম্ম শেষ করা, মুক্তির পথ পরিষ্কার করা, এই প্রকার সংস্কার অন্তরে রহিয়াছে পরিষ্কার বুঝিলাম। নিষ্কাম কর্ম্ম করিব সঙ্কল্পে যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহাও সকাম অর্থাৎ মূলে নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য রাখিয়া নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের প্রতি চেষ্টায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছি, এই সংস্কার ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে। সুতরাং সংস্কার-বর্জ্জিত না হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম করিব কিরূপে? সদসৎ, ভালমন্দ বুদ্ধি থাকিতে কখনও সংস্কার ত্যাগ হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে এ সকল বিচার বুদ্ধি কি প্রকারে লোপ পাইবে? মনে হয়—সদাচারে বহুকাল থাকিয়া যদি তাহা প্রকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে, স্নানাহার ও মলমূত্র ত্যাগের মত, সঙ্কল্পশূন্য স্বাভাবিক অভ্যস্ত ক্রিয়া বলিয়া, উহা কথঞ্চিৎ নিষ্কাম হইতে পারে।

এসকল ভাবিয়া আমি পূর্ব্ববৎ আবার ঘড়ি ধরিয়া দৈনিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। উদ্দেশ্য এসকল কার্য্য অভ্যস্ত হইলেই একমত নিষ্কাম হইবে।

জ্যোতির্দর্শন।

অবিচলিত একাগ্রতার সহিত অনিমেষ সাধন করিতে করিতে গুরুদেবের কৃপায় ধীরে ধীরে এক একটি অদ্ভুত দর্শন খুলিয়া যাইতে লাগিল। যথাক্রমে তাহা লিখিয়া যাইতেছি—

(১) প্রথমে কিছুদিন স্থির, শ্বেতপ্রভাপরিমণ্ডিত, বহু খণ্ড ঘননীলজ্যোতি ক্ষণে ক্ষণে সংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া, বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে, দ্রুতগতিতে, ধীরে তরঙ্গে প্রতিফলিত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্ট হইতে লাগিল। ময়ূরপুচ্ছের কেন্দ্র হইতে দ্বিতীয় স্তর কতকটা এই জ্যোতির্ বর্ণের অনুরূপ।

(২) ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা অন্যপ্রকার হইল। বলয়াকার শ্বেতপ্রভা পরিবেষ্টিত উজ্জ্বল, গাঢ় নীল জ্যোতিঃ ঘন আবর্ত্তে ঘূর্ণন ও কম্পন সহকারে চঞ্চল দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিব্যাপ্ত মণ্ডল ৩/৪ ইঞ্চি পরিমিত দেখিতে লাগিলাম।

(৩) কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে উহাও পরিবর্ত্তিত হইল। পীতাভ শ্বেত জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যে, অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ জ্যোতি দেখিতে লাগিলাম। নিকটে এই জ্যোতি নখপরিমিত খণ্ডাকারে উজ্জ্বল মণিবৎ স্থিরভাবে প্রকাশিত; আবার, দূরত্ব অনুসারে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আকারে কম্পন-সহকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষের অমুদ্রিত, মুদ্রিত, সকলপ্রকার অবস্থায়, স্থানে অস্থানে যেখানে সেখানে উহা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভিতর হইতে

ময়ূরপুচ্ছের চতুর্থ স্তরের সহিত এই বর্ণের কতক উপমা হইতে পারে।

(৪) তৎপরে ক্রমে ক্রমে শ্বেতমণ্ডলটি বিলুপ্ত হইয়া গেল। নিয়ত মটরের মত আকৃতি-বিশিষ্ট, হরিৎ ও নীল মিশ্রিত, অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিকটে ও দূরে একই আকারে নিশ্চলরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মিশ্রিত বলিয়া, ময়ূরপুচ্ছের রঙ্গের কোনও স্তরের সহিত ইহার সাদৃশ্য বুঝা গেল না।

(৫) এখন কদাচিৎ বিদ্যুতের মত চঞ্চল, অত্যদ্ভুত দীপ্তিসম্পন্ন গাঢ় নীল জ্যোতি, ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ প্রভা বিকীর্ণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেছে! এই জ্যোতির তুলনা নাই। প্রকাশে যেমনই আনন্দে দিশাহারা হইতেছি, অন্তর্দ্ধানে তেমনই চিত্তে হাহাকার উঠিতেছে।

আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা—কর্ম্মত্যাগই ধর্ম্ম।

আমার কোন কর্ম্মই ভাল লাগিতেছে না। নিয়ত আসনে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়! লোকে যাহাকে সৎকার্য্য, পুণ্যকার্য্য বলে, আত্মার কল্যাণের পক্ষে তাহাও যেন অন্তরায় মনে হইতেছে। আমাকে, প্রবৃত্তির অনুকূল বিচার বুদ্ধিতে, এখন সমস্ত কর্ম্মেই নিবৃত্ত করিতেছে। এখন মনে হইতেছে, সমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মবিরোধী। জীবাত্মার স্বরূপাবস্থায় ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকাই ধর্ম্ম। চিৎকণা বা জীবাত্মার ক্রমবিকাশের গতিই কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্ম সর্ব্বদাই জীবের বহির্ম্মুখ অবস্থা। ইহার পরিণাম চিৎকণার স্বরূপাবস্থা হইতে স্খলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতরে পরিণতি। যে স্থলে জীবাত্মার কর্ম্মের সমাপ্তি তথায় তাহার বিকাশেরও নিবৃত্তি। সুতরাং দৈহিক স্থূল কর্ম্ম হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম মানসিক কর্ম্মেরও বিরতি ঘটিলে জীবের দেহাত্মবুদ্ধির বা স্থূলতাপ্রাপ্তির মূল বিলয়ান্তে সূক্ষ্ম মানসরূপেরও অবসান হইবে। তৎপরে জীব যতই সূক্ষ্মতর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় বা স্থির হইতে থাকিবে, ততই বাসনাবর্জ্জিত স্বরূপাবস্থার দিকে উপনীত হইবে। এজন্য যাবতীয় কর্ম্মের মূল বাসনাকেও ত্যাগ করিয়া—'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা না কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।' নিবৃত্তিই যথার্থ ধর্ম্ম, যাবতীয় কর্ম্মই জীবাত্মার বিকাশক্রম বলিয়া ধর্ম্মবিরোধী।

গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপা। ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের আলোচনায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাকে একেবারে উদাসীন করিয়া তুলিল। আমার এখন মনে হইতেছে, কর্ম্ম করা মহা অনর্থ। কিছুদিন যাবৎ আমি বাহিরের যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ করিয়াছি। নিত্য আবশ্যকীয় অভ্যস্ত আহার নিদ্রা বাদে, অবশিষ্ট সময় নির্জ্জনে বসিয়া বিধিমত ইষ্টনাম সাধনে পুনঃপুনঃ মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতেছি। ঐ প্রকার নাম করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের রূপ আপনা আপনি চিত্তে উদিত হইতেছে। আমার দেহে গুরুর দেহ, আমার প্রকৃতিতে গুরুর প্রকৃতি, এই প্রকার ধারণা নাম স্মরণের সময়ে প্রবলবেগে অন্তরে আসিয়া পড়ে। আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আপাদমস্তক, সর্ব্বাবয়ব যেন শ্রীগুরুদেবেরই কলেবর; তিনি আমাকে আচ্ছাদন করিয়া

যেন এই দেহে রহিয়াছেন। নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার অভাবনীয় ধারণা চিত্তে উদয় হয়। আমি সাধনকালে তফাৎ থাকিয়া, নিজের ভিতরে নিজেকে না পাইয়া, গুরুদেবকেই দর্শন করি। ইহাতে আমার এতই আনন্দ হয় যে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। নামরূপী সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুদেবকে নিজের ভিতরে তন্ময়ভাবে ধ্যান করিতে করিতে আমার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়; সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে; অবিরামধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে থাকে। গুরুদেবের পরম সুন্দর মনোহর রূপের স্মৃতিমাত্রে আমার ভিতরে যে কি হয় তাহা আর বলিতে পারি না।

শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনায় সাধনরাজ্যে একপ্রকার যুগপ্রলয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। জ্যোতি দর্শন কিছুকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। নূতন উৎসাহে, নূতনভাবে, আবার যখন সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম, বিলুপ্তপ্রায় সবুজ আলো, শ্বেত আলোর সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই মিশ্রিত আলোকদ্বয় খণ্ড খণ্ড জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পড়িল। ২রা ফাল্গুন অপরাহ্নে, শ্বেত জ্যোতির মধ্যে নখ পরিমাণ নিবিড় কালবর্ণ একটি আকৃতি দর্শন করিলাম। ৩রা ফাল্গুন তারিখেও নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন হইতে লাগিল। পরে ধীরে ধীরে যেমন শ্বেত জ্যোতি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইল, কালরূপটিও তেমনই ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে লাগিল। কালরূপটি দেখিয়া মনে করিলাম বুঝি বা কৃষ্ণরূপই প্রকাশ পাইবেন; কারণ উঁহার মাথায় চূড়ার মত দেখিতে লাগিলাম। হাত, পা ও আকৃতির গঠন দেখিয়া পরিষ্কার মনে হইল কৃষ্ণই প্রকাশিত হইবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কাল আকৃতি কৃষ্ণ নয়। পূর্ব্বে যেরূপ দাঁড়ান ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা উপবিষ্ট। পূর্ব্বে যাহা কৃশ ছিল, এখন দেখিতেছি তাহা স্থূল। মাথায় চূড়া নয়, উহা জমাট চুল; আকৃতি ও গঠনে ঠিক গুরুদেবেরই অনুরূপ। তবে খুব পরিষ্কার নয়, অস্পষ্ট। এই রূপের উপরে অনিমেষ দৃষ্টি করিয়া ও মন স্থির রাখিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি আকৃতির বর্ণ ক্রমেই ঘন হইতেছে। স্থানে-অস্থানে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ চোখ বুজা ও মেলা অবস্থায় এই রূপ একই প্রকার। আমার চক্ষে যেন এই রূপ লাগিয়া রহিয়াছে। নামেতে রূপের স্ফূর্ত্তি, রূপেতে নামের স্মৃতি, এই এক অদ্ভুত যোগাযোগ দেখিতেছি। এই দর্শন খুলিয়া দিয়া, অহর্নিশি ঠাকুর আমাকে বিমল আনন্দে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। জানি না, এই সুখ আমার কত দিন!

দর্শন বিষয়ে বিচার।

প্রকৃতি যাহার সংশয়পূর্ণ, প্রত্যক্ষবিষয়েও তাহার নানাপ্রকার বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয় আমি যাহা পরিষ্কার দেখিতেছি, তাহাও ভালরূপে বাজাইয়া লইতে ইচ্ছা হইল। দর্শনের ক্র

অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে লাগিলাম। কালবর্ণ যে আকৃতিটি প্রায় সর্ব্বদাই চক্ষে রহিয়াছে, ইহা কি? কোথায় ইহার দর্শন হয়? আর এই দর্শনে আমার আত্মার কি কল্যাণ হইতেছে? দেখিতেছি অসীম আকাশের দিকে যখন তাকাই, অস্পষ্ট অতি বৃহৎ কালছায়া নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটু সময় উহার দিকে দৃষ্টি স্থির করিলেই দেখিতে দেখিতে উহা ছোট হইয়া পড়ে । ক্রমে অতি ক্ষুদ্র নিবিড় কালবর্ণ, মনুষ্যাকৃতিতে পরিণত হয়। আর সীমাবদ্ধস্থানে দৃষ্টি স্থির করিলে, উহার বিস্তৃতি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া নখপরিমিত আয়তন ধারণ করে। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি করিলে, প্রথমে সুস্পষ্ট জ্যোতি দর্শন হয়। এই জ্যোতির সম্মুখে বা ভিতরে রূপের প্রকাশ। জ্যোতিটি কোন একটি বস্তুর উপরেই দর্শন হয়। কিন্তু রূপটি জ্যোতি-সংলগ্ন অবস্থায় শূন্যেই রহিয়াছে, দেখিতে পাই। এখন এই রূপ বাহিরে কি ভিতরে দর্শন হইতেছে অনুসন্ধান করিয়া, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কারণ, চক্ষু যখন মেলিয়া রাখি, তখনও যেমন বাহিরে ইহা পরিষ্কার দেখি, চক্ষু যখন বুজিয়া থাকি, তখনও ঠিক সেই প্রকারই দৃষ্টিতে পড়ে । চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই প্রকার দর্শন হয় বলিয়া ইহার আশ্রয় কি, তাহা ধরিতে পারিতেছি না। নিয়ত কোন বস্তু বা জ্যোতির উপরে রূপের প্রকাশ হইলে বস্তু বা জ্যোতিই রূপের আধার বুঝিতাম। কিন্তু তাহা নয়। একবার ভাবিলাম বুঝি বায়ু রূপের আশ্রয়। কিন্তু দেখিতেছি তাহা নয়। কারণ বায়ু ত নিয়তই চঞ্চল, কিন্তু ঝড় তুফানেও রূপটি স্থির। জ্যোতি সম্বন্ধেও এই প্রকার। যদিও একটা বস্তুর উপরই জ্যোতির প্রকাশ দেখা যায়, তথাপি ঐ বস্তুতে জ্যোতি আবদ্ধ নয়। কারণ, বস্তু চঞ্চল হইলেও জ্যোতি স্থির থাকে । প্রবল ঝড়ে যখন বৃক্ষের ডাল ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে, অথবা নদীতে যখন প্রবল তরঙ্গ ও স্রোত বহিয়া যায়, তখনও কম্পিত বৃক্ষডালে এবং চঞ্চল জলে জ্যোতি একই স্থানে একই অবস্থায় অচঞ্চল ও স্থিরভাবে অবস্থিত দেখিতে পাই। সুতরাং স্থান বা বায়ু, জ্যোতি ও রূপের আধার নয়, বুঝিতেছি।

চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই প্রকার দর্শন হয় কেন? বাহিরে একটা বস্তু দর্শন হইলে, চক্ষের দোষে বা ঐ সংস্কারবশতঃ চক্ষু বুজিয়াও তাহা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তু যখন দৃশ্যের আশ্রয় লয়, তখন বাহিরে উহা দর্শন হয় কি প্রকারে বলিব; তবে বাহিরেই হউক আর ভিতরেই হউক, উহা যে দেখিতেছি সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। ইহা এতই ঘন ও সুস্পষ্ট যে পুস্তক পড়িতে পারি না; কোনও ক্ষুদ্র বস্তু পরিষ্কার দেখিতে পারি না; দৃষ্টি স্থির হইলেই জ্যোতি ও রূপে বস্তুটিকে আবরণ করিয়া ফেলে। চক্ষু মেলিয়া ও বুজিয়া একই প্রকার দর্শন হয় বলিয়া, এই দর্শন কোথায় কিভাবে হইতেছে নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। দর্শনটি যে আমার কল্পনা নয় বা কোন সংস্কারের ফল নয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই।

অনাদরে রূপের অন্তর্দ্ধান।

কিছুকাল যাবৎ দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি দর্শনের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই দর্শনে আমার আত্মার কি যথার্থ কল্যাণ হইতেছে, বা তাহা অনন্ত উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাইতেছে? এ সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে আমার আপনা-আপনি বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেখিতেছি, রূপটির প্রতি আমার অত্যন্ত আকর্ষণ। ক্ষণকাল ইহা দেখিতে না পাইলে অস্থির হইয়া পড়ি । রূপটিকে আরও পরিষ্কাররূপে দর্শন করিবার জন্যই যেন সাধন-ভজন করিতেছি। এইরূপ অন্তরের অবস্থা আমার কেন হইল? সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরম আনন্দময়, অনন্ত, পরব্রহ্ম যাহার লক্ষ্য, সে এখন নখপরিমিত একটি জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যাকৃতির রূপের ছটায় দিশাহারা হইয়া পড়িল! সুতরাং দুর্দ্দশার আর বাকী কি আছে? আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধন-রাজ্যে এ সকল দৃশ্য যদি নির্দ্দিষ্টই থাকে, তাহা হইলে ইহাতে এত অনুরাগ বা আকর্ষণের কারণ কি? যে কেহ নিয়ম প্রণালীমত সাধন-ভজন করিলেই ত তাহার এসব দর্শন হইবে। আর যদি গুরুদেবের কৃপায় ইহা আমার একটা সঞ্চারী অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল দেখিয়া যাওয়া ভিন্ন ইহার সহিত আমার আর কি সম্বন্ধ; আজ যিনি দয়া করিয়া এই অবস্থা দিয়াছেন; কালই আবার তিনি আমার কোনও ত্রুটি দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। যে বস্তু আমার স্বোপার্জ্জিত বা নিজস্ব নয়, তাহা লইয়া আমি মমতায় আবদ্ধ হইতেছি কেন? তারপর এইসব দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বা অন্য কোনরূপ দর্শনকে ত কোন কালে কেহ ধর্ম্ম বলে নাই। সত্য, সরলতা, বিনয়, পবিত্রতা, দয়া, সন্তোষাদিকেই অবিরোধে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্ম-বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানবাত্মার এই সকল সদ্‌বৃত্তি যদি প্রস্ফুটিত হইয়া না উঠিল, তবে এ সকল অলৌকিক ছবি দেখিয়া আমার কি হইবে? সাধনপথে দু'চার পা চলিয়াই যদি এক বিন্দু জ্যোতির সৌন্দর্য্যে বা একটি রূপের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইয়া পড়ি, এবং তাহাতে অনন্ত উন্নতির পথ অন্ধকার করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়া উহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে ত আমার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। গুরুদেবের মধুর রূপখানি সুস্পষ্টরূপে নিয়ত আমার চক্ষের উপরে থাকিলে পরমানন্দে থাকিব, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু তাহাতেই বা আমার কি হইবে? উহাকে কি ভগবদ্দর্শন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি? তাহা হইলে আর এই রুগ্ন শরীরে প্রাণপণে সাধন-ভজন করিয়া, এত নিয়ম সংযমে থাকিয়া ক্লেশভোগ করিতেছি কেন? সামান্য রেলভাড়াটা জুটাইয়া নিয়া এখনই ত সাক্ষাৎ ভগবৎসঙ্গ লাভ করিতে পারি। গুরুই ভগবান্, বিন্দুই সিন্ধু এ সকল কথার অর্থ আমি বুঝি না। কোন অবস্থায় থাকিয়া মহাপুরুষেরা এ সকল কথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দেন জানি না। তবে আমি কিন্তু নিজের অস্তিত্ব থাকিতে প্রত্যক্ষ সত্য অগ্রাহ্য করিয়া কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না।

পূর্ব্বোক্ত ভাব অন্তরে আসাতে দর্শনের প্রতি তেমন মনোযোগ না রাখিয়া নিয়মিতরূপে সাধন করিয়া যাইতে লাগিলাম। কিছুদিন দর্শন সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন রহিলাম। আজ সাধনকালে অকস্মাৎ রূপের কথা মনে পড়িল। ইতিমধ্যে কবে, কখন, রূপ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, মনোযোগ না থাকায় কিছুই ধরিতে পারি নাই। এখন সেই মধুর রূপের স্মৃতি প্রাণে উদয় হওয়ার, উহার দর্শনের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছি; ভিতর আমার দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হায়, হায়, আমার এ কি হইল? অনাদরে কাহাকে আমি বিসর্জ্জন দিলাম? বোধ হয়, আমার প্রাণের ঠাকুর গুরুদেবই দয়া করিয়া প্রকাশিত হইতেছিলেন, আমার অনাদর ও অগ্রাহ্যভাব দেখিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। শুনিয়াছিলাম, 'এসব দর্শনের বস্তুকে ছেলেপিলের মত সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে হয়, আদর যত্ন করিতে হয়; না হ'লে থাকে না।' ঠাকুর। এবার তোমার দগ্ধপ্রাণ কাতর সন্তানকে ক্ষমা কর। সাধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বহুবার স্পর্দ্ধার সহিত তোমার কৃপাকে প্রলোভন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছি। হায়, হায়, এখন আমার গতি কি হইবে?

এত কাল দর্শনে চিত্ত আবিষ্ট থাকায়, সাধনকালে নামটি বড়ই রসাল হইয়া বাহির হইত। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সারবান্ একটা বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি, অনুভব করিতাম। এখন আমার কিছুকাল যাবৎ আর সেই অবস্থা নাই; এখন ক্লেশের সহিত নীরস ফাঁকা নাম করিতেছি। শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া ২/৪ মিনিটেই ফাঁপর হইয়া পড়িতেছি, মনটা সর্ব্বদাই উদ্‌ভ্রান্ত। একেবারে শূন্যে পড়িয়া, ধরাছোঁয়ার কিছুই না পাইয়া, ত্রাসে ও আতঙ্কে অস্থির হইতেছি। হায়, আমার একি হইল? এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিব না। গুরুদেব, প্রাণের ঠাকুর, দয়া কর।

লালের প্রভাব ও যোগৈশ্বর্য্য।

ফাল্গুনের কিঞ্চিদধিক ২য় সপ্তাহ পর্য্যন্ত, ১২৯৬।

আজ সকালবেলা আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, আর ভিতরের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি; স্বামীজী (হরিমোহন) লালকে লইয়া সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি অমনই সাধন ছাড়িয়া উঠিলাম। লালকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া আমার বিছানার পাশে লালের আসন পাতিয়া দিলাম। একটু বিশ্রামের পর লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'লাল। হঠাৎ তুমি এখন কোথা হ'তে কি ভাবে এখানে এলে?' লাল বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে গোঁসাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। একদিন হঠাৎ তোমাদের কথা হ'ল; আর, দেখ্‌তে প্রাণটা অস্থির হ'য়ে পড়ল। অমনই না ব'লে পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। রাস্তায় কাণপুরে মন্মথবাবুর বাসায় মাত্র দু'দিন ছিলাম। রাস্তায় মধ্যে মধ্যে আমাকে কেহ কেহ গাড়িতেও তুলে নিয়ে ২/৫ ষ্টেশন এসেছেন।'

আমি। তোমার সঙ্গে ত একটি ঘটী বা দ্বিতীয় আর একখানা বহির্ব্বাস পর্য্যন্ত নাই, মাত্র ঐ লেংটি ও কম্বলই দেখ্‌ছি। এতদূর এলে কি প্রকারে? রাস্তায় কোন কষ্ট হয় নাই?

লাল। না, কষ্ট কি? আমি তো বেশ এসেছি। কোন কষ্টই হয় নাই। গুরুদেব কি কারো কষ্ট দেখ্‌তে পারেন?

নাবালক লাল কি প্রকারে সুদূর শ্রীবৃন্দাবন হইতে এতদূর পদব্রজে, শুধু ঐ লেংটি ও কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া, বিনাক্লেশে এখানে আসিলেন, ভাবিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

এই কয়েকমাস যাবৎ আমাদের বাসায় সাধন-ভজনের একটা সুন্দর স্রোত চলিয়াছে। ভাগলপুরের বহু গণ্যমান্য লোক প্রত্যহ অপরাহ্নে আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। ধর্ম্মার্থীদের সম্মিলনে নিত্যই যেন এ বাসায় উৎসব লাগিয়া আছে। সুগায়ক মহাবিষ্ণুবাবুর স্বরচিত সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। লাল আসিয়া যেন ধর্ম্মস্রোতে একটা প্রচণ্ড তুফান তুলিয়া দিলেন। সংকীর্ত্তনে লালের মহাভাব, আসনে বসা অবস্থায় স্থির সমাধি ও অদ্ভুত বিকাশ এবং ধর্ম্মালোচনায় উঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতে লাগিলেন।

একদিন আমরা লালকে লইয়া শ্রদ্ধেয় পার্ব্বতীবাবুর নিকটে গেলাম। পার্ব্বতীবাবু লালের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে লালের সম্মুখে সাংখ্য, বেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম উপদেশ করিয়া, শেষকালে 'অহং ব্রহ্ম' এই মত স্থাপন করিলেন। লাল চুপ করিয়া সমস্ত শুনিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। পার্ব্বতীবাবু তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন লাল সাধারণ ভাবে লৌকিক ধর্ম্মের দু'চার কথা তুলিয়া, এত গভীর তত্ত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার একটি কথায়ও আমি প্রবেশ করিতে পারিলাম না। দেবব্রতী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভগবদুপাসক মহাত্মাগণ একমাত্র গুরুর কৃপাতেই পরম-তত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন—এই কথা প্রমাণ করিতে গিয়া, সংস্কৃত, পালী, তিব্বতী, আরবী ও অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনর্গল বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ মত, সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া, স্থাপন করিলেন। একমাত্র সদ্‌গুরুর এক পলকের দৃষ্টি সঞ্চারে, একটি অঙ্গুলি সঙ্কেতে, অথবা এক মুহূর্ত্তের ইচ্ছাশক্তিতেই অনুগত শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, লাল ইহাই পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন। পার্ব্বতীবাবু শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; পরে, স্থির থাকিতে না পারিয়া, সাষ্টাঙ্গ হইয়া লালের পদতলে পড়িয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। কোথায় দাঁড়াইয়া আপনি এই পরমগুহ্যতত্ত্বের কথা বলিলেন, আমার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টি তাহার ত্রিসীমায়ও যায় না। আপনি আমাকে একটু দয়া করুন।" ইহার পর হইতে পার্ব্বতীবাবু পুনঃপুনঃই লালের সঙ্গ করিতে আমাদের বাসায় আসিতে লাগিলেন। ইহাতে ভাগলপুরে লালের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।

১৩ই ফাল্গুন আমি একখানা পাতঞ্জল দর্শন পড়িতেছি, লাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি পড়িতেছ?"

আমি। পাতঞ্জল।

লাল। এ দুর্ব্বায়ু তোমার হ'ল কেন? ওসব প'ড়ে কি হ'বে? একটি 'লাইন'ও বুঝ্‌বে না; বৃথা সময় নষ্ট। নাম কর না। সকল শাস্ত্র গুরুর কৃপায় নামের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রকাশ পাইবে।

আমি। লেখাপড়া মোটে না কর্‌লে, শুধু গুরুর কৃপায়, গুরুর বরে সরস্বতীর বরপুত্র হওয়া যায়, এ কথা এ যুগে নাবালককেও ব'লো না।

লাল। এটি আমার কুসংস্কার নয়। গুরুর কৃপায় বাস্তবিকই সব জানা যায়। এটি আমি প্রত্যক্ষ ক'রে বল্‌ছি।

আমি আবার লালের কথায় প্রতিবাদ আরম্ভ করিলাম। লাল তখন আমার হাত হইতে পাতঞ্জলখানা টানিয়া নিয়া, গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়, মধ্যে ও শেষ পৃষ্ঠায় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একবার একটু দৃষ্টি করিয়া পুস্তকখানা নিজ মস্তকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিলেন পরে তখনই আবার উহা আমার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এই নাও। আমি তো মাত্র শিশুশিক্ষা—তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পড়েছিলাম; আমার বর্ণজ্ঞানে এ গ্রন্থের উচ্চারণক্ষমতাও কুলায় না। ভাল, তুমি আমাকে এ গ্রন্থের যে কোন স্থান হইতে প্রশ্ন কর যেখানে যে প্রকার আছে, আমি ঠিক সেইরূপই ব'লে দিচ্ছি।" আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থের নানাস্থান হইতে ৭/৮ টি প্রশ্ন করিলাম, টীকাটিপ্পনীসহ যে বিষয়ে যেমনটি মীমাংসা গ্রন্থে আছে, অক্ষরে অক্ষরে লালের মুখে ঠিক সেই প্রকার উত্তর পাইয়া, আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলাম; ভাবিলাম—'এ কি কাণ্ড!' কিছুক্ষণ পরে লালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভাই, এ অদ্ভুতশক্তি তুমি কি প্রকারে লাভ করিলে?' লাল বলিলেন "গুরুকৃপা। একদিন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেশ্চন্দ্র সিংহ (ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্) মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসায় মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলাম। সুরেশবাবু হঠাৎ উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। আমি তাঁর বসার ঘরেই ব'সে রইলাম। টেবিলের উপরে একখানা ইংরাজি মনোবিজ্ঞানের পুস্তক ছিল। মনে হ'ল—লেখাপড়া শিখি নাই। যদি শিখ্‌তাম, এসব পুস্তকে কি কি বিষয়ের মীমাংসা আছে জান্‌তে পার্‌তাম। এই ভাবিয়া, গ্রন্থখানাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ক'রে মাথার উপরে রাখ্‌লাম, আর গুরুদেবকে স্মরণ কর্‌তে লাগলাম। ঐ সময়ে হঠাৎ আমার মাথায় কেমন একটা অনুভব হ'তে লাগ্‌লো, তখন গ্রন্থের ভিতরে যা কিছু বিচার-মীমাংসা আছে, সমস্ত আমার মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ কর্‌ল! ইহা কেন হ'ল, জানি না। সেদিন থেকে যে কোনও বিষয় আমার জানতে ইচ্ছা হয়, আপনা-আপনি তাহা ভিতরে এসে পড়ে। গুরুকৃপা ব্যতীত ইহার আর

কি হেতু বলা যায়? এ প্রকার আকাঙ্ক্ষা করায় নাকি ধর্ম্মজীবনের বিস্তর ক্ষতি হয়। কোনও আকাঙ্ক্ষা না ক'রে হাবা হ'য়ে গুরুদেবের দিকে তাকা'য়ে থাকাই ভাল। কিন্তু তা আর পারি কৈ? মহাশক্তিযুক্ত নাম পেয়েছ, নাম কর, গুরুদেবের কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যে অখিল শাস্ত্র ভিতরে প্রকাশ হ'য়ে পড়তে পারে। এটি আমার কল্পনা নয়, সত্যি বল্‌ছি।"

লাল গুরুদেবের সঙ্গ ছাড়িয়া অকস্মাৎ কেন পদব্রজে ভাগলপুরে আসিলেন তাহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। স্বামীজী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন—বিধির পাকে, সঙ্গদোষে আচারভ্রষ্ট হইয়া এখন স্বেচ্ছাচারে দিন কাটাইতেছেন। লাল ইহা জানিয়া বড়ই ক্লেশ পাইতেছিলেন, এবং অচিরে ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। লাল প্রত্যহই স্বামীজীকে সন্ন্যাসের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক গুরুদেবের আদেশমত চলিতে জেদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বামীজী লালের এসব কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। লাল তখন সহজে হইবে না বুঝিয়া কিঞ্চিৎ যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি প্রায় ১০টার সময়ে ঘরের ভিতরে বসিয়া আমরা সকলে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, লাল পূর্ব্ববৎ স্বামীজীকে সন্ন্যাসের নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী উহার কথায় উপেক্ষাভাব দেখাইবামাত্র, লাল একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঊর্দ্ধদিকে হাত নাড়িয়া. চীৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—" এসো না, এসো না, এসো না। কেন আসছ? চলে যাও! চলে যাও!" ঠিক এই সময়ে আমাদের সম্মুখ দিয়া ভয়ঙ্কর শোঁ শোঁ শব্দে কি যেন একটা চলিয়া গেল। আমরা অবাক্! একটু পরে লাল যেন চমকিয়া উঠিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"হায়, হায়! এ কি হ'ল? একেবারে আত্মহত্যা! উঃ কি ভয়ানক! এ যে আর দেখা যায় না!" এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন— "এখন আর আমার কাছে কেন? আমার কাছে এসে কি হবে? গুরুজীর কাছে যাও। আমার দ্বারা কোন কল্যাণই হবে না। আমার কাছে এসো না, এসো না । শুনছ না কেন? আচ্ছা, তবে এসো।" লাল এই কথা কয়টি বলামাত্র শোঁ শোঁ শব্দে কি যেন একটা আসিয়া আমাদের ঘরের গঙ্গার দিকের জানালায় দুড়ুম করিয়া পড়িল। জানালা ও সার্শির কপাট ভিতর হইতে বন্ধ ছিল; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জানালাটি অকস্মাৎ খুলিয়া গেল এবং কাঁচের কপাটের তিনখানা সার্শি চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল! আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম, অবাক্ হইয়া একে অন্যের প্রতি তাকাইতে লাগিলাম। লাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"একি? একি দেখছি? জ্যান্ত মানুষটাকে চিতায় চড়া'ল! কি ভয়ঙ্কর! উঃ কি ভয়ানক চিতা! ঐ দেখ, ঐ দেখ। "স্বামীজী তখন চীৎকার করিয়া বারান্দায় গিয়া পড়িলেন; "হায়, হায়—এ কি হ'ল? এ কি হ'ল? জীবন্ত মানুষটাকে চিতায় জ্বালালে!" কয়েকবার এইরূপ বলিয়া, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে চৈতন্যলাভ করিয়াও তিনি চিতার কথা মনে করিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। লাল তখন এক একবার

শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"ধামরাই গ্রাম আজ উৎসন্ন হইল। হায়, হায়।

স্বামীজী তখন বিনাবাক্যে নিজের গায়ের কম্বলখানা লালের গায়ে পরাইয়া দিয়া তাঁহার কৌপীনটি টানিয়া নিলেন; পরে, আমাকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"ভাই, কিছু মনে ক'রো না, একটু পাগলামী করি।" এইমাত্র বলিয়া, বারেন্দার রোয়াক হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন, এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া দৌড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন। রাত্রি প্রায় দেড়টা। কিছু পরে লাল বলিলেন—"আর স্বামীজীর অনুসন্ধান নিও না। তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন।" তথাপি মথুরবাবু দু'দিন স্বামীজীর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোনই খোঁজখবর পাইলেন না।

আমার ভগিনীপতি মথুরবাবু লালের অসাধারণ অবস্থা ও যৌগৈশ্বর্য্যের অনেক কথা লোকপরম্পারায় শুনিয়াছিলেন। তিনি লালকে নিজের বাসায় পাইয়া, সে সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ করিতে লালের 'পিছু' লইলেন। লাল উঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, একদিন মথুরবাবুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া নিলেন; পরে আমার মৃত ভগিনীকে পরলোক হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া অনেক আশ্চর্য্য ও বিচিত্র গুহ্য কথা শুনাইলেন। কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কুচেষ্টায় আভিচারিক ক্রিয়াদ্বারা যে ভাবে অকালে আমার ভগিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, সে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া মথুরবাবু স্তম্ভিত হইলেন। ঐ স্ত্রীলোকটিদ্বারা আরও যে সমস্ত এই শ্রেণীর সাংঘাতিক অনর্থের সৃষ্টি হইবে, তাহাও লাল পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। মথুরবাবু ব্যতীত যাহা এ সংসারে আর কেহই জানে না, এমন কতকগুলি গুহ্য বিষয় লালের মুখে শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। আমাদের বাসায় ভূত প্রেতের নানাপ্রকার গোলমাল দূর করিবার জন্য প্রত্যহ হরিনাম সংকীর্ত্তন ও তুলসীসেবা এবং সাধু-সজ্জনদিগকে বাসায় রাখিয়া তাঁহাদের সাধন ভজনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক লাল এ বিষয়ে মথুরবাবুকে বিশেষ 'জেদ' করিয়া বলিলেন। মথুরবাবুও তাঁহার উপদেশমত চলিতে সম্মত হইলেন।

পরে লাল একদিন কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর আমরা সকলেই বিষাদে মুহ্যমান হইলাম। অহর্নিশি আমাদের বাসাতে ধর্ম্মের যে বহ্নি প্রজ্বলিত থাকিয়া আমাদিগকে আলোক দিতেছিল, লাল চলিয়া গেলে আমাদের অন্তর শিথিল ও অবসন্ন হওয়ায় সেই বহ্নি ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

লাল ও স্বামীজী অকস্মাৎ চলিয়া গেলে পর, আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। বিষাদে সমস্তই যেন শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। সাধন ভজনের উৎসাহ উদ্যম কিছুকাল যাবৎ একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। নিয়মিত সাধন আর নাই। আসনে বসিলে অস্থিরতা আসিয়া পড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস ধরিয়া আর নাম করিতে পারি না, ৩/৪ মিনিটেই হয়রান হইয়া পড়ি, মনে হয় যেন সাধ্যাতীত বোঝা লইয়া টানাটানি করিতেছি। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা

হয়। গুরুদেবের দুর্লভ কৃপা স্পর্দ্ধার সহিত আমি অগ্রাহ্য করিয়াছি, ইহা মনে হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। এখন এই অপরাধেরই দণ্ড ভোগ করি; সাধন ভজন আর করিব কি? হাহাকারেই আমার অহর্নিশি কাটিয়া যাইতেছে। কয়েকদিন যাবৎ রোগের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহাও আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। শরীরে ও মনে এমন একটু কিছু নাই; যাহা ধরিয়া তিলমাত্র আরাম পাই। নৈরাশ্যে ও যন্ত্রণায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে। মহাপুরুষদের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়াই এ সময়ে কতকটা স্থির হইতেছি। আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিবে জানিয়াই বোধ হয় ল্যাঙ্গা-বাবা বলিয়াছিলেন—"বাচ্ছা, ঘাব্‌ড়াও মাৎ। গুরুজী তোম্‌কো বহুৎ কৃপা করেঙ্গে। উন্‌হিকো উপর তোমারা সাচ্চা ভক্তি বন্‌ যায়েগা।" পতিতদাস বাবা বলিয়াছেন—"থোড়া রোজ্‌মে তোমারা গুরুভক্তি লাভ হোগা, ধন্য হো যাওগে।" গুরুদেবও বলিয়াছিলেন—"ছেলে বয়সে সাধন পেলে; জীবনে কত উন্নতি লাভ করিতে পার্‌বে। ধন্য হ'য়ে যাবে।" ইত্যাদি। যদি এসব মহাপুরুষদের বাক্য সত্য হয়, যদি আজন্ম সত্যসঙ্কল্প, সত্যবাদী গুরুদেবের বাক্যও অন্যথা না হয়, তবে আর আমার চিন্তা কি? রোগে আমাকে যতই ক্লিষ্ট ও অবসন্ন করুক্ না কেন, স্বেচ্ছাচারে আমি যতই ডুবিয়া যাই না কেন, পরিণামে আমার কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

আমার প্রতি লালের উপদেশ।

১৭ই ফাল্গুন, ১২৯৬।

লাল আমাকে তিনটি কথা বলিয়া গেলেন—(১) ডায়েরী লেখা ছাড়িও না। ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। (২) সাধন ছেড়ো না, খুব নাম কর; তুমি সন্ন্যাসী হবে। (৩) গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার যো নাই; গুরুতে একনিষ্ঠ হও; তাঁহার সঙ্গ করিতে চেষ্টা কর।

আমি তো কিছুকাল হইতে সাধন-ভজন একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি। অনাবশ্যক কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে দিনরাত কাটাইতেছি। নিজের কিসে কল্যাণ বুঝিয়াও তাহা করিতে পারিতেছি না। বাজে কাজে, বৃথা গল্পে, দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেছি। ভিতরে আমার হা হুতাশ ও জ্বালা, বাহিরে আমার কথা মিষ্ট হইবে কি প্রকারে? বন্ধুরাও এখন আমার সঙ্গে উত্তপ্ত হইতেছে। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি।

স্বপ্ন।—বাক্যসংযম।

২২শে ফাল্গুন, ১২৯৬।

আজ রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলাম। গুরুদেবের সঙ্গ-প্রত্যাশায় ছুটিয়াছি। ঝড় তুফানে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, গুরুদেবের নিকটে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, গুরুদেব মৌনী। সস্নেহ-দৃষ্টিতে যাহার পানে তাকাইতেছেন, সেই আনন্দে ডুবিয়া

যাইতেছে। আমি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে হাসিগল্প, তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলাম। গুরুদেব আমার দিকে একটু বিরক্তিভাবে তাকাইয়া বলিলেন—"উঃ, বাব্বা, তুমি এত কথা বলতে পার।" কথাটি শুনিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বুঝিলাম, গুরুদেব আমার বেশী কথা পছন্দ করেন না। অনাবশ্যক কথা আর কহিব না, স্থির করিলাম।

স্বপ্ন।—সন্ন্যাসের অবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ।

বৈশাখ মাস, ১২৯৭।

আমি ভজনসাধনশূন্য, স্বেচ্ছাচারী ও ভয়ঙ্কর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও, গুরুদেবের এই অনুশাসনবাক্য ভুলিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেই গুরুদেবের সেই দৃষ্টি, সেই কথা কয়েকটি মনে আসিয়া পড়ে। আমি আর কিছু বলিতে পারি না। লাল চলিয়া যাওয়ার পরে, ৪/৫ দিন অন্তর অন্তরই স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। আমার সম্বন্ধে লালের ভবিষ্যদ্বাণী শোনার ফলেই এইরূপ হইতেছে মনে করিয়াছিলাম; সুতরাং তেমন গ্রাহ্যও করি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি—ওসব স্বপ্নে আমার ভিতরে এক তুমুল কাণ্ড চলিতেছে। স্বপ্নাবস্থায় নিজেকে যে প্রকার কঠোর বৈরাগ্যপূর্ণ, উদ্যমশীল, ভজনানন্দী সন্ন্যাসীরূপে দেখি, দিবসে উদয়াস্ত আমার সেই মূর্ত্তি যেন চোখে লাগিয়া থাকে, সর্ব্বদা উহাই ভাবিতে ভাল লাগে। ভিতরে যাহা নিয়ত ভাবিয়া আরাম পাই, বাহিরে সেই প্রকার হইতে না পারিলে ভাল লাগিবে কেন? কিছুকাল হাত পা গুটাইয়া ছিলাম; কিন্তু বেশী দিন পারিলাম না। প্রাণে জ্বালা আসিয়া পড়িল। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট আমার সন্ন্যাসের আকৃতি প্রকৃতির অনুযায়ী অবস্থা লাভ করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। আমি এবার কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলাম। দিবসে একাহার ধরিলাম। শয্যায় শয়ন ত্যাগ করিলাম। একখানি কম্বলমাত্র ব্যবহারে রাখিলাম। কোঠাঘরে বাস ছাড়িয়া দিয়া পুলিনপুরীর প্রকাণ্ড বাগানে তমালতলায় আসন করিলাম; লেংটি পরিয়া, ধূনী জ্বালিয়া, তমালমূলে সারারাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। অসাধারণ স্থান প্রভাবেই বোধ হয়, আমার সাধনে স্পৃহা ও কঠোরতায় ব্যাকুলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই তমালতলা নাকি একটি সিদ্ধ মহাত্মার ভজনস্থান ছিল। গাছটি বহুকালের এবং ছত্রাকার গোল। ঘনপত্রবিশিষ্ট সমস্তগুলি ডালই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। বৃক্ষের তলাটি বেশ পরিষ্কার, মণ্ডলাকারে ১৫/২০ জন লোক অনায়াসে বসিতে পারে। একটিমাত্র সরু পথ দিয়া বৃক্ষতলে যাইতে হয়, অন্য কোন দিক্ দিয়া যাওয়ার পথ নাই। গাছতলায় কেহ থাকিলে, বাহির হইতে কোন প্রকারে তাহাকে দেখা যায় না। এমন সুন্দর গাছ ইতিপূর্ব্বে আমি আর কোথাও দেখি নাই। তমালমূলে বসিলে চঞ্চল মন আপনা আপনি যেন জমাট হইয়া আসে। গুরুদেবের কৃপায় সাধনে আমার যে অপূর্ব্ব দর্শনলাভ হইয়াছিল তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম; সাধনে অশ্রদ্ধা, নামে অরুচি জন্মিয়াছিল। জীবনে আর কখনও এই

সাধন করিতে পারিব, কল্পনাও করি নাই। কিন্তু গুরুদেব পুনঃপুনঃই আমাকে স্বপ্নযোগে তেজঃপুঞ্জ ভজনানন্দী সন্ন্যাসীর রূপ দর্শন করাইয়া, সাধন-ভজন তপস্যায় আবার আমার প্রবল আগ্রহ জন্মাইলেন। আশ্চর্য্য গুরুদেবের কৌশল।

শরীর আমার দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। মনের উৎসাহে তমালতলায় রাত্রি যাপন ও অনিয়মিত জাগরণাদি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা করাতে অল্পকালের মধ্যেই জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালবৎ হইয়া পড়িলাম। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মনের অনিবার্য্য আবেগে কাহারও কথাতেই আমি কর্ণপাত করিলাম না। ভাবিলাম— গুরুদেবের কৃপায় যখন আমি বঞ্চিত হইয়াছি, দুর্ব্বুদ্ধি, দাম্ভিকতায় যখন দুর্লভ সাধনফল হারাইয়াছি, তখন এইবার নিজে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব; অকৃতকার্য্য হই, দেহ পাত করিব।

আমি মাসাধিক কাল অবাধে যথারীতি নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া চলিলাম। ভিতরে ভিতরে খুব ভরসা জন্মিল; রোগমুক্ত হইলে নিজ চেষ্টায় সাধনবলে, অনায়াসেই সন্ন্যাসের উপযোগিতা লাভ করিতে পারিব। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শনে আমার অভিমান চূর্ণ হইল। বুঝিলাম সন্ন্যাসলাভের চেষ্টা আমার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। আমি বিষম অবস্থায় পড়িলাম।

আমার খুড়তুত ভ্রাতা মনোমোহন আমা অপেক্ষা নয় দিনের বড় । একই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা একই সংসারে প্রতিপালিত । ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মনোমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সত্যনিষ্ঠ, উপাসনাশীল জীবনযাপনপূর্ব্বক, অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। তাহার দেহত্যাগের তিন দিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, মনোমোহন আমাকে আসিয়া বলিল—"ভাই, আমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় তো শীঘ্র এস; এবার আমি চল্লাম।" আশ্চর্য্য এই যে, ঘটনায়ও তাহাই হইল।

বহুকাল পরে গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—ভাই মনোমোহন সন্ন্যাসবেশে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। উহাকে দেখিয়া খুব উল্লসিত হইয়া বলিলাম—"বাঃ, তুমি সন্ন্যাসী হ'য়েছ? বেশ! আমিও সন্ন্যাসী হ'য়ে তোমার সঙ্গে থাক্‌ব।" সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"সন্ন্যাস তো ভেক নয়; উহা যে অবস্থা; জিতকাম না হ'লে সিদ্ধিলাভ হয় না। যত সহজ ভাব্‌ছ, তত সহজ নয়।"

আমি। কামিনীসঙ্গেও আমার চিত্তবিকার হয় না। সন্ন্যাসের উপযোগিতা আমার স্বভাবেই আছে।

সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"বটে? আচ্ছা, একবার ল্যাংটা হও দেখি।"

আমি অমনই উলঙ্গ হইলাম। আমাকে দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল— "হ'য়েছে, হ'য়েছে; এবার কাপড় পর। এই উপযোগিতা নিয়ে সন্ন্যাসী হবে? এখন ঐ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। এখন সাধন কর, খুব নাম কর। গুরুর কৃপা হ'লে সবই হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি চল্লাম।"

আমি বলিলাম—"সন্ন্যাসের লক্ষণ তোমার কতদূর হ'য়েছে, দেখতে চাই।"

সন্ন্যাসী ভ্রাতা অমনই উলঙ্গ, হইল। তাহার পুরুষাঙ্গ নাই দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এ কি, ভাই? এ যে স্ত্রীলোকের মত দেখছি! সন্ন্যাসী ভ্রাতা বলিল—"না, তা না। কামভাব দমনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থের চঞ্চলতা নষ্ট হ'য়ে যায়; ক্রমে উহা সঙ্কুচিত হ'য়ে খর্ব্বাকৃতি ধারণ করে; পরে উল্টাভাবে উর্দ্ধমুখে অবস্থান ক'রে মূল সহিত সমস্ত ভিতর দিকে টানিতে থাকে। তাহাতেই ঐ স্থানের আকার ঐ প্রকার হ'যে যায়। দেখ্‌তে উহা স্ত্রীচিহ্নের মতই দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা বাহিরে পুরুষাঙ্গেরই সম্পূর্ণ অভাব মাত্র। এটি তো সন্ন্যাসীর শুধু একটা বাহ্য লক্ষণ, কিছুই নয়। সন্ন্যাসীর অন্তরের অসাধারণ দুর্লভ অবস্থা একমাত্র গুরুপ্রসাদেই লাভ হয়।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ভ্রাতা অন্তর্হিত হইলেন, আমিও জাগিয়া উঠিলাম।

স্বপ্নটি দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। সন্ন্যাসীর এপ্রকার লক্ষণ আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই! স্বপ্নটিকে আমি স্বপ্ন ভাবিয়া, অলীক বলিয়া, উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। উহার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলিয়া আমার মনে ছাপ্‌ পড়িয়া গেল। স্বপ্নদৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতে প্রাণে আগ্রহ জন্মিল। আমি খুব কৃচ্ছ্রতার সহিত সাধন করিতে লাগিলাম।

পাপপুরুষের আক্রমণ।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১২৯৭।

মহাত্মাদের মুখে শুনিয়াছি, নিজেও বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উদ্যম সহকারে সাধন ভজন তপস্যা আরম্ভ করিলেই সেই সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে সাধকের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভয়ঙ্কর একটা পিশাচশক্তি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে। সাধকের আন্তরিক কাতরতা বা বাহ্যিক দীনতার কিঞ্চিন্মাত্র অভাব হইলে, অথবা নিয়ম নিষ্ঠার বেড়া অসর্তকতাবশতঃ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সামান্য শিথিল হইয়া পড়িলে ঐ নিদারুণ পিশাচ অমনই প্রবলবেগে সাধককে আক্রমণ করে এবং নানাপ্রকার দুর্দ্দমনীয় দুর্ম্মতি চিত্তে উদ্রিক্ত করিয়া কদাচারে ও ব্যভিচারে সাধককে অতি জঘন্য হীন অবস্থায় উপনীত করে।

অল্প কিছুকাল কঠোর পথে চলিয়া একটু সাধন করিতেই ভিতরে ভিতরে অভিমান জন্মিল—বুঝি আমি জিতকাম হইয়াছি। অন্তরে এই ভাবের উদয় হওয়াতেই দর্পহারী ভগবান্‌ আমার দর্প চূর্ণ করিতে অদ্ভুত উৎপাতের সৃষ্টি করিলেন। জনমানবশূন্য নির্জ্জন বাগান উপাসনার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে উৎপাতশূন্য মনে করিয়াছিলাম; তাই একান্তপ্রাণে সাধন করিব আশায়, পুণ্য বৃক্ষ তমালতলে সিদ্ধ মহাত্মার ভজনস্থলে, সংযমপূর্ব্বক সাধনের বলে অচিরেই আমি সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব, নিরাপৎ অবস্থা লাভ করিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও অভিমানের মোহে অন্ধ হইয়া এখন আমি বিষম অন্ধ কূপে পড়িয়াছি। এ আপদে আমার উপায় নাই।

নানাপ্রকার আভিচারিক ক্রিয়ার জন্য ভাগলপুর প্রসিদ্ধ । ইতর লোকদের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর দুষ্ক্রিয়ার প্রচলন অত্যন্ত অধিক । 'আভিচারিক' বিদ্যা সময়ে সময়ে প্রযুক্ত না হইলে

উহার শক্তি নাকি হ্রাস পাইয়া যায়; এইজন্য, ঐ কার্য্যে যাহারা ওস্তাদ, নিয়ত তাহারা লোক খুঁজিয়া বেড়ায়। উপযুক্ত যজমান জুটিলে, দু'পয়সা রোজগারও হয়। কাহারও প্রতি সামান্য কারণে কাহারও বিদ্বেষাদি জন্মিলেই, ঐ সব লোকের দ্বারা একে অন্যকে জব্দ করিতে বাণমারা, ফুল ছোঁড়া, ধূলাপড়া ইত্যাদির চেষ্টা করে। এই উৎকট শক্তি পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইলে নাকি তাহার জীবননাশও ঘটিত পারে।

আমাদের বাগানের সংলগ্ন উত্তরপ্রান্তে একটি ভদ্রলোক আসিয়া একখানা বাসা ভাড়া লইয়া আছেন। লোকটি সাধুপ্রকৃতি ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিবাসী হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। কিছু দিন হয় তাঁহার একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী কন্যা এই আভিচারিক উৎপীড়নে বিপন্না হইয়াছেন। মেয়েটির একটি সুসন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু স্তন্যাভাবে অনাহারে মারা পড়িয়াছে। যুবতী আরও নানাপ্রকার উৎপাত ভোগ করিতেছেন। অসাধারণ রূপ লাবণ্যই উঁহার এই উৎকট বিপত্তির হেতু হইয়াছে। নির্জ্জন তমালতলায় অহর্নিশি আমি ধূনী জ্বালিয়া বসিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয়ই আমি একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ, এই রকম একটা কুসংস্কার এখানে অনেকেরই ভিতরে জন্মিয়াছে। আমার শুধু একটু কৃপাদৃষ্টিতেই মেয়েটির এই সব 'উপরি' উপদ্রবের শান্তি হইবে, এই প্রকার ধারণায় মেয়েটির পিতা জেদ করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পরে সেই সুন্দরী কন্যাকে নির্জ্জন ঘরে একাকী আমার হাতে অর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন! উদ্দেশ্য—মন খুলিয়া মেয়েটি তাঁহার সব দুঃখের কাহিনী আমাকে বলিবেন। শোকাতুরা সরলা যুবতী অতি কাতরভাবে আমাকে কহিলেন "আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। কোনও দুষ্ট লোকের কু-দৃষ্টিতে প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্বেই আমার একটি স্তন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; অপরটিতে একটি ফোঁটা দুধ নাই। তাই, বুকের দুধের অভাবে; অনাহারে ছেলেটি আমার মারা পড়িয়াছে।" এই বলিয়া, শোকবিহ্বলা বালা অসঙ্কোচে বুকের বস্ত্র খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। যুবতীর বুকে বামদিকের স্তনের কোনও চিহ্ন নাই। দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। অপরটি স্বাভাবিক, স্থূল ও সুগঠন। আমার দৃষ্টিতে ও করস্পর্শে কুগ্রহের দৃষ্টি ছুটিয়া যাইবে, মেয়েটির এইরূপ ধারণা। উহার প্রাণের দুঃসহ যাতনা ও অন্তরের আগ্রহ আমার চিত্তকে স্পর্শ করিল। আমি স্বচ্ছন্দভাবে ও অসঙ্কোচে উহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পর হইতে সেই নির্জ্জন বাগানে আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মেয়েটি প্রত্যহ আসিতে লাগিল। আমি দূর হইতে উহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম।

কয়েকদিন পরে দেখি, কোনদিন মেয়েটি যথাসময়ে না আসিলে আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে, উহার রূপের স্মৃতি আমার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলে। আমি আর তখন আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া সেই বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াই। আবার কখন কখন উহাকে দেখিতে

উহাদের বাড়ীর পাশে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকি। হায়, হায়—এ আমার কি দশা ঘটিল? আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম? আচরণ সম্বন্ধে গোড়ায় সাবধান না হইয়া অন্তর্নিহিত দুষ্প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম আকর্ষণে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, যেন নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার সমস্ত যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখন নিজেকে অতি জঘন্য বলিয়া অনুভব করিতেছি। নিয়ত হা হতাশে, উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে, আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। সাধন ভজন সমস্ত ছুটিয়া গিয়াছে।

আমি তমালতলা ত্যাগ করিয়াছি—নাম, প্রাণায়াম ছাড়িয়া দিয়াছি। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার দেখিয়া আতঙ্কে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছি। গুরুদেব, এ সময়ে তুমি কোথায়?

কে তুমি?

অভাবনীয় ঘটনা জীবনে যাহা ঘটিতেছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। গতরাত্রে কি যে আমি দেখিলাম, বলিতে পারি না। জীবনে কখনও আমি এরূপ দৃশ্য দেখি নাই। ঘটনাটি গুরুদেবকে শুনাইবার জন্য যথাসাধ্য লিখিয়া রাখিতেছি।

রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। বিছানায় পড়িয়া আছি; ঘরের জানালা দরজা সমস্ত খোলা। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে বিছানার অর্দ্ধেকটা আলোকিত। বেদনার যন্ত্রণায় ও মনের আগুনে আমি ছট্‌ফট্ করিতেছি। আকুলপ্রাণে গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা করিলাম—"ঠাকুর, আমি তো আর পারি না। এবার তুমি দয়া কর। আমি তোমার ঐ মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধদৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া চিরকালের মত সমস্ত উৎপাতের শান্তি করিব।" প্রার্থনান্তে গুরুদেবের পবিত্রমূর্ত্তি ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম। জানি না কখন অজ্ঞাতসারে, ধীরে কামিনী কল্পনা* চিত্তে আসিয়া পড়িল। তাহাতেই আমি অভিভূত হইয়া রহিলাম। জাগ্রত কি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, জানি না; অকস্মাৎ আমার পায়ের দিকে কামিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ক্ষীণ কণ্ঠে, কাতর স্বরে আমাকে বলিল—"ও কি ভাব্‌ছ? এই যে আমি এসেছি।" স্বরেতে খুব আপনার মনে হইল। কিন্তু চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে? এ সময়ে এখানে কেন?"

রমণী কহিলেন—"তুমি যে আমায় স্থির হ'তে দিচ্ছ না—টেনে নিয়ে এলে। যথেষ্ট ভুগেছি—আর ক্লেশ দিও না। পায়ে পড়ি, আমায় মুক্ত ক'রে দাও।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কখন আমি তোমাকে ডেকেছি? কে তুমি? এখানে কেন?

কামিনী বলিলেন—" তোমার অদম্য কামভাবে আমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হ'য়েছে। তোমার

* এ সম্পর্কে ঠাকুরের কথা, পূর্ব্ব প্রকাশিত 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' (১২৯৮ সালের) গ্রন্থখানির ১৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে।

কল্পনা ও উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি। তোমার বিকার থাক্‌তে আমার নিস্তার নাই। এখন বাসনার পরিতৃপ্তি কর—ঠাণ্ডা হও। আমিও বাঁচি।"

আমি বলিলাম—"কে তুমি? তোমার কথা শুন্‌ছি, অথচ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি কামিনী কল্পনা করি— তাতে তোমার কি ? তুমি আকৃষ্ট হও কেন?"

যুবতী অস্পষ্ট ছায়ার মত কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া তক্তপোষের ধারে আমার পায়ের দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরে বিছানার উপরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া, আমার পা দু'টি জড়াইয়া ধরিলেন। উঁহার অঙ্গস্পর্শে আমার শরীরে আনন্দের ধারা সঞ্চারিত হইতে লাগিল, আমি পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম।

যুবতী তখন আমাকে বলিলেন, "ছি! তোমার এই দশা? কামভাব, কামিনী-কল্পনা—এ তুমি ছাড়্‌তে পারলে না? নিজের যে সর্ব্বনাশ কর্‌লে। আর এতে আমারও কত দুর্গতি, দেখ দেখি। পরমানন্দে সমাধিতে ছিলাম। সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম ক'রে এতদিনে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ কর্‌তাম। শুধু তোমার সঙ্গে অভেদসম্বন্ধহেতু আবদ্ধ র'য়েছি। তোমার বিষম উত্তেজনার টানে আমাকে উঠ্‌তে দিচ্ছে না। আমি নিরুপায় হ'য়ে এসেছি। এবার আমায় মুক্ত ক'রে দাও। তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেও।"

আমি অমনই উঠিয়া বসিলাম—বলিলাম, "তুমি কে , বল না কেন?" রমণী তখন অকস্মাৎ তক্তপোষের ধারে বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মধুরভাবে, বিনয় সহকারে বলিলেন, "একবার আমাকে ধর না!—পরিচয় পাবে এখন।" আমি যেমন উঁহার কটিদেশে করসংযোগ করিলাম, রমণীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া অমনই বিস্ময়ে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলাম। আমার শিথিল হস্ত খসিয়া পড়িল। উঁহার সেই কমনীয় অঙ্গের কেবল মাত্র নাভিদেশ পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে আমার নিকটে প্রকাশিত হইল। দেখিলাম, নীলদ্যুতিসম্পন্না, সুন্দরী শ্যামা, উলঙ্গ বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শুভ্র, অল্প-পরিসর, সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে উঁহার স্থূল উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থল আবৃত। ষোড়শীর নাভিদেশ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত অসংখ্য ঘন নীল বিদ্যুৎ ফুটিয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া, উঁহাকে ধরিতে আমি হাত বাড়াইলাম। রমণী তখন পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া আমাকে বলিলেন—"আর কেন? যথেষ্ট হ'য়েছে; আর কাম-কল্পনা ক'রো না, আমাকে টেনো না। এবার ভেবে দেখ আমি কে। এখন যাই।" এই বলিয়া উলঙ্গিনী কামিনী, শ্যামাঙ্গের উজ্জ্বল ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া, ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইলেন। তখন উঁহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে নীল বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ অবিরল স্খলিত হইয়া বিশাল নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়ী শ্যামা প্রতিমা অনন্ত নীলাকাশে স্বরূপ মিলাইয়া ধীরে ধীরে বিলীন হইলেন। 'হায়, হায়, কোথায় গেলে! কোথায় গেলে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া, আমি বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

অবশিষ্ট রাত্রি আকাশের দিকে তাকাইয়া কিভাবে যে কাটাইলাম, তাহা আর লিখিবার যো নাই।

এই অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখার পর অন্তরে আমার সর্ব্বদা ঐ রূপ উদয় হইতে লাগিল। দিবা নিশি আমি উঁহারই ধ্যানে রহিলাম। আবার কখন কিরূপে সেই অনুপমা প্রতিমার দর্শন পাইব—এই চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল। অনিষ্টকর যে সকল দূষণীয় কল্পনায় এতকাল সুখ পাইয়াছি, তাহাতে আর রুচি নাই, বরং বিরক্তিই জন্মিতেছে। সাধন ভজন করিলে আবার সেই মনোমোহিনী অপ্রাকৃত রমণীকে দেখিতে পাইব এই ভাবিয়া সাধনে আমার প্রবৃত্তি জন্মিল। কিন্তু লোভে পড়িয়া সাধন করিতে উৎসাহী হইলেও, চেষ্টা করিবার আর আমার সামর্থ্য নাই দারুণ পিত্তশূল বেদনার অসহ্য যন্ত্রণায় আমি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছি। প্রত্যহ দুই তিনবার বমি করি; কণ্ঠনালীতে ক্ষত হইয়াছে অনুমান হইতেছে। গণ্ডূষমাত্র জল পান করিলেও পেট পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। দিনরাত একটানা দুঃসহ বেদনায় আমার আহার নিদ্রা গিয়াছে। চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া আহা উহু, উঠা বসা করিতেছি। মানসিক যন্ত্রণা যতই তীব্র হউক না কেন, কায়িক ক্লেশের তুলনায় উহা কিছুই নয়, এবার ইহা পরিষ্কার বুঝিতেছি। উৎকট দৈহিক যন্ত্রণার উপশমের জন্য মনে হয়, এমন অধর্ম্ম অনাচার বা অকর্ম্ম নাই যাহা করিতে না পারি। এই তো অবস্থা!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

দ্বিতীয়খণ্ড

(১২৯৭ সালের ডায়েরী)

অসহ্য রোগযাতনা। জীবনে বিতৃষ্ণা ; পরোক্ষে গুরুদেবের আহ্বান ।

অহর্নিশ অবিচ্ছেদে নিদারুণ পিত্তশূল বেদনার অসহ্য যাতনায় আমার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মিল। ক্রমশঃ যন্ত্রণার তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ সঙ্কল্প আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। শুনিয়াছি গুরুদেব এ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। স্থির করিলাম—তাঁহার কলুষনাশন মনোমোহন মূর্ত্তি চিরকালের মত একবার দেখিয়া, তাঁহার সেই স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া, পুণ্যতোয়া যমুনার সলিলে এই পাপ দেহ বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু, জীর্ণ-শীর্ণ শরীরে এখন আর চলাফেরা করিবারও সামর্থ্য নাই ; অথচ শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে অস্থির হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে বিছানা হইতে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেও কেহ আমাকে উৎসাহ দেন না। তার পর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার খরচাদি কাহার নিকটেই বা চাহিব ? এই সময়ে পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল গুরুদেব দয়া করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইবে। অচিরে যে কোন প্রকারে আমার যাওয়ারও যোগাড় হইবে—এই ভরসায় কাতর প্রাণে তাঁহাকেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে লাগিলাম। আর্শ্চয্য গুরুদেবের দয়া ! অভাবনীয়রূপে আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। জয় গুরুদেব ! জয় গুরুদেব !

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ, ১২৯৭ ।

শ্রীযুক্ত মথুর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীমান সুরেন্দ্র বিলাতে যাইবেন বলিয়া, হায়দারাবাদে তাঁহার খুড়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে পড়া-শুনা করিতেছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার পিতার নিকটে আসা আবশ্যক হওয়ায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের (রিটার্ণ) টিকিট করিয়া সম্প্রতি ভাগলপুরে আসিয়াছেন । আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার একান্ত আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া, গোপনে আমাকে টিকিটখানি দিয়া বলিলেন— "এখন আর আমার হায়দারাবাদে যাওয়া হইল না। মামা, আপনি এ টিকিটখানা নিন্। ইহাতে আপনি এলাহাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিবেন।" আমি টিকিটখানি পাইয়া, প্রকারান্তরে ইহা গুরুদেবেরই সস্নেহ আহ্বান ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম । অমনই শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এ সময়ে আমাকে বাধা দেওয়া বিফল বুঝিয়া, শ্রীযুক্ত মথুর বাবু ১০ টাকা ও মহাবিষ্ণু বাবু ৩ টাকা দিলেন। আমি দু'খানা জীর্ণ বস্ত্র, গামছা, একটি ঘটী এবং ডায়েরী লেখার সাজ-সরঞ্জাম ও একখানা হরিবংশ ঝোলায় বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলাম ।

আমার স্বর্গীয়া ভগিনীর শিশু পুত্র-কন্যাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এতকাল আমারই উপরে ছিল । আজ তাহাদের ফেলিয়া চলিলাম ; বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

* *
*

শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা।

১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১২৯৭।

মনের উৎসাহে সারাদিন কাটাইয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, গাড়ির সময় বুঝিয়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম । গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া পদবিক্ষেপমাত্রেই সেই নিরুপম কাল রূপ বহুকাল পরে 'ঝিকিমিকি' করিয়া প্রকাশিত হইল। চার পাঁচ হাত অন্তরে, শূন্যে রহিয়া, ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপ সমান গতিতে আমার অগ্রে অগ্রে চলিল। দেখিয়া আনন্দে আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। খালি গায়ে, কম্বল লইয়া, ভিখারী বেশে, ছেঁড়া ঝোলা হাতে লইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। জানি না সকলে আমাকে কি ঠাহরাইয়া হাঁ করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটি লোক আসিয়া টিকিট চাহিল এবং টিকিটখানা দেখিয়া, আমাকে এক সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে গাড়ী ছাড়িল। শ্রান্ত ছিলাম; অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার নিদ্রার আবেশ হইল। এই সময়ে সেই কাল মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন। রাত্রিটি আজ বেশ আরামেই কাটাইলাম।

প্রয়াগধামের প্রভাব-অনুভূতি।

১৯শে আষাঢ়, বুধবার, ১২৯৭

স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতেছি, গাড়িখানা প্রয়াগধামের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পূর্ব্ব দিকে বহু বিস্তৃত একটি ময়দানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ময়দানের দিকে দৃষ্টিমাত্র আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, উদাসভাবে প্রাণটিকে আমার অবসন্ন করিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে স্পষ্টরূপে আপনা আপনি 'অগস্ত্য' 'অগস্ত্য' শব্দ উঠিতে লাগিল। ভরদ্বাজ বশিষ্ঠাদি মহাতপা ঋষিগণ এক সময়ে এই স্থানেই ছিলেন, এই প্রকার ভাব মনে উদিত হওয়ায়, তাঁহাদের জন্য একটা শোক আসিয়া পড়িল। এই শোকে ক্রমে আমাকে এতই অভিভূত করিল যে, আমি কোন মতেই আর কান্না সংবরণ করিতে পারিলাম না। খালি গাড়িতে সুবিধা পাইয়া, ঋষিদের নাম লইয়া কতক্ষণ কাঁদিলাম। মনে হইল, যেন ঋষিগণ এই স্থানে থাকিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমি কাতরভাবে তাঁহাদের চরণোদ্দেশে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম— "হে আর্য্য ঋষিগণ, আজ তোমরা আমাকে এভাবে কেন এত কৃপা করিলে? আজ অকস্মাৎ তোমাদের কথা মনে পড়ায়, তোমাদের জন্য প্রাণ আমার এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল কেন? আমি এ জীবনে কখনও তো তোমাদের কথা একবার ভাবি নাই। তোমাদের স্মরণ করিয়া

মস্তক অবনত করি নাই। বোধ হয়, এই প্রান্তরই তোমাদের পুণ্য আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল; তাই, তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর নাই। অনন্ত স্তরবিশিষ্ট জগতের কোন এক সূক্ষ্ম স্তরে—এই প্রয়াগে তোমাদের পরম আদরের বস্তু, সাধনের ফলকে অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করিয়া, অদৃশ্য শরীরে অবস্থান পূর্ব্বক বুঝি এ স্থানেই তাহা সম্ভোগ করিতেছ । তোমাদের এই সাধের পুণ্য সাধনক্ষেত্রে আজ আমি শ্রদ্ধাশূন্য অন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশমাত্র আমার প্রতি তোমরা কৃপাদৃষ্টি করিলে, দয়া করিয়া তোমাদের কথা আমার চিত্তে উদিত করিয়া দিলে। আজ আমি চিরকালের মত ধন্য হইলাম। হে মূর্ত্তিমান্ দয়ারূপী ঋষিগণ, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাদের অনুগত হইতে পারি; অবিচলিত মনে তোমাদের সনাতন নির্ম্মল পথের অনুসরণ করিতে পারি; প্রাণের ঠাকুর গুরুদেবের শ্রীচরণে একনিষ্ঠ হইয়া যেন অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। আর কিছু চাই না। এই শুভ মুহূর্ত্তে তোমাদের কৃপায় শুভমতি হওয়ায়, আমার দুর্ব্বিনীত, উদ্ধত মস্তক তোমাদের চরণরেণুতে বিলুণ্ঠিত করিতেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।" ভাবুকতাই হউক বা কল্পনাই হউক, আমার মনে হইল, যেন ঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি স্থির হইয়া নাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন প্রয়াগধামে পৌঁছিল।

অতঃপর গাড়ি হইতে নামিয়া ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ দূরে একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসন করিয়া আপন মনে নাম করিতে করিতে আশ্চর্য্য প্রকারে আমার ভিতরে একটা ভাবের স্রোত আসিয়া পড়িল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"আহা! আজ আমি কোথায়? এই সেই প্রয়াগধাম। এক সময়ে এই স্থানে কত কি হইয়াছিল! কত যোগী কত ঋষি এক সময়ে এই পুণ্য ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া দীর্ঘকালব্যাপী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কত সহস্র সহস্র ঋষি-মুনি-তপস্বী এক সময়ে এই স্থানে ধ্যান ধারণা সমাধিতে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া, যুগযুগান্তকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তীব্র তপস্যা, ও একান্ত সাধন ভজনদ্বারা অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সহিত সংযোগ হেতু অসীম শক্তি লাভ করিয়া কত দীর্ঘতপা যোগী ঋষি এই পুণ্য ভূমিতে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ সাধনশক্তি এই স্থানে সঞ্চারিত হইয়া ইহার প্রতি অণু-পরমাণুকে জীবন্ত শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে। এই পবিত্র ক্ষেত্রের সংস্পর্শে, বুঝি ঋষিদের অসাধারণ সাধনশক্তির বীজ অলক্ষিতভাবে জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়; এবং সেই অমোঘ শক্তির অঙ্কুরোদগমে জীব কোন না কোন কালে উদ্ধার হইয়া যায়। তাই ঋষিরা এই ভূমিকে মুক্তিধাম বলিয়াছেন। হে দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণের অপ্রাকৃত সাধনশক্তির খণ্ডিত ভাণ্ডার তীর্থরাজ প্রয়াগ, আমি অনুভব করি আর নাই করি, তোমার এই আনন্দঘন ধূলিকণা স্পর্শ করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম। তীর্থরাজ, আশীর্ব্বাদ কর, আজ পর্য্যন্ত তোমার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলের পদধূলি আমার মস্তকে পড়ুক।" এই ভাবে অভিভূত হইয়া, মাটিতে পড়িয়া প্রয়াগধামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। অমনি ভাবোচ্ছ্বাসের একটা প্রবল বন্যা কিছুক্ষণের

জন্য আমার ভিতরে বহিয়া গেল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে একটি প্রয়াগবাসী ভদ্রলোক আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে আমি স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া যথাসময়ে ষ্টেশনে আসিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম। গাড়িতে আমার কোনও কষ্ট হইল না; বেশ আরামে চলিলাম। জয় গুরুদেব!

জ্যোতির্ম্ময় শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিতি। গুরুদেবের দয়া।

২০শে আষাঢ়।

সকাল বেলা হাত-মুখ ধুইয়া গাড়ির এক কোণে বসিয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণোদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া, খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। যতই মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, দু'দিকের বিস্তৃত ময়দান ও ঘন বন সকল দেখিয়া ততই প্রাণ যেন আমার কেমন হইতে লাগিল। যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষায়, নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, একাকী, মাঠে ময়দানে, নির্জ্জন স্থানে আকুলভাবে কত কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি; যাঁহার বসতিস্থল শুনিয়া, লোকসঙ্গে এই স্থানে আসিতে কত আবদার করিয়াছি—আজ আমার ছেলেবেলার মানস-কল্পনার সেই শ্রীবৃন্দাবনে আসিলাম; ইহা মনে করিতেই আমার কান্না আসিয়া পড়িল। এই সময়ে দেখিলাম, দুই ধারের বনে ও ময়দানে অত্যুজ্জ্বল, নীলাভ, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড খণ্ড জ্যোতিসকল অসংখ্য বিদ্যুদাকারে ক্ষণে-ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া সুস্নিগ্ধ প্রভা বিকীর্ণ করিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই আবার বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই নয়নাভিরাম, মনোমোহন, কৃষ্ণবর্ণের তুলনা জগতে আর নাই। সে যে কি সুন্দর, মনোমোহন তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই! সেই বিচিত্র জ্যোতি বারংবার দর্শন করিয়াও, অর্ন্তদ্ধানের পর আর কিছুতেই তাহা স্মরণে আনা যায় না। এই অনুপম দিব্য জ্যোতির খেলা দেখিতে দেখিতে আমি ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

বেলা প্রায় একটার সময়ে বৃন্দাবন-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় অনাহার ও অনিদ্রায় শরীর আমার অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল ; বুকের বেদনাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে বেশী দূর চলিতে পারিলাম না; ২/১ মিনিট চলিয়াই রাস্তার একধারে ছায়া পাইয়া বসিয়া পড়িলাম। এই সময়ে চলন্ত গাড়ি হইতে একটি ভদ্রলোক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"মহাশয় কোথায় যাবেন?" আমি বলিলাম—"গোপীনাথের বাগে।" ভদ্রলোকটি এই কথা শুনিয়া, গাড়ি থামাইয়া বলিলেন,—"আসুন, আপনি এই গাড়িতে উঠুন, আমিও সেইদিকেই যাব।" আমি গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি গোপীনাথের বাগে আসিয়া থামিল। আমি অমনই নামিয়া পড়িলাম। ঠিক এই সময়ে একজন ব্রজবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্যা বাবু, গোঁসাইজী কা পাছ্ যাওগে?

চল, হামবি উহাঁই যাতা হ্যায়।" আমি ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ব্যস্ততাবশতঃ উহাঁর পরিচয় নিতে বুদ্ধি আসিল না। একটি গলির মধ্যে কিছু দূর গিয়া, একখানা বাড়ী দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যাও ওহি কুঞ্জমে গোঁসাইজী হ্যায়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। আমি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখি, আমার গুরুদেব কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—"**কি কুলদা এসেছ ? বেশ বেশ! এসো। ঝোলা নিয়ে একেবারে উপরে এসো।**"

আমি গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া দোতালায় উঠিলাম। ঝোলা রাখিয়া গুরুদেবের শ্রীচরণে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"**শরীর অসুস্থ; একটু বিশ্রাম কর। পরে, যমুনায় গিয়ে স্নান ক'রে এসো। আমাদের সকলের আহার হয়েছে। তোমার জন্যও প্রসাদ রয়েছে।**"এই বলিয়া, গুরুদেব আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম ঠাকুরের সে আকৃতি আর নাই। সুবিশাল দেহটি শুকাইয়া গিয়া অসম্ভব দীর্ঘ দেখাইতেছে। সুন্দর নধর কান্তি এখন অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া, অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে শরীরের চর্ম্ম লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুগোল, সুন্দর, মুখমণ্ডল মাংসাভাবে 'চুপসিয়া' গিয়া দীর্ঘাকৃতি হইয়াছে। পূর্ব্বের সেই উজ্জ্বল বর্ণও আর নাই; একেবারে কাল হইয়া গিয়াছেন। মস্তকের জড়ানো দীর্ঘ কেশরাশি একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ও কণ্ঠে তুলসী, পদ্মবীজ এবং রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহের কৃশতা দেখিয়া আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া ঠাকুরের নূতন বেশ ও শীর্ণ শরীরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুরের দেহের এইরূপ দুর্দ্দশা আর কখনও আমি দেখি নাই। একটু পরে গোঁসাই কুঞ্জের অধিকারী দামোদর পূজারীকে ডাকিয়া বলিলেন—"**এঁকে, যমুনায় স্নান করায়ে নিয়ে এসো। পরে, খাবার যা আছে দিয়ে দাও।**"

আমি 'ঝোলাঝুলি' আসন-কম্বল প্রভৃতি পাশের ঘরে রাখিয়া স্নান করিতে চলিলাম। এগারোটি টাকা ছিল; তাহা খোলা ঘরে 'আল্‌গা' ভাবে রাখিয়া যাইতে ভরসা হইল না; ট্যাঁকে গুঁজিয়া লইলাম। যমুনার শীতল নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া বড় আরাম পাইলাম। আমার সঙ্গে যে টাকা আছে তাহা দামোদর দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি আমার কোমরের প্রতি টাকার দিকে ঘন ঘন লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, "এ এক বেশ উৎপাত হইল। যতকাল এই টাকা কয়টি আমার পুঁজি থাকিবে, নানাপ্রকার অভাব জানাইয়া, এ ততদিন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। সুতরাং এই আপদ হইতে নিস্তার পাওয়াই ভাল। আমাকে তো এখন কিছুদিন এখানে থাকিতেই হইবে; সুতরাং এই এগারোটি টাকা ইহাকে দিয়া যদি আমার খাওয়া দাওয়ার একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লই, তাহা হইলে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি।" এই মতলব করিয়া, আমি টাকা কয়টি 'ট্যাঁক' হইতে খুলিয়া লইলাম; এবং দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম, পূজারীজী, আপনি এই টাকা কয়টি নিন।

ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়া দিবেন; আর, যতদিন আমি এখানে থাকিব, আমাকে এক মুঠো প্রসাদ দিবেন। আমার আর একটি পয়সাও নাই।" টাকা পাইয়া পূজারীজী খুব খুসী হইলেন; এবং আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আরে, তু তো বড়া ভকত্ হ্যায়! সব দে দিয়া! যেত্না দিন মন হোয়, রহো। খুব আচ্ছা আচ্ছা খিলাউঙ্গা। তেরা উপর রাধারাণীকা বহুৎ কৃপা।" আমি একটু হাসিলাম। অতঃপর, আমরা কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম।

দাউজীর মন্দিরের সংলগ্ন রান্নাঘরে দামোদর আমাকে বসিতে দিলেন। পরে, একখানা শালপাতায় সাজানো ডাল, ভাত, রুটি আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, " গোঁসাই বাবা প্রসাদ পাওতে পাওতে এত্না সব উঠাকে রাখ দিয়া।" শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আহা, ঠাকুরের এত দয়া! আজই আমি যথার্থ প্রসাদ পাইলাম। এ প্রসাদ আমার পক্ষে অতিরিক্ত হইলেও, খুব আনন্দের সহিত রুচিপূর্ব্বক সমস্তটাই খাইলাম।

দণ্ডাঘাত।

আহারান্তে গোঁসাইয়ের নিকটে গিয়া বসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—**তোমার দাদা কেমন আছেন? তাঁর সেই বন্ধু দেবেন্দ্র এখন কোথায়?**

আমি বলিলাম—দাদা ভাল আছেন। সেই হ'তে দেবেন্দ্রের সহিত দাদার আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। আপনার দণ্ডাঘাত না পড়্লে দাদাকে দেবেন্দ্র মেরেই ফেল্‌ত মনে হয়।

গোঁসাই। **উঃ! কি ভয়ানক লোক! আর কিছুদিন ওখানে থাক্‌তে পেলে সে বিষম বিপদই ঘটাত, তোমার দাদার দফা শেষ কর্‌ত। জঘন্য মতলব সাধনের জন্য সে ওখানে ছিল। তোমার দাদা এ পৃথিবীর লোক নন; সংসারের কোন ধার ধারেন না; তিনি এ যুগেরই নন; সত্যকালের লোক। দেবেন্দ্রের সঙ্গে তোমার দাদার কোন ঝগড়া হয় নাই তো?**

আমি। ঝগড়া কিছুই হয় নাই। আপনি দাদার নিকট হ'তে চলে আসার পর ল্যাঙ্গা বাবা ও পতিতদাস বাবা দাদাকে দেবেন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে বলেছিলেন। কিন্তু, দেবেন্দ্রের গুণে দাদা এত মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, তার ধার্ম্মিকতা দেখে এতই ভুলে ছিলেন যে,মহাত্মাদের আদেশ প্রতিপালনেও দাদার প্রবৃত্তি হ'ল না। দেবেন্দ্রের বশীকরণ বিদ্যা খুব অভ্যাস ছিল; তাতেই, বোধ হয়, দাদাকে একেবারে হাতের মুঠোয় ক'রে নিয়েছিল। পরে, আপনি যে দিন কাণপুর হ'তে তাহার উপর দণ্ডাঘাত কর্‌লেন, সেই দিনই দেবেন্দ্র অকস্মাৎ কেমন যেন হ'য়ে গেল; একেবারেই নিস্তেজ ও শক্তিহীন হ'য়ে পড়্‌ল। ভিতরে তার যে কি হ'য়েছিল তা কেহই জানে না। সে দাদাকেও কিছু না বলে সেই সময়েই পালাল। শুন্‌লাম ফয়জাবাদ হ'তে ৫/৬ ক্রোশ দূরে, যমুনাতীরে একটা গ্রামে গিয়ে সে ছিল। ওখানে তার কঠিন রোগ হয়, অত্যন্ত ক্লেশ পায়। পরে নাকি উন্মাদ হ'য়ে কোথায় চলে যায়। এখন সে মারা গিয়েছে না বেঁচে আছে, জানি না। কেহ কেহ বলে বেঁচে নাই। রোগের সময়ে ইচ্ছা কর্‌লেই তো সে দাদার কাছে

আস্‌তে পার্‌ত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে মতিও তার হয় নাই। ধর্ম্মের ভাণ ক'রে হাজার হাজার টাকা দাদাকে ঠকিয়ে নিয়েছে। এমন কি, আমরা দাদার জীবনের পর্য্যন্ত আশঙ্কা করেছিলাম।

দাদার কথা গোঁসাই অনেকক্ষণ বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি নীচে যাইয়া দেখি, দাউজীর মন্দিরের সম্মুখে গুরুভ্রাতারা বসিয়া দাদারই কথা বলিতেছেন। ওসব বিষয় আমার পূর্ব্বে জানা ছিল; এখনও আবার সকলের মুখে শুনিলাম। গোঁসাই ফয়জাবাদ হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিবার সময়ে শিষ্যগণসহ কাণপুরে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় কয়েক দিন ছিলেন। এক দিন সকালে চা-পানের পর গুরুভ্রাতারা সকলে গোঁসাইয়ের কাছে বসিয়া আছেন, কয়েকটি গুরুভ্রাতার নজরে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য পড়িল। তাঁহারা দেখিলেন, সাপের বেঙ্ গেলার মত, একটা পিশাচ ধীরে ধীরে দাদার পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল, আরও গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী (হরিমোহন) অমনই গোঁসাইয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"দয়া ক'রে রক্ষা করুন। হরকান্তকে পিশাচে গ্রাস কর্‌ল।" গোস্বামী মহাশয় একই অবস্থায় স্থির ভাবে থাকিয়া একটু মৃদু মৃদু হাসিলেন। পরে বলিলেন—**"আচ্ছা, আমার দণ্ডটা দাও তো!"** একটি গুরুভ্রাতা তখনই দণ্ডখানি আনিয়া গোঁসাইয়ের সম্মুখে ধরিলেন। গোঁসাই দণ্ডখানা হাতে লইয়া, একবার মাটিতে একটু আঘাত করিয়া বলিলেন—**"যাক, নিশ্চিন্তি।"** ঠিক সেই দিন, সেই সময়েই দেবেন্দ্র হঠাৎ নির্ব্বিষ সর্পের মত একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। দাদা লিখিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবেন্দ্রের ভিতরে কি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। সে ক্লেশের হেতু আমাদের নিকটে প্রকাশ না করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় গোস্বামী মহাশয়ের ইচ্ছাতেই দেবেন্দ্রের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই সে আর এ মুখো হয় নাই।" ইত্যাদি।

আমার উভয়সঙ্কট।

গুরুভ্রাতারা আমাকে বলিলেন—"ভাই, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছ, খুবই আনন্দের কথা। এখন কিছুদিন এখানে থাকিতে পারিলেই ভাল। যাঁর কাছে আসা, যাঁকে নিয়া থাকা, তিনি আর সেইমত নাই; সে গোঁসাই আর নাই; এখন তিনি অন্য প্রকার হইয়াছেন। সর্ব্বদাই বিষম উগ্রভাব ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছু বলুন আর নাই বলুন, বসার ঢং আর চোখের চাহনি দেখিলেই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সারাদিনেও একটিবার কাছে ঘেঁষিতে পারি না; কাছে বসিতে পারি না। যদি কখনও আমাদের কাহাকেও ডাকেন—ডাক শুনিলেই চমকিয়া উঠি। একবার পিছনে একবার সামনে তাকাইয়া, অবশেষে ধীরে ধীরে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গিয়া উপস্থিত হই। তার পর কিসে কি হয় বুঝি না; কথা তাঁহার সঙ্গে যাহাই হোক না কেন, পরিণামে বিষম ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসি। কাহারও সামান্য একটু ত্রুটি

দেখিলে আর রক্ষা নাই—ভয়ানক শাসন করেন, কখনও কখনও কুঞ্জহইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তাই, ভয়ে ভয়ে আমরা প্রয়োজনমত কুঞ্জে থাকিয়া, অবশিষ্ট সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরি। তুমি,ভাই, একটু সাবধান হইয়া থাকিও। গোঁসাইয়ের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বদাই আমরা সশঙ্কিত আছি। পাছে ধাক্কা খাইয়া শীঘ্রই তোমাকে সরিয়া পড়িতে হয়, এই জন্যই এসব কথা বলিয়া রাখিলাম" আমি বলিলাম—"কেন? তোমরা গোঁসাইয়ের শান্তরূপ কি কখনও দেখ না?" শ্রীধর বলিলেন—"তা দেখ্‌ব না কেন? শান্তভাবে যখন থাকেন তখন আবার এতই গম্ভীর হন যে, কাহার সাধ্য কাছে যায়? অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। দু'টি ভাবই অতিরিক্ত। পূর্ব্বে কখনও গোঁসাইকে এই প্রকার অবস্থায় থাকিতে দেখি নাই। তাই বলি—সাবধান!"

গুরুভ্রাতাদের কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বেগে পড়িলাম। আমার বেদনার ব্যারাম, উঁহাদের মত বাহিরে বাহিরে ঘুরিবার আমার সামর্থ্য নাই; চেষ্টা করিতে গেলেও অমনই শয্যাগত হইয়া পড়িব। সুতরাং আমার পক্ষে সেটি একেবারেই অসম্ভব। ভাবিলাম—

"না যাইলে বধে রাজা, যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের সনে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

আমার দশাও এই প্রকারই হইল, আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। যাহাই হউক, আমি গোঁসাইয়ের আসনের নিকটে গিয়া বসিলাম। এই সময়ে দামোদর পূজারী আসিয়া করজোড়ে গোঁসাইকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"বাবা, আপ্‌কা বচন সিদ্ধ হ্যায়। আপ্‌ সবিরে য্যায়সা কহা—ত্যায়সাহি হামারা মিল্‌ গিয়া। এই বাবু বড়া ভকত হ্যায়, বড়া সুপাত্র হ্যায়— হামকো এগারো রূপিয়া দিয়া।" গোঁসাই বলিলেন—**দাউজী বড়ই দয়াল! বেশ ক'রে, প্রাণ ভ'রে তাঁর সেবা কর, দেখবে তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্‌বেন না। তা না হ'লেই মুস্কিল।**

শুনিলাম, আজ ভোরবেলা দামোদর পূজারী গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—"বাবা, ভাণ্ডার শূন্য, আজ দাউজীর ভোগ কি প্রকারে হবে?" গোঁসাই তখন বলিয়াছিলেন—**আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হ'য়ো না; আজ তুমি কিছু পাবে।**

শ্রীবৃন্দাবন বাসের বিধি।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর নিজহইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন—"**শ্রীবৃন্দাবনে এসেছ, বেশ হ'য়েছে। এখানে তো কোন কাজকর্ম্ম নাই। এখন সারাদিন খুব সাধন ভজন কর। রাত্রে আহারান্তে তিন চার ঘণ্টা ঘুমায়ে নিও; পরে, গভীর রাত্রে উঠে নাম ক'রো। গভীর রাত্রে সাধন ভজনের একটা বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই অনুভব করা যায়। এস্থানের তো কথাই নাই। কিছুদিন নিয়মমত বস্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, এই স্থান পৃথিবীর আর আর স্থানের মত নয়—একে অপ্রাকৃত ধাম বলে। এই ধামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে হ'লে, এস্থানের জন্য যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, তা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হয়। কোন তীর্থে বাস কর্‌তে হ'লেই সে স্থানের জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ বিধি নিষেধ আছে, তা প্রতিপালন ক'রে না চল্‌লে সে স্থানের**

যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। এস্থানে বাস কর্‌তে হ'লে, (১) হিংসা ত্যাগ কর্‌তে হয়, (২) পরনিন্দা বিষবৎ ত্যাগ কর্‌তে হয়, (৩) বৃথা কালক্ষেপ কর্‌তে নাই, (৪) অনিবেদিত বস্তু কখনও খেতে নাই, (৫) সর্ব্বদা সাধন ভজনে থাক্‌তে হয়। এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে কিছুকাল চল্‌লেই, এধাম যে কি, ধীরে ধীরে তা টের পাবে। দু'পাঁচ দিন এখানে থেকে যাঁরা চ'লে যান, তাঁরা আর এস্থানের মাহাত্ম্য কিরূপে বুঝ্‌বেন? গর্ভবতী স্ত্রী যেমন সুস্থ শরীরে নিয়মে থেকে দশ মাস পরে সন্তান প্রসব করেন, এসব স্থানেও সেইরূপ দীর্ঘকাল থাক্‌তে হয়। অন্ততঃ একটি বৎসরও নিয়মমত থাক্‌লে ধামের একটা প্রভাব বুঝ্‌তে পারা যায়। আমি তো এসব কিছুই জান্‌তাম না। পরমহংসজীর আদেশমত কিছুকাল এখানে বাস ক'রেই এখন দিন দিন স্থানের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ক'রে অবাক্ হচ্ছি। নিয়মমত খুব সাধন কর—বিশেষ উপকার পাবে। এ ধামের প্রভাব বড়ই চমৎকার।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"গর্ভধারণ ক'রে সুস্থ শরীরে থাক্‌লে দশ মাস পরে যেমন সন্তান প্রসব হয়, তীর্থের নিয়ম যথারীতি প্রতিপালন ক'রে দীর্ঘকাল তীর্থবাস কর্‌লে, তীর্থদেবতাই কি পুত্ররূপে প্রকাশিত হন?"

ঠাকুর বলিলেন—পুত্ররূপে ব'লে কথা নয়; তাঁর রূপেই তিনি প্রকাশ পান। গর্ভধারণের মত নিয়ম ধারণ ক'রে তীর্থবাস কর্‌তে হয়, তবে তো?

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আক্ষেপ ও শেষ কথা।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অকস্মাৎ দেহত্যাগের কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ব্রহ্মচারী মহাশয় আরও এক্‌শত বৎসর থাকিবেন, বলিয়াছিলেন। এত শীঘ্র তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন কেন? কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল?'

গোঁসাই। মৃত্যু কি আর মহাপুরুষদের হয়? রোগ—তা'ও একটা দেখাবার জন্য। ইচ্ছা ক'রেই তিনি দেহ ছেড়েছেন। বল্‌লেন-এখন তাঁর আর থাক্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁর থাকায় বরং আরও লোকের ক্ষতি হবে।

আমি বলিলাম—'ইচ্ছা ক'রে দেহ ছাড়লেন কেন? দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?'

গোঁসাই। হাঁ, ঢের বলেছিলেন। দেহ ত্যাগ করার পূর্ব্ব রাত্রিটি তিনি এখানেই ছিলেন। সারা রাত আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হ'ল। আমাকে বার বার জেদ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তুই আমার আসনে গিয়ে বোস্; আমি আর দেহে থাক্‌ব না।" আমি বল্‌লাম—'এক বৎসর এখানে থাক্‌ব সঙ্কল্প ক'রে আমি আসন ক'রেছি; আমার এধাম ছেড়ে যাবার যো নাই।" তিনি বল্‌লেন—"তবে আমি এ দেহ ছেড়ে দি?" আমি বল্‌লাম—'আপনার যা ইচ্ছা করুন। আপনার দেহের জন্য আমার একটুকুও মায়া নাই।'

আমি গোঁসাইয়ের কথা শুনিয়া বলিলাম—'আপনার সঙ্গে ঝগড়া হইল কোন বিষয়

নিয়ে?'

গোঁসাই। আর কিছু নয়, তোমাদেরই বিষয় নিয়ে। ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে তাঁর কথা-বার্ত্তা শুনে তোমাদের মধ্যে কারো কারো ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়েছে। তাই তাঁকে বল্‌লাম যে, আপনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়ে কারোকে কারোকে অদৃষ্ট প্রারব্ধ ব'লে ব'লে, তাদের মন বিগ্‌ড়িয়ে দিয়েছেন। তারা সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে অন্যপ্রকার হ'য়ে গেছে। এখন তাদের সংশোধন হওয়া শক্ত। লোকের তো এইরূপ উপকারই কর্‌ছেন! তিনি বল্‌লেন,—"আরে, যার যেমন সংস্কার, সে আমার কথা তেমনই বুঝে। আমি কি কর্‌ব? এক একজনে আমাকে এক একপ্রকার বলে। আমাকে কিন্তু কেউ বুঝ্‌লে না, চিন্‌লে না। আমার নিজের তো কোনও প্রয়োজন নাই, তাদেরই জন্য থাকা। তারাই যখন আমাকে চিন্‌লে না, আমার দ্বারা তাদের কোন উপকারই আর হবে না, তখন আর থেকে লাভ কি? আমি দেহ ছেড়ে দিই।" আমি দেখ্‌লাম, এবার বাস্তবিকই আর তাঁহার দ্বারা কারো কোন উপকার হবে না। তাঁর কথা সত্যই লোকে বুঝে না; তাঁর ভাব ও ভাষা অন্যপ্রকার। তাই তাঁকে থাক্‌তে আর অনুরোধ কর্‌লাম না।

আমি। ব্রহ্মচারীর ভাব আমরা বরং না বুঝতে পারি—কথাও কি বুঝতাম না?

গোঁসাই। বুঝ কোথায়? একটি লোক ব্রহ্মচারীকে গিয়ে বল্‌লেন, 'মশায়, শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্ত্রীসঙ্গ কর্‌তে বলেছিলেন, তা তো আমি পারি না। আমার কাম অত্যন্ত বেশী। এখন আমি কি কর্‌ব? ব্রহ্মচারী তাঁকে বল্‌লেন, "যদি নাই পারিস, কি আর কর্‌বি? বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে, ব্যভিচার কর্ গিয়ে।" সেই লোকটি আমাকে এসে বল্‌লেন—"মশায়, ব্রহ্মচারী আমাকে বেশ্যাগমন কর্‌তে ব'লেছেন। মহাপুরুষের কথামত কাজ কর্‌লে কখনই তো পাপ হবে না।" ও-কথা শুনে আমার সন্দেহ হ'ল। 'ব্রহ্মচারী কখনও কি এমন কথা বল্‌তে পারেন? ব্রহ্মচারীর কথার কখনও ঐ প্রকার ভাব নয়। আমি এই বলাতে সেই ভদ্রলোক পুনঃপুনঃ জেদ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"মশায়, আমি মিথ্যা বল্‌ছি না। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে।" ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'তে আমি তাঁকে বল্‌লাম, "আপনি এ সব কি কর্‌ছেন? আপনার উপদেশে যে লোকের সর্ব্বনাশ হবে, ধর্ম্মকর্ম্মে সকলে জলাঞ্জলি দিবে; স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে সমাজ উৎসন্ন যাবে। 'বেশ্যা-গমন কর্ গিয়ে' 'ব্যভিচার কর গিয়ে' 'ঘুষ নে,' আপনার এ সকল কথা ধ'রে লোকে যে বিষম কাণ্ড কর্‌বে।" শুনে ব্রহ্মচারী আমাকে বল্‌লেন, "আরে, তুই বলিস্ কি? ও-শালারা আমার কাছে আসে কেন? আমার কথা বুঝে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেন? বিধিমত যারা স্ত্রীসঙ্গ কর্‌তে না পারে, তাদেরই ব'লে দি—'ব্যভিচার কর্ গিয়ে, বেশ্যাগমন কর্ গিয়ে।' তাই ব'লে কি অন্য স্ত্রীসঙ্গ কর্‌তে ব'লেছি, না বাজারের বেশ্যাগমন কর্‌তে বলেছি? শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচারই তো ব্যভিচার; শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন ক'রে আপনার স্ত্রীগমনও বেশ্যাগমন। আমি তো এইপ্রকার ব্যভিচার, এরূপ বেশ্যাগমনের কথাই বলেছি।" একবার একটি ব্রাহ্ম ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়ে,

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌লেন। ব্রহ্মচারী তাঁর সব কথা শুনে বল্‌লেন, "ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, তারই মুখে আমি মুতি।" এই কথা শুনে ব্রাহ্মটি অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে চলে গেলেন। দশ জনার কাছে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'ব্রহ্মচারী ভয়ানক পাষন্ড, সে নাস্তিক।" ঈশ্বরের মুখে হাগি মুতি এপ্রকার কথা সে বলে। ব্রহ্মচারীকে একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন, "ওরে তিনি যে নিজেই খুব উচ্চ অবস্থার কথা বলেছিলেন। তা হ'লে আমার ওকথা শুনে বিরক্ত হ'লেন কেন? তিনি বল্‌লেন, 'ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী।' আমি বল্‌লাম, সেই ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, আমি মুতি। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হ'লে আমি হাগি মুতি কোথায়, তোরাই বল্ না?" ব্রহ্মচারীর সকল কথাই এইপ্রকার ছিল। তাঁর কথা লোকে বুঝ্‌তে না পারায় অনেক গোল ঘটেছে।

আমি। তিনি আমাকে কত ভরসা দিয়াছিলেন। তিনি থাক্‌লে সে সব তো কর্‌তেন।

গোঁসাই। সেজন্য আর ভাবনা কি? আমি আছি কেন? তোমাদের যা বলি, ক'রে যাও। তোমাদের যা কর্‌বার, আমিই তা কর্‌বো। সেজন্য আর কারো উপর তোমাদের ভরসা কর্‌তে হবে না। তোমাদের কিছুই অভাব থাক্‌বে না। সময়ে সবই পূর্ণ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রহ্মচারী মহাশয় কি আবার জন্মগ্রহণ কর্‌বেন?

গোঁসাই। হাঁ, তাঁর কাজ আছে। তিনি শীঘ্রই বুদ্ধদেবের মত পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে এই বুঝিলাম, যেন গোস্বামী মহাশয়ই ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সরাইয়া দিলেন। একটিবারও যদি ঠাকুর তাঁহাকে এ সংসারে থাকিতে বলিতেন, তাহা হইলে কখনও তিনি এত শীঘ্র দেহত্যাগ করিতেন না।

অবশেষে গোঁসাই বলিলেন—অনেকে তাঁর ভাব ও ভাষা না বুঝে বিপন্ন হয়েছেন। আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলেছিলাম, "যে ভাবে, যেরূপ কথা বল্‌লে সাধারণ লোকে আপনার যথার্থ ভাব বুঝতে পারে, সেই প্রকারে তাদের বলেন না কেন?" তাতে ব্রহ্মচারী বল্‌লেন— "বটে! এখন আমি তাদের ভাষা শিখ্‌তে যাব নাকি ? ওসব লোক আমার কাছে আসে কেন? আমি তো কাউকে ডেকে আনি না।"

সদ্‌গুরুর কৃপা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

গুরুদেব আমাদের জীবনের অনন্ত উন্নতির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই পথে তিনি নিজেই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন, এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপরে যে নির্ভর করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার যথার্থই লজ্জা হইতে লাগিল। গোঁসাইকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ মনে আমি নাম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভাবিলাম,

"সমস্ত অভাব যদি গোঁসাই-ই পূর্ণ করিতে পারেন, তবে আর এত ভুগিতেছি কেন? যাঁর এত দয়া, তিনি কি কখনও অন্যের ক্লেশ দূর করিতে পারিলে তাহা না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন?" গোঁসাইকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম, এ সময়ে একবার আমার পানে তাকাইয়া নিজহইতেই তিনি বলিতে লাগিলেন—**খুব সাধন ক'রে যাও। এখন ফলাফলের দিকে মন রেখো না। সময়ে ফল পাবে। অসময়ে তো কিছুই হয় না। সকলেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। দেখ, গাছে যে ফুল হয়, ফল হয়, তার একটা সময় আছে। চাষারা যে চাষ করে, তারও একটা কাল ঠিক আছে; কাল অতিক্রম ক'রে কেহ কিছু করে না। দেখেছ তো—চাষারা বীজ বোন্‌বার পূর্ব্বে কত করে? সময়মত হালচাষ ক'রে ক্ষেতে আগাছা, গোড়া আবর্জ্জনা সকল পরিষ্কার ক'রে বেছে ফেলে; পরে বীজ বোনে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আবার সুন্দর ক'রে নিড়িয়ে দেয়। তবে সে সব গাছে তেজ হয়, ফসলও খুব সুন্দর হয়। যে সকল চাষা আগে ক্ষেত পরিষ্কার না করে, নানা প্রকার জঙ্গল আগাছা জন্মিয়া তাদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে। তখন চাষাদের আগাছা তুল্‌তে তুল্‌তে প্রাণ যায়, আর ওসব গাছের ফসলও ভাল হয় না; চাষাদের তো দুর্দ্দশার একশেষ, ফসলের দফায়ও ইতি। সমস্তই এইপ্রকার জান্‌বে। যথাসময়েই চাষারা সমস্ত ক'রে নেয়; অসময়ে কিছু কর্‌তে গেলে সেরূপ হয় না। যেমন বলা যায়, ক'রে যাও। অভাব কিছুই থাক্‌বে না। সময়ে সমস্তই হবে। খুব নাম কর।**

গোঁসাইয়ের এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল—তবে আর সদ্‌গুরুর আশ্রয় লোকে নেয় কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম—"সময়ে যার যা হবে তাহা তো হবেই। সেজন্য চেষ্টা করি আর না করি, গুরুর সাহায্য হউক্ আর নাই হউক্ স্বভাবেই হবে। তা হ'লে আর সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে লাভ কি হ'ল? সদ্‌গুরু কৃপা ক'রে যখন তখনই কি একটা অবস্থা খুলে দিতে পারেন না? সময়েই যদি সব হয় তবে আর 'কৃপা' শব্দের অর্থ কি?" গোঁসাই বলিলেন—**সদ্‌গুরুর কৃপায় সমস্তই হ'তে পারে; আর গুরু যখন ইচ্ছা তখনই সব ক'রে দিতে পারেন—একথা যথার্থ। কিন্তু, তাতে লাভ কি? একটা বস্তুর মূল্য না জান্‌তে যদি তা সহজে লাভ হয়, তা হ'লে সেজন্য যত্ন হয় না। যে বস্তুর জন্য যত অভাববোধ, তা লাভ হ'লে তাতে ততই দরদ; যে বস্তুর অভাবে যত ক্লেশ, সে বস্তুর লাভে ততই আনন্দ। গুরু হঠাৎ একটা অবস্থা দিলে তার তো আর মর্য্যাদা বুঝা যায় না। এইজন্য সাধন ভজন ক'রে, চেষ্টা ক'রে, যখন লোকে বুঝে একটা অবস্থা লাভ করা কত শক্ত, উহা কত দুর্ল্লভ, তখন গুরু কৃপা ক'রে ঐ অবস্থা দেন। বস্তুর মূল্য জানিয়ে গুরু তা শিষ্যকে দেন—এই-ই নিয়ম।**

আমি বলিলাম—"বস্তুর মর্য্যাদা কর্‌তে না পার্‌লে, বস্তুর মর্য্যাদা না বুঝ্‌লে তাহা আমি যেন পাই না। যে বস্তু পেয়ে আবার হারাতে হবে তাও আমি চাই না। আমার ভিতরে আবর্জ্জনা সব দূর করে দিন, তাহা হ'লেই বেঁচে যাই। গুরুর কৃপায় যখন সমস্তই হবে তখন আমার কি আর কিছু কর্‌বার আছে?"

গুরুদেব আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে, খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"**যা বলি তা'ই ক'রে যাও। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে, খুব চেষ্টা কর। নামসাধনের মত এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আমার নিজের জীবনে নামসাধনের ফল পেয়েছি। একবার তেমন ভাবে নামসাধন ক'রে দেখ দেখি, কেমন ফল না পাও। প্রথম প্রথম নাম কর্‌তে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়; কিন্তু তাই ব'লে ছাড়্‌তে নাই। বিরক্তি বোধ হয়, হ'লই বা? তাতে তো কোনও ক্ষতি নাই? খুব নাম ক'রে যাও। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করায় বড় উপকার। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌লে প্রারব্ধ ক্রমে ক্রমে কেটে যায়। তখন ভাল ভাল অবস্থাও লাভ হ'তে থাকে। প্রারব্ধ ক্ষয়ের এমন উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই।**" এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া, দাউজীর মন্দিরের বারেন্দায় গিয়া বসিলাম। একটু পরে দাউজী ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হইল। আমার ভাল লাগিল না। আমি আবার উপরে যাইয়া বসিলাম। বেদনার যাতনা খুব হইতে লাগিল।

গোপীনাথজীর মন্দিরে মহোৎসব। ঠাকুরের নৃত্য।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, কুঞ্জহইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হই নাই। শুনিলাম, আজ শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হইবে। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ সেই উৎসবে সম্মিলিত হইবেন। একটু বেলা হইলে, গুরুদেবের সঙ্গে আমরা মন্দিরের দিকে চলিলাম। রাস্তায় একটি বৃহৎ সঙ্কীর্ত্তন আসিতেছে দেখিলাম। গোঁসাই, সঙ্কীর্ত্তন উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, বিস্তৃত পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। করজোড়ে, সতৃষ্ণ নয়নে কীর্ত্তনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোঁসাইয়ের আপাদমস্তক থর থর কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্‌ কম্পিত করিয়া কীর্ত্তনটি গোঁসাইয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবগণ গোঁসাইকে দর্শন করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোঁসাইকে পরিক্রমণ পূর্ব্বক মহা উল্লাসের সহিত, মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গোঁসাই তখন সম্মুখের দিকে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক, উচ্চৈঃস্বরে—"**জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন**" বলিতে বলিতে পড়িয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তনের বহুসংখ্যক পৃথক্‌ দল মহা উৎসাহে মিলিত হইয়া, গোঁসাইকে বেষ্টন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। গোঁসাই ব্রজের রজে পুনঃপুনঃ গড়াইয়া, ধূলিধূসরিত অঙ্গে, এই সময়ে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে, খোল করতালের তালে তালে দু'চার বার পা ফেলিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। "**জয় হে! জয় হে!**" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি মল্লবেশে নৃত্য করিয়া সেই জনসঙ্কুল, বিস্তৃত রাজপথে, বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। জানি না, কি প্রকারে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে গোঁসাইয়ের সেই প্রকাণ্ড দেহটি বায়ুভরে যেন উড়িতে লাগিল। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে যখন যে দিকে গোঁসাই ছুটিলেন, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবল তুফান উঠিয়া সে সকল দিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া

গেল। গোঁসাইয়ের ঘন ঘন হুঙ্কার ও মহুর্ম্মুহুঃ হরিধ্বনি শুনিয়া সকলে যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। স্থানে স্থানে বৈষ্ণবগণ ভাবাবেশে 'বেহুঁস' হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে গোঁসাই কীর্ত্তনস্থলে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিয়া, স্থানে স্থানে এক একবার চকিতের মত দাঁড়াইয়া, অমনই সম্মুখের দিকে হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক, "জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন!" বলিতে বলিতে ভূমিতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। ব্রজের রজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তখনই আবার লাফাইয়া উঠিলেন; এবং অধিকতর উদ্যমের সহিত হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবোন্মত্ত শ্রীধর উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বহির্ব্বাস কম্বল উড়াইয়া গোঁসাইয়ের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উঁহার হুঙ্কার গর্জ্জন ও অদ্ভুত আস্ফালনে বৈষ্ণব বাবাজীরাও মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিচিত্র ভাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি পশ্চাদ্দিকে সরিয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমার পিছন দিকে চাহিয়া দেখি গোঁসাই-নন্দন শ্রীমৎ যোগজীবন দৌড়াইয়া আসিতেছেন। যোগজীবন ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আছেন, ইহাই জানি; অকস্মাৎ তাঁহাকে এ সময়ে কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। সঙ্কীর্ত্তনস্থলে গোঁসাইকে দেখিয়া, যোগজীবন মত্ত হইয়া উঠিলেন। বহুদূরহইতেই ঠাকুরকে ধরিবার জন্য হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক বারংবার অগ্রসরহইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মাতালের মত স্খলিত-পদে, চলিতে গিয়া পদে পদে দক্ষিণে বামে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমি যোগজীবনকে ধরিয়া রহিলাম। এই সময়ে গোঁসাই হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যোগজীবনের প্রতি ক্ষণকাল স্থির ভাবে দৃষ্টি করিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। যোগজীবন 'ঢুলু ঢুলু' নেত্রে গোঁসাইয়ের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র তাকাইয়াই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন।

গোঁসাই সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভাববিহ্বল যোগজীবনকে লইয়া একটু পরে আমিও তথায় উপস্থিত হইলাম। মন্দিরাঙ্গনে যাইয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াই গোঁসাই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। বেলা ৩ টা পর্য্যন্তও গোঁসাইয়ের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সমাধিভঙ্গের পর গোঁসাইকে লইয়া আমরা সকলে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম।

মাঠাকুরাণীর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন। দাউজীর মন্দির।

শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী তাঁহার ছোট ভগিনী কুতুবুড়ী (শ্রীমতী প্রেমসখী) ও জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী যোগমায়া দেবীকে লইয়া অদ্য শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই উঁহাদিগকে দেখিলাম। মাঠাকুরাণীকে পাইয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হইলাম। মা'ও আমাদের সকলকে খুব আদর করিলেন। গোঁসাই কিন্তু মাঠাকুরাণীর সঙ্গে তেমন ভাবে কোনও কথাবার্ত্তা বলিলেন না। সাধারণ ভাবে দু'চার কথায় গেণ্ডারিয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজ আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শুনিলাম, মাঠাক্‌রুণ এবার গোঁসাইকে কোন প্রকার সংবাদ না দিয়াই এখানে আসিয়াছেন। গোঁসাইয়ের শরীরের দুরবস্থা মাঠাক্‌রুণ

বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে অনেক অসুবিধা ঘটিবে বুঝিয়াও, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। মাঠাক্‌রুণ গোঁসাইয়ের দেহের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

এই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীতে আমাদের থাকিবার সুব্যবস্থা গোঁসাই নিজেই করিয়া দিলেন। নীচে আমাদের থাকিবার স্থান নাই। বাড়ীটি খুব ছোট। সমস্ত বাড়ীতে আন্দাজ ৫/৬ কাঠা জমি। এই বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে সদর দরজা। এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখেই ১০/১২ হাত অন্তরে পূর্ব্বদ্বারী দাউজী ঠাকুরের মন্দির। সম্মুখে একটি বারেন্দা আছে। মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নতলে মাত্র দুইখানি ঘর। একখানি ঘর অপেক্ষাকৃত একটু বড়; তাহাতেই ভোগ রন্ধন ও প্রসাদ পাওয়া হয়; পশ্চাৎ দিকের ছোট ঘরে একটি ব্রহ্মচারী থাকেন। ব্রহ্মচারীর ঘরের পাশ দিয়াই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। এই সিঁড়িটি উপরের লম্বা বারেন্দার পশ্চিম দিকে উঠিয়াছে। বারেন্দার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি তিনখানি ঘর। সিঁড়িতে উঠিয়া প্রথম ঘরখানিতেই গোঁসাইয়ের আসন। কোনও জানালা না থাকায় এই ঘর দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার থাকে। এই ঘরের দরজার ঠিক পূবধারে উক্ত বারেন্দাতেই গোঁসাইয়ের আসন সারাদিন পাতা থাকে। উত্তরমুখী হইয়া গোঁসাই উদয়াস্ত এই আসনেই স্থির ভাবে বসিয়া থাকেন। বাড়ীর উত্তরাংশে যৎকিঞ্চিৎ খোলা জমি পড়িয়া থাকায় বারেন্দা হইতে দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। গোঁসাইয়ের আসনঘরের পূর্ব্ব দিকে, অর্থাৎ মধ্যের ঘরখানায়, আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। সর্ব্বশেষের পূর্ব্ব দিকের ঘরে কুতুবুড়ী ও যোগজীবনকে লইয়া মাঠাকুরাণী থাকিবেন। আমাদের ঘরেও তেমন আলো প্রবেশ করে না। এজন্য দিনের বেলায় মাঠাকুরাণীর ঘরে আমরা ইচ্ছামত থাকিতে পারিব। মাঠাকুরাণীর ঘরের পূর্বদিকে একটি বড় জানালা থাকায় ঘরখানা বেশ পরিষ্কার। এই ঘর গোঁসাইয়ের আসনহইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ বলিয়া, আমাদের কথাবার্ত্তা বলিবারও বেশ সুবিধা হইয়াছে।

ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টিতে উৎকট রোগের শান্তি। নানাকথা।

২৩শে আষাঢ়, রবিবার।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আমার পিত্তশূল রোগের কিছুই উপশম বুঝিতেছি না। রাত্রে নিদ্রা না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষম যন্ত্রণাদায়ক শূলের বিরাম নাই। বিকালবেলাও গোঁসাইয়ের কাছে একটু বসিতে পারি না; বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয়। যেদিন বৃন্দাবনে আসিয়াছি সেইদিনহইতে এ বেদনার যন্ত্রণা আরও যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। গোঁসাই আমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল দেখিয়া, নিজের খাওয়ার সামান্য পরিমাণ দুধটুকুরও অর্দ্ধেকটা প্রতিদিন আমাকে দিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার খাওয়ার সামান্য পরিমাণ দুধের অর্দ্ধেকটা আবার আমাকে দেন কেন? আমার দুধের কোনও দরকার নাই।"

গোঁসাই বলিলেন—"**ছেলেবেলা থেকে তোমার দুধ খাওয়া অভ্যাস। এখন না খেলে অসুখ হ'তে পারে।**" আমি খাইতে না চাহিলেও, গোঁসাই জেদ্ করিয়া প্রত্যহ আমাকে দুধ দিতেছেন।

প্রত্যূষে যমুনায় স্নান করিয়া আসিয়া গোঁসাইয়ের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। একটু বেলাহইতেই আমার বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। পাছে গোঁসাই জানিতে পারেন এই ভয়ে, বেশীক্ষণ দম ধরিয়া এক একবার ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। গোঁসাই সমাধিস্থ ছিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি দু' তিনবার গা ঝাড়া দিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। পরে, সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া, ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"**উঃ! তুমি এত ক্লেশ পাচ্ছ। আচ্ছা, তোমায় আর ভুগ্‌তে হবে না।**" এইমাত্র বলিয়া তিনি দু' তিনবার আমার দিকে তাকাইয়া আবার চোখ বুজিলেন। গোঁসাইয়ের মুখটি এ সময়ে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তিনি আবার সমাধিস্থ হইলেন।

আমার বেদনার কথা এখানে কেহ জানেন না। গোঁসাই ইহা কি প্রকরে জানিলেন? এবং 'আর ভুগিতে হইবে না', এ কথাই বা বলিলেন কেন? এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমি নীচে চলিয়া গেলাম।

আহারান্তে ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিতেছি, একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। এ সময়ে ধীরে ধীরে, জানি না কখন, বেদনাটি আমার কমিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে, বেদনা একেবারে নাই দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, 'এ আবার কি হইল? এত কাল যাবৎ যে দুঃসহ যন্ত্রণা অবিচ্ছেদে ভোগ করিয়া আসিতেছি, অকস্মাৎ তাহা কোথায় গেল?' আমি এই অসম্ভব সংঘটন দেখিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মনে হইল, 'বুঝি এ আমার গুরুদেবেরই কৃপা।' যাহা হউক, যথার্থই বেদনা সারিয়া গেল কি না, পরিষ্কার বুঝিবার জন্য রাত্রিতে অতিরিক্ত মাত্রায় রুটি ও অড়হরের ডাল এবং প্রচুর পরিমাণে লঙ্কা ও টক খাইলাম। কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমার আরামে নিদ্রা হইল; বেদনার লেশও অনুভব করিলাম না।

২৪ শে আষাঢ় সোমবার; ৭ই জুলাই।

আজ সকালে যমুনায় স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, গুরুদেব স্বীয় আসনে স্থির ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেহারাটি একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের মুখ-শ্রী দেখিয়া আমার বুক যেন ফাটিয়া গেল। অমনি হাতের বস্ত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম। ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমার রোগ নিয়া আপনি কাল হইয়া গেলেন! আমার রোগ আমাকেই দিন; উহা আমিই ভুগিব।" ঠাকুর আমার হাতখানা ছাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"**ও কি? অমন কর্‌ছ কেন? ভোগ-টোগ ও সব কিছুই তো নয়। কাহার ভোগ কে নেয়!**"

এইমাত্র বলিয়া ঠাকুর চক্ষু বুজিলেন। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসরও পাইলাম

না। বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল,"আহা! ঠাকুর আমার জন্য কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন!" ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন,—"এ রোগ প্রারব্ধের, ভোগেই শেষ হবে।" এখন হাত বুলায়ে সারাইয়ে দিতে পারি; কিন্তু তা হ'লেও জন্মান্তরে আবার ভুগ্‌তে হবে।" আহা! তখন আমি যদি ব্রহ্মচারীর কথায় রাজি হইতাম, বুকে হাত বুলাইতে দিতাম, তা হ'লে এখন আমার ঠাকুরের বুকে এই দারুণ শেল পড়িত না। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার এই ক্লেশ অধিক বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার এই দয়া জীবনে না ভুলি। আমাকে সুস্থ ও শীতল রাখিতে এই ভয়ঙ্কর ভোগ লইয়া নিজ বুকে আগুন ধরাইলে, এ কথা স্মরণে রাখিয়াই যেন আমার এ জীবন শেষ হয়।"

আহারান্তে কিছু সময় গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে গল্পে কাটিয়া যায়। প্রত্যহ ৩ টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে হরিবংশ পাঠ করিয়া থাকি। ঠাকুর উহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হন। আমি পাঠের সময়ে ঠাকুরকে বড়ই বিরক্ত করি। হরিবংশের তত্ত্বকথা আমি কিছুই বুঝি না। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব কথা তো কিছুই বুঝি না। শুধু শুধু পড়িয়া গেলে লাভ কি?"

ঠাকুর বলিলেন—**এখন শুধু পড়েই যাও। সাধনেতে ক'রে যখন এ সব তত্ত্ব প্রকাশ পাবে, তখন এ সব বুঝ্‌বে। একবার পড়ে রাখা ভাল।**

আমি। তত্ত্ব প্রকাশ হ'লে তখনই তো সব জান্‌ব। তবে আর এখন পড়া কেন?

ঠাকুর বলিলেন—"**না, পড়া থাকা ভাল। প্রত্যক্ষ হ'লে তখন এ সকল শাস্ত্র পুরাণের লেখা দেখে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।**"

আমি। যদি বিশ বৎসর পরে একটা বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তা হ'লে তার প্রমাণ কোন্ গ্রন্থে কোথায় কোন্ অংশে আছে তাহা মনে হবে কিরূপে?

ঠাকুর। **একবার পড়া থাক্‌লে, প্রত্যক্ষ বিষয়টি কোথায় পড়া হয়েছিল বিশ বৎসর পরেও তা স্মরণ হয়।**

ঠাকুরকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। ঠাকুর প্রত্যহই বিকাল বেলা শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠ শুনিবার জন্য শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী যান। উক্ত গোস্বামী মহাশয় স্বয়ংই উহা পাঠ করিয়া থাকেন। আমরাও সকলে ঠাকুরের সঙ্গে গিয়া থাকি। এরূপ ভাগবতপাঠ নাকি শ্রীবৃন্দাবনে কেহ শুনেন নাই। এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতে উক্ত গোস্বামী মহাশয় একঘণ্টাও কাটাইয়া দেন। ঠাকুর বলিলেন—**গ্রন্থপাঠের সময়ে ওঁর ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তি মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে প্রকাশ পায়। এরকম অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজকাল শুনা যায় না।**

শ্রীযুক্ত নীলমণি গোস্বামী মহাশয় ঠাকুরকে কাকা বলিয়া ডাকেন, বড়ই ভক্তি করেন।

কথাপ্রসঙ্গে আজ এক সময়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শুনিয়াছি, আমাদের বিষম মানসিক ভোগগুলি আপনি গ্রহণ করেন। প্রারব্ধের উৎকট দৈহিক ভোগও কি আপনাকে ভুগ্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওরে বাপু, সবই ভুগ্‌তে হয়।"

গোঁসাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ।

২৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার।

গোঁসাইয়ের শরীরের অবস্থা অতিশয় খারাপ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মাঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। গেণ্ডারিয়া ত্যাগ করিয়া মাঠাকুরাণী এ সময়ে যাহাতে এখানে না আসেন, এজন্য ঠাকুর পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও, মাঠাক্‌রুণ না আসিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। গোঁসাইয়ের শরীরের অবস্থা অবগত হইয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন! কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি মাঠাক্‌রুণ যেন ভয়ে ভয়ে আছেন; গোঁসাইয়ের নিকটে যান না, বসেন না। ঠাকুরও মাঠাক্‌রুণকে কোন প্রয়োজনে ডাকেন না। মাঠাক্‌রুণ সারাদিন নিজের ঘরেই বসিয়া থাকেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন কথাবার্ত্তা বলেন না। আজ রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে মাঠাক্‌রুণ সাহস করিয়া গোঁসাইয়ের আসনের নিকটে গিয়া বসিলেন; এবং ধীরে ধীরে গোঁসাইকে বাতাস করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে গোঁসাই দারুণ গরমে আসনঘরে থাকিতে পারেন না; দিনের বেলা যেখানে থাকেন, সেই বারেন্দার আসনে বসিয়াই রাত কাটাইয়া দেন। আমিও গরমে অন্ধকূপ ঘরে থাকিতে না পারিয়া বারেন্দায়ই থাকি। গোঁসাইয়ের আসনহইতে প্রায় তিন হাত অন্তরে আমার বিছানা। গোঁসাই-ই আমাকে ঐ স্থানে শুইতে বলিয়াছেন। আমি যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন। রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন একই ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, গোঁসাই ও মাঠাকুরাণীর কলহ শুনিতে লাগিলাম। শ্রীমতী শান্তিসুধা (ঠাকুরের বড় কন্যা) গর্ভবতী; বুড়া ঠাকুরাণী (গোঁসাইয়ের শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ) অসুস্থা; যোগজীবনের স্ত্রীও ছেলে মানুষ; এ অবস্থায় উঁহাদিগকে গেণ্ডারিয়ায় রাখিয়া মাঠাকুরাণীর আসা ঠিক হয় নাই, গোঁসাই পুনঃপুনঃ এ কথা বলিতে লাগিলেন, এবং মাঠাকুরাণীকে অবিলম্বে আবার ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার জন্য 'জেদ্' করিতে আরম্ভ করিলেন। মাঠাক্‌রুণ বলিলেন যে গোঁসাইয়ের শরীর এখন যে প্রকার অসুস্থ ও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, গোঁসাইকে এ ভাবে রাখিয়া কিছুতেই তিনি এখন অন্যত্র যাইবেন না। তিনি শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া তীর্থ করিতে আসেন নাই, ঠাকুরের সেবা করিতেই আসিয়াছেন এবং সেবাই করিবেন। এইপ্রকার কথা কাটাকাটিতে ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইল। গোঁসাই তখন একটু তেজের সহিত মাঠাক্‌রুণকে বলিলেন—

আমি যে আশ্রম নিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌লে সে আশ্রমের মর্য্যাদা থাকে না। তোমার শ্রীবৃন্দাবনে থাক্‌তে হ'লে, অন্যত্র গিয়ে থাক। এ কুঞ্জে থাক্‌তে পার্‌বে না। এতে তুমি যদি জেদ কর, আমি অন্যত্র চলে যাব, উত্তর কুরুতে চলে যাব।

গোঁসাইয়ের শেষ কথা শুনিয়া মাঠাকুরাণী আর কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ দিকেও রাত্রি ভোর হইল। আমি শৌচে গেলাম।

মাঠাকুরাণীর অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান।

২৬শে আষাঢ়,
বুধবার।

ভোর বেলা যথাসময়ে ঠাকুর উঠিয়া শৌচে গেলেন, আমরাও সকলে নীচে আসিলাম। যোগজীবন, সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি একে একে সকলেই স্নানে গেলেন। আমিও মুখ ধুইয়া যমুনায় যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময়ে মাঠাক্রুণ নীচে আসিলেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কি কুলদা, যমুনায় যাবে না?" আমি বলিলাম—"হ্যাঁ যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?" মাঠাক্রুণ বলিলেন—"আমি যাব। তা, তুমি যাও না? তোমার ঘটীটি আমাকে দাও।" এই বলিয়া, মা আমার হাতহইতে ঘটী নিয়া, ৮/১০ হাত অন্তরে কূয়ার পাড়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে কুলকুচি করিতে করিতে এক একবার আমার পানে তাকাইতে লাগিলেন। আমি স্নানে যাইব; ৫/৬ সেকেণ্ডের জন্য একটিবার ঠাকুর প্রণাম করিয়া, মাথা তুলিয়া দেখি, মাঠাক্রুণ নাই! কূয়ার পাড়ে ঘটীটি মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঠাকুরাণীকে না দেখিয়া আমার অত্যন্ত আর্শ্চয্য বোধ হইল; ভাবিলাম 'এত শীঘ্র মা কোথায় গেলেন? এই তো তিনি এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। যাওয়ার পথও তো কোন দিক্ দিয়াই নাই! দেওয়াল ঘেরাবাড়ী, চারিদিক পরিষ্কার! সদর দরজা দিয়া যাইতে হইলেও তো আমারই পাশ দিয়া যাইবেন।' আমি ঘটীটি তুলিয়া লইয়া, এই সব ভাবিতে ভাবিতে যমুনায় চলিয়া গেলাম। যমুনায় স্নান করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র যোগজীবন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--"কি! তুমি মাকে কোথায় রেখে এলে, মা এলেন না?"

আমি বলিলাম—" কৈ, মা আমার সঙ্গে যান নাই তো। তিনি কি বাসায় নাই?" যোগজীবন "না" বলিয়া, অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন গত রাত্রির কলহ-বিবরণ সকলকে বলিলাম। সকলেই অনুমান করিলেন—ঠাকুরের প্রতি রাগ করিয়া মাঠাক্রুণ কোন কুঞ্জে হয় ত গিয়া রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমরা যখন দেখিলাম মা আসিলেন না, তখন শ্রীধর, সতীশ, স্বামিজী, যোগজীবন এবং আমি অস্থির হইয়া মাঠাক্রুণকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। সকাল ৬।। টা হইতে বেলা ১ টা পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, রাস্তায়, ঘাটে, মন্দিরে, বাগানে ও যমুনাতীরে সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া মাঠাক্রুণকে তল্লাস করিলাম; কিন্তু, কোথাও তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। পরিচিত সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। বেলা ১ টা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃন্দাবনে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ক্লান্ত হইয়া আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। নীচে বসিয়া সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, 'এখন কি করা যায়?' যোগজীবন ও শ্রীধর পুনঃপুনঃ আমাকে জেদ করিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি গিয়ে মা'র বিষয় গোঁসাইকে বল। আজ তিনি এমন গম্ভীর হইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছে যাইতে আমাদের একেবারেই সাহস হয় না।" আমি অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া, ধীরে ধীরে ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিলাম, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর চোখ মেলিলেন। আমিও অমনি বলিলাম—"মাঠাক্রুণকে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি

তো একাকী কখনও কুঞ্জহইতে কোথাও যান না। কিন্তু জানি না আজ কোথায় চলে গেছেন। আমরা সেই সকাল হ'তে এপর্য্যন্ত সারা বৃন্দাবন তাঁহার সন্ধানে ঘুরেছি; কোথাও পেলাম না" ঠাকুর, বিন্দুমাত্রও ব্যস্ততা না দেখাইয়া, সহজভাবে বলিলেন— " **কোথায় যাবেন? তালাস ক'রে দেখ। যমুনাতীর দেখেছ?"**

আমি বলিলাম—' কোন স্থানই বাকি রাখি নাই। রাস্তার লোকদেরও জিজ্ঞাসা করেছি।' ঠাকুর মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে বলিলেন—**"তাঁকে এখন খুঁজে আর পাবে না। পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গেছেন।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'পরমহংসজী মাকে নিয়া গেলেন কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—**"কাল যখন ওঁকে অন্যত্র থাক্‌তে বলা হ'ল, অস্বীকার কর্‌লেন। অনেক বুঝায়ে বল্‌লাম, কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। তখন আমি পরমহংসজীকে স্মরণ কর্‌লাম। তিনি তখনই আমাকে বল্‌লেন, 'এজন্য ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? কোনও চিন্তা নাই। কালই ওঁকে আমি অন্যত্র নিয়ে যাব। তিনি ওঁকে নিয়ে গেছেন; খোঁজ করা বৃথা।"**

আমি। মা'র কি আর তবে এখানে আস্‌বার সম্ভাবনা নাই?

ঠাকুর। **তাঁর কোন দিকেই আর মায়া নাই; শুধু কুতুর উপরে একটু আকর্ষণ আছে। তাই কুতুর জন্য আবার আস্‌তেও পারেন। এখন সে বিষয়ে পরিষ্কার কিছু বলা যায় না। আসা না আসা তাঁর ইচ্ছা।**

আমি। পরমহংসজী নিয়া গেলেন কিরূপে? তাঁকে তো সেখানে দেখি নাই। মা আমা হ'তে মাত্র ৮/৯ হাত তফাতে ছিলেন। ৫/৬ সেকেণ্ডের জন্য শুধু একটিবার আমার অন্য দিকে চোখ ছিল। মুখ ফিরায়ে দেখি, মা নাই। পরমহংসজী এলে তো তাঁকে দেখ্‌তে পেতাম।

ঠাকুর। **পরমহংসজী সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন; তাঁকে দেখ্‌বে কি ক'রে? তিনি যে সূক্ষ্ম শরীরে এসে নিয়ে গেছেন।**

আমি। পরমহংসজী তো সূক্ষ্ম শরীরে এসেছিলেন, কিন্তু মা তো আর সূক্ষ্ম শরীরে যান নাই। মা'র স্থূল শরীর মুহূর্ত্তমধ্যে কি প্রকারে পরমহংসজী অন্যত্র নিলেন?

ঠাকুর। **তাঁরা সবই পারেন। যোগীরা ইচ্ছামাত্র এই স্থূল ভূতকে সূক্ষ্মে পরিণত কর্‌তে পারেন, সূক্ষ্ম ভূতকেও স্থূল কর্‌তে পারেন। শরীরের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চ ভূতে মিলায়ে, স্থূলকে সূক্ষ্ম ক'রে, মুহূর্ত্তমধ্যে ওঁকে নিয়ে গেছেন।**

আমি। পরমহংসজী মাকে কোথায় নিয়ে গেলেন? শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁকে কি সূক্ষ্ম শরীরে রেখেছেন— না, আর কোথাও নিয়ে গেছেন?

গোঁসাই। **শ্রীবৃন্দাবনে আর রাখ্‌বেন কেন? পরমহংসজী তাঁকে একেবারে মানসসরোবরে নিয়ে গেছেন।**

আমি। মানসসরোবরেও মা কি সূক্ষ্ম শরীরে আছেন?

ঠাকুর। **তা কেন? সেখানে গিয়ে আবার যেমন তেমনই হয়েছেন।**

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর পুবাতন মন্দিব
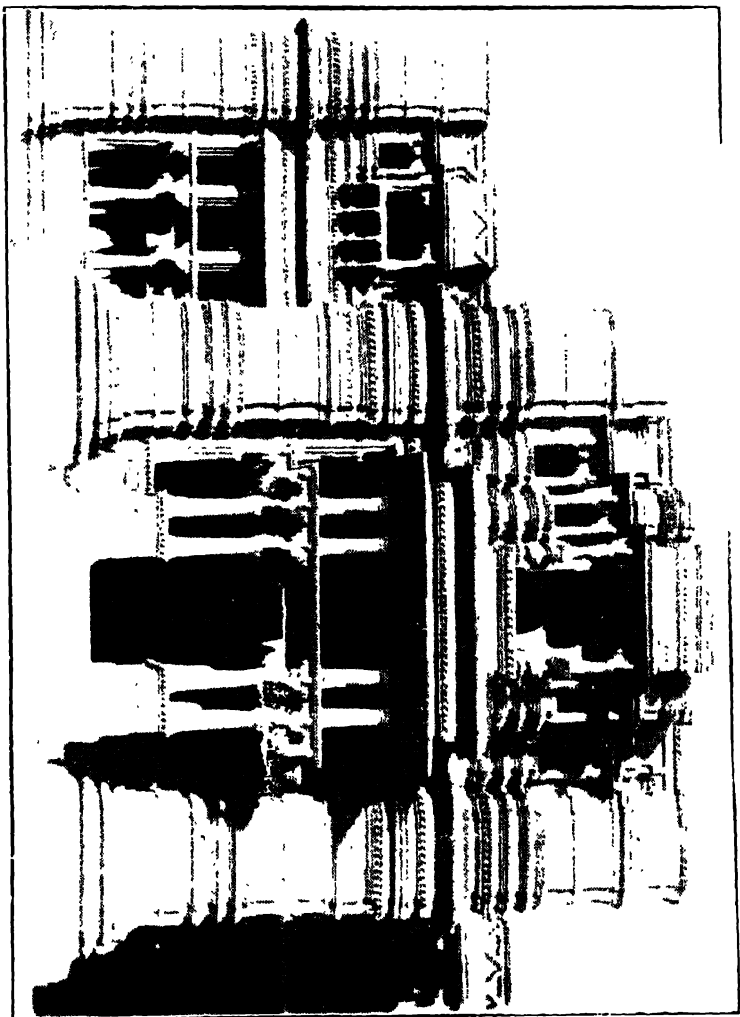
দাউজী ঠাকুরের মন্দির—দামোদর পূজারীর কুঞ্জ

আমি। মানসসরোবরে পরমহংসজী আছেন; ওখানে আরও কি কেউ আছেন—না, পরমহংসজী একাকীই থাকেন?

ঠাকুর। আরও কত আছেন! কত ঋষি, কত মুনি, কত দেবদেবী আছেন!

আমি। এখন সেখানে থেকে মা কি কর্‌বেন?

ঠাকুর। সাধন ভজন কর্‌বেন, কত আনন্দ কর্‌বেন! সেখানে গেলে আর কি আস্‌তে ইচ্ছা হয়?

আমি। মানসসরোবর তো তিব্বতে। সেখানে দেবদেবী, মুনি ঋষিরা থাকেন?

ঠাকুর। না, না, এ সে মানসসরোবর নয়। ভূগোলে যে মানসসরোবর পড়েছ, তা নয়। —সে তো 'মানতলাও'। মানসসরোবর বহু দূরে—হিমালয়ের উপরে।

আমি। আমরা কি মানসসরোবরে যেতে পারি না?

ঠাকুর। এই শরীর নিয়ে কি প্রকারে যাবে? পথ যে অতিশয় দুর্গম। খুব যোগৈশ্বর্য্য না হ'লে সেখানে যাওয়া যায় না। সাধারণে যাকে মানসসরোবর ব'লে জানে, সেখানে সহজেই যাওয়া যায়। সে তো আর মানসসরোবর নয়। মানসসরোবর কৈলাসে যাবার পথে।

আমি। মা তা হ'লে কুতুর জন্য আবার আস্‌তে পারেন?

ঠাকুর। তা বলা যায় না। ঐটুকু মায়া ইচ্ছা কর্‌লেই তাঁরা কাটায়ে দিতে পারেন।

ঠাকুরের সঙ্গে কাথা-বার্ত্তায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। বিকাল বেলা আর আর দিনের মত আজও ঠাকুরের সঙ্গে ভাগবতপাঠ শুনিতে গেলাম। কুঞ্জে ফিরিতে রাত্রি হইল।

যোগজীবনকে সংসার করিতে আদেশ।

২৭শে আষাঢ়, বৃহস্পতি বার ১২৯৭।

মাঠাকুরাণীর অন্তর্দ্ধানে সকলেরই প্রাণে একটা খুব আঘাত লাগিল। যোগজীবন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। আর গেণ্ডারিয়া যাইবেন না, সংসার করিবেন না—বলিলেন। যোগজীবন একেবারে উদাসীনই হইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অতি স্নেহ ভাবে মিষ্টি উপদেশ দিয়া স্থির রাখিতে লাগিলেন। যোগজীবন আজ বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করিলেন। ঠাকুর শেষকালে কহিলেন, "আর অধিক দিন তোর সংসার কর্‌তে হবে না, নিশ্চয় জানিস্‌। শীঘ্রই তোর সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তবে তা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুকাল সংসার কর্‌তে হবে। ওটুকু কর্ম্ম শেষ না কর্‌লে চল্‌বে না। এখন ঢাকায় গিয়ে থাক।" নিতান্তই নির্ব্বন্ধ বুঝিয়া যোগজীবন অগত্যা শীঘ্রই আবার ঢাকায় যাইতে সম্মত হইলেন।

বিকাল বেলা যখন আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবত শুনিতে যাই, রাস্তার দুই দিকে ও সম্মুখে আমরা কেবল মাঠাকুরাণীকেই অনুসন্ধান করিতে থাকি। মাঠাক্‌রুণের অন্তর্দ্ধানের পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—কুতুর প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রেখো। পাঠ শুন্‌তে যখন যাবে, কুতুকে হাতে ধ'রে নিয়ে যেও। পাঠ শুন্‌তে যখন বস্‌বে, কুতুকে কাছে বসাইও। ওকে আবার নিয়ে না

যান।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুতুকেও নিতে পারেন কি?"

ঠাকুর। **তা আর পারেন না? খুব পারেন।**

আশ্চর্য্য এই যে মাঠাকুরাণীর জন্য কুতুর একটুও বিমর্ষ ভাব দেখিতেছি না। কুতু সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকেন; ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় হাসি-গল্পে দিন কাটাইয়া দেন; একটিবারও মা'র কথা মনে করেন না; কাহারও কাছে মা'র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। এমন একটা ব্যাপার হইয়া গেল, কুতু যেন কিছুই জানেন না। কুতুকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা'র অভাবে কি কারো কারো কোনও ক্লেশ হয় নাই?" ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ, ক্লেশ সকলেরই হয়েছে; তবে কারো কারো ধৈর্য্য খুব বেশী।**

বানর 'কৃষ্ণদাস'।

অতি প্রত্যূষে, প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে ঠাকুর বারেন্দায় আসিয়া নিজ আসনে বসেন। এই সময়ে 'কৃষ্ণদাস' আসিয়া হাজির হন। 'কৃষ্ণদাস' একটি ছোট বানর। ঠাকুর আদর করিয়া ইহার নাম 'কৃষ্ণদাস' রাখিয়াছেন। ঠাকুর আহার করিবার পূর্ব্বে প্রতিরাত্রে 'কৃষ্ণদাসের' জন্য অন্ততঃ একখানি রুটি রাখিয়া দেন। সকাল বেলা প্রত্যহই কৃষ্ণদাস আসিয়া উহা সেবা করেন। কৃষ্ণদাসের এখানে অবারিত দ্বার। ভোর বেলা আসিয়াই কৃষ্ণদাস বাহিরে থাকিয়া দুই তিনবার চিঁ চিঁ করিয়া শব্দ করেন। ঠাকুর তখন হাতে ধরিয়া উহাকে খাবার দেন। দু' চারবার আওয়াজ করিয়া কৃষ্ণদাস খাবার না পাইলে বরাবর ঠাকুরের আসনঘরে প্রবেশ করেন; যেখানে খাবার রাখা হয় সেখানহইতে খাবার লইয়া, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া বসেন; পরে ধীরে ধীরে ৫/৭ মিনিট বসিয়া খাবারটি শেষ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু যদি কোনও আকস্মিক কারনে কৃষ্ণদাস আসিয়াও খাবার না পান, তাহা হইলে ঠাকুরের হাত পা ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকেন—কখনও কোলে, কখনও একেবারে ঠাকুরের ঘাড়ে, উঠিয়া বসেন। কৃষ্ণদাসকে খাবার না দেওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুর স্থির হইয়া আসনে বসিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস বড় শান্তপ্রকৃতি নন্; তবে ঠাকুরের বড় আদুরে।

ভক্ত বুড়ো বানরের কার্য্য।

ঠাকুরের ভক্ত আর একটি বুড়ো বানর আছেন। ইনি বেশ বিজ্ঞ। যেদিনহইতে ঠাকুর এই স্থানে আসিয়া আসন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই ইনি ঠাকুরের নিত্য সঙ্গী। সকালে চা-সেবার পরে কিছুক্ষণ শ্রীধর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পরে বেলা ৯টার সময়ে ঠাকুর শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ঠিক সেই সময়েই বুড়ো বানর আসিয়া ঠাকুরের 'বরাবর', ঝাপের বাহিরে, বসেন এবং স্থির ভাবে গালে হাত দিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া

থাকেন; মনে হয় যেন ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বুড়ো কিছুতেই নিজ আসন ত্যাগ করেন না। যদি কোনও দুষ্ট বানর আসিয়া পাঠের সময়ে গোলমাল করে, বুড়ো এমন ভাবে তাহার দিকে একবার দৃষ্টি করেন যে সে চীৎকার করিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। পাঠের সময়ে বুড়োকে কিছু খাবার দিলে বুড়ো কিছুতেই উহা খান না, রাখিয়া দেন; পাঠ শেষ হইলে ধীরে ধীরে উহা সেবা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একটি দিনের জন্যও বুড়োর এই ভাগবতশ্রবণ বন্ধ হয় না। সারাদিন বুড়ো যেখানেই থাকুন না কেন, বেলা ৯ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত বুড়ো নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া থাকেন না। বুড়ো এ পাড়ার বানরদের দলপতি। বুড়োর শরীরটি বেশ হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ। দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। বুড়োর আরও অদ্ভুত ব্যাপার ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। সমস্ত বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে বানরের উৎপাত অত্যন্ত অধিক। বুড়োর জন্যই বোধ হয়, আমাদের কুঞ্জে তেমন বানরের উপদ্রব নাই। একদিন ভোর বেলা অকস্মাৎ এক মর্কট আসিয়া আমাদের একটি ঘটী লইয়া গেল। শৌচে যাওয়ার বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। বুড়ো একটু পরেই আমাদের কুঞ্জে আসিলেন। ঠাকুর বুড়োকে বলিলেন—"বুড়ো, তোমার দলের একটি এসে আমাদের একটি ঘটী নিয়ে গেছেন। আমাদের বড় অসুবিধা হচ্ছে। ঘটীটি এনে দিবে?" ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অমনি বুড়ো একটি উচ্চ স্থানে লাফাইয়া উঠিলেন; সেখানে দুপায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যে মর্কটটি আমাদের ঘটী নিয়া পলাইয়াছিল সে ৩/৪ খানা বাড়ী তফাতে জনৈক ব্রজবাসীর ঘরের ছাদে গিয়া বসিয়াছিল। বুড়ো একবার তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিলেন যে, সে ঘটী ফেলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। বুড়ো তখন ধীরে ধীরে যাইয়া ঘটীটি ধরিলেন, এবং উহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরের নিকটে রাখিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বানরের এইপ্রকার বুদ্ধি ইতিপূর্ব্বে আমি কল্পনাও করি নাই। বানরটি পোষা নয় অথচ এমন বুদ্ধিমান ও বশগামী ইহাই আশ্চর্য্য! ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন—ইনি কোনও বৈষ্ণব মহাত্মা—ব্রজবাস আকাঙ্ক্ষায় বানরদেহ ধারণ ক'রে রয়েছেন।

ঠাকুরের আহারের দারুণ দুরবস্থা।

প্রত্যূষে ঠাকুর আসনহইতে উঠিয়া শৌচে যান। শ্রীধর, জল কৌপীন ও বহির্ব্বাসাদি লইয়া, দাঁড়াইয়া থাকেন। মুখপ্রক্ষালনের পর ঠাকুর উপরে আসিয়া 'কৃষ্ণদাস'-কে খাবার দেন। পরে নিজ আসনে গিয়া বসেন। শ্রীধর এই সময়ে চা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

চা'এর দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। এক পয়সার একটু বাসি দুধ ও সামান্য পরিমাণ একটু চিনি কোন প্রকারে জুটে। অর্থাভাববশতঃ, অতি সাধারণ শ্রেণীর চা সস্তা দরে খুচরা খরিদ করিয়া আনা হয়। এক দিনের প্রস্তুত করা চা'এর পাতাগুলি ফেলিয়া না দিয়া উহাই আবার শুকাইয়া রাখিতে ঠাকুর বলিয়াছেন। অভাব হইলে সেই সব পাতাই জলে সিদ্ধ করিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হয়। ম্যালেরিয়ার জন্য বহুকাল হইতেই ঠাকুরের চা খাওয়া অভ্যাস। সময়মত

উহা না পাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হয়। কিন্তু, এই প্রকার অসার চা কি করিয়া যে ঠাকুর সেবা করেন, বুঝি না। চা'এর এইরূপ অনটনের খবর একবার কলিকাতায় গেলে, শত শত গুরুভ্রাতা কত উৎকৃষ্ট চা আগ্রহের সহিত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, ঠাকুরের অনিচ্ছায় কাহারও কিছু করিবার যো নাই। ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমি দাদাকে উৎকৃষ্ট চা পাঠাইতে লিখিলাম।

ঠাকুরের চা-সেবার পর শ্রীধর এক অধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরে, বেলা নয়টার সময়ে ঠাকুর স্বয়ং শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন।

মধ্যাহ্নে কোন কোন দিন ঠাকুর যমুনায় স্নান করেন। পরে বারটার সময়ে সকলকে লইয়া নীচে রান্নাঘরে গিয়া প্রসাদ পান। ঠাকুরের সেই শরীর এত শুকাইয়া গিয়াছে কেন, প্রসাদের রূপ দেখিলেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, বহু অবস্থাপন্ন ভক্ত লোক ঠাকুরকে উৎকৃষ্ট বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেবা করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দামোদর গরীব বলিয়াই, তাহার প্রার্থনা ও 'জেদে' ঠাকুর তাহারই কুঞ্জে আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের সেবার জন্য যাহা কিছু মাসে মাসে আসে, ঠাকুর তাহার একটি কপর্দ্দকও না রাখিয়া দাউজী ঠাকুরের ভোগার্থে দামোদরের হাতে দিয়া দেন। দামোদর প্রথম প্রথম ২/৩ মাস দাউজীর ভোগ নাকি ভালরূপেই দিয়াছিল। পরে, ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে অর্থশালী বড়লোক এই খবর পাইয়া, অতি বিষম 'ফিকির-ফন্দি' আরম্ভ করিয়াছে। ঠাকুরের আহারাদির অতিশয় ক্লেশ হইতেছে শুনিতে পাইলে, ভক্ত শিষ্যেরা নিশ্চয়ই মুঠো মুঠো টাকা পাঠাইবে, ইহাই দামোদরের স্থির বিশ্বাস। তাই এখন দামোদর, দাউজীর সেবার জন্য টাকা পাইলে, তাহাদ্বারা সর্ব্বাগ্রে তাহার বাড়ীর মাসিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে; পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাদ্বারা কোন মতে দাউজীর সেবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় তিন মাস যাবৎ রুটি, অন্ন ও কুমড়া-সিদ্ধ দাউজীর ভোগে লাগিতেছে। লবণ ও মসলা বর্জ্জিত, মাত্র জলে সিদ্ধ কুষ্মাণ্ড,প্রস্তর মূর্ত্তি দাউজীরই ভোগে অনন্তকাল চলিতে পারে; কিন্তু, রক্ত মাংসের শরীরে, যাহারা উহা প্রসাদ পায়, তাহারা আর কত কাল উহাতে রুচি ও ভক্তি রাখিবে?

পেট ভরিয়া আহার ঠাকুরের একটি দিনও হইতেছে না। কোন প্রকারে সামান্য পরিমাণ দুধে এক মুঠো অন্ন ফেলিয়া তাহাই ঠাকুর খাইয়া উঠেন। সস্তা মূল্যের কদর্য্য মোটা আটার রুটি কেবল মাত্র লবণ ও কুম্‌ড়া-সিদ্ধ দিয়া দু'একখানার বেশী কোন দিনও ঠাকুর খাইতে পারেন না। রাত্রের ব্যবস্থা আরও বিষম। মধ্যাহ্নের কুম্‌ড়া-সিদ্ধ এবং মোটা রুটি অল্প পরিমাণে রাত্রের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। যাহার পেট তেমন জ্বলিয়া উঠে সেই মাত্র সেই পচা দুর্গন্ধ কুম্‌ড়া ও খড়্‌-খড়ে রুটি, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গলাধঃকরণ করিয়া চলিয়া আসে। অনুনয় বিনয় করিয়া দামোদরকে ভোগের একটু ভাল বন্দোবস্ত করিতে বলিলে, দামোদর টাকার জন্য 'বাঙ্গলা মুল্লুকে' গোঁসাইয়ের

'চেলাদের' নিকটে 'খৎ ভেজিতে' উপদেশ দেয়। তাহা আমরা করি না; সুতরাং ' গোঁসাইয়ের ক্লেশ আমাদের প্রাণে লাগে না' বলিয়া দামোদর আমাদিগকে "পাখণ্ডী" (পাষণ্ড) বলিয়া গালি দেয়। মাসে মাসে এত টাকা পাইয়াও দামোদর ভোগের ভাল ব্যবস্থা করিতেছে না কেন, দু'চার জন মিলিয়া আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, দামোদর মালা নাড়িতে নাড়িতে তত্ত্বকথা বলে; বলে—"আরে, ভালা ভোজন ভজনবাদী। ভকত্‌কা লোভ নেহি চাহি।" হাতে পায়ে ধরিয়া সকলে মিলিয়া দামোদরকে আহারের একটুকু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলে, দামোদর কুম্‌ড়া-সিদ্ধ না দিয়া উহার বাকল সিদ্ধ দেয়। 'টাকা পয়সা নিজেদের হাতে রাখিয়া, নিজেরাই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিব' ভয় দেখাইলে, দামোদর মহা উৎসাহ দেখাইয়া বাজার করিতে যায়; বাজারের বাছা বাছা শুষ্ক ও পোকা-ধরা, সাধারণের পরিত্যক্ত বেগুন ও 'বারো মিশালো' শাক আনিয়া তাহাই সিদ্ধ করিয়া দেয়; আর ক্যায়সা খিলায়া, ক্যায়সা খিলায়া বলিয়া দশ পনের দিন ধরিয়া তাহারই বড়াই করে। পেটের জ্বালায় সর্ব্বদা আমাদের ভিতরে "পালাই পালাই" ডাক ছাড়িতেছে। হা ভগবান্! কত কাল আর এ ভোগ। আহার করিতে বসিয়া, প্রতিদিনই দামোদরকে প্রহার করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু একদিনও কিছু বলিবার যো নাই। "দামোদরের এই অতিরিক্ত অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর মিষ্টি মুখে একটু হাসিয়া বলিলেন—**"দাউজী জাগ্রত দেবতা। তিনি সবই দেখ্‌চেন। সময়মত দাউজীই দামোদরকে শাসন কর্‌বেন। তোমরা দামোদরকে কিছুই ব'লো না।"** ভাল, ঠাকুরের পাল্লায় পড়িয়া দেখিতেছি, এবার 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতে হইবে।

দামোদরের উপর দাউজী ঠাকুরের শাসন।

৩১শে আষাঢ়, সোমবার, ১২৯৭।

আজ সকালে ঠাকুরের চা-সেবার পরে অসময়ে দামোদর পূজারী কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখ ভার, কাহারও সঙ্গে কথাটি নাই। দামোদর কাঁপিতে কাঁপিতে ঠাকুরের সম্মুখে যাইয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—**কি দামোদর, কি হয়েছে?**

দামোদর তাহার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ দুই গালে, প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল—"বাবা, দাউজী হামকো বহুত মারা হ্যায়।" দাউজী মহারাজ কেন মারিলেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায়, দামোদর এইপ্রকার কহিলেন—"বাবা, শেষ রাত্রে আমি নিদ্রিত আছি, স্বপ্ন দেখিলাম দাউজী আসিয়া অকস্মাৎ আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। দুই হাতে আমার দুই গালে ভয়ানক চাপড় মারিতে লাগিলেন। পরে আমার সর্ব্ব শরীরে বিষম কীল ও গুঁতা মারিতে মারিতে বলিলেন, 'পাষণ্ড, তোর এত সাহস? ভাল করে ভোগ দিস্ না; গোঁসাই খেতে পারেন না। তাঁকে খাবার ক্লেশ দিচ্ছিস! আজ তোকে কীলিয়ে মেরে ফেল্‌ব।' দাউজীর দারুণ প্রহারের ঘায়ে আমি চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলাম; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের বেদনা আমার কমিল না। এই দেখুন, বাবা,

আমার গাল দুটি ফুলিয়া রহিয়াছে। এই সব স্থানের যন্ত্রণা এখনও আমি ভোগ করিতেছি।"

ঠাকুর দামোদরকে বলিলেন—**দাউজী মহারাজ তোমাকে শাসন ক'রেছেন—তুমি ভাগ্যবান্। ভক্তি ক'রে দাউজী মহারাজের সেবা কর। তিনি তোমার কোন অভাব রাখ্‌বেন না।**

আমরা দামোদরের গালের অবস্থা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। স্বপ্নের প্রহার শরীরে ফুটে—ইহা আর কখনও দেখি নাই। দাউজী ঠাকুরের অনুশাসন ব্যাপার কি, তাহা বিচারবুদ্ধিদ্বারা কিছুই বুঝি না। সে যাহা হউক, দামোদরের গুরুতর দণ্ডভোগ দেখিয়া মনে মনে খুব খুসী হইলাম; ভাবিলাম—এইবার হইতে পেট ভরিয়া দুটি খাইয়া শ্রীবৃন্দাবন বাস করিতে পারিব।

কুতুর কথা। মাঠাকুরাণীর প্রত্যাবর্ত্তন।

আজ মধ্যাহ্নে অবকাশ পাইয়া ঠাকুরকে মাঠাক্‌রুণের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "এতদিন হ'লো মা চলে গিয়েছেন, তাঁর কোনও খোঁজ খবর তো এ পর্য্যন্ত পেলাম না। তিনি কি যথার্থই আর আস্‌বেন না?"

১লা শ্রাবণ,১২৯৭।

ঠাকুর। **তা ব'লেছি তো, কুতুর প্রতি একটু আকর্ষণ আছে। যদি আসেন, কুতুর জন্যই আস্‌বেন। যেসব মহাত্মা ওঁকে নিয়ে গেছেন, তাঁরা ইচ্ছা কর্‌লেই ঐ আকর্ষণটুকুও কাটায়ে দিতে পারেন। তাই ওঁর আসা সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।**

আমি। মহাত্মারা মা'র আকর্ষণই না হয় কাটাবেন। কুতু ছেলেমানুষ, তার তো মা'র প্রতি একটা মায়া আছে।

ঠাকুর। **কুতুর কি মা'র জন্য কষ্ট হচ্ছে?**

আমি। তা কিছু বুঝি না। কুতুর কথাবার্ত্তা, হাসা গল্প, চলা ফেরা দেখে, কুতু একবারও যে মাকে মনে করেন, এমন বোধ হয় না। মা এখানে থাক্‌বেন ব'লে আশা ক'রে এসেছিলেন। তাঁর এ ভাবে যাওয়ায় সকলেরই একটা খুব কষ্ট হয়েছে।

ঠাকুর। **ওঁর এ ভাবে যাওয়া ভালই হয়েছে। এ যাওয়ায় কোন ক্ষতিই হবে না, মঙ্গলই হবে। এবারে শ্রীবৃন্দাবনে এলে ওঁকে কখনই ফিরায়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। ওঁরই স্থানে উনি থেকে যাবেন। এই সব কারণেই ওঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আস্‌তে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলাম।**

এই সময়ে কুতু আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, মা যে পাঠ শুন্‌তে আসেন। প্রায়ই মাকে দেখ্‌তে পাই। আজও মাকে ওখানে দেখ্‌লাম।"

ঠাকুর। **তিনি কোথায় ছিলেন? কেমন দেখ্‌লি?**

কুতু। "কেন? মা আমাদের কাছেই তো বসেছিলেন। এই শরীরে নয়। আজ বোধ হয় মা আমাদের কুঞ্জে আস্‌বেন।"

ঠাকুর। তা আস্‌তে পারেন।

আমি কুতুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুতু, মা'র জন্য কি তোমার কষ্ট হয়?"

কুতু বলিলেন—"কষ্ট হবে কেন? মাকে দেখ্‌তে না পেলে কষ্ট হ'ত। মাকে তো অনেক সময়েই দেখ্‌তে পাই। দেখ্‌বে এখন, মা আজ আস্‌বেন।"

আমি বলিলাম—"তা তুমি কিসে বুঝ্‌লে?"

কুতু আমার কথায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আবার বুঝাবুঝি কি? শুন্‌তে পেলে না—বাবাও যে বল্‌লেন।" হঠাৎ এসময়ে কুতু ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, আমার এমন হয় কেন? দিনের বেলায়ও যখন জেগে থাকি, তখনও স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।"

ঠাকুর। কি বল্‌ছিস—একটু পরিষ্কার ক'রে বল্ না?

কুতু। "সর্ব্বদাই থেকে থেকে আমার মনে হয়, যা কিছু দেখ্‌ছি, শুন্‌ছি, কর্‌ছি, এসব কিছুই নয়, সব মিথ্যা; সমস্তই যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছি মনে হয়। এমন হয় কেন?"

ঠাকুর। তোর খুব সৌভাগ্য, তাই। যথার্থই এসব কিছুই কিছু না। সমস্তই মিথ্যা। স্বপ্ন তো বটেই। এসব স্বপ্ন ব'লে পরিষ্কার জান্‌লেই তো হ'ল। আর কি?

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে কুতুর সঙ্গে ঠাকুরের এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা আসিয়া, নীচে থাকিয়া, আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো, কে আছ গো? তোমাদের মা-গোঁসাই যে আমাদের কুঞ্জে। তোমাদের খবর দিতে এসেছি। এই মাত্র দেখ্‌লাম মা-গোঁসাই আমাদের ঘরে ব'সে রয়েছেন। কখন্ এলেন, কোথা হ'তে এলেন— কিছুই জানি না। ঘরে তাঁকে দেখেই তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি।"

ঠাকুর যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—যোগজীবন, এখনই চলে যা। নিয়ে আয় গিয়ে।

আমাদের কুঞ্জের দুইখানা বাড়ীর পরেই একটি গরীব গৃহস্থঘরে মাঠাক্‌রুণ বসিয়া ছিলেন। যোগজীবন যাইয়া মাকে লইয়া আসিলেন। মা'র শরীরের বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন দেখিলাম না, পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিধানে মাত্র গৈরিক বসন। মাঠাক্‌রুণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও খুব সন্তুষ্টভাবে মাঠাক্‌রুণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; কিন্তু, এতদিন মাঠাকুরাণী যে কোথায় কিভাবে ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

রাত্রে আহারান্তে ঠাকুরের আসনের পাশে শুইয়া রহিলাম। ঠাকুর সারা রাত্রি বারেন্দাতেই থাকেন। মশার বিষম উপদ্রব। মাঠাকুরাণী পাখা লইয়া পূর্ব্ববৎ ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যোগজীবন, শ্রীধর প্রভৃতি মাঠাক্‌রুণের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের বিষয় জানিতে চাহিলে, মা বলিলেন—পরমহংসজী পাঁচটি মহাপুরুষ সঙ্গে লইয়া এসেছিলেন। তাঁহারা ছয় সাত হাত লম্বা; সকলেরই মাথায় পাগড়ী আছে। তাঁহারা আমাকে যমুনায় নিয়ে গেলেন। বল্‌লেন, "এখানে স্নান কর।" আমি স্নান কর্‌লাম। পরে তাঁহারা আমাকে কোথায় কিভাবে নিয়ে গেলেন—কিছুই জানি না। একটু পরে দেখি পাহাড়ে র'য়েছি। বড়ই চমৎকার স্থান।

পরমহংসজী আমার রক্ষকরূপে ঐ মহাপুরুষ পাঁচটিকে নিযুক্ত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁহারা **সর্ব্বদাই** আমার কাছে কাছে থাক্‌তেন; আমি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বেড়াতে পার্‌তাম। সে **স্থানই** এমন যে কোনপ্রকার উদ্বেগ অশান্তি মনে আসে না। বড়ই আনন্দের স্থান। তাঁরাই **আবার** আমাকে এখানে এনে রেখে গেলেন।

প্রশ্ন। আপনি কি আস্‌তে চেয়েছিলেন?

মাঠাকুরাণী। সেখানে থেকে কি আর আস্‌তে ইচ্ছা হয়? তবে সময়ে সময়ে কুতুর কথা **মনে** হ'ত।

আমার কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষাপ্রকাশ।

২রা শ্রাবণ, ১২৯৭।

পিত্তশূল বেদনা আমার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। এই রোগের উপশমে আমার একটি উদ্বেগ জন্মিয়াছে। শরীর সুস্থ হইল, এখন আর ঠাকুর হয়'ত বেশীদিন আমাকে তাঁহার সঙ্গে রাখিবেন না। দেশে গেলেই দাদারা আমাকে পড়াশুনা করিতে বলিবেন; সে তো আমার পক্ষে যমযাতনা **অপেক্ষাও** কষ্টকর। লেখাপড়া না করিলেও, চাক্‌রী তো আমার করিতেই হইবে। তখন সকলে **আবার** আমাকে বিবাহ করিতে অবশ্যই বাধ্য করিবেন। এসকল উৎপাত হইতে কি উপায়ে **রক্ষা** পাই?

হরিবংশপাঠের পর আজ ঠাকুরকে বলিলাম—"কয়দিন ধরিয়া আমি বড় উদ্বেগ ভোগ **করিতেছি**। আপনাকে সব বলিতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—**উদ্বেগ কেন? খুলে বল।**

উৎসাহ পাইয়া আমি প্রাণ খুলিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলাম—"আমার শরীর বেশ সুস্থ **হইয়াছে**, এখন আমি কি করিব? দেশে গেলেই তো দাদারা আমাকে স্কুলে দিবেন; কিন্তু **লেখাপড়া** অনেককাল ছাড়িয়া দিয়াছি, নূতন করিয়া আবার যে পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা **পাশের** চেষ্টা করা, সে আমার বড়ই কষ্টকর মনে হয়। সেদিকে আমার রুচিও একেবারেই **নাই**। তার পর, তাঁরা যদি আমাকে চাক্‌রী জুটাইয়া দেন, তাহাতেও আমার যাতনার একশেষ **হইবে**। লেখাপড়া কিছু শিখি নাই; চাক্‌রী করিতে হইলে খুব সামান্য আয়ের চাক্‌রীই করিতে **হইবে**। চাক্‌রী হইলে তখন আবার সকলে আমাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিবেন। বিবাহ **করিলে অল্প** আয়ে নিজপরিবার ভরণ পোষণই আমার পক্ষে শক্ত হইবে; পরিবার ক্রমে বৃদ্ধি **হইলে তখন** যে কি করিব, বুঝি না। তার পর, চাক্‌রী করিলেই দশজনে কিছু না কিছু আমার **নিকটে** প্রত্যাশা করিবে। আমার অবস্থা কেহই ভাবিবে না; অথচ আকাঙ্ক্ষামত প্রাপ্ত না হইলে **সকলেই** বিরক্ত হইবে। যাঁহারা আমাকে এখন এত ভাল বাসেন, এই চাক্‌রী করার দরুণই **আমার** উপরে তাঁহাদের অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে। বহুকাল আমি রোগশূন্য অবস্থা ভোগ করি **নাই। যদিও** এখন আমার শরীর সুস্থ আছে, সামান্য অনিয়মে আবার ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আমার ভিতরের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয়, তাহাতে বিবাহ করিলে কিছুতেই আমি আর আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। সংযমের দিক্ শিথিল হইলে তখন আমি কোথায় যে গিয়া পড়িব বলিতে পারি না। তখন কদাচার ব্যভিচারে চলিতে ঐ পয়সাই আমার পরম সহায় হইবে। হাতে পয়সা পাইয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিলে আমি যে কোন্ বিষম নরকে গিয়া পড়িব তাহা কিছুই জানি না। এই সব কারণে চাক্রী ও বিবাহ আমার পক্ষে নরকের দ্বার বলিয়া মনে হয়। এসব আপদ্ হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। তাহা না হইলে আর উপায় নাই।"

ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন—"**শরীরের অবস্থা তোমার যেরূপ, তাতে বিবাহ করা তো কিছুতেই ঠিক নয়। শরীরটি বেশ সুস্থ হ'লে চাক্রী ক'রে দাদাদের তো সেবা কর্‌তে পার"** ঠাকুরের কথায়, বিবাহ করিতে হইবে না বুঝিয়া, প্রাণ আমার ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম—'এখন চাক্রীও করিতে হইবে না, ঠাকুর এরূপ একবার বলিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।' আমি আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম—'অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া চাক্রী করা কি আমার পক্ষে নিরাপৎ হইবে? আমার মনে হয়, সাধারণ লোক অপেক্ষা আমার দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক। শুধু সুবিধা তেমন ঘটে না বলিয়াই এখন পর্য্যন্ত আমি ভাল আছি; সাধন ভজনের নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ থাকাতেই আমি রক্ষা পাইতেছি। এদিকে একটু "আল্‌গা" হইলে আমার দশা যে কি দাঁড়াইবে, নিশ্চয় নাই। চাক্রী করিলেই তো বিষয় লইয়া থাকিতে হইবে; মতি গতি সমস্তই বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িবে, সাধনের এসব আঁটাআঁটি নিয়ম প্রণালী তখন আর কিছুই থাকিবে না; তখন একটা প্রলোভন উপস্থিত হ'লে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার সামর্থ্য আমার থাকিবে না। বরং হাতে টাকা পয়সা হইলে, স্বেচ্ছাচারে চলিবার পথ পরিষ্কার হইবে। দস্তুরমত আমাকে আপনি বান্ধিয়া না রাখিলে, রক্ষা পাওয়ার আমার আর উপায় নাই। চাক্রী করিলে অধিকাংশ সময়েই আপনার সম্বন্ধচ্যুত হইয়া থাকিব। তখন ভিতরে সমস্ত কুভাব মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। আমি রক্ষা পাইব কি প্রকারে? এজন্য মনে হয়, শুধু চাক্রী হইতেই আমার এ জীবন নরকগ্রস্ত হইবে। আমি যে কি করিব, কিছুই বুঝিতেছি না। আমার ভবিষ্যতের কল্যাণ অকল্যাণ কিসে, আপনিই জানেন। যাহাতে আমার যথার্থ মঙ্গল হইবে, আপনি আমাকে বলিয়া দিন। আমি তাহাই করিব। তবে আমার ইচ্ছা হয়, আমি অবিবাহিত অবস্থায় চিরকাল থাকি, সাধন ভজন করি। তাহা হইলে চাক্রীর জন্যও আমাকে কেহ জেদ্ করিবে না; কারণ, আমাদের সংসারে তেমন কোনই অভাব নাই। আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে আমি চিরজীবন কুমার হইয়া থাকি।"

ঠাকুর বলিলেন—**শুধু বল্‌লেই কি আর কুমার থাক্‌তে পার্‌বে? সে কি হয়? তুমি এক কাজ কর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নেও। কৌমার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেরই অন্তর্গত। তবে ব্রহ্মচর্য্যে আরও কতকগুলি নিয়ম আছে, তা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হয়। একটা ব্রতের কুণ্ডলীতে না থাক্‌লে শুধু এম্‌নি ঠিক থাক্‌তে পার্‌বে না। কুমার অবস্থায় থাক্‌তে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর। একটা ব্রতের বন্ধনে পড়্‌লেই নিরাপৎ। তিন দিন তুমি গিয়ে এ বিষয়ে বেশ ক'রে চিন্তা কর। ব্রত**

নিয়ে উহা ঠিকমত প্রতিপালন কর্‌তে হয়, না হ'লে অপরাধ হয়; এ সব ভালরূপ চিন্তা ক'রে আমাকে ব'লো, পরে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়া যাবে।

ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণসম্বন্ধে আলোচনা; ঠাকুরের অনুমতি।

৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১২৯৭।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিব কিনা, এ বিষয়ে তিন দিন চিন্তা করিয়া ঠাকুর আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন। তিনি আমাকে এই ব্রত দিতে যে ইচ্ছুক, তাঁহার কথার ভাবেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি। তথাপি ঠাকুরের আদেশমত ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে আমি অনেক ভাবিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। গোপনে যোগজীবন ও শ্রীধরকে পৃথক পৃথক ভাবে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। শ্রীধর শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"ভাই, তোমার দীক্ষার দিনে আমি এই সঙ্কল্পেই একান্ত প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আজও আমার তাহা পরিষ্কার মনে আছে। তুমি বীর্য্যধারণ কর, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত কর, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করি। ব্রত পালন করিতে না পারিলে তোমার ইচ্ছায়ই কি আর উনি এ ব্রত দিবেন? গোঁসাই যদি তোমাকে এই দুর্লভ ব্রত দেন, দ্বিধাশূন্য হইয়া এই মুহূর্ত্তেই গিয়া গ্রহণ কর।" যোগজীবন বলিলেন—"তুমি তো মহাসৌভাগ্যবান্ দেখ্‌ছি; কেহ ইচ্ছা করিলেই কি এই ব্রত পায় নাকি? গোঁসাই তোমার প্রতি খুবই প্রসন্ন, তিনি তোমাকে বিশেষ ভাবেই কৃপা করিবেন। সংসারের নানাপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অনায়াসে রক্ষা পাইবে। ব্রত রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, সে ভাবনা তোমার হয় কেন? মহাপুরুষেরা কখনও অপাত্রে এই ব্রত দেন না— পাত্র বুঝিয়াই কৃপা করেন। উনি যদি দয়া করিয়া তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য দেন, এখনই গিয়া গ্রহণ কর।"

মাঠাক্‌রুণকে এই বিষয় বলাতে তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন; এক ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন—"সে কি? ব্রহ্মচর্য্য নেবে কি রকম? এবুদ্ধি কেন? শরীর যতদিন অসুস্থ থাকে, বিবাহ নাই কর্‌লে। এম্‌নিই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে চল। শরীর নীরোগ হ'লে দস্তুরমত সবই কর্‌বে। বিয়ে কর্‌লে কি আর ধর্ম্ম হয় না? সাধ ক'রে ওসব কঠোরতার প্রয়োজন কি? ব্রত নেওয়া অত সহজ নয়, বড় কঠিন। শেষে যদি ব্রত ভঙ্গ ক'রে ফেল, অপরাধ হবে না? অনর্থক এ মতি কেন?"

মাঠাকুরাণীর কথায় আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইল; মনটিও একেবারে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আমি বিষম সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম—"ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত লইয়া যদি তাহা যথারীতি প্রতিপালন করিতে না পারি, ব্রতভঙ্গজনিত অপরাধে আমাকে পড়িতে হইবে। তাহা অপেক্ষা এই কঠোর ব্রত গ্রহণ না করাই ভাল। কিন্তু এই ব্রত অবলম্বন না করিলে বিবাহ ও চাক্‌রীর অনর্থ হইতে অব্যাহতি পাইবারও তো আর উপায় নাই। এই উভয়সঙ্কটের অবস্থায় আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, ব্রত গ্রহণ করিলে আমি ঠাকুরের

বিশেষ শাসনাধীনেই থাকিব, ব্রতভঙ্গ করিলে আমার দয়াল ঠাকুরই আমাকে শাস্তি দিবেন। দণ্ড ভোগ করিলেও উহা আমার ঠাকুরেরই কার্য্য মনে করিয়া অনেকটা শান্তি পাইব, বিবিধ দুর্দ্দশায় পড়িয়া উৎকট ভোগের উৎপত্তি হইলেও উহা তাঁহারই বিধান বলিয়া মনে হইবে। নরকেও যদি ডুবি, ঠাকুরের সঙ্গে অন্ততঃ ভাবেরও একটা যোগ থাকিবে। কিন্তু বিবাহ করিলে যে অশান্তিপূর্ণ আবর্জ্জনাময় সংসারের সৃষ্টি হইবে, এবং চাক্‌রী করিলে টাকার গরমে যে দুর্নীতি পরিপূর্ণ নরককুণ্ডে ডুবিয়া যাইব, উহা সর্ব্বথা আমার আত্মকৃত বলিয়া মনে করিব, উহার সঙ্গে ঠাকুরের কোনপ্রকার সম্বন্ধ, ভাবে বা কল্পনাতে ও আনিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং আমার ঐহিক ও পারলৌকিক স্বার্থ ও সুবিধার দিকে তাকাইয়া কার্য্য করিলে ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণই আমার পক্ষে লাভজনক মনে হয়। কিন্তু আবার যখন ভাবি 'আমার নিজের এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের আরামের জন্য পরমারাধ্য ঋষিগণের বিশুদ্ধ আশ্রম কলুষিত হইবে; বিশেষতঃ আজন্ম সত্যসঙ্কল্প পুণ্যমূর্ত্তি গুরুদেবের পরমপাবন নাম আমি কলঙ্কিত করিব,' তখন আর আমার ব্রতগ্রহণের প্রবৃত্তি হয় না। আমার অদৃষ্টের ভোগ আমিই ভুগি। শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভ শ্রীশ্রীগুরুদেবের অমল শুভ্র রূপে বিন্দুমাত্র কালিমা নিক্ষেপ করিতে কিছুতেই আমি পারিব না। সুতরাং নিজের এই হীন ও অসার সামর্থ্যে নির্ভর করিয়া কখনই আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব না।

আজ মধ্যাহ্নে আহারান্তে, হরিবংশ পাঠ করিতে ঠাকুরের কাছে গিয়া বসিলাম। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, '**কি? তুমি কি স্থির কর্‌লে? ব্রহ্মচর্য্য নিবে?**' আমি বলিলাম— 'এ সম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিব না। আপনি যেমন বলিবেন, তেমনই করিব। দুর্লভ ব্রত অনায়াসে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিদোষে শেষে উহা অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালন করিতে না পারিলে ঋষিদের পবিত্র আশ্রম আমার দ্বারা কলুষিত হইবে। আমার ভিতরের অবস্থা তো আপনি সমস্তই জানেন; কামভাব আমার অত্যন্ত অধিক। তেমন ভাবে প্রলোভন উপস্থিত হইলে নিজ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি না। এরূপ অবস্থায় পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য চাহিব কোন্ সাহসে? ব্রতগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আমার খুব আছে; কিন্তু উহা রক্ষা করার আমার সামর্থ্য নাই। আমি দুর্ব্বল বলিয়া আপনি যদি দয়া করিয়া নিজ শক্তিতে আমার ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করেন তাহা হইলেই আমি উহা গ্রহণ করিতে পারি; নচেৎ আমার প্রয়োজন নাই।' এই বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুর তখন এক দৃষ্টিতে সস্নেহে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে হাসিমুখে, প্রসন্নভাবে বলিলেন—"**আচ্ছা, তাই হবে। একটা ভাল তিথি দেখে এই ব্রত গ্রহণ কর। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত কারোকে কিছু ব'ল না। এখন পড়।**"

আমি তখন নিশ্চিন্ত মনে হরিবংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। আজ আমার প্রাণে মহা আনন্দ। মনে হইল—'আজই ঠাকুর আমার সমস্ত ভার নিজের উপর লইয়া আমাকে সম্পূর্ণ নিরাপৎ করিয়া দিলেন; আজ আমি উদ্ধার হইলাম।' এই ব্রতগ্রহণের কথা আমি আর

কাহাকেও বলিব না, স্থির করিলাম। কিন্তু মাঠাক্‌রুণ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, ভাবনা হইল। তিনি আমার এই ব্রতগ্রহণের বিরোধী। কুতুকে আমার হাতে অর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা মাঠাকুরাণীর বহুকালযাবৎই আছে। কাহারও কাহারও কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্তও করিয়াছেন। আকারে প্রকারে আমাকেও যে তাহা জানান নাই, এরূপ নহে। কে জানে? বোধ হয় এই জন্যই মা আমার ব্রহ্মচর্য্য ইচ্ছা করেন না। যে দিনে ইচ্ছা ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিবেন; আমি দিন ক্ষণ কিছুই জানি না। জয় গুরুদেব! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ঠাকুরের সঙ্গে মহাপুরুষদর্শন।

৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১২৯৭, ২০শে জুলাই।

বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা দর্শনে বাহির হইলাম। ঠাকুর অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলেন। মাঠাক্‌রুণ, কুতু, শ্রীধর প্রভৃতি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। আমি ঠাকুরের কমণ্ডলুটি হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম। ঠাকুর সোজাসুজি কালীদহের দিকে চলিলেন। শুনিলাম, আজ কালীদহে খুব বড় মেলা, সহস্র সহস্র লোক কালীদহে উপস্থিত হইয়াছে। রাস্তায়ও লোকের ভিড় বড় কম নয়। মেলাস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া চলিতে চলিতে ঠাকুর থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটি লোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে সেই লোকটির দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। উঁহার বেশভূষা কিছুই নাই, সামান্য কৌপীনের উপরে মাত্র একখানা জীর্ণ মলিন বহির্ব্বাস; বর্ণ শ্যাম; আকৃতি দীর্ঘ ও অতিশয় শীর্ণ; গায়ে ধূলাবালি অথবা ব্রজের রজ (তাহাতে আরও যেন কদাকার দেখাইতেছে)। অঙ্গে মালা বা তিলকের নাম গন্ধও নাই, মাথায় লম্বা লম্বা পিঙ্গলবর্ণ জটিল চুল, দেখিতে ঠিক যেন রাস্তার মুটে মজুরের মত। কিন্তু চোখে অসাধারণ জ্যোতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। মনে হইল যেন উঁহার ঘনঘন পলকে উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে।

ঠাকুরকে দেখিয়াই ইনি প্রায় একশত গজ দূরে থাকিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং সমান গতিতে ঠাকুরের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। একটিবার "হরেকৃষ্ণ"-ও বলিলেন না। ঠাকুর আর পশ্চাদ্দিকে না তাকাইয়া কালীদহের দিকে চলিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই আমি তখনই পিছন দিকে চাহিয়া আর ঐ লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না।

মেলা দর্শন করিয়া আমরা সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে ফিরিলাম। রাত্রে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, ঠাকুর বলিলেন—**মেলার মধ্যে আজ একটি মহাপুরুষ দর্শন হ'ল। এরূপ মহাত্মারা লোকালয়ে প্রায় আসেন না, পাহাড়েই থাকেন।**

আমি বলিলাম—আমি তো আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম; মহাপুরুষ কোথায় দেখ্‌লেন? আমাকে দেখালেন না কেন?

ঠাকুর। **অবিশ্বাসপূর্ণ সংসার! এতবড় মহাত্মাকে বিশ্বাস করতে পারবে কেন? হিমালয়ের উপরেই থাকেন, নীচে বড় এরূপ মহাপুরুষেরা আসেন না। যখন আসেন, তখনও এইরূপ ছদ্মবেশেই তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে চলে যান। পূর্ব্বে আর একবার এই মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবার মুহূর্ত্তমাত্র আলো বিস্তার ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্তর্দ্ধান হ'লেন। অতি আশ্চর্য্য মহাপুরুষ।**

আমি বলিলাম—অত লোকের মধ্যে আপনি একটি লোকের দিকে চেয়ে রইলেন, দেখেছিলাম। তাঁর কোন বেশই ছিল না, ঠিক সাধারণ মুটে মজুরের মত; তিনিই কি সেই মহাপুরুষ?

ঠাকুর। হবেন—**তিনিই হবেন। তাঁর পাদুটি ভূমি হ'তে আধহাত উপরে ছিল, রজে তিনি চরণ স্পর্শ করান নাই। পায়ের দিকে তো কেহ দৃষ্টি কর না। পায়ের দিকে দৃষ্টি করলেই অনেক সময়ে ধরা যায়।**

আমি। তিনি তো দাঁড়াইলেন না, আপনার সঙ্গে কোন কথাও বলিলেন না?

ঠাকুর। **যা কিছু বলার সবই ব'লেছেন। তাঁরা কি আর আমাদের মত শুধু মুখেই কথা বলেন? আকার ইঙ্গিতে দৃষ্টিতে নানা উপায়ে তাঁরা সমস্ত ব'লে থাকেন।**

আমি। আকার ইঙ্গিতে এবং দৃষ্টিতেও কি কথা বলিতে পারে?

ঠাকুর। **তা আবার পারে না? খুব পারে। এমন প্রাণী ঢের আছে, যারা মুখে বলে না, আকার ইঙ্গিত দৃষ্টি দ্বারাই সমস্ত ব্যক্ত করে।**

ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের দিন নির্দ্দেশ।

৬ শ্রাবণ, ১২৯৭।

আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুর সদাচারসম্বন্ধে অনেক উপদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণদের আচার, নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা তর্পণাদি যে কতদূর উপকারী, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন।

কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আজ কাল কি কেহ ঋষিদের মত হইতে পারে? এখনও কি বশিষ্ঠ যাজ্ঞ্যবল্ক্যাদির মত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

ঠাকুর বলিলেন—**বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আজ কাল বড়ই শক্ত, সহজ নয়। যদি কেহ সেইমত অনুষ্ঠান করতে পারেন, হবে না কেন? অনেক সময় লাগে।**

আমি। বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রে প্রাচীন ঋষিদের মত ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা হয়। আমাকে আপনি দয়া ক'রে সেইমত ব্রাহ্মণ ক'রে নিন্।

ঠাকুর। **তাই ত ঠিক। তা হ'লেই এখন বৈদিক ব্রহ্মচর্য্য নিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে ঠিক সেই নিয়মমত চল, তা হ'লে ঠিক হবে। একটা দিন দেখে ব'লো, ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে দিব।**

আমি। দিন দেখ্‌তে আমি জানি না।

ঠাকুর। **পঞ্জিকাখানা নিয়ে এস না।**

আমি পঞ্জিকাখানা আনিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম।

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন—**১২ই শ্রাবণ দিন ভাল। ঐ দিনে নির্জ্জনে এসে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রো। সে দিন আমি বরং সময়মত তোমায় ডেকে নিব। এখন কারোকে কিছু ব'লো না।** হরিবংশপাঠের পর ঠাকুর বলিলেন—**পাঠের একটা নিয়ম থাকা ভাল। সময় নির্দ্দিষ্ট রেখে নিয়মমত ভাল ভাল পুস্তকই পাঠ ক'রো।**

আমি। আমার পাঠের পক্ষে উপযুক্ত কি কি পুস্তক তা ত আমি জানি না। আপনি আমাকে ব'লে দিন্।

ঠাকুর। **গীতাখানা নিয়মমত নিত্য পাঠ ক'রো; মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, আর শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়ো।**

কেলিকদম্ব বৃক্ষে রাধাকৃষ্ণ নাম।

বিকাল বেলা আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। শ্রীমদনমোহন ঠাকুর দর্শন করিয়া কালীদহের দিকে চলিলাম। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধিবেদী দর্শন করিয়া যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কালীয় হ্রদের উপরে একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে আমরা বসিলাম। ঠাকুর বলিলেন—**এটি সেই কেলিকদম্বের গাছ, বহু প্রাচীন। প্রবাদ এই যে এই বৃক্ষটির উপরে দাঁড়ায়েই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমনের সময়ে যমুনায় ঝাঁপায়ে প'ড়েছিলেন। এই বৃক্ষে আপনা আপনি 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাম রাম', 'রাধাশ্যাম'—এই সব নাম লেখা হ'য়ে রয়েছে। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে দেখে নাও।**

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়াই আমরা বৃক্ষের গোড়ায় যাইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাছের গুঁড়িতে ও শাখা প্রশাখায় ঐসকল নাম পরিষ্কাররূপে বাকলের শিরাদ্বারা সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা হইয়া রহিয়াছে। দুই এক স্থানে দুই চারিটি নয়, বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে এরূপ অসংখ্য নাম দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমার চিত্ত ভয়ানক সন্দেহপূর্ণ, সহজে কিছুই বিশ্বাস করে না। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুষ্ট পাণ্ডারা পয়সা রোজগারের লোভে ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া এই সব নাম লেখে নাই ত?" ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—"**তুমি যা বল্‌লে তাও ঠিক। পাণ্ডারাও দু'চার স্থানে ছুরি দিয়া কেটে ওসব নাম লিখেছেন। কিন্তু দেখামাত্রই তা বুঝা যায়। স্বাভাবিক নাম ছিল ব'লেই তো তা পাণ্ডারা লিখেছেন।**" এই বলিয়া ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৃক্ষের নিকটে যাইয়া ৪/৫ টি নাম দেখাইয়া বলিলেন—"**এই দেখ, এসব পাণ্ডাদের কারিকরী। অর্থোপার্জ্জনের লোভে পাণ্ডারা এসব স্বাভাবিক বস্তুর নকল কর্‌তে গিয়া মূল জিনিসের উপরে লোকের সন্দেহের সৃষ্টি ক'রেছেন। এসব মহা অপরাধ। কত দেবদেবী ঋষি মুনি বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ পাইতে বৃক্ষলতা রূপে রয়েছেন; তাঁদের এই প্রকার ক্ষতবিক্ষত করা মহা অপরাধ। একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ, স্বাভাবিক আর নকল বুঝ্‌তে পার্‌বে।**"

আমি বলিলাম—এসব দেখে স্বাভাবিক কি না, কি প্রকারে বুঝ্‌ব? ছুরিতে কাটা অক্ষরও তো বেশীদিন জীবন্তগাছে থাক্‌লে স্বাভাবিকেরই মত দেখাবে।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—**তা বটে। আচ্ছা, এক কাজ কর, গাছের যে সকল পুরু পুরু ছাল শুকিয়ে একটা দিক্ ছেড়ে গিয়ে আল্‌গা হ'য়ে আছে, তারই ভিতরে দৃষ্টি ক'রে দেখ। সেখানে তো আর লেখা চলে না।**

আমি অমনি পুরাতন সেই বৃক্ষটির ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা আল্‌গা বাকল (ছাল) দুই খানা চট্ চট্ করিয়া টানিয়া তুলিলাম। ঠাকুর তখন—**'উঃ! উঃ! কি কর্‌লে?'** বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। আমি আর ছাল না ছিঁড়িয়া খুব মনোযোগপূর্ব্বক তাহার ভিতরের দিক্‌টা দেখিতে লাগিলাম। 'রাধাকৃষ্ণ','রাম রাম' নাম পরিষ্কাররূপে বৃক্ষের শিরায় শিরায় লেখা হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। উঁচুতে গাছের শাখা প্রশাখায় ডালায় ডালায় নিম্নদিকেও সুস্পষ্ট ঐ সব নাম দেখিতে পাইলাম। সে সব স্থানে কোন প্রকারেই কেহ নাম লিখিতে পারে না, বুঝিলাম। দেবদেবী বা মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপে আছেন, অথবা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এসকল কথা আমার বিশ্বাস করিবার অধিকার নাই; তবে এই বৃক্ষটি যে অসামান্য সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ঠাকুরের সঙ্গে সকলেই বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণপুর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আমিও নমস্কার করিলাম।

মনোরম বনশোভা; হিংসাশূন্য বৃন্দাবন।

কালীদহ দর্শন করিয়া আমরা যমুনার তীরে তীরে যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনের নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। বনের স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ছোট বড় সমস্ত গুলি গাছই অন্যান্য স্থানের গাছপালা হইতে ভিন্ন প্রকারের দেখিলাম। উচ্চ উচ্চ প্রাচীন ও বৃহৎ বৃক্ষ সকলও সর্ব্বত্রই নতশিরে রহিয়াছে। উহাদের শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া ক্রমে ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন শ্রীধামের রজঃস্পর্শমানসেই বৃক্ষসকল শাখাবাহু বিস্তার করিয়া উহা পাইবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভূমিসংলগ্ন হইয়াছে, তাহারাও যেন রজঃস্পর্শে পূর্ণকাম হইয়া স্থির সমাধি অবলম্বন করিয়াছে। বৃক্ষের এইপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা এ জীবনে আমি আর কোথাও দেখি নাই। শ্রীবৃন্দাবনের ছোট বড় সমস্ত বৃক্ষ লতারই শাখা প্রশাখা, এমন কি, পত্রাদি পর্য্যন্ত নতমুখ। বৃক্ষের এইপ্রকার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য একমাত্র এই স্থানেই দেখিলাম। এই সকল বনের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর ভজনকুটীর পরিত্যক্ত ও শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, দেখিলাম। ঠাকুর বলিলেন—**এক সময়ে এ সকল ভজনকুটীরে কত বৈষ্ণব মহাত্মারা সাধন ভজন ক'রেছেন। আহা! এ সব স্থান এখন চোর ডাকাতের আড্ডা হ'য়েছে।**

এমন সুন্দর ভজনকুটীরগুলি শূন্য পড়িয়া আছে দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা

করিলাম—'এ সকল কুটীরে আজ কাল কি কেহ সাধন ভজন করিতে পারে না? বৈষ্ণব সাধুরা এ সকল স্থানে থাকেন না কেন?

ঠাকুর বলিলেন—**থাকিবেন কিরূপে? এ সকল স্থানে থাক্‌তে হ'লে নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে থাক্‌তে হয়। একটি মাটির করোয়া, আর একখানা ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে থাক্‌লেই নিরাপৎ। না হ'লে সামান্য কিছু থাক্‌লেও চোর ডাকাতের অত্যাচার হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না।**

আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনের ভিতর দিয়া চলিলাম। দুই পার্শ্বের ময়ূর ময়ূরী স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে, খেলা করিতেছে, আনন্দে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ৫।৬ হাত তফাতে থাকিয়াও তাহাদের ভয়ের লেশ নাই: পালাইবার চেষ্টা নাই, স্ফূর্ত্তিরও বিরাম নাই। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। বনের হরিণগুলিও মানুষকে যেন মানুষই মনে করে না; তাহারা নির্ভীকভাবে স্বচ্ছন্দ মনে নিঃসঙ্কোচে মানুষের গা ঘেঁসিয়া চলা ফেরা করে। ভগবানের রাজ্যে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিলে কখনও বিশ্বাস করিতাম না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বনের হরিণ, উড়ো ময়ূর, এরাও এত নির্ভীক কেন?' ঠাকুর বলিলেন—**শ্রীবৃন্দাবনে যে হিংসা নাই; তাই এ স্থানের জীবজন্তু, পশুপক্ষী মানুষের নিকটেও এত নির্ভয়।**

আমরা শ্রীবৃন্দাবনের গভীর অরণ্যে পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার এই সকল ভাব ও অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া সন্ধ্যার পরে কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীবৃন্দাবনের এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে, লোকালয়ে আর ফিরিয়া আসিতে প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয়, চিরজীবন এ সব স্থানে থাকিলেও ইহার নিত্য নূতনত্বের নিবৃত্তি ঘটে না।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব; সদ্‌গুরুসমাশ্রিতজনের গতি।

আহারান্তে হরিবংশ পাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—জাতিতে যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কি কোন বিশেষ সুকৃতি ছিল?

৭ই শ্রাবণ, ১২৯৭;
মঙ্গলবার, ২২ জুলাই

ঠাকুর। **তা নিশ্চয়। একটু বিশেষত্ব ছিলই।**

আমি। যদি আবার সংসারে আস্‌তে হয়, কি ভাবে চল্‌লে বর্ত্তমান অবস্থা হ'তে নীচে আর যেতে হবে না? ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে চল্‌লে ভবিষ্যৎ জন্মেও ব্রাহ্মণই হয়?

ঠাকুর। **ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রে ঠিক সেই ভাবে চল। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক নিয়মমত রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার্‌লে আর কখনও নীচে যেতে হবে না। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা গায়ত্রী নিত্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্‌লে পরজন্মেও ব্রাহ্মণই হয়।**

আমি। আমাদের এই সাধন যাঁহারা লাভ ক'রেছেন, তাঁহাদেরও কি আবার জন্ম নিতে হবে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া মাঠাকুরাণী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন— শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন

কালীদহের ঘাট—বৃন্দাবন।

কেসিঘাট—বৃন্দাবন
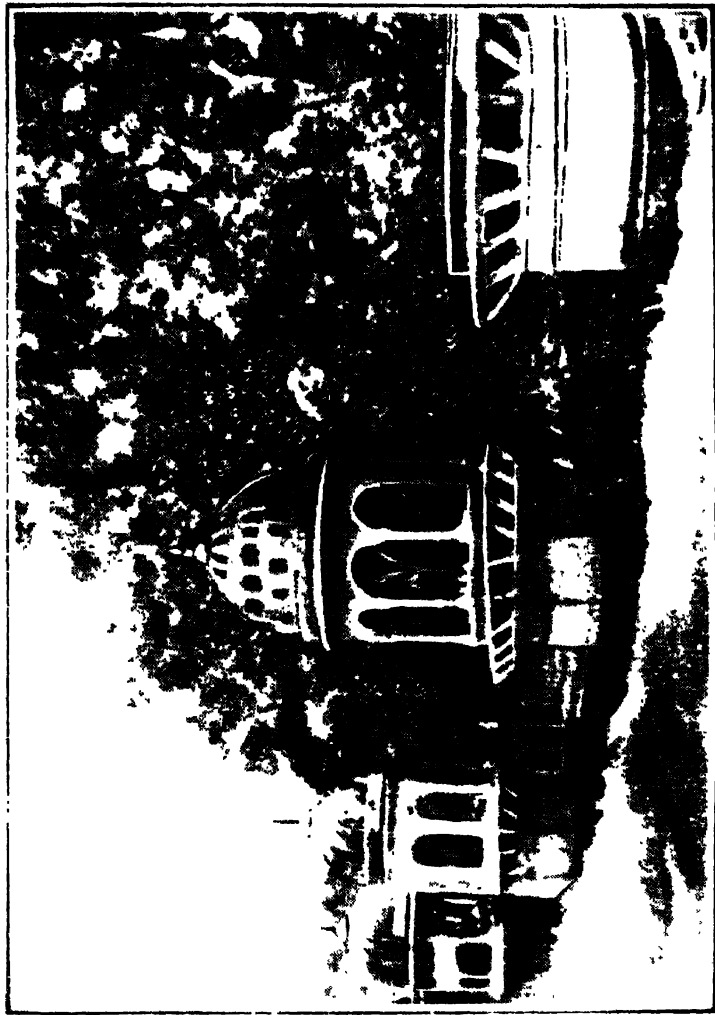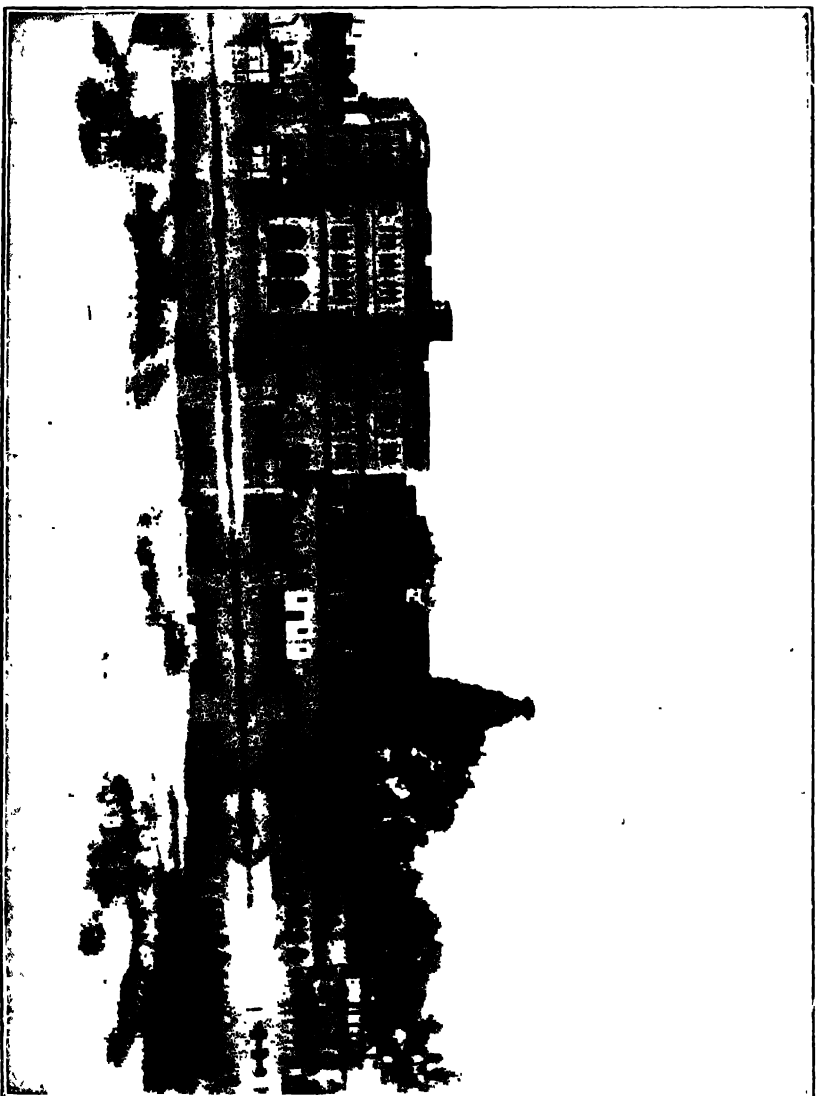
দেখিয়াছিলেন, সাধনের সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে; পণ্ডিত মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে আছেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে খুব বেশী লোক নাই; তৃতীয় শ্রেণীতেই অনেক লোক। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে আছেন, তাঁহাদের আর আসিতে হইবে না, এবারেই তাঁহাদের শেষ জন্ম। যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন তাঁহাদের আর একবারমাত্র আসিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁহাদের আরও দুইবার আসিতে হইতে পারে।

আমি। আচ্ছা, যাঁরা সদ্‌গুরু লাভ ক'রে দেহত্যাগের পর আবার এই সংসারে আস্‌বেন, তাঁরা আবার সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ কর্‌বেন কি না?

ঠাকুর। **তাতে আর কোনও সংশয় নাই, নিশ্চয়ই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ কর্‌বেন।**

আমি। সদ্‌গুরুর কৃপাই যদি লাভ হয়, তা হ'লে আর সংসারে আসায় আপত্তি কি? মুষ্কিলই বা কি?

ঠাকুর। **বাপু, সংসারের মায়ায় বড় আশঙ্কা, সংসারে বড় জ্বালা।**

আমি। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হ'লে এক জন্মেই কি মুক্ত হওয়া যায়?

ঠাকুর। **নিঃসন্দেহে গুরুর আদেশ পালন কর্‌লে আর গুরুতে নিষ্ঠা জন্মালে এক জন্মেই মুক্ত হয়।**

আমি। গুরুর আদেশ প্রতিপালন, চেষ্টা কর্‌লে বরং অনেকটা হ'তে পারে; কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। মনে আপনা আপনি যে সংশয় উপস্থিত হয় তাতে বাধা দিব কিরূপে?

ঠাকুর। **গুরু যা কর্‌তে বলেন তাই কর্‌লেই হ'ল। সন্দেহ হয় হোক, কাজ ঠিকমত কর্‌তে পার্‌লেই হবে।**

আমি। যাঁরা এবার সাধন পেলেন, যত্ন ক'রে সাধন কর্‌লে তাঁরা কি আর সংসারে আস্‌বেন না? এই এক জন্মেই তাঁহাদের সব হ'য়ে যাবে?

ঠাকুর। **তিন জন্মের পূর্ব্বে মুক্তি লাভ করিতে বড় দেখা যায় না। তিনটি জন্ম প্রায় লাগে।**

আমি। তা হ'লে আমাদের সকলেরই তিনটি জন্ম নিতে হবে?

ঠাকুর। **হবে, আবার হবেও না।**

আমি। যাঁরা এবার সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ কর্‌লেন, পূর্ব্বেও কি তাঁরা সকলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলেন?

ঠাকুর। **কেহ কেহ পূর্ব্বেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলেন; আর অনেকে এবারেও লাভ কর্‌লেন।**

আমি। আমার কি পূর্ব্বেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হয়েছিল?

ঠাকুর মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক ইঙ্গিতে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে যাঁদের তিন জন্মেই মুক্তি হবে, তাঁদের মুক্তি না

হওয়া পর্য্যন্ত কি সদ্‌গুরুরও সংসারে আস্‌তে হবে? জন্ম নিয়া সদ্‌গুরু কি শিষ্যের সঙ্গে থাকেন?

ঠাকুর। **সদ্‌গুরু সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। জন্ম না নিয়েও কতরকমে, কত উপায়ে শিষ্যকে কৃপা করেন। বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য ইত্যাদির ভিতর দিয়া, নানা বিষয়ের ভিতর দিয়া, সদ্‌গুরু কৃপা করেন। তাঁরা কি আর সর্ব্বদা আসেন? চার কল্প পরে নানক এবার এসে ছিলেন।**

আমি। তা হ'লেত বড় কষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে গুরু না পাইলে সে যে বড়ই বিষম।

ঠাকুর। **কষ্ট ত বটেই। তবে যাঁরা গুরুবাক্যমত চলেন তাঁদের আর কোন কষ্টই ত নাই। নিজের ভাবমত স্বেচ্ছাচারে চল্‌লেই ঠেক্‌তে হয়। যতদিন না গুরুর বাক্যমত চ'লে, তাঁতে নিষ্ঠা না জন্মায়, ততদিন বারংবার জন্মাতেই হবে। সদ্‌গুরুর সঙ্গে মায়িক কোন সম্বন্ধই নাই তো, শিষ্যের কল্যাণের জন্যই তিনি সংসারে আসেন, শিষ্যের উপকারই তাঁর আসার উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর আদেশমত না চল্‌লে হবে কেন? ঠিক গুরুবাক্য ধ'রে চল্‌তে হয়, তা হ'লেই আর কোনও উৎপাত থাকে না।**

আমি। অনেক সময়ে নাকি গুরু শিষ্যকে নানারূপে পরীক্ষা ক'রে থাকেন? তা হ'লে তাঁর যথার্থ আদেশ কি প্রকারে বুঝা যাবে?

ঠাকুর। **যিনি সদ্‌গুরু তিনি কখনও শিষ্যকে পরীক্ষা করেন না। তা কর্‌বেন কেন? যাতে শিষ্যের যথার্থ কল্যাণ হয়, সদ্‌গুরু তাহাই ব'লে দেন। তবে যারা ঐ বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে নিজের মনমত চলে, গুরু তাদেরই নানা অবস্থায় ফেলে ঠিক ক'রে নেন।**

পিতৃ-ঋণাদি সম্বন্ধে উপদেশ।

বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন, সংসারে যাবতীয় প্রয়োজন উঁহারই চাক্‌রীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিছুদিন হয় পিতার দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া সতীশ অমনিই উদাসীনের মত বাহির হইয়া পড়িলেন, ঘরে বিধবা মাতার ক্লেশের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। পদব্রজে চলিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া এখন ঠাকুরের সঙ্গে রহিয়াছেন। বাড়ীতে যাইয়া পিতার শ্রাদ্ধ এবং রুগ্না, শোকার্ত্তা মাতার সেবা করিতে ঠাকুর সতীশকে বহুবার বলিয়াছেন; কিন্তু সতীশ কিছুতেই ঠাকুরের এই আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিবেন না, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন—বলিতেছেন। ঠাকুর সতীশকে বাড়ীতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ ও সংসারধর্ম্ম করিতে বলিলেই সতীশের মাথা গরম হয়, তখন সতীশ ঠাকুরের সঙ্গে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক, গোলমাল আরম্ভ করিয়া দেন। আজ আবার ঠাকুর সতীশকে লক্ষ্য করিয়া খুব তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—**সতীশের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হবে, বারংবার তাহা ব'লেছি। এখন না শুন্‌লে কি করা যায়? পিতৃঋণ শোধ না কর্‌লে ওর কিছুই হবে না; বাড়ী গিয়ে মাতৃ-সেবা না কর্‌লে এ জীবনটাই বৃথা যাবে। শুধু এ জন্ম কেন, এ অপরাধের দরুণ কত জন্ম বৃথায়**

যাবে ঠিক নাই। শুকপ্রভৃতির ন্যায় তেমন তীব্র বৈরাগ্য হ'লে কিছুতেই আট্‌কায় না সত্য; কিন্তু সেইমত না হ'লে তো হবে না। যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মান পর্য্যন্ত প্রণালী ধ'রে চল্‌তে হয়। যার যা কর্ত্তব্য তাহা উপেক্ষা ক'রে এড়ায়ে যাবার যো নাই। সংসার করতে হরিমোহনকে ঢের ব'লেছি এখন ইঁহারা বুঝ্‌ছেন না; কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, এখন ঠিকমত না চল্‌লে এর পর সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় আদায় হবে। কথা না শুন্‌লে আর কি করা যায়? পরে বেশ বুঝ্‌বে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ ধরিয়া উঁহাদিগকে এইপ্রকার বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ হইতে কিসে মুক্ত হওয়া যায়।

ঠাকুব বলিলেন—পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ হ'তে; যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তীর্থ দর্শনাদি দ্বারা দেব-ঋণ হ'তে, এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষি-ঋণ হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। আর উপায় নাই।

আমি। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর্‌লে কি পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না? সকলেরই কি এজন্য পুত্রোৎপাদন কর্‌তে হবে?

ঠাকুর। শুধু তর্পণাদি কর্‌লে পিতৃঋণে মুক্ত হওয়া যায় না। ঋণমুক্ত হওয়ার এই-ই উপায়। তবে যাঁহারা অক্ষম, তাঁদের জন্য ব্যবস্থা ভিন্ন রকম আছে।

আমি। অক্ষম আবার কিরূপ?

ঠাকুর। মনে কর, কারো শরীর খুব রুগ্ন; শারীরিক অসুস্থতার দরুন পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ। অথবা অন্য কোনও বিশেষ অসুবিধা বা অক্ষমতায় সে কার্য্য সম্পন্ন হ'ল না, এরূপও হ'য়ে থাকে। অনেকের বিবাহ ক'রেও পুত্র জন্মাচ্ছে না! এ সব কারণে পুত্র না জন্মিলে ঋণদায়ী হ'তে হয় না।

আহারান্তে এরূপ প্রশ্নোত্তরে আমাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল। বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে আমরা বস্ত্রহরণের ঘাটে গেলাম। যুমনার দিকে দৃষ্টি করিয়া ঠাকুর বহুক্ষণ ঘাটের উপরে বসিয়া রহিলেন। মাঠাক্‌রুণ, কুতু, ভারত পণ্ডিত মহাশয়*, সতীশ, শ্রীধর ও আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। পরে সতীশের সঙ্গে কথায় কথায় আমার ঝগ্‌ড়া বাধিয়া গেল। শ্রীধর তাহাতে যোগ দিলেন। সন্ধ্যার পরে আমরা সকলে কুঞ্জে আসিলাম।

বারদীর পথে শ্রীধরের কাণ্ড।

১০ই শ্রাবণ, ১২৯৭।

বৈকালে গুরুভ্রাতারা সকলে দাউজীর বারেন্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য ও দয়ার কথা হইতে লাগিল। শ্রীধরের একবার বিপিন বাবুর সঙ্গে বারদী যাইবার

* বিক্রমপুর নিবাসী গুরুনিষ্ঠ সাধনপরায়ণ গুরুভ্রাতা, ঢাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

কালে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, গুরুভ্রাতারা সকলে তাহা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীধর যাহা বলিলেন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঘটনাটি শ্রীধরের কথামত নিম্নে লিখিয়া রাখিলাম।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন। ঢাকায় আসিয়া গুরুদেবের সম্মতিক্রমে শ্রীধর প্রভৃতি কয়েকটি গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বারদী যাত্রা করিলেন। শ্রীধর উপদেশ করিলেন—"শূন্য হস্তে সাধুদর্শনকরিতে নাই।" তদনুসারে ব্রহ্মচারীর সেবার জন্য নানাবিধ তরিতরকারি, ফল-ফলারি সঙ্গে লওয়া হইল। বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ৪টি ফজলি আম অধিক-মূল্যে ক্রয় করিয়া, বিপিন বাবু, স্বহস্তে উহা ব্রহ্মচারীকে দিবেন এই আকাঙ্ক্ষায়, যত্নের সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। শ্রীধর সঙ্গে যাইবেন; তাঁহার মতিগতির স্থিরতা নাই; যদি রাস্তায় কোন ফাঁকে আম কয়টি সাবাড় করেন, ভাবিয়া বিপিন বাবু শ্রীধর প্রভৃতির জন্যও পৃথক্ একটুক্‌রি আম ক্রয় করিয়া লইলেন। নৌকাতে জিনিসপত্রগুলি গুছাইবার সময়ে শ্রীধর ফজলি আম কয়টির প্রতি মনোযোগের সহিত নজর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বিপিন বাবু শ্রীধরকে বলিলেন—"ভাই, দোহাই তোমার। বড় আশা ক'রে এই আম চারিটি মহাপুরুষের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। উহাতে হাত দিও না। তোমাদের জন্যও একটুক্‌রি ভাল আম পৃথক্ নিয়াছি। তাহাই খাইও।" শ্রীধর বিস্ময় প্রকাশ কবিয়া বলিলেন—"তুমি বল কি, য়্যা? এমন কথা তুমি আমাকে বল্‌তে পার্‌লে? ব্রহ্মচারীর জন্য প্রাণের আগ্রহে একটা জিনিস নিয়ে যাচ্ছ, তা আমি খাবো। এপ্রকার নীচ কল্পনা তোমার মনে এলো কি ক'রে, তুমি ত ভয়ানক লোক দেখ্‌ছি।" বিপিনবাবু লজ্জিত হইয়া শ্রীধরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিছু দূর চলিয়া নৌকাখানা একটা বাজারের কাছে পৌঁছিল। গুরুভ্রাতারা সকলেই বাজারে উঠিলেন। শ্রীধরকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে বিপিন বাবু দুই তিনবার চেষ্টা করিলেন; শ্রীধর ভজনমগ্ন, মৌন থাকিয়া হাত নাড়া দিয়া বুঝাইলেন—"তোমরা যাও। আমি যাব না।" নৌকা হইতে নামিয়াও বিপিন বাবু শ্রীধরকে আর একবার বলিলেন—ভাই, আম খেতে ইচ্ছা হ'লে, টুক্‌রিতে ভাল ভাল আম আছে, নিয়ে খেও।" শ্রীধর গম্ভীর রহিলেন। বিপিন বাবু চল্‌তি মুখেও পুনঃপুনঃ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কিয়দ্দূরে বাজারে প্রবেশ করিলেন। উঁহারা অদৃশ্য হইলে, শ্রীধর আসনহইতে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৪টি ৫।৭ বৎসরের উলঙ্গ বালক একটি ভিখারিণীর সহিত নৌকার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীধর আগ্রহের সহিত তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও?" দুঃখী বালকেরা কহিল—"বাবা, কিছু খাবার দিবে?" শ্রীধর অমনি ছুটিয়া গিয়া সেই বড় বড় ফজলি আম চারিটিই নিয়া আসিলেন; পরে উহা সেই ভিখারী বালকদের হাতে দিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"যা, শীঘ্র চ'লে যা; না হ'লে আম আবার কেড়ে নিব।" বালকেরা শ্রীধরের ধমক শুনিয়া ভয়ে দৌড় মারিল। তখন শ্রীধর আবার আসনে গিয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং খুব উৎসাহের সহিত তদ্গত ভাবে ভজন গাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে, গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বিপিন বাবু যে পথে আসিতে ছিলেন সেই

পথেই বালক কয়টি, আম হাতে লইয়া যাইতেছিল। বালকদের হাতে বড় বড় ফজলি আম দেখিয়া বিপিন বাবুর চক্ষু স্থির। তিনি জিহ্বা কাটিয়া মাথায় হাত দিয়া গুরুভ্রাতাদের বলিলেন—"দেখ্‌লে? পাগলের কাণ্ড দেখ্‌লে? পাগ্‌লা সর্ব্বনাশ ক'রেছে। এত ক'রে যা নিষেধ করেছিলাম, পাগ্‌লা তাই ক'রেছে—সেই আম চারিটিই দিয়াছে।" বিপিন বাবু তখন আবার আট আনার পয়সা দিয়া, বালকদের নিকট হইতে আম কয়টি পুনরায় আদায় করিয়া লইলেন, পরে খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিনবাবু শ্রীধরকে খুব গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীধর তখন দ্বিগুন উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিলেন। কতক্ষণ পরে শ্রীধর ভজন শেষ করিয়া, বিপিন বাবুর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁকে খুব ধমক দিয়া বলিলেন—"কি, এ কি রকম? ভজনের সময়ে যে বড় গোলমাল কর্‌ছিলে? তোমার আক্কেল নাই?" বিপিন বাবু, ধমক খাইয়া একটু দমিয়া গেলেও, পরে গুরুভাইদের বল পাইয়া বলিলেন—"তোমার তো খুব আক্কেল, তুমি কোন্ বিবেচনায় আমার আম চারটি অন্যকে দিয়া দিলে?" শ্রীধর বলিলেন, "দিয়েছি তো কি হ'য়েছে? ফিরে পেয়েছ তো? হাতবদল হ'লেই দোষ হয়?" বিপিন বাবু বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর নামে আম রেখেছিলাম, তুমি কাহার হুকুমে অন্যকে দিলে?" শ্রীধর বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর হুকুমেই দিয়েছি। যাও, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।" এইরূপ বচসার পর দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত। প্রদীপ জ্বালিতে 'পলিতা' নাই। "একটু ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া কোথায় পাই"— ভাবিয়া সকলেই ব্যস্ত হইলেন। শ্রীধরের ঝোলার ভিতরে রাশীকৃত টুক্‌রা টুক্‌রা ময়লা ন্যাক্‌ড়া আছে, সকলেই জানে। উহা সহজে শ্রীধর খুলেন না, ময়লা ন্যাক্‌ড়ার ঝোলাটি মাথায় দিয়া শয়ন করেন। বিপিন বাবু অন্ধকারে সুযোগ বুঝিয়া গুরুভ্রাতাদের ইঙ্গিতমত পলিতার ন্যাক্‌ড়ার জন্য শ্রীধরের ঝোলাহইতে যেমন একখানি ছেঁড়া টুক্‌রা বাহির করিলেন, অমনই শ্রীধর এক বিকট চীৎকার করিয়া বিপিন বাবুর সম্মুখে গিয়া পড়িলেন, এবং কিছুমাত্র কথা না বলিয়া তাঁহার উরুর মধ্যস্থলে কামড়াইয়া ধরিলেন। বিপিন বাবু "বাবারে, মারে,খুন কর্‌লেরে", বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা আসিয়া টানাটানি করিয়া যখন ছাড়াইতে পারিলেন না, তখন শ্রীধরের পিঠে সকলে কিলের উপর কিল মারিতে লাগিলেন। তাহাতেও শ্রীধরের ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলে তখন নৌকার পাটাতন তুলিয়া শ্রীধরের পৃষ্ঠে দড়াম্ দড়াম্ মারিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধর এসময়ে ঘন ঘন মাথা ঘাড় নাড়া দিয়া অধিকতর তেজের সহিত প্রাণপণে কামড়াইতে লাগিলেন। ক্ষত বিক্ষত উরুহইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তখন অনুপায় দেখিয়া মাঝিরা বলিল—"আপনারাও সকলে ওকে কামড়াইয়া ধরুন, তা হ'লেই ছেড়ে দিবে।" মাঝিদের কথামত শ্রীধরের পিঠে দুই তিন জনে কামড়াইয়া ধরিল। শ্রীধর তখন কামড় ছাড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; "জয় নিতাই", "জয় নিতাই" বলিয়া দুই একটি লম্ফ দিয়া, চলন্ত নৌকা হইতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সাঁতার জানেন না, সকলেরই জানা ছিল। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া

নদীতে পড়িলেন। চুবুনির উপর চুবুনি খাইয়া সকলে টানাটানি করিয়া শ্রীধরকে নৌকায় তুলিলেন। সারা রাত এইপ্রকার উদ্বেগে কাটিয়া গেল। ক্রমে নৌকা গিয়া বারদীর বাজারে পৌঁছিল।

সকাল বেলা সকলে ফল-ফলারি সিধার সামগ্রী হাতে লইয়া, ব্রহ্মচারীর দর্শনে যাত্রা করিলেন। শ্রীধরের কিছুই নাই; ব্রহ্মচারীর জন্য কি লইয়া যাইবেন, ভাবিয়া শ্রীধর মনোদুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ নৌকাহইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া খালহইতে দল ঘাস, কলমী শাক, লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া খালের পাড়ে জড় করিতে লাগিলেন; রাশীকৃত জমা হইলে পর, লেংটিমাত্র পরিয়া, বহির্ব্বাস দ্বারা উহা আঁটিয়া বাঁধিয়া লইলেন; তৎপরে ঘাসের প্রকাণ্ড বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইয়া, ব্রহ্মচারীর আশ্রমের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। এদিকে বিপিন বাবু প্রভৃতি আশ্রমে যাওয়ামাত্রই ব্রহ্মচারীর দর্শন পাইলেন না। একটু অপেক্ষা করিতে হইল। যথাসময়ে ব্রহ্মচারী সকলকে ডাকিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বসামাত্রই ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন— "ওরে, সেই শ্রীধর কোথায়? তোদের সঙ্গে আসে নাই?" গুরুভ্রাতারা বলিলেন—"সে নৌকায় ব'সে আছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"কেন সে এল না? তাকে কি তোরা মেরেছিস্?" বিপিন বাবু বলিলেন— "মহাশয়, তাকে নিয়া বড় জ্বালাতন। সে সারা রাস্তা বড় উৎপাত করেছে। আমার উরু কামড়ায়ে ঘা ক'রে দিয়েছে।" ব্রহ্মচারী আম দেখিয়া বলিলেন—" তোরা এ আম আবার কোথায় পেলি?" এই সময়ে মাথায় বোঝা লইয়া শ্রীধর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীধরকে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী আসনহইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন; অমনই শ্রীধর ঘাসের বোঝাটি ব্রহ্মচারীর সম্মুখে দ্রুম করিয়া ফেলিয়া দিয়া, "এই খা, এই খা" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া লম্বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী একমুখ হাসিয়া খুব প্রফুল্ল ভাবে ঘাসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব কি ব্রহ্মচারীকে খেতে দিলে?" শ্রীধর মাথা তুলিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন—"শাস্ত্র জান? 'গোব্রাহ্মণহিতায়চ'।" উঁহারা বলিলেন—"শাস্ত্রের অর্থটা কি হ'লো?" শ্রীধর বলিলেন—"আরে, আগে গরুর; পরে বামুণ বেটাদের; তারপর তোমার, আমার, জগতের। 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ'।। তা হ'লে আগে গরুর যা প্রিয় তাই তো ব্রহ্মণ্যদেবেরও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।" শ্রীধরের কথা শুনিয়া সকলে খুব হাসিতে লাগিলেন। বিপিন বাবু তখন নিজের রোগের পরিচয় দিয়া আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন—"শ্রীধর না তোর উরু কামড়ায়েছে? রক্ত পড়েছে তো?" বিপিন বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, ভয়ানক কামড়ায়েছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"ওতেই তোর রোগ সেরে যাবে। কেন শ্রীধর কামড়ালে, তা একবার জিজ্ঞাসা করিস্ নাই?"তখন শ্রীধরকে সকলে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীধর খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আরে ভাই, তোরা ত সকলে বাজারে গেলি। আমি হঠাৎ সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। নৌকা হ'তে বাইরে এসে চারিদিক্ তাকায়ে দেখি, সঙ্কীর্ত্তনাদি কিছুই না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় চারিটি ঋষিবালক লইয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত, বলিলেন—"ও'রে, আমার জন্য যে চারিটি আম রয়েছে, তাই এনে এদের দিয়ে দে।" আমি অমনি আম কয়টি দিয়ে দিলাম। সত্য মিথ্যা ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেও। এজন্য ত আমাকে তোমরা কত গালি দিলে! তোমাদের কথায় কাণ না দিয়ে আমি নাম কর্‌তে লাগলাম। আকাশপথে একটি সঙ্কীর্ত্তন আস্‌ছে দেখ্‌লাম। ব্রহ্মচারী মহাশয় সঙ্কীর্ত্তনের আগে আগে এসে বল্‌লেন—'ওরে, ওর উরু কামড়ায়ে রক্তপাত ক'রে দে, ওর রোগটা তাতে সেরে যাবে।' আমি ভাবিলাম, শুধু শুধু কামড়াই কিরূপে? এই সময়ে বিপিন বাবুর দিকে চেয়ে দেখি, তিনি আমার ঝোলা হ'তে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া টেনে বার করছেন। অমনি আমার মাথা গরম হ'ল। নেপাল, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ ও পশ্চিমে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি, প্রত্যেকের ব্যবহারের কিছু না কিছু, বহির্ব্বাস, লেংটি, আসনাদির টুক্‌রা সংগ্রহ ক'রে, আমার ঝোলা পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছি; ওসব আমার বুকের রক্ত। ময়লা ব'লে নোংরা বাজে ন্যাক্‌ড়া ভেবে যেমন বিপিন বাবু একখণ্ড বার করতেছিলেন, আমি অমনি তাঁর উরু কাম্‌ড়ায়ে ধর্‌লাম। তার পর তোমরা কিলই মার, আর লাঠিই মার, রক্তপাত না হ'লে ত আমি ছাড়্‌ব না। রক্তপাত হইতেই আমি লাফায়ে উঠ্‌লাম। সম্মুখে দেখি, তুমুল সঙ্কীর্ত্তন। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভু নৃত্য কর্‌ছেন এবং গোঁসাই সঙ্কীর্ত্তনে আগে আগে 'হরিবোল', 'হরিবোল' বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছেন। আমি অমনি ঐ সঙ্কীর্ত্তনে লাফায়ে পড়্‌লাম। পরে দেখি চুবুনি খাচ্ছি। তখন তোমরা সকলে আমাকে টানাটানি ক'রে নৌকার উপরে তুল্‌লে।" শ্রীধরের মুখে উক্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই তখন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। ধন্য শ্রীধর!

ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা।

১২ই শ্রাবণ, ১২৯৭
শুক্লাদশমী তিথি,
রবিবার।

আজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের মহাযোগ। শুনিলাম; সহস্র সহস্র লোক স্নানার্থে তথায় সম্মিলিত হইয়াছেন। আমাদের কুঞ্জেরও সকলেই আজ সেখানে গিয়াছেন। আমি অন্যান্য দিনের মত, সকাল বেলা শৌচান্তে যমুনায় স্নান করিতে চলিলাম, ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—**তুমি কেশিঘাটে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন ক'রে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ক'রে, শীঘ্র চলে এস। একটি শিখা রেখো!**

আমি গুরুদেবের কথা অনুসারে যমুনাতীরে যাইয়া কেশিঘাটে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখামাত্র অবশিষ্ট রাখিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া দেখি, অসংখ্য লোকের সমাগমে ব্রহ্মকুণ্ড আজ পরিপূর্ণ। জল ভাং গোলার মত এবং অতিশয় কদর্য্য ও ময়লা হইলেও স্নানার্থীদের ভাব ভক্তি দেখিয়া আমারও স্নানের জন্য অতিশয় আগ্রহ জন্মিল। অবগাহনান্তে তর্পণ সমাপন করিয়া, অবিলম্বে কুঞ্জে আসিলাম। গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণামান্তে স্বীয় আসনে গিয়া বসিলাম। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"**কুলদা, আমার আসনঘরে**

এস। এখনি তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিব। বস্‌বার একখানা আসন নিয়ে এস।" আমি একখানা আসন লইয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঠাকুর পূর্ব্বেই নিজ আসনে আসিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে বলিলেন—"পূর্ব্ব মুখ হ'য়ে আমার সম্মুখে ব'স।" আমি কম্বল আসনখানা পাতিয়া ঠাকুরের সম্মুখে স্থির হইয়া বসিলাম। তখন আমার 'হু হু' শব্দে কান্না আসিয়া পড়িল। ভাবিলাম, গুরুদেব আজ আমাকে ঋষি মুনিদের পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষা দিতেছেন। ঠাকুরের কত দয়া! ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে আমাকে বলিতে লাগিলেন—

এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মচর্য্য ব্রত বার বৎসর, তিন বৎসর বা এক বৎসরের জন্যও নেওয়া যায়। এখন তোমাকে এক বৎসরের জন্যই এই ব্রত দিচ্ছি। যদি নিয়ম রক্ষা ক'রে ঠিকমত এই এক বৎসর চল্‌তে পার, তবে আবার দেওয়া যাবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ঠাই মূল। নিষ্ঠাটি খুব চাই। নিজের নিষ্ঠা কোন অবস্থায়ই ত্যাগ কর্‌বে না। যে সব নিয়ম ব'লে দিচ্ছি, নিষ্ঠার সহিত সে সব নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌বে।

১) প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে সাধন কর্‌বে। পরে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন ক'রে,শুচি শুদ্ধ হ'য়ে আসনে বস্‌বে। গায়ত্রী জপ কর্‌বে। তার পর গীতা অন্ততঃ এক অধ্যায় ক'রে পাঠ কর্‌বে। পাঠ শেষ ক'রে আবার সাধন কর্‌বে। স্নানান্তে গায়ত্রী জপ ক'রে তর্পণাদি কর্‌বে।

২) স্বপাক আহার কর্‌বে, অথবা ভাল ব্রাহ্মণের রান্না অন্নও আহার কর্‌তে পার। আহারে কোন প্রকার অনাচার না হয়। আহারের একটা নিয়ম রাখ্‌বে। পরিমিত আহার কর্‌বে, খুব বেশী বা কম না হয়, যাতে কামভাব উত্তেজিত হয় এমন বস্তু খাবে না। অধিক পরিমাণ ঝাল, অম্ল, মিষ্টি ত্যাগ কর্‌বে। মধু ও ঘৃতে উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়; এ সব বস্তুও অধিক খাবে না। আহারসম্বন্ধে সর্ব্বদাই খুব সাবধানে থাক্‌বে। আহারটি বেশ শুদ্ধমত কর্‌বে।

৩) আহারান্তে কিছুক্ষণ ব'সে বিশ্রাম কর্‌বে। পরে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি কিছু সময় পাঠ কর্‌বে। পাঠের পর নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান কর্‌বে। বিকাল বেলায় ইচ্ছা হ'লে একটু বেড়াতে পার।

৪) সন্ধ্যার সময়ে গায়ত্রী জপ কর্‌বে। পরে সাধনাদি যেমন ক'রে থাক তেমনই কর্‌বে। খুব ক্ষুধা বোধ হ'লে সামান্য কিছু জলযোগ কর্‌বে। অন্নাহার দু' বেলা কর্‌বে না।

৫) নিতান্ত সামান্য বসন পরবে। সামান্য শয্যায় শয়ন করবে। এসকল নিজের নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। দিনের বেলায় নিদ্রা ত্যাগ কর্‌বে। সময়ে সময়ে সাধুসঙ্গ কর্‌বে, সাধুদের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শুন্‌বে। নিজের সাধনে বিশেষ রূপে নিষ্ঠা রাখ্‌বে।

৬) কাহারও নিন্দা কর্‌বে না; কাহারও নিন্দা শুন্‌বে না; যে স্থানে নিন্দা হয় সে স্থান বিষবৎ ত্যাগ কর্‌বে।

৭) কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব রাখ্‌বে না। যিনি যে ভাবে সাধন করেন তাঁকে সেই ভাবেই সাধন কর্‌তে উৎসাহ দিবে।

৮) কাহারও মনে কষ্ট দিবে না; সকলকেই সন্তুষ্ট রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। অন্যের সেবা তোমার দ্বারা যতদূর সম্ভব হয়, কর্‌বে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী বৃক্ষলতা প্রভৃতির যথাসাধ্য সেবা কর্‌বে। নিজেকে অন্যের নিকটে ছোট মনে কর্‌বে। সকলকে মর্য্যাদা দিবে। প্রতি কার্য্যই বিচার ক'রে কর্‌বে। সর্ব্বদা প্রতি কার্য্যে বিচার ক'রে চল্‌লে কোন বিঘ্ন হয় না।

৯)সর্ব্বদা সত্য বাক্য বল্‌বে; সত্য ব্যবহার কর্‌বে। অসত্য কল্পনা মনেও আস্‌তে দিবে না। কথা কম বল্‌বে।

১০) যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ কর্‌বে না। দেব দর্শনে, গোলমালে, রাস্তায় ঘাটে বা অজ্ঞাতসারে স্পর্শ হ'লে তাহা স্পর্শমধ্যে গণ্য হবে না। অতি গোপনে নিজের কাজ ক'রে যাবে।

১১) সর্ব্বদাই খুব শুচি শুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে। পবিত্র স্থানে, পবিত্র আসনে বস্‌বে।

এসমস্ত নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার্‌লে আগামী বৎসর আরও নিয়ম ব'লে দেওয়া যাবে।

এই সব নিয়ম উপদেশ করিয়া ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া খুব প্রাণায়াম করিতে লাগিলেন। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়াম করিতে বলিলেন, আমিও করিতে লাগিলাম। পরে দুর্লভ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আমায় দীক্ষা দিলেন। এ সময়ে আনন্দে আমার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল। ভাবে অভিভূত হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে ঠাকুর আমাকে উঠিতে বলিলেন।

আমি যেমনি ঠাকুরের ঘরহইতে বাহির হইলাম, অমনি সকলে কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ব্রতের বিষয়ে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না।

বিচারপূর্ব্বক দানের উপদেশ।

বিকাল বেলা আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীগোবিন্দজী দর্শনে বাহির হইলাম। মন্দিরের নিকটে একটি বৃদ্ধকে দেখিয়া ঠাকুর দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ অতিশয় জ্বরাতুর, কাঙ্গালবেশ। ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া, হাবভাবে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ইঙ্গিতে কিছুই বুঝিলাম না। এ সময়ে আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বৃদ্ধ কি বল্‌ছে?' ঠাকুর বলিলেন—**'তোমার গায়ের কম্বলখানা চায়।'** আমি বলিলাম—' দিয়া দিব নাকি?' ঠাকুর বলিলেন—**'তোমার ইচ্ছা হ'লে দিতে পার।'** আমি তখন কম্বলখানা বৃদ্ধকে দিয়া, খালি গায়ে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**' তোমার গায়ের অন্য কোন কাপড় নাই?'** আমি বলিলাম— 'শুধু একখানা ছেঁড়া ধুতি আছে। আর কিছু নাই। সকাল বেলা গায়ের আলোয়ানখানা একটি ভিখারীকে দিয়া দিয়াছি।' ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—**'যে বস্তুর অভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পেতে হয় সেরূপ নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তু ছেড়ে দিতে নাই। উহার অভাবে কষ্ট হ'লে যদি একবারও দানের জন্য অনুতাপ হয়, তবে সবই মাটি। এই জন্য সকল কার্য্যই বিচার ক'রে কর্‌তে হয়। যাক্‌, ভগবান তোমার যোগাড় রেখেছেন।'**

কুঞ্জে আসিয়া ঠাকুর মাঠাক্‌রুণকে বলিলেন— **তোমার আসনের কম্বলখানা কুলদাকে পেতে শুতে দিও।** মাঠাক্‌রুণ তৎক্ষণাৎ আমাকে তাঁহার কম্বলখানা আনিয়া দিলেন। মাঠাকুরাণীর বহুদিনের সাধন ভজনের কম্বল আসন পাইয়া, নিজেকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিলাম। প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল।

আসনের গ্রন্থ।

ভোরবেলা যথারীতি প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে যমুনায় যাইয়া স্নান ও তর্পণ করিলাম। কয়েকদিনযাবৎ ব্রাহ্মবন্ধু গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্রও আমার সঙ্গে তর্পণ করিতেছেন। তর্পণ করিয়া নাকি তাঁহার শরীর হাল্‌কা হাল্‌কা বোধ হয়, মনেও তিনি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। উঁহার এ কথা শুনিয়া অবধি আমারও তর্পণের উপর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল। স্নানান্তে নিজের আসনে বসিয়া কিছু সময় সাধন করিলাম। আমার প্রতি প্রত্যহ এক এক অধ্যায় গীতাপাঠের আদেশ হইয়াছে; অথচ গীতা আমার নাই। সাহস করিয়া ঠাকুরের আসনঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গীতাখানি লইয়া আসিলাম। পরে পাঠান্তে পুনরায় উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—**আসনের গ্রন্থ কখনও স্থানান্তরিত কর্‌তে নাই, ক্ষতি হয়।**

১৩ই শ্রাবণ সোমবার; ১২৯৭।

আমি। আমাকে গীতা পাঠ কর্‌তে বলেছেন, আমার গীতা নাই।

ঠাকুর। **ঐ গীতাই তুমি স্বচ্ছন্দে পড়। অন্য ঘরে না নিলেই হ'ল। আমার আসনঘরে ব'সে পড়্‌তে পার।**

আমি। আসনহইতে গ্রন্থখানি তুল্‌লেই তো স্থানান্তরিত করা হবে?

ঠাকুর। **তাতে কোনও দোষ হয় না। আসনঘরে থাকলেই হ'ল।**

দৃষ্টিসাধন।

অপরাহ্ণে কিয়ৎকাল দৃষ্টিসাধন করিয়া, ঠাকুরকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—অনেককাল যাবৎ ক্ষিতিতেই দৃষ্টিসাধন ক'রে আস্‌ছি। এখন কি অন্য ভূতে অভ্যাস কর্‌ব? ঠাকুর বলিলেন— **না, এখনও এই কর। আরও পাকুক। একটায় ঠিক হ'য়ে গেলে অন্যটায় করা ভাল। একটিমাত্র বিন্দুতে সমস্তটি দৃষ্টি স্থির কর্‌তে হয়।**

আমি। দৃষ্টিসাধনে কি উপকার হয়? ঠাকুর বলিলেন—**চক্ষু পরিষ্কার হয়; দৃষ্টিশক্তি খুব বৃদ্ধি হয়। অতি দূরবর্ত্তী বস্তু আর সূক্ষ্ম বিষয় সকলও পরিষ্কার দেখা যায়। আর আর যা হয়, দৃষ্টি সাধন কর্‌তে কর্‌তেই তা বুঝ্‌বে।**

'কর্‌তে কর্‌তেই বুঝ্‌বে'—ঠাকুর এইরূপ বলায় আমার আর কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। মনে করিলাম, এই কথা দ্বারাই আমাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

শ্রীবিগ্রহদর্শনের উপদেশ।

কিছুকাল পরে ঠাকুর নিজ হইতে বলিলেন—**শ্রীবৃন্দাবনে যত দিন থাক্‌বে, প্রত্যহ মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রো, উপকার পাবে।** আমি বলিলাম—ঠাকুর তো পাথরের মূর্ত্তি, উহা দর্শন ক'রে কি উপকার হবে? আপনার সঙ্গে কতদিনই তো দর্শন কর্‌লাম। উপকার যে কি হ'ল তা তো বুঝ্‌লাম না।

ঠাকুর কহিলেন—**যেসব স্থলে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সহস্র সহস্র লোক শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন, সেসব স্থানে ওসব ভাবের একটা যোগ থাকে। ওসব স্থানে গেলেই ভিতরের ধর্ম্মভাব সকল জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। এ কি কম উপকার? আর এই শ্রীবৃন্দাবনের বিগ্রহ সকল সাধারণ প্রস্তরমূর্ত্তি নন। "ভক্তমাল" প'ড়েছ? একবার প'ড়ো।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—শ্রীবৃন্দাবনের এসব ঠাকুর কি কথা বলেন? হাত পা নাড়েন? সকলেই বলেন, এখানকার ঠাকুর সব জাগ্রত। কি রকম জাগ্রত? ঠাকুর বলিলেন—**যাঁদের সেপ্রকার চোখ কাণ আছে, তাঁরা ঠাকুরের হাত পা নাড়াও দেখেন, কথা বলাও শোনেন। এ সব বললে, সাধারণ লোকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বে কেন?**

স্বপ্ন। গঙ্গার আবর্ত্তে নিমজ্জন।

মাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের চা-সেবার এখন বেশ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপাভাজন শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু (ব্রহ্মানন্দ স্বামী), প্রবোধচন্দ্র এবং দক্ষ বাবু নিত্য চা খাইতে আমাদের কুঞ্জে আসেন। কাঠিয়াবাবার আশ্রিত শ্রীযুক্ত অভয়বাবুও প্রত্যহ আসিয়া থাকেন। সকলের চা-সেবার পর শ্রীধর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তৎপরে ঠাকুরের আদেশমত অভয় বাবু **"ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্ট" পাঠ ও বঙ্গানুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইয়া থাকেন। ঠাকুর আজ এই পুস্তকখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্ট" নিত্য পাঠের উপযুক্ত। গ্রন্থখানা যিনি লিখেছেন তিনি একজন মহাপুরুষ।**

১৪ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

সকলে চলিয়া গেলে, গত রাত্রের একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত ঠাকুরকে বলিলাম। স্বপ্নটি এই—নির্ম্মল, শীতল গঙ্গাজলে গলা পর্য্যন্ত নামিয়া প্রফুল্ল মনে স্নান করিতেছি, কোন দিকেই আমার দৃষ্টি নাই। অকস্মাৎ প্রবল স্রোতে পড়িয়া গেলাম। স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। খুব সাঁতার কাটিতে জানি বলিয়া সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। পরে যখন দেখিলাম তীরহইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন পাড়ে যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটিতে গিয়া, সর্ব্বাঙ্গ আমার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন অতিরিক্ত শ্রান্ত হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেখি, অতিভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়াছি। তরঙ্গপরিশূন্য বহু বিস্তৃত আবর্ত্তজল মণ্ডলাকারে সোঁ সোঁ

শব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ নীচের দিকে একটি অজ্ঞাতকেন্দ্র গহ্বরে যাইয়া পড়িতেছে। আমি সেই পাকজলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পাতালতলে যাইতে লাগিলাম। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, স্থল-কূল কোথাও নাই। তখন ভাবিলাম, 'হায়, এ কি হইল? পরমপবিত্রতোয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী গঙ্গার মধ্যে ছিলাম, ইঁহারই আবর্ত্তে পড়িয়া এখন রসাতলে চলিলাম!' এমন সময়ে হঠাৎ মেজ দাদা গঙ্গাতীরে আসিলেন, এবং আমার জীবনসঙ্কট অবস্থা দেখিয়া উন্মত্তবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অমনই গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং অনতিবিলম্বেই সাঁতার কাটিয়া আমার নিকটে পৌঁছিলেন। পরে বাম হস্তে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া তীরে উপনীত হইলেন। পাড়ে উঠিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন— **স্বপ্ন যা দেখবে, লিখে রেখো। অনেক সময়ে স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যায়।**

স্বপ্নের কথা হইতে হইতে মেজ দাদার কথা তুলিলাম। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মেজ দাদা কি দীক্ষা নিয়াছেন?

ঠাকুর। **দীক্ষা নিয়ে থাক্‌লে দেখা হ'লেই জান্‌বে।**

আমি। কি প্রকারে জান্‌বো? আমাকে কি আর বল্‌বেন?

ঠাকুর। **তিনি না জানালেও তুমি বুঝ্‌বে। এ শক্তি যাঁরা পান তাঁদের কাছে কি আর ছাপাতে পারে?**

আমি। আপনার কথায়ই ত বুঝা গেল, তিনি দীক্ষা পেয়েছেন। তবে স্পষ্ট ক'রে বলেন না কেন?

ঠাকুর একটি বালকের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"**তা বল্‌ব কি ক'রে? তিনি যে আমাকে নিষেধ ক'রেছেন।**

ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া সকলেই খুব হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া দেখিতেছি, গুরুভ্রাতাদের উচ্ছিষ্টবিচার নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার কাহারও তেমন মতি নাই। আহারের পর সকলে এঁটো হাতে মাটি মাখেন, উচ্ছিষ্ট মুখে মাটি মলেন। তাঁহাদের হাতে জল দিতে গেলে, তাঁহারা আমাকে চাপিয়া ধরেন, আর জোর করিয়া ধূলাবালি আমার হাতে মুখে ঘষিয়া দিয়া বলেন, 'এইবার পবিত্র হ'লি।' স্নান করিয়া আসিবার সময়েও আমার পরিষ্কার শরীরে কাদা মাটি ধূলা ডলিয়া দেন। আমি রাগ করিলে বা বিরক্তি প্রকাশ করিলে, পথের দু দিকহইতে বৈষ্ণব বাবাজীরা আমাকে ঠাণ্ডা হইতে উপদেশ দিয়া বলেন—"ক্রোধ কর্‌বেন না। আনন্দ করুন। ওতে রাধারাণীর কৃপা হয়, কৃষ্ণ

ভক্তি লাভ হয়।" গুরুভ্রাতাদের ইহাতে আরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আজ মধ্যাহ্নে হরিবংশপাঠের পরে গুরুভ্রাতাদের এসকল অনাচার অত্যাচার ও অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিকার প্রত্যাশায়, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম, 'শ্রীবৃন্দাবনের মাটির কি এতই গুণ যে উহা লাগাইলে উচ্ছিষ্টও শুদ্ধ হয়?'

ঠাকুর বলিলেন—**শ্রীবৃন্দাবনের মাটি নয়, রজ বল্‌তে হয়। ব্রজের রজ পরম পবিত্র। পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের মাটির সহিত ইহার তুলনা হয় না। উচ্ছিষ্টাদি সমস্তই এই রজ লাগালে শুদ্ধ হয়; শ্রীবৃন্দাবনে জল অপেক্ষা রজেই অধিক পবিত্র হয়।**

আমি বলিলাম—খেয়ে দেয়ে উচ্ছিষ্ট হাতে মুখে রজ লাগ্‌লেই শুদ্ধ হবে? জল আর দিতে হবে না?

ঠাকুর বলিলেন—**আমি যখন প্রথম এখানে এলাম, আহারের পর জল দিয়েই পরিষ্কার ক'রে আঁচাতাম; ব্রজবাসীরা আমাকে বল্‌লেন, "বাবা, ব্রজ-রজ লাগানেসে অউর অধিক শুদ্ধ হোতা হ্যায়।" আমাকে দু'দিন এই প্রকার বলাতে আমার মনে হ'ল, 'আচ্ছা দেখি না কেন?' তৃতীয় দিনে আমি জল ব্যবহার না ক'রে হাতে মুখে রজ মাখ্‌তে লাগ্‌লাম। এইপ্রকার কর্‌তেই মন আমার একেবারে দ্বিধাশূন্য হ'ল, উচ্ছিষ্টের কোন একটা সংস্কারই রইল না। গঙ্গাজলে ধুলে যেমন পবিত্র বোধ হয়, আমার তেমনই বোধ হ'তে লাগ্‌ল। তার পর থেকে আমি এই রজ দিয়েই ড'লে ফেলি। পরিষ্কারের জন্য সামান্য একটু জল দিয়ে হাত মুখ ধুলেই হয়। এখানে ঠাকুরভোগের বাসন পর্য্যন্ত রজে ঘ'ষে নেয়, তাতেই পবিত্র হয়।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ব্রজ-রজের নাকি বড়ই গুণ? উহা গায়ে মাখলে নাকি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়? রজে বিশ্বাস না হ'লে কি শুধু গায়ে মাখলেই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হবে?

ঠাকুর বলিলেন-**মেখে দেখলেই বুঝতে পার। বিশ্বাস কর আর নাই কর, বস্তুগুণ যাবে কোথায়? কিছু দিন হ'ল একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন। দুই তিন দিন বিগ্রহাদি দর্শন ক'রে দাউজীর ওখানে এলেন। আমি তখন মন্দিরের কাছে ব'সে ছিলাম। কথায় কথায় আমাকে তিনি বললেন "মশায়, দেশে থাকতে বৃন্দাবনের কত মাহাত্ম্যের কথাই শুনেছি। কিন্তু কই? কিছুই ত দেখতে পেলাম না। রজের কত গুণ শুনেছিলাম, তাও তো কিছুই বুঝ্‌লাম না। আর দশটি স্থান যেমন, এও তো তেমনই দেখ্‌ছি।" আমি তাঁকে বল্‌লাম,'রজের বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনি একবার রজে পড়ে দেখুন দেখি।' তিনি একবার রজে মাথা ঠেকিয়ে বল্‌লেন,"কই, যেমন তেমনই তো।" আমি ব'ল্‌লাম, 'গায়ের জামাটি খুলে ফেলুন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে রজে একবার গড়ায়ে নিন তার পর দেখুন কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না। তিনি তখনই পরীক্ষা করতে জামাটা খুলে রজে গড়াতে লাগ্‌লেন। দু'তিন গড়ান দিতেই তাঁর কি হ'ল, তিনিই জানেন,হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন "মশায় আমি ঘোর অবিশ্বাসী; কিন্তু, জীবনে কখনও রজের এ গুণ ভুল্‌ব না।"**

ঠাকুর এইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া, নানা দৃষ্টান্ত তুলিয়া, রজের অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা

কহিতে লাগিলেন। কিছুক্ষন পরে আমরা সকলে ঠাকুরদর্শনে বাহির হইলাম।

মথুরার পথে শ্রীধরের কীর্ত্তি।

আর আর দিনের ন্যায় বেলা ন'টার মধ্যেই আসনের কার্য্য শেষ করিলাম। ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—**কয়দিন হরিমোহন জ্বরে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তোমাকে দেখ্‌তে চান। মনোমোহনের (মথুরার য়্যাসিস্‌ট্যান্ট সার্জ্জন) বাসায় আছেন। আজই তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। পীড়িত অবস্থায় কেহ দেখ্‌তে চাইলে যেতে হয়। এখনই তুমি একবার যাও।**

১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৭

আমি বলিলাম—'আমি পথ চিনি না, মনোমোহন বাবুর বাসাও চিনি না। কার সঙ্গে যাব?' ঠাকুর শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন—**কুলদাকে মথুরায় মনোমোহনের বাসায় নিয়ে যাও। কুলদা মথুরায় যায় নাই; হাসপাতালও চেনে না।**

শ্রীধরের সঙ্গে চলিলাম। সতীশও আমাদের সঙ্গে হরিমোহনকে দেখিতে চলিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া বহু কষ্টে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা মথুরায় পৌঁছিলাম। স্বামিজী হরিমোহন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আরাম পাইলেন। কতক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইলাম। শ্রীধরের মাথা গরম হইয়াছে। সারাটি রাস্তা তিনি আমাদিগকে বিষম ভোগাইয়াছেন। মনোমোহন বাবুর বাসায় আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়াই, কিছু না বলিয়া অনায়াসে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে চম্পট্ মারিয়াছেন! আমরা রাস্তা ঘাট কিছুই জানি না। বেলা প্রায় তিনটার সময়ে কুঞ্জে পৌঁছিলাম। আহারাদি করিয়া ঠাকুরের নিকটে বসামাত্রই ঠাকুর বলিলেন—**শ্রীধর তোমাদের ঠিক রাস্তা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তো? কোন গোলমাল তো করেন নাই?**

উত্তরে আমি বলিতে লাগিলাম—কুঞ্জ হইতে বাহির হইবার সময়েই শ্রীধর হাত মুখ নাড়া দিয়া, 'চল্ মথুরায় চল্, এবার তোদের মথুরা দেখাব;' বলিয়াই, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সোজা উল্টাদিকে বংশীবটে উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে সেখান হইতে যমুনার তীরে তীরে একবারে রাধাবাগে লইয়া গেলেন। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীধর বলিলেন, "সোজা চল।" আমরা বলিলাম, 'পথ কোথায়?' শ্রীধর তখন দ্রুতপদে বনের ভিতরে আমাদিগকে ঘুরাইতে লাগিলেন। একই স্থানে দুই তিন বার ঘুরিয়া ফিরিয়া বুঝিলাম শ্রীধরের মাথা গরম হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাই শ্রীধর, মথুরা কোন্ দিকে?' শ্রীধর উত্তর করিলেন "ময়ূর দেখ!" আমরা আর কি করি? চুপ করিয়া রহিলাম। একটু পরে শ্রীধর পরিষ্কার পথে না চলিয়া রাস্তার ডাহিনে বামে বনের ভিতর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমরাও উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে দুর্ভোগ ভুগিতে ভুগিতে, অবশেষে আমরা একটা বিস্তৃত ময়দানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখন শ্রীধরকে নিকটে পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, " ভাই শ্রীধর, মথুরা আর কতদূর?"

শ্রীধর, রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ দেখাইয়া বলিলেন, "নমস্কার কর। এইগাছ গোঁসাই আবিষ্কার করেছেন।" আমরা বৃক্ষটিকে নমস্কার করিয়া দেখি, বৃক্ষটির সর্ব্বাঙ্গে দেবমূর্ত্তি; গোড়ার দিকে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশাদির মূর্ত্তি আপনা আপনি হইয়া রহিয়াছে। হাতে তৈয়ারি মাটির পুতুলের মত, এত পরিষ্কার দেবমূর্ত্তি বৃক্ষে কি করিয়া উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া অবাক্ হইলাম। সতীশ ও আমি মূর্ত্তিগুলি মনোযোগের সহিত দেখিতেছি, সহসা শ্রীধর আবার ময়দানের মধ্যদিয়া ছুটিয়া চলিলেন। আমরা উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া একটি বস্তিতে পৌছিলাম। ঐ বস্তির নানা কদর্য্য স্থানের উপর দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়া, আবার একটা প্রকাণ্ড মাঠে নিয়া ফেলিলেন। শ্রীধর ঐ বিস্তৃত মাঠের মাঝামাঝিপর্য্যন্ত কিছুক্ষণ খুব ধীরে ধীরে চলিলেন। পরে ময়দানের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াই আমাদিগকে কিছু না বলিয়া লম্বা দৌড় মারিলেন। আমরা উঁহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিলাম। শ্রীধর তখন, একবার ডাহিনে একবার বামে, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। আমরা রাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না; কি করিব? উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলাম। এই ভোগ ভুগিয়া, অনেকক্ষণ পরে আমরা উঁহার সঙ্গে যমুনার তীরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীধর তখন ঘাসবনের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কিছু দূরে গিয়া, অকস্মাৎ "জলজন্তুরে, জলজন্তু," বলিয়া ঘাসের উপর দিয়া দৌড় মারিলেন। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। কিছু দূরে গিয়া আমরা একটি ছোট খালের পাড়ে পৌঁছিলাম। তখন শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীধর, এ কোথায় আন্‌লে?" শ্রীধর বলিলেন " খাল পার হও।" আমরা বলিলাম, "তুমি আগে যাও।" তিনি বলিলেন, "সাঁতার জানি না।" সতীশ তখন ধমক দিয়া বলিলেন, " এস, এবার তোমাকে জলে চুবাব।" শ্রীধর অমনি অগ্রপশ্চাতে একবার তাকাইয়া সোজা দৌড় মারিলেন। আমরা অনুপায় হইয়া উঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। শ্রীধর, একটা স্থানে কতকগুলি হাড় দেখিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, হাড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে আমাদের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সতীশ বলিলেন—"শ্রীধর ও কি কর্‌ছ? ওগুলো যে গরুর হাড়! ছিঃ ছিঃ।" একথা শুনিয়াই শ্রীধর "দাঁড়া শালা", বলিয়া গরুর প্রকান্ড মেরুদন্ডের হাড়খানা কাঁধে তুলিয়া সতীশকে তাড়া করিয়া আসিলেন। 'পাগলা শালা এইবার খুন কর্‌বে রে' বলিয়া সতীশ দৌড় মারিলেন, আমিও প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিলাম। শ্রীধর আমাদের ধরে ধরে অবস্থা। এ সময়ে গত্যন্তর না পাইয়া সতীশের সঙ্গে আমিও খালে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। শ্রীধরও ছুটিয়া আসিয়া সেই হাড় লইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন। শ্রীধর সাঁতার জানেন না; চুবুনি খাইতে খাইতে হাড় ছাড়িয়া দিলেন। তখন আমরাও কোন প্রকারে উঁহাকে টানাটানি করিয়া অপর পারে তুলিলাম। পরে অতি কষ্টে উঁহার সঙ্গে মথুরায় মনোমোহন বাবুর বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম। স্বামিজী হরিমোহনকে দেখিলাম, তিনি একটু ভাল আছেন। আরোগ্য লাভ করিয়াই তিনি এখানে আসিবেন। শ্রীধর মনোমোহন বাবুর নিকট হইতে আমাদের জলখাবার জন্য কয়েক আনা পয়সা আদায় করিয়া

বলিলেন—"ভাই, তোরা একটু ব'স, তোদের জন্য ছোলাভাজা নিয়ে আসি।" এই বলিয়া শ্রীধর সেখানহইতে সোজা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন; এবং আমাদের জলখাবার সেই পয়সা দিয়া একখানা টিকিট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। আমরা উঁহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিয়া পরে চলিয়া আসিয়াছি।"

ঠাকুর শ্রীধরের এই সব পাগ্‌লামীর কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আমোদ দেখিয়া আমাদেরও খুব আনন্দ হইল। ধন্য শ্রীধর! তুমিই ধন্য! সাধন ভজন অপেক্ষাও তোমার এই পাগ্‌লামী শ্রেষ্ঠ।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঐ বৃক্ষটি কি আপনিই প্রথম বের করেছিলেন? ঐ সব মূর্ত্তিতে সিন্দুরাদির ফোঁটাও ত দেখ্‌তে পেলাম।

ঠাকুর বলিলেন—**পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা কর্‌বার সময়ে ঐ গাছটি দেখি। তখন পর্য্যন্ত গাছটির দিকে কারো লক্ষ্য পড়ে নাই। যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের ঐ গাছে ওসব দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখাতেই তাঁরা প্রচার ক'রে দেন। এখন পাণ্ডারা ঐ গাছটি দেখায়ে যাত্রীদের নিকট হ'তে প্রণামী নেন; সিন্দুরও পাণ্ডারাই দিয়েছেন।**

আমি বলিলাম—'গাছটি কিন্তু বড়ই অদ্ভুত। শুনিলাম ঐ সব দেবদেবীরা নাকি সত্য সত্যই ঐ গাছে আছেন। দেবদেবীরা ওখানে ঐ জঙ্গলে গাছ আশ্রয় ক'রে থাক্‌বেন কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—**আবে বাপু, কত দেবদেবী, ঋষি মুনি এই শ্রীবৃন্দাবনের রজ পাবার জন্য লালায়িত! এ স্থানে প্রত্যেকটি রজের কণায় মহাবিষ্ণু রয়েছেন।**

অতঃপর, শ্রীবৃন্দাবনের রজের মাহাত্ম্য ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিতে শুনিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমরাও দাউজীঠাকুরের আরতি দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

স্বপ্ন। সংসার কর্‌তে হবে না।

ভোর রাত্রিতে একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনটা বড় অস্থির হইয়া আছে। অবসরমত ঠাকুরকে স্বপ্নটি শুনাইলাম—"একটি নির্জ্জন মনোরম স্থানে পাঁচটি মহাপুরুষ আপনাপন আসনে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন; আমি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি সকলের চরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলাম। মহাপুরুষেরা আমাকে দেখিয়া সকলে একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? তুমি এখানে কেন? কি চাও? তোমার যে কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। সংসারের ঢের কর্ম্ম তোমাকে কর্‌তে হবে।" আমি বলিলাম, 'সংসারকর্ম্ম যদি আমার প্রারব্ধে থাকে, হবে। তবে প্রারব্ধ কর্ম্ম তো আমার ঠাকুরেরই হাতের মুটো। তিনি যা বল্‌বেন তাই তো কর্ম্ম। তা ছাড়া আবার কর্ম্ম কি? আচ্ছা আমার গুরুদেবকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে সংসার কর্‌তে বলেন কি না।' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া আমি আপনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত

১৭ই শ্রাবণ, ১২৯৭, শুক্রবার।

হইলাম। মহাপুরুষদের কথা আপনাকে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, " আমাকে কি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত কর্‌বেন না? সত্যই কি তবে আমাকে আবার সেই সংসার কর্‌তে হবে?" আপনি আমার প্রতি স্নেহভাবে দৃষ্টি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন— "না, না, সংসার আর তোমাকে কর্‌তে হবে না।" এই কথা কয়টি শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটি কি সত্য? ঠাকুর বলিলেন— এসব স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। তোমার আর সংসারকর্ম্ম কিংবা ঘর গৃহস্থালী কর্‌তে হবে না। স্বপ্নটি লিখে রেখো। এখন থেকে সব স্বপ্নই লিখো। আরও কত দেখ্‌বে।

বৃক্ষরূপী বৈষ্ণব মহাপুরুষ।

গত কল্য শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার পথে বড় রাস্তার ধারে যে পুরাতন বটবৃক্ষটি দর্শন করিয়া আসিয়াছি, সেই বৃক্ষটি সম্বন্ধে দু' চার কথা তুলিতেই অনেক কথা হইতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে কত মহাপুরুষ আছেন, বলা যায় না। গুরুদেব নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বলিতে লাগিলেন—একদিন আমি বেড়াতে বেড়াতে রাধাবাগে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। যমুনাতীরে একটু নির্জ্জন স্থান দেখে সেখানে একটি বৃক্ষের তলে স্থির হ'য়ে ব'সে র'লাম। একটু পরেই 'সর্‌ সর্‌' শব্দ আমার কাণে আস্‌তে লাগ্‌ল। চেয়ে দেখি, সম্মুখে একটি গাছ কাঁপ্‌ছে। দেখে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমি বৃক্ষটির দিকে চেয়ে রইলাম। দেখ্‌লাম বৃক্ষ আর নাই, একটি পরম সুন্দর বৈষ্ণব মহাত্মা সেখানে দাঁড়ায়ে আছেন। তাঁর দ্বাদশাঙ্গে যথারীতি তিলক, গলায় কণ্ঠী, তুলসীর মালা, হাতেও জপের তুলসীমালা রয়েছে। আমি তাঁর বিষয়ে জান্‌তে ইচ্ছা করায় তিনি আমাকে সমস্ত পরিচয় দিলেন, আর বল্‌লেন "এখানে আমি বৃক্ষরূপে আছি।" আরও অনেক কথা ব'লে তিনি তখনই আবার বৃক্ষরূপী হ'লেন। আমি একথা দু'একটি বৈষ্ণবকে বলায় তাঁহারা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বরং উপহাস ক'রে গৌর শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে বল্‌লেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে ওবিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি সব তাঁকে পরিষ্কাররূপে বল্‌লাম। তিনি শুনে রজে গড়াতে লাগ্‌লেন, কাঁদতে লাগ্‌লেন; পরে আমাকে বল্‌লেন— "প্রভু, এসব কথা যাকে তাকে বল্‌বেন না ; বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বে না, উপহাস কর্‌বে।"

শুনিলাম পরে গৌর শিরোমণি মহাশয়ও রাধাবাগে এই বৃক্ষরূপী বৈষ্ণব মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাত্মারা আবার এখানে বৃক্ষরূপে থাকেন কেন?

ঠাকুর বলিলেন— শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। অপ্রাকৃত লীলা এস্থানে নিত্যই হচ্ছে। বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা নিরুদ্বেগে তাহাই দর্শন কর্‌তে বৃক্ষাদিরূপে রয়েছেন; ব্রজধামে বাস ক'রে আনন্দে ভজন করেন, আর লীলা দর্শন করেন।

আমি বলিলাম—বৃক্ষরূপে যে সব মহাপুরুষ বৃন্দাবনে আছেন, তাঁহাদের ত আর সাধারণ লোকে জান্‌তে পারে না। বৃক্ষের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার কর্‌লে ওসব মহাপুরুষদের

কোনও ক্ষতি হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—**এই জন্য ব্রজের বৃক্ষলতার উপরেও হিংসা নাই। অত্যাচার কর্‌লে তাঁদের ক্ষতি খুবই হয়। এই ত কিছুদিন হয় একটি বৃক্ষের উপরে অত্যাচার করায় ভয়ানক অনিষ্ট হ'য়ে গেল।**

বিষয়টি কি, জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **এখানে নিকটেই একটি কুঞ্জে অনেক দিনের একটি সুন্দর নিম গাছ ছিল, কুঞ্জের বৈষ্ণব বাবাজী গাছটিকে খুব সেবা যত্ন কর্‌তেন। এক দিন ওখানকার একটি বৈষ্ণব যুবতী রজঃস্বলা অবস্থায় বৃক্ষটিকে ধর্‌লেন। রাত্রিতে বাবাজী স্বপ্ন দেখ্‌লেন—একজন বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তাঁকে এসে বল্‌লেন—" তোমার এই কুঞ্জে এত কাল বেশ আরামে ছিলাম, কাল তোমাদের বৈষ্ণবী অশুদ্ধ কাম-কলুষিত অবস্থায় বৃক্ষকে বারংবার জড়ায়ে ধরেছে। এতে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে; তাই আমি এস্থান ত্যাগ কর্‌লাম।" বাবাজী সকালে উঠে দেখ্‌লেন, বৃক্ষটি শুকিয়ে গেছে। আমরাও যেয়ে দেখ্‌লাম, একটি রাত্রের মধ্যেই সেই বড় বৃক্ষটি একেবারেই শুকিয়ে গেছে।**

ঠাকুরের এসব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। মুঙ্গেরে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই গোলাপ গাছের কথা আমার আজ মনে পড়িল। ঠাকুরকে সেই গাছকয়টির কথা বলায়, তিনি বলিলেন— **যথার্থ ভাবে সেবা কর্‌তে পারলে বৃক্ষের কথাও শুনা যায়।**

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল বাস্তবিকই অদ্ভুত। ছোট বড় সমস্তগুলি বৃক্ষেরই শাখাপ্রশাখা লতার মত ঝুলিয়া ভূমির দিকে পড়িয়াছে, পাতাগুলি পর্য্যন্ত বোঁটার সহিত নিম্নমুখ। এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। নিধুবনে এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রাচীন কুঞ্জে ও বনে বড় বড় বৃক্ষসকল রজে লুটাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ঊর্দ্ধদিকে কেন যে বৃক্ষ উঠে না, তাহা কিছুই বুঝিতেছি না। বহুদিনের অতি পুরাতন অনেক বৃক্ষকে ঐসকল বনে লতা বলিয়া ভ্রম হয়। অদ্ভুত ব্রজভূমি! ভূমিরই বোধ হয় এই গুণ যে, মস্তক তুলিতে দেয় না। উদ্ধত প্রকৃতি দুর্ব্বিনীত লোকও শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস কর্‌লে, রজঃপ্রভাবে নতমস্তক হয়, ইহা আর অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অপরাপর শত শত দোষ থাকা সত্ত্বেও ব্রজবাসিগণের স্বভাব মৃদু এবং বিনীত দেখিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনে দুরন্ত মশা।

শ্রীবৃন্দাবনে সারাদিন আনন্দ, কিন্তু সন্ধ্যা হ'লেই আতঙ্ক। বেলা শেষ হ'তে থাক্‌লেই মশার উৎপাতের কথা মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। এমন দুরন্ত মশা আর কোথাও দেখি নাই। রাত্রি হ'লেই ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিয়া গায়ে পড়ে। ঘুমাইবার তো যোই নাই, একস্থানে স্থির হইয়া একটুকু বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সারারাত ছট্ ফট্ করিয়া কাটাই; মনে হয়, কতক্ষণে আবার ভোর হবে। রাত্রিতে ঠাকুরও ঘরে না থাকিয়া এখনও পূর্ব্ববৎ বারেন্দাতেই

বসিয়া থাকেন। মাঠাকুরাণীও সমস্ত রাত্রি পাখা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করেন। ঠাকুর দু' তিনবার মাঠাকুরাণীকে বিশ্রাম করিতে বলেন; কিন্তু মা সেকথা শুনেন না, স্থিরভাবে ভোর পর্য্যন্ত মশা তাড়াইয়া থাকেন। হাওয়া করিয়া মাঠাকুরুণ ঠাকুরের সেবায়ই সারারাত্রি কাটাইয়া দেন। ওদিকে কুতু মশার কামড়ে ছট্‌ফট্ করেন। খুবই কষ্ট। আজ কথায় কথায় কুতু ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, শ্রীবৃন্দাবনে তো হিংসা কর্‌তে নাই, কিন্তু রাত্রে মশা তাড়াতে যে হিংসা হ'য়ে পড়ে?

ঠাকুর বলিলেন—**তুই মশা মারিস্ নাকি? দু' চার দিন মশাকে কামড়াতে দে না? পরে দেখ্‌বি, মশার কামড় আর লাগ্‌বে না।**

কুতু বলিলেন—তোমার কি মশার কামড় লাগে না?

ঠাকুর বলিলেন—**এখন আর লাগে না। প্রথম যখন এসেছিলাম, তখন খুব লেগেছিল। এক দিন মশা তাড়াতে হাতের উপর হাত বুলাতে গিয়ে দেখি মশাতে হাত পরিপূর্ণ। তখন আর কি কর্‌ব? তাড়াতে গেলেই তো শত শত মশা ম'রে যাবে। আমি তখন হাত পা নাড়া চাড়া না ক'রে একভাবেই রইলাম। সারা রাত আমার এত রক্ত খেল যে, ভোরে উঠে আমার শরীর অবশ বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু তাতে আমার কোনও ক্ষতি হ'ল না, বড়ই উপকার হ'ল। তখন প্রতিদিন আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ত। মশা যেদিন ওরূপ কামড়াল সেদিন থেকে আর আমার জ্বর হয় নাই। মশাতে ম্যালেরিয়ার বিষ সমস্ত চুষে নিল। সেদিন থেকে মশার কামড়ও আমার আর লাগে না। তোরা একটু স'য়ে থাক্‌তে পারিস্ না? দু' এক দিন স'য়ে থেকে দেখ্ দেখি, পরে আর লাগে কি না? আর না হয় মশাকে একটু বল্‌লেই তো পারিস্ যে আমায় কামড়াইও না। তা হ'লেই তো হয়।**

কুতু হ্যাঁ। মশাকে বল্‌লেই সে শুন্‌বে কি না?

ঠাকুর। **শুন্‌বে না? আচ্ছা, আমি ব'লে দেই, দেখ দেখি শুনে কি না? "মশা, তোমরা কুতুকে কামড়াইও না।" যা, এর পরে যদি তোকে মশায় কামড়ায় আমাকে বলিস।**

সাধনে নানা অনুভূতির ক্রম।

১৮ই শ্রাবণ, ১২৯৭; শনিবার

আহারান্তে হরিবংশপাঠের পর আমরা সকলেই গুরুদেবের নিকটে বসিয়া আছি, গুরুদেব নিজ হইতেই ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—**দর্শনের বিষয় যেমন ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে ধীরে ধীরে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়, শ্রবণও ঠিক সেইরূপই হ'য়ে থাকে। শ্রবণের আরম্ভে একরূপ কিচ্‌কিচ্ শব্দ কাণের মধ্যে প্রথম প্রথম শুন্‌তে পাওয়া যায়। ঐ শব্দ হ'তেই যদি বিরক্ত হ'য়ে অগ্রাহ্য করা যায়, তা হ'লে অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। নাম কর্‌তে কর্‌তে বেশ নিষ্ঠাপূর্ব্বক ঐ শব্দ শুন্‌তে হয়; নিষ্ঠা রাখলেই ধীরে ধীরে সকল প্রকার শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য শব্দের ন্যায় এ শব্দ নয়, এর মধ্যে একটু বিশেষত্ব থাক্‌বেই। তা প্রথম থেকেই টের পাওয়া যায়। নিষ্ঠা রেখে স্থির চিত্তে ঐ সকল শব্দ শুন্‌লেই ক্রমে ক্রমে কথাও**

শুনা যায়। তখন আলাপ করা যায়, জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পাওয়া যায়। আলাপ না করা পর্য্যন্ত যথার্থ বিশ্বাসটি কিন্তু হয় না। বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে আলাপকারীর অঙ্গাদি স্পর্শও ক্রমে ক্রমে পরিষ্কাররূপে হ'য়ে থাকে। এই স্পর্শ পাঞ্চভৌতিক স্পর্শ নয়। এ স্পর্শ অন্য রকমের। এ সব যখন হয় তখনই ঠিক বুঝা যায়; নিয়মমত সাধন ক'রে গেলে এসব অবস্থা সকলেরই হবে। ইচ্ছা কর্‌লেও হবে,না কর্‌লেও হবে। ঠিক সময়টি হ'লেই হবে। এই প্রকার আরও অনেক কথা বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। সে সব কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না। ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব দর্শন স্পর্শন শ্রবণাদির জন্য এবং নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ কর্‌বার জন্য অন্য কোনপ্রকার সাধন কর্‌তে হয় কি?

ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তরে 'এই নামেই সব' বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—একমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম অভ্যস্ত হ'লে সমস্তই হয়। শরীর হইতে আমি পৃথক্ এটি পরিষ্কার জ্ঞান না হ'লে ওসব অবস্থা হয় না। 'শরীর হ'তে আমি পৃথক্' বুঝ্‌তে হ'লে, শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাও বড় সহজ নয়; তিন চার লক্ষ নাম কর, বা তিন চার কোটিই নাম কর শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার কিছুতেই নয়। ইহার উপকারিতাই অন্যপ্রকার। সহজ শ্বাস প্রশ্বাসে একবার ঠিক্‌মত নামটি গেঁথে গেলেই আত্মদর্শন হয়। 'শরীর হ'তে আত্মা পৃথক্' জেনে, একটু স্থির হ'তে পার্‌লেই, সেই আত্মার নানাপ্রকার ক্ষমতা জন্মে। তখন ঐ আত্মা অনেক অলৌকিক কার্য্য অনায়াসে কর্‌তে পারে।

ঠাকুরের কথায় আমার গুরুতর ভ্রমের সংশোধন হইল। ২১৬০০ (একুশ হাজার ছয় শত) নাম সংখ্যা করিয়া প্রত্যহ জপ করাও, অল্প সময় শ্বাসপ্রশ্বাসে নামজপের চেষ্টার তুল্য নয়। সুতরাং ভিতরে ভিতরে লজ্জিত হইয়া, আমার সেই সংখ্যাজপের পরিচয় আর দিলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আত্মার ঐপ্রকার ক্ষমতা জন্মালেও তখন কোন প্রকার অলৌকিক কার্য্য করায় কি কিছু অনিষ্ট হয়?

ঠাকুর বলিলেন—অনেককে দেখা গিয়াছে, ঐরূপ একটু ঐশ্বর্য্য হ'তে না হ'তেই উহা প্রয়োগ করে একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছেন। ঐ ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে নানাপ্রকার সম্পদবৃদ্ধি, রোগারোগ্য এবং ইচ্ছানুযায়ী আরও অনেক অলৌকিক কার্য্য কর্‌বার ক্ষমতা হয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্মলাভের পথে উহা বিষম বিঘ্ন ও প্রলোভন। ঐ সকল ঐশ্বর্য্যলাভ হওয়া মাত্রই শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে নাই। তা হ'লেই ক্রমে ক্রমে নানা আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ হয়। আর শক্তি প্রয়োগ কর্‌লেই অল্পকালের মধ্যে তার সর্ব্বনাশ হয়; ধর্ম্ম কর্ম্ম তো চুলায় যায়, ঐ শক্তিও নষ্ট হয়। কিন্তু উহা এমনই প্রলোভন যে, একটু কিছু হ'তে না হ'তেই শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে ইচ্ছা হয়। এ বিষয়ে বড়ই সাবধানে থাক্‌তে হয়।

লাল সম্বন্ধে ঠাকুরের অনুশাসন।

প্রসঙ্গক্রমে মাঠাক্‌রুণ এই সময়ে লালের কথা তুলিয়া বলিলেন, "লালের ভিতরে অনেক আশ্চর্য্য শক্তি দেখেছি। অনেকের অতীত জীবনের এমন সব গোপনীয় বিষয় তাদের বলেছেন যাহা তারা ব্যতীত সংসারে আর কেহই জানে না। অনেকের ভবিষ্যতের কথাও পরিষ্কার বলে দেন। সাধারণ কথায়ও লালের এমন একটা শক্তি যে, যারা তা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে। যোগজীবন ঘরে বসে পড়াশুনা কর্‌তো, আর লাল গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে থেকে একপ্রকার শব্দ কর্‌তেন; ঐ শব্দের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যোগজীবন তা শুনে আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌তো না; পড়া ফেলে লালের কাছে অমনই ছুটে যেত। এই সব কারণেই যোগজীবন পরীক্ষাটা পাশ কর্‌তে পার্‌ল না।" মাঠাক্‌রুণ লালের সম্বন্ধে আরও অনেক ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলেন। তখন আমিও ক্রমে ভাগলপুরে লালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশের কথা বলিলাম। ঠাকুর সমস্ত কথা স্থিরভাবে শুনিয়া বলিলেন—**পুনঃপুনঃ লালকে এস্‌ব করতে নিষেধ করেছি, কিছুতেই কথা শুনে না। এর পর ঠেকে শিখ্‌বে।**

আমি একথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম কেন? কতকগুলি লোকের জীবনের ভার আপনিই তো লালের উপরে দিয়াছেন; লালের মুখে শুন্‌লাম, তাদেরই কল্যাণ কর্‌তে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে।

ঠাকুর বলিলেন—**সে কি? তুমি কি বল্‌ছ? পরিষ্কার ক'রে বল। লাল তোমাকে কি বলেছিলেন, ঠিক্ তাই বল।**

ঠাকুর এভাবে আমাকে ঐ বিষয় বল্‌তে আদেশ করায় আমি বলিলাম—"লাল আমাকে পূর্ব্বেও একবার বলেছিলেন, এবারেও ভাগলপুরে বল্‌লেন, 'গোঁসাই বৃদ্ধ হয়েছেন, এতগুলি লোকের বোঝা কত আর তিনি বহন কর্‌বেন? তাই আমাদের এই তিনজনের উপরে সকলের ভার বিভাগ ক'রে দিয়েছেন; কতক শ্যামাকান্ত পণ্ডিতের উপর, কতক বিহারীনামে একটি পশ্চিমা সন্ন্যাসী গুরুভাইয়ের উপর, আর কতকগুলি আমার উপর।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি কাহার ভাগে পড়েছি? লাল উত্তরে বলিলেন—'তুমি আমার ভাগে আছ।' ঠাকুর এসব কথা শুনিয়া বলিলেন—**বটে, এতটা হয়েছে? বড় বেশী লাফালাফি আরম্ভ করেছে। মহাপুরুষদের কৃপায় সামান্য একটু সর্ষপবিন্দু পেয়েই অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। খুব শীঘ্রই ঐ কণাটুকু তুলে নিলে, সে যে নিজে কি তখন বেশ বুঝ্‌বে। থাম, ব্যস্ত নাই।**

এই বলিয়া, আসনে উপবিষ্ট রহিয়াই ঠাকুর একবার একটু দক্ষিণে ও বামে নড়িলেন, তখনই আমার মনে হইল, 'আজ প্রলয় ঘটিল, লালের সর্ব্বনাশ হইল, আর নিস্তার নাই'

সাধনপ্রভাবে দেহতত্ত্ববোধ।

কিছুক্ষণ পরে কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দেহতত্ত্ব শিক্ষা না থাক্‌লে দেহের কোথায় কি রোগ, কেন রোগ, ইহা কিরূপে জানা যায়? আরোগ্যই বা কিরূপে হওয়া সম্ভব?'

ঠাকুর বলিলেন—**এ শরীর থেকে আত্মা যে ভিন্ন, এটি বেশ পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হ'লেই, স্থূল শরীরের কোথায় কি আছে, সমস্ত ঠিক ঠিক চোখে পড়ে। তখন শরীরের উপরের ও ভিতরের সকল স্থানের চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, মজ্জা, নাড়ীভুঁড়ী, শিরা ধমনী, যা কিছু আছে স্পষ্ট দেখা যায়। তখন শরীরের কোন্ স্থানে কোন্ বস্তুর অভাব, কোথায় কিসের আধিক্য, তাহাও ধরা যায়; পৃথিবীর কোন্ বস্তুর সহিত দেহের কি সম্বন্ধ, তাহাও পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা যায়।**

গৈরিক কি?

সতীশ কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন— 'গৈরকিবসন পরার কি একটা অবস্থা আছে, না ধর্ম্মার্থীরা ইচ্ছা করিলেই উহা ব্যবহার করিতে পারেন?'

ঠাকুর বলিলেন—'**গৈরিকগ্রহণ, ভস্মলেপন, দণ্ড কমণ্ডলু ও চিম্‌টা প্রভৃতি ধারণ, এ সকলেরই একটা একটা বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে। সেই সব অবস্থা লাভ হ'লেই ওসব চিহ্ন ধারণ কর্‌বার অধিকার; না হ'লে বিড়ম্বনা, অপরাধ হয়। আজ কাল এসব বিষয়ে বিচার না থাকায় বিষম অনিষ্ট হ'চ্ছে। তোমাদের ওসব নিয়ে এখন কোনও প্রয়োজন নাই। অবস্থাটি হ'লে ওসব গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে। শাস্ত্রে আছে—ভগবতীর রজঃ হ'তে গৈরিক হয়েছে। গৈরিক বসনকে ভগবান্‌বস্ত্র বলে। ভগবান নারায়ণের ঐ বসন। দেবদেবী, ঋষি-মুনি, যোগী মহাপুরুষদের উহা বড়ই আদরের ও সম্মানের বস্তু। উহা গ্রহণ ক'রে যথার্থরূপে উহার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে ভয়ানক অপরাধ হয়। গৈরিকবসনে কাহারও কোনরূপে একবিন্দু বীর্য্যপাত হ'লে, সমস্ত দেবদেবী, ঋষি-মুনি , সিদ্ধ মহাত্মাদের শাপগ্রস্ত হ'তে হয়। পূর্ব্বে এসব বিষয়ে দৃষ্টি ছিল, শাসন ছিল, জিনিসেরও ঠিক মর্য্যাদা ছিল। এখন বিদেশী রাজা, কে শাসন কর্‌বে? তাই ফিরিওয়ালারাও গৈরিক-বসন পর্‌ছে।**

নিত্য নূতন তত্ত্বের প্রকাশ ; পরতত্ত্ব।

আহারান্তে হরিবংশ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকি; ঠাকুর নিজ হইতে কোনও কথা তুলিতেই সাহস করিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্ন করি। যে দিন কথাবার্ত্তা হয়, সেদিন মাঠাক্‌রুণও বাসায় থাকেন; তাহা না হইলে শ্রীধরের সঙ্গে কুতুকে লইয়া দর্শনে চলিয়া যান। ঠাকুর যে দিন বাহির হন, আমরা সকলেই তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকি, আর যে দিন ঠাকুর

বাসায় থাকেন, বাসার অন্যান্য সকলে দর্শনে গেলেও আমি ঠাকুরেরই কাছে বসিয়া থাকি, এবং অবসর বুঝিয়া নানা বিষয়ের প্রশ্ন করি। বিকাল বেলা ঠাকুর কোন কোন দিন আসনেই বসিয়া থাকেন; আর আমাদিগকে ঠাকুর দর্শনে যাইতে তাড়া দিতে থাকেন। কিন্তু নিজে সে দিন উদয়াস্ত একবারের জন্যওআসন ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। ইহার তাৎপর্য্য কি, জানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিও নিয়মিতরূপে দর্শনে যান না কেন? একটুকু বেড়ান হইলে শরীরটিও সুস্থ থাকে। ঠাকুর বলিলেন—**শ্রীবৃন্দাবনে আসার পরই গুরুজী আমাকে বল্লেন—'অন্ততঃ একটি বৎসর এখানে তোমার আসন রাখ্তে হবে। আসনে নিত্য তোমার নিকটে নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হবে।' সেই হ'তে প্রত্যহই দু'টি একটি নূতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'চ্ছে। যতক্ষণ না অন্ততঃ একটি তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, আমি কখনও আসন ছেড়ে অন্যত্র যাই না। এই জন্যই আমি প্রতিদিন দর্শন করতে যেতে পারি না। ওটি হ'য়ে গেলেই আমি আসন ছেড়ে উঠি, দর্শনেও যাই।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর এ আবার কোন্ তত্ত্ব বলিলেন? তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বহু যুগ যুগান্তব্যাপী অবিচ্ছেদ কঠোর সাধন ভজনে রক্ত মাংস অস্থি মজ্জার প্রলয় ঘটাইয়া, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ যে তত্ত্ব একটিমাত্র আয়ত্ত করিলেই ঋষিপদবাচ্য হইতেন; কয়েক ঘণ্টা আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, ক্ষণে ক্ষণে হাসি গল্পে সময় অতিবাহিত করিয়াও, এই ধর্ম্মবিরোধী ঘোর কলিকালে সেই তত্ত্ব ঠাকুর প্রতিদিনই দু'টি একটি অনায়াসে লাভ করিতেছেন এ কি অসম্ভব কথা! আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—তত্ত্ব কাকে বলে? তত্ত্ব মোট কয়টি? কিরূপ সাধন করলে এই সব তত্ত্ব লাভ হয়? আমি মুখ খুলতেই ঠাকুর আমার সমস্ত ভাব বুঝিয়া লইলেন, তাই মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—**"স্বয়ং ভগবানই তত্ত্ব। ভগবানের ভাবের, কার্য্যের ও লীলার কি আর বিরাম আছে? তত্ত্ব অনন্ত। এই তত্ত্ব কি আর সাধনাদি ক'রে লাভ করা যায়। লক্ষ লক্ষ জন্ম কঠোর সাধন ভজনে দেহপাত কর্লেও এসব তত্ত্বের একটি মাত্র কেহ জান্তে পারে না। এসব তো আর সাধনসাপেক্ষ নয় সাধনাতীত, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই এসব তত্ত্ব লাভ হয়। সাধনেতে ক'রে লাভ কর্তে হলেই অসম্ভব। তাঁর কৃপায় মুহূর্ত্তের মধ্যেও সবই হ'তে পারে। জীব মুক্ত হ'য়ে একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই লীলাতত্ত্বে প্রবেশ কর্তে পারে। ইহাই পরতত্ত্ব।**

ঠাকুরের এসব কথা শুনিয়া ব্যাপারটি আমি বুঝিলাম। আর কোন কথা না বলিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

অভিনব তিলক। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক সংস্কার।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া, এবার ঠাকুরকে নূতনরকম দেখিতেছি। ঠাকুরের অভিপ্রায় কি, জানি না; উদ্দেশ্য কি, বুঝি না। আর তাঁহার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবারই বা আমার অধিকার কোথায়? নিজহইতে দয়া করিয়া, ঠাকুর যখন মিলিয়া মিশিয়া আমাদের সঙ্গে

কথাবার্ত্তা বলেন, সুযোগ ঘটিলে তখনই মাত্র দু' একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লই। এতকাল ঠাকুরকে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর তিনি সেরূপটি নাই। এখন তিনি অনায়াসে দেবমন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন; প্রস্তরমূর্ত্তি বিগ্রহের সম্মুখে ধরা খাদ্য, প্রসাদজ্ঞানে ভোজন করেন; গলায় নানাপ্রকারের মালা, আবার দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে এখন তিনি সমস্ত বৈষ্ণব আচারই অবলম্বন করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু, সাহসে কুলায় না।

১৯শে, শ্রাবণ ১২৯৭; রবিবার।

যাহা হউক, আজ আহারান্তে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর্‌লেই কি এইরূপ তিলক ধারণ কর্‌তে হয়? আপনাকে আগে কখনও মালা তিলক ধারণ কর্‌তে দেখি নাই। বলেছিলেন, আমাদের কোন একটা সম্প্রদায় নাই, কিন্তু তিলক তো বৈষ্ণবদেরই মত'। ঠাকুর বলিলেন— **তা ঠিক্। আমি যখন শ্রীবৃন্দাবনে এলাম, তিলক ধারণ কর্‌তে আদেশ হ'লো। তখন কিরূপ তিলক ধারণ কর্‌বো ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের চিহ্ন নিব না স্থির ক'রে, একটি নূতন রকমের তিলকের সৃষ্টি কর্‌লাম। আমার ঐ নূতন ধরণের তিলক দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ কর্‌লেন। একদিন গৌর শিরোমণি মশায় এসে আমাকে বল্‌লেন—"প্রভু, তিলক এই প্রকারে কর্‌ছেন কেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এরূপ তিলক তো কোন সম্প্রদায়ের ভিতরেই দেখি নাই! দয়া ক'রে এই তিলকের তাৎপর্য্য আমাকে বলুন।" আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'আমার কোনও সম্প্রদায় নাই; এই জন্য মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্র, যীশু খ্রীষ্টের ক্রস্ এবং মহাদেবের ত্রিশূল নিয়ে, এই এক নূতন রকমের তিলক কর্‌ছি।' শিরোমণি মশায় বল্‌লেন— " আপনি সবই কর্‌তে পারেন, কিন্তু আপনি যেটি কর্‌বেন সেটির অনুকরণ সহস্র লোকে ক'রে একটি সম্প্রদায় গঠন কর্‌বে। সুতরাং, শাস্ত্র ব্যবস্থানুসারেই করুন না কেন? নূতন সম্প্রদায় আর কেন কর্‌বেন? আমার বিনীত অনুরোধ আপনি এই তিলক ত্যাগ ক'রে যথামত তিলক ধারণ করুন।" আমি শিরোমণি মশায়ের কথা শুনে বল্‌লাম— ' এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য স্থির হয় শীঘ্রই আপনি জান্‌বেন।' পরে এক দিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই প্রকার তিলক দেখায়ে আমাকে বল্‌লেন— ' তুমি এই রূপ তিলক ক'রো।" অদ্বৈতপ্রভু এই প্রকারই তিলক কর্‌তেন। তাঁর আদেশমতই আমি এই রূপ তিলক কর্‌ছি।**

শ্রীবৃন্দাবনে সাম্প্রদায়িকভাব।

আমি বলিলাম, ''শ্রীবৃন্দাবনে আপনি যখন এসে উপস্থিত হ'লেন, মালা তিলক না দেখে বাবাজীরা গোলমাল কর্‌তেন না? এঁদের ভাব দেখে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এঁদের মধ্যে খুব বেশী। অন্য ভেকধারী সাধুদেরও এঁরা আমল দেন না, সাধু ব'লেই গ্রাহ্য করেন

না। কেহ মালা তিলক ধারণ না কর্‌লে তাকে অপবিত্র মনে করেন। আমি যত দিন না মাথা মুড়ায়ে টিকি রেখেছিলাম, আর যত দিন না মাঠাক্রুণ আমার গলায় এই কণ্ঠী বেঁধেছিলেন, তত দিন বৈষ্ণব বৈরাগীরা প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান নাই, এখন আমার এই নেড়া মাথায় চৈতন ও গলায় কণ্ঠী দেখে তাঁরা বলেন; 'আহা, রূপের কি শোভাই হয়েছে, অঙ্গের কি জ্যোতিই খুলেছে।' আমি কিন্তু নিজের রূপ যখন একবার আয়নায় দেখি, পাল্টে দ্বিতীয় বার আর দেখতে ইচ্ছা হয় না। নেড়া মাথায় চৈতন এতই কদর্য্য দেখায়।''

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন— **এখানে ভেক না নিলে বাস করাই শক্ত হ'য়ে পড়ে। আমার এই গৈরিক ত্যাগ করাবার জন্য ইঁহারা কত চেষ্টাই করেছেন! এমন কি, গৌর শিরোমণি মশায়কে দিয়েও কত অনুরোধ করিয়েছেন। একদিন শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলাম। সকলে ব'সে ভাগবত শুন্‌ছি, একজন ময়লা ড্রেণের জলে খানিকটা গোবর গুলে উপর থেকে আমার মাথায় ফেলে দিলেন। পাশে শিরোমণি মশায় বসেছিলেন, জলগুলো সমস্ত তাঁরই মাথায় পড়্‌লো। তিনি সব বুঝ্‌লেন, পরে আমাকে বল্‌লেন,— "দেখলেন, প্রভু, এদের কাণ্ড? চলুন, আর এস্থানে থাক্‌তে নাই!" এই ব'লে তিনি আমাকে নিয়ে চলে এলেন। বৈষ্ণব বেশ না দেখ্‌লে এখানে বাবাজীরা এরূপ সব ব্যবহার করেন।**

এ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল,'' এতকালযাবৎ ঠাকুর এখানে আসিয়াছেন; না জানি আরও কত সব অত্যাচার এ সময়ের মধ্যে ইঁহারা ঠাকুরের উপরে করিয়াছে!'' কথায় কথায় ঠাকুরের মুখে কখন কখন এসব কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতেই এক আধটুকু বুঝিতে পারি, না হ'লে ত এ সব বিষয় জানিবার কোন উপায়ই নাই। যাহা হউক, দামোদর পূজারী ও শ্রীধর প্রভৃতির কাছে জিজ্ঞাসা করিলেও হয় ত কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া, আমি কিছুক্ষণ পরে নীচে আসিয়া উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে এলেন, তখন এখানকার লোকেরা ঠাকুরকে অপদস্থ কর্‌তে কোনরূপ চেষ্টা করেছিল কি?'' উঁহারা আমাকে যেসব কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। তন্মধ্যে একটি বিষয় মাত্র এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি, ঘটনাটি এই —

দর্শনে বিরোধী প্রভুসন্তানের উৎকট শিক্ষা।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর উপস্থিত হইয়া ব্রজবাসী দামোদর পূজারীর কুঞ্জে উঠিলেন। কয়েক দিন পরে বলিলেন— **কাল সকালে গোবিন্দজী দর্শন কর্‌তে যাব।** ঠাকুর ইহা বলামাত্র সর্ব্বত্রই এ কথা ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীবৃন্দাবনে বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল! বাতাসের আগে এই সংবাদ প্রভুপাদদের দরবারে পৌঁছিল। সর্ব্বপ্রধান প্রভাবশালী সম্মানিত বৈষ্ণবনেতা জনৈক প্রভুসন্তান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? এম্‌নিই মন্দিরে যাবে? আমাদের এসে দর্শন করলে না, অনুমতি নিলে না। তাকে ত জানা আছে। এত সহজেই সে মন্দিরে যাবে? আচ্ছা

দেখা যাক।" এই বলিয়া তিনি তিন চারিটি প্রভুসন্তানের সহিত সমস্ত বৈষ্ণব সমাজকে আহ্বান করিয়া এক বিরাট্ সভা করিলেন। প্রভুপাদ বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে বলিলেন, "অদ্বৈত পরিবারের কুলাঙ্গার, জাতনাশা, ম্লেচ্ছাচারী এক গোঁসাই সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে এসেছে। সনাতনধর্ম্ম-বিরোধী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক'রে সহস্র সহস্র লোককে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট করেছে। এত কাল অনাচারে কাটিয়ে এখন গৈরিক প'রে সন্ন্যাসীর বেশে সে বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে, অনুমতি জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না রেখে কালই সে গোবিন্দজী দর্শন কর্‌তে মন্দিরে যাওয়ার সাহস কর্‌ছে। এখন তাকে মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া হবে কি না?" প্রভুপাদের প্রশ্ন শুনিয়া বৈষ্ণব বাবাজীরা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা কখনই হবে না। আমরা বাধা দিব"। এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রভুপাদ বলিলেন," শুধু বাধা দেওয়া নয়। মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে চাইলেই তাকে দ্বারে বিশেষরূপে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিবে।" গোবিন্দজীর সেবায়েতের উপরেও এই আদেশ করা হইল। দু' চারিটি নিতান্ত নিরীহ বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই এ কার্য্যে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আপন আপন কুঞ্জে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে আহারান্তে প্রভুসন্তান প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, অকস্মাৎ উৎপাত উপস্থিত হইল। স্বপ্ন দেখিলেন — ভয়ঙ্কর এক বন্য বরাহ গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুসন্তানকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। গুঁতার উপরে গুঁতা খাইয়া প্রভুপাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; 'উহু উহু' করিতে করিতে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। পরে, একটুকাল বসিয়া হাত মুখ রগড়াইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন ও নিদ্রিত হইলেন। কিছুক্ষণ অতীত হইতে না হইতে আবার সেই বন্য শূকর ভীষণ রব করিতে করিতে প্রভুজীর উপরে আসিয়া পড়িল এবং ধাক্কার উপর ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। প্রভু তখন 'হাউ হাউ' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ অস্থির অবস্থায় থাকিয়া আবার শয়ন করিলেন। এবার আর তেমন নিদ্রা নাই। সামান্য একটু তন্দ্রাবেশ হইতেই প্রভুপাদ দেখিলেন— স্বয়ং বলদেবজী বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গভীর গর্জ্জনে চারি দিক কাঁপাইয়া বিকটদর্শন বিস্ফারণপূর্ব্বক, অতি প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রভুজীর উপরে আসিয়া পড়িলেন; ঘন ঘন নিষ্পেষণ ও সংঘর্ষণে প্রভুপাদের সর্ব্বাঙ্গ নিপীড়িত করিয়া, মুখাগ্র ঘর্ষণে তাঁহার বক্ষঃস্থল মর্দ্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! গোঁসাইকে মন্দিরে যাইতে বাধা দিবি? জানিস্ না তিনি কে? তাঁহাকে সামান্য ভেবেছিস্? আজ তোকে শেষ কর্‌বো।" প্রভুজীর তন্দ্রাবেশ ছুটিয়া গেল; সজ্ঞান চমকিত অবস্থায় তিনি বরাহদেবের মুহুর্ম্মুহুঃ গর্জ্জন শুনিতে লাগিলেন। কঠোর মর্দ্দনে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সামর্থ্য হইল না। পরে তিনি চীৎকার করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন; এবং ধীরে ধীরে দম্ ছাড়িয়া ক্রমে সুস্থ হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এখন কি করি? কিসে এই অপরাধ হইতে রক্ষা পাই?' শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমৎ গৌর শিরোমণি মহাশয়কে সকলেই সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস

করেন। প্রভুসন্তান তখনই রাত্রিতে তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং অকপটে সমস্ত বিবরণ বিস্তারিতরূপে তাঁহাকে জানাইয়া, বরাহের নিষ্পেষণের চিহ্ন শরীরের নানাস্থানে দেখাইয়া, বলিলেন, "এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? কৃপা করিয়া বলুন।" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "প্রভু আপনি বিষম দুঃসাহস করিয়াছিলেন। এরূপ সঙ্কল্পেও ভয়ানক অপরাধ হয়। রাত্রি প্রভাত হইলেই আপনি গোস্বামী প্রভুর নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন; এবং খুব সসম্মানে আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দজীর মন্দিরে লইয়া যান।" পরদিন প্রত্যুষে প্রভুসন্তান তাহাই করিলেন। শ্রীগোবিন্দজী দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন; তখন ঠাকুরের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া বিদ্রোহি দল একান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। পরে সকলেই মহানন্দে ঠাকুরকে লইয়া আমাদের কুঞ্জে আসিলেন। এইরূপ অসাধারণ কোনও ঘটনা না ঘটিলে এত অল্পকালমধ্যে এ স্থানে ঠাকুরের এইপ্রকার গৌরব ও এইরূপ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত, মনে হয়।

সাধকের সুরাপান কি?

আজ ঠাকুর অপরাহ্নকালে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না। ঠাকুরের কাছে বসিয়া আমরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের তো মাদক খাইতে একেবারেই নিষেধ করেছেন; কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরা ত খুব মাদক সেবন করেন। শাস্ত্রে কি মাদক সেবন নিষেধ?

ঠাকুর বলিলেন—**মাদক সেবন সম্পূর্ণ নিষেধ; শাস্ত্রে ধর্ম্মার্থীদের জন্য মাদক খাওয়ার ব্যবস্থা কোথাও নাই। যাঁহারা সর্ব্বদা পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরে বেড়ান, ঐ সকল স্থানে থেকে সাধনাদি করেন, তাঁদের শরীরে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। নানা স্থানে নানাপ্রকার শীত উষ্ণাদিতে শরীরটিকে স্থির রাখ্‌বার জন্য তাঁদের পক্ষে মাদক সেবন প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা শুধু শরীর রক্ষারই জন্য, উহাতে সাধনের কোন সাহায্যই করে না; বরং ভয়ানক অনিষ্টই হয়, চিত্ত অস্থির হয়। যোগশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে মাদক ব্যবহারের মহা দোষ উল্লেখ ক'রে গেছেন। কেবল মাত্র শরীর রক্ষার জন্য ঔষধার্থে যাঁহারা উহা সেবন কর্‌বেন, ঔষধের মত, প্রয়োজন শেষ হ'লেই আবার ছেড়ে দিবেন—এই ব্যবস্থা।**

আমি বলিলাম—কেন? দেখ্‌তে পাই তান্ত্রিক সাধকেরা খুব মদ খেয়ে থাকেন। মদ না খেলে নাকি তাঁহাদের সাধনই হয় না। বীরাচারীরা যে খুবই মদ মাংস খান, এ ত সকলেই জানেন।

ঠাকুর বলিলেন—**মদ খেয়ে সাধন করার ব্যবস্থা বীরাচারীদের জন্যও নাই। তবে নিজেকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য বীরেরা উহা ব্যবহার কর্‌তে পারেন, এই পর্য্যন্ত। তন্ত্রেতে যে অবস্থাকে 'বীর' বলেছেন, তা তো বড় সহজ নয়।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন্ অবস্থায় তান্ত্রিক সাধকেরা 'বীর' হন?

ঠাকুর বলিলেন—**বীর সহজে হয় না; সমস্ত পশুভাব বিনষ্ট হ'লেই বীর হয়। কামাক্রোধাদি সমস্ত রিপু যখন একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, তখনই বীরাচারী হ'তে পারে।**

আমি বলিলাম—শাস্ত্রে সুরাপানের ব্যবস্থা নাই, বল্লেন; কিন্তু তান্ত্রিকেরা তো সুরাপানের মাহাত্ম্য দেখায়ে বলেন—"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।"

ঠাকুর বলিলেন—**যে সুরাপানের এই ব্যবস্থা, তাহা বাহিরের সুরা নয়। এ সব মাদক নয়। লোকে ইহা না বুঝে গোল করে। ভক্তিতে ক'রে এই দেহেতেই একপ্রকার সুরা জন্মে; তা খেলে ভয়ানক নেশা হয়। উহাকেই অমৃত বলে; উহা খেলে আর জন্ম হয় না।**

আমি বলিলাম—ভক্তিতে দেহের ভিতরে সুরা হয় কি প্রকারে? তাহা খায়ই বা কিরূপে?

ঠাকুর বলিলেন—**দেখ, যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মস্তিষ্কের কোন একটা বিশেষ স্থানে একপ্রকার অনুভাবেতে ঐ স্থানের রক্তের একটা অন্যপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়। ঐ রক্ত তখন গরম হ'য়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কামেতেও ঐরূপ। এইপ্রকার সৎ অসৎ সকল ভাবেই মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানে, এক এক রকম অনুভবে রক্তাদির পরিবর্ত্তন ঘটায়। উহাই শিরা ধমনী দিয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভাব ভক্তি আনন্দেও রক্তের একরূপ পরিবর্ত্তন হয়। ভক্তিতে মস্তিষ্কের রক্তের যে অবস্থা হয়, অত্যন্ত বেশী হ'লেই তাহা ক্রমে গরম হ'য়ে ভাবেতে ক'রে একমত রস জন্মে। ঐ রস ধীরে ধীরে টাক্‌রা দিয়ে চুয়ায়ে জিহ্বায় এসে পড়ে, ঐ রসই অমৃত। উহা দু' তিন ফোঁটা খেলেই এত নেশা হয় যে, ৫/৭ দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়, আহারেরও প্রয়োজন হয় না। উহাকেই সুরা বলেছেন; উহাই খাওয়ার ব্যবস্থা। ঐ সুরার মাদকতাশক্তি এত বেশী যে, যাঁহারা না খেয়েছেন, বল্লে কিছুতেই বুঝ্‌বেন না। উহা খাওয়ামাত্র মানুষ চেতনাশূন্য হয়—শরীর একেবারে অচল হ'য়ে পড়ে; কিন্তু ভিতরের জ্ঞানের হ্রাস হয় না, যেমন তেমনটিই থাকে, শুধু বাহ্য-জ্ঞানই থাকে না।**

আমি বলিলাম—যে অমৃতের কথা বল্লেন, উহা খেতে কেমন লাগে? রক্তেরই যখন কোন এক রকম পরিবর্ত্তনে উহা তাহারই চুয়ান রস, তখন উহা খেলে কি কোনও অনিষ্ট হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—**এক এক সময়ে উহার এক এক প্রকার স্বাদ হয়। ভক্তির ভাব সকলের সহিত উহার যোগ আছে। যে ভাবেতে ভক্তি হয়, স্বাদটিও সেই মত হ'য়ে থাকে। কখন লবণ, কখন মধুর, কখন বা লবণ-মধুর, আবার কখন বা তিক্ত, এইরূপ নানা স্বাদ পাওয়া যায়। ভক্তির যখন যেমন ভাব, তখন তেমন স্বাদ। আমি তো দেখ্‌ছি উহা খেয়ে কোন অনিষ্টই হয় না; বরং শরীর আরও সুস্থই থাকে। উহা খেয়ে দীর্ঘকাল আহার না কর্‌লেও কোন গ্লানিই বোধ হয় না; শরীর খুব সবল ও সুস্থ হয়। উহাতে শরীরের মহা কল্যাণ সাধন**

করে ব'লেই শাস্ত্রে উহাকে 'অমৃত' বলেছেন। উহা যথার্থই অমৃত।

আমি বলিলাম—যে ভক্তিতে এই অমৃত জন্মে, সেই ভক্তি কিসে লাভ হয়? আমরা ঐ অমৃত লাভ কর্‌তে পারি না কি?

ঠাকুর বলিলেন—**এই অমৃত লাভ কর্‌তে হ'লে শ্বাসে প্রশ্বাসে খুব নাম কর। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে পার্‌লেই দেখ্‌বে ক্রমে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।**

নামে ঠাকুরের শুষ্কতা ও জ্বালা। পরমহংসজীর সান্ত্বনা।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিলাম—চেষ্টা তো কম করি নাই; কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করা অসম্ভব মনে হয়। নাম ক'রে যদি আনন্দ পাওয়া যায়, তা হ'লে বরং শ্বাস প্রশ্বাসে চেষ্টা করা যায়। নাম যতদিন শুষ্ক কাঠের মত নীরস থাকে, ততদিন চেষ্টা কর্‌তে ধৈর্য্য থাক্‌বে কেন? নাম করাতে যে কি উপকার তাহাও তো বুঝি না।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—**উপকার কি হ'চ্ছে তাহা এখন বুঝ্‌বে না। শুধু নাম ক'রে যাও। ক্রমে সবই বুঝ্‌বে। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করা খুবই শক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তা ব'লে ছেড়ে দিতে নাই। প্রথম প্রথম নাম খুব শুষ্কই বোধ হয়। আমাকে যখন গুরুদেব শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে বল্‌লেন, কিছু দিন চেষ্টা ক'রেই আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কারণ, কিছু না বুঝে শুষ্ক নাম আর কতক্ষণ করা যায়? অনেক সময়ে নাম কর্‌তে এত শুষ্কতা বোধ হ'তো যে, বৃথা নাম কর্‌ছি মনে ক'রে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হ'তো। তখন একদিন পরমহংসজী দর্শন দিলেন, আমি বল্‌লাম—'বৃথা বৃথা এরূপ নাম আর কর্‌তে পারি না। শুষ্ক নাম নিয়ে আর কি হবে? কিছুই তো বুঝ্‌ছি না।' তখন তিনি একটু হেসে আমাকে বল্‌লেন—'শুধু আমার অনুরোধ মনে ক'রে নাম ক'রে যাও। শুষ্ক বোধ হয় হউক, তাতে কি? বিরক্তি বোধ হ'লেও তাতে কোন ক্ষতি নাই। নাম কর্‌তে থাক, ক্রমে সব টের পাবে।' আমি পরমহংসজীর কথামত আবার নাম কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। গয়াতে আকাশ গঙ্গায়, বরাবর পাহাড়ে ও বিন্ধ্যাচলে খুব নাম ক'রে ছয় মাস কাটালাম, তখন একটু একটু টের পেতে লাগ্‌লাম। ওখানে নানাপ্রকার অবস্থা আমার হ'তে লাগ্‌ল। তখন ঘুমায়ে কি জেগে আছি, এ বিষয়েও সময়ে সময়ে সংশয় হ'তো, সে সময়ে নিঃসংশয় হ'তে কখন কখন শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছি, কতই করেছি। পরে যখন দ্বারভাঙ্গায় এলাম, গুরুদেব একদিন দর্শন দিলেন। তাঁকে আমি আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বল্‌লাম; তিনি তখন আমাকে শুধু বল্‌লেন—'হঠযোগ প্রদীপিকা' এবং 'বিচারসাগর' এই গ্রন্থ দু'খানা এনে একবার পড়। আমি বল্‌লাম—'কোথায় পাব?' তিনি একটি দোকানের উল্লেখ ক'রে বল্‌লেন—'দ্বারভাঙ্গাতে মাত্র ঐ দোকানে এই গ্রন্থ আছে, পাঁচ টাকা দাম নিবে। যাও, নিয়ে এস গিয়ে।' আমি গুরুজীর কথামত সেই দোকানে গিয়া দেখ্‌লাম—মাত্র সেই দু'খানা পুস্তকই ঐ দোকানে আছে।**

মূল্যও পাঁচ টাকাই নিল। আমি পুস্তক দু'খানা পড়্‌লাম। দেখ্‌লাম ঐ গ্রন্থ দু'খানায় যতগুলি অবস্থার কথা লেখা রয়েছে সে সমস্তগুলিই আমার লাভ হ'য়ে গেছে। ঐ সব অবস্থা যখন আমার লাভ হয়, ভেবেছিলাম আমার মাথা নষ্ট হ'য়ে গেছে। গ্রন্থপাঠ শেষ হ'তেই গুরুদেব আবার দর্শন দিলেন। তখন তাঁকে বল্‌লাম—'আগে কেন এই পুস্তক দু'খানা আমাকে পড়্‌তে বলেন নাই; তা হ'লে তো আর এত কাণ্ড কর্‌তাম না।' গুরুজী বল্‌লেন—"না, আগে দিলে ঠিক্ হ'তো না। তুমি যে বিষম গোঁড়া ছেলে, তা তো আমি জানি। ঐ গ্রন্থ তোমাকে আগে পড়ায়ে নিলে, এখন তুমি মনে কর্‌তে—ঐ পড়ার সংস্কারেই তোমার মাথার গোলমাল ঘটেছে। এ সকল অবস্থায় তোমার যথার্থ বিশ্বাস হ'তো না। এখন তোমার অবস্থা তুমি নিজে অনুভব কর্‌ছ। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা যে সব শাস্ত্র লিখে গেছেন, তাতেও ঐ সব অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে; এখন আমিও বল্‌ছি, সাধনেতে ক'রে তোমার যে সব অবস্থা লাভ হয়েছে, সমস্তই সত্য। এখন ওবিষয়ে আর তোমার কোন সংশয় হবে না।" অবস্থাটি লাভ ক'রে, উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য শাস্ত্র দেখাই ঠিক। তাতে শাস্ত্রেও অভ্রান্ত বিশ্বাস হয়। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন; পরে আবার বলিতে লাগিলেন—অনেকে আমাকে অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করেন; কিন্তু উহার উত্তর দিতে আমার ভাল বোধ হয় না। একমাত্র নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে নিতে পার্‌লেই ক্রমে ক্রমে সকল অবস্থা প্রকাশ হ'তে থাক্‌বে। তখন তাহা প্রমাণের জন্য শাস্ত্র দেখ্‌লেই হ'লো। শাস্ত্রই যথার্থ অবস্থার সাক্ষ্য দিবে। যা কিছু প্রত্যক্ষ কর্‌বে, বাজায়ে নিবে। তোমাদের তো একটা কিছু প্রত্যক্ষ হ'লেই বিশ্বাস কর; আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্য্যন্ত দশটি ইন্দ্রিয়দ্বারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য ব'লে না বুঝি, সে পর্য্যন্ত উহা সত্য ব'লে গ্রহণ করি না। বাস্তবিক পক্ষে দশ ইন্দ্রিয়দ্বারা বাজায়ে যাহা সত্য ব'লে গ্রাহ্য হবে, তাহাই বিশ্বাস করা যায়। কোন বিষয় শুধু দেখে, শুনে বা স্পর্শ ক'রেই অমনি সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রো না; সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তিনবার ক'রে বাজায়ে সত্য বুঝ্‌লে, পরে আবার শাস্ত্র দেখো। তাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয় হ'তে পার্‌বে। না হ'লে ঠিক্ হয় না।

আমি বলিলাম—'শুনিতে পাই সমস্ত দেবদেবী, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি পঞ্চদেবতাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে না পার্‌লে মুক্তি লাভ করা যায় না; তা হ'লে কি উঁহাদের সকলকেই পূজা কর্‌তে হবে?'

ঠাকুর বলিলেন—সকলকেই খুব সম্মান কর্‌বে; অনাদর, অমর্য্যাদা কারোকেই কর্‌বে না। পূজা তাঁদের না কর্‌লেও চলে। পূজাদ্বারা শুধু তাঁদের লোক-ই লাভ হয়, মুক্তি হয় না।

আমি আবার বলিলাম, পূজাদ্বারা তাঁদের সন্তুষ্ট ক'রে না গেলেঃ রাস্তায় তাঁরা কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটান না তো?

ঠাকুর বলিলেন—একমাত্র ভগবানের পূজাতেই সব হয়। বৃক্ষের যেমন গোড়াতে জল ঢাল্‌লে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প, সর্ব্বত্রই ঐ জল যায়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানের পূজা

কর্‌লেই সকলের তাতে সন্তোষ হয়, আনন্দ হয়।

আমার ও হরিমোহনের শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগসম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি।

কিছুকাল যাবৎ আমার মাথার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর, রাত্রের আহার ছাড়িয়াছিলাম। অনুমান হয়, তাহাতেই এই অসুখের আবার উৎপত্তি। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নিয়মানুসারে গুরুর প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিতে নাই। বোধ হয়, এই জন্যই আজ কয়েকদিনহইতে ঠাকুর প্রত্যহই রাত্রে দুধ রুটি প্রসাদ দিতেছেন। ঠাকুরের আহারের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাকে প্রসাদ দেন বলিয়া পরিমাণের অধিক তিনি কখনও গ্রহণ করেন না, নিজের আহার্য্যেরই অংশ দিয়া থাকেন। এই প্রকারই নাকি ব্যবস্থা। আমার এ অসুখের কথা কিছুই আমি ঠাকুরকে জানিতে দেই নাই, কারণ, তিনি জানিলেই হয় ত আমাকে বড় দাদার নিকটে যাইতে বলিবেন।

২০শে ও ২১শে শ্রাবণ।

ঠাকুরের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত যোগজীবন ভাগলপুরে চাক্‌রীর প্রত্যাশায় গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মথুর বাবু তাঁহাকে আশা দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। স্বামিজী (হরিমোহন) বহুদিন ভাগলপুরে ছিলেন। অবিলম্বে তিনিও আবার তথায় যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। সতীশকেও ঠাকুর পুনঃপুনঃ মাতৃসেবার জন্য দেশে যাইতে বলিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সতীশ ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইবেন না জেদ করিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছি, কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়ার দরুণ মধ্যে মধ্যে বড়ই অবসন্ন হই।

আজ নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে ঠাকুরের কাছে গিয়া বসিতেই ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—**শরীর তোমার বড় কাতর হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি; আধ সের ক'রে দুধ তোমার খাওয়া প্রয়োজন। না হ'লে খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বে। আর রাত্রে নিয়মমত রুটি খেও। ব্রহ্মচর্য্যের সব নিয়ম ঠিক ঠিক রক্ষা ক'রে চলা প্রথম প্রথম সহজ নয়; ক্রমে ক্রমে অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। শরীরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা না কর্‌লে হবে কেন? শরীরটি ভাল না থাক্‌লে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। মাথার রোগ বড় খারাপ। মাথা দিয়েই সমস্ত কাজ কর্ম্ম। মাথা খারাপ হ'লে জীবনটাই বৃথা যায়। বরং কিছু কালের জন্য তোমার দাদার নিকটে যেতে পার। ফয়জাবাদ অতি উৎকৃষ্ট স্থান। মাথার অসুখও সার্‌বে, আর সাধনেরও কোন ক্ষতি হবে না। তোমার দাদার সঙ্গেতে উপকারই পাবে। শরীর একটু সুস্থ হ'লে আবার আস্‌লেই হবে।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, শীঘ্রই আমায় ফয়জাবাদে যাইতে হইবে। স্বামিজী (হরিমোহন) মথুরা হইতে একটু সুস্থ হইয়া এখানে আসিয়াছেন। রোগের যন্ত্রণায় অতিশয় কাতর হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন—''ভাই, ভাগলপুরে বেশ ছিলাম, কেন আমার এ

দুর্ম্মতি হইল, এখানে আসিলাম? দেহের এই ক্লেশ তো আর সহ্য হয় না। কোনমতে একটু সুস্থ ও সবল হইলেই আবার আমি ভাগলপুরে যাইব। ধর্ম্মকর্ম্ম তো সর্ব্বত্রই হইতে পারে। বরং আত্মীয় স্বজনের নিকটে থাকা নিরাপৎ।" কথায় কথায় আজ স্বামিজীর আক্ষেপোক্তি আমি ঠাকুরকে বলিলাম। শুনিয়া, ঠাকুর বলিলেন—**তীব্র বৈরাগ্য না জন্মালে কর্ম্মের শেষ হয় না। জোর ক'রে কি আর কর্ম্ম কাটান যায়? হরিমোহনকে আমি পুনঃপুনঃ আগে এসব কর্ম্ম শেষ ক'রে নিতে বলেছিলাম। এখন দেখ, সন্ন্যাস নিয়ে অনুতাপ পর্য্যন্ত কর্‌লেন। এই অনুতাপে ওর সবই তো নষ্ট হ'য়ে গেল। এখন দস্তুরমত কর্ম্মটি শেষ ক'রে না এলে কিছুতেই হরিমোহন স্থির হ'তে পার্‌বেন না। কিছুই আর হবে না।**

স্বামিজীও ঠাকুরের এসকল কথা শুনিয়া শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

বৈরাগ্য, বাসনা ও বৈধ কর্ম্ম।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কর্ম্ম শেষ না করিলে লোকের মুক্তি হয় না বল্‌লেন; কিন্তু এমন কি কোন উপায় নাই, যাহা অবলম্বন কর্‌লে মানুষ কর্ম্ম কাটায়ে মুক্ত হ'তে পারে?'

ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ, থাক্‌বে না কেন? তীব্র বৈরাগ্যদ্বারাও মুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু সে বৈরাগ্য কোথায়? বিষয় হ'তে মনটিকে যখন সম্পূর্ণ ভিতরের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিতে পার্‌বে, আর প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে পার্‌বে, তখনই আশা করা যায়। একটি শ্বাস বা প্রশ্বাস বাদ গেলেও হবে না; কারণ, ঐ ছিদ্রটুকু পেয়েই কত শত্রু ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে পারে! এই নিষ্কাম মুক্তির পথে কত মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, দেবতাদি নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটান; সকলেই এই পথে বিষম পরীক্ষা করেন। বাসনাশূন্য হ'য়ে তীব্র সাধন না কর্‌লে, এপথে চলা যায় না। এই জন্যই বৈধ কর্ম্মের ব্যবস্থা। বৈধ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ শেষ ক'রে নিলেই সহজ হয়।**

আমি বলিলাম—যে কর্ম্ম শেষ করার কথা বল্‌ছেন, সে কর্ম্ম কি প্রকার? চাক্‌রী ক'রে সংসার গৃহস্থালী করাই কি কর্ম্ম?

ঠাকুর বলিলেন—**কর্ম্ম বল্‌তেই সংসার করা বা চাক্‌রী করা নয়। যাহার যে বিষয়ে আসক্তি তাহার সেটি নিয়েই কর্ম্ম।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বৈধ ভোগের কথা যে বল্‌লেন, তাহা কি রকম? শাস্ত্রমত ভোগ কর্‌লেই তো তাহা বৈধ ভোগ?

ঠাকুর বলিলেন—**বৈধ ভোগ যে কি তাহা বুঝা বড়ই শক্ত। শাস্ত্রোক্ত ভোগ ত বটেই, কিন্তু শাস্ত্রেতে ভোগ কাটাবার জন্য প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ব্যবস্থা করেছেন। যাহার যেমন প্রকৃতি তাহার পক্ষে সেই মত কর্ম্মের ব্যবস্থা। এইপ্রকার ব্যবস্থামত কর্ম্মের ভোগই বৈধ ভোগ। শাস্ত্র দেখে প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম বিধিমত কর্‌লেই ক্রমে ক্রমে ভোগ কেটে যায়।**

শ্রীযুক্তেশ্বরী-মা ঠাকরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী।

আমি। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণদ্বারা কি প্রকৃতি জানা যায় না?

ঠাকুর। **প্রকৃতি জানা কি এতই সহজ? শাস্ত্রপাঠে বা অন্য কোনও চেষ্টাসাধ্যে উহার কিছুই জানা যায় না।**

আমি। তা হ'লে আন্দাজে কিরূপে কর্ম্ম কর্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন—**নিজের প্রকৃতি নিজে কখনও কেহ বুঝে না। এইজন্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হয়; সদ্‌গুরু, যাহার যেরূপ প্রকৃতি পরিষ্কার প্রত্যক্ষ ক'রে, প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা ক'রে দেন। অবিচারে তাঁর আদেশমত কর্ম্ম ক'রে গেলেই অনায়াসে কর্ম্মটি শেষ হয়। এই ভিন্ন আর উপায় নাই।**

আমি। এতকাল আমার সংস্কার ছিল চাক্‌রী করা, সংসার করাই কর্ম্ম।

ঠাকুর বলিলেন—**বাসনাতেই কর্ম্ম; বাসনা নিবৃত্তিই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। বৈধ ভোগদ্বারাই বাসনা শেষ কর্‌তে হয়। বাসনা যার যে দিকে, কর্ম্মও তার সেই দিকে। শুধু সংসার করা বা চাক্‌রী করাই কর্ম্ম নয়।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ধর্ম্ম লাভ করার জন্য ঘর বাড়ী, পিতা মাতা ছেড়ে যে লোকে আসে, সেই ধর্ম্মলাভই তো তার বাসনা। সুতরাং তাহাই তো তাহার কর্ম্ম।'

ঠাকুর বলিলেন—**তা ত বটেই, তবে শুধু যদি তার ধর্ম্মের দিকে বাসনা থাকে তা হ'লেই সে নির্ব্বিঘ্নে তাহা কর্‌তে পার্‌বে। আর যদি অন্যান্য দিকেও বাসনা থাকে তা হ'লে স্থির হ'য়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্‌তে পার্‌বে না। যে পরিমাণে অন্য দিকে বাসনা থাক্‌বে, সেই পরিমাণে তাকে অস্থির হ'তে হবে ও ভুগ্‌তে হবে। এই জন্যই অন্যান্য বাসনা শেষ ক'রে আস্‌তে হয়।**

আমি। কর্ম্ম যাহাতে শেষ হ'য়ে যাবে, সদ্‌গুরু তো তাহাই কর্‌তে বলেছেন। কিন্তু সে প্রকার ক'রে কর্ম্ম শেষ হ'লো কি না কিসে বুঝ্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন—**যখন দেখ্‌বে কোন দিকেই একটা বাসনা নাই, বিষয়ের সংস্রবেও ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ অনাসক্ত, নিবৃত্ত, তখনই বুঝ্‌বে এসব কর্ম্ম শেষ হয়েছে।**

গোঁসাইপ্রদত্ত উপবীতের শক্তি।

আজ মধ্যাহ্নে সতীশ আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"ভাই, কি করি বল্‌ তো? আমার দুর্দ্দশা যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায়ই গোঁসাই আমাকে বাড়ীতে গিয়া মাতৃসেবা করিতে তাড়া দেন—আমার ত তাহা একেবারেই ইচ্ছা হয় না। কর্ম্মে যদি মাতৃসেবা থাকে, গোঁসাই কি আর তাহা কাটায়ে দিতে পারেন না?" আমি বলিলাম—"কিছুমাত্র না ভোগায়ে সহজে এ কর্ম্ম কাটায়ে দিতে পার্‌লে তিনি কি আর দিতেন না? ঠাকুর যাহা বলেন, অবিচারে সেরূপ করাই ত ভাল।" সতীশ বলিলেন—"ভাই, সেটি পার্‌ব না, ওকথা আর বলিস্‌ না। গোঁসাই ইচ্ছা কর্‌লে সবই কর্‌তে পারেন। শুধু বৃথা বৃথা আমাদের ভোগায়ে মার্‌ছেন। আমি

উঁহার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে অবাক্ হয়েছি। জানিস্ তো আমি ঘোর ব্রাহ্ম ছিলাম। সহজে কিছুই বিশ্বাস করি না; কিন্তু গোঁসাইয়ের অদ্ভুত শক্তি দেখে আমার আর অবিশ্বাস কর্‌বার যো নাই। অল্প দিনের একটি ঘটনা শুন্, বুঝ্‌তে পার্‌বি।'' অতঃপর সতীশ আমাকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—ভাই, উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলাম, সে সকল ব্যাপার তো সবই জান। ''কিছুদিন হয় পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মা আমাকে বাড়ী যাইতে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু আমি পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াই যেন কেমন হইয়া গেলাম। সমস্ত ছাড়িয়া তখনই পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় যে কত অবস্থায় পড়িলাম, কত ভোগই ভুগিলাম, বলিতে পাবি না। অনেক কষ্টের পরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলাম। তখন প্রতিদিনই গোঁসাইয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইত। এখানে আসামাত্রই গোঁসাই আমাকে বলিলেন—'**তোমার পিতার প্রেতাত্মা সর্ব্বদা তোমার উপরে রয়েছেন, শাস্ত্রমত গিয়ে শ্রাদ্ধাদি কর। তাতে তাঁরও বিশেষ কল্যাণ হবে, তোমারও উপকার হবে।**' আমি গোঁসাইকে বলিলাম—উপবীত ত্যাগ ক'রে আমি ব্রাহ্ম হয়েছিলাম। শাস্ত্রমত শ্রাদ্ধ কিরূপে কর্‌ব? গোঁসাই বলিলেন—'**উপবীত আবার গ্রহণ কর, তা হ'লেই হল।**' আমি বলিলাম—''গ্রহণই যদি কর্‌ব, তবে আর ত্যাগ করিলাম কেন? উপবীতের যদি তেমন কোন গুণই থাক্‌ত, তবে কি আর উহা ত্যাগ কর্‌তাম—না ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তাম?'' গোঁসাই আমার একথা শুনিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন—''**বটে, উপবীতের গুণ নাই! সে ভাবে উপবীত পাও নাই, তাই; তেমন ভাবে ব্রাহ্মণে উপবীত দিলে সাধ্য ছিল তুমি ত্যাগ কর? উপবীতের গুণ দেখ্‌বে? আচ্ছা আমি তোমায় উপবীত দিচ্ছি, তুমি ত্যাগ কর দেখি।**'' এই বলিয়া গোঁসাই আমার গলায় এক গাছা উপবীত ঝুলাইয়া দিয়া বলিলেন—''**সতীশ, এই উপবীত এখন তুমি ফেল দেখি।**'' ভাই, গোঁসাই উপবীত দিলে অমনিই আমি উহা ফেলিয়া দিব, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম—জেদও আমার খুবই হইয়াছিল। গোঁসাই যখন ঐ কথা বলিয়া আমাকে উপবীত দিলেন, আমি উহা সেই মুহূর্ত্তেই ফেলিয়া দিতে যেমন উপবীত স্পর্শ করিলাম, আমার কেমন এক অবস্থা হইল, সর্ব্বশরীর ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, ভিতর হইতে সবেগে গায়ত্রী-মন্ত্র উঠিতে লাগিল, ভিতরে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হইল। সর্ব্বাঙ্গ আমার অবসন্ন হইয়া পড়িল, আমি তখন কান্দিতে লাগিলাম, পুনঃপুনঃ গোঁসাইকে নমস্কার করিতে লাগিলাম, তাই বলি, ভাই, আমি তো বহুবার দেখেছি, গোঁসাই সবই কর্‌তে পারেন। তবে বৃথা বৃথা আমাদিগকে ভোগাচ্ছেন কেন?'' সতীশের কথা শুনিয়া আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দেওয়ার পরহইতে আমার নিজেরই জীবনে যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার অনুভব করিতেছি, তাহা মনে করিয়া ভাবিলাম—'এ আব কি?' আমার অদ্ভুত অনুভূতির কথা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়া সতীশকে বলিলাম—''এ সব দেখিয়াই তো ঠাকুরের কোন কথা আর অগ্রাহ্য কর্‌তে সাহস হয় না।''

সতীশ আমাকে তাঁহার রিপুর উত্তেজনা সম্বন্ধে যে সমস্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা বলিলেন,

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি তাঁহার দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া ব্যথিত মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হওয়ামাত্রই তিনি বলিলেন—"**সতীশ তাঁর যে সব অবস্থার কথা তোমাকে বল্‌ছিলেন, তাতে বুঝা যায়, এখানে তাঁর আর থাকা ভাল নয়। তাঁকে বলে দাও, অন্যত্র গিয়ে থাকুন।**"

আমি ঠাকুরের কথামত আসিয়া সতীশকে সব বলিলাম। সতীশ আমার উপরে বিরক্ত হইয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"যা যা, ব্যাটা, গোঁসাই আমাকে বল্‌তে পারেন না?" তখন আমি আসিয়া ঠাকুরকে ঐকথা বলাতে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন—"**সতীশ তোমার ভিতরের যেরূপ অবস্থা, স্ত্রীলোক হ'তে দূরে থাকাই ভাল। এখানে যখন স্ত্রীলোক রয়েছেন, তখন তুমি অন্যত্র গিয়ে থাক। আহারাদি এখানে ক'রে যেও, থাকার বন্দোবস্ত অন্য কোথাও ক'রে নেও।**"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সতীশ একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। খুব তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন—"কেন, আমি যাব কেন? স্ত্রীলোক সব এখান থেকে চলে যাক্‌। ওদের অন্যত্র যেতে বলেন না কেন? সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্ত্রীলোক কেন থাক্‌বে? আমি কখনও এখান থেকে যাব না।" সতীশ এই কথা বলিয়াই ঠাকুরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তখনই তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন। মাঠাকুরাণী বলিলেন—"সতীশের মা'র যে কি বিষম অবস্থা, বলা যায় না। সময়ে সময়ে তাঁর জ্বালার আঁচ আমার বুকে এসে লাগে। তাতেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়ি।" ঠাকুর বলিলেন—"**পিতৃশ্রাদ্ধ না ক'রে এই ভাবে সতীশ এসেছেন বলেই নানাপ্রকার উৎপাত ভোগ কর্‌ছেন।**"

শ্রাদ্ধে প্রেতাত্মার যন্ত্রণার শান্তি।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রাদ্ধে কি যথার্থই প্রেতাত্মার ক্লেশের শান্তি হয়? ঠাকুর এখানকার একটি অল্প দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"একদিন আমি যমুনার তীরে তীরে কালীদহের নিকটে উপস্থিত হ'তেই, একটি প্রেত এসে আমার সম্মুখে প'ড়ে বিষম ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"ওরকম কর্‌ছেন কেন? প্রেত বল্‌লেন—'প্রভু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আর এ ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পারি না। শত সহস্র বৃশ্চিক আমাকে সর্ব্বদা দংশন কর্‌ছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে দিনরাত আমি দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছি। মুহূর্ত্তের জন্যও আমি নিস্তার পাচ্ছি না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি তাঁকে বল্‌লাম, "আপনার কোন্‌ পাপে এই দণ্ড।" প্রেত চীৎকার ক'রে কেঁদে বল্‌লেন—'প্রভু, এখানে আমি * * * মন্দিরে পূজারী ছিলাম। ঠাকুর সেবায় যে সমস্ত অর্থাদি পেতাম, সেবাতে না লাগায়ে তাহা আমি ভোগবিলাসে ও বদ্‌মাইসীতে উড়াতাম। এটিই আমার গুরুতর অপরাধ।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কিসে আপনার এই ভোগের শান্তি হবে?" প্রেতাত্মা বল্‌লেন—'আমার শ্রাদ্ধ হয় নাই; শ্রাদ্ধ হ'লেই এই ক্লেশের শান্তি হবে।

আপনি দয়া ক'রে আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে দিন।' আমি বল্লাম—"কি প্রকারে ব্যবস্থা কর্‌ব?" প্রেত বল্লেন—'আমার শ্রাদ্ধের জন্য দেড় হাজার টাকা আমার ভাইপোর হাতে দিয়েছিলাম; কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত আমার শ্রাদ্ধ করে নাই। আপনি দয়া ক'রে ঐ অর্থ আনায়ে কতক ঠাকুর সেবায় দিয়ে দিন; বাকি টাকা দ্বারা আমার কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধ ক'রে, মহোৎসব কর্‌লেই আমি এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচি, প্রেতের কথা শুনে আমি সেই মন্দিরের বর্ত্তমান পূজারীর নিকটে গিয়ে সমস্ত বল্লাম। পরে এসব ব্যাপার সেই প্রেতের ভাইপোকেও বিস্তারিতরূপে জানান হ'ল। তিনি ভেবেছিলেন ঐ অর্থের আর কেহ খোঁজই নিবে না। যা হোক্ তিনি সমস্তগুলি টাকা দিয়ে বিধিমত শ্রাদ্ধটি কর্‌লেন। মহোৎসবাদিও হ'ল। পরে সেই প্রেতের ঐ যন্ত্রণার শান্তি হয়েছে। কয়েকদিন হয়, এখানে এই ঘটনা হ'য়ে গেছে।"

চীরঘাটে নৌকালীলা।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। যমুনার তীরে তীরে গিয়া চীরঘাটে পৌঁছিলাম। সেখানে ঠাকুর একটি বৃক্ষের মূলে বসিয়া, পরপারের বেলবাগের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অল্পক্ষণ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নাম করিয়া কাটাইয়া, সন্ধ্যার পরে আমরা কুঞ্জে ফিরিলাম। কুতু তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল আনিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ ধোয়াইয়া দিতে সিঁড়ির ধারে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর তামাসা করিয়া কুতুকে বলিলেন—'**কুতু আজ কতগুলি বেড়ালের গু মাড়িয়ে এসেছি। পায়ে গুগুলি জড়ায়ে রয়েছে।**' কুতু 'তা বেশ, তা বেশ' বলিয়া চরণ ধরিতে উপক্রম করামাত্রই ঠাকুর পা দুটি সরাইয়া লইয়া বলিলেন—'**আরে, থাম্ না, পায়ে যে বিশ্রী গু লেগে রয়েছে।**' কুতু বলিলেন—'তা হোক্ না, ওতে আমার একটুও ঘৃণা নাই। আমি রগ্‌ড়িয়ে বেশ্ পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিচ্ছি।' ঠাকুর বলিলেন—'**আরে, তোর হাতে যে গু লাগ্‌বে।**' কুতু একটু হাসিয়া বলিলেন—'ও কি বল্‌ছ, তোমার পায়ে যে লেগে রয়েছে ও আবার গু কি?' ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না। আমি কুতুর এই ভাবটি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আহা! ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে যাহা লাগিয়া আছে, তাহা কি আর গু আছে? তাহাতে আবার ঘৃণা কি? ঠাকুরের উপরে কতদূর শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিলে এই প্রকার ভাব স্বভাবসিদ্ধ হয়, আমি তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। ধন্য কুতু!

আমরা সকলে বারেন্দায় আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছি, কুতু ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, যমুনাতীরে যখন আমরা সকলে ব'সে ছিলাম, তখন তুমি সমাধির অবস্থায় '**ডুব্‌বে না, ডুব্‌বে না,**' ব'লে খুব হেসেছিলে কেন? ঐ কথা তুমি কাকে বলেছিলে?"

ঠাকুর কহিলেন—'**আর কাকে বল্‌ব?**' কুতু বলিলেন—খুলে বল না কেন? ঠাকুর বলিলেন—"**ওরে যমুনাতীরে গিয়ে বস্‌তেই কৃষ্ণ নৌকা নিয়ে এলেন, আমাকে বল্লেন—"ওঠ্! একবার যমুনায় 'বাচ' খেলি গিয়ে।" কৃষ্ণের কথায় নৌকায় উঠ্‌লাম। কৃষ্ণ নৌকার**

গলুইয়ের উপরে ছিলেন। মাঝ যমুনায় নৌকাখানা নিয়ে গলুইটি জলের ভিতর চেপে ধর্‌লেন। নৌকা তখন ডুবে ডুবে। নৌকায় যাঁরা ছিলেন, সকলে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। আমিও দেখ্‌লাম, কৃষ্ণ নৌকাখানা ডোবান ডোবান। তখন মনে হ'ল, কৃষ্ণ ভয় দেখাচ্ছেন। এ নৌকা কখনও ডুব্‌বে না। নৌকা ডুব্‌লে তো শুধু আমরাই ডুব্‌বো না, কৃষ্ণ যখন নৌকায় আছেন, গলুই দিয়া জল উঠ্‌লে কৃষ্ণই আগে ডুব্‌বেন। তাই সকলকে বলেছিলাম, 'ভয় নাই, ডুব্‌বে না, ডুব্‌বে না, এসব কৃষ্ণের চালাকী।"

কুতু। তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে গেলে, আমাদের নিলে না কেন?

ঠাকুর। **ওরে, সে যে বড় ছোট নৌকা। তাতে কি আর বেশী লোক ধরে?**

মাঠাক্‌রুণ বলিলেন—তোমাদের খেলা বরং দেখ্‌তে দিতে। তাও তো দিলে না।

ঠাকুর বলিলেন—**তাতে আর লাভ কি হ'ত। একটা চিত্র দেখার মত দেখ্‌তে বই তো নয়।**

মাঠাক্‌রুণ কহিলেন—তাই বা ক্ষতি কি ছিল? 'নাই চেয়ে কাণা ভাল।'

মাঠাক্‌রুণ, কুতু এবং ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না।

কুতু, ঠাকুরকে বলিলেন—বাবা, গেণ্ডারিয়ায় যখন ছিলাম তখন তুমি আমাকে চিঠি লেখ নাই কেন?

ঠাকুর বলিলেন—**তোকে আবার চিঠি লিখ্‌ব কি? তুই তো সর্ব্বদা আমাকে দেখ্‌তে পেতিস্‌।**

কুতু বলিলেন—দেখ্‌তে পেতাম ব'লে কি তোমার আর চিঠি লিখ্‌তে নাই?

ঠাকুর বলিলেন—**দেখ্‌তে পেলে, কথা শুন্‌লে আর চিঠিতে দরকার?**

কুতু বলিলেন—দেখ্‌তে তো পেতাম; কিন্তু কথা তো সর্ব্বদা শুন্‌তে পেতাম না।

ঠাকুর বলিলেন—**সর্ব্বদা কথা শুন্‌লে কি আর ভাল লাগ্‌তো?**

অনেকক্ষণ ইঁহাদের এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর আমরা শয়ন করিলাম।

মাঠাক্‌রুণকে ঠাকুরের সঙ্গে রাখার কথা।

২২ শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

গতকল্য সতীশ রোখের মাথায় ঠাকুরকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে ভাবনা হইল, বুঝি ঠাকুর আবার মাঠাকুরাণীকে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে বলেন। ঠাকুর ত বলিয়াছিলেন যে, মাঠাক্‌রুণ সঙ্গে থাকিলে আশ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়। মাঠাক্‌রুণকে সঙ্গে রাখিয়াছেন। ইহা কি ঠাকুরের নিজের ইচ্ছায়, না পরমহংসজীর আদেশে তাহা বুঝিতেছি না। এ বিষয় জিজ্ঞাসা করার আরম্ভমাত্রই ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—

কিছুকাল হয় একদিন গুরুদেব আমাকে সূক্ষ্ম শরীরে লইয়া গিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগ্‌লেন। পরে আমাকে মন্দার পর্ব্বতে নিয়ে উপস্থিত কর্‌লেন। সেখানে দয়া ক'রে তিনি আমাকে ঊর্দ্ধরেতা ক'রে দিলেন। বহুকাল ধ'রে ঊর্দ্ধরেতা হ'তে আমার একটা ইচ্ছা ছিল। আমাব ঐ অবস্থা হওয়ায়, আমি ওঁর জন্য বিশেষ ক'রে বল্‌লাম, দয়া ক'রে ওঁকেও তিনি সে অবস্থা দিলেন। পরে একদিন গুরুদেব এসে আমাকে বল্‌লেন, 'তুমি ত সম্পূর্ণ নিরাপৎ হয়েছ। তুমি পাহাড় পর্ব্বতেই থাক, আর বাড়ী ঘরেই থাক, সর্ব্বত্রই তোমার অবস্থা একই প্রকার। ওঁকে তুমি এখানেই রাখ; ভালই হবে।' গুরুদেবের আদেশমতই আবার ওঁকে আনা হয়েছে। না হ'লে, আমি তো উত্তরকুরুতেই যাব মনে করেছিলাম।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, 'হায় রে! কি দুর্দ্দশা। ঠাকুরের কার্য্যেও আমার আবার প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল।' যাহা হউক, একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—উত্তরকুরুতে কি যাওয়া যায়?

ঠাকুর বলিলেন—যাওয়া যাবে না কেন, তবে বড় কষ্ট।

আমি বলিলাম—শুনিতে পাই মানসসরোবরে ও কৈলাসে নাকি কেহ যেতে পারে না?

ঠাকুর বলিলেন—পার্‌বে না কেন? হঠযোগ খুব অভ্যাস থাক্‌লেই পারে। না হ'লে যাওয়া অসম্ভব হয়। সেদিন যে পরমহংসটি এখানে এসেছিলেন, তিনি কৈলাস হ'তেই এসেছেন।

কৈলাসযাত্রার বিবরণ।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই সাধুটির সঙ্গে পূর্ব্বেও কি আপনার পরিচয় ছিল? তিনি কিরূপে গিয়েছিলেন?—একা, না সঙ্গে আরও কেহ ছিলেন?"

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরমহংসটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। একটি হঠযোগী সাধু, এই পরমহংস এবং আমি কৈলাসে যাওয়ার সঙ্কল্প ক'রে যাত্রা কর্‌লাম। অনেক দূর পাহাড়ের পথে চলে চলে একটি খুব বড় পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হ'লাম। একটি লোক এসে আমাদের যাওয়ায় বাধা দিয়ে বললেন—"ঐ পাহাড়ের উপর যেতে হুকুম নাই।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, কেন? তিনি বল্‌লেন, "ঐ পাহাড়ে মানুষ উঠ্‌লেই পাথর হ'য়ে যায়।" তাঁর কথায় সন্দেহ হওয়াতে তিনি আমাদের বহু দূরে পাহাড়ের উপরে তিনটি মানুষ দেখায়ে বল্‌লেন—"ঐ দেখুন, উহারা সব পাথর হ'য়ে রয়েছে।" ঐ পাহাড়ে উঠ্‌বার পথে পাহাড়েরই ধারে একখানা বড় পাথরে বড় বড় অক্ষরে খোদা রয়েছে—"অত্র অগ্রে ন গচ্ছন্তি।" পাহাড়ের ঐ প্রকার অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাওয়ার সময়ে ঐ কথা লিখে গিয়েছিলেন, পাছে কেহ ঐ পথে চলে বিপন্ন হন। আমরা ঐ সব দেখে ওদিক্ দিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌লাম। হঠযোগ আমার অভ্যাস নাই, পথে আরও কত প্রকার বিঘ্ন থাকতে পারে, এই ভেবে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী দু'টি ফির্‌লেন না। তাঁরা

বল্‌লেন—"অগ্নির অভাব আমাদের হবে না, সঙ্গে 'চক্‌মকি' আছে। রাস্তায় যদি জল পাই তা হ'লে আমাদের ক্রিয়া চল্‌বে; ক্রিয়াটি চল্‌লে আমাদের শরীরের কিছু হবে না।" ঐ কথা বলে তাঁরা অন্য পথ ধ'রে একটু ঘুরে চলে গেলেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে এসে সেই পরমহংসটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। রাস্তার সমস্ত বিবরণই তিনি আমাকে বল্‌লেন। শুন্‌লাম—উঁহারা পাহাড়ের পথে অনেক দিন চলে মানসসরোবরে উপস্থিত হলেন। কৈলাসে যেতে হ'লে মানসসরোবর দিয়েই যেতে হয়। কৈলাসের সমস্ত যাত্রী একটা নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করেন। সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে মানসসরোবরের মধ্যে মহাদেবের রথ ওঠে। যাঁদের ঐ রথের চূড়াটিও দর্শন হয় তাঁরাও কৈলাসে যাত্রা করেন, অবশিষ্ট সকলে থেকে যান। যদি কেহ রথ বা চূড়া দর্শন না পেয়েও কৈলাসে যান, তাঁর কৈলাসে গিয়ে মহাদেব দর্শন অদৃষ্টে ঘটে না। কৈলাসের যাত্রীদের মহাদেব দর্শনের ঐটিই পরীক্ষা। হঠযোগী সাধু ও পরমহংস মানসসরোবরে গিয়ে, নির্দ্দিষ্ট দিনের বিলম্ব আছে জেনে, মানসসরোবর পরিক্রমা কর্‌লেন। পরিক্রমায় তাঁদের সতেব দিন লেগেছিল। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হ'লে সরোবরের চারি দিকে সহস্র সহস্র সাধু মহাত্মাদের 'হর হর বোম বোম' শব্দ উঠ্‌ল, ফুল বিল্বপত্র, ধূপ ধূনা চন্দনাদি নিয়ে সকলেই সরোবরে মহাদেবের পূজা আরতি কর্‌তে লাগ্‌লেন। ঐ সময়ে মানসসরোবরের জল পাক দিয়ে খুব ঘুর্‌তে লাগল্। সকলেই মহাদেবের স্তব-স্তুতি কর্‌তে কর্‌তে সরোবরের দিকে তাকায়ে রইলেন। যথাসময়ে পাকজলের মধ্যস্থলে সুবর্ণরথের চূড়া উঠ্‌ল। পরমহংসটি উহার দর্শন পেয়ে কৈলাসের দিকে চল্‌লেন; কিন্তু হঠযোগী সাধুটি চূড়া দর্শন পেলেন না, কাজেই ওখান হ'তে ফিরে এলেন।

পরমহংসটি আরও কয়েকটি মহাত্মার সঙ্গে কৈলাসে গিয়ে ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। কৈলাস পর্ব্বতের ১০৮টি শৃঙ্গ একটির পর একটি শৃঙ্খলামত উঁচু; প্রত্যেকটি শৃঙ্গই শিবলিঙ্গের আকার। ঐ সকল শৃঙ্গকেও শিবলিঙ্গ বলে। ঐ সকল শিবলিঙ্গ পরিক্রমা ক'রে কৈলাসে ওঠ্‌বার নিয়ম। এক একটি শৃঙ্গ পরিক্রমায় প্রায় এক এক দিন লাগে। শুন্‌লাম ১০৮টি শৃঙ্গ পরিক্রমায় ওঁদের ঠিক ১০৮ দিনই লেগেছিল। ঠিক শিবচতুর্দ্দশীর দিনে কৈলাসের উপরে মন্দিরের নিকটে উঁহারা উপস্থিত হলেন। যথাসময়ে রাত্রে আপনা আপনি মন্দিরের দরজা খুলে গেল। সকলে তখন মন্দিরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ মহাদেব ও ভগবতীর দর্শন পেলেন। এই দর্শন বেশী সময়ের জন্য হয় না, ৩/৪ মিনিট মাত্র। পরমহংসটির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অনেক কথা হ'ল। ৩/৪ বৎসর পরে এবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা।

তিব্বতে বাঙ্গালী বাবু।

ঠাকুরের এ সকল কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনেছি তিব্বত দেশেও অনেক ভাল ভাল বৌদ্ধ লামা যোগী আছেন; সে সব স্থানে আমরা যেতে পারি না?"

ঠাকুর বলিলেন—আগে বরং এ দেশের সাধুরা যেতে পার্‌তেন। এখন আর সেখানে যাওয়ার যো নাই। একটি বাঙ্গালী বাবু সেখানে যাওয়ার পর থেকে যত বিঘ্ন ঘটেছে। সেখানে আইন হয়েছে এখন তিব্বতে আর কারও ঢুক্‌বার হুকুম নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—বাঙ্গালীটি যাওয়ায় কি ঘটেছিল?

ঠাকুর বলিলেন—কিছুকাল হয় ছদ্মবেশে একজন বাঙ্গালী বাবু তিব্বতে গিয়ে সে দেশের ভাষা শিখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর গোপনে গোপনে ঐ দেশের নক্‌সা আঁক্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। অবশেষে ধরা পড়াতে আর তিনি দেশে আস্‌তে পার্‌বেন না, রাজার এরূপ আদেশ হ'ল। বাঙ্গালী বাবুটি রাজার পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলেন, এবং দেশে যাতে আবার ফিরে আস্‌তে পারেন, সে বিষয়ে সুবিধা ক'রে দেবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌লেন। বিপন্ন শরণাগতকে পরিত্যাগ কর্‌তে নাই ব'লে পণ্ডিতজী তাঁকে আশ্রয় দিলেন। পরে পণ্ডিতজীর কথামত তিনি শপথ কর্‌লেন, দেশে এসে তিনি ঐ ভাষা আর অন্য কাকেও শিখাবেন না। আর তিব্বতের রাস্তা ঘাটের পরিচয় কাকেও দিবেন না। রাজপণ্ডিত মহাধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি ঐকথা বিশ্বাস ক'রে, সেই বাঙ্গালী বাবুটিকে কান্ধে তুলে গভীর রাত্রে পাহাড়-পথে প্রায় ৪/৫ ক্রোশ চলে একটি নিরাপৎ স্থানে পৌছায়ে দিলেন। বাবুটি কলিকাতা এসেই সমস্ত প্রকাশ ক'রে দিলেন এবং তিব্বতী ভাষাও শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন। এই কথা ক্রমে তিব্বতে প্রচার হওয়ায়, সেখানকার রাজা সেই পণ্ডিতজীকে বিষম দণ্ড দিলেন। একটা চামড়ার ভিতরে তাঁকে পূরে চার দিক সেলাই ক'রে নদীতে ডুবায়ে দিলেন। একজন লামা-গুরু কিছুদিন হয় আমাকে এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বল্‌লেন—"রাজা যদি আমাদের মত দশ হাজার লোকেরও মাথা নিয়ে, যোগীশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজীকে ছেড়ে দিতেন, সমস্ত দেশের লোক তাতে খুসী হ'ত। গুরুজী সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাজাও তাঁকে খুবই সম্মান ও পূজা কর্‌তেন; কিন্তু এরূপ কঠোর শাসন না হ'লে, দেশ রক্ষা শক্ত হবে স্থির ক'রে দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে এভাবে জীবন নাশের দণ্ড দিলেন। সেই লামা-সাধুটি এসে পুনঃপুনঃই "বেইমান বাঙ্গালী, বেইমান বাঙ্গালী" বল্‌তে লাগ্‌লেন। বাঙ্গালীদের উপরে তিব্বতীদের এখন আর বিশ্বাস নাই—তাঁরা সকলেই এখন 'বেইমান বাঙ্গালী' ভিন্ন বলেন না।"

মাঠাকুরাণীর ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া মাঠাকুরাণীর অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। এ সকল ঘটনা কি ভাবে ঘটিতেছে, কিছুই বুঝিতেছি না। মাঠাকরুণ আসিয়া আমাদের আহারাদির সমস্ত ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের এতগুলি লোকের যখন যে বস্তুর প্রয়োজন, না জানাইলেও, মাঠাকরুণ তাহা নিজেই বুঝিয়া জোগাড় করিয়া দেন। টাকা-পয়সা পূর্ব্বে যেমন আসিত, এখনও ঠিক সেইরূপই আসিতেছে; অথচ আমাদের কোনও বস্তুরই অভাব নাই। ভাণ্ডারঘর সর্ব্বদাই জিনিসে পরিপূর্ণ। নিত্য আমরা ন'দশটী লোক দু'বেলা আহার

করিয়া থাকি, তাহা ছাড়া বাসাতে নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার দু'তিন দিন অন্তরই চলিতেছে--- মাঠাক্রুণ ছোট একটি 'বোক্‌নাতে' মাত্র একবার অন্ন পাক করেন; বোক্‌নাটিতে এক সেরের অধিক চাউল ধরে না। ডা'ল, তরকারি প্রভৃতি ৫/৬ রকম ব্যঞ্জন ছোট একখানি কড়াতে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পাত্র ছোট হইলেও, একটি বস্তু আবার দ্বিতীয়বার রান্না করা মাঠাক্রুণের নিয়ম নাই। যখন আমরা সময়ে সময়ে পনর-কুড়ি জন লোক আহারার্থে উপস্থিত হই এবং অতিরিক্ত লোকের আহারের নিমন্ত্রণ হয়, তখনও মাঠাক্রুণ নিয়মিত পরিমাণের অধিক রান্না করেন না। রান্নাটি হইয়া গেলে দাউজী ঠাকুরকে ভোগ দেন, ভোগ সরাইয়া সমস্ত প্রসাদ রশুই ঘরে রাখা হয়। রশুই ঘরেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাত্র এক বোক্‌না প্রসাদে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা আমরা যত লোক উপস্থিত থাকি না কেন, মাঠাক্রুণ নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইয়া থাকেন। সকলের আহার হইয়া গেলে মা ও কুতু সকলের শেষে প্রসাদ পান। অতিরিক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের জোগাড় কোথাহইতে কি ভাবে হয়, বুঝিতেছি না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যহই এখানে হইতেছে। ডা'ল, তরকারি ইত্যাদি রান্না বস্তুর স্বাদও এক নূতন রকম দেখিতেছি; এরকম স্বাদু-সামগ্রী জীবনে আর কোথাও কখন খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কুতুবুড়ী ভোগ রান্নার সময়ে মাঠাক্রুণের সাহায্য করেন। আমাদের ঐ সময়ে ওদিকে যাওয়ার হুকুম নাই। রান্নার সমস্ত জোগাড় করিয়া অন্ন ও ৫/৭টি ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া লইতে মাঠাক্রুণের দু'তিন ঘণ্টার অধিক সময় কোন দিনই লাগে না। কি কৌশলে যে মাঠাক্রুণ এ সকল কার্য্য শৃঙ্খলারূপে সমাধা করেন, নানাপ্রকারে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে হরিবংশ পাঠের পর মাঠাক্রুণের ঘরে যাইয়া বসিলাম। মাঠাক্রুণ আমাকে বলিলেন---"কুলদা, বোধ হয় শীঘ্রই তোমার দেশে যাওয়া হবে। দেশে গিয়ে মায়ের সেবা বেশ ক'রে ক'রো।" মাঠাক্রুণের কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার দেশে যাওয়া হবে, ইহা কি আপনি পরিষ্কার দেখে বল্‌ছেন।" মাঠাক্রুণ বলিলেন—"কেন? দেশে যেতে তোমার ইচ্ছা হয় না? দেশে গিয়ে তোমার ভালই হবে।" আমি বল্‌লাম—"মা, আপনার বিষয় তো আমি কিছুই জান্‌লাম না। আপনার অবস্থার ২/১টি ঘটনা আমাকে বলুন না। কৃপণের মত আপনি সবই লুকিয়ে রাখেন কেন?" মা বলিলেন--- "তোমায় একটি কথা বলি, যদি ধর্ম্মজগতে বড়লোক হ'তে চাও, ধনী হ'তে চাও, কৃপণ হ'য়ো। নিজের কোন অবস্থাই কারুকে ব'ল না, বল্‌লে আর তা থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ভবিষ্যতের সব ঘটনা কি আপনার নিকট প্রকাশ হয়?

মাঠাক্রুণ। হবে না কেন? তবে সবই কি আর প্রকাশ হয়? দূরের বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানা যায়; আর ৫/৭ দিনের ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি সর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকে।

আমি। সাধনের সময়ে আপনার দর্শনাদি হয় না? সমাধি কখনও হয় কি?

মাঠাক্‌রুণ। সাধন ভজন আর করি কোথায়। দিনের বেলা তো সেবার কাজ কর্ম্মে কেটে যায়। মধ্যাহ্নে অবসর পেলে একটু বিশ্রাম করি। বিকাল বেলাটিও ঠাকুর দর্শনেই চলে যায়, রাত্রেই মাত্র বসি। তখন দর্শনও হয়। এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, সমাধি নিয়ে প'ড়ে থাকি, আবার সে ইচ্ছা হয় না; সমাধির চেয়ে এই ভাবে সেবার কাজ ক'রে দিন শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।

এই প্রকার অনেক কথার পর মা আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—"ভবিষ্যতে কাহার কি অবস্থা ঘট্‌বে, এখন তা ত আর বলা যায় না। তাই তোমাকে কয়েকটা কথা বল্‌ছি, মনে রেখো। মা'র জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। মা আমার বড় দুঃখিনী। আমাকে নিয়েই তিনি চিরকাল রয়েছেন। কত ক্লেশই পেয়েছেন। একটি দিনের জন্যেও সুখী হ'তে পারেন নাই। ভবিষ্যতে মা'র অদৃষ্টে কি যে আছে, বলা যায় না। মাকে দেখো। বৃদ্ধাবস্থায় অন্যের গলগ্রহ না হ'য়ে, মা যদি কোনও তীর্থে গিয়ে থাক্‌তে চান, ৪/৫টি টাকা মাসিক মাকে জোগাড় ক'রে দিও; আর তাঁকে খুব সান্ত্বনা দিও।"

আমি বলিলাম—দিদিমার জন্য আপনি ভাব্‌বেন না। কোন কালেও তিনি কষ্ট পাবেন না। অন্ততঃ ভিক্ষা ক'রে, আমিই দিদিমার অভাব দূর কর্‌বো।

মাঠাক্‌রুণ আবার বলিলেন—"তোমায় আর একটি কাজ কর্‌তে হবে। শান্তিসুধার গর্ভাবস্থা। তাকে আমি ফেলে এসেছি। মা'র সঙ্গে তার তেমন সদ্ভাব নাই। শান্তির মাথাও ভাল নয়। গর্ভাবস্থায় যদি সর্ব্বদা মানসিক কষ্ট পায়, গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট কর্‌বে। তুমি শান্তিকে আমার নামে একখানা পত্র লিখে দাও। 'আমার যা কিছু, সমস্তই শান্তির। গেণ্ডারিয়া-আশ্রম শান্তিরই। শান্তি যেন ওখানেই স্থির হ'য়ে থাকে।"

মাঠাক্‌রুণের আদেশমত তাঁহারই নামে আমি অমনি শ্রীমতী শান্তিসুধাকে পত্র লিখিলাম। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মাঠাক্‌রুণের এ সকল কথা শুনিয়া আমার নানাপ্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মাকে আর গেণ্ডারিয়াতে ফিরাইয়া নেওয়া যাইবে না। সে কথাও আমার এখন মনে পড়িল। ভাবিলাম, যদি মাঠাক্‌রুণ অচিরে দেহত্যাগই করেন, তাঁহার তো কোন সেবাই আমি করিতে পারিলাম না।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা, আপনার কথা শুনে আমার নানারকম আশঙ্কা হয়। আপনার মনে কোন বিষয়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে কি না, জান্‌তে ইচ্ছা হয়।

মা বলিলেন—কুতুর বিবাহ হিঁদুসমাজে হয়, আর যোগজীবন সমাজে ওঠে, এই দু'টি আকাঙ্ক্ষা আমার আছে। আর 'গোস্বামী মশাই' মহাভারত পড়্‌তে চেয়েছিলেন, তাঁকে একখানি মহাভারত দিতে ইচ্ছে হয়। কুতু ছেলেমানুষ, ব্রজমায়ীদের মত ওর পায়ে একজোড়া পাঞ্জোর দিলে হ'ত। আর কোনও বাসনা আমার নাই।

মাঠাক্‌রুণ কুতুর বিবাহের জন্য একটুকু ব্যস্ত আছেন, কথার ভাবে বুঝিলাম। তিনি সে সম্বন্ধে আমাকে আরও অনেক কথা বলিলেন।

স্বপ্নে ভূতের উপদ্রব।

আজ অবসরমত গত রাত্রির একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্নের বৃত্তান্ত ঠাকুরকে বলিলাম। 'রাত্রি প্রায় ২।। টার সময়ে দেখিলাম, আমি আসনে বসিয়া, স্থির হইয়া নাম করিতেছি, অকস্মাৎ একটা বিকটাকার ভূত আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া আমাকে সাধনহইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি এক এক সময়ে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিলাম; কিন্তু, নাম ছাড়িলেই বিপদ্ ঘটিবে বুঝিয়া, খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। তখন সেই ভূতটা ভয়ঙ্কর একখানা খড়্গ হাতে লইয়া আমাকে কাটিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, এবং বলিল—"ঐ নাম নিলে, ঐ সাধন কর্‌লে, তোকে কেটে খণ্ড-খণ্ড কর্‌ব। শীঘ্র ঐ সাধন ছেড়ে দে।" আমি ভূতের সেই ভীষণ আকৃতি ও ভয়ঙ্কর আক্রোশ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ তখন আমার মনে হইল, গুরুদেব বলিয়াছেন—**স্থিরভাবে সাধন কর্‌লে, নাম কর্‌লে কেহই আর কোন বিঘ্ন কর্‌তে পার্‌বে না।** এই কথা স্মরণ হওয়ায়, ভূতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি নাম করিতে লাগিলাম। ভূতটা তখন আর আমার দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। "নাম ছাড়্," "নাম ছাড়্," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। আমিও নাম করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্ন শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—**এ আর কি এ তো কিছুই নয়। যে পথে চলেছ—কত বাঘ, সাপ, কত ভূত, প্রেত, কত দেবদেবী এসে বাধা জন্মাবে। সকলেই সাধন ছাড়াতে চেষ্টা কর্‌বে। খুব সাবধানে থেকো, কখনও কিছুতেই নাম ছেড়ো না। নাম কর্‌লেই ওসব উৎপাত দূর হবে। নাম ছাড়্‌তে অনেকেই বল্‌বে।**

২৩ শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

প্রকৃতির রোগ। কর্ম্মই ধর্ম্ম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—হরিবংশপাঠ শেষ হইলে পর এখন আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ পড়্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন—**মহাভারতখানা আগাগোড়া বেশ ক'রে প'ড়ো। উদ্‌যোগ পর্ব্ব, শান্তি পর্ব্ব এবং অশ্বমেধ পর্ব্ব বিশেষ মনোযোগ ক'রে পড়্‌বে। ভাগবত একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ এবং তৃতীয় স্কন্ধ প'ড়ো। এসব পড়া হ'লে রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ পড়্‌তে পার। অন্য কোন পুরাণাদি এখন পাঠ ক'রো না। এই কয়খানা পড়্‌লেই হবে।**

আমি বলিলাম—যাহা কোনকালে কল্পনাও করি নাই, এমন উৎকৃষ্ট অবস্থায় আপনি আমাকে রেখেছেন। কাম ক্রোধাদির নামগন্ধও আমার ভিতরে আছে ব'লে মনে হয় না; কিন্তু আপনার সঙ্গ-ছাড়া হ'লে কত প্রকার পরীক্ষা প্রলোভনে পড়্‌তে পারি! তখন আমার ব্রহ্মচর্য্য কিপ্রকারে রক্ষা হবে?

. ঠাকুর বলিলেন—**পরীক্ষা প্রলোভনে পড়্‌লেই বা। সে জন্য তোমার চিন্তা কি? যেখানেই থাক, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা ক'রো। তা হ'লেই সব ঠিক্ হ'য়ে আস্‌বে। কাম ক্রোধ, এসকল তো মানুষের প্রকৃতি নয়—এসব মানুষের প্রকৃতির রোগ। রোগ হ'লে যেমন ঔষধ সেবন দরকার, এসকল উৎপাতের প্রতিকারের জন্যও সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক। শরীরের রসেতেই এসকল নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। তাই শরীরের রস কমায়ে নিতে হয়। রসের হ্রাস করতে হ'লে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাক্‌তে হয়। এসব বিষয়ে যতটা পার চেষ্টা কর, ক্রমে সব ঠিক্ হ'য়ে আস্‌বে।**

ইহার পর ঠাকুরকে ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপপুণ্য এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর সংক্ষেপে তদুত্তরে বলিলেন—"**যে সকল কর্ম্ম ধর্ম্মলাভের অনুকূল, তাহাই কর্‌তে হয়। ধর্ম্মের প্রতিকূল কর্ম্মই পাপ। মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে দু'দিনের সাধনেই হয় তো পাপ দূর কর্‌তে পারে; মানুষের পাপ ছাড়্‌বার ক্ষমতাই আছে, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়্‌বার ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম ক'রেই, কর্ম্ম ক্ষয় কর্‌তে হয়। কর্ম্ম না ক'রে কারও নিস্তার নাই। কর্ম্মটি ধর্ম্মের বাহিরের বিষয় নয়, কর্ম্মই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকর্ম্মের অতীত অবস্থা অনেক দূরে। বৈরাগ্য অর্থ এই নয় যে, কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিলাম। ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌লাম। সমস্ত বিষয় থেকে এই ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হ'লেই বৈরাগ্য। বিষয়ে অনাসক্ত হ'লেই বুঝ্‌বে বৈরাগ্য হয়েছে। কর্ম্ম না কর্‌লে বৈরাগ্য হয় না। তোমরা নিশ্চয় জেনো, যতই কর না কেন, কর্ম্ম যাহার যেটুকু আছে, আজ হউক, কাল হউক, দু'দিন পরে হউক, একদিন কর্‌তেই হবে। সেটি না ক'রে কিছুতেই নিস্তার নাই। একমাত্র ভগবানের কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যেই সব শেষ হ'তে পারে, না হ'লে জোর ক'রে কার সাধ্য কর্ম্ম ছাড়ায়?**"

মাতৃসেবা ও ভ্রাতৃসেবার আদেশ।

. ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল। কত কর্ম্মের বোঝা আমার অদৃষ্টে আছে, কিছুই ত জানি না। শীঘ্র শীঘ্র সে সকল সারিয়া না নিলে কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না; নিশ্চিন্তভাবে সাধন ভজন, ভগবানের নাম, কিছুই করিতে পারিব না। গুরুদেব আমার সমস্তই তো জানেন। তাঁহাকেই আমার কি কি কর্ম্ম, স্পষ্টতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া, সেগুলি শেষ করিয়া ফেলি। এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া, ঠাকুরকে আমি বলিলাম—"আমার যে সব কর্ম্ম আছে আমি তো তাহা জানি না। আপনি আমাকে পরিষ্কার ক'রে বলে দিন; আমি খুব উৎসাহের সহিত তাহাই করব। সতীশকে গিয়া মাতৃসেবা করতে প্রতিদিনই তো বল্‌ছেন; স্বামিজীকেও কর্ম্ম কর্‌তে কতই বল্‌ছেন, কিন্তু এদের সে মতি হচ্ছে না। এপ্রকার দুর্ম্মতি পরে আমারও তো জন্মিতে পারে। তাই আপনি পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিন। আমায় কি কর্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **তোমারও মাতৃসেবাই আছে। ওটি ক'রে নিলেই সব পরিষ্কার।**

নিয়মমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ক'রে, এখন যেয়ে মায়ের সেবা কর। তা হ'লেই সব ঠিক হবে। কিছুকাল মায়ের সেবা কর্‌লেই ওতে কত উপকার, বুঝ্‌তে পার্‌বে। চাক্‌রী, অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা বা সংসার তোমায় আর কর্‌তে হবে না। মাতৃসেবা কর্‌লে তাতেই তোমার সমস্ত কেটে যাবে।

আমি বলিলাম—আমার সেবাতে মা সন্তুষ্ট হ'য়ে, যদি আমাকে ধর্ম্ম লাভ কর্‌বার জন্য আশীর্ব্বাদ ক'রে ছেড়ে দেন, তা হ'লে আপনার সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌ব তো?

ঠাকুর বলিলেন—**সেবাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে মা তোমাকে ছেড়ে দিলে, মা'র অনুমতি নিয়ে অনায়াসে আমার সঙ্গে থেকো। সে সবই হবে। এখন খুব ভক্তি ক'রে গিয়ে মা'র সেবা কর।**

ঠিক এই সময়ে দশ টাকার একটি 'মনি-অর্ডার' আমার স্বাক্ষর করিয়া লওয়ার জন্য 'পিয়ন' আমাকে ডাকিতে লাগিল। স্বাক্ষর করিয়া টাকা দশটি আমি লইলাম। দেখিলাম, ফয়জাবাদ হইতে বড় দাদা এই টাকা পাঠাইয়াছেন। হঠাৎ তিনি এ সময়ে আমাকে টাকা পাঠাইলেন কেন, বুঝিলাম না। ঠাকুরের কাছে যাইয়া একথা বলামাত্রই তিনি বলিলেন—**এখন তুমি এখান থেকে তোমার বড় দাদার নিকটে চলে যাও। কিছুদিন সেখানে তাঁর সেবা কর। সন্তুষ্ট হ'য়ে তিনি অনুমতি কর্‌লে বাড়ীতে গিয়ে মা'র সেবা ক'রো। সেবাদ্বারা সকল গুরুজনকে সন্তুষ্ট ক'রে তাঁদের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে তবে ধর্ম্মপথে চল্‌তে হয়। তা হ'লেই অনায়াসে এই পথে চলা যায়। গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যদি একটি লোকও বাদী হন, ধর্ম্মপথে অনেক বিঘ্ন ঘটে।**

এই সকল কথার পরে ঠাকুর আমাকে কাঙ্গাল ফিকিরের "ব্রহ্মাণ্ডবেদ"-খানা পাঠ করিতে বলিলেন। ঠাকুরের দীক্ষা ও আমাদের সাধনে শক্তিসঞ্চারের কথা এই পত্রিকার স্থানে স্থানে কাঙ্গাল কিছু কিছু লিখিয়াছেন। ঠাকুরের কথামত উহা পড়িয়া আমি শুনাইতে লাগিলাম।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদে ঠাকুরের দীক্ষাদি ও শক্তিসঞ্চারের কথা।

"১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, যে সময় কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময়ে এইরূপ একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকেই "মা মা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হস্ত ধরিয়া, নানক আবার অন্য ভক্তগণের সঙ্গে গলাগলি হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কীর্ত্তন করতঃ ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর বৎসর, ১২৯২ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপাসনা করিতেছিলেন, তখন ঐপ্রকার একটি আধ্যাত্মিক দৃশ্যও প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে রংপুর কাকিনিয়ার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমারঞ্জন রায়, যে সময় তত্রত্য ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, ১মভাগ, ৩৯২ পৃষ্ঠা।

মহাশয় প্রাতঃকালে বেদির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই দিনও ঐপ্রকার আর একটি দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট লক্ষিত হয় নাই।"

অসাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন—"তিনি একদা পর্ব্বতবাসী কয়েকজন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। একজন মান্দ্রাজবাসী তাঁহার পথপ্রদর্শক সঙ্গী হইয়াছিলেন। পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইলে, ললাটাদি স্থানে সিন্দূর রঞ্জিত ভীষণমূর্ত্তি জনৈক ভৈরব তাঁহাদিগের গমনের অন্তরায় হইয়া প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। ভৈরবের এই ব্যবহার মান্দ্রাজবাসী জাতীয়তেজে উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'উষ্ণ হইলে কার্য্য হইবে না। আমি ইহার উপায় করিতেছি' অনন্তর ভৈরবমূর্ত্তি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলে, গোস্বামী মহাশয় বেগে গমন করিয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। ভৈরব হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমরা মনে করিতেছ, আমি ঘোর পাষণ্ড ও নির্দ্দয়, বাস্তবিক তাহা নহে। এই পর্ব্বতে যে কয়েকজন যোগী বাস করেন তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ। আমি তাঁহাদের সেবার্থ নিযুক্ত আছি। বৈষয়িক লোকেরা বিষয়ের শুভাশুভ জানিতে যোগিগণকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করে। ইহাতে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তন্নিমিত্ত তাঁহারা সুড়ঙ্গপথে পর্ব্বতাভ্যন্তরে সম্প্রতি প্রবেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোকের তথায় যাইতে নিষেধ নাই। কে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও কে বিষয়ী, আমি প্রস্তরখণ্ড ছুড়িয়া তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। বিষয়ী হইলে ভয় পাইয়া প্রস্থান করে। আর যথার্থ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইলে, তোমাদের মত, উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে না। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গমন কর, যোগিগণকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তথায় জল নাই, এখানেই যাহা কিছু আহার করিয়া নির্ঝরের জল পান কর; এই কথা বলিয়া সেই ভৈরবমূর্ত্তি নরকপালে নরমাংস আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিল। "আমি কোনপ্রকার মাংসই আহার করি না" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিলেন; ভৈরবমূর্ত্তি ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিল; কিন্তু পথপ্রদর্শক হইয়া যোগিগণের নিকট লইয়া চলিল। গোস্বামী মহাশয় সুড়ঙ্গপথে হামাগুড়ি দিয়া অনেক কষ্টে যোগিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক দেখিলেন, সে স্থান ছাদশূন্য একদ্বার কোঠার সদৃশ; অর্থাৎ চারি দিকে ভিত্তিস্বরূপ পর্ব্বত, মধ্যস্থান দিব্য পরিষ্কৃত ও বৃক্ষলতায় সুশোভিত। যোগীদিগের মধ্যে একজন, গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ভৈরবমূর্ত্তিকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি অঘোরপন্থীর পথ অবলম্বন করিয়াছ, সুতরাং নরমাংস তোমার খাদ্য; কিন্তু অন্যপথাবলম্বীর যাহা খাদ্য নহে, তুমি তাহাকে তাহা প্রদান করিলে কেন? ইহাতে তোমার বিলক্ষণ ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে। তুমি কি মনে কর, অঘোরপন্থী না হইলে কেহ সিদ্ধ হইতে পারে না? এ তোমার নিতান্ত ভুল। পথ কিছুই নহে, উপায়মাত্র। সিদ্ধিলাভ স্বতন্ত্র কথা। আমরা যে চারি জন এখানে আছি, আমরা কি এক পথ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়াছিলাম? কেহ বৈষ্ণব, কেহ অন্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ
২য় ভাগ, ২৮৩ পৃষ্ঠা।

করিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে সকলেরই এক পথ ও এক উদ্দেশ্য। সুতরাং এক্ষণে কোন প্রণালীই আর নাই।" গোস্বামী মহাশয় যোগীদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, ভৈরবকে প্রবোধ করিতে যোগিবর সেই জিজ্ঞাসারই উত্তর দান করিলেন। যোগীরা যে বাহ্য দুটি নেত্রের ন্যায় ললাটাভ্যন্তরস্থ তৃতীয় নেত্রে সকলই জানিতে পারেন ও দেখিতে পান, এই ঘটনা তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তাহার পর যোগিগণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত, যে প্রকার আলাপ করিলেন, তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর সমুদায় দেশের সমুদায় ঘটনা বলিলেন। গোস্বামী মহাশয় সংবাদপত্রপাঠে যাহা অবগত এবং পরম্পরায় যাহা শ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তৎসমুদায়ের ঐক্য হওয়ায় তিনি বিস্মিত হইলেন। জঙ্গলময় নিবিড় পার্ব্বত্য প্রদেশে সংবাদপত্র দূরে থাকুক, সাংসারিক লোকজনেরও গতায়াত নাই। বিশেষ, পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস, ও উপস্থিত ঘটনার সংবাদ, পাঠক যাহা অবগত নহেন, যোগিগণ তাহা জানেন, ইহা যে দিব্যচক্ষুর ফল তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভৈরব যখন পাথর ছুঁড়্তে লাগ্লেন, আপনারা কি কর্লেন? উহা কি আপনাদের গায়ে লেগেছিল?

ঠাকুর। **ভৈরব ভয়ঙ্কর চীৎকার ক'রে গালি দিতে দিতে ঢিল ছুঁড়্তে লাগ্লেন, তখন সঙ্গের ব্রাহ্মবন্ধুটি দৌড়ে পালালেন। আমার গায়ে ঢিল পড়্তে লাগ্ল। পায়ে একই স্থানে দু'টি ঢিল পড়াতে ক্ষত হ'য়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়্তে লাগ্ল। আমি পা ঝাড়া দিয়ে সেই স্থানেই দাঁড়ায়ে জোড়হাতে একদৃষ্টে ভৈরবের দিকে তাকায়ে রইলেম। ভৈরব তখন অবাক্ হ'য়ে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই অবসরে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়্লাম। তখন তিনি খুব আদর ক'রে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে পাহাড়ের একটা নির্জ্জন স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভৈরব আমাকে একখানা পোড়া হাতের চেটো এনে খেতে দিয়ে বল্লেন, "মহাপ্রসাদ পাইয়ে।" হাতের চেটো তাঁদের খুব সম্মানের আহার। আমি মাংস খাই না ব'লে উহা পরিত্যাগ করাতে তিনি বড়ই দুঃখিত হলেন। পরে আমাকে মহাপুরুষদের নিকটে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি এক ঘরের চার কোণে চারিটি মহাত্মা সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে আছেন। তাঁরা পূর্ব্বে একজন আচারী, একজন অঘোরী, একজন কাপালী ও একজন নানকপন্থী এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ পথাবলম্বী ছিলেন। গয়ার গম্ভীরনাথজীও তাঁদেরই মধ্যে একজন। পরমানন্দে শান্তিতে তাঁরা সকলে একই স্থানে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'লো।**

আমি, ঠাকুরের কথামত, তৃতীয় ভাগ ব্রহ্মাণ্ডবেদের ১৭৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুরের দীক্ষা বিষয়ে কাঙ্গালের লেখা পড়িতে লাগিলাম।

অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে, একদা জনরব উঠিয়াছিল, অসাম্প্রদায়িক ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এই জনরব একেবারে মূলশূন্য নহে। গোস্বামী মহাশয় দারজিলিঙ্গের বনপ্রান্তরে ষটচক্রভেদী কোন যোগীর

সাধন দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, নর্ম্মদাতীরস্থ উক্ত ষটচক্রভেদী যোগীর গুরুদেবকে দর্শন করিতে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাবশতঃ তথায় গমন না করিয়া গয়াধামস্থ ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে উপস্থিত এবং তত্রত্য বৈষ্ণব মহান্তের নিকটে সাধনশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বিলাসবেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিবেশে তত্রত্য আশ্রমের মহান্ত পরমহংসের নিকটে প্রায় নয় মাসযাবৎ জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের পদ্ধতি অনুষ্ঠানসহকারে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনের ধনকে এত করিয়াও হৃদয়মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া, এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে হতচৈতন্য অবস্থায় কয়েকদিন পড়িয়াছিলেন। অনন্তর স্পর্শানুভাবে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, জনৈক পরমহংসের ক্রোড়ে শায়িত আছেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্রোড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই অপরিচিত পরমহংসের চরণে প্রণত ও লুণ্ঠিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনার আশ্রমে লইয়া চলুন, এবং আমি যাহাতে সাধনের ধনকে হৃদয়মাঝে দেখিতে পাই, সেই উপদেশ করুন্; আমি গৃহাশ্রমে আর প্রতিগমন করিব না।" পরমহংসপ্রবর বলিলেন, "বৎস! স্থির হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং অনাথা শ্বশ্রূ তোমার আশ্রিত; তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইবে, এবং কিছুই সাধন করিতে পারিবে না।" গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত বহুদূরস্থ নির্জ্জন পর্ব্বতবাসী তাহা কিরূপে জানিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই নিমিত্ত বিস্মিতনেত্র হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে আবার আর একটি কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন যে, পরমহংস হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তোমরা অনেকে মিলিয়া একখানি গৃহ 'উছাইয়া' ফেলিয়াছ; গৃহখানি পুনরায় ছাইতে পারেন, এমন একটি লোকও তোমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। যেমন উছাইয়াছ, তদ্রূপ ছাইবার উপায় কর; নতুবা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইবে।" গোস্বামী মহাশয় পরমহংসের নিগূঢ় উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিলেন, "ভগবন্! সে সাধ্য আমার কিছুই নাই। সাধ্য লাভ করিতেই এতাদিন আশ্রমে বাস করিলাম এবং এক্ষণে আপনার অনুগামী হইতে চাহিতেছি।" পরমহংসদেব কহিলেন, "আমি মানসসরোবরবাসী যোগী, তোমার নির্ব্বেদ জানিতে পারিয়া তিব্বত দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই গয়াধামে উপস্থিত হইয়াছি, ভয় নাই। আমি যে উপদেশ দান করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, গৃহখানি যেমন ছিল নূতন ছাউনীতে আবার তদ্রূপই হইবে।" তিনি এই কথা বলিয়া, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সাধনোপযোগী সহজ প্রাণায়াম শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "আমি অদ্যহইতে তোমার সাধনসহায় হইলাম। যিনি যে কোন দেশে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাধন করেন, আমি তাঁহাদেরই সহায়তা করিয়া থাকি।" এবম্প্রকার নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর গোস্বামী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, তিনি সামান্য পরমহংস নহেন। তাঁহার যে শরীর প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাও জড়ময় দেহ নহে। পরমহংসপ্রবর

ব্রহ্মাণ্ড বেদ
৩য় ভাগ, ১৭৮ পৃষ্ঠা
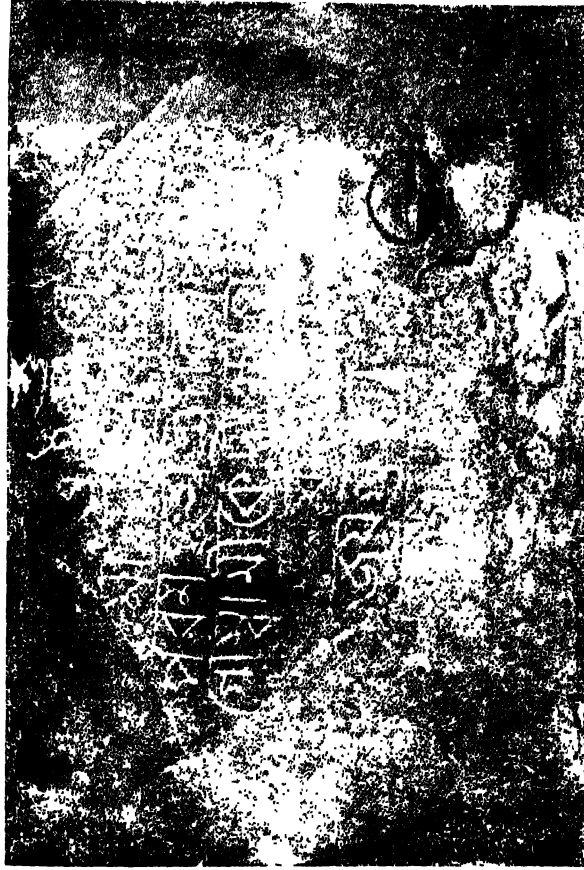
গযাধামস্থ

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাস্থান।

মাঠাকুরাণীর (শ্রীশ্রীমতি যোগমায়া দেবী) সমাধি মন্দিব
সেই আম্রবৃক্ষ যাহা হইতে মধুক্ষরণ ও রক্তপাত হইয়াছিল
গোস্বামী প্রভুর সাধন-কুটীর, গেন্ডারিয়া আশ্রম

সূক্ষ্ম শরীরে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন। অতএব তদীয় শিক্ষাসাধন শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনপ্রার্থী পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে প্রাণায়ামশিক্ষাসহকারে লোকদিগকে সাধন প্রদান করিতেছেন, তাহাতে জ্ঞানসাধনের সহিত যোগ ও ভক্তি সাধন সংযুক্ত আছে। সুতরাং উক্ত সাধনপ্রণালী চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত সাধনপ্রণালীর সম্পূর্ণানুরূপ এবং অতিশয় সহজ ও বিষয়ী লোকের অবসরোপযোগী। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডবেদে প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী দুর্ব্বোধ্য মনে করিবেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। আমরা উক্ত প্রণালী অবলম্বী ৩/৪ জনকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছি এবং গোস্বামী মহাশয়ের উপদেষ্টা পরমহংসপ্রবর যে সাধনার্থীসহায় হইয়া থাকেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে কেবল বুঝিতে পারিয়াছি তাহা নহে, কখন কখন প্রত্যক্ষও করিয়াছি।

নানাস্থানে ঠাকুরের মন্ত্রলাভ। বিবিধপ্রকার সাধন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষা। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা।

ব্রহ্মাণ্ডবেদপাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার দীক্ষাদি সম্বন্ধে কাঙ্গাল যেরূপ লিখেছেন তাহা কি ঠিক?

ঠাকুর বলিলেন—**অনেকটা ঐরূপই বটে। তবে স্থানে স্থানে গোলমালও আছে।**

ইহার পরে সতীশ, শ্রীধর এবং আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথায় কথায় তাঁহার মন্ত্রলাভ ও সাধনাদি বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে ঠাকুর যেরূপ বলিলেন, যথাসাধ্য লিখিয়া রাখিতেছি—

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—**ছেলেবেলা মাঠাকুরাণীর সঙ্গে আমাকে শিষ্যবাড়ী যেতে হ'তো। আমাদের কুলপ্রথা অনুসারে তখন মাঠাক্‌রুণই আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। উপনয়নের পর আমি খুব নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌তাম। কিছু কাল পরে টোলে সংস্কৃত প'ড়ে, বেদান্তের আলোচনায় আমার অদ্বৈত মত দাঁড়াল। আমি অমনি উপবীতটি ত্যাগ কর্‌লাম। চার দিকে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। মাঠাক্‌রুণ আত্মহত্যা কর্‌তে প্রস্তুত হলেন। কি করি? মা'র কথায় আবার উপবীত গ্রহণ কর্‌লাম। তখন পর্য্যন্ত আমি ব্রাহ্মসমাজে যাই নাই। তার পর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে মনে লাগ্‌ল উপবীত জাতিভেদের চিহ্ন, উহা ধারণ করা মহা অপরাধ। অমনি আবার উপবীত ত্যাগ কর্‌লাম। মাঠাক্‌রুণকে জানালাম—যদি তিনি এবারও আমাকে উপবীত গ্রহণ কর্‌তে জেদ করেন, আমি আত্মহত্যা করব। মাঠাক্‌রুণ আর কিছু বল্‌লেন না। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে রীতিমত উপাসনাদি কর্‌তে লাগ্‌লাম, আর নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ কর্‌লাম। তখন আমার একটা বিশ্বাস ছিল, যিনি আমার বক্তৃতা শুন্‌বেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌বেন।**

একবার, ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে যখন আমি ছিলাম, এক দিন গভীর রাত্রিতে ব'সে

উপাসনা কর্‌ছি; একটু নিদ্রাবেশ হ'লো। হঠাৎ দ্বারে ঘা পড়্‌ল। অমনি দোর খুল্‌লাম, দেখি 'বিলকুল' মহাপ্রভুর দল; ঘরটি ভ'রে গেল; বিদ্যুতের মত আলো। অদ্বৈতপ্রভু আমাকে বল্‌লেন—'আমি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ, অদ্বৈত আচার্য্য। ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, আর ইনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রণাম কর। ইনি তোমাকে মন্ত্র দিবেন; স্নান ক'রে এসো।' আমি তিন প্রভুকে নমস্কার ক'রে বস্‌তে আসন দিলাম। পরে পাতকূয়ায় গিয়ে স্নান ক'রে এলাম। মহাপ্রভু আমাকে নাম দিলেন। আমি চেতনাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। সকালবেলা ঘুম হ'তে উঠে সবগুলি ঘটনা পরিষ্কার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লাম—বুঝি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু ঘরে আসন পাতা রয়েছে, আর কূয়ার পাড়ে ভিজা কাপড় আছে দেখে, সে সংশয় দূর হ'লো। তখন মনে কর্‌লাম—আমি কেমন ব্রাহ্ম, তাহাই পরীক্ষা কর্‌তে কতকগুলি 'স্পিরিট' এসেছিল। তখন ত জানি না, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাই ঐ নামও ধামাচাকা রইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতিমত উপাসনা ক'রে নানাপ্রকার অবস্থা আমার ভিতরে প্রকাশ হ'তে লাগ্‌ল। অপ্রাকৃত দর্শন শ্রবণাদিও সবই হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হ'তো না। হয় আর যায়, এমনি অবস্থা। সত্য বস্তু প্রকাশ হ'লে তাহা আবার যায় কেন, এই সংশয় আমার উপস্থিত হ'লো। তখন সত্য বস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হ'লাম। অনেক ঘুর্‌লাম; কোথায় কি আছে প্রত্যক্ষ কর্‌তে কবিরপন্থী, দাউদপন্থী, গোরখপন্থী, সুন্দরপন্থী, বাউল, দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ কর্‌লাম। একটি একটি ক'রে তাঁদের প্রণালীমত সাধন ক'রে, কোন্ সম্প্রদায়ে কতদূর কি আছে দেখে নিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হ'লো না। আমি যাহা চাই, তাহা কোথাও পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি বাউলদের ভিতরেও প্রবেশ করেছিলেন? তাঁদের সাধন কিরূপ?

ঠাকুর। সে এক বিষম কাণ্ড। আমি তো বিপদেই পড়েছিলাম। বাউলসম্প্রদায়ে, অনেক স্থলে বড়ই জঘন্য ব্যাপার। তা আর মুখে আনা যায় না। ভাল ভাল লোকও বাউলদের মধ্যে আছেন। তাঁরা সব চন্দ্রসিদ্ধি করেন। শুক্র চান্, শনি চান্, গরল চান, উন্মাদ চান্, এই চার চান্ সিদ্ধি হ'লেই মনে করেন সমস্ত হ'লো। শরীরের পূয, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র কিছুই তাঁরা ফেলেন না, সবই খান। এক দিন একটি বাউলকে আমরক্ত বিষ্ঠা খেতে দেখে, খুব বিরক্তি প্রকাশ কর্‌লাম। আখ্‌ড়ার মহান্ত শুনে আমাকে শাসন ক'রে বল্‌লেন, 'তোমাকে উন্মাদ চান্, গরল চান্ সিদ্ধি কর্‌তে, বিষ্ঠা মূত্র খেতে হবে।' আমি বল্‌লাম, 'ওটি আমি পার্‌ব না। বিষ্ঠা মূত্র খেয়ে যে ধর্ম্ম লাভ হয়, তা আমি চাই না।' মহান্ত খুব রেগে উঠে বল্‌লেন, 'এতকাল তুমি আমাদের সম্প্রদায়ে থেকে আমাদের সমস্ত জেনে নিলে, আর এখন বল্‌ছ সাধন কর্‌ব না! তোমাকে ওসব সাধন কর্‌তেই হবে।' আমি বল্‌লাম, 'তা কখনই কর্‌ব না।' মহান্ত শুনে গালি দিতে দিতে আমাকে মার্‌তে এলেন; শিষ্যেরাও 'মার্ মার্' শব্দ ক'রে এসে পড়্‌ল। আমি তখন খুব ধমক্ দিয়ে বল্‌লাম, 'বটে, এতদূর আস্পর্দ্ধা, মার্‌বে? জান আমি কে?

আমি শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমাকে বল্‌ছ বিষ্ঠা মূত্র খেতে?' আমার ধমক খেয়ে সকলে চম্‌কে গেল। মহান্ত খুব কাতর হ'য়ে এসে নমস্কার ক'রে করজোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভো! আপনি গোস্বামী সন্তান, অদ্বৈত প্রভুর বংশ, আমি জান্‌তাম না। বড় অপরাধ করেছি দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' আমি তখনই ওখান থেকে চলে এলাম। ঊর্দ্ধরেতা হওয়াই ওদের সাধনের লক্ষ্য। সেরূপ লোকও বাউলদের ভিতরে আছেন।

প্রশ্ন। ব্রহ্মোপাসনা ক'রেই যখন ধীরে ধীরে আপনার সমস্ত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছিল, তখন আবার গুরুর প্রয়োজন মনে কর্‌লেন কেন?

ঠাকুর। প্রকাশ হ'লে কি হবে? স্থায়ী তো হ'তো না। এক দিন মেছোবাজার ষ্ট্রীটে একটি মহাপুরুষের দর্শন পাই। তাঁকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলে বলায় তিনি বল্‌লেন, 'অনেক অবস্থাই প্রকাশ হ'তে পারে; তাতে কি হ'লো? থাকে না তো। যথাশাস্ত্র গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না কর্‌লে, কোন অবস্থাই স্থায়ী হবে না—তিনি একদিন হঠাৎ এসে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিলেন; পরে যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন, 'ঘরখানা তো বেশ প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আল্‌গা খুঁটির উপরে, ভিত্তিশূন্য—দাঁড়াবে কি প্রকারে? গুরু নাই; এ কখন টিক্‌বে না।' আমি এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি পিঠে চাপড় মেরে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বাচ্চা, ঘাবড়াও মৎ। গুরু তোমারা হ্যায়, বখত্‌মে মিল যায়েগা।' আমি স্থির থাক্‌তে না পেরে, বিন্ধ্যাচলে, তিব্বতে, হিমালয়ে, বহুস্থানে পাহাড় পর্ব্বতে গুরুর অনুসন্ধান কর্‌লাম। কোথাও গুরু পেলাম না। সকল মহাপুরুষই একই কথা বল্‌লেন, 'গুরু তোমার ঠিক আছে; সময়ে পাবে।' অবশেষে গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে কিছুকাল রইলাম। এক দিন ঐ পাহাড়ের উপরে নিরিবিলি একটি স্থানে একাকী ব'সে আছি; গুরু লাভ হ'লো না ভেবে, নৈরাশ্যে মনকষ্টে মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়লাম। জ্ঞান হ'লে পরে, দেখি, একটি মহাপুরুষের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমার গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। আমি অমনি উঠে তাঁর চরণে প'ড়ে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,'আপনি কে? কখন এখানে এসেছেন?' তিনি বল্‌লেন, 'আমি পরমহংস, মানসসরোবরে থাকি। তোমার এই ক্লেশের অবস্থা দেখে, তোমাকে দীক্ষা দিতে এইমাত্র এখানে এসেছি।' আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'এইমাত্র কি প্রকারে আপনি মানসসরোবর হ'তে এলেন?' পরমহংস বল্‌লেন, 'যোগীরা তা পারেন। যোগীরা দেহের পঞ্চভূতকে পঞ্চভূতে মিলায়ে দিয়ে, চৈতন্যমাত্র অবলম্বন ক'রে যথা ইচ্ছা যেতে পারেন, পরে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই পঞ্চভূতকে আকর্ষণ ক'রে আবার স্থূল দেহ ধারণ করেন। যোগীদের এসব ক্ষমতা আছে। আমার এই যে স্থূল দেহ দেখ্‌ছ ইহাও ঐরূপ।' এই প্রকার অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। দীক্ষা গ্রহণের পরে কি কর্‌লেন?

ঠাকুর। দীক্ষাগ্রহণমাত্রই আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হ'লো। চৈতন্য হ'লে পর, চারি দিকে

চেয়ে দেখি পরমহংস নাই। আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। ভাল ক'রে চোখ্ মেল্‌তে পার্‌লাম না। ঢুলু ঢুলু অবস্থায় কোন প্রকারে বাবাজীর আশ্রমে নেমে এলাম। গোফার ধারে বেলগাছের নীচে বড় পাথরের চটাংখানার উপরে ব'সে পড়্‌লাম। এগার দিন এগার রাত্রি একই অবস্থায় কেটে গেল। সে সময়ে বাবাজী খুব যত্নের সহিত আমার দেহটি রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে বড়ই ভাল বাস্‌তেন।

প্রশ্ন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও নাকি আপনাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন?

ঠাকুর। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। সে বহুকাল পূর্ব্বে। একবার কাশীতে গিয়ে একমাস ছিলাম। কেদারঘাটের নিকটে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, লোকনাথ বাবুর বাসায় উঠেছিলাম। তিনি খুব আগ্রহ ক'রে আমাকে তাঁর বাসায় থাক্‌তে বল্‌লেন। আমি বল্‌লাম, 'আপনাদের খুব অসুবিধা হবে। আমি সারা দিন রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াব; প্রয়োজনমত বাসায় আস্‌ব। দিনে রাত্রে কখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার কর্‌তে পার্‌ব না। আর ঘরও আমার একখানা প্রয়োজন হবে; তাতে অন্য লোক থাক্‌লে চল্‌বে না।' লোকনাথ বাবু, আমার সমস্ত কথায় রাজি হ'য়ে, তাঁর বাসায় থাক্‌তে জেদ কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমাকে একখানা নির্জ্জন ঘর দিলেন। আমি দিনে রাত্রে ইচ্ছামত ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম; প্রয়োজন মত বাসায় আস্‌তাম। অধিকাংশ সময়ই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটে থাকতাম। প্রথম প্রথম কয়দিন তিনি আমাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। গায়ে কুকুরের বিষ্ঠা, ময়লা, কাদা মেখে থাক্‌তেন, নিকটে গেলে উহা ছুড়াতেন। পরে নাছোড়বান্দা দেখে, খুব আদর কর্‌তেন, যাওয়ামাত্রই কাছে বসতে বল্‌তেন। বেলা অধিক হ'লে, ক্ষুধা পেয়েছে কি না ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা কর্‌তেন; নিকটে যাঁরা থাক্‌তেন তাদের কিছু খাবার আন্‌তে বল্‌তেন। একজনকে খাবার আন্‌তে একটু ইঙ্গিত করামাত্র পাঁচ ছয় জন দৌড়াতেন। প্রচুর পরিমাণে খাবার আস্‌তো। আমার মত খাবার রেখে, অবশিষ্ট স্বামিজীকে খেতে বল্‌তাম। তিনিও আমাকে উহা মুখে তুলে দিতে ইঙ্গিত কর্‌তেন। আমি মুখে তুলে দিতাম। তিনি বেশ খেতে পার্‌তেন। শরীর খুব সবল ও সুস্থ, ডনগিরের মত ছিল। কখন কখন তিনি কেদারঘাটে গঙ্গায় প'ড়ে ডুব দিতেন, একেবারে মণিকর্ণিকায় গিয়ে ভুস্ ক'রে ভেসে উঠ্‌তেন। আমি তখন গঙ্গার পাড়ে পাড়ে দৌড়াতাম।

এক দিন দেখি, তিনি একটি কালীমন্দিরে গিয়ে কালীর সম্মুখে দাঁড়ায়ে প্রস্রাব কর্‌ছেন, আর গণ্ডূষে গণ্ডূষে ঐ প্রস্রাব নিয়ে 'গঙ্গোদকং, গঙ্গোদকং' ব'লে কালীর গায়ে ছিটায়ে দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'এ কি কর্‌ছেন?' বল্‌লেন, 'পূজা'। আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'এই পূজার দক্ষিণা কি?' উত্তর দিলেন 'যমালয়'। রাত্রিতে অনেক সময়েই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকটে থাক্‌তাম। তিনি আমাকে নানাপ্রকার অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য দেখাতেন। একদিন বল্‌লাম, 'আপনি আমাকে এত দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমার কিছুই বিশ্বাস হয় না। দয়া ক'রে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন বিশ্বাস হয়।' তিনি আমাকে স্নান ক'রে আস্‌তে বল্‌লেন। রাত প্রায় একটা, ভয়ানক শীত, আমি ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লাম। অমনি তিনি আমার

ঘাড়টি ধ'রে, আল্‌গা ক'রে তুলে নিয়ে ঝুপ ক'রে গঙ্গায় চুবায়ে নিলেন। পরে আমার মাথায় হাতখানা রেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বিশ্বাস বন যায়।' সেই দিন থেকে সত্য বিষয়ে আর আমার সংশয় হয় নাই। আশ্চর্য্য! আমাকে তিনি মন্ত্র দিতে চাইলেন। আমি বল্‌লাম, 'আমি আপনার নিকটে মন্ত্র নিব কিরূপে? আপনি সাকার উপাসক, দেখ্‌ছি আপনি ১০০টি বেলপাতা ও গঙ্গাজল শিবের মাথায় চড়ান, শিবপূজা করেন, আর আমি নিরাকার ব্রহ্মোপাসক। আমি আপনাকে গুরু করব না।' তিনি সাবলম্ব ও নিরবলম্ব উপাসনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। পরে বল্‌লেন, 'নল রাজাকে যেমন সর্পে দংশন করেছিল, আমিও সেই প্রকার তোমাকে একটু স্পর্শ ক'রে রাখ্‌ছি। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আমি তোমার গুরু নই; তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট আছেন। তিনিই তোমাকে যথাসময়ে দীক্ষা দিবেন।' এই ব'লে তিনি আমার কাণে তিনটি মন্ত্র দিলেন। একটি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্র পূর্ব্বে মাঠাক্‌রুণও আমাকে দিয়েছিলেন। অপরটি সর্ব্বদা জপ করতে, ভগবানের নাম। আর একটি আপৎবিপদে পড়্‌লে জপ কর্‌তে বল্‌লেন। পরমহংসজীর নিকটে দীক্ষালাভের পর যখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'লো, প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে, হাতের তেলোতে লিখে, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'ইয়াদ হ্যায়?'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'ত্রৈলঙ্গ স্বামী না মৌনী ছিলেন?'

ঠাকুর। হাঁ; কথা বল্‌তেন না, ইঙ্গিতে সব জানাতেন, কখন কখন লিখেও দিতেন। রাত্রে অনেক সময়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেন। তখন তিনি অজগর-ব্রত নেন নাই। শেষকালে অজগর-ব্রত নিয়ে সমস্তই ছেড়েছিলেন। কোন প্রকার ইঙ্গিতও কর্‌তেন না। এক স্থানেই ব'সে থাক্‌তেন। শরীর স্থূল হ'য়ে পড়্‌ল; বাত হ'লো। তার উপরে তাঁকে জীবন্ত শিব মনে ক'রে সকলে তাঁর মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। রাত চারটা হ'তে বেলা বারটা পর্য্যন্ত পৌষ-মাঘের শীতেও এই জলঢালার বিরাম ছিল না। দেহের ধর্ম্ম—শেষকালে ঘা হ'য়ে দেহটি পচে পচে গেল। এক ভাবে, নির্ব্বিকার অবস্থায় থেকে, দেহটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল-সমাধি দেওয়া হয়।

মহাদেবের শিরোবস্ত্র। এ সাধন বৈদিক।

এবারে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ঠাকুরের মাথার চুল প্রায় ৬/৭ ইঞ্চি লম্বা দেখিতেছি। এত বড় চুল ঠাকুরের মাথায় আর কখনও দেখি নাই। যমুনাতে স্নান করিয়া মাথার চুল প্রত্যহ একই প্রকারে একখানা গৈরিক ন্যাক্‌ড়ার দ্বারা বাঁধিয়া রাখেন। কপালের উপরের সমস্ত চুল উভয় কপাটির ধারহইতে তালুপর্য্যন্ত জড়াইয়া ন্যাক্‌ড়াখানি মাথার দুই দিকে লইয়া যান; পরে উভয় কর্ণের উপরিভাগে সমান পরিমাণে দুই গোছা চুল ঐ ন্যাক্‌ড়া দ্বারা বেষ্টন করিয়া পশ্চাৎ দিকের নিম্নভাগের চুলগুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া রাখেন। ব্রহ্মতালুর দুই পার্শ্বের আলগা চুল পশ্চাদ্দিকের অবশিষ্ট চুলের সহিত আপনা আপনি জড়াইয়া পড়িতেছে। তাহাতে

ঠাকুরের মস্তকে সর্ব্বসমেত ৫টি জটার সৃষ্টি হইয়াছে।

গৈরিক ন্যাক্‌ড়াখানা অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া বলিলাম—এই গৈরিক ন্যাক্‌ড়াখানা ফেলিয়া একখানি নূতন গৈরিক ন্যাক্‌ড়া নিলে হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—**রাম, রাম! তা হয় না। এখানা সাধারণ ন্যাক্‌ড়া নয়, মহাদেবের মাথার বস্ত্র। আমাকে মাথায় বেঁধে দিয়েছিলেন।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কবে, কোন স্থানে বেঁধে দিয়েছিলেন?

ঠাকুর বলিলেন—**শ্রীবৃন্দাবনে আস্‌বার সময়ে কাশীতে বিশ্বেশ্বরদর্শনে গিয়ে ছিলাম, সেখানে মন্দিরে আমাকে এই বস্ত্র মাথায় জড়ায়ে দিলেন।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাদেবই কি এই সাধন মার্গের প্রবর্ত্তক?

ঠাকুর বলিলেন—**মহাদেব এ সাধনের প্রবর্ত্তক নন; তিনিও এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হন। বেদে এই সাধনের বিষয় উল্লেখ আছে। অনেক যোগী ঋষি ইহা অবলম্বন ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুকাল নিয়মমত এই সাধন কর্‌তে পার্‌লে ইহার উপকার উপলব্ধি হয়। বীর্য্যধারণের সঙ্গে এই প্রাণায়াম ও কুম্ভক, ছয়টি মাস কর্‌লে অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণায়ামের ফল লাভ কর্‌তে পারা যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে পার্‌লে আর কিছুরই দরকার হয় না। উহাতে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি সমস্তই হ'য়ে পড়ে। ভিন্ন চেষ্টাও কর্‌তে হয় না। এই পথের মত এমন সহজ পথ আর নাই। শুধু শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে পার্‌লেই সমস্ত অবস্থা লাভ হয়, আর কিছুই কর্‌তে হয় না।**

আমি বলিলাম—প্রাণায়ামের প্রণালী অনেক রকম আছে শুন্‌তে পাই, আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় কোনও শাস্ত্রে আছে কি?

ঠাকুর। **শাস্ত্রে আটপ্রকার প্রাণায়ামের প্রণালী প্রকাশ ক'রে লিখে গেছেন; কারণ, প্রথম শিক্ষার্থীদের উহাই প্রয়োজন। আমাদের এই প্রাণায়ামের বিষয় অতি সঙ্ক্ষেপে কোনও কোনও তাপনীতে, উপনিষদে উল্লেখমাত্র আছে। ইহা সিদ্ধগুরুর নিকটে শিক্ষা করবে, শাস্ত্রে এরূপ সঙ্কেত ক'রে গেছেন। চিরকালই ইহা সিদ্ধ মহর্ষিদের ভিতরে অতি গোপনে চ'লে আস্‌ছে। শাস্ত্র দেখে ইহা অভ্যাস কর্‌তে গেলে হঠাৎ মৃত্যুও হ'তে পারে। এই প্রাণায়াম দেখাদেখি চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে অনেকে দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই জন্য এবং আরও অনেক কারণে, চিরকালই ইহা অতিগোপনে আছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্র দেখেই সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই প্রাণায়াম দিয়ে থাকেন। অন্যান্য কুম্ভক প্রাণায়ামাদিতে যে সকল ফল লাভ হয়, এই প্রাণায়াম ঠিক নিয়মমত অল্পকাল অভ্যাস কর্‌লেই, সেই সব ফল লাভ হ'য়ে থাকে।**

আমি। আমাদের এই সাধন কি তান্ত্রিক না বৈদিক? কোন্ কোন্ ঋষি এই সাধন প্রথমে অবলম্বন করেছিলেন?

ঠাকুর। **এ সাধন আধুনিক নয়, ইহা বহু প্রাচীন বৈদিক সাধন। প্রথমে মহাদেব, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগীশ্বরেরা এই সাধন ক'রে সিদ্ধ হয়েছিলেন।**

আমি। সাধনের সময়ে যে নানাপ্রকাব জ্যোতিঃ, আকৃতি বা ছায়া দর্শন হয়, ওসব কি? ঐ সময়ে কি কর্‌তে হয়?

ঠাকুর। **যা কিছু দর্শন হয় তারই খুব আদর কর্‌তে হয়, অনাদর কর্‌তে নাই। দর্শন হ'লে ওসকলের খুব ভক্তি ক'রে সম্মান ও পূজা কর্‌তে হয়।**

আমি। সাধন কর্‌তে কর্‌তে যে সকল অবস্থা লাভ হয়, কোনও প্রকার অপরাধে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হ'লে, আবার সাধন ক'রে সে সব কি লাভ করা যায়?

ঠাকুর। **হাঁ, খুব, খুব; ঠিক রীতিমত সাধন কর্‌লে পুনরায় তা লাভ হয়।**

আমি। আমার কি বিশেষ কল্যাণ কর্‌তে, আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে আন্‌লেন?

ঠাকুর। **বিশেষ কল্যাণ কি হ'লো তা কি আর সহজে বুঝা যায়? পরে সব বুঝ্‌বে।**

মাঠাকুরাণীর পতিপূজা। ববাহের দন্ত।

শুনিলাম গত বৎসর ঠাকুর চার পাঁচ মাস কলিকাতায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন। পরে কোন কারণে মাঠাকুরাণীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় কাশীধামে পঁহুছিয়া প্রায় মাসাধিক কাল রহিলেন। এই সময়ে আমার অনুপস্থিতকালে কলিকাতা, শান্তিপুর ও কাশীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কয়েকটি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতার ডায়েরীতে এবং শ্রীধর, মাঠাক্‌রুণ ও সতীশ প্রভৃতির মুখে নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হইয়া সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া রাখিতেছি—

১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে, কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটের ৫০/১ নং বাড়ী, ঠাকুরের থাকিবার উদ্দেশ্যে চার মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হয়। তথায় তিনি শিষ্যগণ সহিতে সপরিবারে অবস্থিতি করেন। এই বাসায় মাঠাক্‌রুণ প্রত্যহ নির্জ্জনে ঠাকুরের চরণ পূজা করিতেন। দুর্ব্বা, চন্দন, ফুল, তুলসী প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুরের আসনঘরে প্রবেশ করিতেন। ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক একান্ত প্রাণে তাঁহার চরণে তুলসী চন্দনাদি অর্পণ করিতেন। পরে ঠাকুরের মস্তকে ফুল, তুলসী প্রদানান্তর তাঁহার ললাটদেশে চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া দিতেন। তৎপরে ঠাকুরের মুখে কিঞ্চিৎ মিষ্টি তুলিয়া দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। ঠাকুরও সেই সময়ে মাঠাকুরাণীর কপালে চন্দনের টিপ দিয়া, তাঁহার মস্তকোপরি করতল স্থাপন পূর্ব্বক, কিয়ৎকাল নিস্পন্দভাবে ধ্যানস্থ থাকিতেন। এই পূজা না করিয়া মাঠাক্‌রুণ কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। পূজা আরম্ভের প্রথম দিবসে দিদিমা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, মাঠাক্‌রুণ, ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পড়িয়া আছেন। আর ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া মাঠাকুরাণীর মস্তকোপরি চরণ দুটি ছড়াইয়া নিয়া, স্থিরভাবে রহিয়াছেন, উভয়েরই বাহ্য চৈতন্য শূন্যাবস্থা।

এই বাসায়ই তিনি তাঁহার জন্মদিন ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাস ধারণ পূর্ব্বক মুক্তকচ্ছ হইলেন। স্বহস্তে চিঠি-পত্র লেখা এই সময় হইতেই বন্ধ হইল। এই বাসায় নানা স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার ও উচ্চশিক্ষিত দেশমান্য ব্যক্তিগণ অলৌকিক প্রকারে ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন।

এই বাসায় অবস্থানকালে এক দিবস ভাবোন্মত্ত শ্রীধর অনুদয়ে স্নানান্তে বরাহরূপী ভগবানের দর্শন পাইয়া গঙ্গার ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উদয়াস্ত অনাহারে থাকিয়া কাশীপুর, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীর পাড়ে একটি পশুর অস্থি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। অমনি শ্রীধর উহা তুলিয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকটে আসিলেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর অস্থিটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই নেও তোমার দন্ত। ঠাকুর উহা হাতে লইয়া ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

দেহে অনাহত ধ্বনি।

এই বাসায় মাঠাক্‌রুণ ঠাকুরের নিকটে বসিয়া প্রায় সারারাত্রি তাঁহাকে বাতাস করিতেন। কখন কখন তিনি পদসেবা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া থাকিতেন। এক দিন মাঠাক্‌রুণ কথায় কথায় বৃন্দাবন বাবুকে বলিলেন যে, রাত্রিতে সময়ে সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শরীরহইতে একপ্রকার মধুর ধ্বনি বাহির হয়। উহা এতই সুমিষ্ট যে, শুনিতে শুনিতে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই কথা শুনিয়া ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিতে বৃন্দাবন বাবুর অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি অবসর বুঝিয়া গভীর রাত্রে ঠাকুরের আসন-ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তর কাণ পাতিয়া রহিলেন। একটু পরেই ঠাকুর মাথা তুলিয়া বলিলেন—**কি বৃন্দাবন?** বৃন্দাবন বাবু কহিলেন মশায়! শুনেছিলাম আপনার শরীর হ'তে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, উহাই শুন্‌তে এসেছি। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—**বেশ, শুন্‌লে তো?** বৃন্দাবন বাবু বলিলেন হাঁ, এই ধ্বনি শুনে আশ্চর্য্য হলেম্। এরূপ সুমধুর মনোহর ধ্বনি বোধ হয় জগতে আর নাই। এ কিসের ধ্বনি?

ঠাকুর বলিলেন—**ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। সাধকদের শরীর হ'তে এই শব্দ উত্থিত হয়। ইহা এতই মধুর যে, সাপে শুন্‌তে পেলে, একবারে সাধকের শরীরে উঠে পড়ে।**

এই সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন—"**তিনি কলিকাতায় আস্‌তে পারেন, তবে আমার এখানে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।**" গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ ভদ্রলোকটির বিবিধ সদ্‌গুণের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে তাঁহার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে কহিলেন—**যাঁদের সাধন হবার তাঁদের ঠিকই হবে। এরূপ কেহ যদি আমার নিকটে নাও আসেন, আমি তাঁর নিকটে যেয়ে দীক্ষা**

দিব। তিনি যদি আমাকে বাঁশ নিয়ে তাড়া করেন, মার খেয়েও তাঁকে দীক্ষা দিয়ে আস্‌ব।

সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর এক দিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, কুঞ্জবিহারী গুহ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণকে সঙ্গে লইয়া, আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনে গিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে খুব আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং শিষ্যগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমার ছেলেবেলা হ'তে গরীব লোকেরা কি ভাবে থাকে, উৎসবাদিতে কি করে, এসব জান্‌তে বড় ইচ্ছা হ'তো। তজ্জন্য অনেক সময়ে গোপনে ভিন্ন ভিন্ন বেশে তাদের বাড়ী যেতাম। তাদের অলক্ষিতে সমস্ত দেখে আস্‌তাম। এখন ভগবান দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থান ঘুরান। এই মাত্র তোমাদের আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে নানাস্থান ঘুরে এলাম। তাঁর অপার দয়া।

ঠাকুর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—**মানুষ মৃত্যুর পরে কোথায় যায়?** মহর্ষি বলিলেন—'কেন, যে সকল গ্রহ নক্ষত্র দেখ্‌ছ তাহাতে যায়।' পরলোক সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা কথার পর মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর সন্ধ্যার পর বাসায় আসিলেন।

জাতিভেদসম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়, বরিশালে যাইয়া তথাকার গুরুভ্রাতাদিগের নিকটে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, 'জাতিভেদ বুদ্ধি থাকিতে আমাদের কাহারও এই সাধনে কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না', ঠাকুর এই প্রকার বলিয়াছেন; এই কথা লইয়া বরিশালের গুরুভ্রাতাদের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়, এই বিষয় পরিষ্কার জানিবার অভিপ্রায়ে কুঞ্জ বাবুকে পত্র লিখিলেন; তিনি ঠাকুরকে ঐ পত্র শুনাইবামাত্র ঠাকুর তৎক্ষণাৎ কুঞ্জ বাবুর দ্বারায় নিম্নলিখিত চিঠি শিব বাবুর নিকটে পাঠাইলেন—

চিঠির নকল—

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯;
৫০/১,সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র গুহ
শ্রীচরণ কমলেষু,

জাতিভেদ সম্বন্ধে বরিশালে সম্প্রতি যে গোলযোগ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্তেশ্বর গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আমাকে যাহা বলিতেছেন তাহা লিখিতেছি ঃ—"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ; এই তিনটিই প্রকৃত

জাতি। এই তিন গুণ ত্যাগ না করিলে জাতি পরিত্যাগ করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে অভিমানই জাতি। এই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে, জাতি পরিত্যাগ হয় না। যাহার তাহার অন্ন ভোজন করিলেই জাতিভেদ যায় না। এইরূপ আচরণ জাতিভেদ ত্যাগের উপায় নয়। অভিমান পরিত্যাগ কর, সমদর্শী হও, জাতিভেদ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। যিনি যে সম্প্রদায়ে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের আচার-পদ্ধতি অনুসারে চলিবেন। অবস্থা না হইলে, দেখাদেখি কোন কার্য্য করিবেন না। সাধনোদ্দেশে জীবন গঠনে, যেরূপ জীবন হইবে বাহিরে তাহাই প্রকাশ পাইবে। ভিতরে ও বাহিরে এক হওয়াই প্রকৃত জীবন। অতএব বিপক্ষে না চলিয়া সাধনের পক্ষে অগ্রসর হও। ইতি—

সেবকাধম
শ্রীকুঞ্জবিহারী গুহ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ লিখিয়াছেন—'সুকিয়া ষ্ট্রীটে, ঠাকুরের বাসা-বাড়ীতে এক দিন মধ্যাহ্নে ওখানকার সমস্ত গুরুভাই ও বিলাত হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় প্রভৃতির খাওয়ার নিমন্ত্রণ হয়। আমরা সকলে একসঙ্গে নীচের ঘরের বারেন্দায় আহার করিতে বসি। ইতিমধ্যে জাতিভেদের কথা উঠিল; ঠাকুর বলিলেন—**গুরুগৃহে এক পংক্তিতে আহারে দোষ নাই। আমি যদি তোমাদের দেশে যাই, তখন এরূপ কর্‌বে না। সকলকে সামাজিক নিয়মানুসারে চল্‌তে হবে।**'

ঠাকুরের ষ্টার-থিয়েটার দর্শন।

একদিন 'ষ্টার-থিয়েটারের' শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'চৈতন্যলীলা' দেখিবার জন্য সশিষ্য ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর যথাসময়ে সকলকে সঙ্গে লইয়া নাট্যশালায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় খুব সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে বসাইলেন। ঠাকুর অভিনয় দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী।
মাধব-মন মোহন, মোহন মুরলিধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।
ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন;
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা,
রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী,

শ্যাম রাস-রস-বিহারী
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার।

এই গানটি আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। **'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন'** বলিতে বলিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন ভাবে বিভোর গুরুভ্রাতাগণও দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিয়া ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'গোলমাল হচ্ছে, গোলমাল হচ্ছে; থেমে যাও, থেমে যাও' ইত্যাদি শব্দও স্থানে স্থানে উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে অমৃতলাল বসু মহাশয় উপস্থিত হইয়া, আজ আমার থিয়েটার করা সার্থক হইল, আজ আমি ধন্য হইলাম এইরূপ নানাপ্রকার বাক্য পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরে করতালি সংযোগে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া অভিনেত্রীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি আবার গান আরম্ভ হইল।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
গোপীগণ-মনোমোহন, মঞ্জু কুঞ্জচারী।।
জয়রাধে, শ্রীরাধে।
ব্রজবালকসঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,
উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।
দৈত্যছলন, নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী,
ব্রজবিহারী গোপনারী মান-ভিখারী।
জয়রাধে, শ্রীরাধে।।

এই সময়ে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ নৃত্য-গীতে দর্শক মণ্ডলীর চিত্তও অভিভূত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে নাট্য-মন্দিরে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। স্বামিজী হরিমোহন, ভাবাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর শ্রীধর ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কম্পিত কলেবরে বেহুঁস হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া উচ্চ হরিবোল বলিতে বলিতে বিবিধ প্রকার নৃত্য সহকারে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। ঠাকুরের বাহুসঞ্চালনপূর্ব্বক মধুর হরিধ্বনির তড়িৎঝঙ্কারে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। নাট্যাভিনয় স্থগিত রাখিয়া এই প্রকার বহুক্ষণ কীর্ত্তনোৎসব হইল। তৎপরে সকলে প্রহৃষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

বেশ্যাদ্বারা সমাজের পরিণাম।

কলিকাতার কোন একটি প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, বেশ্যা ছিলেন। তাহার একটি মাত্র মেয়ে ছিল, সে বেথুন স্কুলে পড়িত। ব্রাহ্ম-সমাজের কোন এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন--

বেশ্যার মেয়ে সমাজে নেওয়া কখনই উচিত নয়। ইহাতে সমাজ কলুষিত হয়। যদিও প্রথমে খুব ভাল এবং সচ্চরিত্রা দেখা যায়, কিন্তু সময়ে ভিতরের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

ঠাকুর এই বিষয় বুঝাইতে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' হইতে বেশ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

রোগ আপনিই সারে। অবিশ্বাসীর উপায় কি?

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উৎকট রোগে দীর্ঘকাল ভুগিয়া মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িলেন। অনেকেই তাঁহার জীবনে নিরাশ হইল। এক দিবস রাত্রিতে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। শ্রীশ তখন কাতর ভাবে সঙ্গীদের বলিলেন—'আমার এখনই মৃত্যু হইবে। এই সময়ে একবার দয়া করিয়া তোমরা ঠাকুরকে আনিয়া দেখাও।' শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ অমনি রাত্রি দু'টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে দৌড়িলেন। ঠাকুর, শ্রীশের কথা ও অবস্থা শুনিয়া বলিলেন—'**তাঁকে বল গিয়ে কোন ভয় নাই। অসুখ সেরে যাবে। অস্থির না হন।**'

কয়েক দিন পরে শ্রীশের অসুখ সারিয়া গেল। তখন ঠাকুর এক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময়ে শ্রীশকে দেখিতে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কুঞ্জ বাবুকে জ্বরে আক্রান্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—**তোমার চিকিৎসা এখন কে করেন?** কুঞ্জ বাবু একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকেব নাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন—**ডাক্তারের সাধ্য নাই যে, তোমার রোগ সারান। যখন সার্‌বে, আপনি সেরে যাবে। দেখ্‌লে ত, শ্রীশের রোগ কেহ সারাতে পার্‌লেন?**

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—আপনি ত বলেছেন যে, ঔষধ সেবনেও অনেক কর্ম্মভোগ কেটে যায়।

ঠাকুর কহিলেন—**হাঁ, তা ঠিক।**

শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—আমার অবিশ্বাস ত কিছুতেই যায় না—কি করিব?

ঠাকুর। **যাঁহারা সাধন লাভ করেছেন, তাঁদের ভিতরে সকলেই কিছু না কিছু বিশ্বাসের জিনিস পেয়েছেন। অবিশ্বাসের সময়ে তাহা স্মরণ কর্‌লে ও ধ'রে থাক্‌লে বিশেষ উপকার হয়।**

আবার বলিলেন—**অবিশ্বাস কি প্রলোভনের সময়ে যদি ৫/৬টি নামও কর্‌তে পারা যায়, তা হ'লেও রক্ষা। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব তাও কেহ কর্‌তে পারে না।**

পীড়িত কুঞ্জ বাবু বলিলেন—আমি যে নাম কর্‌তেই পারি না।

ঠাকুর কহিলেন—**নাম করার ইচ্ছা হ'লেও হয়।**

কথায় কথায় ঠাকুর আবার বলিলেন—**আমাদের যে যোগ, তাহা নামের যোগ। গম্ভীরনাথ বাবার নিকটে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপের কথা শুনি। বিশ বৎসর পরে ঐ কথার অর্থ বুঝি। মাঝিমাল্লা ও সাধারণ লোকের মুখেও ত কতবার শুনেছি—**

মন পাগ্‌লা রে হরদমে গুরুজীর নাম লইও।
দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এক দিবসে হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ নাম নিতেন কিরূপে?

ঠাকুর বলিলেন—**এক লক্ষ উচ্চৈঃস্বরে, এক লক্ষ মনে মনে, আর এক লক্ষ তাঁর আত্মাতে আপনা আপনি হ'তো।**

কুঞ্জ বাবু লিখিয়াছেন, এই বাসায় থাকাকালীন অর্থের অতিশয় অনটন ছিল। বিছানার অভাবে মাঠাক্‌রুণ একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপরে বাহু উপাধানে শয়ন করিতেন। ঠাকুরের ব্যবহারে অতি অল্প মূল্যের একখানা দেশী কম্বল মাত্র ছিল। তিনি শয়নকালে গ্রন্থের উপরে একখানা বহির্ব্বাস বিছাইয়া তাহাতেই মাথা রাখিতেন। কুঞ্জ বাবু এক দিন একটি বালিশ প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য আনিয়া দিলেন। তাহাতে বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের সাক্ষাতেই কুঞ্জ বাবুকে উপহাস করিয়া বলিলেন—"উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন, তুমি ওঁর জন্য বালিশ এনেছ? বেশ, একখানা তোষক, একটি ছাতা আন্‌লে না কেন?" কুঞ্জ বাবু দুঃখিত মনে নীরব থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এই কথার পর ঠাকুর বোধ হয়, এই বালিশ আর ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু কুঞ্জ বাবুর একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া দয়াল ঠাকুর প্রতিদিনই শয়নের সময়ে উহা গ্রহণ করিতেন।

যে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা চা'র মাসের জন্য। নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, ঠাকুর সকলকে অল্প ভাড়ায় একখানা বাসা দেখিতে বলিলেন। অনুসন্ধানের পর গুরুভ্রাতারা আসিয়া জানাইলেন যে, অল্প ভাড়ায় বাড়ী জুটিতেছে না, তখন ঠাকুর কহিলেন—'**একখানা খোলার ঘর হ'লেও হয়।**' মণি বাবু বাড়ী ভাড়া করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

পরদিন সকালে প্রায় ৮টার সময়ে ঠাকুর শ্রীধরকে মাত্র সঙ্গে লইয়া হঠাৎ বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বেলা ১০টার সময়ে বাসায় খবর আসিল—তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া, অকস্মাৎ এই ভাবে ঠাকুরের যাওয়ার হেতু এক এক জনে এক এক প্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন। পরদিন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে, বাজার দেনা ৮০(আশি) টাকা পরিশোধ হইল। মাঠাক্‌রুণ অমনি দিদিমা ও কুতুকে লইয়া যোগজীবন এবং কুঞ্জ বাবুর সহিত শান্তিপুর রওয়ানা হইলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুরমাতা উৎকট উন্মাদরোগে বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। ঠাকুরকে দেখিলে তিনি সময়ে সময়ে অনেকটা ঠাণ্ডা থাকেন।

ঠাকুরমার ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা কিঞ্চিৎ উপশম হইলেও সময়ে সময়ে তিনি শয়ন-ঘরে, মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া উহা দেওয়ালে ও সমস্ত মেজেতে ছড়াইতেন। সকাল বেলা মাঠাক্‌রুণ উহা পরিষ্কার করিতেন। দিদিমার ইহা বড়ই অসহ্য হইত। তিনি ইহা লইয়া অনেক সময়ে ঠাকুরমার সহিত ঝগড়া করিতেন। এক দিন প্রত্যূষে এই সকল অনাচার অত্যাচার লইয়া উভয়ের মধ্যে

বিষম গোলমাল বাধিল। তখন ঠাকুর নিজের থাকার ঘরে দোতালার উপরে ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুরমার সেবা-শুশ্রুষা, মলমূত্র পরিষ্কারাদি ঠাকুর নিজেই সমস্ত করিবেন বলিতে লাগিলেন। অনর্থক এই দুর্ভোগ কেন মাথায় টানিয়া নেওয়া বলিয়া মাঠাক্‌রুণ, ঠাকুরের কথায় আপত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দিদিমাও তাহাতে যোগ দিয়া ভয়ানক গোলমাল করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঠাকুর হঠাৎ আসনহইতে উঠিয়া মাঠাক্‌রুণকে বলিলেন—**'আমি এখনই কাশী চল্‌লেম, ভাড়ার আট্‌টি টাকা দেও।'**

অকস্মাৎ ঠাকুরের কাশী যাওয়ার উদ্যোগ দেখিয়া মাঠাক্‌রুণ চমকিয়া গেলেন, এবং ঠাকুরের সঙ্কল্পে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে টাকা দিতে ওজর করিয়া বলিলেন—'তা হ'লে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লও।' ঠাকুর তখন ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্ত্তি হইলেন এবং মাঠাক্‌রুণকে ধমক দিয়া দণ্ডদ্বারা 'পোর্টমেণ্টের' উপরে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঠাক্‌রুণ অমনি বাক্সের চাবিকাঠি ঠাকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—'বাক্সটি ভেঙ্গো না—এই চাবি নাও।' ঠাকুর বাক্স খুলিয়া আটটি টাকা গুণিয়া লইলেন। পরে মাঠাকুরাণীর নিকটে চাবিকাঠি ফেলিয়া দিয়া অমনি একাকী রাণাঘাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। ওখানে যাইতে নদী পার হওয়ার সময়ে ঠাকুর পাটনির হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন—**"এখানে একটু পরেই একটি বাবাজী আমার অনুসন্ধানে আস্‌বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী যাচ্ছি—তিনি যেন কাশী গিয়ে আমার সঙ্গে মিলেন।"**

ঠাকুর যখন বাড়ীহইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, শ্রীধর তখন কোন প্রয়োজনে বাহিরে ছিলেন। বাড়ীতে আসিয়া শ্রীধর যেমনি শুনিলেন, ঠাকুর কাশী চলিয়া গিয়াছেন, অমনি তিনি সেই অবস্থাতেই উন্মত্তের মত ছুটিয়া রাণাঘাটের দিকে চলিলেন। নদীর পাড়ে পঁহুছিয়া, খেওয়া ঘাটে যাওয়া মাত্রই পাটনি শ্রীধরকে দেখিয়া বলিল—'কিছুক্ষণ হয় একটি সাধু এখানে হ'য়ে ষ্টেশনে গেলেন। তিনি কাশী যাবেন। আমার হাতে একটি টাকা দিয়ে বল্‌লেন যে, একটু পরে একটি বাবাজী এখানে আমার তালাসে আস্‌বেন, তাঁকে এই টাকাটি দিয়ে ব'লো, আমি কাশী যাচ্ছি; তিনিও যেন কাশী গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীধর মাঝিকে বলিলেন—'হাঁ, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁরই তালাসে এসেছি।' মাঝি অমনি টাকাটি শ্রীধরের হাতে দিল। শ্রীধর তখন নদী পার হইয়া তাড়াতাড়ি রাণাঘাট ষ্টেশনে পঁহুছিলেন, দেখিলেন—যাত্রীপূর্ণ একখানা ট্রেণ ষ্টেশনে রহিয়াছে। এদিক সেদিক তাকাইতে তাকাইতে ঠাকুরকে গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুরও শ্রীধরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন—**'শ্রীধর আমি কাশী যাচ্ছি। তুমি কলিকাতা গিয়ে কুঞ্জদের বাসায় উঠো। সেখানে টাকা জোগাড় ক'রে নিয়ে কাশী যেও, আমার সঙ্গে দেখা হবে। ব্যস্ত হ'য়ো না।'**

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। শ্রীধরও কলিকাতা যাইয়া কুঞ্জ বাবুদের বাসায়

উঠিলেন। সেখানে রেল ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করিয়া, পরদিনই কাশী রওয়ানা হইলেন। কয়েকদিন পরে মাঠাক্রুণ, দিদিমা এবং যোগজীবন প্রভৃতিকে লইয়া, কলিকাতার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাসায় আসিলেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া, কুঞ্জ বাবু এবং শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কাশী যাওয়ার সুব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে এক দিন বিষ্ণুবাবু, বেঙ্গল ফটোগ্রাফারকে আনাইয়া মাঠাকুরাণীর ফটো তুলিয়া লইলেন। এই ফটো গুরুভ্রাতারা অনেকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাঠাক্রুণ অবিলম্বেই যোগজীবন ও দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের কাশীধামে অবস্থিতি।

ঠাকুর কাশীধামে পঁহুছিয়া প্রথমে কাকিনিয়া মহারাজার ছত্রে উঠিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিয়া অগস্ত্যকুণ্ডের সন্নিকটে মাণিকতলার মাতাজীর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গেলেন। মাঠাক্রুণও সেই সময়ে যোগজীবনকে লইয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতার সঙ্গে ঐ বাসায়ই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে ১০/১২টি লোক হইল। আহারত্যাগী মাতাজী, গণ্ডূষমাত্র জল গ্রহণ না করিয়া, স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রফুল্ল মনে প্রত্যহ সকলের পরিবেশনাদি যাবতীয় সেবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। মাসাধিক কাল ঠাকুর কাশীতে রহিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অদ্ভুত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিতে বহু বাধা বিঘ্ন দেখিয়া, আমি তাহা পরিত্যাগ করিলাম। কয়েকটি সাধারণ ঘটনার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

ঠাকুরকে সন্ন্যাসিবেশে দেখিয়া শহরের ইংরাজি-শিক্ষিত উকীল, অধ্যাপকাদি বাঙ্গালী বাবুরা নানা প্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও খ্যাতনামা শ্রীনাথ রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুর যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইলে, সকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসিমণ্ডলীর পুরোভাগে বসাইলেন। বহু গণ্য-মান্য লোকের সমাগমে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। অধিবেশনের কার্য্য সমাপনান্তে সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। ঠাকুর অসুস্থ থাকা বশতঃ বাসায় আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ত্তাদের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া তিনি সঙ্কীর্ত্তনে থাকিতে সম্মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর কতকক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে উচ্চ হরিবোল হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সঙ্কীর্ত্তনে মহাভাবের বন্যা আসিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দ সকলেই তাহাতে হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন। অচিরেই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও সভাস্থ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিলেন। বিরুদ্ধভাবাপন্ন বাঙ্গালী বাবুরাও তখন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন।

ঠাকুর এক দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিতে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বহু লোকের ভিড়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মণ্ডপের এক ধারে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময়ে আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুর দূরে থাকিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। পরে উচ্চৈঃস্বরে **বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা** বলিয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আরতি দর্শন না করিয়া সকলে উল্লসিত ভাবে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। পাণ্ডারা তখন আগ্রহের সহিত অবাধ গতিতে নৃত্য করিবার সুবিধা করিয়া দিল। ঠাকুর বোম্ ভোলা, বোম্ ভোলা রবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধর, স্বামিজী প্রভৃতিও মত্ত হইয়া জয়ধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক ঠাকুরের উভয় পাশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেবকগণ পরমোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে স্তবপাঠ করিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর, দর্শন করিতে করিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ঠাকুরকে দর্শন ও স্পর্শ করিবার জন্য লোকের ভিড় পড়িয়া গেল। অধিক রাত্রিতে ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

আর এক দিন ঠাকুর বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন; ফুপিয়া ফুপিয়া বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন। তখন আশ্চর্য্য প্রকারে ঠাকুরের নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুরাশি নির্গত হইয়া সবেগে ছুটিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পাণ্ডা, পূজারি ও দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেও, তাঁহারা আনন্দ উৎসাহের আবেগে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অধিক আরতি করিলেন।

ইহার পর প্রত্যহই দলে দলে লোক আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিল। কোন্ দিন কখন ঠাকুর বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইবেন, বাঙ্গালীটোলাবাসীরা নিত্য আসিয়া খবর লইয়া যাইত।

ভাস্করানন্দ স্বামী এবং পাল মহাশয়।

ঠাকুর এক দিন ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে শিষ্যগণ সহিত দুর্গাবাড়ী গেলেন। একটি লোক ঠাকুরকে স্বামিজীর নিকটে যাইতে বাধা দিয়া বলিলেন, 'ওদিকে যাবেন না। এ সময়ে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তিনি ধ্যানস্থ আছেন।' ঠাকুর তাহাকে কিছু না বলিয়া একটি বৃক্ষতলে চোক বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। দু' এক মিনিটের মধ্যেই স্বামিজী সহাস্য মুখে আনন্দ হ্যায়, আনন্দ হ্যায়, বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার উদ্যোগ করা মাত্রই স্বামিজী ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া

শ্রীযুক্ত বামদাশ কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

(কাঠেব কৌপিন পবা অবস্থা)
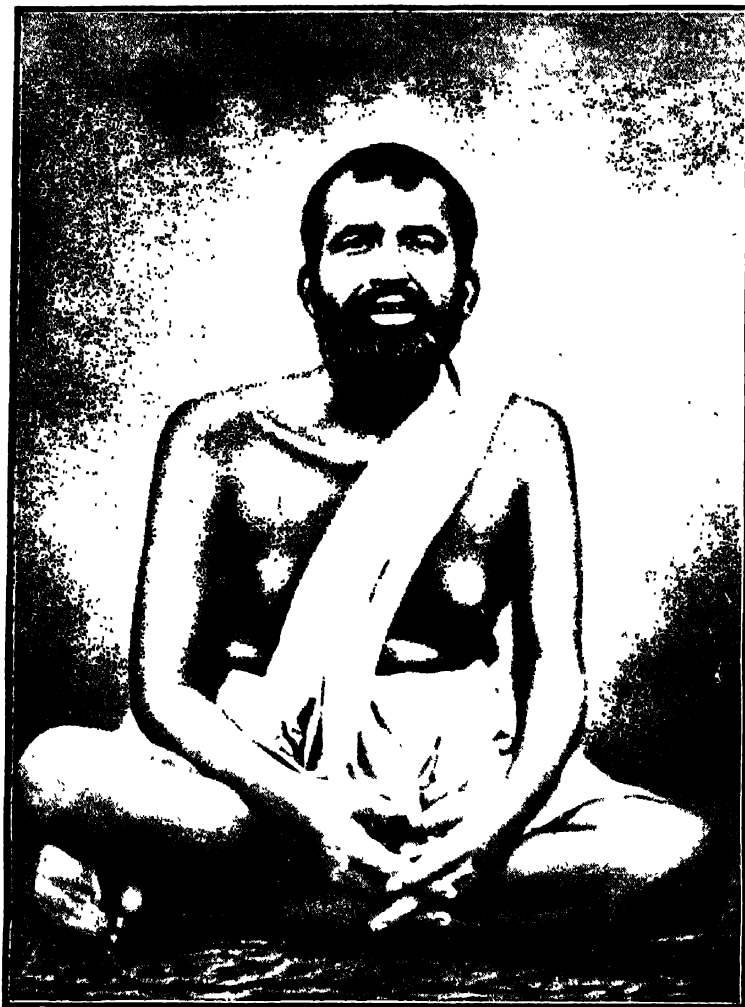
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধরিলেন। উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন। বহুক্ষণ নীরবে একই ভাবে কাটিয়া গেল। তৎপরে দু' একটি কথা বলিয়া ঠাকুর বাসায় আসিলেন।

ঠাকুরের মুখে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পাল মহাশয়ের কথা অনেক বার শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ইনি একজন প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন হীন কাঙ্গালের মত কাশীর একপ্রান্তে দুর্গাবাড়ীর দিকে নির্জ্জন একটি বাগানে বাস করিতেছেন। লোকসমাগমে পাছে ভজনের বিঘ্ন ঘটে, এজন্য তিনি কুটিরের দ্বার বাহির দিকে তালাবন্ধ করিয়া রাখেন; পরে ক্ষুদ্র একটি জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। তৎপরে সেটিও বন্ধ করিয়া নির্জ্জন ঘরে সারাদিন একাসনে ধ্যানমগ্ন থাকেন। ঠাকুর তাঁহার দর্শন মানসে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কুটিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দেওয়ালে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া আসিলেন। পরদিন ক্ষীণশরীর বৃদ্ধ পাল মহাশয়, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগস্ত্যকুণ্ডে আসিলেন। ঠাকুর যতদিন কাশীতে ছিলেন, পাল মহাশয় প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার আগমনে ঠাকুরের বাসায় শিক্ষিত লোকের অত্যধিক সমাগম হইতে লাগিল। সনাতন ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনায় ও সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইলেন। শাস্ত্র অভ্রান্ত ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, পূর্ণানন্দ স্বামী ইত্যাদি আরও কয়েকটি সন্ন্যাসী এবং পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কাশীর প্রয়োজন শেষ হইলে, ঠাকুর ফয়জাবাদ রওয়ানা হইলেন।

পরমহংসজীর আহ্বান।

অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মাঠাকুরাণীর সহিত ঝগড়া হওয়াতেই কি আপনি শান্তিপুর ছেড়ে এলেন?'

ঠাকুর। **আমি নিজ ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। পরমহংসজীর আহ্বানেই এসেছি। ঝগড়ার সময়ে তিনি বল্লেন, 'এখনই তুমি কাশী চলে যাও। কাশীতে আমার দেখা না পেলে অযোধ্যায় যেও। সেখানেও সাক্ষাৎ না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে যাবে। শ্রীবৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হবে।' ঝগড়ার সময়ে যেমন পরমহংসজীর আদেশ হ'লো, আমিও অমনি বের হ'য়ে পড়্লাম।**

এক দিন ঠাকুর পায়খানায় গিয়াছেন; একটি সমারোহের সঙ্কীর্ত্তন কুঞ্জের সমীপবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিল। ঠাকুর উহা শুনা মাত্র পায়খানা হইতে হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহুক্ষণ আনন্দ করিয়া কুঞ্জে আসিলেন। তখন হঠাৎ ঠাকুরের স্মরণ হইল জলশৌচ করেন নাই।

আর এক দিন আহার করিতে করিতে খোল করতালের আওয়াজ পাইয়া, অমনি এঁঠো মুখে ছুটিয়া বাহির হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে আনন্দ করিয়া অপরাহ্ণে বাসায় আসিলেন। তখন মুখপ্রক্ষালনাদি করিলেন।

গুরুর ইঙ্গিত আহ্বান ব্যতীত, এই প্রকার বিচারশূন্য অদ্ভুত আবেগ আর কিসে ঠাকুরের হইতে পারে, জানি না।

গুরুভ্রাতার সংস্পর্শে বিলুপ্ত গুরুশক্তির স্ফূর্ত্তি।

কেহ যদি কোনও সিদ্ধ মহাত্মা বা মহাপুরুষের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইষ্টমন্ত্র বিস্মৃত হন, গুরুকেও একেবারে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার কোন গুরুভ্রাতার সহিত একটুকু মাত্র কোন প্রকারে সংস্রব ঘটিলেও, গুরুশক্তির একটা ক্রিয়া তাঁহার ভিতরে হইতে থাকে; ঠাকুরেব মুখে একটি গল্প শুনিয়া এই বিষযটি বুঝিলাম। গল্পটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

গয়াতে একটি অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক ছেলেবেলা কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরে টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তির সম্পর্কে, তিনি সাধন ভজন, ইষ্টনাম, এমন কি, গুরুকেও ভুলে গেলেন; ক্রমে ঘোর বিষয়ী হ'য়ে পড়্লেন। এক দিন একটি উদাসী সাধু, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, 'হাম্ ভুখা হ্যায়, হাম্কো কুছ্ ভোজন দিজিয়ে।' বাড়ীর চাকর একমুটো চাউল এনে সাধুকে বল্লে, 'এই লেও, চলা যাও।' সাধু বল্লেন, 'দানা মেই নাহি মাঙ্গ্তা, হাম্কো থোড়া ভোজন দেও।' বাবু, সাধুর কথা শুনিয়া ধমক দিয়া চাকরকে বল্লেন, 'ও কি গোলমাল হ'চ্ছে? ভাল উৎপাত! ওটাকে ধাক্কা মেরে তাড়ায়ে দেনা। চাকর অমনি সাধুটিকে ধাক্কার উপর ধাক্কা মার্তে লাগ্ল। সাধু তখন ব'সে পড়্লেন এবং বল্তে লাগ্লেন 'হাম বড়া ভুখা হ্যায়, জেরা ভোজন দিজিয়ে।' সাধুর জেদ দেখিয়া, বাবু একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হ'লেন; 'ঠারো বদমাইস, ভোজন দেতা হ্যায়' বলিয়া, সাধুকে গিয়া ধর্লেন, পরে কিল চাপড় ও লাথি মার্তে মার্তে তাঁহাকে ধরাশায়ী ক'রে ফেল্লেন। সাধু, 'আহা রে গুরুজী' বলিয়া, চীৎকার ক'রে উঠ্লেন। এই সময়ে বাবুর কি হ'ল ভগবান্ জানেন, তিনি লাথি মার্তে মার্তে অকস্মাৎ থম্কে দাঁড়ালেন, থর থর কাঁপ্তে কাঁপ্তে প'ড়ে গিয়ে সাধুকে জড়িয়ে ধর্লেন এবং পুনঃপুনঃ সাধুর চরণে প'ড়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্তে লাগ্লেন, 'আরে তু কোন্ হোঁ, আরে তু কোন্ হোঁ?' সাধু তাঁহার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে কহিলেন 'আরে, হাম তেরা গুরুভাই হোঁ, হাম তেরা গুরুভাই।' এই বলিয়া সাধু ছুটিয়া অমনি এক দিকে চলে গেলেন। বাবুটি বহু অনুসন্ধান ক'রেও আর তাঁকে পেলেন না। এই ঘটনার পর হ'তে বাবুটির স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি সাধন ভজন ধর্লেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সদাচারী, নিষ্ঠাবান্, ভজনানন্দী হ'য়ে উঠ্লেন।

নন্দোৎসব। দর্শনসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

আজ জন্মাষ্টমী। সমস্ত বৃন্দাবন আজ মহা আনন্দ উৎসবে মাতিয়াছে, ঠাকুরের সহিত আমরা শৃঙ্গারবটে চলিলাম। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু প্রবোধ বাবু, দক্ষ বাবু এবং অভয় বাবুও

আমাদের সঙ্গে চলিলেন। শৃঙ্গারবটের সমস্ত আঙ্গিনা লোকে পরিপূর্ণ দেখিলাম। হাঁড়িতে হাঁড়িতে দধি আনিয়া তাহাতে প্রচুর পরিমাণে হলুদ মিলাইয়া উহা ব্রজবাসী ও বৈষ্ণব বাবাজীরা ঊর্দ্ধে ও চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সকলেই, সকলের অঙ্গে মহা আনন্দে হলুদ দধি মাখাইয়া পরম উৎসাহে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দোৎসবের মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন ক্রমেই খুব জমাট হইয়া পড়িল। উদ্যেমের সহিত, বাবাজীরা নৃত্য করিতে করিতে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণে 'ধ্রুম ধ্রুম' পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীধর সর্ব্বাঙ্গে হলুদ দধি মাখিয়া ব্রজবাসীদের সঙ্গে মাতিয়া গেলেন। তিনি সময়ে সময়ে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলিতে বলিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে বালকের মত সঙ্কীর্ত্তনস্থলে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেন। পরে ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর প্রায় তিনঘণ্টাকাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। অপরাহ্নে আমরা সকলে যমুনায় স্নান করিয়া কুঞ্জে আসিলাম। শ্রীধর কীর্ত্তনস্থলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর নানা ভঙ্গীতে নৃত্যের বিবরণ, ঠাকুরকে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

১৪ই শ্রাবণ, ১২৯৭,

শ্রীধর চলিয়া গেলেন। পরে আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'জন্মাষ্টমীতে উপবাসের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম। শাক্তদের সঙ্গে কখন কখন বৈষ্ণবদের মতের মিল হয় না, আমি কোন্ মতে উপবাস কর্‌ব?'

ঠাকুর বলিলেন—"**ব্রত উপবাসাদি বংশপরম্পরায় যাঁর যে নিয়ম, তিনি সেইমতই কর্‌বেন।**"

আমি বলিলাম—আমাদের লক্ষ্য কি? কোন্ রূপে ভগবান্ আমাদের নিকটে প্রকাশ হবেন?

ঠাকুর বলিলেন—" **আমাদের এই সাধনে কোন দেবতা লক্ষ্য নয়। একমাত্র ভগবানই লক্ষ্য। তা হ'লেও যাঁর যেমন ভাব, যাঁর যে কুলদেবতা, ভগবান্ তাঁকে সেইভাবে সেইরূপেই প্রথম দর্শন দিয়ে থাকেন।**"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, তাঁহারা ত কোন দেব দেবীই ভাবেন না, মানেনও না; তাঁদের নিকটে ভগবান্ কিভাবে প্রকাশ হবেন?

ঠাকুর বলিলেন—**আমি কয়েকটি ঘটনা এরূপ দেখেছি; কোন কোন ভাল ভাল ব্রাহ্ম অনেক দিন উপাসনাদি ক'রে আমাকে এসে বলেছেন, 'মহাশয় অমুক দেবতার ভাব ও রূপ কেন মনে এসে পড়ে? কখনও ত ওসব ভাবি না, কল্পনাও করি না; তবু এরূপ হয় কেন?' আমি তাঁদের কথায় অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, যাঁর যে কুলদেবতা, তাঁর ভিতরে সেই দেবতার রূপ ও ভাব এসে পড়ে। পিতৃপিতামহাদি বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণহইতে যেসকল ভাব রক্ত মাংসের সহিত আমাদের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে, উহা কি সহজেই যায়? ব্রহ্মোপাসক হ'লে কি হবে? ব্রহ্ম যখন প্রকাশিত হবেন, তখন একটা ভাবে একটা রূপে তো প্রকাশ হবেন। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যাঁর বংশের যে দেবতা, ব্রহ্ম তাঁর নিকটে সেই রূপেই প্রথম**

প্রকাশ হন, পরে উহাহইতে অন্যান্য দেব দেবী ও যাহা কিছু, ধীরে ধীরে প্রকাশ হ'তে থাকেন।

আমি বলিলাম—আমার মনে হয় ব্রাহ্মসমাজের পাল্লায় প'ড়ে আমার বিষম ক্ষতি হয়েছে; সরল বিশ্বাস আর নাই। সবটাতেই সন্দেহ, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়েছে। ওখানে কেনই বা গেলাম?

ঠাকুর বলিলেন—**সরল বিশ্বাস ভেঙ্গেছেনও যিনি, এখন আবার গড়্‌ছেনও তিনি। সেজন্য আর তোমার ভাবনা কি? এখন যেটি হবে, সেটি ঠিক হবে, তা আর ভাঙ্গবে না। ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে ক্ষতি কিছুই হয় নাই, বিস্তর উপকারই হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়াতেই নীতি চরিত্রাদি রক্ষা পেয়েছে। আর প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞানটি না হ'লে কোন প্রকারেই ঠিক তত্ত্ব জানবার অধিকার হয় না। এজন্য ঋষিরা প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞানই শিক্ষা দিতেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ, মঙ্গলময়, নির্ব্বিকার, নিরাকার ইত্যাদি ভাব সকল ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে, যখন ক্রমে ক্রমে উহার ভিতর দিয়া অলৌকিক রূপের আশ্চর্য্য ছটা প্রকাশ হ'তে থাকে. তখনই উহা ধীরে ধীরে বুঝা যায়, ধরা যায়।**

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া সকলেই ত আসেন নাই, যাঁহারা হিন্দুসমাজে থেকে এই সাধন লাভ করেছেন, তাঁদের এসব তত্ত্ববোধ হয় না কি?

ঠাকুর বলিলেন—**তা হবে না কেন? তবে একটু শক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তত্ত্ব সকল ধর্‌তে তাঁদের তেমন একটা কষ্ট হয় না। খুব সহজেই ধর্‌তে পারেন। আর ব্রহ্মজ্ঞানটি লাভ না হ'লে ত কিছু হবারই যো নাই। তাই প্রথম অবস্থায়ই উহা হওয়া ভাল, এতে সব দিকেই সহজ হ'য়ে আসে। যাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাই করা কর্ত্তব্য, তাই কর।**

ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া নিজহইতেই আবার বলিতে লাগিলেন—**অবশ্যই ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে অনেকের বিস্তর ক্ষতিও হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের ভাল যেটুকু, তাহা ত সকলে সহজে ধর্‌তে পারে না; যাহাতে অনিষ্ট হয়, এমন সব বিষয়েই সাধারণ লোকে প্রায় জড়ায়ে পড়ে; অবিশ্বাস, সন্দেহাদি কতকগুলি বৃথা সংস্কারে কেহ কেহ বড়ই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছেন; সহজে ওসব সংস্কার যায় না; ঐ সকল সংশোধন হওয়া বড়ই শক্ত।**

এ সকল কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ চলিয়া গেল; ঠাকুরের আদেশমত, মহোৎসবের পূরী, কচুরী, মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পরিপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিতে করিতে দেখিলাম—পুনঃপুনঃ একটি অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কাল জ্যোতি ঝল্‌মল্ করিয়া এক একবার প্রকাশ হইয়া আবার অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল; কতকক্ষণ এই জ্যোতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আহারের কিঞ্চিৎ পরে প্রাণায়াম আরম্ভ করাতে, মাঠাক্‌রুণ নিষেধ করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—**খুব খালি পেটে বা ভরপূর পেটে প্রাণায়াম কর্‌তে নাই। আহারের অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে কর্‌তে হয়।**

অভয় বাবুর প্রতি কৃপা।
গোঁসাই ও কাঠিয়াবাবার প্রথম সাক্ষাৎকার।

আজ শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত কথায় বার্ত্তায় তাঁহার জীবনের একটি সুন্দর ঘটনা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অভয় বাবুর সঙ্গে আমার নূতন পরিচয় নয়, পূর্ব্বেও ফয়জাবাদে দাদার বাসায় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ছিল। তখন তাঁহাকে ধর্ম্মের কোনও বেশ ধারণ করিতে দেখি নাই। এবার শ্রীবৃন্দাবনে অভয় বাবুকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিতেছি। তাঁহারই মুখে শুনিলাম—"কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিন তিনি মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন; অমনি যমুনায় ডুবিবেন স্থির করিয়া, উহার তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের চৌরাশি ক্রোশের মহান্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবা, অভয় বাবুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অকস্মাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাত মহাপুরুষ নিজহইতেই স্নেহের সহিত সান্ত্বনাবাক্যে অভয় বাবুকে ভরসা দিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আমি দীক্ষা দিচ্ছি; সমস্ত অশান্তি চলে যাবে। তুমি ওরূপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।' সিদ্ধ মহাত্মা এই বলিয়া অভয় বাবুকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। অভয় বাবু তখন মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তবৎ লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং সম্মুখে একটি বৃক্ষের ডাল ধরিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায়ই তাহাতে ঝুলিতে লাগিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠিয়াবাবা উঁহাকে সুস্থির করিয়া চলিয়া গেলেন। অভয় বাবু বলিলেন, 'এবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বে কিছুকাল গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ছিলাম। এক দিন স্বপ্ন দেখিলাম, কাঠিয়াবাবা আমাকে বলিলেন, 'চলো, তোম্‌কো এক আসল মহাত্মা দর্শন করায়েঙ্গে।' এই বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমাকে দাউজীর মন্দিরে গোস্বামী প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দাউজীর 'জগমোহনে' বসিয়াছিলেন; বিস্তর ব্রজবাসী, সাধু, ব্রাহ্মণাদি গোঁসাইয়ের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। আমাকে গোস্বামী প্রভু দয়া করিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দাউজী ঠাকুর দর্শন করাইলেন এবং আদেশ করিলেন যে, 'ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ ও নিরাহারে একাদশী করিবেন।' এই মন্দির এবং এই গোস্বামী প্রভু আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। স্বপ্নদর্শনের কিছুকাল পরে, ঘটনাক্রমে আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম এবং দাউজীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে গোস্বামী মহাশয়কে দর্শনমাত্র তাঁহাকে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমেই আমি বাস করিতে লাগিলাম। এক দিন শুনিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে কাঠিয়াবাবা আসিয়াছেন। অমনি আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'দেখ্ স্বপন্ তো প্রত্যক্ষ হুয়া হ্যায়্? উন্‌হিকা নাম সাধু। ওহি সাচ্চা সাধু। চল্, হাম্‌ভি দর্শন

কর্‌নেকো আস্তে তোমারা সাত্ যায়েঙ্গে।' এই বলিয়া কাঠিয়াবাবা আমার সঙ্গে গোঁসাইয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা একে অন্যকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় আলাপাদি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ঐ দিন গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে পরম সমাদরে ভোজন করাইলেন। পরদিন আমার সহিত গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে দর্শন করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে একই স্থানে বসিয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন; একটি কথাও হইল না। এইপ্রকার ক্রমান্বয়ে তিন চার দিন উঁহাদের পরস্পর সঙ্গ হইল; কিন্তু একেবারে নীরব, একটি বাক্যও নাই। তখন এক দিন আমি গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা তো কোন কথাবার্ত্তাই বলেন না।' গোঁসাই বলিলেন, **'মুখে না ব'লেও মহাপুরুষেরা সমস্ত কথা অন্তরে প্রেরণ করেন, ভিতরে ভিতরে কথা হয়।'** এক দিন গোস্বামী মহাশয় কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলেন। উভয়েই আপনাপন ভাবে নির্ব্বাক্ ও নিবিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছেন, হঠাৎ কাঠিয়াবাবা, গোঁসাইয়ের জানু স্পর্শ করিয়া অবনত ভাবে বলিলেন, 'বাবা! হাম্ আপ্‌কা বালক হ্যায়।' গোঁসাই অমনি কাঠিয়াবাবাকে দুই হাতে বুকের উপরে লইয়া জড়াইয়া ধরিলেন।"

কাঠিয়াবাবা বহুকালযাবৎ প্রত্যহ দিবসের অধিকাংশ সময়ে সেবাকুঞ্জের দ্বারে আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে, এই স্থানেই বাবাজীর সর্ব্বপ্রথমে অপ্রাকৃতলীলা দর্শন হয়। তাই প্রতিদিন এই স্থানে বসিয়া, তিনি এখনও নিত্যলীলা দর্শন করেন।

গোঁসাইয়ের অনুকম্পা।

কথায় কথায় অভয় বাবু বলিলেন, একদিন মথুরার সরকারী ডাক্তার শ্রীমনোমোহন দাস, একখানা সরা পরিপূর্ণ বড় বড় নাড়ু লইয়া, এই কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয়কে না পাইয়া তাঁহার সেবার্থে, উহা দামোদর পূজারীর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন। দামোদর ঐ নাড়ু সামান্যমাত্র এখানে রাখিয়া, সমস্তগুলি নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন সকাল বেলা, দামোদর আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—"বাবা, মনোমোহন বাবু ৬টি নাড়ু দিয়াছিলেন; আপনার জন্য দুটি রাখিয়া, দাউজীঠাকুরকে দুটি, অভয় বাবুকে একটি এবং শ্রীধর বাবুকে একটি দিয়াছি।" এই কথা আমি কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়া শুনিলাম। পরে, দামোদরের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, গোঁসাইকে বলিলাম—'মনি-অর্ডার যাহা আসে, তাহা তো আপনি স্বাক্ষর মাত্র করেন; সমস্তই দামোদর লইয়া যায়, আর যা তা আপনাকে আহার করিতে দিয়া কষ্ট দেয়। কল্যও নাড়ুগুলি সমস্ত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছে, এ কিরূপ ব্যবহার?' গোস্বামী মহাশয় খুব হাসিয়া প্রফুল্ল মুখে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, **'আহা, আহা! বেশ করেছে। ছোট ছোট ছেলে পিলে পরিবারাদি আছে, তারা খাবে। ভালই**

হয়েছে।' আমি শুনিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলাম। একটু পরে গোঁসাই বলিলেন—**"আমার গুরুর আদেশ, এক বৎসর কাল এই আসনে আমাকে বাস কর্‌তে হবে, তাতে যত ক্লেশ-কষ্ট হয় হউক। আমি জানি আপনাদের আহারাদির কষ্ট হ'চ্চে। নিজের নিজের কিছু কিছু খরচ ক'রে, বাজার থেকে খরিদ ক'রে এনে খাবেন। আর রুখা-শুকা খাওয়াও ভাল, তাতে ইন্দ্রিয়সংযম হয়।"**

মহাত্মা গৌর শিরোমণি।

আজ আহারান্তে গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা উঠিল। শুনিলাম, একদিন **শ্রীধর,** শিরোমণি মহাশয়কে দর্শন করিতে তাঁহার কুঞ্জে যাইয়া দেখিলেন, তিনি নিদ্রিত আছেন, সুতরাং সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে দর্শন করিয়া চরণের দিকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া নমস্কার করিলেন। শিরোমণি মহাশয় নিদ্রিত থাকিলেও, তাঁহার চরণ দু'টি তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গেল। শ্রীধর আবার তাঁহার চরণের দিকে যাইয়া নমস্কার করিলেন; উঠিয়া দেখিলেন, শিরোমণি মহাশয়ের চরণ দু'টি আবার অন্য দিকে গিয়াছে। শ্রীধর পুনরায় চরণের দিকে চার পাঁচ হাত অন্তরে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িলেন, এবারও শ্রীধর উঠিয়া দেখিলেন চরণ দু'টি আর সেখানে নাই; নিদ্রিতাবস্থায়ই শিরোমণি মহাশয়ের চরণ সরিয়া গিয়াছে। তিনবারই এই প্রকার ঘটনা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া চলিয়া আসিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাহারও নমস্কার করিবার সাধ্য নাই, দূরে থাকিয়াও তাঁহার জ্ঞাতসারে কেহ তাঁহাকে অগ্রে নমস্কার করিতে পারে না। অবিচারে সকলকে তিনি সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম করেন। রাস্তায় তাঁহার সহিত চলা এক মহা মুস্কিল ব্যাপার। তিনি চলিতে চলিতে রাস্তার দুই দিকে বিড়াল, বানর, গরু, স্ত্রীলোক, পুরুষ এবং বিগ্রহাদি সকলকেই একভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে অগ্রসর হন। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত স্ত্রীলোক ও পুরুষ, শিরোমণি মহাশয়কে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন।

২৫ শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

ঠাকুর বলিলেন—"তৃণাদপি **সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা** হরিঃ।।" **এই শ্লোকের যথার্থ দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে হ'লে শিরোমণি মহাশয়কে গিয়ে দেখ; বর্ত্তমান সময়ে এরকমটি আর দেখা যায় না।**

শিরোমণি মহাশয়ের পূর্ব্বকালীন ঘটনা ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—**শিরোমণি মহাশয় দেশে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন; ছয়টি দর্শনে, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এক দিন দেশে একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত শুন্‌তে যান। বহু গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠক ব্রাহ্মণ, ভাগবতপাঠের পূর্ব্বে গৌরবন্দনা পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম আছে, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়, উহা শুনেই আগুন হ'য়ে উঠ্‌লেন। পাঠক ব্রাহ্মণকে ডেকে বল্‌লেন, "এ কি মহাশয়, একি ভাগবত পাঠ হ'চ্ছে? আপনি ভাগবত পাঠ কর্‌তে বসেছেন, সম্মুখে ভাগবত খোলা রয়েছে; ওদিকে দৃষ্টি ক'রে আপনি গৌরচন্দ্রিকা পাঠ কর্‌ছেন কেন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে ব'সে,**

সম্মুখে শালগ্রাম রেখে, ভাগবত পড়্‌বেন্ ব'লে, এসব মিথ্যা বচনের আবৃত্তি? ভাগবতে ওসব কোথায় লেখা আছে?" ভক্ত ব্রাহ্মণ করজোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে বল্‌লেন, "প্রভো! ভাগবতই আমি পাঠ করছি। এই সমস্তই ভাগবতে আছে। আমি অসত্য বাক্য উচ্চারণ করি নাই।" শিরোমণি মশায় তখন আসন হ'তে লাফায়ে উঠ্‌লেন, পাঠকের নিকটে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন—'মশায়, 'অনর্পিতচরীং' ভাগবতের কোথায় আছে একবার দেখান দেখি।' ব্রাহ্মণ অমনি প্রতি দু'লাইনের ভিতরের ফাঁক্ দেখায়ে বল্‌লেন, 'এই সাদা স্থানে দৃষ্টি ক'রে দেখুন'। শিরোমণি বল্‌লেন, 'কোথায়? এ তো সাদা স্থান দেখাচ্ছেন।' ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, 'আপনার দৃষ্টিশক্তি নাই, কি প্রকারে দেখ্‌বেন? চোখ্ দুটি একটু পরিষ্কার ক'রে নিন্, পরে দেখ্‌তে পাবেন।' শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত রেগে গিয়ে বল্‌লেন, 'শালগ্রাম সম্মুখে রেখে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, এতগুলি ব্রাহ্মণের মধ্যে আপনি অনায়াসে মিথ্যা কথা বল্‌ছেন।' ব্রাহ্মণ তখন খুব তেজের সহিত বল্‌লেন, 'আপনি ওরূপ কথা বল্‌বেন না, চুপ্ করুন। এই ব্রাহ্মণের সভায় শালগ্রাম সাক্ষী ক'রে, ভাগবত স্পর্শ ক'রে, আমি যথার্থই বল্‌ছি ভাগবতের প্রতি দু'লাইনের মধ্যে 'গৌরবন্দনা' লেখা রয়েছে, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। আপনি সিদ্ধ কোনও বৈষ্ণব মহাত্মার নিকট গিয়ে দীক্ষা নিয়ে আসুন, পরে আমি যেসব নিয়ম ব'লে দিব, ঠিক সেইমত এক সপ্তাহ কাল চলুন; অষ্টম দিবসে এখানে আস্‌বেন, তখন ভাগবতের ফাঁকে ফাঁকে গৌরচন্দ্রিকা যদি পরিষ্কার দেখাতে না পারি, আমার জিব কেটে দিব, সকলের সমক্ষে আমি এই শপথ কর্‌ছি।' শিরোমণি মহাশয় মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তখনই তিনি গিয়ে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকটে দীক্ষা নিলেন, পরে পাঠক ঠাকুরের কাছে এসে, তাঁহার নিয়ম প্রণালী গ্রহণ কর্‌লেন। সাত দিন ঠিক সেইমত চ'লে, ব্রাহ্মণের নিকট পুনরায় এসে বল্‌লেন, 'মশায়, এখন আপনি সেই গৌরবন্দনাগুলি ভাগবতে দেখাবেন ত?' পাঠক ব্রাহ্মণ অমনি ভাগবত খুলে বল্‌লেন, 'আচ্ছা, এবার এসে দৃষ্টি করুন।' তখন গৌর শিরোমণি মহাশয় ভাগবতের শ্লোকের প্রত্যেক দু'লাইনের ভিতরে দৃষ্টি করামাত্র দেখ্‌তে পেলেন, উজ্জ্বল সুবর্ণ অক্ষরে গৌরবন্দনা পরিষ্কার লেখা রয়েছে। তখন তিনি মাটিতে প'ড়ে গড়াতে লাগ্‌লেন; কেঁদে কেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। অমনি সমস্ত ছেড়ে, শ্রীবৃন্দাবনে পদব্রজে যাত্রা কর্‌লেন। সেই থেকে ইনি এখানে আছেন। এ অবস্থার লোক শ্রীবৃন্দাবনে আর নাই। ইনিই যথার্থ বৈষ্ণব।

মৎস্যাহারের অনিষ্টকারিতা।
অশুদ্ধ দেহের হেতু ও পরিণাম এবং শুদ্ধির উপায়।

ঠাকুর, গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণবাচারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন আমি অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'যোগসাধনের পক্ষে মাছ, মাংস খাওয়াতে কি কিছু অনিষ্ট করে?'

ঠাকুর বলিলেন—**কিছু কি? ঢের অনিষ্ট করে।**

আমি আবার বলিলাম—মাংস খেলে ক্ষতি হয়, ইহাই ত শুনেছি; মাছ খেলেও কি ক্ষতি করে?

ঠাকুর বলিলেন—**মাছ খাওয়াতেও ক্ষতি করে। তবে প্রথম প্রথম যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের তত ক্ষতি হয় না, একটু উন্নতি হ'লেই উহাতে কত ক্ষতি করে, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝ্তে পারেন। মাছ খেলে সূক্ষ্ম-শরীরে গতিবিধি কর্‌তে বড়ই ক্লেশ হয়। এজন্য অনেকেই তখন মাছ ছাড়্‌তে বাধ্য হন। আমি মুসলমান ফকিরদের এবং বৌদ্ধ যোগীদের ভিতরেও ঢের দেখেছি যাঁহারা বহুকাল মাছ মাংস খেয়েছেন, তাঁহারাও যোগ আরম্ভ ক'রে কিছু উন্নতি লাভ কর্‌তেই ঐ সব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।**

আমি বলিলাম—সূক্ষ্মশরীরে গতিবিধি ত অনেক উপরের কথা মনে হয়। মাছ, মাংস খাওয়াতে অন্য কোনও অনিষ্ট হয় কি?

ঠাকুর বলিলেন—**আহারের সহিত মনের খুব নিকট সম্বন্ধ; আহারটি সাত্ত্বিক হ'লে মনটিও সাত্ত্বিক হয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে মনটিও সেইরূপ হ'য়ে পড়ে। মাছ, মাংস রজস্তমোগুণী আহার, এসব আহার বিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সাবধান থাক্‌তে হয়।**

পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের উপরে ভক্তি হয় না কেন? ইহার উপায় কি? কোন ব্যক্তির এই প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন—**পূর্ব্বজন্মে শরীর অশুদ্ধ থাক্‌লে পিতা, মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনের উপর অভক্তি ও ঘৃণা হয়। তাঁহারা ভালবাসিলেও অশ্রদ্ধা হয়। এমন কি ভগবানের উপরেও ভক্তি হয় না। পূর্ব্বজন্মের সূক্ষ্ম পরমাণু পরজন্মে সূক্ষ্ম দেহের সহিত স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হয়। এজন্য পরজন্মেও পিতামাতা প্রভৃতির উপরে অশ্রদ্ধা হয়। এই ভক্তির, শরীরের সহিত যোগ। ইহার সহিত আত্মার বিশেষ কোন যোগ নাই। পিতামাতার সহিত দেহের যোগ। পিতার শুক্র ও মাতার শোণিতে দেহের সৃষ্টি। এই দেহ শুদ্ধ কর্‌তে হবে, শুদ্ধ রাখ্‌তে হবে, নচেৎ পিতামাতার প্রতি ভক্তি হবে না। গঙ্গা স্নান, তীর্থ পর্য্যটন, একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিশিপালনাদি ব্রত উপবাসাদি কর্‌লে দেহ শুদ্ধ হয়।**

ঠাকুর কয়েকদিনযাবৎ আমার শরীর অসুস্থ দেখিয়া দাদার নিকটে যাইতে বলিতেছেন। আগামী কল্যই আমি ফয়জাবাদে যাইব স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকটে অনুমতি চাহিলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন—**শ্রীবৃন্দাবনের সকল মন্দিরে যেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রে এসো। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া কুঞ্জে ফিরিলাম।**

ঠাকুরের চরণে বিদায়গ্রহণ; মাঠাকুরাণীর শেষ আদেশ।

সকালবেলা ঝোলা কম্বল বাঁধিয়া ফয়জাবাদ রওয়ানাহইতে প্রস্তুত হইলাম। গুরুভ্রাতাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া দামোদর পূজারীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। উঁহার চরণে আট

আনা পয়সা দিয়া নমস্কার করিতেই পূজারী আমার পিঠে তিনটি চাপড় মারিয়া বলিলেন 'সুফল, সুফল, সুফল। আব্ তোমারা শ্রীবৃন্দাবনবাস সুফল হো গিয়া।' আমি উপরে আসিয়া গুরুদেবের চরণে বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে মাঠাকরুণ আমাকে ডাকিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া নমস্কার করিতেই, তিনি আমার মাথায় ডান হাতখানা রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—"কুলদা! ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা যায় না, আমার এই কয়টি কথা তুমি চিরকাল মনে রেখো; যোগজীবন আমার যেমন পুত্র, তোমাকেও আমি ঠিক সেইরূপ পুত্র ব'লেই জানি; ইহা শুধু একটা কথার কথা মনে ক'রো না; তোমাকে সত্যি ক'রে বল্‌ছি—নিজের ছেলের মতই তোমাকে দেখি; তুমি যোগজীবনের আপন ভাই, এটি মনে ক'রে সর্ব্বদা তার বল হ'য়ে থেকো। শান্তিসুধার ক্লেশে, কেহ সহানুভূতি কর্‌তে পারে না। তাকে ক্লেশের সময়ে সান্ত্বনা দিও। আর ভবিষ্যতে মা যেন দশ জনার গলগ্রহ না হন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখো। ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছ, ভালই হয়েছে, শরীরটি বেশ্ সুস্থ হ'লে বিবাহ কর্‌তে ক্ষতি কি? গোঁসাইয়ের অনুমতি নিয়ে, এর পর বিবাহ কর্‌তে পার, তাতে ধর্ম্ম-কর্ম্মের, সাধন-ভজনের কোন অনিষ্টই হবে না।" এইসব কথা বলিয়া মাঠাকরুণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি গুরুদেবের নিকটে আসিয়া, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহ-দৃষ্টিতে একটু সময় আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—**বেশ্ এখন এসো, যা ব'লে দিয়েছি তা কর্‌তে চেষ্টা ক'রো; সময়ে সময়ে চিঠি লিখো; প্রয়োজনমত উত্তর পাবে।**

২৭শে শ্রাবণ, ১২৯৭, সোমবার, একাদশী।

আমার ফয়জাবাদ যাত্রা; রাস্তায় সঙ্কট।

শ্রীবৃন্দাবনহইতে ট্রেনে চাপিয়া একেবারে কানপুরে আসিলাম। মন্মথ দাদার বাসায় উঠিলাম। আমার সহিত সাক্ষাৎ কবিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বহুকালযাবৎ ছিল। তিনি আমাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আগামী কল্য বা পরশ্বই আমি ফয়জাবাদে যাইব শুনিয়া, তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। দশ পনের দিন না রাখিয়া, আমাকে কখনই তিনি ছাড়িবেন না, পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। মন্মথ দাদার জ্ঞাতসারে আমার অবিলম্বে ফয়জাবাদ যাওয়া অসম্ভব বুঝিলাম। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে তিনি যেমন কাছারীতে গেলেন, আমিও গোপনে একখানা এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া কানপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। দুরদৃষ্টবশতঃ তখনই ট্রেনখানা ছাড়িয়া দিল। একটি ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন—এখনই এই এক্কায় পোল-ঘাটে চলিয়া যান, গাড়ী পাবেন। আমি অমনি ঐ এক্কাতে উঠিয়া পোল-ঘাটে চলিলাম। ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি, একটু পূর্ব্বেই ট্রেনখানা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি তখন বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম; এদিকে এক্কাওয়ালা ভাড়ার জন্য তাড়া করিতে লাগিল। কাগজে মোড়ান পাঁচটি টাকা ট্যাঁকে রাখিয়াছিলাম, ভাড়া দিতে ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখি ট্যাঁক শূন্য; আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঐ টাকাই আমার রাস্তার সম্বল। আমি বিষম বিপদে পড়িয়া

২৮শে শ্রাবণ, ১২৯৭।

গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর! এই বিপদে আমাকে রক্ষা কর।' ভাবিলাম বুঝি কানপুর ষ্টেশনে যেখানে বসিয়া ছিলাম, টাকা সেইখানে পড়িয়া গিয়াছে। ঝোলা কম্বল এক্কাতে রাখিয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য অবস্থায় বড় রাস্তা ধরিয়া দৌড় মারিলাম। দু' তিন মিনিট দৌড়িয়া, হঠাৎ রাস্তার উপরে টাকা পড়িয়া আছে দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছিন্ন মোড়ান কাগজের কিঞ্চিৎ তফাতে টাকা পাঁচটি দেখিয়া তুলিয়া লইলাম। প্রশস্ত রাজপথে শত শত কুলি, মজুর, দীন দুঃখী নিয়ত যাতায়াত করিতেছে, এতক্ষণ কাহারও চক্ষে এই টাকা পড়ে নাই—এ কি কাণ্ড! রাস্তার মাঝামাঝি না চলিয়া যদি আমি কোনও ধার ধরিয়া ছুটিতাম, তাহা হইলে কখনও এ টাকা আমার নজরে পড়িত না। ইহা ভাবিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলাম। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিয়া এক্কাওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। গাড়ী আবার না পাওয়া পর্য্যন্ত কানপুর ষ্টেশনে যাইয়া অপেক্ষা করিব, স্থির কবিলাম।

এই সময়ে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে বলিলেন—'মশায়, আপনি ফয়জাবাদ যাইবেন, আমাকেও আজই লক্ষ্ণৌ যাইতে হইবে। চলুন, তিন ক্রোশ পথ চলিয়া নাওঘাটে যাই, ওখানে নিশ্চয়ই গাড়ী পাইব। এই গাড়ী নাওঘাটে যাইয়া দু'ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করে। আমাদের সেখানে পঁহুছিতে আর কত সময় লাগিবে?' আমি, এই যুক্তি ভাল মনে করিয়া, ঝোলা কম্বল মাথায় তুলিয়া লইলাম এবং উঁহার সঙ্গে দ্রুতপদে পাকা পথ ধরিয়া নাওঘাট চলিলাম। পাকা রাস্তাটির এক দিকে বড় নদী, অপর দিকে বিস্তৃত মাঠ; এখন বর্ষার জল বৃদ্ধি পাইয়া নদী, মাঠ, রাস্তা, সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। নদীর জল প্রবল বেগে রাস্তাটির উপর দিয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। রাস্তার উপরে জল প্রায় আড়াই ফুট; রাস্তার দুই পাশে বড় বড় বৃক্ষ থাকায় ঠিক পথ বুঝিতে কোনও অসুবিধা নাই। আমরা কোমরজলে স্রোত ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় এক মাইল পথ চলিয়াই আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার উপরে প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকবৎ পাথরকুচা ও কঙ্কর পায়ে বিঁধিতে লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল; মাথার বোঝাটি ভিজিয়া ওজনে চতুর্গুণ হইল। বিষম বিপদে পড়িয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মাথার বোঝাটি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলাম। এই সময়ে সঙ্গীটি আসিয়া আমার বোঝাটি নিজ মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং হাতে ধরিয়া স্রোত কাটাইয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। দুই ক্রোশ পথ এই ভাবে চলিয়া আমরা নাওঘাটে পৌছিলাম। ষ্টেশনে যাইয়াই নিজের বোঝাটি ঘাড়ে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ফটকের দিকে দৌড়িলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি 'প্লাটফর্ম্মে' যাইবার ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন এক হাতে মাথার বোঝা, অপর হাতে ফটকটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অমনি ট্রেন ছাড়িবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তখন আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল, আমি অবাক্ হইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। এই সময়ে, দূরহইতে 'গার্ডসাহেব' আমার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া ফটকের নিকটে আসিলেন এবং আমার হাতে ধরিয়া "জল্‌দি চলিয়ে, জল্‌দি চলিয়ে" বলিতে বলিতে টানিয়া লইয়া চলন্ত

গাড়ীর উপরে তুলিয়া দিলেন। ''টিকেট পিছে মিল্ যায়েগা'' বলিয়া গার্ডসাহেব দৌড় মারিলেন। পরের ষ্টেশনেই আমি টিকেট পাইলাম।

অকস্মাৎ একটি বিষম বিপদে পড়িয়া বিনা চেষ্টায় সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার হইলে উহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু একটির পর একটি উৎকট সঙ্কটে, সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণের উপায় ঘটিলে, উহা আর আকস্মিক মনে করিব কি প্রকারে? প্রতি চা'লে ''পোয়া বারো'' পড়িলে, হাতের কৌশল না ভাবিয়া পারা যায় না। এই সকল অঘটন সঙঘটন, গুরুদেবেরই হাত মনে করিয়া, আমি তাঁহার অভয় চরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা ফয়জাবাদে পৌঁছিলাম।

চাক্‌রীর তাড়া ; মরণাপন্ন ব্যাধি ; মাঠাকুরাণীর পত্র।

ফয়জাবাদে পঁহুছিলাম। পরে, দাদা আমার বহুকালের শূলরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। কি প্রকারে আরোগ্য লাভ করিয়াছি শুনিয়া, তিনি বলিলেন—'ইহা শুধু তোমার ঠাকুরেরই কৃপা। গোস্বামী মহাশয়ের এমন সঙ্গ ছেড়ে তুমি এলে কেন?' আমি বলিলাম—'এখন আপনার সেবা কর্‌তে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। মায়ের এবং আপনার সেবা না কর্‌লে আমার কল্যাণ নাই' দাদা বলিলেন—'সেবার লোকের তো আমার অভাব নাই। আচ্ছা, তুমি এখানে থেকে তাঁর আদেশমত সাধন ভজন কর; তা হ'লেই আমি মনে কর্‌বো, আমার যথেষ্ট সেবা কর্‌ছ।' দাদার কথামত আমি সময় নির্দ্ধারণ করিয়া, সাধন ভজন করিতে লাগিলাম। অবসরমত দাদার সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ফয়জাবাদে দাদার বাসায় ঠাকুর কয়েক দিন থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সমস্ত শুনিলাম। বেশ আনন্দে, সাধন ভজনে, সৎপ্রসঙ্গে আমার দিন কাটিতে লাগিল।

ভাদ্র, ১২৯৭।

এই সময়ে মেজ দাদা বহুদিনের সরকারী কার্য্যটি পরিত্যাগ করিয়া ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে ফয়জাবাদে আসিলেন। আমার শরীর সবল ও সুস্থ দেখিয়া একটি চাক্‌রী জুটাইয়া দিয়া ফয়জাবাদেই আমাকে রাখিবার জন্য দাদাকে বলিলেন। দাদাও সেইমত একটি ভাল কর্ম্মের জোগাড় করিলেন। এদিকে চাক্‌রীর কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ''ব্রহ্মচর্য্যব্রতে চাক্‌রী করা নিষেধ'' দাদাকে বুঝাইয়া বলিলাম। দাদা কহিলেন—''ব্রতভঙ্গ ক'রে চাক্‌রী কর, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়; শুধু তোমার মেজ দাদার কথায়ই আমি চাক্‌রীর জোগাড় করেছি; তাঁকে তুমি বুঝিয়ে বল।'' মেজ দাদাকে এসব কথা বলাতে তিনি বলিলেন—'ওসব কিছু না; চাক্‌রী করার ইচ্ছা নাই, তাই ঐ সকল কথা বলা হ'চ্ছে।' আচ্ছা চাক্‌রী নাই কর্‌লে, ব্যবসা কর, দাদার পেটেন্ট্ ঔষধগুলি ঘরে ব'সে প্রস্তুত কর আর বিক্রয় কর; সংবাদপত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া দেই।' আমি বলিলাম—'এতেও ব্রতভঙ্গ হবে। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কর্‌তেও নিষেধ।' মেজ দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—''ওসব কিছু না, সব চালাকী।''

এই সঙ্কটে 'আমি কি করিব' ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিলাম। এদিকে

বিষম মাথার যন্ত্রণায় আমি শয্যাগত হইলাম। ১০৫ ডিগ্রী জ্বর হইল। জলন্ত কয়লারাশি যেন মাথার ভিতরে পূরিয়া রাখিয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। দাদা বহু চেষ্টা করিয়া মাথার অসহ্য যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও উপশম করিতে পারিলেন না; বরং আরও অনেক প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইল। পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাতে প্রলাপ বকিতে লাগিলাম। দাদা ভয় পাইলেন, 'এবার দেখ্‌ছি রাখা গেল না' বলিয়া, তিনি বিষম চিন্তায় পড়িলেন।

দুই সপ্তাহ পরে আমার চিঠির উত্তর আসিল। মাঠাকরুণ আমার পত্রের উত্তর দিলেন—

কল্যাণবরেষু,

কুলদা, তোমার পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম এবং গোস্বামী মহাশয়কে পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি কহিলেন, তোমার শরীরের যে অবস্থা দেখিয়াছেন তাহাতে বিষয়কার্য্যে রত হইলে পীড়া আরও বৃদ্ধি হইবে। তোমার দাদাদের কহিবে যে, তাঁহাদের সংসারে যে কার্য্য করিতে পার, তাহা তোমাকে দিয়া করান। তাঁহাদের দাসত্ব করিতে কহিলেন। ভগবানের রাজ্যে একমুষ্টি আহার ভগবান্ কোনও প্রকারে দিয়া থাকেন। সকলের একই প্রকার করিতে হয় না। যাকে যে ভাবে রাখেন। মন স্থির করিয়া চলিবে, সংসারে কত অবস্থায় পড়িতে হয়! ধৈর্য্য সম্বল। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। এখানে একপ্রকার সকলে ভাল।

আশীর্ব্বাদিকা
যোগমায়া।

পত্রখানা পড়িয়া দাদা ও মেজদাদা সমস্ত বুঝিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন—'চাক্‌রী আর তোমায় কর্‌তে হবে না; এখন ভাল হ'লেই হয়।' রোগের অষ্টাদশ দিবসে দাদাদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার ভিতর যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল; ঊনবিংশ দিবসে অকস্মাৎ মাথাধরা কমিয়া গেল, শারীরিক কোন গ্লানিই আর রহিল না। বিংশ দিবসে পথ্য পাইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম।

এতকাল সাধন ভজন, ব্রত নিয়ম সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল। আরোগ্য লাভের পরে আবার সাধন করিতে প্রবল স্পৃহা জন্মিল। আমি নিয়ম করিয়া ঠিক সেইমত চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ছয়টাহইতে এগারটা পর্য্যন্ত নাম, প্রাণায়াম, পাঠ ও ধ্যান করিতে লাগিলাম। আহারান্তে সাড়ে বারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত নাম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছি। রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বারটা কখনও বা একটা পর্য্যন্ত নিদ্রায় যায়; তৎপরে ভোরবেলা পর্য্যন্ত প্রাণায়াম, কুম্ভক, নাম ও ধ্যান করিয়া সময় কাটাইয়া থাকি। এই ভাবে পরমানন্দে আমার দিন রাত চলিয়া যাইতেছে।

সদগতিপ্রার্থী শক্তিশালী মৃতাত্মার উপদ্রব।

এবার ফয়জাবাদে আসিয়া অনেক নূতন নূতন ব্যাপার দেখিলাম। তাহার মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। এখানে আসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজনের সুবিধার জন্য

ঠাকুরঘরে আসন করিয়াছি। উপরে দুইটি মাত্র কোঠা। দাদার থাকিবার ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বেই ঠাকুরঘর; এই ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি বড় জানালা আছে। নীচেই বিস্তৃত বাগান। জানালার পাঁচ ছয় হাত অন্তরেই একটি সুন্দর বেলগাছ। বেলগাছের নীচে একটু দূরেই বাহিরের পায়খানা। ঠাকুরঘরে, জনৈক পরমহংসপ্রদত্ত দাদার শালগ্রাম রহিয়াছেন। এই ঘরের এক কোণে আসন পাতিয়া আমি সাধন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে সুস্পষ্ট শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আমার কাণে আসিতে লাগিল; ঠিক যেন কোন এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে বসিয়া সজোরে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া ফেলিয়া প্রাণায়াম করিতেছে। আমি চোখ মেলিয়া চারি দিকে তাকাইতে লাগিলাম; শূন্য ঘরে মুহুর্মুহুঃ ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। অনুসন্ধানে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আসনে স্থির হইয়া বসিলেই এইপ্রকার শব্দ আরম্ভ হয়, যতক্ষণ আসনে বসিয়া থাকি, এই শব্দের বিরাম নাই; ইহাতে আমার বড়ই উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। তিন চার দিন পরে দাদাকে এ বিষয় জানাইলাম। দাদা বলিলেন—'গোস্বামী মহাশয়ের যাওয়ার পরহইতে এখানে এই এক নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুরঘরে গেলেই আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাই। বাসার কেহই সহজে ঐ ঘরে যায় না: সকলেই ঐ প্রকার শব্দ শুনিয়া থাকে ; চোখে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু দেখে নাই। একাকী কখনও আমি ঐ ঘরে বসি না। তুমি এতদিন যে ঐ ঘরে আছ, ইহা খুব আশ্চর্য্য।' আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'গোস্বামী মহাশয় যখন এখানে এসেছিলেন তখন কি তিনি এখানে কোন ভূত প্রেত আছে এরূপ বলেছিলেন?' দাদা বলিলেন—"গোঁসাই যেদিন এখানে এলেন, ভোরে বাহিরের পায়খানায় যাইতেই একটি ভূত তাঁর নিকট উপস্থিত হ'ল, আর নানা প্রকার গোলমাল আরম্ভ করলো। এদিকে চা প্রস্তুত, সকলে গোঁসাইয়ের অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন; গোঁসাইয়ের আস্‌তে অত্যন্ত বিলম্ব দেখে সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। কেহ কেহ দূর হ'তে দেখতে লাগ্‌লেন গোঁসাই আস্‌ছেন কি না। পরে আমাকে উঁহারা জিজ্ঞাসা করায় আমি বল্‌লাম 'গোঁসাইকে ভূতে ধরেছে।' উঁহারা সকলে আমার কথা শুনে তামাসা মনে কর্‌লেন। আধ্ ঘণ্টারও পরে গোঁসাই এলেন। হাত মুখ ধুয়ে দরজার সম্মুখে দাঁড়ায়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গোঁসাই বল্‌লেন—**"দুর্গা! দুর্গা!! বাবা! কি উৎপাত! কি উৎপাত! বাঁচা গেল।"**

শ্রীধর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'কি?'

গোঁসাই বল্‌লেন—**বেলগাছে একটি ভূত আছেন, তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ। সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন; যানও না, মহামুস্কিল! তাই বিলম্ব হলো।**

ভূত কি বলিল জিজ্ঞাসা করাতে গোঁসাই বলিলেন—**পায়খানায় যাওয়ামাত্রই ভূত সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বল্‌লেন—"আপনি এখানে আস্‌বেন জেনে আজ বার বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় এখানে আছি, এখন আমার গতি করুন।" আমি তাঁকে বল্‌লাম—'আপনি এখন সরে যান; আমি পায়খানা সেরে নেই, পরে যা হয় শুন্‌বো এখন।' তিনি কিছুতেই দরজা ছাড়্‌লেন না: কান্নাকাটি গোলমাল আরম্ভ কর্‌লেন; তাঁর সদগতির জন্য আমাকে**

প্রতিজ্ঞা করালেন; এখানে তিনি কাহারও কোনও অনিষ্ট কর্‌বেন না, যথাসাধ্য উপকারই কর্‌বেন, স্বীকার কর্‌লেন। তাঁর আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর্‌তে হবে, বল্‌লাম। পরে তাঁকে সরায়ে দিয়ে পায়খানা সেরে এলাম; তাতেই এতক্ষণ বিলম্ব হ'লো।

দাদার এসকল কথা শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইল। আমি ঠাকুরঘরেই আসন রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে দিবারাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। গুরুদেব বলিয়াছিলেন, **'প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মোপাসনা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সহজে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।'** আমি নাম করিবার সময়ে গুরুর ধ্যান ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, নিরাকার পরব্রহ্মের অস্তিত্বমাত্র ধ্যান করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ এইরূপ উপাসনায় আমার খুব আনন্দই বোধ হইতে লাগিল। আর আর দিনের মত রাত্রি ১ টার সময়ে জাগিলাম; হাত মুখ ধুইয়া, শুষ্ক মোটা কাষ্ঠের ধুনি জ্বালিয়া, আসনে বসিলাম। প্রাণায়াম, কুম্ভক যথামত করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। শরীর একটু অবসন্ন বোধ হওয়ায়, বালিশের উপরে একটি বাহু রাখিয়া কাৎ হইয়া রহিলাম। উপরের একটি পা গুটাইয়া রাখিয়া, অপরটি দেওয়ালের দিকে ছড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে আমার ধুনি 'ধা ধা' করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কখনও চোখ মেলিয়া, কখনও বা বুজিয়া, নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। একটু পরেই সুস্পষ্টভাবে ঠাকুরের রূপ আমার মনে পুনঃপুনঃ উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আমি উহা মনহইতে সরাইয়া দিয়া, ব্রহ্মধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে লাগিলাম। এই সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি আমার পায়ের দিকে আসনের উপরে একটি লোক বসিয়া আছে। লোকটির আকৃতি ভয়ঙ্কর ডনগীরের মত—বর্ণ কালো, মাথা নেড়া, চক্ষু দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তার চো'খে চোখ্ পড়াতে সে আমাকে ইঙ্গিত করিয়া আসনে উঠিয়া বসিতে বলিল এবং তাহার সহিত প্রাণায়াম করিতে সঙ্কেত করিল। 'সাধনের আসনে অপরে বসিলে সাধনের জমাট ভাব নষ্ট হইয়া যায়, অন্যের ভাবে আসন দুষ্ট হয়, এজন্য অন্যকে ভজনের আসনে বসিতে দিতে নাই' এই কথা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং উহাকে আমার আসনে বসিতে দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইল। নামিয়া বসিতে এক বার আমি উহাকে বিরক্তির সহিত বলিলাম, কিন্তু আমার কথা সে গ্রাহ্য না করিয়া, স্থিরভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন আমি ক্রোধভরে গুটান বাম পা আকর্ষণ করিয়া সজোরে উহার বুক লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিলাম। পা'টি উহার শরীর ভেদ করিয়া দ্রুম্ শব্দে দেওয়ালে গিয়া লাগিল; কিন্তু উহার শরীরের স্পর্শ বিন্দুমাত্রও অনুভব হইল না। লাথি মারা মাত্রেই লোকটি এক অদ্ভুত শক্তি প্রয়োগ করিল। অকস্মাৎ প্রাণায়ামে ভয়ানক দম দিয়া খট্ খট্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। উহার বাহুদ্বয়ের, গলার ও মস্তকের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল পরিষ্কার দেখিতে লাগিলাম। তখন আমার ভিতরের বায়ু প্রাণায়ামের প্রবল টানে আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ দম চড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও বায়ু টানিয়া লইতে পারিলাম না। কুম্ভকদ্বারা ঘরের সমস্তটা বায়ু স্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছে বুঝিলাম। তখন সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল, নড়িবারও আমার শক্তি রহিল না। আমি আসন্নকাল উপস্থিত বুঝিয়া অভ্যাসবশতঃ নিরাকার

ব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলাম। এসময়ে ভাঙ্গের নেশার মত কি যেন আমাকে এক একবার শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া ভয়ানক আতঙ্কে ও যন্ত্রণায় আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। উঠাপড়ার পাকে অস্থির হইয়া, তখন গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। আমার সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইল। এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলাম, কিছুই জানি না; পরে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস চলিতে লাগিল। একটু পরেই আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি ঝাঁ করিয়া আসনে উঠিয়া বসিলাম। তখন তেজের সহিত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ভূতকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও এই দিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাগ্রত অবস্থায় এই প্রকার ভূতের উপদ্রবে আমি আর কখনও পড়ি নাই। এই ভূতটি যে মহাশক্তিশালী পুরুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, এক দিন রাত্রি প্রায় একটার সময়ে স্বপ্ন দেখিলাম—একটা দস্যু দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়া দাদাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে একগাছি বড় লাঠিদ্বারা দাদার মাথায় ঠনাঠন আঘাত করিতেছে, আর আমি দাদাকে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া যাইতেছি। স্বপ্নটি দেখিয়াই নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়াই দাদার ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ এবং মহা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। প্রাণ আমার চমকিয়া উঠিল। আমি দাদার ঘরে ছুটিয়া গেলাম; গিয়া দেখি দাদা বিছানায় বসিয়া হাত পা আছড়াইতেছেন, শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে দাদাকে জড়াইয়া ধরিলাম । কতক্ষণ পরে, দাদা শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে সমর্থ হইলেন । সুস্থ হইয়া দাদা বলিলেন—'স্বপ্নে দেখিলাম —একটা লোক আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে; তাহাতেই আমার শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল।'

সত্য স্বপ্ন, চক্ষের অসুখ ।

আর এক দিন, নাম করিতে করিতে শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাবেশ হইল । স্বপ্নে দেখিলাম—একটি গৌরবর্ণ পবিত্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওহে, তোমার বামচক্ষুটি আজ উঠবে, ৩/৪ দিন একটু যন্ত্রণা হবে, পরে সেরে যাবে; ব্যস্ত হইও না ।' সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া দাদাকে চক্ষু দু'টি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমার কি চোখ উঠবে?' দাদা দেখিয়া বলিলেন—'চোখ্ বেশ পরিষ্কার, চোখ্ উঠবার কোন লক্ষণই দেখ্‌ছি না।' কিছুক্ষণ পরে, স্বপ্নের কথা ভুলিয়া গেলাম। বেলা ৮টার সময়ে চোখ্ একটু 'আস্ আস্' (ভারি) বোধ হইতে লাগিল। একটু পরেই বাম চক্ষুটি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ভয়ানক জ্বালা আরম্ভ হইল; দাদা আসিয়া চক্ষের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। চার দিন খুব যন্ত্রণা ভোগ হইল, পরে সারিয়া গেল। কোনও ঔষধ ব্যবহার করিলাম না। অক্ষরে অক্ষরে স্বপ্ন সত্য হইল দেখিয়া, বড়ই আনন্দ হইল।

ক্ষুধার্ত্ত শালগ্রাম।

এক দিন সকাল বেলা, আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, যজ্ঞধূমের অতি পবিত্র গন্ধ পাইতে লাগিলাম। কোথা হইতে এই গন্ধ আসিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না। অন্য কোথাও এই গন্ধ নাই, শুধু ঠাকুরঘরেই সুগন্ধ 'গম্ গম্' করিতেছে। প্রাতঃকালহইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একই ভাবে সমস্ত দিন এই আশ্চর্য্য গন্ধ রহিল। গন্ধের গুণে চিত্ত প্রফুল্ল হইতে লাগিল। সকলেই ঠাকুরঘরে সারাদিন এই গন্ধ পাইয়া বিস্মিত হইলেন। গন্ধের কোন প্রকার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া দাদা বলিলেন—'ইহা আমার শালগ্রাম ঠাকুরের গায়ের গন্ধ; তাহা না হইলে, ঘরের বারেন্দায় পর্যন্ত এই গন্ধ নাই কেন?' আমি দাদার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। দাদা তখন শালগ্রামের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন—'আমার নারায়ণকে তুমি বিশ্বাস কর না; আমিও উঁহাকে পাথর ভিন্ন কিছুই মনে করিতাম না; কিন্তু এখন শালগ্রামের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া বিশ্বাস না করিয়া পারিতেছি না। এক দিন হঠাৎ একটি দীর্ঘাকৃতি জটাজূটধারী, সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র, তিনি শালগ্রামটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'এই শালগ্রাম ঘরে রাখিয়া আপনি সেবা পূজা করুন, আপনার বিশেষ কল্যাণ হইবে।' আমি ওসব বিশ্বাস করি না; সেবা পূজাও করিতে পারিব না বলিয়া, উহা লইতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন— 'আচ্ছা, আপনি শুধু এই চক্রটি ঘরে রাখিয়া দিন, ইনি নিজেই নিজের সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।' আমি সন্ন্যাসীর কথামত, ঘরের একটি স্থানে উহা রাখিয়া দিলাম, খোঁজ খবর কিছুই রাখিতাম না। এক দিন রাত্রে, শালগ্রাম স্বপ্ন দিলেন—'দেখ এই আবর্জ্জনার ভিতরে আমাকে ফেলে দিয়েছে!' সকালে উঠিয়া আবর্জ্জনার ভিতরহইতে শালগ্রামটি লইয়া আসিলাম। কে কখন কি ভাবে উহা ফেলিয়া দিয়াছিল, কিছুই জানি না। তাই একটু আশ্চর্য্য হইলাম। এই ঘটনায় শালগ্রামের উপরে একটু ভক্তিও হইল। আমি শালগ্রামটি আনিয়া ঘরে একখানা ছোট চৌকীর উপর রাখিয়া দিলাম; প্রত্যহই আমি স্নানের পর কিছু সময় আসনে বসি, সেই সময়ে শালগ্রামটিকে স্নান করাইয়া, ফুল তুলসী দিতে লাগিলাম। এই সময়হইতেই শালগ্রামটি পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে আমাকে এমন ভাবে কৃপা করিতে লাগিলেন যে, তাহা কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। যেমন শালগ্রামের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, তেমনই আমারও শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের এখানে আসার পরহইতে, তাঁহার কথায় রীতিমত শালগ্রামের সেবা পূজা করিতেছি। ঠাকুর আমার পাথর নন, জাগ্রত দেবতা; তিনি ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এক দিন তিনি অযোধ্যা যাইয়া সমস্ত ঠাকুর দর্শন করিয়া আসিলেন। বাসাতে পঁহুছিয়াই, আমার ঠাকুর দর্শন করিতে, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। একটুকু সময় শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি করিয়াই, তিনি বালকের মত কান্দিতে লাগিলেন, চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল; তিনি ব্যস্ত হইয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া, পরে নিজের আলখিল্লার পকেটে হাত দিলেন এবং কিছু পেঁড়া বরফি বাহির করিয়া ঠাকুরের কাছে

ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। মিষ্টি কোথায় পাইলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন— **"আমি কিছু মিষ্টি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলাম; ঠাকুরঘরে যেতেই, ঠাকুর প্রকাশ হ'য়ে আমার নিকটে দুহাত পেতে বল্‌লেন, 'শীঘ্র আমাকে কিছু খেতে দাও; অনেক দিন আমি উপবাসী আছি, ইহারা আমাকে খেতে দেয় না।' আমার পকেটে যাহা ছিল, তাহাই নারায়ণকে দিলাম। সমস্ত মন্দির ও দেবালয় দেখে এলাম, কিন্তু এরূপটি আর কোথাও দেখ্‌লাম না। এখানে, বামনদেব সর্ব্বদা জীবন্তভাবে প্রকাশ রয়েছেন। নিয়মমত ঠাকুরের সেবা পূজা কর্‌তে হয়।"**

দাদা বলিলেন—'হাঁসপাতালের কাজকর্ম্ম করিয়া শালগ্রামের পূজা করিতে বড়ই অসুবিধা হয়, ভোগের বন্দোবস্ত এখানে করা আরও কঠিন।' গোঁসাই এই কথা শুনিয়া বলিলেন— **"হাঁসপাতালে যাওয়ার পূর্ব্বে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে একবার গিয়ে নারায়ণকে স্নান করায়ে চন্দন তুলসী দিবেন; আর একটুকু মিষ্টি ও জল তুলসী নিবেদন ক'রে দিলেই হবে"** আমি গোস্বামী মহাশয়ের কথামতই এখন শালগ্রামের পূজা করিতেছি। আমি দাদাকে বলিলাম, 'এখানে যখন ঠাকুর আসিয়াছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আর কে কে ছিলেন? বাসায় সুবিধামত সকলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তো? ঠাকুর কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন? সারাদিন কোথায় কোথায় বেড়াতেন? এসকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়।'

ফয়জাবাদে গোঁসাইয়ের অবস্থিতি।

দাদা বলিতে লাগিলেন—তোমার পত্র পাইয়াই আমি তিন চারি দিনের ছুটি লইয়া গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে কাশীতে গেলাম। তাঁহাকে বহুকাল পরে দেখিলাম, দেখিয়াই মনে হইল তিনি আর সে মানুষ নাই, এখন তিনি আকৃতি প্রকৃতিতে সাক্ষাৎ মহাদেব হইয়াছেন। আমার বড়ই আনন্দ হইল। ছুটি অল্প দিনের ছিল বলিয়া আমাকে শীঘ্রই চলিয়া আসিতে হইল। আসিবার সময়ে গোস্বামী মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার পথে ফয়জাবাদ হইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া আসিলাম; তিনি দয়া করিয়া আমার কথায় সম্মত হইলেন। গোঁসাই কয়েকদিন পরেই এখানে আসিলেন; তাঁর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, যোগজীবন, হরিমোহন, দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মাণিকতলার মা ও তাঁর স্বামী ব্রজ বাবু আসিয়াছিলেন। আমার বাসায়ও তখন দেবেন্দ্র পাল প্রভৃতি চার পাঁচটি ছিলেন; স্থানাভাব বশতঃ বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া আমরা সকলে থাকিতাম। আমি গোস্বামী মহাশয়ের পাশেই শয়ন করিতাম, দেবেন্দ্র আমার অপর পাশে থাকিত। গোঁসাই ঘুমাইতেন না, সারারাত্রি বসিয়া কাটাইতেন। এক দিন রাত্রি আড়াইটার সময়ে, কেন জানি না, দেবেন্দ্র আমার বুকে একটি চাপড় মারিল। শক্তিচুরির এবং বশীকরণাদির ক্ষমতা উহার ছিল। চাপড় খাইয়া আমি জাগিয়া পড়িলাম। ভিতরটা যেন নিস্তেজ, শূন্য হইয়া গেল, মনটি বড়ই বিশ্রী হইল। তখন গোঁসাই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—**"অবিশ্বাসীর সংসর্গ হ'তে সাধু সাবধান। সাবধান।। সাবধান!!!** গোঁসাইয়ের

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে এমন একটা শক্তিসঞ্চার হইল যে, মনে হইতে লাগিল—ইচ্ছা করিলে আমি সমস্ত বাড়ী, ঘর, দালান, কোঠা লাথি মারিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি। দেবেন্দ্র তখন আমার পাশে আর থাকিতে পারিল না, উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

এক দিন গোস্বামী মহাশয় সকলকে লইয়া লেঙ্গা বাবার দর্শনে গেলেন। গোঁসাইকে দেখিয়া, লেঙ্গা বাবা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। পরে, সুস্থির হইয়া, গোঁসাইকে ওখানে একরাত্রি বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সম্মত হইলেন, বাবাজী মোটা চাউলের ভাত এবং রসুন দেওয়া ডাল প্রস্তুত করিয়া অতিথিসেবা করিলেন। শীতকালের রাত্রিতে সরযূর অনাবৃত চড়াতে সকলে থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, শ্রীধর, হরিমোহন এবং দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাত্র গোঁসাইয়ের সহিত রহিলেন; অবশিষ্ট সকলে চলিয়া আসিলেন। আমার বন্ধু দেবেন্দ্র ওখানে রাত্রি কাটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু লেঙ্গা বাবা তাহাকে থাকিতে দিলেন না। দেবেন্দ্র বাসায় আসিয়া, গোপনে আমার নিকট সকলের কুৎসা করিতে লাগিল; গোস্বামী মহাশয়কেও একবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিবে, এই প্রকার আস্ফালন আরম্ভ করিল। উহার কথা শুনিয়া আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। পরদিন সকাল বেলা, সকলকে লইয়া গোস্বামী মহাশয় বাসায় আসিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিবার সময়ে, দরজার নিকটে আসিয়াই বলিলেন— **'ওহে! এখানে সাধুনিন্দা হয়েছে; আর থাকা চল্‌বে না, তোমরা সকলে আসন তোল।'** এই বলিয়া গোঁসাই ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসনে বসিয়া খুব তেজের সহিত নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন—**"এঁদের জান্‌তে তোর ঢের দেরি! কতটুকু বুঝিস্? কি জানিস্? হয়েছে কি ? কিছুইত না—অনেক ঘুরপাক খেতে হবে, অনেক ভুগ্‌তে হবে। তুই আবার পরীক্ষা কর্‌বি কি?"**

গোঁসাই যখন এসব কথা বলিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তার মুখখানা কাল হইয়া গেল, সে চারি দিকে ব্যস্তভাবে তাকাইয়া, অমনি ঘরহইতে বাহির হইয়া পড়িল।

চা খাওয়ার পরে, সকলে বসিয়া গত রাত্রির দর্শনাদি বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করিলেন। ভূত প্রেত সঙ্গে মহাদেবকে, ডাকিনী যোগিনীর সঙ্গে কালীকে এবং মহাবীরকে যিনি যে ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। গোঁসাই সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—**"লেঙ্গা বাবার প্রার্থনাতেই সকলে এসে দর্শন দিয়েছিলেন। লেঙ্গা বাবা তোমাদের খুব কৃপা কর্‌লেন। তাঁর আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবেই, এইপ্রকার চড়াতে আমরা সামান্য শীতও অনুভব কর্‌লাম না। এটি বড় সহজ কথা নয়।"**

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—গায়ে তো আপনাদের সকলেরই মাত্র এক একখানা কম্বল, এই দারুণ শীতে সারারাত সরযূর খোলা চড়াতে আপনাদের কি শীতে কষ্ট হয় নাই?

ঠাকুর বলিলেন—**কই না, আমাদের তো কোন কষ্টই হয় নাই, ছাপ্পরের ভিতরে বেশ আরামে ছিলাম।**

হরিমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হাঁ, চমৎকার ছাপ্পর, দু'দিকে দু'টিমাত্র ভাঙ্গা টাট্টি, সম্মুখে ও পশ্চাতে খোলা, মাথার উপরে পরিষ্কার আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের ছাপ্পর। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কিছুক্ষণ পরে গায়ের কম্বল ফেলে দিতে হ'লো। গরম বোধ হ'তে লাগ্‌ল। তখন যোগজীবন বল্‌লেন—আমারও মনে হ'তে লাগ্‌ল, যেন একটা গরম হাওয়ার কুণ্ডলিতে আছি। শেষ রাত্রে ৪টার সময়ে ঐ কুণ্ডলিটি অন্তর্দ্ধান হ'লো। তখন সামান্য একটু শীত বোধ হয়েছিল। এই সময়ে ঠাকুর, দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**কি সাধন লেঙ্গা বাবা করেছিলেন জান?** দাদা বলিলেন—শুনেছি, শব-সাধন করেছিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ, তাই সম্ভব। নইলে এ প্রকার শক্তি এত সহজে লাভ হ'তে বড় দেখা যায় না। কিন্তু এই শক্তি বেশী দিন থাকে না। এই সাধন মার্গের সাধুদের প্রকৃতি যেরূপ উগ্র হয়, লেঙ্গা বাবার তেমন নয়। ইনি বেশ শান্ত।** এই বলিয়া লেঙ্গা বাবার তপস্যার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সব তপস্যায় সিদ্ধ হ'লেই কি মানুষ দীর্ঘজীবী হয়?

ঠাকুর বলিলেন—**না, সিদ্ধ হ'লেই যে মানুষ দীর্ঘজীবী হবে তা নয়। কায়াকল্পে সিদ্ধ হ'লে শরীর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।** এই বলিয়া তিনি একটি ফকির সাহেবের কথা বলিলেন—

কায়াকল্পি ফকিরের কথা।

(এই গল্পটি ঠাকুরেব মুখে আমি যে প্রকাব শুনিয়াছিলাম, দাদার ডায়েরিতেও অবিকল সেইরূপ দেখিয়া লিখিয়া রাখিতেছি।)

ঠাকুর কহিলেন—**গয়াতে যখন ছিলাম, প্রায়ই একটি ফকিরের নিকটে যাওয়া আসা কর্‌তাম। ফকিরটি নির্জ্জন স্থানে জঙ্গলের ভিতরে একটি ভাঙ্গা মস্‌জিদে থাকতেন। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্‌জিদের বারেন্দায় লম্বা হ'য়ে বেহুঁস অবস্থায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছেন। ওদিন কিছুক্ষণ সেখানে চুপ ক'রে ব'সে থেকে চ'লে এলাম। এইরূপ পাঁচ সাত দিন গেল, রোজ আমি একবার ক'রে ফকির সাহেবকে দেখ্‌তে যেতাম। এক দিন গিয়ে দেখি, ফকিরের শরীরটি ভয়ানক ফুলে গেছে, আর তাহাতে বিষ্ঠার কীটের মত লেজওয়ালা বড় বড় পোকা সর্ব্বশরীরে ব'সে রক্ত পান কর্‌ছে। সরিসার মত স্থানও ফাঁক নাই, ফকির সাহেব পোকার কামড়ের যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে গোঁ গোঁ কর্‌ছেন। দেখে বড়ই কষ্ট হ'লো;ওখানে এমন একটি পাখীও ছিল না যে, পোকাগুলিকে এসে খায়। এমনই ভগবানের লীলা!**

তখন এক দিন একটি মুসলমান্ তালুকদার এসে, আমাকে ফকির সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাঁকে ফকির সাহেবের নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি যেন উঁহার কোন প্রকার প্রতিকার কর্‌তে গিয়ে, ফকির সাহেবকে বিরক্ত না করেন, বিশেষ ক'রে বল্‌লাম। কিন্তু

তিনি আমার কথা শুন্‌লেন না; ধীরে ধীরে ফকিরের নিকটে গিয়ে ব'সে, আস্তে আস্তে দুই তিনটি পোকার লেজ ধ'রে টেনে তুল্‌লেন। আর অমনি সে স্থান হ'তে অজস্র রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো। ফকির সাহেব চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। তালুকদার তখন চম্‌কে গেলেন। সেই সেই স্থানে পোকা কয়টিকে তুলে আবার বসায়ে দিতে ফকির সাহেব বারম্বার চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন। মুসলমান্‌টি ঐরূপ করার পরে, ফকির নীরব হলেন। তালুকদার খুব আক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন। আমিও বাসায় এলাম। ইহার কয়দিন পরে, এক দিন গিয়ে দেখি, ফকির সাহেব মস্‌জিদের বারেন্দায় পায়চারি কর্‌ছেন। মুখশ্রী সুন্দর প্রফুল্ল, শরীরে যেন একটা জ্যোতি খেল্‌ছে। তখন বুঝ্‌লাম ফকির সাহেবের সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে, কিছুদিন পরে আর তাঁকে দেখা গেল না। কোথায় চ'লে গেলেন।

শুনিয়াছি—দেহকল্পে তিন শত বৎসর, পাঁচ শত বৎসর, হাজার বৎসর পরমায়ু লাভের জন্য সঙ্কল্প করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাধন, আচার, নিয়ম ও ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়। পক্ষারম্ভহইতে পক্ষান্ত পর্য্যন্ত পনের দিন, কেহ বা এক মাস, আবার তেমন সমর্থ তপস্বী ব্যক্তি দীর্ঘ পরমায়ু লাভের জন্য ঔষধ সেবন পূর্ব্বক দেড় মাস কাল, নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া দেহকল্পে সিদ্ধ হন।

আমি যখন ভাগলপুরে ছিলাম, তখন দু'টি সাধু গঙ্গাতীরে বারোয়ারির নির্জ্জন বহুপুরাতন অন্ধকার 'গোহফাতে' তিনশত বৎসরের জীবনলাভ সঙ্কল্প করিয়া পনের দিনের জন্য এই সাধনে প্রবৃত্ত হন। ঔষধের গুণে নাকি, দিন দিন তাঁহাদের শরীরের মাংস ধীরে ধীরে পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, অমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানে নূতন মাংস গজাইতে আরম্ভ করিল, একটি সাধুর যন্ত্রণায় মৃত্যু হইল। অপরটি সিদ্ধিলাভ করিয়া পনের দিন পরে কোথায় চলিয়া গেলেন, খোঁজ পাওয়া গেল না। ভগবানের সৃষ্টিতে কত কি আছে জানিবার পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করা যায় না!

গোস্বামী মহাশয় এক দিন অযোধ্যা যাওয়ার সময়ে গাড়ীতে বসিয়া, রানুপালীর প্রকাণ্ড ময়দানে, অপূর্ব্ব রাজবেশে রাম-সীতার দর্শন পাইলেন। সে দিন তিনি সরযূতে স্নান করিয়া হনুমানগোরী, রংমহল, রাম-সীতার মন্দিরাদি অনেক ঠাকুরবাড়ীতে গিয়াছিলেন। মাধুদাস বাবার আশ্রমে যাইয়া, তাঁর শিষ্য নারায়ণদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মণি বাবার আশ্রমে গেলেন। অযোধ্যাতে সকলেই মণিবাবাকে সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া জানেন। গোঁসাইকে দর্শন করিয়া, তিনি আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। কতক্ষণ পরে উঠিয়া করজোড়ে গোঁসাইকে বলিলেন—"কৃপা কর্‌কে দর্শন তো দিয়া, আউর হামারা রয়্‌নেকা প্রয়োজন ক্যা? আপ্ হামারা স্থান পর্ রহিয়ে, হাম্ দেহ ছোড় দেতে।" গোঁসাইও যেন কতকালের পরিচিত লোক পাইয়া, তাঁর সঙ্গে সেইভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। পতিতদাস বাবাজীকে দর্শন করিতেও গোঁসাই গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের সম্মিলনে যে আনন্দোচ্ছ্বাস ও ভাবাবেশ হইয়াছিল, তাহা আমরা আর কি বুঝিব?

দাদা কহিলেন—আহারাদি আমাদের সকলের এক সঙ্গেই হইত। যাঁহারা মাছ খান, তাঁহারা পূর্ব্বেই আহার করিতেন। আমি গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পাশেই বসিতাম। এক দিন আহার করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, আমি মাছ খাই; অমনি তিনি রশুইয়ে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আমাকে মাছ দিতে বলিলেন। আমি পুনঃপুনঃ আপত্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে তাঁহার একান্ত আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া, আমি মাছ খাইলাম। গোঁসাই বলিলেন—**"আপনি স্বচ্ছন্দে মাছ খান, ওতে আমার কোন অসুবিধাই হয় না।"** আহারের সময়ে আমার মুখে খাওয়ার শব্দ হইত। তাহা শুনিয়া এক দিন বলিলেন—**"আহারে খাওয়ার শব্দ না হওয়াই ভাল।"** আমি সেইহইতে সাবধান হইয়া আহার করি। মাণিকতলার মা, বহুকালযাবৎ আহারত্যাগী, তিনি এক গণ্ডূষ জলও খাইতেন না; অনুরোধ করিয়া কোন ভাল জিনিস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বমি হইয়া যাইত। এইপ্রকার অদ্ভুত অবস্থা কোথাও দেখি নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধে ঠাকুরের পরমাত্মীয় নানকপন্থী সিদ্ধ মহাত্মা মাধুদাস বাবাজীর জনৈক শিষ্য, ভজননিষ্ঠ কানাইয়ালাল বাবা প্রায় সর্ব্বদাই গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে থাকিতেন। তিনি একদিন অপ্রাকৃত অম্বুরাশিমধ্যে মৎস্যাবতার ভগবান্‌কে গোঁসাইয়ের সম্মুখে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে দেখিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাধুদাস বাবার বহু গণ্য মান্য ইংরাজী শিক্ষিত শিষ্যগণ, অনেক সময়েই গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে থাকিতেন। তাঁহারা ওখানে নানাপ্রকার অলৌকিক দৃশ্য ও নিজ অভীষ্টদেবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন।

ঠাকুরের ফয়জাবাদে অবস্থানকালে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা ঠাকুরের মুখে শুনিয়া লিখিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

ফয়জাবাদে প্রায় দুই মাস কাল দাদার সঙ্গে খুব আনন্দে কাটাইলাম; অকস্মাৎ এক দিন বাড়ীহইতে খবর আসিল, মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা হইয়াছেন। দাদা আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই কয়মাস যে ভাবে আমার নিকটে কাটাইলে, তাহাতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি একান্ত প্রাণে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করুন। গোস্বামী মহাশয় তোমাকে মা'র সেবা করিতে বলিয়াছেন; এখন তুমি বাড়ীতে যাইয়া মায়ের সেবা কর, তাহাতেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হইবে।' দাদার আদেশ মত আমি বাড়ী রওয়ানা হইলাম; কাশীতে, ভাগলপুরে, কলিকাতা ও ঢাকাতে প্রায় এক মাস কাল আমার বিলম্ব হইল। রাস্তায় যে যে স্থানে, যে সকল অবস্থায় পড়িলাম, তাহা বিস্তারিত লেখা অনাবশ্যক। শ্রীবৃন্দাবনে গুরুদেবের দয়ায় ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, যে দেবদুর্লভ অবস্থা ভোগ করিয়াছিলাম, আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় পড়িয়া তাহাহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। কি প্রকার দুর্ঘটনায় কি ভাবে কতদূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাই স্মৃতিতে রাখিবার জন্য ঘটনার আভাসমাত্র সামান্য রূপে উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যের অদ্ভুত অবস্থা।

গুরুদেব যে দিন আমাকে ঋষিগণের আদরের পরম পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রত দিলেন, সে দিন আমাকে তিনি কি যে করিলেন, তিনিই জানেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, আমি আর সেই মানুষ নাই। আমার সমস্ত দেহ মন অন্যপ্রকার হইয়া গেল, নিজের শরীরের প্রতি যখন আমি দৃষ্টি করিতাম, চর্ম্ম-মাংস বর্জ্জিত স্বচ্ছ কাচের দেহ মনে হইত। রাস্তা ঘাটে চলিতে ফিরিতে তূলার মত হাল্‌কা দেহটি যেন মাটির উপরে বায়ু অবলম্বন করিয়া চলিতেছে, অনুভব করিতাম। উপবীত স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মচর্য্যের বৈদিক মন্ত্র আপনা আপনি স্মৃতিতে আসিয়া, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ঋষি' এইপ্রকার একটা ভাবের সঞ্চার করিয়া দিত। জপের সময়ে নামটি একটি সারবান্, সজীব শক্তিশালী মন্ত্র বলিয়া বোধ হইত। তাহাতে নূতন নূতন উচ্ছ্বাস ও ভাবের তরঙ্গ অন্তরে প্রায় সর্ব্বদাই খেলিতে থাকিত। বহুকালের অভ্যস্ত কামিনীকল্পনা, প্রমোদবাসনা অজ্ঞাতসারে অন্তরে উদয় হইলে বিষম বিরক্তি জন্মিত, জ্বালা উপস্থিত হইত। শুধু শুদ্ধ দেহের অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করিয়াই, সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। ভাবিতাম 'এ কি হইল? গুরুদেব আমাকে এ কি করিলেন?' গুরুদেবের শ্রীচরণে বিদায়গ্রহণের পরেও, অনেক দিন তিনি আমাকে এই অপূর্ব্ব অবস্থা সম্ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। পরে, জানি না কেন, দয়াল ঠাকুর একটি ললনার সূত্র করিয়া, আমার অচল ব্রতের প্রলয় ঘটাইলেন; আমিও, ধীরে ধীরে নিস্তেজ, হীনপ্রভ হইয়া পড়িলাম।

প্রলোভনে অবিকার; অহঙ্কারে পতন।

মাতাঠাকুরাণী পীড়িতা, এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার সেবার জন্য অবিলম্বে বাড়ীতে পৌঁছিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু বিধির পাকে, দুর্ম্মতিবশতঃ এদিকে সেদিকে মাসাধিক কাল ঘুরিয়া বেড়াইলাম। এই সময়ে কিছু দিন একটি পরিচিত লোকের ভবনে, আমায় অবস্থান করিতে হইল। তিনি উপর্য্যুপরি কতকগুলি অনর্থে উত্তেজিত হইয়া, উহার উপশম প্রয়োজনে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। ঘরে একটি স্ত্রীলোক মাত্র রহিলেন। চাকর চাকরাণী ব্যতীত অন্য পরিজন না থাকায়, কামিনীর তত্ত্বাবধানের ভার, বাবু আমারই উপরে রাখিয়া গেলেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হেতু সজনে, নির্জ্জনে নিঃসঙ্কোচে আমার সহিত উঁহাদের আলাপন, উপবেশন বহুকালযাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আমার আসন ও শয়নের স্থান উঁহাদের আগ্রহ ও জেদে ভিতরেই হইল। বেলা বারটা পর্য্যন্ত আমি নির্জ্জন সাধন ভজনে কাটাইতাম, রমণী তখন আপন গৃহকর্ম্মে রত থাকিতেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে, ভৃত্যবর্গ বাহিরে চলিয়া যাইত। কামিনী তখন একাকিনী এক ঘরে না থাকিয়া আমার ঘরে আসনের কিঞ্চিৎ অন্তরে শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এই সময়ে তিনি ধর্মপ্রস্তাব তুলিয়া, সরলতার ভানে, নিজের আভ্যন্তরিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষম সঙ্কট সমস্যায় পড়িয়া, কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।

উঁহার কোন চেষ্টায়ই বাধা দিতে আমি সাহস পাইলাম না। মনে হইল এই অবস্থায় উঁহাদের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমার কোন বিরুদ্ধ ব্যবহারে, যদি উঁহার মর্ম্মে ও অভিমানে আঘাত পড়ে, এখনই যুবতী আমার নামে কুৎসিত কথা বলিয়া, চীৎকার করিয়া দশ জনকে একত্র করিবেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে অপদস্থ করিয়া চিরকালের মত আমার অখ্যাতি অপযশ দেশে বিদেশে রটনা করিবেন। এক দিবস আমি বিষম বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া, আতঙ্কে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুর কতবার বলিয়াছেন—**'পুরুষ অভিভাবক উপস্থিত না থাকিলে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষণকালও, অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নয়'** মনে হইল ঠাকুরের এই অনুশাসন বাক্য, সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াই, আজ আমি বিপন্ন হইলাম। তখন গুরুদেবের অভয় চরণ স্মরণ করিয়া, পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিরিক্ত সাহসে বিষম চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া, অবশেষে 'ও হরি! তুমি ব্রহ্মচারী' বলিয়া সলজ্জ হাসিমুখে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি তখন স্পর্দ্ধিত মনে ভাবিতে লাগিলাম—'ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া, নিশ্চয়ই আমার অপূর্ব্ব শক্তি লাভ হইয়াছে; তাই ইদৃশ ব্যাপারে আমি নির্ব্বিকারে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি; আমি যথার্থই সাধনরাজ্যের পিচ্ছিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, নিরাপৎ ভূমি লাভ করিয়াছি।' কিন্তু হায়, এই প্রকার অযথা অহঙ্কারের কয়েক দিন পরেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বুঝিলাম। ঘটনার সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে আমার ভিতরে আগুন লাগিল। বেড়াপাক বহ্নির কালধূমে, দুর্লভ ব্রহ্মচর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে অন্তর্হিত করিল। আমি পূর্ব্বের অপূর্ব্ব পবিত্র অবস্থাহইতে স্খলিত হইলাম। পরদিবসেই বাবুটি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমিও অমনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

স্বপ্নে গুরুজীর অনুশাসন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই, উপর্য্যুপরি কয়েকটি স্বপ্ন দেখিলাম। একটা স্থানে পরিচিত অপরিচিত বহুলোক একত্র হইয়াছি। গুরুদেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার পিছনে পিছনে চল।' আমি গুরুদেবের আদেশমত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিস্তৃত ক্ষেত্রে, ছাগল ও ভেড়ার বিচিত্র ক্রীড়া দেখিয়া এক একবার দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেব তখন পশ্চাৎ দিকে তাকাইয়া আমাকে তাড়া দিতে লাগিলেন। আমিও অমনি ছুটাছুটি করিয়া গুরুদেবের সঙ্গ ধরিযা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই প্রকারে আমি ঠাকুরের সহিত একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের সমীপে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতে উঠিবার জন্য বহু গুরুভ্রাতা তথায় সমবেত আছেন দেখিলাম। গুরুদেব সেখানে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—**'তুমি এখানে থাক, আমি এখন যাই।'** ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি কান্দিয়া ফেলিলাম, এবং খুব আকুলভাবে বলিলাম—'আমি আপনার সঙ্গেই এই পর্ব্বতে উঠ্‌বো, আমাকে আপনার সঙ্গে নিন্।' ঠাকুর আমাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, **'তুমি বিষম একগুঁয়ে ছেলে। যা ইচ্ছা তুমি তাই ক'রে থাক। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কি শেষকালে উৎপাতে পড়্‌বো? এখানে কিছু কাল**

থাক; সকলে যখন যাবে, তুমিও তখন যেও; এখন আমার সঙ্গে পার্‌বে না।' এই বলিয়া গুরুদেব পাহাড়ে উঠিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, আমিও কান্দিতে কান্দিতে জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটি দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইল। খুব নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিলাম। গুরুদেবের নিকটে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তখন এক দিন স্বপ্নে দেখিলাম—একটি স্থানে হরিসঙ্কীর্ত্তনের মহাধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া বহু লোক ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। 'দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই' বলিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন। আমি ভাবিলাম—নিতাই পতিতপাবন, তাঁকে ডাকি। এই ভাবিয়া 'দয়াল নিতাই, দয়াল নিতাই' বলিতে বলিতে কান্দিতে লাগিলাম। এই স্বপ্নটি দেখিয়াও আমার প্রাণে শান্তি আসিল না, সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল—নিজের দোষেই দুর্লভ অবস্থা হারাইলাম। অনুতাপে ও ক্লেশে আমার সময় কাটিতে লাগিল। এক দিন খুব কাতরভাবে নিজের দুরবস্থা গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিয়া, শয়ন করিলাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম—অনেক গুলি লোক সঙ্গে লইয়া গুরুদেব একটি মহাসঙ্কীর্ত্তনে চলিলেন। আমি নিজের দুরবস্থায় ম্রিয়মাণ হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুদেব আমাকে বলিলেন—'**চল, সঙ্কীর্ত্তনে যাই; আজ কীর্ত্তনে তুমি বিশেষ কৃপা লাভ করবে।**' আমি নিজেকে পতিত ভাবিয়া, করজোড়ে কাঁপিতে লাগিলাম্। ঠাকুরের দিকে চাহিয়া কান্দিয়া ফেলিলাম। তখন গুরুদেব আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার শরীর প্রস্তরবৎ কঠিন বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোলে উঠিয়া ঠাকুরের দেহতূলার মত নরম, অনুভব করিতে লাগিলাম। সঙ্কীর্ত্তনস্থলে আমাকে কোলহইতে নামাইয়া বলিলেন, '**কিছু কাল তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি এখনই আবার আস্‌ছি।**' এই বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; আমিও অমনি জাগিয়া পড়িলাম।

এই স্বপ্নটি দেখার পর, ঠাকুরের দয়া ভাবিয়া প্রাণে অনেকটা শান্তি পাইলাম; কিন্তু গুরুদেবের অসাধারণ কৃপায় যে অদ্ভুত অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তাহা আর ফিরিয়া আসিল না। দাতা একমাত্র তিনি, তাঁর দয়ায় মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সেই অবস্থা আমার লাভ হইতে পারে—এই ভাবিয়া স্থির মনে সাধন ভজন করিতে লাগিলাম।

গুরুবাক্যে অনাস্থাহেতু দুর্দ্দৈব।

ফয়জাবাদ হইতে বাড়ী যাইবার সময়ে কাশীতে কয়েক দিন থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা হইল। এক দিন দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিব স্থির করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এক দিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"**তীর্থে গিয়ে প্রথমেই তীর্থগুরু করতে হয়, তাঁর অনুমতি নিয়ে পাণ্ডার সাহায্যে স্নান দর্শনাদি তীর্থের সমস্ত কার্য্য করতে হয়—ইহাই ব্যবস্থা।**"

এই প্রকার ব্যবস্থার তাৎপর্য্য কি, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্যই ইহা শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থা, মনে হয়। শক্ত সমর্থের জন্য এই প্রকার বাধ্যবাধকতার

কিছু প্রয়োজন আছে, বোধ হয় না। ইহা ভাবিয়া এই সকল নিয়মপদ্ধতিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি স্নান করিবার জন্য দশাশ্বমেধে উপস্থিত হইলাম; ঘাটে যাইয়া স্নানের উদ্যোগ করামাত্রই পাণ্ডারা আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কল্পমন্ত্র না পড়িলে দশাশ্বমেধে স্নান করিতে দিবে না বলিয়া, গোলমাল করিতে আরম্ভ করিল। আমি 'মন্ত্র তন্ত্র বুঝি না,' 'ঠাকুর দেবতা মানি না' বলিয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে রাস্তায় আবার পাণ্ডাদের মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। সামান্য দু'চার আনা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট মনে সুবিধামত আমাকে দর্শন করাইবে, বলিতে লাগিল। কেহ কেহ দু'চার পয়সার ফুল বিল্বপত্রের ডালি আমার সম্মুখে ধরিয়া, পয়সার জন্য বিরক্ত করিতে লাগিল। এসমস্ত পাণ্ডাদের শুধু পয়সা আদায়ের ফন্দি মনে করিয়া, সকলকে ধমক দিয়া বলিলাম—'অন্ধ, খোঁড়া, বুড়োবুড়ীদের দর্শন করায়ে গিয়ে পয়সা আদায় কর। তাদের জন্যই পাণ্ডা, আমি নিজেই বেশ দর্শন কর্‌তে পার্‌বো। ফুল, বেলপাতায় অনর্থক পয়সা ব্যয় কর্‌বো না। যিনি বিশ্বনাথ, তিনি কি আর ফুল বেলপাতার প্রত্যাশী? বাজে খরচের জন্য পয়সা নয়।' সকলেই আমার কথা শুনিয়া 'আরে রাম রাম' বলিয়া, সরিয়া পড়িল। আমি মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া লোকের ভিড় দেখিয়া অবাক্ হইলাম। অনেক চেষ্টায় ভিতরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু বহু লোকের ধাক্কায় পড়িয়া দেওয়ালের ধারে যাইয়া দাঁড়াইলাম। এত স্ত্রীলোক ও পুরুষ ঠেলিয়া বিশ্বেশ্বরদর্শন, আমার পক্ষে অসম্ভব বুঝিলাম। তখন বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটি সুন্দরী যুবতী, সুযোগ পাইয়া লোকের গোলমালে নানা কৌশলে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি বিপৎ বুঝিয়া অতি কষ্টে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। বিশ্বেশ্বরদর্শন হইল না বলিয়া, মনে কোনও উদ্বেগ আসিল না; বরং বিষম উৎপাতে নিষ্কৃতি পাইলাম ভাবিয়া সন্তুষ্টই হইলাম। বাসায় যাইবার সময়ে ভাল ভাল কমণ্ডলু দেখিয়া একটি ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইল। মূল্য দিতে টাকার অনুসন্ধান করিয়া দেখি পকেট শূন্য। ভিতরে জামার উপরের পকেটে ৩৫ টাকা ছিল তাহার একটিও নাই। আমার বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, যদি আট দশ আনা পয়সা পাণ্ডাদের হাতে দিয়া মন্দিরে যাইতাম, তাহা হইলে তাহারা আমার দর্শনের সুব্যবস্থা অনায়াসে করিয়া দিত। অন্য কোন উপদ্রবও আমাকে স্পর্শ করিত না, টাকাগুলিও এইভাবে হারাইত না। শাস্ত্রব্যবস্থার অমর্য্যাদা হেতু, ইহা আমার প্রতি গুরুদেবেরই অনুশাসন বুঝিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলাম। কাশীতে আমার থাকিতে আর উৎসাহ রহিল না; বিরক্তির নানাবিধ কারণ উপস্থিত হইল। আমি অবিলম্বে কাশী ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে পৌঁছিলাম। কিছুকাল তথায় যোগজীবনের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। পরে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মাণিকতলার মা।

কলিকাতা আসিয়া এক সপ্তাহ থাকিলাম। দাদা আমাকে মাণিকতলার মাতাজীর সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন; আমি দুইটি সমবয়স্ক বন্ধুকে লইয়া মাণিকতলার মাতাজীর বাড়ীতে গেলাম।

মাতাজীর স্বামী, দাদার পরিচয়ে আমাকে চিনিয়া, খুব আদরের সহিত সকলকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে মাতাজী ভাবাবেশে সমাধিস্থ ছিলেন। হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে করিতে করিতে ৫/৭ মিনিট পরে, তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি খুব স্নেহের সহিত আমাকে কিছু জলযোগ করিতে বলিলেন। 'আমি প্রসাদ ব্যতীত কিছুই খাই না' বলাতে, মাতাজী কহিলেন 'মাটিতে স্পর্শ করায়ে খাও, তা হ'লেই মায়ের প্রসাদ পাওয়া হবে। মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে, সর্ব্বপ্রথমে এই মায়েরই আশ্রয় নিতে হয়েছে; মাটিই যথার্থ মা। এই মাকে নিবেদন ক'রে মাটিতে স্পর্শ করায়ে নিলে, বস্তুর অপবিত্রতা দোষ থাকে না।'

মাতাজী আমাকে নিজহইতে অনেক উপদেশ করিলেন। আমি সেই সকল কথার কোন অর্থই বুঝিলাম না; তত্ত্বজ্ঞানের অতি দুর্ব্বোধ্য বিষয় সকল, বিশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় দু' ঘণ্টা কাল অবাধে বক্তৃতা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার তেজঃপূর্ণ ভাষার যোজনা, শব্দের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম। মাতাজীর বক্তৃতা শেষ হইলে পর বলিলাম, আপনি এতক্ষণ কি যে বলিলেন, কিছুই বুঝিলাম না। মাতাজী কহিলেন—'তোমাকে দেখিয়া ভিতরে একপ্রকার ভাব হ'লো; আপনা আপনি যাহা এসেছে, বলে ফেলেছি। কি যে বলেছি, তাহা আমিও জানি না। যাহা বলা গেল, সেই সকল অবস্থা তোমার যখন লাভ হবে, তখন তুমি আমার এসব কথা স্মরণ কর্‌বে। মনে হতেছে তুমি গোঁসাইয়ের শিষ্য। সেই ছেলে সাধারণ নয়! যাহারা তাঁহার আশ্রয় পেয়েছে, তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়েছে; এটি নিশ্চয় জেনে রেখো, শিষ্যদের ভিতরে তিনি নিত্যধাম প্রস্তুত ক'রে নিয়েছেন; যে ভাবে ইচ্ছা চল, সময়ে তিনি সমস্তই ক'রে নিবেন।

মাতাজীর কথা শুনিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরের মুখে মাতাজীর অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। বিনাসাধনে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারগুণে অনেকগুলি অদ্ভুত শক্তি ইঁহার স্বতঃই লাভ হইয়াছে। প্রায় দশবৎসরযাবৎ আহার ত্যাগ করিয়া সুস্থশরীরে রহিয়াছেন। রূপের উজ্জ্বলতা ও মুখের প্রভা দেখিয়া, ইঁহার দেহে, কোন দেবীর আবির্ভাব বলিয়া সকলে মনে করেন। মাতাজীর অসাধারণ স্নেহ মমতায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

হরিচরণ বাবু ও লালের অনুশোচনা।

কলিকাতাহইতে আসিয়া, ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে এক সপ্তাহ কাল রহিলাম। ভজননিষ্ঠ সংসারত্যাগী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বাগচী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইলাম। ঢাকার সকল গুরুভ্রাতার সহিতই আমার দেখা সাক্ষাৎ হইল। এক দিবস শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি না, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—শুনিয়াছি আপনারা ৩/৪ টি গুরুভ্রাতা ঠাকুরের আদেশ অমান্য করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গকরার ফলে, বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; তাঁর উপদেশ অনুসারে অদ্বৈতবাদ এবং

প্রারব্ধ সংস্কারে জড়িত হইয়া, সাধন ভজন ত্যাগ করিয়াছেন; গুরুদেবের প্রদত্ত সাধনে আপনাদের পূর্ব্ববৎ নিষ্ঠা, ভক্তি কিছুই নাই; বরং এই সাধনের বিরোধী হইয়াছেন। তাই ঠাকুর কথায় কথায় এক দিন বলিলেন—**'ইঁহারা যদি এখন হইতে নিয়ম মত সাধন করেন, তা হ'লে ৫/৬ বছর পরে হয় ত, পূর্ব্বের অবস্থা আবার লাভ কর্‌তে পারেন। না হ'লে এবার এই ভাবেই যেতে হবে।'**

হরিচরণ বাবু বলিলেন— গোঁসাই ঠিক কথাই বলেছেন। দীক্ষাগ্রহণ ক'রে তাঁর কৃপায় যে অপূর্ব্ব অবস্থা ভোগ করেছি, তা আর নাই; ব্রহ্মচারীর সঙ্গ করাতেই সেই অবস্থা হারিয়েছি। আহা! গোঁসাই দয়া ক'রে কি আনন্দেই রেখেছিলেন। কত দর্শনাদি হ'ত; সে সব স্বপ্ন মনে হয়। এখন সে সকল বিষয় মনে ক'রে দিন রাত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। আবার গোঁসাই আমাকে কৃপা কর্‌বেন ত? এই বলিয়া হরিচরণ বাবু কান্দিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম।

গেঁণ্ডারিয়া-আশ্রমে অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যশালী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত লালবিহারীর সহিত আমার খুব মেলা মেশা হইল। সর্ব্বদা দু'জনে একসঙ্গেই থাকিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এক দিন লাল, আমাকে গেণ্ডারিয়ার নির্জ্জন জঙ্গলে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভাই, গুরুজীর ওখানে আমার কথা কিছু হ'য়েছিল কি? যাহা জান গোপন না ক'রে আমাকে সমস্ত খুলে বল।' আমি লালের সম্বন্ধে যে সকল কথা হইয়াছিল, পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। লাল শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'যথার্থই ব'লেছ,' সেই সময়ে নিয়ত যে ব্রহ্মজ্যোতি আমার নিকট প্রকাশিত ছিল, তখন থেকে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। শক্তির কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা ছেড়ে দাও, এখন ও সব কিছুই নাই; এখন আত্মরক্ষাও অসম্ভব হয়েছে। দিনরাত অনুতাপে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছি। আহা! গোঁসাই আমাকে কত সাবধান করেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর কথা গ্রাহ্য করি নাই; তাঁর নিকট হ'তে আস্‌বার সময়েও আমাকে তিনি বলেছিলেন—**"লাল! সম্পূর্ণ উত্তাপ-শূন্য হ'লে, বহু বিলম্বে মৃত্তিকার ঘাসে, চন্দ্র কিরণ প'ড়ে এককণা শিশির বিন্দু জন্মে; কিন্তু অভিমান-সূর্য্যের প্রকাশমাত্রে, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা একেবারে শুকায়ে যায়; খুব সাবধানে থেকো।"** আমি তখন গোঁসাইয়ের কথা বুঝি নাই, যাহা হ্উক আমার আর তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? ঐ সকল অবস্থা আমি ত আর সাধন ভজন ক'রে, পরিশ্রম ক'রে লাভ করেছিলাম না; তাঁর বস্তু, তিনি কৃপা করে দিয়েছিলেন, ভোগ করেছি। এখন তাঁর জিনিস তিনি নিয়েছেন; আমি আগে যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি।' লাল এই প্রকার অনেকক্ষণ আক্ষেপ করিলেন; পরে আমরা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

ছোট দাদার (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) মুখে মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলাম। ছোট দাদারও শরীর অতিশয় কাতর দেখিলাম। এবার তিনি 'বি, এ' পরীক্ষা দিবেন। রুগ্নদেহে অতিরিক্ত পড়াশুনা করিয়া, এখন বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পরীক্ষা দিতে

পারিবেন কি না ভাবিয়া, সময়ে সময়ে বড়ই হতাশ হইয়া পড়েন। ছোট দাদার কথামত আমি বাড়ী চলিলাম।

আমার দৈনন্দিন কার্য্য। মাতৃ-সেবায় অশেষ কল্যাণ লাভ।

বাড়ীতে আসিয়া মাকে অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় দেখিলাম। পিত্তশূল বেদনা এবং আমাশয়াদি রোগে বার্দ্ধক্যাবস্থায়, মা'র শরীর অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দিবানিশি রোগের যন্ত্রণায় অবসন্ন থাকিয়াও, বৃহৎ-সংসারের সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ এবং নিজের আহারের যাহা কিছু আয়োজন, মাকেই করিতে হয়। মা, অচল না হইলে, অপরের সেবা গ্রহণ করেন না। মা'র দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই লাগিল। সংসারের যাবতীয় ভার এবং মা'র সেবা শুশ্রূষার যাহা কিছু কার্য্য, আমিই গ্রহণ করিলাম।

অগ্রহায়ণ,১২৯৭।

আমার বহুকালের পিত্তশূল বেদনা এবং বায়ুরোগ একেবারে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। শরীর বেশ সবল ও সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া, মা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিসে তোর এই রোগ সেরে গেল?' আমি রোগের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন ঠাকুরের কৃপায়, যে ভাবে আমি রোগমুক্ত হইয়াছি এবং রক্ষা পাইয়াছি মাকে বিস্তারিতরূপে বলিলাম। আমার 'ব্রহ্মচর্য্য' গ্রহণের কথাও মাকে পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম। মা সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। গোঁসাই তোর জীবন রক্ষা করেছেন বলিয়া, মা কাঁদিতে লাগিলেন। মা কহিলেন—'এমন গুরু যখন পেয়েছিস্, তখন তাঁকে ছেড়ে আর এলি কেন? তাঁর সঙ্গে থাক্‌লে তোর আরও উপকার হ'তো।' আমি বলিলাম, তিনি আমাকে 'তোমারই সেবা করিতে বাড়ীতে পাঠায়েছেন।' আমার প্রতি গুরুর আদেশ শুনিয়া, মা বলিলেন—'বেশ, গুরুর আজ্ঞামত তুই আমার সেবা কর্।' মা'র আদেশ পাইয়া, আমি সমস্ত কার্য্যেরই একটা নিয়ম বাঁধিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমি প্রতিদিন শেষরাত্রে আসনহইতে উঠিয়া শৌচান্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করি; পরে নির্জ্জন ঘরে, আপন আসনে বসিয়া সাধন সমাপনান্তে, তিল, তুলসী, কুশোদকে, কখনও বা পঞ্চামৃতে, বিশেষ বিশেষ তিথিতে গো-শৃঙ্গজলে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, মা'র নিকট উপস্থিত হই। মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি; মা তাঁর পা দুইটি আমার মাথায় তুলিয়া দিয়া, পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করেন—'তোর মনস্কামনা পূর্ণ হউক, সুখে থাক্।' আমি মনে মনে প্রার্থনা করি—'আমার সেবায় তুমি আরোগ্য লাভ কর; তোমার তৃপ্তি হউক, আর আমার গুরুদেব আনন্দলাভ করুন।' মা যখন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া, পরম স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন, তখন আমার সমস্ত শরীর শীতল হইয়া যায়। ভিতরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে থাকে, আমি ধন্য হইলাম মনে হয়। মায়ের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর, আসনে বসিয়া বেলা ৯টা পর্য্যন্ত সাধন ভজন করি। এ সময়ে মা, আমার ঘরে আসেন। গুরুগীতা, ভগবদ্‌গীতা ও সূর্য্যস্তবাদি মাকে পাঠ করিয়া শুনাই। ১০টার সময়ে মা'র জন্য রান্না করিতে যাই; মাও তখন আহ্নিক করিতে বসেন। মায়ের পূজা ও জপ হইতে হইতে, আমারও রসুই

হইয়া যায়। মাকে তখন আবার নমস্কার করিয়া, চরণামৃত গ্রহণ করি। মা শিবের মাথায় ফুল বিল্বপত্র দিয়া, নমস্কার করিতে করিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলেন—'ঠাকুর! ওর মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ কর।' পূজা শেষ করিয়া মা আহার করিতে বসেন; মাকে খাবার দিয়া, আমিও মা'র সম্মুখে প্রসাদ পাইতে বসি। মা আহার করিতে করিতে যাহা ভাল লাগে, নিজে কম খাইয়া আমার পাতে ফেলিয়া দেন। পরমানন্দে মায়ের হাতে, মায়ের প্রসাদ পাইতেছি; আমার রান্নাবস্তু খাইয়া, মা প্রত্যহই খুব সন্তোষ লাভ করিতেছেন; মায়ের তৃপ্তি দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হয়, বলিতে পারি না। এই সময়ে আমার দয়াল ঠাকুরের কথাই স্মরণ হয়; তাঁরই কৃপায় আমার এই শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। আহারের পর গুরুদেবের শান্তিপ্রদ অভয়চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসি।

বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত নির্জ্জনে বসিয়া নাম করি। মা এই সময়ে বিশ্রাম করেন। ৩টার সময়ে মা, আমার আসন-ঘরে আসিয়া বসেন। তখন আমি মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণ পাঠ করিয়া মাকে শুনাই। এই সময়ে পাড়ার আরও অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ আসিয়া পাঠ শুনিতে থাকেন। বেলা ৫টা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, আসনহইতে উঠি। তখন সংসারের হাট বাজার, হিসাব পত্র লেখা ইত্যাদি যাহা কিছু কার্য্য করিয়া থাকি। সন্ধ্যার সময়ে মাকে নমস্কার করিয়া দু' চারটি–সমবয়স্কের সঙ্গে ভগবানের নাম গান করি। পরে মায়ের নিকটে উপস্থিত হই। রাত্রে মা আমারই জন্য, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আমাকে প্রসাদ দেন। মা শয়ন করিলে, কখন কখন তাঁর পায়ে তেল মালিশ করিয়া দেই। মা, কিছু সময়ের জন্য আমাকে বুকে জড়াইয়া শুইয়া থাকেন এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া, মাথায় ফুঁ দিতে দিতে, পেটে পুনঃ পুনঃ টোকা মারিয়া, রক্ষা মন্ত্র পড়িতে থাকেন। মায়ের স্পর্শে আমার শরীর ও মন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। মায়ের স্নেহ দেখিয়া, এই সময়ে আমি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দি। নিদ্রাবেশ হইলে নিজের আসন-ঘরে আসিয়া শয়ন করি। কখনও বিছানায়, কখনও বা আসনেই কাত হইয়া পড়িয়া থাকি। রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে হাত মুখ ধুইয়া, ধুনি জ্বালিয়া, সাধন করিতে বসি। শেষরাত্রি পর্য্যন্ত নাম করিতে করিতে ভাবাবেশে, কখনও বা তন্দ্রাবেশে, আমার সময় কাটিয়া যায়। গুরুদেব আমাকে কত যে আনন্দে রাখিয়াছেন, প্রকাশ করিতে পারি না।

বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিদিন একই নিয়মে, সাধন ভজনে, মাতাঠাকুরাণীর সেবায়, আমার সময় অতিবাহিত হইতেছে; নিত্য নূতন নূতন উৎসাহ-আনন্দে, সাধন ভজনের স্পৃহা আমার বৃদ্ধি পাইতেছে। রাত্রি শেষে মনে হয়—কতক্ষণে সূর্য্য উদয় হইবে, কতক্ষণে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া মায়ের চরণধূলি মস্তকে লইব; তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন; কতক্ষণে মায়ের চরণামৃত পাইব; সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি মাকে রান্না করিয়া খাওয়াইব। বিশেষ বিশেষ পূজা উৎসবের দিনে, সকলের মনে, সূর্য্যোদয় হইতেই, যেমন একটা উৎসাহ আনন্দ প্রাণে খেলিতে থাকে, প্রতিদিনই, দিবসের প্রারম্ভে, আমার ভিতরে সেই প্রকার একটা উচ্ছ্বাস আনন্দের তরঙ্গ উপস্থিত হয়। গুরুদেবের অসীম কৃপাগুণে, মাতাঠাকুরাণীর প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ লাভে যথার্থই

আমি কৃতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম। আমার প্রতি ঠাকুরের এই অসাধারণ দয়া, সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, নির্জ্জনে চীৎকার করিয়া কান্দিতে ইচ্ছা হয়; গুরুদেব যখন দয়া করেন, সমস্তই তখন অনুকূল হয়। মাতৃ-সেবার কথা শুনিয়া, দাদারা সন্তুষ্ট মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাকে লিখিতেছেন—সাধন ভজনে তোমার উন্নতি হউক, তুমি সুখে থাক। আত্মীয় স্বজন, অভিভাবকগণ, পূর্ব্বে যাঁহারা আমার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এখন তাঁহারাও আমার উপরে পরম সন্তুষ্ট; গ্রামবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরাও, আমার দৈনিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন। ব্রাহ্ম বলিয়া, এতকাল আমার উপরে যাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল, তাঁহারাও এখন আমার সঙ্গে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আনন্দলাভ করিতেছেন। সকল গুরুজনের স্নেহ মমতা ও আশীর্ব্বাদ গুণে, নিত্য নূতন উৎসাহ-উদ্যমে, সাধন ভজন করিয়া ভিতরে একটা অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করিতেছি। পরম আনন্দে আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

গুরুকৃপার অলৌকিক নিদর্শন। ছোট দাদার রোগমুক্তি।

আমি পরিষ্কার অনুভব করিতেছি, সদ্‌গুরুর কোন একটি সামান্য আদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করিলেও, তাহাই সূত্র আকারে পরিণত হইয়া, বহুদূরবর্ত্তী শিষ্যের চিত্তকেও, তাঁহার অনন্ত মহান্‌ভাবের সহিত যোগ করিয়া রাখে। এই সূত্র, মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্ম হইলেও, উহাই অবলম্বন করিয়া, গুরু-কৃপার প্রবল ধারা, তড়িত প্রবাহের মত বেগে আসিয়া, শিষ্যের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, ইহা নিয়ত মনে হওয়াতে, গুরুদেব আমার প্রতি প্রসন্ন, এইরূপ ধারণা আমার বদ্ধমূল হইতেছে। গুরুদেব আমার প্রার্থনা শোনেন, কাতরভাবে বলিলে বা জেদ করিয়া আবদার করিলে, তাহা তিনি পূর্ণ করেন; এইরূপ সংস্কার প্রাণে আসিয়া পড়িতেছে, এবং তাহারই ফলে নিজের উপরে অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কয়েকটি ঘটনাতে, এ বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইলাম; তাহার দুই চারিটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

কিছুদিন হয় ছোট দাদার পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—'হঠাৎ বুকে বেদনা হইয়া তিন দিন শয্যাগত আছি। পড়াশুনা আর করিতে পারিতেছি না; ভয়ানক যন্ত্রণা সর্ব্বদা ভোগ করিতেছি। পরীক্ষা নিকট; এক একদিনে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, এবার আর বুঝি পাশ করিতে পারিব না। তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও।' ছোট দাদার পত্রখানা পড়িয়াই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম—'গুরুদেব! ছোট দাদার দেহের যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারি না; অচিরে তাঁর রোগটি তুমি দয়া করিয়া আমার ভিতরে সঞ্চার করিয়া দাও। আমি অবিচলিত মনে, সন্তুষ্ট প্রাণে, রোগশেষ পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিব।' এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেবকে স্মরণ করিলাম; পরে, উদ্যমের সহিত প্রাণায়ামের প্রতিদমে, রোগকল্পনায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া, রেচকের সহিত নিজের স্বাস্থ্য ছোট দাদার রুগ্নদেহে সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলাম। এই প্রকার অনন্যমনে, প্রাণপণে

ধ্যান ও প্রাণায়াম করিতে করিতে বুকে আমার বেদনার অনুভব হইল। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রণার ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল; তখন অন্তরে উৎসাহ পাইয়া, আগ্রহসহকারে পুনঃপুনঃ কুম্ভকপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত চাপিয়া, বুকে ধারণ করিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যেই ঠাকুরের ইচ্ছায়, অসহ্য যন্ত্রণায়, শরীর আমার অবসন্ন হইল। আমি অমনই জয় গুরু, জয় গুরু, বলিতে বলিতে আসনহইতে উঠিয়া পড়িলাম। তখনই ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম। যে দিন যে সময়ে আমার ভিতরে এই রোগের সঞ্চার হইল, ছোট দাদাকে পরিষ্কার করিয়া জানাইলাম। ছোট দাদার জবাবে জ্ঞাত হইলাম, সেই দিন ঠিক সেই সময়েই, তাঁহার বেদনা কমিয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া। অধিক দিন এই পীড়া, আমায় ভুগিতে হইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ছোট দাদার বি,এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইল; পরীক্ষার তিন দিন পূর্ব্বে, ছোট দাদা ভয়ানক জ্বরে শয্যাগত হইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি সোমবার বেলা ৯টার সময়ে কোন প্রয়োজনে জৈনসার গ্রামে চলিয়াছি, রাস্তায় ছোট দাদার পত্রখানা পাইলাম। বুঝিলাম, ঐ দিনই ছোট দাদার পরীক্ষা আরম্ভ। রোগমুক্ত হইয়া ছোট দাদা হয় ত পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, এই চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; জৈনসার যাওয়ার অর্দ্ধপথে, একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলে, আমি বসিয়া পড়িলাম; ছোট দাদার আরোগ্য লাভ এবং পরীক্ষার শুভফলের জন্য ব্যাকুল হইয়া, ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল একই অবস্থায় আকুল প্রাণে কান্দিলাম; বিপদ ঘটিল মনে করিয়া, নিরুপায় হইয়া, ঠাকুরকে সব জানাইলাম। এই সময়ে ভিতরের ক্লেশে, হাহুতাশে, মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম; কিঞ্চিৎ পরেই ঠাকুরের কৃপায়ই বুঝিতে পারিলাম—'ঠাকুর ছোট দাদাকে দয়া করিবেন। ছোট দাদা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন। পরীক্ষাতে ছোট দাদা নিশ্চয় পাশ হইবেন।' আমি অমনি উঠিয়া জৈনসার গ্রামে চলিয়া গেলাম। তখনই পোষ্টাফিসে বসিয়া, ছোট দাদাকে পত্র লিখিলাম—'কোন চিন্তাই করিবেন না, গুরুদেব আপনার কল্যাণ করিলেন। নিশ্চয় পরীক্ষায় পাশ হইবেন। জ্বর বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে; কেমন আছেন লিখিবেন।' ছোট দাদা আমার পত্রের উত্তরে জানাইলেন—"পরীক্ষার দিনই (সোমবারে) পথ্য পাইয়া, অতি কষ্টে পরীক্ষা দিতে চলিলাম; রাস্তায় অকস্মাৎ আমার ভিতরে একটা তেজ যেন প্রবেশ করিল; আমার আর কোন অসুখ নাই; ভগবানের দয়ার পরীক্ষা ভালই দিয়াছি।" ছোট দাদার পত্র পাইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; গুরুদেবের অপরিসীম কৃপা স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলাম।

প্রকৃতিপূজায় দুর্দ্দশা। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় দান।

বাড়ীতে আসিয়া, গুরুদেবের আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি যথামত প্রতিপালন করিয়া, সাধন ভজনে দিন রাত কাটাইতে লাগিলাম। গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং মুরুব্বিগণ, যাঁহারা এতকাল আমার উপর ব্যবহারিক অনাচারে বিষম বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাও

শতমুখে আমার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। ভদ্র, অভদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকল লোকই আমাকে সদাচারী, চরিত্রবান্, ভজননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। দূর গ্রামবাসী এবং পাড়াপড়্সিগণও আমাকে তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক এবং সাংসারিক নানাপ্রকার দুরবস্থার ও দুর্ঘটনার কথা জানাইয়া, আশীর্ব্বাদ চাহিতে লাগিলেন; ভগবানের কৃপায় কেহ্ কেহ্ উৎকট রোগে, আপদে বিপদে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অযথা আমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আমার প্রচুর প্রশংসা প্রচার হইয়া পড়িল। আমার প্রতি গুণারোপ নিতান্তই অনর্থক, এইসব ব্যাপারে আমার কোনই সংস্রব নাই, ইহা পরিষ্কার জানিয়াও, সাধারণের স্তুতিবাদ আমার ভালই লাগিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দেখিতে লাগিলাম, যাঁহাদের ক্লেশ আমার প্রাণে স্পর্শ করে, যাঁহাদের বিপদে আমি অভিভূত হই, আমি তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিলে, ঠাকুর তাঁহাদের শুভ করেন, উৎপাতের শান্তি করেন। এই সকল দেখিয়া আমার মনে হইল— কড়ায় গণ্ডায় নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছি, ভজন সাধনে দিনরাত অতিবাহিত করিতেছি। দশজনেও আমার চরিত্রের এবং অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন; সুতরাং সত্য সত্যই আমি ধন্য হইয়াছি। এই প্রকার ভাব অন্তরে আসাতে, নিজের উপরে আমার অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মিল; ভাবিলাম ঠাকুরের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের কণিকা, আমার ভিতরে সঞ্চরিত হইয়াছে; তাঁহার অসাধারণ কৃপায় এবার আমি যথার্থই নিরাপৎ হইয়াছি। এইরূপ সংস্কারে আমি ধীরে ধীরে গর্ব্বিত হইয়া পড়িলাম; স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ করিয়া সকলেরই সহিত নির্ভয়ে মিশিতে লাগিলাম। আমার চরিত্রে সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাস হওয়াতে নিঃসঙ্কোচে যুবতীরাও স্বেচ্ছামত সজনে নির্জ্জনে আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই আপন আপন প্রাণের কথা আমাকে বলিয়া আরাম পাইতে লাগিলেন।

এক দিন একটি পরমা সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা ব্রাহ্মণকন্যা কাঁদ কাঁদ স্বরে আমাকে আসিয়া বলিলেন—"ভিতরের অসহ্য জ্বালা আর আমি সহ্য করিতে পারি না, তোমাকে মনে পড়িলেই আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়। ভোগের লালসায় অস্থির হইয়া পড়ি। আমার এই কামনার পরিতৃপ্তি কর।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—'এক সময়ে তোমার উপরেও আমার ভয়ানক লোভ ছিল। গুরুদেব তাহা এখন শান্তি করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি; চিরকালের জন্য ওসব কার্য্যে বঞ্চিত হইয়াছি। যুবতী বলিলেন—"তা হ'লে আমার এইভাব যাহাতে নষ্ট হয়, তাহার উপায় ব'লে দাও, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।" উঁহার ক্লেশের কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই লাগিল। আমি উঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—'আপনি নিশ্চিন্ত হউন, নিশ্চয়ই আমি আপনার শান্তির ব্যবস্থা করিব।'

এই ঘটনার পরে, যুবতী সুবিধা পাইলেই আমার ঘরে আসিয়া বসিতেন; আমিও তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রসঙ্গের নানা দৃষ্টান্তে, সংযমের উপদেশ করিতাম। কিন্তু অবসর পাইলেই, তিনি কাতরভাবে তাঁহার অসহ্য জ্বালার নিবৃত্তির উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদিও কামোন্মত্তা কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে দেবদুর্লভ ব্রহ্মচর্য্যের অতুলনীয় অমৃতফল, ইতিপূর্ব্বেই আমি হারাইয়াছিলাম,

তথাপি বর্ত্তমানে গুরুর কৃপায় কামশূন্য অচঞ্চল অবস্থায় অতিরিক্ত গর্ব্বিত থাকাতে, আমি ভাবিলাম—শুনিয়াছি বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে, নির্ব্বিকার কামশূন্য অবস্থায়, কোন ব্যক্তি প্রকৃতির রতিমন্দিরে মহাশক্তির পূজা করিলে, তাহাতে কামিনীর কামের উপশম হয়, এবং উপাসকেরও প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা হয়। ভাল, আমি তাহাই করি না কেন? যুবতীর অঙ্গস্পর্শ করিতেই আমার নিষেধ, কিন্তু দূর হইতে পূজা করিতে আর দোষ কি? আমি এই প্রকার স্থির করিয়া, তাঁহাকে আমার সঙ্কল্প জানাইলাম; রমণী সন্তুষ্ট মনে সম্মতা হইলেন।

মাঘ মাসের কোন এক পবিত্র তিথিতে, বিশেষ একটি কার্য্য উপলক্ষে, পাড়ার সমস্ত লোকই আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। ঐ দিনই, এই কার্য্যের প্রশস্ত দিন মনে করিয়া, আমি সঙ্কল্প অনুসারে শক্তিপূজার আয়োজন করিলাম। যজ্ঞ কাষ্ঠ সমেত ঘৃত, বিল্বপত্র, অতসী, জবা, অপরাজিতা, ধূপ ধূনা ও চন্দনাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে যুবতীর নিকট উপস্থিত হইলাম; সঙ্কেত মাত্র অভিপ্রায় অবগত হইয়া, হৃষ্টমনে তিনি আমার অনুগামিনী হইলেন; জনপ্রাণী শূন্য কোন এক নিভৃত স্থানে অবিলম্বে আমরা পৌঁছিলাম। পরে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক,কামিনীকে কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিতে বলিলাম। তৎপরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া, স্থিরমনে কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ করিলাম। অতঃপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, একান্তভাবে নিজ ইষ্টরূপ, প্রদীপ্ত হুতাশনে ধ্যান করিতে লাগিলাম। তখন জবা, অপরাজিতা এবং বিল্বপত্র ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া, সাবিত্রীমন্ত্রে কয়েকবার অগ্নিতে আহুতি দানে, হোম সমাপন করিলাম। পরে করজোড়ে ঠাকুরের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—গুরুদেব! আজ আমি বিষম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, এখন আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, মনমুখী, মোহযুক্ত, তোমার অভিপ্রায় কি, কিছুই আমি বুঝিতেছি না; তোমাকে আহ্বান করিলে তাহা তুমি জানিতে পার, তোমাকে কিছু বলিলে তাহা তুমি শুনিয়া থাক, তাই ঠাকুর, আজ তোমাকে ডাকিতেছি, তোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি; এ অবস্থায় যাহা কল্যাণকর তাহাই ব্যবস্থা কর। প্রকৃতি পূজা করি, ইহা যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, অকস্মাৎ কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটাইয়া এ চেষ্টায় আমাকে বাধা দাও; আরও পাঁচ মিনিট কাল আমি অপেক্ষা করিব। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে, সঙ্কল্পমত শক্তি-পূজায় প্রবৃত্ত হইব। এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া, একান্ত মনে ঠাকুরের পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। পাঁচ সাত মিনিট নির্ব্বিঘ্নে অতীত হইল; এই সময়ে অধীরা রমণীকে, তিন চার হাত দূরে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে বলিলাম। কামিনী আমার ইঙ্গিতানুসারে, প্রহৃষ্ট অন্তরে অমনি উলঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন দেবীর অভীপ্সিতা অতসী, অপরাজিতা, জবা, বিল্বদল অঞ্জলি পূরিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম। পরে চণ্ডীর 'যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, শান্তিরূপেণ সংস্থিতা,' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠনান্তর পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থিরভাবে মনযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—অকস্মাৎ উঁহার নাভিস্তর হইতে উরুদ্বয়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত, গোলাকৃতি নিবিড়

কাল ছায়ায় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িল; মধ্যাহ্নে প্রশস্ত সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। আচম্বিতে গৌরাঙ্গীর অঙ্গবিশেষে মহাকালীর আবির্ভাব হইল। বহুক্ষণ বারংবার দৃষ্টি করিয়াও, ঘন কৃষ্ণ বর্ণের অন্তরালে দিপ্তিময়ী কাল বিজলীর ঝিকিমিকি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। মস্তকের পুষ্পাঞ্জলি, ভগবতীর চরণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িলাম। অদ্ভুত ভগবান গুরুদেবের লীলা! অদ্ভুত ভগবতী যোগমায়ার খেলা! কি দেখাইলে! কি দেখিলাম! স্তম্ভিত হইয়া আসনে বসিলাম। অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। তখন দেখিলাম— রমণীর গৌর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; কুঞ্চিত নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছেন! উঁহার পানে তাকাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। উঁহার চঞ্চল কটাক্ষে, তড়িৎ বেগে আমার ভিতরে কামোত্তেজনার সঞ্চার হইল। বিচলিত অবস্থায় সঙ্কট ভাবিয়া অবিলম্বে উঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলাম। যুবতী আমার কথায় বাক্যব্যয় না করিয়া, হোমাগ্নিকে প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিলাম—'আমার যা হবার হোক্; ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' অবিলম্বে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বস্ত্র পরিধানান্তর নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। যুবতী চলিয়া গেলে পর, আমার ভিতরে অদম্য কামের উত্তেজনা আরম্ভ হইল। প্রাণায়াম, কুম্ভকাদিতে উত্যক্ত ভাবের শান্তি করিতে অকৃতকার্য্য হইলাম। অমনি বিপত্তি বুঝিয়া আসনহইতে উঠিয়া পড়িলাম।

এই দুঃসাহসিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার দুর্দ্দশার একশেষ আরম্ভ হইল। ভগবান গুরুদেবের অভিপ্রায় কি, জানি না। যুবতীর কাম বিকারের সম্পূর্ণ বিরাম হইল বটে, কিন্তু, দিন দিন আমি কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিলাম। বোধ হয়, পরম দয়াল গুরুদেব অবলার অপূর্ব্ব সরলতা অবলোকন করিয়া, তাঁহার জ্বালার শান্তি করিলেন, এবং আমার বিষম দুরন্ত অনুষ্ঠানে, অতিরিক্ত স্পর্দ্ধা ও হঠকারিতা দেখিয়া, কামপীড়িতা কামিনীর কামভাব আমার ভিতরে সঞ্চরিত করিলেন। আমি অহর্নিশি কামাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলাম। কিসে যে এ জ্বালার শান্তি হয়, কি উপায়ে এ বিপদে রক্ষা পাই, সর্ব্বদা কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে স্থির করিলাম—অস্থি মজ্জা অঙ্গার করিয়া কঠোর সাধন করিব। সেই অনুসারে আমি পরিমিত আহারের (এক 'থাবা' অন্নের) এক-তৃতীয়াংশ কমাইয়া ফেলিলাম। আহারের চেষ্টায় সামান্য সময় ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট কাল নির্জ্জন জঙ্গলে যাইয়া, সাধন করিতে লাগিলাম। শয়ন এককালে ত্যাগ করিলাম; নিদ্রা এক প্রকার উঠাইয়া দিলাম। সম্মুখে ধুনি জ্বালিয়া, প্রাণপণ সাধনে রাত্রি শেষ করিতে আরম্ভ করিলাম। তন্দ্রাবেশের উপক্রম দেখিলে, একপদে দাঁড়াইয়া, কখন বা পদচালনা করিয়া. নাম করিতে করিতে রাত্রি কাটাইতে লাগিলাম। অতিশয় নিদ্রাবেশ হইলে, কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতাম। তিন বেলা স্নান, অম্ল, কটু, মধুরাদি রস ত্যাগ, এবং লোকসঙ্গ বর্জ্জনাদি, সমস্তই খুব কঠোর ভাবে করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার অহেতুকী উত্তেজনার অনেকটা উপশম হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা কিছুতেই আর ফিরিয়া আসিল না। আচম্বিতে,

অতীত ঘটনার ছবি অন্তরে উদিত হইয়া, আমাকে অস্থির করিতে লাগিল; আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। চারি দিক শূন্য দেখিলাম; ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত আমার আর নিস্তার নাই বুঝিয়া, গুরুদেবকে এই কয়টি কথা লিখিয়া জানাইলাম—

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীগোস্বামী মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলেষু।

শ্রীবৃন্দাবনহইতে আপনার আদেশমত অযোধ্যায় যাইয়া তথায় প্রায় দুই মাস কাল ছিলাম। পরে বাড়ী আসিয়া এতদিন মাতৃসেবায় কাটাইলাম। এতকাল বেশ আনন্দেই ছিলাম। আজকাল আমার অবস্থা সমস্তই আপনি দেখিতেছেন, সুতরাং লিখিয়া আর লাভ কি? এ সময়ে আমায় যাহা করিতে হইবে, অবিলম্বে জানাইবেন। আমার মনের উপরে এখন আর আমার কোনও অধিকার নাই। দয়া করিয়া এ সময় রক্ষা করিতে হয় করিবেন। আপনি রক্ষা না করিলে, এ সময়ে আর আমার কোনও ভরসা নাই। ব্রহ্মচর্য্য, আপনারই বাক্যে, আপনারই দয়া ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, লইয়াছি। এখন ব্রত নষ্ট হইলে, আমি দায়ী নহি। আমার প্রকৃতি পূর্ব্বে জানিয়াই তো এই ব্রত দিয়াছেন!

সেবক
শ্রীকুলদা।

পত্রখানা লেখার পরই, শ্রীবৃন্দাবনহইতে একেবারে ৪ খানা চিঠি আমার নিকট আসিয়া পড়িল। স্বামিজী হরিমোহন লিখিলেন—"ভাই, গুরুজী তোমার পত্রখানা পড়িয়া অমনি হাত নাড়িয়া— **'মা ভৈঃ। মা ভৈঃ। মা ভৈঃ।'** উচ্চৈঃস্বরে তিন বার বলিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া **'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'** বলিয়া তোমাকে অভয় দিয়া, পত্র লিখিতে কহিলেন; তোমার জ্ঞাতকারণ লিখিলাম। নির্ভয় হও।"

যোগজীবন লিখিলেন—"গোঁসাই তোমাকে লিখিতে বলিলেন—**'যদি বাড়ী থাকতে অসুবিধা বোধ কর, সময়ে সময়ে গেণ্ডারিয়ায় যাইয়া থাকিবে। ব্যস্ত হইও না। আমরাও শীঘ্র যাইতেছি"**

এই প্রকার শ্রীধর এবং মাঠাকুরুণও লিখিলেন—"তোমার প্রতি গোঁসাইয়ের অসীম কৃপা। কোন চিন্তাই নাই। নির্ভয় হও। আনন্দ কর।"

জানি না গুরুদেব ইঁহাদের পত্রে কি অলৌকিক শক্তি প্রেরণ করিলেন। পড়িবার সময় প্রত্যেকের পত্রের প্রতি অক্ষরে নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ, আশ্চর্য্যরূপে আমার হৃদয়ে সঞ্চরিত হইতে লাগিল। অনতিকাল মধ্যে আমার মনের মলিনতা বিদূরিত হইয়া, বিমল আনন্দ প্রবাহিত হইল। উৎসাহ, উদ্যমের সহিত উৎফুল্ল অন্তরে আবার আমি ভজনানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। গুরুদেবের অসীম কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলাম। কবে আবার আমার দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন পাইব, আগ্রহ সহকারে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

মায়ের আশীর্ব্বাদ এবং গোঁসাই-চরণে আমাকে সমর্পণ।

অনেককাল পরে, এবার গঙ্গাস্নানের অতি দুর্লভ উৎকৃষ্ট (অর্দ্ধোদয়) যোগ পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-

বঙ্গহইতে সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাস্নানে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন; মাতাঠাকুরাণীও এই প্রশস্ত যোগে গঙ্গাস্নান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংসারে বিস্তর প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, মাতাঠাকুরাণীকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইব সঙ্কল্প করিলাম। মাকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে ভরসা দিলাম। পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত তীর্থগুলি, এই সুযোগে মা'র দর্শন করিয়া আসিবার সুবিধা হইবে। মাতাঠাকুরাণী তীর্থদর্শনে যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে বলিলেন—"আমি তো তীর্থে চলিলাম, আবার কবে দেশে আসিব তারও নিশ্চয় নাই; এখন আমার শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে, তোরও শরীর এখন নীরোগ; পশ্চিম হ'তে এসে এবার তোকে বিবাহ করাব।" আমি তখন মাকে পরিষ্কার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের নিয়ম এবং আমার ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার আকাঙ্খা জানাইলাম। বিবাহ করিলে আবার আমার রোগগুলি দেখা দিতে পারে, ইহাও বুঝাইয়া বলিলাম। মা আমার সমস্ত কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া বলিলেন—"তুই বিবাহ বা চাক্‌রী না কর্‌লে, সংসারের কিছুই ঠেকে থাক্‌বে না। আমার আর আর ছেলেরা সকলেই ত সংসারী। তোর সুখের জন্যই তোকে বিবাহ কর্‌তে বলি, সংসার কর্‌তে বলি। তা তোর ভাল না লাগ্‌লে, করবার দরকার নাই। সংসারে সুখ নাই; সুখ থেকে জ্বালাই বেশী। ধর্ম্ম নিয়ে যদি থাক্‌তে পারিস্, তা তো ভালই! তোর ইচ্ছা হ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই থাক্।"

আমি বলিলাম—'তুমি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে অনুমতি কর্‌লে, আমি গুরুদেবের নিকটে থাক্‌তে পারি; তিনি আমাকে তোমার সেবার জন্য পাঠাবার সময় বলেছিলেন—**"মা'র সেবা কর গিয়ে। সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে, তিনি তাঁর কর্ম্ম-বন্ধন হ'তে তোমাকে মুক্তি দিলে, আমার নিকটে এসে থাক্‌তে পার্‌বে।"**

মা বলিলেন—"আচ্ছা তোর সেবায় তো আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি; আমার কর্ম্ম থেকে তোকে আমি খালাস দিলাম। বাড়ীতে থাক্‌লে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না, গোঁসাইয়ের নিকটে গিয়ে থাক্। তাতে তোরও উপকার হবে, আমারও প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্‌বে।"

আমি বলিলাম—'ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন—**"সেবাদ্বারা মাকে সন্তুষ্ট ক'রে অনুমতি আন্‌তে হবে; না হ'লে কোন প্রকার কৌশল ক'রে অনুমতি নিলে হবে না।"** যদি তুমি যথার্থই আমার সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে থাক, তা হ'লে আমার ঠাকুরকে তুমি একবার জানাও। ধর্ম্মার্থে আমাকে যদি তুমি তাঁর চরণে অর্পণ কর, আমার পরম কল্যাণ হবে, আর তোমারও পুত্র দানের মহাফল লাভ হবে।'

মা বলিলেন—"আমি নিজে তো ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই কর্‌তে পার্‌লাম না। তোরা যদি কিছু কর্‌তে পারিস্, তাতেও আমার উপকার হবে। তোর এই আকাঙ্ক্ষায় আমি বাধা দিব কেন? সন্তুষ্ট হয়েই গোঁসাইয়ের হাতে তোকে দিলাম।"

আমি বলিলাম—তা হ'লে তুমি আমার গুরুদেবকে এই ব'লে একখানা পত্র লেখ যে, 'আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকে, ধর্ম্মার্থে আপনার চরণে সমর্পণ কর্‌লাম যাতে ওর ধর্ম্মলাভ হয় আপনি তাই কর্‌বেন।'

মা বলিলেন—"আচ্ছা কাগজ কলম নিয়ে আয়। এখনই আমার নামে গোঁসাইকে পত্র লিখে দে।"

মা'র কথা শুনিয়াই আমি কাগজ কলম আনিয়া মা'র সম্মুখে রাখিলাম। মা, মেজবৌ-ঠাকুরাণীর দ্বারা নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখাইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কুলদা, আপনার আদেশমত বাড়ীতে আসিয়া, নানাপ্রকারে আমার সেবা শুশ্রূষার দ্বারা আমাকে বড়ই সুখী করিয়াছে। আমি তাহাকে আর আমার কর্ম্মপাশে বদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। ধর্ম্মার্থে আমি শ্রীমান্ কুলদাকে সন্তুষ্টচিত্তে সম্পূর্ণরূপে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। 'বিবাহাদি করিয়া সংসার করুক' উহার অবস্থা দেখিয়া আমি সেরূপ ইচ্ছা করি না; সুতরাং যাহাতে ধর্ম্মলাভ করিয়া এবং আপনার অনুগত থাকিয়া, শ্রীমান্ মনে সর্ব্বদা শান্তি পাইতে পারে, যে কোন প্রকারে হউক আপনি তাহা করিবেন। কুলদা যদি আনন্দে থাকে, তবেই আমি সুখে থাকিব! আপনার সঙ্গে উহাকে রাখিলে, আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে। ইতি—

নিঃ
শ্রীমান্ কুলদার মাতা।

পত্রখানা লেখাইয়া, মা আমাকে বলিলেন—' আমার দুইটি কথা তুই মনে রাখিস্—(১) আমার মৃত্যুর পর একটি ভুজ্যি তুই ব্রাহ্মণকে দান করিস্। (২) আর যতকাল বেঁচে থাক্‌বি পেট ভ'রে খা'স্।'

আমি বলিলাম—'ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কত অবস্থাই তো ঘট্‌তে পারে; পেটভরা খাবার যদি না জোটে?'

মা বলিলেন—'আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, পরমেশ্বর তোকে আহারের কষ্ট কখনও দিবেন না। চিরকাল তুই পেটভরা খাবার পাবি। পেট ভ'রে খা'স্; তাতে অন্তরাত্মা তুষ্ট থাক্‌বেন।'

আমি বলিলাম—'তোমার মৃত্যুর সময়ে যদি আমি কাছে না থাকি, বহুকাল পরে মৃত্যু সংবাদ পাই, ঐ সময় যদি হাতে আমার টাকা পয়সা বা চাউল ডা'ল না থাকে, তা হ'লে কি কর্‌বো?'

মা বলিলেন—'যদি তেমনই হয়, তা হ'লে যখন আমার মৃত্যু-সংবাদ পাবি, তখন সুবিধা মত একটি ভুজ্যি ব্রাহ্মণকে দিলেই হবে। হাতে যদি কিছু না থাকে, ভিক্ষা ক'রে দিস্।'

মা'র কথা শুনিয়া, আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমার পরম কল্যাণের পথ মাতাঠাকুরাণী আজ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। সংসারে আসার উদ্দেশ্য মা'র কৃপায়, আজই আমার সার্থক হইল। মা'র দয়াতেই আমি গুরুদেবের বিমল শান্তিপূর্ণ দুর্লভ চরণ-রেণুর সংলগ্ন হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইলাম। জয় গুরুদেব! তোমার কৃপা, সকল শুভ ও সৌভাগ্যের মূল, ইহা যেন কখনই আমি না ভুলি, এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে এক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'**তোমার মা এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, তাঁকে আর এখন বাড়ীতে রাখা কেন? তাঁর সংসার তো শেষ হ'য়ে গেছে। এখন তোমার বৌ-ঠাক্‌রুণদেরই সংসার। তাঁরাই এখন বাড়ী ঘর দেখুন, সংসার করুন। তোমার দাদাদের উচিত, মাকে এখন তীর্থে রাখা। কাশীতে বা শ্রীবৃন্দাবনে এখন তাঁকে বাস কর্‌তে দিলেই, তাঁর যথার্থ উপকার হয়। শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা কাশীই তাঁর পক্ষে ভাল। তোমাদের এ বিষয়ে যত্ন করা উচিত।**'

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি, মাকে সংসারের গোলমাল হইতে সরাইয়া কাশীতে রাখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। বড় দাদাকেও এজন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এবার সুযোগ পাইয়া, বহু বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া মাকে তীর্থে পাঠাইলাম। মা সুস্থ শরীরে পশ্চিমে রওয়ানা হইলেন।

ছোট দাদার দীক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্তি।

মাতাঠাকুরাণীর পশ্চিমে যাওয়ার কিছুদিন পরেই, ছোট দাদা বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলেন। দুই একটা বিষয়ে ভাল লিখিতে পারেন নাই বলিয়া, পরীক্ষার সুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হইয়া, অতিশয় উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বলিতে লাগিলেন—"এবার পরীক্ষায় পাশ না হইলে আত্মহত্যা করিব।" আমি জেদ করিয়া ছোট দাদাকে বলিলাম—'আমি আপনার পাশের জন্য গোঁসাইয়ের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছি। গোঁসাই নিশ্চয়ই আপনাকে পাশ করিয়া দিবেন।' ছোট দাদা বলিলেন—"গোঁসাইয়ের তেমন কোন অলৌকিক শক্তি আছে, আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা যদি তাই হয়, তবে আমি একটা 'প্রবলেম্' (problem) দিই, গোঁসাই তাহা 'সলভ' (solve) ক'রে দিন দেখি।" আমি ছোট দাদার এ সকল কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না। ছোট দাদা, গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁকে যোগ সাধন পুস্তকখানা পড়িতে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া বলিলেন—"ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতের সঙ্গে যাহা মিলে না, তাহা কুসংস্কার। আমি ওসব কিছু মানি না। গোঁসাইকে ধার্ম্মিক ব'লে মনে করি, কিন্তু তাঁর শিষ্যগুলির কিছু হয়েছে বলে বিশ্বাস করি না।" আমি ছোট দাদার কথার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পরে কথায় বার্ত্তায় সুবিধা পাইলেই, গোঁসাইয়ের মহিমা ধীরে ধীরে বলিয়া, তাঁর দিকে ছোট দাদাকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। গোঁসাইয়ের নানা প্রকার অসাধারণ অবস্থার কথা শুনিতে শুনিতেই, ছোট দাদার, গোঁসাইয়ের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভক্তি আসিয়া পড়িল। তখন আমি গোঁসাইয়ের নিকটে ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। দীক্ষার প্রয়োজন কি, এই বিষয়ে তিন চার দিন তর্কবিতর্ক আলোচনার পরে, ছোট দাদা বলিলেন—"আচ্ছা, যদি এবার আমি পরীক্ষায় পাশ হই, গোঁসাইয়ের নিকটে দীক্ষা লইব।" আমিও আগ্রহের সহিত ছোট দাদার পাশের খবরের অপেক্ষায় রহিলাম। কিছু দিন পরে, ছোট দাদা পাশ হইয়াছেন, খবর পাইলাম। তখন ছোট দাদাকে দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলাম। ছোট দাদা বলিলেন—"গোঁসাইয়ের কাছে দীক্ষা নিব যখন বলিয়াছি,

তখন নিবই; কিন্তু এখনই যে নিব, এমন কথা তো আমি বলি নাই। এখন আমার শরীর অসুস্থ; শরীর সুস্থ হউক পরে নিব।" আমি বলিলাম—"আমি কত অসুস্থ ছিলাম তা তো সবই জানেন, গোঁসাইয়ের কৃপায় এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি; আপনিও দীক্ষা নিলেই সুস্থ হইবেন।"

ছোট দাদা বলিলেন—"যোগ সাধনের যেসকল নিয়ম আছে, আমি তাহা এখন প্রতিপালন করিতে পারিব না।"

আমি কহিলাম—"আপনি যাহা প্রতিপালন করিতে না পারিবেন, এমন কোন নিয়ম কখনই গোঁসাই আপনাকে আদেশ করিবেন না।"

শেষ কালে ছোট দাদা স্বীকার করিলেন, গোঁসাই গেণ্ডারিয়ায় আসিলেই, তাঁহার নিকটে যাইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিবেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

মাতা যোগমায়াদেবীর তিরোভাব। লালজীর দেহত্যাগ।

বড় দাদার পত্রে অবগত হইলাম 'মাঠাক্‌রুণ যোগমায়াদেবীর শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১০ই ফাল্গুন, ১২৯৭ সাল, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, একদিনের ওলাউঠাতেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর এই সংবাদ, যোগজীবনের দ্বারা দাদাকে জানাইয়াছেন।' হঠাৎ এই খবর পাইয়া আমি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। শ্রীবৃন্দাবনহইতে মাঠাক্‌রুণ আর ফিরিবেন না, সেই স্থানেই থাকিয়া যাইবেন, ঠাকুরের ও মাঠাক্‌রুণের কথার ভাবে বহুবার এই প্রকার সন্দেহ মনে জন্মিয়াছিল। কি ভাবে, কি অবস্থায় মাঠাক্‌রুণ দেহ রাখিলেন, বিস্তারিতরূপে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে আবার সংবাদ পাইলাম, জীবন্মুক্ত জাতিস্মর গুরুভ্রাতা লালবিহারী বসু, প্রায় ঐ সময়েই, একদিন স্বেচ্ছাক্রমে, অকস্মাৎ গেণ্ডারিয়া অন্ধকার করিয়া পরমধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সকল দুঃসংবাদে এবং আরও দু'একটি উদ্বেগজনক কারণে, আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইব সঙ্কল্প করিয়া, ঠাকুরকে অভিপ্রায় জানাইলাম। ঠাকুর, যোগজীবনের দ্বারা উত্তর দিলেন—**'শীঘ্র আমি গেণ্ডারিয়ায় যাইতেছি। সুবিধা বোধ করিলে এখন হইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।'** পত্র পাইয়া আমি অবিলম্বেই গেণ্ডারিয়ায় যাইব স্থির করিলাম।

ছোট দাদার দীক্ষা ও বিস্ময়কর ঘটনা। নানা প্রশ্ন।

শেষ রাত্রে আসনে থাকিয়াই আমার প্রাণ অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় আসিয়াছেন, বারংবার মনে হইতে লাগিল। অদ্যই ঢাকা পহুঁছিব সঙ্কল্প করিলাম। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া; ছোট দাদাকে আমার সঙ্গে গেণ্ডারিয়ায় যাইতে বলিলাম। তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক রাজী হইলেন। এক মাসের মত চাউল, ডা'ল, লবণ, লঙ্কা, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি আহারের সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পরে বেলা প্রায় দশটার সময়ে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। মজুরের অভাব বশতঃ গুরুভার গাঁঠ্‌রিটি আমাকে বহন করিতে না দিয়া, ছোট দাদা রুগ্ন শরীরে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া লইলেন।

১২৯৭ সাল, ১৪ই চৈত্র; দ্বিতীয়া তিথি, শুক্রবার।

তিন চার মাইল রাস্তা চলিয়া, আমরা সেরাজদিঘার 'গহনায়' (খেয়া নৌকায়) উঠিলাম। বেলা অপরাহ্নে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গেণ্ডারিয়ায় পঁহুছিলাম। আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে, পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত হইয়াই খবর পাইলাম—গত কল্য ঠাকুর আশ্রমে আসিয়াছেন। দূরহইতে দেখিলাম, লোকে লোকারণ্য। ঠাকুর আমগাছের তলায় বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব দুষ্কৃতির কথা এ সময়ে পুনঃপুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাই বহুজনতার ভিতরে, ঠাকুরের নিকটে যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। পণ্ডিত দাদার কুটীরে, বিষণ্ণ অন্তরে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুর আসনহইতে উঠিয়া, দক্ষিণ দিকে পুষ্করিণীর ধারে প্রস্রাব করিতে গেলেন; তখন সকল লোক আমতলা হইতে চলিয়া আসিলেন। আমি উহাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ছোট দাদাকে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে ঠাকুরের নিকটে পাঠাইলাম। ঠাকুর হাত মুখ ধুইয়া যেমনি নিজের পায়ে জল ঢালিতেছিলেন, ছোট দাদা অমনি অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। এই মন্ত্র অস্ফুটভাবে আওড়াইতে আওড়াইতে ঠাকুরের চরণে গিয়া পড়িলেন। পরে করজোড়ে 'আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়' মাত্র বলিয়া কাঙ্গালের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর, ছোট দাদার দিকে চাহিয়া **"কোথায় আছ? কবে এসেছ?"** জিজ্ঞাসার পর, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন—**'আচ্ছা তুমি যাও, আমি কুলদাকে বলব এখন।'** ছোট দাদা পুনরায় ঠাকুরকে নমস্কারান্তর চলিয়া আসিলেন। আমি কিঞ্চিৎ দূরে, বৃক্ষের আড়ালে অবস্থানপূর্ব্বক এই সমস্ত দেখিলাম। ঠাকুর নিশ্চয় ছোট দাদাকে কৃপা করিবেন মনে করিলাম, এবং অবিলম্বে ছোট দাদার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ভরসা দিতে লাগিলাম।

তিন বৎসরের মধ্যে ঠাকুর, ছোট দাদাকে দেখেন নাই। বহু লোকের ভিতরে কোন সময়ে দেখিলেও, 'আমার দাদা বলিয়া' পরিচয় পান নাই। ঠাকুর, ছোট দাদাকে দেখিয়াই কি প্রকারে চিনিলেন এবং আমি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়াছি কিরূপে তিনি জানিলেন, এ সকল ভাবিয়া, ছোট দাদা বড়ই বিস্মিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই, আমতলায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িলাম। ঠাকুর আমার প্রতি খুব স্নেহের সহিত দৃষ্টি করিতে করিতে বলিলেন—**'তোমার' দাদাকে কুঞ্জের বাড়ী নিয়ে এস। এখনই তাঁর দীক্ষা হবে।'**

ঠাকুরের আদেশ মত, আমি অমনি ছোট দাদাকে লইয়া ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ছোট দাদা, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ বাড়ীর পূবেব-ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের কোন লোক ঘরের নিকটে না আসে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে ঠাকুর আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সাধনপ্রাপ্ত বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া, ঘরের ভিতরে বাহিরে যথায় তথায়, উৎফুল্ল মনে বসিয়া পড়িলেন। আজ দীক্ষা-প্রার্থী কত লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না। পরিচিতের মধ্যে কুঞ্জ বাবুর পরিবারস্থ কয়েকটি স্ত্রীলোক এবং বঙ্কিম নামে একটি কায়স্থ বালক, ছোট দাদার সহিত ঠাকুরের সম্মুখে সাধন লইতে বসিয়াছেন দেখিলাম। ধূপ, ধুনা, চন্দন, গুগ্‌গুলাদির সুগন্ধি ধূমে ঘর পরিপূর্ণ

হইল। ঠাকুর দীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সাধনের নিয়ম প্রণালী উপদেশ করিয়া, ঠাকুর যখন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-ভক্তগণের কলিজার বস্তু মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, তখন অদ্ভুত মহাশক্তির তরঙ্গ উঠিয়া সকলকেই কম্পিত করিয়া তুলিল। ঠাকুর প্রাণায়ামের প্রকরণ দেখাইয়া **'জয় গুরু!' 'জয় গুরু!'** বলিতে বলিতে বাহ্য সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। তখন ঘরের অন্দরে বাহিরে সকলেরই ভিতরে এক মহাকাণ্ড আরম্ভ হইল। গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরা নানা ভাবে অভিভূত হইয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বহু লোকের হাসি কান্নার বিচিত্র রোল উঠিল। ছোট দাদা এই সময়ে চিৎকার করিয়া, 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' এবং 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' মন্ত্র দ্বয় বারংবার পড়িতে পড়িতে, ঠাকুরের চরণতলে লুটাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—**'আহা! আহা!! আহা!!! কি চমৎকার! কি চমৎকার!! আজ সত্যযুগের ধ্বজা আকাশে উড়্‌ল, আজ হ'তে সত্যযুগ আরম্ভ হ'ল, আহা দেখ! কত যোগী, কত ঋষি, কত দেব দেবী, আজ সত্যযুগের নিশান হাতে ল'য়ে, নভোমণ্ডলে আনন্দে নৃত্য কর্‌ছেন; মহাপুরুষগণ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছেন। এরূপ শুভদিন আর হয় না। পঁচিশজন বৌদ্ধ যোগী লামাগুরু এ স্থানে উপস্থিত। সংসারের কল্যাণ কর্‌তে, আজ এই মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতরণ কর্‌লেন। আজ মহা আনন্দের দিন। ধন্য! ধন্য!! ধন্য!!!**

ঠাকুর ভাবাবেশে এই সকল বলিতেছেন, অকস্মাৎ একটি অল্পবয়স্কা বালিকা, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং ভাববিহ্বল অবস্থায় করজোড়ে পুনঃপুনঃ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গদগদ স্বরে তিব্বতী ভাষায় ঠাকুরের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে এক একবার সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতপূর্ব্বক ঠাকুরকে দেখাইতে দেখাইতে বিবিধ ভাষায় অসামান্য তেজে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী লোকবিস্ময়কর বক্তৃতা করিলেন। ভাষা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া, যদিও উহার একটি শব্দেরও অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু তেজস্বিনীর তেজঃপূর্ণ প্রত্যেকটি শব্দের প্রভাবে, ভিতরে এক চমৎকার শক্তির প্রবাহ চলিতে লাগিল। বক্তৃতার মুগ্ধকরী শক্তিতে সকলেই প্রায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই প্রকার অসম্ভব ব্যাপার জীবনে আর কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, বালিকাটি কুঞ্জবাবুর শ্যালিকা, নাম অবলা; ইনিও অদ্যই দীক্ষা লাভ করিলেন। জীবনে কখনও ইনি তিব্বতী ভাষা শ্রবণ করেন নাই। কি প্রকারে ইনি অজ্ঞাত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিলেন, জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহল জন্মিল।

দীক্ষার পরে, ঠাকুর সকলকে ধীরে ধীরে শান্ত ও সুস্থির করিয়া, ঘরহইতে বাহির হইলেন। ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও চলিলাম। ভাবাবেশে বিভোর অবস্থায় গুরুভ্রাতারা ঢুলিতে ঢুলিতে আশ্রমে যাইয়া এক একজনে এক একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। দু' চার জনার সঙ্গে ঠাকুর কোঠা-ঘরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি ছোট দাদাকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরের বারেন্দায় গিয়া বসিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে গুরুভ্রাতাদের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র দশ এগার বৎসরের বালক ফণিভূষণ, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দীক্ষার সময়ে বুট বুট করে উনি যে অতক্ষণ বল্‌লেন, ওঁর ভিতরে কি কোনও স্পিরিট, (প্রেতাত্মা) প্রবেশ করেছিল? কি যে বল্‌লেন, কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

ফণীর কথা শুনিয়া, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"**যে সকল বৌদ্ধ যোগী দীক্ষা স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন উঁহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে ছিলেন। তিনি তিব্বতী ভাষায় বল্‌লেন, তাই তোমরা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না।**"

ফণী বলিলেন—'আপনিও তো ঐ ভাষা জানেন না। আপনি বুঝিলেন কিরূপে? অন্যের ভাষা বোঝ্‌বার কি কোন সাধন আছে?'

ঠাকুর বলিলেন—"**এই সাধনেই সব হয়। শুধু সঙ্কেতটি জানা থাক্‌লেই হ'লো। সঙ্কেতটি এই, কারো ভাষা বুঝ্‌তে ইচ্ছা হ'লে সুষুম্নাতে প্রবেশ ক'রে, সম্বিৎ শক্তিতে মনটিকে স্থির রেখে শুন্‌তে হয়। এরূপ কর্‌লে, শুধু মানুষের কেন, সমস্ত জীব জন্তু, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতারও ভাষার অর্থ অবগত হওয়া যায়। যখন সেই অবস্থা হবে, চেষ্টা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।**'

ঠাকুর এইপ্রকার আরও অনেক তত্ত্বের কথা বলিলেন। আমি সে সকল কথা কিছুই পরিষ্কার বুঝিলাম না। কতকক্ষণ রোয়াকের উপরে বসিয়া, বাহিরে চলিয়া আসিলাম; দেখিলাম কোথাও গুরুভ্রাতারা দু' চারজনে মিলিয়া আনন্দে ভজন গান করিতেছেন, কোথাও বা কেহ কেহ নীরবে বসিয়া নামানন্দে মগ্ন আছেন; আশ্রম আজ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রফুল্ল মনে নানাপ্রকার অবস্থায়, আলাপ আলোচনায়, গান সঙ্কীর্ত্তনে, নির্জ্জন ভজনে, পরমানন্দে সময় কাটাইতেছেন; শুধু আমারই ভিতরে বিষম শুষ্কতা। আমি অস্থির হইয়া একবার গুরুভ্রাতাদের কাছে, আবার ঠাকুরের নিকটে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অহেতুকী শুষ্কতার জ্বালায় প্রাণ আমার ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অস্থিরভাবে ঠাকুরকে গিয়া বলিলাম—'সকলেই তো আপনার। আজ সকলের প্রাণে আনন্দ দিয়া, শুধু আমাকে শুষ্কতার জ্বালায় পোড়ায়ে মার্‌ছেন কেন? এ জ্বালা কিসে যাবে?'

ঠাকুর বলিলেন—"**যার পক্ষে যেটি কল্যাণকর ভগবান তাকে তাই দিচ্ছেন। বহুভাগ্যে মানুষের ভিতরে এই শুষ্কতা আসে। ব'সে স্থির হ'য়ে গিয়ে নাম কর। ও সব দিকে লক্ষ্য রেখো না; নাম করতে কর্‌তেই উহা চ'লে যাবে।**"

আমি কহিলাম—'আমার ভিতরটি সরস ক'রে দিন, ব'সে গিয়ে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন—"**যার পক্ষে যা কুপথ্য, রোগী চাইলেই কি ডাক্তার তা দিয়ে থাকেন? একটু স্থির হও, নাম কর যেয়ে।**"

আমি আর কিছু বলিতে সাহস পাইলাম না। বারেন্দায় ছোট দাদার কাছে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ ছেদনে ব্রাহ্মণোচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, গুরুভ্রাতাদের নিকটে, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের গল্পাদি করিলেন। ভিতরে বাহিরে বহুলোক বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। মহাপুরুষেরা কত স্থানে কত ভাবে অবস্থান করিতেছেন বলা যায় না। শ্রীবৃন্দাবনের রজলাভ মানসে, মহা মহা সিদ্ধ মহাত্মারা বর্ত্তমান সময়েও

নানারূপে তথায় রহিয়াছেন। এ বিষয়ে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

" শ্রীবৃন্দাবনের কোন এক কুঞ্জে, সুন্দর একটি বৃক্ষ ছিল। কুঞ্জের কর্ত্তা ঐ বৃক্ষটিকে কেটে ফেল্‌তে অধীনস্থ লোকদের আদেশ কর্‌লেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখ্‌লেন, একটি বৈষ্ণব বেশধারী ব্রাহ্মণ, তাঁকে এসে বল্‌ছেন—'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে বহুকালযাবৎ আছি। শ্রীবৃন্দাবনের রজলাভে ধন্য হওয়ার মানসেই, আমার বৃক্ষরূপ ধারণ। তুমি বৃক্ষটিকে ছেদন ক'রে, কখনও আমাকে এই রজস্পর্শ হ'তে বঞ্চিত ক'রো না। তুমি ওরূপ কর্‌লে আমাকে আবার জন্মাতে হবে, তাতে তোমারও শুভ হবে না। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মনে ক'রে, তুমি আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করো না। তোমার বিশ্বাসের জন্য, কাল প্রত্যুষে আমি বৃক্ষের নীচে একবার দাঁড়াব;ইচ্ছা কর্‌লেই আমাকে দেখ্‌তে পাবে।' পরদিন ভোরে বৃক্ষের নীচে পণ্ডিতজী যথার্থই একটি ব্রাহ্মণকে দেখ্‌তে পেলেন। কিন্তু, তাতেও তাঁর বিশ্বাস হ'লো না। গ্রাহ্যই কর্‌লেন না। তিনি বৃক্ষটিকে কাটালেন। যাঁরা এ সব কথা শুনেও বৃক্ষটিকে কাট্‌লেন ওলাউঠা হ'য়ে, তাঁরা মারা গেলেন। পণ্ডিতজীর স্ত্রী পুত্রাদিও কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ রোগে মারা পড়্‌লেন। পণ্ডিতজী বৃন্দাবনে দর্শনশাস্ত্রে মহা বিদ্বান ব'লে, বিশেষ খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে, হাবা হ'য়ে ব'সে আছেন। পূর্ব্বে সকলেই তাঁকে কত সম্মান কর্‌তেন, কিন্তু এখন কেউ তাঁকে আর গ্রাহ্য করেন না।"

ঠাকুরের মুখে এই প্রকার অনেক কথা শুনিয়া আমরা শয়ন করিলাম।

গোঁসাইয়ের মুখে শ্রীবৃন্দাবনের কথা।

১৫ই চৈত্র।

সকালবেলা শৌচান্তে, স্নান তর্পন সমাপন করিয়া পূবের-ঘরে, ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। রাত্রিতে আমরা কোথায় ছিলাম, কোনও প্রকার অসুবিধা হয়েছে কি না, ঠাকুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের রান্নাঘরে আমাদের রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি, ঠাকুরকে জানাইলাম। লোকের ভিড় কমিয়া গেলে, আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালায় ঠাকুর আমাদিগকে থাকিতে বলিলেন। ছোট দাদা আশ্রমেই দু' বেলা আহার করিবেন, আর আমি অপরাহ্নে এক বেলা পূর্ব্ববৎ স্বপাক আহার করিব, ইহাই ব্যবস্থা হইল। ছোট দাদার কথা তুলিয়া ঠাকুর বলিলেন—**"আশ্চর্য্য! খুব সৎপাত্র, এরূপটি বড়ই দুর্লভ। দীক্ষামাত্রই মুহূর্ত্তমধ্যে গুরুনিষ্ঠার দিক্‌টি, ওঁর খুলে গেছে। এরূপ বড় দেখা যায় না।"**

আজ অপরাহ্নে নারায়ণগঞ্জ হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী একটি ব্রাহ্মণ, ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু! শ্রীবৃন্দাবনে অদ্ভুত কি কি দেখিলেন? শুন্‌তে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—**"শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম, সেখানে সকলই অদ্ভুত। শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সমস্তই অন্য প্রকার। অন্য কোন স্থানের সহিতই উহার তুলনা হয় না।**

সেখানকার সমস্ত বৃক্ষেরই শাখাপত্র সকল নিম্নমুখী। অনেক স্থানে বড় বড় বৃক্ষ সকল, লতার মত রজসংলগ্ন হ'য়ে আছে। দেখ্‌লে পরিষ্কার মনে হয়, সাধু বৈষ্ণব মহাত্মারাই ব্রজরজ পাবার জন্য, বৃক্ষাকারে রয়েছেন। আপনা আপনি, বৃক্ষে দেব দেবীর মূর্ত্তি পরিষ্কার রূপে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। রাধাকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নামের অক্ষর আপনা আপনি বৃক্ষে উৎপন্ন হ'চ্ছে। কোথাও 'রা' কোথাও বা 'কৃ' মাত্র হ'য়ে আছে। বৃক্ষের শিরায় শিরায় এ সকল স্বাভাবিক অক্ষর দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি।"

বৈষ্ণবটি জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! এ সকল কি সকলেই দেখ্‌তে পায়? না আপনিই মাত্র দেখতে পেয়েছিলেন?

ঠাকুর বলিলেন—"এ সব সকলেই দেখেছেন। কালীদহের উপরে বহু প্রাচীন একটি কেলিকদম্বের বৃক্ষ আছেন; তাঁর শাখায়, প্রশাখায় 'হরেকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পরিষ্কার রূপে লেখা রয়েছে। যাঁর ইচ্ছা হয়, যেয়ে দেখে আস্‌তে পারেন। বন পরিক্রমার সময়ে, একদিন একটি বনের ধারে ব'সে আছি, সম্মুখে একটি গাছের পাতা দেখে, হাতে তুলে নিলাম; চেয়ে দেখি, দেবনাগর অক্ষরে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম পাতাটির শিরায় শিরায় লেখা রয়েছে। একটু অনুসন্ধান কর্‌তেই বৃক্ষটিকে পেলাম, তখন একে একে ভারত পণ্ডিত মশায় ও সতীশ প্রভৃতি যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, সকলকে ডেকে দেখালেম্‌; সকলে একই প্রকার নাম, বৃক্ষের পাতায় পাতায় দেখ্‌তে পেলেন। অনুসন্ধান কর্‌লে সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়।"

"পরিক্রমার সময়ে আর এক দিন একটি বনের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। শুন্‌লাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ বনের কদম্ব বৃক্ষের পত্রে 'দোনা' প্রস্তুত করেছিলেন। এখনও ভগবান সেই লীলার নিদর্শন সময়ে সময়ে ভক্তদের দর্শন করান। আমরা বনের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, খুঁজে খুঁজে হয়রান। দোনা কোন বৃক্ষেই দেখ্‌তে পেলাম না। পরে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার ক'রে, কাতরভাবে সকলে ব'সে আছি, চেয়ে দেখি সম্মুখেই একটি কদম গাছের পাতা, দোনার মত দেখা যাচ্ছে। নিকটে যেয়ে দেখি, বৃক্ষের সমস্ত পাতাগুলিই দোনার আকার। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন সকলেই বৃক্ষের পাতায় পাতায় দোনা দেখ্‌লেন।"

"চরণপাহাড়ীতে যেয়ে দেখ্‌লাম, পাহাড়ের প্রস্তরে গরু বাছুর এবং মনুষ্যের অসংখ্য পদচিহ্ন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে বংশী ধ্বনিতে, সমস্ত বৃন্দাবন মুগ্ধ হ'তো, সেই মধুর বংশীরবে এক সময়ে ঐ পাহাড়ও দ্রবীভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ে ধেনু, বৎস ও রাখাল বালকগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐ পাহাড়ে ছিলেন, সকলেরই পদচিহ্ন ঐ প্রস্তরে অঙ্কিত হ'য়ে পড়্‌ল। আজও সে সকল চিহ্ন পাহাড়ে পরিষ্কার রয়েছে। দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উহা কখনও মানুষের খোদা নয়। ওরূপটি মনুষ্যের দ্বারায় কখনও হ'তে পারে না।"

এ সকল কথা বার্ত্তা হইতে হইতে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সহর হইতে দলে দলে স্কুলের ছাত্র এবং বাবুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ঠাকুর নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ

করিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিলাম।

সন্ধ্যার সময়ে আমগাছের তলে, সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শুনিয়াছিলাম, প্রায়ই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে, আশ্রমের বুড়ো লাল কুকুরটির মহাভাব উপস্থিত হয়। আজ বুড়োকে সঙ্কীর্ত্তন কালে, ভাবাবেশে সংজ্ঞা শূন্য অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। 'হরেকৃষ্ণ' নাম বহুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বুড়োর কানে বলিতে বলিতে তাহার চৈতন্য লাভ হইল।

গোঁসাইয়ের জটা ও দণ্ড।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের মস্তকে মহাদেবের যে শিরোবস্ত্র সর্ব্বদা জড়ান থাকিত, এখন আর তাহা নাই। মস্তকের দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে তিনটি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত পরম সুন্দর জটা দেখিতেছি। পশ্চাদ্দিকে বেণীর আকারে, একটি জটা পৃষ্ঠদেশে লম্বমান; ব্রহ্মতালুর চতুর্দ্দিকের চুলের গাঁথুনিতে অপর একটি সুন্দর জটা। সর্ব্বশুদ্ধ ঠাকুরের মস্তকে পাঁচটি জটার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্মুখের বড় জটাটির বিস্তৃত অগ্রভাগ নৃত্যকালে আশ্চর্য্য প্রকারে ঠাকুরের কপালের উপরে যখন দাঁড়াইয়া উঠে, তখন মহাদেবের শিরোফণীর কথা মনে হয়। আবার সমাধি সময়ে ঐ জটাটিই যখন বামে হেলিয়া কিঞ্চিৎ দুলিয়া মস্তকোপরি অবস্থান করিতে থাকে, তখন দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ময়ূর শিখার স্বভাবসিদ্ধঃসংস্কার প্রাণে আসিয়া উদয় হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক জটা এত সুন্দর, এত মনোহর কোথাও দেখি নাই। ঠাকুরের শরীরের বর্ণ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু হস্ত পদ ও মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত কাল। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিনে—'**শ্রীবৃন্দাবনে শীত অত্যন্ত বেশী। গায়ে সর্ব্বদা 'আল্‌খাল্লা' প'রে থাক্‌তাম্। যে সব স্থান খোলা থাক্‌তো, শীত লেগে তাহাই কাল হ'য়ে গেছে।**'

১৬ই চৈত্র, ১২৯৭,

কুম্ভমেলার সময়ে ঠাকুর যখন হরিদ্বারে গিয়াছিলেন, শুনিলাম, 'নিষোল' (নিরেট) বাঁশের দণ্ডখানা সেখান হইতেই তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। দণ্ডটির গোড়ায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত স্থানের মধ্যে সাতটি গাঁট আছে; বংশ দণ্ড এই প্রকার লক্ষণযুক্ত হইলেই তাহা ধারণোপযোগী হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবাসী।

আজ একটি ভদ্রলোক ব্রজভূমির নানা প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিলেন—'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃতই হউক, আর যাহাই হউক, সেখানের লোকগুলি কিন্তু বড় ভয়ানক। টাকা টাকা করিয়া যাত্রীর উপরে যে বিষম অত্যাচার করে, তাহা শুনিয়াই ত প্রাণে ত্রাস উপস্থিত হয়।' ঠাকুর বলিলেন—**"টাকার জন্য ব্রজবাসীরা নরহত্যাও করে, এরূপ ঘটনা কয়েকটি শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা যথার্থ ব্রজবাসী কি না, বলা কঠিন। আগ্রা, দিল্লী জয়পুরাদি নানাস্থানের অনেক লোক, তিন চার পুরুষ থেকে ব্রজভূমে বাস করছেন। তাঁরাও ব্রজবাসী ব'লে পরিচয় দেন। লোকেও**

তাঁদের ব্রজবাসী ব'লেই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনের পল্লীগ্রামে ঘুর্‌লে, যথার্থ ব্রজবাসীদের সরলতা, উদারতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। যে সকল ব্রজবাসী যাত্রী যজমানদের উৎপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করেন, তাঁরা ঐ টাকার দ্বারায় কি করেন তাও ত দেখতে হবে। বন পরিক্রমার সময়ে, সহস্র সহস্র সাধু, বৈষ্ণব ও যাত্রীদের ভরণ পোষণ তাঁরাই তো করেন। অর্থ তাঁরা জমা করেন না। তোমাদের হ'তে টাকা নিয়ে, তোমাদেরই সেবা করেন। পূর্ব্বে ব্রজবাসীরা আহারের অভাবে অর্থের অনটনে কোথাও ঘোরাঘুরি কর্‌তেন না। যাত্রীর উপরেও তাঁহাদের কোন উপদ্রব ছিল না। তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি ছিল। আমাদেরই দুর্ব্যবহারে এখন তাঁদের এই দুর্দ্দশা।”

যে লালা বাবুর নাম কীর্ত্তন করিয়া, আজ সমস্ত বাঙ্গালার লোক কৃতার্থ হইতেছেন, তিনিও এক সময়ে কিরূপ ছিলেন? পরে, শ্রীধাম বাসের গুণে, ভগবৎ কৃপায় কত দুর্লভ অবস্থা লাভ পূর্ব্বক জন সাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন, ঠাকুর তাহা বলিতে লাগিলেন—

“প্রথম অবস্থায় লালা বাবু, আর দশ জন জমীদার যেমন, তেমনই ছিলেন। ব্রজবাসীরা ভোলা। ভাং ও লাড্‌ডু পেলে তাঁরা আর কিছু চান না। ওতেই তাঁদের পরম আনন্দ। লালা বাবু ইহা দেখে তাঁদের খুব ভাং ও লাড্‌ডু খাওয়াতে লাগ্‌লেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত লিখিয়ে নিলেন। এখনও ব্রজবাসীরা অনেকে দুঃখ ক'রে বলেন, লালা বাবুই আমাদের শেষ করেছেন। পরে ভগবানের কৃপায় যখন লালা বাবুর বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি রাধাকুণ্ডর একটি সিদ্ধ মহাত্মার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হ'য়ে গেলেন। সিদ্ধ বাবাজী, লালা বাবুকে খুব তিরস্কার ক'রে বল্‌লেন—'যাঁদের সঙ্গে তোমার পরম শত্রুতা, নেংটি মাত্র প'রে কাঙ্গাল বেশে তাঁদের চরণে প'ড়ে আগে যেয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর। পরে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এসো। আর তাঁদের ঘরেই মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে সেবা কর্‌বে।' লালা বাবু যখন কাঙ্গাল বেশে নেংটি মাত্র প'রে, মথুরার চৌবেদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হ'তে লাগ্‌লেন, তখন সকলে ভেবেছিল লালা বাবুকে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। কিন্তু চৌবেরা তাঁর অবস্থা দেখে, চোখে জল রাখ্‌তে পার্‌লেন না, বল্‌লেন—'আহা! তোমার এই অবস্থা, ভিক্ষা করতে আমাদেরই দ্বারে এসেছ? তোমাকে কি ভিক্ষা দিব বল? আমাদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও তুমি নাও।' চৌবেরা প্রাণের সহিত তাঁহাকে ক্ষমা ক'রে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। পরে তাঁর দীক্ষা হ'লো। দীক্ষার পরে তিনি যেরূপ কঠোর বৈরাগ্য কর্‌লেন, তা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। প্রত্যহ ভিক্ষার সময়ে লোকে তাঁকে চিন্‌তে পেরে, ভাল ভাল খাবার দিতেন; এজন্য তিনি কত কঠোরতাই করেছিলেন। আদর যত্ন প্রশংসা তাঁকে বিষের ন্যায় জ্বালা দিত। লোকে তাঁকে চিন্‌তে না পারে, এজন্য কত ভাবেই পাগলের মত বেড়াতেন। লোকে আদর ক'রে ভিক্ষা দিত ব'লে, তিনি ভিক্ষা করা ছেড়ে দিলেন। অবশেষে ঘোড়ার 'লাদে' (বিষ্ঠা) যে সব দানা পেতেন, তাই মাত্র খেয়ে, কোন প্রকারে জীবন ধারণ কর্‌তেন। এক দিন ঐরূপ ঘোড়ার লাদ ঘেঁটে দানা সংগ্রহ কর্‌ছিলেন, অকস্মাৎ ঘোড়া বিষম এক লাথি মার্‌লো, তাতেই লালা বাবুর মৃত্যু হয়। এপ্রকার অদ্ভুত

বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন এখন আর দেখা যায় না।"

পরিক্রমাকালে ব্রজমায়ীদের ব্যবহার।

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের কথা বলিতে বড়ই আনন্দ পান। এতকাল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়া দর্শকগণও আসিয়া ঠাকুরকে শ্রীবৃন্দাবনের কথাই জিজ্ঞাসা করেন। আজ একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রজ পরিক্রমার সময়ে অসংখ্য যাত্রীদের আহারাদি কি প্রকারে চলে? সঙ্গে সঙ্গে কি বাজার যায়? না জিনিস পত্র যাত্রীদের নিয়ে চল্‌তে হয়? রাস্তায় চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না কি? ঠাকুর বলিলেন—"চোর ডাকাতের উপদ্রব তো সর্ব্বত্রই আছে। পরিক্রমার সময়ে সঙ্গে জিনিস পত্র নিয়ে যাওয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাজার চলে, আবার পথের স্থানে স্থানে আড্ডাও আছে। সেখানে সমস্ত জিনিসই জোটে। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরা আড্ডায় গিয়ে প্রয়োজন মত জিনিস খরিদ ক'রে আহারাদি করেন। আর সাধুরা লুটপাট ক'রে খাবার সংগ্রহ ক'রে নেন। পরিক্রমার সময়ে গ্রামে গ্রামে ব্রজমায়ীরা দধি দুগ্ধাদি, ভারে ভারে একখানা ঘরে সাজায়ে রাখেন। পরে অন্য ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকেন। সাধুরা গিয়ে এঘর, ওঘর ক'রে দধি দুগ্ধ খুঁজে বা'র করেন। সেই সময়ে ব্রজমায়ীরা, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে, হাতে ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া কর্‌তে থাকেন। সাধুরা দধি দুগ্ধাদি লুটপাট ক'রে, হাঁড়ি পাতিল ভেঙ্গে দৌড় মারেন। ইহাতে ব্রজমায়ীদের বড়ই আনন্দ। তাঁরা এ সময়ে রাখাল বালকসহ শ্রীকৃষ্ণের দধি দুগ্ধ চুরির কথা মনে ক'রে সেইভাবেই মুগ্ধ হ'য়ে থাকেন। চুরি ক'রে বা জোর ক'রে এরূপ লুটপাট ক'রে কেহ কিছু নিলে, ব্রজমায়ীদের যে আনন্দ, তা আর বল্‌বার নয়। এই আনন্দ কর্‌বার জন্যই তাঁরা প্রতিদিন কত চেষ্টা ক'রে দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি নানা সুখাদ্য বস্তু ঘর ভ'রে সাজায়ে রাখেন। যে সকল সাধুরা লুটপাট করেন না, আসনেই থাকেন, ব্রজমায়ীরা তাঁদের নিকটে যেয়ে, বাৎসল্যভাবে কত গালি দেন। হাতে ধ'রে টেনে বাড়ীতে নিয়ে যান। সাধুদের গলা জড়ায়ে ধ'রে, কত আদর ক'রে, ঘরে যা কিছু থাকে স্বহস্তে সাধুদের মুখে তুলে দিয়ে খাওয়ান। ব্রজমায়ীদের এ সব ভাব দেখ্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়।

১৭ই চৈত্র

ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, এখনও সেই ভাবই বর্ত্তমান। বেলা শেষ হ'লে, ব্রজমায়ীরা উৎকণ্ঠিত প্রাণে, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়ায়ে থাকেন। কতক্ষণে রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে ফির্‌বে, তাই দেখেন। চেনা, অচেনা জ্ঞান নাই। ঘরের ভাল ভাল জিনিস নিয়ে, কত আদর ক'রে, রাখাল বালকদের খাওয়ান। রাখালগণের আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'লে, স্নেহভরে তাদের কত গালাগালি করেন। ব্রজের পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়, ব্রজমায়ীদের ভিতরে এখনও পূর্ব্বের সেই ভাব, সেই অবস্থা সমস্তই রয়েছে।

ঠাকুরের সঙ্গে এবার মাঠাকুরাণী, সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি অনেকেই ব্রজ পরিক্রমা করিয়াছেন। ইঁহারই ধন্য। আমার অদৃষ্টে অল্পদিনের জন্য উহা ঘটিল না। ঠাকুর, সতীশকে চৌরাশি ক্রোশ

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিতে বলিয়াছিলেন। সতীশও তাহা লিখিয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে শুনাইতেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার সমস্ত ঘটনাই, এই পুস্তকখানায় থাকিবে আশা করি। সতীশ উপস্থিত এই আশ্রমেই রহিয়াছেন।

জীবপ্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা।

আহারান্তে সাড়ে বারটার সময়ে, ঠাকুর আমগাছের তলায় নিজ আসনে যাইয়া বসেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একই ভাবে, আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নে চৈত্রের বিষম উত্তাপে ঘর হইতে কেহ বাহির হন না। ঠাকুরও এই সময়ে গরমে কখন কখনও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়েন। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে, আমিও একখানা পাখা হাতে লইয়া আমতলায় যাইয়া বসি। ঠাকুরের বাম দিকে, দুই হাত অন্তরে থাকিয়া, বাতাস করিতে আরম্ভ করি। ঠাকুর প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অনিমেষ নয়নে, নিস্পন্দ ভাবে, পূর্ব্ব দিকে বৃক্ষ পানে তাকাইয়া থাকেন। কখন কখন বা নয়ন মুদ্রিত করিয়া একই ভাবে সমাধি অবস্থায় তিন চার ঘণ্টা কাল অবস্থান করেন। অপরাহ্নে প্রায় পাঁচটার সময়ে, আমতলায় লোক জন আসিয়া পড়ে। তখন ঠাকুর, তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করেন। নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে, আমতলা পরিপূর্ণ হয় দেখিয়া, বড়ই আনন্দ লাভ করি। আজ মধ্যাহ্নে, আমতলায় নিজ আসনে বসিয়াই, ঠাকুর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। আমি নিকটে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময়ে, ঠাকুর অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্তভাবে আমাকে বলিলেন—**"দেখ ত। দেখ ত। ওদের তাড়ায়ে দাও, পাখীরা ভয় পেয়ে ডাক্‌ছে।"** আমি বলিলাম—পাখী কোথায় ডাক্‌ছে? কাদের তাড়িয়ে দিব? ঠাকুর বলিলেন—**'যেয়ে দেখ না, কুঞ্জ ঘোষের বাড়ীর বড় আমগাছে।'** এইমাত্র বলিয়াই ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও অমনি ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর দিকে দৌড়িলাম। বড় আমগাছটির নিকটে যাইয়া দেখি, কয়েকটি দুষ্ট বালক, শালিক পাখীদের বাসা লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছে। তিন চারিটি শালিক, গাছের উপরে এ ডালে ও ডালে, ব্যস্ত হইয়া উড়াউড়ি করিতেছে আর ডাকিতেছে। বালকদের আমি ধমক দেওয়া মাত্রই, সকলে পলাইয়া গেল। পাখীরা স্থির হইল। আমিও ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলাম এবং পাখা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর অমনি মাথা তুলিয়া চোখ মেলিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**'কি দেখ্‌লে?'** আমি দুষ্ট ছেলেদের শালিকের ছানা পাড়িবার দুশ্চেষ্টা ও শালিক তাড়াইবার জন্য ঢিল ছোড়ার কথা বলিতে লাগিলাম। ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না, এরূপ ভাবে থাকিয়া, খুব মনোযোগের সহিত আমার কথা শুনিতে লাগিলেন। বলা শেষ হইলে পর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি তো এখানেই ব'সে ছিলাম, পাখীদের শব্দ তো কিছুই শুন্‌তে পাই নাই। আপনি মগ্নাবস্থায় থেকে অত দূরে পাখীদের ডাক কিরূপে শুন্‌লেন।' ঠাকুর বলিলেন—**'নিকটে, দূরে কি কর্‌বে? যেখানে যে অবস্থায় থাকা যাক্, কোন আপদে প'ড়ে কেহ ডাক্‌লে তা এসে প্রাণে বাজে।**

১৮ই চৈত্র।

এই সময়ে ঠাকুরের আসনের পাশ দিয়া, এক সারি পিঁপড়া দ্রুতপদে চলাচল করিতেছিল। ঠাকুর উহাদের দিকে একটু তাকাইয়া, মাথাটি নোয়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, কান পাতিয়া, যেন উহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন এবং উহাদের কথা যেন বুঝিতেছেন এইরূপ ভাবে, সময়ে সময়ে, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—'পিঁপ্‌ড়ারাও কি কথা বলে? পিঁপ্‌ড়াদের কথাও কি শুনা যায়?'

ঠাকুর বলিলেন—**'পিঁপ্‌ড়া কেন, বৃক্ষ লতাও কথা বলে। চিত্তটি একটু স্থির হ'লে, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা সকলের কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়।'**

ঠাকুর আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে না দিয়া অমনি বলিলেন—**'সে যাউক, তুমি পিঁপ্‌ড়াদের কিছু খাবার এনে দাও না। আটা ও চিনি মিলায়ে দিলে পিঁপ্‌ড়াদের খেয়ে বড় আনন্দ হয়।'** আমি আটা না পাইয়া, শুধু চিনি আনিয়া, ঠাকুরের কথামত তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে ছড়াইয়া দিলাম। ঠাকুর তখনই আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এক একবার চোখ মেলিয়া পিঁপ্‌ড়াদের দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—**'এদের ভিতরেও এলোমেলো কিছু হয় না। সমস্ত কার্য্যেরই সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। এদের মধ্যেও চালক আছে, শাসন আছে বিচার ও দণ্ড আছে। মানুষ বড় ব'লে কিসে অভিমান করে? পিঁপ্‌ড়ার মত, বালি হ'তে এইরূপে চিনি পৃথক ক'রে নিক্ দেখি?**

শ্রীবৃন্দাবনে "রাধাশ্যাম" পাখী।

মধ্যাহ্নের গরমে সকলেই আপন আপন ঘরে বিশ্রাম করেন ; চারিদিক নিস্তব্ধ। গেণ্ডারিয়ার পাখী সকল ছায়াতে বৃক্ষডালে বসিয়া, নানাপ্রকার রব করে ; শুনিয়া বড়ই আনন্দ হয়। আজ অপরাহ্লে, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের একপ্রকার আশ্চর্য্য পাখীর গল্প করিলেন। শুনিয়া অবাক্ হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে এতকাল ছিলাম, কিন্তু কোন বিষয়েরই কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই। সে জন্য এখন আক্ষেপ হয়। ঠাকুর আজ শ্যামাপাখীর কথা বলিতে লাগিলেন—**'কোন একটি ঋতুতে, উত্তর দেশ থেকে এক শ্রেণীর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ঐ পাখী সকল, 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাকেন। এমনই সুস্পষ্টস্বরে 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' বলেন যে, শুনে অন্য কিছু মনে করা যায় না। শ্রীবৃন্দাবনে ঐ পাখীকে 'রাধাশ্যাম' পাখী বলে। একবার একটি ব্রজবাসী, কৌশলক্রমে দু'টি রাধাশ্যাম পাখী ধর্‌লেন। কিন্তু একটি উড়ে গেলেন, অপরটিকে ব্রজবাসী একটি পিঞ্জরায় পূরে রাখ্‌লেন। খাবার দিলেন, পাখীটি পিঞ্জরায় বদ্ধ হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ কর্‌লেন। আর সে ডাক্ও নাই, পাখীর স্ফূর্ত্তিও নাই। পরদিন প্রত্যুষে দলে দলে রাধাশ্যাম পাখী এসে ব্রজবাসীর কুঞ্জে প'ড়ে 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্‌তে লাগলেন। পাড়ার সব ব্রজবাসীরা তখন ঐ ব্রজবাসীকে ধমক্ দিয়ে বল্‌লেন, অবিলম্বে তুমি ঐ পাখীটি ছেড়ে দাও। না হ'লে**

তোমার সর্ব্বনাশ হবে। দেখ দলের সমস্ত পাখীগুলি এসে উহার জন্য 'রাধাশ্যাম', 'রাধাশ্যাম' ব'লে ডাক্‌ছে। তখন ব্রজবাসী পাখীটি ছেড়ে দিলেন।'

শ্রীবৃন্দাবনে হিংসা।

শ্রীবৃন্দাবনে কাক কোথাও দেখলাম না। আমিষ ভক্ষণ নাই ব'লেই, ওখানে কাক নাই। আমিষ খাওয়া আরম্ভ হ'লেই কাক যেয়ে উপস্থিত হবে। ব্রজভূমির ন্যায় হিংসাশূন্য স্থান, আর কোথাও দেখা যায় না। এজন্য বনের পশু পক্ষীও, মানুষের গা ঘেঁসে চল্‌তে কোন শঙ্কা করে না। যার ভিতরে হিংসা, তারই নিকটে ভয়।

শুনিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে হিংসা নাই বলিয়া সমস্ত ব্রজভূমে পশু পক্ষী শীকার করাও সরকার হইতেই নিষেধ আছে। কিছুকাল হয়, কোন এক পুলিশ সাহেব সরকারের হুকুম অমান্য করিয়া, শীকার করিতে গিয়াছিলেন। শীকারের চেষ্টা করা মাত্রই তিনি মারা পড়িলেন। ঘটনাটি ঠাকুর এই প্রকার বলিলেন—

'পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চ'ড়ে যমুনা পার হ'য়ে 'বেলবাগের' দিকের এক জঙ্গলে উপস্থিত হ'লেন। অনেকেই নিষেধ করেছিলেন, কারো কথাই তিনি গ্রাহ্য কর্‌লেন না। বনে যেয়ে একটি শূকর দেখে বন্দুক ছুড়্‌লেন; শূকর অমনি দুই লাফে সাহেবের নিকেট এসে পড়্‌লো। ঘোড়া অমনি সাহেবকে ফেলে দিয়ে পালালো। শূকর তৎক্ষণাৎ সাহেবকে চিরে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্‌লো।'

হোমের ব্যবস্থা।

মধ্যাহ্নে, আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন হঠাৎ মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

১৯শে চৈত্র

'বৈশাখ মাসের পহেলা হইতে তিন মাস কাল তোমায় হোম কর্‌তে হবে।'

—'হোম কিরূপে কর্‌বো, আমি তো কিছুই জানি না।'

ঠাকুর বলিলেন—**'বেল, বট, অশ্বত্থ বা যজ্ঞডম্বুরের কাষ্ঠদ্বারা হোম কর্‌বে। একশ আটটি ত্রিদল বিল্বপত্র নিয়ে, ঘৃতে মিলায়ে এই......মন্ত্র পাঠ ক'রে একশ আট বার আহুতি দিবে। প্রতিদিন সকালে, স্নানের পর গায়ত্রী জপ ক'রে, তিন মাস এই প্রকার হোম ক'রো। স্বপাক আহার চা'রটার পরে করাই তোমার পক্ষে ভাল।'**

আমি বলিলাম—'দেশে দেখিয়াছি, হোম করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা যন্ত্রাদি আঁকিয়া কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া নেন্, আর হোম-স্থানে বালি ছড়াইয়া দেন, আমায় কি ঐরূপই কর্‌তে হবে?'

ঠাকুর বলিলেন—'না, না, কিছু না। **আসনের সম্মুখে—এইরূপ একটি কুণ্ড প্রস্তুত ক'রে নিয়ো, প্রত্যহ ওতেই হোম ক'রো।'**

এই বলিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া গোলাকার কুণ্ড দেখাইলেন। বৈশাখ মাস আরম্ভের আর

বেশী দিন বাকী নাই। হোমের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত ও কাষ্ঠ এখানে সংগ্রহ করা বিশেষ অসুবিধা বুঝিয়া, আগামী কল্যই বাড়ী যাইব স্থির করিলাম।

ফকির আলিজান। প্রাণায়ামের প্রকারভেদ।

এক দিন মাত্র বাড়ী থাকিয়া, হোমের জন্য উডুম্বর কাষ্ঠ ও গব্য ঘৃত লইয়া গেণ্ডারিয়ায় আসিয়াছি। দেখিলাম, নানা দিক হইতে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ গুরুভ্রাতাভগিনীরা আসিয়া, আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় আসার পরহইতে, নানা শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী এবং খৃষ্টান ও মুসলমান্ ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিভাগের কাপ্তেন, পেন্সন প্রাপ্ত কাম্বেল সাহেব, বহুকালযাবৎ উদাসীন ভাবে, সাধন ভজনে, জীবন যাপন করিতেছেন। মধ্যাহ্নে, নির্জ্জন পাইলেই তিনি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া, কিছু সময় কাটাইয়া যান। লোকজন দেখিলেই অমনি সরিয়া পড়েন। সমুদ্র বাবা নামক একটি সাধু কয়েকদিনযাবৎ আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরের বারেন্দায় তিনি থাকেন। বাবাজীর সাধন ভজন কিছুই দেখি না। কি করেন, তাহাও জানি না। কিন্তু লোকটির কথা বার্ত্তা, আচার-ব্যবহার বড়ই মিষ্টি লাগে। ঠাকুরের প্রতি ইনি বড়ই শ্রদ্ধাবান্। ঠাকুরের যে দর্শন পাইয়াছেন, ইহাতেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন।

২৩শে চৈত্র, ১২৯৭।

একটি মুসলমান্ ফকির প্রায় অনেক সময়েই ঠাকুরের নিকটে আসেন। ঠাকুরের এখানে আসার পূর্ব্বে, তিনি গেণ্ডারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিতেন। ফকির সাহেবের নাম আলিজান। কথা বার্ত্তা যাহা বলেন, একটিরও অর্থ বুঝি না। চাল চলনও প্রায় অনেক সময়ে পাগলের মত মনে হয়। কিন্তু আলিজান কাহারও কোন অনিষ্টকর কার্য্য করেন না। ছেলে, বুড়ো সকলেই আলিজানকে লইয়া খুব আমোদ করেন। আলিজানও সকলের সঙ্গে খুব মিশিয়া থাকেন। ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, বেলা প্রায় ২ টার সময়ে ৩।৪ খণ্ড ইক্ষু দণ্ড লইয়া, বৃদ্ধ আলিজান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আসন করিয়া খুব আঁট্ সাঁট্ হইয়া বসিলেন। পরে একখানা বড় ইক্ষুদণ্ড খাওয়ার উদ্দেশ্যে, হাতে লইয়া যেমনই উহা দন্ত সংলগ্ন করিলেন, অমনি অকস্মাৎ উচ্চলম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। এবং চারি দিকে চঞ্চলভাবে দৃষ্টি করিয়া, ইক্ষুদণ্ডখানা দক্ষিণে বামে প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। আর চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আঃ! আল্লা! হালারা তিতা কইরা দিল। খাইবার দিল না। আরে হালারা, লাট তো আইচে। লাটের মস্তবড় জাহাজও আইচে, ইয়াতে কি ওইল। লাটের কাছে কামের ইসাব দিবি না। হালারা য্যাম্বায় অই যাইবি? তা পার্‌বি না। দিক্ করতে আইচ! নেকাল! নেকাল! নেকাল!" এই বলিয়া ফকির সাহেব কয়েকবার গোঁসাইয়ের সম্মুখে ইক্ষুদণ্ড ঘুরাইয়া লম্ফ ঝম্ফ দিতে দিতে, দৌড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুর এই সময়ে মৃদু মৃদু হাসিয়া ফকির সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব

চলিয়া গেলেন। পরে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আলিজান এরূপ করিলেন কেন? শূন্যের উপরে ইক্ষুদণ্ড দ্বারা কাহাকে মারিলেন? কে আলিজানের আখ তেতো করিল? এসব কি আলিজানের শুধু পাগলামী?'

ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—**'আলিজানকে তোমরা পাগল মনে কর? ইনি পাগল নন, ইনি খুব ভাল ফকির। সিদ্ধ পুরুষ। লোকের নিকটে পাগল না সাজ্‌লে, আজ কাল, রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। আলিজান যা বলেন, যা কিছু করেন, সকলেরই সঙ্গে তাঁর নিজের ক্রিয়াটির যোগ রাখেন। ইনি অনর্থক কিছু করেন না। ভূত প্রেতাদির দৃষ্টিতেও খাদ্য বস্তু নষ্ট হয়, উচ্ছিষ্ট হয়। আলিজানের সে সমস্ত পরিষ্কার নজরে পড়ে। শূন্যে আখ্ ঘুরায়ে যে লম্ফ ঝম্ফ কর্‌লেন, উহা একপ্রকার প্রাণায়াম। আলিজান অনেক রকম জানেন। ফকির সাহেবকে সাধারণ মনে ক'রো না।**

আমি বলিলাম—'লাফালাফি করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, নানাপ্রকার বিকট শব্দে মুখভঙ্গি পূর্ব্বক চিৎকার করিয়াও আবার প্রাণায়াম হয় নাকি? শ্বাস প্রশ্বাসের কোন প্রকার ক্রিয়া করিতেই তো উহাকে দেখিলাম না। প্রাণায়াম কত প্রকার আছে?'

ঠাকুর বলিলেন—**"মানুষের শরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে। ঐ সকল নাড়ীতে প্রাণ-বায়ুকে চালনা কর্‌বার যে সকল প্রক্রিয়া, তাহাকেই প্রাণায়াম বলে। এক এক নাড়ীতে এক এক প্রকার প্রক্রিয়ায় এই প্রাণবায়ু চলে। এইজন্য প্রাণায়ামও বাহাত্তর হাজার প্রকারের। নানারূপ অঙ্গভঙ্গীতে এবং নানাপ্রকার শব্দতেও প্রাণায়াম হয়। কি প্রকার চেষ্টাতে কোন্ নাড়ীতে কি ভাবে প্রাণায়ামের ক্রিয়া হয়, লোকে তার সন্ধান জানে না। আজ কাল ও সব প্রাণায়াম আর দেখা যায় না। ঐ সব প্রায় সমস্তই লোপ পেয়েছে। ফকিরদের মধ্যে এখনও এ সব প্রাণায়াম কতকটা আছে দেখা যায়।"**

এ'সকল কথা হইতে হইতে অনেক লোক আসিয়া পড়িল। ঠাকুরও তাঁহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমিও আহারের চেষ্টায় চলিয়া আসিলাম। প্রতিদিনই সন্ধ্যা-কীর্ত্তনে, মহা আনন্দ উৎসব চলিতেছে।

প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিতে সিদ্ধ মহাত্মাগণের লোকবিরুদ্ধ ব্যবহার।

আজ ঠাকুর বলিলেন—**'ধর্ম্মার্থীদের প্রতিষ্ঠায় ও প্রশংসাতে যত অনিষ্ট করে, এত আর কিছুতেই নয়। এইজন্য কত ভাল ভাল সাধু মহাত্মারা, কত প্রকার উপায় অবলম্বন ক'রে, লোকের চোখ্ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য আত্মগোপন করেন, বলা যায় না। একবার শ্রীবৃন্দাবনের একটি ভদ্রলোক, এক দিন সাধু বৈষ্ণবদের সেবা করালেন; আমিও দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেকি, টিকেট দেখিয়ে বৈষ্ণব বাবাজীরা কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ কর্‌ছেন। একটি কাঙ্গাল ভিতরে যেতে চাইলেন, কিন্তু টিকেট ছিল্ না ব'লে দ্বাররক্ষক তাঁকে গালি**

২৪শে চৈত্র, ১২৯৭।

দিয়ে সরিয়ে দিলেন। পুনরায় ঐ ব্যক্তি ভিতরে যাবার চেষ্টা করা মাত্র, দ্বার-রক্ষক তাঁকে খুব কয়েক ঘা মার্‌লেন। লোকটি প্রহারে কোন প্রকার ক্লেশ প্রকাশ না ক'রে, প্রফুল্ল মুখে ঐ স্থান হ'তে চলে গেলেন। দেখে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। আমি উহার জন্য কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্‌লাম। তিনি যমুনার তীরে তীরে অনেক দূর যেয়ে, বনের ভিতরে একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি গুহার ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন। আমি তাঁর নিকটে যেয়ে, তাঁকে নমস্কার ক'রে খাবার দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'লোকালয় হ'তে এত দূরে থেকে, আপনার ভিক্ষাদির কিরূপে সুবিধা হয়; শহরেও তো কোন স্থানে থাক্‌তে পারেন।' বাবাজী বল্‌লেন, লুকায়ে থাকাই নিরাপৎ। একবার মাত্র প্রত্যূষে উঠে যমুনায় স্নান করি, আর রাত্রিতে একবার 'মাধুকরী' (ভিক্ষা) ক'রে রুটির টুকরা নিয়ে আসি। তাই যমুনার জলে গুলে, সেবা করি; এতে আমার কোন উৎপাত নাই। বেশ আছি। বাবাজী পরম বৈষ্ণব। এই ভাবে বহুকালযাবৎ নির্জ্জন গুহায় থেকে, দিন কাটাচ্ছেন। শ্রীবৃন্দাবনে এরূপ গোপনে আরও কত আছেন, কে আর সে সকলের খোঁজ নেয়?"

ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"এবার হরিদ্বারে একটি সাধুকে দেখ্‌লাম। তিনি খুব ভাল সাধু ব'লে চারি দিকে প্রচার হওয়াতে, সর্ব্বদা তাঁর নিকটে লোকের ভিড় হ'তে লাগ্‌লো। লোকের গোলমাল হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য, তিনি সাধুর বেশ পরিত্যাগ কর্‌লেন। লোকে তাতেও তাঁর সঙ্গ ছাড়লো না। সাধু তখন 'পেণ্টালুন কোট' প'রে, ছড়ি হাতে নিয়ে বাবুর বেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। মানুষ তাতেও ভুল্‌লো না। সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় চল্‌লো। তখন সাধু অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন। লোকসঙ্গ ত্যাগের জন্য একটা দুর্নাম রটাতে, রাত্রিতে এক মুদির দোকানে যেয়ে, চাউল চুরি কর্‌লেন। পুলিশ তাঁকে ধ'রে চোর ব'লে চালান দিল। বিচারে তাঁর তিন টাকা জরিমানা হ'লো। তখন মুদি তাঁকে জান্‌তে পেরে, তিনটি টাকা জরিমানা দিয়ে খালাশ্ ক'রে নিয়ে এলেন। করজোড়ে তাঁর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাইলেন। অনেক সময়ে মহাত্মারা প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য, এমন সমস্ত কাজ করেন, যাতে চার দিকে ভয়ানক দুর্নাম রটনা হয়।"

"অযোধ্যার হরিদাস বাবাজী একজন সিদ্ধ মহাত্মা। তিনি লোকালয় ত্যাগ ক'রে, বহু দূরে জঙ্গলের ভিতরের একখানা জীর্ণ কুটীরে থাক্‌তেন, আর নিজের মনে, আনন্দে ভজন কর্‌তেন। সেখানে যেয়েও অনেকে তাঁর দর্শন কর্‌তেন। বাবাজী নানা প্রকারে তাঁদের বুঝায়ে বল্‌তেন যে, ও সব তিনি কিছুই জানেন না। বাবাজীর কথা গ্রাহ্য না ক'রেও সকলে তাঁর নিকটে উপস্থিত হ'তে লাগ্‌লেন। বাবাজী তখন অশ্লীল গালাগালি ক'রে, তাঁদের তাড়ায়ে দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। কেহ তাঁহার নিকটে না যায়, এইজন্য তিনি লোকদের ভয় দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে পাথর ছুঁড়েও মার্‌তেন।"

"শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে, কয়েক দিন কাশীতে ছিলাম। সে সময়ে পূর্ণানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে অত্যন্ত ইচ্ছা হ'লো। তিন দিন তাঁকে দর্শন কর্‌তে যাওয়ার উদ্‌যোগ কর্‌লাম। তিন দিনই লোকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন—মশায়, আপনি সেখানে যাবেন, সেই মাতাল বেটার কাছে। না তা হবে না। কাশীর সকলেই তাঁকে মাতাল ও ভয়ানক বদ্‌মায়েস ব'লে জানেন। কিন্তু ও সব কথা শুনেও আমার ভিতরে তেমন স্পর্শ কর্‌লে না। যাওয়ার জন্য প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি কারো কথা না শুনে, স্বামিজীর আশ্রমে গেলাম। স্বামিজীকে নমস্কার কর্‌তেই তিনি একটু হেসে বল্‌লেন—'কি মাতাল ব্যাটার কাছে এসেছিস্ ব'স্।' তখন তিনি একটি স্ত্রীলোককে, নানা প্রকার অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে, বল্‌তে লাগ্‌লেন—'আরে তোকে শিষ্যা ক'রে কি হবে, তোর যে বয়স বেশী হয়েছে। আমি সুন্দরী যুবতী পেলে শিষ্যা করি। তোকে দীক্ষা দিব না; তুই চ'লে যা। অন্যের নিকটে যেয়ে দীক্ষা নে।' স্ত্রীলোকটি খুব আগ্রহ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তখন স্বামিজী বল্‌লেন, আচ্ছা আমার কথামত চল্‌তে পার্‌বি? দিব্যি কর, তা হ'লে শিষ্যা করি। স্ত্রীলোকটি বল্‌লেন 'আপনার দয়া হ'লে পার্‌বো না কেন বাবা?' স্বামিজী তখন বল্‌লেন—'বেশ তা হ'লে একটু অপেক্ষা কর, আমি কারণ ক'রে নেই। পরে তোকে ঐ বড় রাস্তায় নিয়ে বেইজ্জৎ কর্‌বো। তার পর তোর দীক্ষা হবে।' স্বামিজী তখন চিৎকার ক'রে তাঁর ভৈরবীকে বল্‌লেন—'ওগো এক বোতল কারণ নিয়ে আয় দেখি। আর দ্যাখ্ হারামজাদি না পালায়, বাইরের দরজায় খিল দে।"

"স্ত্রীলোকটি তখন ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। স্বামিজীর মন্ত্রপূত ক'রে কারণ পান কর্‌লেন। পরে আমাকে বল্‌লেন—'ওরে দ্যাখ্ এ মাতাল ব্যাটার নিকট এসেছিস্ কেন? আমি যে মাতাল ব্যাটা, মদ খাই, কত বদমাইসি করি, তা তুই জানিস্? আমার বাড়ীও শান্তিপুরে ছিল, ছেলে বেলা যাত্রার দলে মেথ্‌রাণী সাজ্‌তাম, কি ভাবে নেচে নেচে তখন গান কর্‌তাম শুন্‌বি?' এই ব'লে তিনি নেচে নেচে গান কর্‌তে লাগলেন—'নিশিতে দেখেছি স্বপন, কাল এক পুরুষ রতন।' এই গানটি কর্‌তে কর্‌তে স্বামিজীর বাহ্যজ্ঞান লোপ হ'য়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মহাদেবের রূপ হ'য়ে গেলেন। স্বামিজী কাল, কিন্তু তিনি একেবারে শুভ্র হলেন। কপালে আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশিত হ'লো। যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলেই দেখে অবাক্। স্বামিজী সংজ্ঞা লাভ ক'রে বল্‌লেন—'দ্যাখ্ মদ খেয়ে, মদের বোতল বগলে নিয়ে, রাস্তায় প'ড়ে থাকি, কত মাতলামি করি, যাঁরা নিকটে আসেন কত অশ্লীল ভাবে গালাগালি করি, কখন কখন খাঁড়া নিয়ে তাঁদের কাটতে যাই, কিন্তু তবু এখানে মানুষ আসে, আমাকে বিরক্ত করে, সিদ্ধ পুরুষ ব'লে, কত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে আসে। আমি একটু স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারি না। এদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে, আমি আর কি কর্‌বো বল দেখিনি?"

"যোগজীবনকে দেখে তিনি বল্‌লেন—'ওর এত বয়স হয়েছে, এখনও পৈতা হয় নাই, আচ্ছা আমি ওকে পৈতা দিয়া দিব।' পরে স্বামিজীই যথামত যোগজীবনকে এক দিন পৈতা দিয়ে দিলেন। স্বামিজীর ওখানে আমরা সকলেই খুব আনন্দ পেলাম।"

অযাচিত দান অগ্রাহ্য করায় দুর্দ্দশা।

এবার শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভমেলার সময়ে, প্রায় ছয় সাত হাজার বৈষ্ণব সাধু, যমুনার চড়াতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর প্রতিদিন সকালে তাঁহাদের সকলকে পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া আসিতেন। এক দিন তিনি সাধু দর্শনে বাহির হইয়া, জমাতের মধ্যে একটি সাধু, অনাবৃত শরীরে শীতে কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে একখান কম্বল দিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—**'আপনার শীতবস্ত্র কিছুই নাই, দয়া ক'রে এই কম্বলখানা গ্রহণ করুন।** কম্বলখানা সাধারণ রকমের ছিল। সাধুর পছন্দ হইল না। তিনি একবার উহার দিকে চাহিয়াই, হাতে লইয়া বিরক্তির সহিত ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং খুব ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন "আরে, য়্যায়্‌সা কম্বলি মেই নেহি লেতা হ্যায়, ইস্কো বিক দেও।" ঠাকুর জোড়হাতে সাধুকে অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক বলিলেন; কিন্তু সাধু উহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। ঠাকুর উহা অগত্যা অপর একটি সাধুকে দিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে, ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চড়ায়, বিষম শীতে যখন সাধুরা সকলে কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন ঐ সাধুটি শীতে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া, শীত নিবারণের জন্য ধুনি জ্বালিবার অভিপ্রায়ে, কাষ্ঠ সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। কাষ্ঠ অন্য কোথাও না পাইয়া, লেকড়ির গোলাহইতে কয়েকটি কুন্দা চুরি করিলেন। লেকড়িওয়ালা তাঁহাকে চোর বলিয়া পুলিশের হাতে দিল। সাধুর জেল হইল। ঠাকুর এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"অভাবে পড়্‌লে অযাচিতরূপে যা আসে, তাহাই ভগবানের দান মনে ক'রে, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কর্‌তে হয়। ভগবানের দান অগ্রাহ্য কর্‌লে, বিষম অনর্থ ঘটে। ঐ সাধু যখন কম্বল ছুঁড়ে ফেল্‌লেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল, ইনি বিষম গোলে পড়্‌লেন। অভিমান ক'রে শ্রদ্ধার দান অগ্রাহ্য কর্‌লে অপরাধ হয়।"

অনাহারী সাধুরপ্রতি ঠাকুরের আকস্মিক টান।

এক দিন অপরাহ্নে, ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি যমুনার চড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর সাধুদের মধ্য দিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল সাধু বৈষ্ণবদের আগ্রহের সহিত দর্শন করিয়া নমস্কারাদি করেন, ঐ দিন আর সে সকল সাধুদের স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহাদের দিকে তাকাইবারও অবসর পাইলেন না। দক্ষিণে বামে সাধুদের রাখিয়া, জমাতের মধ্য দিয়া অপর প্রান্তে একটি অকিঞ্চন সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সাধু তখন সহাস্য মুখে, প্রফুল্ল মনে কয়েকটি লোকের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন। ঠাকুর একটু সময় তাঁহার নিকটে বসিয়া, অবসর মত সাধুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—**"মহারাজ, আজ আপ্‌কা সেবা হুয়া হ্যায়?"** সাধু বলিলেন 'নেহি।' ঠাকুর বলিলেন, **'কাল হুয়া হ্যায়?'** সাধু কহিলেন—'নেহি।' ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সাত দিন তিনি একেবারে অনাহারে আছেন। ক্রমান্বয়ে সাত দিন আহার না করিয়া, অক্লান্ত শরীরে প্রফুল্লমুখে আলাপাদি করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর অবাক্ হইয়া গেলেন। শুন্‌তে পাই, প্রাণ গেলেও তিনি কারো নিকটে কিছু যাচ্ঞা করেন না। এরূপ সাধু বড়ই বিরল। ঠাকুর কুঞ্জে আসিয়া অমনি তাঁকে খাবার পাঠাইয়া দিলেন।

জমাতের সাধুদের অর্থাগম ও বিপদের কথা।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে পরে, জিজ্ঞাসা করিলাম—'সহস্র সহস্র সাধু কুম্ভমেলায় একত্র হন, উঁহাদের আহারাদি প্রতিদিন কি প্রকারে চলে?'

ঠাকুর বলিলেন—**'সকল সম্প্রদায়ের সাধুদেরই মহান্ত আছেন। সাধুরা আপন আপন সম্প্রদায়ের মহান্তদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সব মহান্তদের এক একজনার জমাতে তিন চার হাজার সাধুও থাকেন। রাজা মহারাজা ও বড় বড় ধনীরা, ঐ সকল মহান্তদের, প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। উট, ঘোড়া ও হাতীর উপরে বোঝাই ক'রে, মহান্তরা তাঁদের ভাণ্ডারা নিয়ে চলেন। আহারাদির কোন ক্লেশই সাধুদের পেতে হয় না। যাঁরা কোন মহান্তের আশ্রয় না নিয়ে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন, তাঁহাদেরই ভিক্ষাদি ক'রে চালাতে হয়।'**

জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহান্তদের সঙ্গে বিস্তর মাল এবং অর্থাদি যখন থাকে, তখন জমাতের ভিতর চোর ডাকাতের উপদ্রব হয় না?'

ঠাকুর বলিলেন—**'তা খুব হয়।' এবার শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভের মেলাতে, একটি মহান্তের উপর ভয়ানক অত্যাচার হ'লো। তাঁর সঙ্গে তিন চার শত টাকা ছিল। হরিদ্বারে যেয়ে ঐ টাকার প্রয়োজন হবে ব'লে তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। সাধুর সঙ্গে দশ বার জন লোক ছিলেন। একটি সাধু, যিনি মহান্তের সেবা কর্‌তেন, তিনিই মাত্র ঐ টাকার কথা জান্‌তেন। এক দিন তিনি রুটির সঙ্গে বেশী পরিমাণে ভাং ধুতুরা মিলায়ে, মহান্তকে খাওয়ালেন; মহান্ত খেয়ে নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লেন। ঐ সাধু তখন টাকা নিয়ে পালালেন। মহান্ত দু' দিন পর্য্যন্ত নেশায় জ্ঞানশূন্য ছিলেন। পরে আর সাধুরা উহা জান্‌তে পেরে তাঁকে ঘৃত গরম ক'রে খাওয়ালেন; তাতেই মহান্তের নেশা ছুট্‌লো। পরে প্রকাশ পেল, মহান্তের সেবকই অর্থ লোভে ঐ কাণ্ড করেছেন।**

সোনা প্রস্তুতকারী সাধু।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'শুনিতে পাই, সাধুদের মধ্যে নাকি এমন লোকও আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সোনা প্রস্তুত কর্‌তে পারেন?'

ঠাকুর বলিলেন—**'হাঁ! এবার শ্রীবৃন্দাবনে একটি সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তিনি সোনা**

প্রস্তুত কর্‌তেন। তাঁর প্রতি তাঁর গুরুর হুকুম ছিল, প্রতিদিন অন্ততঃ বারটি সাধুর সেবা করাতে হবে। অর্থের অভাব হ'লে, বার জনার সেবার মত যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণের সোনা তিনি প্রস্তুত কর্‌তে পার্‌বেন। অন্য প্রয়োজনে অথবা নিজের জন্য সোনা প্রস্তুত কর্‌তে তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে এসে, তিনি আবশ্যক মত সোনা প্রস্তুত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ক্রমে তাহা প্রচার হওয়াতে, পুলিশের লোক টের পেল। এক দিন মথুরা হ'তে পুলিশ সাহেব এসে, ঐ সাধুটিকে ধর্‌লেন। সাধু সোনা প্রস্তুত ক'রে সাহেবকে দেখালেন। সাহেব ঐ সোনা পরখ্‌ ক'রে জান্‌লেন, অতি উৎকৃষ্ট সোনা। পরে সাহেব সোনা প্রস্তুতের প্রণালী শিখ্‌বার জন্য, সাধুকে বহু টাকার লোভ দেখালেন। দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। সাধু বল্‌লেন—'আমি দশ মিনিটের মধ্যে দশ হাজার টাকার সোনা, অনায়াসে প্রস্তুত কর্‌তে পারি। আমাকে অর্থের লোভ দেখাচ্ছেন কেন? আমার এই বিদ্যা আমি কারুকে শিখাব না।' পরে সাহেব তাঁহাকে অনেক ভয় দেখাতে লাগ্‌লেন। সাধু বল্‌লেন—'আমি ঝুঠা মাল দিয়ে প্রতারণা ক'রে অর্থ নেই কি না, আপনি শুধু তাহাই পরীক্ষা কর্‌তে পারেন। আমার বিদ্যা আমি অপরকে শিক্ষা দিব না। এ বিষয়ে কারো জেদে আমি বাধ্য হ'বো না।

'এক দিন ঐ সাধু দাউজীর মন্দিরে এসে, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে বল্‌লেন—আমার গুরুজী আমাকে হুকুম করেছিলেন—'আমার আদেশ রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে, এমন একটি সাধুকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিও।' কিন্তু আমি এরূপ সাধু পাইতেছি না। অথচ এক জনকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেই হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এ বিদ্যা আপনাকে শিক্ষা দিই।' এই বলে তিনি আমার সম্মুখেই একটু তামা নিয়ে, উহাতে একটি পাতার রস মিলায়ে, আগুনে ফেলে দিলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরে, উহা আগুন হ'তে তুল্‌লেন। দেখ্‌লাম, উৎকৃষ্ট সোনা হয়েছে। আমি সাধুকে বল্‌লাম—'এসব শিখে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। এই বিদ্যা আপনি জানেন ব'লে, দেখুন কত লোক আপনার পিছনে সর্ব্বদা লেগে আছে। এ সব উৎপাত নিয়ে প্রয়োজন কি? এক 'মুট' (মুষ্টি), অন্ন ভগবান্‌ যখন দিবেনই, তখন আর সকলে কি দরকার?' সোনা প্রস্তুত করার অনেক প্রকার প্রণালী আছে। কিন্তু এই সাধুটি যে প্রণালীতে কর্‌লেন, তাহা খুব সহজ। এরূপ সহজে সোনা প্রস্তুত কর্‌তে আর কোথাও দেখি নাই। এ সব শিখ্‌তে নাই। এ সব শিখ্‌লে, সর্ব্বদা লোককে নানা প্রকার উৎপাতে, আপদে বিপদে পড়্‌তে হয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত চুলায় যায়। ভগবানের কৃপা যাঁরা লাভ কর্‌তে চান, এ সকল তাঁদের পক্ষে বিষম প্রলোভন। এ সমস্ত প্রলোভন উপস্থিত হ'লে থু থু দিয়ে অগ্রাহ্য কর্‌তে হয়।

সুখময় বৃন্দাবন।

শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহাত্মাদের কথা, ঠাকুর অনেক সময় বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের

শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে, একটি বৈষ্ণব আশ্চর্য্যরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঠাকুর আজ তাঁহার কথা বলিলেন—'**এক দিন একটি মহোৎসব উপলক্ষে, বৃন্দাবন পরিক্রমা ক'রে, সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে লাগ্‌লেন। গানের পদ ছিল—'সুখময় বৃন্দাবন যমুনাপুলিন।' একটি বৈষ্ণব মহাত্মা, সঙ্কীর্ত্তনে মহাভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হ'লেন। তিন দিন তিন রাত্রি তিনি একই অবস্থায় রইলেন। বাবাজীর মগ্ন অবস্থার সময়ে, আমি তাঁর বুকের উপরে কয়েকবার কাণ পেতে শুন্‌লাম ভিতরে পরিষ্কার শব্দ উঠ্‌ছে 'সুখময় বৃন্দাবন।' বাবাজী ঐ অবস্থায়ই দেহ রাখ্‌লেন।**'

২৫শে চৈত্র, ১২৯৭।

অজ্ঞাত সাধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণে বিপদ।

এবার হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায়, পাহাড়পর্ব্বত হইতে অনেক মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ আসিবেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানহইতেই সাধু সন্ন্যাসীরা এই মহামেলায় আগমন করিবেন, এরূপ একটা কথা পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। বাঙ্গালার নানা স্থানহইতে অনেক ভদ্রলোক এবং স্কুলের ছেলেরাও হরিদ্বারে এই মেলায় উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তিন চার জন স্কুলের ছেলে, কোন সন্ন্যাসীর বাহিরের বেশ এবং সাধুতার আড়ম্বরে ভুলিয়া, তাঁহাকে মহাপুরুষ স্থির করিয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদের দীক্ষা দিয়াই, বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইয়া কৌপিন পরিতে দিলেন এবং সেবাকার্য্যে লাগাইলেন। ভদ্রসন্তান কয়টি নিয়ত বাসন মাজা, লেক্‌ড়ি কাটা, জল টানা ইত্যাদি পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী উঁহাদের পীড়িতাবস্থা দেখিয়াও, অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে অবসর দিলেন না, বরং আরও তাড়না করিতে লাগিলেন। উঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথামত না করিলে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিবেন, এরূপ ভয়ও দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছেলে কয়টি যেন পলাইয়া না যান, সে জন্য তাঁহাদের উপরে অন্য অন্য সন্ন্যাসী শিষ্যদের দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। উঁহাদের কাজ কর্ম্মে কোনপ্রকার শিথিলতা দেখিলে, তাঁহারাও উঁহাদের উপরে অত্যাচার করিতেন। পীড়িত শরীরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কার্য্য দিনরাত করিবার সামর্থ্য নাই, পলাইবারও উপায় নাই। সুতরাং ছেলে কয়টি বিষম বিপদে পড়িলেন। এক দিন ঠাকুর হঠাৎ ঐ সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ছেলে কয়টি ঠাকুরকে দেখিয়া, কান্দিয়া তাঁহাদের সমস্ত অবস্থা বলিলেন। ঠাকুর উঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী, ঠাকুরের অনুরোধ গ্রাহ্য কর্‌লেন না। নানাপ্রকার গালাগালি দিয়া, তেজ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—'এ লোক হামারা চেলা হুয়া হ্যায়, মন্ত্র লিয়া হ্যায়, হাম কভি এ লোক্‌কো ছোড়েঙ্গে নেহি।' ঠাকুর চলিয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, উঁহাদের উদ্ধার সাধন করাইলেন। আরও কয়েকটি স্কুলের ছেলে ঐ প্রকার ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, অজ্ঞাত কুলশীল সন্ন্যাসীদের নিকটে দীক্ষা লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বিপন্ন ছেলে

কয়টির কথা বলিয়া, তাঁহাদের সেই সঙ্কল্প নিরাপৎ নয়, জানাইলেন এবং অবিলম্বে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

অনধিকারীর গৈরিক ধারণে অপরাধ।

আর এক দিন কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক, গৈরিক বসন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস বা অন্য কোন আশ্রম গ্রহণ করেন নাই। এ পর্যন্ত তাঁহাদের দীক্ষাও হয় নাই। ঠাকুর তখন তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসা করিলেন—**'আপনারা গৈরিক বসন গ্রহণ করেছেন কেন? গৈরিক ধারণের একটা উপযোগিতা আছে। অনধিকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক গৈরিক গ্রহণ করেছেন জান্‌তে পার্‌লে, এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁরা সহ্য কর্‌বেন না। চিম্‌টে দিয়ে, ভয়ানকরূপে প্রহার ক'রে ঐ বসন ছিনিয়ে নিবেন।'**

ভদ্রলোকগুলি বল্‌লেন—'মশায়, সাদা কাপড় দু'চার দিনেই ময়লা হ'য়ে যায়। হাতে পয়সা নাই যে ধোয়ায়ে লই, তাই এই রং ক'রে নিয়েছি।'

ঠাকুর তাঁহাদের কথা শুনিয়া বার আনা পয়সা তাঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন—'কাপড় ধোয়াবার জন্য এই কয় আনা পয়সা নেন্। আজই যেয়ে গৈরিক ত্যাগ করুন।'

ভদ্রলোক কয়টি তাহাই করিলেন। অবিলম্বে গৈরিক ত্যাগ করিয়া সাদা বস্ত্র পরিলেন।

কুম্ভমেলার কথা

কুম্ভমেলায় অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মিলেনর কথা শুনিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'গঙ্গাস্নান করিবার জন্যই কি সাধু মহাত্মারা কুম্ভমেলায় আসেন?'

ঠাকুর বলিলেন—**'কুম্ভযোগে তীর্থস্থানে গঙ্গাস্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য, তাহা তো আছেই। কিন্তু, কুম্ভমেলার উদ্দেশ্য শুধু স্নান নয়। এই মেলা তিন বৎসর অন্তর এক একটি স্থানে হ'য়ে থাকে। হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে এবং উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভযোগ উপলক্ষ ক'রে নানা স্থানের, এমন কি পাহাড় পর্ব্বতবাসী মহাপুরুষেরাও নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র হন। কুম্ভযোগটি সাধু মহাত্মাদের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হওয়ার সঙ্কেত সময় মাত্র। সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই ইহা জানেন। সাধুদের সাধন ভজনে যে সকল সঙ্কট, সংশয় উপস্থিত হয়, এই সময়ে মহাত্মা মহাপুরুষদের নিকটে তাহা ব্যক্ত ক'রে মীমাংসা ক'রে নেন্।**

'সাধন ভজন বিষয়ে যাঁর যা প্রয়োজন, সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করাই এ **মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সময়ে মহাপুরুষেরা একত্র হ'য়ে, সাধু সন্ন্যাসীদের এবং দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মভাব কিরূপ তাহার খবর নেন্। যে প্রকার ব্যবস্থা কর্‌লে, যে দেশের**

লোকের কল্যাণ হয়, তাই স্থির ক'রে এক এক দেশের ভার এক একটি মহাত্মার উপর অর্পণ ক'রে প্রস্থান করেন। এবার চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার, মহাপুরুষেরা, রামদাস কাঠিয়া বাবার উপরে দিয়েছেন। তাঁহাকে মহাপুরুষেরা 'ব্রজবিদেহী মহান্ত' উপাধি দিলেন। এই প্রকার ভারতবর্ষের সকল দেশের জন্যই এইরূপ এক একজন মহাত্মা নির্দ্দিষ্ট আছেন। দেশে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, তাঁহাদিগকে সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হয়। সর্ব্বদা খাট্‌তে হয়।

আমি অমনি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মসংস্থাপনের ভার কাহার উপরে আছে? ঠাকুরকে এই প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সুতরাং আমাকেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

শান্তিসুধার মাতৃশোকে ঠাকুরের সান্ত্বনা।

শ্রীবৃন্দাবনে মাঠাকরুণের দেহত্যাগের বিষয় বিস্তারিত জানিবার একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না, সাহসও পাইতেছি না। মাঠাকরুণের দেহত্যাগের পরে, ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে, শান্তিসুধা প্রভৃতিকে উহা জ্ঞাত করাইতে স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিস্তারিত কিছুই লেখা নাই। ঐ পত্রখানা পাইয়া আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাভগিনীরা ঐ ঘটনাটি তখন শান্তিসুধাকে বলিতে সাহস পাইলেন না। পত্রখানা গোপনেই রাখিলেন। ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া শান্তিসুধাকে ঐ খবর দিবেন, সেই সময়ে তিনি সান্ত্বনাও দিতে পারিবেন, এইরূপ ভাবিয়া গুরুভ্রাতাভগিনীরা সকলে নীরবে রহিলেন। ঠাকুর এই প্রকার লিখিয়াছেন—

২৬শে চৈত্র, ১২৯৭।

"ওঁ হরি"

'কল্যাণবরেষু

গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, তাঁহার চির-প্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে। কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজি সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্যলাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে সে যেন শোক না করে। ইহা শোকের ব্যাপার নহে, অতি আনন্দের কথা। বহু ভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়।'

'আগামী ২১শে ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে উৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব। শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়াইয়া দেয়।'

'মা শান্তিসুধা! শোক করিও না, আনন্দ কর, যত শীঘ্র পারি আমরা যাইতেছি।'

আশীর্ব্বাদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে, শান্তিসুধা অষ্টম মাস গর্ভ সময়ে সুলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ছেলে লইয়া শান্তিসুধা পরামানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এবং অচিরে পিতামাতা আসিবেন ভাবিয়া, উল্লসিত মনে, তাঁহাদের আসিবার দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই সময়ে ঠাকুর হরিদ্বার হইতে কলিকাতা হইয়া, অবিলম্বে ঢাকা গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। যোগজীবন, কুতুবুড়ি, দিদিমা প্রভৃতি সকলেই, আশ্রমে ঠাকুরের সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। বাবা আসিয়াছেন শুনিয়াই, শান্তিসুধা ছেলে কোলে লইয়া দৌড়িয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'বাবা! মা কই?' ঠাকুর বলিলেন—**'শান্তিসুধা! আমি তোমার মাকে শ্রীবৃন্দাবনে রেখে এলাম। তিনি এলেন না, ওখানেই রইলেন। আমরাও কিছুকাল পরে আবার সেখানে যাব।'**

শুনিলাম, ঐ সকল কথা শুনিয়া শান্তিসুধা পরিষ্কার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঠাকুরও শান্তিসুধাকে সম্মুখে বসাইয়া মহাভারতের ও পুরাণাদির উপাখ্যান বলিতে বলিতে মাঠাক্‌রুণের দেহত্যাগের বিষয়ও বলিয়া ফেলিলেন। শান্তিসুধা শুনিয়াই মুর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ঠাকুর উঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া চেতনা করিলেন। শান্তিসুধার শরীর খুব অসুস্থ ছিল; সুতরাং মাতৃশোকে মস্তিষ্কের অবস্থা বিষম বিকৃত হইবে, সকলেই এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কিছুই হইল না। ঠাকুরের শীতল করস্পর্শে শান্তিসুধার ভিতর এতই ঠাণ্ডা হইয়া গেল যে, মাতার দেহত্যাগ জনিত দারুণ যন্ত্রণাদায়ক শোকও উঁহাকে তেমন কিছুই স্পর্শ করিতে পারিল না।

মাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের বিবরণ।

আজ মধ্যাহ্নে, আহারান্তের ঠাকুর আমতলায় বসিলেন। আমি তখন মাঠাক্‌রুণের দেহত্যাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—**'শ্রীবৃন্দাবনে গেলে আর উনি ফিরবেন না জেনেই, ওঁর যাওয়ার পূর্ব্বেই কতবার নিষেধ পত্র লিখেছিলাম; কিন্তু তা উনি শুন্‌লেন না। আমার শরীর অসুস্থ জেনে, তাড়াতাড়ি সেখানে গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পঁহুছিবার পরেও ওঁকে ঢাকা পাঠাতে কত কৌশল করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই উনি এখানে এলেন না। দেহত্যাগ যেদিন হবে, পূর্ব্বেই টের পেয়েছিলেন। দু' বার দাস্ত হ'তেই শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌লো। ঐ সময়ে পরমহংসজী আমাকে বল্‌লেন—'তুমি অবিলম্বে কুঞ্জ হ'তে অন্যত্র চ'লে যাও; তুমি এখানে থাক্‌লে ওঁকে নেওয়া যাবে না।**

দেহত্যাগ হ'য়ে গেলে কুঞ্জে এসো।' আমি পরমহংসজীর আদেশ মত অমনি আসন হ'তে উঠ্‌লাম। পাশের ঘরে উনি ছিলেন, একবার দেখে যাই মনে ক'রে, ঐ ঘরে গেলাম। উনি সবই বুঝেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ঐ সময়ে কাছে থাকি ; তাই হাতে ধ'রে টেনে, পাশে আমাকে বস্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লেন। কিন্তু পরমহংসজীর আদেশ মত আমি আর অপেক্ষা না ক'রে কুঞ্জ হ'তে চ'লে গেলাম। পরে উঁহার দেহত্যাগ হয়েছে জেনে, কুঞ্জে এসে উপস্থিত হলাম।'

শুনিলাম, ঠাকুর মাঠাক্‌রুণের দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কুঞ্জের গুরুভ্রাতাভগিনীরা মাঠাক্‌রুণের শবদেহ বারেন্দায় রাখিয়া চিৎকার করিয়া কাদিতে ছিলেন। ঠাকুর সেই স্থানে যাইয়াই যোগজীবনকে বলিলেন—**যোগজীবন! মৃতদেহ এতক্ষণ রেখেছিস্ কেন? যমুনার তীরে নিয়ে সংস্কার ক'রে আয়।'** এই বলিয়া ঠাকুর ঐ দিকে আর না তাকাইয়া আপন আসনটি বিছাইয়া বসিলেন। যেমন অন্যান্য দিন থাকেন, ঠাকুর তেমনই আসনে একভাবে বসিয়া রহিলেন। কোন প্রকার বৈলক্ষণ্যই দৃষ্ট হইল না। যোগজীবন, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, শ্রীধর, অশ্বিনী ও সতীশ প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা মায়ের পরম পবিত্র দেহ অবিলম্বে যমুনাতীরে লইয়া গিয়া, কেশীঘাটে অগ্নিসাৎ করিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় মত চিতা নির্ব্বাণের পরে, যোগজীবন মাঠাক্‌রুণের তিন খণ্ড অস্থি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে একখানা শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত করিলেন। অপর দুই খণ্ড হরিদ্বারে ও গেণ্ডারিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাখিলেন।

ভক্তবিচ্ছেদে মহাত্মাদের অসাধারণ জ্বালা।

মাঠাক্‌রুণের শোকে দিদিমা দিনরাত দগ্ধ হইতেছেন। সময়ে সময়ে ঠাকুরের কৃপায় দিদিমা মাঠাক্‌রুণের দর্শন পাইয়া থাকেন। তাহাতেই রক্ষা, তা না হইলে এতদিনে তিনি পাগল হইতেন। দিদিমা যখন 'যোগমায়া, যোগমায়া' বলিয়া চিৎকার করিয়া কান্দিতে থাকেন, সমস্ত আশ্রম তখন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়। শুনিয়া, আমাদেরও শরীর অবসন্ন হইয়া আসে। দিদিমার চিৎকার শুনিয়া, আমরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিলে, ঠাকুর নিষেধ করিয়া বলেন—'**শোকের সময়ে চিৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে দিতে হয়, তাতে শোক পাতলা হ'য়ে যায়। শোক পেয়ে কাঁদ্‌তে না পেরে অনেকে পাগল হয়। এমন কি, অনেকের উৎকট রোগ হ'য়ে মারাও পড়ে।**

মাঠাক্‌রুণের নাম লইয়া, দিদিমা যখন হৃদয় বিদারক শব্দে, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে থাকেন, সেই সময়ে, ঠাকুরের মুখশ্রী কোন প্রকার ভাবান্তর হয় কি না, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমি তাহা লক্ষ্য করিতে থাকি। একটি দিনও ঠাকুরের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'যাহারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, কারো জন্যই কি তাঁহারা শোক যন্ত্রণা পান না?'

ঠাকুর বলিলেন—'**হাঁ খুব পান। ভক্ত বিচ্ছেদে তাঁরা যে জ্বালা ভোগ করেন, তার আর কোথাও তুলনা হয় না। আত্মার সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ জন্মে, তাঁদের বিচ্ছেদে যে যন্ত্রণা, সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে, তাহা কল্পনা করে। সে জ্বালার আঁচও সাধারণের সহ্য কর্‌বার সামর্থ্য নাই। সে অতি বিষম।**'

আমি বলিলাম—'যাঁহারা ভক্ত বা মহাপুরুষ, তাঁদের শোকের কোন লক্ষণ কি বাইরে প্রকাশ পায় না?'

ঠাকুর বলিলেন—'**কখন হয়, কখন বা একেবারেই হয় না। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর, রূপ সনাতনাদি মহাপ্রভুর ভক্তগণের বাহিরে কোন প্রকার শোক চিহ্ন না দেখে, অনেকের মনে সন্দেহ হয়েছিল যে, এঁরা আবার কেমন ভক্ত? এক দিন একটি বৃক্ষতলে ভাগবৎ পাঠ হ'চ্ছে। সকলেই পাঠ শুন্‌ছেন। হঠাৎ ঐ বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্র, রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়্‌লো। পাতাটি গায়ে পড়ামাত্র, দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌লো। তখন উহা দেখে সকলে বুঝ্‌তে পারলেন, মহাপ্রভুর বিরহ অগ্নিতে তাঁর ভক্তগণ কি প্রকার দগ্ধ হচ্ছেন।**'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'কত কথাই তো এরূপ শুন্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থই কি ওরূপ হয়? শোকেতে মানুষের শরীরে যথার্থই কি উত্তাপ উঠে?'

ঠাকুর বলিলেন—'**খুব উঠে। শ্রীবৃন্দাবনে ওঁর (যোগমায়া ঠাকুরাণীর) দেহত্যাগের পরে, কুতু অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন। কুতুকে সান্ত্বনা কর্‌তে, উঁহার পিঠে যেমনই হাত দিয়েছি, অমনি কুতু 'উঃ উঃ' ক'রে চমকে লাফায়ে উঠ্‌লেন। আমি তখনই বুঝ্‌লাম। একটু পরেই দেখা গেল, কুতুর পিঠে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ, আগুনে পোড়া ফোস্কার মত উঠে পড়েছে।**'

ঠাকুরের সহিত এই সকল কথা বার্ত্তার সময়ে অন্যান্য লোক আসিয়া পড়িলেন, সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা হইল না।

গোঁসাইদর্শনে পাহাড়বাসী অজ্ঞাত মহাপুরুষ।

শ্রীবৃন্দাবনে মাঠাক্‌রুণের শ্রাদ্ধকার্য্য যোগজীবনের দ্বারা সমাপন করাইয়া, কিয়দ্দিন পরে, চৈত্রের প্রারম্ভে, ঠাকুর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং মাঠাক্‌রুণের অস্থি গঙ্গাগর্ভে সংস্থাপন করাই, ঠাকুরের তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং চার পাঁচ দিনের অধিক সময় আর তিনি সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

২৮শে চৈত্র, ১২৯৭।

হরিদ্বারে পৌঁছিয়াই ঠাকুর গুরুভ্রাতাভগিনীদিগকে লইয়া, ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানান্তে যোগজীবনের দ্বারায় মাঠাক্‌রুণের একখণ্ড অস্থি গঙ্গামধ্যে সমাহিত করাইলেন।

কন্‌খলে, নানকসাহী মহান্ত শ্রীযুক্ত রামপ্রকাশজীর আশ্রমে ঠাকুরের থাকিবার কথা ছিল।

কিন্তু সেখানে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে গঙ্গার উপরে একটি পাণ্ডার বাড়ীতে অবস্থান করিলেন।

একদিন ঠাকুর সাধুদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে, সঙ্গীদের লইয়া মেলার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তখন নেংটিমাত্র পরিধানে, একটি পাহাড়বাসী সন্ন্যাসী দূরহইতে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া বহুজনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে অত্যন্ত উল্লসিতভাবে নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের সম্মুখীন হইলেন, এবং বারংবার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আজ মেরা মিলারে মিলা', 'আজ মেরা মিলারে মিলা'। অশ্রুপূর্ণ নয়নে, উচ্চৈঃস্বরে, এইরূপ বলিতে বলিতে, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিতে নাচিতে কয়েকবার ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন। কি ভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই আর অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না।

আর একটি উলঙ্গপ্রায় জটিল উদাসী মহাপুরুষ, কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া, ঠাকুরকে দর্শনমাত্র স্খলিতপদে দুই চারি পা অগ্রসর হইয়াই, স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দরদর ধারে অশ্রু বর্ষণ হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ তিনি শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। কম্পিত কলেবরে করজোড়ে ঠাকুরের পানে অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। গদ্গদভাবে অস্ফুটস্বরে এক একবার বলিতে লাগিলেন—'সব মেরা পুরাণ হো গিয়া, আজ হাম ধন্য হো গিয়া। ধন্য হো গিয়া।' একটুপরে শ্রীধর ঐ মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—'আশিস্ করিয়ে মহারাজ, আশিস্ করিয়ে'। মহাপুরুষ শ্রীধরকে বলিলেন—'অহোভাগ তোম লোক্‌কা, অহোভাগ তোম লোক্‌কা। ভগবানকা সঙ্গ পায়য়া। দর্শন হি বহুৎ দুর্লভ হ্যায়। হামেসা পিছু পিছু রয়না। সঙ্ কভি নেহি ছোড়না। ধন্য হো গিয়া। ধন্য হো গিয়া।

এ সব মহাত্মাদের বিষয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর বলিলেন—'এ সকল মহাপুরুষেরা লোকালয়ে কখনও আসেন না। পাহাড়েই থাকেন। এঁদের দর্শন মাত্রই মনে হ'লো, যেন কতকালেরই ইঁহারা আমার পরিচিত। প্রাণের যোগ যাঁদের সঙ্গে, বহুকাল পরেও সাক্ষাৎ হ'লে তাঁদের চেনা যায়। কতই আত্মীয় ব'লে মনে হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

তৃতীয়খণ্ড

(১২৯৮ সালের ডায়েরী)

ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন হইতে গেণ্ডারিয়া আগমন ও আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা।

গুরুদেব (প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়) ১২৯৬ সনের পৌষ মাস হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে মাঠাক্‌রুণ (শ্রীমতী যোগমায়া দেবী) ১২৯৭ সনের ১০ই ফাল্গুন তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুর, তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী (শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুত্র শ্রীযোগজীবন গোস্বামী, কন্যা কুতুবুড়ী (শ্রীমতী প্রেমসখী) এবং আমাদিগের অন্যান্য কয়েকটি গুরুভ্রাতাভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অল্প কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করেন এবং যোগজীবনের দ্বারা মাঠাক্‌রুণের অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করিয়া, ঢাকা গেণ্ডারিয়া যাত্রা করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে জানাইয়াছিলেন, **"শীঘ্রই আমি গেণ্ডারিয়া যাইতেছি। সুবিধা বোধ করিলে, এখন হইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।"** কোন্ দিন কোন্ সময়ে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিবেন, আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত, বাড়ীতে থাকিয়াই, ঠাকুরের ঢাকা আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, অকস্মাৎ ১৩ই চৈত্র ঠাকুরের জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি অমনি এক মাসের মত আহারের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, ছোট দাদার (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) সঙ্গে ১৪ই চৈত্র গেণ্ডারিয়া আসিয়া পঁহুছিলাম। শুনিলাম, ঠাকুর গতকল্যই এখানে আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পরে ঠাকুর ঢাকা পঁহুছিতেছেন, সর্ব্বত্রই এ কথা ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং নানাস্থান হইতে শিষ্য ও শিষ্যাগণ ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্খায় গেণ্ডারিয়া-

আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবার পরদিন হইতেই দীক্ষাস্রোত চলিয়াছে। চৈত্র মাসের বাকি কয়দিনে কত লোক যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেন, বলিতে পারি না। বরিশাল, ফরিদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সমাগমে, এখন আর আশ্রমে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। আশ্রমসংলগ্ন আমাদিগের সতীর্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, শশীবাবু ও সতীশবাবু প্রভৃতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া এবং ঐ ঘরের দু'দিকের বারান্দায় চাটাই মাত্র বিছাইয়া বহু অবস্থাপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত গুরুভ্রাতৃগণ রাত্রি যাপন করিতেছেন। ঠাকুর পূবের ঘরে আসন করিয়াছেন। সেখানেও কয়েকজন গুরুভ্রাতা রাত্রিতে থাকেন। ছোট দাদা, কুঞ্জবিহারী গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি কোথাও স্থান না পাইয়া অগত্যা ভাণ্ডারঘরের এক কোণে কোনও মতে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই, খোল করতাল বাজিয়া উঠে। গুরুভ্রাতারা সকলে মিলিত হইয়া, ভোর-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিন চারি জন গুরুভাই ঝাঁটা লইয়া সমস্ত আশ্রম ঝাড়ু দিতে থাকেন। কেহ কেহ গোবর জল লইয়া আমতলা, ঠাকুরের আসন-কুটীর, আশ্রমের উঠান ও ঘরের চারি দিকের পিড়া ও বারান্দা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই লেপিয়া রাখেন। গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই আপন আপন রুচি-অনুযায়ী ঠাকুর-সেবার কোনও না কোনও কার্য্য লইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। মহাসমারোহের পূজা বা মহোৎসবাদি ব্যাপারে দিনটি যে ভাবে আনন্দ উৎসাহে চলিয়া যায়, আমাদেরও সকলের সেই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা, কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র (দাউজী) জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতেই, অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, এখন মাতৃবিয়োগ-সংবাদ পাইয়া, আরও কাতর হইয়াছেন। দিদিমা কন্যা-বিয়োগে অতিশয় শোকাতুরা হইলেও, গুরুভগিনীদের সহিত সকালবেলা এগারটা পর্য্যন্ত আশ্রমস্থ সকলের আহারের বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত থাকেন। যোগজীবনের স্ত্রী পঞ্চাশ ষাট জন লোকের রান্না প্রতিদিন অবাধে দু'বেলা প্রফুল্লমনে সুচারুরূপে করিতেছেন; দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেছি।

সকালে ৭টার সময়ে ঠাকুরের চা-সেবা হয়, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শিখগুরুদিগের উপদেশ এবং ভজন-সম্বলিত 'গ্রন্থসাহেব' প্রভৃতি পাঠ হইয়া থাকে। বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত প্রত্যহই ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকে। আহারের পরে মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আসন আমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুর কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা বলেন না— ধ্যানস্থ থাকেন। সুতরাং অধিকাংশ গুরুভ্রাতাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করেন। নিয়ত একটি লোক ঠাকুরের নিকটে থাকা আবশ্যক বলিয়া, আমিই পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকি। ১লা বৈশাখ (১২৯৮ সন) হইতে আহারান্তে ঠাকুর আমাকে প্রত্যহ তাঁহার নিকটে ঁকালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। পাঠের সময় গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আমতলায় উপস্থিত হইয়া থাকেন; কিন্তু পাঠান্তে সকলেই চলিয়া যান।

সুতরাং অপরাহ্ন পাঁচটা পর্য্যন্ত আমতলা প্রায় নির্জ্জনই থাকে। পাঁচটার পর ধীরে ধীরে লোকে পরিপূর্ণ হয়। আমিও ঐ সময়ে ঠাকুরের আদেশানুসারে আমার আহারীয় প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া আসি। পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠাকুর স্বচ্ছন্দভাবে সকলের সঙ্গে শাস্ত্র, সদাচার, ধর্ম্ম, সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপাদি করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে, সমস্ত গুরুভ্রাতা একত্রিত হইয়া বহু খোল করতাল সংযোগে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই সঙ্কীর্ত্তনের চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। খোল করতালের ধ্বনি, সঙ্কীর্ত্তনের রবে মিলিত হইয়া, আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলে। মহাভাবের তরঙ্গ প্রবল বেগে ঘন ঘন উঠিয়া আশ্রমস্থ সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কি ভাবে যে চলিয়া যায়, কিছুই আমাদিগের লক্ষ্য থাকে না। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর সন্দেশ, বাতাসা, পেঁড়া, বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন, স্বয়ং নিবেদন করিয়া, হরির লুট দিয়া থাকেন। তৎপরে সকলে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলে, ঠাকুর আহারান্তে দুই এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত শিষ্যগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত একভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন; অতঃপর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করেন। আশ্রমস্থ সকলের এই ভাবে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

বৈশাখ, ১২৯৮ সাল।
গঙ্গার প্রস্তর— গৌরীশঙ্কর।

আজ মহাভারতপাঠান্তে অপরাহ্নে আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে গুরুভগিনী শ্রীযুক্তা মনোহরা দিদি আসিয়া তাঁহার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা ঠাকুরকে বলিলেন; শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মাঠাকরুণের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে, মনোহরা দিদি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। গত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে ঠাকুর যখন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় যান, অন্যান্য গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে মনোহরা দিদিও তথায় গিয়াছিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে ও বালুচড়ায় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে সুগোল শুভ্রবর্ণ প্রস্তরকঙ্করে লাল, নীল, সবুজ ও কাল রঙ্গের চক্র, মালার মত, অতি পরিপাটীরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে দেখা যায়। স্নানের সময়ে মনোহরা দিদি একদিন নানা রঙের চক্র বিশিষ্ট একখানা গোলাকার শিলা তুলিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়া, ঐ প্রস্তরখণ্ড শয়নের ঘরে টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি ঐ প্রস্তরখণ্ড লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "হরিদ্বার হইতে আসিবার সময়ে সুন্দর একখানা সাদা সুগোল চক্রধারী পাথর আনিয়াছিলাম, এত দিন উহা টেবিলের উপরে কাগজ চাপা রাখিয়াছি; জানি না, কেন উহাতে সময়ে সময়ে মহাদেব ও ভগবতী দেখিতে পাই। গত রাত্রে আবার শুনিলাম, প্রস্তরখানি আমাকে বলিতেছেন, 'গঙ্গাতে বড় আনন্দে ছিলাম, এ অবস্থায় আমাকে এখানে আনিয়া রাখিলে কেন? আমার ক্লেশ হইতেছে।' এরূপ দেখি শুনি কেন, বুঝিতেছি না।" ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরকে গৌরীশঙ্কর বলে। মহাদেব ও পার্ব্বতী উহাতে অবস্থান করেন; পূজা না ক'রে এ শিলা রাখ্‌তে নাই।"

৫ই বৈশাখ, শুক্রবার।

দিদি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এই পাথর আমি আর রাখ্‌তে পার্‌ব না, তুমি এটি নিয়ে যা হয় কর।" আমি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া দিলাম। বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর আছেন, এই প্রস্তরখণ্ডও সেই সঙ্গেই পূজিত হইবেন।

গোবর্দ্ধনের শিলা— গিরিধারী গোপাল।

হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরে মহাদেব ও ভগবতীর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা শুনিয়া, শ্রীবৃন্দাবনধামের আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় মনে হইল। ঠাকুরের সঙ্গে যখন আমরা শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, তখন একদিন গুরুভ্রাতা স্বামিজী * গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী গোপাল রূপে ঐ পাহাড়ের প্রত্যেক খণ্ড শিলাতেই জাগ্রত রূপে অবস্থান করিতেছেন। তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার সময়ে বার খণ্ড ছোট ছোট সুন্দর শিলা তাঁহার ঝোলাতে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজবাসীরা গোবর্দ্ধনের শিলা অন্যত্র লইতে দেন না, এই জন্য স্বামিজী শিলা কয়টি গোপনে সংগ্রহ করিয়া ঝোলার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরের পার্শ্বের ঘরেই গুরুভ্রাতা শ্রীধরের শয়নঘর ছিল; স্বামিজীও শ্রীধরেরই এক পাশে আসন রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ঝোলা-ঝুলি সর্ব্বদা ঐ আসনের উপরেই পড়িয়া থাকিত। একদিন স্বামিজী খুব প্রত্যূষে কুঞ্জ হইতে পরিক্রমায় বাহির হইলেন। শ্রীধর মধ্যাহ্নে আহারান্তে আপন আসনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, স্বামিজীর আসনের উপরে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীধরকে বলিতে লাগিলেন, "গোবর্দ্ধনে আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম, আমাদের এখানে এনে কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ? স্নান করাও না, খাবার দেও না, এ ভাবে আর কতকাল আমাদের এখানে রাখ্‌বে?" এই কথা কয়টি বলিয়া বালকগণ অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীধর জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া চমকিয়া গেলেন। কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

---

* স্বামিজী— শ্রীহরিমোহন চৌধুরী— বাড়ী ধাম্‌রাই, জেলা ঢাকা। ইনি কিছুকাল ঢাকা গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে ইঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। অল্প বয়স হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া, তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর মুখে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, একদিন অতি নির্জ্জন স্থলে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ ঠাকুর উঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্বাসিত করিলেন। ঠাকুরের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরেই, স্বামিজী সরকারি চাকরিটি ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ঠাকুরের নিকটে সন্ন্যাস আশ্রমের কতিপয় নিয়ম গ্রহণ করিয়া উদাস ভাবে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের অদ্ভুত ঘটনা সকল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্ব তিন বৎসরের ডায়েরীতে বিবৃত রহিয়াছে।

ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন— "খাবার কিছু মিষ্টি আর পরিষ্কার এক ঘটী জল এক্ষণি এনে গিরিধারী গোপালদের নিবেদন ক'রে দাও। হরিমোহনের ঝোলার ভিতরে গোবর্দ্ধনের শিলা আছেন, অনুসন্ধান কর্‌লেই দেখ্‌তে পাবে।"

শ্রীধর তখনই স্বামিজীর ঝোলা খুলিয়া বারখণ্ড শিলা দেখিয়া অবাক্ হইলেন; অবিলম্বে খাবার আনিয়া গিরিধারী গোপালদিগকে নিবেদন করিয়া দিলেন। স্বামিজী সন্ধ্যার সময়ে কুঞ্জে আসিলে, ঠাকুর, ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া, তাহাকে বলিলেন— "রীতিমত সেবা করতে না পার্‌লে এ সব শিলা আন্‌তে নাই; কালই ভোরে গোবর্দ্ধনে গিয়ে রেখে এসো।"

স্বামিজীও পর দিন প্রত্যূষেই ঝোলা লইয়া গোবর্দ্ধনে চলিয়া গেলেন। শিলার মাহাত্ম্য ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। সমস্তগুলি শিলা কিছুতেই তিনি রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। দশখণ্ড গোবর্দ্ধনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দুই খণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং কিছুকাল উঁহাদের সেবা পূজা করিয়া, একখণ্ড সতীশকে দিলেন। সতীশ প্রতিদিন খুব শ্রদ্ধার সহিত উহা পূজা করিয়া আসিতেছেন। স্বামিজী অবশিষ্ট শিলাখণ্ড সোণার মাদুলীতে ভরিয়া, দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়াছেন এবং জল ও তুলসীর দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

* সতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপীড়ন।

৭ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল, রবিবার।

আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় বসিলে, আমিও তাঁহার নিকট আর আর দিনের মত দুই ঘণ্টাকাল মহাভারত পাঠ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীধর ও সতীশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন; একটু পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, উঁহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন— "সতীশ, শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে রাস্তায় নাকি তুমি মায়াচক্র দেখেছিলে? ঘটনাটি তোমার মুখে শুনি নাই, বল না শুনি।"

---

* সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— বাড়ী ঢাকা, বাঘিয়াগ্রামে। ইঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না থাকায়, পাঠ্যাবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছিলেন। নানা দুরবস্থা ভোগ করিয়াও নিজ অধ্যবসায়গুণে ইনি এন্ট্রেন্স্ ও এফ্, এ, পরীক্ষায় গবর্ণমেন্টের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কোন কারণে পরীক্ষা দিতে বিঘ্ন ঘটিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সুন্দর দখল ছিল। পঠদ্দশার প্রারম্ভেই সতীশের ধর্ম্মলাভের আকাঙ্খা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। উপাসনাশীল, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মদের সঙ্গলাভ করিয়া ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হয়েন, এবং উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে সতীশের সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, উপাসনার ভাব, ও অসাধারণ উৎসাহ উদ্যম দেখিয়া, আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইনি যাহা সত্য বুঝিতেছেন, লঘু গুরু না মানিয়া তাহাই বলিতেন ও করিতেন। এজন্য আমরা উঁহাকে পাগ্‌লা সতীশ বলিয়া ডাকিতাম। ১২৯৪ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন। ঠাকুরের সঙ্গে ইনি পুরী গিয়াছিলেন।

ঠাকুর কোনও কথা সতীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, সতীশ আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন। ঠাকুরের আদেশ পাইয়া, সতীশ আজ খুব উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন— "পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমার মন অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। আমি চারিদিকে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সকলই অসার ভাবিয়া তখনই (হেডমাষ্টারী) চাকরীটি ছাড়িয়া দিলাম ও পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। আপনি শ্রীবৃন্দাবনে আছেন জানিয়া, আপনার সঙ্গে থাকিব সঙ্কল্প করিয়া চলিলাম। আমি সমস্তিপুর হইতে রওয়ানা হইয়া পথে এলাহাবাদের নিকটে একস্থানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাঁদের সঙ্গে কিছু সময় আমার থাকিতে ইচ্ছা হইল। একটি খুব তেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, তাঁর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং আলাপাদি করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা জানিয়া নিলেন। ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও উদাসভাবে বাহির হইয়াছি জানিয়া সাধু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাধু আমাকে বলিলেন— "তোমরা মন হোয় তো কয় রোজ ইঁহাই রহো।" রাস্তার ক্লেশে শরীর আমার খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; সাধুও আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। ইহা ভগবানেরই কৃপা ভাবিয়া, দুই চার দিন সাধুর নিকটেই থাকিব স্থির করিলাম। কয়েকদিন পরে আমি একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তখন সাধু আমাকে বলিলেন, "আরে, কাঁহা যাওগে? হামারা সাথ্‌হি রহো, থোড়া রোজ্‌মে সিদ্ধ্ বন্ যাওগে।" আমি সাধুকে বলিলাম, 'মহারাজ, আপ্ সিদ্ধ্ হ্যাঁয়?' সাধু খুব তেজের সহিত আমাকে বলিলেন, 'তব্ ক্যা, তোম্ হাম্‌কো ক্যা সম্‌ঝা?" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপ্ হাম্‌কো কুছ্ সিদ্ধাই দেখ্‌লানে সেক্‌তে?" সাধু বলিলেন "হাঁ, দেখোগে?" এই বলিয়া সাধু আমার কপালে তাঁর কয়েকটি অঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া, হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনটি তুড়ি দিয়া বলিলেন, "আব্ মায়াচক্র দেখো।" ঐ সময়ে আমি কেমন যেন হইয়া গেলাম; আমার এক অদ্ভুত অবস্থা হইল। আমি অলৌকিক দৃশ্য সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম— চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে ঘুরিতেছে, শত শত গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে; তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অসংখ্য জীবজন্তু মায়াচক্রে পড়িয়া স্বর্গে যাইতেছে, আনন্দ করিতেছে, আবার ক্রমে ক্রমে তাহারাই ঘুরিতে ঘুরিতে শত শত ভীষণ নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িতেছে, চীৎকার করিতেছে, দগ্ধ হইতেছে। তিন দিন তিন রাত্রি এই মায়াচক্রে কত কি যে দেখিলাম, বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিয়া কখনও বা আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, কখনও

অচিরে ঠাকুর কলেবর পরিত্যাগ করিবেন জানিতে পারিয়া, সতীশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণে করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিলেন, যেন তৎপূর্ব্বেই উঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ঐ সময়ে ঠাকুরের নিকটেও নিজের প্রবল আকাঙ্খা অতি কাতরপ্রাণে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর একদিন সতীশকে বলিলেন, "জগন্নাথদেব তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।" ইহার কয়েক দিন পরেই, দুই দিনের জ্বরে, ৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিনে, রাত্রি প্রায় ১।। টার সময়ে, সতীশ অভিলষিত শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার জীবনের অতি অদ্ভুত ঘটনাসমূহ, আমার পূর্ব্বাপর ডায়েরীতে লিখিত আছে।

বা ভয়ে জড়সড় হইয়াছি। যতক্ষণ মায়াচক্র দেখিলাম, ততক্ষণ ইষ্টমন্ত্র একবারের জন্যও আমার স্মরণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ চতুর্থ দিনে যেমনই আমার ইষ্টনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ঘটনায় সাধুকে আমি একটি অসামান্য সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিলাম, এবং সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ হইলে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলাম। তিনিও আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন। ইচ্ছামাত্রেই সন্ন্যাসী আমাকে অনায়াসে সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই বিশ্বাসে আমি তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কয়েকদিন সেখানেই রহিলাম।

একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন— "চলো, ইঁহা আউর নেহি রহেঙ্গে।" বলিবামাত্র আমিও সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী নিজের আসন গুটাইয়া অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি বোঝা সাজাইয়া, আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিলেন। আমিও তাহা লইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কতকক্ষণ পরে আমরা একটি প্রকাণ্ড ময়দানের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ময়দানটি এত বড় যে, তার অপর পার ধূ ধূ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী বলিলেন যে, ময়দানটি পার হইয়া যাইতে হইবে। বেলা তখন প্রায় দশটা, ময়দানের উপর দিয়া চলিলাম। সঙ্গে আমাদের আর একটি লোকও নাই, ময়দানও জনমানব শূন্য, ধূ ধূ করিতেছে। সন্ন্যাসী খুব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বিষম ভারী বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভয়ঙ্কর রৌদ্রে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলাম। দুর্ব্বল শরীরে ঐরূপ পরিশ্রমে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীকে আমি একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলায়, তিনি বিরক্ত হইয়া খুব কর্কশ স্বরে বলিলেন— "আরে চল্।" আমি তখন ভাবিলাম, 'এ আবার কেমন সাধু? ক্লেশে আমার প্রাণ যায়, একটু দয়া হইতেছে না!' আবার ভাবিলাম— 'ইনি তো সিদ্ধ পুরুষ। বোধ হয় পরীক্ষা করিতেছেন।' ইহা ভাবিতেই মনে উৎসাহ আসিল, কিছুক্ষণ আবার খুব চলিলাম, পরে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন বোঝাটি কত ভারী তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "মহারাজ, যব্ হাম্ নেহি থে, তব্ কোন্ এত্না বোঝা লে যাতে রহে?" সাধু বলিলেন— "আরে হামারা ভূত সিদ্ধ্ হামারা সব্ চিজ্ ওহি লে যাতে।" সাধুর কথা শুনিয়া আমার মাথা গরম হইল, বিষম রাগও হইল, অমনি মাথার বোঝাটি দুড়ুম্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আরে শালা, ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে?" সাধুর অনেক জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধু দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং কুৎসিত গালি দিতে দিতে চিম্টা তুলিয়া আমাকে মারিতে দৌড়িয়া আসিলেন। আমার তখন আবার মনে হইল, 'ইনি তো মহাপুরুষ, ইঁহার প্রহারে আমার কল্যাণই হইবে।' সুতরাং না দৌড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সাধুও প্রকাণ্ড লোহার চিম্টাদ্বারা সজোরে আমাকে পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন। আমার তখন মনে হইতেছিল, ভিতরে আমার বিষম রিপুর উত্তেজনা, সাধু দয়া করিয়া সেই রিপুগুলিকেই তাড়াইয়া দিতেছেন; সুতরাং সাধু যেমন পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন, আমিও তেমন এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণিতে লাগিলাম। ক্রমে ছয়টি ঘা মারিয়া সাধু যখন সপ্তম ঘা আমাকে হাঁকিলেন, তখন আমি "দূর শালা! রিপু তো ছয়টা"

এই বলিয়া দৌড় মারিলাম। সাধু গালি শুনিয়া আরও রাগিয়া গেলেন; চিম্‌টা তুলিয়া বিষম যমদূতের মত আমার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। 'এবার আমাকে পাইলে সাধু খুনই করিবেন।' নিশ্চয় বুঝিয়া, আমি প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। সাধু আমাকে ধরে ধরে অবস্থা দেখিয়া, প্রাণ বাঁচাইবার অন্য উপায় না পাইয়া সম্মুখে একটা জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন কূপ দেখিয়া তাহাতেই লাফাইয়া পড়িলাম। সাধু আর কি করিবেন চলিয়া গেলেন। কূপে জল খুব অল্প ছিল, কিন্তু উঠিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া উহার মধ্যেই পড়িয়া রহিলাম। চিম্‌টার আঘাতে নানাস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তখন এত কষ্ট হইতেছিল যে মনে হ'ল বুঝি মারা পড়িলাম। 'এবার নিশ্চয়ই মৃত্যু' ভাবিয়া একান্ত মনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্ব্বে, কয়েকটি রাখাল ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা কাপড়ে কাপড়ে বাঁধিয়া নীচে নামিয়া অনেক চেষ্টায় আমাকে উপরে তুলিল। আমার চলিবার সামর্থ্য ছিল না বুঝিয়া, সকলে আমাকে কাঁধে তুলিয়া ময়দানের একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার খবর তাহারা কোথায় পাইল। একজন বলিল, "সাধুর তাড়াতে যখন তুমি দৌড়িয়া কুয়াতে লাফাইয়া পড়িলে, তখনই আমরা বহুদূর হ'তে দেখিতে পাইয়াছিলাম।" এই বলিয়া উহারা চলিয়া গেল। আমি গাছতলায় পড়িয়া রহিলাম। সাধুর প্রহারে শরীর আমার এত খারাপ হইয়াছিল যে বিষম জ্বর হইল। দুইদিন পর্য্যন্ত আমার পাশ ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় ও শরীরের যন্ত্রণায় এত অসহ্য ক্লেশ হইতে লাগিল যে, মনে হইল এবার বুঝি প্রাণ যায়। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, সম্মুখের গাছটিকেই জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম— "হে বৃক্ষ, আমার প্রাণ যায়, এ সময়ে একটি ফল দিয়া আমাকে বাঁচাও।" এই প্রার্থনা করিয়া বারংবার বৃক্ষটিকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া! হঠাৎ ঐ সময়ে টপ্‌ করিয়া একটি ফল আমার সম্মুখে পড়িল। ফলটি লাল, গোল, শ্রীফলের মত বড়, দেখিতে ঠিক মাকাল ফলের ন্যায়। আমি উহা পাইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। একটু স্থির হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া উহা খাইলাম। ঐরূপ ঠাণ্ডা সুমিষ্ট ফল জীবনে আর কখনও আমি খাই নাই। ফলটি খাওয়া মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইল; শরীরটি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ফলটি কোথা হইতে আসিল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, একটি ফল বা ফুলও বৃক্ষে নাই। গাছটি ঝাপ্‌রা, বট গাছের মত। ফলটি খাইয়া এত সুস্থ হইলাম যে, অনায়াসে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া একটি গ্রামে পঁহুছিলাম, কোন কষ্টই আমার বোধ হইল না। তারপর সেই সাধুকে আর আমি দেখিতে পাই নাই।

ঠাকুর বলিলেন — "তাকে আর দেখবে কি? সে ঐ দিনেই সমস্ত হারায়েছে। তার সিদ্ধি, শুদ্ধি সমস্ত ছুটে গেছে. এখন পাগলের মত সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন রাত যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করছে। এখন আর তার কিছুই নাই, সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

এ সব শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সিদ্ধ হ'য়েও, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় নাকি?" ঠাকুর বলিলেন— **"তা হয় না? সিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হ'ল নাকি? সিদ্ধ বল্‌তে তোমরা কি মনে কর? ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ, সিদ্ধ তো কতই আছে! ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকাব সংস্রব না রেখেও, লোকে কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছে! সিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হবে, ইহা কখনও মনে ক'রো না। আজকাল সিদ্ধ লোকের অভাব নাই।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— " ভূত-প্রেতসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক লোক নাই কি?"

ঠাকুর— "এ সব সিদ্ধদের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "যাঁহারা ভূত-প্রেতসিদ্ধ, তাঁহারা কি দেবদেবীর রূপও দর্শন করাইতে পারেন?"

ঠাকুর— **"সকলেই যে পারেন, তা নয়, তবে কেহ কেহ পারেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে একটি সাধু এসেছিলেন, তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাতে পার্‌তেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন।"**

প্রশ্ন— "সে কি রকম?"

প্রেতের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

ঠাকুর—**"একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আমাকে বল্লেন, 'কাল সকালে একা আপনি আস্‌বেন, আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাব।' আমি পরদিন প্রত্যূষে সাধুর কাছে গেলাম; তিনি আমাকে বস্‌তে দিয়ে সম্মুখের ঘরে দৃষ্টি রাখ্‌তে বল্লেন। আমি সেই ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'সে রইলাম। সাধু আমার কাছে ব'সে জপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সুন্দর পরিস্কার চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন হ'লেও একটা ভাবভক্তির উদয় হ'ল না দেখে, সন্দেহ হ'ল। আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লাম, শ্রীবৎসচিহ্ন বা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ওতে কিছুই নাই। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে নাম কর্‌তে লাগ্‌লাম। তখন ঐ মূর্ত্তি থরথর কাঁপতে লাগ্‌ল। এবং বাবাজীকে বল্লে, 'তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস্, আমি যে টিক্‌তে পারি না;' এই ব'লে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাটিতে প'ড়ে গিয়ে চিঁ চিঁ করে চীৎকার কর্‌তে লাগল। সাধু তখন অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে বল্লেন,— 'ছোড়্ দিজিয়ে মহারাজ। ছোড় দিজিয়ে।' আমি বল্লাম— "আমি তো ধ'রে রাখি নাই।" সাধু বল্লেন, "আপ্ যো নাম কর্‌তে হ্যাঁয়, ওহিসে বান্ধা গিয়া।' ঐ সময় দেখলাম বিষ্ণুমূর্ত্তি আর নাই, বিকটাকার এক প্রেত মাটিতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। আমি তখন ঐ সাধুকে খুব ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম— 'তোমারা কাণমে বিষ্ঠা কাহে রাখা হ্যায়? তোম প্রেতসিদ্ধ হো?' সাধু বলিলেন— 'হাঁ, মহারাজ। আপ্ ভগবদ্ভক্ত হ্যায়, হামারা মালুম নেহি থে। হামারা প্রেত ভগবদ্ভক্তকি সাম্‌নেমে ঠাহারণে নেহি সেক্‌তে।' আমি তাকে বল্লাম— "বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাও ব'লে লোকেব নিকট হ'তে প্রতারণা করে তুমি টাকা পয়সা আদায় কর কেন?" সাধু বল্লেন— 'আপনি অনুসন্ধান কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বেন যে সকলকে আমি এ মূর্ত্তি দেখাই না। যেসকল লোকের অর্থ মদ,**

বেশ্যা ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই মূর্ত্তি দেখায়ে কেবল তাদের নিকট হ'তে প্রচুর অর্থ আদায় ক'রে থাকি; কিন্তু ঐ অর্থ হ'তে একটি পয়সাও আমি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি না। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করি। যেসকল স্থানে জলাভাব, ঐ অর্থ দ্বারা সেখানে পুকুর বা ইন্দারা কাটিয়ে দিই, দুর্গমস্থলে রাস্তা প্রস্তুত করাই ও দুঃখী দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করি। আপনি আর একে কষ্ট দিবেন না, ছেড়ে দিন্।' আমি তখন চ'লে এলাম। আসবার সময় সাধু খুব কাতর হ'য়ে আমাকে বল্লেন, 'যতদিন আপনি শ্রীবৃন্দাবনে থাক্‌বেন কাহাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির কথা বল্‌বেন না।' সাধুর কথামত, যত কাল শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম কাকেও এ বিষয় বলি নাই, আজই তোমাদের নিকট বল্লাম। এই সাধু ভাল লোক ছিলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম— ভূত প্রেতও যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি বা দেবদেবীর রূপ ধারণ ক'রে দর্শন দিতে পারে, তখন প্রকৃত রূপ এবং কপট রূপ বুঝ্‌তে পার্‌ব কি উপায়ে?

ঠাকুর বলিলেন— **"ঐ রূপের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সহিত নাম কর্‌তে থাক্‌লেই কপট রূপ কখনও টিক্‌বে না, অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। যথার্থ কোনও দেবদেবী দর্শনমাত্রেই ঐ দেবদেবীর ভাব প্রাণে উদয় হবে। নাম কর্‌তে কর্‌তে ঐ রূপটি আরও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হবে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— উজ্জ্বল পরিষ্কার রূপ তো প্রথম প্রথম প্রেতেরও দর্শন হয়েছিল, বলিলেন। যথার্থ রূপ ও কপট রূপের আকৃতিতে কি কোন রূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না?

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, তাও থাকে। ভূতপ্রেতাদি দেবদেবীর আকার ধারণ কর্‌তে পার্‌লেও ঐ সকল দেবদেবীর চিহ্ন ধারণ কর্‌তে পারে না। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ সকল যেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, সেইরূপ সকল দেবদেবীরই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। যখনই যে দেবদেবীর দর্শন হবে লক্ষণগুলি তখনই মিলায়ে নিতে হয়। ঐ সময় খুব নাম কর্‌তে হয়; নাম কর্‌লে সমস্তই ধরা পড়ে। সতীশ নাম না ক'রেই তো গোলে প'ড়েছিল। নাম কর্‌তেই মায়াচক্র অদৃশ্য হ'লো, শুন্‌লে তো?"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— শঙ্খ চক্র বা এরূপ কোন বিশেষ চিহ্ন তো সদ্‌গুরুর নাই; সুতরাং ভূত প্রেত সদ্‌গুরুর রূপ ধ'রে এলে, কি প্রকারে তাহা বুঝতে পার্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন— **"ভূত প্রেত কি, দেবদেবী ঋষি মুনিরাও সদ্‌গুরুর রূপ ধারণ কর্‌তে পারেন না। সদ্‌গুরুর রূপ দর্শন হ'লে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ক'রো না।"**

গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত সতীশের ঝগড়া।

সতীশ মায়াচক্রীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অচিরে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে পাগ্‌লা সতীশের সঙ্গে ঠাকুরের যেরূপ কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, আজ ঠাকুর তাহা তুলিয়া শ্রীধরের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। পরিধানে ছেঁড়া গৈরিক বসন— হাতে লম্বা বাঁশের দণ্ড, চেহারা অতিশয় জীর্ণ

১০ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল, বুধবার।

শীর্ণ, সতীশ ঠাকুরের নিকট দাউজীর মন্দিরে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে একটু সুস্থ হইলে ঠাকুর সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন— **"সতীশ! তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন? বীর্য্যধারণ না হ'লে গৈরিক নিতে নাই; শাস্ত্রে নিষেধ আছে; তুমি গৈরিক ছাড়।"**

সতীশ বলিল—"আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, গৈরিক ও দণ্ড আমার সন্ন্যাসের চিহ্ন, ইহা ছাড়ব কেন?" শ্রীধর তখন বলিলেন, "সতীশ! গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করিস্ না, ভয়ানক অপরাধ।"

সতীশ মাথা ঝাড়া দিয়া হাত নাড়িয়া খুব তেজের সহিত বলিল, "যাঃ যাঃ যাঃ বেটা। গুরু! গুরু কে? গুরু তো পরমহংসজী। দীক্ষার সময় উনি তো বলেছিলেন— **পরমহংসজী দীক্ষা দিচ্ছেন? উনিও পরমহংসের শিষ্য, আমিও পরমহংসের শিষ্য। উনি তো আমার গুরুভাই। সাধুসঙ্গ কর্‌তে এসেছি।"**

ঠাকুর বলিলেন— **"তুমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাক্‌তে পাবে না, অন্যত্র গিয়ে থাক।"**

সতীশ বলিল— "আজ তো আমি আপনার অতিথি।"

ঠাকুর বলিলেন—**"অতিথিরূপে এসেছ? তা হ'লে তোমাকে আর কিছুই বল্‌বার নাই— আজ তবে এখানেই থাক।"**— এই বলিয়া ঠাকুর সতীশের আদর যত্ন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিলেন। দিন রাত সতীশ আমাদের উপর হুকুম চালাইয়া ও খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটাইল। পরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন—**"সতীশ! এক তিথির অধিক সময় অতিথির তো থাক্‌বার নিয়ম নাই, এখন তুমি অন্যত্র যাও।"** পাগ্‌লা সতীশ খুব চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"তা কেন? শাস্ত্রে আছে, এক রাত্রি কারো সঙ্গে বাস কর্‌লেই, সে বান্ধব হয়। সুতরাং আপনি এখন তো আমার বান্ধব হইয়াছেন, বান্ধবশূন্য হইয়া কারো কোথাও থাকা উচিত নয়। এখন আর অন্যত্র যাইব না।" এই বলিয়া সতীশ শরীর ঝাড়া দিয়া আপন আসনে আরো আঁটিয়া বসিল। সতীশকে গৈরিক ত্যাগ করিতে ঠাকুর বিস্তর বলিলেন। কিন্তু সতীশ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিল না। শ্রীবৃন্দাবনে পাগ্‌লা সতীশকে লইয়া এবং শ্রীধরের পাগ্‌লামী লইয়া ঠাকুর অনেক সময় আনন্দ করিতেন। ঠাকুর যাহাদের সঙ্গে, এবং দশজনার নিকটে যাহাদের কথা প্রসঙ্গে এরূপ আমোদ করেন, সেই সতীশ ও শ্রীধরই ধন্য!

ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের * আকর্ষণ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর মাথা গরম হইলে সময়ে সময়ে বিষম পাগলামী করিতেন। এক দিন সামান্য বিষয় লইয়া গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনীবাবুর সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধিল। শ্রীধর মাথা গরমে কোনও কোনও বার পনের দিন পর্য্যন্ত কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য থাকিতেন। কামিনীবাবু

* শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ— ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার সন্নিকটে সদবদি গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কিছুকাল ইনি পুলিশের চাকরী করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ন্যায়পরতা ও কার্য্যদক্ষতা গুণে ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই জীবনে ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য শ্রীধরের অসাধারণ উৎকণ্ঠা ছিল। ক্রমে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মদের সঙ্গ লাভ করিয়া ইঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ জন্মে। অচিরে তিনি

শ্রীধরকে ঐ সময়ে ভয় দেখাইয়া বলিলেন— "সাবধান হও, ঝগড়া কর্‌লে মার খাবে।" শ্রীধর ঐ কথা শুনিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বড় রাস্তায় যাইয়া এক পুলিশের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত চীৎকার করিয়া পুলিশকে বলিলেন— "বাঙ্গালা মুল্লুক হ'তে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত আসিয়া আমাদের কুঞ্জে রহিয়াছে, সে আমাকে খুন কর্ত্তে চায়— শীঘ্র তাকে ধর, না হ'লে এখনই আমাদের মেরে কেটে একাকার কর্‌বে।" পুলিশ শ্রীধরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুঞ্জে আসিল। কামিনীবাবুকে দেখাইয়া তখন শ্রীধর বলিল— "ইস্কো পাক্‌ড়ো।" এই সময় আর আর যাঁহারা ছিলেন, শ্রীধরকে পাগল বুঝাইয়া পুলিশকে বিদায় করিলেন। ঠাকুর এই ব্যাপার শুনিয়া শ্রীধরকে খুব ধম্‌কাইয়া বলিলেন— **"শ্রীধর! এখনই যেয়ে কামিনীবাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও, না হ'লে এস্থান হ'তে এ মুহূর্ত্তেই চলে যাও।"**

শ্রীধর বলিল—"মার্‌তে যে চায় তার দোষ হলো না! সে ডাকাত নয়! ডাকাতকে পুলিশের হাতে দেওয়াই অপরাধ হ'ল! এজন্য আবার ক্ষমা! আমি ডাকাতের নিকট কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।"

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিত রূপে আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যেই ভগবৎকৃপায় শ্রীধরের কয়েকটি অলৌকিক উপলব্ধিও প্রত্যক্ষদর্শন লাভ হইল। শ্রীধর তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মহতের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন অবস্থাই স্থায়ী হইবে না বুঝিয়া, শ্রীধর সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— "আমি সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ আকাঙ্খায় এখানে এসেছি—আপনি দয়া ক'রে আমাকে দীক্ষা দিন্।" পরমহংসজী বলিলেন—"সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই বিজয়ের কাছে যা। * * * *।" শ্রীধর, আর ওখানে অপেক্ষা না করিয়া এবং করসঙ্কেতে ইঙ্গিত পাইয়া, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে প্রচারকনিবাসে ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দীক্ষা লাভ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গছাড়া প্রায় কখনও হয় নাই। শ্রীধরের ন্যায় সোজা চাল চলন ও স্বাভাবিক সরলতার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। উঁহার প্রগাঢ় ভজনানুরাগ এবং অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীধরের আনন্দ

উৎসাহ একেবারেই নিবিয়া গেল। যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, দীর্ঘনিশ্বাসই উঁহার নিত্য-সহচর ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম— "শ্রীধর, দিন কি ভাবে কাটাও?" শ্রীধর বলিলেন, "ভাই! সকাল বেলা থেকে ভাব্‌তে থাকি কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে, আবার সন্ধ্যা হ'লে ভাবি কতক্ষণে সকাল হবে— এই ভাবেই দিন যাইতেছে।"

১৩০৯ সালে, শ্রীধর কিছুকাল কলিকাতা বাদুড় বাগানে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে অকস্মাৎ জ্বরে পড়িয়া রাত্রি দশটার পর শ্রীধর কয়েকটি গুরু ভ্রাতাকে ডাকিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন— "ওহে, তোমরা আমার নিকটে এসো, আজ আমি দেহত্যাগ কর্ব্বো।" জ্বরের জ্বালায় মাথা গরম হইয়া শ্রীধর ঐ সব বলিতেছেন ভাবিয়া, গুরুভ্রাতারা কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ভোর বেলা সকলে শ্রীধরের অসুখের খবর লইতে গিয়া দেখিলেন, শ্রীধর বিছানা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া উল্টাভাবে, মাথার দিকে পা এবং পায়ের দিকে মাথা রাখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন। পুনঃপুনঃ ডাকিয়া, কোন সাড়া না পাওয়াতে সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিল এবং স্পর্শ ও ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল, শ্রীধর চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরল ভাবে ভূমিসংলগ্ন ললাট এবং সম্মুখের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় সুপ্রসারিত দেখিয়া ঐ সময় সকলেরই এরূপ ধারণা হইল যে তিনি কাহারও দর্শন পাইয়া তাঁহাকে যথারীতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার পবিত্র দেহ সুসজ্জিত করিয়া নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়া অগ্নিসংস্কার করিলেন। শ্রীধর অপুত্রক ছিলেন, নানা স্থানের গণ্যমান্য গুরুভ্রাতারা সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে ১১ই মাঘ রবিবার শ্রীধরের পারলৌকিক ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। শ্রীধরের অদ্ভুত ঘটনাবলি আমার পূর্ব্বাপর ডায়েরীতে লিখিত রহিয়াছে।

ঠাকুর শ্রীধরকে শাসন করিয়া বলিলেন, **"এখনি তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, এক্ষণি যাও।"**

শ্রীধরও 'এমন সঙ্গে আর কখনও থাক্‌ব না—এখনি যাইতেছি' বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া শ্রীধর কান্দিতে কান্দিতে কাতর হইয়া ফিরিলেন ও ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন।

ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রীধর, গিয়েছিলে তো আবার এলে কেন?"**

শ্রীধর হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—"কি কর্ব্বো? ছেড়ে যে থাক্‌তে পারি না।" ঠাকুর শ্রীধরের কথা শুনিয়া ছল ছল চক্ষে শ্রীধরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন— **"তবে যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও।"** শ্রীধর যাইয়া অমনি কামিনীবাবুর পায়ে পড়িলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। ধন্য শ্রীধর! অদ্ভুত তোমার গুরুপ্রেম! অদ্ভুত তোমার গুরুর প্রতি আকর্ষণ!

ঠাকুরের উপর সতীশ ও শ্রীধর উভয়েরই অসাধারণ ভালবাসা, প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল; তাই ইহারা সময়ে সময়ে ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিত এবং মনোমত না হইলে ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ বা বিপরীত কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করিত না। শ্রীধর ও সতীশের এইরূপ বাহ্য অবাধ্যতা, যে ঠাকুরের প্রতি উঁহাদের অসামান্য অনুরাগেরই নিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কৃপা।

সম্প্রতি গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পরশুরাম আসিয়াছেন। ঠাকুর অনেক সময়ে পরশুরামের কথা বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে এই পরশুরামের কথা যেমন শুনিলাম, লিখিয়া রাখিতেছি।

বৈশাখ, ১০ই—১৫ই. এপ্রিল, ২৩শে—২৭শে। পরশুরাম ধামরাই গ্রামের একজন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁতী ছিলেন; তেজারতী কারবারাদিতে গ্রামে দশজনের উপরে বেশ আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন। আটটি পুত্রসন্তান— সকলেই উপযুক্ত, বিষয়কার্য্যে দক্ষ এবং উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। ছয়টি কন্যাও ভাল ঘরে সৎপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন। সুখে স্বচ্ছন্দে পরশুরাম দিন কাটাইতেছিলেন। অকস্মাৎ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখিতে দেখিতে আটটি পুত্রই একে একে দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে পাঁচটি কন্যারও মৃত্যু হইল। একটিমাত্র যুবতী কন্যা বাঁচিয়া রহিলেন; তিনিও দুরদৃষ্টক্রমে বিধবা হইলেন। পরশুরাম কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ হইলেন। অতিবৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া, শোকসন্তপ্তা স্ত্রীও ইহলোক হইতে বিদায় নিলেন। বিধবা একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত, পরশুরামের সংসারে আর কেহই রহিল না। পিতার দুরবস্থা দেখিয়া বিধবা কন্যাটি পরশুরামের নিকটে আসিলেন এবং প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রামের দশটি লোক, যাঁহারা পরশুরামের নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন, সকলেই অনুমান করিলেন পরশুরাম অবিলম্বে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া কন্যাকে দিয়া যাইবেন। পাপিষ্ঠ দেনাদারেরা একজোট হইয়া অসহায়া কন্যাটির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং

বিষম কৌশল সৃষ্টি করিয়া অকালে বৃদ্ধ অন্ধের একমাত্র অবলম্বন বাল-বিধবাটির প্রাণ নষ্ট করিল। কন্যার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পাষণ্ডগণ, একদিন রাত্রিতে পরশুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া, কাগজপত্র যাহা কিছু ছিল লুট্‌পাট্ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ অন্ধ শূন্য ঘরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গ্রামের একটি সামান্য অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, পরশুরামের দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া, তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু গ্রামের ঐ দুর্বৃত্তদের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিল— 'নির্ব্বংশে লোককে বাড়ীতে নিয়ে স্থান দিয়েছ, শীঘ্রই তুমিও নির্ব্বংশ হবে; তোমার সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব রাখিলে আমাদেরও বংশ থাকিবে না। এখনই তোমার বাড়ী থেকে ওকে তাড়ায়ে দেও, না হ'লে সবাই মিলে তোমাকে একঘরে করব।' ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পরশুরামকে সকল অবস্থা জানাইলেন; পরশুরাম শুনিয়া বলিলেন— 'আমাকে স্থান দিলে আপনি বিপন্ন হইবেন; শীঘ্র আমাকে মাধবের মন্দিরে রাখিয়া আসুন।' পরশুরামের জেদ দেখিয়া, ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীশ্রীমাধবের বাড়ীতেই রাখিয়া আসিলেন। মাধবজীকে যিনি যাহা ভোগ দিতেন, দয়া করিয়া পরশুরামকে প্রসাদের কিছু অংশ প্রদান করিতেন। পরশুরাম তাহাই মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরশুরামের সকল দিকই শূন্য হইয়াছে; এখন আর কি লইয়া থাকিবেন? দিবারাত্র কেবল 'মাধব মাধব' নামই জপ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধ পরশুরামের প্রতি দয়াল মাধবের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। এক দিন মাধব পরশুরামকে বলিলেন— "পরশুরাম, আমাকে তুমি দেখ্‌বে?" পরশুরাম বলিলেন— "ঠাকুর, আমি যে অন্ধ।" মাধব বলিলেন— "আচ্ছা, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও না?" পরশুরাম মাথা তুলিয়া মাধবের দিকে চাহিতেই দয়াল মাধবের অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন হইতেই আশ্চর্য্যভাবে উঁহার বাহ্য দৃষ্টিশক্তিও খুলিয়া গেল। পরশুরাম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া দিনরাত দয়াল মাধবের নামে বিভোর! এখন প্রায় সর্ব্বদাই মাধবের দর্শন পান। সকালে বিকালে প্রত্যহ প্রতিঘরে যাইয়া মাধবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গ্রামের সকলেই এখন উঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করেন। এখন আর পরশুরামের কেহই শত্রু নাই, পূর্ব্ব শত্রুগণও এখন পরশুরামের কৃপা-ভিখারী এবং একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। এই পরশুরাম এখন আমাদের গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের ঠাকুরকে 'মাধব' বলিয়াই ডাকেন; যখন তখন 'মাধব', 'আমার দয়াল মাধব' বলিয়া স্তব স্তুতি করেন। পরশুরামের অবস্থা দেখিয়া আশ্রমস্থ সকলেই অবাক্ হইয়া যাইতেছেন।

এক সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "পরশুরাম, এখানে এলে কেন?" পরশুরাম বলিলেন— "আজ্ঞা, জান্‌তে পার্‌লাম, মাধব গেণ্ডারিয়ায় আছেন।"

প্রশ্ন।— "তুমি বুড়ো মানুষ, রাস্তা চিনে এলে কিরূপে?'

পরশুরাম বলিলেন—"আমি তো আশ্রম চিনি না; ঢাকাতে আস্‌লাম। একটি কালো মেয়ে, ১৪/১৫ বৎসর বয়স, আমাকে বলিল— 'তুমি গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে যাও তো আমার সঙ্গে এস।'

আশ্রমের কাছে এসে আমাকে বলিল, 'এই আশ্রম, যাও।' তার পর আর সেই মেয়েটিকে দেখ্‌তে পেলাম না। তখন সকলই বুঝিলাম। সে তো আর মেয়ে নয়। আমি আশ্রমে এসে দেখি— আমার 'মাধব' এখানে।"

পরশুরামের বয়স আশীর উপরে। তিনি সর্ব্বদাই মাধবের নামে দিশাহারা। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় আহারের সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "পরশুরাম, ডাল কেমন লাগে?"

পরশুরাম চমকিয়া অমনি বলিলেন— "আস্তাহ! যা কইলেন, কিষ্টনাম বড় মিঠা।" পরশুরামের অনেক কথায়ই এইপ্রকার আত্মহারা ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পরশুরাম সর্ব্বদাই সকলের নিকট বলিয়া থাকেন— "মাধব আমার বড় দয়াল। তিনি আমার ছেলে মেয়ে সমস্ত জঞ্জাল নিয়া তাঁর দুর্লভ চরণ আমাকে দিয়াছেন। এত দয়া মাধব না কর্‌লে আমার কি সাধ্য ছিল মাধবের নাম লই?" পরশুরাম এসব কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া অস্থির হন, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। 'মাধব আমার বড় দয়াল,' পুনঃপুনঃ এই কথাই তিনি বলিতে থাকেন।

পরশুরামের সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রশংসাবাদে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'ঠাকুর তো প্রায় সকলেরই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইঁহার সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইবে।' সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি আমতলায় ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন, কীর্ত্তন হইতেছে— ইতিমধ্যে পরশুরাম তাঁহার কাণে তিন বার "গুরু সত্য", "গুরু সত্য", "গুরু সত্য" এই কথা বলিয়া পিঠে কয়েকটি চাপড় মারিলেন। ঐ সময়ে কুঞ্জবাবু অকস্মাৎ কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার ভিতরে এক অদ্ভুত শক্তির খেলা হইতে লাগিল। তিনি হাত পা আছড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর যখন ধামরাই গিয়াছিলেন, তখন পরশুরামের সহিত মাধবের মন্দিরে তাঁহার দেখা হয়। পরশুরাম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, " আমি যেন মাধবের দর্শন পাই।" ঠাকুর তখন বলিলেন, **"আপনি ত মাধবের দর্শন পেয়ে থাকেন, তিনি ত আপনার নিকটেই রয়েছেন।"** তাহাতে পরশুরাম বলিলেন—"এই মাধব নয় ইঁহার ভিতরে যে আর এক মাধব আছেন, তাঁকে নিয়ত দেখতে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে উঁকি দিয়ে থাকেন।"

স্বপ্ন, প্রারব্ধ এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

বৈশাখ, ১৬ই হইতে ৩১শে।

আজ কাল অরুণোদয়ে স্নান করিয়া আসি। আসনে বসিয়া স্থিরভাবে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া হোম করিয়া থাকি। পরে প্রাণায়াম কুম্ভকের সহিত কিছুক্ষণ নাম জপ করিয়া গীতা এক অধ্যায় পাঠ করি। তৎপরে ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসিয়া থাকি। ঠাকুর এগারটার সময় শৌচে যান। শ্রীধর ঐ সময়ে কূয়া হইতে জল তুলিয়া, লেঙ্গটি ও বহির্ব্বাস লইয়া ঠাকুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন। ঠাকুর

পায়খানা হইতে আসিয়া গা ধুইয়া আসনে গিয়া বসেন। আহার বারটার মধ্যেই শেষ হয়। আহারের পর আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমতলায়ই বসিয়া থাকেন। ঠাকুর আমতলায় বসিলে পর, দুই ঘণ্টা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভাবত পাঠ করি; পাঠ শেষ হইলে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটেই বসিয়া থাকি এবং অবসর বুঝিয়া সময়ে সময়ে নানা সংশয়যুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি। একদিন কথায় কথায় ঠাকুরকে আমার কয়েকটি স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলাম।

ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন— "সকল স্বপ্নই অলীক নয়। অতীত জীবনের চিত্র অনেক সময় স্বপ্নে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাও কখন কখন স্বপ্নে আভাস পাওয়া যায়। মাথা বা পেট গরম হ'লেও অনেক সময়ে এলো মেলো স্বপ্ন দেখা যায়। যে সকল স্বপ্ন দেখ্‌ছ, তার কতকগুলি জীবনে পরিণত হচ্ছে, আর কয়েকটি ভবিষ্যতে বুঝ্‌বে।" এই বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন। ভাগলপুরে ১২৯৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে * অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় যে দৃশ্য বা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা ঠাকুরকে বলিলাম, শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন— "প্রকৃতিকে তৃপ্ত কর্‌তে হবে। প্রকৃতিই এসে তোমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। দুই উপায়েই প্রকৃতির তৃপ্তি সাধন করা যায়। এক বৈধ ভোগদ্বারা, আর এক সাধনদ্বারা। সাধনদ্বারাই তোমাকে প্রকৃতির তৃপ্তিসাধন কর্‌তে হবে। তোমার পক্ষে সাধনই একমাত্র উপায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবার পর মানুষ যে সকল কর্ম্ম করে থাকেন, তাহা কি শুধু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারব্ধের প্রভাবে না স্বাধীন ইচ্ছায়? আর এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তি কর্ম্ম করে নূতন কর্ম্মফলের সৃষ্টি করতে পারেন কিনা?"

ঠাকুর বলিলেন— "বাস্তবিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় একবার নিলে মানুষ কখনই আর নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি কর্‌তে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ভোগই মাত্র কর্‌তে থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে মানুষ দুষ্কর্ম কর্‌তে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল দুষ্কর্ম্মে কখনই আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। দুষ্কর্ম্ম কর্‌বার সময়ে, সেটা দুষ্কর্ম্ম ব'লে বুঝ্‌তে পারে এবং তা থেকে বিরত থাক্‌তে একটা চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে থাকে। শুধু প্রারব্ধেই যেন বাধ্য করে ঐ সব কর্ম্ম করায়ে নেয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে যে নূতন কর্ম্ম কর্‌তে পারে না— এও তার একটি প্রমাণ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "ভোগ কার হয়? আর এই ভোগের শেষই বা কোন্ সময়ে, কিসে হ'য়ে থাকে?"

ঠাকুর বলিলেন— "সংস্কারবশতঃ ভোগটি দেহেরই হ'য়ে থাকে। শরীরটি যখন মানুষের একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখনই ভোগের শেষ হ'য়ে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ মানুষ কি উপায়ে লাভ করতে পারে?"

ঠাকুর বলিলেন— "বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ এক নামসাধন দ্বারাই লাভ হ'য়ে থাকে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম কর্‌লেই দেহটি সাত্ত্বিক হ'য়ে যাবে। দেখ, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই দেহ রক্ষিত হতেছে,

---

*১ম খণ্ড — কে তুমি?

শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হতেছে। রক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসেই বিশুদ্ধ হতেছে, এবং দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হতেছে। এক কথায়, দেহের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারাই চল্‌ছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটি যখন গেঁথে যাবে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই যখন আপনা আপনি নাম চল্‌তে থাক্‌বে, তখন যেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সমস্ত দেহে হবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হবে। নামটি শ্বাস-প্রশ্বাসে মিলিত হ'য়ে গেলে, ক্রমে দেহটিও নামময় হ'য়ে যাবে। দেহ নামময় হ'লে উহাদ্বারা আর অন্য কার্য্য হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মই হবে। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর। চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম— 'শ্বাস-প্রশ্বাসে যাদের নাম অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের শরীরে কি বিশেষ কোনও চিহ্ন প্রকাশ পায়? যদি কেহ বলে যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হয়, তার বাহিরের কোন্ লক্ষণ দ্বারা উহা সত্য ব'লে বুঝ্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মুখে বল্‌লেই ত আর হবে না। শরীরেও যে তাদের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম গেঁথে গেলে শরীরের চর্ম্মের উপরে এইপ্রকার চিহ্ন পড়বে। লক্ষ্য কর্‌লেই দেখতে পাবে।"**

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের অঙ্গুলির পৃষ্ঠভাগে একপ্রকার চক্রাকার চিহ্ন দেখাইলেন। দুই হাতেরই সমস্ত অঙ্গুলির পৃষ্ঠে ঐ প্রকার কোঁকড়া কোঁকড়া ওঙ্কারবৎ চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "অস্থি মাংস রক্তে যখন নাম হইতে থাকে তখন ঐ সকলে কি নামের ছাপ পড়ে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বৃক্ষের শিরায় নামের স্বাভাবিক ছাপ তো শ্রীবৃন্দাবনে চক্ষে দেখে এসেছ। মানুষের শরীরের প্রতিপরমাণুতে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন অস্থি, মাংস, রক্তেও নামের ছাপ প'ড়ে যায়। মুসলমান্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থে একটি ফকির সম্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাঁহার রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক ফোঁটা রক্তে "আয়েনুল্ হক্" এই শব্দ অঙ্কিত রয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া গেল। এবার অর্দ্ধকুম্ভসময়ে শ্রীবৃন্দাবনে, যমুনার চড়াতে একদিন সাধুদের দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলাম, বালির উপরে একখানা হাড় দেখে তুলে নিলাম, দেখ্‌লাম সমস্ত হাড়খানিতে দেবনাগর অক্ষরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" লেখা রয়েছে। হাড়খানা আমি সাধুদের দেখালাম, তাঁহারা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। কোনও বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি স্থির করে তাঁরা সেখানি নিলেন এবং খুব সমারোহের সহিত মহোৎসব করে যমুনার চড়াতেই সমাধিস্থ কর্‌লেন।"**

এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীধর ও সতীশের নিকটে বিষয়টির আগাগোড়া জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভমেলায় যমুনার চড়ায় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও সাধুরা আসন করিয়াছিলেন। একদিন সকালে ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, যমুনার চড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদের নিকটে না যাইয়া, না বসিয়া, সোজা চড়ার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পঁহুছিয়া

অল্প বালির ভিতর হইতে একখানা অস্থি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন— **"দেখ, কোনও মহাপুরুষের অস্থি, 'হরেকৃষ্ণ' নাম লেখা রয়েছে।"** ঠাকুর অস্থিখানি আনিয়া সাধুদের দেখাইলেন। সাধু সন্ন্যাসীরা অস্থিখানি "হরেকৃষ্ণ" নামে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিকট হইতে ঐ অস্থিখানি চাহিয়া লইয়া, খুব আনন্দের সহিত সমস্ত সাধুরা মিলিয়া, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া, মহা সমারোহে কেশীঘাটের সন্নিকটে যমুনার চড়ায় সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আমি শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে না পারায় তাৎসাময়িক অনেক ঘটনাই আমার জানা নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঘটনার উল্লেখ করিলে, তাহা যেমন শুনি লিখিয়া রাখি। অতিসংক্ষেপে ঠাকুর যাহা বলিয়া যান, তাহা পরিষ্কার রূপে জানিতে শ্রীধর, সতীশ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনাবস্থান সময়ের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার এখন শুনিতেছি।

ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।

আজ ঠাকুর কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। আমি ঐ সময়ে অনুপস্থিত থাকাতে ছোট দাদা (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার ডায়েরীতে উহা তুলিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ প্রশ্নের উপরে এই সকল উপদেশ, তাহা আমি জানি না। লেখা যেমন পাইলাম তেমনই তুলিয়া রাখিলাম।

ঠাকুর। — **"ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রপথ ধ'রে সর্ব্বদাই চল্‌তে হবে। যদি কোন সাধুবাক্য ঋষিবাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যই গ্রহণ কর্‌তে হবে। লোভ-মোহ-ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিয়মগুলির উপরে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখ্‌বে। না হ'লে সাধনে বিস্তর অনিষ্ট হবে। যে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে, তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম কখনও করা উচিত নয়। কোনও প্রাণীর, এমন কি, উদ্ভিদেরও, কষ্টের কারণ হবে না। হরিদাসকে সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন কর্‌তে মহাপ্রভু কত অনুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজেকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্ব্বদা তফাৎ তফাৎ থাক্‌তেন। রূপ সনাতন যদিও ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্‌তেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কিনা, স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।"**

দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর একটি গল্প বলিলেন— **"একদিন পোপ্ দেখ্‌লেন বহু লোক একটি স্ত্রীলোকের কাছে যাচ্ছেন। ঐ স্ত্রীলোকটির উপর খৃষ্ট আবির্ভূত হয়েছেন, এইরূপ প্রচার। পোপ্ বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। পোপ্‌কে তাঁহার কার্ডিনেল্ বল্‌লেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি একবার দেখে আসি।' স্ত্রীলোকটির নিকটে কার্ডিনেল্ উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন— 'ওরে, আমার জুতোটা খুলে দে তো?' কার্ডিনেলের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শুনে স্ত্রীলোকটি**

গ্রাহ্যই কর্‌লেন না। দর্শকমণ্ডলীও ঐপ্রকার ব্যবহার দেখে অবাক্ হ'লেন। কার্ডিনেল স্ত্রীলোকটির অগ্রাহ্যভাব দেখে অমনি চ'লে এলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক পোপের নিকটে জ্ঞাপন ক'রে বল্‌লেন—"ঐ স্ত্রীলোকটি ভণ্ড, কখনই খৃষ্ট উহাতে আবির্ভূত নন। যদি খৃষ্টই আবির্ভূত হ'তেন, তা হ'লে নিশ্চয় তিনি বিনয়ী হ'তেন এবং যা বলেছিলাম কর্‌তেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"জ্ঞানের সম্যক্ ব্যবহার কর্‌বে। কাকেও সহজে বিশ্বাস কর্‌বে না। আবার বিশ্বাস ক'রেও সহজে তাকে অবিশ্বাস কর্‌বে না। জ্ঞান ও ভক্তি এ সকলই প্রকৃতির। দেখ, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজে নিরক্ষর ছিলেন। অথচ মহা মহা জ্ঞানী লোকে তাঁর নিকটে ব'সে জ্ঞানলাভ কর্‌তেন। আবার মহাভক্ত লোকেরাও তাঁর চরণতলে বসে কত ভক্তির উপদেশ শুন্‌তেন। তাঁকে জ্ঞানীরা মহাজ্ঞানী এবং ভক্তেরা মহাভক্ত মনে কর্‌তেন।"**

আসন ও হোম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

১লা বৈশাখ হইতে নিত্য হোম করিতে ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে স্নানান্তে নাম প্রাণায়াম করিয়া আমি হোম করিয়া থাকি। ১০৮টি ত্রিপত্র বিল্বপত্র এক ছটাক ঘৃতের সহিত মিলাইয়া মন্ত্র মনে মনে জপ করি— "অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি দেই। ঠাকুর বলিয়াছেন— **"বেল, বট, অশ্বত্থ বা যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠে হোম কর্‌বে। এই মন্ত্র প'ড়ে প্রজ্বলিত অগ্নিতে "অগ্নয়ে স্বাহা" ব'লে আহুতি দিবে।"** এই বলিয়া হোমের মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমের পুকুরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় বনের মধ্যে একখানা ঘর করিয়াছেন। ঐ ঘরে কেহই কোনও সময়ে থাকে না। নির্জ্জন পাইয়া, কুঞ্জবাবুর সম্মতি অনুসারে, ঐ ঘরেই আমার আসন করিয়াছিলাম। উপস্থিত সেই স্থানে বড়ই বিঘ্ন দেখিতেছি, আশ্রম হ'তেও একটু তফাৎ; কি করিব জানি না।

আজ ঠাকুর আহারের পর আমতলায় গিয়া বসিয়া নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন— **"উত্তর-মুখ বা পূর্ব্বমুখ হ'য়ে আসন ক'রে হোম কর্‌বে। ভগবৎপ্রীতি-ইচ্ছায় বা নিষ্কাম হ'য়ে যা কিছু কর্‌বে তা উত্তরমুখ হ'য়ে ক'রো, আর সকাম বা সঙ্কল্পিত কার্য্য পূর্ব্বমুখ হ'য়ে করা ব্যবস্থা। হোম কর্‌বার সময়ে হোমধূম শরীরে লাগাতে হয়। না হ'লে দেহেতে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই হোমের উপাকারিতা কি?"

ঠাকুর বলিলেন—**"হোমের উপকারিতা অনেক আছে, তাহা এখন জেনে প্রয়োজন নাই। ঠিক মত হোম ক'রে যাও, উপকারিতা নিজেই অনুভব কর্‌তে পার্‌বে। হোম ক'রে হোমের ফোঁটা কপালে দিও। হোমের বিভূতি দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কর্‌তে হয়। মধ্যে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও ব্রাহ্মণের করা ব্যবস্থা।"**

আমি হোম বিভূতিদ্বারা সকালেই ত্রিপুণ্ড্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া হোমান্তে হোমের ফোঁটা ধারণ করি। স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় হস্তে পাঁচটি স্থানে এবং উভয় পার্শ্বে, দুইটি স্তনে,

নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, কণ্ঠের বিপরীত মেরুদণ্ডের উপরে ও পৃষ্ঠে নাভিমূলের বিপরীত স্থলে, সর্ব্বত্রই ত্রিরেখা দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে স্ত্রীলোকের সংস্রব।

আমাদের দেশে হীন জাতি ছোট লোকদের ভিতরে, মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে, স্ত্রীলোক সংস্রবে যে সকল বীভৎস কাণ্ড অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে বৈরাগী বৈষ্ণব কথাটার উপরেই যেন সাধারণ লোকের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রসমাজেরও দুই এক জন লোক এ সকল সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে, সাধারণ লোকসমাজের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, বলা যায় না। আজ কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মহাশয়, ইতর শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণবদের ভিতরে স্ত্রীলোক লইয়া যে সাধন-ভজনের ব্যবস্থা আছে শুনিতে পাই, তাহা কি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম?"

জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা —১৩ই।

ঠাকুর শুনিয়া কাণে হাত দিয়া বলিলেন— **"রাম! রাম!! মহাপ্রভু শাস্ত্র-সদাচারবিরুদ্ধ কোন অনুষ্ঠানই করেন নাই, বলেনও নাই। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।' মহাপ্রভু মাত্র ইহাই প্রচার করেছেন। নাম কি ভাবে কর্‌তে হবে তাও বলেছেন—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।' স্ত্রীলোক হ'তে মহাপ্রভু কত তফাৎ থাক্‌তেন এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের ঐ সংস্রব থেকে কত সাবধানে রাখ্‌তেন, চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করলেই তা বেশ বুঝা যায়। শুধু এদিকে কেন? প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, স্ত্রীলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রেখে বৈষ্ণবসমাজে ধর্ম্মবিষয়ে বিষম অধোগতি হয়েছে। শ্রীবৃন্দাবনেও দেখ্‌লাম—সংযোগী না হ'লে কারো ওখানে থাকা সহজ নয়।"**

এই বলিয়া ঠাকুর একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ঠাকুরে শ্রীবৃন্দাবনে বাস-সময়ে আমিও তথায় ছিলাম। এই ঘটনাটি আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা আছে, সুতরাং তৎকালীন ডায়েরী হইতে এই স্থলে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে একদিন একটি ভদ্র ঘরের যুবতী ব্রাহ্মণরমণী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমি এ সময়ে কি করিব বলুন।" ঠাকুর তাঁহাকে বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিলেন, "অল্প বয়সে ধর্ম্মোন্মত্ততা বশতঃ আমি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম, চারি ধাম পরিক্রমা করিয়া কিছু কাল হইল শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছি। এতকাল বেশ ছিলাম, কিছুদিন হইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আমার পিছনে বড়ই লাগিয়াছে। তাহারা দিনরাত আমাকে জ্বালাতন করিতেছে। ভেক্ গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব নিয়া সংযোগী হইয়া, নাকি যুগল উপাসনা করিতে হয়, না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা নাকি মহা

অপরাধ, সকলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। অনেক বৈষ্ণবই নিয়ত আমার নিকট আসিতেছেন, আর ভেক্ দিতে চাহিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, কিছুকাল হইল বিধবা হইয়াছি। এখন কি বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া যুগল উপাসনা করিতে আপনি আমাকে বলেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"দুষ্ট লোকেরা আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এসকল পরামর্শ দিতেছে। শাস্ত্রে বরং ইহার বিরুদ্ধেই আছে, যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের অধোগতি হয়। সংযোগী না হ'লে যুগল উপাসনা করা যায় না, এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যুগল উপাসনা বরং নাই হবে; এসব দুষ্ট লোকের পাল্লায় প'ড়ে, স্ত্রীলোকের সার সতীত্ব ধর্ম্মে কিছুতেই জলাঞ্জলি দিবেন না।"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি খুব সন্তুষ্টা হইলেন; বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়া আপন মনে সাধন-ভজন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

সতীর রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্।

যৌবনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটি যখন একাকী চারি ধাম পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তখন একদিন একটি দুষ্ট লোকের উপদ্রবে পড়িয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটি তাহা ঠাকুরকে বলিলেন। ঠাকুর অনেক সময়ে এই ঘটনাটি বলিয়া থাকেন। যথার্থ সতীর সহায় ভগবান্। তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন। এই ভদ্রমহিলা বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রামের একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের পুত্রবধূ। স্বামিপুত্রাদি থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মের আকর্ষণে ইনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। পদব্রজে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবার প্রত্যাশায়, স্বামীর চরণে পড়িয়া কিছুদিন অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামী তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়া কিছুকাল ঘরে রাখিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে, পাগলের মত ছুটিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পথে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত তীর্থ-দর্শনমানসে নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও মনের আবেগে তিনি, একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র অবলম্বন করিয়া, একাকী ছুটিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ভগবৎ কৃপায় নীলাচলে উপস্থিত হইয়া, তিনি শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া, পরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে চলিলেন। সেতুবন্ধের পথে তাঁহাকে যে আকস্মিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের নিকটে যে কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীধর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "একাকী যৌবনাবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণকালে কোথাও কোন প্রকার বিপদ্ ঘটে নাই তো?" স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন "ভগবান্ যাহার সহায়, তাহার আবার বিপদ্ কি? তবে একদিনের একটি ঘটনার কথা আপনাদিগের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভাল সঙ্গী না জুটাতে, একাকীই দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলাম। একদিন সমস্ত রাস্তা চলিয়া বিশ্রামের কোনও নিরাপদ স্থান না পাইয়া বড় ভইয়

পড়িলাম। পথ অতিশয় দুর্গম, একান্ত নির্জ্জন; একটানা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই কোনও নির্জ্জন স্থানে সাধুদের একখানি কুটীর দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি, কয়েকটি শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। উঁহাদিগকে দেখিয়া ভরসা হইল। তাই ঐ স্থানে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু রাত্রি একটু অধিক হইতেই সন্ন্যাসীরা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, অন্য একটি আড্ডায় চলিয়া গেলেন। একটিমাত্র বলিষ্ঠ যুবক সন্ন্যাসী ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে যখন চারিদিক অন্ধকারময়, নিস্তব্ধ, তখন সাধুটি নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে ভিতরের দুষ্টাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি তখন বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। কিছুক্ষণ আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। অবলা নারী নির্জ্জন স্থলে নিশাকালে অতিবলিষ্ঠ কামুকের হাতে পড়িয়া কি উপায়ে রক্ষা পাই, ভাবিতে লাগিলাম। সাধুকে দু'চার বার হাতজোড় করিয়া, তাঁহার চেষ্টা থামাইতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সাধু মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, আমাকে টানাটানি করিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করিব? "মা জগদম্বে!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সাধু মহাবলিষ্ঠ, বিষম উত্তেজনার অবস্থায় সজোরে আমাকে যেমনি মাটিতে টানিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া লাফাইয়া উহার ঘাড়ে পড়িল এবং মুখে করিয়া পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইল। পরদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিলেন, কিছু তফাতে এক স্থানে সাধুর মৃত দেহ ঘাড়-মট্‌কান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা বলিলেন, আর কখনও তাঁহারা এই গ্রামে বাঘ আসিতে দেখেন নাই, অথবা বৃদ্ধদের মুখেও কখনও এই গ্রামে কোন কালে বাঘ আসিয়াছিল এমন কথা শুনেন নাই। ঐ সাধু বহুকাল কুটীরেই বাস করিতেছিলেন। জগদম্বার কৃপা অতি অদ্ভুত!..."

স্ত্রীলোকটি যখন এই কথা ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন, আমি তখন সেখানেই থাকিয়া ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম। ঐ প্রকারের আরও একটি ঘটনা ঠাকুর সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; তাহা সেই সময়ের ডায়েরী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

যথার্থ সতী বিপন্না হইলে ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ দেখাইতে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে একটি ভদ্রলোকের বাস ছিল। যৌবনাবস্থায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি আফিং ধরিয়াছিলেন। একদিন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজ যুবতী স্ত্রীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া, পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পথিমধ্যে আফিমের অভাব হইল, ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হইয়া ঘন ঘন হাই তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে দুঃসহ ক্লেশ প্রকাশপূর্ব্বক স্ত্রীকে বলিলেন— "ওগো! আর আমি সইতে পারি না, শীঘ্র আফিং আনিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাও।" স্বামীর ঐ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদ আশঙ্কা করিয়া, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিলেন, এবং কোথায় আফিং পাওয়া যাইবে অনুসন্ধান করিয়া অস্থিরচিত্তে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন, ঐ গ্রামে এক ব্যক্তির নিকট আফিং আছে; কিন্তু তিনি ভয়ঙ্কর

মাতাল।' যুবতী অগত্যা মাতালের দ্বারেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। আফিমের অভাবে স্বামীর জীবন সংশয়াপন্ন জানাইয়া, অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত হইয়া, করজোড়ে অতি কাতরভাবে মাতালের নিকট আফিং প্রার্থনা করিলেন। মাতাল বলিল—"ওগো, স্বামীর জন্য যদি যথার্থই দরদ থাকে, তবে আফিং নিতে পার; মদ, গাঁজা যাহা চাহিবে দিতে পারি, কিন্তু মূল্য নিয়া দিব না; কিছুক্ষণের জন্য তোমার দেহটি আমাকে দান করিতে হইবে, না হ'লে দিব না নিশ্চয় জানিও।" স্ত্রীলোকটি বড় অনুনয় বিনয় করিলেও মাতাল কিছুতেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী নিরুপায় হইয়া স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন। স্বামী তখন আফিমের অভাবে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন; সুতরাং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ওগো! আমার প্রাণ যায়, যেখান থেকে যে ভাবে পার, আফিং আনিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাও।" যুবতী বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। একদিকে স্ত্রীলোকের সার ধর্ম্ম সতীত্বের নাশ, আর একদিকে স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা পতির অপমৃত্যু। সতী ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে মাতালের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতালের চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনি আমার এই দেহ গ্রহণ করিয়া ইহার বিনিময়ে আমার স্বামীর জীবন দান করুন। আমাকে এই পাপে নরকে যাইতে হয় আপত্তি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শীঘ্র আফিং দিয়া আমার মরণাপন্ন স্বামীকে রক্ষা করুন।"

ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া! সতীর কি অদ্ভুত শক্তি! যুবতীর করস্পর্শে মাতালের কি এক অবস্থা হইল, মাতাল চমকিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ যুবতীর চরণে মস্তক রাখিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর; তোমার কৃপায় আজ আমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল। আমি অত্যন্ত দুরাচার, মদ, গাঁজা, আফিং সমস্ত নেশাই করিয়া থাকি, কিন্তু আজ হইতে আমি সমস্ত নেশা ত্যাগ করিলাম, তোমার যত ইচ্ছা আফিং লইয়া যাও। মা, তোমার মত দুর্দ্দশা আমার স্ত্রীরও তো ঘটিতে পারে! জীবনে আর নেশা বস্তু স্পর্শ করিব না।" যুবতী আফিং নিয়া স্বামীর নিকটে পঁহুছিলেন; দেখিলেন, স্বামী বসিয়া খুব কান্দিতেছেন। স্বামীর হাতে আফিং দিতেই তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! আমার জন্য তোমার সার সতীত্ব-ধর্ম্ম তুমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলে! ধিক্ আমার জীবনে! এ জীবন যাওয়াই তো ভাল। আর কখনও আফিং স্পর্শ করিব না, প্রাণ যায় যাক্। তুমিই ধন্যা, তুমিই যথার্থ সতী।" স্ত্রী তখন কান্দিতে কান্দিতে স্বামীর চরণে ধরিয়া, ভগবানের অদ্ভুত কৃপায় তিনি যে ভাবে এই বিষম সঙ্কটে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানাইয়া স্বামীকে শান্ত করিলেন।

হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অনুতাপ।

আজ মাসাধিক কাল হইল, নিয়মিত রূপে অনুদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণ করিয়া আশ্রমে আসি এবং বেলা নয়টা পর্য্যন্ত আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকি। বাড়ী হইতে যজ্ঞডুম্বুরের কাষ্ঠ ও বিশুদ্ধ গব্যঘৃত আনিয়া রাখিয়াছি। সকালে কিছুক্ষণ গায়ত্রীজপান্তে, অখণ্ডিত বিল্বপত্রদ্বারা ঠাকুরের আদেশ অনুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ১০৮টি আহুতি দেই। আহুতি দিয়াই হোম-ধূম

শরীরে পাখা করিয়া লাগাইয়া থাকি, এবং খুব উদ্যমের সহিত প্রাণায়াম ও নাম করি। কিছুদিন যাবৎ পবিত্র হোমগন্ধ, আসন ছাড়িয়াও, সময়ে সময়ে অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু আজকাল হোমগন্ধ আমাকে আর ছাড়িতেছে না। প্রায় সর্ব্বদাই যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত হোমগন্ধ পাইয়া, আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। নিয়ত হোমগন্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। এই পবিত্র হোমগন্ধের প্রভাবে চিত্তের প্রফুল্লতা, মনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নাম সুস্পষ্টভাবে, খুব তেজের সহিত, রসাল হইয়া প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধ নামের, এবং নাম গন্ধের, প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে। মন আর অন্য দিকে যায় না, গন্ধে মাতিয়া নামেতে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অনুদয়ে স্নান করিয়া অপরাহ্ন ছয়টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকি; অবসন্নতা, ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝি না। পূর্ব্বে যাঁহারা আমার গায়ে ঘর্ম্মের দুর্গন্ধ পাইয়া সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া তফাৎ থাকিতেন, আজকাল তাঁহারাও এই হোমগন্ধ পাইয়া আমার গা ঘেঁষিয়া বসেন, গায়ে হোমগন্ধ হইয়াছে বলিয়া পরস্পর আলোচনা করেন। আমি কিন্তু গায়ের গন্ধ কিছুই বুঝি না, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র হোমগন্ধ পাইয়া দিশাহারা হইয়া যাইতেছি। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত খাইতে না বলিয়া, ঠাকুর আমাকে কেন অনর্থক আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন, সময়ে সময়ে আমার এই খট্‌কা উঠিত । আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া! এই ভাবে না বুঝাইলে আমার কিছুতেই শান্তি হইত না। ঠাকুর! দয়া কর। এই ভাবেই প্রতি সংশয়ের হাত হইতে রক্ষা করিও। জয় ঠাকুর!!

আশ্রমের পশ্চিম দিকে শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণাংশে পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের রান্নার ও থাকিবার দু'খানা ঘর আছে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া আহারাদি ব্যাপারে আশ্রম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া উঁহারা আনন্দে ভজন-সাধন করিতে করিতে দিন কাটাইতেছিলেন। সম্প্রতি ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত আশ্রমেই হইয়াছে। তাঁহাদের রান্নাঘরটি শূন্য পাইয়া আমার আসন ঐ ঘরে আনিবার সুযোগ পাইলাম। জঙ্গলের ভিতরে দরজা-শূন্য ফাঁকা ঘরে আসন, বস্ত্র ও হোমের ঘৃতাদি সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া ঠাকুরের নিকটে সারাদিন থাকায় উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না। গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে বাঘের অভাব নাই, সাপও বিস্তর; রাত্রিতে ঐ ঘরে যাইয়া একাকী আমাকে থাকিতে অনেকে নিষেধ করিতেছেন। একটু তফাৎ থাকি বলিয়া, রাত্রিতে যে আনন্দ সকলে ঠাকুরকে লইয়া ভোগ করেন আমি তাহাতে বঞ্চিত।

আর একটি ঘটনায় আমার চিত্তকে বিষম অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একদিন আমি আশ্রমে রান্নায় নিযুক্ত আছি, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনসহ অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমার হোমের কাষ্ঠগুলি একটু ভিজা ছিল বলিয়া, ভালরূপে শুকাইয়া লইবার মানসে উহা আসনঘরের উত্তর দিকের একটা অনাবৃত স্থানে রৌদ্র পাইবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই, 'হায় ঠাকুর, কি হইল? কাঠগুলি ভিজিয়া গেল,' ভাবিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কল্য ভিজা কাষ্ঠে কি প্রকারে হোম করিব চিন্তায় অস্থির হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইলাম; 'তাঁর দয়া হ'লে সবই সম্ভব, না হ'লে আর উপায় নাই,' বুঝিয়া অগত্যা

স্থির হইলাম। আহারান্তে রাত্রে বৃষ্টি থামিলে আসনে যাইয়া দেখি, সমস্তগুলি কাঠ ঘরের মধ্যস্থলে সাজান রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাত্রির অধিকাংশ সময় ভাবিতে লাগিলাম, 'কাঠগুলি কে ঘরে আনিয়া রাখিল?' পরে ২/৩ দিন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, কে উহা ঘরে লইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সকলেই বলিলেন, "জানি না।" পণ্ডিত দাদা বলিলেন, "এ বিষয়ে আর অনুসন্ধান কেন? অন্যদ্বারা হ'লেও উহা তো ঠাকুরই করাইয়াছেন।" সাধারণের নিকটে ঘটনাটি সামান্য বোধ হইলেও এই ব্যাপারে আমার চিত্তটিকে অত্যন্ত আলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! হায়! আমার ব্যস্ততা দেখিয়া ঠাকুরেরই এই কর্ম্ম!

পণ্ডিত দাদাদের রান্নাঘরেই আমার আসন করিলাম।

কর্ম্ম কিসে শেষ হয়?

আজ নির্জ্জন পাইয়া পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "শুনিতে পাই, কর্ম্মই মানুষের বন্ধন। এই কর্ম্ম কিসে শেষ হয়? কর্ম্ম করিয়াই কি কর্ম্মকে শেষ করিতে হয়?" ঠাকুর বলিলেন— **"তা কি কখনও হ'য়ে থাকে? কর্ম্ম ক'রে কেহই কর্ম্মকে শেষ কর্‌তে পারে না। কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে মানুষ আরও কর্ম্মে জড়িত হ'য়ে পড়ে। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম শেষ করা যায় বটে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা অভ্যাস করা সহজ নয়। সাধনাদ্বারা কর্ম্ম শেষ করাই সহজ।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিলেও কর্ম্ম শেষ হ'তে এত বিলম্ব হয় কেন? সদ্‌গুরুর আশ্রয়াদি নিয়াও কি আবার সাধন-ভজন ক'রে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ কর্‌তে হবে?"

প্রশ্নটি শুনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন— **"সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে কর্ম্ম আপনা আপনি শেষ হ'য়ে আসে। আগুনের উপরে রাশীকৃত কাঠ চাপায়ে রাখ্‌লে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ধীরে ধীরে যেমন উহা দগ্ধ হ'তে থাকে, পরে একটু বাতাস পেলেই একবারে দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাঠ জ্বালায়ে দিয়ে একেবারে ভস্ম ক'রে ফেলে, সেইরূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও, বহুজন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জ্জনার নীচে থেকে, ধীরে ধীরে কার্য্য কর্‌তেছে এবং ঐ সমস্ত আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে নষ্ট কর্‌তে কর্‌তে গুরুকৃপায় যখন উহা একবার দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে তখনই সমস্ত কর্ম্মরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে নষ্ট ক'রে প্রকৃত শান্তির অবস্থাতে নিয়ে যাবে। গুরুশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "যে সকল দুষ্কার্য্য প্রারব্ধহেতু করা হয়, তাহা যে প্রারব্ধেরই কার্য্য, তাহা কি প্রকারে জানা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"একটি কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা থাক্‌লেও এবং পুনঃপুনঃ বিরত হ'তে চেষ্টা ক'রেও যখন অবশ হ'য়ে তা ক'রে ফেল, তখন উহা প্রারব্ধ বশতঃই হ'ল জান্‌বে। ঐ প্রকারকার্য্য হওয়ার পরে যথার্থ অনুতাপ এলেই ঐ প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যায়। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর্‌তে পার্‌লে সমস্ত প্রারব্ধই খুব শীঘ্র নষ্ট হয়। এত সহজে আর কিছুতেই হয় না।"**

জীবন্মুক্তের কর্ম্ম; প্রারব্ধক্ষয়ের উপদেশ।

আজ জিজ্ঞাসা করিলাম— "মানুষ যখন একেবারে নিঃস্বার্থ হ'য়ে যায়, জীবন্মুক্ত হ'য়ে যায়, তখনও কি তার কর্ম্ম থাকে?"

জ্যৈষ্ঠ১৩ই—৩১শে, জুন, ১৮৯১।

ঠাকুর বলিলেন— **"মানুষের যত দিন স্বার্থ আছে, তত দিন আর তার কর্ম্ম কোথায়? মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখনই তার যথার্থ কর্ম্ম আরম্ভ হয়। স্বার্থ নষ্ট হ'য়ে মুক্তাবস্থা লাভ কর্‌লে, সমস্ত সংসারের জন্য অবিশ্রান্ত খাট্‌তে হয়। নিঃস্বার্থ না হ'লে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভই হয় না। জীবন্মুক্ত হ'লেই যথার্থ কর্ম্মের আরম্ভ।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহা ভোগ না ক'রে কি উপায় নাই? সমস্ত প্রারব্ধই কি ভুগে শেষ কর্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগ করাবেন, তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াতে পার্‌বে না। তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম্ম ক'রে যায়, ঝাঁ ক'রে তাদের কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যায়। আর বেগারের মত কর্ম্ম কর্‌লে, ক্রমে অনেক কর্ম্মে জড়িয়ে ধরে। কর্ম্মকে কখনও উপেক্ষা কর্‌তে নাই। কর্ত্তব্যবোধে প্রফুল্লমনে কর্ম্ম ক'রে যাও, তা হ'লেই খুব শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।"**

কিছুদিন হইল ঠাকুর বলিয়াছিলেন— **"কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম শেষ করা যায় না, সাধন দ্বারাই কর্ম্ম শেষ করা সহজ।"** আবার এখন বলিলেন— **"ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগাইবেন, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিবে না। প্রফুল্লমনে কর্ম্ম করিয়া যাও, শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।"** এই দুইপ্রকার কথার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া আমি এই বুঝিলাম যে, ভগবান্‌ই সকলের কর্ত্তা, তাঁরই ইচ্ছায় প্রারব্ধভোগ। সাধন-ভজন করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহার কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ শেষ হইতে পারে। সুতরাং একান্তপ্রাণে তাঁকেই ডাকি। কিন্তু ভগবান্ যে কি, তাহা তো কিছুই জানি না। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে কি ভাবে ডাকিতে হয়, পূজা করিতে হয়, তাহা তো বুঝিতেছি না। শূন্যে ঢিল মারিবার মত, লক্ষ্য স্থির না করিয়া নাম করিতেছি মাত্র। মনে এই খট্‌কা উপস্থিত হইল, নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে কিছুতেই তো ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাঁর পূজা আর কিরূপে করিব? শূন্যে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইতেছি। গুরুর ধ্যানে ও পূজায় ভগবানের পূজা হয় না কি? আমাকে পরিষ্কাররূপে ইহা বুঝাইয়া দিন।"

গুরুই ভগবান্।

ঠাকুর বলিলেন— **"অগ্নি তো সকল স্থানেই আছে; কিন্তু সেই অগ্নি কি কেউ ধর্‌তে পারে? না তাহাদ্বারা কোনও কাজ হয়? আগুনের আবশ্যক হ'লে সর্ব্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেহ উহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনি, চুল্লী ইত্যাদি**

যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত র'য়েছে, সেখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সে রকম, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁকে ধর্‌তে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎ শক্তির প্রকাশ দেখে, তথায়ই পূজা কর্‌তে হয়। গুরু তো আর মানুষ নন্। গুরুই ভগবান্, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।"

সাধকজীবনে শুষ্কতার আবশ্যকতা।

অনেক সময় নাম করিতে করিতে অত্যন্ত নৈরাশ্য, উদ্বেগ ও শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন নাম করিতে জ্বালা হয়। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধনের সময়ে কখনও কখনও বড়ই নিরাশ হই, শুষ্কতা ও জ্বালা আসিয়া অস্থির করে, সাধন-ভজন এই সময়ে ভাল লাগে না। কত কাল এই শুষ্কতা ভোগ হবে? এইরূপ হয় কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"দেখ, এই বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক। পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুখায়ে গেছে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার কর্‌তেছে। গাছপালাও পূর্ব্বের মত নাই, দেখ্‌লেই মনে হয় যে কি এক বিষম অবস্থা। বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এমন দারুণ অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে দেখ, এই গ্রীষ্মকাল না হ'লে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার নূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্য্যের কারণ। গ্রীষ্ম হয় ব'লেই আমরা বর্ষার এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য অনুভব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এইপ্রকার। সাধনের সময়ে শুষ্কতা, নৈরাশ্য, জ্বালা ইত্যাদি বিবিধপ্রকার দুঃখের অবস্থা ভোগ কর্‌তে হয় ব'লেই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নৈরাশ্য বা শুষ্কতা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাক্‌ত না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ যখন ধর্ম্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল অবস্থা হ'তে মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ কর্‌তে পারে না। এখন এ সকলই প্রয়োজন। যদি শান্তির অবস্থা একবার লাভ হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই তা নষ্ট হয় না।"**

অসময়ে শাস্ত্রপাঠের ও সাধুসঙ্গের অপকারিতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে এবং অনেক সাধুর সঙ্গ করাতে ধর্ম্মজীবনের কল্যাণ হয়, না অনিষ্ট হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সমস্ত কার্য্যেরই তো একটা প্রণালী আছে। অসময়ে অনিয়মে কোন কার্য্যেরই সুফল লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করারও একটা সময় আছে, অবস্থা আছে। অসময়ে এলো মেলো ভাবে ওসব কর্‌লে কোন উপকারই হয় না, বরং অনিষ্টই হয়। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ আছে। প্রকৃতির অনুযায়ী পন্থা ধ'রে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে, অবস্থানুরূপ শাস্ত্র পাঠ কর্‌তে হয়। নিজের সাধনপথে একটা নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও শাস্ত্রপাঠ বা কোনও**

সাধুসঙ্গ করাই ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, ওরকম করায় লোকের বিষম ক্ষতি হয়। আপন সাধন ভজনের পথে নিষ্ঠা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে নিত্য সঙ্কীর্ত্তন ও ভাবাবেশ।

গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে নানা দিক্ হইতেই গণ্যমান্য বহু গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। আজকাল সাধু সন্ন্যাসী, বাউল, উদাসী এবং মুসলমান্ ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতেছেন, যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুভ্রাতারা আপন আপন রুচি অনুযায়ী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বসিয়া, কোথাও স্থির ভাবে নাম, প্রাণায়াম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, কোথাও বা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের সেবার কার্য্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রতিযোগিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে। সকলেই একই ভাবে মত্ত; উদয়াস্ত যে কি ভাবে যাইতেছে কাহারও লক্ষ্য নাই; কেমন যেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া যাইতেছে। প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সকলে একত্র মিলিত হইয়া ঠাকুরের নিকট, কখনও আশ্রমের পূবের ঘরে, কখনও বা আমতলায়, খুব উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সঙ্কীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। বরিশাল, বানরিপাড়া, ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা একত্র হইয়া, খোল করতাল লইয়া যখন উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরেব উপরে। ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকেন, পুনঃপুনঃ চাপিতে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠেন, উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরের হুঙ্কারে, হরিবোল ধ্বনিতে, চারি দিকে স্ত্রীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে দেখিতে দুই চারি মিনিটের মধ্যেই মহা হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হয়, সকলে যেন কেমন একপ্রকার হইয়া যান। কেহ কেহ "জয় রাধে, জয় রাধে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, কেহ কেহ "হরিবোল, হরিবোল" ভীষণ রব ছাড়িয়া নির্নিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহির্ব্বাস উড়াইয়া ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা "নিতাই, নিতাই" বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুরের সম্মুখীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎকাল নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়া ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোনও ভাবে মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দিশাহারা। খোলের ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তনের রব, গুরুভ্রাতাদের হুঙ্কার ও গর্জ্জনে মিলিত হইয়া, অদ্ভুত তাড়িৎপ্রবাহে দর্শকমণ্ডলীকেও কাঁপাইয়া তুলে। এই সময়ে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পর্দ্দার আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়েন ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। আমরা কয়েকটি গুরুভাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুরকে বাঁচাইয়া রাখিতে ঠাকুরের চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; এবং ভাবাবেশে উন্মত্ত, মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে, অবস্থা বুঝিয়া, সরাইয়া দেই। আশ্রমে আজকাল প্রত্যহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎসব! ধন্য ঠাকুর! ধন্য ঠাকুব!! তোমার সঙ্গলাভে আমরাও ধন্য!

সাধন কি? সাধকের ও সিদ্ধের কর্ত্তব্য কি?
ধর্ম্ম হইল কি না কিসে বুঝিব?

আহারান্তে ঠাকুর যখন আমতলায় বসেন, কিছুক্ষণ লোকের ভিড় তেমন থাকে না। পাঠান্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম— "মানুষের অশান্তির মূল কি?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈর্য্যের অভাবে। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ।"**

একটু থামিয়া ঠাকুর নিজহইতেই আবার বলিতে লাগিলেন,— **"মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা কর্‌বে, স্থির ভাবে বিচার ক'রে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাজই করা সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য্য ধ'রে কার্য্য কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম,— "আমাদের সাধন কি? নামজপ করাই কি সাধন?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নাম জপ করাকে সাধন বলে না। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নাম গুরুশক্তি প্রভাবে, আপনা আপনি অনন্ত কাল চল্‌বে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিচার ক'রে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই যথার্থ সাধন। সকল বিষয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই সাধন।"**

বিচারপূর্ব্বক কার্য্যের কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,— "সাধক সাধনের অবস্থায় তো সমস্ত কার্য্যই বিচারপূর্ব্বক কর্‌বে। সিদ্ধ হ'লে কি আর বিচার ক'রে কার্য্য কর্‌বে না?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"সিদ্ধ পুরুষের কাছে যেসকল বিষয় আস্‌বে, তিনি তা ভগবানের সম্মুখে নিয়ে ধর্‌বেন। যেসব বিষয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ সুস্পষ্টরূপে পড়েছে দেখ্‌তে পাবেন, তাহাই কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর্‌বেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সমস্ত কাজই ভগবানের ইঙ্গিত অনুসারে করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ ইচ্ছায় কিছুই করেন না। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পশ্চাতে দাঁড়ায়ে নিশান ধরেন মাত্র।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম,— "ধর্ম্ম যথার্থই প্রকৃতিগত হয়েছে কি না কিসে বুঝ্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একপ্রকার থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার উত্তাপ নষ্ট হয় না, সেইপ্রকার আপদে বিপদে, আনন্দে উল্লাসে, কোন অবস্থায়ই যাহার**

ধৈর্য্য নষ্ট না হয়, সত্য ও ধর্ম্ম একই রকম থাকে, বিনয় ও সমতার কিছুমাত্র ভাবান্তর না হয়, তাহারই ঐসকল ধর্ম্ম প্রকৃতিগত হয়েছে জান্‌বে। সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাক্‌লে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে বুঝ্‌বে। বিপদে সম্পদে, নিন্দাতে ও প্রশংসাতেই মানুষের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে কিনা পরীক্ষা হয়।"

এই সকল উপদেশের সময়ে ঠাকুর অনেক গল্প ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। ধর্ম্ম সহজ জিনিস নয়, এ জীবনে কি আর তাহা লাভ হইবে?

ভাব বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য উপদেশ।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান্, খ্রীষ্টান্ প্রভৃতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য অবস্থাপন্ন লোকসকলও সাধন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে কিছুকাল একস্থানে বাস করায়, সময়ে সময়ে আচার ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক, কলহ, বাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ও নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মতামতের ও আচার ব্যবহারেব বিরোধ মীমাংসার জন্য, সময়ে সময়ে উভয় পক্ষই স্পর্দ্ধার সহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হন। সাধারণের, সাধারণ অনুষ্ঠানের উপরে কেহ কিছু করিলেই তাহা অসার প্রতিপন্ন করিতেও ঠাকুরের নিকটে কত সময়ে কত প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু সমস্যার ভিতরে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যভাবে প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

আজ ঠাকুর সকলকে বলিলেন,— **"সকলরেই অবস্থায় সহানুভূতি কর্‌তে হয়। অন্যের মতের সঙ্গে অনৈক্য বা অবস্থার সঙ্গে অমিল হ'লেই, তাহা একেবারে উড়ায়ে দিতে নাই। অন্যের অবস্থার বিচার কর্‌তে হ'লে, ঐ অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব কর্‌তে হয়, এক ইঞ্চি তফাৎ থাক্‌লেও একজনের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, দোষ বা গুণ অন্য জনে ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। মতের অনৈক্য, অবস্থার পার্থক্য, এ সমস্ত তো সংসারে চিরকালই থাক্‌বে। ভগবানের রাজ্যে কোনও দু'টি বস্তুই ঠিক একমত নয়। কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য থাক্‌বেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যেও একটি সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। যত দিন মানুষ তাহা দেখ্‌তে না পায়, তত দিনই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একপ্রকার হ'লে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য্যই থাকে না। নানাপ্রকারের ফুলগাছে বাগানের যেমন একটা চমৎকার শোভা হয়, শুধু এক প্রকারের গাছে সেই রকমটি কখনও হয় না। এ সংসারও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে এক সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। মানুষ যখন তা দেখ্‌তে পায়, তখন সমস্ত বিরোধই ছুটে যায়, প্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতরে ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টিশৃঙ্খলা ও অদ্ভুত কৌশল দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও পরমানন্দ লাভ করে। কিছুতেই তারা আর বিচলিত হয় না; অশান্তি ভোগ করে না। নিজের স্থানে নিজে ঠিক থেকে অন্যের অবস্থা মাত্র দেখে যেতে হয়; তবেই ক্রমে শান্তি।**

"সব্‌ছে রসিয়ে, সব্‌ছে বসিয়ে, সব্‌ছে লীজিয়ে কাম,
হাঁ জী, হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে, বৈঠিয়ে আপন ঠাম।"

দুর্গাচরণবাবুর প্রতি ফকিরের অত্যাচার। সম্পূর্ণ ক্ষমার স্থলে ভগবানের দণ্ড।

আমাদের গুরুভ্রাতা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাহা মহাশয় ফকিরদের সঙ্গে কিছুদিন মিশিয়া কতগুলি বুজ্‌রুকী শিখিয়াছেন। সময়ে সময়ে দুর্গাচরণ, ঠাকুরের নিকটেও ঐসকল বুজ্‌রুকী দেখাইয়া খুব আমোদ করেন। আমরাও খুব আমোদ পাই, তামাসা করি। গাঁজা খাইতে আমাদের সকলের নিষেধ থাকিলেও, ফকিরদের চক্রে পড়িয়া দুর্গাচরণ গাঁজা খাইতে বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন দুর্গাচরণকে বলিলেন, —"দুর্গাচরণ, গাঁজাটা কেন খাও?" দুর্গাচরণ একটু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"আপনারা সাধারণতঃ যেসব স্থলে বিচরণ করিতেছেন, তাহা হইতে একটু উপরে উঠিতে হইলেই, গাঁজায় একটু দম দিয়া নিতে হয়।" গাঁজা খাইলেও দুর্গাচরণ অতিশয় বিনীত ও নিরীহ প্রকৃতির ভাল মানুষ। গেণ্ডারিয়ার একটি প্রভাবশালী ফকিরকে দুর্গাচরণ প্রত্যহ দু'চার পয়সার গাঁজা দিয়া থাকেন। দিন দুই হইল দুর্গাচরণের হাতে পয়সা না থাকায় তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফকির সাহেবকে গাঁজা দিতে পারেন নাই। তাই একটু ভীত হইয়া, আশ্রমে আসিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব সময়ে গাঁজা না পাইয়া দুর্গাচরণকে তালাস করিতে করিতে অপরাহ্নে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের নিকটে দুর্গাচরণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন। হাতে একখানা বেত ছিল, তাহাদ্বারা অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় সজোরে দুর্গাচরণের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আরে শালা গুরুকা সাম্‌নে আয়্‌কে বৈঠা হ্যায়! তুঝ্‌কো মার্‌নেছে তেরা গুরু.হামারা ক্যা করেগা?" দুর্গাচরণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ফকির সাহেবকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া, মার খাইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর দুই একবারমাত্র ফকিরের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। ফকির সাহেবও খুব দম্ভের সহিত হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া দুর্গাচরণকে বলিলেন,— **"দুর্গাচরণ, ফকির সাহেব অন্যায়রূপে তোমাকে এত প্রহার করলেন, আর তুমি চুপ ক'রে র'লে, একেবারে কিছুই বল্‌লে না!"**

দুর্গাচরণ বলিলেন— "প্রভো! আপনার সাক্ষাতে আমি কিরূপে উহাকে বল্‌ব? আমি তো ঠাকুরের-ই উপরে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

ঠাকুর বলিলেন,— **"আহা! ওরূপ কর্‌তে নাই। প্রতিফল দিতে সমর্থ হ'য়েও অত্যাচার ভোগ ক'রে যাঁরা ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দেন, তাঁরা অত্যাচারীর দফা শেষ করেন।**

আশ্রম হ'তে বাহির হ'য়েই ফকির সাহেব কি বিষম বিপদে প'ড়েছেন, অনুসন্ধান নিলেই সমস্ত জান্‌তে পারবে।"

দুর্গাচরণ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া, ফকির সাহেবের অনুসন্ধান নিলেন; পরে আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "ফকির সাহেব বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে লোহার পুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে অনর্থক গালাগালি করিতে থাকেন। নিকটে পাহারাওয়ালা ছিল, সে ফকির সাহেবকে গালাগালি করিতে নিষেধ করায় ফকির সাহেব কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা পুলিশকে কয়েক ঘা আঘাত করেন; তাহাতে দু' চারজন পাহারাওয়ালা একত্র হইয়া উঁহাকে ধরিয়া নিয়া যায়। আজ শুনিলাম, ফকির সাহেব পাগল হইয়াছেন অনুমানে, তাঁহাকে ঐ দিন পাগ্‌লা গারদে দেওয়া হয়। জেলের দারোগা এবং ডাক্তারের নিকট নীত হইলে, ফকির সাহেব নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় তাঁহাদিগকে গালি দেন। এই অপরাধে সেইদিন হইতে তাঁহার উপর প্রত্যহ সকালে ও বিকালে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশ ঘা বেতের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন ফকির সাহেব বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন।" ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং ফকির সাহেবের মুক্তির জন্য কয়েকটি ভদ্রলোককে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল পদস্থ লোকের চেষ্টায় অচিরেই ফকির সাহেব কারামুক্ত হইবেন।

দুর্গাচরণ ফকির সাহেবের প্রতিশোধ নিলে, তাঁহার আর এই বিষম দুর্দ্দশা ঘটিত না অনুমানে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেহ অন্যায়রূপে অত্যাচার করিলেই কি তার প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত?"

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,— **"রাম! রাম!! প্রতিহিংসা কি আর মানুষে নেয়, অত্যাচারীকে সর্ব্বদাই ক্ষমা কর্‌বে; অত্যাচারীর মঙ্গল আকাঙ্খা কর্‌বে। তবে যিনি অত্যাচার করেন, তাঁরই কল্যাণের জন্য, ভিতরে সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শান্তি রেখে, বাইরে একটু কৃত্রিম ক্রোধ দেখায়ে দু'চার কথায় কিছু শাসন ক'রে দিতে হয়। ইহাতে প্রতিফলও দেওয়া হ'ল, অত্যাচারীকে বিষম দণ্ড হ'তে রক্ষাও করা হ'ল। সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা ক'রে ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দিলে, অত্যাচারীকে অত্যন্ত দণ্ড পেতে হয়। গয়াতে এরূপ একটি ঘটনা হয়েছিল! গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, তখন কিছুদিন একটি পরমহংসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একদিন, পরমহংসের একটি শিষ্য, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ক'রে, দ্বাদশীর দিনে সকালে উঠে ফল্গুতে যেয়ে স্নান কর্‌লেন; বিষ্ণুপদ দর্শন কর্‌তে একটু বিলম্ব হ'ল। সঙ্গে তিনি একটি গোপাল ঠাকুর সর্ব্বদাই রাখ্‌তেন। দ্বাদশীর পারণের সময় অতীত হ'য়ে যেতেছে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন, এবং তাড়াতাড়ি একটি ময়রার দোকানে উপস্থিত হ'য়ে দোকানদারকে বল্‌লেন,—'পারণের সময় চলে যেতেছে, আমাকে একটু মিষ্টি দেও, গোপাল ঠাকুরকে ভোগ চড়ায়ে আমি একটু জল খাব।' দোকানদার তাঁর কথায় কর্ণপাতই কর্‌লে না। সাধু তিন চারবার চেয়েও, 'হাঁ, না' কোনও উত্তর না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে একখণ্ড বাতাসা নিতে যেমনি হাত বাড়ালেন, অমনি দোকানদার ও তার ছেলে, দোকান**

থেকে লাফায়ে রাস্তায় প'ড়ে সাধুকে ধ'রে দারুণ প্রহার কর্‌তে লাগ্‌ল। পূর্ব্বদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে সাধু কাতর ছিলেন, তার উপরে এইরূপ প্রহার, একেবারে প'ড়ে গেলেন। রাস্তার লোকেরা বহু চেষ্টায় সাধুকে ছাড়ায়ে দিলেন। সাধু, দোকানদারদের একটি কথাও না ব'লে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি ক'রে একটু হেসে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন,—"ভালারে, দয়াল গুরুজী, তেরা লীলা!" এইমাত্র ব'লে সাধুটি পাহাড়ের দিকে চ'লে গেলেন। পরমহংসজী পাহাড়ে একটি চটানের উপর স্থিরভাবে বসেছিলেন, হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন, এবং চটান হ'তে লাফায়ে নীচে প'ড়ে খুব দ্রুতবেগে গোদাবরী নামক রাস্তার দিকে ছুটে চল্‌লেন। রাস্তার ধারে শিষ্যকে দেখে পরমহংসজী বল্‌লেন, "ক্যা রে বাচ্চা? ক্যা কিয়া?" শিষ্য বল্‌লেন, 'মৈ তো কুছ্‌ নেহি কিয়া, গুরুজী!' পরমহংসজী বল্‌লেন,— 'বহুৎ কিয়া। বড়া বুরা কাম্‌ কিয়া। রামজীকা উপর বিল্‌কুল্‌ ছোড়্‌ দিয়া। আকে দেখো, রামজী উস্কা ক্যায়্‌সা হাল্‌ কিয়া।' এই ব'লে শিষ্যটিকে নিয়ে পরমহংসজী ময়রা-দোকানের ধারে যেয়ে উপস্থিত হ'লেন। দেখ্‌লেন— ময়রার সর্ব্বনাশ হয়েছে। সাধুকে মেরে ময়রার ছেলে জ্বালানি কাঠ আন্‌তে যেমনি কাঠের ঘরে ঢুকেছিল, অমনি একটি কেউটে সাপ উহাকে দংশন করে। ময়রা ঘি জ্বাল দিতেছিল, সর্পাঘাতে ছেলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে শুনেই, উনুনের উপর ঘি রেখে দৌড়িয়ে যেয়ে ছেলেকে ধর্‌ল, আর টানাটানি ক'রে ছেলেকে রাস্তায় এনে ফেল্‌ল। এদিকে উনুনের ঘি জ্ব'লে ময়রার ঘরের চালা ধর্‌ল। পরমহংসজী যেয়ে দেখ্‌লেন, রাস্তায় ছেলেটি মড়ার মত প'ড়ে আছে, ঘরগুলি হু হু ক'রে জ্ব'লে যেতেছে, রাস্তায় লোক দাঁড়ায়ে হাহাকার কর্‌ছে। বিষম ব্যাপার! পরমহংসজী শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে এলেন, শিষ্যকে খুব গাল্‌ দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন— "বিনা অপরাধে কেহ অত্যাচার কর্‌লে, ক্রোধ না হ'লেও মুখে অন্ততঃ একটা গালি দিয়ে আস্‌তে হয়। মানুষে সামান্য প্রতিফল দিলেও অত্যাচারী রক্ষা পায়, রামজীর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিলে, রামজী গুরুতর শাস্তি দেন। ভগবানের দণ্ড বড়ই বিষম।"

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমের অবস্থা।

বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে নানাদেশ হইতে দীক্ষাপ্রার্থী বহু লোক দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে শত শত স্ত্রীলোক ও পুরুষের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার সময়ে গুরুভ্রাতাভগ্নীদের উপরে পরলোকগত বিবিধ অবস্থার আত্মার আর্বিভাব হইয়া থাকে। এই সময়ে উঁহাদের নানা প্রকারের ভাবোচ্ছ্বাস ও অদ্ভুত কথাবার্ত্তা, স্তবস্তুতি, কান্না অনুতাপ এবং অবস্থার বিচিত্রতা দেখিয়া, একেবারে অবাক্‌ হইয়া যাই। নিয়ত নবাগত লোকের সমাগমে, প্রায় দেড়মাস যাবৎ এই আশ্রম সর্ব্বদাই যেন সর-গরম হইয়া রহিয়াছে। দিন রাত্রে লোকের উৎসাহ উদ্যমের বিরাম নাই; আনন্দের একটা স্রোত যেন একটানা চলিতেছে। আহারনিদ্রা বাদে, অবশিষ্ট সময় গুরুভ্রাতারা উল্লসিত প্রাণে ঠাকুরেরই সঙ্গ করিতেছেন। ঠাকুরের নিকটে বসিয়াই সকলের আনন্দ, তাঁর কথাতেই সকলে পরিতৃপ্ত, তাঁর দর্শনেই সকলে মুগ্ধ এবং ঝগড়া বিবাদেও, দেখিতেছি, মাত্র তাঁহারই প্রসঙ্গ।

এসময়ে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ।

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে কিছুদিন যাবৎ এখন আর ঘরের বাহিরে টেঁকা যায় না। আহারান্তে মধ্যাহ্নে ঠাকুর পূবের ঘরে বসিয়া থাকেন। একরামপুর হইতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াই, ঠাকুর পূবের ঘরে উত্তর দিকে দক্ষিণমুখ হইয়া আসন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনবাসকালে গেণ্ডারিয়ার গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের আসনের স্থানটি পাকা গাঁথাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া পাকা গাঁথুনির উপর আর বসেন নাই, ঐ ঘরের দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখ হইয়া আসন করিয়াছেন।

ঠাকুর অতি প্রত্যূষে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। শৌচান্তে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আশ্রমেরই ভিতরে, আমতলার দিকে পা-চালি করেন। পরে কখনও সাধন-কুটীরে, কখনও বা পূবের ঘরে আসনে আসিয়া বসেন। প্রায় সাতটার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়, ভাবে গদগদ হইয়া, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। এই পাঠ শুনিতে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন। আমি কিন্তু শুধু ঠাকুরকে দেখিতে এবং ঘোষ মহাশয়ের অবস্থা লক্ষ্য করিতেই ঘরে গিয়া বসি। চরিতামৃত গ্রন্থ নমস্কার করিয়া গৌরচন্দ্রিকা পাঠ করিতে করিতেই কুঞ্জবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া পড়ে। কিছু কিছু পাঠ করিয়াই পুলকাশ্রুকম্পনে তিনি অবসন্ন হইতে থাকেন। চরিতামৃতের কোন শ্লোকই পরিষ্কাররূপে উচ্চারণ করিবার তাঁহার আর ক্ষমতা থাকে না। ঠাকুর, ঘোষ মহাশয়ের ভাববিহ্বল গদগদ স্বর শুনিয়াই, যেন ডুবিয়া যান। এই পাঠ শেষ হইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। পরে ঠাকুর নিজেই গ্রন্থসাহেব এবং আরও কয়েকখানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া যায়। এগারটার পরেই ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া শৌচে যান। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গা ধুইয়া আসনে আসেন। তিলকসেবা ও ঔষধ সেবনাদিতে প্রায় বারটা হয়।

মধ্যাহ্নে প্রায় বারটার সময়ে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। তাঁহার ভোজনের পরেই মহাভারত পাঠ আরম্ভ করি। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল মহাভারতপাঠ হয়। পরে ঠাকুর সিদ্ধাসনে স্থির ভাবে বসিয়া থাকেন। এ সময়ে বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে ঘরে কেহ প্রবেশ করেন না; কথাবার্ত্তা বন্ধ থাকে। ঠাকুর একখানা পুস্তক হাতে মাত্র রাখিয়া চোখ বুজিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত এক ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইয়া, পরিধেয় বহির্বাস পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। ঠাকুর আবেশে, দেহ স্থির রাখিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকেন। পনের বিশ মিনিট কাল এক একবার সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসেন। প্রত্যহই প্রায় পাঁচটা পর্য্যন্ত এইভাবে কাটিয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলে আসন আমতলায় নিয়া পাতিয়া দেই।

অপরাহ্নে সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হন। আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। আমি এই সময় আহারের চেষ্টায় থাকি; সুতরাং এই সময়ের কোন ঘটনাই বিশেষরূপে সাক্ষাৎভাবে জানি

না। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত মহা আনন্দ উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় দশটার সময়ে ঠাকুরের রুটি তরকারি হালুয়া প্রভৃতি ভোগ হয়। আহারান্তে রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত ঠাকুর একভাবে একাসনে বসিয়া থাকেন। চারিটার পর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শয়ন করেন। যোগজীবন প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা রাত্রিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকেন। প্রায় পাঁচটার সময়ে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া ভোরকীর্ত্তন করেন। দিন রাত্রি ঠাকুর এইভাবে অতিবাহিত করিতেছেন।

আষাঢ়।

পরমহংস গৌর শিরোমণির দৃষ্টান্ত— দোষে গুণদর্শন।

জিজ্ঞাসা করিলাম,— "পবমহংস কাহাকে বলে?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"দুধে জলে মিলায়ে হংসের নিকটে ধর্‌লে, হংস জলের অংশ ত্যাগ ক'রে, শুধু দুধের অংশই গ্রহণ করে। সেইরূপ এই অনিত্য মিথ্যা সংসারে যাঁহারা কেবল সার সত্যই গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পরমহংস। পরমহংসেরা কেবল সারই গ্রহণ করেন, গুণই দেখেন; দোষ কখনই তাঁহারা দেখেন না। পরমহংসেরা সর্ব্বদাই গুণগ্রাহী হন।"**

আষাঢ়, ১লা—১৫ই।

পরমহংসদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের গৌর শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিলেন,— **শ্রীবৃন্দাবনে একটি বিষয়বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বহুকাল নির্জ্জনে ভজন সাধন ক'রে পরমানন্দে ছিলেন। ভগবানের চক্র! একবার তাঁর স্ত্রীসঙ্গ হ'লো। বৈষ্ণবসমাজে এই কথা প্রচার হ'য়ে পড়ায়, সর্ব্বত্র তাঁর নিন্দা আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। পতিত হয়েছেন ব'লে, বৈষ্ণবসমাজ ঘৃণার সহিত তাঁর সংস্রব ত্যাগ কর্‌লেন। গৌর শিরোমণি মহাশয় এই কথা শুন্‌তে পেলেন। একদিন শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে মহোৎসব। সমস্ত বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হলেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বৈষ্ণব সাধুটিকেও নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। সেবার সময়ে আর আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌তে ঐ সাধুটিকেও তিনি অনুরোধ কর্‌লেন। তখন সমস্ত বৈষ্ণব, শিরোমণি মহাশযকে বল্‌লেন, "প্রভো! আপনি যা বল্‌বেন বা কর্‌বেন তাই আমাদের শিরোধার্য্য। তবে আমাদের প্রার্থনা যে, এঁর সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বস্‌তে আদেশ কর্‌বেন না। ইনি বিষম কুকর্ম্ম ক'রে পতিত হয়েছেন।" শিরোমশি মহাশয় করজোড়ে সকলকে নমস্কার ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন,—"আপনারা এরূপ কথা আর বল্‌বেন না। ইনি মহাত্মা। আমাদের প্রতি ইঁহার বড়ই দয়া। এইরূপ একজন মহাত্মা পুরুষও যদি ঐরূপ একটা গর্হিত আচরণ করেন, সমাজে তাঁকেও যে কত লাঞ্ছনা, নিন্দা, অপমান ও ঘৃণা ভোগ কর্‌তে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রতি দয়া করেই, ইনি এই বিষম ভোগ স্বীকার করেছেন।" এই ব'লে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে ঐ দীনভাবাপন্ন কাতর বিরক্ত সাধুকে নমস্কার কর্‌লেন এবং সকল বৈষ্ণবকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—"আমাকেও আপনারা ত্যাগ করুন; সত্যি সত্যি বল্‌ছি, আমি**

এঁর চেয়েও অনেক অপরাধের কার্য্য করেছি।” এই ব'লে তিনি নিজ জীবনের অতীত ঘটনা সকল বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তখন সকল বৈষ্ণব, কাণে হাত দিয়া, “প্রভো, থামুন্ থামুন্” বল্‌তে বল্‌তে সাধুকে নিয়ে এক পংক্তিতে সেবা কর্‌তে বস্‌লেন। কেহ গুণেও দোষ দেখেন; কেহ বা গুণকে গুণ, আর দোষকে দোষ দেখেন; কারও চক্ষে আবার দোষই পড়ে না; দোষেও তিনি গুণই দেখেন। সকলই অবস্থাতে হয়।

সাধকজীবনে দুর্দ্দশা। অসারত্ববোধই নির্ভরের হেতু।

একদিন পাঠান্তে ছোট দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন,— “রাধাকৃষ্ণসংবাদে রাধা কি জীবাত্মা, না অন্য কিছু?”

ঠাকুর বলিতে বলিলেন,— “এ সকল বিষয় অত্যন্ত দুরূহ, এখন বল্‌লে এ সব বিষয় কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বে না। অসময়ে বল্‌লে, অবস্থা না হ'লে, ভাবার্থ কেহ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারে না; কথার বিকৃত অর্থ ধ'রে নিয়ে, আত্মার অনিষ্ট করে, আর বর্ণিত বিষয় দূষিত করে; দেখ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত লিখে জীবগোস্বামীকে নিয়ে দিলেন। জীবগোস্বামী মহাশয়, ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, উহা প্রচার কর্‌তে নিষেধ ক'রে বল্‌লেন—যদিও এ গ্রন্থদ্বারা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে, তথাপি ইহাদ্বারা সাধারণ জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই হবে না।

সর্ব্বদা নাম কর্‌তে থাক, ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খুলে যাবে। তখন চৈতন্য কে, খৃষ্ট কে, লীলা কি, আপনা আপনি প্রকাশ হবে। সাধন কর্‌তে কর্‌তে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই সকল অবস্থা লাভ কর্‌তে হ'লে প্রথম কর্ম্ম কর্‌তে হয়, খুব সাধন কর্‌তে হয়। এ সময় লোভমোহাদি রিপুসকলদ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে, সাধক পুনঃপুনঃ বিষম পরীক্ষায় পড়্‌তে থাকেন; কখনও পরীক্ষায় পরাজিত হন, আবার কখনও বা জয়লাভ করেন। সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানি নৌকা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাক্‌লে, সে যেমন কখন ঊর্দ্ধে কখন বা নীচে তরঙ্গের সঙ্গে উঠে নেবে চল্‌তে থাকে, সাধকও সেইরূপ নানা অবস্থার পরীক্ষাতে উঠে প'ড়ে চল্‌তে থাকেন। এই পরীক্ষার সময়ে অনেক সাধকই সাধন ভজন একেবারে ছেড়ে দেন। নানাপ্রকার ক্লেশ, অশান্তি, শুষ্কতা ও নৈরাশ্যে প'ড়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে যান, কিন্তু সারা দিনে যদি এই সময়ে অন্ততঃ চার পাঁচটি বারও নাম কর্‌তে পারেন, কোন না কোনপ্রকারে উদ্ধার পান। এই বিষম দুঃসময়ে নামস্মরণই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এইরূপ পরীক্ষা প্রলোভনে পতিত হওয়াও উন্নতির একটি লক্ষণ। অনেকের দুই তিন জন্ম পর্য্যন্ত এসমস্ত পরীক্ষাই জীবনে আসে না। দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনের অবস্থাতে এ সকল প্রলোভন পরীক্ষায় না পড়্‌লে, নিজেকে শোচনীয় অবস্থাপন্ন মনে কর্‌তে হয়। এই সকল পরীক্ষায় প'ড়েই মানুষের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই সব দুরবস্থায় প'ড়ে নিজেকে যখন একেবারে অপদার্থ জ্ঞান হয়, 'নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, নিজ শক্তিতে একটি

সামান্য তৃণও তুল্‌তে পারে না' মানুষে বুঝে, ভক্তি তখন হ'তেই বিকশিত হ'তে থাকে। আত্মশক্তি অসার হ'তেও অসার; একমাত্র "ভগবচ্ছক্তিই সার" বুঝ্‌লে, তখন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে, এবং ভগবানের কৃপায় তখন তার হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বও প্রকাশিত হ'তে থাকে।" কিছুকাল পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন,— **"অহঙ্কারটি নষ্ট হ'লে শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমানাদি কিছুরই আর বোধ থাকে না; কারণ আমিত্ব থাক্‌লেই এই সব থাকে। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হ'য়ে যায়, তখন সুখ দুঃখ যা কিছু তাদের উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ভগবানই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তদের সে সব কিছুই ভোগ কর্‌তে হয় না। এই নিয়মেই প্রহ্লাদ অগ্নি, জল, হস্তী ইত্যাদি হ'তে অনায়াসে রক্ষা পেয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্তেরা ইচ্ছা কর্‌লে অনায়াসেই সমস্ত ভোগ হ'তে মুক্ত থাক্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও তা করেন না। ভক্তেরা সমস্ত ভোগ নিজেরাই করেন। প্রকৃতির মধ্যেও এই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, যদি পরস্পর এক জনে অন্য জনকে যথার্থ ভাল বাসে, তবে একের কষ্ট হ'লে অন্যেও তা ভোগ করে; একের শরীরে বেত মারলে, অপরের শরীরেও তার চিহ্ন পড়ে।"**

ঐকান্তিক ভালবাসার পরিণাম শুভ—দুইটি দৃষ্টান্ত।

একদিন মহাভারতপাঠের সময়ে অনেক লোক উপস্থিত হইলেন। পাঠান্তে অনেক কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। সরলপ্রাণে একান্তভাবে সমস্ত চিত্ত একটি স্থানে বসাইতে পারিলে, তাহাহইতেই ক্রমে পরমবস্তুলাভের উপায় হয়। এমন কি, একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়াও জীবনের যথার্থ কল্যাণ লাভ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে, ঠাকুর্ দুইটি গল্প বলিয়াছিলেন, যথা—

"কলিকাতা তালতলায়, কোনও ষ্টুডেন্টস্ মেসের পাশে, একটি সাহেবের বাসা ছিল। সাহেবের একটি অববাহিতা যুবতী কন্যা ছিল। মেসের কোনও ছেলের নজর তাহার উপরে পড়িল। কিছু দিন পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। একদিন ছেলেটি স্থির থাকিতে না পারিয়া, সাহেবের বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সে দিন সাহেব টের পাইয়া উহাকে খুব ধম্‌কাইয়া দিলেন। কয়েক দিন পরে আবার একদিন ছেলেটি সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করায় ধরা পড়িল। সেই দিন সাহেব, দ্বারওয়ান্ দ্বারা কিছু অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মেয়েটির ভাব-গতিক দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন অবস্থা সহজ নয়। মেয়েটিকে অবিলম্বে তফাৎ করা আবশ্যক মনে করিয়া, সাহেব একদিন মেয়েটিকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ছেলেটি তাহা বুঝিতে পারিয়া, রাস্তায় যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব গাড়ী আনাইয়া মেয়েটিকে লইয়া যেমন তাহাতে চাপিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি ছেলেটি দৌড়িয়া গিয়া মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল। সাহেব তখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ছেলেটিকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। মেয়েটি তখন সাহেবের লাঠি ধরিয়া মার থামাইয়া দিয়া পিতাকে বলিল, "তোমার ব্যবহার তো ভয়ানক কসাইয়ের মতন দেখিতেছি! কি দোষ পাইয়া উঁহাকে এরূপ দারুণ প্রহার করিলে? বহুকাল উনি আমাকে ভাল বাসিয়া আসিতেছেন,

আমিও উঁহাকে মনে প্রাণে ভালবাসি। ওঁর কোনও অপরাধ নাই।"— ইত্যাদি বলিয়া মেয়েটি সাহেবের সঙ্গে খুব ঝগড়া করিতে লাগিল। সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়া, কন্যাটিকে লইয়া ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিলেন।

এদিকে ছেলেটি সাহেবের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল; পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া 'সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল?' বলিতে বলিতে চারি দিকে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে একটি ভাল ফকির, ঐ অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া, উহার পিছন ধরিলেন। অবসর বুঝিয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন। ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফকির সাহেবকে বলিল, 'ফকির সাহেব! আমাকে দয়া করুন। তাকে পাই, আর না হারাই, এমন উপায় বলিয়া দিন্।' ফকির সাহেব ঐ সময়ে ছেলেটির কাণে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এই মন্ত্র তুমি অবিশ্রান্ত জপ কর, আর মনে মনে সেই মেয়েটির মূর্ত্তি ধ্যান কর।' এই বলিয়া, ছেলেটিকে বাজারের মধ্যে একটি বটগাছের তলায় বসাইয়া দিলেন। ছেলেটি তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় একাসনে থাকিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, মন্ত্রজপসহ মেয়েটির রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। ওদিকে মেয়েটিও, ছেলেটির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তের মত হইয়া, একদিন বাহির হইয়া পড়িল, এবং খোঁজ করিতে করিতে অনুসন্ধান পাইয়া, ছেলেটির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তখন ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে, যার জন্যে এত ক্লেশ পাইয়াছ, সে যে আসিয়াছে, এখন চোখ্ মেল।" ছেলেটি কণ্ঠস্বর শুনিয়া একপাশে তাকাইয়া তাহাকে দেখিল, আবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ব্যস্ততার সহিত দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল, "এ আবার কি? তুমি? না, তুমি? আমি ত দু'টি একই আকৃতি দেখিতেছি। কাল থেকে সর্ব্বদাই তো তুমি আমার নিকট রহিয়াছ। আবার তুমি কে?" সাহেবের মেয়েটি, কিছুক্ষণ উহার ভাবগতিক দেখিয়া, অবশেষে ছেলেটি পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া চলিয়া গেল। ফকির সহেবের মন্ত্রপ্রভাবে এবং ছেলেটি একান্তচিত্তে ধ্যান ও মন্ত্রজপ করাতে, ভগবান্ই তাহার নিকট মেয়ের রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।"

এই গল্পটির পরে ঠাকুর বলিতে বলিলেন— **"স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে, একান্তপ্রাণে একচিত্তে বস্‌তে পার্‌লেই তো হয়। তা কি আর সহজ কথা? তা আর হয় কই? প্রকৃত সৌহার্দ্দ আজকাল বড়ই দুর্ল্লভ। এক জনে অন্য জনকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে, এ বড় দেখা যায় না। অনেক দিন হ'ল শান্তিপুরে একটি ঘটনা দেখেছিলাম। সেরূপ ঘটনা এখন আর শুনা যায় না।"**

ঠাকুর এই বলিয়া, ঘটনাটি এইরূপ বলিতে লাগিলেন— "শান্তিপুরের এক পাড়ার ভিতরে অল্পবয়সে একটি ছেলে ও মেয়েতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বয়স হইতে লাগিল, ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া নানা কুকথা বলিতে লাগিল। মেয়েটি একদিন ছেলেটিকে বলিল, 'দশ জনে নানা কথা বলিতেছে,

আর তুমি আমার নিকটে এরূপ এস না।' ছেলেটি ঐ কথা শুনিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেল; দিনরাত বিষম যন্ত্রণা পাইতে লাগিল। অবিলম্বেই মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেয়েটি যখন শ্বশুরবাড়ী চলিল, ছেলেটিও কাঁদিতে কাঁদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী ছেলেটিকে দেখিয়া বলিলেন— 'আহা! তুমি যদি কোনও দেবতাকে ঐরূপ ভালবাস্‌তে, তা হ'লে এতদিন উদ্ধার হ'য়ে যেতে। তুমি কোনও দেবতাকে ভালবাস?' ছেলেটি বলিল 'হাঁ, আমি রামকে বড় ভালবাসি।' সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়া, রামনাম জপ করিতে বলিয়া গেলেন। পাড়ার এক বাড়ীতে রামমূর্ত্তি আছেন; ছেলেটি প্রত্যহ সেখানে গিয়া, ঠাকুরের নিকট বসিয়া বসিয়া জপ করিত। জপের সময় ছেলেটির দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইয়া, সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে, খাবার নিয়া দুই তিন দিন রামজীর সম্মুখে বসিয়া কান্দিতেছে, তথাপি রামজী প্রসাদ করিয়া না দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটি বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।"

প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ।

আমাদের গুরুভাই বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় একটি পিতলের কমণ্ডলু লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহারান্তে, ঠাকুর আসনকুটীরে আসিয়া বসিবার পরে, রাজকুমারবাবু কমণ্ডলুটি লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এটি আপনার জন্য আনিয়াছি, আপনি এটি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।"

ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া সেটি হাতে নিলেন, এবং এদিক ওদিক দেখিয়া উহা মাটিতে রাখিয়া বলিলেন— **"আমার একটি কমণ্ডলু র'য়েছে, এটি নিয়ে অশ্বিনীকে দিন্। অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র নাই। আমার আর আবশ্যক নাই।"**

রাজকুমারবাবু আর জেদ না করিয়া কমণ্ডলুটি লইয়া গেলেন। আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম— **"গ্রহণ করিলেন এই ভাব দেখাইয়া, হাতে লইয়া আবার ফিরাইয়া দিলেন কেন? অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র আছে।"**

ঠাকুর বলিলেন— **"থাক্‌লেও ওটি অশ্বিনীকে দেওয়া ভাল। অশ্বিনীর ওটি নিতে ইচ্ছা হয়েছিল।"**

আমি বলিলাম— "নেওয়ার ইচ্ছা শুধু অশ্বিনীর কেন, অন্য লোকেরও ত হ'য়ে থাক্‌তে পারে।"

ঠাকুর বলিলেন— **"হ্যাঁ, তা হ'তে পারে। তবে একটি জিনিস দেখে সাধারণ ভাবে নেওয়ার ইচ্ছা এক, আর তাতে আসক্তি হওয়া স্বতন্ত্র কথা।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "কোন বস্তুতে কারও একটা আসক্তি হ'লে বস্তুটি মাত্র দেখে, তাহা কি প্রকারে জানা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"যার যে বস্তুতে আসক্তি হয়, ঐ বস্তুতে তার একটা আকৃতির ছাপ পড়ে। বস্তুটির দিকে তাকালেই ঐ আকৃতিটি বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনি যে কি বল্‌লেন, কিছু বুঝ্‌লাম না। স্বচ্ছ বস্তুর উপরে শুধু মানুষের কেন, সকল বস্তুরই তো প্রতিবিম্ব পড়ে। বস্তুটি সরায়ে নিলে আর তো প্রতিবিম্ব থাকে না। খুব স্বচ্ছ নির্ম্মল না হ'লে প্রতিবিম্বও তো পড়ে না। আর প্রতিবিম্ব পড়্‌লেও তাহা স্থায়ী হয় কই?"

ঠাকুর বলিলেন— **"স্বচ্ছ বস্তুতে শুধু নয়। মানুষ যে কোনও বস্তু দেখে, তাতেই তার একটা আকৃতি পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা সাধারণে চক্ষে দেখ্‌তে পায় মাত্র। আয়নার কাছে দাঁড়ালে চেহারা পড়ে, আর স'রে গেলে তা থাকে না সত্য; কিন্তু ফটো তুল্‌বার সময়ে, কাঁচে যে ফটো পড়ে, তাহা বদ্ধ হ'য়ে যায়, আর উঠে না। তার কারণ, কাঁচে যে আরক থাকে তাতেই আকৃতি বদ্ধ হ'য়ে পড়ে। সেইপ্রকার সাধারণ ভাবে সকল বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা স্থায়ী হয় না। আসক্তিরূপ আরক যে বস্তুতে লেগে থাকে, তাতে চেহারা পড়্‌লে আর উঠে না, থেকে যায়। চোখ্‌ যাঁদের একটু পরিষ্কার হয়েছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাঁরা তা দেখ্‌তে পান। এসকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'লেই মাত্র জানা যায়, না হ'লে শুনে কিছুই বুঝা যায় না। যে কোন বস্তুতে লোভ হবে, তাতেই আকৃতি বদ্ধ হ'য়ে পড়্‌বে, জেনো।"**

আমি এসকল কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইলাম। একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আসক্তিতে ক'রে বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কত কাল স্থায়ী হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"যত কাল যে বিষয়েতে আসক্তি থাক্‌বে, তত কালই তাতে আকৃতি স্থায়ী হবে। আসক্তি নষ্ট হ'লে, আকৃতিও আর থাকে না; ফটোর আরক নষ্ট হ'য়ে গেলে, যেমন আকৃতিও আর থাকে না।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "শাস্ত্রে নাকি আছে যে, বিষয়ে আসক্তিই সংসারাবৃত্তির কারণ? বিষয়ে আসক্তিহেতু যে আকৃতি পড়ে, তাহাতেই কি পরলোকগত জীবকে সংসারে টানিয়া আনে?

ঠাকুর বলিলেন— **"হ্যাঁ, তাও বটে। সংসারে আস্‌বার আরও সব গুরুতর কারণ থাকে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— " যে বিষয়ের সম্বন্ধে মনের যে প্রকার ভাব হয়, ঐ বিষয়েতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা কি সেই ভাবেরই অনুরূপ?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হ্যাঁ, ঠিক সেইরূপ।"**

আমি বলিলাম— "তবে তো বড় বিষম! গোপন ত কিছু করা যায় না!"

ঠাকুর বলিলেন— **"সাধ্য কি যে গোপন কর্‌বে, প্রকৃতিতে যে চেহারা আপনা আপনি নিয়ত পড়্‌ছে, তাতে আর কারও কি হাত আছে? যার চোখ্‌ আছে, প্রকৃতির দিকে তাকালেই তো মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র দেখে নিবে। গোপন কি আর কেউ কিছু করতে পারে!"**

সাধনের অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য।

অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "যথাসাধ্য সাবধানে থাকিয়া নিয়মমত সাধন করিয়া যাইতেছি— অথচ রিপুর উত্তেজনার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই তো দেখিতেছি। এইরূপ হইতেছে কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— "**তা হয়। যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন তাহা খুব প্রবল হ'য়ে উঠে; নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপের মত। ঐ সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে, অনেকের সাধন ভজনেও অবিশ্বাস এসে পড়ে। এই সময়টি বড়ই বিষম। সর্ব্বদাই প্রায় উন্মত্তের মত থাক্‌তে হয়। এই সময়ে গুরুদত্ত নাম যদি একেবারে ত্যাগ না করে, তা হ'লে কিছু কালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তীর্ণ হ'য়ে, উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে; না হ'লে বিষম দুরবস্থায় প'ড়ে যায়। নাম সর্ব্বদা কর্‌লে আর কোন ভয়ই থাকে না। কত অবস্থাতে পড়্‌তে হবে, তখন নামই একমাত্র অবলম্বন।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনাই যখন থাকে না, কোন প্রকার কল্পনাও যখন মনে একেবারে আসে না, তখন অকস্মাৎ ইন্দ্রিয় বিষম উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে কেন? এরূপ অবস্থায় কি করা যাইবে?"

ঠাকুর বলিলেন— "**স্নায়ুগুলি খুব দুর্ব্বল হ'লে, অনেক সময়ে ঐরকম হ'য়ে থাকে। ঐ সময়ে কখনও এক স্থানে ব'সে থাক্‌তে নাই, বেড়াইও; না হয় কারও কাছে যেয়ে গল্প ক'রো। আমার যখন ঐ রকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অম্‌নি মাথায় ঢেলে দিতাম; কখনও বা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়ে হয়রান্ হ'লেই ব'সে পড়্‌তাম। তোমার ঐ সময় স্নান বা দৌড়ান সহ্য হবে না, আসন হ'তে উঠে বেড়ায়ো, তা হ'লেই তোমার আর কোনও ক্ষতি হবে না।**"

গুরুদক্ষিণা, গুরুর আনুগত্য ও গুরুর সঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "পূর্ব্বকালে উপনয়নের পরে গুরুগৃহে থাকিয়া আপন আপন সঙ্কল্প বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, যখন শিষ্য গৃহে ফিরিতেন, গুরুদক্ষিণা দিয়া যাইতেন। আমাদের কি কোনও সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— "**মোক্ষার্থীদের আর গুরুদক্ষিণা নাই। যাঁরা গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন কর্‌তেন, তাঁরাই অধ্যয়ন শেষ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতেন। সদ্‌গুরু দীক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার ক'রে নেন্। তাঁকে আর গুরুদক্ষিণা দেবে কি? আমাদের ওসব নাই।**"

দীক্ষাদানমাত্রেই সদ্‌গুরু তো শিষ্যকে আপনার ক'রে নেন, কিন্তু শিষ্য যদি গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখেন, তা হ'লে আর বিশেষ লাভ কি হইল? গুরুর অনুগত হ'লেই গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ। তা না হ'লে আর গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যোগ কি? নানাপ্রকার সংশয়ে সর্ব্বদাই তো গুরুতে মতি চঞ্চল করিয়া দিতেছে, সুতরাং এখন আর উপায় কি?— এইরূপ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "গুরুর অনুগত কি উপায়ে হওয়া যায়?"

ঠাকুর বলিলেন— "**গুরুর অনুগত কি প্রকারে হওয়া যায়, তা বলা যায় না। বৃক্ষ কি উপায়ে বড় হয়, ফুল ফলে সুশোভিত হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? জল, উত্তাপাদি এসব পেয়ে বৃক্ষ বড় হয়, ফল ফুলে শোভিত হয়, এ পর্য্যন্তই বলা যায়; সেরূপ যথামত গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে কর্‌তে মানুষও তেমনি শ্রদ্ধাভক্তি আনুগত্য লাভ করে, এই মাত্র বলা যায়। ঠিক আদেশমত চল্‌তে চেষ্টা কর্‌লেই অনুগত যে কিরূপে হয় বুঝ্‌বে।**"

গুরুর নিকটে থাকিয়া গুরুতে নিয়ত ভগবদ্‌বুদ্ধি রাখা অতিশয় কঠিন। সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুরুতেও অনেক সময়ে চেষ্টা, কার্য্য ও ভুল ভ্রান্তি দেখা যায়। বরং তফাৎ থাকিয়া গুরুতে ভগবদ্‌জ্ঞান সহজ। এই সংশয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "গুরুর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁর সেবা শুশ্রূষা করাতে বেশী উপকার, না তফাৎ থাকিয়া তাঁর আদেশমত সাধন ভজন করাতে জীবনের অধিক কল্যাণ হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— "**সকলের পক্ষে একরূপ নয়। এক প্রকৃতির লোক আছে, গুরুর নিকটে থাক্‌লে ক্রমশঃ গুরুর প্রতি তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়; সুতরাং তেমন উপকার হয় না। আবার কারও গুরুর নিকটে থাকাতেই বেশী উপকার হয়; প্রকৃতি বুঝে। সকলের একরকম নয়। তবে গুরুর নিকটে থাক্‌লে ক্ষতি কারোরই হয় না; সেবা শুশ্রূষায় থাক্‌লে, বাৎসল্যভাবই কিছু বেশী হ'তে দেখা যায়।**"

ঠাকুরের কথায় এই বুঝিলাম যে, নিকটে থাকিয়া গুরুতে সন্দেহাদি হ'লেও বাৎসল্য ভাবে যে মমতা ও আকর্ষণ জন্মে, তাহা মহামূল্য। গুরুতে মমতা ও ভালবাসাই, তাঁহাতে সমস্ত সদ্ভাবারোপের হেতু হয়।

বিধিমার্গ ও চঞ্চলতা বিষয়ে উপদেশ।

একদিন নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "আমার কি আবার সংসারে আস্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— "**দেখ, খুব চেষ্টা ক'রে এবার সব সেরে নিতে পার্‌লে, আর আস্‌বে কেন? বাসনাটি জয় কর্‌তে পার্‌লে আর আস্‌তে হবে না। বাসনা থেকে গেলেই আবার আস্‌তে হবে।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "মোক্ষই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন বিধিপথে আর চল্‌বার প্রয়োজন কি?"

ঠাকুর বলিলেন— "**যতকাল ইন্দ্রিয়দমন না হয়, বিধিমার্গ ধ'রে চল্‌তেই হবে; কিন্তু ঐ সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র মোক্ষই থাক্‌বে। ইন্দ্রিয়দমনের জন্যই বিধিমার্গে চলা প্রয়োজন। অবস্থাটি হ'য়ে গেলে, আর নিজের জন্য বিধির আবশ্যক হয় না। ওটি না হওয়া পর্য্যন্ত বিধি মেনে চল্‌তেই হবে।**"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "পূর্ব্বকালে সমস্ত যোগী ঋষিরাই কি মোক্ষের সাধক ছিলেন, না অন্য ভাবেরও ছিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, অনেকে মোক্ষের সাধক ছিলেন, আবার অনেকে ত্রিবর্গের সাধকও ছিলেন। সকলে এক প্রকারের ছিলেন না; কত প্রকারেরই ছিলেন।"**

একদিন ছোট দাদা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "নাম করিবার সময়ে মন তো স্থির কিছুতেই হয় না, কি করিব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মন কি সহজেই স্থির হয়? মন স্থির হ'লে ত হ'য়েই গেল। প্রথম প্রথম মন খুব অস্থিরই থাকে, নাম কর্‌তে বিষম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এ সময় নাম ছেড়ে দিতে নাই; ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছাতেও নাম করতে হয়। জোর ক'রে এ সময়ে নাম না কর্‌লে হয় না। নাম কর্‌তে কর্‌তে একবার যদি উহা বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে যায়, তা হলে আর কোন মুস্কিলই থাকে না। নাম খুব অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়্‌তে নাই, সর্ব্বদাই খুব চেষ্টা রাখ্‌তে হয়। চেষ্টা খুব ক'রে যাও, ভগবানের কৃপায় সময়ে সবই হবে।"**

আসনের মর্য্যাদা।

আহারান্তে পূবের ঘরে বসিয়া, আজ ঠাকুর আমাকে একটি আসন দেখাইয়া বলিলেন— **"এই প্রকার আসন ক'রে সর্ব্বদা বস্‌তে চেষ্টা কর। এটি এমন অভ্যাস করবে যে, যেখানে সেখানে বস্‌তে হ'লেই যেন এই আসন ক'রে বস্‌তে পার।"**

আষাঢ়, ১৬ই —৩২শে।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "আসন কত প্রকার আছে? এই আসন কি সব চেয়ে ভাল?"

ঠাকুর বলিলেন— **"চৌরাশি লক্ষ জীব, আসনও চৌরাশি লক্ষ। তন্মধ্যে চৌরাশিটি প্রধান বলেছেন, এই চৌরাশি আসনের মধ্যে আবার পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার উপকারিতা অসাধারণ। সমস্ত আসনেরই একটা একটা প্রয়োজন আছে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "সাধু সন্ন্যাসীরা যেমন বস্‌বার স্বতন্ত্র আসন রাখেন, আমরাও কি সাধন ভজনের জন্য সেরূপ আসন রাখ্‌তে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এই সাধনা যাঁরা পেয়েছেন, ইচ্ছা করলে তাঁরা সকলেই স্বতন্ত্র আসন রাখ্‌তে পারেন। তবে আসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে, তা না নেওয়াই ভাল।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "আসনের মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষা কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"আসন নিয়মমত একটা স্থানে পেতে রেখে, প্রতিদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাতে ব'সে সাধন-ভজন কর্‌তে হয়। ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান, ঐ আসনে ব'সেই কর্‌তে হয়। অন্য কাকেও ওতে বস্‌তে দিতে নাই। অন্যে বস্‌লেই, আসনের গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। আসনের পবিত্রতারক্ষাই আসনের মর্য্যাদারক্ষা। আসন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখাতেই বেশী উপকার। আসন অল্প সময়ের জন্যও তুল্‌তে হ'লে, অন্ততঃ একটি তৃণও ঐ স্থানে ফেলে রাখ্‌তে হয়, আসনের স্থানটি কখনও একেবারে শূন্য রাখ্‌তে নাই।"**

জীবন্মুক্তের কথা— মৃত্যু ও অপমৃত্যু।

আজ মহাভারতপাঠের পরে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "যাঁহারা জীবন্মুক্ত হ'য়ে যান, তাঁহারা ইচ্ছা কর্‌লে আবার কি সংসারে আস্‌তে পারেন?"

ঠাকুর বলিলেন— "**হ্যাঁ, ইচ্ছা কর্‌লে আর পার্‌বেন না কেন?**"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সংসারে এলে, সংসারের পাপস্রোতে প'ড়ে তাঁদের কোনও অনিষ্ট হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন— "**অনিষ্ট কি তাঁদের আর হ'তে পারে? তাঁরা সংসারে এসে কিছুকাল সংসারের জন্য কার্য্য ক'রে চ'লে যান। সঙ্গদোষে প'ড়ে তাঁদের ভোগের ইচ্ছা হ'লেও, ওতে তাঁরা একেবারে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন না, উপর হ'তেই নানাপ্রকার বাধা আসে। তেমন দেখ্‌লে মহাপুরুষেরাই তাঁদের সরায়ে নিয়ে যান, যেমন লালের হয়েছিল।**"

আমি বলিলাম— 'লাল তো বিষ খেয়ে মরেছিল। অপমৃত্যু ঘটাতে কি তাকে দণ্ড পেতে হয় নাই?"

ঠাকুর বলিলেন— "**লাল বিষ খেয়েছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহূর্ত্তেই মহাপুরুষেরা মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে, ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌তে বলেন; তাতেই ওর অপমৃত্যু ঘটে নাই, কোন অপরাধেও পড়্‌তে হয় নাই; দণ্ডও হয় নাই।**"

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার বুঝিবার জন্য প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলিলেন—"**প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু এসে জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌লেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; আর অকস্মাৎ কোনও দুর্ঘটনায় জীবাত্মা দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বর্হিগত হ'য়ে গেলে, ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়। উহাই অপমৃত্যু; ওরূপ হ'লেই অসদ্গতি হ'য়ে থাকে।**"

রুদ্রাক্ষধারণের আদেশ; ব্রহ্মচর্য্যের জন্য উৎকণ্ঠা।

সকালবেলা আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া, এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। আজ দেবীভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন— "**তুমি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ কর্‌লে বিশেষ উপকার পাবে। ভাল পাকাদানা বড় বড় রুদ্রাক্ষ একশ আটটি আনায়ে নেও। কাশীতে ভাল রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। খাঁটি রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়। নিত্যহোম যাঁহারা ক'রেন, 'যোগপাট' তাঁদের ধারণ করতে হয়। একটি যোগপাটও আনিয়ে নেও।**"

ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কাশীতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী (তারাকান্ত গাঙ্গুলী) মহাশয়কে একশত আটটি বড় বড় খাঁটি রুদ্রাক্ষ এবং একটি যোগপাট পাঠাইতে লিখিলাম।

ঠাকুব আমাকে এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছিলেন। তাহা ত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই এক বৎসর কতপ্রকার বিষম প্রলোভন পরীক্ষাতে পড়িয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া তাঁরই অসাধারণ কৃপায় মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছি; উহা মনে হইলে, ভয়ে প্রাণ জড়সড় হয়; আতঙ্কে অস্থির

হই। ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ নিরাপদে পরমানন্দে দিন যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ত জানি না এই সৌভাগ্য আমার আর কত দিন। যদি কর্ম্মবিপাকে সঙ্গচ্যুতই হই, এ বৎসর আবার কোন্ মুখে, কি সাহসে, ঠাকুরের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য লইতে যাইব? এই ব্রতে অটল থাকিতে পারিব, ব্রতদানকালে এরূপ অভয় তিনিই দয়া করিয়া দিয়াছিলেন। এখন একান্তপ্রাণে অহর্নিশ নাম করিতে করিতে এই প্রার্থনাই করিতেছি, ঠাকুর আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে, এবারও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিয়ে, আমাকে তাঁর শান্তিপ্রদ শ্রীচরণের অনুগত সেবক করিয়া রাখুন।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম বৎসর অতীত।

আজ প্রত্যূষে স্নানান্তে জপ, হোম, প্রাণায়াম ও পাঠ সমাপন করিয়া, বেলা প্রায় নয়টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম— "আজ আমার ব্রহ্মচর্য্যের এক বৎসর পূর্ণ হইবে।"

৩২শে আষাঢ, বুধবার।

ঠাকুর বলিলেন— "**কাল থেকে আবার এক বৎসরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিও। নিয়ম যা ছিল তাই থাক্‌বে, বিশেষ কিছু আর কর্‌তে হবে না। ওসব নিয়মই আরও দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "আগামী বৎসরেও কি হোম কর্‌তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— "**হাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্‌বে। ব্রাহ্মণের জন্য ত নিত্যহোমের ব্যবস্থা। গায়ত্রী, হোম কি ত্যাগ কর্‌তে আছে?**"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "তর্পণ যেমন করিতেছি, এখনও কি তেমনই করিব?"

ঠাকুর বলিলেন— "**হাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্‌বে। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এ সব নিত্যকর্ম্ম; এর একটিও বাদ দিতে নাই। যথাসাধ্য এ সকল প্রতিদিনই কর্‌তে হয়।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম— "এ সব যজ্ঞ কি প্রকারে কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—

"ব্রহ্মযজ্ঞ— **ঋষিপ্রণীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ ইত্যাদি।**

পিতৃযজ্ঞ— শ্রাদ্ধতর্পণাদি; অন্ততঃ প্রতিদিনই তর্পণটি কর্‌তে হয়।

দেবযজ্ঞ— হোম, পূজা, যা ক'রে থাক।

ভূতযজ্ঞ— জীবসেবা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সর্ব্বজীবে সেবা— প্রতিদিনই কর্‌তে হয়।

নৃযজ্ঞ— অতিথিসেবা।

অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।।

এই সকল প্রতিদিন কেহ নিয়মমত ক'রে গেলে, কিছুদিনেই বুঝ্‌তে পারে এর কি উপকারিতা।"

শ্রাবণ।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ।

সকালবেলা ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিতেই ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"এবার আবার এক বৎসরের জন্য তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দেওয়া হ'লো। এ বৎসরে বিশেষ নিয়ম— পৃষ্ট না হ'য়ে কথা বল্‌বে না; জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ হ'লেই উত্তর দিবে; উত্তরটি যত সংক্ষেপে হয়, ততই ভাল; খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ই মাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌বে। এই মত চল্‌তে পার্‌লে খুব উপকার পাবে। পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ্‌বে। অন্ধকারেও ঐদিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে। তার পর নিত্য হোম কর্‌বে এবং অধিক পরিমাণে গায়ত্রী জপ কর্‌বে।"**

১লা শ্রাবণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "যে সব গ্রন্থ পাঠ ও যে ভাবে হোম এত দিন করেছি, ঠিক তেমনই কি কর্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"প্রত্যহ ভোরবেলা স্নান ক'রে এসে, চণ্ডী ও গীতা এক অধ্যায় ক'রে নিত্য পাঠ কর্‌বে। পরে কিছুকাল ইষ্টনাম জপ ক'রে, অন্ততঃ একশত আট বার গায়ত্রী জপ কর্‌বে। তারপর একটু হোম ক'রো। কাঠের বিশেষ নিয়ম রাখ্‌বার আর আবশ্যক নাই। ঘৃতেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না রাখ্‌লেও চল্‌বে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "ব্রহ্মচর্য্য কি এক বৎসর করেই নিতে হয়?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— **"তা কিছু নয়। বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হয়। তবে তোমাকে এবারও এক বৎসরের জন্যই দিলাম। এক বারে বেশীকালের জন্য দিতে ভরসা হয় না; যদি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফেল। এক বার ব্রত ভঙ্গ হ'য়ে গেলে, বড় দোষ। নিয়মটি ঠিকমত রক্ষা ক'রে চল্‌লে, আগামী বৎসরে আবার পাবে। এরূপই ভাল। যে রূপ চল্‌ছ এই প্রকার চল্‌তে পারলে ১২ বৎসরও করতে হবে না— ৯ বৎসরেই ব্রহ্মচর্য্য হয়ে যাবে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "শ্রীবৃন্দাবনে যে দিয়েছিলেন, এবারও কি তাই, না কিছু বিশেষ আছে? আগামী বৎসরে যদি আমি আপনার সঙ্গে না থাকি, তা হ'লে কি কর্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রীবৃন্দাবনে যা পেয়েছিলে তাই; নূতন কিছু নয়। তবে বছর বছর ব্রত নিয়ে পাঠ বৃদ্ধি কর্‌তে হবে। আগামী বৎসরে আমাকে না পেলেও নিজেই টের পাবে। সেজন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। এর পর একাদশস্কন্ধ ভাগবত ও যোগবাশিষ্ট পড়্‌তে হবে।"**

আমি আর বেশী কথা না তুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

ক্রোধে স্বপ্নদোষ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্যা গ্রহণের পরে, মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। আহারের চাউলও ফুরাইয়া গিয়াছে। এক এক বারে চারি পাঁচ সের চাউল আনিলে আমার মাসাধিক কাল চলিয়া যায়। বাড়ী যাইয়া কয়দিন নিজেই মাতাঠাকুরাণীর রান্না করিয়া, তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আহারের নিয়ম বাড়ীতে কখনও ঠিক রাখিতে পারি না। মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহে, অসময়ে এবং তাঁহার প্রসাদ বলিয়া, মিষ্টি টক ইত্যাদি তিন চারিটি তরকারিও খাইতে হয়। ঠাকুরকে এ সব বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন— "**মা'র প্রসাদ খুব খাবে; ওতে কোনও ক্ষতি হবে না, উপকারই হয়।**" আমারও বেশ সুবিধা হইয়াছে। যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেই বলি; তিনিও খুব আদর করিয়া সেই সকল আমাকে প্রসাদ করিয়া দেন। আশ্রমে যখন থাকি, তখন একমাত্র খিঁচুড়ি ব্যতীত সারা দিনরাত্রিতে আর এক গণ্ডূষ জলও খাই না; ঠাকুরের প্রসাদ ভাগাভাগি করিয়া এক গ্রাস মাত্র পাইয়া থাকি। এবার নূতন ব্রহ্মচর্য্য লইয়া, খুব কড়াকড়ি চলিব স্থির করিয়া, মাতাঠাকুরাণীর মিষ্টান্ন প্রসাদও গ্রহণ করিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর জেদ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল; খুব ঝগড়া করিলাম. এবং চারি পাঁচ সের চাউল লইয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

শ্রাবণ, ৫ই —৯ই।

আশ্রমে আসিবার পরে ক্রমাগত তিন রাত্রি স্বপ্নদোষ হইল। মাথা গরম হইয়া গেল। এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষের উৎপাত কমিল না। ঠাকুরের উপরে অভিমান আসিল। ঠাকুরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "এখন ত আমি ঠিক নিয়ম ধরিয়া চলিতেছি, তবে আবার স্বপ্নদোষ হয় কেন?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— "**শুধু আহারের নিয়মই কি নিয়ম? ব্যবহারের নিয়ম, নিয়ম নয়? তা কতটা প্রতিপালন কর? বাড়ী যেয়ে কারও উপর রাগ করেছিলে? রাগ কর্‌লে শরীরের রক্ত বিকৃত হয়, তাতেও খুব স্বপ্নদোষ হয়। শরীরের রক্ত সর্ব্বদা শীতল রাখ্‌তে হয়।**"

রাগ করিলে স্বপ্নদোষ হয়, আজ এই এক নূতন কথা শুনিলাম এবং লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাধা।

মহাভারতপাঠের পর, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কথামত ঠাকুরকে বলিলাম— "আপনার জীবনের কতকটা ঘটনা 'আশাবতীর উপাখ্যানে' বহুকাল হয় লিখেছিলেন, শুনেছি। ঐ পুস্তকে যে পর্য্যন্ত লেখা আছে, তার পরের ঘটনাগুলি জান্‌তে অনেকের খুব আকাঙ্ক্ষা। আপনি যদি অবসরমত একটু একটু ক'রে বলেন, আমি লিখে যেতে পারি।"

১০ই শ্রাবণ, শনিবার।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন— **"তা বেশ। একটা নিয়ম ক'রে নেও: প্রত্যহ পাঠের পর, মধ্যাহ্নে এক ঘণ্টা ক'রে লিখ্‌লেই হবে। আমি ব'লে ব'লে যাব; কাগজ পেন্সিল নিয়ে ব'সো। ইচ্ছা হ'লে কাল থেকেই লিখ্‌তে পার।"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। অপরাহ্নে পণ্ডিতদাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ঠাকুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই খুব আনন্দিত হইলেন।

১১ই শ্রাবণ, রবিবার। আজ মধ্যাহ্নে, মহাভারতপাঠান্তে কাগজ পেন্সিল হাতে লইয়া ঠাকুরকে বলিলাম— "আপনি এখন বল্‌লেই আমি লিখে যেতে পারি।"

ঠাকুর একটু সময় স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন— **"ওসব থাক্। আশাবতীর উপাখ্যান, বামাবোধিনী পত্রিকায় যখন আমি লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম, সামান্য একটু লিখ্‌তেই চারি দিকে বিষম হৈ চৈ প'ড়ে গেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হ'য়ে ঐপ্রকার সব লিখ্‌ছি, সাধারণ ব্রাহ্মদের ভিতরে এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন চল্‌লো। প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের অনাদর অশ্রদ্ধা দেখে, বড়ই দুঃখ হ'ল। অমনই লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। আশাবতীতে যাহা লেখা হ'য়েছে, তা ত কিছুই নয়, অতি সামান্য। তার পরের সব ঘটনা আরও অদ্ভুত। সে সব কেহ বিশ্বাস কর্‌বে না। গুলিখোরের গল্প মনে কর্‌বে। তাই ওসকল আর প্রচারিত না হওয়াই ভাল।"**

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। আমি একটু সময় অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরকে বলিলাম— **"আমরা প্রচার কর্‌ব না; শুধু আমাদেরই মধ্যে রাখ্‌ব। জীবনের ওরূপ আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি চিরকালের জন্য একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যাবে; কেহ কিছু জান্‌বে না।"**

ঠাকুর আমার প্রাণের ক্লেশ বুঝিয়া খুব স্নেহভাবে বলিলেন— **"আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে। সেজন্য এখন এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? এখন থেমে যাও, সময়ে সবই হবে।"**

ঠাকুরের এই কথার পর আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ঠাকুর যখন পরিষ্কার বল্‌লেন, **'সময়ে সবই প্রকাশ পাবে'** তখন আর চিন্তা কি? না হয় দু'দিন পরে হবে।

ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের কথা।

১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার। মধ্যাহ্নে, পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "সন্ন্যাসগ্রহণ কর্‌তে হ'লে, সকলকেই কি আগে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ক'রে নিতে হয়?"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন— **"ব্রহ্মচর্য্য না কর্‌লে কখনও বৈদিকসন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার হয় না।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "কত কাল এই ব্রহ্মচর্য্য কর্‌লে বৈদিকসন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার হয়? ব্রহ্মচর্য্য কি সকলকেই নির্দ্দিষ্ট একটা কালের জন্য কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সকলের পক্ষে এক রকম নয়। কারও ছত্রিশ বৎসর, কারও চব্বিশ বৎসর, কারও বা বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করা আবশ্যক হয়। আবার কেহ নয় বৎসর, কেহ ছয় বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর ক'রেই সন্ন্যাস নেবার অধিকারী হন। আমাকে তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হয়েছিল।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম-- "আপনি আবার ব্রহ্মচর্য্য কবে করেছিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"দীক্ষাগ্রহণের পরেই আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্‌লেন— এমনি তো হবে না, যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্‌তে হবে। তুমি কাশীতে চলে যাও, তোমাকে সন্ন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে রয়েছেন।' আমি গয়া হ'তে হেঁটে হেঁটে কাশী পৌঁছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বল্‌লেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্যই আমি এখানে এসেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তোমার আরও কর্‌বার আছে। অনেক অনাচার করেছ, এখন মস্তক মুণ্ডন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর; তার পরে সন্ন্যাস । আমিও অমনি মস্তক মুণ্ডন ক'রে, প্রাযশ্চিত্ত কর্‌লাম। পরে উপবীত ধারণ ক'রে, ব্রহ্মচর্য্য নিলাম। তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করার পরই তিনি আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।"**

আমি বলিলাম— "সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও ত আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেছেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হ্যাঁ, সন্ন্যাস নিয়ে আমি আর ফির্‌ব না, মনে করেছিলাম। পরমহংসজীকে বলাতে, তিনি বল্‌লেন, তা হবে না। সংসারে তোমার অনেক কাজ কর্‌তে হবে— যেমন ছিলে তেমনি গিয়ে থাক, সংসারেই সব হবে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনার গৈরিক বসন কি তখন থেকে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"না, গৈরিক আরও পূর্ব্বে। গয়াতে যখন ছিলাম, পাহাড়ে একটি পরমহংস তাঁর গৈরিক বসন আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, 'আমার এই গৈরিক বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর, আর তোমার নামটি আমাকে দেও।' সেই থেকে আমার গৈরিক।"**

ঠাকুরের আরও এরূপ অনেক কথা শুনিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃশ্য।

১৪ই শ্রাবণ, বুধবাব।

আজ আমার শরীর অসুস্থ। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকট নামমাত্র মহাভারত পাঠ করিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন; আমিও একপাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে পনঃ পুনঃ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায একটার সময়ে ঠাকুর অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিয়া পশ্চিমোত্তরে আকাশ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন— **"আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! কি সুন্দর!!! সোণার রথ, কি শোভা! ধন্য! ধন্য!! ধন্য!!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়্‌ছে! আহা! সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রংয়ের**

উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝল্‌মল্ কর্‌ছে! চারি দিকে কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যা! দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন কর্‌ছেন, অপ্সরাসকল নৃত্য ও গান কর্‌ছেন! আহা কত আনন্দ! আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া, আকাশপথে সকলে আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছেন! মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চল্‌লেন! হরিবোল! হরিবোল!!"

ঠাকুর আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া চোখ বুজিলেন। সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুমূত্র রোগে শয্যাগত, এরূপ একটা কথা কিছুদিন হয়, সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ ঘটনার বিরুদ্ধে তখনই প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন— 'আমার চৌদ্দ পুরুষেও বহুমূত্র রোগ নাই' ইত্যাদি। উহা পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুস্থ আছেন— এ পর্য্যন্ত এইরূপ সংস্কারই আমার ছিল। সুতরাং ঠাকুরের ভাবাবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা শুনিয়া, মনে করিলাম— হয় ত ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ জীবনেরই একটা চিত্র দর্শন করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খবর পাইলাম, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্কুল কলেজাদি সমস্ত বন্ধ হইল। জয় বিদ্যাসাগর— ধন্য বিদ্যাসাগর!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন—দুই একটি মাত্র লিখিতেছি—

ঠাকুর বলিলেন— "**বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পুস্তকখানা প্রকাশ হ'তেই সর্ব্বত্র ছেলেদের পাঠ্য হ'লো। আমি ঐ পুস্তকখানা প'ড়ে দেখলাম, ওতে ভগবানের নাম গন্ধও নাই। আমার মনে বড়ই দুঃখ হ'লো; আমি অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়ে বল্‌লাম, 'সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাহাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয়খানা সে ভাবেই লিখেছেন। কিন্তু মানুষের, সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়ের বোধ বেশী আবশ্যক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার কথা শুনে, একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, গোঁসাই ঠিক ব'লেছ। আচ্ছা, আগামী সংস্করণে, গোড়াতেই আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লিখ্‌বো।' পরে দেখ্‌লাম, বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। সকলের কথাই তিনি মন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শুন্‌তেন।**"

তার পর মেডিকেল কলেজের গোলমাল সম্বন্ধে, ঠাকুর বিদ্যাসাগরের দয়া ও সৎসাহসের কথা বলিলেন। এ সময়ে আমি দু' একবার আসন হইতে উঠিয়া যাওয়াতে সমস্ত কথা আগা গোড়া শুনিতে পাইলাম না। সুতরাং গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে শুনিয়া এ বিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে, সেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, বাঙ্গালা বিভাগের একটি ছাত্রকে, চোর সন্দেহ করিয়া, পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন এবং ঐ বিভাগের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ছোট লোক ও অসভ্য বলিয়া প্রকাশ্যভাবে দোষারোপ করিয়া গালাগালি দেন। ইহাতে ছাত্রেরা সকলেই অতিশয় অপমান বোধ করেন, তাঁহারা গোস্বামী

মহাশয়কে নেতা করিয়া অনেকেই এককালে কলেজ ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারি দিকে এই ব্যাপার লইয়া খুব আলোচনা চলিল। ইহার একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায়, গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে বহুসংখ্যক সহাধ্যায়ীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দু' চারটি কথা বলিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ধমক দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যাও, যাও, আমি ওসব কিছু শুন্‌তে চাই না। ছেলেরা অনেক সময়ে মিছামিছি ওরূপ অনর্থক গোল করে।" এই বলিয়া তিনি কোন কথা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, গোস্বামী মহাশয় খুব তেজের সহিত বলিলেন— "আপনি আমাদের কোন কথা না শুনেই একটা স্থির ক'রে নিচ্ছেন কেন? আমাদের দু'টা কথা শুনে, পরে যা ইচ্ছা বলুন। বাঙ্গালা বিভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কি একটা বংশের বা জাতির মর্য্যাদা নাই? ইঁহ'রা সকলেই কি ইতর, ছোট লোক, চোর, বদমায়েস্; আপনিও একথা বলেন?" বিদ্যাসাগর একথা শুনিয়া অমনি চমকিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছ গোঁসাই? এরূপ, কি ব্যাপার বল ত।" তখন গোস্বামী মহাশয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন— "বটে, এ রকম ঘটনা? তবে আর তোমরা কলেজে যেও না। দেখি, আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি না।" এই বলিয়া তিনি তদানীন্তন ছোটলাট বীডন সাহেবের নিকট সমস্ত বিষয় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া জানাইলেন, এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যখন শুনিলেন যে, অনেক ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, ঐ বৃত্তির দ্বারাই তাহাদের আহারাদি চলিতেছিল, উপস্থিত তাহাদের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে; অনেক ছেলে আবার এই বৃত্তির টাকা হইতেই অসহায় বৃদ্ধ মাতাপিতারও কিছু কিছু সাহায্য মাসে মাসে করেন, তখন তিনি সকলের বৃত্তির টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তিন চারি মাস কাল সকলের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। বীডন সাহেবের আদেশে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইল। কলেজের অধ্যক্ষের দোষেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইল। এইজন্য অধ্যক্ষকে ত্রুটি স্বীকার করিতে হইল। এই ঘটনায় কলেজের অধ্যাপকগণ গোস্বামী মহশয়কে দলের নেতা জানিতে পারিয়া, কোন প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আর কলেজে যাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না; সুতরাং তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে অন্যতম অধ্যাপক তামিজ খাঁ মহাশয়ের সহিত গোলদীঘির ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তামিজ খাঁ সাহেব, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন— "গোঁসাই, তুমি কলেজে না যাইয়া বড়ই ভাল করিয়াছ, নচেৎ তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।"

রুদ্রাক্ষধারণ; নীলকণ্ঠবেশ।

কাশী হইতে রুদ্রাক্ষের মালা আসিয়াছে, উহা ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর মালাগুলি হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন— **"চমৎকার দানা। সমস্তগুলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিকমত গেঁথে নেও।"**

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

আমি কয়েকদিন পরিশ্রম করিয়া ছুঁচ ও শণের দ্বারা, রুদ্রাক্ষের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সকল শিকড় ছিল, তুলিয়া ফেলিলাম। পরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুর দেবীভাগবত খুলিয়া উহা যে প্রণালীতে ধারণ করিতে হইবে, শ্লোক পড়িয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন—

রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতি দ্বে
ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব।
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভির্নয়নযুগকৃতে ত্বেকমেকং শিখায়াং
বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ।।

আমি ঠাকুরের আদেশমত কণ্ঠে ৩২টি, মস্তকে ২২টি, কর্ণদ্বয়ে ৬টি করিয়া ১২টি, করযুগলে ১২টি করিয়া ২৪টি; বাহুদ্বয়ে ৮টি করিয়া ১৬টি, শিখাতে ১টি, এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টি, মোট ১০৮টি মালা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গাঁথিয়া রাখিলাম।

আজ ১৬ই শ্রাবণ, একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, গ্রন্থি দেওয়া নূতন উপবীত, যোগপাট এবং রুদ্রাক্ষের মালা, ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলাম। ঠাকুর উপবীত হাতে লইয়া দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিলেন। পরে যোগপাট স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিলেন। তৎপরে রুদ্রাক্ষের মালাগুলি হাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অনন্তর উহা আমাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন— **"ইহাই নীলকণ্ঠবেশ।"**

আমি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, ঠাকুরের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আজ আমাকে নীলকণ্ঠ মহাদেবের বেশ দিলেন মনে করিয়া, আমার শরীর ও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর! দয়া করিয়া আমাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার দয়াতেই যেন এই বেশের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। নিয়ত যেন অনুগত থাকি।" এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। কি ভাবে যে এই সময়টি আমার চলিয়া গেল, বলিতে পারি না। ঠাকুর শৌচে গেলেন, আমিও আসন হইতে উঠিয়া আশ্রমস্থ সকল গুরুভ্রাতাকে নমস্কার করিলাম। সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধ্যাহ্নে মহাভারতপাঠের পরে, পাঁচটা পর্য্যন্ত পরমানন্দে নামে মগ্ন থাকিয়া, কাটাইলাম।

সাধনে দৈহিক উপসর্গ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের পর নূতন নিয়ম প্রতিপালনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম।

২০শে—৩১শে শ্রাবণ।

এখন দিন দিন শরীরের যন্ত্রণা আমার এতই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কি করিব বুঝিতেছি না। পদাঙ্গুষ্ঠে সর্ব্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্য অনবরত একভাবে মাথা হেঁট্ করিয়া থাকিবার ফলে আজ কয়দিনযাবৎ ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, সমস্ত ঘাড় যেন পাকিয়া গিয়াছে। এই যাতনা সময়ে সময়ে এতই তীব্র হইয়া পড়ে যে, কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসিত না হইলে কথা বলিতে পারিব না, এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ না হইলে উত্তর দিতে পারিব না, এইপ্রকার আদেশ করিয়া, ঠাকুর আমাকে প্রকারান্তরে মৌনীই করিয়া রাখিয়াছেন। সারা দিনে রাত্রে দুই চারিটি কথাও বলিতে পাই না।

প্রাণ সর্ব্বদা আই ঢাই করে; মনে হয়, নির্জ্জনে কোথাও যাইয়া চীৎকার করিয়া আসি। ঘন ঘন হাই তুলিয়া সময় কাটাইতেছি। গুরুভ্রাতারা আমাকে একবার একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেই আমি দশটি কথা বলিয়া উত্তর দিব প্রত্যাশায়, যেমনই কারও হাতখানা ধরিয়া টান দেই, সে অমনি কথাটি মাত্র না বলিয়া আমার টিকিটি টানিয়া দু'এক পাক ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রশ্ন পাইবার আকাঙ্ক্ষায়, কোনও গুরুভ্রাতার গা ঘেঁসিয়া বসিলে, সে উঠিয়া নীরবে আমাকে সজোরে ঠাসিয়া ধরে; আমার তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কখনও কেহ বা গুঁতা মারিয়া সরাইয়া দেয়। হায় কপাল! আহা-উহুঃ শব্দ মাত্র করিয়া ভাগিয়া পড়ি। ঠাকুর আমার অবস্থা বুঝিয়াই দয়া করিয়া সময়ে সময়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাই উত্তর দিয়া প্রাণ বাঁচে। আজ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গেও কি ইচ্ছামত কথা বলিতে পারিব না?"

ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন— **"আচ্ছা, তা ব'লো।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "শুধু আপনার দিকে চাহিতে পারিব ত?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মাথাটি না তুলে যদি চাইতে পার, চাইবে।"**

স্বপ্নদোষ; হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ।

এবার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বীর্য্যধারণের চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই বীর্য্য স্থির রাখিতে পারিতেছি না। ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই ভাল লাগে না। বীর্য্য কেন স্থির থাকিতেছে না, এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষ কেন নিবৃত্ত হইতেছে না, এই প্রকার দুর্দ্দশা আমার কি জন্য হইতেছে, স্থির করিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর একটু ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন— **"দু' দশ দিনের একটু চেষ্টায়ই একটা কিছু হ'তে চাও নাকি? কু-অভ্যাসে ছেলেবেলা বহুকাল বীর্য্য নষ্ট করেছ। তার একটা স্রোত কি একবারেই বন্ধ হয়? এখন খুব নিয়ম ধ'রে কিছুকাল চল্‌লে, ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আস্‌বে। ব্যস্ত হ'লে হবে কেন? ওসব দিকে দৃষ্টি না করে নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল। চিত্ত-চাঞ্চল্যে স্বপ্নদোষ হয়, ক্রোধ কর্‌লে স্বপ্নদোষ হয়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় হয়, পেট গরম ও মাথা গরম হ'লে হয়, আহারের দোষে হয়, আর অতিরিক্ত নিদ্রাতেও স্বপ্নদোষ হয়। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ঘুমায়ে রাত দশটা এগারটার সময় উঠে, সারারাত্রি ব'সে নাম কর্‌তে পার না? ঘুমটি কমাও। ঘুম বেশী হ'লে স্বপ্নদোষ যাবে না। শয়নের পূর্ব্বে দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত, দুই পা হাঁটু পর্য্যন্ত ধুয়ে নিও। পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রেখে শুতে নাই। শোবার সময়ে বেলপাতায় গায়ত্রী লিখে মাথার নীচে রাখ্‌তে পার। তুলসীপাতা রাখ্‌লেও কারও কারও উপকার হয়।"**

ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলাম, একটু বিরক্তিও আসিল। ভাবিলাম, 'স্বপ্নদোষের কথা ঠাকুরকে বলিলেই ঠাকুর এক এক দিন এক একটি নূতন নূতন হেতু তুলিয়া,

নূতন নূতন নিয়ম ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। এও উৎপাত মন্দ নয়! নিদ্রাটি না হয় কমাইয়া ফেলিব; কিন্তু শয়নকালে ঘাড়টি সোজা রাখিয়া রাত্রিতে যা একটু আরাম পাইতাম, এবার ঠাকুর যে তাও সারিলেন! এগারটার পরে আসনে বসিতে হইলেই ত মাথাটি গুঁজিয়া বসিতে হইবে। অধিক নিদ্রায় স্বপ্নদোষ হয়, একথা আর কখনও শুনি নাই।'

ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধন প্রণালী।

ঠাকুরের উপদেশমত চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া, সারারাত্রি নাম করিয়া কাটাইতেছি। কিন্তু বীর্য্য ত কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বীর্য্যধারণ না হইলে সাধন, ভজন, তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদি সমস্তই বৃথা মনে করিয়া, অতিশয় অস্থিরচিত্তে ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—"শুনিয়াছি, ঊদ্ধরেতাঃ না হইলে কিছুতেই বীর্য্যধারণ হয় না। কি প্রণালীতে সাধন করিলে ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া যায়? নিয়মমত চলিলে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে কত কাল লাগে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া সাধারণের সহজসাধ্য নয়। আবার নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে যে সকলেই হবে, তাও বলা যায় না। এমন লোকও আছেন যে, তিন দিনের মধ্যেই ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পারেন। কারও তিন মাসে হয়, কারও বা তিন বছর লাগে। আবার বহুকাল চেষ্টা ক'রেও কারও কারও হওয়া অসম্ভব হয়। যারা অভ্যস্ত, তাদের একটু সময় লাগে; শীঘ্র হয় না। তোমার বীর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এজন্য একটু সময় নেবে। নিয়মমত চল্‌তে থাক, বিশেষ ব্যস্ত হবার কোনও আবশ্যক নাই।"**

ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার জন্য কি কি নিয়মে চলিতে হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে জানিতে ইচ্ছা হইল। আমি সাহস করিয়া আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— **"ঠিক নিয়ম ধ'রে চল্‌তে থাক; বেশী সময় তোমার লাগ্‌বে না! এখন থেকে সর্ব্বদা পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে চেষ্টা কর। কখনও অন্য দিকে তাকাবে না। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখ্‌তে নিতান্ত না পার্‌লে, নাসাগ্রেও রাখ্‌তে পার। তবে তাতে মাথা একটু গরম হয়। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টিতে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধকার রাত্রেও এদিক সেদিক চাহিবে না। সর্ব্বদাই একভাবে মাথা হেঁট্ ক'রে থাক্‌বে।"**

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন— **"আর একটি কাজ ক'রো। প্রস্রাব এক ধারায় না ক'রে, একটু থেমে থেমে ক'রো। দু'চার সেকেণ্ড্ প্রস্রাব ত্যাগ ক'রে আবার দু'চার সেকেণ্ড থেমে যেও। এইরূপ ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ধারণ ক'রে ক'রে, ত্যাগ কর্‌তে অভ্যাস কর। ধারণের সময়ে খুব কুম্ভক ও সঙ্গে সঙ্গে খুব নাম কর্‌বে। যতক্ষণ কুম্ভক ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে, ততক্ষণই ধারণের চেষ্টা রাখ্‌বে। অল্প অল্প ত্যাগ ক'রে ক'রে, অন্ততঃ পাঁচ সাতবারে সমস্তটি প্রস্রাব ত্যাগ কর্‌বে। এটি অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে প্রস্রাবের রাস্তার মাংসপেশী খুব দৃঢ় হ'য়ে আস্‌বে; ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হবে। এখন থেকে এটি বেশ অভ্যাস কর।"**

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন— "স্বাভাবিক কুম্ভক ক'রে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে। ধীরে ধীরে প্রতি দমে কুম্ভকের সহিত নাম কর্‌তে পার্‌লে, এ বিষয়ে যথেষ্ট উপকার পাবে। এ সকল ক্রিয়া, যার সঙ্গে শরীরের বিশেষ একটা যোগ আছে, হঠাৎ একবারে হয় না; সময় লাগে। নানা কারণেতে নানা অবস্থায় দেহের বীর্য্য মথিত হ'য়ে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে উপস্থের দিকে চলে। বীর্য্যের উর্দ্ধদিকে যাবারও একটি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। নীচের পথটির মুখ একেবারে বন্ধ না হ'লে, বীর্য্য কখনও উর্দ্ধপথে যেতে পারে না। বীর্য্যের স্রোত উর্দ্ধপথে দিতে না পার্‌লে, কোনও উপায়েই উহা দেহে রাখা যায় না। বীর্য্য একস্থানে কখনও থাক্‌বার বস্তু নয়। বীর্য্য অধোগামী না হয়, সে জন্য কত লোকে কত কাণ্ডই করে! শরীরের গরম কমাবার জন্য কেহ শিরা কেটে ফেলেন; কেহ মনের উত্তেজনা কমাতে অঙ্গাদি ছেদন করেন। কিন্তু তাতে যথার্থ কোন উপকারই হয় না। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করায় ধর্ম্মজীবনেরও কোন কল্যাণ হয় না। সংযম দ্বারা চিত্ত স্থির রেখে, নামযোগে কুম্ভক দ্বারা বীর্য্য উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কর্‌তে হয়। কুম্ভক কর্‌লেই বীর্য্যের নীচের দিকের পথে চাপ পড়ে, আর উপরের পথও প্রশস্ত হয়; সুতরাং বীর্য্যের গতি নিম্নদিকে আর না হ'য়ে উর্দ্ধদিকেই হয়। একবার বীর্য্যের গতি উর্দ্ধদিকে হ'লে, উহা আর নীচে যায় না। আমার যখন ঐ রকম হয়েছিল, মনে হ'লো যেন একটা অমৃতের সাগরে আমাকে ডুবিয়ে দিলে। চেষ্টা ক'রে কুম্ভকাদিতে কোনও ফলই হয় না। নামের সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্বাভাবিক কুম্ভক ক'রেই এ সব হয়। অস্বাভাবিক কুম্ভকে লাভ নাই। নামের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে এই ভাবে কুম্ভক অভ্যাস কর। এসব বিষয়ে সর্ব্বদা খুব একটা চেষ্টাও রাখ্‌তে হয়। দৃঢ়তা না থাক্‌লে বেশী দিন চেষ্টাও রাখা যায় না।"

ঠাকুর এ সকল বলিয়া নীরব হইলেন। আমি কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,— "আমার কি কখনও উর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? কত অত্যাচার ত এক সময়ে করেছি।"

ঠাকুর বলিলেন— "অত্যাচার আর এমন কি করেছ? চেষ্টা কর্‌লে কেন হবে না? দেখ, আমারও ত ছেলেমেয়ে হয়েছে। আমিও ত তোমাদেরই মত ছিলাম। স্ত্রীলোক দেখে আমারও কামভাব হ'তো, কত সময় চঞ্চল হ'তাম। এখন কাম যে কি তা কল্পনাতেও আনা যায় না। উর্দ্ধরেতাঃ হ'লে তোমারও এই রকমই হবে। সর্ব্বদা শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম কর, আর স্বাভাবিক কুম্ভক অভ্যাস কর। দমে দমে কুম্ভকের সঙ্গে নাম কর্‌তে পার্‌লে, উর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পার্‌বে। উর্দ্ধরেতাঃ হ'লে শরীরটি সর্ব্বদা বেশ সুস্থ থাক্‌বে। ব্যারাম স্যারাম কিছুই বড় হবে না। অল্প আহার, অধিক আহার, ভাল আহার বা খারাপ আহার কিছুতেই শরীরের কোনও অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন— "বীর্য্যধারণ কর্‌তে হ'লে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হয়। আহারের দোষে অনেক সময়ে উত্তেজনা হ'য়ে থাকে। সকল বিষয়েই খুব সতর্কতার সহিত না চল্‌লে, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।"

আমি অমনই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়মে চল্‌বো?"

ঠাকুর বলিলেন— **"আহারটি খুব নির্জ্জনে কর্‌বে। আহারের বস্তু কাহাকেও দেখ্‌তে দেবে না। আহারের সময় প্রতিগ্রাসে নাম কর্‌বে। আহারের সময়ে আহারের বস্তু ব্যতীত আর কোনও দিকে দৃষ্টি কর্‌বে না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তুমাত্র আহার কর্‌বে। অধিক ঝাল্, অধিক নুন বা অধিক টক খাবে না। মিষ্টি একেবারেই ত্যাগ কর্‌বে। দুধ খাওয়াও ভাল নয়; আবশ্যক হ'লে, সামান্য পরিমাণে একবল্‌কা দুধমাত্র খেতে পার। ঘন দুধ বড়ই অনিষ্টকর।"**

এ সব শুনিয়া আমি বলিলাম— "আরও কি কোন বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"আছে বই কি? শয়নেরও নিয়ম আছে। যেখানে সেখানে শুতে নাই। শোবার বিছানা সর্ব্বত্রই পৃথক্ রাখ্‌বে। অন্যের বিছানায় শোওয়া বসা বা অন্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ কর্‌বে। এই সকল নিয়মে সর্ব্বদা খুব মনোযোগ রেখে চল্‌বে। না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয়। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি যেমন ব্যবহার কর্‌বে না, নিজের ব্যবহারের বস্ত্রাদিও কখন অন্যকে ব্যবহার কর্‌তে দেবে না; সমস্তই পৃথক্ রাখ্‌বে। অন্যের স্পর্শ পর্য্যন্ত হ'লে এই সাধনের অবস্থায় অনেক সময়ে ক্ষতি হয়।"**

ঠাকুরের আদেশমত ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী ধরিয়া খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। খিচুড়ি ছাড়িয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত আহার ধরিলাম। সমস্ত দিনে আর কিছুই খাই না। কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়াছি, মাত্র ঠাকুরের সঙ্গে যা ইচ্ছা বলি। শয়নের সময়ে ঘাড় সোজা করিয়া শুইতাম, এখন হইতে ঘাড় বাঁকা রাখিয়া শুইতে অভ্যাস করিতেছি। রাত্রি জাগরণ ঠিক ঠাকুরের কথামত হইতেছে না; কখনও বারটা, কখনও বা একটার সময়ে হয়। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, যথাসময়ে উঠা ত আর আমার হাতে নয়।

ভাদ্র।

ঠাকুরকে একদিন বলিলাম— "যখন ইচ্ছা করি, তখন ত ঘুম ভাঙ্গে না, কি কর্‌বো?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— **"আচ্ছা, নিজের নাম নিয়ে চীৎকার ক'রে ডেকে ব'লো, 'ওহে! আমাকে আজ রাত এতটার সময়ে তুলে দিও।' এরূপ ক'রে দেখ দেখি!"**

আমি বলিলাম— "তা আমি পার্‌বো না। লোকে হাস্‌বে। আমার লজ্জাবোধ হয়।"

ঠাকুর একটু হাসিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। ইহা সত্য, না ঠাকুর আমাকে তামাসা করিলেন— একবার জানিতে হইবে।

শ্রীধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ।

এই বৎসর ভাদ্রমাসে ঝড় বৃষ্টি তুফান খুব বেশী পরিমাণে হইতেছে। এক দিন সকালবেলা পণ্ডিত বৃষ্টি মহাশয়ের রান্নাঘরে নিজ আসনে থাকিয়া নিত্যকর্ম্ম করিতেছি, অকস্মাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এত প্রবল বেগে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল যে, মনে হইল আজ সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। উঠানে বিস্তর জল দাঁড়াইয়া গেল। দশ বার হাত তফাতে অন্য ঘরের লোক ছায়ার

৭ই — ১৮ই ভাদ্র।

মত দেখা যাইতে লাগিল। এই সময় শ্রীধর, পণ্ডিত দাদার ঘর হইতে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে, উঠানে নামিয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, করজোড়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে লেংটিমাত্র পরিধানে— শ্রীধর, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে, 'জয় রাধে, জয় রাধে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। একঘণ্টা কাল অতীত হইল, শ্রীধরের নৃত্য থামিতেছে না। আকাশ হইতে ভগবানের চরণামৃত পড়িতেছে, এই ভাবে মত্ত হইয়া, শ্রীধর পাগলের মত একবার কাদায় গড়াগড়ি, একবার উঠানের চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃই শ্রীধরের হুঙ্কার ও গর্জ্জন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবাবেশে শ্রীধর অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতে করিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এসব দেখিয়া আমার মনে হইল, শ্রীধরের প্রায়ই সটকজ্বর হয়, তখন তিনি বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হন। এখন যে ভাবেই শ্রীধর মত্ত থাকুন না কেন, এত লম্ফঝম্প ও বৃষ্টি ঐ শরীরে কখনই সহ্য হবে না। যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে একবার থামাইয়া দিতে পারিলে হয়। এই ভাবিয়া আমি শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলাম— "শ্রীধর! আর না, ঢের হয়েছে। এত লাফানি সহ্য হবে না; এখন থাম।" শ্রীধর আমার কথা শুনিয়াই একবার থমকে দাঁড়াইয়া আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি আবার বলিলাম— "শ্রীধর! এত লাফানি সইবে না, থাম, থাম।"

শ্রীধর খুব বিরক্তির সহিত আমাকে গালি দিয়া বলিল— "চুপ্ শালা, চুপ্!"

আমি বলিলাম— "আচ্ছা, আমি চুপ কর্‌ছি, কিন্তু জ্বর হ'লে তুমিও চুপ থেকো। তখন চীৎকার ক'রে পাড়ার লোককে অস্থির ক'রো না।"

শ্রীধর আমার কথায় বিষম রাগিয়া গিয়া বলিল— "চুপ্ কর্, শালা! এক লাথিতে তোর দাঁতগুলি ভেঙ্গে দিব!" এই বলিয়া শ্রীধর আমাকে পা দেখাইল। আমি ক্রোধে ও অভিমানে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম— "এত আস্পর্দ্ধা, পা দেখালে! আচ্ছা, যদি ব্রাহ্মণ হই, ছ'টি মাস ঐ পা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে। এই লাফানি, এই পা দেখান তখন মনে কর্‌বে, নিশ্চয় জেনো।"

শ্রীধর মুখ খারাপ করিয়া গালি দিতে দিতে আমাকে বলিল, "আরে শালা! আমি তো ম'রেই আছি। আমার উপর তোর বামণালী তেজ দেখিয়ে, এ লাফানি আর কি থামাবি? তোর উত্তেজনার সময়ে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য যদি থামাতে পারিস্, তবেই জানি তুই বামুণ!" শ্রীধরের ব্যবহারে অত্যন্ত অভিমান ও ক্রোধ হইল বটে; কিন্তু উহার কথাটি বড়ই সত্য, ইহা মনে করিয়া লজ্জিত হইলাম। জিজ্ঞাসিত না হইয়া নিজ হইতে উপদেশ দিতে গিয়াই আমার উপযুক্ত দণ্ড হইল, পুনঃপুনঃ ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। সারাদিন ক্লেশে কাটিল। অবসরমত ঠাকুরের নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "অভিমানটি কিসে নষ্ট হয়?"

ঠাকুর প্রশ্নটি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন— **"অভিমান নষ্ট! বড় সহজ কথা নয়। একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমানটি থাকে। সকল অপেক্ষা নিজেকে হীন ব'লে জান্‌তে**

হয়। যত দিন নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে না বুঝ্‌বে, ততদিন কিছুই হ'লো না, এটি নিশ্চয় জেনো। মুটে মজুর, এমন কি নিতান্ত জঘন্য ইতর লোককেও, আপনা অপেক্ষা ভাল মনে কর্‌তে হয়, সকলকেই শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌তে হয়। অভিমানের ভাব অণুমাত্র কোনও কারণে ভিতরে এলে, আর রক্ষা নাই। সামান্য বিষয়ে অভিমান জ'ন্মে কত বড় বড় যোগীরও পতন হয়েছে, দেখেছি। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে, অভিমান সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু। সকলেরই নিকটে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হয়। শুধু নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাক্‌লেই কোনও উৎপাতে পড়্‌তে হয় না।"

আজ কয়দিনযাবৎ শ্রীধর সটকজ্বরে শয্যাগত আছেন। বর্ষার জলে ভিজিয়া বাতজ্বরে শ্রীধর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দু'টি পা আর নাড়িবার যো নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইলে শ্রীধর আমাকে ডাকিয়া বলেন, "ভাই! তোর শাপেই আমার এ দশা ঘটিয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর্।" শ্রীধরের অবস্থা দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া, বড়ই কষ্ট হয়। হায়! সকল প্রকার ভোগই মানুষের ভগবদিচ্ছায় হয়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্ত ঘটিতেছে; বৃথা অভিমানে আঘাত পাইয়া একটা কথা বলিয়া, আমি কেন অনর্থক নিমিত্তের ভাগী হইলাম?

লোকসঙ্গই ক্রোধ এবং অভিমানাদির হেতু হয় দেখিয়া, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম— "লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড়-পর্ব্বতে থাকিতে পারিলে, বোধ হয়, অভিমানাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কি প্রকার অবস্থা হইলে পাহাড় পর্ব্বতে নিরুদ্বেগে থাকা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"লোকালয়ে থাক্‌লে অভিমানের অনেক কারণ উপস্থিত হয় বটে, পাহাড়-পর্ব্বতে থাক্‌তে পার্‌লে, এ সকল দিকে ঢের নিরাপদ; কিন্তু আহারটি ত্যাগ না হ'লে, নির্জ্জন পাহাড়-পর্ব্বতে শান্তিতে থাকা যায় না। আহারের জন্য অস্থির হ'য়ে আবার লোকালয়ে আস্‌তে হয়। আহারের চিন্তায় সকলেই অস্থির। আহারচিন্তায় সাধকদের অনেক সময়ে বিস্তর অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। এজন্য অনেক সময়ে সাধুরা কঠোর সাধন ক'রে প্রথমেই আহার ত্যাগ অভ্যাস করেন। আহারটি ত্যাগ হ'লে ইন্দ্রিয়দমনাদির বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। খুব অধ্যবসায়ের সহিত কিছু কাল নিয়ম ধ'রে চল্‌লে, আহার ত্যাগ করা যায়। সকলের পক্ষেই সহজ নয় বটে, সম্ভবও নয়, কিন্তু কেহ কেহ চেষ্টা করলে খুব সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পারে। সে চেষ্টা আর কে করে?"**

ঠাকুর এই ভাবে উপদেশ দিয়া, আহারত্যাগের প্রবৃত্তি আমার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। প্রার্থী না হইলে নিজ হইতে ঠাকুর কোন বিষয়েই তো প্রায় কিছু বলেন না। তাই খুব আগ্রহের সহিত বলিলাম— "চেষ্টা কর্‌লে আমি আহারত্যাগী হইতে পারি কি? যদি সম্ভব হয়, নিয়মগুলি আমাকে বলুন, আমি একবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখি।"

ঠাকুর বলিলেন— **"আহারত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, এখনও তুমি পার। বয়স তোমার বেশী হয় নাই, চেষ্টা কর্‌লে সহজেই পার্‌বে, মনে হয়। আহারত্যাগ একবারে হঠাৎ হয় না। প্রণালীমত খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অভ্যাস কর্‌তে হয়। যে সকল বস্তু আহার**

ক'রে থাক, তার মধ্যে অন্নের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। প্রথম প্রথম আরম্ভেই কম খাওয়া ঠিক নয়। ডাল তরকারি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস দিয়ে আহার না ক'রে একটি দিয়ে খাওয়া অভ্যাস কর্‌তে হয়। শুধু ডাল বা শুধু তরকারি ভাত খাওয়া ভালরূপ অভ্যাস হ'লে, ভাতে সিদ্ধ ভাত ধর্‌তে হয়। এ সময়ে প্রয়োজন হ'লে সামান্য পরিমাণে দুধ ঘি খেতে পার। দুধ না খাওয়াই ভাল। ভাতে সিদ্ধ ভাত অভ্যাস হ'লে, ধীরে ধীরে ভাতে সিদ্ধের পরিমাণ কমিয়ে নেবে এবং জল দিয়ে তা পূরণ কর্‌বে। ক্রমে জল ভাত ধর্‌বে। এ সময় খুব সাবধান হ'য়ে ধীরে ধীরে ভাতেরও পরিমাণ কমিয়ে, জলের মাত্রা বৃদ্ধি কর্‌বে। জল ভাত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নুন ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। নুন ত্যাগ হ'লে জলভাতের সঙ্গে অল্প অল্প ফল খেতে আরম্ভ কর্‌বে। ফলের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি কর্‌বে, ভাতের পরিমাণও তেমনই কমিয়ে নেবে। ক্রমে শুধু জল আর ফল খাবে। এ সময় ফলের সঙ্গে দু পাঁচটা নিম পাতা, বেল পাতা খেতে আরম্ভ কর্‌বে। পরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পাতার পরিমাণ বাড়িয়ে নেবে। তৎপরে শুধু জল ও পাতা খাবে। খুব ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস করতে হয়; না হ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বে। খুব দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল চেষ্টা কর্‌লে, আহার ত্যাগ করা যায়। আহার ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা হলে, মিষ্টি এখন হ'তে ছেড়ে দাও। মিষ্টির মধ্যে ফলমাত্র খেতে পার। বীর্য্যধারণই সমস্ত সাধনের মূল। ওটি না হ'লে এসব কিছুই হবে না। বীর্য্যধারণ হ'লে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

সমাধিমন্দির আরম্ভ; গেণ্ডারিয়ার কথা।

মাঠাকরুণের দেহত্যাগের পরেই ঠাকুরের আদেশে তাঁহার একখানি অস্থি শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত হয়। হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলার সময়ে আর একখানি অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে দেওয়া হইয়াছিল। অপর একখানি অস্থি, সমাধি দিবার জন্য, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আনা হইয়াছে। ঢাকার গুরুভ্রাতারা চাঁদা তুলিয়া একটি ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। গুরুভ্রাতা রাধারমণ গুহ মহাশয় মন্দিরের নক্‌সা আঁকিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের দক্ষিণ সীমায় পুকুরের ঠিক উত্তর পাড়ে, আম গাছের তিন চারি হাত তফাতে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মন্দিরটি উঠিতেছে। মন্দিরের বুনেদ্ খুঁড়িতে সিঁড়ির স্থানে দুইটি মুসলমানের কবর বাহির হইয়া পড়িল।

ঠাকুর বলিলেন— **"কিছু কাল পূর্ব্বেও গেণ্ডারিয়া মুসলমান ফকিরদের সাধনস্থান ছিল। গেণ্ডারিয়া জঙ্গলে অনেক স্থানেই মুসলমানদের কবর আছে। ভাল ভাল ফকিরেরা প্রায় অনেকেই চ'লে গেছেন। জঙ্গলে এখনও যে দু' চার জন আছেন, তাঁরাও শীঘ্রই চ'লে যাবেন।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "যোগিনীমাইর কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি কি আছেন? তাঁর আসন কোথায়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"কিছু দিন হ'ল তিনি মণিপুরের জঙ্গলে চ'লে গেছেন। আনন্দ বাবুর বাগানের দিকে যেখানে আমি বস্‌তাম, যোগিনীমাই সেখানেই প্রায় থাক্‌তেন। আসন তাঁর নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানে ছিল না। সর্ব্বদা তিনি গাছে গাছে থাক্‌তেন।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সূক্ষ্ম দেহে যে সকল ফকির মহাত্মা আছেন, তাঁরাও কি গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চ'লে যাবেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"যে সকল বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁরা রয়েছেন, সে সব কেটে ফেল্‌লে আর থাক্‌বেন কেন? আনন্দ বাবুর বাগানের ধারে নবকান্ত বাবুর বাড়ীর সীমাতে একটি বড় গাছ ছিল, তা কেটে ফেলাতে দুটি মাহাত্মা গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চ'লে গেছেন। গেণ্ডারিয়াতে বেশী লোকের বাস হ'লে, সকলকেই বোধ হয়, স'রে পড়্‌তে হবে।"**

গেণ্ডারিয়ার ভূমি বহুকাল হইতে মহাত্মাদের সাধনক্ষেত্র শুনিয়া, বড় আনন্দ হইল।

গুরুমর্য্যাদালঙ্ঘনে সিদ্ধ পুরুষের পুনরাবৃত্তি।

শ্রীমতী শান্তিসুধার ছেলে দাউজীর কথা অনেক সময়ে ঠাকুর বলিয়া থাকেন। দাউজী ঠাকুরের নিকট আসিলেই, ঠাকুর কত প্রকারে দাউজীর আদর করেন। দাউজীর মাথায় ফুল দিয়া নমস্কার করেন; 'জয় দাউজী! জয় বলদেব মহারাজ!' বলিয়া আনন্দ করেন। দাউজীর এখনও কথা ফুটে নাই। কিন্তু উহার হাবভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতেছি। সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে দাউজী, খোল করতালের শব্দ শুনিলেই স্থির ভাবে একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। কাণের ধারে 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' বলিতে থাকিলেই ধীরে ধীরে দাউজীর চৈতন্য লাভ হয়।

ঠাকুর বলিলেন— **"পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা দাউজীর স্মরণ আছে। চৌরাশি প্রকার আসন উঁহার অভ্যস্ত ছিল, কিছুই ভুলেন নাই। দাউজী একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারির কুঞ্জে বলরামমূর্ত্তি দাউজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দাউজী সেই ঠাকুরেরই সেবা পূজা কর্‌তেন, একান্ত ভাবে উপাসনা ক'রে দাউজী সেই বিগ্রহেরই রূপ লাভ করেছেন।"**

ঠাকুরের কথায় এখন বুঝিলাম— যথার্থই দাউজীর আকৃতি ঠিক সেই বিগ্রহের অনুরূপ। অনেক সময়ে ভাবিতাম, ছেলের চেহারার সহিত পিতামাতার চেহারার সাদৃশ্য নাই; অথচ এই চেহারা খুব পরিচিত মনে হয়, কোথায় যেন দেখিয়াছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "দাউজী চিরকালই কি জাতিস্মর থাকিবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা কি আর থাকে? কথা বল্‌তে যেমন শিখ্‌বে, স্মৃতিও তেমনই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "দাউজী এত বড় সিদ্ধপুরুষ হ'য়েও আবার এলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এক ক্ষেত্রে গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করাতেই এবারে দাউজীকে সংসারে আস্‌তে হয়েছে। দাউজী পূর্ব্বজন্মে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। গুরুর সঙ্গেই সর্ব্বদা থাক্‌তেন। গুরু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষ সর্ব্বদাই তাঁকে দর্শন কর্‌তে আস্‌তেন। একদিন কয়েকটি স্ত্রীলোক এই মহাপুরুষের নিকট আস্‌তেই, মহাপুরুষ**

তাঁদের আদর যত্ন ক'রে বসালেন। একটি ব্রজময়ী, কতক্ষণ থেকে, হাসি গল্প আনন্দ ক'রে, চ'লে গেলেন। গুরুর নিকটে স্ত্রীলোক যায় আসে, বসে, কথা বার্ত্তা হাসি গল্প করে— দাউজী একেবারে পছন্দ কর্‌তেন না; অনেক সময়ে খুব বিরক্তিই প্রকাশ কর্‌তেন। ঐ দিন স্ত্রীলোকেরা চ'লে যেতেই দাউজী গুরুকে খুব ধমক্ দিয়ে দু' চার কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। দাউজীর গুরুর নিকটে ঐ সময়ে একটি মহাপুরুষ ব'সে ছিলেন। তিনি দাউজীকে বল্‌লেন, 'আরে বাচ্চা! গুরুজীকো এয়সা মৎ বোল্‌না। চুপ রহো।' দাউজী বল্‌লেন, 'কাহে? ওয়াজিব কাহে নেহি কহেঙ্গে?' মহাত্মা বল্‌লেন, 'আরে হাতী কেত্‌না খাতা হ্যায়, কেত্‌না হজম কর্‌তা হ্যায়, তু ক্যায়্‌সে জানোগে। তু তো বিল্লি হ্যায়।' দাউজীর ক্রোধ হ'লো, অমনি তিনি ব'লে ফেল্‌লেন— 'হাঁ জী, হাঁ। বহুত বহুত ঐরাবত দেখা হ্যায়।' মহাপুরুষ শুনে বল্‌লেন— 'হাঁ, এয়সা। আচ্ছা, ফের আউর একদফে দেখ্‌নে হোগা, লোট্‌নে পড়েগা।' দাউজীর গুরু অমনই মহাপুরুষের পায়ে প'ড়ে বল্‌লেন, 'ও ছেলে মানুষ, আপনি ওর অপরাধ, দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' মহাপুরুষ বল্‌লেন, 'আর একবার ওর আসাতে বিশেষ কল্যাণই হবে, কোন অনিষ্টই হবে না। এই জন্যই দাউজীর আসা। পরলোকে থেকে, দাউজী পঁচিশ বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন যাতে আর না আস্‌তে হয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাক্য কিছুতেই অন্যথা হ'লো না। মর্য্যাদা লঙ্ঘন বিষম অপরাধ। দণ্ড ভোগ না ক'রে এই অপরাধ হ'তে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।"

স্বপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা।

একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় উদ্বেগ আসিয়াছে। মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি বলিলাম— "লাল ও আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধদিকে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতেছি। লাল আমার দু' তিন হাত আগে আগে যাইতে লাগিল। লালের উপরে উঠিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই পারিলাম না। মনে অতিশয় দুঃখ হইল; অমনই আপনার নিকট আসিয়া বলিলাম, লাল আমার অনেক পরে দীক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ সে জাতিতে শূদ্র। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া লালের উপরে উঠিতে পারিলাম না কেন? লাল কোন চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক গতিতেই যাইতেছে দেখিতে পাইলাম; তথাপি আমা অপেক্ষা দুই তিন হাত আগে আগে চলিল।' ইহা কেন হইল আপনাকে জিজ্ঞাসা করায়, আপনি বলিলেন— "লালের বৈষ্ণবভাব, আর তোমার শাক্তভাব।" আর কিছুই বলিলেন না। অমনই জাগিয়া পড়িলাম। এই কথা বলিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— শাক্তভাব ও বৈষ্ণবভাবে পার্থক্য কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে উপাসনার ভাবের পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। যাঁরা বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই চান না; ঐশ্বর্য্য তাঁদের ভক্তির অন্তরায় মনে ক'রে, তাঁরা তা বিষবৎ ত্যাগ করেন। একান্তপ্রাণে তাঁরা দাসই হ'তে চান। ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রে তাঁরা অভয় পদ প্রাপ্ত হন। সমস্ত**

ঐশ্বর্য্য, তাঁরা ইচ্ছা না কর্‌লেও, দাস দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। আর শাক্তদের অন্য প্রকার— শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য্য আকাঙ্খা ক'রেই কঠোর সাধন করেন; পরে, ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে, পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন; ঐ প্রকারে সর্ব্বজীবের সেবা ক'রে, ভগবদুপাসনাদ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।"

স্বপ্নটি বোধ হয় আমার অলীক নয়, কারণ ঐশ্বর্য্যের দিকেই তো আমার ঝোঁক বেশী। ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আহার ত্যাগ করা ইত্যাদি সকলগুলিই তো ঐশ্বর্য্যের ক্রিয়া। তবে এ সকল চেষ্টার লক্ষ্য যখন ভগবান্, তখন ভক্তির সাধন বিনা আর কি বলা যায়? তাঁকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, সমস্ত তো তাঁরই সেবা!

কালীর অপমানে উৎপাত— পূজায় শান্তি।

কয়েকদিন পূর্ব্বের একটি অতি বিচিত্র ঘটনা, আমারই হাতের লেখা একখানা আল্‌গা কাগজে পাইলাম। ঘটনাটির ঠিক তারিখ বা মাস তাহাতে লেখা নাই এবং আমারও মনে নাই; সুতরাং যেমন লেখা আছে, এই স্থলে তুলিয়া দিতেছি।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়, ঠাকুরের একান্ত অনুগত ও শ্রদ্ধাবান্ সেবক। ঘোষ মহাশয়ের সমস্ত পরিবারটিই স্বতন্ত্র রকমের। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি হইতে কচি খোকা খুকীটি পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তায়, চাল চলনে, আচার ব্যবহারে যেন ঠাকুরের ভাবে মাখা। দেখিলে মনে হয়, ঠাকুর ভিন্ন এই পরিবারের কাহারই জীবনে আর যেন কিছুই লক্ষ্য নাই। সহজ ভাবে নিঃসঙ্কোচে ঠাকুরের সঙ্গে মিলামিশা, এই পরিবারের ছেলে বুড়োর যেমনটি দেখিতেছি, এমন অল্পই দেখা যায়। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! ঠাকুর-গতপ্রাণ এই পরিবারের ভিতরেও বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল।

একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সকলেই দেখিলাম, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী আশ্রমসংলগ্ন— ঠিক পূর্ব্ব দিকে। আর কোথাও একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই; কিন্তু ঐ বাড়ীর উঠানে, ঘাসের উপরে ও গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত প্রায় সর্ব্বত্রই পড়িয়া রহিয়াছে। কুঞ্জ বাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রভৃতি কয়েক জনের সকালবেলা হইতে জ্বর আরম্ভ হইল। এই জ্বরের মাত্রা, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া একশত চার পাঁচ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়িল। রোগীরা সকলেই শয্যাগত, মূর্চ্ছিতপ্রায়। ঘোষ মহাশয়ের বৃদ্ধা শাশুড়ী, একবার ঠাকুরের নিকটে, আর একবার নিজ বাড়ীতে, ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবসর পাইয়া বৃদ্ধা, ঠাকুরকে সমস্ত বিপদের কথা পরিষ্কাররূপে জানাইলেন। শুনিলাম, ঠাকুর নাকি বৃদ্ধাকে খুব ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁরই অপরাধে এ সকল উৎপাত ঘটিতেছে। বৃদ্ধাকে ঠাকুর অপরাধের হেতু নিজ হইতে বলিবার পূর্ব্বেই, বৃদ্ধা বলিলেন— "কয়দিন থেকে, নাম কর্‌বার সময়ে, কালীমূর্ত্তি আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছিলেন। যতই নাম করি, ততই কালী আমার আরও নিকট হইতে

থাকেন। আমি অনেকবার কালীকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি যান নাই। পরে, ঘর ঝাঁট দিয়া, ঝাড়ু নিয়া বসিয়া, দরজার ধারে নাম করিতেছি, দেখিলাম কালী সাম্‌নে দাঁড়ান। বারংবার সরিয়া যাইতে বলিলাম, গেলেন না; তখন আমার রাগ হ'লো, হাতে ঝাড়ু ছিল, উহাই ছুঁড়িয়া মারিলাম। তার পর থেকে আর কালীকে দেখি নাই।"

ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন— **"ক'রেছ কি? কালী কাঁচা-খেকো দেবী, তাঁকে তুমি ঝাঁটা মার্‌লে? লোকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে একবার যাঁর দর্শন পায় না, দয়া ক'রে তিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর তুমি তাঁকে ঝাঁটা মার্‌লে?"**

বৃদ্ধা বলিলেন— "আমি ভগবানের নাম করি, তাঁকেই ডাকি; কালী আমার কাছে আসেন কেন? আমি মনে করেছিলাম, কালী আমার সাধনপথের প্রলোভন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"সে কি? কালী কি ভগবান্ নন্?"**

বৃদ্ধা বলিলেন— "শ্রীকৃষ্ণইতো ভগবান্। নাম তো তাঁরই করি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"দীক্ষাকালে ভগবানের কি কোন নির্দ্দিষ্ট একটি রূপের কথা বলা গিয়াছিল? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি রয়েছেন, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁরই ভিতরে রয়েছে, তিনিই ভগবান্। তিনি কি দ্বিভুজ মুরলীধর, না চতুর্ভুজা, তা তো কিছুই বলা হয় নাই! তিনি কোন্ রূপে তোমার নিকট প্রকাশ পাবেন, তা তিনিই জানেন। আগে থেকে এ সব কল্পনা কেন?"**

বৃদ্ধা বলিলেন— "তবে এখন কি কর্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মানসিক ক'রে, গিয়ে কালীপূজা কর। কালীপ্রতিমা এনে ব্যবস্থামত পূজা কর্‌তে হবে।"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া, বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন— **"তোমার শাশুড়ী তো শুন্‌বে না। তুমি শীঘ্র কালীপূজা কর, নচেৎ অকল্যাণ হবে।"**

ইহার পরই কুঞ্জ বাবুর বাড়ীতে কালীমূর্ত্তি আসিল। ব্যবস্থামত, যথাশাস্ত্র বেশ সমারোহের সহিত কালীপুজা হইল। এই পুজার দিনে কি কারণে জানি না, বৃদ্ধার প্রতিনিধি রূপেই হউক অথবা একটি ব্রাহ্মণের উপবাস করা ব্যবস্থা বলিয়াই হউক, ঠাকুর আমাকে নিরম্বু উপবাস করিতে বলিলেন। আমিও সারা দিন উপবাস করিয়া রহিলাম।

রাত্রিতে কালীপূজা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর যাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন বিষয়ে ঠাকুর পরে এক সময়ে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

ঠাকুরের স্বহস্তে লেখা— **"প্রথম দেখিলাম, মা কালী নৈবেদ্যের আমটি মাথায় লইয়া বসিয়া আছেন। পরে দেখিলাম, মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রকে স্কন্ধে লইয়া দণ্ডায়মান। তদনন্তর**

দেখিলাম, গরুড়ের স্কন্ধে বিষ্ণু রহিয়াছেন। পরে দেখি, মহাদেবের উপরে কালীমূর্ত্তি। তাহার পরে দেখিলাম, বলরামের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। অনন্ত ভাব, কে বুঝিবে!"

এই পূজায়, ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু বলিদান হইল। বহু গুরুভ্রাতা ভগ্নী পূজার পরদিন, পরম পরিতোষে প্রসাদ পাইলেন।

কালীপূজা হইয়া গেল, পরে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনার অজ্ঞাতসারেই কি কালী এরূপ একটা উৎপাত ঘটাইলেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তাকি কখনও হবার যো আছে? কালীকে ঝাঁটা মার্‌তেই কালী এসে আমতলায় বল্‌লেন্— 'দেখ্, আমাকে আহ্বান ক'রে অপমান করেছে; আমি ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'— তার পরই এই সব।"**

আমি বলিলাম— "বৃদ্ধার আর এতে কি শিক্ষা হ'লো?"

ঠাকুর বলিলেন— "যা হয়েছে তাই যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম— "কেন, কালী ঐ বুড়ীকে কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন— **"ও বুড়ীযে বড় সহজ বুড়ী নয়। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একটি ভদ্র লোকের বাড়ীতে, বহুকাল থেকে একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ ভদ্রলোকের মাঠাকরুণ খুব শ্রদ্ধাভক্তির সহিত প্রত্যহ তাঁর সেবাকার্য্য করেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি বাড়ী গেলেই, কালীর প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন, আর মন্দিরের বারান্দায় নানাপ্রকার অনাচার করতেন। কালী এক দিন বৃদ্ধাকে স্বপ্নে বল্‌লেন, 'ওগো! সাবধান থাকিস্। তোর ছোট ছেলে যে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ করেছে। নিষেধ ক'রে দিস্। আবার ঐরূপ কর্‌লে, আমি তোর বড় ছেলের ঘাড় মট্‌কাব!' বৃদ্ধা বল্‌লেন, 'কেন মা, বড় ছেলের ঘাড় মট্‌কাবে কেন? বড় ছেলে ত কোন অপরাধ করে নাই। ঘাড় মট্‌কাইতে হয় তো ছোট ছেলেরই ঘাড় মট্‌কাও না কেন?' কালী বল্‌লেন, 'ওগো, সে যে আমাকে একেবারেই মানে না, কিছুই গ্রাহ্যি করে না! তাকে আমি পার্‌বো না।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "একই স্থানে দীক্ষালাভ ক'রে, একই নাম জপ ক'রে, কেহ কালী দেখেন, কেহ বা কৃষ্ণ দেখেন, আবার কেহ কেহ অন্য দেবদেবীও দেখেন, এরূপ হয় কেন?'

ঠাকুর বলিলেন— **"যিনি যে বংশের, তার নিকটে প্রথম প্রথম সেই বংশের কুলদেবতাই প্রায় প্রকাশ হন্। পরে ক্রমে ক্রমে সবই হ'য়ে থাকে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "নাম করতে কর্‌তে যাহা কিছু প্রকাশ হয়, কি প্রকার ব্যবহার কর্‌লে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"নাম কর্‌তে কর্‌তে যা কিছু প্রকাশ পাবে, খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রে নমস্কার ক'রে, সেখানেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর্‌তে হয়। ওরূপ কর্‌লেই কল্যাণ হয়।"**

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "কি আশীর্ব্বাদ চাইতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ভগবানের চরণে মতি গতি হউক, তাঁর চরণে ভক্তি হউক, এই মাত্র আশীর্ব্বাদ চাইলে তাঁরাও সন্তুষ্ট হন্।"**

গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

কিছুদিন হইল, ঠাকুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে, গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত,* পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ** প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রসিদ্ধ, সিদ্ধ ফকির সাহেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই ফকির সাহেবকে সকলেই সা-সাহেব বলেন। সা-সাহেবের একটি যুবক শিষ্য আছেন, তিনিও মুসলমান। এই শিষ্যটির অদ্ভুত অবস্থা ও অসামান্য গুরুভক্তির কথা ঠাকুর সময়ে সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন। ঐ দিনের ঘটনাটি যেমন শুনিলাম, লিখিয়া রাখিতেছি— বৃদ্ধ সা-সাহেবের একপাশে শিষ্যটি নাড়ুগোপালের মত উপবিষ্ট থাকিয়া করযোড়ে গুরুর দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন; যেন কোন হুকুম পাইলেই তাহা তামিল করিবেন, এই ভাবে ব্যস্ততার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন। কখনও কখনও ময়দানের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিয়া অমনি হাতে ঠেঙ্গা লইয়া বিস্তৃত মাঠে ছুটাছুটি করেন, শূন্য স্থানেই দু'হাতে ঠেঙ্গা চালাইয়া চীৎকার করিয়া বলেন, 'আরে, উধার যা, হট্; এধার কাহে আয়া? কিষণ্জী তো ওধার গিয়া।' কখনও বা শূন্য মাটির উপরে লাঠি মারিয়া বলেন, "আরে শালা! বলাইজীকা বাত নেহি মান্‌তা? মারেঙ্গে ডাণ্ডা, তো মালুম্ হোই।' এই শিষ্যটির নিকট অনেক

---

* পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। — ঢাকা, বিক্রমপুরে, 'তেজপুর বগুনিয়া' গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। ইঁহার উৎসাহপূর্ণ জীবনে সত্যনিষ্ঠা ও সাধনশীলতা দেখিয়া, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিমাপূজা অপরাধ যখন মনে হইল, সেইদিন হইতে, পূজার সময়ে পাছে ঢাকের শব্দ কাণে যায়, এই ভয়ে তিনি সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।

ঠাকুরের নিকট ইঁনিই নাকি সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি আর ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া প্রায় হন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী একটানা অসাধারণ সাধনচেষ্টা এবং দুর্ল্লভ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ঠাকুরের অর্ন্তদ্ধানের পরে, ইনি ঠাকুরের সমাধি আশ্রমেই শেষদিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে দোলপূর্ণিমার দিনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

**মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, B.L. নিবাস দমদমার নিকট কেদেটি গ্রাম। ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিছুকাল পরেই, ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঠাকুর পূর্ব্ব-বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করার পর, মন্মথবাবু, উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন (পূর্ব্বেও করিয়াছিলেন)। তখন ইঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে মনে করিতেন, বুঝি এই ব্যক্তির দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভাব পূর্ণ হইবে। ইঁহার বক্তৃতাকালে শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত হইয়া থাকিতেন। কিছুকাল পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন, পরে কাণপুরে ওকালতি কার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন তথায়ই অতিবাহিত করিলেন।

সময়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা প্রকাশিত হয় এবং ইনিও তাহাতে যোগ দেন। গরু বাছুরদের বেচাল দেখিলে, সময়ে সময়ে ঠেঙ্গা হাতে লইয়া, ইনিও গিয়া শাসন করিয়া থাকেন।

ঐ দিন সা-সাহেব একটু চিন্তাযুক্ত ভাবে বসিয়া আছেন, কি যেন ভাবিতেছেন; দেখিয়া শিষ্যটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— "সা-জী। আপ্ দুঃখী কাহে ভ্যায়া?"

সা-সাহেব বলিলেন— "আরে, গুরুজীকা হুকুম হুয়া, শাদি কর্‌নেকো।" শিষ্য বলিলেন— "বাঃ, আচ্ছা তো। গুরুজীকা হুকুম, ও তো কর্‌নেই হোগা। আপ্ শাদি কীজিয়ে।" সা-সাহেব বলিলেন— "আরে তু' তো কহতে হো, আব্ লেড়্‌কী হাম্‌কো কোন্ দেয়েগা? মই তো বুঢ্‌ঢা হো গ্যায়ি।" শিষ্য বলিলেন— "কাহে, গুরুজী, হাম দে দেতে। হামারা জরুকো আপ শাদি কি জিয়ে।' সা-সাহেব বলিলেন— "সো ক্যায়্‌সে হোগা, তু জিন্দা হ্যায়। খসম্ মর্‌ণেসে জরুকো নিকা হো সেক্‌তা হ্যায়।" শিষ্যটি একটু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, হাতে তালি দিয়া বলিলেন— "আচ্ছা তো, গুরুজী! আচ্ছা তো; উস্‌মে মুশ্‌কিল ক্যা? আভি হাম্ মর্ যাই, হামারা জরুকো আপ্ নিকা কীজিয়ে।" সা-সাহেব শিষ্যটিকে অনেক করিয়া থামাইলেন, শিষ্যটি এক একবার চমকিয়া উঠিয়া সা-সাহেবকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "গুরুজীকা হুকুম, ও তো কর্‌নেই হোগা।" সা-সাহেব, বোধ হয়, শিষ্যের গুরুভক্তি দেখাইতেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট এই খেলা খেলিলেন। অদ্ভুত শিষ্য! অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!!

সা-সাহেবের সাধন ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি, একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করিলে, ঠাকুর বলিলেন-- **"এঁদের সাধনে নিজেদের পুরুষকারই প্রধান, গুরুকৃপাও চাই। আমাদের সম্পূর্ণ গুরুকৃপা, পুরুষকারের কিছুই অপেক্ষা করে না। এই মাত্র।"**

শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান।

কিছুকালযাবৎ শ্রীধর পীড়িতাবস্থায় আছেন। সময়ে সময়ে সটকজ্বরে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। উপস্থিত শ্রীধরের উপস্থের অগ্রভাগে একটি ফোড়া হইয়া বিষম যন্ত্রণা দিতেছে। অনভিজ্ঞ একটি গুরুভ্রাতাকে যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"বেশ করিয়া কষ্টিক লাগাইয়া দাও, ফোড়া সারিয়া যাইবে।" শ্রীধর আর দ্বিধা না করিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাতে কষ্টিক লাগাইয়া ভয়ানক ঘায়ের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। এখন শ্রীধর দিনরাত চীৎকার ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। মহেন্দ্র দাদা, শ্রীধরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি ভাই শ্রীধর! কি হয়েছে?" শ্রীধর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অমনই সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জবাব দিলেন— "আরে ভাই! আর কি হবে? দুষ্কৃতির ভোগ! সে দিন ঐ কুকুরটা এখানে এসেছিল। — আর কি বল্‌ব— বেগ সামলাতে পার্‌লাম না, তাই কুকর্ম্মের ফল। হায় কপাল।"

মহেন্দ্র দাদা, পাগ্‌লা শ্রীধরের প্রকৃতি জানেন, মাথা গরম হইলে শ্রীধর সবই বলিতে পারেন, সবই করিতে পারেন, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন এবং অবসর মত শ্রীধরের কথা ঠাকুরকে বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন— **"রাম! রাম! ওসব কিছু নয়, কিছু নয়। শ্রীধরের মাথা গরম হ'লে, ওরূপ ঢের মিথ্যা কথা বলে। ঔষধ দিয়ে ঘা করেছে।"**

মহেন্দ্র দাদা ভাবিলেন— মাথাপাগলা শ্রীধর দ্বারা সব কাজই ত সম্ভব। শ্রীধর নিজেই তো তাঁর দুষ্কৃতির কথা বলিলেন, শ্রীধরের দুষ্কার্য্য গোপন করিবার জন্যই ঠাকুর, শ্রীধরের কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইযা দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, মহেন্দ্র দাদা এক দিন শ্রীধরকে কথায় কথায় বলিলেন— "শ্রীধর। তোমার রোগের কথা সমস্ত গোঁসাইকে যাইয়া বলিয়াছিলাম; তিনি 'ওসব কিছু নয়, শ্রীধর মিথ্যা কথা বলেছে, ঔষুধ দিয়ে ঘা করেছে' বলিয়া, তোমার সব কথা ঢাকিয়া দিলেন।" শ্রীধর শুনিয়া মহেন্দ্র দাদার দিকে একটু চাহিয়াই খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিলেন— "মিত্রি! এবার তুমি ঠ'কে গেলে। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর্‌লে, আর গোঁসাইয়ের কথায় বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না!" মিত্রি দাদার তখন হুঁস্ হইল; তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। অনেক সময় গুরুভ্রাতাদের নিকটে এই বিষয় বলিয়া, মিত্রি দাদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঠাকুরের এমন নিষ্ঠাবান্ ভক্তেরও যখন এই প্রকার মতিভ্রম হয়, তখন আমি আর কোথায় আছি?

শ্রীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি।

শ্রীধর, ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণের পর, ঠাকুর সঙ্গছাড়া কখনও হন নাই বলিলেই হয়; বিশেষ প্রয়োজনেও শ্রীধর, ঠাকুরের সঙ্গত্যাগে নারাজ, উহা যেন যমযাতনা মনে করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শ্রীধরকে একান্ত ভজনপরায়ণ, শান্ত, সরল, নিষ্ঠাবান্, বিশ্বাসী এবং অতি মধুর প্রকৃতির একজন ভাবে মগ্ন মহাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। আবার মাথা গরমের অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বিষম পাগল বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের উদয়ের সময় হইতে শ্রীধরের মাথা গরমের সূচনা হয়, আর চন্দ্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ চড়িতে থাকে। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধর কোথায় কি অবস্থায়, কোন্ রূপ ধরিবেন, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই সময়ে আশ্রমস্থ সকলেই সশঙ্কিত থাকেন, কখন শ্রীধর কার ঘাড়ে চাপেন। কিন্তু এই উন্মাদ অবস্থায়ও শ্রীধর কোন না কোন প্রকাবে ধর্ম্মেরই একটা অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী হইতে, তাহাদের জ্ঞাতসারে ঝগড়া করিয়া বা অজ্ঞাতসারে, প্রয়োজনীয় কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালেন এবং দিনরাত একভাবে বসিয়া ধুনি তাপিতে থাকেন। কখনও একতারা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। আবার কখনও বা অন্যে পছন্দ না করিলেও, নিজ হইতেই ঘাড়ে পড়িয়া, কাহাকেও ধর্ম্ম উপদেশ করিতে করিতে অস্থির করিয়া তুলেন। এ সময়ে শ্রীধর কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া, খুব নির্ভীক ও সরল ভাবে দশ জনের নিকট তাহা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে থাকেন। মধুরপ্রকৃতি শ্রীধরকে মাথা গরমের অবস্থায়ও প্রায় সকলেরই মধুর লাগে। যখনই শ্রীধর যেখানে থাকুন

না কেন, সকল অবস্থায়ই শ্রীধর আনন্দে ডগমগ। নিতান্ত বিমর্ষ ব্যক্তিও শ্রীধরের সঙ্গপ্রাপ্তিতে হর্ষ লাভ করেন। তবে মাথা গরমের অবস্থায় যখন শ্রীধর যাহার রাশিতে ভার হন, তখনই তাহার পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়।

গুরুকে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাথা গরম।

সম্প্রতি হাই স্কুলের জনৈক প্রসিদ্ধ হেড্ মাষ্টার, স্ত্রীবিয়োগ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে তাঁর সমস্ত শোক দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন- "মহাশয়! এখন আমার শান্তি কিসে হয় বলিতে পারেন?"

ঠাকুর তাঁহার দুঃখে খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন— **"শোক অতি বিষম জিনিস; ইহার শান্তি কিছুতেই হয় না। সময় যত যাবে, শোক ততই আপনা আপনি ধীরে ধীরে কমে আস্‌বে। এখন রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ, সৎসঙ্গ ও যতটুকু পারেন, ভগবানের নাম ক'রে সময় কাটাতে চেষ্টা করুন, এতে কতকটা শান্তি পাবেন।"**

ভদ্রলোকটি ঠাকুরের উপদেশে বোধ হয় তেমন তৃপ্তিলাভ করিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরের এক কোণে শ্রীধর নিজ আসনের সম্মুখে ধুনি জ্বালিয়া, স্থিরভাবে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া জপ করিতেছিলেন। কম্বলমোড়া লেংটিপরা শ্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, ভদ্রলোকটির মনে একটা আশা হইল; তিনি কিছুক্ষণ শ্রীধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী! কিছুকাল হয় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার বড়ই ক্লেশ, একটু আরাম কিসে হয় বলিতে পারেন?" শ্রীধর শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন— "হাঁ, আরাম কিসে হবে বল্‌তে পারি। ঐ ঘরে যান, গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে বসুন, তাঁকে কষ্টের কথা সব খুলিয়া বলুন, আরাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন— "মশায়! এতক্ষণ তো গোঁসাইয়ের কাছেই ছিলাম। তিনি যা বল্‌লেন তাও শুন্‌লাম। ও সব তো ঢের শুনা আছে; আপনি দয়া ক'রে কিছু বলুন না?" 'ও সব তো ঢের শুনা আছে' ঠাকুরের কথায় এরূপ অবজ্ঞাসূচক ভাব দেখিয়া, শ্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল; শ্রীধর বলিলেন, "বিয়ে কর্ব্বেন?"

মাষ্টারটি বলিলেন— "না মশায়, সে সব আর না। আপনি আমাকে এমন কিছু প্রক্রিয়ার উপদেশ বলুন, যাতে একটু আরাম পাই। শ্রীধর তখন খুব উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়া দিয়া বলিলেন— "আমার কাছে প্রক্রিয়া শিখ্‌বেন! আচ্ছা, যান, এখন গিয়ে এই ক্রিয়া করুন, খুব আরাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি শ্রীধরের হাতমুখনাড়া দেখিয়া এবং শ্রীমুখের বচন শুনিয়া চটিয়া আগুন হইলেন। অমনই গোঁসাইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীধরের সমস্ত ব্যবহারের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"একে কি আপনি শাসন কর্‌বেন না?"

ঠাকুর এ সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন— **"একি শ্রীধর! তুমি তো অতি বিষম লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি! এই ভদ্রলোকটিকে তুমি কি বলেছ?**

এরূপ পাগলামী কর্‌লে এখানে তোমার থাকা হবে না। খুব সাবধান হ'য়ে চল, না হ'লে এখনই এখান থেকে চ'লে যাও।'

শ্রীধরের মাথা আগেই গরম হইয়াছিল, এখন আবার ঠাকুরের ধমক খাইয়া, তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শুনে ইঁহার তৃপ্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই। আমার কাছে গেছেন শান্তির উপদেশ নিতে! আমি কি আচার্য্য? আমার যখন স্ত্রী মরেছিল, তখন আমি যা ক'রে আরাম পেতাম, তাই বলেছি। আমার যেমন অধিকার, আমি তো তেমনই বল্‌ব। এতে আমার দোষ হ'লো?"— এই মাত্র বলিয়া, শ্রীধর অমনই দ্রুতপদে নিজ আসনে চলিয়া আসিলেন এবং চোখ মুখ রাঙ্গাইয়া বলিতে লাগিলেন— "শালা গোঁসাইয়ের কথা অগ্রাহ্য ক'রে, আমার কাছে এসেছে আরামের উপদেশ নিতে!" সমস্ত দিন শ্রীধর রাগে গমগম করিয়া কাটাইলেন। ঠাকুর, ভদ্রলোকটিকে শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থার পরিচয় দিয়া, ক্ষমা চাহিলেন এবং খুব মিষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। শ্রীধরের কার্য্য মাথা গরম হইলে কখনও কখনও এই প্রকার সৃষ্টিছাড়া দেখা যায়।

ঠাকুর আমাদের মত একগুঁয়ে, অসংযত ও উন্মাদ প্রকৃতি শিষ্যদের বুকে রাখিয়া, প্রশান্ত সাগরের ন্যায় কি প্রকারে স্থির আছেন এবং সকলের বিষ হজম করিয়া কি ভাবে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এইটুকুই দেখিবার বিষয়। প্রতিপদেই আমাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতায় ঠাকুরের ধৈর্য্য, বিরোধ বিসংবাদে শান্তি এবং সকলের সকল প্রকার দুরবস্থায় ঠাকুরের অসাধারণ দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি।

শ্রীধরের জঠরানলে আহুতি।

শ্রীধরের আর একটি কার্য্য এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। শ্রীধরের অসুখ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে, একদিন আমাদের আশ্রমের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইল। সকালবেলা উঠিয়া বুড়োঠাক্‌রুণ (দিদি-মা) ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দুই তিন বাড়ী ঘুরিয়া, ধার করিয়া দু'টি টাকা আনিলেন এবং শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীধর! এখন ধ্যান ধারণায় চল্‌বে না, আসন থেকে ওঠ, ভাণ্ডার একেবারে শূন্য, একবার বাজারে যাও, বাজার হ'তে এলে রান্না চড়্‌বে।"

শ্রীধর বুড়োঠাক্‌রুণের কথায় কোন জবাব না দিয়া চোখ বুজিলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ পুনঃ পুনঃ শ্রীধরকে ডাকিতে আরম্ভ করায়, শ্রীধর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাজার কি অমনই হয়? টাকা ফেলুন; টাকা কই?" বুড়োঠাক্‌রুণ টাকা দিতেই, শ্রীধর টাকা হাতে লইয়া আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বাজারে যাইতে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! কি কি জিনিস আন্‌বে, তা একবার শুন্‌লে না?" শ্রীধর বলিলেন, "আমি কি ভাত খাই না? কি আন্‌বো তা আর জানি না? ডাইল আন্‌বো, চাউল আনবো, আবার কি?" বুড়োঠাক্‌রুণ আর বেশী কথা না বলিয়া, যে সকল জিনিস আনিতে হইবে বলিয়া দিলেন। শ্রীধর বলিলেন, "আপনি যান, গিয়ে উনুন্ ধরান, আমি তো যাব আর

আস্‌ব।” এই বলিয়া শ্রীধর ঝোলা কাঁধে লইয়া বাজারে চলিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল; শ্রীধর আসিতেছেন না দেখিয়া বুড়োঠাক্‌রুণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, শ্রীধরের কোন খোঁজ খবর না পাইয়া, এবাড়ী ওবাড়ী হইতে চাউল ডাইল ধার করিয়া আনিয়া, রান্না চাপাইলেন। রান্না হইয়া গেল, তথাপি শ্রীধর আসিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা সাড়ে বারটা, ঠাকুরের ধুনি আমতলায় জ্বলিল। ঠাকুর আহারান্তে আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় দুইটা; শ্রীধর একটা বড় পুঁটুলি ঘাড়ে লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে আমতলায়, ধুনি সম্মুখে রাখিয়া আসন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর অন্তর এক একবার শ্রীধর পুঁটুলি হইতে ধূপ্‌ধুনা, চন্দন, গুগ্‌গুলাদি 'মুঠেমুঠে' তুলিয়া, 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া কোন কথাই না বলিয়া, খুব আনন্দের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুড়োঠাক্‌রুণ, শ্রীধরের কথাই ঠাকুরকে বলিতে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় শ্রীধরকে স্থিরভাবে বসিয়া ধুনির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর, বুড়োঠাক্‌রুণকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ, শ্রীধরকে বলিলেন, “কি শ্রীধর! তুমি বাজারে যাও নাই?” শ্রীধর সে কথার কোন জবাব না দিয়া, খুব মনোযোগের সহিত পুঁটুলি হইতে ধুনা চন্দনাদি মুঠেমুঠে তুলিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আগুনে আহুতি দিতে লাগিলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ বলিলেন, “পাগল! এ কি কাণ্ড? এতে কি দিন যাবে?” শ্রীধর খুব তেজের সহিত বলিলেন, 'আবার কি বল্‌ছেন আপনি? জঠরানল তো অনল? আগুনে আহুতি দিলে কখনও আবার ক্ষুধা থাকে? শাস্ত্র জানেন?'

শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্‌রুণকে বলিলেন— **“আপ্‌নি বাজার কর্‌তে শ্রীধরকে টাকা দিয়েছেন। শ্রীধর ঐ টাকা দিয়ে ধূপধুনা এনে জঠরানলে আহুতি দিচ্ছেন।”**

সকলেই শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীধরের তখন বাক্যটি নাই, বুড়োঠাক্‌রুণ ধার করিয়া বাজারের টাকা দিয়েছিলেন, সুতরাং 'টাকা কি করিলে' বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। শ্রীধর আর আসনে না থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্‌রুণের নিকটে যাইয়া বলিলেন, “হয়েছে, হয়েছে ; এখন চলুন, এত বেলা হয়েছে, আমার ক্ষুধা পায় না? খাবার দিন, গালিতে পেট ভরে না।”

বুড়োঠাক্‌রুণ শ্রীধরের মাথা গরম বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি সঙ্গে লইয়া গিয়া খাবার দিলেন। শ্রীধরের এই প্রকার পাগলামী প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বুড়োঠাক্‌রুণের ঘাড়েই এ সকল উৎপাত উপদ্রব অনেক সময় পড়িয়া থাকে। শ্রীধরের মাথা-গরমের পাল্লায়, দিদিমার সহিষ্ণুতা ও দয়া দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

আশ্বিন মাস।

মাঠাক্‌রুণের সমাধিমন্দির।

আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে, মাতাঠাকুরাণীর দর্শন আকাঙ্খায় বাড়ী গেলাম। বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিতে দশ বার দিন বিলম্ব হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। অফিস, আদালত, স্কুল প্রভৃতির ছুটি হইল। দলে দলে গুরুভ্রাতা ভগিনীগণ গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে কত আনন্দ! মহাষ্টমীর দিনে মহামায়ার পূজা বহুকাল আমরা দেখি নাই। এবার ঠাকুরের কৃপায় তাঁরই ইচ্ছায় ঐ তিথিতে ভগবতী যোগমাযার অস্থি নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মাঠাক্‌রুণের নিত্য সেবা পূজা ঐ তিথিতে আরম্ভ হইবে। ঐ দিনের কল্পনা করিয়া এখন হইতেই আমাদের মনে কত আনন্দ। গুরুভ্রাতাদের সম্মিলনে, ঠাকুরের আশ্রমে একমাত্র ঠাকুরকে লইয়াই আমাদের নিত্য আনন্দ ও মহোৎসব। এবার মহাষ্টমীতে দেশব্যাপী মহা আনন্দের দিনে, ঠাকুর আমাদের স্নেহময়ী মাতা যোগমায়ার স্মৃতি জাগাইয়া, তাঁর শীতল বিমল আনন্দপ্রদ শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকিবাব অবসর দিবেন। এবার হইতে আমাদেরও প্রতি বৎসর মহাষ্টমী তিথিতে মহামায়া ভগবতী যোগমাযার মহাপূজা হইবে মনে করিয়া, গুরুভ্রাতাভগ্নীদের কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ!

মাঠাক্‌রুণের অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পূর্ব্বে, শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে, একদিন ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখিবে, এবার গেণ্ডারিয়াতে অবিলম্বেই শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিবে।' তখন একবার কল্পনাও করি নাই, যে ইহা মাঠাক্‌রুণেরই সমাধিমন্দিরে ঘটিবে।

মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে ; ঠিক নক্সার অনুরূপ হয় নাই। ঠাকুর, মন্দির দেখিয়া বলিলেন—**"ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে, তাতে কি মানুষের আর কোনও হাত আছে? নক্সা মত প্রস্তুত কর্‌তে, রাজেরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আর এক প্রকার হ'য়ে গেল। মন্দিরটি অনেকটা বিষ্ণুমন্দিরের মত হয়েছে।"**

মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রণালী।

পঞ্চমী তিথিতে, সকালে নয়টার সময়ে ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"মহাষ্টমীর দিনে প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি তুমি কর্‌বে। ঐ দিনে তোমার নিত্যকর্ম্ম মন্দিরে ব'সে ক'রো। চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো, তা হ'লেই হবে।"**

আমি বলিলাম— "সমস্ত চণ্ডীখানি পাঠ করিয়া কি হোম করিব? হোম কি যেমন করিয়া থাকি, তেমনই করিব?"

ঠাকুর বলিলেন—**'সমস্ত চণ্ডীপাঠ না ক'রেও হয়। যে হোম ক'রে থাক, তাই ক'রো, একশত আটটি আহুতি দিও।"**

পাছে চণ্ডীপাঠের সময়ে, প্রতিষ্ঠাকার্য্যে চণ্ডীপাঠ ভুল হয়, এই আশঙ্কায় চণ্ডী আবৃত্তি আরম্ভ করিলাম। ভাল দেখিয়া শুষ্ক বিল্বকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে দেখিতেছি, আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা! জয় গুরুদেব!

সপ্তমী তিথিতে, শ্রীমন্দিরের জমির মধ্যস্থলে পাকা চতুষ্কোণ 'সিমেন্ট' করা কুণ্ডের ভিতরে যোগজীবন প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা একটি কৌটায় ভরিয়া মাঠাক্‌রুণের অস্থি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার নামাঙ্কিত সাদা 'মার্‌বেল' প্রস্তরে আবৃত করিয়া, সিমেন্ট দিয়া পাকা করিয়া আঁটিয়া দিলেন। পরে উহার উপর একখানি জলচৌকি রাখিয়া, তদুপরি মাঠাক্‌রুণের ব্যবহৃত আসন, বালিশ, বস্ত্রাদি, গদি আকারে পরিপাটীরূপে সাজাইয়া, গৈরিক বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার একখানি 'ফটো' এবং ঠাকুরের লেখা "নামব্রহ্মের" পট কল্য উহার উপর স্থাপন করা হইবে।

নানা শ্রেণীর পত্রপুষ্পে মালা গাঁথিয়া, মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করা হইয়াছে। মন্দিরের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার মূলদেশে দুইটি পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। কল্য আম্রপল্লব, নারিকেল ও পুষ্পমাল্যে উহা যথারীতি সাজান হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমতলায় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনানন্দে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া, আপন আপন আসনে যাইয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম।

মাঠাক্‌রুণের সমাধি-প্রতিষ্ঠা।

মহাষ্টমীর দিনে অনুদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণাদি করিয়া আসিলাম। মালা, তিলক ধারণ করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, সমাধি প্রতিষ্ঠার অনুমতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কুতুবুড়ী ও মঙ্গলী প্রতিষ্ঠা কার্য্যের যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। দক্ষিণে মাঠাক্‌রুণের আসন রাখিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে নিজ আসন পাতিয়া বসিলাম। মাঠাক্‌রুণের 'ফটো'-কে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া গদির উপরে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিলাম। "নামব্রহ্মের" পটখানিকেও ঐ প্রকার নমস্কার করিয়া, মাঠাক্‌রুণের গদির উপরেই রাখা হইল। মন্দিরের মেজেতে বালি সাজাইয়া হোমের জন্য বিল্ব ও উডুম্বর কাষ্ঠ ঠিক করিয়া রাখিলাম। আতপ তণ্ডুল, রম্ভা, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে প্রস্তুত করা নৈবেদ্য কয়েকখানি আনা হইলে, হোমকুণ্ডের ধারে উহা ধরিয়া রাখিলাম। পরে আচমনান্তে কয়েকবার প্রাণায়াম ও কুম্ভক করিয়া স্থিরভাবে মাঠাকুরাণীর সেই স্নেহপূর্ণা কৃপাময়ী মূর্ত্তিকে ধ্যানে রাখিয়া, ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপান্তে, ফুল, তুলসী, বিল্বপত্রাদি দ্বারা মাঠাকুরাণীর পূজা করিয়া, ফটো ও নামব্রহ্মের পট পরিপাটীরূপে মালা, তুলসী, পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া সাজাইলাম। অনন্তর মহাষ্টমী পূজার লগ্নে শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল ; এই সময়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনিমেষ নয়নে ঠাকুর, মাঠাকুরাণীর ফটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া, কয়েক শ্লোক চণ্ডীপাঠ শুনিয়াই মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলেন

২৫ শে আশ্বিন, রবিবার।

এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে হেলিয়া দুলিয়া, মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গুরুভাইভগ্নীরা আনন্দধ্বনি করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার চণ্ডীপাঠ শেষ হইয়া গেল। মাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত সংযোগে অখণ্ডিত বিল্বপত্র দ্বারা হোম আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া মাত্রই, উহা দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া নানাবর্ণের শিখা বিস্তার করিয়া, মাঠাকুরাণীর ফটোর অভিমুখে ধাবিত হইল। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ নখপরিমিত এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, অতিশয় চঞ্চল ভাবে, সমস্ত অগ্নিতে ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া, ক্ষণে অন্তর্দ্ধান, ক্ষণে প্রকাশ হইতে লাগিলেন। মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিলাম না! অথচ অগ্নির যে দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথায়ই বিদ্যুতের মত অত্যুজ্জ্বল চঞ্চলমূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে, ক্ষণে প্রকাশ,ক্ষণে অন্তর্হিত হইতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। সে মূর্ত্তিটি আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া, আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। হোমকার্য্যে ১০৮টি আহুতিদান সম্পন্ন হইল। নৈবেদ্য মাঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, আরতি করিলাম। পরে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলাম। জয় ঠাকুর, তোমারই জয়! তোমারই জয়!! তোমারই জয়!!!

মধ্যাহ্নে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া, পক্বান্ন দ্বারা মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রহিল। ভোগ সরিলে, সকলে প্রসাদ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে কুতুবুড়ী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। তৎপরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকলে ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। কীর্ত্তনের পর, ঠাকুর স্বহস্তে হরির লুট বিলাইয়া, আপন আসনে যাইয়া বসিলেন। আমরাও স্ব স্ব স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম।

হোম করিতে করিতে শেষকালে অকস্মাৎ এক বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল। কাঁচা সিমেন্টের উপর হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায়, সিমেন্ট ফাটিয়া চটাচট্ শব্দে চটা উঠিয়া, জ্বলন্ত কয়লার সহিত চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত ঘরে ও বারান্দায় জ্বলন্ত কয়লা গিয়া পড়িলেও, এক টুকরা সিমেন্ট বা কয়লা, মাঠাকুরাণীর অর্দ্ধহস্ত তফাৎ আসনে বা আমার শরীরে আসিয়া পড়ে নাই।

শক্তিপূজা ও ভগবানের নরলীলা।

নবমীর দিনে প্রত্যূষে স্নান তর্পণ করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম।

২৬ শে আশ্বিন, সোমবার।

ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"তোমার নিত্যক্রিয়া মন্দিরে ব'সেই ক'রো, চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো।"**

গতকল্য মন্দিরের মেজের চটা উঠিয়া গিয়াছে বলাতে, ঠাকুর— **"মন্দিরের মেজেতে হোম না ক'রে, পিতলের যে একখানি বড় ধুনুচি আছে, তাতে হোম ক'রো।"**

আমি বুড়োঠাক্‌রুণের কাছে চাহিয়া ঐ ধুনুচি আনাইয়া লইলাম। নাম, প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপ করিয়া, গীতা ও চণ্ডী পাঠের পর হোম করিয়া, মাঠাকুরাণীর পূজা করিলাম। তৎপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। বেলা ১২টার সময়ে মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। 'ভোগ দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা আবশ্যক,' ঠাকুর এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময়ে পঞ্চপ্রদীপ, ধুনা, শঙ্খ, বস্ত্রাদি দ্বারা কুতুবুড়ী, মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনিতে আশ্রম যেন নৃত্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যা আরতির পর, সকলে মিলিয়া আমতলায় সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুর হরির লুট দিলেন।

(দশমীর দিনে) মাঠাকুরাণীর পূজা নিত্যই এক নিয়মে চলিল। আজ সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট শক্তিপূজা, দুর্গাপূজা, মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম— "শ্রীরামচন্দ্র কি দুর্গাপূজা করেছিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণে কোনও উল্লেখ নাই, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।"**

আমি বলিলাম— "শ্রীরামচন্দ্র ত স্বয়ং ভগবান্। তিনি ত সবই জানিতেন, সবই পারিতেন, তিনি আবার দুর্গাপূজা করিলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এ যে নরলীলা। এখানে জানা টানার, পারা না পারার কোন কথা নাই। তিনি যদি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায়ই সব কর্‌বেন, তা হ'লে আর অবতীর্ণ হলেন কেন? সেখানে থেকেই ত সব কর্‌তে পার্‌তেন। তাঁর আর অসাধ্য কি আছে? যাঁর ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে, তিনি মুহূর্ত্তে কি না কর্‌তে পারেন? যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন। লীলাসময়ে তাঁর আপন মায়াশক্তি দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন রাখেন, যেমন গুটিপোকা আপন সূতায় আপনি আবদ্ধ হয়। তাঁর লীলা কি বুঝ্‌বার সাধ্য আছে? শুধু তাঁর কৃপা।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "শ্রীরামচন্দ্র যে বালিবধ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"তাঁদের কথায় কর্ণপাতও কর্‌তে নাই, অনিষ্ট হয়। যাঁরা সমস্ত শাস্ত্র আগাগোড়া পড়েন না, বুঝেন না, তাঁরাই ওরূপ বলেন। যাঁরা শাস্ত্রের কতক অংশ গ্রহণ করেন, কতক অংশ ত্যাগ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনোমত কথাই বেছে নেন মাত্র। তাঁদের আবার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা কেন? শাস্ত্র বিশ্বাস কর্‌লে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস কর্‌তে হয়। একটু ক'রে, একটু না কর্‌লে চল্‌বে কেন? শাস্ত্রকর্ত্তারা**

কোন কথাই ত গোপন ক'রে যান নাই, সমস্ত বিষয়েরই পরিষ্কার মীমাংসা ক'রে গেছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একান্ত শরণাগত, ভক্ত সুগ্রীবকে রক্ষা কর্‌বার জন্যই যে শ্রীরামচন্দ্র, ভ্রাতৃদারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন, তাহা ত পরিষ্কাররূপে রামায়ণে লেখা আছে। কোনও শাস্ত্রগ্রন্থেরই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস ক'রে না পড়্‌লে, একটা অর্থবোধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত যাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না প'ড়ে, ইংরাজি পুস্তকে বাঘের গল্প, কুকুরের গল্প পড়্‌লেই ত পারেন। শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস ক'রে না পড়্‌লে, শাস্ত্রপড়া আর না পড়া সমান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রজগোপীরা যে ভগবতীর পূজা করেছিলেন, তাহা কি কোনও মূর্ত্তি গ'ড়ে? গোপীরা আবার শক্তিপূজা কর্‌লেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—**"শক্তিপূজা না ক'রে কারও কি পার পাবার যো আছে? শক্তির কৃপা না হ'লে কিছুই যে হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর্‌বার জন্যই কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। এখনও সেই প্রণালীমত ব্রজমায়ীরা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে, প্রাতঃস্নান ক'রে, যমুনার কূলে বালি দিয়ে বেদি প্রস্তুত করেন এবং তাতে কাত্যায়নী পূজা করেন। এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন হয় না। মূর্ত্তিপূজার বহু প্রণালী আছে। বেদীতে পূজা করা বা যন্ত্র এঁকে পূজা করা এই মূর্ত্তিপূজারই প্রকারভেদমাত্র।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুর্গা ও কালী একই ত শক্তি; কারও পূজা রাত্রিতে আবার কারও পূজা দিনে কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—**"শক্তিপূজা তন্ত্রমতেও হয়, আবার বৈদিকমতেও হয়। কালীপূজা তন্ত্রমতে রাত্রিতে হয়, আর দুর্গাপূজা বৈদিকমতে দিনে হয়। হিমালয়ের ঘরে প্রথমে শ্যামবর্ণা দ্বিভুজা কালী জন্ম গ্রহণ করেন, তার পরে পার্ব্বতী।"**

ব্রহ্মজ্ঞান ও অবতারতত্ত্ব।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"নির্গুণ পরব্রহ্মই কি আবার সাকার হ'য়ে লীলা করেন? মহাপ্রলয়ে এ সমস্তই কি সেই পরব্রহ্মে লীন হয়?"

ঠাকুর বলিলেন—**"হাঁ, মহাপ্রলয়ে কিছুই আর থাকে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মনুষ্য,পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যা কিছু সমস্তই অদ্বয় ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রুতিতে বলেছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।।' 'যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে' ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু 'যাহা কর্ত্তৃক হইয়াছে,' এইরূপ বলেন না। পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন; করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই। 'যাহা হইতে', যেমন মৃত্তিকা হ'তে ঘট, স্বর্ণ হ'তে কুণ্ডল, সমুদ্র হ'তে তরঙ্গ ইত্যাদি। মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই এক প্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণেরই এক প্রকার পরিণাম কুণ্ডল, এবং সমুদ্রেরই এক**

প্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তা হ'লেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র বল্‌লে হবে না; ঘটই বল্‌তে হবে, তরঙ্গই বল্‌তে হবে। সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বয়, আর চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন; 'কুম্ভকার এবং ঘট' এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ; লতা, আর এই লাঠিখানি, মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি, সবই ব্রহ্ম। ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারে। নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হ'লে, সগুণ সাকারতত্ত্ব বুঝ্‌বার কি সাধ্য আছে? সাকার কি এমনই সোজা কথা? শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

এই নির্গুণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হ'য়ে লীলা কর্‌ছেন। কাক ভুশুণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। 'সেই নির্গুণ পরব্রহ্মই কি এই দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে?' এক দিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাচ্ছেন ; কণিকা মাটিতে পড়্‌ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কাক ভুশুণ্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধর্‌বার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুশুণ্ডী ভয়ে পলাল। কিন্তু হাত তাঁর পেছনে পেছনে চল্‌ল। কাক ভুশুণ্ডী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন, শ্রীহস্ত তাঁর পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনার সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্‌লেন। তখন ভুশুণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন। দেখ্‌লেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতরে বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে, এই রূপ কতশত রাম, লীলা কর্‌ছেন। নিজেকেও ভুশুণ্ডী ঐরূপ একস্থানে দেখ্‌লেন। এ সকল দেখে ভুশুণ্ডী ত অবাক্‌। শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাস্‌লেন, ভুশুণ্ডী অমনি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়্‌লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখ্‌লেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কৃপা করলেন; অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ হ'ল। তখন ভুশুণ্ডী সমস্তই বুঝ্‌লেন। খণ্ডপ্রলয়ে একটি ব্রহ্মাণ্ডের লয় হ'লেও, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে যায়; কিন্তু মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তুই যখন নাই, তখন কিছু আর থাকে না, এরূপও বলা যায় না, থাকে এরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য, সুতরাং সমস্তই নিত্য।"

এ সকল উপদেশের পর নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ হইল। পাগ্‌লা শ্রীধর হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তাহাও নহে, ব্রহ্মকে জানি নাই তাহাও নহে; এই কথার অর্থ যিনি জানিয়েছেন তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানিয়াছেন।" উপনিষদের এই কথা শ্রীধর এ সময়ে বলাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ভগবানের নরলীলা।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "পরমেশ্বরকে ত সকলেই বিশ্বাস করে; তবে তিনি সংসারে যখন অবতীর্ণ হন, তাঁকে ধরা যায় না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— "অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই রয়েছেন এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথম এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় 'আহা উহু, গেলাম্‌রে, ম'লাম্‌রে,' চীৎকার ক'রে ছট্‌ফট্‌ করছেন, শোকেতে অস্থির হ'য়ে 'কোথা গেলরে, কোথা গেলে পাবরে' ব'লে, কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন, কখনও বা পিপাসায় অস্থির হচ্ছেন, ইনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহা মনে করা, বিশ্বাস করা কি তামাসার কথা। তিনি যাঁকে দয়া করেন, সেই মহা ভাগ্যবান্‌ই মাত্র তাঁকে বুঝ্‌তে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত এতে সংশয় হয়েছিল। ব্রহ্মা ভাব্‌লেন—'এ কি কখনও সম্ভব! যিনি মাঠে মাঠে হৈ হৈ ক'রে গরু চরাচ্ছেন, রৌদ্রে কাতর হ'য়ে গাছতলায় যাচ্ছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচ্ছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখালবালকদের কাঁধে নিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটোছুটি কর্‌ছেন, কখনও কাদায় পড়্‌ছেন, আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি ক'রে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পলাচ্ছেন, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, এই গোকুলে? আচ্ছা, দেখা যাক্‌।' এই ভেবে তিনি, অকস্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্ঠি, ইত্যাদি সমস্ত হরণ ক'রে, পর্ব্বতের এক গুহায় লুকায়ে রাখ্‌লেন, দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চ'লে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কর্ম্ম বুঝে, তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেই গোবৎস, রাখালবালক, বেণু, যষ্ঠি, শিঙ্গা, সিকা, হাঁড়ি, লাঠি সমস্তই হ'লেন; কেহই বিন্দুমাত্র জান্‌তে পার্‌লেন না। বলরাম সেদিন গোষ্ঠে যান নাই; বৎসগণের প্রতি গাভীগণের, সন্তানদিগের প্রতি গোপীগণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাব্‌লেন, 'এ কি? এমনটি ত পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখ্‌ছি।' তিনি কিছু স্থির কর্‌তে না পেরে ধ্যানে বস্‌লেন; সমস্ত তখন তিনি জান্‌তে পার্‌লেন। একটি বৎসর এই ভাবে চ'লে গেল; পরে ব্রহ্মা এসে দেখ্‌লেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নিয়ে পূর্ব্বেরই মত লীলা কর্‌ছেন। তখন ব্রহ্মা পর্ব্বতগুহায় যেয়ে দেখ্‌লেন, তিনি যে ভাবে ঐ সব রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। ব্রহ্মা একবার পর্ব্বতগুহায়, আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌লেন; পরে একেবারে অবাক্‌ হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পড়্‌লেন ও স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন— 'প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি অবোধ। সন্তান জননীর কোলে থেকে কত অত্যাচার করে, লাথি মারে, তাতে কি জননী ক্রোধ করেন? তুমিই ধন্য! ধন্য ব্রজবাসিগণ! এই ব্রজের বৃক্ষ লতাও ধন্য! কারণ তাঁরা তোমার ও ব্রজবাসীদের চরণধূলির স্পর্শ পায়। দয়া ক'রে আমাকে তোমার

ব্রজের বৃক্ষ লতা ক'রে রাখ।' গ্রন্থাদিতে যেমনটি লেখা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মমত বাস কর্‌লে ক্রমে ক্রমে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হ'লে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বুঝ্‌বার যো নাই; মানুষের আর কথা কি?"

সংশয়সম্বন্ধে উপদেশ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সঙ্গে থাকিয়া ত দেখি, সন্দেহ পদে পদে। এর উপায় কি? বিশ্বাস না হ'লে ত নিস্তার নাই।

ঠাকুর বলিলেন— **সংশয়ও হয় আবার বিশ্বাসও হয়; সবই তাঁর ইচ্ছায়। শাক্যসিংহ যখন সংসারে এলেন, এক দিন বাড়ীর বাহির হ'য়েই, জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে অকস্মাৎ বিষম বৈরাগ্য হ'ল। তিনি গৃহ ত্যাগ কর্‌লেন। ছয় বৎসর কাল একটানা কঠোর তপস্যা ক'রে একেবারে স্থাণুর মত হ'য়ে গেলেন। কিন্তু যা চান, তা লাভ হ'ল না। তিনি নিরাশ হ'য়ে আসন হ'তে উঠে পড়্‌লেন; একটি শবের বস্ত্র পেয়ে তা পর্‌তে উদ্যত হ'লেন। দেবতারা ঐ বস্ত্রখানা ধুয়ে এনে দিলেন। বুদ্ধদেব ক্ষুধিত ছিলেন, আহার কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌লেন। সেই সময়ে অভুক্ত অতিথিকে ভোজন করাবার জন্য সুজাতা লোক পাঠালেন; সে খুঁজে কোথাও লোক পেল না, একমাত্র বুদ্ধদেবকে দেখ্‌তে পেল। সুজাতা শাক্যসিংহকে একটি সুবর্ণ বাটিতে মিষ্টান্ন ভোজন কর্‌তে দিলেন। নিরঞ্জনা নদীতে দাঁড়ায়ে শাক্যসিংহ মিষ্টান্ন খেতে লাগ্‌লেন। দেবতারা তখন তাঁর চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত যে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন, তাঁরা শাক্যসিংহকে মিষ্টান্ন ভোজন কর্‌তে দেখে, পরস্পর বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লেন— 'দেখেছ ভাই? এ বেটা বিষম ভণ্ড; এইরূপে মিষ্টান্নই খায়, কিন্তু আমাদের জানিয়ে খায় না। চল, এই ভণ্ড বেটার সঙ্গে থেকে আর কিছুই লাভ নেই।' এই ব'লে, সামান্য কারণে খট্‌কা লাগাতে, তাঁরা সকলে চ'লে গেলেন। শাক্যসিংহ, ভোজনান্তে সুজাতাকে বল্‌লেন, 'ভগ্নি, মিষ্টান্ন খেয়েছি, এই বাটি কি কর্‌ব?' সুজাতা বল্‌লেন— 'মিষ্টান্নের সহিত বাটিও তোমাকেই দিয়েছি।' শাক্যসিংহ তখন সেই বাটি নদীমধ্যে নিক্ষেপ কর্‌লেন। দেবগণ তখন উহা হইতে প্রসাদ পেতে লাগ্‌লেন। ভোজনান্তে, শাক্যসিংহ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে, বোধিদ্রুমতলে বস্‌লেন। অন্তরের সমস্ত রিপুকুল পরাস্ত হ'ল, বাসনা কামনা একেবারে লয় পেল, বোধিসত্ত্ব তাঁর মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন, তিনি বুদ্ধ হ'লেন। বুদ্ধদেব অবতার, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ ক'রে ভাব্‌লেন, 'এ বস্তু কাকে দেই;' তখন সেই পাঁচটি শিষ্যের কথা মনে হ'ল। তাদেরই এ বস্তু দিবার জন্য তিনি চল্‌লেন। পথে ঘাটমাঝিকে নদীপার করিতে বলায়, সে পয়সা চাইল। পয়সা নাই, তখন সঙ্কল্পমাত্রেই দেখ্‌লেন অপর পারে পৌঁছেছেন। কাশী যেয়ে সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখ্‌তে গেলেন; তাঁরাও দূর হ'তে বুদ্ধদেবকে দেখ্‌তে পেয়ে, পরস্পর বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আরে ভাই, ঐ দেখ, সেই ভণ্ড বেটা! আবার সেই বেটা এদিকে আস্‌ছে। ওর সঙ্গে আমরা আলাপই কর্‌ব না।' কিন্তু বুদ্ধদেব**

যখন তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁরা খুব সসম্ভ্রমে ভক্তির সহিত আদর অভ্যর্থনা কর্‌লেন। তাঁর প্রভাবকে ত আর কারও অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য নাই। বুদ্ধদেব তখন তাঁদের কৃপা কর্‌লেন এবং বল্‌লেন—'তোমরা এই বস্তু প্রচার কর।' তাঁরাও ঐ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে সকলকে সন্ন্যাসী কর্‌লেন। ভগবান যখন যা করতে আসেন, তা না ক'রে যান না। তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না। তিনি না ধর্‌লে মানুষের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে? মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই তাঁর কৃপাই সার।"

শ্রাদ্ধান্ন ও উচ্ছিষ্টের অপকারিতা।

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা (পার্ব্বতী বাবু), ঠাকুরকে আমতলায় জিজ্ঞাসা করিলেন— "শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে কি কোনও অনিষ্ট হয়? আমাদের ত প্রায়ই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হ'য়ে থাকে।"

ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রাদ্ধে আহার কর্‌লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে, ভক্তিভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন কর্‌লে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই তাহা দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে।"**

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুকাল পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ঘটনাটি ঢাকা হইতে কয়েক ঘণ্টার পথ তফাৎ মুন্সিগঞ্জে ঘটিয়াছিল।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **"কিছু দিন হ'লো, একটি ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মুন্সিগঞ্জে পৌঁছিয়া, একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ব্রাহ্মণ খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে, নিজের ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তাঁর থাক্‌বার স্থান ক'রে দিলেন। সন্ন্যাসী নিজেই রান্না ক'রে, ভোজনান্তে বিশ্রাম কর্‌লেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি কর্‌তেন, অনেক সোণার গহনা দিয়ে সাজিয়ে রাখ্‌তেন। সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-আরতির সময়ে সে সকল দেখে, খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন। শেষ রাত্রিতে তিনি সেই সকল গহনা ঠাকুরের অঙ্গ হ'তে খুলে নিয়ে, চম্পট দিলেন। সকালে ব্রাহ্মণ উঠে দেখ্‌লেন, সন্ন্যাসী নাই। ভাবলেন, 'উদাসীন সন্ন্যাসী, ওঁদের ত কোন লোক লৌকিকতা নাই, ইচ্ছে হয়েছে, চলে গিয়েছেন।' ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ঠাকুর 'পূজা কর্‌তে ঠাকুর ঘরে যেমন প্রবেশ কর্‌লেন, দেখ্‌লেন, ঠাকুরের গায়ে সোণার গহনা নাই। দেখে ত একেবারে অবাক্। তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্ম্ম বুঝে, গ্রামের সকলকে খবর দিলেন; সকলে চারিদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। এদিকে সন্ন্যাসী গহনা নিয়ে, শেষ রাত্রি থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে, বেলা অপরাহ্নে একটি স্থানে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বস্‌লেন। একটু পরে, স্থির হ'তেই হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো, 'ভাল, এ কি কর্‌লাম?' তখন মাথা কপাল চাপড়ে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লেন। তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না ক'রে, আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী তথায় পৌঁছিবামাত্রই, সকলে নানা প্রকার গালিগালাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী গহনার পুঁটলি সম্মুখে রেখে বল্‌লেন, 'আপনারা একটু আমাকে**

স্থির হ'তে দিন; আপনাদের সমস্ত গহনাই আমার কাছে পাবেন। পাড়ার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন, আমার কিছু বল্‌বার আছে; সকলের সাক্ষাতেই গহনা দিব।' ব্রাহ্মণ তাই কর্‌লেন। গ্রামের দশটি ভদ্রলোক এলে, সন্ন্যাসী সকলকে বল্‌লেন, "দেখুন, আপনাদের সকলের সাক্ষাতে এই ব্রাহ্মণকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, ইনি আমার কথাগুলির যথার্থ উত্তর দিবেন। ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ দুর্ম্মতি ত আমার কখনও হয় নাই। এত কাল ভজন সাধন ক'রে যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম, আপনার গৃহে একবেলা মাত্র অন্ন গ্রহণ ক'রে, আমার সে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারও এক কপর্দ্দক চুরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর, অকস্মাৎ আমার এই দুর্ম্মতি হ'লো কেন? ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রান্না কর্‌তে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংস্রব আছে? একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখুন দেখি।' ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধানে জান্‌লেন— চাল, ডাল, ঘৃতাদি যা তিনি যজমানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ ঐরূপ বলাতে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন— 'আপনি যজমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে ঐ সকল জিনিস পেয়েছিলেন?' ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, 'কেন? শ্রাদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম। তাই আপনাকে দেওয়া হ'য়েছিল।' সন্ন্যাসী চমকে উঠে বস্‌লেন— 'শ্রাদ্ধান্ন দিয়েছিলেন? আচ্ছা, যার শ্রাদ্ধ করেছিলেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল?' তখন গ্রামের সকল ভদ্রলোকই বল্‌লেন— 'বাবাজী, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কখনও শুনি নাই। এদেশের লোক তার নামে কাঁপ্‌ত, সে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।'

সাধু বলিলেন— **দেখুন, সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণেই আমার এই সর্ব্বনাশ। এই আপনাদের গহনা নিন, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না। আমার সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। এক মাস কাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।' গ্রামের সকলে তখন তাঁকে যত্ন ক'রে রেখে, চান্দ্রায়ণের জোগাড় ক'রে দিলেন। সাধু এক মাস মুন্সিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক'রে চ'লে গেলেন, শ্রাদ্ধান্ন অতি বিষম জিনিস। খেলে আর রক্ষা নাই; ভক্তির দিকে একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "শ্রাদ্ধান্ন ত শ্রাদ্ধের সময়ে যাহা কিছু প্রেতকে দেওয়া হয়, এই জানি। ঐ শ্রাদ্ধবাড়ীর চাল, ডাল দূষিত হয় কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রাদ্ধসময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে সমস্তই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্য শ্রাদ্ধবাড়ীর কোন বস্তুই খেতে নাই, খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়।"**

পার্ব্বতী বাবু বলিলেন— "তা হ'লে আমরা যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইয়া আর কিছু কি নিব না? শ্রাদ্ধের ভোজ্য গ্রহণ, এই নিয়ম ত চিরকালই পুরোহিতদের ভিতরে চলিয়া আসিতেছে।"

ঠাকুর বলিলেন— **"ভোজ্য নিবেন না কেন? তবে উহার ব্যবহার নিজেদের কর্‌তে নাই, বিক্রয় ক'রে ফেল্‌তে হয়।"**

আমি বলিলাম— "যিনি খরিদ ক'রে নিবেন, তাঁকে ত উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ কর্‌তে হবে।"

ঠাকুর বলিলেন— **"না, যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।' মূল্য দিয়ে নিলে ওসব জিনিস পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। যিনি বিক্রয় করেন, এবং যিনি ক্রয় করেন, কারও ক্ষতি হয় না।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ব্যবস্থা ত সকল সমাজেই আছে। শাস্ত্রেরও ইহাই বিধি বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রাদ্ধবাড়ীতে সকলেই ত নিমন্ত্রণ খায়।"

ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না কেন? শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধবাড়ীতে কিছুই খেতে নাই। ব্রাহ্মণভোজনাদি ঐ দিনে ত হয় না।"**

শ্রাদ্ধদিনে প্রেতকে আহ্বান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাবতীয় বস্তুই উচ্ছিষ্ট হয় বলিয়া, শ্রাদ্ধবাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে ব্রাহ্মণাদি ভোজন যে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহ্বান নাই, উচ্ছিষ্ট সম্ভাবনাও নাই।

ঠাকুর এই প্রকারের আরও অনেক কথা বলিলেন।

অপঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার উৎপীড়ন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোনও ভদ্রপল্লীর কায়স্থবংশোদ্ভব একটি বালক, কিছুকাল হয়, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পরই ইহার ভজননিষ্ঠা, ঠাকুরের প্রতি স্বাভাবিক টান এবং সরলতা দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়াছি। একদিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া সে বলিল— "গোঁসাই, সত্যই তুমি আমাদের উদ্ধার কর্‌বে ত?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তোমাদের উদ্ধার না হ'লে আমার ত নিষ্কৃতি নাই। দেখ না, রাখাল সমস্ত গরু নদীর পাড়ে একত্রিত ক'রে, একটি একটি ক'রে সকলগুলিকে পার ক'রে দেয় পরে শেষ যেটি থাকে, তার লেজ ধ'রে নিজে পার হয়। আমিও তোমরা সকলে পার হ'লে, শেষটিকে ধ'রে নিজে পার হব।"**

শুনিতেছি, কিছুদিন যাবৎ নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য ও অস্বাভাবিক ব্যবহার আমাদের এই গুরুভাইটির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, অভিভাবকেরা তাহাকে নাকি দোতালা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। সে তথা হইতেই রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া, বিন্দুমাত্র আঘাত না পাইয়া, অনায়াসে এক দিকে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আবার কখনও বা কোঠা ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে শিকল দিয়া আসিবার পর দেখা গিয়াছে, সে রাস্তায় আসিয়া বেড়াইতেছে, শিকল খোলা রহিয়াছে। সাধনপ্রভাবে সে অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এতদিন আমাদের সংস্কার ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি অন্য প্রকার। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া এখন সে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। উপস্থিত তার অসীম দুঃসাহস, অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সকলেই

অস্থির। কয়েকদিন যাবৎ তার মানুষ খুন করিবার ঝোঁক চাপিয়াছে। আশ্রমে এখন কাহারও স্থির হইয়া চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিবার উপায় নাই; সকলেই তার ভয়ে সশঙ্ক। ঠাকুরের নিকটে সে কখনও যায় না। দূর হইতে সে ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে কখনও বা ভয়ে কাঁপিতে থাকে, কখনও স্তব স্তুতি করে, আবার কখনও, নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় ঠাকুরকে গালাগালি করিয়া, ইষ্টকাদি ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিবারও চেষ্টা করে। নিয়তই উহাকে চোখে চোখে রাখিতে হয়, এ এক বিষম উৎপাত। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "অকস্মাৎ এ ছেলেটির এই দশা ঘট্‌ল কেন? কিছুকাল পূর্ব্বে ত এ ভালমানুষ ছিল?"

ঠাকুর বলিলেন— **"একটি প্রেত ওকে আশ্রয় করেছে। এখন ওর সমস্ত কার্য্যই ঐ প্রেতদ্বারা হ'চ্ছে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "প্রেত উহাকে ধর্‌ল কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ওর পূর্ব্ব পুরুষ কোনও ব্যক্তি, একটি ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল। টাকার লোভ সংবরণ কর্‌তে না পেরে, তিনি নির্জ্জন পথে সেই ভদ্রলোকটিকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে বধ করেন। অপঘাতে মৃত্যু ঘটাতে সেই প্রেতের বিষম আক্রোশ জন্মে। ইনি যতকাল জীবিত ছিলেন, এই প্রেতদ্বারা নানা প্রকার অত্যাচার ভোগ করেছেন। দেহত্যাগের পরেও, বংশধর দ্বারা উহার কোন প্রকার সদগতি লাভ না হয় এই অভিপ্রায়ে, সে ওঁর বংশলোপ কর্‌বার চেষ্টায় আছে। এই ছেলেটির দ্বারা তার পূর্ব্বপুরুষের সদগতি লাভ হবে জেনেই, একে আশ্রয় ক'রে, নানা প্রকারে বিপন্ন কর্‌বার চেষ্টায় আছে। তোমরা এর সঙ্গে ব্যবহারে, সর্ব্বদা সাবধানে থেকো।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সময়ে সময়ে এমন বিষম কাণ্ড কর্‌তে চেষ্টা করে যে, তাহা দেখিয়া সহ্য করা যায় না, কখন কাকে খুন করে সর্ব্বদা এই ভয় হয়। সহ্য কর্‌তে না পার্‌লে কি কর্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মনে মনে প্রেতকে লক্ষ্য ক'রে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্‌তে কর্‌তে ওকে কিল চাপড় মেরো। তাতে প্রেতকেই মারা হবে; ছেলেকে স্পর্শ কর্‌বে না। এরূপ কর্‌লে প্রেত ছুটেও যেতে পারে।"**

ইহার পর আমরা ছেলেটির অত্যাচার দেখিলেই, কিল চাপড় মারিতে লাগিলাম। ২/৪ দিনের প্রহারের চোটেই ছেলেটির ঘাড়ের ভূত ছুটিয়া গেল এবং সে প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু জানি না কেন, সে বেশী দিন আশ্রমে টিকিতে পারিল না; দিন দুই হয়, কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

অর্থ হইতে কতপ্রকার অনর্থ ঘটে, তাহা বুঝাইতে ঠাকুর বলিলেন— **"টাকার জন্যই ত অপঘাত মৃত্যু এবং পরলোকে প্রেতত্ব লাভ হ'লো। আর একজন, টাকার লোভেই নরহত্যা ক'রে, পরলোকে অসদগতি লাভ করলে, বংশধরদের পর্য্যন্ত বিপন্ন কর্‌লে। টাকা বিষম কালকূট, কখনও পুষে রাখ্‌তে নাই। টাকা উপার্জ্জন ক'রে, প্রয়োজনমত খরচ কর্‌তে হয়। অবশিষ্ট যা কিছু থাক্‌বে, ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে ক'রে, যার অভাব অকাতরে তাকেই**

দিতে হয়। বিপদে প'ড়ে কেউ কিছু চাইলে, অমনই দিয়ে দিতে হয়, কোনও দ্বিধা কর্‌তে নাই। ধর্ম্ম যাঁরা চান, তাঁদের এভাবেই চল্‌তে হয়; দিন কোনও প্রকারে কেটে গেলেই হ'লো।"

প্রেতাত্মার মুক্তির উপায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতিতে যাহাদের পরলোকে অসদগতি ঘটে, বংশধরদের কিরূপ কার্য্য-দ্বারা তাহাদের সদগতি লাভ হয়?

ঠাকুর বলিলেন— **"শাস্ত্রে আছে, গয়াতে যথামত পিণ্ডদান কর্‌লেই, তাদের সদগতি হ'য়ে থাকে।"**

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "গয়াতে পিণ্ড দিলে সত্যই কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে?"

ঠাকুর বলিলেন— **হ্যাঁ, ব্যবস্থামত দিলে পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করে। আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে গিয়েছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাক্‌তাম। ঐ সময়ে একবার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু, বিলাতফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা, তাঁকে এক দিন স্বপ্নে বল্‌লেন— 'বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটি পিণ্ড দাও; আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।' তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্‌লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্‌ছেন,— "বাবা, তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" দু'বার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য কর্‌লেন না। আমাকে এ বিষয়ে এসে বল্‌লেন। আমি তাঁকে বল্‌লাম— "পুনঃপুনঃ যখন এরূপ দেখ্‌ছেন, তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, 'আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হ'য়ে, এরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন?' আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'আপনি ত আর আপনার বিশ্বাসমত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাসমত দিবেন, তাতে বাধা কি?' তিনি তাতেও সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্‌লেন, পিতা জোড় হাত ক'রে বল্‌ছেন— 'বাপু আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না?' বন্ধুটি তখন আমাকে এসে বল্‌লেন, 'মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্‌লাম, তিনি করজোড়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছেন—বাপু, আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না? আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।' শুনে আমার কান্না এল। আমি তখন বল্‌লাম, 'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধিদ্বারাও ত দেওয়াইতে পারেন।' তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি দু'টি টাকা নিয়ে, একটি পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। এই পিণ্ডদানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ডদান কর্‌লেন, তখন দেখ্‌লাম বন্ধুটির চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়্‌ছে। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন; পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, 'মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখ্‌লাম, আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন—**

'বাপু, আমার যথার্থ উপকার কর্‌লে, তুমি সুখে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' আহা, আগে যদি আমি জান্‌তাম পিতা এভাবে এসে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌বেন, তা'হলে আমি নিজেই খুব যত্ন ক'রে পিণ্ড দিতাম।' এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায়?"

ধর্ম্মরূপে অধর্ম্ম।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ত দয়া, সরলতা প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, দয়া ক'রে লোকের ক্ষতি করা হয়, আবার সরল হ'য়ে এবং বিশ্বাস ক'রেও অনুতাপ ভোগ কর্‌তে হয়। সুতরাং যথার্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিসে বুঝ্‌ব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"অধর্ম্ম, অধর্ম্ম-রূপে মানুষের নিকট উপস্থিত হ'লে, লোকে তা সহজেই বুঝ্‌তে পারে এবং তাহার আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ারও একটা চেষ্টা কর্‌তে পারে; কিন্তু অধর্ম্ম, ধর্ম্মের আকারে এসে পড়্‌লে, তা বুঝে নেওয়া বড়ই শক্ত। সিদ্ধ পুরুষেরাও সে স্থলে ঠ'কে যান, স্বয়ং ভক্তরাজ মহাবীরেরও মতিভ্রম ঘটেছিল, মানুষের আর কথা কি!"**

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তরাজ মহাবীরের কথা বলিতে লাগিলেন— **নিজের ইষ্টদেবতা রামলক্ষ্মণকে পাপরূপী মহীরাবণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, নিজ লেজের কুণ্ডলী দ্বারা গড় প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে রামলক্ষ্মণকে রাখিলেন এবং দরজায় খুব সতর্ক হইয়া রহিলেন, যেন কোন ছলে মায়ারূপী পাপ মহীরাবণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামলক্ষ্মণকে অপহরণ না করে। মহীরাবণ কখন কৌশল্যার, কখনও দশরথের, কখনও বা জনকের, কখনও বা ভরতের আকারে আসিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন কিন্তু ভক্তরাজ সকলকেই করজোড়ে বলিলেন, 'একটুকু অপেক্ষা করুন, বিভীষণ এখনি আসিবেন, তিনি বলিলেই দরজা ছাড়িয়া দিব।' মহীরাবণ যখন কোনও প্রকারে হনুমানকে ভুলাইতে পারিলেন না, তখন বিভীষণেরই রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন— 'মহাবীর, শীঘ্র দরজা ছাড়িয়া দাও, আমি একবার রামলক্ষ্মণকে দে'খে আসি।' হনুমানের একবার সংশয় হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে আর মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না। বিভীষণরূপী মহীরাবণ অমনই বলিলেন, 'মহামায়াবী মহীরাবণ নিয়ত ঘুরিতেছে, জানি না কখন কোন্ ছলে ভিতরে প্রবেশ করে। তুমি খুব সাবধানে থাক, আমি একবার রামলক্ষ্মণের শিরে রক্ষা বেঁধে আসি।' তখন হনুমান দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। মহীরাবণও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত রামলক্ষ্মণকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।**

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **"অধর্ম্ম, যে কোনও রূপে ভক্তের নিকট আসুক না কেন, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি স্থির থাক্‌লে কিছুতেই তাকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মের আকারে অধর্ম্ম এসে উপস্থিত হ'লে, মহা-সিদ্ধপুরুষকেও মুগ্ধ ক'রে ফেলে। গয়ার আকাশগঙ্গার বাবাজী, দয়া কর্‌তে গিয়ে, কি বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হ'লেন।**

রঘুবর বাবাজীর ঐশ্বর্য্যের কথা।

আকাশগঙ্গার বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **গয়ার বাবাজীর অদ্ভুত শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাজীর পায়ের কাছে মাথা হেঁট ক'রে প'ড়ে থাক্‌তো; বাবাজী আটার টিক্কর প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন, রাত্রিতে বাঘ এলে হাতে ক'রে তিনি তাই বাঘকে খাওয়াতেন। গোখ্‌রো সাপগুলো বাবাজীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো। বাবাজী নিশ্চল হ'য়ে নাম জপে মগ্ন থাক্‌তেন। আকাশের দিকে তাকায়ে কখনও পাখীদের বল্‌তেন, "আরে তু ভি রামজীকা জীব হো, মৈঁ ভি উন্‌হিকা দাস; ইঁহা আয়কে মেরা কাণ সাফ কর্ দে।" বাবাজী এই কথা বল্‌বামাত্র পাখীরা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে পড়্‌তো এবং কাণ খুঁচে দিয়ে যেতো। এক এক সময়ে দুই তিন শত লোক বাবাজীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'লেও, বাবাজী আসন হ'তে না উঠে, তাঁদের লুচি মণ্ডা প্রভৃতি দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাবে অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ হ'তো। বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধন্না দিয়ে প'ড়ে রইলেন; পরে মহাবীরের কৃপা হ'লো; পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখায়ে মহাবীর বল্‌লেন—"একখানা লাঠি দিয়ে এই পাথরের উপর সামান্য আঘাত কর, পাথরের নীচ হ'তে ঝরণা বেরিয়ে পড়্‌বে।" বাবাজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে একখানা লাঠি নিয়ে যেমনই ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত কর্‌লেন, অমনই প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান, লক্ষ মণেরও অধিক, দ্রুম ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেল। আর সেই স্থান হ'তে কল্ কল্ রবে জল ছুট্‌লো। বাবাজীর ঐ ঝরণার নাম যমুনা রেখেছিলেন। এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।**

দয়াতে পতন।

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিতে পাই বাবাজী নাকি খুব ভক্তও ছিলেন, সকলেরই প্রতি নাকি তাঁর খুব দয়া ছিল?

ঠাকুর বলিলেন— **দয়া তাঁর অসাধারণ ছিল; কিন্তু এই দয়াই তাঁর পতনের কারণ হ'লো।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— দয়া করিলে আবার পতন হয় নাকি?

ঠাকুর বলিলেন— **তা আর হয় না?**

এই বলিয়া ঠাকুর আকাশগঙ্গার রঘুবর বাবাজীর সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন— বাবাজীর একটি গুরুভাই ছিলেন, তিনি ফল্গুর অপর পারে রামগয়া পাহাড়ের নীচে একটি গ্রামে বাস করিতেন। তাঁর স্ত্রী এবং দুইটি নাবালক ছেলে ছিল। গুরুভাই পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইলে, বাবাজী প্রত্যহ যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। মৃত্যুসময়ে তিনি নাবালক দু'টি সন্তান এবং স্ত্রীকে বাবাজীর হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। বাবাজী প্রত্যহ দু'বেলা নিজে রান্না করিয়া, তাহাদের জন্য দুই ক্রোশ পথ খাবার বহিয়া লইয়া যাইতেন; কিছুদিন এইরূপ সেবা করিয়া বৃদ্ধ বাবাজী হয়রান হইয়া পড়িলেন। তখন ভাবিলেন, অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক ও নাবালক

ছেলে দু'টিকে নিকটেই আনিয়া রাখি না কেন? ইহাতে আমার ভজনের প্রচুর সময় পাইব, যাতায়াতেও হয়রান হইতে হইবে না; স্ত্রীলোকটিকে সর্ব্বদা নজরে রাখিতে পারিব এবং ছেলে দু'টিও মানুষ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া বাবাজী ছেলে দুইটির সহিত স্ত্রীলোকটিকে আশ্রমে আনিলেন। পাহাড়ে আসিয়াই একটি ছেলের মৃত্যু হইল। অপর ছেলেটির প্রতি বাবাজীর ক্রমেই মায়া বৃদ্ধি হইল। বাবাজী ছেলেটির ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন। বাবাজীর নিকট অনেক সময় বড় বড় লোক যাইতেন, শত শত টাকা প্রণামী পড়িত; বাবাজী একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্ত না রাখিয়া, সমস্তই দীনদুঃখীদের দান করিয়া ও ভাণ্ডারা দিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যে সময়ে স্ত্রীলোকটি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় হইতে দান ও ভাণ্ডারা কমিয়া গেল। লোকে অনুমান করিতে লাগিল, ঐ স্ত্রীলোকটির ও ছেলেটির মায়ায় পড়িয়া, বাবাজী অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজীর একটি প্রিয় শিষ্য, পুনঃপুনঃ বাবাজীকে বলিলেন, "মহারাজজী, লেড়কা আউর আউরত্‌কো পাহাড়মে নেহি রাখ্‌না। আপ্‌কা বিপদ হোগা, সহরমে রাখ দিজিয়ে।" বাবাজী প্রথম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমার গুরুভাই মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আমার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; সুতরাং যতটা নিরাপদে ইহাদিগকে রাখিতে পারি রাখিব। ইহারা আমার আশ্রিত, ইহাদিগকে নিয়ত সঙ্গে রাখিয়া বিপন্ন হইলেও, আমি ইহাদের কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহারা বড়ই দুঃখী।" ঐ শিষ্যটি বাবাজীকে আর একদিন বলেন, "মহারাজ, পাহাড়ে স্ত্রীলোক থাকিলে আপনার বিষম দুর্নাম হইবে। আর উহাদের জন্য টাকা পয়সা সঞ্চয় করিতেছেন, সাধারণের এইরূপ একটা সংস্কারও জন্মিবে। এই নির্জ্জন পাহাড়ে গুণ্ডাদেরও উৎপাত হইবে।" বাবাজী তখন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কোন্ শালা হামারা ক্যা করনে সেক্‌তা হ্যায়? আনে দেও।' শিষ্যটিও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শুনিতে পাই, ২/৪ দিন পরে ঐ শিষ্যটিই, গুণ্ডাদের লোভ দেখাইয়া; বাবাজীর আশ্রম লুট করিতে যুক্তি দেন। এক দিন গভীর রাত্রিতে সতের জন গুণ্ডা, বাবাজীর আশ্রমে মার্ মার্ রবে আসিয়া পড়িল। বাবাজী একখানা লাঠি হাতে লইয়া বাহির হইলেন; একাকী সতের জন গুণ্ডাকে পিটাইয়া ভাগাইলেন। দ্বিতীয় বারে গুণ্ডারা বাবাজীকে আবার যখন আক্রমণ করিল, বাবাজী পূর্ব্বের মত এবারও হাতের লাঠিখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। হঠাৎ লাঠিখানি একখানা পাথরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, অমনই গুণ্ডারা বাবাজীকে ধরিয়া ফেলিল, তৎপরে লাঠির উপর লাঠি মারিয়া বাবাজীকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিল। বাবাজী সংজ্ঞাশূন্য হইলেও গুণ্ডারা নিরস্ত হইল না, পাথরের দ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাবাজীর মাথার, পাঁজরার ও হাতের হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। অতঃপর পায়ে গামছা বান্ধিয়া, ৪/৫ জনে টানিয়া ছেঁচ্‌ড়িয়া পাহাড়ের উপর তুলিল, এবং একটা স্থানে বাবাজীকে ফেলিয়া বড় একখণ্ড প্রস্তর বাবাজীর বুকের উপর চাপাইয়া চলিয়া গেল। নিত্য প্রত্যূষে যাঁহারা পাহাড়ে যাইতেন, ঐ দিন ভোর হইতেই তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য, বাবাজী নাই। যেখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। বাবাজী কোথায় আছেন অনুসন্ধান করিতে

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শান্তিপুরস্থ বাটী (বর্ত্তমান অবস্থা)
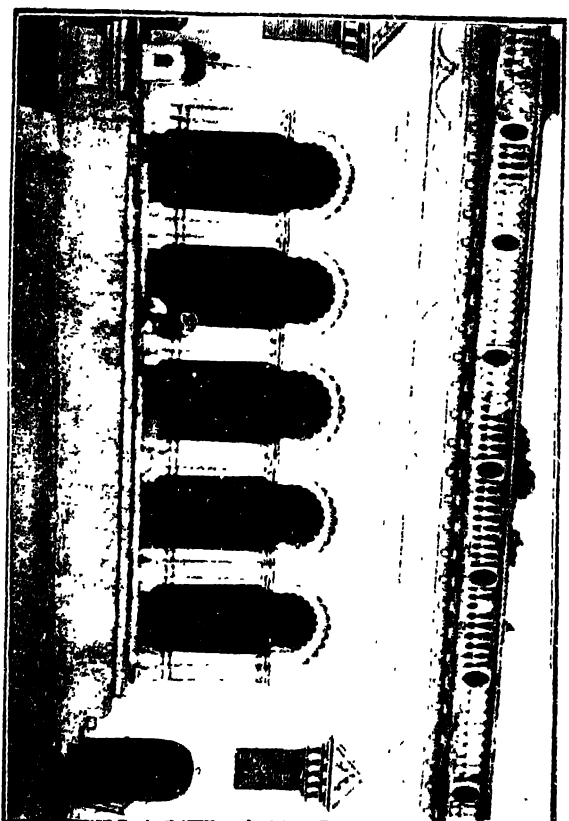
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির

করিতে, পাহাড়ের উপরে সকলে যাইয়া দেখিলেন, বাবাজী প্রকাণ্ড একখানা পাথর চাপায় পড়িয়া আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটি ভাসিয়া গিয়াছে। তখন বহুলোক একত্র হইয়া, অনেক চেষ্টায় পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল, বাবাজীর দেহটি আশ্রমে আনিয়া মহাবীরের নিকট ফেলিয়া রাখিল, এবং পুলিসে খবর দিল; পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং শ্বাস রুদ্ধ দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ বাবাজী গা নাড়া দিয়া মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "জয় মহাবীরজী, তেরা জয়, ধন্য তেরা দয়া! হাম্ য্যয়্সা কসুর কিয়া ত্যায়্ সাই দণ্ড্ দিয়া। তু বড়া দয়াল, তু বড়া দয়াল।" পুলিস সাহেব বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও আপনি চিনেন?" বাবাজী বলিলেন, আমি সকলকেই চিনি; কিন্তু তাদের একজনেরও নাম বলিব না। তাহারা ভগবানের দিক হইতেই গুরুতর দণ্ড পাইবে, আপনারা আবার তাহাদের শাস্তি দিবেন কেন? পুলিস সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজী কিছুতেই তাহাদের নাম বলিলেন না। এই ঘটনার পর বাবাজীর জ্বর হয়; তিনি পাহাড় ত্যাগ করিলেন; এখন আর রাত্রিতে তিনি পাহাড়ে থাকেন না, "চান-চউরাতে" থাকেন।

এইরূপ বলিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **"আকাশগঙ্গার বাবাজীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে, তাঁর অতীত অবস্থা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। আকাশের নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্কার জন্মালেই, মহা মহা যোগীদেরও সেই প্রকার পতন হয়। অহঙ্কারের হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায়, সর্ব্বজীবে সেবা। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতারও সেবা কর্‌তে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা কর্‌তে নাই। সকলকেই নিজ হ'তে বড় মনে কর্‌তে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নোয়ায়ে রাখ্‌লেই রক্ষা। মাথা তুল্‌লে আর নিস্তার নাই। পরমহংসজী যখন আমাকে কৃপা কর্‌লেন, বাবাজীকে আমি সমস্ত বল্‌লাম, বাবাজীর শুনে অভিমান হ'লো, তিনি বল্‌লেন, "আরে এক জঙ্গলমে দো সের নেহি রহনে সেক্‌তা হ্যায়, ইঁহা আউর কোই নেহি হ্যায়; তোমারা যে কুছ্ হুয়া, হাম্‌হি কিয়া। দেখো হিঁয়া যমুনা হাম্‌হি লে আয়া, দোস্‌রা কোহি নেহি।" আমার তখনই মনে হ'লো, বাবাজীর এরূপ অভিমানেই অচিরে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। এমন শক্তিশালী পুরুষকেও পতিত হ'তে হ'লো। পরে তাঁর কি দুর্দ্দশা না ঘট্‌ল? এখন তিনি মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— বাবাজী কি আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্‌তে পার্‌বেন না?

ঠাকুর বলিলেন— **"তিনি খুব কঠোর সাধক, স্থির হ'য়ে বস্‌লে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শুধ্‌রে নেবেন, পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্‌বেন।"**

রঘুবর বাবাজীর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইলাম, এত বড় মহাত্মারও এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে! জিজ্ঞাসা করিলাম— কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণ কত দিন থাকে?

ঠাকুর বলিলেন— **"যত দিন মন থাকে, তত দিন স্ত্রী—পুরুষে এবং বিষয়—বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হ'লেও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার।"**

অভিমান কিসে হয়?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— রঘুবর বাবাজী ত খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হইল?

ঠাকুর বলিলেন— **"অভিমান ত আর এক প্রকার নয়? অভিমানও নানা রকমের আছে। অনেক টাকা থাক্‌লে অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়। এরূপ যে অভিমান, তা সহজেই নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক রকমের অভিমান আছে, ঠিক এর বিপরীত। তার হাত এড়ান বড়ই কঠিন। নির্ধন ব্যক্তি মনে করে, ধনী তাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং ধনীর উপরে তার অভিমান হয়। মূর্খ মনে করে বিদ্বান তাকে অগ্রাহ্য করেন, এ ভাবে বিদ্বানের উপরও মূর্খের অভিমান হয়। পাপী সংসারাসক্ত ব্যক্তিও ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে। এই প্রকারের অভিমান সত্য যুগ হ'তে চ'লে আস্‌ছে। রাজর্ষি জনকের নিকট, অনেক ঋষি তপস্বীও যেয়ে, এই প্রকার অভিমান প্রকাশ কর্‌তেন।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— সদ্‌গুরুর নিকট যাঁরা সাধন লাভ করেন, তাঁদেরও কি ভগবান্ দয়া কর্‌বেন না?

ঠাকুর বলিলেন— **"তাঁরা উপযুক্ত সাধন লাভ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে নিজেকে না বুঝা পর্য্যন্ত কিছুই ত হবে না! কাঙ্গালকেই দীননাথ দয়া ক'রে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দয়ার পাত্র নয়।"**

একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন— মহাপুরুষেরা দয়া ক'রে মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের সমস্ত কুস্বভাব দূর ক'রে ভাল ক'রে নিতে পারেন নাকি?

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, তা পারেন; কিন্তু যিনি প্রণালী মত না ক'রে, ঐ প্রকার দয়া করেন, তাঁকে ভুগ্‌তে হয়, পতিত হ'তে হয়। যেমন গয়ার বাবাজী পরের উপকার কর্‌তে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আপনি পতিত হন। তাঁর সেই অসাধারণ প্রভাব একেবারেই নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন দেখ, তিনি ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সকলের কি দরকার ছিল? সুখ দুঃখ ভোগ মাত্র। ভগবান্‌ই ত সব করেন; আমার কি ক্ষমতা? আমি আর কি কর্‌তে পারি? কার কোন অবস্থায় প'ড়ে পতন হয়, তা বলা যায় না। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুরই বিশ্বাস নাই। কারও হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা বাসনা জন্মে, তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কিছুই বিশ্বাস নাই।"**

কার্ত্তিক।

ঔষধে বাবাজীর আপত্তি।

আশ্বিন মাস শেষ হইতেই মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আমি ঠাকুরের অনুমতি লইয়া বাড়ী গেলাম। গহনার (খেয়ার) নৌকায় ৪/৫ ঘন্টা থাকিয়া সেরাজদিঘা পঁহুছিতে হয়। গহনার নৌকায় সাতটার সময়ে চাপিয়া বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া আমার ভয়ানক শিরঃপীড়া হইল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। গহনায় প্রায় পঁচিশ জন লোক ছিল, সকলেই আমার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এক জন কবিরাজ আমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিয়া বলিলেন, "এক গণ্ডূষ জলের সহিতে ইহা খাইয়া ফেলুন, বেদনা সারিয়া যাইবে।" ঐ সময়ে একজন বৈষ্ণব বাবাজী গলুইয়ের উপর বসিয়া হরিনামের ঝুলি লইয়া জপ করিতেছিলেন, সকলে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিল। আমি যেমনই ঐ ঔষধের বড়িটি কবিরাজের নিকট হইতে খাইবার জন্য হাতে লইলাম, অমনই সেই বৈষ্ণব বাবাজী, কট্‌মট্ করিয়া একবার কবিরাজের দিকে চাহিয়াই, আমার বেশভূষা দেখিয়া আমাকেও নিজেরই দলের লোক ঠাওরাইয়া, নৌকার গলুই হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং দুই তিন লাফে আমার নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা গোঁসাই, আপ্‌নে ক্যান্ ওষুধ খাবেন, ঐ বড়ি ফিক্যা ফ্যালাইয়া দ্যান্ ধলেশ্বরীর জলে; কিষ্ট কন্, কিষ্ট কন্।" বাবাজীর রকম দেখিয়া আমি আর ঔষধ খাইতে সাহস পাইলাম না; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বাবাজীর ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ আমার বেদনার শান্তি হইল, নৌকার সকলেই তখন অবাক্ হইয়া গেলেন।

কার্ত্তিক১ লা— ১৭ই পর্য্যন্ত

আমাদের পাড়াগাঁ সম্বন্ধে ঠাকুরের নানা কথা।

বাড়ীতে সাত আট দিন থাকিয়া, আবার গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যখনই আমি বাড়ী হইতে আসি, ঠাকুর আমাকে দেশের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এবার ঠাকুর বলিলেন— **"তোমাদের গ্রাম হইতে জৈনসার যাবার পথে একটি বহুকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থের জোড়া গাছ ছিল, সেই গাছটি এখন কি অবস্থায় আছে?"**

আমি বলিলাম— 'ঐ গাছের তলা দিয়াই চিরকাল সাধারণের যাতায়াতের পথ; ওখানে পঁহুছিলেই শরীর যেন শীতল হইয়া যায়; গাছতলায় একটু না বসিয়া পারা যায় না। গাছটি ছেলেবেলা যে প্রকার বড় ও ঝাপড়া দেখিয়াছি এখন আর সে প্রকার নাই, আপনা আপনিই একটি একটি করিয়া বড় ডালগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। শুনিয়াছি নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোক ঐ গাছের দু' একখানা ডালা কাটিতে গিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া অকস্মাৎ মারা পড়িয়াছে। গাছে যে কি আছে জানি না।'

ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিলেন— **"আহা! তোমাদের অঞ্চলের ঐ প্রাচীন বৃক্ষটি ধর্ম্মের নিশান স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, হয়, প্রাচীন ধর্ম্মাভাবও তোমাদের দেশে লয় পাবে।"**

আমি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন— **"তোমাদের ওদিকের লোকের ধর্ম্মভাব এখন কেমন?"**

আমি বলিলাম— 'কোজাগর পূর্ণিমার দিনে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বড়ই আনন্দ। এই পূর্ণিমাতে মেয়েরা ঢালের মত বড়, লক্ষ্মীর সরা খরিদ করিয়া আনাইয়া, পূজা করেন। খুব বড় লোক হইতে নিতান্ত গরীব পর্য্যন্ত (যাঁহারা এক সন্ধ্যা আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করেন তাঁহারাও) এই লক্ষ্মীপূজা করেন, এবং প্রতি গৃহস্থের ঘরেই যথাসাধ্য এই লক্ষ্মীপূজার আড়ম্বর হইয়া থাকে। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই প্রত্যেকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই প্রসাদ ভোজন শেষ করিতে, রাত্রি ভোর হইয়া যায়। সারা দিন মেয়েরা অনেকেই নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন। এবার দেখাদেখি আমিও উপবাস করিয়াছিলাম, বড়ই ভাল লাগিল।'

ঠাকুর বলিলেন— **"পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ব্রতাদি করে না?"**

আমি বলিলাম— 'আমাদের দেশে প্রায় সকল পাড়ায়ই এই কার্ত্তিক মাসে চার পাঁচ বৎসরের কচি কচি মেয়েগুলি, ভোরবেলা উঠিয়া যমপুকুরের ব্রত করে। বাড়ীতে কোন ঘরের কোণে বা উঠানে, এক ফুট আন্দাজ স্থানে চতুষ্কোণ গর্ত্ত করিয়া পুকুর কাটে; ঐ পুকুরের পাড়ে ছোট ছোট কলা গাছ, কচু গাছ এবং ধান গাছ পুতিয়া রাখে; ঐ গর্ত্তের চারিদিকে কাক, চিল, বাজ, কচ্ছপ, কুমীর, যম এবং যমুনা প্রভৃতির ছোট ছোট মৃত্তিকার পুতুল স্থাপন করিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে ব্রত-মন্ত্র পড়িতে থাকে এবং ঐ গর্ত্ত হইতে গণ্ডূষে গণ্ডূষে জল লইয়া মেয়েরা তাহাদের ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোকে জল প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া ঐ সমস্ত পুতুলের মুখে জল ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট মেয়েরা এই প্রকার কোন না কোন ব্রত বৎসরের অধিকাংশ সময়ই করিয়া থাকে।'

ঠাকুর বলিলেন— **"পূজা, ব্রত, উপবাস এ সকল যত করা যায় ততই ভাল। খেলার ছলে এ সকল ব্রত নিয়মাদিতে, শিশুকাল থেকে ছোট ছোট মেয়েদের অভ্যস্ত করান এদেশের প্রথা ছিল। এ সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যে কত কল্যাণকর, তাহা এখন আর কেহ বুঝে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোধ হয়, এ সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। মেয়েদের হইতেই দেশে ধর্ম্মরক্ষা হয়। শিশুকাল থেকে এসব কর্‌লে বড়ই কল্যাণ হয়।'**

গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন— **"তোমাদের দেশে সাধারণ লোকদের ভিতরে হরি সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রভুর মহোৎসবাদি পূর্ব্বে প্রায় সকল গ্রামেই হইত, এখনও সেই প্রকার হয় ত?"**

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া, আমি আমার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিবার সুযোগ পাইয়া, বলিতে লাগিলাম— "আমাদের পাড়ার সংলগ্ন সূজানগরে, দত্ত পরিবারের একজন ধনী বৈষ্ণব, কিছুদিন

হয়, একটি বৃহৎ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন; তাহাতে গ্রামের সমস্ত লোকেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিল। ধেনো জমির প্রায় ৫০/৬০ বিঘা লইয়া এই মহোৎসবের স্থান প্রস্তুত হইল; নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় শতাধিক উননে রাশি রাশি অন্ন ও লাফরা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হইল, এবং সে সমস্ত, অনাবৃত মাঠে চাটাই ও হোগলা বিছাইয়া, তাহার উপর স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক, দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মৃদঙ্গ, খোল, করতাল লইয়া বৈষ্ণবেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরু, পুরোহিত ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা, ভোগ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহার গুরুদেবের নিকট যাইয়া, কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গুরুদেব গরীব ছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা চাহিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনাকে যাহা দিতেছি, তাহাই লইয়া অনুমতি দেন; না হ'লে যথা ইচ্ছা চলিয়া যান। আপনি অনুমতি না দিলেও আমার এই কার্য্য এখন আর অসম্পন্ন থাকিবে না।' শিষ্যমুখে এই প্রকার অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া, গুরু অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া অমনই উঠিয়া পড়িলেন, এবং যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, 'মহাপ্রভু জাগ্রত দেবতা, আমি তোমার গুরু, আমাকে যখন তুমি এভাবে অপমান কর্‌লে, তোমার এই কার্য্য কখনও তিনি সুসম্পন্ন হ'তে দিবেন না।' এদিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহাপ্রভুর আসন সাজান হইতে লাগিল, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশে কালমেঘ উঠিয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া, চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। লোক সকল চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল; রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি, সমস্ত উপকরণ সহিত, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গেল। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে যে বিরাট্ ব্যাপার হইয়াছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা একেবারে পণ্ড হইয়া গেল। এ ঘটনা আমি বাড়ী থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"

ঠাকুর বলিলেন— **"গুরুর অপমান, এ যে গুরুতর অপরাধ; তাই ফল হাতে হাতে। অপরাধের দণ্ড, অপরাধ বুঝিয়া, কোথাও তিন দিনে, কোথাও তিন মাসে, কোথাও বা তিন বৎসরের ভিতরে হয়। অনেক অপরাধের দণ্ড পরলোকে ভোগ কর্‌তে হয়।"**

নিজ পুত্রের জীবন লইয়া শিষ্যপুত্রের জীবনদান।

গুরুর প্রাণে ক্লেশ দিলে যেমন অকস্মাৎ বিপদের উৎপত্তি হয়, গুরুকে প্রসন্ন করিলেও তেমন তাঁহার কৃপায় আপদ হইতে আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি যথার্থ ঘটনা, এবার মাঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম—

আমার বড় মামার উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা পড়িতে লাগিল। লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, পরে শিশুটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। বার বার এইরূপ হওয়াতে, আমার মাতুল মহাশয় অতি উদ্বিগ্ন ও হতাশ

হইয়া পড়িলেন। একবার আমার মামীমাতার প্রসব হওয়ার সময়েই দৈবক্রমে তাঁহার গুরুদেব ঐ গ্রামে অন্য শিষ্য-বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন তান্ত্রিক, সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন; নরকপাল এবং সুরা প্রভৃতি লইয়া অতি কঠোর সাধন করিতেন। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর (অন্যান্য বারের মতই) টিঁ টিঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার সর্ব্ব শরীর নীল বর্ণ হইয়া গেল। আমার মাতুল, এবারও পুত্রটি, মারা যায় দেখিয়া, যার পর নাই মর্ম্মাহত ও হতাশ হইলেন। পরে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেবের কথা স্মরণ হওয়ায়, সেই অন্ধকার রাত্রিতে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া, যাহাতে এবারে তাঁহার বংশ রক্ষা হয়, সেই জন্য, অত্যন্ত কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুদেব তখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'একটি বিলবপত্র লইযা আইস।' বিলবপত্র আনা হইলে, তিনি তাহাতে সিন্দূরের দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র ও একটি মূর্ত্তি আঁকিলেন, পরে সেই পত্রটি স্পর্শ করিয়া, কিছুক্ষণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার মাতুলকে বলিলেন যে, তুমি যদি এক দৌড়ে এই বিলবপত্রটি লইয়া গিয়া তোমার নবজাত পুত্রটির বক্ষঃস্থলে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ সন্তান দীর্ঘায়ু হইবে; কিন্তু যদি রাস্তায় কোন স্থানে এই বিলবপত্র লইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে। আর এক কথা, এই পুত্রটির নাম হরচরণ রাখিও। আমার মাতুল সেই বিলবপত্রটি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে বাটী আসিলেন এবং উহা সেই শিশুর বক্ষঃস্থলে ধরিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, তৎক্ষণাৎ ছেলেটির সমস্ত উপসর্গ একেবারে শান্ত হইয়া গেল এবং সে ক্রমে ক্রমে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পরদিন আমার মাতুল, তাঁহার গুরুদেবের নিকটে যাইয়া শিশুটির সুস্থতার সংবাদ জানাইলেন এবং কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুত্রটির নাম "হরচরণ" রাখিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের নাম "হরচরণ" এবং তাহারই আয়ু লইয়া, তিনি ঐ শিশুটির দেহে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন পরে সংবাদ আসিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র ঐ সময়ে কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন।

ঘটনাটি শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন— **"তান্ত্রিকদের ভিতরে খুব ভাল ভাল সিদ্ধ মহাপুরুষ এখনও আছেন। তোমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট আর কি শুনিলে?"**

আশ্চর্য্য জন্মবিবরণ।

আমি বলিলাম— "মহাপ্রভুর কৃপাতে, আমার বড় দাদার (হরকান্তবাবুর), যে ভাবে জন্ম হয়, সেই কথাও তিনি বলিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"সে কি রকম, বল না?"**

আমি বলিলাম— "গর্ভের একাদশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ সন্তান প্রসব হইতেছে না দেখিয়া, আত্মীয় স্বজন সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে এক দিন প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিন দিন বেদনায় মাতাঠাকুরাণী জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কোনও জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন— "তুমি মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর, তবেই অচিরে তোমার সন্তান হইবে, নচেৎ কিছুতেই ইনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না।" ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর অপর ঘরে, পিসী ঠাকুরাণীও ঠিক ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, 'জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু' বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন তখন ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রামের অপর প্রান্তের একটি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ (রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য), হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন— "এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস না করিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে না; তোমরা মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর।" তিন জনে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও ঠিক একই স্বপ্ন একই সময়ে দেখিলেন, ইহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং আত্মীয়গণ অগৌণে ঐরূপ মানস করিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই দাদার জন্ম হইল। কিন্তু দাদা, শৈশবে নানা প্রকার রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহাতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। সেই সময় একদিন তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "মানসমত মহোৎসব না করাতে, ছেলে এ সকল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" আমরা শাক্ত পরিবার হইলেও, এই ঘটনাতে মহাপ্রভুর মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া, দাদার অন্নপ্রাশন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।"

ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রীবৃন্দাবনে যাবার সময়ে আমরা সকলে কিছুদিন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম; তাঁর অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। তিনি এ যুগের লোক নন, সত্য যুগের লোক; ওরকমটি প্রায় দেখা যায় না।"**

এই বলিয়া, ঠাকুর দাদার জীবনের আশ্চর্য্য কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন; ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন সেখানে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, সে সকল বলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনা আমার সেই সময়ের ডায়েরীতে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে বলিয়া, এস্থলে আর লিখিলাম না।

অহিংসককে কেহ হিংসা করে না।

মহাভারতপাঠের পর, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ পাহাড়-পর্ব্বতে নিরাপদে কি উপায়ে থাকা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মহাভারতে পুনঃপুনঃ পড়েছ ত! যাদের ভেতর হিংসা নাই, তাদের কেহই হিংসা করে না; হিংস্র জন্তু সকলও, তাদের গাছ পাথরের মতই মনে করে।"**

এই বলিয়া ঠাকুর একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া, এইরূপ বলিতে লাগিলেন— "কিছুদিন পূর্ব্বে এখানকার হাতীখেদার এণ্ডারসন্ সাহেব, হাতীতে চড়িয়া জয়দেবপুরের জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সাহেব বিপদে পড়িলেন। হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদা হইতে ফেলিয়া দিয়া পলাইল। সাহেব বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিন বার বন্দুক ছুড়িলেন, কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। প্রকাণ্ড বাঘটা সাহেবের দিকে অগ্রসর

হইতে লাগিল। সাহেব প্রাণপণে জঙ্গলের নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বাঘ, যেন শিকার হাতে পাইয়াছে বুঝিয়াই, খেলা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সাহেব কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর, হয়রান অবস্থায় জঙ্গলের ঝোপে একটি উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই নিকট গিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?" সাহেব ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "বাঘ যে আমাকে ধ'রে ফেল্‌বে।" তখন সন্ন্যাসী বাঘটিকে, হাত নাড়িয়া, অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "বৈঠ্ বাচ্ছা, আউর নগিজ মত্ আও।" বাঘ একটু বসিয়া থাকিয়া লেজ নাড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, পরে এক দিকে চলিয়া গেল। সাহেব সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঘের ভয়ে তুমি এত অস্থির হইলে কেন?' সাহেব বলিলেন, আমি এই বাঘটিকে শিকার করিতে দুই তিন বার গুলি ছুড়িয়াছি, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়, অমনই বাঘ আমাকে আক্রমণ করিতে পেছন নেয়।' সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঘকে তুমি গুলি ছুড়িলে কেন? তুমি কি বাঘ খাও?" সাহেব বলিলেন, "না, বাঘ আমরা খাই না, আমোদের জন্য শিকার করি। আপনার ইঙ্গিতে বাঘ স্থির হইল, পরে চলিয়া গেল; বনের "বাঘকে কি উপায়ে আপনি বশ করিলেন, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই, শুধু ভালবেসে। পশু,পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলকেই একমাত্র ভালবাসার দ্বারা বশ করা যায়। তোমার ভিতরে হিংসা আছে বলিয়াই, অন্যেও তোমাকে হিংসা করে। হিংসাশূন্য হইলে, সাপে বাঘেও কিছু করে না।" সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ভিতরে তাঁর কি এক চমক্ লাগিল, তিনি খুব কাতর হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে দীক্ষা দিলেন, এবং ঘরে যাইয়া ভজন সাধন করিতে বলিলেন। সাহেব বাসাবাটিতে আসিয়া বাবরচিকে বিদায় করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণের পাকে নিরামিষ আহার করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ঢাকার অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তাঁহাকে দেখিতে যান। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন জানি না।

ঠাকুর যে এণ্ডারসন্ সাহেবের কথা বলিলেন, দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ এই সাহেবকে আমি অনেক বার রম্‌ণার মাঠে ক্রিকেট্ খেলিতে দেখিয়াছি। শুনিলাম, এখন তিনি চাট্‌গাঁর দিকে বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন। খুব সাত্ত্বিক ভাবে বৈষ্ণব আচারে থাকেন। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে রহিয়াছে।

এই ঘটনা বলার পর, ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন— **"যেখানে হিংসা নাই, সেখানে সাপে বাঘেও হিংসা করে না। খাদ্যখাদক সম্বন্ধে বধ পৃথক। তাকে যথার্থ হিংসা বলে না। কামাখ্যাতে এক দিন অচলানন্দ স্বামী, একটি জলাশয়ের কাছে ব'সে আছেন, ব্রাহ্মণেরা সেখানে পূজা আহ্নিক কর্‌ছেন; এমন সময়ে একটি বাঘ জল খেতে এসে উপস্থিত হ'লো। ব্রাহ্মণেরা বাঘের ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে পলায়নে ব্যস্ত হ'লেন। অচলানন্দ স্বামী, সকলকে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে বলে, বল্‌লেন—'আপনারাই তো ব'লে থাকেন, কামাখ্যায় হিংসা নাই, তবে এত ভীত হচ্ছেন কেন? আপনাদের কোনও ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজেদের কার্য্য করুন্'।**

স্বামিজীর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা সশঙ্ক হ'য়ে আপন আপন সন্ধ্যা আহ্নিকাদি কর্‌তে লাগলেন; বাঘটিও জল খেয়ে চ'লে গেল।"

ঠাকুরের শান্তিপুর যাইতে ব্যস্ততা।

প্রায় এক মাস হইল, নানা স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সম্মিলনে, ঠাকুরের সঙ্গে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে পরমানন্দে কাটাইলাম। জানি না, আজ কেন ঠাকুর অকস্মাৎ শান্তিপুরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আজ সকালে চা-সেবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন— **"মা'কে দেখ্‌তে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।"**

১৮ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবাব।

আমরা অনুমান করিলাম, ঠাকুরমা অতিশয় পীড়িতা, তাই ঠাকুর বোধ হয়, তাঁহার শেষ সময় বুঝিয়া বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ঠাকুরের সঙ্গে কে কে শান্তিপুরে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে, ঠাকুর বলিলেন— **"যার যার ইচ্ছা হয় যেতে পার।"**

আমরা আট নয়টি গুরুভাই, ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। শ্রীধর বাতরোগে শয্যাগত, উঠিবার শক্তি নাই; ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া, কান্দিয়া অস্থির হইলেন। শ্রীধর ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর কখনও তাঁহাকে সঙ্গছাড়া করিয়া রাখেন না; এ সময় শ্রীধরকে নিতান্ত অচল দেখিয়া, ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন— **"শ্রীধর, এই তোমার পাথেয় রইল, যখন সমর্থ হবে, তখনই আমার কাছে চ'লে যেতে পার্‌বে।"**

শ্রীধর সারারাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন।

শান্তিপুর যাত্রা।

ট্রেন যাইবার বহুপূর্ব্বেই, শেষ রাত্রিতে ঠাকুরের দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ঠাকুরকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। রাণাঘাট পর্য্যন্ত আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর আট নয়খানা টিকেট করা হইল। নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, আমরা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। ষ্টীমারে উঠিয়া, একপাশে ঠাকুরের আসন পাতিয়া, আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা, ঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিলাম। অনেক লোক আসিয়া, ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ মামলা মোকদ্দমার ফলাফল, কেহ বা সাংসারিক নানা প্রকার অশান্তি উৎপাতের প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল; আবার কেহ কেহ বা খুব কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ উৎকট রোগের ঔষধের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

১৯ শে কার্ত্তিক, বুধবাব।

ঠাকুর ধীবভাবে সকলকেই বলিতে লাগিলেন— **"আমি ওসব কিছুই জানি না, ভগবানের নাম করি মাত্র।"**

কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনিয়াও, কেহই পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ঐরূপ লোকের সংখ্যার ক্রমশঃই বৃদ্ধি দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম, "ইহারা এই ভাবে সমস্ত দিনই জ্বালাতন করিবে। আপনি বলিলে, আমি সহজে এক কথায়ই ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারি। তাই করিব কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তুমি কি ব'লে এদের নিবৃত্ত কর্‌বে?"**

আমি বলিলাম— "ইনি হাজার টাকার কমে কিছুতেই ঔষধ দেন না; মোকদ্দমার ফলাফলের কথাও বলেন না। ইহা বলিলে, টাকার কথা শুনিয়াই সকলের শ্রদ্ধা উড়িয়া যাইবে, আর কখনও কেহ এদিকে ঘেঁসিবে না।"

ঠাকুর বলিলেন— **"যদি কেহ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়, তখন কি কর্‌বে? এমন লোকও ত থাক্‌তে পারে।"**

আমি আর এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঠাকুর তখন বলিলেন— **"ওরূপ বল্‌তে নাই, যথার্থ কথাই বল্‌তে হবে। যে বিশ্বাস করে করুক, না করে তাতেই বা ক্ষতি কি? লোকে আশা ক'রে আসে, একটু বিরক্তও কর্‌বে না? এতে অস্থির হ'লে চল্‌বে কেন?"**

আমি লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময়ে গোয়ালন্দে নামিয়া, ট্রেনে চাপিলাম, এবং শেষ রাত্রে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া তথায়ই ভোরবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রত্যূষে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া, প্রায় সাড়ে আটটার সময় শান্তিপুরে পৌঁছিলাম।

২০ শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

ঠাকুরের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঠাকুরমা সেখানে যেন ঠাকুরেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "তুই এখন এলি যে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মা, তুমি যে আমাকে 'বিজয়', 'বিজয়', ব'লে ডেকেছিলে, তা আমি শুনেছিলাম।"**

ঠাকুরমাব শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র কাহারও বিরুদ্ধে ঠাকুরকে একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমে আমরা ঠাকুরমার সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম, যে, উন্মাদের অবস্থায় যাঁহাদের উপরে ঠাকুরমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি, উঁহাকে সামলাইতে না পারিয়া, এমন দারুণ প্রহার করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরমা দুই তিনবার "বিজয়", "বিজয়" রবে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ঐ চীৎকার শুনিয়াই, ঠাকুর শান্তিপুরে আসিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, ইহা পরিষ্কার জানিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। ঠাকুর, বাড়ীতে পৌঁছিয়া. নীচের ঘরেই আসন করিয়া বসিলেন।

অবিলম্বেই আমরা উপরের ঘর পরিষ্কার করিয়া, ঠাকুরের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। এত কাল আমি স্বপাকে আহার করিয়াছি, আজ সকলের সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন, উপরে একটি মাত্র ঘর, তাহাতেই আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে রহিলাম।

'পাণ্ডব বিজয়' যাত্রাভিনয়— সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

আহারান্তে, অপরাহ্নে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে শান্তিপুরের বহু দেবালয়ে লইয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে, আমরা যাত্রা শুনিবার জন্য কোনও এক গোস্বামীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। গৃহস্বামী যাত্রাস্থলে ঠাকুরকে বসিতে আহ্বান করাতে, ঠাকুর আমাকে মাত্র সঙ্গে লইয়া, সভায় গিয়া বসিলেন। অপরাপর সকলকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণদের সভায় অপর জাতি একাসনে বসেন না বলিয়াই, ঠাকুর সকলকে লইয়া সভাস্থলে গেলেন না, এ কথা পরে জানাইলেন।

২১ শে কার্ত্তিক, শুক্রবার।

যাত্রা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে দণ্ডী রাজা পাণ্ডবদিগের শরণাগত হইলেন। ভীমসেন দণ্ডী রাজাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া, পাণ্ডবদের নিকটে আসিয়া দণ্ডী রাজাকে চাহিলেন। পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'ইনি প্রাণভয়ে আমাদের শরণ লইয়াছেন। আমরাও ইঁহাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিয়াছি। সুতরাং কিছুতেই ইঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না'। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার বিষম বিরোধ ঘটিল দেখিতেছি।' ভীমসেন বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমাদের একমাত্র বল তুমি। তোমার আত্মীয়তার গর্ব্বেই আমরা ইন্দ্র চন্দ্রকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করি না। কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করিতে যদ্যপি আমাদের জীবন দিতে হয়, এমন কি, যদি তোমার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়, অনায়াসে করিব। ধর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডবেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দেবগণের মহাযুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধের পরিণাম পাণ্ডবের জয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়। এই যাত্রা শুনিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ ভগবান্, তা হ'লে তিনি সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও সামান্য পাণ্ডবদের নিকট পরাস্ত হইলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এই দেখালেন যে, নিজ কর্ত্তব্যে যদি দৃঢ়তা থাকে, সত্যে ও ধর্ম্মে যদি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদির সহিত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান্ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই কর্‌তে পারেন না। সত্যের সর্ব্বত্রই জয় জান্‌বে। যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, তাহাতেই স্থির থাক্‌বে। ভগবান্‌ও যদি নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য**

দেখায়ে বিচলিত কর্‌তে চেষ্টা করেন, কখনই টল্‌বে না। তিনি যদি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত কর্‌তে চেষ্টা করেন, পার্‌বেন না। দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও পরাস্ত হবেন, তাঁর কৃপায় সর্ব্বত্র সত্যের জয় হয়, ইহা নিশ্চয়ই জেনো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "গুরু যাকে যেটি নিয়ম করিয়া দেন, তাহাই ত তার কর্ত্তব্য? আর তাঁর উপদেশই ত ধর্ম্ম?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, তা বই আর কি?"**

আমি বলিলাম— "সকল নিয়মই কি আর ষোল আনা সর্ব্বত্র রক্ষা করা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, তা না কর্‌লে হবে কেন? যার যেটি নিয়ম, তা সর্ব্বত্র ষোল আনা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে, একটু বাদ পড়্‌লে চল্‌বে না; নিয়মের একটি ছাড়্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটিও ছাড়্‌তে হয়। শত সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও নিজের নিয়মে দৃঢ়তা রাখ্‌বে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন হবে। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি। লোকোত্তারাণাম্ চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি।।" বজ্রের মত কঠোর ও পুষ্পের মত কোমল হ'তে ঋষিরা যে বলেছেন, তাহা এই নিয়ম রক্ষা বিষয়েই। আর এই নিয়মে প্রবেশ বিষয়েই আবার পুষ্পের মত কোমল হ'তে হবে। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ও শান্ত ভাবে, নিজের নিয়ম রক্ষা ক'রে যাবে।"**

চিত্তবিকৃতি ও শাসন।

ঠাকুর শান্তিপুরে পঁহুছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয় স্বজনগণ, বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিয়া, ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেছেন। একটি অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণ বিধবা, প্রায় সর্ব্বদাই আমাদের এখানে আসেন। গতকল্য হইতে আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "ঠাকুর না বলিলে আমি কোথাও এক পা যাইতে পারি না। আপনি ঠাকুরকে বলুন না?" স্ত্রীলোকটি ঠাকুরকে যাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রহ্মচারী শিষ্যটিকে একবাব আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।"

২২ শে কার্ত্তিক, শনিবার।

ঠাকুর বলিলেন— **"ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হ'লে যাবে।"**

ঠাকুরকে ছাড়িয়া পাঁচ মিনিটের জ[illegible]ও অন্যত্র যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অথচ স্ত্রীলোকটির বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ দেখিয়া, আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ঠাকুর আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, কোনও প্রকারে মনকে বুঝাইয়া উঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উঁহার বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি, অন্য একটি লোকও ঐ বাড়ীতে নাই, মাত্র একটি ছোট ছেলে রহিয়াছে। বিধবাটি, আমাকে বসিতে আসন দিয়া, জল খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি নিষেধ করাতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সম্মুখে বসিয়া. নানা কথায় আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। সুন্দরী যুবতীর

রূপলাবণ্য ও হাব ভাব দেখিয়া, আমি যেন কেমন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি থাকিব কি যাইব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ভয়ে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি বিধবাটিকে বলিলাম, "অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছি, শীঘ্র আমাকে ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আমার অসুখ বোধ হইতেছে, বরং অন্যদিন আসিব।" স্ত্রীলোকটি যেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কয়েক বার থাকিতে বলিয়া, আর বিশেষ জেদ্ করিলেন না; রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি বাড়ী পঁহুছিয়া ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলিলেন— **"কি ব্রহ্মচারী, বেড়িয়ে এলে, বেশ ভাল লাগ্‌লো?"**

আমি বলিলাম— "বিষম ভাল লাগ্‌লো। আমি কি আর এমন জানি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা আবার জান না? না জেনেই কি গিয়েছিলে?"**

আমি খুব লজ্জিত হইয়া বলিলাম— "কি করব উঁহার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। আমার তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না।"

ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন— **"তবে গেলে কেন? ধর্ম্মলাভ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়্‌তে হবে। কিসে কার মনে কষ্ট হবে, কিসে কার মন রক্ষা হবে, এসব দিকে তাকালে কখনও ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। ঠিক প্রাণের সরল আকর্ষণের দিকে তাকায়ে কার্য্য কর্‌তে হয়। কারও অনুরোধে কোথাও যাওয়া বা কোনও কার্য্য করা ঠিক নয়। ঐরূপ কর্‌লে উপকার না হ'য়ে বরং অনেক সময়ে বিষম ক্ষতিই হয়। সহজভাবে প্রাণের আকর্ষণমত কার্য্য ক'রে গেলে, কোনও ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এমনও ঘট্‌তে পারে যে, একজন লম্পটের উপর আকর্ষণ পড়্‌লো, আবার একজন সাধুর উপরও হ'লো না। সে সব স্থলে বুঝে নেওয়া বড়ই কঠিন; তা হ'লেও সরল ভাবে প্রাণের সহজ টানে কোন কার্য্য কর্‌লে পরিণামে অমঙ্গল ঘটে না। যিনি যত উন্নত হউন না কেন, স্ত্রীলোক হ'তে সকলকেই সর্ব্বদা তফাৎ থাক্‌তে হবে। এমন কি উর্দ্ধরেতাঃ হ'লেও, স্ত্রীলোক হ'তে বিষম অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"**

সৎসঙ্গ বিষয়ে উপদেশ।

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। ঠাকুরের উপরই একটু চাপ দিয়া আমি বলিলাম, "নিয়ত সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করেও এ সকল কুপ্রবৃত্তি আমার কিছুতেই গেল না!"

ঠাকুর বলিলেন— **"সদ্‌গুরুরসঙ্গ! সে ত অনেক দূরের কথা, সৎসঙ্গও তোমরা ঠিকমত কর্‌ছ না। সৎসঙ্গ হ'লে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।"**

আমি বলিলাম— "আবার সৎসঙ্গ কিরূপে কর্‌তে হয়? সৎসঙ্গ কাকে বলে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সাধুর সঙ্গে দশটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলাই সৎসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খুব ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ভাবে দেখে যেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন্ অবস্থায় তিনি কিরূপ ব্যবহার**

করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করেন, সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাক্‌লে, চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে; ধীরে ধীরে, নিজের দিকে যাহা কিছু ত্রুটি আছে ধরা পড়ে ও তাতে ধিক্কার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবও নষ্ট হ'য়ে যায়।"

বাবলায় অপ্রাকৃত হরিসঙ্কীর্ত্তন।

ঠাকুর এখানে আছেন খবর পাইয়া, কলিকাতা হইতে কয়েকটি গুরুভ্রাতা গতকল্য শান্তিপুরে আসিয়াছেন। প্রত্যূষে আমরা সকলেই গঙ্গাস্নানে গেলাম; গঙ্গা বহুদূরে, চড়াতে পঁহুছিয়াও প্রায় এক মাইল চলিতে হয়।

২৩ শে কার্ত্তিক, রবিবার।

ঠাকুর বলিলেন— **"বড় রাস্তার উপরে, যে স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিছু কাল পূর্ব্বেও গঙ্গা সেই স্থানে ছিলেন।"**

আহারান্তে, আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে অদ্বৈতপ্রভুর ভজন স্থান দেখিতে, বাবলাতে চলিলাম। অনেক দূর চলিয়া আমরা একটি খাল পাইলাম!

ঠাকুর বলিলেন— **"এই খাল এক সময়ে গঙ্গা ছিল।"**

সন্ধ্যার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, আমরা বাবলাতে পঁহুছিলাম। একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী, অদ্বৈতপ্রভুর মন্দিরে সেবক রহিয়াছেন। বাবাজীর বিনয়, ভক্তি ও সেবানিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, গঙ্গা হইতে এখন বহুদূরে। এক সময়ে গঙ্গা এই মন্দিরেরই ধার দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে বসিলে—

ঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন— **"স্থানের প্রভাব বড়ই চমৎকার। একটু স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্‌লেই বুঝতে পার্‌বে।"**

আমরা সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, বহুদূর হইতে যেন খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি সংযোগে একটি মহাসঙ্কীর্ত্তন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ভাবিলাম, ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানিয়াই, বুঝি আশপাশের লোক সঙ্কীর্ত্তন লইয়া এস্থানে আসিতেছেন। আমরা খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল। দুই এক মিনিট অন্তরেই, সঙ্কীর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং অদূরেই সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের খেলা, ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার আকাঙ্খায় চলিতে লাগিলাম, ততই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া, দুই এক মিনিটের মধ্যে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। আমরা আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সঙ্কীর্ত্তনের মহা কোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্খায় যেমন আমরা

মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানি না অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সঙ্কীর্ত্তন মুহূর্ত্তমধ্যে কোন্ দিকে চলিয়া গেল।"

ঠাকুর বলিলেন— **"ছেলেবেলা প্রায়ই আমি বাবলায় আস্‌তাম। এই সঙ্কীর্ত্তন শুন্‌তাম; তখন একবার এদিক্ একবার ওদিক্ ছুটাছুটি কর্‌তাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্‌লেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পার্‌তে। এই সঙ্কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনেছ।"**

আমরা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। সমস্তই, ভগবান্ গুরুদেবের কৃপা। তাঁরই কৃপাতে সেই অপ্রাকৃত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের আভাষ পাইলাম। কুবুদ্ধি বশতঃ, ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে যাইতেই, তাঁর অপরিসীম কৃপার ফল মুহূর্ত্তমধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ধন্য গুরুদেব! তোমার কৃপা ব্যতীত সমস্ত অলৌকিক অবস্থা, অদ্ভুত দৃশ্য ও অপ্রাকৃত আনন্দকেও কিছুই যেন মনে না করি, এই আশীর্ব্বাদ করিও। বাবাজী, ঠাকুরকে অদ্বৈতপ্রভু বলিয়া বহু স্তব স্তুতি করিলেন। বাবাজীর নিষ্কপট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "হিন্দুস্থানী বাবাজী এখানে আসিয়া রহিলেন কিরূপে? কতকাল যাবৎ এখানে আছেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"কতকালযাবৎ আছেন বলিতে পারি না। বহুকাল হ'তেই বাবাজীকে এই অবস্থায় দেখে আস্‌ছি। অল্প বয়সে ইনি অকস্মাৎ এখানে এসে পড়েন, অদ্বৈতপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ ক'রেই, এস্থানে প'ড়ে আছেন। এরূপ মরার মত প'ড়ে না থাক্‌লে কি আর ধর্ম্মলাভ হয়? ধর্ম্ম কি আর এমনই সহজ জিনিস? অভিমান শূন্য হ'তে হবে। বৃক্ষের যেমন বীজ না পচ্‌লে তা হ'তে অঙ্কুর বাহির হয় না, মানুষেরও, অভিমানটি একেবারে নষ্ট না হ'লে, ধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মায় না। অভিমান যত কাল আছে, তত কাল প্রকৃত ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্‌বে, জীয়ন্তে মৃত হ'তে হবে।"**

বাবলায় কুকুর দ্বারা অদ্বৈতপ্রভুর পাদুকা আবিষ্কার।

শুনিলাম এই বাবলা শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তপস্যার স্থান ছিল। শান্তিপুরের প্রায় দুই মাইল উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান শান্তিপুরেরই অন্তর্গত ছিল। এখনও ইহাকে 'আদি শান্তিপুর' বলে। সেই সময়ে সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা এই পুণ্যভূমির ধার দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিতা ছিলেন, এখন গঙ্গার খাত মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাবলা বৃক্ষের জঙ্গলে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে বাবলা বলে। বাবলার উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর সন্নিকটে একটি দোলমঞ্চ ছিল। তথায় অদ্বৈতপ্রভুর দোল হইত। এখন দোল শ্রীমন্দিরেই হইয়া থাকে। এই দোল 'সপ্তম দোল' নামে অভিহিত। এখনও এই দোল উপলক্ষে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরে অদ্বৈতপ্রভুর দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বহুকাল হইতে তাঁহার নিত্যসেবা চলিতেছে।

এই পরম পবিত্র, নির্জ্জন ভজন স্থানের প্রতি বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের অসাধারণ আকর্ষণ। ক্রমশঃই এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তিপুরে থাকিলে ঠাকুর প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন এবং ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়েন। পূর্ব্বেই শান্তিপুরে ব্রাহ্মবন্ধুদের সমাগম হইলে ঠাকুর তাহাদের লইয়াও বাবলায় আসিতেন। কেশববাবু, সাধু অঘোরনাথ, ভাই প্রতাপ, কান্তিবাবু, ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুদের লইয়া ঠাকুর অনেকবার এই বাবলায় আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনোৎসব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শান্তিসুধার বিবাহের কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর যখন শান্তিপুরে আসিয়া কিছুকালের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই বাবলায় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনিয়া অবাক হইলাম। একদিবস ঠাকুর চৌদ্দ মাদল লইয়া বহুলোক সমেত নিজ বাড়ী হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবলায় চলিলেন। গৃহপালিত কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এ কুকুর সাধারণ কুকুর নয়। শুনিলাম জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস বা উচ্ছিষ্ট খায় নাই। কুকুর "কেলে" প্রত্যহ শ্যামসুন্দরের মন্দির পরিক্রমা করিত। খোল করতালের শব্দ পাইলে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং নিবিষ্টচিত্তে একস্থানে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিত। কখন কখনও উহার অশ্রুধারা নির্গত হইত। ঠাকুর কেলেকে "ভক্তরাজ" বলিয়া ডাকিতেন। কেলে না কি মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য্য সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযাত্রীদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কেলেকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কেলে তখন নিরুপায় হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন। অচিরেই হরিসঙ্কীর্ত্তন মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তখন ভাবাবেশে মত্ত হইয়া সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দ্দিক হইতে অপ্রাকৃত মহাসঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সঙ্কীর্ত্তন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাতে যোগ দিবার মানসে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা মন্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন ততই সেই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না। এই সময়ে "ভক্তরাজ" কেলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পঞ্চবটীর নিকটে একটি স্থানে দৌড়িয়া গিয়া সজোরে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকটে আসিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরের বহির্ব্বাস কামড়াইয়া ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমাগত তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া ঠাকুর কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহা খুঁড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। নিকটবর্ত্তী কৃষকদের গৃহ হইতে দু'খানি কোদালি আনিয়া ঐ স্থানে খনন করা হইল। খানিক দূর খনন করিয়া কিছুই না পাওয়াতে খননকারীরা নিবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভক্তরাজ ঠাকুরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং নখদ্বারা মৃত্তিকা আবার ব্যস্ততার সহিত আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া ঠাকুর আরও মৃত্তিকা খনন করিতে বলিলেন। এইবার কিছুক্ষণ

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ

৪১নং সুকিয়া স্ট্রীট (রাখাল বাবুর বাড়ী)

শান্তিপুরে বাবলায় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রী বিগ্রহের মূর্ত্তি

বাব্‌লার শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দির

খুঁড়িতেই একটি পিতলের বড় হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। উহার ভিতরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামাঙ্কিত একজোড়া কাষ্ঠ পাদুকা একটি মাটির করোয়া এবং হস্তলিখিত ছিন্নপুঁথি একটি বাক্সের ভিতরে রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঠাকুর ঐ পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন আবার আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন ভক্তরাজ কেলেও অচৈতন্য। ঠাকুর তাহার কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কেলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া **"যে কার্য্যের জন্য তুমি এসেছিলে, আজ তাহা সম্পন্ন হইল, এখন তুমি গঙ্গালাভ কর"** বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রহরাধিক রাত্রির পর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গৃহে আসিল। পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নানে গিয়া দেখিলেন একহাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। ঠাকুর নিজহস্তে গঙ্গাতীরে বালুকা খনন করিয়া ভক্তরাজ কেলের দেহ সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর করোয়া পাদুকা প্রভৃতি লইয়া কিছুকাল পরে গোস্বামীদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল, তখন ঠাকুর একসময়ে বাবলায় আসিয়া ঐ সমস্ত বস্তু অদ্বৈতপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের নীচে সমাধিস্থ করিয়া রাখিলেন। এ সকল শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

হিমালয়ে গুরু অন্বেষণ ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার।

আহারান্তে, ঠাকুরের নিকট বসিয়া, আমরা শান্তিপুরের অনেক কথা ঠাকুরের মুখে শুনিতে লাগিলাম। কথা প্রসঙ্গে, সুবিধা পাইয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্মস্থান, শুনিয়াছি এই শান্তিপুরেই ছিল। শান্তিপুরের আরও কোন প্রাচীন মহাত্মা এখন আছেন কি?"

২৪ শে কার্ত্তিক, সোমবার।

ঠাকুর বলিলেন— **"জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি না; তবে হিমালয়ের উপরে একটি মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, তাঁহার জন্মস্থান এই শান্তিপুরে।"**

ঠাকুর, কখন কি ভাবে তাঁর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, জানিতে আমাদের কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **"গুরু নির্দ্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃ পুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে, আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হ'য়ে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগ্‌লাম। সেই সময়ে আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে, ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম। কয়েকটি বৌদ্ধ যোগীর মুখে শুন্‌তে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্নিকটে, এই পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে, একটি বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিষ্যেরা নিকটবর্ত্তী গোফা হ'তে বের হ'য়ে এসে তাঁকে চৈতন্য করান। মহাপুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাঙ্খায়, আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌লাম। হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অজ্ঞাত পথে, মহাপুরুষের উদ্দেশে চল্‌তে লাগ্‌লাম। দুই দিন দুই রাত্রি আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন**

হ'ল যে, একটি বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া। একটি উলঙ্গ , দীর্ঘাকৃতি পর্ব্বতবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ কর্‌লেন; পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "বাচ্ছা, এহি দানা পায় লেও, ভুখ্ পিয়াস ছুট্ যায়েগা, পর্ব্বত পর যেত্‌না রোজ রহোগে, দু' এক দানা পায় লিও, ভুখ্ পিয়াস কভি নেহি হোগা।" এই বলিয়া, তিনি আমাকে কতকগুলি সর্‌ষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি দুই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একেবারে দূর হ'য়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পাহাড়ে আমি যত কাল ছিলাম, ঐ বীজ দুই একটি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে খেতাম। পাহাড়বাসী সন্ন্যাসীকে ঐ মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, "হাঁ, বাঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্ব্বতকা উপর্‌মে রহতে হ্যাঁয়; কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আস্নান কর্‌কে বিজ্‌লিকা মাফিক্ তুরন্ত চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর্ ঝর্ গিরতি হ্যায়। এয়্‌সে চলে যাও, মিল যায়েগা।" এই ব'লে তিনি ঐ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন। আমি ঐ পথ ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। দু'টি শিষ্য নিয়ত তাঁর সেবায় রয়েছেন দেখ্‌লাম। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্তরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ একবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হ'তে থাকে, বরফ গ'লে গ'লে ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে। শিষ্যেরাও ঐ সময়ে মহাপুরুষের সম্মুখে আগুন জ্বেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে সময় সময় খুব গরম গরম চা মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে মহাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "হিমালয়ের উপরেও সাধুরা চা খান? চা তাঁরা কোথায় পান?"

ঠাকুর বলিলেন— "হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধযোগী মহাত্মা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে। দশ পনের মিনিট অন্তর অন্তর, তাঁরা একটু একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকায়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় বড় হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "চায়ে কি তাঁরা দুধ দেন না?"

ঠাকুর বলিলেন— "হাঁ, খুব উৎকৃষ্ট দুধ দেন। পালানে দুধ ভার হ'লেই, পাহাড়ের গাভীরা এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধ ছেড়ে যায়। ঐ দুধ বরফময় প্রস্তরে পড়ামাত্রেই জমাট হ'য়ে যায়; সাধুরা ঐ দুধ চিমটা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেল্‌লেই উৎকৃষ্ট দুধ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না। প্রয়োজন হ'লে, তাও অনায়াসে সংগ্রহ কর্‌তে পারেন। ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসযুক্ত লতা পাতা পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়, সাধুরা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "মহাপুরুষ কি কোন কথাই বলিলেন না?"

ঠাকুর বলিলেন— "হাঁ, খুব বল্‌লেন; নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্প বয়সে উপনয়নের পরেই, একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চ'লে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে

অবশেষে এই বল্‌লেন, "বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা এই দু'টি ঠিক হ'লেই, ক্রমে যোগিজনদুর্ল্লভ 'ব্রহ্মপদ' লাভ হয়। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা না হ'লে কিছুই হয় না। বীর্য্যধারণ যেমন শরীররক্ষা বিষয়ে এক পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ । অসত্য চিন্তা, অসত্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহাপাপ, মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ; যাঁরা যোগপথে চল্‌বেন, যাবতীয় কার্য্যেই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহার মূলই অসত্য বা মিথ্যা তা শুনা বা পড়া যোগশাস্ত্রে নিষেধ। অসত্য চিন্তা মহাপাপ জান্‌বে, ওতে মস্তিষ্ক নষ্ট করে। ভগবান্‌ই সত্য; ভগবচ্চিন্তাতে মস্তিষ্কের শক্তি সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে, তাহা বলা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সাধু মহাত্মাদের সঙ্গলাভ হ'লে, তাঁরা যে সকল উপদেশ দিবেন, সেইমত কি আমরা চলতে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, ইচ্ছা হ'লে খুব পার। যেখানে সত্য, যেখানে ন্যায়, সেখানেই আমাদের অধিকার আছে। সকল স্থানে, সকলেরই কাছে, আমরা শিক্ষালাভ কর্‌তে পারি, তাতে কোনও নিষেধ নাই; তবে প্রয়োজনও কিছুই নাই। এই সাধন ধ'রে চল্‌তে পার্‌লে, ক্রমে সমস্তই লাভ হবে; কিছুরই অভাব থাক্‌বে না। অন্যের উপদেশমত চলতে গেলে, অনেক সময় ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। নিষ্ঠার দিকেও অনিষ্ট হয়। অনেকেই নিজ মতে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, এ ত প্রায়ই দেখা যায়।"**

জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

২৫শে—২৯শে কার্ত্তিক,
মঙ্গলবার — শনিবার।

এখানে আসিয়া আমার দু'দিন হোম বন্ধ ছিল। এখন নিত্য হোম করিতেছি। আজ হইতে ঠাকুর আমাকে আবার স্বপাক আহার করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার অসুবিধাতেও আমি স্বপাক আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলাম। ঠাকুরের সঙ্গে, অপরাহ্নে আর বেড়াইতে সুবিধা পাইব না ভাবিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। ভাবিলাম, "গুরুকুলে বাস করিতেছি, গুরুপরিবারের ব্রাহ্মণকন্যাই রান্না করিতেছেন, ঠাকুরের ভোগ হইতেছে, কোনও প্রকার অনাচারেরই সম্ভাবনা নাই, এখানে আবার স্বপাক! ইহার তাৎপর্য্য কি? লোকসমাজে যে প্রকার জাতিভেদ প্রচলন রহিয়াছে, আমার প্রতি ব্যবস্থা ত দেখিতেছি তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে কঠিন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, ঠাকুর সাধারণের অন্তর হইতে জাতিবুদ্ধির মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ব্যবহারিক জাতিভেদের আঁটাআঁটি, ঠাকুরের কার্য্য কলাপে ততটা দেখিতে পাইতেছি না। তবে আমার উপরই বা এত কঠোর নিয়মের আদেশ কেন? ঠাকুরের মুখ হইতে কোনও প্রকারে একবার জাতিভেদের একটু দোষ প্রকাশ হইলেই, আমার পক্ষে এ সকল কঠোরতার যে ব্যবস্থা, তাহা একেবারে উল্‌টাইয়া লইব; এইরূপ স্থির করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— "আমাদের দেশে যে একটা জাতিভেদ প্রথা আছে, তা কি থাকা ভাল?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন— "জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্ব্বত্রই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্যসমাজে নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে আছে, দেখ্‌তে পাবে। এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা। কোথাও ইহা কেহ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এ দেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুষ্যসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, তাহা অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শূদ্র জাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি এক প্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্য প্রকার। পরমহংস অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই এই জাতিবুদ্ধি ত্যাগ কর্‌তে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাক্‌লেই, সেখানে জাতিবুদ্ধি থাক্‌বে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল, মন্দ বুদ্ধি যত কাল আছে, মানুষ তত কাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। যার তার হাতে খেলেই, জাতিবুদ্ধি যায় না; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহার করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা দেখ্‌তে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য; এ সকল এক বিষম সমস্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "কোন্ অবস্থা লাভ কর্‌লে, যার তার হাতে খাওয়ায় কোন অনিষ্ট হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন— "যে অবস্থা লাভ কর্‌লে, মানুষ সমস্ত বস্তুতে একেরই অস্তিত্ব দর্শন করে। যিনি নিত্যশুদ্ধ, মঙ্গলময়, পতিতপাবন, যাঁর নামেতে মহাপাপী উদ্ধার হ'য়ে যায়, তিনি যেখানে অবস্থান কর্‌ছেন প্রত্যক্ষ হয়, তা কি কখনও আর অপবিত্র মনে করা যায়? বিষ্ঠাতে চন্দনেতে যিনি নিজের সেই ইষ্টদেবতারই অধিষ্ঠান প্রকাশিত দেখ্‌তে পান, তিনি কি তা পরম পবিত্র তীর্থ মনে না ক'রে থাক্‌তে পারেন? বস্তুবিশেষে তাঁর আর ভেদবুদ্ধি হবে কি ক'রে? এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে, সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই তিনি ভগবল্লীলা দর্শন করেন, সর্ব্বত্রই তিনি অমৃত ভোজন করেন; তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তা না হ'লে, যত কাল ভেদবুদ্ধি আছে, তত কাল মুচি, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতিবুদ্ধি যাওয়া সহজ কথা নয়, বড়ই কঠিন।"

প্রসাদসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও শ্যামাক্ষেপার কথা।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "সাধারণের পক্কান্ন ভোজনে যে অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা বল্‌লেন, ঠাকুরের প্রসাদ ভোজনেও কি সেইরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

ঠাকুর বলিলেন— "প্রসাদ ভোজন ত মহাভাগ্যের কথা, তাতে পরম কল্যাণই হ'য়ে থাকে। কিন্তু রান্না ক'রে ঠাকুরের নিকটে ধ'রে দিলেই যে ঠাকুর তা গ্রহণ কর্‌বেন, আর প্রসাদ হবে তা ত নিশ্চয় বলা যায় না। বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যবস্থায় এই শান্তিপুরে একটি মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে শ্যামাক্ষেপা ব'লে ডাকৃত। শ্যামাক্ষেপা কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁর চাল চলন, আচার ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌বার যো ছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাক্‌তেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। আহারের জন্য, ঠাকুরের ভোগ সর্‌বার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্যামাক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাবধানতা বশতঃ, ভোগরান্না সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হ'য়ে পড়্‌লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্যামাক্ষেপা উঠে পড়্‌তেন এবং গালাগালি দিয়ে ব'লে যেতেন, 'আরে, ভোগে এই গন্ধ পাচ্ছি; রান্নার সময়ে রান্ধুনী এই ক'রেছিল, এই হ'য়েছিল, আজ ইহা প্রসাদ হয় নাই; ঠাকুর যে ইহা সেবা করেন নাই, অনাহারে রয়েছেন; শীঘ্র গিয়ে আবার রান্না ক'রে দে।' আশ্চর্য্য এই যে, তিনি যেমন যেমনটি ব'লে যেতেন, অনুসন্ধানে জানা যেত, তা যথার্থ; মেয়েরা লজ্জায় ম'রে যেত। শ্যামাক্ষেপা কখন কার বাড়ী যেয়ে প্রসাদ পেতে উপস্থিত হন, এই ভয়ে মেয়েরা সশঙ্ক থাক্‌তেন এবং অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে ব্যবস্থামত ভোগ রান্না কর্‌তেন। আমাদের বাড়ীতেও একবার এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ব্যতীত, লোকালয়ে যাবার তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শান্তিপুর নিবাসী কোন একটি গোস্বামী, একবার পুরীধাম হ'তে লিখে জানালেন, 'শ্যামাক্ষেপা শ্রীক্ষেত্রে কিছুদিন যাবৎ এসেছেন। প্রায়ই তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে দেখ্‌তে পাই।' অথচ দেখা গিয়েছিল, শ্যামাক্ষেপা সেই সময়ে শান্তিপুরেই ছিলেন। শ্যামাক্ষেপা আমাকে দেখ্‌তে পেলে, ছুটে এসে ধ'রে ফেল্‌তেন, কয়েক সেকেণ্ড ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়ে থেকে বল্‌তেন, "কাল কুচ্‌কুচে, লাল টুকটুকে, সাদা ধপ্‌ধপে; আর এই হল্‌দে কিরে ভাই, আর এই হল্‌দে কিরে ভাই, পুনঃপুনঃ এইরূপ ব'লে এক দিকে ছুটে অদৃশ্য হতেন। কিছুকাল পরে শ্যামাক্ষেপা কখন কোথায় যে চ'লে গেলেন, তাঁর আর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সন্ন্যাস গ্রহণ না ক'রে, ঘরে থেকে কি কেহ এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ কব্‌তে পারেন না?"

ঠাকুর বলিলেন— "হাঁ, খুব পারেন। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাক্‌তে, সাময়িক উৎসাহে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়। দুর্গের ভিতরে থেকে যেমন নিরাপদে যুদ্ধ করা যায়, সংসারে থেকেও সেই প্রকার বৈধ উপায়ে কর্ম্মক্ষয় করা সহজ। কর্ম্মক্ষয় না হ'লে ত কিছুই হবার যো নাই। সন্ন্যাস একটা কথার কথা নয় বা মত নয়, মানুষের ভিতরেরই একটা অবস্থা; ভগবানে সম্যক্ প্রকারে আত্মসমর্পণই সন্ন্যাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "উৎপাতশূন্য স্থানে থেকে নিরুদ্বেগে ভগবানের উপাসনা করতে হয় শুনেছি। সংসারে নানাপ্রকার বিষম প্রলোভনের মধ্যে, বাঘ মহিষের সঙ্গে লড়াই করে, যাঁহারা স্থির ভারে ভগবদুপাসনা করতে অসমর্থ, তাঁহারা কি করবেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সম্মুখ যুদ্ধ আর কয় জনে কর্‌তে পারেন? বীরত্বের পরিচয় দেওয়া ত আর ভগবদুপাসনার তাৎপর্য্য নয়। সংসারের প্রলোভন অতিক্রম ক'রে, নিরুপদ্রবে যাঁরা ভজন সাধন কর্‌তে না পারেন, তাঁরা অবশ্যই অন্য উপায় নিবেন। 'সংসারে থেকে ধর্ম্ম করা উচিত,' লোকে বলে বটে; কিন্তু যাঁরা তা না পারেন, নিজেকে নিতান্ত দুর্ব্বল মনে করেন, তাঁরা যে অবস্থায় যেখানে যেয়ে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে পারেন তাই কর্‌বেন। এ ভিন্ন আর উপায় কি? সকলকেই যে এক পথ ধ'রে চল্‌তে হবে, এরূপও কিছু নয়। প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, পথও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশ্যক হয়ে থাকে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও কি আবার সাধারণ কর্ম্মবন্ধন থাকে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বাড়ী ঘর, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ কর্‌লেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। এই দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হ'লে সমস্তই বিড়ম্বনা। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে, তত দিনই কর্ম্ম থেকে যায়। বাহিরে একটা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। ভগবান্‌কে লক্ষ্য রেখে কর্ম্ম ক'রে গেলে, অচিরে সেই কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যায়?"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "জীব যখন পরাধীন, নিজ ইচ্ছায় কিছু করে না, তখন তার আবার বন্ধন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"জীব সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হ'লেও বাসনা কামনা যা কিছু তার মনে নিয়ত উঠ্‌ছে, তাই তার বন্ধনের হেতু হয়। এই বাসনাই কর্ম্ম, এ ত আর স্বাধীন পরাধীনের অপেক্ষা রাখে না। আত্মার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা কামনা ক্ষয় হয়; উহা ক্ষয় হবার সময় ইহা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।"**

শান্তিপুরের রাস।

৩০ শে কার্ত্তিক, রবিবার; ১৫ই নভেম্বর।

আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সকালবেলা হইতেই সমস্ত শান্তিপুরবাসী, ভগবানের রাসোৎসব স্মরণ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিলেন। সকল গোস্বামী প্রভুর বাড়ীতেই, কোথাও শ্যামসুন্দর, কোথাও রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বহুকালযাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আজ সকলে আপন আপন বাড়ীর ঠাকুরকে পরিপাটী করিয়া সাজাইতে, পরম উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইয়াছেন। শান্তিপুরে আজ আনন্দের সীমা নাই।

ঠাকুর বলিলেন— **"ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন, এবং শান্তিপুরের রাসযাত্রা দেখ্‌বার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। চক্ষে যাঁরা না দেখেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না। এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে চিত্ত প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে।"**

সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে, রাসোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম। ঠাকুর প্রথমে নিজবাড়ীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, শ্যামসুন্দরের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দরদর ধারে চক্ষের জল পড়িয়া, ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। প্রায় ১৫/২০ মিনিট কাল একভাবে অবিশ্রান্ত কান্দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। একটু স্থির হওয়ার পর, শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন। বড়রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া আমরা রাসযাত্রা দেখিতে লাগিলাম। বিগ্রহ সকলের বহুমূল্য বেশভূষা ও সজ্জার পারিপাট্য দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আহা, যিনি ভগবদবুদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য হইয়া গিয়াছেন! আমি এ সকল বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেছি।

ঠাকুরের মুখে শ্যামসুন্দরের কথা।

একটু অধিক রাত্রিতে ঠাকুর নিজবাড়ীর শ্যামসুন্দরের কথা বলিতে লাগিলেন—

"একবার শ্যামসুন্দর এসে আমাকে বল্‌লেন, 'ওরে, আমি সোণার চূড়ো পর্‌বো; আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্‌লাম, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস টিশ্বাস করি না; যারা করে, তাদের গিয়ে বল। আমি টাকা কোথায় পাব? শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'দ্যাখ্, তোর খুড়ীমাকে বল্‌গে, তার ঝাঁপির ভিতরে টাকা আছে। তা নিয়ে নে না।' পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে, খুড়ীমাও বল্‌লেন, 'ওরে কাল্ শ্যামসুন্দর এসে আমাকে স্বপ্নে বল্‌লেন— 'ওগো, আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্‌লাম— 'আমি কোথায় টাকা পাব? আমার ত কিছু নাই।' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন— 'ওগো, ৪০/৫০টি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস না? দেখ্‌না, না পারিস্ ত বিজয়কে বল্‌গে, সে দেবে।' খুড়ীমা এই ব'লে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্‌লেন, '৬৭টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না।' ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হ'তে সোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরেছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম, শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে আমাকে বল্‌লেন, 'ওরে এক্‌বার দেখে যা না, চূড়ো প'রে আমি কেমন সেজেছি!' আমি বল্‌লাম, 'আমি আর কি দেখ্‌ব, আমি ত আর তোমাকে মানি না।' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'তাতে আর কি, নাই বা মান্‌লি একবার দেখ্‌তেও কি দোষ?' পরে আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে, তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়্‌লাম। শ্যামসুন্দর একটু হেসে বল্‌লেন, 'এ কি, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস্ না?' আমি

বল্‌লাম, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন?' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'তাতে আর তোর কি? ভেঙ্গেও ছিলেম আমি, এখন আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি; তোর তাতে আর কি হয়েছে? ভেঙ্গে গড়্‌লে আরও কত সুন্দর হয় জানিস্?"

এই কথার পর, ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন— **'প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মাঠাকুরাণীকে দেখ্‌তে আমি বাড়ী আস্‌তাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বল্‌লেন- 'দ্যাখ্, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, আর জল দেয় নাই।' আমি অমনই খুড়ীমাকে ডেকে বল্‌লাম, 'খুড়ীমা। তোমাদের শ্যামসুন্দর বল্‌ছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দেও নাই।' খুড়ীমা আমাকে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, শ্যামসুন্দর ত আর লোক পেলেন্ না; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কি না, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয় নাই।' আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা, অনুসন্ধান ক'রে দেখ না।' খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জান্‌লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বল্‌তেন। পূজারী কোনপ্রকার অনাচার বা ত্রুটি কর্‌লে, শ্যামসুন্দর এসে ব'লে যেতেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আস্‌ছি; আমি না মান্‌লেও তিনি কখনও ছাড়েন নাই।"**

ভাবের অমর্য্যাদা— নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ।

ঠাকুর, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যাত্রা গান শুনিতে, একটি ভদ্রলোকের বাড়ী পহুঁছিলেন। শান্তিপুরের গণ্যমান্য অনেক গোস্বামী প্রভুও এই গান শুনিতে উপস্থিত হন। যাত্রা আরম্ভ হইলে, ঠাকুর ভাবাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি এক সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ উহা দর্শন করিয়া মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া, লাফাইয়া উঠিলেন এবং উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠ মাতিয়া গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরেও ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে গোস্বামী প্রভুরা সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা ভারি গোলমাল কর্‌ছে; শীঘ্র এদের থামায়ে দাও।" ভাববিরোধী দলের প্রতিকূল চেষ্টা দেখিয়া, নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিলেন, এবং বলিলেন, 'যে স্থলে এ সব ভাবের আদর নাই ও ভক্ত মহাপুরুষের মর্য্যাদা নাই, সে স্থলে আমি গান করি না। সে স্থানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।' এই বলিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর, আমাদের সকলকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

অগ্রহায়ণ।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা।

আহারান্তে. সকলে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, অবসর পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "হিন্দুদের মঠে মন্দিরে সর্ব্বত্রই ত দেবদেবীর মূর্ত্তি— শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ— এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌তে পাই; গেণ্ডারিয়ার সমাধি-মন্দিরে মাঠাকুরাণীর ফটোর সহিত যে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন, ঐরূপ পটপ্রতিষ্ঠা কোথাও ত দেখি নাই!"

১লা—৫ই অগ্রহায়ণ।
১৬শে—২০শে নভেম্বর।

ঠাকুর বলিলেন— **"কেন? কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত আছে— বহুকাল পূর্ব্বে আমি তা দেখে এসেছিলাম। আরও দুই একটি স্থানে আছে।"**

একটি গুরুভাই বলিলেন— "ভগবানদাস বাবাজী কি প্রকারের সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন? সিদ্ধ শুনিলেই ত ভয় হয়।"

ঠাকুর বলিলেন— **"দেশে সাধারণের সংস্কার এরূপই বটে। "সিদ্ধ" শুন্‌লেই লোকে একটা ভয়ানক কিছু মনে করে। ভগবানদাস বাবাজী বৈষ্ণব পরমহংস ছিলেন। ইনি যেন বিনয়ের অবতার ছিলেন। কারও দোষ কখনও দেখ্‌তে পেতেন না। দোষের কথা কেহ তাঁর কাছে বল্‌লে, উনি কেঁদে ফেল্‌তেন, সকলের চেয়ে নিজেকে হীন ম'নে কর্‌তেন।"**

গুরুভাইটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনি ত ব্রাহ্ম অবস্থায় ওখানে গিয়াছিলেন; বাবাজী কিরূপ ব্যবহার করিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"প্রচারক অবস্থায়, আরও দু'টি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন কর্‌তে কাল্‌নায় গিয়েছিলাম। আমরা পৌঁছিতেই বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বস্‌তে আসন দিলেন। পথশ্রান্তিতে আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল; বাবাজীকে বলাতে, বাবাজী নিজ কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে, আমাকে পান কর্‌তে দিলেন। কমণ্ডলুটি বাবাজীরই বুঝ্‌তে পেরে, আমি বল্‌লাম 'বাবাজী! আমি যার তার হাতে খাই, জাত টাত কিছুই মানি না— ব্রহ্মজ্ঞানী; আমাকে অন্য একটা পাত্রে জল দিন।' বাবাজী খুব কাতরভাবে করজোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভো! আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন না। জাত কুল থাক্‌তে কি কখনও ভক্তি লাভ হয়? ব্রহ্মজ্ঞানই ত সমস্ত ধর্ম্মের মূল। আপনি দয়া ক'রে এই পাত্রেই জল পান করুন।" আমি জল পান ক'রে কমণ্ডলুটি রাখ্‌তেই, বাবাজী সেটি নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে, সমস্তটা জল পান কর্‌লেন। কয়েকটি ভদ্রলোক ঐস্থানে ব'সে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন বল্‌লেন, 'বাবাজী! এ কি কর্‌লেন? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, আর ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।'**

বাবাজী বল্‌লেন, 'আমার অদ্বৈতরও ত পৈতা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোঁসাই আচার্য্য।' ভদ্রলোকটি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন,

'তা ঠিকই বলেছেন বাবাজী! আচার্য্য! আচার্য্য কেমন দেখ্‌তে ত পাচ্ছেন! কেমন জামা, জুতো, ধুতি, চাদর! বাঃ!' শুনিয়া বাবাজীর চ'ক্ষে জল এল, তিনি বল্‌লেন, 'আহা! প্রভুকে পরিপাটি ক'রে সাজান, এ ত আমাদেরই কর্ত্তব্য। এমনই দুর্ভাগ্য যে তা পার্‌লাম না! প্রভু নিজের প্রয়োজনমত জিনিস নিজেই সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছেন, তা দেখে যে একটু আনন্দ কর্‌ব, হায়, হায়, সে অদৃষ্টও ঘট্‌ল না।' এই ব'লে বাবাজী বালকের মত 'হু হু' শব্দে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন।

বাবাজীর ওখানেই নামব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত দেখি; তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাহার নিত্য সেবা পূজা কর্‌তেন।

বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সম্বন্ধে উপদেশ।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি ভাবে চলিলে প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয়? আর বৈরাগ্য লাভ হইলে, কিসে তাহা জানা যাইবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বিষয়ের আসক্তি নষ্ট না হ'লে, ত্রিতাপ না গেলে, যথার্থ বৈরাগ্য লাভ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, মান অপমানাদিতে যত কাল কর্ত্তব্য কার্য্য কর্‌তে বাধা জন্মাবে, তত কালই ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই—জান্‌বে। তত দিন পর্য্যন্ত খুব নিয়মে থাক্‌তে হয়। দিবসটিকে নানা কার্য্যে বিভাগ ক'রে, খুব নিষ্ঠার সহিত তাতে নিযুক্ত থাক্‌তে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অন্যথাচরণ কর্‌তে নাই। এই প্রকারে চল্‌লেই, ক্রমে ত্রিতাপ নষ্ট হ'য়ে যায়।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "ত্রিতাপ কি? কষ্টই ত তাপ?"

ঠাকুর বলিলেন— **"শুধু কষ্ট কেন? বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই তাপ। দুঃখ যেমন তাপ, সুখও তেমনই তাপ। নিরানন্দ যেমন তাপ, আনন্দও তেমনই তাপ। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, মানে অপমানে চিত্তকে যত কাল স্পর্শ কর্‌বে, তত কাল যথার্থ ধর্ম্মের অঙ্কুরই জন্মায় নাই— জান্‌বে।"**

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "বিষয়জ্ঞান ও তাপবোধ না থাকলে লোকে কোনও কার্য্য করে কিরূপে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"কর্ত্তৃত্বাভিমান যত কাল আছে, তাপও তত কাল আছে। কর্ত্তৃত্বাভিমান না গেলে, মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত হ'লেও মানুষের কর্ম্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বালকের ক্রীড়াবৎ, উন্মাদের নৃত্যবৎ। একটা যন্ত্রের মত দেহদ্বারা তাদের কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে মাত্র।"**

ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মূর্চ্ছা।

আজ দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, অত্যাচারী, শান্তিপুরের একটি জমিদারের প্রকাণ্ড ভবনের জনমানবশূন্য শ্মশানতুল্য পরিণাম দেখিয়া, ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন— **"এক সময়ে এই বাড়ীর কতই জাঁক জমক ছিল! জমিদার * * * বাবুর ভয়ে, এ বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ চল্‌তে সাহস পেত না। শান্তিপুরবাসীরা এঁর অত্যাচারের আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাক্‌তেন। আজ তিনিই বা কোথায়, আর তাঁর সাধের বাড়ীই বা কোথায়? দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছু কালের মধ্যে একেবারে সমস্ত ছারখার হ'য়ে গেল। কিছুই আর চিরদিন এক অবস্থায় থাকে না, সঙ্গেও কিছুই যায় না; তবু একে অন্যকে পীড়ন ক'রে সুখী হ'তে চায়, বড় লোক হ'তে চায়! পরিণাম যে কি, তা একবার কেউ ভাবে না।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "এই জমিদার কি প্রকার অত্যাচারী ছিলেন? অত্যাচার ক'রে তার কি দুর্দ্দশা ঘটেছিল?

ঠাকুর বলিলেন— **"এঁর এক দিনের অত্যাচার আমি চক্ষে দেখেছি। মনে হ'লে এখনও শরীর শিউরে উঠে। তখন আমার বয়স ছয় সাত বৎসর; সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে কর্‌তে, একদিন এই বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হ'য়ে শুন্‌লাম, জমিদার বাবু টাকার জন্য একটি গরীব লোকের উপর ভয়ঙ্কর পীড়ন কর্‌ছেন। আমি খেলা ফেলে ছুটে গিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখি, একটি লোকের উপরে বাঁশডলা দিচ্ছে, লোকটি যন্ত্রণায় হাত পা আছড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আর সময়ে সময়ে তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেখেই, আমি উন্মত্তের মত হ'য়ে, একেবারে জমিদারের সম্মুখে লাফায়ে প'ড়ে, খুব চীৎকার ক'রে তাঁকে বল্‌তে লাগ্‌লাম— 'তুমি ডাকাত! ডাকাত!! লোকটি যে ক্লেশে ম'রে গেল; তোমার লাগ্‌ছে না? ভাল চাও, এখনই একে ছেড়ে দাও, এখনই একে ছেড়ে দাও। এই কয়টি কথা ব'লেই, আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। জমিদার বাবু কিন্তু তখনই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেরা গিয়ে বাড়ীতে আমার মূর্চ্ছার খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে, আমার জ্ঞান হ'লে, জমিদারবাবু আমাকে বল্‌লেন, 'ওহে, তোমার কথাতেই ঐ বেটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ভাল, তোমার ত খুব সাহস দেখ্‌ছি! আমাকে তুমি ধমক্‌ দিলে! একটুকুও ভয় হ'লো না?' আমি বললাম, 'ভয় কেন করব? আমি ত ঠিকই বলেছি! জান না আমি গোঁসাইদের ছেলে?'**

এর কিছুকাল পরেই জমিদার বাবু, একটি অসহায়া ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে, তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুট্‌ কর্‌লেন। বিধবাটি রান্না চড়ায়েছিলেন; ভাতের হাঁড়িটি লাথি মেরে ফেলে দিলেন, পরে তাঁর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার কর্‌লেন। বিধবাটি আর কি কর্‌বেন? এই মাত্র বল্‌লেন— 'আমি নিতান্ত অসহায়া বিধবা, হায়, হায়, আমার উপর তুমি এ ব্যবহার কর্‌লেন! আচ্ছা, আমি আর কাকে বল্‌ব? আমার আর কে আছে? ভগবান্‌কেই বলছি, তিনিই এর বিচার কর্‌বেন। যেমন যেমনটি আমাকে তুমি কর্‌লে ঠিক তেমন তেমনটি তোমার স্ত্রীরও

ঘট্‌বে'। আশ্চর্য্য এই যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই জমিদার বাবু, একটি শক্ত মামলায় প'ড়ে, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'লেন; কঠিন পরিশ্রমের সহিত জমিদার বাবুর জেল হ'লো; জেলে তিনি ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে মারা গেলেন। একদিন তাঁর বিধবা স্ত্রী, হবিষ্যান্ন কর্‌তে রান্না চাপিয়েছিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা সেই সময়ে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুট্ কর্‌লো। আধসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে পিতলের হাঁড়িটি একজন লাথি মেরে ফেলে দিয়ে, তাও নিয়ে গেল। নীচ প্রকৃতি ছোটলোকদের নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার ভুগে, জমিদারের স্ত্রী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে পড়্‌লেন। কথায় বলে, 'দুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনে বাপে।' কথাটা বড়ই সত্য। নিতান্ত অধম অপদার্থ দুরাচার ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারেন না।"

সমস্তই অসার—ধর্ম্মই সার।

ইহার পর ঠাকুর বলিলেন— **"কিছুই ত থাকে না। সমস্তই অসার, একমাত্র ধর্ম্মই সার। সংসারের সুখের জন্য, অর্থের জন্য, কখনই অসত্য পথ অবলম্বন কর্‌বে না, ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বে না। এতে সংসার থাকে থাক্, যায় যাক্। বরং ভিক্ষা ক'রে সারাটি জীবন কাটায়ে দিবে। পতির প্রতি যেমন সতীর, ধর্ম্মের প্রতিও সেই রকম সাধকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখে চল্‌তে হয়। স্বয়ং ভগবান্‌ই সকল অবস্থায় ধর্ম্মার্থীকে রক্ষা ক'রে থাকেন।"**

নাম ও ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ।

শান্তিপুরে আসিয়া অবধি, এখানে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতেছে। আমার বেশ দেখিয়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন— "তুমি কোন্ ভাবের উপাসক?" আমি তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারি না। কারণ, আমি কোনও বিশেষ একটা ভাব লইয়া সাধন করি না। নানা প্রকারের ভাবই আমার ভিতরে সময়ে সময়ে আসে, আবার চলিয়া যায়। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম— "কোন্ ভাবের উপাসক, কেহ জিজ্ঞাসা করলে, আমরা কি বলব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"যার যে ভাব ভাল লাগে, সে তাই বল্‌বে। বিষ্ণু ভাল লাগ্‌লে বৈষ্ণব বল্‌বে, শিব ভাল লাগ্‌লে শৈব বল্‌বে, এইরূপ।"**

আমি বলিলাম— "এক সময়ে একটা ভাব ভাল লাগে, আবার একটু পরেই অন্য আর একটা ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। একটা কিছু, স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না। এরূপ চঞ্চলতা হয় কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"নানা প্রকার অবস্থায় প'ড়ে, সংসর্গেতে ও সন্দেহেতে, পূর্ব্বাভাস এসে উপস্থিত হয়। যত কাল কর্ম্ম আছে, তত কাল কেহই কোন একটাতে স্থির হ'তে পারে না; এরূপ চঞ্চলতা ত্যাগ হওয়া অসম্ভব হয়। নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধ'রে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে ভগবানের অনন্ত রাজ্য, অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব ও অনন্ত**

লীলা প্রকাশ পাবে। অনন্ত রাজ্যে অনন্ত দিক্ দিয়ে অনন্ত ভাবে চল্তে হবে। কোনও একটি বাদ্ পড়্লে, পরে মনে হ'তে পারে, ওদিক দিয়ে ওভাবে বল্লে আরও সুবিধা হ'ত। এ প্রকার আক্ষেপ পরে আর না আসে, সে জন্য নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে, নানা ভাবে, নানা দিক্ দিয়ে চলা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। এতে সমস্ত জানাও হয়।"

এসব শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "মন ত নিতান্ত চঞ্চল, তার উপরে বাহিরের উপসর্গও বিস্তর, স্থির হ'য়ে নাম করব কি উপায়ে? আমাদের কি কিছু ধ্যানের ব্যবস্থা নাই?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বৈধ ধ্যান ও রাগের ধ্যান, এই দুই প্রকার ধ্যান আছে বটে— তবে আমাদের সে সকলের কোনও প্রয়োজন নাই। মনটিকে কোন একটি 'চক্রে' বসায়ে এবং চক্ষের দৃষ্টি কোন একটি বস্তুতে স্থির রেখে নাম কর্তে হয়, এরূপ কর্লে অনেক উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্য্যটিও সকল অবস্থায়ই প্রায় ঠিক চলে। চক্রে মন রেখে নাম কর্তে কর্তে, একটুকু স্থির হ'লেই দেখা যায়, চক্রের ভিতর একটি রূপের প্রকাশ হয়; যেমনই প্রকাশ, অমনই টপ্ ক'রে ধরা। কল্পনা ক'রে আমাদের কোনও রূপের ধ্যান নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন্ রূপে তিনি কার কাছে প্রকাশিত হবেন, কে বল্তে পারে? আর এক রূপেই যে তিনি সর্ব্বদা দর্শন দিবেন, তারই বা নিশ্চয় কি? শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস ধ'রে নাম ক'রে যাও, তাতেই সমস্ত ঠিক হ'য়ে আস্বে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "নাম করতে করতে মন স্থির হবে, না মন স্থির করে নাম করতে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা কি আর কেউ পারে? ভগবানের নাম, শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে কর্তে কর্তে, তাঁরই কৃপায় মন স্থির হ'য়ে আসে। ওরূপ কর্লে ক্রমে সবই বুঝ্তে পার্বে।"**

নয় বৎসর বয়সে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা।

আজ বিকাল বেলা, ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, প্রায় দেড় মাইল দূরে, নির্জ্জন স্থানে, একটি জীর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলাম। একটু সময় সেখানে বসিয়া, ঠাকুর বলিলেন— **"বহুকাল পূর্ব্বে এই কুটীরে একটি হীনজাতি ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজী ছিলেন। সময়ে সময়ে বাড়ী হ'তে আমি তাঁকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। অনেক দিন হ'লো, তিনি দেহ রেখেছেন। তার পর হ'তে এই স্থান শূন্য প'ড়ে আছে।"**

বাবাজীর সহিত, ঠাকুরের কোথায় কি ভাবে পরিচয় হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা হওয়ায় ঠাকুরকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **"আমার ছেলেবেলা, নয় বৎসর বয়সের সময়, একটি সমারোহের কার্য্যে প্রসাদ পেতে, বাবাজী আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের পূর্ব্বে অপর জাতিদের তো আর-দেওয়া হয় না। বাবাজী দরজায় দাঁড়ায়ে দু'তিন বার খাবার চাইলেন, তাঁকে বলা হ'লো, 'একটু অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণেরা বস্লেই আপনাকে খাবার দিচ্ছি।' বাবাজী আর অপেক্ষা না ক'রে চ'লে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। আমি অমনই**

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বল্‌লাম, 'একটি বৈষ্ণব প্রসাদ চেয়ে, না পেয়ে চ'লে যাচ্ছেন। ক্ষুধিত হ'য়ে খাবার চাচ্ছেন; খাবার রয়েছে, দিয়ে দিবে—এতে আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র কি?' আমাকে সকলে বল্‌লেন, 'বাবাজীকে একটু বস্‌তে বল্‌গে' আমি এসে দেখি, বাবাজী দ্বারে নাই, রাস্তায় চ'লে যাচ্ছেন। অমনই দৌড়ে গিয়ে বাবাজীকে ধর্‌লাম, অনেক ক'রে বল্‌লাম; কিন্তু বাবাজী আর ফির্‌লেন না। তখন তাঁর ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ্‌লাম। একটু পরেই ব্রাহ্মণেরা সেবায় বস্‌লেন, আমিও অমনই একজনের মত প্রসাদ চেয়ে নিয়ে, জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হ'লাম। বাবাজীকে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'বাবাজী! প্রতিদিন কি ভাবে আপনার সেবা চলে?' বাবাজী বল্‌লেন— 'ভিক্ষা করি। তার পর ভগবান্ যে দিন যে রকম দেন, সেরূপই জুটে।'

এর পর, যত কাল বাড়ীতে ছিলাম, ক্ষুধা হ'লেই আমার বাবাজীর কথা মনে হ'ত। চেষ্টা ক'রে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ রেখে বাবাজীকে এখানে এনে দিতাম, না হ'লে আহারে আমার রুচি হ'ত না। শান্তিপুরে কিছু কাল পূর্ব্বেও বৈষ্ণব মহাপুরুষদের অভাব ছিল না। আজকাল আর সেরূপ মহাত্মাদের বড় দেখা যায় না। ক্রমে সমস্তই লোপ হ'য়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি, দিন রাত কেবল উহাই মনে উঠিতেছে। আহা! ছয় সাত বৎসরের বালক অবস্থায়, যিনি একজনের যাতনা দেখিয়া, ছট্ ফট্ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নয় বৎসর বয়সে যিনি, সংস্থাশূন্য ভিক্ষোপজীবী ক্ষুধিত বাবাজীর কথা মনে করিয়া, বহু কাল প্রতিদিন আহারে তৃপ্তিলাভ করেন নাই, রৌদ্র-বৃষ্টিতেও দেড় মাইল চলিয়া গিয়া যিনি খাবার দিয়া আসিতেন, হে ভগবন্, জন্মান্তরে এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলাম যে, সেই দয়ার শরীরের আশ্রয় পাইলাম? ধন্য দয়ার ঠাকুর! তোমার গৌরবে আমরাও ধন্য।

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম— "অন্যের রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসাদির যন্ত্রণা দেখিয়া তেমন লাগে না কেন? মুখে একটা 'আহা' 'উহু' করি মাত্র। কত কালে যথার্থ দয়া প্রাণে জাগিবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা কি বলা যায়? সকলেরই ভিতরে সকল সদ্বৃত্তি আছে, সময় হ'লেই তা ফুটে উঠে। যেমন বৃক্ষের ফল ফুল সময়ে প্রকাশ হয়। নিয়মে চ'লে, সময়ের প্রতীক্ষা ক'রে, প'ড়ে থাক।"**

প্রশ্ন করিলাম— "সময়ে হবে, ইহা অনেক সময় বলেন। এই সময়ের অর্থ কি কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা শুধু নয়। ঋতুবিশেষে এক এক জাতীয় বৃক্ষের ফল ফলে, কিন্তু সেই ঋতুতে গাছটিরও ফল প্রসবের উপযুক্ত বয়স হওয়া চাই। চারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত, ছাগল গরু হ'তে তা রক্ষা করা, বেড়া দেওয়া, জল দেওয়া, উত্তাপ লাগার ব্যবস্থা করা— এ সকল যেমন আবশ্যক, সকলেতেই সেই প্রকার। নিয়মে না থাক্‌লে সময়ও উপস্থিত হয় না।"**

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী।

আহারান্তে, নানা কথার পর, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "শুনেছি, এক বাবাজী নাকি আপনাকে 'মালা তিলক ধারণ করতে হবে' এরূপ কথা বহুকাল পূর্ব্বে বলেছিলেন? সে কবে? আপনি কি বাবাজীকে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন, না অমনই?"

ঠাকুর বলিলেন— " **ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের কিছু কাল পরে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন কর্‌তে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। সে সময়ে এ দেশে সকলেই বাবাজীকে মহা সিদ্ধপুরুষ ব'লে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্‌তেন। বাবাজীর নিষ্কিঞ্চন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হ'লো। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে নমস্কার কর্‌তেন। ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেল মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন, বাবাজীর আর কিছুই সম্পত্তি ছিল না। আমি বাবাজীর নিকটে কিছু সময় ব'সে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?' বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে, কোনও উত্তর না দিয়ে, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে থর থর ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল। বাবাজী অস্ফুটস্বরে একটি গভীর হুঙ্কার ক'রে বল্‌লেন, 'কি বল্‌লে গোঁসাই? তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয়!! য়্যাঁ, তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয়!!!' এই বলেই সমাধিস্থ হ'লেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে, আমি একেবারে অবাক্‌ হ'য়ে গেলাম। সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী, সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রে, করজোড়ে বল্‌লেন 'প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল হ'তে পারি। তা না হওয়া পর্য্যন্ত তো ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, পরিষ্কার আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। ভক্তি তো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিস, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি আর ভক্তির অভাব আছে?' বাবাজীর কথা শুনে চ'লে এলাম। তখন আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, কখনও আমাকে আবার তিলক মালা নিতে হবে। আর একটি ভদ্রলোক বাবাজীকে ঐ প্রশ্ন করায়, বাবাজী ব'লেছিলেন, 'দু'টি পয়সায় ভক্তি লাভ হয়।' সে ভদ্রলোকটি শুনে বল্‌লেন, 'সে কি বাবাজী, দু' পয়সায় ভক্তি লাভ! সে আবার কেমন ভক্তি, আপনি আমাকে উপহাস করলেন?' বাবাজী বল্‌লেন— 'হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলেছি। দু'টি পয়সা দিয়ে একখানা বটতলার ছাপা 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ুন, তা হ'লেই সব বুঝতে পার্‌বেন।"**

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যদৃষ্টি এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, যাহা সিদ্ধ পুরুষেরা লাভ ক'রে থাকেন, তা কি যোগ ক'রে?"

ঠাকুর বলিলেন— "**যোগ ক'রেই এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, না হ'লে হয় না, এমন কিছু নয়। যে কোন প্রকারে চিত্তটি একাগ্র হ'লেই হ'লো; তখন আপনা আপনি এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য এসে পড়ে। কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্‌লেই সর্ব্বনাশ। গোপনে রাখ্‌লেই এ সব শক্তি**

ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই শক্ত। যোগীদের পক্ষে এসব ঐশ্বর্য্যের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কত শত যোগীর সাধনের সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য্যের তুফানে প'ড়ে, একেবারে ডুবে গেছে। বড়ই সাবধানে থাক্‌তে হয়।"

আমি আবার বলিলাম— "প্রয়োগই যদি না করলাম, ব্যবহারই যদি না হ'ল, তবে আর এ সকল শক্তিতে লাভ কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তো ভগবানের, তাঁরই কৃপায় এসব মানুষের লাভ হয়। তাঁরই ইঙ্গিত অনুসারে তা প্রয়োগ কর্‌তে হয়। নিজ ইচ্ছায় কিছু কর্‌তে গেলেই গোল।"**

খোদার উপর খোদ্দারী।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "শাস্ত্রে যে সকল কার্য্যকে সৎকার্য্য বলেছেন, ধর্ম্মকার্য্য বলেছেন, সে সকল বিষয়েও কি যোগৈশ্বর্য্য প্রয়োগ করতে নাই?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সৎ অসৎ বুঝা বড় সহজ নয় তো। মুসলমানদের একখানা ধর্ম্মগ্রন্থে এ বিষয়ে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে। একটি দয়ালু ফকির, সহরে দুঃখ দরিদ্রতা রোগ শোক ইত্যাদিতে লোকের ক্লেশ দেখে ভাব্‌লেন— 'আহা! খোদা এদের তো কিছুই কর্‌ছেন না!' তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা কর্‌লেন, 'প্রভো! একটি দিনের জন্যও যদি শক্তি দিয়ে, মাত্র এই সহরে আমাকে তোমার খোদ্দারী দাও, তা হ'লে আমি সকলের সকল প্রকার ক্লেশ দূর ক'রে পরম শান্তি স্থাপন করি।' খোদা 'তাই হউক' ব'লে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর কর্‌লেন। ফকির সাহেব, সহরে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হ'লেন। অমনই তিনি যাবতীয় প্রাণীর দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক একেবারে দূর ক'রে, মহা আনন্দের ঢেউ তুলে দিলেন। একটি ভয়ঙ্কর দুর্ব্বৃত্ত ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তি ঐ শহরে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিল। বহু চেষ্টাতেও যুবতীর জীবদ্দশাতে সে কোন প্রকারে উহাকে পায় নাই। অকস্মাৎ স্ত্রীলোকটির দেহ ত্যাগ হ'লো। তার আত্মীয় স্বজনেরা তাকে কবর দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই ঐ দুরাচার ব্যক্তি তা জান্‌তে পেরে, নির্জ্জন স্থানে ঐ কবরের কাছে উপস্থিত হ'লো এবং যুবতীর মৃত শরীর কবর হ'তে তুলে নিয়ে তারই উপর নিজ জঘন্য বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌ল। ফকির সাহেবের নজরে যেমনই এই ব্যাপার পড়্‌লো, অমনই তিনি তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফায়ে উঠ্‌লেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে 'কাফের' 'কাফের' ব'লে চীৎকার ক'রে তার গর্দ্দান লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল হাঁক্‌লেন। খোদা তৎক্ষনাৎ ঐ তরোয়াল ধ'রে ফেল্‌লেন এবং ফকির সাহেবকে বল্‌লেন, 'এ কি কর্‌ছ? কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য খোদ্দারী পেয়েই এতটা! এর সারা জীবনের প্রতিদিন এই রকম কত দুষ্কার্য্য দেখেও, আমি একে ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি; আর দশটির মত, সকল অবস্থায়ই আমি একে প্রতিপালন কর্‌ছি একটি দিনের জন্যও একে উপবাসী রাখি নাই; আর তুমি, মাত্র একটা দোষ দেখেই**

একে একেবারে বধ কর্‌তে উদ্যত হ'লে! যাও, আর তোমার খোদ্দারী কর্‌তে হবে না।' ফকির সাহেব বল্‌লেন, 'প্রভো! আমি তো অন্যায় কিছু করি নাই। কোরানেই তো ব্যবস্থা আছে, এরূপ অপরাধীকে বধ কর্‌তে হয়।' খোদা বল্‌লেন, 'কোরানের ব্যবস্থা কি তোমার জন্য, না আমার জন্য?' ফকির বল্‌লেন— 'মানুষেরই জন্য, আমার জন্য।' খোদা বল্‌লেন, 'তবে? আজ তো তুমি আর তুমি নও, আজ যে তুমি খোদা হয়েছিলে। খোদার জন্য তো আর কোরানের ব্যবস্থা নয়!' ফকির সাহেব তখন, ভগবানের কার্য্য ও অসীম দয়া দেখে এবং নিজের বিচারবুদ্ধি ও অবস্থা বুঝে, একবারে মুগ্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লেন। সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হ'লে, তার দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এই জন্যই শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীকে বধ করেছিলেন।"

ঠাকুর এসব বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। শক্তিলাভ হইলে, সম্পদ অপেক্ষা বিপদই বেশী।

ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমন।

৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।

ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি শান্তিপূর্ণ মধুর শান্তিপুরের বাস আজ আমাদের ফুরাইল। ঢাকা, বরিশাল, কলিকাতা ও কাকিনা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের প্রাণের অতিশয় আগ্রহ জানিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে ঠাকুর তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, অবিলম্বেই তিনি তথায় পঁহুছিবেন। কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের কাহারও অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, সকলেই গরীব। ঠাকুরের সঙ্গে বহু লোক উপস্থিত হইলে, ব্যযভার কি প্রকারে বির্ব্বাহ হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং অনেক লোক লইয়া ঠাকুর কলিকাতা পঁহুছিলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে, ইহাও তাঁহারা ঠাকুরকে পরিষ্কার জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। ঠাকুর, তখন তাঁহাদের সেই কথার কোনও উত্তর না দিয়া, একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

শান্তিপুর হইতে ঠাকুরের কলিকাতা পঁহুছিবার নির্দ্দিষ্ট দিন অবগত হইয়া, শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য বাবু, মণি বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতা যথাসময়ে আহিরীটোলা ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ৩/৪টি মাত্র লোক আসিবে অনুমানে, তাঁহারা ইতিঃপূর্ব্বে ঠাকুরের জন্য একখানা ছোট বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাস্তায় অকস্মাৎ ষ্টীমারের গতি রুদ্ধ হওয়াতে যথাসময়ে ষ্টীমার কলিকাতা পঁহুছিতে পারিল না। এদিকে গুরুভ্রাতারা বহুক্ষণ ষ্টীমারের প্রত্যাশায় থাকিয়া, অবশেষে রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে সকলেই হতাশপ্রাণে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা পঁহুছিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। ঠাকুর ষ্টীমার হইতে নামিয়াই, কাহারও প্রত্যাশায় না থাকিয়া, একেবারে ব্রাহ্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আমরা নগেন্দ্র বাবুর বাসায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী "মা আনন্দময়ী" আমাদের আট দশটি লোকের আহারের সুব্যবস্থা রাখিয়া, খুব উৎকণ্ঠার সহিত

ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে মনে হইল, পূর্ব্বেই উঁহারা কোনও প্রকারে আমাদের সকলের ঐ দিনে তাঁহাদের বাসায় পঁহুছিবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

পরদিন, ঠাকুরের খবর পাইয়া সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের আনন্দের আর সীমা নাই। উঁহাদিগকে পাইয়া আমরাও খুব প্রফুল্ল হইলাম। কিন্তু এত লোকের সমাবেশ কোথায় হইবে ভাবিয়া, সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব মহাশয়, বার দিনের ছুটি লইয়া বৈদ্যনাথ চলিলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার খালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার সুবিধা হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার খালি বাড়ীতে, আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এক দিন মাত্র নগেন্দ্র বাবুর বাসায় থাকিয়া, ৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার আহারান্তে, ঠাকুরের আসন লইয়া ঐ বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইলাম।

মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটের বাসা।

৮ই—১৫ ই অগ্রহায়ণ।

এই বাসায় পঁহুছিয়া, ঠাকুরের থাকিবার ঘরখানা আমরা সর্ব্বাগ্রে পছন্দ করিয়া লইলাম। রাস্তার উপরে, খোলা মেলা দোতালা ঘরের এক কোণে ঠাকুরের আসন পাতিলাম; এই ঘরের ভিতর দিকে, সাম্‌নেই বড় বারেন্দা এবং বারেন্দাসংলগ্ন একধারে দু'খানা বড় বড় কুঠ্‌রী আছে। ঠাকুরের সঙ্গে যে কয়টি গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন, স্বচ্ছন্দরূপে তাঁহারা এই বাসায় থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া, সকলেরই মনে খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ বেশীক্ষণ আমাদের রহিল না। এখন দেখিতেছি, অপরাহ্নে দর্শনার্থী হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া যখন বাড়ীটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, তখন স্থানাভাবে বড়ই অসুবিধা হয়। সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পরে, একটু বেশী রাত্রিতে, বাহিরের লোকের সংঘট্ট কমিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন আবার গুরুভ্রাতাদের ভিড়ে অস্থির হইয়া পড়ি। আফিস আদালত ছুটি হইলেই, গুরুভ্রাতারা সকলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেকে সারারাত্রি এখানে থাকিয়া, প্রত্যূষে আপন আপন বাসায় চলিয়া যান। ঠাকুরের ঘরটি সমস্ত রাত্রিই লোকে পরিপূর্ণ থাকে। দু' তিন ঘণ্টা কালও কেহ ঘুমান কি না সন্দেহ। রাত্রিতে সামান্য জলযোগ করিয়া, প্রায় অভুক্ত অবস্থায়, ক্লান্তশরীরে, গুরুভ্রাতারা এখানে অবস্থান করেন। তাঁহারা প্রায় সারারাত্রি এইভাবে জাগরণ করিয়া, প্রতিদিন আফিস আদালতের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে সুচারুরূপে কি প্রকারে সম্পন্ন করিতেছেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।

বৃন্দাবন বাবুর সেবানিষ্ঠা।

ঠাকুরের প্রতি গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক টানের এক একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অবাক্ হইয়া যাইতেছি। ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিতে, কোনও দিকের কোনও প্রকার বাধা, গুরুভ্রাতারা তৃণতুল্যও মনে করেন না। কোনও কারণে ঠাকুরের সেবার একটুকু অসুবিধা হইতেছে শুনিলেই, উঁহারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন।

আজ আমাদের উনন ধরাইবার ঘুঁটে না থাকায়, সকালে মেয়েরা আসিয়া জানাইলেন, "ঘুঁটে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘুঁটে না আনিলে গোঁসাইয়ের রান্না হবে না।" শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'ঘুঁটে এনে দিচ্ছি' বলিয়া, তখনই বাসা হইতে বাহির হইলেন। ঘুঁটের অনুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও না পাইয়া, অবশেষে তিনি অনেক ঘুরিয়া, গোয়াবাগানে একটি ঘুঁটের দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুটের দ্বারা ঘুঁটে বাসায় লইয়া যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, তিনি কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া জুতা, মোজা, কোট ও গরম গাত্রবস্ত্র পরিহিত থাকা অবস্থায়ই, ঘুঁটের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া লইলেন। অমনই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বড় রাস্তার উপর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি একটি নগণ্য লোক নহেন, পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কায়স্থসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী, এবং কলিকাতার বহু সম্মানিত লোকের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ঠাকুরের প্রতি ইঁহার সুন্দর সখ্যভাব। ইঁহার অসাধারণ সরলতা ও উদারতার কথা, ঠাকুর অনেক সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন।

ঠাকুরের মুক্তিফৌজ দর্শন— আমার অভিমান চূর্ণ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জেনারেল্ বুথ্ ও মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ঠাকুর, পুস্তকখানা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এ সময়ে মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল্ বুথ্ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট অনেক সময় আলোচনা হইতে লাগিল।

নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর, পরোপকারী, দয়ালু জেনারেল্ বুথের অসাধারণ সেবাব্রত এ সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় লর্ড-পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারাও, সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, এই মহাত্মার দৃষ্টান্তানুসারে রোগী-সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা কাঙ্গালবেশে, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, রাস্তার নিরাশ্রয়, অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি— কুষ্ঠ রোগীদিগকেও— আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে লইয়া আসেন এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের প্রতি ইঁহাদের দরদ, ভালবাসা এবং রোগীদিগের অত্যাচারেও ইঁহাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া, ঠাকুর কান্দিয়া ফেলিলেন এবং উঁহাদিগকে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন— **"পরদুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ; তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।"**

এই বলিয়া, ঠাকুর, বেলা প্রায় দু'টার সময়ে, সকলকে লইয়া মুক্তিফৌজ দর্শন করিতে চলিলেন। সকলের সঙ্গে আমিও যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর তখন, আমার দিকে চাহিয়া, খুব স্নেহভাবে বলিলেন— **"আমার আসনটি শূন্য ঘরে থাক্‌বে; তুমি এই সময়টুকু এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না?"**

একটি গুরুভাই বলিলেন— "কেন? বাসায় ত আরও লোক আছে।"

ঠাকুর আবার বলিলেন— **"শুধু আসনের জন্যও নয়। মুক্তিফৌজের ভিতরে অল্পবয়সী যুবতী মেয়েরা সব আছেন, ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?"**

আমি, ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, যাইতে নিরস্ত হইলাম। নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'হায়রে কপাল! এই ব্রহ্মচর্য্যে আমার প্রয়োজন কি, যদি সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতে না পারিলাম?'

মনে বড় দুঃখ হইল, ঠাকুরের উপর খুব অভিমানও আসিয়া পড়িল। ভাবিলাম, "ঠাকুর এই মাত্র বলিলেন, 'উঁহারা তীর্থস্বরূপ, উঁহাদের দেখ্‌লেও পুণ্য হয়।' ভাল, ঠাকুর সকলকে লইয়া তীর্থে গেলেন, সকলে পবিত্র হইবে, আর শুধু আমিই গেলে একেবারে অপবিত্র হইয়া যাইতাম? বিশেষতঃ, ঠাকুর যেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, সেখানেও আমাকে লইয়া যাইতে এত আশঙ্কা! ঠাকুর আমাকে কি এতই অপদার্থ, এতই কামুক মনে করেন? এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, ঠাকুরের উপর আমার অত্যন্ত অভিমান আসিয়া পড়িল। আমি ঠাকুরকে ভাবিতে ভাবিতে, মুক্তিফৌজই দেখিতে লাগিলাম। এ সময়ে, নিজেরই অজ্ঞাতসারে, কল্পনার স্রোতে পড়িয়া, সুন্দরী মেয়েদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। অবশেষে, ঘর্ম্মাক্তকলেবরে একেবারে অবসন্ন হইয়া বারান্দায় পড়িয়া রহিলাম।

আমার অভিমান চূর্ণ করিতে, দয়া করিয়া, ঠাকুরই আমার প্রকৃত রূপ আমাকে দেখাইলেন— এ সময়ে ইহা আমি বেশ বুঝিলাম।

ঠাকুর, আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন, সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই ত প্রশ্রয় দিবেন না। এই জন্যই আমাকে স্ত্রীলোকেদের ভিতরে নিজের সঙ্গেও নিলেন না। বলিলেন— **"ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?"**

ইহা আর আমি বুঝিলাম কই? আমি এই কথার অন্যপ্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলাম; যেন আমার প্রকৃতির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই, ঠাকুর ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, নিজের অবস্থা নিজে না বুঝিয়া, যেমন ঠাকুরের কার্য্যে অভিমান করিয়াছিলাম, তেমনই দয়া করিয়া ঠাকুর, আমার প্রকৃতি আমাকে দেখাইয়া আমার সেই অভিমানটি চূর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের অনুপস্থিতি সময়ে, পোষ্টাফিসের ডেপুটি কন্ট্রোলার, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আসিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কখন আসিলে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইব?" ইঁহার সহিত আলাপে জানিলাম, দু' এক দিনের মধ্যেই ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইঁহাকে আমি দু'টা হ'তে তিনটার মধ্যে আসিতে বলিলাম।

গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিয়া, ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি আমার বড় দাদার অত্যন্ত বন্ধু ও সমপাঠী, ইঁহার কথায়, দাদাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আসিতে লিখিলাম; ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষাও করিলাম না।

ঠাকুর বাসায় আসিলে, অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "নিয়মে থাকিয়া সাধন-ভজন যতই করিতেছি, ততই ত রিপুর বৃদ্ধি দেখিতেছি। সাধারণ লোক অপেক্ষা, সাধকদের কি রিপুর প্রাবল্য অধিক? কামের উত্তেজনার ত কিছুতেই বিরাম হইতেছে না।"

ঠাকুর বলিলেন— **"কাম যে আমাদের শরীরে ও মনে অত্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। সাধারণ লোকদের অপেক্ষা সাধকদের আবার এ সব অনেক প্রবল হ'য়ে থাকে; কারণ, এসমস্ত ত আত্মারই বৃত্তি। জল উত্তাপাদি দ্বারা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, সাধন-ভজন দ্বারাও সেই প্রকার আত্মার বৃত্তি সকলের পুষ্টি হয়। তবে যত কাল এ সকল বৃত্তি বহির্ম্মুখ থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে। অন্তর্ম্মুখ হ'লেই সাধক তখন বুঝ্‌তে পারেন, এ সকলের বৃদ্ধির কত প্রয়োজন ছিল; এই বৃদ্ধিতেই তখন আবার কত আনন্দ! সাধন-ভজন দ্বারা আত্মার সমস্ত বৃত্তির পুষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল বৃত্তি বহির্ম্মুখ অবস্থায় যত কাল থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে, অনিষ্টকর বোধ হয়; কিন্তু ভগবৎকৃপায় একবার মুখটি ফিরে গেলে, তখন ইহারাই আবার পরম উপকারী হ'য়ে থাকে। সাধকদের জীবনের অবস্থা সমস্তই স্বতন্ত্র প্রকারের। সাধারণ লোকের মত এঁদের কিছুই নয়। একমাত্র তাঁর অনুগত হ'লেই নিরাপৎ।"**

কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঙ্কীর্ত্তন; মুকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ।

ঠাকুর, কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া, একদিন শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঘোষ, ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইমত দিনও ধার্য্য হইয়া যায়। ঠাকুর ঐ দিন অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, ভয়ানক জ্বর হইল; এদিকে মুকুন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই দিনেই অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। মুকুন্দ ঘোষ তাহাকে লইয়া শ্মশানে গেলেন। অপরাহ্ন প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়ে, বকুলাল বাবু, অমিয়বাবু প্রভৃতি কলেজের ছাত্রগণ, ঠাকুরকে গান শুনাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া, তাঁহারা আর উপরে উঠিলেন না; নীচে থাকিয়াই হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট হইয়া পড়িল; ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায়ও আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, উঠিয়া পড়িলেন এবং লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে যাইয়া, কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতারাও মাতিয়া গেলেন। এই কীর্ত্তনে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সকলে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে মুকুন্দ ঘোষও হঠাৎ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তনান্তে আমাদের কোনও গুরুভ্রাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আপনি এ সময়ে কি প্রকারে আসিলেন?" তিনি বলিলেন, "শ্মশানে প্রভুর কথা মনে হইতেই, প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল, তাই সৎকারের পরই বাড়ীতে না গিয়া, ছুটিয়া আসিয়াছি; আসা আমার সার্থক, আজ আমার পূর্ণ দর্শন হইল। পূর্ব্বে আর একবার প্রভুর এই রূপ দর্শন পাইয়াছিলাম।"

অনুসন্ধানে জানিলাম, গত ১২৯৪ সালে ঠাকুর যখন শান্তিসুধার বিবাহের কথা স্থির করিতে, কলিকাতা চোরবাগানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর বাসায় ছিলেন, তখন একদিন নগেন্দ্রবাবুর

সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া, তিনি কাঁসারিপাড়ার শ্রীযুক্ত হরজহরের বাড়ী গিয়াছিলেন। ওখানে ঠাকুর ভগবানের নাম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনে ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া অনেকে সংজ্ঞাশূন্য হন, মুকুন্দও একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই হইতে নিয়ত মুকুন্দের প্রাণে আকাঙ্খা ছিল যে, ঠাকুরকে আর একবার পাইলে কীর্ত্তন শুনাইয়া ঐ রূপ দর্শন করেন।

বৈষ্ণব দর্শন— মহাপ্রভুর কথা।

আজ ঠাকুর, একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, বাহির হইলেন। যোগজীবন, সতীশ এবং আমি, ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। অনেক রাস্তা হাঁটিয়া, আমরা একটি বাড়ীতে পঁহুছিলাম। ভদ্রলোকটি, ঠাকুরকে দেখিয়াই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সকলকেই তিনি তাঁর কোঠাঘরের দোতালার বারেন্দায়, আগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। [illegible] তাঁকে খুব ভক্তি করিয়া নমস্কার করিলেন। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। মহাপ্রভুর এ[illegible] ভক্ত [illegible] বৈষ্ণব অথবা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের খুব উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া অনুমান হইল [illegible] নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব উভয়েরই শরীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কতক্ষণ কথা বার্ত্তার পর, বৃদ্ধটি, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন ছিলেন; ওখানে তাঁকে কখনও দেখিতে পাইলেন? শুনিয়াছি, তিনি এখনও সেই শরীরেই আছেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, ঠিক সেইই আছেন। একদিন দয়া ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'লেন; দর্শন মাত্রেই বুঝ্‌লাম মহাপ্রভু।"**

বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, কিছু বলিলেন কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"দর্শনমাত্রেই পায়ের উপর প'ড়ে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, কত কি বল্‌লাম। তিনি মাথায় হাত বুলায়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন 'সমস্তই ত পূর্ণ হ'য়েছে, আর কেন? স্থির হও, স্থির হও। আমি ত তোমাদেরই ঘরে কেনা।' ঐ সময়ে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। পরে জ্ঞান হ'লে উঠে দেখি, আর তিনি নাই, চ'লে গেছেন।"**

ঘণ্টা দুই পরে, আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় আসিলাম।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ।

অপরাহ্ন প্রায় ৩ টার সময়ে, আমাদের পরম আত্মীয়, বহুকালের পরিচিত, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর, তাঁহাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, 'নির্জ্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।' শুনিয়াই আমি আসন হইতে উঠিয়া বারেন্দায় গেলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গলার আওয়াজ একটু বড়; বারেন্দায় থাকিয়াও তাঁর কয়েকটা কথা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "গঙ্গোত্রী হইতে হিমালয়ের উপরে গিয়া কিছুকাল ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েকটি উপদেশ দিলেন, এবং আপনার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ

করিয়া আপনার উপদেশমত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া করিয়া, আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"সর্ব্বত্রই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রহ্ দর্শন ক'রে, সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম কর্‌লে, উপকার হ'য়ে থাকে। সত্যকে লক্ষ্য রেখে, সরল ভাবে চল্‌লেই সব হয়। গৈরিক ধারণ কর্‌লে, বীর্য্যও ধারণ কর্‌তে হয়, শাস্ত্রের এরূপ ব্যবস্থা আছে; না হ'লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"**

এই বলিয়া ঠাকুর, আমাকে ডাকিয়া নিজের একখানা বহির্বাস, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে দিতে বলিলেন। তিনিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া উহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের শাসন ও সান্ত্বনা।

আমাদের বাসাটি ছোট হওয়াতে, দিন দিন বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সকালে ও রাত্রিতে লোকের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি গুরুভগ্নী নিয়ত এখানে থাকাতে, আর আর স্ত্রীলোকেরাও দলে দলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ঠাকুর নিজেই দয়া করিয়া তাঁর ঘরে আমাকে আসন করিতে দিয়াছেন, তাই অনেকটা আরামে আছি। কিন্তু রান্না, খাওয়া ও হোমাদি কার্য্যের খুবই অসুবিধা, প্রত্যহ ভুগিতেছি। উপরের ঘরের সম্মুখের বারেন্দায় আমি নিত্য হোম করি। এ সময়ে প্রায়ই গুরুভ্রাতাভগিনীদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে থাকে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়াতে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গুরুভ্রাতারা আমাকে এখানে হোম করা বন্ধ করিতে অনেকবার বলিয়াছেন, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি নাই, বরং উল্টা তাঁহাদিগকে ধম্‌কাইয়া দিয়াছি। আজ ভিজা কাষ্ঠ অনেক চেষ্টায় জ্বালাইয়া, যেমন তাহাতে কয়েকটি মাত্র আহুতি দিয়াছি, অতিরিক্ত ধোঁয়াতে অস্থির হইয়া, আমাদেরই একজন, তাঁর ছেলেটিকে কোলে লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন— "তুমি কি রকম লোক? সকলকে মেরে ফেল্‌বে নাকি? রেখে দেও তোমার হোম। সকলকে জ্বালাতন কর্‌লে যে।" আমি উঁহার হাতনাড়া, মুখনাড়া ও বিরক্তিভাবের কথা শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলাম, এবং খুব তেজের সহিত বলিলাম-- "বটে? লোকের উপর বড়ই ত দয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছেলেটা যখন টেঁ টেঁ ক'রে চীৎকার করে এবং সকলকে জ্বালাতন ক'রে তুলে, তখন ছেলেটার মুখ চেপে ধর্‌তে পার না? তখন ছেলেটাকে কি সরিযে দাও? তোমাদের জ্বালা হয় ব'লে, আমি আমার নিত্যকর্ম্ম কর্‌ব না? বাঃ!" তিনিও আমার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঠাকুর, আসন হইতে খুব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন— **"কে আছ ওখানে? এক্ষণই আগুনে জল ঢেলে দেও। এ কি রকম? একটা সাধারণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি নাই!"**

ঠাকুরের মুখ হইতে যেমনই ঐ কথা বাহির হওয়া, অমনই দুই তিনটি গুরুভাই জল আনিতে ছুটিয়া গেলেন। আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, নিজের মান রাখিতে, নিজেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে দশ জনের কাছে, এতটা

অপ্রস্তুত করিলেন মনে করিয়া, ছাদের উপর চলিয়া গেলাম। লজ্জায় ও অভিমানে আমার সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর খুব রাগিয়া গেলাম। ভাবিলাম, এদিকে আপন আপন নিয়মে অটল থাকিতে, দিনের মধ্যে দশবার উপদেশ দিচ্ছেন, এখন ত এদের কষ্ট দেখে আমার নিয়মটি ভেঙ্গে দিতে একবারও ভাব্‌লেন না। সিঁড়িঘরে যাইয়া আবার আগুন জ্বালিয়া হোম করিলাম। আর ঠাকুরের ঘরে যাইব না স্থির করিয়া, নিতান্ত অপ্রশস্ত চার ফুট মাত্র স্থানে কুকুরকুণ্ডলী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্তটি দিন মানসিক ক্লেশে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, ঠাকুর অকস্মাৎ ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে ওখানে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন— **"কি, তুমি এখানে হোম কর্‌বার ঠিক ক'রে নিয়েছ? সে বেশ হয়েছে। সকলকে ক্লেশ দিয়ে কি ওভাবে কিছু কর্‌তে আছে? উপাসনা কর্‌তে গিয়ে কারও ক্লেশ জন্মালে উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও গর্ভবতী, এদের সুবিধা সকল অবস্থায়ই সকলের আগে দেখ্‌তে হয়। না হ'লে অপরাধ হ'য়ে পড়ে। যাও, এখন গিয়ে রান্না কর।"**

ঠাকুর, এমন স্নেহ ভাবে এই কথাকয়টি বলিলেন যে, আমার ভিতর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ঠাকুর, কখনও কারও ক্লেশ দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন না; এ আবার শিশুর ক্লেশ ও রোগীর ক্লেশ! তার পর আমার মানসিক ক্লেশেই বা উদাসীন রহিলেন কই? কখনও ছাদে আসেন না, আজ আমার যাতনার বিষয় কিছু না বলাতেও, নিজে উহা অনুভব করিয়া, আমাকে ঠাণ্ডা করিতে, ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর! এই দয়াই ত আমাদের ভরসা!

আজ অপরাহ্নে, বাসাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একটি অনুগত শিষ্য আসিয়া, বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলেন। আমি এই সময়ে রান্নার চেষ্টায় ছাদে চলিয়া গেলাম, সময়ে সময়ে আসিয়া দু' একটা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন— ধন্, মন্, তন্, এ সমস্তই গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ না হ'লে কিছুই হ'ল না, সবই বিড়ম্বনা। কথাটি শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল।

মা আনন্দময়ীর সঙ্গীত।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী (শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী), আমাদের অনেক গুরুভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া, অপরাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইঁহাকে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া ডাকেন। মা আনন্দময়ী যখন যেখানে যান, স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসাতে সেখানকার সকলকে যেন আনন্দে ডুবাইয়া রাখেন। আমি রান্নার চেষ্টায় হয়রান হইয়া যাইতেছি বুঝিতে পারিয়া, মা আমাকে বলিলেন— 'কেন বাবা এ কষ্ট? সকলের সঙ্গে একমুঠো খেয়ে নিলেই ত পার!' আমি বলিলাম— 'কি কর্‌বো মা? নিজে রান্না ক'রে খাই, ইহা যে উনি ভালবাসেন।' রান্না করিয়া কোন প্রকারে আহার করিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম। সন্ধ্যাকীর্ত্তন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় নয়টা হইল।

ঠাকুরের আহারান্তে, মা আনন্দময়ী, একটি একতারা লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গান এমন জমাট হইয়া পড়িল যে, সকলেই নিশ্চল ভাবে আপন আপন আসনে পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন। মা আনন্দময়ী ভাবে বিভোর। কিছু ক্ষণ পরে, কীর্ত্তনের পদ, মধুর কণ্ঠস্বরে মিলিত হওয়ায়, এমনই ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল যে, ঠাকুরও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঘন ঘন অশ্রুকম্প পুলকাদিতে অবশ হইয়া, আসনেই বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঐ সময় 'হরিবোল' 'হরিবোল', 'জয় রাধে' 'জয় রাধে', 'আঃ উঃ' ইত্যাদি এক একটি শব্দ ঠাকুরের মুখ হইতে নির্গত হওয়াতে, একটা প্রবল শক্তি, ঝঞ্ঝাবাতের মত আসিয়া, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে, সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন, কারও কারও বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। আবার কতকগুলি লোক মূর্চ্ছিত অবস্থায়ই গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরের দিকে চলিলেন। আমার কখনও ভাব হয় না; আমি স্থির হইয়া সকলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভাবের বিকাশ দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে, ক্ষণে স্থির, ক্ষণে অস্থির অবস্থায়, প্রায় সমস্তটি রাত্রি অতিবাহিত হইল।

মা আনন্দময়ীর পুত্র (মণীন্দ্রনাথ) বলিলেন— "ঐ সময়ে গোঁসাইয়ের ভিতর হইতে প্রবল শক্তি আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। মনে হইল, আজ গোঁসাই এ ভাবেই শক্তি-সঞ্চার করিয়া আমাকে কৃপা করিলেন।"

প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ।

ঠাকুর, দিনরাত আসনেই বসিয়া থাকেন; বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কখনও আসন ছাড়িয়া উঠেন না। ঠাণ্ডা ঘরে, একটানা বসিয়া থাকাতেই, বোধ হয়, পায়ে বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে শীতও খুব পড়িয়াছে। মণি বাবু এবং বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের জন্য একটি উলের 'ট্রাউজার' আনিয়া ঠাকুরকে পরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর এ সকল কখনও ব্যবহার করেন না, কিন্তু উঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া, খুব সন্তোষভাবে গ্রহণ করিলেন এবং ৫/৭ মিনিট পরিয়া রহিলেন। পরে উহা খুলিয়া বৃন্দাবন বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন— **"বৃন্দাবন! তুমি এটি পর, তুমি পর্‌লেই আমার পরা হবে।"**

বৃন্দাবন বাবু, কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা পরিয়া বসিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র তিনি স্বয়ং হাতে ধরিয়া দিলেন, উহা ত মাথায়ই রাখিতে হয়; বৃন্দাবন বাবুর এ কি প্রকার ধৃষ্টতা যে, অনায়াসে উহা পায়ে লাগাইয়া পরিলেন!'

তিন চারি মিনিট পরেই, বৃন্দাবন বাবু উহা অতিশয় ব্যস্ততার সহিত খুলিয়া ফেলিলেন এবং বিস্মিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন— "মশায়! এ কি? একটা 'ইনেনিমেট্' (Inanimate) বস্তুতেও এত ইলেকট্রীসিটি (Electricity) ঢুকিল! আমার সমস্তটি শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, কিছুতেই আর এটি রাখিতে পারিলাম না। এ কি রকম?" এই বলিয়া, বৃন্দাবন বাবু পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা ত তখন অবাক্! ভাবিলাম, 'ঠাকুরের হাত পা টিপিয়া

শরীরেরসেবা করিয়াও ত কত সময় কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কখনও ত এমন একটা কিছু অনুভব হয় না, যাহাতে শরীর ও মন অস্থির বা অন্যপ্রকার হয়; আর, দু' চার মিনিটের জন্য ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র, বৃন্দাবন বাবু স্পর্শ করিয়া এমনই হইলেন যে, শরীর তাঁর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল! তিনি পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মধ্যাহ্নে, ঠাকুরের আহারান্তে, প্রসাদ লইয়া মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বৃন্দাবন বাবু, খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক বলিয়া, আজ প্রসাদ পাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলেন না। শূন্য পাতাখানামাত্র কুড়াইয়া লইয়া, দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেলেন; উহা কপালে কয়েক বার স্পর্শ করাইয়া, খুব আগ্রহের সহিত, ডাঁটা সহিত সমস্ত কলাপাতাখানাই চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ভক্তিভাবে ছল্ ছল্ চক্ষু ও সমস্তটি মুখের এক প্রকার চমৎকার প্রভা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ধন্য বৃন্দাবন বাবু!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ঠাকুর কয়েকটি গুরুভ্রাতার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবন বাবুও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন— **"বৃন্দাবন, তোমার বাড়ীটি ত বেশ। তোমার সেই কুঞ্জ কই?"** শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর, কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়াইয়া, করজোড়ে বাড়ীটিকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, বাসায় চলিয়া আসিলেন। একটু পরে কথায় কথায় বলিলেন— **"বৃন্দাবনের বাড়ী যেয়ে শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল; ইচ্ছা হ'ল, একবার ঐ মাটিতে প'ড়ে খুব গড়িয়ে নেই। বাড়ীটি কি সুন্দর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!"**

রাত্রিতে বৃন্দাবন বাবু আসিয়া, ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া, ঠাকুরকে বলিলেন, "মশায়! বাড়ী পরিষ্কার হোক্ আর যাই হোক্, এখন ভূতের জ্বালাতনে বাড়ীতে টেকা যে শক্ত হ'য়ে পড়ল! আপনার সাধন নিয়ে আর কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হ'ল।"

ঠাকুর বলিলেন— **"শুধু ভূতে কেন? যাহা সত্য সে সকলেই ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। সবই ত উড়ায়ে দিয়ে বসেছিলে।"**

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দ বাবু অন্য সম্প্রদায়ের একটি মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। অদ্য তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "গুরুর সঙ্গ অপেক্ষা, অন্য কোন সাধুর সঙ্গে যদি অধিক আনন্দ হয়, তা হ'লে সেখানে যাওয়া যায় কি না, এবং গুরুর নিকট না আসাতে কোন অপরাধ হয় কি না?"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন,— **"যার যেখানে গিয়ে আনন্দ হবে, উপকার পাবে, সে সেখানেই যাবে। গুরুর কাছে যেয়ে আনন্দ না হ'লে, উপকার না পেলে, সেখানে না যাওয়াই ভাল; এরূপ স্থলে যাওয়াতে বরং পাপই হয়।"**

বাসা পরিবর্ত্তন।

আমাদের বর্ত্তমান বাসাতে জলের, পাইখানার, রান্নার ও থাকার বড়ই অসুবিধা হইতেছে; তাহার উপর দিন দিন লোকসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরমা, একটি ঝি ও সীতানাথকে * সঙ্গে লইয়া, কিছুকাল এখানে থাকিবার প্রত্যাশায়, শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চারি পাঁচ দিন মাত্র থাকিয়াই চলিয়া গেলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীমতী শান্তিসুধা ও তাঁহার ছেলে (দাউজী) দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের এখানে আনাইয়াছেন। শান্তিসুধার সঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়া, কয়েকটি গুরুভগ্নীও উপস্থিত এখানেই রহিয়াছেন। মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা, বাড়ী ঘরের সম্বন্ধ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, অফিসের সময় বাদে, দিবারাত্রি এখানেই আছেন। তাঁহারা ভাতেসিদ্ধ ভাত খাইয়া আফিসে চলিয়া যান, রাত্রিতে মুড়ি মুড়কি দু' এক মুঠা পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন। তার পর নবাগত লোকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে বাড়ীর মালিক সুরেশ বাবুরও ছুটি শেষ হইয়া আসিল। সুতরাং অবিলম্বেই আমাদের অন্যত্র না যাইয়া উপায় নাই। ঠাকুর সকলকেই একটি বাসার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা, নিজেদের বাসার সন্নিকটে বাড়ী তালাস করিয়া, সুবিধা অসুবিধা ঠাকুরকে জানাইতেছেন। শ্রীচরণ বাবুর চেষ্টায়, শ্যামবাজার বড় রাস্তার তেমাথার উপরে, কান্তি ঘোষের বাড়ীর তেতালাটি মাত্র ভাড়ায় পাওয়া গেল। বাসাখানা, নবীন বাবুর বাড়ীর কাছে, রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু তেতালায় ঠাকুরের থাকা হইলে, নিয়ত উঠা নাবা সকলেরই অসুবিধা হইবে বলিয়া, ঠাকুর একটু অসম্মতি জানাইলেন। পরে নবীন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের আগ্রহ এবং মণি বাবুর জেদ দেখিয়া, অগত্যা সেই বাসায়ই যাইতে রাজি হইলেন। আগামী কল্য আহারান্তে, আমরা ঐ বাসাতেই যাইব, স্থির হইয়া গেল।

শ্যামবাজারের বাসা।

অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার পারলৌকিক কল্যাণার্থে উপাসনাদি হইবে। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া, যোগজীবনের সহিত তথায় চলিয়া গেলেন। শ্যামবাজারের নূতন বাসায়, উপস্থিত বেবন্দোবস্তের ভিতরে, পীড়িতাবস্থায় শান্তিসুধার থাকার অসুবিধা হইবে, এইজন্য বৃন্দাবন বাবু, তাঁহার বাসায় উঁহাকে লইয়া গেলেন। শান্তিসুধা এখন কয়েক দিন সেখানেই থাকিবেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।

অপরাহ্নে, আমরা সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া শ্যামবাজারের বাসায় পঁহুছিলাম। এ বাড়ীর তেতালাটিমাত্র আমাদের জন্য লওয়া হইয়াছে। হল্‌ঘরের মধ্যস্থলে, দেওয়ালের ধারে, উত্তরমুখে ঠাকুরের আসন পাতিলাম। ঠাকুর, নিজ আসনের পশ্চিম দিকে, দরজাটি মাত্র ব্যবধান রাখিয়া,

---

* শ্রীমান সীতানাথ, প্রভুজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রজগোপাল গোস্বামীর পৌত্র ও যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র।

আমাকে আসন করিতে বলিলেন, আমি সেইমত ঠাকুরের বামদিকে প্রায় চার ফুট অন্তরেই নিজের আসন করিলাম। নিত্যহোম, আমায় অন্যত্র করিতে হইবে।

বাসার অবস্থা দেখিয়া খুব ভালই মনে হইল। হল্‌ঘরের ভিতরে অনায়াসে পঞ্চাশ জন লোক থাকিতে পারে। এই ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরে অপ্রশস্ত লম্বা বারান্দাও রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইখানা ঘর আছে। পূবের ঘরের সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে দোতালার প্রকাণ্ড ছাদ এবং পশ্চিমের ঘরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে বড় একখানা রান্নাঘর আছে। বাড়ীর একেবারে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি মাত্র পাইখানা। উহা ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।

হল্‌ঘরের পশ্চিম দিকের ঘরখানাতে, ভাণ্ডার রাখার ব্যবস্থা হইল। চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকট গুরুভ্রাতারা বসিয়া থাকিতে অসুবিধা বোধ করেন, সুতরাং এই ঘরে প্রয়োজনমত তাঁহাদের বিশ্রাম করাও চলিবে। হলের পূর্ব্ব দিকের ঘর, মেয়েদের জন্য রহিল।

তেতালায় জলের কোন ব্যবস্থা নাই; ভারীর দ্বারা জল তুলিয়া লইতে হইবে। পাইখানা একটি মাত্র থাকায়, গুরুভ্রাতারা নবীন বাবুর বাড়ী যাইবেন। রাস্তা হইতে তেতালা পর্য্যন্ত সোজা সিঁড়ি থাকাতে, ঐ বাড়ীতে যাতায়াতের কোনও ক্লেশ নাই। নবীন বাবু, তাঁর বাড়ীখানা গুরুভ্রাতাদের দিয়া রাখিলেন। আবশ্যকমত যে কেহ, ওখানে অবাধে যাইতে ও থাকিতে পারিবেন।

আজ সন্ধ্যা হইতে না হইতেই, দলে দলে গুরুভ্রাতারা আসিয়া পড়িলেন। খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তনের খুব ঘটা পড়িয়া গেল। সকলেরই এ বাসায় আসিয়া মহা আনন্দ। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর স্বহস্তে হরির লুট দিলেন। গুরুভ্রাতারা, আজ অনেকেই এখানে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত, আনন্দ-আলাপে কাটাইয়া, আমরা নিদ্রিত হইলাম।

শ্যামবাজারে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য।

শেষ রাত্রিতে, প্রায় ৪টার সময়ে, ঠাকুর আসনে উঠিয়া বসেন। গুরুভ্রাতারাও অনেকেই এই সময়ে জাগরিত হন এবং আপন আপন আসনে বসিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুর করতাল বাজাইয়া দুই তিনটি গান করেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা ভোর পর্য্যন্ত প্রাতঃসঙ্গীত করিয়া থাকেন।

ঠাকুর, প্রত্যূষে কীর্ত্তনান্তে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে, কিছুক্ষণ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া, পাঠ আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ হয়। ১১টার পরে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য শৌচে যান। ১২টার সময়ে আহার হয়। আহারের পর, অর্দ্ধঘন্টাকাল, ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর পাওয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। এই সময়ে অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণে, ঠাকুরের বুকের আল্‌খিল্লা ভিজিয়া যায়। ৪টার পর তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়, তখন নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথা-

বার্ত্তা, প্রশ্ন-উত্তর, হাসি-গল্প সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। আমি নিজের রান্নার ব্যাপারে এই সময়ে ব্যস্ত থাকি, সুতরাং অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাই না। বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটিলে বা প্রয়োজনীয় উপদেশ হইতে থাকিলে, রান্না ফেলিয়া, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। রান্নাঘরটি খুব নিকটে বলিয়া এ বিষয়ে আমার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

সন্ধ্যায় হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময়ে ঘরের ভিতরে সকলের স্থান হয় না। সঙ্কীর্ত্তন সাধারণতঃ রাত্রি ৯।।০ টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের সেবা হয়। তৎপরে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত, গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে, ঠাকুরের হাসি-গল্পে, কথায়-বার্ত্তায় কাটিয়া যায়, তার পরে একেবারে নিস্তব্ধ। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর একবার শয়ন করেন। কোন কোন দিন সমাধিস্থ থাকায়, শয়ন করাও হয় না। এইভাবে সমস্ত দিনরাত্র অতিবাহিত হইতেছে।

যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়।

আকাশবাণী— "গণ্ডি ছাড়।"

ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কৃতবিদ্য একটি ব্রাহ্মবন্ধু (শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত), ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়?'

ঠাকুর বলিলেন— **"যথার্থ সত্য লাভ কর্‌তে হ'লে, সকল প্রকার সংস্কার-বর্জ্জিত হ'তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ'লে, মনটি একেবারে নির্ম্মল হ'য়ে যায়, তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যের অনুসন্ধান। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হ'তে একেবারে চ'লে গেলে, যা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কার-বর্জ্জিত অন্তরে, সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হ'লেও তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীরা, প্রণালীগত উচ্চসাধন অবলম্বন কর্‌বার প্রারম্ভেই, এই সংস্কারটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ক'রে নেন্। এতে তাঁদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার-বর্জ্জিত হন ব'লেই, বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলেন।"**

১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন— **"যাঁরা কোনও মতের বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে চলেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। যাঁরা কোনও মতামতের বা সংস্কারের অধীন না হ'য়ে, কেবল মাত্র নিজের অন্তরে সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনও দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, কিছু কালের জন্য আমি বাগআঁচড়ায় ছিলাম, ঐ সময়ে আমার কার্য্যপ্রণালী, বক্তৃতা ও উপদেশাদি নিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে খুব হুলস্থূল পড়েছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগ্‌লাম। আমার কয়েকটি বন্ধু, ঐ সকল আলোচনার প্রতিবাদ কর্‌তে, কলিকাতা হ'তে আমাকে পুনঃপুনঃ লিখ্‌তে লাগ্‌লেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হ'তে বল্‌লেন। আমি বিষম সমস্যায় প'ড়ে গেলাম। নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হবে কি না, প্রাণে সর্ব্বদা এই আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। আমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর্‌লাম— 'ঠাকুর, এ সময়ে আমার কি করা কর্ত্তব্য, ব'লে দাও।' এ সময়ে পরিষ্কাররূপে আকাশবাণী**

হ'ল, শুন্‌লাম 'গণ্ডির ভিতরে থাক্‌লে, জীবনে সত্য লাভ হবে না।' আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। মানুষের দিকে চেয়ে চল্‌লে, ধর্ম্মকর্ম্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ। কারও দিকে না তাকায়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, যদি নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, না হ'লে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্যলাভের জন্য, সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চল্‌তে হবে, তা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক্ পৃথক্, তাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চল্‌তে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।"

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আহারের সঙ্গে কি ধর্ম্মের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, খুব আছে। আহার বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপবিত্র আহারে শরীরে ব্যাধি জন্মে, মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়; সুতরাং ধর্ম্মলাভ কঠিন হ'য়ে পড়ে। সর্ব্বদা পবিত্র আহার কর্‌তে হয়।"**

আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।

আজ সমস্ত দিন উদ্বেগে ও অশান্তিতে গিয়াছে। ধর্ম্মলাভ করিব আশায় সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হইব এরূপ ভরসা পাইতেছি না। ঠাকুর, ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত! তাতে উপকার আর কি হইতেছে? স্ত্রীসঙ্গটিই মাত্র করিতেছি না। মনে মনে সমস্তই ত চলিতেছে। একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিলে সেই ধ্যানেই ত থাকিতে অধিক আরাম পাই। হায়! হায়! আমি আবার জীবনে ধর্ম্মলাভ করিব? যে সকল গুরুভ্রাতা স্ত্রীসঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারাও ত আমা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দ করিতেছেন! সুতরাং এ ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি? যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য আর হইল কই? ইত্যাদি চিন্তায় আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সকলে নিদ্রিত হইলেন, আমি বিছানায় পড়িয়া, সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ছট্‌ফট্ করিতেছি; ঠাকুর সমাধিস্থ; রাত্রি প্রায় দু'টা, অকস্মাৎ ঠাকুরের মুখ দিয়া এই কথা কয়টি বাহির হইয়া পড়িল—

"এক পরিবারের দুই কর্ত্তা, এক রাজ্যে দুই রাজা, মঙ্গল কখনও হয় না। নিজে ম'রে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে দেহমনের রাজা কর্‌তে হবে। না হ'লে আর কল্যাণ নাই। বৃক্ষের বীজ পচ্‌লেই তা অঙ্কুরিত হয়। অভিমান নষ্ট হ'লেই চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ পাবে।"

একটু থামিয়া আবার বলিলেন— **"গভীর নিশীথে, নির্জ্জনে, নিজের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, অনুসন্ধান কর্‌লে ক্রমে জানা যায় আমি কি! ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের গোড়া। অনুগত না**

হ'লে, সেটি হবার যো নাই। একমাত্র গুরুকৃপায়ই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হ'লে, আর কিছুই বাকি থাকে না। তখন সমস্ত অবস্থা করতলন্যস্ত আমলকবৎ হ'য়ে থাকে। আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।"

আমি, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ঠাকুরের এই কথা কয়টি ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইলাম। কোনও প্রশ্ন নাই, ইঙ্গিত নাই, নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলিতেছি; সমাধিস্থ থাকিয়াও, ঠাকুর তাহা অনুভব করিয়া, উপদেশ দানে আশ্বস্ত করিলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর!

এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে।

ঠাকুর, এই বাড়ীতে আসিয়াছেন, পরে বহুলোকের সমাগম হইতেছে। দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য, ঠাকুর অপরাহ্ন চারিটা হইতে সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত, সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনই অপরাহ্নে, বহুদূর হইতেও, বিভিন্ন অবস্থার লোক, সঙ্গ প্রত্যাশায়, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে?"

ঠাকুর এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন— **"স্কুল কলেজের ছেলেদের জীবনের উপরেই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভর কর্‌ছে। আমাদের দেশে, ঋষিদের সময়ে, তাঁহারা, ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে, ছেলেদের শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না। এজন্য শিক্ষালাভ ক'রেও সে প্রকার ফল হয় না। আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে প্রায়ই এই প্রশ্ন করতেন, 'মহাশয় আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব? ছেলেবেলা আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকেরা কখনও বুঝায়ে দেন নাই যে বীর্য্য নষ্ট করা অনিষ্টকর; সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান হ'তে কখনও চেষ্টা করি নাই। এখন বুঝ্‌ছি যে, ওতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি কর্‌ব? অনেক কালের কু-অভ্যাস এখন আর বহু চেষ্টাতেও ছাড়্‌তে পার্‌ছি না।' বাস্তবিক সর্ব্বত্রই এ বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিতরে একটা শিক্ষা না থাকাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হ'চ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষকতা কর্‌ছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলে মিশে এমন সুবিধা ক'রে দেন যে, ছেলেরা তাদের ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিঃসঙ্কোচে শিক্ষকদের নিকট বল্‌তে পারেন, এবং এ সকল কু-অভ্যাসের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়েও একটা সংস্কার ছেলেদের মনে জন্মায়ে দেন, তা হ'লেই তাদের এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। যে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর কর্‌ছে, সম্প্রতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। একবার, অনেক দিন হয়, হিমালয়ে একটি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম; তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ দেশের কল্যাণ কিসে হয়?' তাতে তিনি বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্য ও বীর্য্য রক্ষা কর্‌লেই দেশের কল্যাণ হবে।' তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"**

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু, দেশমান্য সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ধর্ম্ম সহজে লভ্য নয়।

কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া 'ধর্ম্ম কি উপায়ে সহজে লাভ হয়,' এ বিষয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন।

১৮ই অগ্রহায়ণ।

ঠাকুর বলিলেন— **"আজ কাল দেখ্‌ছি, সকলেই খুব সহজে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে চায়। ধর্ম্ম যে কত মূল্যবান্ বস্তু, ধর্ম্ম লাভ করা যে কতদূর কঠিন, তা একবার কেহ ভাবে না। অন্তরের কু-অভ্যাস সমস্ত দূর না হ'লে, ধর্ম্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস, মানুষ ইচ্ছামাত্রেই দূর কর্‌তে পারে না; তা দু'এক দিনের কর্ম্মও নয়। এসব দূর কর্‌তে যে সময়টুকু লাগে, ততটুকু সময়ও কেহ ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে চায় না। খুব শীঘ্রই একটা কিছু পেতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে; তাই কিছুই হয় না। তার পর সকলেই আবার আপন আপন রুচিমত ধর্ম্ম চায়। নিজ রুচির সঙ্গে একটু অমিল হ'লে, তা ধর্ম্ম ব'লেই কেহ স্বীকার করে না। এই দু'টি কারণে, ধর্ম্ম লাভ করা লোকের কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম্ম একটা গাছের ফল নয় যে, ইচ্ছামাত্রই তা টপ্ ক'রে কেহ পেড়ে নিবে।"**

তাঁহারা আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে, তাঁর প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, না শুধু জপ তপ করিলেই হইবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ভগবান্‌কে সহজে লাভ করা যায় না। কেহ সর্ব্বদা তাঁর প্রিয় কার্য্য ক'রে তাঁকে লাভ করেন। কেহ বা সর্ব্বদা ধ্যান ক'রে তাঁকে প্রাপ্ত হন; কোন কোন ব্যক্তি নিয়ত জপ ক'রে তাঁর দর্শন লাভ করেন। সকলের এক প্রকার নয়। কে যে কোন্ ভাবে চ'লে তাঁকে লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে, বলা যায় না। সকলকেই যে ধ্যান ধারণা জপ তপ ক'রে তাঁকে লাভ কর্‌তে হবে, এমনও কিছু নয়। তাঁর কৃপায়ই তাঁকে লাভ করা যায়। কৃপাই সমস্তের মূল।"**

জিজ্ঞাসার অবস্থা; হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্যভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "পুরাণাদিতে দেখা যায়, শিষ্য, গুরুর নিকটে কোনও বিষয় প্রশ্ন করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যের ভিতরে সেই জ্ঞানটিও প্রস্ফুটিত হত। আমাদের তা হয় না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও মুমুক্ষুতা এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হ'লে, তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে কারও জিজ্ঞাসা কর্‌বার অধিকারই হয় না। এ সকল অবস্থা লাভ ক'রে প্রশ্নটি কর্‌লে, উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লাভ হয়। তা না হ'লে, মনে যা আসে তাই যদি ভাসা ভাসা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, উত্তরটিও সেইরূপ ভাসা ভাসা হ'য়ে থাকে; কোনও ফলই হয় না। অন্তরে যথার্থ ব্যাকুলতা না হ'লে, বস্তুর প্রকৃত অভাবজ্ঞান না জন্মালে, প্রশ্ন করা,**

নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর আশ্রম।

কাল্‌নার সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম।

ছেলেদের পয়সা না নিয়ে, বাজারের সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখে, দর জিজ্ঞাসা করার মতই হয়। ওর কোন মূল্যই নাই। অনেক সময়ে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া, আচার্য্যেরা কোন প্রয়োজনই মনে করতেন না; এমন কি, ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত বলেছিলেন, 'তপ। তপ। তপ।' তপস্যা কর, তপস্যা কর, তপস্যা করলেই সমস্ত বুঝতে পারবে।"

একজন বলিলেন, "একটা জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলে, তাহা করিতে যেমন উৎসাহ হয়, না বুঝিয়া করিলে সে প্রকার ত হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ঐ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝবো পরে করবো, এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্ম্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদের উপদেশ, 'আগে কর, পরে বুঝ।' সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়। যেমন ক এর পর খ, খ এর পর গ পড়তে হয়। এতে, গোড়া ধ'রে, 'তা কেন' প্রশ্ন করলে, শিক্ষা কখনও হয় না।"**

আজ হোমের জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহ না হওয়ায়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোনও ফুল দিয়া কি হোম হয় না?'

ঠাকুর বলিলেন— **'শাক্তদের হোম অপরাজিতা ফুল দিয়া হয়, আর বৈষ্ণবদের কুন্দ-পুষ্প ও শ্বেত করবী দ্বারা ব্যবস্থা আছে।'**

ব্রজমায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নানা কথায় ঠাকুর আজ শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজমায়ীদের ভাব ও ভজন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন— **"নিতান্ত সাধারণ অবস্থায় গরীব দুঃখী পাড়াগেঁয়ে ব্রজমায়ীদেরও ভগবানের প্রতি যেরূপ একটা স্বাভাবিক স্নেহ মমতা বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন-ভজনেও তা লাভ করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দজীকে তাঁরা এখনও সেই ভাবেই দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়ীরা দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে, সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান করতে করতে, গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন, ঠিক নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন, তেমনই তাঁরা গোবিন্দজীকে কত প্রকারে আদর করেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমো খান, নিজের পায়ের ধূলো হাতে নিয়ে, গোবিন্দজীর কপালে মাখায়ে দেন, এবং আশীর্ব্বাদ করেন; গোবিন্দজীকে দেখতে দেখতে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। তাঁকে, তাঁরা ঠিক যেন ঘরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।"**

১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "ব্রজমায়ীদের ভগবানের প্রতি কি শুধু বাৎসল্য ভাবই হয়, না অন্যান্য ভাবও হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ব্রজমায়ীদের সকলেরই ত আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন ত কত প্রকারের। কেহ বা নানা প্রকার বেশভূষা ক'রে, অলঙ্কারাদি প'রে, এক একবার নিজের দিকে তাকাচ্ছেন, নিজেরই রূপ নিজে দেখে ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়ছেন। এ অবস্থায় তাঁরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়েও অনেক সময় প'ড়ে থাকেন। কেহ বা দু' ঘণ্টা ধরে মুখই পুঁচ্ছেন,**

তিলকই কত বার কর্‌ছেন আর পুঁচছেন। পছন্দমত হ'য়ে গেলে, আয়নাতে একবার নিজের মুখখানি নিজেই দেখে একেবারে অবশাঙ্গ হ'য়ে ঢ'লে পড়েন। তিন চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হ'তে থাকে। কেহ বা একখিলি পান মুখে দিয়ে, চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাই চিবাচ্ছেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবে ডমমগ। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। সাধারণ লোকে এ সকল ভাব, এ সকল অবস্থা কি প্রকারে বুঝ্‌বে? এ সকল ভজনই বা কি প্রকারে জান্‌বে? দেহদ্বারা ভগবানের ভজন, এ যে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে এ সব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্বর্য্যভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন-ভজন নিয়ে থাক্‌লেই, চিত্তে আপনা আপনি এ সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হ'য়ে থাকে।"

ভাব কাকে বলে?

আজ শনিবার বলিয়া, বেলা দুইটা হইতেই, ঠাকুরের নিকট বিস্তর লোকের সমাগম আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের গণ্যমান্য, ঠাকুরের কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া, বিবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গের পর ঠাকুরকে বলিলেন, 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি, দেখিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতেছে। আর তাতে জ্ঞানের দিকটা যেন দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে।'

২০শে অগ্রহায়ণ,
৫ই ডিসেম্বর, শনিবার।

ঠাকুর বলিলেন— **"বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি হ'লে জ্ঞানের দিক্ কখনও নিবে যায় না। নাচাকোঁদা, কান্নাকাটি, মাতামাতি করা— এ সকলকে ত আর ভাব বলে না। ভাব বড় সহজ জিনিস নয়।"**

একটি বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমরা ত ও সবকেই ভাব বলি; ভাব তবে কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ভাব ত ঢের পরে। ভাবের অঙ্কুরমাত্র জন্মিলে যে সকল অবস্থা দেখা যাবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তা এইরূপ বলেছেন—**

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচিঃ।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।"

ভাব জন্মিবার পূর্ব্বেই এ সকল ত হওয়া চাই; মুখে 'ভাব ভাব' বল্‌লেই ত হবে না।

১। "ক্ষান্তি"— সকল বিষয়েই তার ধৈর্য্য ও ক্ষমা থাকবে। নিন্দা অপমান অত্যাচারাদি যত দুর্ব্যবহারই তার প্রতি হউক না কেন, কিছুতেই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হবে।

২। "অব্যর্থকালত্বম্"— সে ক্ষণেও বৃথা কালক্ষেপ কর্‌বে না; সর্ব্বদাই আত্মার কল্যাণকর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে সময় অতিবাহিত কর্‌বে।

৩। "বিরক্তি"— সকল বিষয়েতেই তার বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্ত ভাব জন্মিবে।

৪। "মানশূন্যতা"— গর্ব্ব অভিমানাদি কিছুই তার থাক্‌বে না।

৫। "আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা"— ভগবৎকৃপালাভ এবং নিজের অভিলষণীয়-বস্তুপ্রাপ্তি বিষয়ে একটা খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাক্‌বে। ইষ্টবস্তুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই একটা ব্যস্ততা থাক্‌বে।

৬। "নামগানে সদারুচিঃ"— ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই অভিলাষ হবে, আনন্দ হবে।

৭। "আসক্তি স্তদ্‌গুণাখ্যানে"— ভগবানের গুণ কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই সে অনুরক্ত থাক্‌বে।

৮। "প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে"— ভগবানের বসতি স্থলে কেহ কেহ বলেন বিগ্রহ, প্রতিমা ও তীর্থাদিতে, আবার কেহ কেহ বলেন সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সর্ব্বভূতে— তার প্রীতি ও ভালবাসা হবে।

"ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে"। ভাবের অঙ্কুরমাত্র যার জন্মেছে, এ সকল লক্ষণ পূর্ব্বেই তার হবে। ভাব কি একটা তামাসার কথা? চক্ষের একটু জল পড়্‌লেই ভাব হ'লো?

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

সর্ব্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা; শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। শাস্ত্র সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলেই সাধুসঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচারের অনুসরণ ক'রে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ করেছেন, কি প্রকার শান্তিতে, আরামে, আনন্দে দিন যাপন কর্‌ছেন, এ সমস্ত দেখে শুনে সাধুদের মত জীবন লাভ করতে একটা আকাঙ্খা হয়, আগ্রহ হয়। এ প্রকার হ'লেই, তখন ভজন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্‌তে কর্‌তে, সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হ'য়ে যায়। অন্তরে কোনও প্রকার অনিষ্টকর, প্রতিকূল অবস্থাই আর থাকে না, ভজনেতে ক'রে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যায়। এসব হ'য়ে গেলে তার পর ভাব। এই ভাবের পরে ভক্তি, তার পর প্রেম। ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প, প্রেম সুপক্ক ফল। এ সকল বহুদূরের কথা।"

প্রশ্ন— "অশ্রুকম্পপুলকাদি যে হয়, তাহা কি ভাব নয়?"

ঠাকুর বলিলেন— "ওসব ভিতরের একটা অবস্থার বিকাশ বটে, কিন্তু অশ্রু কম্প হ'লেই তার এসব ভাব হয়েছে, এরূপ যে মনে কর্‌তে হবে, তার কোনও অর্থ নাই। কোন্ ভাব উপস্থিত হ'লে, চ'খের জলে ঐ সময়ে কোন্ দিক্ দিয়ে, কি ভাবে পড়্‌বে, কোন্ ভাবের

চ'খের জলের স্বাদ কি প্রকার হবে, তা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে শাস্ত্রকর্ত্তারা, ভক্তির দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসা ক'রে গেছেন। অভ্যাসের দ্বারাও ত অনেকে অশ্রুকম্পপুলকাদি আয়ত্ত ক'রে থাকেন।"

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন— "মহাশয়! অনেকে বলেন, গুরুকরণ না হ'লে ধর্ম্মলাভ করা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মতামতের কথা আমি কিছু জানি না; বল্‌তেও পারি না। তবে আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি যে, গুরু ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামান্য একটা কিছু জান্‌তে হ'লে সামান্য একটু শিক্ষালাভ কর্‌তে হ'লে, গুরুর প্রয়োজন হয়; গুরু ব্যতীত হবার যো নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়টি দুর্ব্বোধ, গুরু ব্যতীত অনায়াসে তা লাভ হবে, এ কখনও হয় না।"**

প্রশ্ন— "পশু, পক্ষী, মনুষ্য— সকলেরই ত কার্য্য দেখে শিক্ষালাভ হতেছে; সাধারণ ভাবে সকলেই ত গুরু, তবে বিশেষভাবে একজন মানুষকে ধরা কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধর্‌তে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন কর্‌তে পারলেই প্রকৃত গুরু লাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হ'য়ে যায়। এরূপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না।"**

প্রশ্ন— "কিরূপ অবস্থার লোককে গুরু করতে হয়?"

ঠাকুর— **"যাঁতে ভগবানের চিৎ শক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞান শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই গুরু। গুরু অন্য কেহ হ'তে পারে না। মহাপুরুষেরাই গুরু।"**

প্রশ্ন— "আমাদের ত অন্তর্দ্দৃষ্টি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা মহাপুরুষদের বুঝিতে পারিব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা যায়।**

প্রথমতঃ— মহাপুরুষেরা কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না; কার্য্যদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজেকে বড় ব'লে জানান্‌ না।

দ্বিতীয়তঃ— মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা করেন না।

তৃতীয়তঃ— মহাপুরুষেরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না; আত্মার কল্যাণকর, কোনও একটা অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থতঃ— মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবে দয়া করেন; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি, বৃক্ষলতার পর্য্যন্ত দুঃখে সহানুভূতি করেন; অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব করেন; কাহারই একটা উদ্বেগের কারণ হন না।

পঞ্চমতঃ— মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন; কখনও কোনও কারণে চঞ্চল হন না।"

মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান।

এ সকল কথা শেষ হইতে হইতেই, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ মূর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিকপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশানুসারে, তাঁহার অনুগত সেবক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়, ঠাকুরের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন— 'মহর্ষি অসুস্থ, কাণে ভাল শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে; আপনি কলিকাতায় আছেন শুনিয়া, আপনাকে দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া, আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তাঁর কতকগুলি কথা, আপনাকে তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন।' শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঠাকুর মহর্ষিকে উদ্দেশ করিয়া, করজোড়ে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেন— **"আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। আমি তাঁকে দর্শন কর্‌তে যাব। কখন গেলে তাঁকে দর্শনের সুবিধা হবে?"**

শাস্ত্রী মহাশয় বেলা তিনটা হইতে পাঁচটার মধ্যে সময় নির্দ্দেশ করিলেন। ঠাকুরও ঐ সময়েই তথায় উপস্থিত হইবেন বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সন্ধ্যাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার— মহর্ষির ভাব ও উপদেশ।

আজ গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরের সঙ্গে মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাইবেন, সকলেরই মনে কত আনন্দ! আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম— "আমার ভাগ্যে বুঝি মহর্ষির দর্শন ঘটিবে না! যে সময়ে সকলে মহর্ষির নিকট যাইবেন, আমার তখন আহারের সময়। একদিন উপবাস করিয়া থাকিতে আমি কোন কষ্টই মনে করি না, কিন্তু আহার ত আমার শুধু আহার নয়! উহা ঠাকুরের আদেশমত, আমার সাধন-প্রণালীর অন্তর্গত একটি বিশেষ নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, ঠাকুর কি অসন্তুষ্ট হইবেন না? ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হয় না। এখন কি করি?" এই প্রকার ভাবিয়া, ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

২১ শে অগ্রহায়ণ,রবিবার; ৬ই ডিসেম্বর।

ঠাকুরের নিয়মিত পাঠ শেষ হইলে, এগারটার সময় আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন— **"কি, আজ তুমি কি কর্‌বে? রান্না না ক'রে একমুঠো প্রসাদ পেয়ে নিলে হয় না?"**

আমি শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "আমি কখনও মহর্ষিকে দর্শন করি নাই, যেতে বড় ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর— **"তা হ'লে প্রসাদই দু'টা পেয়ে নিও।"**

আমার সুবিধামত ব্যবস্থা ঠাকুর নিজ হইতেই করিলেন দেখিয়া, আনন্দে আমার কান্না আসিল। যথাসময়ে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

আজ রবিবার। স্কুল, কলেজ, আদালতাদি বন্ধ বলিয়া, অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দু'টার পর, তের চৌদ্দজন গুরুভ্রাতা, ঠাকুরের সঙ্গে চলিলেন। প্রায় তিনটার সময় আমরা পার্কষ্ট্রীটে মহর্ষির ভবনে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, সম্মুখের হল্‌ঘরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই, খুব আদর করিয়া, ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এবং মহর্ষিকে, সশিষ্যে ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মহর্ষি ঐ সময় মগ্নাবস্থায় ছিলেন বলিয়া, আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রেই, মহর্ষি সকলকে উপরে যাইতে সংবাদ দিলেন, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলেই যাইয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, প্রকাণ্ড হল্‌ঘরের মধ্যস্থলে একখানা 'ইজি-চেয়ারে' মহর্ষি অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। দক্ষিণে ও বামে দু'খানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে দু'খানা লম্বা বেঞ্চ এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহাতে বসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া, মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে পবিত্রমূর্ত্তি বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদগদ স্বরে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ।" পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, গণ্ডস্থল ভাসিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া, মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, 'ইঁহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইঁহারা কে?' শাস্ত্রী মহাশয়, মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইঁহারা সকলেই গোঁসাইয়ের শিষ্য।"

মহর্ষি বলিলেন, "মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে যাহা ভোগ করছেন, শিষ্যদিগকেও তাহা দিচ্ছেন; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্খা করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তাপহারক! ইঁহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।" এ সকল কথার পর, ঠাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়া, বোলপুরের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন, "বোলপুরে একটি আশ্রম হয়েছে। শীঘ্রই উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য হবে। সশিষ্যে তুমি এ উৎসবে যোগদান করলে বড়ই আনন্দিত হব। ঐ আশ্রমটির প্রয়োজন এবং নিয়মপ্রণালী কিরূপ হওয়া তুমি ভাল মনে কর, জানতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন— **"ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রম আছে। তাই সাধু সন্ন্যাসীরা ঐ সকল দেশে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ প্রকার কোন ধর্ম্মাশ্রম নাই বল্‌লেই হয়। যে দুই একটি আছে— তাহাও সম্প্রদায় বিশেষের। সকল ধর্ম্মার্থিগণ একটা স্থানে আশ্রয় পেয়ে, আপন আপন ভজন সাধন অবাধে কর্‌তে পারেন, এরূপ একটি স্থানের বড়ই প্রয়োজন মনে হয়। শান্তিনিকেতনে যদি সাধু সন্ন্যাসী, ফকির দরবেশাদি, সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভগবদুপাসকগণের শান্তির সাধারণ স্থান হয়, তবে বড়ই কল্যাণ হয়। দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায় না। দেশে এটির বড়ই অভাব।"**

মহর্ষি, ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু! সাধু!! বাস্তবিক যাহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাদের কথায় অন্তরকে স্পর্শ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। যথার্থ সাধুর কথা এইরূপই হয়! না হ'লে কথা ভাসা ভাসা হ'য়ে যায়। তুমি যে রকম বল্‌লে তাই হওয়া ঠিক, ইহা সত্য। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁহাদের উপর রয়েছে, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্যে গোলমাল চল্‌ছে। তোমার এই অসাধারণ উদার ভাব, কখনও তাঁহারা গ্রহণ করতে পার্‌বেন না। আমার অন্তরের কথা আমি কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝ্‌বে, তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা বলে ঠাণ্ডা হব।" এই বলিয়া, মহর্ষি নিজ জীবনের কথার সঙ্গে, হাফেজের কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মহর্ষি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন— "ভগবান্‌কে যেমন ভাবে পেতে আকাঙ্খা তেমনি ভাবে পাচ্ছি না। সময় সময় তিনি দয়া করে দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে যান, যতক্ষণ আবার সেই প্রেমময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি, প্রাণ আমার ধড়্‌ফড়্ করে, সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়া করে দর্শন না দিলে, কি আর কর্‌ব! জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁকে লাভ করা যায় না. জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে লাভ কর্‌বার একমাত্র উপায়। তা' ত আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়; "পুরুষকার" অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করে, তিনি আমাকে গ্রহণ কর্‌বেন বলেছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করে, তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে আছি।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর **"জয় গুরু, জয় গুরু,"** বলিতে লাগিলেন। একটু পরে, চোখ্‌মুখ মুছিয়া মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব্ব হ'তেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসঙ্গে না থাক্‌লে প্রকৃত সত্য বস্তু ষোলআনা ধর্ম্ম, লাভ হয় না! তোমাতে এই চারিটি উপযুক্ত রূপে রয়েছে। বিশুদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করেছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেছ, তাঁর কৃপায় প্রকৃত সৎশিক্ষা সদুপদেশ পেয়েছ। তার পর, মনুষ্য-চেষ্টায় সাধন-ভজনও যতটি সম্ভব, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় তুমি করেছ, সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা, তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রয়েছে। তুমিই ধন্য।" এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটি শ্লোক পড়িলেন।—

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ।।"

"তুমি যাহাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান্ তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"আপনিই ত আমাকে হাতে ধ'রে মানুষ করেছেন। আমার সবই ত আপনা হ'তে। আপনিই ত আমার গুরু!"**

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই, মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা ঠিকই ব'লেছ, গুরু ত বটেই! তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মত! ক, খ শিখ্‌তে হ'লে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকটে শিখ্‌তে হয়, পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়ে, ঐ গুরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বল্‌লে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হচ্ছে।" ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া, ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থান করিয়া, মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া, বলিলেন—

"আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্।"

মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন— "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পারি না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।"

আমরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি খুব হৃষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হবে, গোঁসাইকে তোমরা কখনও ছেড়ো না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।"

মহর্ষির নিকট হইতে বাহির হইবার পরেই, গুরুভ্রাতা শ্রীচরণবাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছি সদ্‌গুরুর কৃপা না হ'লে এরকম অবস্থা খোলে না। মহর্ষির এ অবস্থা কিরূপে হ'ল?"

ঠাকুর বলিলেন— **"মহর্ষির উপর সদ্‌গুরুর কৃপা হয় নাই, কে বল্‌লে?"**

শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুকৃপা। সগর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি।

আমরা ঠাকুরের সঙ্গে, সিটি কলেজের 'প্রিন্সিপ্যাল' শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গুরু, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় পঁহুছিলাম। নবীন বাবু, অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বসাইয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম আপনার সহিত নাকি মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তিনি কি বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বিশেষ সুখী হইব।"
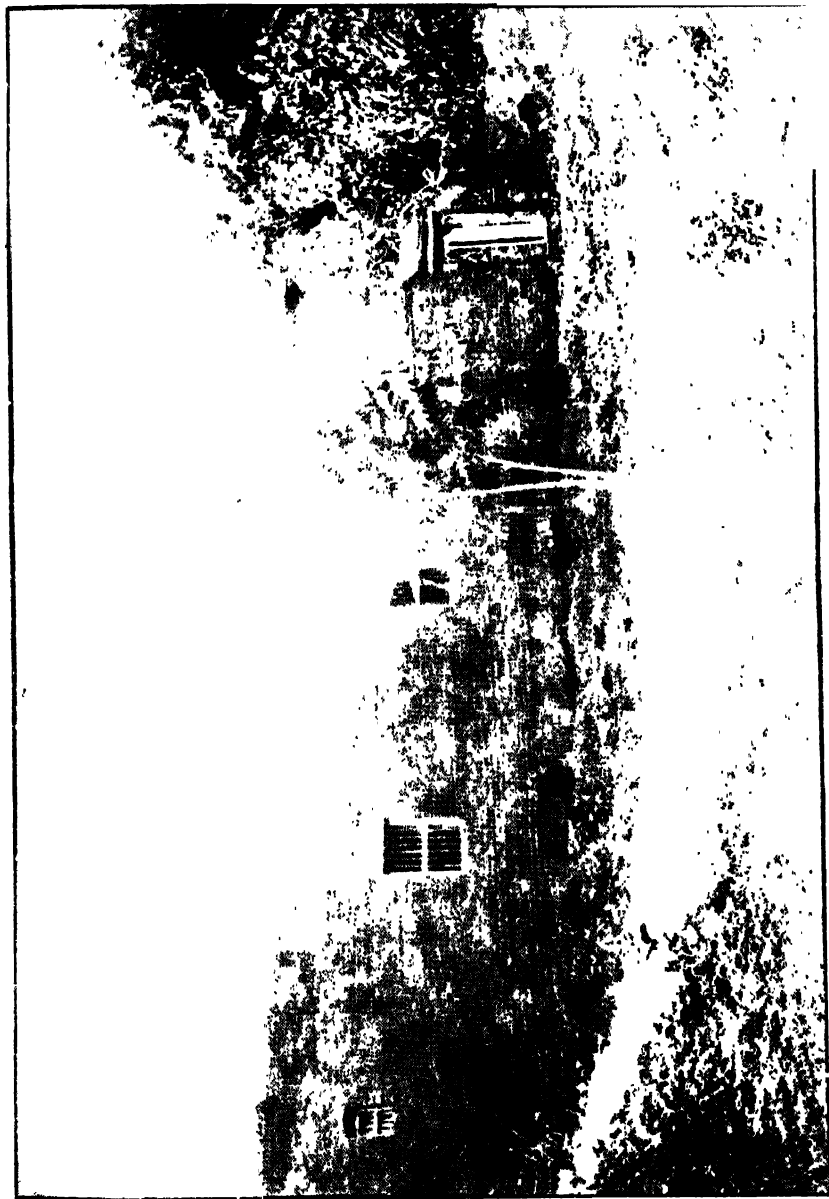
শীকারপুরে শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর
মাতুলালয়।

মাতুলালয় সংলগ্ন কচুবন।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান।

ঠাকুর বলিলেন— "হাঁ, তার দর্শন পেয়ে প্রথম আমার বাক্যস্ফুরণ হ'ল না, চরণতলে প'ড়ে কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ একটু শিথিল হ'লে, বল্‌লাম— 'ঠাকুর, বড় ঘুরেছি।' তিনি বল্‌লেন— 'তোদের কুলেরই ত এই ধরম।' আমি বল্‌লাম— 'দেব, দয়া ক'রে পুনরায় প্রকাশ হ'য়ে, কলির মলিন জীব সকলকে উদ্ধার করুন।' তিনি বল্‌লেন— 'প্রকাশ হ'লে কে আর আমাকে এখন বিশ্বাস কর্‌বে। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।' এইরূপ আরও কত কি বল্‌লেন।"

ঠাকুর তৎপরে নবীনবাবুকে বলিলেন— "আমার যেন মনে হয়, তাঁকে সে ভাবে দরদ কর্‌বার তেমন কেহ ছিল না; থাক্‌লে আরও কিছুদিন তিনি থাক্‌তেন।"

নবীনবাবুর সহিত ঠাকুরের আরও মহাপ্রভুসম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধ্যার পর আমরা বাসায় পঁহুছিলাম।

রাত্রিতে খুব সঙ্কীর্ত্তন হইল, মহর্ষির সম্বন্ধে আজ অনেক কথাবার্ত্তা হইল। নগেন্দ্রবাবুর প্রশ্নে ঠাকুর বলিলেন,— "মহর্ষি যখন হিমালয়েতে সাধন কর্‌তেন, তখন একদিন একটি হিমালয়পর্ব্বতনিবাসী মহাপুরুষ, দৃষ্টিদ্বারা মহর্ষির ভিতরে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। মহাপুরুষের কৃপার পর হ'তেই, মহর্ষির অবস্থা খুলে গেছে, ভগবদ্‌ধ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়।"

প্রশ্ন— "ভগবৎ ধ্যান ব্যতীতও সমাধি হয় কি?"

ঠাকুর— "সমাধি দুই প্রকার। সগর্ভ ও বিগর্ভ। বায়ুরোধ পূর্ব্বক শরীর স্থির রেখে যে সমাধি হয়, সে বিগর্ভ সমাধি; তাতে কোন উপকারই হয় না। বাজিকরেরাও কুম্ভক ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। যোগবাশিষ্ঠে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে নিয়ে, একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হ'য়ে, মাটি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে একটি পাকা কুঠুরী পেলেন; উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন, একটি লোক শূন্যে অবস্থান কর্‌ছে। বশিষ্ঠদেব তার চৈতন্য সঞ্চার কর্‌বামাত্রই, সে তিনপাক ঘুরে, তানা না-না-না ক'রে হাত পেতে— 'মহারাজ! রূপিয়া দেও' প্রার্থনা কর্‌ল। বহুকাল পূর্ব্বে, সে অর্থ প্রত্যাশায়, কুম্ভক যোগে সমাধিস্থ হ'য়ে, শূন্যে কি প্রকারে অবস্থান কর্‌তে হয়, তাই দেখাচ্ছিল। কোনও প্রকারে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, তার কুম্ভক আর ছুট্‌ল না। রাজার রাজত্ব গেল, বাড়ী অরণ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ঐ সমাধি আর ভাঙ্গ্‌ল না। বশিষ্ঠদেব তার জ্ঞান সঞ্চার কর্‌বামাত্রই, পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে, সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট "রূপিয়া দেও" প্রার্থনা কর্‌ল। মুদ্রা ক'রে, কুম্ভক ক'রে, হঠযোগের নানা প্রকার প্রণালী ক'রে যে সমাধি হয় তা কিছুই নয়। ভগবৎ চিন্তার সহিত যে সমাধি, তা-ই প্রকৃত সমাধি।

যাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য বা শক্তিকেই তাঁরা নিতান্ত অনর্থ মনে ক'রে ত্যাগ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য দাসীর মত সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরেও সে দিকে চান না। যথার্থ যোগ লাভ কর্‌তে হ'লে, বীর্য্য

ধারণ কর্‌তে হয়। সত্য কথা না বল্‌লে, বীর্য্য ধারণ হয় না। সত্য কথা বল্‌তে হ'লে বাক্য সংযম কর্‌তে হয়। প্রায় মৌনই হ'তে হয়। আজকাল রাজযোগ বড়ই কঠিন। এতে কৃতকার্য্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভক্তিযোগই এ সময়ের উপযোগী, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।"

সমস্ত অবতার— পূর্ণভগবান্। আনুষঙ্গিক প্রশ্ন।

আজ অবতারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— **"কোন কোন সময়ে বিশেষ কোন প্রয়োজনে, ভগবানের শক্তি, ব্যক্তি বিশেষের ভিতর দিয়ে কার্য্য করে দেখা যায়, তাহাই অবতার। ঐ কার্য্যটি শেষ হ'য়ে গেলেই, ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন আর সে অবতারও নয়। যেমন 'পরশুরাম' বিশেষ একটা সময়ের জন্য অবতার। আবার যাবজ্জীবন অবতারও থাকে, যেমন 'রামচন্দ্র'। অংশ, কলা, আর্বিভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে। অবতার সর্ব্বদাই পূর্ণ, কারণ ভগবৎশক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান্ সর্ব্বদাই পূর্ণ। তবে তাঁর অংশ, অংশাংশ ইত্যাদি বল্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য, বীর্য্যের কার্য্য, কোথাও বা ভক্তির কার্য্যই দেখা যায়। ভগবান যে কার্য্যে যতটুকু শক্তি প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝেন, ততটুকুই মাত্র করেন, তাই ব'লে অন্যশক্তি তাতে নাই, বলা ঠিক নয়। পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি কোন ক্ষেত্রে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয়, তথায় পূর্ণ শক্তিই র'য়েছে বুঝ্‌তে হবে। ভগবান্ কোথাও অপূর্ণ নন্, সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই পূর্ণ। অবতার সমস্তই পূর্ণ, যতটুকু প্রকাশ ততটুকুই লোকে জানে মাত্র।"**

২২শে অগ্রহায়ণ।

সাকার ধ্যানে ভগবানকে লাভ করা যায়, না নিরাকার ধ্যানে? কোন্ মত ঠিক জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন— **"মত একটা কিছু নয়। ওসব মতামতে হয় না। সাকার ধ্যানই কর, আর নিরাকার ধ্যানই কর, যা-ই কর, কিছুতেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। তিনি স্বপ্রকাশ, নিজে দয়া ক'রে যখন প্রকাশ হন, তখনই তাঁকে জানা যায়। চিত্তশুদ্ধ না হ'লে, তাঁর প্রকাশ ধরা যায় না। সাধন-ভজন যাই কর না কেন, আগে চিত্তশুদ্ধিটি চাই; চিত্তশুদ্ধ না হ'লে, ভগবানের প্রকাশ হয় না। প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ কর।"**

শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী কি উপায়ে রাখা যায় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন— **"শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী রাখ্‌তে হ'লে, আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক রাখ্‌তে হয়। বীর্য্যধারণই মূল, কিন্তু ঐ নিয়ম দু'টির রক্ষা না হ'লে, বীর্য্যধারণও ঠিক মত হয় না। পূর্ব্বে যোগী ঋষিদের সকলেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁরা কখনও ঐ নিয়ম দু'টির অন্যথা কর্‌তেন না।"**

কালীঘাটে কালী দর্শন— উদাসী সাধু দর্শন— স্পর্শ করা বিষয়ে উপদেশ।

আজ ঠাকুর, আমাদের সকলকে লইয়া, কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কালী-মন্দিরে লোকের খুব ভিড় ছিল। ঠাকুরকে পাণ্ডারা খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত ভিতরে লইয়া গেলেন— সঙ্গে মাত্র আমরাই রহিলাম। কোন প্রকার অসুবিধাই হইল না। কালীকে মালা ও ডালী দিয়া, নমস্কার করিতে করিতে, করজোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, ঠাকুর যখন 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন ঠাকুরের আধ কান্নাস্বরে আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কালীর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের আপাদমস্তক থর্‌থর্ কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর এদিকে ওদিকে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমরা অতি সাবধানে ঠাকুরকে বাহিরে লইয়া আসিলাম। দলে দলে লোক আসিয়া, ঠাকুরের চরণধূলি লইতে লাগিল, লোকের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা রাস্তায় আসিলাম। একটু চলিয়াই, ঠাকুর একটি 'রকে' বসিয়া পড়িলেন। এবং বলিলেন— **"জগন্নাথের রূপের সহিত, এই কালীর রূপের সাদৃশ্য আছে, মা'র কত দয়া! সকলকেই মা দয়া কর্‌ছেন।"**

২৩শে অগ্রহায়ণ।

কালীর মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে, ঠাকুর ভাবাবেশে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে, একটি বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী আসিয়া, ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমার জন্ম সার্থক। আর আমার কিছু নাই; একটি পয়সা মাত্র আছে, এইটিই তুমি দয়া ক'রে নেও," এই বলিয়া বুড়ী পয়সাটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা হাতে লইয়া, মস্তকে কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে মহেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন। পাছে না নেন, তাই বলিলেন—**"অযাচিত দান অগ্রাহ্য কর্‌তে নাই, এই পয়সাটি আপনার কন্যাকে দিবেন।"** মহেন্দ্র বাবু যত্ন করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই, ঠাকুর অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বটগাছের ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েকটি সন্ন্যাসী, আপন আপন আসনে বসিয়া, ধুনি তাপিতে ছিলেন। একটি সৌম্যমূর্ত্তি, ভস্মাবৃতাঙ্গ , ভজনানন্দী সন্ন্যাসীকে, ঠাকুর নমস্কার করিয়া কয়েকটি টাকা সেবার্থে দিয়া বলিলেন— **"এজন্যই ভগবান আজ আমাকে এখানে এনেছেন।"**

ঠাকুর, আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার সময়েই, কয়েকটি টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তাঁহাদের অযাচক বৃত্তি, দুইদিন একেবারে আহার জুটে নাই। সন্ন্যাসীটির প্রভাবে ঐ স্থানটি যেন অন্য প্রকার হইয়া রহিয়াছে। উদাস ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ঐ স্থানে পঁহুছিবামাত্রই আমাদের কারও কারও পরিষ্কার অনুভব হইতে লাগিল। অল্প সময় ওখানে বসিয়াই, ঠাকুর বাসায় যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জ্বর হইল। অবিলম্বে গাড়ী করিয়া, আমরা তাঁহাকে লইয়া, বাসায় পঁহুছিলাম। নিয়মিত সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পর ঠাকুর সুস্থ হইলেন। অধিক রাত্রিতে কথায় কথায় বলিলেন, **"ভাবাবেশে থাক্‌লে অথবা অন্যমনস্ক থাক্‌লে, কখনও তাকে স্পর্শ কর্‌তে নাই।**

স্পর্শ কর্‌তে হ'লে, তিনবার ডেকে, তাকে জানায়ে, স্পর্শ কর্‌তে হয়। এখনও অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। হঠাৎ কেহ স্পর্শ কর্‌লে, তার সমস্তগুলি ভাব, দেহে সঞ্চার হয়। শরীরটি আগাগোড়া যেন জ্ব'লে যায়। এই নিয়ম, সাধারণের জানা নাই ব'লে অনেক সময় অনেক উৎপাতে পড়্‌তে হয়।"

রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাঙ্খা ও অনুরোধ।

কলিকাতার সুবিখ্যাত দানশীল, বিপুল ধনাধিপতি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, অদ্য বেলা দুইটার সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন— "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রতিমাসে সহস্র সহস্র টাকা ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিয়া, তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সম্বন্ধে, তিনি অনেক কথা লোকমুখে শুনিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁর বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনার নির্দ্দিষ্ট আয় কিছুই নাই, অথচ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানেরা, বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মলাভ আকাঙ্খায়, আপনার আশ্রয় লইয়া, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; আকাশবৃত্তির উপরই আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই ঠাকুর মহাশয়, আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়া, এই বিষয় জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত আকাঙ্খা একলক্ষ টাকা আপনাকে তিনি উৎসর্গ করেন, এবং ধর্ম্মার্থে আপনার ইচ্ছামত তাহা ব্যয়িত হয়। আপনার অবসর মত, অনুগ্রহ করিয়া, একবার যদি তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় আপনাকে জানাইয়া, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ টাকা আপনার হাতে অর্পণ করেন। এখানে আগন্তুক লোকের সমাগম সংবাদ এবং যাঁহারা সর্ব্বদা আছেন, তাঁহারা কিরূপ অবস্থার লোক আর কি প্রকার অভাবে থাকিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে আছেন ইত্যাদি তিনি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

২৪ — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনিয়া, ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল; মুখটি স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল; ঠাকুর করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া, বলিতে লাগিলেন— **"ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন— আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে, ভগবান তা প্রতিদিন দিয়ে থাকেন। একটি কাণাকড়িরও অভাব রাখেন না, তাঁরই দ্বারে দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে, তাঁর নাম নিয়ে, যেন প'ড়ে থাক্‌তে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর্‌তে বল্‌বেন, তিনি ঐ টাকা ধর্ম্মার্থে যথায় ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি তা গ্রহণ কর্‌লে, আমার বিশেষ অনিষ্ট হ'বে মনে করি। বড়লোকের বাড়ী যে'তে আমার ভয় হয়।"**

বিদ্যারত্ন মহাশয়, আর এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে চলিয়া গেলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়, বহু সাধুকেই মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও খুব সদ্ভাবে এই কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

ছোট দাদার সেবা— ঠাকুরের অশ্রু।

আমরা কলিকাতা পঁহুছিতেই দ্বারভাঙ্গা হইতে পত্র আসিল, শান্তিসুধা তথায় অতিশয় পীড়িতা, দাউজীও রক্ত আমাশয় রোগে খুব ভুগিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই, যোগজীবনকে তথায় পাঠাইয়া, শান্তিসুধাকে এখানে আনাইয়াছেন। শান্তিসুধা কয়দিন বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া, এখানে আসিয়াছেন। এখন প্রবল জ্বরে ও পেটের অসুখে তিনি মরণাপন্না, এখানে সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আমরা সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করিব। সাংসারিক আরাম-আনন্দ, সুখভোগ, বিষময় জ্ঞান করিয়া, শুধু ঠাকুরের অমৃতময় সঙ্গলাভেই আমরা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। এখানে রোগীর উৎপাত ঘাড়ে লইয়া, বিষ্ঠা-মূত্র ঘাঁটিতে ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং আমরা অনেকেই রোগী হইতে তফাৎ থাকিয়া, রোগীর সেবা শুশ্রূষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এই প্রকার কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপদেশই একে অন্যকে দিতেছি মাত্র। এদিকে শান্তিসুধার অবস্থাও ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

ছোট দাদা কলিকাতায় থাকিয়া এম, এ, ও আইন পড়িতেছেন। তাঁহার অবসর বড়ই কম; তথাপি ঠাকুরের সঙ্গলাভের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, ঝামাপুকুর হইতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও আসিয়া, প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইতেন। শান্তিসুধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি সকল দিকের প্রয়োজন, এমন কি ঠাকুরের সঙ্গলাভের আকাঙ্খা পর্য্যন্ত একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে, প্রায় অর্দ্ধক্ষিপ্তা, উৎকটপীড়িতা শান্তিসুধার সেবায় একটানা নিযুক্ত রহিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে বিকারী রোগীর বিষম উৎপাতে স্থির থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন এবং নির্ব্বিকার ভাবে বিষ্ঠা, মূত্র, বমি দুই হাতে পরিষ্কার করিতেছেন দেখিয়া গুরুভ্রাতারা সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুর সর্ব্বদাই পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে থাকিয়া, শান্তিসুধার সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আজ প্রসঙ্গক্রমে, ছোট দাদার সেবা-পারিপাট্য বিষয়ে কথা তুলিয়া, কান্দিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,— **"যথার্থ মায়ের মত দরদ্ ক'রে, রোগীর প্রাণে যা চায় সেটি বুঝে, সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে সারদাই পারেন। ওঁর স্পর্শে প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়। এক ঘটী জল যে সারদা দেন, তাতেও যেন সমস্তটি প্রাণ ঢেলে দেন। সেবা অনেকেই করেন বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখা যায় না।"**

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গদগদ ভাবে, ছোট দাদার সেবাকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন শুনিয়া, আমার নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। ভাবিলাম, হায়, কবে এমন দিন আসিবে যে, ঠাকুর আমার সেবা দেখিয়াও এই প্রকার আনন্দ করিবেন! এত কাল এত সাধন-ভজন করিয়া এবং ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁর যে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না, দুই পাঁচ দিন একটা রোগীর একটু সেবা করিয়া, অনায়াসে ছোট দাদা ঠাকুরের সেই প্রসন্নতা লাভ করিলেন। সকলই অদৃষ্টে করে!

এই সময় ঠাকুর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন— **"স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যে সেবা সে এক প্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা। সেটি কি আর চেষ্টায় হয়, না যার তার হয়?"**

শান্তিসুধার সেবাকালে, ঠাকুরের কৃপা বিষয়ে ছোট দাদা তাঁর ডায়েরীতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"দু' হাতে বমি কাচাইতে কাচাইতে (পরিষ্কার করিতে·করিতে), ওয়াক দিতে দিতে, গুরুজীর সাহায্য চাহিলাম, গুরুজীর কৃপায়— তাঁরই নামের গুণে, কিঞ্চিৎ হইল। হায়! হায়! নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই। একটু সামান্য সেবা করিতে হইলেও গুরুজীর সাহায্য দরকার * * *। গুরুজীর অতিসুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদিমধ্যে প্রকাশিত হইল, * * * * * * *। গুরুজী আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। নিমেষশূন্য নয়নে। * * আমি উহা এড়াইতে প্রয়াস পাইলাম।"

ঠাকুরের বিরক্তি।

ছোট দাদা ও কুঞ্জ বাবু রাত্রিতে ঠাকুরের পদসেবা করিয়া থাকেন। একদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, উঁহারা ঠাকুরের পদসেবায় যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবু উঁহাদের বলিলেন, "আমার মাথাটা টিপে দেও।" উঁহারা ভিতরে ভিতরে একটু বিরক্ত হইয়া, ব্যস্ততার সহিত, তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র বাবুর মাথা টিপিয়া দিয়া, উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, উঁহারা যেমন ঠাকুরের পদসেবার উদ্যোগ করিলেন, ঠাকুর খুব বিরক্তির সহিত ধমক্ দিয়া বলিলেন— **"যাও, যাও, পা আর টিপ্‌তে হবে না। শুয়ে থাক গিয়ে। স'রে যাও।"**

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

উঁহারা মহেন্দ্র বাবুর নিকট ত্রুটির এই ফল বুঝিয়া, লজ্জায় ও ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া সরিয়া পড়িলেন। কারও ক্লেশে উদাসীন থাকিয়া বা কারও প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, ঠাকুরের সেবায় গেলে, প্রায় সর্ব্বদাই আমরা ঠাকুরের এ প্রকার বিরক্তি ভাব দেখি।

ভিতরে ত্রিভঙ্গ।

ঠাকুর, দিবারাত্রি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিয়মপূর্ব্বক থাকাতে, আমাদেরও দৈনিক কার্য্যগুলি নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। সমস্তটি দিন কি প্রকারে যে চলিয়া যায়, বুঝিতে পারি না। সারাদিনে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটা কথা বলিবারও কেহ অবসর পায় না। রাত্রিতে আহারের পর, ঠাকুর কিছুকালের জন্য, শিষ্যবর্গের সঙ্গে, তাহাদেরই মত হইয়া গিয়া, হাসি গল্পে রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। আর আর দিনের মত আজও, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয় ও ছোট দাদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর নানা কথা তুলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। তখন অবসর বুঝিয়া ছোট দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, "একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, দশভূজা ভগবতী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মিলাইয়া গেলেন। তখন একটা অসীম শক্তি অনুভব করিলাম— ইহা কি সত্য?"

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

ঠাকুর বলিলেন— **"ওহে বাপু, এসব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমাকে ত্রিভুবন ঘুরাচ্ছেন। বা'র হ'তে চেষ্টা ক'রে, তিনিও আর পার্‌ছেন না,** (হাত দিয়া উভয় পার্শ্ব দেখাইয়া) **এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন। আর তোমার ভিতরে দশভঙ্গ, ক্রমে টের পাবে।"**

ঠাকুর অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন— **"আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ান।"**

কৃষ্ণের বিজয় অর্থাৎ কৃষ্ণের ঘুরে বেড়ান। ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য ইহাই কি না, জানি না।

স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্য সহানুভূতি ও চিকিৎসা।

নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা বিষয়ে প্রশ্ন করায়, ঠাকুর বলিলেন— **"অনেক সময় স্বপ্নেই মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্নে যখন দেখ্‌বে নানাপ্রকার প্রলোভনে প'ড়েও চিত্ত স্থির আছে, কোনও দিকে বিচলিত হচ্ছে না, তখনই ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ'লেই বুঝ্‌বে, ভিতরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। গুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা সত্য ব'লে জান্‌বে। ওর ভিতরে অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা, একটা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল সাধন-ভজন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে, তা অনায়াসে লাভ হ'ল দেখা গিয়েছে। আমি যখন ডাক্তারী কর্‌তাম, শক্ত রোগীদের জন্য চিন্তা হ'লে, প্রায়ই পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার স্বপ্নে আমাকে ঔষধের কথা ব'লে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।"**

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

এই বলিয়া ঠাকুর যে ভাবে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন, বলিতে লাগিলেন, শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। একবার শান্তিপুরে বিষম মড়ক লাগিয়াছিল, তিন চারিবার দাস্ত বমি হইয়াই লোক মরিতে লাগিল, শান্তিপুরে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল, সহরের লোক চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ঠাকুর, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি ঔষধের বাক্স হাতে লইয়া, রোগীদের বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারই কোন উপকার হইল না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া একদিন রাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে ঔষধের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয়, ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন, "স্যান্টোনিনের সহিত এই কয়টি ঔষধ মিলাইয়া দাও, খাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।" রাত্রি ৩।। টার সময় এই ব্যবস্থা পাইয়া ঠাকুর অমনি উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদের ঘরে ঘরে যাইয়া ঐ ঔষধ দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ ঔষধ সেবনের পর আর একটি রোগীরও মৃত্যু হইল না।

ঠাকুরের শান্তিপুরে অবস্থান কালে, একদিন তিনি গঙ্গার অপর পারে একটি মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসার্থে আহূত হন। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও তাহার সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি

অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোগীকে ঔষধ দিয়া পরদিন সকালে আবার ঔষধ আনিতে তাহার বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঐ দিন বিষম দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। সকালবেলা হইতেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর, রোগীর বাড়ী হইতে কেহ ঔষধ লইতে আসিবে মনে করিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল, এদিকে ঝড় বৃষ্টি আরও ভীষণাকার ধারণ করিয়া, সহরটিকে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিল। তখন তিনি রোগীর ক্লেশের অবস্থা মনে করিয়া, অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ঔষধের শিশিটি হাতে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে, পার হইবার নৌকা নাই দেখিয়া, তিনি পরিধেয় বস্ত্রে ঔষধের শিশিটি জড়াইয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই সময়ের প্রশস্ত ও ভয়ঙ্কর প্রবল গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, অপর পারের কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উঠিলেন এবং তথা হইতে দুর্গম অজ্ঞাত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে, রোগীর বাড়ীতে গিয়া পঁহুছিলেন। বাড়ীর সকলে ঐ অবস্থায় ঐ সময়ে ঠাকুরকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুর্য্যোগে ঘর হ'তে বাহির হওয়া দুষ্কর, আপনি এই রাত্রিতে, এতদূর কি প্রকারে আসিলেন?" ঠাকুর তখন রাস্তার সমস্ত বিবরণ তাঁহাদিগকে বলিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিলেন এবং সেই রাত্রি তথায়ই অবস্থান করিয়া, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইলে, পরদিন প্রাতে চলিয়া আসিলেন।

নবীন * বাবুর সেবা- কার্য্য।

গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নবীন বাবুর স্ত্রী, বহুকালযাবৎ উন্মাদগ্রস্তা। তাহার উপর নানাপ্রকার রোগের পীড়নে, বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। অনেক সময়েই তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। নবীন বাবু নিজেই, প্রতিদিন অত্যন্ত যত্নের সহিত তাঁহাকে বাহ্য, প্রস্রাব, স্নান ও আহারাদি করাইয়া থাকেন। একটি দিনের জন্যও ঝি বা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না। ঠাকুর, উঁহার আন্তরিক দরদ ও অক্লান্ত সেবা বিষয়ে প্রশংসা করিয়া বলিলেন— **"আজকাল এ ভাবের সেবা প্রায় দেখা যায় না।"**

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

প্রত্যহ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে নবীন বাবুর বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের সমাগম হইতেছে। যে ভাবে তিনি স্ত্রীর আবদার রক্ষা করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে আদর যত্ন করিতেছেন, তাহার আর তুলনা নাই। আড়ম্বরশূন্য সদনুষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

---

* শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ— ইনি এক সময়ে ভারপ্রাপ্ত সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। চাকরি করিতে হইলে আপন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুকূলে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা বড়ই দুষ্কর বুঝিয়া, ইনি চাকরিটি পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। তৎকালে ইঁহার সুযশ ব্রাহ্মসমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর, ক্রমে ক্রমে নবীন বাবুর মতের ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই সময় হইতে ইনি যথার্থ বৈষ্ণব আচারে থাকিয়া, একটানা সাধন-ভজনে দিন রাত অতিবাহিত করিতেছেন। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাগুণ্ডি গ্রামে ইঁহার নিবাস।
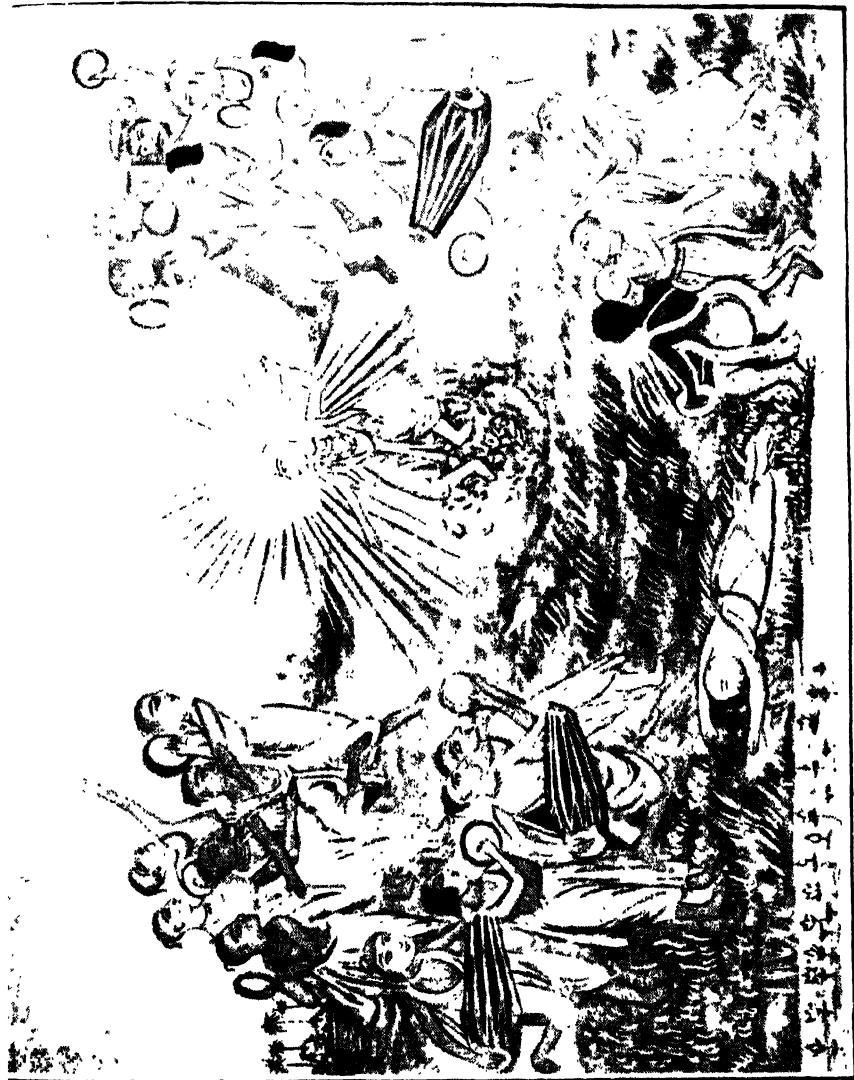
শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরাতন চিত্রপট।

ভাবাবেশে নৃত্য।

নিয়মিত আহ্নিক সমাপনান্তে, নির্জ্জন ও অবসর বুঝিয়া, ফুল চন্দন তুলসী লইয়া, প্রতিদিন তিনি ঠাকুরকে পূজা করিতে আসেন। ঠাকুরের সম্মুখে একটু সময় বসিয়াই, অশ্রুকম্পপুলকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং ঠাকুরের চরণে তুলসী চন্দনাদি পূজোপহার অর্পণ করিবার উদ্যোগমাত্রই— ঠাকুর **"তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন"** বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আমরা আসন হইতে উঠাইতে পারি না।

গুরুভ্রাতা বৃন্দাবন বাবু, একদিন সকালে, রাত্রিবাস কাপড়ে, কিছু খাবার আনিয়া, ঠাকুরকে দিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নবীন বাবু বলিলেন— 'ও কি! নোংরা কাপড়ে খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে যাচ্ছেন!' বৃন্দাবন বাবু একটু লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন বাবু ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— **"ডাক্তার বাবু তাঁর ভাব মত ত ঠিকই বলেছেন; কিন্তু তুমি তোমার ভাব মত কাজ কর্‌লে না কেন? তিনি ত তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছেন।"**

বৃন্দাবন বাবু বলিলেন— "কি জানি মশায়! আপনি যদি না খান!"

ঠাকুর বলিলেন— **"আমি না খেলেও, তুমি ছাড়্‌বে কেন? আমার গাল টিপে খাইয়ে দিবে।"**

ভক্তের সেবা— সাহসে ঠাকুরের দুঃখ।

বিদেশ হইতে সপরিবারে গুরুভ্রাতারা আসিয়া, আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দীক্ষাপ্রার্থী বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন। পঞ্চাশ, ষাট জন লোক সর্ব্বদাই আশ্রমে রহিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু এবং চন্দ্রমণি দিদি অকাতরে গোপনে খরচ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর মগ্নাবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ কান্দিয়া উঠিয়া বলিলেন— **"ওরা আমাকে তাড়ালে, এখানে আর থাক্‌তে দিলে না।"** কিছুক্ষণ পরে গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন— "কারা আপনাকে তাড়ালে?"

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

ঠাকুর বলিলেন— **"নবীন বাবু আর নেড়া।"**

ইহা শুনিয়া চন্দ্রমণি দিদি কান্দিয়া বলিলেন— "বাবা! আমরা কিসে আপনাকে তাড়ালাম?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তাড়ালে না ত কি! তোমরা যে রকম কর্‌ছ, আর কিছু দিন আমি এখানে থাক্‌লে, তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।"**

উঁহারা বলিলেন— "আমাদের কি বাবা! আপনার টাকা, আপনারই প্রয়োজনে লাগিতেছে। আমরা মাত্র উহা হাতে ক'রে দিয়ে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছি। এতেও আপনি বাধা দিবেন?" অতিরিক্ত সাহসে চন্দ্রমণি দিদি ও নবীন বাবুর ঋণগ্রস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টায় বাধা দিলেন।

ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর।

২৪শে — ২৭শে অগ্রহায়ণ।

একদিন একটি খুব গরীব গুরুভ্রাতা, ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইবার আকাঙ্খায়, মাত্র দুই তিন আনা পয়সা লইয়া, প্রাতে সাতটা হইতে বেলা প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত কলিকাতা সহর ঘুরিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার পছন্দ মত খাবার, দুই তিন পয়সার এক এক স্থানে খরিদ করিয়া, বেলা দু'টার সময় অনাহারে শ্রান্ত শরীরে শ্যামবাজারের বাসায় পঁহুছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা গ্রহণ করিবেন কি না সংশয়ে ও ত্রাসে, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি নীচে (রাস্তায়) সিঁড়ির নিকট পঁহুছিবামাত্রই, ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া, ছলছল চক্ষে ছুটিয়া, উপরে সিঁড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাঁদ কাঁদ স্বরে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া, গুরুভ্রাতাটিকে বলিলেন— **"ওহে! তুমি ও কি এনেছ? আন, শীঘ্র আন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।"** ঠাকুরের সস্নেহ আহ্বান শুনিয়া, গুরুভ্রাতাটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের হাতে খাবার দিয়াই পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও ছলছল চক্ষে, অতি আগ্রহের সহিত তাহা প্রায় সমস্তই খাইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে, উহা গুরুভ্রাতাটির হাতে দিয়া, খাদ্যের প্রশংসা করিতে করিতে এবং চোখ মুছিতে মুছিতে আসনে যাইয়া বসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত ঠাকুর কিছু আহার করেন না। অসময়ে কিছু খাবার আসিলে, ঠাকুর কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত আমাদের বিলাইয়া দেন। কিন্তু এই গুরুভ্রাতাটির অসাধারণ আগ্রহ ও অনুরাগ বুঝিয়াই, বোধ হয়, ঠাকুর নিয়ম ভুলিয়া গিয়া অসময়ে প্রায় সমস্ত খাদ্য নিজেই খাইলেন।

ডাক্তার হরকান্ত * বাবুর দীক্ষা।

২৮শে অগ্রহায়ণ।

কিছুদিন দীক্ষার খুব হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে। কাহারও দীক্ষা হইলেই, বড় দাদার কথা আমার মনে পড়ে। এ পর্য্যন্ত তাঁহার দীক্ষা না হওয়ায়, বড়ই মনঃকষ্টে আছি। এবার দাদা আসিলেই ঠাকুরের দয়া হইবে ভাবিয়া, দাদাকে পুনঃপুনঃ জেদ্ করিয়া আসিতে লিখিলাম। ঠাকুরের কৃপার উপর ভরসা থাকায়, অনুমতিরও অপেক্ষা করিলাম না। দাদা ফয়জাবাদ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর, দাদাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

---

* ডাক্তার হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর। খ্যাতনামা মিঃ কে, জি. গুপ্ত, ডাক্তার পি, কে, রায় প্রভৃতি ইঁহার সমপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। প্রথম বয়সে, কেশব বাবুর প্রথম উদ্যমের সময়, ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন, গোঁসাইয়ের সহিত ঐ সময় হইতেই আলাপ। বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সরকারী এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও সিভিল মেডিকেল অফিসার স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার চাকরির সময়, নানা তীর্থে, অনেক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদের কৃপায় ইঁহার সনাতন ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তৎপরে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 'পেন্‌সন' গ্রহণের পর, জীবনের শেষভাগে, বিষয়ের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, সাধন-ভজন লইয়া, পুরীধামে নিজ গুরুর সমাধিস্থানে বাস করিতেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, ঠাকুরের কৃপা, বিশেষভাবে ইনি প্রত্যক্ষ করেন। পুরীধামে সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া, ইনি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বপারের মনোরম দৃশ্য সকল দর্শন করিতেন। বহুদূরে থাকিয়াও গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, অনেক অলৌকিক ঘটনা ইঁহার প্রত্যক্ষ হইত। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে, ইনি মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক, শব বহন করিবার জন্য বিমান প্রস্তুত করাইলেন। দেহত্যাগের দিন প্রাতঃকালে, সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন,

২৮শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে, দাদার আকাঙ্খা মত, নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষাকালে বিশেষ কিছু অনুভব হইল কি না জিজ্ঞাসা করাতে, দাদা বলিলেন— "আমি প্রাণায়াম কর্‌তে পার্‌লাম না। কয়েকবার নাম স্মরণ কর্‌তেই, কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। মহাদেব এসে আমাকে জড়ায়ে ধরলেন। 'বেটারি' হতে তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায়, অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে আমার আনন্দ ছড়াইয়ে পড়্‌ল। গোঁসাই দুই হাতে আমার দুই বাহু ধরে ফেল্‌লেন। গোঁসাইকে 'মহাদেব' রূপে দেখ্‌লাম, ঐ সময়ে আমার যেন তন্দ্রাবেশ হ'ল; আর কিছুই জানি না।" দাদার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সাধন গ্রহণের পর দাদা, ঠাকুরের নিকটে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন— "দীক্ষা ত দিলেন— কোন্ প্রকার আসনে বসিয়া জপ করিতে হইবে, তাহা ত ঠাকুর বলিলেন না!" ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন, দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া, ক্রমে ক্রমে তিন প্রকার আসন করিয়া দেখাইয়া, পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। দাদা মনে মনে খুব আনন্দিত হইলেন। (দাদার নিজ লেখা হইতে উদ্ধৃত)।

হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন।

মধ্যাহ্নে, আহারান্তে, ঠাকুর, দাদার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। দাদার স্বপ্নবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত! ঠাকুর এবং গুরুভ্রাতারা অনেকে দু' একটি স্বপ্ন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুরও, দাদাকে বলিতে উৎসাহ দিলেন। দাদাও তাঁহার লেখা দুই তিনটি স্বপ্ন বলিতে লাগিলেন—

২৯শে অগ্রহায়ণ।

(১) "একদিন দেখ্‌লাম— ভয়ঙ্কর তরঙ্গযুক্ত, কাল জল পরিপূর্ণ, খরস্রোতা একটি প্রকাণ্ড নদীর মধ্যস্থলে, আপনি দাঁড়াইয়া আছেন; অনেক চেষ্টায় হাবুডুবু খাইয়া, দলে দলে লোক আপনার নিকট যেমনই যাইয়া পঁহুছিতেছে, আপনি তাহাদের প্রত্যেককে দু'হাতে ধরিয়া নদীতে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাদের শরীর অমনই সাদা কাঁচের মত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা সকলে একই আকৃতি লাভ করিয়া, অনায়াসে নদী পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে।"

(২) দাদা আবার বলিলেন— "আর একদিন দেখিলাম— একটি মেম ডিস্ হাতে খাবার লইয়া আমার নারায়ণকে ভোগ দিতে, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকার দেখিলাম কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"লক্ষ্মী এখন সাহেবদেরই ঘরে। তাই ওরূপ দেখেছেন। যেখানে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নাই--- লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এ দেশে দ্রৌপদীর উপর যে অত্যাচার ও অপমান হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত তার ষোলআনা প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।"**

"আজ ঠাকুর আমাকে বলিলেন "তোমার কর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেছে, তবে ইচ্ছা কর্‌লে আরও কিছুকাল তুমি থাক্‌তে পার অথবা যদি ইচ্ছা হয় এখনই আমার নিকটে আস্‌তে পার।" এতকাল ত আমি সাধ্যমত তোমাদেরই সেবা শুশ্রূষা করেছি, এখন ঠাকুর আমাকে দয়া ক'রে ডাক্‌ছেন, আমি আর থাক্‌তে পারি না। তোমরা সকলে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।" এই বলিয়া তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিতে, তুলসী চন্দন দিয়া, একটু বার্লি নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নমস্কার করিয়া, ঐ প্রসাদ পাইয়া, নিজ বিছানায় শয়ন করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সজ্ঞানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন।

মাধোদাস বাবাজীর সমাধিতে অন্তর্দ্ধান ও ঠাকুরের কথা।

অযোধ্যার নানকসাহী সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা মাধোদাস বাবাজীর, কি অবস্থায় দেহত্যাগ হইল, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায়, দাদা বলিলেন— "বাবাজী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন, এবং সারারাত্রি আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। যে রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে শিষ্যদিগকে বাহির দিক হইতে দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে, বাবাজী, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। একটু অবসর মত যাইব ভাবিয়া, ঐ দিন আমি গেলাম না। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম— বাবাজীর দেহটি সোণার হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া. মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন— "বাবা, তোহারা ভালা হোগা, আনন্দ কর্। আবি হাম্ চলে যাতে।" ইহা বলিয়া অঙ্গচ্ছটায় চারিদিক আলোকিত করিয়া, শূন্যমার্গে, অনন্ত আকাশে অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্ন দেখিয়াই আমি জাগিয়া উঠিলাম; বুক আমার দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল; বাবাজীর ঐ রূপটি, পুনঃপুনঃ মনে জাগিয়া, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি, একটু ফরসা হইতেই, বাবাজীর খবর জানিতে লোক পাঠাইলাম; কিছুক্ষণ পরেই লোক আসিয়া বলিল. প্রত্যূষে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বাবাজী আসন ত্যাগ না করায়, শিষ্যদের মনে সন্দেহ জন্মিল। পরে সকলে জানিলেন— ঐ রাত্রিতেই বাবাজী নিজ আসনে, সমাধির অবস্থায়, দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, বাবাজী তাঁর প্রিয়শিষ্য নারায়ণদাসকে, রাণুপালীতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। এখন ঐ নারায়ণদাসই, বাবাজীর গদিতে আছেন। নারায়ণদাসেরও খুব সুখ্যাতি শুনিতে পাই।"

২৯শে অগ্রহায়ণ।

মাধোদাস বাবাজীর কথা প্রসঙ্গে, এক সময়ে ঠাকুর বলিলেন— **"বাবাজী বড়ই দয়াল ছিলেন। আমাকে বড়ই কৃপা কর্‌তেন। আমাকে নিয়ে একই পাত্রে, তিনি আহার করেছিলেন। 'গ্রন্থসাহেব' তিনিই আমাকে পাঠ কর্‌তে বলেন। তাঁরই কথামত প্রতিদিন আমি তাহা পাঠ কর্‌ছি। নারায়ণদাস ঐ গদিতে থাকায় ভাল হয়েছে। নারায়ণদাসের প্রতি বাবাজীর অসাধারণ কৃপা ছিল।"**

সাধু নারায়ণদাসের অদ্ভুত জন্ম-বৃত্তান্ত।

মাধোদাস বাবাজীর কৃপায়, নারায়ণদাসের অলৌকিক জন্ম সংঘটিত হয়, তদ্বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। — বাবাজীর আশ্রম যখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যহ একটি বিধবা স্ত্রীলোক আসিয়া, দু'বেলা ঝাড়ু দিয়া যাইত। স্ত্রীলোকটির সংসারে আর কেহই ছিল না, বড়ই গরীব ছিল। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, শীতে, গ্রীষ্মে, অবাধে তাহার সেবা দেখিয়া, বাবাজী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা শীঘ্রই তোমার গর্ভ হইবে এবং একটি সাধু সুপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।" স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "বাবা! আমি যে বিধবা! এবং অতিশয় দরিদ্র! পুত্র হইলে আমার দশা কি হইবে?"

২৯শে অগ্রহায়ণ।

বাবাজী শুনিয়া বলিলেন— "সবই গুরুজীর ইচ্ছা! আমি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ত আর অন্যথা হইবার যো নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভালই হইবে। ছেলেটি পাঁচ বৎসরের হইলে, আমাকে দিও, আমি চেলা করিয়া রাখিব।" বাবাজীর কথামত বিধবাটির পুত্র হইলে, পাঁচ বৎসর পরে, ঐ ছেলেটিকে আনিয়া, মা, বাবাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। ছেলেটির তের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বাবাজী উঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। পরে সমস্ত তীর্থ-পর্য্যটনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় হইতে নারায়ণদাস, গুরুজীর আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, এতকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাবাজীর সহিত আর দেখা হয় নাই।

যখন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম, অবসর পাইলেই দাদার সঙ্গে রাণুপালীতে বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতাম। আশ্রমটি ঠিক যেন মুনি ঋষিদের তপোবন! ওখানে পঁহুছিবামাত্রই চিত্তটি প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ভজনের একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও গাম্ভীর্য্য, আশ্রমে উপস্থিত হওয়ামাত্রই অনুভূত হয়। শুনিয়াছি, বাবাজীর অসাধারণ ঐশ্বর্য্য প্রভাবেই, আশ্রমের ভিতর দিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত সত্বেও, রেলপথ করা বন্ধ হইয়াছিল। বাবাজীকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই, অসাধারণ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ছিলেন। ধীর, শান্ত, আনন্দময় বাবাজীর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণে চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

পৌষ।

ঠাকুরের পূজা ও আরতি— মহাভাব।

১লা পৌষ।

আজ গুরুভ্রাতা রামদয়াল বাবু ফুল, চন্দন, মালা, ধুনুচি, পঞ্চপ্রদীপাদি পূজোপকরণ ও আরতির সামগ্রী সকল লইয়া, বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ঐ সময়ে স্থির ভাবে আসনে বসিয়াছিলেন, রামদয়াল বাবুর অভিপ্রায় বুঝিয়াই, বোধ হয় চোখ বুজিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামদয়াল বাবু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন এবং করজোড়ে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। দরদর ধারে অশ্রুজল বর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদ ভাবে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের চরণ যুগলে অর্পণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে তুলসী চন্দনে সাজাইয়া, গলায় ও মস্তকে মালা পরাইয়া দিলেন।

ভাগ্যবান গুরুভ্রাতারাও ঐসময়ে চতুর্দ্দিক হইতে উল্লসিত প্রাণে, জয়-ধ্বনি করিতে করিতে, অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবু, পঞ্চপ্রদীপাদি দ্বারা যথারীতি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ করিলেন। পুনঃপুনঃ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, কাঁসর তালে তালে বাজিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতারা সকলে ভাব-বিহ্বল অন্তরে, নির্নিমেষ নয়নে, ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে কেহ 'জয় নৃসিংহ', 'জয় নৃসিংহ' বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কেহ বা 'জয় রাম', 'জয় রাম' বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুখে মল্লবেশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সজোরে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। কেহ 'ঐ কিরে', 'ঐ কিরে' বলিতে বলিতে, কম্পিত কলেবরে, ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, দাঁড়ান অবস্থায়ই, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন; আবার কেহ কেহ বা হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া 'ঐ দ্যাখ্', 'ঐ দ্যাখ্' বলিয়া, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করিয়াই, এক এক জনের এক এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল।

ঠাকুরকে এক এক জনে, এক এক প্রকার দেখিয়া, কেহ কম্পিত ও কেহ বা স্তম্ভিত হইলেন, আবার কেহ কেহ হুঙ্কার গর্জ্জন ও ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিতে করিতে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঞ্চারীভাবের মহাতরঙ্গে আজ প্রায় সকলেই চৈতন্যহারা হইলেন। ধন্য গুরুদেব! ধন্য গুরুদেব!!

এক ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকিয়া, ধীরে ধীরে সকলেই নিদ্রোত্থিতের ন্যায়, উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুরের বাম পাশে, নিজ আসনে দাঁড়াইয়া, গুরুভ্রাতাদের বিচিত্র ভাবের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া, পুলকিত ও বিস্মিত হইতে লাগিলাম। আজই ঠাকুরের প্রথম পূজা ও আরতি হইল। ধন্য গুরুপ্রাণ গুরুভ্রাতৃগণ! তোমাদের এই অসাধারণ গুরুপ্রেমের নিদর্শন, চিরকাল স্মৃতিতে রাখিয়া, আমার অবশিষ্ট জীবনও যেন ধন্য হইয়া যায়, এই আশীর্ব্বাদ করিও। মধ্যাহ্নে নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্যে শতাধিক লোকের ভোজন হইল। সারাদিন আজ অনেকে ভাবাবেশেই রহিলেন। সন্ধ্যাকীর্ত্তনে, আবার ভাবের প্রবল তরঙ্গে, মহা ঢলাঢলি ব্যাপার হইল। অধিক রাত্রিতে, আহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

"আসন নেড় না, ফোঁস কর্‌বে।"

গতকল্য, ঠাকুরের পূজা ও আরতিকালে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে সকল পত্র, পুষ্প, দূর্ব্বা, চন্দনাদির বর্ষণ হইয়াছিল, অনবসর হেতু, সে সকল, আসন হইতে তুলিয়া লইতে সুবিধা পাই নাই। মধ্যাহ্নে, শৌচে যাইবার সময়, কোন কোন দিন, ঠাকুর নিজ হইতেই, তাঁহার আসন রৌদ্রে দিয়া, পাতিয়া রাখিতে বলিয়া যান, আমিও সেইরূপ করি। আজ শৌচে যাইবার সময়ে, আসন অপরিষ্কার থাকিল, অথচ উহা তুলিতে বা ঝাড়িয়া রাখিতে বলিলেন না দেখিয়া, ভাবিলাম, বুঝি ঠাকুর বলিতে ভুলিয়া গেলেন। তাই আসনটি রৌদ্রে দিতে মনস্থ করিয়া, যেমন উহা গুটাইতে, একটু সম্মুখের দিকে টানিলাম, অমনই মনে হইল, যেন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের শরীরেও টান পড়িল, কারণ তিনি তন্মুহূর্ত্তেই পাইখানা হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন— **"ওহে! আসন নেড় না, থেমে যাও, থেমে যাও! ফোঁস কর্‌বে!"**

২রা পৌষ।

আমি শুনিয়াই একেবারে চমকিয়া গেলাম। আসনের উপরের অংশ ঝাড়িয়া, সরিয়া পড়িলাম। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে দাউজীর মন্দিরে ছিলেন, তখন ঠাকুরের আসন-ঘরে নিয়ত সাপ থাকিত জানি, গেণ্ডারিয়াতেও ঠাকুরের সাধন-কুটীরে, আসনের ধারে, সর্ব্বদা একটি জাত সাপ অবস্থান করে; জানি না ইহার ভিতরে কি রহস্য আছে। দু'টি পাকা দেওয়ালের অন্তরালে, পাইখানার ভিতরে থাকিয়া, আসনটি টানার সঙ্গে সঙ্গে, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ আমাকে বাধা দিলেন— ইহাতেও চমকিয়া গেলাম। ঠাকুর আসিলে পর, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কলিকাতা সহরে, তেতালার উপরে, আসনের নীচে সাপ কোথা হ'তে আসিল?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বাস্তুসাপ প্রায় সকল পুরানো বাড়ীতেই ত আছে, কলিকাতাই কি, আর অন্যত্রই বা কি? কিছুকালের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন ক'রে বস্‌লেই, নিকটবর্ত্তী বাস্তুসাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।"**

আমি বলিলাম— "আসনের নীচে কি সর্ব্বদাই সাপ থাকে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এ সব স্থানে সর্ব্বদা থাকবার সুবিধা পাবে কেন? আসনের নীচে থাকার সুযোগ না ঘট্‌লে, ঐ ঘরে অন্য যে কোনও স্থানে থাক্‌তে পারে। নিকটে নিকটে থাক্‌বারই ওদের চেষ্টা।"**

আমি— "আসন ত প্রায়ই রৌদ্রে দিতে হয়। কখন কি বিপদ ঘটে ভয় হয়!"

ঠাকুর— **"বিপদের আশঙ্কা কিছুই নাই। বিশেষ উপদ্রব না হ'লে, ওরা কোন অনিষ্টই করে না। তবে অকস্মাৎ আঘাত পেলে, ফোঁস্ কর্‌তে পারে।"**

আমি— "কখন আসনের নীচে সাপ থাক্‌বে তাহা কিরূপে বুঝ্‌ব?"

ঠাকুর— **"আসন কখনও নাড়া চাড়া কর্‌তে নাই। আমি যখন বল্‌ব, তখনই তুলে রৌদ্রে দিও— না হ'লে, শুধু উপর উপর পরিষ্কার ক'রে রেখো।"**

যোগজীবনের পত্নীর গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু-বিবরণ এবং তদীয় জননীর ভবিষ্যৎ।

শান্তিসুধার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইতেই, গেণ্ডারিয়া হইতে খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী কিছুদিন হয়, গর্ভনাশের ফলে, দারুণ জ্বর-বিকারে ভুগিতেছেন। গুরুভ্রাতা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, খুব যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। গেণ্ডারিয়াস্থ গুরুভ্রাতাভগিনীরা সকলেই উঁহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই, যোগজীবনকে ঢাকা যাইতে বলিলেন। ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, যোগজীবন কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তখন যোগজীবনকে ধীরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন— **"স্ত্রীর প্রতি যা একটুকু কর্ত্তব্য আছে, এ সময়ে যেয়ে শেষ ক'রে নে। আর তোকে স্ত্রী নিয়ে ঘর কর্‌তে হবে না। খুব শীঘ্রই বউমা দেহ রাখ্‌বেন। এবার তাঁর আর নিষ্কৃতি**

নাই। তা হ'লেও, যে ক'টা দিন আছেন, সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক রোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা যেয়ে এ সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কর্। আমি ও শীঘ্রই যাচ্ছি।"

আজন্ম উদাস প্রকৃতি যোগজীবন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হইবে না শুনিয়া, আনন্দে যেন লাফাইয়া উঠিলেন এবং অদ্যই রাত্রির গাড়ীতে গেণ্ডারিয়া রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলেন। অবসর মত, গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "যোগজীবনের স্ত্রীর পুত্র, গর্ভেই নষ্ট হইল কেন? রোগ কি মারাত্মক?"

ঠাকুর বলিলেন— **"একজন উন্নত অবস্থার যোগী, কর্ম্মবিপাকে প'ড়ে, একটি গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেন। তাতে অভিশাপ হ'ল, সাতবার গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ কর্তে হবে তাই জীবিত অবস্থায় কখনও ইনি ভূমিষ্ঠ হন্ না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস ক'রে, পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্তে হবে, যে সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রসূতিও, ইঁহার ভূমিষ্ঠ হবার পরই, দেহত্যাগ করেন।"**

যোগজীবনের স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। আহা! প্রথম গর্ভের উপসর্গে ও অবসন্নতায় নিতান্ত রুগ্নদেহ লইয়া, প্রতিকূল আচরণে, উপযুক্ত দয়া এবং সদ্ব্যবহারের অভাবেও, ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, যে ভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে, অম্লান বদনে, সহিষ্ণুতা সহকারে, তিনি আশ্রমস্থ ও পরিবারস্থ সকলের সেব্য-কার্য্য চালাইয়াছেন, তাহা বড় সহজ নয় এবং সাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় নয়। এবার গেণ্ডারিয়াতে যাইয়া, আবার কি তাঁর সেই দীনভাবাপন্না, সরলতা মাখা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? ঠাকুরের কথায় মনে হইল, খুব শীঘ্রই তাঁহার দেহত্যাগ হইবে এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরেরও তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমরা সকলেই যোগজীবনের স্ত্রীর কখন কি সংবাদ আসে, এই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর, কখন গেণ্ডারিয়া চলিয়া যান, নিশ্চয় নাই।

আহার বিষয়ে অনুশাসন— জাতিবিচার।

অপরাহ্নে, তিনটার পর উনন ধরাইয়া, রান্না এবং আহার শেষ করিতে, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ সময়ে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিতে পাই না। এজন্য আজ সহজে আহারের ব্যাপার চুকাইব মনে করিয়া, সরকারী পাকের পরেই, সেই জ্বলন্ত উননে ভাতে-সিদ্ধ-ভাত রান্না করিলাম। পরে ঐ ঘরের এক কোণে উহা রাখিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। "নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পবিত্র ভাবে, স্বপাক আহার করিতে হইবে," আমার আহার বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম। মতলবে ঠেকিয়া, মনকে এই প্রকার বুঝাইয়া, সাড়ে তিনটার পরই আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে প্রস্তুত হইয়া, সম্মুখে অন্ন লইয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে একটি কায়স্থ গুরুভগ্নী, পীড়িতা শান্তিসুধার পথ্য প্রস্তুত করিতে, রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই আমার মাথা

৩রা পৌষ।

গরম হইয়া গেল। তাঁহাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলাম— "আমি নির্জ্জনে আহার করি, তুমি তা জান না? তুমি ঘরে প্রবেশ কর্‌লে! আজ আমার অন্ন নষ্ট হইল। আজ আমি আর আহার করব না।" এ বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। গুরুভগ্নীটি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঠিক সেই সময়েই খুব উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, **"কি হয়েছে?"**

আমি বলিলাম— "আমি আহার করতে বসেছি, শূদ্রা একটি গুরুভগিনী সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন।"

ঠাকুর বলিলেন,— **"আচ্ছা, যাও, সেই অন্নই যেয়ে খেয়ে নেও।"**

ঐ সময়ে ঠাকুর, আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আহারান্তে, ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসামাত্রই, ঠাকুর আমাকে বলিতে লাগিলেন— **"মেজাজটি একটু ঠাণ্ডা রেখে চল্‌তে চেষ্টা ক'রো। মেজাজ উত্তপ্ত হ'লে, সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যাবে। আহারের সময়ে, কায়স্থ ঘরে প্রবেশ কর্‌লেই, সমস্ত খাবার নষ্ট হ'য়ে যাবে, এ তোমাকে কে বলেছে? আর কায়স্থ ব্রাহ্মণ বুঝাও বড় সহজ নয়। শূদ্র কায়স্থের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। যাঁরা সত্ত্বগুণী তাঁরাই ব্রাহ্মণ। রজস্তমোগুণীদের স্পর্শেই আহার্য্য দূষিত হয়। সত্ত্বগুণী কায়স্থদের প্রতি, তোমাদের যদি ঐ প্রকার ভাব হয়, তা হ'লে ঠিক হবে না। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়্‌বে। গুণ দ্বারাই জাতি বিচার, এসব বিচার ক'রে না চল্‌লে, মানুষ বড়ই ভ্রমে প'ড়ে যায়।"**

"অন্যের পাক করা অন্ন খাবে না, এই তোমার নিয়ম। সকলের আহার শেষ হ'য়ে গেলে, নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ে রান্না হ'লেই, নিবেদন ক'রে খেয়ে নিবে। পাক ক'রে রেখে দিয়ে, কিছুক্ষণ পরে আহার করা, ঠিক নয়। ঢেকে রাখ্‌লে মানুষের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু পক্ক অন্নে শুধু মানুষের দৃষ্টিই ত পড়ে না!-ভূত প্রেত অপদেবতাদির দৃষ্টি এবং কুকুর বিড়ালাদির স্পর্শও ত যখন তখনই হ'তে পারে। সুতরাং পাক্‌টি যেমনই হবে, অমনই নিবেদন ক'রে আহার ক'র্‌বে। সর্ব্বদা বিচার ক'রে না চল্‌লে, অনেক সময়ে গোলে পড়্‌তে হয়। অপরাধী হ'তে হয়।"

অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সঙ্কেত।

প্রশ্ন— প্রতি কার্য্যে বিচার কর্‌তে গেলে, কাজ কি আর করা যায়? বিচারের ত অন্ত নাই এমন অবস্থা কি হয় না, যে বিচার না কর্‌লেও ভাল মন্দ বুঝ্‌তে পারা যায়?

ঠাকুর বলিলেন—**"হাঁ, খুব হয়। আমাদের অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্তেই, প্রতিকার্য্য সম্বন্ধে, এটি ভাল এটি মন্দ, এই প্রকার শব্দ আপনা আপনি উঠ্‌ছে। যাঁরা নিয়ম মত, সর্ব্বদা প্রতি শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য রেখে নাম করেন, দমে দমে কুম্ভক করেন, তাঁদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরাই ঐ ধ্বনি শুন্‌তে পান। এরূপ অবস্থা লাভ হ'লে, তাঁদের আর বিচার কখনও কর্‌তে হয় না। তাঁদের আর কোন ভয় বা সংশয়ও থাকে না। কিন্তু যাঁদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁদের প্রতি কার্য্যে বিচার না কর্‌লে চল্‌বে কেন?"** এই সকল বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন।

বীর্য্যধারণাদি শারীরিক তপস্যার প্রয়োজনীয়তা।

আমি একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার-শুদ্ধি, দেহ-শুদ্ধি এবং বীর্য্যধারণ এ সমস্তই ত শারীরিক তপস্যা?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—"**তা বটে। কিন্তু এসব ঠিক না হ'লে ত সহজে ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়ই শরীর। সর্ব্বাগ্রে এই শরীরটিকে রক্ষা কর্‌তে হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি আহারে যে দেহের পুষ্টি, সে নিতান্তই অসার। বীর্য্যধারণেই যথার্থ দেহ রক্ষা হয়। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হ'লে, বীর্য্যধারণ হয় না। শরীর সুস্থ ও পবিত্র না হ'লে, সাধন কর্‌বে কি নিয়ে?**"

আমি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "পবিত্র আহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, বাক্য সংযমাদি ও বীর্য্যধারণের যে সকল নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, প্রাণপণে করিয়া যাইতেছি; কিন্তু বীর্য্যধারণ ত কিছুতেই হইতেছে না! কি করিলে স্বপ্নদোষের হাত হ'তে রক্ষা পাই, বলে দিন।"

ঠাকুর বলিলেন— "**দু'টি ঘণ্টা খুব স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো দেখি, কেমন স্বপ্নদোষ হয়।**"

নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।

জিজ্ঞাসা করিলাম— "যে সব নিয়ম দিয়েছেন, সে ভাবে চল্‌লে কতকালে সিদ্ধ হ'ব?"

ঠাকুর বলিলেন— "**সিদ্ধি কি? কতগুলি শক্তি লাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর? ষড়ৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বিষয়। কখনও ওতে আসক্তি রেখো না। যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সাধন ভজন ও চেষ্টা কর্‌ছ, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য ঐ রূপটি কর্‌লে, একটি বছরেই ঢের ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত কর্‌তে পার। মাত্র একটি বৎসর বীর্য্য ধারণ ক'রে, যদি সত্য- বাক্য, সত্য-চিন্তা ও সত্য-ব্যবহার কর্‌তে পার, অনেক ঐশ্বর্য্য শক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম কর্‌বে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জান্‌বে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাক্‌তে, সে অবস্থা কখনও লাভ হয় না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ল্লোভ ও অনাসক্ত হ'লেই হয়। এই অবস্থা হ'লেই প্রকৃত পক্ষে নামে রুচি জন্মে। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।**"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার চমক্ লাগিল, আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "অসৎ বিষয়ে লোভই ত ক্ষতিকর?"

লোভ সর্ব্বত্রই সমান ক্ষতিকর।

ঠাকুর বলিলেন— "**বিষয় সমস্তই অসৎ। লোভ যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, অনিষ্টকর জান্‌বে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে, তাঁর প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারে মিঠায়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে, তাতে লোভ করায়ও, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি। সামাজিক ইষ্টানিষ্টের কথা স্বতন্ত্র।**"

এই সময়ে মণি বাবু, অচিন্ত্য বাবু, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা রহস্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে ঠাকুরকে বলিলেন—"মশায়! ওসব আমাদের দ্বারা হবে না। ধর্ম্মলাভ হউক আর নাই হউক, পৈত্রিক সম্পত্তি (গুরুকৃপা) কিছু ত পাবই।"

ঠাকুর বলিলেন,— **"ধর্ম্মলাভ সকলেরই হবে, বঞ্চিত কেহই হবেন না। তবে দু'দিন আগে আর পরে। সকলেই যে, সকল নিয়ম প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে পার্‌বে, তা নয়। অন্ততঃ নিয়মগুলি প্রতিপালনের একটু ইচ্ছা যদি থাকে, তা হ'লেও যথেষ্ট।"**

একথা বলামাত্রেই, সকলে একেবারে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, " এযে বজ্র-আঁটুনির ফস্কা গেরো।"

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নোত্তর।

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি যা ব'লে দিয়েছেন, সেই মত যারা চলে, আর যারা সেই মত চলে না, এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কি?"

ঠাকুর উত্তরে বলিলেন,— **"উপদেশ মত যাঁরা চলেন, তাঁদের সঙ্গে যে একটা যোগ রয়েছে, এ তাঁরা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারেন, আর যাঁরা উপদেশ মত চলেন না, তাঁদের মাঝে কিছুদিন, ইহা চাপা প'ড়ে যায়।"**

দেবেন্দ্রবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন— "সাধনের সময়ে যাকে যা ব'লে দিয়েছেন, সেই রকম সে চল্‌তে না পার্‌লে, অথবা তার বিপরীত আচরণ কর্‌লে, তার কি হবে? আর এসব কারণে কাকেও ত্যাগ করা হয় কি না?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"কাহাকেও একেবারে ত্যাগ করা হয় না; এই জিনিস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নষ্ট হয় না। সময়ে সকলেরই সব ঠিক হ'য়ে যায়।"**

দেবেন্দ্র বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাঁহারা সাধন লইয়া গিয়াছেন, জীবনে আর কখনও দেখা হয় নাই, তাঁহাদিগের সকলকে আপনি চিনেন কি না?"

ঠাকুর বলিলেন,—**"সকলের সঙ্গেই অন্তরের একটা যোগ রয়েছে।"**

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন— "অন্তরের যোগের কথা বল্‌ছি না, বাহ্যিক তাঁদের চিনেন কি না?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"হাঁ, চিনি।"**

তখন দেবেন্দ্র বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন— "তবে, আপনি নূতন কেউ এলে, 'ইনি কোথা থেকে এলেন, ইনি কে,' ইত্যাদি বলেন কেন?"

ইহাতে ঠাকুর কোন উত্তর না দিয়া, কেবল একটু হাসিলেন। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন —'ইঁহাদের প্রত্যেকের খোঁজ রাখেন কি না?'

ঠাকুর— **"হাঁ।"**

দেবেন্দ্র বাবু— "তাঁহাদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আপনার জান্‌তে হয় কি?" (অর্থাৎ পূর্ব্বে ঋষি মুনিরা, যেমন কোন বিষয় জান্‌তে হ'লে, ধ্যানস্থ হ'য়ে জান্‌তেন, সেইরূপ কি না?)

ঠাকুর,— **"মনোযোগ দিয়ে জান্‌তে হয় না। প্রত্যেকের জীবনের ভাল মন্দ, যাহা কিছু বর্ত্তমানে ঘট্‌ছে, তাহা চোখে পড়ে।"**

দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠাকুর সাহেব-বাড়ীর দোকানের আয়নার কথা বলিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়, ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—"গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে না পারিলে কিরূপ হয়?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"গুরুর আজ্ঞা কি কেহ প্রতিপালন কর্‌তে পারে!"**

মনোরঞ্জন বাবু— "সামান্য সামান্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারে ত, যেমন মাংস না খাওয়া ইত্যাদি।"

ঠাকুর বলিলেন,— **"তাও পারে না।"** পরে একটু থামিয়া— **"যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি ত করেনই, যাঁর প্রতিপালন কর্‌বার ইচ্ছা আছে, দুর্ব্বলতা বশতঃ পারেন না, তিনিও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যদি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধেও চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন; ইহা নিশ্চয়।"**

লোভে হতাশ—উপদেশ

সকালবেলা সাধন করিতে করিতে, বিষম একটা জ্বালা প্রাণে আসিয়া পড়িল— মনে হইল, আজ ছয় বৎসর হইল দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ সময়টা যথাসাধ্য নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া, সাধন-ভজনও করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জীবনের উন্নতি কিছুই ত দেখিতেছি না। ছেলেবেলা হইতে যে সকল কু-অভ্যাস স্বভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার একটিও ত এতকালে বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না? এ সকল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্থির হইব কবে? আর ভগবদুপাসনাই বা করিব কবে? দিন ত এ সকল উৎপাত শান্তির নিমিত্ত লড়াই করিতে করিতেই শেষ হ'য়ে গেল। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপাগুণে, দুরন্ত কাম রিপুর উত্তেজনার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু লোভের ভয়ঙ্কর উদ্দীপনায় দিনরাত জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। ঠাকুরের আদেশ অনুসারে, দিবসান্তে একবেলা স্বপাক ভাতে-সিদ্ধ-ভাত মাত্র আহার করিতেছি, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতি প্রতিদিন ঠাকুর আবার আমাকেই পরিবেশন করিতে আদেশ করায়, বিষম লোভাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিতেছি। যে সকল সুস্বাদু সামগ্রী প্রত্যহ নাড়া চাড়া করিতেছি, এখন ভজন সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারই রসাস্বাদন কল্পনায়, সারাদিন জিহ্বা চুষিয়া কাটাইতেছি। সকলের অজ্ঞাতসারে, চুরি করিয়া ঐ সকল বস্তু খাইতে, সময়ে সময়ে প্রবল ইচ্ছা পর্য্যন্ত

৩ রা পৌষ।

হইতেছে; কখনও কখনও আবার এমনই জ্বালা হইতে থাকে যে, ঠাকুরের সঙ্গও ভাল লাগে না, মনে হয়, ঠাকুরের সঙ্গে থাকিলে, যদি এ সকল লোভের বস্তু সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করিয়া, জ্বলিয়া পুড়িয়াই মরিতে হয়, এমন সঙ্গে আর লাভ কি? ক্ষতিই ত হইতেছে, বরং তফাৎ হইয়া যাই। হায়! হায়!! ভগবানের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব প্রত্যাশায়, বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, শেষ কালে আমার এই দশা! এখন লোভের বশীভূত হইয়া চুরির প্রবৃত্তি!! দুর্ল্লভ ঠাকুরের সঙ্গলাভেও বিরক্তি!!!

প্রাণের জ্বালা অসহ্য বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—"আমি আর সহ্য করতে পারি না, চেষ্টা করতে আমি কোন ত্রুটি করছি কি না, তাহা ত আপনি দেখছেন; এখন আর কি করব?"

ঠাকুর বলিলেন- **"ওর জন্য তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? একেবারেই কি সব হয়! ক্রমে ক্রমে সবই হবে। পুনঃপুনঃ চেষ্টা ক'রে, অকৃতকার্য্য হ'লে, তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে, ব'সে ব'সে তাঁর নাম ক'রো। ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাতই কেটে যাবে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই বুঝ্‌লে, তাঁর উপর নির্ভর না ক'রে আর উপায় কি? মনটিকে খোলসা ক'রে ফেলে, নিজের দুরবস্থা পরিষ্কার বুঝে, সরলভাবে একবার তাঁর দিকে তাকায়ে যদি বল্‌তে পার, 'প্রভো! আমি আর পার্‌লাম না, আমাকে রক্ষা কর।' তিনি রক্ষা করবেন। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।"**

মনে মনে ভাবিলাম— "নিজের চেষ্টায় কখনও পারিব না ইহা যথার্থ বুঝিলে, আর অনুতাপ হইবে কেন? এখন ত বুঝি আমিই সমস্ত করিব, তবে সাহায্যও চাই।"

দীক্ষাস্থলে বিচিত্র ভাব।

ঠাকুরের শ্যামবাজারের বাসায় আসিবার পর বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্ত্রীপুরুষ এবং কলিকাতা নিবাসী অনেক ভদ্র মহিলারা আসিয়া ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। দু'পাঁচ দিন অন্তরই লোকের দীক্ষা হইতেছে। এই দীক্ষা সময়ে, যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছি; তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। একই সময়ে বহুলোকের দীক্ষাকালেও, এক এক জনের ভিতরে এক এক প্রকার দর্শন ও অনুভূতি, তাহাতে এক এক প্রকার ভাব ও উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও আবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। মহাপুরুষ ও পরলোকগত আত্মাদের, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আবির্ভাব হেতু, কেহ জ্ঞাত, কেহ বা অজ্ঞাত, বিবিধ প্রকার ভাষায়, আনন্দ উল্লাস পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, ক্লেশসূচক বিলাপ করিতে করিতে, কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি। ঠাকুর এই সকল পরলোকগত জীবদের কাহাকেও স্তবস্তুতি বা নমস্কার দ্বারা, কাহাকেও বা ভর্ৎসনা ও তাড়না দ্বারা বিদায় দিয়া থাকেন। এই সাধনে, প্রকৃতিভেদে কেহ কেহ উপদেশ ও দীক্ষা মাত্র, নাম

৪ ঠা পৌষ।

শ্রবণান্তে প্রাণায়াম করিয়া সহজ অবস্থায়ই অবস্থান করেন, দীক্ষাকালে বিশেষ কিছুই অনুভব করেন না। কেহ কেহ মন্ত্রলাভ করিয়া, দুই চারিবার প্রাণায়াম করিয়াই, ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ বা নামটি কাণে প্রবেশ করা মাত্রেই, একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। দুই তিন ঘণ্টাকাল বাহ্যজ্ঞানও থাকে না। অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামাদি আপনা আপনি চলিতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে মহা সাত্ত্বিক ভাবের বিকার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একই সময়ে দীক্ষাস্থলে বহুলোকের ভিতরে বিচিত্র ভাবের ও অবস্থার সমাবেশ দেখিয়া, দিন দিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি, কিসে যে কি হয়, কিছুই বুঝিতেছি না!

এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী-স্নান।

৪ঠা পৌষ, শুক্রবার, বেলা দশটার সময়ে বরিশাল, বানরীপাড়া ও ঢাকা জেলার কতকগুলি লোকের দীক্ষা হয়। কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রী প্রভৃতির দীক্ষাও এই তারিখে হইল। একটি প্রেতাত্মা, কুঞ্জ বাবুর শালী শ্রীমতী বসন্তকুমারীর, কলিকাতা আসিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ মানসে, তথায়ই উহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দীক্ষাকালে এই প্রেতের কান্নাকাটি, চীৎকার ও কাতরোক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কুঞ্জ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ মাত্র, চৈতন্যশূন্যা হইলেন, সারাদিন তিনি নেশাখোরের মত ভাবে ঢুলুঢুলু অবস্থায় রহিলেন। কুঞ্জবাবুর মা, দীক্ষান্তে, অবসর মত, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— " আমি যে আপনার নিকট মন্ত্র নিলাম, ইহা ত দেশে যাইয়া বলিতে পারিব না; কি বলিব?" সকলে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "গোঁসাই কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিবেন?"

৫—১৮ই পৌষ।

ঠাকুর বলিলেন— **"তোমরা এঁদের অবস্থা জান না। এঁদের খুব বড় সমাজ, সমাজে সম্মানও এঁদের খুব, এ সব কথা সেখানে ইনি বল্‌তে পার্‌বেন না।"**

তারপর কুঞ্জবাবুর মা'কে বলিতে লাগিলেন— **"আপনি বল্‌বেন যে, ত্রিবেণীতে স্নান ক'রে এসেছি, শাস্ত্রে ইহাকে ত্রিবেণী-স্নান বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, ইহাদের মিলন স্থান কুণ্ডলিনীকে ত্রিবেণী বলে। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী স্নান।"**

ঠাকুরের এই কথার পরই, কুঞ্জ বাবুর মা'কে, ঘটনাতে পড়িয়া, ত্রিবেণীতে যাইয়া স্নান করিয়া আসিতে হইল। কুঞ্জ বাবুর মা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আমি পূর্ব্বে কুলগুরুর নিকটে যে পূজা নিয়াছিলাম, তাহা কি ছাড়িয়া দিব?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা কেন? পূর্ব্বে যে পূজা নিয়েছিলেন, তাও কর্‌বেন।"**

কুলগুরু প্রদত্ত সাধনও করিতে হইবে কি না, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, অনেকেই অনেক দিন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

ঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন— **"কোনও প্রয়োজন নাই, এই সাধন কর্‌লেই হবে।"**

কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন— **"ইচ্ছা হ'লে করবে।"**

আবার এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন— **"হাঁ, তাও করবে, ইচ্ছা ক'রে ওসব কিছু ছাড়তে নাই।"**

অবস্থাভেদে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে এ প্রকার ব্যবস্থা, না অন্য কোনও কারণে আদেশের এরূপ পরিবর্ত্তন, জানি না।

দীক্ষার বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ।

দীক্ষা গ্রহণের পরে, গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বাবু, ঠাকুরকে একখানা মলিদা দিলেন। ঠাকুর উহা একটি শীতবস্ত্রশূন্য কাঙালকে দিয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই, বিশেষতঃ পরেশ বাবু, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাত্রিকালে গল্পচ্ছলে মণি বাবু ঠাকুরকে বলিলেন— একখানা বস্ত্র যদি জামাইকে ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, আর তাহা তিনি ব্যবহার না করিয়া অন্যকে দিয়া ফেলেন, তা হ'লে মনে বড় কষ্ট হয়!

ঠাকুর বলিলেন— **"দান একেবারে করতে হয়। ওখানি যদি তাঁর নিজস্ব হ'ল, তবে তিনি দিবেন না কেন? গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে, কোন দান প্রতিদান নাই, সে অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে বা অন্য অভিভাবক জ্ঞানে, কিংবা পথের অন্ধকে দানের ন্যায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হন। অতএব অন্যভাবে গুরুকে কেহ কিছু দিও না।"**

অন্য সময়ে, দীক্ষাকালে একটি গুরুভ্রাতা, ঠাকুরকে কয়েকটি টাকা দেওয়াতে, ঠাকুর তাহাকে বলিলেন— **"আমি সামান্য জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব,-আমার কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকে যে, আমি যাচ্ঞা করছি, তা হ'লে আমার ত্রুটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে, টাকা যিনি দেন ও নেন উভয়েই নরকগ্রস্থ হন।"**

দেব দেবীর অনুরোধ—পূজাটি লোপ না হয়।

এবার এখানে আসার পর, কিছুদিন হয়, দীক্ষাসময়ে ঠাকুর সকলকেই একটি নূতন উপদেশ দিতেছেন। দীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি বলেন— **"যার যেটি দেশগত, সমাজগত, বা কুলক্রমাগত রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি রয়েছে, যথাসাধ্য তা বজায় রেখে, এই সাধন পথে চলতে চেষ্টা করবে।"**

৫—১৮ই পৌষ।

এই উপদেশটি নূতন দেওয়া হইতেছে কেন, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিলেন— **"একদিন দেখলাম, হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটি, অগ্নিময় হ'য়ে গেছে। সেই অগ্নির ভিতর হ'তে কালী, দুর্গা, মহাদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীগণ বা'র হ'য়ে এসে বললেন, 'দেখ, আমাদের পূজা লোপ না হয় এই ক'রো!' আমি বললাম, 'কেন, আমার দ্বারা কি**

লোপ হ'চ্ছে? তাঁরা বল্‌লেন, 'তুমি যাদের সাধন দিচ্ছ, তারা যদি আমাদের অগ্রাহ্য করে, তা হ'লেই ক্রমে পূজাদি সব লোপ হ'য়ে আস্‌বে।' তদবধি দীক্ষার সময় ঐ উপদেশটি দেওয়া হ'চ্ছে।"

একটি গুরুভ্রাতা প্রশ্ন করিলেন— "বিষ্ণু, শিব, এঁদের আবার পূজা পাইতে এত আগ্রহ কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এঁরাও ত ত্রিগুণেরই মধ্যে।"**

প্রশ্ন— "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পূজায় কি ভগবানের পূজা হয় না?"

ঠাকুর— "হাঁ, খুব হয়। ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্‌লেই হয়। ভগবান, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে যেমন মায়িক সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হ'য়ে আছেন, সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদি ধামেও তাঁর ঐ প্রকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। ভগবানই এক এক রূপে ভক্তের নিকট লীলা কর্‌ছেন।"

মহাত্মা মণিবাবার দৃষ্টি শক্তি।

ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে দাদার নিকটে কয়েকদিন ছিলেন, সেই সময়ে একদিন মণিবাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মণিবাবা ঠাকুরকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপ্ কৃপা কর্‌কে হামারা আসন পর্ রহিয়ে, হাম আভি দেহ ছোড়্ দেতে।" ঠাকুর এই মহাত্মার সহিত দাদাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়ছিলেন। দাদা দু'দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া, চাক্‌রি স্থলে চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি মণিবাবাকে দর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন— "গোঁসাইয়ের আদেশ মত, মণিবাবার দর্শনে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বেও কখন কখন মণিবাবার নিকটে আমি যাইতাম; তিনি আর দশটি লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার প্রতিও প্রায় সেইরূপই করিতেন। কিন্তু এবার আমি বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই, বাবাজী আমাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং খুব উল্লসিত ভাবে দুই হাত বিস্তার করিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন— 'আহা হা ! বহুত্ জনম্ জনম্ তপস্যা কর্‌কে, আভি সদ্‌গুরুকা কৃপা লাভ কিয়া হ্যায়। সব পূরণ হো গিয়া, ধন্য হো গিয়া! ধন্য হো গিয়া!! এই বলিয়া তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া, নিজের আসনের সম্মুখে লইয়া বসাইলেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। গোঁসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষা গ্রহণ বিবরণ, বাবাজীর জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তাঁর এই দৃষ্টি শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বাবজীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল।"

৫—১৮ই পৌষ

চরণামৃত গ্রহণে প্রেতাত্মার উদ্ধার।

অত্যন্ত দুষ্কার্য্যকারী ব্যক্তিদিগের আত্মা, পরলোকে অবস্থানকালে, দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া, শান্তির জন্য কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যায় না। কেহ গয়াতে পিণ্ডলাভ আকাঙ্খায়, বংশধরদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে, কেহ বা মহদাশ্রয় লাভ করিলে

সমস্ত ক্লেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের নিকট, সুবিধা পাইলেই ছুটাছুটি করে, আবার কোন কোন আত্মা সদ্‌গুরুর কৃপার একটু ছিটা ফোঁটা লাভ হইলেই একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে নিশ্চয় করিয়া, তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি!

৫—১৮ই পৌষ।

গভীর রাত্রিতে, কয়েকটি ভক্ত গুরুভ্রাতার নিকটে, প্রেতাত্মাদের কথা প্রসঙ্গে, ঠাকুর বলিলেন— **"আজ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। যমুনাতীরে কয়েকটি প্রেতাত্মা আমাকে খুব কাতর ভাবে বল্‌লে, 'শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় আমাদের ক্লেশ হ'চ্ছে, আমাদের এই ক্লেশ হ'তে দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করুন। আমি বল্‌লাম, 'আমি কিছুই জানি না। আমার গুরুদেবের হুকুম বিনা কিছুই আমার কর্‌বার উপায় নাই।' তারা বল্‌লে, 'আপনি যমুনায় স্নান করুন।' পরে আমি যমুনায় স্নান ক'রে উঠ্‌লাম, ভিজা গায়ের জল, বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রেতেরা খুব আগ্রহ ক'রে উহা চেটে খেতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌লাম তাদের শরীর জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে গেল, এবং দিব্যরথ এসে, তাদের নিয়ে গেল।"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া, কয়েকটি গুরুভ্রাতা ভাবিলেন, চরণামৃত গ্রহণ করিয়া প্রেতাত্মারা যদি উদ্ধার হইল, তবে আমরাও একবার উহা খাইয়া রাখি না কেন? পরদিন সকালে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, ঠাকুরের শৌচান্তে, জোর করিয়া চরণামৃত লইয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরিষ্কার কলের জলের চরণামৃত, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি যাঁহারা পান করিলেন, সকলেই পবিত্র মনোমোহন এক প্রকার সদ্‌গন্ধ পাইয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর গন্ধ বস্তু কিছু ব্যবহার করেন না, ইহা আমরা জানি।

পাগলী ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের জন্মবিবরণাদি শ্রবণ।

শ্যামবাজারে আসিয়া অবধি, আশ্রমস্থ লোকের আহারাদির ব্যবস্থা, অতিথি অভ্যাগতের আদর, অভ্যর্থনা এবং নবাগত দীক্ষাপ্রার্থী স্ত্রীপুরুষের থাকার বন্দোবস্ত, ধীর প্রকৃতি কার্য্যদক্ষ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপর বিশেষভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় এবং ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও, এ সকল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। চন্দ্রমণি দিদি, অনার মা, সারদা পিসী এবং আগন্তুক গুরুভগ্নীদের দ্বারা, এত কাল সুচারুরূপে, পাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। পরে পাগলী ঠাকুরমা আসা অবধি, সমস্ত উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই, প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকিলেন। গুরুভগ্নীদের রান্না কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া, বলিলেন—"আরে, একি? তোরা এখানে কেন? গোঁসাই বাড়ীর রান্নাঘরে শূদ্র! তোরা ত এঁটো মুক্ত কর্‌বি, আর বাসন মল্‌বি। যতদিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দিব, রান্না আমিই কর্‌ব। তোরা এ ঘর থেকে বের হ।" ঠাকুরমা এই বলিয়া, উঁহাদের কুট্‌না, বাট্‌না সমস্ত ফেলিয়া দিলেন এবং নিজহাতে খোসা সহিতে তরকারি কুটিয়া, আধসিদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ডালও ঐ প্রকারে

৫—১৮ই পৌষ।

রাঁধিলেন, আধোয়া চাউল ফুটাইয়া পিণ্ড করিলেন। প্রথম দিন সকলেই ঠাকুরমার রান্না দেখিয়া, খুব আমোদ করিয়া খাইলেন। ঠাকুরমাও প্রত্যহই ঐ প্রকার রান্না করিতে লাগিলেন। একদিন চন্দ্রমণি দিদি, ডাল চাউল, ধুইয়া রাখিতেই, ঠাকুরমা তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগের জিনিস শূদ্রু হ'য়ে ছুঁলি, বড়ই আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি?"— ঠাকুরমার রান্না খেয়ে টেকা, সকলের শক্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকলেরই পাঁতে ডাল, ভাত, তরকারি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ঠাকুরমা ছুটিয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, "ওরে বিজয়! বল্‌ দেখিনি, কেমন রেন্ধেছি?" ঠাকুর অমনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"**কেন মা! তাকি আর জিজ্ঞাসা করতে হয়! ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ। ওঁরা সব কেমন খাচ্ছেন?**" ঠাকুরমা বলিলেন, 'ওরা খাবে কি! ওদের কি ভক্তি আছে! আমরা হ'লেম শান্তিপুরে গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খান, বুঝ্‌লে! আমরা বাপু তেল ঘিও দিই না, আর বাট্‌না কুট্‌নারও ধার ধারি না—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ ক'রে দি, দ্যাখ্‌ দেখিনি তারই কত স্বাদ?"

ঠাকুর— "**জগন্নাথের রান্না সাদা জলেই ত হয়।**"

গুরুভ্রাতার তামাসা করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরমা! হেলায় শ্রদ্ধায় কোন প্রকারে এই প্রসাদ, এক গ্রাস তল করতে পারলেই যে হ'লো। একেবারে নিশ্চিন্তি। সারাদিনে আর কিছু না খেলেও চলে।' ইহা শুনিয়া ঠাকুরমা খুব খুসি। সময় সময় কিন্তু ঠাকুরমার রান্না খুব সুস্বাদুও হয়। কেন যে হয় বুঝি না!

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জিনিস পত্রও প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরমা একদিনের জিনিস অন্যদিনের জন্য রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ফেলেন। প্রচুর পরিমাণে রান্না করিয়া, রাস্তা হইতে কাঙ্গাল দুঃখীদের ডাকিয়া আনিয়া, খাওয়াইতেছেন। অধিক রান্না করিতে নিষেধ করিলে, ঠাকুরমা ধমক্‌ দিয়া বলেন, "তোরা মানুষ না পশু? মানুষকে না দিয়া কি কখন মানুষে খায়; সে ত শিয়াল কুকুরেই করে? ভগবান একমুঠো দয়া ক'রে দিলে, তা হ'তে একগ্রাসও অন্যকে দিতে হয়। ভগবানের দান, যার প্রয়োজন তারই জন্য, সকলেরই জন্য, পুঁজি করিবার জন্য নয়।" এক বেলার কোন জিনিস অন্য বেলা থাকে না দেখিয়া, বৃন্দাবন বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ঠাকুরমাকে একটু হিসাব করিয়া চলিতে বলায়, ঠাকুরমা তাঁকে বলিলেন— "গিন্নি! আমরা গোঁসাই বাড়ীর বউ, আজকের যা এলো তা হ'লো, কালকে গোবিন্দ আছেন।"

ঠাকুরের জন্য মাত্র এক সের দুধ রোজকরা আছে; ঠাকুরমা ঐ দুধ আহারের সময় সকলকে একহাতা করিয়া বিলাইয়া দেন। ঠাকুরকেও ভাগ মত এক হাতাই দেন। সকলে এজন্য বিরক্ত, কিন্তু ঠাকুরমা কারও কথা গ্রাহ্য করেন না। একটি গুরুভগ্নী, এক সের দুধ গোপনে পৃথক রাখিয়া, ঠাকুরকে দিতেছেন।

একদিন ঝি, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া বাড়ী যাইতে ব্যস্ত। ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

— "এত শীঘ্র যেতে ব্যস্ত হচ্ছিস্ যে?" ঝি বলিল, "মা! আমার ছেলেটির অসুখ, আজ তাকে একটু দুধ মাত্র খেতে দেব। তারই জোগাড়ে যাব।"

ঠাকুরমা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া।" এই বলিয়া, গুরুভগ্নীটির ঘর হইতে ঠাকুরের দুধ আনিয়া ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নিয়ে যা। ছেলে রোগা, কোথায় আবার তালাস কর্‌তে যাবি, যদি না পা'স্।" এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুরমার সঙ্গে কোন কোন গুরুভ্রাতাভগ্নীদের ঝগ্‌ড়া হইল। সকলে ঠাকুরমাকে বলিলেন, "ঠাকুরমা! দুধ একটু না খেলে তোমার ছেলের যে অসুখ হয়, কষ্ট হয়, জান?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "যাঃ, সব জানি। অসুখ হ'লে ঝিয়ের ছেলের কি কষ্ট হয় না? বিজয়ের তোরা দশজন আছিস্, দরকার হ'লে দশ দিকে ছুটাছুটি কর্‌বি। ঝিয়ের ছেলের জন্য কে আর কর্‌তে যাবি!" ঠাকুরমা খুব গালাগালি দিয়াও সকলকে জব্দ করিতে না পারিয়া, ছুটিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, "বিজয়! তোর সঙ্গে সর্ব্বদা থেকেও এদের এরূপ বুদ্ধি হ'লো কেন?" ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি ঠাকুরমাকে ঠাণ্ডা করিয়া সকলকে বলিলেন— **"মা'র প্রাণে যেরূপ দয়া, তার এক আনাও আমার নাই। ছেলেবেলা দেখেছি, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসায়ে প্রত্যহ খাওয়াতেন। আমাদের মতন আসন তারও ছিল। থালা, বাটি, গ্লাস, মা তাকে আমাদেরই মত কিনে দিয়েছিলেন। কোনও প্রকারে পৃথক মনে কর্‌তেন না। সে আমাদের সমবয়স্ক ছিল ব'লে ধুতি, চাদর, জামা, জুতা, মা যেমন আমাদের দিতেন, তাকেও দিতেন।"**

আমাদের ভাণ্ডারঘরে, ঠাকুরের সেবা হয়। ঠাকুরের আহারান্তে, আমরা সকলে প্রসাদ বাটিয়া লই। ঝি পরে অবসরমত শূন্য বাসনগুলি লইয়া যায়। ঠাকুরমা একদিন হঠাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া, বাসন পড়িয়া আছে দেখিয়া, একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; ঠাকুরকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিজয়! একি অনাচার! এঁটো বাসন ভাঁড়ারে! ইন্দুর, বিড়াল, কত কি এ ঘরে আসে; এ ঘরের জিনিস কি ক'রে ঠাকুরের ভোগে লাগ্‌বে?" এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিয়া অমনই ঠাকুরমার স্বরের উপর, আরও স্বর চড়াইয়া বলিলেন— **"রাম! রাম! এক্ষণই ওসব ফেলে দাও। ওসব কি আর রাখ্‌তে আছে? রাম! রাম! এঁটোটা যদি সঙ্গে সঙ্গে কেহ তুলে নিতে না পার, তবে কাল থেকে আমিই নিব।** ঠাকুরমা অমনই সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন— **"মা পঞ্চমে চড়্‌লে, আমাকেও সেই তালে সপ্তমে চড়্‌তে হয়, না হ'লে কি রক্ষা আছে? মা'কে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা না কর্‌লে, মা আজ একটা কাণ্ডই ক'রে ফেল্‌তেন। পাগলকে, অনেক সময়ে, তার বাগে চ'লে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হয়, না হ'লে তার অনিষ্ট করা হয়।"**

ভোরকীর্ত্তন শেষ হইলেই গঙ্গাস্নানে, যাওয়ার সময়ে, ঠাকুরমা একবার ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঠাকুর নিবিষ্ট ভাবে চোখ বুজিয়া থাকিলেও, ঠাকুরমা, ঠাকুরকে খুব স্নেহের

সহিত ডাকিয়া বলেন; "ওরে বিজয়— নে পের্‌ণাম কর্। এখন উঠ্ না; ভোর হয়েছে দেখ্‌চিস্ না?" ঠাকুর অমনই ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া, পদধূলি মাথায় নেন্ এবং কচি খোকাটির মত মা'র পানে একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া যায়। উহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকি। একদিন বৃন্দাবন বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মশায়, আপনি ঠাকুরমার দিকে ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন? আপনার ওরকম চাউনি দেখে, আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন— **"মা যখন এসে দাঁড়ান, মা'র প্রতিলোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে আমি দেখ্‌তে পাই।"**

ঠাকুরমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল— "ঠাকুরমা! আমাদের ঠাকুরের জন্মকথা কিছু বলুন না? লোকের মুখে ত কত রকমই শুনি।" ঠাকুরমা বলিলেন— 'লোকের মুখে আর কি শুনিস্? লোকে তা কি জানে? সাধারণ লোকের জন্ম যে ভাবে হয়, ওর জন্ম ত আর সে ভাবে হয় নাই! তা বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌তে পারবি কেন? সে সময়ে ওর বাবা ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তেন; শান্তিপুর হ'তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কত ক'রে! — বুকেতে, হাতেতে, হাঁটুতে ছালা বেঁধে। ওরকম এখন কেউ করুক দেখিনি? তিনি জগন্নাথের দর্শন পেয়ে, যা প্রার্থনা কর্‌লেন, তাই হ'লো। ভক্তের আকাঙ্খা ত ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বিজয় যখন আমার পেটে ছিল, উদয়াস্ত সূর্য্যের প্রতিরশ্মিতে, আমি রাধাকৃষ্ণের দর্শন পেতাম।'

ঠাকুরমা কখন কখন আমাদিগকে পরিহাস করিয়া বলেন— 'যা, তোরা ত কচুবুনোর শিষ্য।' একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরমা, আপনি কি আর স্থান পেয়েছিলেন না? ছেলে হ'লো কচুবনে?' ঠাকুরমা বলিলেন— "আরে! তখন যে শীকারপুরের বাড়ী বরকন্দাজ এসে ঘেরাও কর্‌লে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল; ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, যাব কোথা? আমি গিয়ে বাড়ীর ধারে কচুবনে বস্‌লাম। কতক্ষণ পরে দেখি, বিজয় হয়েছে! প্রসব বেদনা ত হয় নাই, আগে বুঝ্‌ব কি ক'রে? তাই ত ওকে সকলে কচুবুনো বলে। আর ওর বাবাকে পাড়ার লোকে খড়িধোয়া গোঁসাই বল্‌ত।"

প্রশ্ন— 'কেন, তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই বল্‌ত কেন?' ঠাকুরমা বলিলেন— "আরে, তিনি যে ভারি আচারী ছিলেন, জানিস্? নিজে রান্না ক'রে হবিষ্যান্ন কর্‌তেন; রান্নার সময়ে প্রতিদিন প্রত্যেকখানা খড়ি জলে ধুয়ে নিতেন। এজন্য সকলে তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই ব'লে ডাক্‌ত। ওরূপ লোক কি আর এখন হয়? কত ভক্ত ছিলেন! তিনি যখন ভাগবত পাঠ কর্‌তেন, তিন চার ঘণ্টা জ্ঞান থাক্‌ত না, গায়ের সাদা পাতলা চাদরখানা ঘামের মত রক্তে ভিজে যেত, লাল হ'য়ে যেত!"

ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল— 'ঠাকুরমা, আপনি নাকি আঁতুড়ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাওয়াইয়া ছিলেন?' ঠাকুরমা বলিলেন— "রাম, রাম! তোরা কি বল্ দেখিনি! তা কি আবার

কেউ করে? ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল। মুসব্বর যে লাগাতে হয়, তা ত আমি জানি না, আমি মুসব্বর ভেবে, দু' আনা আন্দাজ আফিং গুলে খাইয়েছিলাম; কালো হ'য়ে গিয়েছিল। তাতে আর ছেলের কি হ'ল? ভগবান্‌ই দয়া ক'রে রক্ষা কর্‌লেন।"

একদিন ঠাকুরমা, ঠাকুরকে বলিলেন— "বিজয়, তুই আর সব তীর্থে যাস্‌, শ্রীক্ষেত্রে যাস্‌ না।" ঠাকুরমার একথা বলার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন— 'ও যে শ্রীক্ষেত্র হ'তেই এসেছে; শ্রীক্ষেত্রে একবার গেলে আর কি ওকে আন্‌তে পার্‌বি? ওর স্থানে একবার ও গেলে, আর ফিরে আস্‌বে না, সেইখানেই থেকে যাবে।"

ঠাকুরমা, ঠাকুরের সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা অনেক সময়ে বলেন, যে সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝি না। মাথা গরম অবস্থায় ঠাকুরমা যা তা বলেন বলিয়াই মনে হয়। এ সকল কথা যথার্থ কি না, জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেছি, অবসর মত ঠাকুরকে এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রসাদ কাকে বলে, কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্ত।

৫—১৮ই পৌষ। প্রতিদিন প্রসাদ লইয়া আমাদের মধ্যে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ঝগড়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে।

ঠাকুর ইহা জানিয়া বলিলেন— **"ভুক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ বলে না। উহা উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রসন্ন ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ ভাবেতে হয়। কৃপাই প্রসাদ, দয়াই প্রসাদ। গুরু যে সকল নিয়ম ক'রে দেন, তা ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্‌লেই, গুরুর যথার্থ প্রসাদ পাওয়া যায়।"**

কোন ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া, গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জ্ঞাত করায়, ঠাকুর বলিলেন— **"যাঁরা অন্তর্দর্শী, তাঁরা বাইরের কার্য্যাকার্য্যের একটা মূল্যই দেন না। তাঁরা অন্তরের ভাবই দেখেন। কার কোন্ কার্য্যে উপকার হয়, তাও বুঝা বড় কঠিন। অনেক রোগী আছে, কুপথ্য ক'রে উৎকট রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ করে। সে সমস্ত কার্য্যকে সংসারের লোকে নিতান্ত জঘন্য মনে করে, হয় ত তা অনুষ্ঠান ক'রে কারও জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয়। কিসে কি হয়, তা বুঝা সহজ নয়। যিনি যা করুন না কেন, পরিণামে কল্যাণই হয়। নিজের কর্ত্তব্যে স্থির থেকে, অন্যের কার্য্য দেখে যেতে হয় মাত্র। তা হ'লেই রক্ষা। লোকের দোষ গুণের আলোচনাতে অনিষ্টই হয়।"**

ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন— **"কারও অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে, যদি হঠাৎ একটা অন্যায় কার্য্য হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সেজন্য অপরাধী হ'তে হয় না। জেনে শুনে অন্যায় কার্য্য কর্‌লেই অপরাধ। ভাল কর্‌তে গিয়ে, যদি একটা অনিষ্টও ক'রে ফেলে, তাতে অপরাধ হয় না।"**

রাসলীলা ও গুরুশিষ্যসম্বন্ধ।

৫ই—১৮ই পৌষ। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার প্রতি সঙ্কোচ ভাব যায় না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— (পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত) **"নিজেকে যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও সেইরূপ মনে কর্‌বেন। নন্দ ও যশোদা, গোপালকে যেরূপ দেখ্‌তেন, আমাকে সেই ভাবে দেখ্‌বেন।"**

এই কথার পর, ঠাকুর একটু থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন— **"শ্রীমতীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখালে তিনি গর্ব্বিতা হন, ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন কর্‌লেন। পরে সখিগণ ও শ্রীমতী একত্র হ'য়ে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা কর্‌লেন। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখে, আনন্দে বিহ্বল হলেন, শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের বামে সখিগণকে দেখে আনন্দিতা হলেন। গুরুশিষ্যসম্বন্ধও এই প্রকার। গুরু, শিষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌লে ভগবান্, গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু শিষ্য একত্র হ'য়ে ক্রন্দন কর্‌লে, ভগবান প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করেন। তখন শিষ্য, গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন; গুরুও, শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন।"**

ভোরকীর্ত্তন— শিষ্যপদে লুটালুটি।

৫ই—১৮ই পৌষ। শেষ রাত্রে, প্রায় চারিটার সময়ে, নিত্যই, ঠাকুরের আসনের সম্মুখে ধূপ ধুনা চন্দন গুগ্‌গুলাদি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ঘরটি সুগন্ধি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর, করতাল বাজাইয়া—

"হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হেরিব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপিকার নূপুর,
গোপীর রাঙ্গা পায়ে রুণু ঝুনু বাজিব গো।
তোরা সব ব্রজবাসী পূরাও এ অভিলাষী
আমি নিতই নিতই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো।"

গাইতে গাইতে অতি মধুর স্বরে **'হরি ওঁ' 'হরি ওঁ'** বলিতে থাকেন, এবং কান্দিতে কান্দিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

ঐ সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য বাবু ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিতে থাকেন—

"কানাই! এ কি ভাই, র'লি প্রভাতে অচৈতন্য?
উঠ্‌ল ভানু ও নীলতনু, যায় না ধেনু কানু ভিন্ন।
অঞ্জন আঁখিযুগলে, গুঞ্জাহার পরবে গলে,

কদম্বমঞ্জরী দিয়ে সাজাও যুগল কর্ণ।
পর ধড়া মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া রূপলাবণ্য।
একদিন বলে রাখালগণে বিষভোজনে জীবনশূন্য;
তুই যাই ছিলি, জীবন দিলি, তোর তুলনা নাই আর অন্য।"

কখনও বা— "শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন্।
ওলো সখি, কহ দেখি ইহার কি বিবরণ।
শ্যাম চঞ্চল নয়নে চায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
কে বুঝিবে অভিপ্রায়, ইহার কেমন।
সরল বাঁশের অংশ, বংশীকুল-অবতংস,
কুল ধর্ম্ম ক'রে ধ্বংস, সে করে মন হরণ।
শ্যামা অতনু সতনু করে, সতনুর মন হরে,
শিখী পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনোহরণ।"

ঠাকুর কোন কোন দিন—

"আমার মন পাগ্লারে, হর্দমে গুরুজীর নাম লইও।
আরে দমে দমে লইও নাম, কামাই নাহি দিও।

ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে 'গুরু ওঁ', 'গুরু ওঁ' বলিতে থাকেন এবং তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়। তখন ঢাকা ও বানরীপাড়ার শশীবাবু প্রভৃতি খোলকরতাল সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন—

"আমি গৌরপ্রেমে হয়েছি পাগল (ঔষধে আর মানে না)
চল্ সজনী যাইগো নদীয়ায়।
নগরেতে হেঁটে যেতে পাড়ার লোকে মন্দ কয়,
(আমি) পরের মন্দ পুষ্প চন্দন অলঙ্কার প'রেছি গায়।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষ উজান ধায়,
(ওলো) গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হ'য়ে, দংশিয়াছে আমার গায়।।"

ভাববিহ্বল অন্তরে মহা-উৎসাহের সহিত উঁহারা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট গুরুভ্রাতারা সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া আপন আপন আসনে নিস্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন। কখনও কখনও ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া বিস্তৃত ঘরের মেজেতে গড়াইতে গড়াইতে শিষ্যদের পদতলে যাইয়া লুটাইয়া থাকেন, এবং শিষ্যদের চরণ মস্তকে বারংবার জড়াইয়া ধরিয়া

কান্দিতে কান্দিতে— **"আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"** বলিতে বলিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন।

আহা! তখন ঠাকুরের জটামণ্ডিত মস্তক, নগণ্য শিষ্যপদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া, প্রাণে যে কি অবস্থা হয়, বলিতে পারি না। ধন্য দয়াল ঠাকুর। আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, দুর্বিনীত, দাম্ভিক প্রকৃতি নিজ আশ্রিত জনের চরণতলে কাতর হইয়া লুটাপুটি করে, এ জগতে এমন আর কে আছে?

পাপের মূল কিসে যায়? ধর্ম্ম কি?

৫ই—১৮ই পৌষ। আজ একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "পাপের মূল কি চেষ্টা দ্বারা নষ্ট করা যায় না?"

ঠাকুর বলিলেন— **"পাপের মূলচ্ছেদ মানুষে সহজে কর্‌তে পারে না; এ বিষয়ে মানুষের শক্তি একেবারে নাই বল্‌লেও হয়। প্রায়শ্চিত্ত, ব্রতনিয়মাদি দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, কুঞ্জরস্নানবৎ। অন্তরে সংস্কার অবস্থায় পাপ থেকে যায়, একটা তেমন কারণ পেলেই আবার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। একমাত্র ভগবানের দর্শন লাভ হ'লে, তাঁরই কৃপায়ই পাপের মূল নষ্ট হ'য়ে যায়।"**

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"

ইহা শুনিয়া বলিলাম— "তা হ'লে আর আমাদের কর্‌বার কি আছে? এম্‌নি পড়ে' থাকি, তাঁর কৃপা যদি কখনও হয় ত হবে।"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা বল্‌লে চল্‌বে কেন? যতদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা থাক্‌বে, কার্য্য না ক'রে কি নিস্তার আছে? কার্য্য কর্‌তেই হবে। নানাদিকে নানা প্রকার চেষ্টা ক'রেও, যখন মানুষ নিজেকে একেবারে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য ব'লে বুঝ্‌তে পারে, তখনই সে ঠিক স্থানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তা পরিষ্কার রূপে না বুঝা পর্য্যন্ত, সে মনে করে, চেষ্টা কর্‌লেই কৃতকার্য্য হ'তাম। সুতরাং ভগবানের শক্তির উপর যথার্থ নির্ভরটি হয় না। এজন্য পুনঃপুনঃ নিষ্ফল হ'লেও, অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টা কর্‌তে হয়, না হ'লে হয় না।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— "ধর্ম্ম লাভ কর্‌তে হ'লে, প্রথমে কি কি বিষয় চেষ্টা কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বলা ত যাচ্ছে কত, কিন্তু কর কই। ধর্ম্মার্থীদের প্রথমেই শৌচ, সত্য, ক্ষমা ও শান্তি এই চারিটি অভ্যাস কর্‌তে হয়।"**

প্রশ্ন— "শৌচ কি শরীরটি শুদ্ধ রাখা?"

ঠাকুর— **"হাঁ, তাই। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুধু ঋতুগামী হওয়া। আন্তরিক শৌচ 'সরলতা'। যথার্থ সরল হ'লেই অন্তর শুদ্ধ হয়।**

'সত্য'— সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা। অসত্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।

'ক্ষমা'— মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা কারও হ'তেই উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখ্‌তে হয়।

'শান্তি'— চিত্তের অবস্থা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, এক প্রকার রাখা। কোন কিছুতে উপেক্ষা বা অপেক্ষা না রাখা। এ সব নিয়ম ধ'রে খুব চেষ্টা কর না।"

আমি এই সকল শুনিয়া ভাবিলাম, "মন্দ নয়! সিদ্ধ হইলে যে সকল অবস্থা লাভ হয় বলিয়া এতকাল মনে করিয়া আসিতেছি, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে তাহাই প্রথম আরম্ভ, ইহাই ঠাকুর বলিলেন; সুতরাং ধর্ম্মলাভ, আমার পক্ষে হাতে চাঁদ ধরার মত কল্পনা মাত্র। যাহা কখনও হইবে না, তাহা লইয়া চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "তবে প্রকৃত ধর্ম্ম কি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। বাহিরের বেশ ভূষা, বাহিরের কাজ কর্ম্ম, এ সকল কিছুই ধর্ম্ম নয়। তবে এখন নিজে ভাল হ'ওয়া এবং অন্যের ভাল করা, ইহাই ধর্ম্ম মনে কর্‌তে হবে। নির্জ্জনে অন্ধকারে একাকী ব'সে, আত্মানুসন্ধান ক'রে দেখ্‌বে, নিজের ভিতরে কোন দোষ আছে কি না। নিজের কাছে নিজে ভাল হ'লেই ভাল। মিথ্যাকথা, কু-দৃষ্টিপাত, হিংসা, বিদ্বেষাদি যা যা দোষ ব'লে জান, তা আগে ত্যাগ কর। তার পরে, ত্রিতাপ অতীত হ'লে, ধর্ম্ম কি বুঝ্‌বে। তাপমুক্ত না হ'লে, প্রকৃত ধর্ম্মের খোঁজই পাবার যো নাই। ভগবানই ধর্ম্ম।"**

মহাপ্রভুর পুরাণ চিত্রপট।

৫ই—১৮ই পৌষ।

একদিন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবু, একখানি চিত্রপট আনিয়া, ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ছোট দাদা (সারদা বাবু), কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ঐ স্থান দিয়া চলায়, পাছে তাঁহার বস্ত্রাদি ঐ পটে লাগিয়া যায়, এই আশঙ্কায় খুব ত্রস্ত হইয়া, ঠাকুর চিত্রপটখানি হাতে তুলিয়া নিলেন এবং এক দৃষ্টে উহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, উহা মস্তকে ধরিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুকালের জন্য ঠাকুর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন, পরে ভাব সংবরণ করিয়া চোখ মুখ পুছিয়া বলিলেন— **"মহাপ্রভুর ঐ সময়ের আকৃতি ঠিক এই প্রকারই ছিল। বিরহোন্মাদে জীর্ণশীর্ণ কলেবরের এবং ভাবাবেশে নৃত্যের এইরূপ অবিকল চিত্র আর দেখি নাই।"**

চিত্রপটে মহাপ্রভুর চক্ষু দিয়া পিচকারীর মত বেগে অশ্রুজল পড়িতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম— "একি আবার কখনও হয়।" ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন— **"নিশ্চয় হয়। চিত্রকর যেমন যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনটিই এঁকেছেন; তিনি প্রভুরই আকৃতি**

ও নৃত্যের অবস্থা অবিকল দিয়েছেন। * **এক সময়ে যা সত্য সত্য ঘটে, অন্য সময়ে তা অসম্ভব মনে হয়। প্রার্থনাসময়ে কেশব বাবুর চোখ্ দিয়ে রক্তের ধারা কখনও কখনও পড়্‌ত। যারা দেখে নাই, কখনও কি বিশ্বাস কর্‌তে পেরেছে? এ ত সে দিনের কথা।"**

প্রশ্ন— "মহাপ্রভুর সময়ে ত ফটোতোলার প্রণালী ছিল না, অবিকল রূপ কি প্রকারে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— "**কেন, ধ্যানেতে ক'রে। তখনকার চিত্রকরদের এমন শক্তি ছিল, যা আঁক্‌বেন মনে কর্‌তেন, এমন একাগ্র হ'য়ে তা দেখ্‌তেন, যে ঐ চিত্র তাঁদের চক্ষে যেন ছাপ্ প'ড়ে যেত। কিছু দিন তাই তাঁরা ধ্যান কর্‌তেন এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, পরে সেই রূপ আঁক্‌তেন।**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "তাতে কি অবিকল রূপ হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— "**একেবারে ঠিক কি আর হয়? তবে প্রায় ঠিকই হয়। এখনও কৃষ্ণনগরের কুমারদের মধ্যে কারও কারও শক্তি অনেকটা আছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার।"**

ঠাকুর, এই চিত্রপটখানিকে অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া, ইহার একখানা ফটো রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন— যাই যাই!

এখানে যতই দিন যাইতেছে, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের গুরুভ্রাতা ভগ্নীরা প্রতিদিনই দলে দলে আসিতেছেন। প্রত্যহই শতাধিক পাতা পড়িতেছে। কেনারাম নামক এক প্রসিদ্ধ রসুয়ে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই দুই তিন দিন, দেড়শত দুইশত লোকের

---

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তলীলার শেষ ভাগে, যখন তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল, তখন তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ (সেরসাহ), তাঁহার বিবরণ লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আলেখ্য তুলিবার জন্য কতিপয় সুনিপুণ শিল্পীকে পুরুষোত্তমে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় পঁহুছিযাই দেখিলেন, মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, পিচকারীর জলের মত তাঁহার অশ্রুধারা বেগে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে, আজানুলম্বিত ভুজ, সুবিশাল বক্ষঃ, চারি হস্ত দীর্ঘ সুন্দর কলেবর, একেবারে অস্থিসার হইয়া গিয়াছে। চিত্রকরেরা ঐ দৃশ্যটি অতি সতর্কতার সহিত অবিকল অঙ্কিত করিয়া বাদসাহকে আনিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে দিল্লীর রাজধানীতে উহা যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছিল। পরে দিল্লী অববোধের সময়ে উহা ভরতপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। ভরতপুরের মহরাজা একবার শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালে অনেক সময়ে লালাবাবুর কুঞ্জে শ্রীগুরুদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। বাবাজী তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর লীলাকথা বলিতেন । ঐ সকল কথা শুনিয়া একদিন মহারাজা বলিলেন, 'প্রভো! আপনি যেরূপ বলেন, ঐ প্রকার একখানি চিত্রপট আমার রাজধানীতে আছে।' বাবাজী উহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে, মহারাজা উহা আনাইয়া বাবাজীকে দেন। পটের দিকে দৃষ্টি করিয়া বাবাজী কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ঐ পট দেখিয়া, চিত্রকর দ্বারা অনুরূপ প্রতিকৃতি লওয়া হয়। সেই প্রতিকৃতিই এই চিত্রপট।

ঠাকুর এই চিত্রপটখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এইটি যাহাতে লোপ না হয় সে জন্য ফটো রাখিতে বলিয়াছিলেন। এ কারণে পুরুষোত্তমধামে, ঠাকুরের (জটিয়া বাবার) সমাধিমন্দিরের সেবায়েত ছোট দাদা শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ দেব ও রাধাকৃষ্ণের পটের সহিত, সমাধিমন্দিরে রাখিয়া নিয়মিত রূপে উহা পূজা করিতেছেন।

লুচি, মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতির বিপুল আয়োজন ও মহাঘটার সহিত ভোজনোৎসব হইতেছে। কোথা হইতে কোন্ দিন কি ভাবে এ সমস্ত সামগ্রী জুটিতেছে, অনেক অনুসন্ধানেও আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পরিচিত অপরিচিত বহুলোকের সমাগমে এবং সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে আশ্রমটি দিনরাত যেন ঝম্ ঝম্ করিতেছে।

আশ্রমে সান্ধ্যকীর্ত্তন যে কি অদ্ভুত ব্যাপার তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ স্মরণ করিয়া দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বণিক্ ও নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা প্রতিদিনই আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া "হরিসে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনাত বনি যাই" এবং "প্রভুজী য়্যায়সা নাম তুমহার। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার," কখন বা "গগনমে থালে রবি চন্দ্রদীপক বনি, তারকামণ্ডল চমকে মতি রে" এই সকল গান করিয়া আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা সকলে হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ গায়ক মুকুন্দ ঘোষ বা রামতারণ ঘোষ অথবা বৈষ্ণবচরণ কুণ্ড মহাশয় স্ব স্ব দলে মিলিত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত মহাজন পদাবলী বা নাম গান করিয়া থাকেন। এই সঙ্কীর্ত্তনে নিত্যই ঠাকুরের নব নব অবস্থার অদ্ভুত বিকাশ এবং ভক্তমণ্ডলীর চমৎকার ভাবোচ্ছ্বাসের মনোমোহন চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ একদিনের জন্যও উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এ জীবনে আর কখনও এ দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ!

গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাসমারোহের কীর্ত্তনে তিন চারিটি খোল করতাল একতালে বাজিয়া উঠিলে, বহুলোকে যখন একতানে সমস্বরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ঠাকুর ক্ষণকাল আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণে বামে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী একবার ঠাকুরের পানে, আরবার ভক্তগণের দিকে, উল্লসিত প্রাণে তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুর, হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে উত্তোলন করিয়া, **"জয়শচীনন্দন" "জয়শচীনন্দন"** বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোকই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ প্রকার নৃত্য ও হরিধ্বনিতে আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। জানি না কি দেখিলাম! ঠাকুরের প্রকাণ্ড শরীরটি ক্রমে ক্রমে খর্ব্বাকৃতি হইয়া গেল; **"ঐরে, ঐরে"** বলিতে বলিতে তিনি বালকের মত মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া, বিস্তৃত হলঘরের এদিকে সেদিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ ও করতালের তালি ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, হুঙ্কার গর্জ্জনে মিলিত হইয়া, আশ্চর্য্য চমকে সকলকে দিশাহারা করিল। এ আবার কি অদ্ভুত দৃশ্য! ঠাকুর **"ধর", "ধর"** বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক নতশিরে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক, **'জয়রাধে',**

'জয়রাধে' বলিতে বলিতে নিস্পন্দ নয়নে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। শরীরটি স্থির, অথচ বাহু বক্ষঃস্থলাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের ও উভয় পার্শ্বের লম্বিত জটাভার থরথর কম্পিত হইয়া মস্তকোপরি খাড়া হইয়া উঠিল এবং উহা সর্পফণার ন্যায় অগ্রভাগ বিস্তার করিয়া সর্‌সর্ কাঁপিতে লাগিল। ঐ সময়ে মস্তক হইতে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ছটা এবং নেত্রদ্বয় হইতে জ্যোতির্ম্ময় স্ফুলিঙ্গরাশি বিদ্যুতের মত ছুটিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অনেকে বিস্ময়সূচক চীৎকার কবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুব, ঊর্দ্ধদিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশপূর্ব্বক, **"ঐ দেখ, আমাকে সকলে নিতে এসেছেন, আমি যাই, আমি যাই"** বলিতে বলিতে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া দিলেন। 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,' 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,' বলিয়া চাবিদিকে কান্নার শব্দ উঠিল। বহুলোকের উপর লম্ফ দিয়া আমবা চারি পাঁচজনে যাইয়া ঠাকুবকে জড়াইয়া ধরিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, উন্মত্তেব মত হইয়া, "দোহাই পরমহংসজী। দোহাই পরমহংসজী।। কখনই যেতে দিব না, কখনই যেতে দিব না" বলিতে বলিতে, মস্তক ও হস্তদ্বয় ঘন ঘন নাড়া দিয়া ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিবে স্ত্রীলোক পুরুষের ভীষণ কান্নাব রোল উঠিল। ঠাকুর অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর, **'জয়গুরু!' 'জয়গুরু!'** বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন। চারি দিক নিস্তব্ধ! আগন্তুক ভদ্রলোক সকল ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা সব কে এসে আপনাকে টানাটানি কর্‌ছিলেন? আমাদের ত মনে হ'লো বুঝি এবার আপনি চলে গেলেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"গতিক তাই বটে। গৌর শিরোমণি মশায়, যোগজীবনের মা, শ্রীবৃন্দাবনের সখিগণ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে পরমহংসজী * হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হ'লে কারও চেষ্টাতে ত কিছু হবার যো নাই।"**

প্রশ্ন— "গৌর শিরোমণি মহাশয় কি এ শক্তি লাভ করেছিলেন?"

ঠাকুর— **"এ শক্তি লাভ না কর্‌লে রাসমণ্ডলে প্রবেশ কর্‌বেন কিরূপে?"**

প্রশ্ন— "রাসমণ্ডলে প্রবেশকালে নাকি সখিদেহ লাভ হয়?"

ঠাকুর— **"হাঁ, পুরুষের ওখানে প্রবেশাধিকার নাই।"**

গতকল্যকার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমার দৃষ্টি কিন্তু ঠাকুরের দিকেই ছিল। স্মৃতিতে যতটুকু জাগরূক আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। সমস্ত অবস্থা ও ভাবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাখিতে পারিলাম কি না, জানি না।

সঙ্কীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাদের নানাপ্রকার ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সাধন-ভজন কোন গুরুভ্রাতা হইতে যে কম করিতেছি তা নয়, সকলেই ত বিষয় কার্য্যে বা বাজে গল্পে দিন কাটাইতেছেন। আমি ত প্রায় সারা দিনই নাম করি। তবে আমার এরূপ শুষ্কতা কেন?

* মানসসরোবরবাসী শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ স্বামী পবমহংসে, যিনি গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে প্রভুজীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহাব নির্দ্দেশে তিনি কাশীধামে শ্রীশ্রীহবিহবানন্দ স্বামী সবস্বতীব নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছিলেন।

এসব অবস্থা সাধনসাপেক্ষ হইলে, আমারই ত সকলের আগে হইবার কথা। আর কৃপাসাপেক্ষ হইলে, অযোগ্যে কৃপা হইল, যোগ্যে হইল না, ভগবানের এই অবিচারই বা কেন?

ঠাকুরসম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুর কথা।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিছুকালযাবৎ অবিরাম জ্বরে ভুগিয়া এখন তিনি একরূপ মৃত্যুশয্যায় আছেন। গেণ্ডারিয়ার সকলেই তাঁহাকে লইয়া অস্থির। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই ঢাকা যাইতে ইচ্ছা জানাইলেন।

আমরাও সকলে পৌষ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুরের সঙ্গে ঢাকা যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ঢাকাযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্জ্জনে আলাপ করিলেন। কি বলিলেন, কিছুই তখন জানি না। পরে এক সময়ে ছোট দাদা ও কুঞ্জ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন— "গোঁসাই মনের কথা বলিতে পারেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতাম না। গোঁসাইকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোঁসাই! বলুন ত আমি কোন্ চক্রে।' গোঁসাই অমনি ষট্‌চক্রের মধ্যে ঠিক সেই চক্রের নাম লইয়া বলিলেন— **"আপনি *** চক্রে ঘুরিতেছেন।"** গোঁসাইয়ের নিকট আমার দীক্ষার আকাঙ্খা জানাইলে তিনি বলিলেন, **"আপনাকে আমি বন্ধুভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।"**

নগেন্দ্র বাবু এই দুই জনকে এবং আরও কাহাকে কাহাকে ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গোঁসাই যে দিন কলিকাতা আসিলেন, সেই দিন শূন্যপথে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলাম, গোঁসাই আসিতেছেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। গোঁসাই ষ্টেশন হইতে সোজা আমার বাসায়ই ঐ দিন রাত্রে আসিয়া উঠিলেন।"

ঠাকুরের ঢাকাযাত্রা—গুরুভ্রাতাদের অবস্থা।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ট্রেন ছাড়িবার কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ঠাকুরের তাড়াতে আমরা ছয়টার সময়েই বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর ট্রেনযোগে যখনই যে কোন স্থানে যান, দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকেন, ইহা ছেলেবেলা হইতে ঠাকুরের একটি অলঙ্ঘ্য নিয়ম। আমরা বহুপূর্ব্বে ষ্টেশনে যাইতে ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া পড়ি।

ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন— **"অনর্থক বাসায় সময় কাটায়ে পর অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি করার চেয়ে, বরং দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকা ভাল। আমি কোথাও যেতে হ'লে ওরূপই করি। জীবনে আমি কখনও ট্রেণ 'মিস্' করি নাই।"**

সন্ধ্যার একটু পরেই গুরুভ্রাতারা সকলে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দের হাট ভাঙ্গিল। গুরুভ্রাতাদের কাহারও মনে শান্তি নাই। সকলেরই মুখ

মলিন এবং চিত্ত স্ফূর্ত্তিহীন। ঠাকুর যতক্ষণ ষ্টেশনে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরকে ঘিরিয়া নির্ব্বাক্ অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। গাড়ি ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, সকলে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও ছল্ ছল্ চক্ষে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া করজোড়ে মস্তক অবনত করিয়া প্রতিনমস্কার করিতে লাগিলেন। এ সমস্ত গুরুভ্রাতারা আর কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের কাতর প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কেহ দাঁড়ান অবস্থায় থাকিয়া, কেহ কেহ বা অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। উঁহাদের ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। গাড়ির ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। এমন সময়ে গাড়িও ছাড়িয়া দিল। আহা! মাসাধিক কাল ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী নবীন বাবু, অচিন্ত্য বাবু, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু, দেবেন্দ্র সামন্ত, কুঞ্জ গুহ, শ্রীচরণ বাবু, মহেন্দ্র বাবু, ছোট দাদা ও মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতির অনুরাগবিহ্বল বিষন্ন মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিত মনে আমরা গোয়ালন্দ চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, 'হায় অদৃষ্ট। এ সকল গুরুভ্রাতার অনুরাগের কণিকামাত্র পাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্যও যদি আমি এইরূপ কাঁদিতে পারিতাম, এ জীবন ধন্য হইয়া যাইত।"

পদ্মার জল হাওয়া; সাহেবের পরিহাস।

আমরা সমস্ত রাত্রি গাড়িতে থাকিয়া সকালবেলা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। একখানা বড় কম্বল বিছাইয়া সকলে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া পডিলাম। ঠাকুর পদ্মানদী দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন— **"গঙ্গার প্রবল ধারাটিই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহিত হ'চ্ছে। পদ্মার হাওয়াতে শরীরের জড়তা নষ্ট করে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ক'রে তুলে। জলের অসাধারণ গুণ। আধফুটা চাল বা কাঁচা চিড়ে আধ সের খেলেও, পদ্মার এক ঘটী জল খেলে তা অনায়াসে হজম হ'য়ে যায়। পদ্মাতীরবাসী মাঝিরা যেরূপ সবল এবং সুস্থ এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মানদীর বিস্তৃতি দেখ্‌লে চিত্তটি যেন প্রশান্ত হ'য়ে পড়ে।"**

ঠাকুর পদ্মার জল হাওয়ার গুণ কিছুক্ষণ বলিয়া চুপ করিলেন। এ স্থলে সুন্দর একটি ঘটনা লিখিতেছি। মধ্যাহ্নকালে ঠাকুর শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, ভাবের প্রগাঢ়তায় বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, আবার মাথা তুলিতেছেন; অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। গুরুভ্রাতারাও নির্ব্বাক, আপন আপন ইষ্ট নাম স্মরণে স্থির! দূর হইতে একজন উচ্চপদস্থ সাহেব, ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া, মাতাল অনুমানে, ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ক্যা জী, দারু পিয়া? কেৎনা পিয়া? আরে তোম্ ক্যায়সা দারু পিয়া?" সাহেব দু'তিন বার ঐ প্রকার বলাতে ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন— **"হাঁ, দারু পিয়া, বহুত পিয়া। তুমহারা যীশুখ্রীষ্ট যো দারু পিতে থে, হাম্ তো আভি ওহি দারু পিয়া।"**

সাহেব শুনিয়া, একটু চমকিয়া, কয়েক সেকেণ্ড ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে লজ্জিত ভাবে একটু হাসিয়া, মাথার টুপি তুলিয়া দু'হাতে ঠাকুরকে সেলাম দিতে দিতে স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আমরা দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহুছিলাম। আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ; ঠাকুরকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর স্ত্রী বসন্তকুমারীর দেহত্যাগ।

২৫শে পৌষ, শুক্রবার।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রমস্থ এবং সহরনিবাসী গুরুভ্রাতা ভগিনীদিগকে পাইয়া আমাদের যেমনই একটা আনন্দ ও উৎসাহ প্রাণে জাগিয়াছে, যোগজীবনের স্ত্রীর মুমূর্ষ অবস্থা দেখিয়া তেমনই আবার একটা আতঙ্ক ও বিমর্ষভাব সকলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দিবারাত্র বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে ঠাকুর আশ্রমে উপস্থিত হওয়াতে কাহারও কাহারও প্রাণে একটু ভরসা জন্মিয়াছিল, বুঝি এ যাত্রা বসন্তকুমারী রক্ষা পাইবেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে উঁহার অবস্থা ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া পড়াতে সকলেই একেবারে হতাশ হইলেন।

বসন্তকুমারীর সেবার বন্দোবস্ত করিবার জন্যই ঠাকুর যোগজীবনকে গেণ্ডারিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেবাকার্য্যে নিতান্ত অপটু বলিয়াই হউক অথবা আজন্ম উদাসপ্রকৃতি বলিয়াই হউক, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যথানিয়মে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার যাতনা লাঘবের তেমন সাহায্য করিতে পারেন নাই; তথাপি তাঁহার আগমন ও উপস্থিতিই বসন্তকুমারীকে যে আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছে ইহাই পরমকারুণিক গুরুদেবের ব্যবস্থা ও আদেশেরই ফল মনে হয়।

২৩ শে পৌষ বধূর বিকারের মত অবস্থা ও শ্বাসের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, ঠাকুরকে উহা জ্ঞাত করায় ঠাকুর বলিলেন— **"দৈহিক সামান্য যাহা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে তাহাই পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে।"**

২৫ শে তারিখে বসন্তকুমারী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর উঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বসন্তকুমারী কৃতাঞ্জলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরকে বলিলেন, 'বাবা, আর কত দুঃখ দিবে বাবা?'

ঠাকুর অশ্রুসিক্ত নেত্রে বলিলেন— **"মা! তোমার ক্লেশের অবসান হ'ল ব'লে।"**

ঐ দিন ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঠাকুরকে গিয়া বলিলেন— 'তিন দিন যাবৎ বসন্তকুমারীর ভয়ঙ্কর শ্বাস চলিয়াছে, এ অবস্থায় আর কত কাল থাকিবে? এ অবস্থা ত আর দেখা যায় না।'

ঠাকুর বলিলেন— **"আর বিলম্ব নাই, সময় প্রায় হ'য়ে এলো; তবে সাংসারিক ব্যাপারে বুড়োঠাক্‌রুণ হ'তে সময়ে সময়ে গালিগালাজ খাওয়াতে, বুড়োঠাক্‌রুণের উপর এখনও উঁহার একটা বিরক্তি ভাব আছে, সেটুকু গেলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"**

ডাক্তার বাবু বলিলেন— 'তা আর হবে কিরূপে?'

ঠাকুর বলিলেন— **"বুড়োঠাক্‌রুণ যেয়ে ওঁকে একটু প্রসন্ন কর্‌লেই হয়। এজন্য আর ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"**

ইহার পর রোগীর অবস্থা নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িল দেখিয়া, দিদিমা অস্থির হইয়া পড়িলেন। বউ এবার চলিলেন বুঝিয়া, দিদিমা কান্দিতে কান্দিতে বধূর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, 'বউ! আমি যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি, কষ্ট দিয়ে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' বসন্তকুমারী দিদিমার আকুল কান্না দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, ছল্‌ছল্ চক্ষে বাহুদ্বারা দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'দিদিমা! আপনি ত কোনও অপরাধই করেন নাই।' এই ঘটনার পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, পুণ্যশীলা ভাগ্যবতী বসন্তকুমারী অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, জ্যেষ্ঠ সহোদর জগবন্ধু বাবুর সমক্ষে, আশ্রমস্থ সমস্ত গুরুভ্রাতাভগ্নীকে কান্দাইয়া, স্বামীর পদান্তিকে, গুরুর আশ্রমে দেহরক্ষা করিলেন।

মাঘ।

যোগজীবনের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক অবস্থা।

প্রশ্নোত্তর।

বসন্তকুমারীর অচিরে দেহত্যাগ ঘটিবে অনুমান করিয়াই, আমি ঠাকুরের নিকট হোমের ঘৃত ও আহারের চাউলের অভাব হইয়াছে জানাইয়া, অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাড়ী গেলাম। সাতদিন পরে আবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম বহু গুরুভ্রাতা সমবেত হইয়া হরিধ্বনিসহকারে বসন্তকুমারীর পবিত্র কলেবর শ্যামপুর শ্মশানঘাটে লইয়াছিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে, যোগজীবনই উঁহার মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। দেহে অগ্নিসংস্কার কালে অকস্মাৎ একটি গোলাকৃতি জ্যোতিঃপিণ্ড চিতা হইতে উত্থিত হইয়া নক্ষত্রবেগে উর্দ্ধদিকে অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল। শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিলেন।

৫ ই মাঘ, সোমবার।

গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবার পরদিনই, সকালে চা-সেবার পর, ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"তুমি যোগজীবনকে শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি পড়াতে পার্‌বে?"**

আমি বলিলাম— "শ্রাদ্ধমন্ত্র আমি জানি না।"

ঠাকুর বলিলেন— **"পুস্তক দেখে পড়াবে, ওতে আর জানা না জানা কি?"**

আমি— "শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ার সময়ে ত কতপ্রকার প্রক্রিয়া করে দেখেছি, সে সব ত আমার কিছুই জানা নাই। আর সংস্কৃতও আমি ভাল জানি না। শ্রাদ্ধমন্ত্র আমাকে পড়াতে হ'লে, এখন থেকে পুস্তক দেখে অভ্যাস ক'রে রাখ্তে হয়; না হ'লে শুদ্ধমত পড়াতে পার্‌ব না।"

ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। একাদশ দিবসে, ঠাকুর নিজেই শ্রাদ্ধপদ্ধতি দেখিয়া যোগজীবনেক শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়াইলেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মত শ্রাদ্ধকার্য্য করাইলেন। শ্রাদ্ধের পর, ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন— **"বসন্ত শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থেকে হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন; সূক্ষ্ম দেহটি পরিত্যাগ ক'রে, দুর্লভ কারণদেহ লাভ কর্‌লেন।"**

সময়মত জিজ্ঞাসা করিলাম— "জীবের কি প্রকার অবস্থাতে, দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আশ্রয় কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"বিষয়েতে যাঁদের অতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা যাঁদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমাত্রে অপর দেহ আশ্রয় করেন।"**

প্রশ্ন— "পিতৃলোকে কাহারা যান?

ঠাকুর— **"বিষয় উপস্থিত হ'লে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্য তেমন প্রবল স্পৃহা রাখেন না, সাধারণতঃ তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন।"**

প্রশ্ন— "বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মালোকে এবং তারও অতীত লোকে জীব কি অবস্থা হ'লে যায়?"

ঠাকুর— **"যাঁরা ধর্ম্মমাত্র লক্ষ্য রেখে, কোনও প্রকার সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী এক এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সমস্ত বাসনার মূল পর্য্যন্ত যাঁদের নষ্ট হ'য়ে যায়, একমাত্র ভগবান্‌ই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই ব্রহ্মলোকের অতীত স্থানে গতি হয়।" শুধু বাসনাহেতু জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।"**

ইহা ব্যতীত লোকান্তর প্রাপ্তির অন্য কোনও হেতু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব মনে করা মাত্র, ঠাকুর নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন— **"এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মীমাংসা আছে, কিন্তু সকলের কাছে সকল অবস্থার কথা বল্‌তে নাই। যে যে অবস্থার লোক, যার যে দিক্‌ দিয়ে বুঝ্‌বার অধিকার, তাকে সেইরূপই বল্‌তে হয়; নইলে সে তা ধর্‌তে পারে না, বল্‌লে উপকার না হ'য়ে বরং অনিষ্টই হয়। এ সব শুনে কিছু লাভ নাই, কাজ ক'রে যেতে হয়।"**

আশ্রমে অশান্তি।

ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে সহস্র অসুবিধাকেও অসুবিধা মনে করি না, এ প্রকার আস্ফালন আমরা অনেকেই যখন তখন পরস্পরের নিকটে করিয়া আসিতেছি। এবার গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসা অবধি আমাদের সেই অভিমান, ভগবান্‌, পদে পদে চূর্ণ করিতেছেন। কয়েকদিনযাবৎ, ঠাকুরের সন্নিধিসত্ত্বেও আশ্রমে বিষম অশান্তি চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; কি করি, কোথায় যাই, সকলেরই ভিতরে এরূপ একটা উদ্বেগের আন্দোলন হইতেছে।

৯ই মাঘ, শুক্রবার।

আশ্রমে একটিমাত্র চাকর, সে বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। রসুয়ে ব্রাহ্মণ, আশ্রমে কোনকালেই ছিল না, এখনও নাই। শান্তিসুধা রোগে অকর্ম্মণ্যা; একাকিনী দিদিমা, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও, এই বৃদ্ধাবস্থায় আশ্রমস্থ সকলের এবং অতিথি অভ্যাগত লোকদের রান্না, পরিবেশন এবং বাসনমাজা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া একবারে হয়রান হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নিজের অসমর্থতা জানাইয়া, প্রতিদিনই তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এ সকল কার্য্যভার লইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা এত কাল এ সকল সেবা গুরুপরিবার হইতে অবাধে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, একারণেই এখন দিদিমার এ সকল আপত্তি বা গালাগালিতে কেহ কর্ণপাতই করিলেন না। এদিকে অর্থেরও অতিরিক্ত অনটন উপস্থিত হইল। শুধু ভাতের সঙ্গে ডাল বা তরকারি ব্যতীত আহারের আর কোন ব্যবস্থাই রহিল না। প্রতিদিন একই প্রকার, অতএব অধিকতর অরুচিকর খাদ্য খাইয়া এবং বিরক্তির সহিত প্রদত্ত আহারের সঙ্গে গালাগালি ভোগ করিয়া, গুরুভ্রাতারা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। দিদিমার কোনও কার্য্যে কেহ কোনও প্রকার সাহায্য বা অর্থকৃচ্ছ্রতায় সহানুভূতি না করিয়া বরং তীব্রভাষায় তাঁহার অর্থলোভ, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বশতঃই এখানে এ সমস্ত অসুবিধা ভোগ হইতেছে, এই প্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অশান্তির সহিত ঝগড়া বিবাদ ক্রমে ক্রমে এতই বৃদ্ধি হইল যে, অবশেষে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলেন, কেহ কেহ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন; আবার কেহ কেহ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। দিদিমার দোষালোচনাই সকলের ভজন সাধন হইয়া উঠিল।

পবিত্র আশ্রমে, সামান্য আহার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার লইয়া, পরস্পরের ভিতরে মনোবাদ ও সময়ে সময়ে তুমুল ঝগড়া বিবাদ চলিল দেখিয়া, ভাবিলাম— 'এ আবার কি? ঠাকুরের পরম শান্তিপ্রদ সঙ্গলাভই যাঁহাদের এস্থানে থাকিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ আহার ব্যবহার লইয়াও তাঁহাদের চিত্ত এত উত্তপ্ত হয়? ঠাকুর আমাকে স্বপাক আহারের আদেশ করিয়া বড়ই সুখে রাখিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমাল হইতে তফাৎ থাকিয়া, বেশ আনন্দে আছি।' গুরুভ্রাতাদের অবস্থা দেখিয়া, আমি দিন দিন গর্ব্বিত হইতে লাগিলাম। এ সময়ে কিছুদিনের মধ্যেই, আশ্রমের গরম হাওয়াতে, আমাকেও ফাঁফর করিয়া তুলিল। আমিও পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম।

আমার চাউলের অভাব হইলেই, বাড়ী হইতে লইয়া আসি। দিবসান্তে একবার মাত্র ভাতে সিদ্ধ ভাত বা খিচুড়ি আহার করি। দক্ষিণের চৌচালা ঘরে বিকালবেলা বহু লোকের আড্ডা হয় বলিয়া, ভাঁড়ার ঘরের বারেন্দায় রান্না করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের আদেশমত পর্দ্দা খাটাইয়া, নির্জ্জনে আমাকে আহার করিতে হয়। ভাণ্ডার ঘরের বারেন্দায় আহারের ব্যবস্থা করাতে, ভাণ্ডারের তরিতরকারি, ডাল, লবণ, প্রভৃতি চুরি করি বলিয়া, মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা হইল।

আহারের সময়ে কি আহার করি, আড়ে থাকিয়া কেহ কেহ তাহারও অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জ্বলিয়া যাইতে লাগিলাম। অবিলম্বে দক্ষিণের

চৌচালার বারেন্দায় রান্না করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। দু'মুঠো চাউল সিদ্ধ করিতে দুই তিনখানা কাষ্ঠই যথেষ্ট। এই কাষ্ঠ, আমি অবসরমত বৃক্ষের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখি। যদি কখনও আমার কাষ্ঠ না থাকে, আশ্রম হইতে প্রয়োজনমত উহা গ্রহণ করি। তাহা লইয়াও নানা কথা উঠিল। আমি, এ সকল উৎপাত দেখিয়া, আশ্রমের কোন বস্তুতেই হাত দিব না সঙ্কল্প করিলাম। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এত অশান্তি আশ্রমে ঘটিতেছে, অথচ ঠাকুর নির্ব্বাক্ ও উদাসীন রহিয়াছেন দেখিয়া, ঠাকুরের উপর বড়ই বিরক্তি ও রাগ হইল। জানি না কত কাল এ সকল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন হিংসা, বিদ্বেষ, জ্বালা, যন্ত্রণা, আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিবে। ঠাকুর, সকলকে নিজ প্রকৃতিমত চলিতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?

সময়মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— " মায়িক বিষয়ের সম্বন্ধ হেতু, কত কাল জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন— **"আরে বাপু! কত জ্ঞানী, কত যোগী, কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, মায়ার চক্রে প'ড়ে, একেবারে অস্থির হ'য়ে যান। কোন্ সময়ে, কার ভিতরে, কোন্ ছিদ্র দিয়ে পাপ প্রবেশ করে বলা যায় না। এ জন্য সর্ব্বদা কেবল ভগবান্‌কে নিয়ে থাক্‌তে হয়। সৎসঙ্গে, সদালাপে, সদনুষ্ঠানে, সচ্চিন্তায় প্রাতঃকাল হ'তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কাটিয়ে দিতে হয়; আর মনে মনে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌তে হয়— 'ঠাকুর! আমাকে তোমার ক'রে নেও। তোমাকে ছেড়ে আর কিছুই যেন আমি না চাই।' দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটায়ে দিতে পার্‌লে, ভগবানের দয়াতে মায়া মোহ হ'তে ক্রমে ক্রমে রক্ষা পাওয়া যায়। তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হবার যো নাই, তাঁর বিন্দুমাত্র কৃপা হ'লে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়।"**

বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর যোগজীবন ভাবিলেন, 'এবার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম; এখন সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে থাকিত পারিব।' যোগজীবনেব স্ত্রীর জন্য সকলের বিষণ্ণভাব হইলেও যোগজীবনের বিন্দুমাত্র তাহা দেখিলাম না, গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায়, "আর সংসার করিতে হইবে না" বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর শৌচে যাইবার সময়ে, যোগজীবনকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন—**"যোগজীবন নিশ্চয় জেনে রাখিস্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও, বড় জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট ক'রে দিতে পারেন না; সে শুধু একজনারই হাতে।"**

দিদিমা কয়েকদিন পরেই যোগজীবনের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পডিলেন। গুরুভ্রাতারাও কেহ কেহ ঠাকুরের নিকটে এ বিষয়ে কথা তুলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—**"আমি ওকে আর বিবাহ কর্‌তে বলি না, তবে ওর তেমন ইচ্ছা হ'লে কর্‌বে; বিবাহ আর করা ঠিক নয়।"**

দিদিমা ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতা ভগ্নীরাও অনেকে "যোগজীবনের আর বিবাহ হইবে না, গুরুবংশ লোপ হইবে" ভাবিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আশা কেহ একেবারে ছাড়িলেন না, মনে করিলেন, 'ঠাকুর এখন নিষেধ করিলেন, আবার হয় ত কখনও বা বিবাহের অনুমতি দিতেও পারেন।'

ঠাকুরের এ সময়ে দৈনন্দিন কার্য্য।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন প্রচারিত হইলে, সহর হইতে দলে দলে লোক আশ্রমে আসিতে লাগিল। সকালবেলা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর হয় না, সুতরাং বিকালবেলাই লোকের ভিড় হইতেছে। ঠাকুর প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে আসন ত্যাগ করিয়া, কূয়াতলায় যান। শৌচান্তে, আসনে না যাইয়া খড়ম পায়ে ও দণ্ড হাতে আশ্রমের দক্ষিণ দিকে পা-চালি করিতে থাকেন। বৃক্ষ লতার নিকটে যাইয়া উহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন কোনটিকে কতই যেন স্নেহভাবে স্পর্শ করেন। চারা গাছের বৃদ্ধি এবং দূর হইতে লতার বৃক্ষাবলম্বনের কৌশল ও চেষ্টা দেখিয়া, আনন্দ করিতে থাকেন। উহাদেরও আপন আপন প্রয়োজন মত চলিবার জন্য দৃষ্টিশক্তি আছে; সুখ দুঃখের অনুভব ও বিচারবুদ্ধি মনুষ্য অপেক্ষা কম নয়, তাহার প্রমাণ দেখাইতে থাকেন। সবুজ গাছে লাল ফুল, এক এক ফুলের নানা রং শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপড়ি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ভাবে ডুবিয়া যান; বেড়াইবার ছলে মাঠাকরুণের মন্দিরটিকে পরিক্রমা করিয়া, কুঞ্জবাবুর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পুকুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘাসের উপরে যাইয়া দাঁড়ান; পুকুরের দক্ষিণপাড়ের ভয়ঙ্কর জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া থাকেন। ঐ সময়ে, মশার কামড়ে অস্থির হইয়াই যেন, ঠাকুর সজোরে পা তোলা ফেলা আরম্ভ করেন। পরে পাখীদের খাওয়ার কয়েক মুঠো চাউল দেওয়া হইলে, আপন আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন।

১১ই মাঘ, রবিবার।

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় নিজ বাড়ী হইতে চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। এত কাল ঠাকুরকে নারিকেলের মালায় চা-সেবা করিতে দেখিয়াছি, এবার কুঞ্জবাবু, ঠাকুরের চা-সেবার জন্য একটি এনামেলের বাটি লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাতেই চা সেবা করিতেছেন। চা-সেবার পর কুঞ্জ বাবু চরিতামৃত পাঠ করেন। পরে ঠাকুর নিজেই 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করিয়া, শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময়েই গ্রন্থ হাতে থাকে মাত্র, ঠাকুর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বেলা এগারটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। এগারটার পর আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। মস্তকমাত্র বাদ দিয়া, সর্ব্বাঙ্গ জলে ধুইয়া ফেলেন। পরে আসনে আসিয়া, তিলক-সেবার পরে, ঔষধ সেবন করেন। আহার প্রায় বারটার সময়ে হয়। আহারান্তে, আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর ধুনি সম্মুখে রাখিয়া নির্নিমেষ নয়নে একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পূর্ব্বমুখে কোনও বৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকেন। ঠাকুরের শরীর নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবেই থাকে; অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণে গাত্রের বস্ত্র ভিজিয়া যায়, চক্ষু দু'টি নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে। কখনও কখনও শরীরের বর্ণও অন্যপ্রকার হইয়া যায়। আমি ঐ সময়ে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠ

করিয়া, নাম করিতে থাকি, এবং সময়ে সময়ে ঠাকুরের মগ্নাবস্থায়, শ্রীঅঙ্গের বিচিত্র রূপান্তর দেখিয়া, হৃষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি।

বিকালে, সহরের লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন, আমি আহারের চেষ্টায় চলিয়া যাই। সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যহই খুব উল্লাসের সহিত হরিসঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তন পূবের ঘরেই হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে গুরুভ্রাতারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া যান। ঠাকুর জলযোগ করিয়া নিজ আসনে বসিয়া থাকেন।

ঠাকুরের হাসি ও ঝগড়ার শান্তি।

এবার গেণ্ডারিয়াতে ভয়ঙ্কর শীত। ঠাকুরের ঘরের বেড়া, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে। চারি পাঁচটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরের ঘরে রাত্রিতে থাকেন; তাঁহাদের ভাল শীতবস্ত্র নাই, ঠাকুর এজন্য রাত্রিতে ধুনি রাখিতে বলিয়াছেন। অর্থাভাববশতঃ আশ্রমে রান্নার কাষ্ঠই সব সময়ে থাকে না, ধুনির কাষ্ঠ আর কোথা হইতে জুটিবে? অধিক রাত্রিতে মহেন্দ্র বাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা ধুনির কাষ্ঠের অনুসন্ধানে আশ্রমসংলগ্ন গুরুভ্রাতাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে থাকেন। সকলে একটু নিস্তব্ধ হইলেই তাঁহারা অবিচারে কাহারও দরজার জন্য রক্ষিত চৌকাঠের কাঠ, কাহারও বা রান্নাঘরে লাগাইবার খুঁটি, কোন বাড়ীর মাচাং প্রস্তুত করিবার ভাল তক্তা আনিয়া ধুনিতে চাপাইতে থাকেন। সকালবেলা গৃহস্থের লক্ষ্য পড়িলেই উহা লইয়া ঝগড়া আরম্ভ হয়। আমি অতিকষ্টে রান্নার জন্য কিছু কাষ্ঠ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উঁহাদের ভয়ে রাধারমণ বাবুর গোয়ালঘরে তাহা রাখিয়া দেই। রাত্রিতে অন্ধকার গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলে গরুর গুঁতা খাইয়া উঁহারা ভাগিয়া পড়িবেন, আমার ইহাই মতলব ছিল। কিন্তু জানি না, গুরুভ্রাতারা তাহাও কি-রূপে কখন কৌশলক্রমে আনিয়া, আমার এক মাসের জ্বালানী কাঠ এক রাত্রিতেই সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ভোরবেলা উঠিয়া প্রত্যহই কাষ্ঠ আছে কি না, একবার অনুসন্ধান করি। আজ গোয়ালে ঢুকিয়া দেখি, কাঠ নাই; আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। অমনই উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠ সম্বন্ধে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ কেহ বলিলেন, "ঠাকুরের ধুনিতে তোমার কাঠ লাগিয়াছে, ইহা ত তোমার সৌভাগ্য। এজন্য এত রাগ করছ কেন?" আমি বলিলাম, "ঠাকুরের ভাণ্ডার হ'তে রান্নার জন্য একটি দিন আমি একখানা কাঠ নিলে, দশ দিন আমাকে চোর বলিয়া প্রচার করা হয়, আর এ বেলা বুঝি চুরি হয় না?" ঠাকুর চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া আমাদের ঝগড়া শুনিতে লাগিলেন, পরে ঝগড়াব মাত্রা যখন খুব বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, ক্রমে আরও অধিক গড়াইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা হইল, ঠাকুর তখন একবার আমাদের পানে তাকাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্য দেখিলাম— হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই ভিতরে শান্তি আসিল, সকলেরই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং আনন্দের একটা ঢেউ সকলেরই প্রাণে উঠিয়া পড়িল।

১২ই মাঘ।

শ্রীধরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত; ঠাকুরের উপদেশ।

১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার।

আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আমার আসন, এই ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীধর থাকেন। ঘরের অবশিষ্ট স্থানে ঢালা বিছানা করিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতারা রাত্রে শয়ন করেন। শ্রীধরের ও আমার আসনের মধ্যস্থানে দরজা। বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর, শ্রীধরের মহা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এক এক দিন উঁহার এক এক প্রকার বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের ধাক্কায় আমাদের প্রাণ অস্থির। একদিন শ্রীধর নিজ আসন গুটাইয়া সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ, সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে, ত্রস্ত হইয়া, কোদালি মারিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ফুট গর্ত্ত করিয়া, ঘরের মেজেতে মাটি স্তূপাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরের এই অবস্থায় কারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কি জানি, যদি কোদালিই ঘাড়ে বসাইয়া দেন! দিদিমা খবর পাইয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীধরকে আসিয়া বলিলেন— "পাগল! এ কি কর্‌ছ? মেজেতে গর্ত্ত ক'রে ঘরটিকে শেষ কর্‌লে! এ পাগলামী কেন?" শ্রীধর বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া খুব মনোযোগের সহিত ধমাধম্ ঘরের মেজেতে কোদাল মারিতে লাগিলেন; দিদিমার কথা কোনও গ্রাহ্যেই আনিলেন না। দিদিমাও খুব চীৎকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীধর স্বর বিকৃত করিয়া দিদিমাকে বলিলেন, "যান যান, আপনি গিয়ে ভাণ্ডার দেখুন। ঘর শেষ কর্‌লে! ঘর শেষ কর্‌লে!! আমার যখন দফা শেষ হবে, তখন কি আপনি তার ব্যবস্থা কর্‌তে আস্‌বেন?" শ্রীধর এই বলিয়া, হাতের কোদাল বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং একটি কলসী লইয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন; পরে কলসী কলসী জল আনিয়া ঘরের মেজেতে মাটির উপর ঢালিতে লাগিলেন। জলে কাদায় সমস্তটি ঘর একাকার হইল। আমার আসনের ধারে জল আসিতেছে দেখিয়া, আমি আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম এবং খুব ধমক্ দিয়া শ্রীধরকে বলিলাম, "শ্রীধর! সাবধান! এক ফোঁটা জল আমার হোমকুণ্ডে পড়্‌লে বা আসনে লাগ্‌লে, আজ তোমাকে খুনই কর্‌ব।" শ্রীধর তখন বেগতিক দেখিয়া অমনই খুব ব্যস্ততার সহিত জলের ধারা অন্য দিকে টানিয়া লইয়া নরম স্বরে বলিলেন, "ভাই! আর একটু থাম্ না। তার পর খুন কর্‌লে আর দুঃখ নাই।" আমি বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিয়া রহিলাম। অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেহ অত্যাচার কর্‌লে তাহাকে শাসন করা কি অন্যায়।"

ঠাকুর বলিলেন— **"মানুষের সহিত ব্যবহার প্রকৃতি বুঝে কর্‌তে হয়। যদি কেহ নিজ প্রকৃতি মত চলাতে, কারও কিছু অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তা হ'লে শান্তভাবে তাকে তা বুঝায়ে দিতে হয়। যতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্‌তে হয়। আর যদি দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন প্রকার দুরভিসন্ধিতে, মতলব ক'রে, কেহ একটা অত্যাচার কর্‌ছে, তা হ'লে তাকে শাসন কর্‌তে হয়। অনেক সময়ে সদভিপ্রায়ে মানুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে; কিন্তু তাতে তাকে দোষী বলা যায় না। ভুল ভ্রান্তি ত লোকের হ'য়েই থাকে। সময় হ'লে**

সে নিজেই তা আবার বুঝ্‌তে পারে। সমস্ত কার্য্যেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেই ত যত বিরোধ।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'বাঃ, এ মন্দ নয়! এক জনে কেবল অত্যাচার করুক, আর এক জনে কল্পনা করিয়া তার শুভ উদ্দেশ্য ভাবিয়া ঐ অত্যাচারে কেবল ধৈর্য্য ধ'রে থাকুক! এ উপদেশ মন্দ নয়! শ্রীধরের নাম উল্লেখ না করিলেও, ঠাকুর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ সব উপদেশ আমাকে দিলেন বুঝিলাম; কিন্তু শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে সকল উদ্বেগজনক কর্ম্মকে সকলেই পাগলামী ভিন্ন কিছুই বলে না, তাহাতে ঠাকুর উহার কি শুভ উদ্দেশ্য দেখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীধর সমস্ত দিন জলকাদা ঘাঁটিয়া আসনপরিমিত গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে উচ্চ বেদি প্রস্তুত করিলেন। পরে কতকগুলি তুলসী গাছ আনিয়া, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উহার উপর পুতিলেন। তৎপরে গর্ত্তের ভিতরে চাটাই বিছাইয়া, তাহার উপর কম্বল আসন পাতিলেন। অনন্তর একটি একতারা লইয়া, ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন— 'শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভাবধাম যবে ছাড়িবে।' শ্রীধরের ভজন শেষ না হইতেই, সহরের গুরুভ্রাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধেক ঘর শ্রীধরের পাগলামীতে জোড়া দেখিয়া সকলে বলিলেন, "এ কি শ্রীধর, এসব কি করেছ?"

শ্রীধর খুব তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "এ কি, দেখ্‌চো না, চোক্ নাই? তুলসীকানন।" গুরুভ্রাতারা বলিলেন, "পাগল, কানন কি তোমার ঘরের ভিতরে? বাইরে গিয়ে তুলসীকাননে ভজন কর না?" শ্রীধর বলিলেন, "এত শীতে পাছে বাইরে যেতে হয়, সেই জন্যই ত এত করা। আমার দেহ ত্যাগ হ'লে, এই তুলসীকাননেই হবে; তোদের শীতে কোন কষ্টই হবে না; এই গর্ত্তে আমাকে রেখে এই সব মাটি দিয়েই কবর দিস্।" এই বলিয়া শ্রীধর হাতের একতারা রাখিয়া কম্বলমুড়া দিলেন এবং লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শ্রীধর নীরব হইলে, গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ হরিধ্বনি দিয়া, 'শ্রীধর মরিয়াছে,' বলিতে বলিতে চারিদিকের মাটি ঠেলিয়া উহার গায়ে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তখন শ্রীধর ধড়্‌মড়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের সঙ্গে শ্রীধরের ও হাসি অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী চলিল। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলাম এবং শ্রীধরের পাগলামীতেও শুভ উদ্দেশ্য থাকে জানিয়া, অবাক্ হইলাম।

শ্রীধর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, এ পাগলামী কর্‌ছিলে কেন?"

শ্রীধর বলিলেন— "ভাই, ঠাকুর বলেছিলেন আমার শরীরে সন্ন্যাসরোগের বীজ প্রবেশ করেছে, সুতরাং কোন্ মুহূর্ত্তে আমি কি অবস্থায় মর্‌ব, কিছুই ত নিশ্চয় নাই! এই জন্য তুলসীকানন করেছিলাম; তুলসীর নিকটে যদি মরি, তা হ'লেও ত একটা সদ্‌গতি হবে। তার পর এখন যে বিষম শীত। যদি সন্ধ্যার সময়ে মরি, তা হ'লে যাঁরা শ্মশানে নিয়ে যাবেন, তাঁদের কি কম কষ্ট? ইহা ভেবেই মাথায় খেল্‌লে, আমার দেহ নিয়ে পাছে কেহ উদ্বেগ ভোগ করে তাই সে ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। অমনই অত পরিশ্রম ক'রে ঘরের ভিতরেই কবরের স্থান প্রস্তুত করেছিলাম।" শ্রীধরের মাথা ঠিক হইলে, নিজের পাগলামী নিজেই ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন।

স্বপ্নে ফকিরদর্শন।

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কঠোর সাধক তিনটি মুসলমান ফকির রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি তেজস্বী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন— "দেখ, এই আমি বসিলাম; যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধ হইব, এই আসন হইতে উঠিব না, অনাহারে এই আসনেই কলেবর ত্যাগ করিব।" ফকির সহেব এই বলিয়া বামপদের গুল্‌ফোপরি সোজা হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ সম্মুখে বিস্তার পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ আকর্ষণ পূর্ব্বক, নাসাগ্রে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অপর দুইটি ফকির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক; চেহারা কিঞ্চিৎ স্থূল, স্বভাব ধীর, বর্ণ ঈষৎ গৌর; পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিবিড় অরণ্যের ভিতরে, মাটির নীচে, আসন করিয়া বসিলেন। কিছুদিন পরে, উঁহাদের খবর লইতে আসিয়া, পূর্ব্বোক্ত ফকির সাহেবকে দেখি, তাঁব আর সে আকৃতি নাই, সর্ব্বাঙ্গ বাতে ফুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ফাটিয়া রস গড়াইতেছে, উরু ও কোমরের স্থানে স্থানে পচিয়া মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ফকির সাহেব, অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। অপর দু'টি ফকিরের কি অবস্থা ঘটিল, জানিবার জন্য যেমন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। ফকিরদের তীব্র তপস্যার চিত্র ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত হইল।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

প্রত্যূষে ঠাকুর আর আর দিনের মত পায়চারি করিতে করিতে কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণে, ইক্ষুক্ষেতের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘাসের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্য যে স্থানে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুখে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া দু'চার বার পা তোলা ফেলা করিয়া নিজ আসনঘরে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্নযোগে যে স্থানে ফকির সাহেবকে দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে ঠাকুর নিত্য যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তাই বিস্মিত হইয়া অবসর মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "সকালবেলা পুকুরের কোণে যে স্থানে আপনি যেয়ে দাঁড়ান, ঠিক সেইস্থানে একটি ফকিরের আসন রয়েছে স্বপ্নে দেখ্‌লাম, স্বপ্নটি কি সত্য?"

ঠাকুর বলিলেন— **"স্বপ্নটি সমস্ত পরিষ্কার করে' বল না।"**

আমি স্বপ্নবৃত্তান্ত আগাগোড়া ঠাকুরকে বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন— **"স্বপ্নটি সত্য; ফকির সাহেবের যথার্থ অবস্থাই দেখেছ। ইনিই কৃষ্ণসর্পের দেহ আশ্রয় ক'রে আমার সাধন কুটীরে আসনের নীচে এসে রয়েছেন। আর পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে যাঁদের দেখেছ, তাঁদের মধ্যেও একজন সর্প হ'য়ে আছেন— তাঁর বর্ণ দুধের মত সাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল; সময়ে সময়ে আমতলায় এসে থাকেন; লক্ষ্য রাখ্‌লে দেখ্‌তে পাবে।"**

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিবার পর, আর একটি দিনও, ঠাকুরকে ঐ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া পা তোলা ফেলা করিতে দেখি নাই। ইহার ভিতরে যে কি রহস্য আছে জানি না! স্বপ্নটি শুনিয়া

ঠাকুর আমাকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমটি এক সময়ে মুসলমান ফকিরদের নির্জ্জন ভজনভূমি ছিল। বহু সিদ্ধ ফকিরের কবর এই আশ্রমে এবং আশ্রমসংলগ্ন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে রহিয়াছে। বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে, প্রকাণ্ড আমগাছের গোড়ায়, একটি মুসলমান মহাত্মার কবর আছে। দয়া করিয়া তিনি সময়ে সময়ে মনোহবা দিদিকে (সতীশবাবুর মাতাকে) দর্শন দেন। ফকির সাহেবের তৃপ্তির জন্য বা মর্য্যাদা রক্ষার্থে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃক্ষমূলে ধূপ, ধুনা, প্রদীপাদি দেওয়া হয়।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; ঠাকুরের উপদেশ।

আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের ঝগড়া কোন্দল ও বহির্ম্মুখ ভাব দেখিয়া, আমি ভিতরে ভিতরে গর্ব্বিত হইতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম— বাড়ী ঘরে নানাপ্রকার উদ্বেগ অশান্তি ভুগিয়া যাঁহাদের দিনপাত করিতে হয়, তাঁহারাই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। যথার্থ সাধন-ভজন বা ঠাকুরের সঙ্গলাভ করা ইঁহাদের এখানে থাকিবার উদ্দেশ্য নয়; তাই সামান্য সামান্য স্বার্থ লইয়া ইঁহারা ঝগড়া বিবাদে সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের আকর্ষণে এবং ধর্ম্মলাভাকাঙ্খায় মাত্র আমিই এখানে রহিয়াছি। অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরের আদেশ আমিই অধিক প্রতিপালন করিয়া চলিতেছি এবং ঠাকুরের সঙ্গও আমিই অধিক সময় করিতেছি। এই সব কারণে আর দশটি অপেক্ষা আমি বেশী আদরের হইয়াছি কি না বুঝিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করে, কেহ বা নিয়ম নিষ্ঠা পূর্ব্বক চল্‌তেছে; আবার কেহ বা উল্টা বাগে চল্‌তেছে। কারও সামান্য দোষে গুরুতর শাসন, আবার কারও বা গুরুতর অপরাধেও উপেক্ষা প্রদর্শন, এরূপ কেন?"

১৯শে মাঘ।

ঠাকুর বলিলেন— **"মানুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে, তাকে চল্‌তে দিতে হয় ও চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিনটি লোক একই ঘরে জ্বরে পড়্‌লে, আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনিন্ সকলের পক্ষে ব্যবস্থা কর্‌লে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনিনে উপকার হ'তে পারে, আবার কারও বা মৃত্যুও হ'তে পারে। রোগ এক হ'লেও, রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের অবস্থাদি বুঝে, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কর্‌তে হ'লে, এক এক জনের এক এক ভাবে চলা আবশ্যক হ'তে পারে। যার যেটি, সে সেইটি নিয়ে থাক্‌বে, অন্যের কিসে কি হ'চ্ছে তা দেখ্‌বার প্রয়োজন কি? আর দেখেই বা কি বুঝ্‌বে? আমার মত না চল্‌লে কারও কিছু হবে না মনে করা, অত্যন্ত ভুল।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "সদ্গুরুর নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করলেই কি সকলের একই অবস্থা লাভ হবে?"

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, তা হ'তেই হবে; কোন একটি ষ্টেশনের টিকেট ক'রে দশটি লোক গাড়ীতে চেপে বস্‌লে, জেগে থাক্ বা ঘুমিয়ে থাক্, ঝগড়া বিবাদ ক'রে, কি তাস-পাশা খেলেই চলুক, সকলকে একই স্থানে যেয়ে পৌঁছাতে হবে।"**

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "তা হ'লে আর আদেশ বা নিয়মাদি প্রতিপালন করায় লাভ কি?"

ঠাকুর— **"লাভ খুব আছে। যাবে সকলে একই স্থানে, তবে কেউ পাল্কিতে ব'সে, আবার কেউ বা পাল্কি ঘাড়ে নিয়ে, পথের পার্থক্য এই মাত্র।"**

ঠাকুরের প্রথম দু'টি প্রশ্নোত্তরে মনে মনে একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম, এবার মনে বেশ স্ফূর্ত্তি আসিল; পাছে শ্রীমুখ হইতে আবার অন্য প্রকার কিছু বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে আসন গুটাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

অভিমানে দুর্দ্দশা ; ঠাকুরের অনুশাসন।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, আমার রাশিতে বিষম কুগ্রহ চাপিল। সেই সময় হইতে গুরুভ্রাতাদের উপর তাচ্ছল্য ভাব এবং তাহাদের কার্য্যকলাপে দিন দিন দোষদৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠিলাম। নীলকণ্ঠবেশ, মালা, তিলক, একাহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, নিত্য হোম, পাঠ ও ঠাকুরের সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস ইত্যাদি বাহিরের অনুষ্ঠানে আমার অতিরিক্ত নজর পড়িয়া গেল। সারা দিন আমি নাম করিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতাম, এ সময়ে ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। আহারান্তে রাত্রি ১১/১২টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাই, এই সময়ের মধ্যেও প্রায় দুই একদিন অন্তরই স্বপ্নদোষ হইতে লাগিল। নামে অরুচি ও মনে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও নানাপ্রকার উপাধি উপস্থিত হইল। হস্ত, বাহু, মস্তকাদি যে সকল স্থানে রুদ্রাক্ষ আঁটিয়া ধারণ করি, যে সকল স্থানে জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ এই জ্বালা বৃদ্ধি পাওয়াতে লোম্‌ছা-পোড়ার মত যন্ত্রণা সর্ব্বদা ভোগ করিতে লাগিলাম; এবং সেই সকল স্থানে ফোস্কার মত ছাল উঠিতে লাগিল। মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ভিতরের অশান্তি ও শরীরের ক্লেশ অসহ্য হওয়াতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম, "কয়েকদিন যাবৎ, আমার সপ্তাহে তিন চার দিন করিয়া স্বপ্নদোষ হইতেছে, মনে সর্ব্বদা বিরক্তি, শরীরেও বিষম জ্বালা দিনরাত ভুগিতেছি, এরূপ দুর্দ্দশা আমার হইল কেন?"

২০শে—২৭শে মাঘ।

ঠাকুর বলিলেন— **"দুর্দ্দশা আর হয়েছে কি? এখন থেকে খুব সাবধান হ'য়ে না চল্‌লে, আরও কত দুর্দ্দশায় পড়্‌বে। ধর্ম্মটি তামাসার জিনিস নয়। সকলের পায়ের তলা দিয়ে ধর্ম্মের পথ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ধর্ম্মের সিঁড়িতে উঠ্‌তে হয়। মাথা উঁচু ক'রে কখনও ধর্ম্মলাভ হয় না। অভিমান বড়ই বিষম জিনিস। জটা, মালা তিলকাদি ধর্ম্মের বেশভূষা ধারণ ক'রে, বিন্দুমাত্রও যদি প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ত্যাগ কর্‌তে হয়। না হ'লে উহাই সর্প হ'য়ে দংশন করে। সর্ব্বদা এ সব বিচার ক'রে চল্‌তে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বস্তু ধারণ করা হয় না, এবং যাতে শুধু একটা প্রতিষ্ঠার লোভই বৃদ্ধি পায়, তা যাই হোক্ না কেন, কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ কর্‌বে। আর যেটি তাঁর উদ্দেশ্যে**

রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তাতে ভ্রূক্ষেপ কর্‌বে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চল্‌তে হয়। ধর্ম্মাভিমান বড়ই ভয়ানক। এত অনিষ্ট আর কিছুতেই হয় না। মদখোর, বেশ্যাসক্ত, নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি নিজের দুরবস্থা বুঝে, নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ জঘন্য মনে করে, সে একজন সদনুষ্ঠানী। চরিত্রবান্‌, ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অপরাধের পার কিনারা আছে, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানীর পার সহজে নাই। সাধন, ভজন, তপস্যা, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা, যে কোনও বিষয়ে ধর্ম্মের অভিমান হয়, প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, বিষম রোগ মনে ক'রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্‌বে। শরীর মন ঠাণ্ডা না হ'লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ্য হবে না, গরম হ'য়ে যাবে। এখন যেয়ে রুদ্রাক্ষ মালা তুলে রাখ, শুধু তুলসীর মালা ধারণ কর।

আহারসম্বন্ধেও কোনপ্রকার অনিয়ম অত্যাচার কর্‌লে স্বপ্নদোষ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না। অশুদ্ধ আহার একবার পেটে গিয়ে রক্তে পরিণত হ'লে, ক্রমে ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্তই দূষিত করে। ঐ রক্ত যত কাল দেহে থাকে, নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। উহা একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, নানা প্রকার উৎপাত ভোগ কর্‌তে হয়। এক এক প্রকার রসে এক এক প্রকার বিকারের উৎপত্তি করে। রস ত্যাগ না কর্‌লে, শরীরটি সহজে নির্ম্মল হয় না। শরীর বিকারশূন্য না হ'লে ভজন সাধনও হয় না। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই শরীর শুদ্ধ হয়। আগে শরীরটাকে ঠিক ক'রে নেও। শরীর নিয়েই সব। শরীর ঠিক না হ'লে, কি দিয়ে কি কর্‌বে?"

ঠাকুরের অনুশাসন বাক্য শুনিয়া, আমি নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম, এবং সমস্ত রুদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া রাখিলাম। আহারের পবিত্রতা ও মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য, ঠাকুরের প্রসাদ মিলাইয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাইতে লাগিলাম।

প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিশ্বাস।

২৮শে মাঘ, বুধবার।

গেণ্ডারিয়ানিবাসী, আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সি মহাশয় প্রতিদিনই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন; ঠাকুরের নিকট কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, বাড়ী যাওয়ার সময়ে আমার নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও, প্রসাদে বক্সি দাদার অচলা ভক্তি। দুইটি বা তিনটি অন্নপ্রসাদমাত্র তাঁহাকে গণিয়া দিয়া থাকি; অধিক দিতে চাহিলেও তিনি নেন না। প্রসাদ হাতে পড়া মাত্রেই, তিনি থর্‌ থর্‌ কাঁপিতে থাকেন। আফিংখোরের মত তাঁর চোখ দু'টি বুজিয়া আসে। তিনি ক্ষণমাত্রও না দাঁড়াইয়া, দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া যান। অবসরমত নিজ আসনে বসিয়া, ঐ প্রসাদ মুখে রাখিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, তিন চার ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ থাকেন। আমাদের জেদে পড়িয়া, কখনও তিনি দু 'এক গ্রাস প্রসাদ পাইলে, দু' তিন দিনের জন্য তাঁহার পাইখানা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে তিনি নেশাখোরের মত ঢুলু ঢুলু অবস্থায় দিন রাত কাটান। কথায় কথায় আজ তিনি বলিলেন, 'প্রসাদ পাইলে এমনই একটা নেশা হয়

যে, অন্য কোন দিকে মন টানিয়া আনিবার ক্ষমতা থাকে না; প্রসাদের গুণে মনটিকে নামেতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখে, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়ে।' বঙ্কি দাদার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। ভাবিলাম, এই প্রসাদ ত গ্রাসে গ্রাসে প্রত্যহই খাইতেছি। আমার এরূপ হয় না কেন?

কিছু কাল হয়, রুদ্রাক্ষমালা ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহাতে মনের উৎসাহ উদ্যম যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে; শরীরও পূর্ব্বের মত নাই, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ত এলোমেলো স্বপ্ন দেখা বন্ধ হইতেছে না! সকল প্রকার নিয়ম নিষ্ঠা করিয়াও যখন কোন ফল পাইলাম না, তখন বঙ্কি দাদার কথা মনে হইল। ভাবিলাম, শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়া নিদ্রা যাইব। জাগ্রৎ অবস্থায় শরীর স্বভাবতঃই অস্থির এবং মন চঞ্চল থাকে বলিয়া, প্রসাদের অসাধারণ গুণ অনুভব হয় না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় দেহ মন স্থির থাকে, সুতরাং আহারের বা সঙ্গের কোনও প্রকার দোষে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি অকস্মাৎ বিকারের সম্ভাবনা হয়, মহাপ্রসাদ মুখে রাখিলে, তাহার গুণে অবশ্যই উহার শান্তি হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, অন্য একগ্রাস প্রসাদ মুখে রাখিয়া, নিদ্রিত হইলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম— 'ঠাকুর আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দ উৎসাহ করিতে লাগিল। বহুবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না হইল। ঠাকুর পরম পরিতোষে সেবা করিলেন। অন্যান্য দিনের মত, ভোজনের পাত্র হাতে লইয়া, আমি সকলকে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া, ১৫/১৬ বৎসরের যুবতী, প্রসাদ পাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে, আমার হাতে প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই ঐ পাত্র হইতে প্রসাদ তুলিয়া লইয়া, খাইতে লাগিল। আমি, তাহার হাতখানা বাঁ হাতে আঁটিয়া ধরিয়া, অপর হাতে প্রসাদ তুলিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিলাম। মেয়েটি তখন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিল।' তন্মুহূর্ত্তেই আমি জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়াছে। মুখের সেই প্রসাদই খুব ব্যস্ততার সহিত চিবাইয়া খাইতেছি। অবশিষ্ট রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলাম। ভাবিলাম— 'হায়, এ কি হইল? বহুকাল যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, মহাপ্রসাদের গুণে আজ নিদ্রিতাবস্থায় তাহার স্মৃতি জাগাইয়া আমার এই সর্ব্বনাশ করিল! নির্জ্জিত দোষকে পুনর্জ্জীবিত করাই কি মহাপ্রসাদের গুণ? বোধ হয়, অন্ধভক্তদের কল্পনারই একটা পরিণাম মাত্র।'

মধ্যাহ্নে, মহাভারতপাঠান্তে অবসর পাইয়া, ঠাকুরকে বলিলাম— "স্বপ্নদোষ না হয় সেজন্য শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রেখেছিলাম। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে একটি মেয়ের সহিত প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করে খাওয়াতে, স্বপ্নদোষ হইল। মুখের প্রসাদ চিবাইতে চিবাইতে জাগিয়া পড়লাম। ঐ মেয়েটিকে ত আমি একমত ভুলে গিয়েছিলাম, তবে এমন হ'ল কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তা বল্‌লে কি হয়? প্রকৃতিতে যা কিছু দোষ লুকায়ে আছে, তা সমস্তই ত ফুটে বে'র হবে। উহার প্রতি আসক্তি, তোমার বহুকালই ত ছিল। কল্পনাতেও যখন কোন প্রকার কামভাব উহার প্রতি আন্‌তে না পার্‌বে, তখনই বুঝ্‌বে, এই প্রবৃত্তি তোমার নষ্ট হ'য়ে গেছে। অষ্টপ্রকার মৈথুনই ত্যাগ কর্‌তে হবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শেতে ক'রে যেমন উত্তেজনা হ'য়ে থাকে, উহাদের স্মরণে, দর্শনে এবং উহাদের সহিত আলাপাদি ক'রেও সেই রূপই হয়। সুতরাং বীর্য্যরক্ষা কর্‌তে হ'লে, ইহার একটিও অবহেলা কর্‌লে চল্‌বে না। একটা বিষয়ে**

চেষ্টা কর্‌তে হ'লে, ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে যেতে হয়। না হ'লে কিছুই হবার যো নাই। মাটির দিকে মাথা হেঁট্ ক'রে রেখে, আড়ে আড়ে এদিক্ সেদিক্ তাকালে ব্রতরক্ষা হয় না; বরং চোরের মত কপট ব্যবহারই করা হয়। কোন প্রকার অসৎ কল্পনা মনে এলে, চীৎকার ক'রে গান ক'রো অথবা পাঠ ক'রো।

আমি যে পাত্রে রান্না করি, সেই পাত্রেই আহার করিয়া থাকি; অনেক সময় কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পারি না, এজন্য বড়ই অসুবিধা বোধ হয়। আজ একটি গুরুভ্রাতা, আমাকে একখানা এনামেলের ডিস্ আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তুমি আহার করিও, মাজিতে কোনও কষ্ট হইবে না।' আমি ঐখানা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া, ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই পাত্রে আমি আহার ক'রতে পারি?'

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন-- **"রাম। রাম!! ওতে কি খেতে আছে? ওসব স্পর্শও কর্‌তে নাই। আমি কয়দিন ওতে চা খেয়েছিলাম, এখন আবার নারকেলের মালাতেই চা খাচ্চি। ঐ পাত্র শুদ্ধ নয়।"**

আমি, ডিস্‌খানা লইয়া, যিনি দিয়াছিলেন, তাঁহাকেই দিয়া দিলাম।

ফাল্গুন

গেণ্ডারিয়ায় সিদ্ধ ফকিরদের আশ্চর্য্য কথা।

মাঘ মাসটি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গেণ্ডারিয়ার শীত কিছুই কমিতেছে না। রাত্রিতে দু' এক ঘণ্টা আসনে বসিলেই শীতে যেন শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলে; ধুনি না জ্বালিয়া স্থির থাকিতে পারি না। প্রত্যহই আমি ধুনির কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখি।

৩রা ফাল্গুন, রবিবার।

ফাল্গুন মাস পড়িতেই একদিন আমার ধুনির কাঠ সংগ্রহ ছিল না; নিদ্রাভঙ্গ হইতেই বাহিরে যাইয়া ধুনির কাঠ আনিবার সঙ্কল্প করিয়া, যেমনই আসন হইতে উঠিলাম, তন্মুহূর্ত্তেই ঠাকুর আমাকে পূবের ঘরে নিজ আসনে থাকিয়া, ডাকিয়া বলিলেন— **"ওহে, এখন বাহিরে যেও না, একটু অপেক্ষা কর; বাঘে চ'ড়ে ফকির সাহেব আস্‌ছেন, এখনই চ'লে যাবেন।"**

আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া, অমনই আসনে বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, 'মানুষ কি কখনও বাঘে চ'ড়ে চলতে পারে? পাছে ফকির সাহেব আমাকে দেখিয়া আশ্রমে না আসিয়াই চলিয়া যান, সেইজন্যই বুঝি ঠাকুর, আমাকে বাঘের কথা বলিয়া, এ সময়ে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন।' সকালবেলা উঠিয়া দেখিলাম, আমতলায় ও আশ্রমের দক্ষিণ দিকের উঠানে, স্থানে স্থানে পরিষ্কার বাঘের পায়ের চিহ্ন রহিয়াছে। অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— ফকিরের সঙ্গে বাঘ কেন?'

ঠাকুর বলিলেন— **"অনেক ফকির তান্ত্রিক সাধনের কোনও প্রণালী ধ'রে সাধন-ভজন করেন। ইঁহারা শক্তির উপাসক। সাপ বাঘ সঙ্গে রাখা ইঁহাদের প্রয়োজন হয়।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "রাত্রিতে ফকির সাহেব আসেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"দেখা কর্‌তে।"**

আমি বলিলাম— "আপনি ত আসন ছেড়ে উঠেন না। দেখা হয় কি প্রকারে?'

ঠাকুর বলিলেন— "তা হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "এসব ফকিরদের কি আমরা রাত্রিতে বাইরে থাক্‌লে দেখ্‌তে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন— **"তাঁরা দয়া ক'রে দর্শন দিলেই পার।"**

আজ মহাভারতপাঠের পর, বেলা আড়াইটার সময়ে, একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান ফকির, আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব আসা মাত্রেই, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। ফকির সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল, বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে; কিন্তু তাঁহার কথায় বার্ত্তায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে অনুমান হয় অনেক বেশী। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল, তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, গেণ্ডারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিয়া, সাধন-ভজন করিতেছেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ঠারে ঠোরে সাঙ্কেতিক ভাষায় যে সব আলাপ করিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় ফকির সাহেব বলিলেন— 'বহুকাল আমি জাহাজে চাক্‌রি করিয়াছিলাম। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করাই, আমাদের কাজ ছিল। একবার ভারতমহাসাগরের দক্ষিণ সমুদ্রে আমরা যাইতে যাইতে দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা একটি দেশ দেখিতে পাইলাম, দেশটি খুব বড় বলিয়াই মনে হইল। ক্রমশঃ আমরা সেই দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন দূর হইতে একখানা জাহাজ, আমাদের দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া, আর আগে যাইতে নিষেধ করিল। পরে ঐ জাহাজখানার সহিত মিলিয়া, আমরা আরও কিছু দূর, দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বহুস্থানব্যাপী বিস্তৃত ঘূর্ণীজলরাশি ভয়ঙ্কর স্রোতে সাঁ সাঁ শব্দে চলিয়া একটা কেন্দ্রস্থানে যাইয়া পড়িতেছে। ঐ স্রোতে একবার জাহাজ পড়িলে, কোনও উপায়েই উহা আর রক্ষা করা যাইবে না। ঐ জাহাজের লোকের মুখে শুনিলাম, ঐ স্রোতে পড়িয়া কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়াও গিয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রের ভিতরে এমন কোনও বস্তু আছে, যাহাতে জাহাজ আকর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলে, অথবা জলেরই এমন গুণ যে, তাহাতে কিছু ভাসিতে পারে না। ঐ পাকজলের বাহিরে থাকিয়া, কয়েকদিন আমরা ঘুরাঘুরি করিলাম। তিথিবিশেষে ঐ আবর্ত্তজলের কেন্দ্রস্থানে সোণার মত রং, অতি উজ্জ্বল, খুব বড় একটা জালার মত, কি যেন দেখা যায়, আবার ডুবিয়া যায়। উহা যে কি, দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঘূর্ণীজলের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ দেশে পঁহুছিবার কোন সুবিধাই আমরা পাইলাম না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "রামায়ণে যে লঙ্কার কথা আছে, এই দেশই কি সেই লঙ্কা?"

ঠাকুর বলিলেন— "তা হ'তে পারে। **এখন যাকে লঙ্কা বলে, সেই সিলোন, লঙ্কা নয়। সমুদ্রপথে জাহাজ দিতে ক'রে লঙ্কায় যাওয়া অসম্ভব। শূন্যপথেও নাকি সহজে যাওয়া যায়**

না। জলে টেনে নেয়, এরূপ শুনা আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণী জলের বিবরণও পাওয়া যায়। লঙ্কা বহু দূরে।"

ফকির সাহেব বলিলেন— 'এক বার আমরা উত্তরমহাসাগরে গিয়াছিলাম; সেখানেও আমরা উত্তর দিকে যাইতে যাইতে বহু বিস্তৃত এক দেশ দেখিতে পাইলাম। বরফ কাটিয়া আমাদের জাহাজ বেশী দূর যাইতে পারিল না। আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কিছু খাবার লইয়া, একখানা দ্রুতগামী কলের গাড়ীতে, ঐ দেশের দিকে বরফের উপর দিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা সেই দেশের দক্ষিণ প্রান্তে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, সেখানেও মানুষ আছে; তাহাদের আকৃতি সমস্তই আমাদের মত, কিন্তু মুখটি ঠিক ঘোড়ার মত। তাহারা অতি সুন্দর গান করে। স্বর বড়ই মধুর। অন্তরে তাদের বড়ই দয়া— ব্যবহারে বুঝিলাম।'

ঠাকুর বলিলেন— **"ঐ দেশকে কিম্পুরুষবর্ষ বলে। হয়মুখ নর ঐ দেশে বাস করেন, পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণনা আছে। তাঁহারা অসভ্য নন; খুব ভদ্র।"**

রমণার বুড়োশিবের কৃপা। ঠাকুরের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির কথা।

ঢাকা সহরের উত্তর দিকে, পুরাণ রমণার অধিকাংশ স্থানই, ভয়ঙ্কর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ জঙ্গলে একাকী দিনের, বেলাও, কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। বহু কালের পুরাণো বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, উহার ভিতরে স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, একটি মন্দিরে পঁহুছিলাম। মন্দিরে দুই তিন জন নানকশাহী সন্ন্যাসী আছেন। শুনিলাম, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, গুরু নানক যখন ঢাকা আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁর এই পদচিহ্ন রহিয়াছে। সাধুরা ঐ নির্জ্জন অরণ্যে থাকিয়া, এই পদচিহ্নের সেবা পূজা করিতেছেন। আমাদিগকে তাঁহারা খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং 'কড়া প্রসাদ' দিলেন।

৬ই ফাল্গুন, রবিবার।

ঠাকুর ওখান হইতে বাহির হইয়া, রাস্তার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, বনের ভিতরে, বুড়োশিবের মন্দিরে আমাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন; বুড়োশিবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মন্দিরের সম্মুখে বহু কালের প্রাচীন বটগাছের তলায় বসিয়াই, সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও, সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া, ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ দু' তিন সেকেণ্ডের ভিতরে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ভগবান্ মহেশ্বরের অপরিসীম কৃপার বিস্ময়জনক নিদর্শন, পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ 'এ কি হইল' বলিয়া উর্দ্ধদিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। আমরা, ঘটনাটি স্মরণ করিয়া, ভাবিতে ভাবিতে,বেলা অবসানে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম— 'যে স্থানে কোনও কালে যাই নাই, যাহা কখনও দেখি নাই, সেরূপ কোন কোন স্থানে যেয়েও মনে হয়, যেন পূর্ব্বে কখনও সেই স্থান দেখেছি। এরূপ হয় কেন?'

উত্তর— **"পূর্ব্বজন্মে যে সকল স্থানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, সেখানে উপস্থিত হ'লে, কারও কারও, উহা পরিচিত ব'লে মনে হয়।"**

এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির বিষয় বলিতে লাগিলেন—

ঠাকুর বলিলেন— "গয়াতে যখন আমি ছিলাম, একদিন বেড়াতে বেড়াতে, ফল্গুর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একটি মন্দিরে নৃসিংহদেব দর্শন ক'রে, তখনই আমার মনে পড়্‌ল, যেন পূর্ব্বে কখনও আমি এই মূর্ত্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা স্মরণ হ'তে লাগ্‌ল। ঐ স্থানে, ফল্গুর পারে, পুরাণ বান্ধান ঘাটের উপরে, একটি অশ্বত্থ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিম দিকের একখানা ডালাতে ছুরি দিয়ে 'ওঁ রাম' এই নামটি বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনই আমি উঠে সেই গাছটির কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখ্‌লাম আমার সেই লেখা ঐ ডালাতে রয়েছে। তবে ডালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে পড়েছে। তার পরে রামগয়ার যে স্থানে থেকে, সাধন-ভজন করেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে দু'টি পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়্‌ল। আমি পাহাড়ের সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে, সেই সমস্ত স্থান ও চিহ্ন দেখে অবাক্ হ'লাম। পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতিই সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌ল।

বহুতীর্থ দর্শন ও বহুস্থান পর্য্যটন কর্‌তে কর্‌তে, কেহ পূর্ব্ব জন্মের সাধন-ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্মাৎ তাঁর পূর্ব্বভাব বা স্মৃতি, মুহূর্ত্তমধ্যে উদয় হ'তে পারে। বহু সাধন-ভজনেও, এটি সহজে হয় না। কোন্ স্থানের সহিত, কোন্ বিগ্রহের সহিত, কার জীবনের কি সম্বন্ধ আছে, বলা যায় না। সমস্ত যোগাযোগ হ'লে, কারও কারও ভাগ্যে তাহা প্রকাশ হয়। সকলেরই যে হবে, এমনও নয়।"

প্রশ্ন—"নোংরা অপবিষ্কার একটা স্থানেতে উপস্থিত হ'লেও, অনেক সময়ে দেখা যায়, মন সেখানে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে, চিত্ত যেন আপনা আপনি জমাট্ হ'য়ে পড়ে। আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাগানবাড়ীতে গিয়েও, যেন মন বিরক্তিপূর্ণ হ'য়ে যায়, চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এর কারণ কি?"

উত্তর— "বিশেষ বিশেষ ভাবে, যে যে স্থানে, যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে, সে সকলের একটা ভাব ঐ সকল স্থানে জমাট হ'য়ে থাকে। ওখানে উপস্থিত হ'লেই, সেই সকল ভাবে চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই এসকল অনুভবে আসে, নচেৎ হয় না। ভজন, সাধন, তপস্যা, দেব দেবীর অধিষ্ঠান, মহাপুরুষদের বাস বা পরলোকগত পুণ্যাত্মাদের অবস্থান, যে সকল স্থানে হয়, সহস্র বৎসর পরেও সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই সকল ভাবে চিত্তকে অভিভূত করে। সে প্রকার, আবার যে সব স্থানে বিষম অত্যাচার, অনাচার, দুষ্কার্য্যাদির অনুষ্ঠান হয়, বহুকাল পরে সেখানে গেলেও, সে সকল ভাব চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত নির্ম্মল হ'লেই, স্থানের প্রভাব বুঝ্‌তে পারা যায়।"

আদেশপালনে অসমর্থতা; ঠাকুরের সহানুভূতি ও উপদেশ।

স্বভাবে যে সকল দোষ বহুকালযাবৎ রহিয়াছে এবং যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া, এত কাল একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম— 'এসব দোষ ছাড়াইতে আর চেষ্টা

করিতে হইবে কেন? ইচ্ছামাত্রই ত ত্যাগ করা যায়,' এখন তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, দেখিতেছি, একটিও ছাড়াইতে পারিতেছি না। মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি, এ সকল দোষের শিকড় স্বভাবের এত নিভৃত স্তরে যাইয়া ঢুকিয়াছে যে, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। স্বভাবের সেই বিন্দুমাত্র দোষকেই, এখন যেন অপার সিন্ধু মনে হইতেছে। নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া হতাশ হইয়া, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম— 'সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া স্বভাবের একটি দোষও ত ছাড়াইতে পারিলাম না। এখন কি করিব?'

৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

ঠাকুর খুব স্নেহভাবে সহানুভূতি করিয়া বলিলেন— **"স্বভাবের দোষ কি কেহ ইচ্ছামাত্রেই ত্যাগ কর্‌তে পারে? নিষেধ বর্জ্জন আর বিধির অনুষ্ঠান— ইহার মধ্যে নিষেধ বর্জ্জন অপেক্ষা বিধির অনুষ্ঠানই সহজ। বিধির অনুষ্ঠান কর্‌তে কর্‌তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলি আপনা আপনি ধীরে ধীরে ত্যাগ হ'য়ে আসে। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর, দোষ সমস্ত আপনিই যাবে।"**

আমি বলিলাম— 'যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে বলেছেন, তাহা ত ঠিকমত পারছি না।'

ঠাকুর বলিলেন— **"চেষ্টা ক'রে যাও। পার না পার, সে দিকে লক্ষ্য রেখো না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা কি সহজেই লোকে কর্‌তে পারে? এজন্য বার বৎসর সময় দিয়েছেন। বার বৎসরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসে। দু'চার বারের চেষ্টায় ফল না পেলে, হাত পা ছেড়ে দিতে নাই; যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেষ্টা রাখ্‌তে হয়।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— 'যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জ্জন করতে বলে দিয়েছেন, তা না পার্‌লে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন?'

ঠাকুর বলিলেন— **"কিছু না। আমি ত কতই বল্‌ব, সবই কি আর একেবারে ঠিক মত কর্‌তে পার্‌বে? তা হ'লে ত সিদ্ধই হ'লে। যতটা পার ক'রে যাও। চেষ্টা ক'রেও যদি না পার, কোন অপরাধই হবে না। ইচ্ছা ক'রে একটা অনিয়ম না কর্‌লেই হ'ল। হঠাৎ যা হ'য়ে পড়ে, তা নিজে কর্‌লে মনে কর কেন? নিজে কর্‌লাম ভাবলেই ত অপরাধ। সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব করছেন, তিনিই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন— এটি বুঝ্‌লেই শান্তি।"**

আমি বলিলাম— 'একটা দূষণীয় কার্য্য না করবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করেও, যখন পরাস্ত হয়ে করে ফেলি, তখনও ত অনুতাপ হয়; মনে হয়, 'বুঝি আরও চেষ্টা কর্‌লে উহা না করে পারতাম।'

ঠাকুর বলিলেন— **"যথার্থ পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আমরা কিছুই ত বুঝি না। ছোট বেলা হ'তে দেখে শুনে একটা ভাল মন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে গেছে। বাস্তবিক তত্ত্ব বুঝা বড়ই**

কঠিন। লোকের লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য্য করি না; মনে করি— পাপ। যথার্থই উহা পাপ কি না, ঠিক বলা যায় না। পাপ পুণ্য সকলেরই একটা একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হ'লেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝ্‌তে পারে। কোনও কার্য্যে পাপ বোধ হ'লে তাকি সে আবার কর্‌তে পারে? এখন যাহা পাপ পুণ্য মনে কর্‌ছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র।"

বারদি নিবাসী জমিদার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বর্ত্তমান খ্যাতনামা প্রিন্সিপ্যাল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় কোনও সময়ে নানা কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,— "আমরা প্রত্যহ রাশি রাশি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে আরও একটি গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়া যেন আপনি আমাদিগকে আরও বিপন্ন করিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"কেন?"**

উত্তর— "আপনি যে সকল বিধি নিষেধ বিধান করিয়াছেন, তাহা পালন করা সুদুষ্কর। আমাদের অপর অপরাধের উপর, গুরুনির্দ্দেশলঙ্ঘন নামে আরও গুরুতর অপরাধের যোগ হইয়াছে।"

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন— **"এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কিছু স্থির হয়েছে?"**

কুঞ্জ বাবু বলিলেন— "আমি মনে মনে একটা সমন্বয় করিয়া লইয়াছি, তাহা ঠিক কি না, আপনি জানেন।"

ঠাকুর বলিলেন— **"কি সমন্বয়?'**

উত্তর— "আপনার বিধি নিষেধ আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও অতি কঠিন। একটি দিনও যদি তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি, তবে ত জীবন্মুক্ত হইযা যাই। আপনি এরূপ আশা ও ইচ্ছা করেন না যে, একদিনে আমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইব। কতকগুলি উচ্চলক্ষ্য আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। তাহার দিকে চাহিয়া সাবধান ও সচেষ্ট ভাবে চলিলে ক্রমে আমরা সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইয়া ধন্য হইব, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তাহা না হইলে, আমাদের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের পথ প্রস্তুত হইয়াছে মন করিতে হয়।"

ঠাকুর বলিলেন— **"ঠিক, ঠিক, তাই ত ঠিক।"**

সাধুর প্রতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি।

১০ই ফাল্গুন, রবিবার। আজ অপরাহ্নে, সহর হইতে অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মবিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল।

একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলিলেন— "ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন শুনিতে পাই, তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন— **"এ সম্বন্ধে আমি কোন কোন জমাতের মহান্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা বল্‌লেন, 'বাঙ্গলা দেশে তাঁদের আদর যত্ন নাই, থাক্‌বারও স্থান নাই। এদিকে এলে**

আহার ও বাসের অসুবিধাতেই তাঁদের ভেগে পড়্‌তে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই সাধুদের থাক্‌বার বড় বড় ধর্ম্মশালা, সত্রাদি আছে; যত কাল ইচ্ছা সাধুরা তাতে আরামে থাক্‌তে পারেন। স্থানীয় জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ধনী লোকেরা তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে সেবা করেন। বাঙ্গলা দেশে সে প্রকার স্থানও নাই, আর তাঁদের সেবা করে এমন লোকও নাই। বরং গুণ্ডা, চোর, বদ্‌মাইস মনে ক'রে, বাঙ্গালীরা তাঁদের অবজ্ঞাই করে।"

একজন বলিলেন— 'পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলোকেরা খাবার না পাইলে, গায়ে ভস্ম মেখে, লেংটী প'রে, সাধু হয়। অনেক গুণ্ডা বদ্‌মাইসও সাধুর বেশে ঘুরে। সুবিধা পাইলে তারা সর্ব্বত্রই চুরি ডাকাতিও করে। ভাল সাধুরা একটু পরিচয় দিলেই ত পারেন।'

উত্তর— **"পরিচয় নিতে জান্‌লে তাঁরাও পরিচয় দেন। অনেকে সাধুদের পরখ্‌ কর্‌তে গিয়ে বিপন্নও হ'য়ে পড়েন।"**

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। যথা— "একবার গঙ্গাসাগরের পথে একদল সাধু রামপুরহাটে কয়েক দিন অবস্থান করিযাছিলেন। রাস্তার ধারে অনাবৃত মাঠে তাঁহারা ধুনি জ্বালিয়া দিনরাত থাকিতেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেবা অপবাহ্নে তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিতেন। একটি বাঙ্গালী বাবু— উকিল, প্রত্যহই আসিয়া সাধুদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সাধুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। স্থূল শরীব দেখিলে, তিনি কোনও সাধুর পেটে লাঠি দিয়া খোঁচা মারিয়া, বলিতেন, 'আরে তোম্‌ তো হালুয়া মালপোয়াকা সিধ্‌ হো, ক্যাত্‌না খাতা হ্যায়;' কোন সাধুর জটাটি ঝাঁক্‌রাইয়া বলিতেন, 'চোরাই মাল ক্যাত্‌না ইস্‌মে রাখা হ্যায়? রাত্‌মে চুরি কর্‌তা হ্যায়, আউর দিন মে সাধু বন্‌কে বৈঠা হ্যায়।' সাধুরা ঐ বাঙ্গালী বাবুকে দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইতেন। জমাতের ভিতরে একটি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি মহান্তকে বলিলেন, 'মহারাজ, বাঙ্গালী বাবু নিত্‌ আয়কে বড়া অপরাধ কর্‌কে যাতা হ্যায়, উস্কো জেরা কৃপা কীজিয়ে।' মহান্ত বলিসেন, 'বাঙ্গালীলোক সাধুকো নেহি মান্‌তা হ্যায়।' একদিন ঐ বাবু আসিয়া মহান্তকে বলিলেন, 'এই সাধু! তোম্‌ গাঁজামে তো খুব দম্‌ মারতা হ্যায়, ইস্‌মে তো খুব কেরামৎ। আউর কুছ্‌ কেরামৎ দেখলানে সেক্‌তা হ্যায়?' এই সময়ে সেই সিদ্ধপুরুষটি উকিল বাবুকে ডাকিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন, **'আরে বাঙ্গালী বাবু, ক্যা বল্‌তা হ্যায়? সাধুকা আউর কুছ্‌ কেরামৎ দেখোগে? ভালা, লেড়্‌কা বালা লেকে ঘর কর্‌তা হ্যায় তো, আচ্ছা, চলা যাও ঘর, আব্‌ যায়কে সাধুকা কেরামৎ দেখো।'** **সাধুর কথা শুনিয়া উকিল বাবু চমকিয়া গেলেন, মুখ তাঁর শুকাইয়া গেল; তিনি দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিলেন; রাস্তায় দেখিলেন, তাঁর চাকরটি ছুটিয়া আসিতেছে। বাবুকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে।' বাবু বাড়ী যাইয়া, ছেলের মূর্চ্ছা অবস্থা দেখিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; তখনই ওঝা, বৈদ্য, ডাক্তারাদি আনাইয়া যত প্রকার চেষ্টা করিবার, করিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। তখন সাধুর ইচ্ছাতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে**

বুঝিয়া, সস্ত্রীক তিনি ঐ সাধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কান্নাকাটি করিয়া সাধুর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু বলিলেন— 'আব্ কাহে আয়া? সাধুকা কেরামৎ দেখো না? আউর তিন রোজ বাদ আয় যাও।' সাধুর কথায় আশ্বাস পাইয়া. উকিল বাবু, ছেলেটিকে **একটি** ঘরে রাখিয়া দিলেন, তাহার শরীর ফুলিয়া গেল; তিনি দিন পরে তিনি সাধুর পায়ে পড়িয়া ঔষধ চাহিলে, সাধু ধুনি হইতে কিছু ভস্ম লইয়া বাবুটির হাতে দিয়া বলিলেন, 'আপ্‌না হাত্‌সে শও ঘয়লা পানি লেকে, লেড়্‌কা কা শিরপর ঢাল দেও, আউর এহি ভসম্ আচ্ছা কর্‌কে উস্‌কা শরীরমে মল্ দেও; আধা ঘণ্টা বাদ লেড়্‌কা আচ্ছা হো যায়েগা।' সাধু এই বলিয়া তখনই জমাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাবুটি ঐ প্রকার করাতে ছেলেটি সুস্থ হইয়া উঠিল। সকলে অবাক্। বাবুটি পরে সাধুকে ঢের খুঁজিলেন, কিন্তু আর পাইলেন না।"

স্বপ্ন— কর্ম্মের উপদেশ।

ঠাকুর, আমাকে কিছুকালযাবৎ, আশ্রমস্থ সকলের সেবা ও বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। সকালবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার নিয়মিত কার্য্য করিয়া প্রায় অবসর পাই না, সময়ে সময়ে নাম করিতে বিরক্তি বোধ হইলেও, বাহিরের কোন কাজ কর্ম্মে বা কাহারও সেবা করিতে আমাব প্রবৃত্তি হয় না। আমি ঐ সময়ে কোন একটি প্রশ্ন তুলিয়া ঠাকুরেরই সঙ্গে গল্প করি। গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, একটি মহাত্মা আমাকে আসিয়া বলিলেন, "গুরু যেমন বলেছেন, ঠিক সেই মত ক'রে যাও, ওতে কখনও নিরুৎসাহ হ'য়ো না। কর্ম্মটি ত্যাগ কর্‌তে নাই। যতকাল না বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হয়, তত কালই কর্ম্ম কর্‌তে হবে; রজস্তমোগুণ যত কাল আছে, কর্ম্ম না ক'রে নিস্তার নাই। আলস্য ক'রে কর্ম্ম না কর্‌লে, পরে ভুগ্‌তে হবে। বৈধ কর্ম্ম দ্বারাই রজস্তমোগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়।' স্বপ্নের কথা ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর বলিলেন— **"সময় দীর্ঘ বোধ হ'লে বা নাম কর্‌তে বিরক্তি জন্মালে, ব'সে থাক্‌তে নাই, বাহিরের কাজই কর্‌তে হয়। ঐ সময় জোর ক'রে নাম কর্‌তে গেলে, নামে আরও শুষ্কতা আসে। তাতে অনিষ্ট হয়।"**

১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আমি বলিলাম— আমার মনে হয়, বাহিরের কাজ কর্ম্ম করা অপেক্ষা, ঐ সময়ে জোর ক'রে নাম বা পাঠ করাতেই বেশী উপকার হয়।

ঠাকুর বলিলেন— **"সে কিছু নয়। বাহিরের কাজ কর্ম্ম করা আর নাম করা, আমি কিন্তু সমানই মনে করি। সমস্তই ত কর্ম্ম। লক্ষ্যটি স্থির থাক্‌লেই হ'ল। কর্ম্ম করা নিয়ে কথা, কার কোন্ কর্ম্মে কি বস্তু লাভ হয়, তা কে বল্‌তে পারে? লক্ষ্যটি স্থির রেখে কাঁথা সেলাই-ই কর আর নামই কর, একই কথা। জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত, এরূপই কর্‌তে হয়। তোমার এখনও একটা জীবনের দিক্ ঠিক হয় নাই। যখন তাহা ঠিক হ'য়ে যাবে, তখন একধারা কর্ম্ম কর্‌বে। জীবনের গতি ঠিক হ'তে, এ জীবন কোন্ দিকে কোন্ পথ দিয়ে যাবে, বলা যায় না। সকলেরই এক পথ নয় ত। নানাপথে চ'লে, মানুষ লক্ষ্যবস্তু লাভ করে। ব'সে থাক্‌তে নাই; তা হ'লেই ক্রমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।"**

স্বপ্ন— প্রলয়ের দৃশ্য।

গতরাত্রে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম— 'বেলা অবসানপ্রায়, আমি রান্না করিতে বসিয়াছি, অকস্মাৎ ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বসিয়াও আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। চারিদিকে ভীষণ শব্দ শুনিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, বিষম ব্যাপার—

১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

অনন্ত আকাশব্যাপী ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবায়ু গ্রহ-উপগ্রহ-সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটি চক্রাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোথায় যেন লইয়া যাইতেছে। ধূলিরাশিতে সমস্ত নভোমণ্ডল একেবারে ধূমাকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষীসকল ঘূর্ণীবায়ুতে পড়িয়া আবর্ত্তজলের তৃণের মত, ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর দিকে আসিয়া পড়িতেছে। চটাচট্ শব্দে চতুর্দ্দিকে রাশিকৃত শিলাবর্ষণ হইতেছে। মহা দুর্লক্ষণ দেখিয়া, আমি হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম— ঝল্‌মল্ করিয়া ঐদিকে একটি সূর্য্য উঠিল। বিস্মিত হইয়া অমনই আমি আকাশের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিলাম— সকল দিকেই একটি একটি করিয়া সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দশ বারটি ভয়ঙ্কর প্রখরতেজোবিশিষ্ট সূর্য্যের এককালে প্রকাশ ও তাহাদের ঘন ঘন কম্পন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে ঐ সকলের সহিত পৃথিবীটিও ভয়ঙ্কর সোঁ সোঁ শব্দে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া, নিম্নদিকে কোথায় যেন যাইতে লাগিল। আমি অমনই আসনে বসিয়া গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যানে রাখিয়া 'জয়গুরু,' 'জয়গুরু', বলিতে বলিতে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই দেখি, সকল দিক্ শান্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত নিস্তব্ধ!' অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন,— **"ভবিষ্যৎ প্রলয়ের দৃশ্যটিই দেখেছ। প্রলয় অনেক প্রকার আছে। যা দেখেছ, তা এই সৌর জগতের প্রলয়, ওরূপ একটা সময় শীঘ্রই আস্‌ছে বটে।"**

স্বপ্ন— ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্যোগ।

তিন চার দিন হয়, স্বপ্নে ভয়ানক প্রলয়ের দৃশ্য দেখিয়াছি, গতকল্য আবার তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া, মন অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম— আমরা বহুলোক ঠাকুরের সঙ্গে একটা স্থানে রহিয়াছি। ঠাকুর উত্তর দিকে আসন করিয়া বসিয়া বলিলেন, 'আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে; এখন আমি দেহ ত্যাগ করবো।' পরে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে আমার কাঁথাখানা ফেলে এসেছিলাম, তাহা কেহ নিয়ে আস্‌তে পার?' আমি অমনই শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁথাখানা আনিয়া দিলাম। ঐ সময়ে গুরুভ্রাতাভগিনীরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঠাকুরের বামপার্শ্বে, একহাত অন্তরে রহিলাম। ঠাকুর সকলেরই প্রতি সস্নেহদৃষ্টি করিয়া, এক এক জনকে এক একটা কিছু দিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঠাকুরের নিকটে থাকিলেও, ঠাকুর আমাকে

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

কিছুই দিলেন না। পরে দেহত্যাগের সময়ে, সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কি, তোমাকে কিছু দিই নাই?' এই বলিয়া নিজ মস্তকের সম্মুখ হইতে একটি জিনিস মুঠে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন 'আচ্ছা, তুমি এটি নেও।' ওটি পাওয়া মাত্রে আমি মাথায় রাখিলাম। ভাবাবেশে উন্মত্তবৎ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আমি ক্ষণকাল পরে ঐ জিনিসটি মাটিতে ফেলিয়া আসন করিয়া উহার উপরে বসিয়া, নাম করিতে লাগিলাম। আর অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুরকে স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম— 'আমি ত কখনও এ সব কল্পনাও করি না, তবে এরূপ দেখিলাম কেন?'

ঠাকুর বলিলেন— **"কেন দেখ্‌লে, বলা যায় না। এ সব স্বপ্ন লিখে রাখ্‌তে হয়। সমস্ত স্বপ্নই অলীক নয়। একটি স্বপ্ন বিশ বৎসর পরে সত্য হয়েছে, দেখেছি।"**

আমি বলিলাম— যে বস্তু মাথায় একবার স্পর্শ কর্‌লে কৃতার্থ হওয়া যায়, তা মাটিতে ফেলে পেতে নিয়ে, আসন ক'রে বস্‌তে, আমার প্রবৃত্তি হ'লো কেন?

ঠাকুর বলিলেন— **"ওটি হ'চ্ছে শক্তি। ভগবানের নাম করতে হ'লে, শক্তির উপরেই ত বস্‌তে হয়।"**

ইহার পর ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিলেন— **"তোমাদের কয় ভাইয়ের ভিতরেই বৈষ্ণব বীজ রয়েছে। এখন যে যে ভাবেই থাক, পরে সকলেরই বৈষ্ণব ভাব দাঁড়াবে।"**

ঠাকুর দেহ ছাড়িবেন ভাবিয়া কোথায় দুঃখে অধীর হইব, তাহা না হইয়া, ঠাকুর এ জিনিস আমাকে দিবেন মনে করিয়া, গর্ব্ব হইতে লাগিল। হায় দশা! এই ত আমার অবস্থা।

কৃপণতায় অনুশাসন। ঘরখানা উইল কর্‌বে কার নামে?

২১শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

আশ্রমের দক্ষিণের ঘরে, সকালে সন্ধ্যায়, অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হন। এই ঘরখানাই সকলের বসিবার ঘর। সুতরাং আসনে স্থির হইয়া এ ঘরে বসিবার যো নাই। ঠাকুরকে যাইয়া আজ বলিলাম, 'দক্ষিণের ঘরে সর্ব্বদাই লোকের গোলমাল। ওখানে সাধন করার বড়ই অসুবিধা। সকলেই এসে বাজে গল্প করে, অথচ তাহা বল্‌লে ঝগড়া হয়।'

ঠাকুর বলিলেন— **"ওখানে অসুবিধা হ'লে অন্যত্রও ত যেতে পার? গাছতলায়, এদিকে সেদিকে, আশ্রমে স্থানের ত আর অভাব নাই। নাম করা নিয়ে কথা, তা ত যেখানে সেখানেই হ'তে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলে মিশে একটা আনন্দ করে, সেখানে তাদের বাধা দিয়ে, নিজের সুবিধার চেষ্টা কর্‌তে নাই।"**

আমি বলিলাম— 'আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, পুকুরের ধারে, আপনি যদি বলেন, একখানা ছোট ঘর করে নিতে পারি। তা হ'লে আর কোনও অসুবিধা থাকে না।'

ঠাকুর বলিলেন— **"তার পর? কোথাও চ'লে গেলে ঐ ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে?"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর একথা আমাকে বলিলেন কেন?'

রাত্রিতে ঠাকুর আমার সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন— **"ওর সাধন-ভজনেতে যা একটু হ'চ্ছে, এক কৃপণতা দোষে তা মাটি ক'রে দিচ্ছে। হাতে ওর এক শত টাকা আছে, অনেক চেষ্টায় জমায়েছে। তা কোন প্রকারে খরচ করায়ে দিতে পারেন? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা কি না। ধর্ম্মার্থীদের স্বভাবে একটি মাত্র দোষ থাক্‌লেও, তাতে ক'রে সাধন-ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। এখন হ'তে এবিষয়ে সাবধান না হ'লে, ক্রমে ঘটনায় প'ড়ে, ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, ঠিক হবে।"**

ঠাকুর এ সময়ে ছোটদাদার উদারতার খুব প্রশংসা করিলেন। 'ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে?' ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য্য এ সময় আমি বুঝিলাম। ঠাকুরের মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া, মাথা আমার বিষম গরম হইয়া গেল। ভাবিলাম, 'প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে যতকাল উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্লেশ বোধ আছে, ততকাল বিনা আয়াসে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ক্লেশের ও অশান্তির উপশমের ব্যবস্থা রাখা দোষ হইল। নিয়ত অভাব ভোগ করিয়া মন যদি অশান্তিপূর্ণই রহিল, তা হ'লেই বা সাধন-ভজন করিব কিরূপে? অর্থ সঞ্চয় ত সাধন-ভজনেরই সুবিধার জন্য, বিলাসিতার জন্য ত নয়। ঠাকুর এত বুঝেন, আমার এই শুভ অভিপ্রায়টি বুঝিলেন না!'

আমার সঙ্কীর্ণতা। ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা।

২২শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

গতকল্য ঠাকুরের মুখে আমার সঙ্কীর্ণতার বিষয় শুনিয়া অবধি, ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছি। প্রাণ যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। অভাব বশতঃই আমার এই কৃপণতা অথবা স্বভাবেই আমার সঙ্কীর্ণতা, তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছেন যে, **'ক্রমে ধাক্কা খেয়ে, এ দোষ আমার দূর হবে।'** কিন্তু ধাক্কাও ত কম খাইতেছি না! দোষ দূর হইতেছে কই? কয়দিন হয়, সরকারি ভাণ্ডারে 'ঘৃত বাড়ন্ত হইয়াছে' দিদিমা বলাতে, ঠাকুরের সেবায় আধ ছটাক পরিমাণ ঘৃত প্রত্যহ আমি দিয়া আসিতেছিলাম। পাঁচ ছয় দিন ঐ প্রকার দেওয়ার পর, একদিন আমার মনে হইল, 'ভাল! সরকারি ভাণ্ডারে ত ঘৃত আসিতেছে না, দিদিমাও বেশ সুবিধা বুঝিয়াছেন। ওরা যত কাল ঘৃত না আনিবে, তত কালই ত এই প্রকার ঠাকুর সেবায় আমাকে ঘৃত দিতে হইবে! এত কষ্টে আমি ঘৃত সংগ্রহ করি; এ ভাবে প্রতিদিন দিলে আমার এক মাসের হোমের ঘৃত ত দশ দিনেই শেষ হইয়া যাইবে।'

এই প্রকার বিচার ও আক্ষেপ আমার মনে আসার পরে, সেই দিনেই, ঠাকুর, দিদিমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন— **"আহারের সময়ে ওর ঘি আমাকে দিবেন না। ঐ ঘি আমার হজম হবে না।"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে মনে করিলেন, 'হোমের ঘৃত বহু দিনের সংগ্রহ—

নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই ঠাকুর ঐ কথা বলিলেন।' আমি কিন্তু ঠাকুরের বলার তাৎপর্য্য, তখনই বুঝিয়া, কয়দিন যাবৎ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। আমার অভিপ্রায় মতই ত ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে তাতেও এত জ্বালা কেন? ভিতরের ক্লেশ অসহ্য বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, 'আমার সঙ্কীর্ণতা কিসে যাবে, বলিয়া দিন। হাতের টাকাগুলি আমি দান ক'রে ফেল্‌ব?'

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন— **"টাকা যা রয়েছে, এখনই ব্যয় ক'রে দরকার নাই। এখন থাক্। সাময়িক একটা ভাবে বা উৎসাহে কোন কাজই কর্‌তে নাই। অনেক সময়ে, উৎসাহে দান ক'রে, পরে অনুতাপে লোক নরক ভোগ করে। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীর ভাবে কর্‌তে হয়। এখন থেকে আর কিছু সঞ্চয় ক'রো না। দাদারা যাহা মাসে মাসে দেন, পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যয় ক'রে ফেলো। যে পথে চল্‌ছ, তাতে সঞ্চয় কর্‌তে নাই।"**

আমি বলিলাম— 'ব্যয় কি নিজের প্রয়োজনে কর্‌বো, না অন্যের জন্য?'

ঠাকুর বলিলেন— **"তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কি? আজ থেকে আহারের জন্য ভিক্ষা কর্‌বে। অর্থ কারও নিকট চাইবে না। ভিক্ষায়, দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত, গ্রহণ কর্‌বে না। কেহ বেশী দিয়ে গেলে, তা কাকেও দিয়ে দিবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় কর্‌বে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, রান্নাও কর্‌বে না। যে দিন ভিক্ষায় কিছু না জুট্‌বে, ভাণ্ডার হ'তে নিবে। আশ্রমের ভাণ্ডারের সামগ্রী ত ভিক্ষুকদেরই জন্য। এই ভাবে চ'লে, যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে, তবেই ত সন্ন্যাস। না হ'লে, এখন থেকে যে দিকে জীবনের গতি হবে, সে দিকেই যেতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই, সমস্ত অভ্যাস কর্‌তে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হ'লেই ত সব হ'লো। এ সকল অভ্যাস এখন না কর্‌লে, আর কর্‌বে কবে?"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ভিক্ষা কয় বাড়ী পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌বো?'

ঠাকুর বলিলেন— **"ভিক্ষা তিন বাড়ী পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌বে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— 'কোন্ কোন্ জাতির বাড়ী ভিক্ষা করা যায়?'

ঠাকুর বলিলেন— **"চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ীই করা যায়। শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন সর্ব্বত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের, ভিক্ষাই ব্যবস্থা।"**

প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে; এ কি চমৎকার!

ঠাকুর এ সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন, পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম— 'লোকে বলে, প্রথম দিনের ভিক্ষা যে ভাবে যাহা পাওয়া যায়, সারা জীবনে ভিক্ষা সে ভাবেই সেই প্রকারের বস্তু লাভ হইয়া থাকে। এজন্য নাকি উপনয়নের সময় ভিক্ষা মা'র হাতেই প্রথমে লইতে হয়। স্নেহভাবে দরদ করিয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তু, ঠাকুর বিনা কে আর আমাকে দিবে?' এই মনে করিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'জীবনে প্রথম ভিক্ষা তা হ'লে আপনার নিকটই আজ কর্‌বো?'

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন— **"তা বেশ, আজ আমিই তোমাকে ভিক্ষা দিব, কাল থেকে অন্য বাড়ী যেও। এখন ভিক্ষা এ পাড়াতেই ক'রো।"**

সকালবেলা, ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ পাইয়া, নিজ আসনে আসিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে দেখি, আশ্রমে মহা ঘটা পড়িয়া গেল। একটি অবস্থাপন্ন ভক্ত গুরুভ্রাতা, আজ ঠাকুরের সেবার জন্য প্রচুর সামগ্রী লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পলাউ, ছানার ডাল্না প্রভৃতি বহু উপাদেয় খাদ্য, ঠাকুরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইল। বেলা প্রায় একটার সময়ে, ঠাকুরের সেবা হইল। আহারান্তে ঠাকুর, নিজ হাতে ভুক্তাবশিষ্ট পলাউ এবং ডাল্না প্রভৃতি, একটি পাথরের বাটীতে তুলিয়া, আমাকে ডাকিয়া উহা দিয়া বলিলেন— **"এই নেও, আজ এই তোমার ভিক্ষা। এখন নিয়ে রেখে দেও, তোমার আহারের সময়েই খেয়ো।"**

আমি খুব আনন্দিত মনে উহা লইয়া আসিলাম এবং ঢাকিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম,— 'হায় ঠাকুর! পলাউ যদি দিলে, তা হ'লে গরম গরম এখনই খেতে বল্লে না কেন? চার পাঁচ ঘণ্টা পরে ইহা ত জুড়ায়ে একবারে জল হ'য়ে যাবে। প্রথম ভিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রসাদ হাতে ধ'রে দিলেও গরম থাক্তে তৃপ্তির সহিত খেতে দিলে না!'

ঠাকুরের সেবার পর, নিয়মিত রূপে মহাভারত পাঠ করিয়া, স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর, আর আর দিনের মত, ৫।। টার সময়ে আমাকে বলিলেন— **"যাও, এখন তুমি আহার কর গিয়ে।"** আমি আহার করিতে বসিয়া, প্রসাদের বাটীটা স্পর্শ করিয়াই, চমকিয়া উঠিলাম। 'দেখিলাম, তরকারি সহিত সমস্ত পলাউ চমৎকার গরম রহিয়াছে, ঠিক যেন উহা কেহ উননের উপর হইতে আনিয়া রাখিয়াছে।' পাথরের বাটীতে পলাউ-প্রসাদ, পাঁচ ঘণ্টা পরেও কি প্রকারে এত গরম রহিল, ভাবিয়া একবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ উহা লইয়া বসিয়া কান্দিলাম। প্রসাদ পাইতে আজ আমার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, 'সঙ্কল্প মাত্রে পাখীর মত শূন্যমার্গে অনন্ত আকাশে উর্দ্ধদিকে উড়িয়া যাইতেছি।'

অদ্য (২৩শে ফাল্গুন) জীবনে প্রথম, বাহিরে ভিক্ষা করিলাম। মনোহরা দিদি, খুব শ্রদ্ধার সহিত চাউল, বুটের ডাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুণ, লঙ্কা, সৈন্ধব ও ঘৃত ভিক্ষা দিলেন। আমি নিজের পরিমাণ মত রাখিয়া, অবশিষ্ট পাখীদের ছড়াইয়া দিলাম। পক্কান্ন দ্বারা হোম করিয়া যোগজীবন, শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশয়কে এক এক গ্রাস দিয়া, প্রসাদ পাইলাম। ভিক্ষান্নে, আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

এই কয়দিন যাবৎ ঠাকুরের কথা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে। হাতের টাকাগুলি ব্যয় না করিয়া ফেলা পর্য্যন্ত, বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে থাকার কালে মাঠাকরুণ, ঠাকুরকে একখানা মহাভারত দেওযার আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি, ঠাকুরকে তাহাই দিব স্থির করিয়া, টাকা আনিতে বাড়ী যাইব।

ঠাকুরকে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে, ঠাকুর বলিলেন,— **"বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা ক'রো না; মা'র মনে কষ্ট হবে। বাড়ীতে যখনই যাবে, মাঠাকরুণের প্রসাদ পেও।"**

সমবয়স্ক গুরুভ্রাতা, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্রকে সঙ্গে লইয়া, বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁহুছিতে নৌকায় ও স্থলপথে ৫/৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে বহুবার ১৫/২০ মিনিট করিয়া রাস্তায় ধূপ-ধুনা চন্দন ও গুগ্‌গুলের পরিষ্কার সুগন্ধ পাইয়া, উভয়েই আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। বিস্তৃত ময়দানে, চল্‌তি পথে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সদ্‌গন্ধ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে, কিছুই বুঝিলাম না।

চৈত্র

সেবা-ভক্তিতে বিগ্রহ জাগ্রত হন।

১০ই চৈত্র।

এবার বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী কথায় কথায় তাঁর গোপাল ঠাকুরের কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। মা'র দু'টি সুন্দর ছোট ছোট গোপাল ঠাকুর আছেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহাদের খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সেবা পূজা করিয়া থাকেন। একদিন পাড়ার একটি দুষ্ট ছেলে, আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া, ঐ গোপাল ঠাকুর দু'টি দেখিতে পায়; খেলা সাঙ্গ হইলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া. সন্ধ্যার পরে, সে গোপাল দু'টি চুরি করিয়া লইয়া যায়। মা, তাহা কিছুই জানেন না। শেষ রাত্রিতে গোপাল ঠাকুর, স্বপ্নে মা'কে বলিলেন— 'ওগো! একবার আমাদের দ্যাখ্। ঐ দুষ্ট ছেলেটা আমাদের নিয়ে এই বাড়ীতে এনে উত্তরের ঘরে শিকার উপর হাঁড়ির ভিতর নারিকেলের মালায় ক'রে রেখে দিয়েছে। সকাল হ'লেই, পুরুত পাঠায়ে, আমাদের নিয়ে যাস্।' মা শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া, অমনই জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্ততার সহিত ঠাকুর ঘরে গিয়া, দেখিলেন— যথার্থই ঠাকুর সিংহাসনে নাই। তিনি অমনই পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুর, গ্রামের অপর প্রান্তে সেই বাড়ীতে যাইয়া, একেবারে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং শিকার উপর হাঁড়ির ভিতরে নারিকেলের মালায় গোপাল দুইটিকে পাইয়া, লইয়া আসিলেন।

ঠাকুরকে এই কথা বলায়, ঠাকুর বলিলেন— **"শ্রদ্ধা ক'রে সেবা পূজা কর্‌লে, বিগ্রহ জীবন্ত হন। তখন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন; মানুষের মত খাবার চান; কোনও প্রকার অনাচার অত্যাচার হ'লে ব'লে দেন। এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অনেক স্থলেই এ সব দেখা যায়। তোমার দাদার শালগ্রামটিও বড় চমৎকার; বেশ জাগ্রত। আমি যখন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, একদিন অযোধ্যা থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে বাসায় এসে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, তোমার দাদার ঠাকুর, আমাকে বল্‌লেন— 'ওরে, আমাকে কিছু খাবার দে। ওরা আমার পূজা করে, কিন্তু খাবার দেয় না। আমি সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিলাম তাই ওই বামনদেবকে দিলাম। সেই থেকেই তোমার দাদা, ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছেন।"**

এই বলিয়া ঠাকুর, দাদার শালগ্রামের আরও অনেক কথা বলিলেন। সে সকল বিষয়, গত বৎসর আমি যখন দাদার নিকটে ছিলাম, দাদার মুখে শুনিয়া, সেই সময়ের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি, এজন্য এস্থলে আর লিখিলাম না। কোনও একটি বৈষ্ণব পরমহংস, অযাচিত ভাবে হঠাৎ একদিন আসিয়া, ঐ শালগ্রামটি, দাদাকে দিয়া যান। দাদা, তাঁকে বলিলেন— 'আমি, এ সব মানি না, বিশ্বাস করি না।' পরমহংস বলিলেন— 'ঘরে এমনই রেখে দিন। ঠাকুর আমার খুব জাগ্রত, ইনি নিজেই মানায়ে নিবেন।' দাদা, শালগ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিলেও, ঠাকুরের কৃপায়, শালগ্রামকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঠাকুর, দাদার কথা তোলাতে, সুযোগ পাইয়া বলিলাম— 'কয়দিন হয় দাদা, তাঁর ৫/৬ বৎসরের মেয়েটির জাগ্রত অবস্থায়ও যে সকল দর্শনাদি হয়, সে সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে লিখেছেন।' এই বলিয়া আমি বিস্তারিত রূপে, দাদার পত্রের বিষয়, ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন— **"তোমার দাদা ডাক্তার মানুষ। লিখে দাও, মাথা গরম হয়েছে বা কোন রোগ হয়েছে মনে ক'রে, ওকে ঔষধ পত্র না খাওয়ান। এ অবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে অনিষ্ট হবে। সাধারণে চোখে যা দেখে না, কেহ তা দেখে বল্‌লেই গোল। লোকে মনে করে, মাথার কোন রোগ হয়েছে। এ অবস্থায় রোগ মনে ক'রে ঔষধাদি খাওয়ালে, অনেক সময়ে বিপদ্ ঘটে।"**

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— 'মাথার গোলমালে কি লোকে ওসব দেখে না?'

উত্তর— **"তা দেখ্‌বে না কেন, খুব দেখে। এজন্যই শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলায়ে নিতে হয়। মাথার গোলমালে যা দেখে, তা গোলমালই দেখে, প্রমাণের সহিত তার মিল থাকে না।"**

প্রশ্ন— 'সাধনের সময়ে আসনে ব'সে, লোকে যে সব বিভীষিকা দেখে, তা কি সত্য?'

উত্তর— **"আসনে স্থির থেকে সাধন কর্‌লেই, তা সত্য কি মিথ্যা ধরা পড়ে।"**

কৌশলের দান; অনুতাপ।

বাড়ী যাইয়া, এবার ৮/১০ দিন ছিলাম। পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া, মাতাঠাকুরাণীকে ২৫ টাকা দিয়া, গেণ্ডারিয়া আসিয়াছি। ঠাকুরকে একখানা মহাভারত কিনিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে, একটি গুরুভ্রাতাকে ৪০ টাকা দিলাম। নিজের প্রয়োজনে পুস্তক ক্রয় করিয়া, ৮/১০ টাকা ব্যয় করিলাম। অবশিষ্ট টাকা দু' দিন আমার হাতেই রাখিয়াছিলাম। কোন কোন গুরুভ্রাতা, তাহা জানিতে পারিয়া, অভাব ও প্রয়োজন জানাইয়া, আমার নিকট কিছু কিছু চাহিতে লাগিল। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম 'এ কি উৎপাত।' আমি তাড়াতাড়ি ঐ টাকাগুলি লইয়া গিয়া, দিদিমার হাতে দিয়া বলিলাম— 'দিদিমা! এই টাকা আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন; আশ্রমের ভাণ্ডারে ইহা আমি দিলাম।' জানি না, ঠাকুর কোন্ সূত্রে আমার দানের কৌশল বুঝিয়া, আমাকে বলিলেন— **"আশ্রমের ভাণ্ডারের জন্য বুড়োঠাক্‌রুণের হাতে অতগুলি টাকা দিয়েছ কেন?"**

১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

ঠাকুরের ঈষৎ হাস্যমুখে, ঠাট্টার ভাবে, এই প্রশ্নটি শুনা মাত্র, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল, আমি লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম— 'হয়েছে, এবার বুঝি সব গুমর ফাঁক!'

গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে, দামোদর পূজারিকে যে দান করিয়াছিলাম, তাহা আমার এ সময়ে মনে পড়িল, আর ভয়ানক অনুতাপে ও জ্বালায় অস্থির হইতে লাগিলাম। গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর আমাকে যমুনায় স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। সঙ্গে আমার এগারটি টাকা ছিল। আল্‌গা স্থানে রাখিয়া গেলে, পাছে কেহ জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়, টেঁকে গুঁজিয়া স্নান করিতে গেলাম। পথ আমার অজ্ঞাত বলিয়া, কুঞ্জের মালীক দামোদর পূজারি সঙ্গে চলিলেন। স্নানের সময়ে টাকা সরিয়া রাখিতে, দামোদর উহা দেখিয়া ফেলিলেন। আমি মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম, ঠাকুরের কোন কিছুর প্রয়োজন জানাইয়া এ বেটা যখন ইচ্ছা, টাকা কয়টা বাহির করিয়া লইবে। নজর যখন উহার পড়িয়াছে, এ টাকা যাওয়ারই মধ্যে। সুতরাং এখনই ভবিষ্যৎ উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল।' মনে মনে এই স্থির করিয়া, স্নানেব পর দামোদরকে বলিলাম— 'পূজারিজী! আপনিই ত আমাদের ঠাকুরের সেবার সমস্ত ভার লইয়া আছেন। এই কয়টা টাকা মাত্র আমার আছে, আপনি ইহা ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়া দিবেন। আর আমি যে দু' তিন মাস আপনার আশ্রয়ে থাকিব, দয়া করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ, দু' বেলা দু' মুঠো আমাকে দিবেন। তীর্থে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণকেই ত দান করিতে হয়, না হ'লে কিছুই ত সফল হয় না। তাই আমার যাহা কিছু আছে, আপনাকেই দান করিলাম, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' এই বলিয়া টাকা কয়টি দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিলাম। দামোদর হাতে টাকা পাইয়া, খুব খুসি হইয়া, অত্যন্ত আদরের সহিত আমার পিঠে দু'টি চাপড় মারিয়া বলিলেন— 'ও তোহারা তো ভক্তি বড়া ভারি! ভালা! ভালা!! আরে সব দে দিয়া! রাম! রাম!!' আমিও মনে মনে বলিলাম— 'হাঁ, দান ভক্তি আমার যা, তুমি পরে বুঝ্‌বে।'

এবারও, আশ্রমসেবার জন্য দানটি আমার যে ভাবে হইয়াছে, জানিতে পারিয়া ঠাকুর বলিলেন— **"যার প্রয়োজন, কোনও দিক্‌ না তাকায়ে, দান তাকেই কর্‌তে হয়। দান দরদ ক'রে কর্‌তে হয়। নিজের একটা অভাব হ'লে তা যেমন পূরণ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, অন্যের প্রয়োজনও যদি সেই প্রকার মনে লাগে, তা হ'লেই যথার্থ দান হয়। শ্রদ্ধাশূন্য দান, দেখাদেখি দান বা উৎপাত শান্তির জন্য যে দান, তাকে দান বলে না। আর প্রতিষ্ঠার জন্য দান, একটা মতলব ক'রে দান বা অন্য কোন প্রকারে স্বার্থের গন্ধ রেখে যে দান, তা দানই নয়। উহা একটা কৌশল করা মাত্র। ওতে আত্মার কোন কল্যাণই হয় না, বরং অনিষ্ট হয়।"**

দুর্দ্দিনে ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি।

গতকল্য একাদশী তিথিতে, আর আর বারের মত, নিরম্বু উপবাস করিয়াছি। সন্ধ্যার পরে, ছয় সাত বৎসরের কয়েকটি বালিকা আসিয়া, আমার আসনের পাশে বসিল এবং গল্প বলিতে

পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিল। আমি, দু' একটি গল্প শুনাইয়াই, তাহাদিগকে বিদায় করিলাম।

১৩ই চৈত্র, শুক্রবার। রাত্রে স্বপ্নদোষ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি, প্রায় বারটা হইতে ভোর পর্য্যন্ত, একবার বাহিরে একবার ঘরে, উঠাবসা করিয়া কাটাইলাম। বিষম আক্ষেপ আসিল। মনের ক্লেশে মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ঠাকুরের উপরে, দারুণ অবিশ্বাস জন্মিল! ভাবিলাম— 'সমস্তই বৃথা! অনর্থক শ্রম করিতেছি।' সামান্য শরীরের একটা দুর্গতি, যে গুরুর ব্যবস্থামত, এত কাল কার্য্য করিয়াও ফিরিল না, তাঁর উপদেশ মত চলিলে, স্বভাবের দোষ, মনের বহির্ম্মুখ দুরবস্থা যে দূর হইবে, তারই বা প্রমাণ কি? ভগবান্‌কে লাভ করিব প্রত্যাশায়, যাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি এবং যাঁহার উপদেশই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া আছি, সামান্য সামান্য বিষয়েই যদি তাঁর বাক্য মিথ্যা হইল, তাহা হইলে, প্রকৃত ধর্ম্মলাভের জন্য তিনি যে সকল উপায় বলিয়া দিতেছেন, তাহা যে সত্য, তারই বা বিশ্বাস কি? চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবনে রোগের উপশম না হইলে, তাঁহার হাতযশে রোগীর নির্ভর করা, আর অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকা, একই কথা। আমি, তাহা কিছুতেই পারিব না। কল্যই আমি ঠাকুরকে শেষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব। এই স্থির করিয়া, সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অনুদয়ে স্নান করিয়া, কোনও প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সারিয়া লইলাম। নির্জ্জনে অবসর বুঝিয়া, ঠাকুরের চা-সেবার সময় সময় কালে, তাঁর পশ্চাদ্দিকে, ঘরের বাহিরে, উঠানে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। "হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম," এ সময়ে মনে হইতেই, আমার কান্না আসিয়া পড়িল, আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এই সময়ে ঠাকুরও, আধকান্না স্বরে, প্রায় দুই মিনিট কাল "**হরি বোল,**" "**হরি বোল,**" বলিতে লাগিলেন। আমি মাথা তুলিতেই, ঠাকুর পশ্চাদ্দিকে আমার পানে মুখ ফিরাইয়া, মমতাপূর্ণ ছলছল চক্ষে, খুব স্নেহভাবে ডাকিয়া বলিলেন— "**আহা! কাল নিরম্বু উপবাস ক'রে এখনও কিছু খাও নাই? এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাণ্ডা হও গিয়ে।**"

এই বলিয়া, ঠাকুর কিছু মিষ্টি ও একটি বেল আমার হাতে দিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কান্না, অর্দ্ধস্ফুট স্বর ও এক প্রকার চাহনিতে, আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। কেবল এই মনে হইতে লাগিল, 'আহা! এ জগতে এরূপ দরদের চ'ক্ষে কে আর আমাকে দেখিবে?' আমি কান্দিতে কান্দিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরে খাবার লইয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম।

সকালে জলযোগের পর, বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে, ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। ঠাকুর কিছুকালের জন্য পাঠ বন্ধ করিলেন। ঐ সময়ে আমি বলিলাম, 'অনেক সময়ে অনেক কথা আপনাকে বলব মনে করি, কিন্তু নিকটে আসিলেই সব ভুলে যাই।'

ঠাকুর আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন— "**বলিবে আর কি? বলা কওয়ার আর কি আছে? কাজ ক'রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎই ত মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ**

সোণার পাত্রে না রাখ্‌লে টেকে না, নষ্ট হ'য়ে যায়। মহাত্মারা পাত্রটি ঠিক ক'রে নিয়ে, বস্তু দেন। অবস্থালাভের জন্য ব্যস্ত হইও না, সে ঠিক সময়েই হবে।"

আমি বলিলাম— 'এক সময়ে হবে, এই আশা পেলেই ত নিশ্চিন্ত থাকি।'

ঠাকুর বলিলেন— **"এখন যদি তোমাকে ঐ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'লে, তুমি কারোকেই গণ্য করবে না। ঐ অবস্থা লাভ হ'লে, তুমি স্থির থাক্‌তে পারবে না। ঐ ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে, সমস্ত সংসার তুমি ছারখার করবে, সর্ব্বনাশ করবে। অভিমানটি নষ্ট হ'লেই, ওসব ঐশ্বর্য্যলাভ নিরাপদ। এখন কাজ ক'রে যাও। ওসব দিকে খ্যাল রেখো না। সব দিকে ঠিক হওয়া, দু' একদিনের কর্ম্ম নয়।"**

ঠাকুর, একটুকু থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন— **"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, স্ত্রীলোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রবই রাখ্‌তে নাই! এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়। তাঁদের দিকে তাকাবে না, তাঁদের সঙ্গে বস্‌বে না, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপও করবে না। স্ত্রীজাতি যেই কেন হউন না, অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন আর যুবতীই হউন অথবা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন, সর্ব্বদা তাঁদের থেকে তফাৎ থাক্‌বে। চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে, সেই প্রকার স্ত্রীজাতির শরীর এমন কতগুলি উপাদানে গঠিত যে, তাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে। এটি বস্তুগুণ, এতে পাত্রাপাত্র, সাধু অসাধু বিচার নাই। এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা, এমন কি মাতা, ভগিনী, দুহিতার সম্বন্ধেও, সাবধান থাক্‌তে অনুশাসন ক'রে বলেছেন—**

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।

মাতা, ভগিনী, দুহিতার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে বস্‌বে না; বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্‌কেও আকর্ষণ করে। বিদ্বান্ বল্‌তে ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁকেও এতে আকর্ষণ করে। কাশীতে দণ্ডী স্বামী এ কথা বিশ্বাস করতে পার্‌লেন না, তিনি মনে করলেন, 'এ কখনও হয়? ব্রহ্মবিদ্যা যিনি লাভ করেছেন, সেই বিদ্বান্‌কে কিছুতেই এতে আকর্ষণ করতে পারে না।' তিনি, ব্যাসদেব ভুল লিখেছেন মনে ক'রে, তা কেটে দিয়ে, 'নহি কর্ষতি,' নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি লিখে রাখ্‌লেন। তার পর তাঁর যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল, তা ত শুনেছ?'

অবিশ্বাস, সাধনে অভিমান; অনুশাসন।

মহাভারতপাঠের পর, ভিতরে বিষম উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার যে সব অবিশ্বাস সন্দেহ জন্মিয়াছে, বলিয়া ফেলি। আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'মিথ্যা কথা বলা কি শুধু আমাদেরই দোষ, না ভগবানেরও?'

ঠাকুর বলিলেন— **"ভগবান্ কখনও মিথ্যা বলেন না; তাঁর ইচ্ছা, কার্য্য, বাক্য সমস্তই সত্য। সেখানে মিথ্যার কিছুই নাই।"**

আমি বলিলাম— 'শ্যামবাজারে আমার প্রতি আদেশ হয়েছিল— "দু'টি ঘণ্টা স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো, স্বপ্নদোষ হবে না।" আমি ত ঐ সময় থেকে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ সাত ঘণ্টা ব'সে নাম কর্‌ছি, কিন্তু স্বপ্নদোষ ত নিবারণ হ'ল না। এজন্য আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে। দেখিতেছি, আমরা মিথ্যা বলি অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ে, আর আপনারা বলেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।'

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া, কোনও প্রকার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একভাবেই থাকিয়া বলিলেন— **"তুমি স্থিরমনে দু'ঘণ্টা নাম ক'রে থাক?"**

আমি বলিলাম— 'স্থিরমনে কি ক'রে কর্‌ব? মন ত স্বভাবতঃই অস্থির। আসনে দু' ঘণ্টারও অধিক সময় একভাবে ব'সে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন,— **"তা হ'লে আর অন্যের দোষ কি? দু'ঘণ্টা কেন, দু' মিনিটও তুমি স্থির হ'য়ে নাম কর না। একটিবার কর দেখি, কেমন কথা অন্যথা হয়। শুধু নাম কর্‌লেই ত হবে না, স্থির হ'য়ে করা চাই। এই নাম অক্ষর নয়, একটা শব্দ নয়; এই নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। ভগবান্‌ই নাম। নাম করা আর ভগবানের সঙ্গ করা এক। লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে দিয়ে, নাম কর্‌লে কি হবে? নাম করার সময়ে, মনটি নানাদিকে ঘুরে বেড়ায়, নাম ঠিক করা হয় না। নিজের দোষ দেখ না, অন্যেরই দোষে কষ্ট পাচ্ছ মনে কর। নিজের ত্রুটি না দেখে, এরূপে অন্যের প্রতি দোষারোপ কর্‌তে নাই, অপরাধ হয়।"**

একটু থেমে, আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন— **"তুমি অন্যান্য অপেক্ষা আসনে একটু অধিক সময় ব'সে থাক, এতেই তোমার কতটা অভিমান হয়েছে! দেখ, কি ভয়ানক। তোমার মত যারা আসনে বসে না, নাম করে না, সর্ব্বদা হাস গল্প ক'রে বেড়ায়, কিছুই করে না দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাদের ভিতরেও এমন সব সদ্‌গুণ আছে, যা তোমার নাই। কোন চেষ্টা না ক'রে, শুধু বিশ্বাসবলে, কেহ কেহ এমন অবস্থা লাভ কর্‌বে, যা সাধন-ভজন ক'রে বহুকালে তোমার লাভ করা কঠিন হবে। সর্ব্বদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারও অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, মনে ক'রো না। অনেককে, বহু সাধন-ভজন ক'রে, কঠোরতা ক'রে, যে অবস্থা বহুকালে লাভ কর্‌তে পারে না, একটি লম্পটের, বদ্‌মায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা স্বাভাবিকই থাক্‌তে পারে। অভিমান কর্‌বার কি আছে? একটু সাধন কর ব'লে, অভিমানে পথ দেখ্‌ছ না! এই অভিমান থাক্‌তে, একটা অবস্থা তোমাকে দিলে, ঐশ্বর্য্যমত্ত হ'য়ে তুমি কারোকে তৃণতুল্যও জ্ঞান কর্‌বে না। প্রতিকার্য্যে বিচার ক'রে চ'লো, বিচার না কর্‌লে অনেক অনর্থ জন্মে। নিজেকে ছোট ব'লে না জানা পর্য্যন্ত, হাজার সাধন-ভজন চেষ্টা তপস্যায়ও কিছুই হবে না।"**

ঠাকুরের প্রতি আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি মিথ্যা কথা বলেন, এই সকল বিষয় ঠাকুরকে মুখের উপরে বলা অবধি, ভিতর যেন আমার একেবারে শূন্য শ্মশান

হইয়া গিয়াছে। দিনরাত আমার কি ভাবে যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া, নিজের শরীরে, নিজেই নানাস্থানে আঘাত করিলাম, চুল ছিঁড়িলাম, মাথা ঠুকিলাম, কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া, হাত পা সময়ে সময়ে আছড়াইতে লাগিলাম। আত্মহত্যা করিবারও সময়ে সময়ে ঝোঁক আসিতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে পাঠ বন্ধ রাখিয়া, এক একবার উচ্চৈঃস্বরে '**হরিবোল' হরিবোল**', বলিতে লাগিলেন।

১৫ই চৈত্র, রবিবার।

কিছুক্ষণ পরে, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন— "**কাল থেকে আবার তুমি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ক'রো।**"

আজ ঠাকুরের আদেশ মত, আবার সেই 'নীলকণ্ঠবেশ' ধারণ করিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বেশের গুণেই হউক অথবা ঠাকুরের কৃপায়ই হউক, ধীরে ধীরে আমার জ্বালা যন্ত্রণা, কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবৃত্তি হইয়া গেল।

পরিবেশনে ত্রুটি। তীর্থ-পর্য্যটনের নিয়ম।

এবার কলিকাতা হইতে আসার পর, এ পর্য্যন্ত আশ্রমে অর্থকৃচ্ছ্রতা চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা অনেকে আহারের অসুবিধা ভোগ করিয়া, স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও, আশ্রমে আহারাদি বিষয়ে ভালর দিকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিছু দিন, ঠাকুরের এবং সমাধিমন্দিরের জন্য পৃথক্ ভাবে ভোগ রান্না করিয়া, আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের সাধারণ রকম ব্যবস্থায় চলিয়াছিল। ঠাকুর, বোধ হয় আমাদের ভিতরের দুরবস্থা আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই, তখন ওসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই। 'ঠাকুর পূবের ঘরে পৃথক্ আহার করেন, তাঁর পাক স্বতন্ত্র প্রকার হয়' ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কথা তুলিলেন। ঠাকুর উহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রই, সেই দিন হইতে, দক্ষিণের ঘরে, সকলের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া, সাধারণের পাকে আহার করিতেছেন। পরিবেশনের ভার, পূর্ব্বাপর আমার হাতেই আছে। আমি গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা, ঠাকুরকে ভাল তরকারি অধিক পরিমাণে দিয়া থাকি। ঠাকুর, দুই তিন দিন আমাকে ওরূপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়াও শুনি নাই।

১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজ আবার ঠাকুর বলিলেন—"**একস্থানে দশটি লোক ব'সে আহার কর্‌লে, পরিবেশনে লঘু গুরু কর্‌তে নাই; এক রকমই দিতে হয়। প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে, এঁটো বস্তু দেওয়া হয়। খেয়ে আহারে কোন তৃপ্তি হয় না, ক্ষুধাও মিটে না।**"

আজ মহাভারতপাঠের পর ঠাকুর, আমাকে তীর্থ-পর্য্যটনের নিয়ম বলিলেন—"**তীর্থ-পর্য্যটন যৌবনে না কর্‌লে আর হ'য়ে উঠে না। যা কিছু করা, এ সময়েই কর্‌তে হয়। পর্য্যটনের সময়ে সর্ব্বদা মাথা হেঁট ক'রে, মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চল্‌তে হয়। প্রতিদিন ৩/৪ ক্রোশ-বা বেলা দশটা পর্য্যন্ত চ'লে, একটা স্থানে বিশ্রাম কর্‌তে হয়। সেখানে ভিক্ষা ক'রে, স্বপাক**

আহার কর্‌লেই ভাল। পর্য্যটনের সময়ে ধাতু বস্তু সঙ্গে রাখ্‌তে নাই। অর্থাদি স্পর্শও কর্‌তে নাই। টিকেট কেহ ক'রে দিলে নিতে পার। জলপাত্র কাঠের করঙ্গ হ'লেই ভাল । কৌপীন, বহির্বাস, একখানা কম্বল ও পাঠের দু'একখানা পুস্তক মাত্র সঙ্গে রাখ্‌তে হয়। কারও সঙ্গে না চ'লে, একাকী চলাতেই বেশী উপকার হয়। আহারের জন্য কোন দেবালয়ে প্রসাদও পাওয়া যায়।"

আমি ভাবিলাম, এ মন্দ নয়। দেবতা বিগ্রহকে কল্পনা বই কিছুই মনে করি নাই, এ অবস্থায় আমাকে তীর্থ-পর্য্যটনের ব্যবস্থা!

যোগ-সঙ্কট।

১৯শে চৈত্র।

গতরাত্রিতে, বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম রাত্রি বারটার সময়ে, আর আর দিনের মত, হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসিলাম। প্রায় দেড়টার সময়ে, ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া, জাগিয়া পড়িলাম। তিনি প্রায়ই গভীর রাত্রিতে দুই একটি গানে টান দিয়া, দু'এক মিনিটের মধ্যেই ভাবাবেশে গোঁ গোঁ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়েন। গত রাত্রিতেও—

"(সেই) এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি, কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে;
জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়,
দেখে সেই, যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, বিরাজিত হৃদি-কন্দরে;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার, প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে।
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজ গুণে, দীন হীন ব'লে দয়া ক'রে।
চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা নিকট সহায় দুঃখসাগরে;
পরম ন্যায়বান, করেন ফলদান, পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে;
তাঁর মুখ দেখি'. সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে
বিচিত্র শোভাময়, নির্ম্মল প্রকৃতি,
বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে;
ভজন-সাধন তাঁর, কর রে নিরন্তর,
চিরভিখারী হ'য়ে তাঁর দ্বারে।।"

ব্রহ্ম-সঙ্গীতের এই গানটির দু'এক পদ গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের ঐ গান এবং আশ্চর্য্য গম্ভীর এক প্রকার স্বর শুনিয়া, আমার ভিতরে, আপনা আপনি এতই বেগে নাম হইতে লাগিল যে, আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে, আমার হাত পা মাথা যেন খিচিয়া পেটের ভিতরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি তখন ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়া, প্রতি অঙ্গে হইতেছে বুঝিয়াও, তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিলাম না। শিরা, ধমনি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীগুলি মোচড়াইয়া, মনে হইল, যেন আমাকে একেবারে কুষ্মাণ্ডাকৃতি করিয়া ফেলিল। ভিতরে বাহিরে কেবল নামই শুনিতে লাগিলাম। শরীরে এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা নিবারণের কোনও চেষ্টাই আসিল না। কিছুক্ষণ পরে, আমার দেহের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইল। তখন কি অবস্থায় কোথায় কি ভাবে ছিলাম, ঠাকুরই জানেন। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, আমি কিছুই জানি না। পরে, ধীরে ধীরে নামের বেগ কমিয়া আসিল, হাত পাও ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করিয়া, সোজা করিয়া বসিলাম। ঠাকুরকে মধ্যাহ্নে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম— 'এরূপ কেন হ'ল?'

ঠাকুর বলিলেন— **হাঁ, ওপ্রকার হয়। নাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে হ'লে, যখন ঐ নাম প্রতি শিরায় শিরায় চল্‌তে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিতর দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার আরম্ভেই, সতর্ক না হ'লে, আর নাম এ সময়ে একবারে ছেড়ে দিলে, বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়। ঐ অবস্থায়, হাত পা সমস্ত, একবারে পেটের ভিতরে চ'লেও যেতে পারে। আবার অন্য প্রকারও হয়। নামটি অস্থি মজ্জা মাংসে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যখন হ'তে থাকে, তখন হাত, পা, জানু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থলের গ্রন্থি সকল খ'সে যায়, একবারে আল্‌গা হ'য়ে পড়ে; হাত পা লম্বা হ'য়ে যায়। তেমন মত হ'লে, হাত পা এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত শরীর হ'তে ছুটে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে, ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয়, নিজে দেখেছি।'**

প্রশ্ন— "একই নামে, শরীরের ভিতরে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা ঘটায় কেন?'

উত্তর— **"নাম এক এক ভাবে চ'লে, দেহে এক এক প্রকার অবস্থা করে।"**

প্রশ্ন— 'নাম কর্‌তে কর্‌তে এক এক সময়ে শরীরে ভয়ানক জ্বালা হয় কেন?'

ঠাকুর বলিলেন— **"এ জ্বালা কি জ্বালা? নাম যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে জ্বালা কি টের পাবে। প্রাচীন কালে ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। দেহশুদ্ধির জন্য কারো কারোকে তাঁরা তুষানলে শুদ্ধ ক'রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়; সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহাপুরুষেরা কৃপা ক'রে, নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ ক'রে নেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন এই জ্বালার আরম্ভ হয়। ক্রমে নামের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হ'য়ে পড়ে যে, মনে হয়, শরীরের প্রতি অণু পরমাণু একবারে দগ্ধ হ'য়ে গেল। এই নামাগ্নির জ্বালায় মানুষ তখন পাগলের মত ছুটাছুটি করে। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, পরমহংসজীর আদেশে, যখন আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে ছিলাম, এই**

জ্বালা আমার হয়েছিল। এই জ্বালায় স্থির থাক্‌তে না পেরে, সারা দিন আমি গায়ে পাতলা কাদা মাখ্‌তাম। একদিন, ঐ জ্বালা বিষম অসহ্য হওয়ায়, পর্ব্বতের ভিতরে একটা কুণ্ডে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী, আমাকে তুলে এনে, বল্‌লেন— 'এ কি করেছ? এ জলে কখনও নাব্‌তে আছে? এখনই যে পাথর হ'য়ে যেতে। দেখ, তোমার চুল, দাড়ি, গোঁপ সমস্ত একবারে সাদা হ'য়ে গেছে। এ জলের এ রকমই গুণ।' সন্ন্যাসী, অমনই পাহাড় খুঁজে, একটি লতা এনে, তা ছেঁচে কিছুটা রস ক'রে, চুলে লাগায়ে দিলেন। যে সব স্থানে ঐ রস দিয়েছিলেন, তা কাল হ'লো। আর যেগুলিতে লাগান হ'লো না, তা এখনও সাদা হ'য়ে আছে। তাই আমার সাম্‌নের এ সব চুল সাদা আর দু' পাশে ও পিছনের চুল কাল। গুরুজীর দর্শন পেয়ে, তাঁকে জ্বালার কথা বলায়, তিনি বল্‌লেন— "এ জ্বালায়ই এত অস্থির হ'চ্ছ। এখন তুমি জ্বালামুখী চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন কর্‌লে, স্থানের প্রভাবে, এই জ্বালা আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হবে; পরে শীঘ্রই একেবারে নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে। আমি অমনই জ্বালামুখী চ'লে গেলাম।'

এই বলিয়া ঠাকুর, বিন্ধ্যপর্ব্বতে সাধন সময়ে, যে সকল অবস্থা হয়েছিল, অনেক বলিলেন। ঠাকুরের মুখে সে সব কথা শুনিয়া, পূর্ব্বে একবার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি বলিয়া, এস্থানে আর লিখিলাম না।

প্রকৃতির গলদ বার্দ্ধক্যে প্রকাশ। উপদেশ।

আমার জীবনের গতি একটা ঠিক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। ঠাকুরের মুখে ইহা শুনিয়া অবধি, মনটি অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। এবার বাড়ী যাইয়া, আমার হিতাকাঙ্খী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একটি বৃদ্ধের মুখে, তাঁহার জীবনের কথা শুনিয়া, নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। তিনি আমার ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনিয়া, বলিলেন— 'আরে বাপু, এখন যাহাই কর না কেন, শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াবে, বলা যায় না। যৌবনে ইন্দ্রিয়প্রাবল্য যেমন অধিক হইয়া থাকে, তেমন আবার সৎসঙ্গে থাকিলে, ধর্ম্মোৎসাহও খুব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। প্রকৃতির গলদ যৌবনে চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উহা প্রায় ফুটিয়া ওঠে। যৌবনাবস্থায় ধর্ম্মের দিকে আমার বড়ই ঝোঁক ছিল; সন্ধ্যা, পুজা, জপতপ লইয়াই প্রায় অনেক সময় কাটাইতাম। চরিত্রের বলও আমার অসাধারণ ছিল। একবার একটি জরুরি মামলায় পড়িয়া, বিষম ঝড় তুফানের পরদিন, আমি পদ্মানদী দিয়া ঢাকা চলিলাম। পূর্ব্ব রাত্রিতে অনেক নৌকাডুবি হইয়াছিল। আমি পান্সি নৌকা হইতে দেখিলাম— ১৭/১৮ বৎসরের একটি পরমা সুন্দরী যুবতী, উলঙ্গাবস্থায়, চড়ার উপরে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে বিপন্না মনে করিয়া, অমনই আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। মেয়েটি বলিল, 'গত রাত্রিতে এই নদীতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়। আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না, জানি না। প্রায় মূর্চ্ছাবস্থায় আমি এই চড়ায় আসিয়া পড়ি। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন।' আমি তাহার কথা শুনিয়া, কান্দিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড়ের অর্দ্ধখানা পরিতে দিয়া, তাহাকে নৌকায় লইয়া আসিলাম। আমার কার্য্য শেষ

না হওয়া পর্য্যন্ত সে ৩/৪ দিন পান্সি নৌকায় আমার সঙ্গেই ছিল। পরে তাহার বাড়ীতে, তাহাকে পঁহুছাইয়া দিলাম। ঐ সময়ে, সঙ্গে আর কেহই ছিল না। তৎকালে, মুহূর্ত্তের জন্যও, আমার কোন প্রকার বিকার হয় নাই। বয়স তখন আমার ২৭/২৮ বৎসর। আর আজ পর্য্যন্ত, জীবনে কখন কোন বিশেষ দুষ্কার্য্যও আমি করি নাই। কিন্তু এখন আমার বয়স প্রায় ৬৭ বৎসর হইল, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, শরীর রুগ্ন, অবসন্ন; এই নিস্তেজ বৃদ্ধাবস্থায়ও আমার এমনই দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, সেই সময়ের কথা মনে করিয়া, আক্ষেপে দিনরাত কাটাইতেছি। কেবলই মনে হয়, 'হায়, এমন সুযোগ হাতে পাইয়া তখন কেন ছাড়িলাম?' তাই বলি বাপু, বিষম প্রলোভনে পড়িলেও, এক সময়ে নিজ চেষ্টায় ভাল থাকা যায়; কিন্তু মূলে ভাল হওয়া যায় না। প্রকৃতিতে যে সকল দোষ আছে, তাহা চাপিয়া রাখা সহজ, কিন্তু তার মূল উৎপাটন করা নিজের সাধ্যে নাই। তা শুধু গুরুকৃপায়ই হয়।'

এই গল্পটি ঠাকুরের নিকট বলিলাম। ঠাকুর বলিলেন— **"ভবিষ্যৎ কিছু ভেবে প্রয়োজন নাই। এখন যা বলা যাচ্ছে, ক'রে যাও। এজন্য যৌবনেই সাধন-ভজন কর্‌তে হয়। বয়স বেশী হ'লে, মনের উৎসাহ উদ্যম, ক্রমে ক্রমে নিবিয়া আসে। শরীর অবসন্ন ও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, তখন সাধন ভজন করা কি সহজ? যৌবনই যথার্থ সাধন-ভজন করার কাল। এ সময় থেকে খুব চেষ্টা ক'রে, ধর্ম্মে একটা সংস্কার ও রুচি জন্মায়ে নিতে পার্‌লে, কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামটি অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, নিরাপৎ ভূমি লাভ করা যায় না। অদৃষ্টের ভোগ যদি ষোল আনাই ভুগ্‌তে হয়, স্বভাবের দোষ ত্যাগ করা যদি অসম্ভবই হয়, তা হ'লে সাধন-ভজন, ব্রত, তপস্যা— এ সকলের আর তাৎপর্য্য কি? ভগবানের বিন্দুমাত্র কৃপা হ'লে, লক্ষ লক্ষ জন্মের ভোগ, পলকে নষ্ট হ'য়ে যায়; এ অতি সত্য কথা। তাঁর কৃপাই সার, আর কিছুই কিছু না। কাতর হ'য়ে তাঁর দিকে তাকালে, তিনি নিশ্চয় কৃপা করেন।"**

বৃষ্টিসময়ে তর্পণ; ঠাকুরের কৃপা।

আজ অষ্টমীস্নানের দিন। ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া স্নানতর্পণ করিব, অনেক দিন হইতে এ প্রকার মনে করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা হইল না। আর আর দিনের মত, প্রত্যূষে উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গায়ই স্নান করিতে গেলাম। ভয়ানক বৃষ্টি হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুদিনে, আজ এক গণ্ডূষ জল পিতাকে দেওয়া হইবে না, মনে করিয়া, অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে, ঐ জল রুধির হইয়া যায়, শুনিয়াছি। তাই নদীর পাড়ে যাইয়া, কিছুক্ষণ বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম, পরে অনুপায় দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া, ঠাকুরের নিকট খুব কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলাম— 'ঠাকুর, সারা বৎসর আমি পিতাকে তর্পণের জল দিয়া আসিয়াছি, আর আজ বিশেষ দিনে, এক গণ্ডূষ জল তাঁকে দিতে পারিলাম না। ঠাকুর, দয়া ক'রে কিছুক্ষণের জন্য এ বৃষ্টি থামায়ে দেও।' বৃষ্টি এক ভাবেই রহিয়াছে দেখিয়া, আমি অগত্যা নদীতে নামিলাম এবং ব্রহ্মপুত্রকে আহ্বান করিয়া, এক এক জনের নামে, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ১৫/২০ টি ডুব দিলাম। মাথা তুলিয়া দেখি, **আর বৃষ্টি নাই,**

২৩শে চৈত্র।

একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জলও পড়িতেছে না। আমি দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিয়া, শেষ গণ্ডূষ জল দেওয়া মাত্রে, অকস্মাৎ আবার ঝাপটা হাওয়া আসিয়া, মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি ইহা দেখিয়া, একবারে অবাক্ হইলাম। এ সব কি আকস্মিক ঘটনা, না— ঠাকুরের কৃপারই ফল, কিছুই পরিষ্কার বুঝিলাম না। গঙ্গাতীরে চমৎকার সদ্‌গন্ধ পাইয়া চিত্ত বড়ই প্রফুল্ল হইল।

মধ্যাহ্নে, অবসরমত, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'কখন কখন দিনের বেলা আসনে বসিয়া, কখন বা গভীর রাত্রিতে, আবার রাস্তায় ঘাটে বা বাগানে, জঙ্গলে, অকস্মাৎ খুব সদ্‌গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়, একটু পরেই আর থাকে না। অনেক সময়ে অনুসন্ধান করে দেখেছি, সে সব স্থানে, ঐ প্রকার গন্ধের কোন হেতুই থাকে না; এ প্রকার হয় কেন?'

ঠাকুর বলিলেন— **"এ সব গন্ধ পাওয়া ভাল। দেব দেবী, ঋষি মুনি বা মহাপুরুষেরা, দয়া ক'রে যে স্থানে আসেন, সে স্থানে, তাঁদের কৃপাতেই, তাঁদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান। এই গন্ধ নানারকমই পাওয়া যায়। কখনও ধূপ ধুনার গন্ধ, কখনও চন্দন গুগ্‌গুলের গন্ধ, কখনও পদ্ম গন্ধ, কখনও অন্য প্রকার সুগন্ধি ফুলের গন্ধ, মর্ত্তমান কলার গন্ধ, কাঁঠালের গন্ধ, আবার ফকির সাহেবদের আগমনে, গাঁজার বা লবানের (সুগন্ধ বৃক্ষনির্য্যাস) গন্ধ পাওয়া যায়। সে সময়ে, তাঁদের চরণ উদ্দেশে, ভক্তি ক'রে প্রণাম করতে হয়। আর স্থির হ'য়ে ব'সে, খুব নাম করতে হয়; তাঁদেরও তাতে খুব আনন্দ হয়। ক্রমে তাঁদের আরও কৃপা প্রত্যক্ষ করা যায়।"**

সাধকের মাদক ব্যবহার; গাঁজার ধূঁয়ার দশমহাবিদ্যা।

আজ কথায় কথায়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'সাধু, ফকির, তান্ত্রিক সাধকেরা, অনেকেই ত মদ গাঁজা খান। এই সব খাওয়াতে, তাঁদের সাধনের কি কোন প্রকার সাহায্য করে? গাঁজাখোর সাধুদের দেখ্‌লেই ত গুণ্ডা ব'লে মনে হয়।'

ঠাকুর বলিলেন— **"গুণ্ডারাও অনেকে, সময়ে সময়ে সাধুর বেশ ধ'রে থাকে, তা ঠিক। গয়াতে, আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, একদিন গোফার ভিতর থেকে দেখ্‌লাম, কয়েকজন লোক, অনেকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে, ঝম্ ঝম্ ক'রে পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। তাদের দেখেই, আমি চিনতে পার্‌লাম। পাহাড়ের নীচেই, তারা সাধু সেজে থাকত। প্রতিদিন সকালে, আমি, তাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতাম। ঐ দিন সকালবেলা, বাবাজীকে গিয়ে বল্‌লাম, 'বাবাজী, পাহাড়ের নীচে, যারা গায়ে ভস্ম মেখে, তিলক কেটে, মালা প'রে, সাধু সেজে ব'সে থাকে, তারা সাধু নয়। গত রাত্রে, তাদের, আমি কতকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে, পাহাড়ে উঠ্‌তে দেখেছি।' বাবাজী বল্‌লেন, 'ওরা সাধু নয়, গুণ্ডা। দিনে, সাধুর বেশ ধ'রে থাকে, আর রাত্রে, সহরে গিয়ে চুরি ডাকাতি করে। সে সব চোরাই মাল, পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে একটা গোফাতে রেখে দেয়, তা আমি জানি। তুমি যে ওদের পরিচয় পেয়েছ, তা ওদের কিছুতেই জানতে দিও না; বিপদে পড়বে। ওদের সঙ্গে, এতকাল যে প্রকার ব্যবহার**

ক'রে এসেছ, ঠিক তেমনই ক'রো।' আমি, বাবাজীর কথা শুনে, আর আর দিনের মত, তাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে এলাম। তারা, লোক দেখ্‌লেই, ধুনির কাছে, সাধু সেজে ব'সে থাক্‌ত, আর লোক না থাক্‌লে, গাঁজা খেয়ে গোলমাল করত। কোনও সাধুকে গাঁজা খেতে দেখ্‌লেই, আমার সময়ে সময়ে মনে হ'ত, ইনিও বুঝি ঐ রকমই এক জন। ছেলেবেলা থেকে, কারোকে গাঁজা খেতে দেখ্‌লেই আমি, তার উপর খুব চ'টে যেতাম।

একদিন বুদ্ধগয়া যেতে, রাস্তার ধারে, বট গাছের নীচে, গায়ে ভস্মমাখা, খুব তেজস্বী একটি সাধুকে, ধুনি জ্বেলে ব'সে আছেন, দেখ্‌তে পেলাম। আমি, তাঁর নিকটে গিয়ে, উপস্থিত হ'তেই, তিনি, আমাকে বস্‌তে আসন দিলেন। পুনঃপুনঃ তিনি গাঁজা খাচ্ছেন দেখে, আমার বড়ই বিবক্তি বোধ হ'ল। আমি সাধুকে বল্‌লাম, 'এত গাঁজা খেলে কি চিত্ত স্থির রেখে সাধন-ভজন করা যায়? আপনি এত গাঁজা খান কেন?' সাধু একটু হেসে আমাকে বল্‌লেন, 'বৈঠ বাচ্ছা, গাঁজা কাহে পিতে দেখোগে? আচ্ছা।' এই ব'লে, তিনি, তাঁর চেলাটিকে বল্‌লেন, 'আরে! দশ চিলুম গাঞ্জা, এক দফে চড়াও।' চেলাটি একেবারে দশ কল্কিতে গাঁজা চড়ায়ে, তার উপরে আগুন দিতে লাগ্‌লেন। সাধু একটি একটি ক'রে ঐ কল্কি নিয়ে এক এক দমে ফর্‌সা ক'রে ফেলে দিতে লাগ্‌লেন। প্রতি দমেই তিনি ধূঁয়া গিলে, কিছুক্ষণের জন্য কুম্ভক ক'রে, চোখ্ বুজে স্থির হ'য়ে থেকে, উহা ছেড়ে দিতে লাগ্‌লেন, আর আমাকে আঙ্গুল দিয়ে সঙ্কেত ক'রে ঐ ধূঁয়ার দিকে দৃষ্টি কর্‌তে বল্‌লেন। আমি ধূঁয়ার দিকে দৃষ্টি ক'রে দেখ্‌লাম, প্রত্যেক দমের ধূঁয়ায়ই, কুম্ভকের পর ছেড়ে দেওয়া মাত্র, উহাতে দশমহাবিদ্যার এক একটি আকৃতি হ'তে লাগ্‌ল। ক্রমে দশ দমের ধূঁয়াতে, সাধু, আমাকে দশটি মহাবিদ্যার রূপ দেখালেন। আমি ওখানে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে, বুদ্ধগয়ায় চ'লে গেলাম।"

"শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায়, অনেক সময়, অনাবৃত মাঠে, ময়দানে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, সাধুদের থাকতে হয়। ঐ সকল স্থানে নানা প্রকার জল হাওয়ায়, ব্যাধি জন্মাইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্য, সাধুরা গাঁজা, চরস, কুইচ্‌লা প্রভৃতি নেশা বস্তু, অভ্যাস কর্‌তে বাধ্য হন।"

মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশা বস্তুর স্বাভাবিক একটা গুণ এই যে, প্রকৃতির যথার্থ অবস্থাটি, উহাতে প্রকাশ ক'রে দেয়। অনেক ভাল ভাল তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীও, আত্মপরীক্ষার জন্য স্বভাব যথার্থই অধিকৃত হ'য়েছে কি না, তাহা পরিষ্কাররূপে জান্‌বার জন্য, ভয়ানক প্রলোভনের বস্তু, চোখের সামনে রেখে, ঐ সকল নেশা ক'রে থাকেন। আর তাতে ভিতরের অবস্থা কি প্রকার হয়, সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য করতে থাকেন। ভাল সাধুরা, নেশার কখনও বশ হন না, প্রয়োজনমত গ্রহণ ক'রে থাকেন মাত্র।"

দয়া ও সহানুভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না।

এবার, দু' তিনটি চোর, গভীর রাত্রিতে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, আমাদের আশ্রমে কয় দিনই আসিয়া, কোন সুবিধা না পাইয়া, অমনই চলিয়া গেল। চোর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই, ঠাকুর,

তাহাদের ডাকিয়া বলেন— **"জেগে আছি হে।"** চোরেরা, ঠাকুরের ঐ কথা, কয় দিনই শুনিয়া আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপার জানিয়া, আমাদের কারও কারও মনে এ প্রকার আলোচনা হইতেছে, 'ঠাকুর এরূপ করেন কেন? চোরকে ত ধরিয়া শাস্তি দেওয়াই উচিত। পাছে চোরের উপর অত্যাচার হয়, এজন্য তাদের সরিয়া পড়িতে, ঠাকুর, এ প্রকারে, নিত্য তাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন মনে হয়।' ঠাকুরের নিকট এই বিষয়ে কথা তুলিলে, ঠাকুর বলিলেন— **"যে স্থলে দয়া ও সহানুভূতি হয়, সাধারণ নীতি সেখানে টেঁকে না। গাজিপুরের পাহ্বারী (পয়- আহারী) বাবা, প্রায় সর্ব্বদা সমাধিতে থাক্তেন। সপ্তাহে দু' তিন দিন মাত্র, কিছু কালের জন্য গোফার দরজা খুলে রাখ্তেন, ঐ সময়ে, অনেক বড় বড় লোক তাঁকে দর্শন কর্তে যেতেন; অনেকে অনেক মূল্যবান্ বস্তুও বাবাজীকে দিতেন। বাবাজীর গোফাতেই, সে সব জিনিস থাকৃত। বাবাজী পোযাটাক দুধ মাত্র খেতেন। একদিন বাবাজী, সকালে, গোফা হ'তে বা'র হ'য়ে, গঙ্গায় স্নান কর্তে গেলেন, সেই অবসরে, একটি চোর, বাবাজীর গোফায় প্রবেশ ক'রে, যা কিছু ছিল, সমস্ত জড় ক'রে, কম্বলে গাঁঠরি বাঁধ্লে। এই সময়ে, বাবাজী স্নান ক'রে উঠ্লেন; বাবাজীর দৃষ্টি পড়্তেই, চোর বস্তা ফেলে পালাল। বাবাজী গোফায় এসে, আসনে না ব'সে অমনই ঐ বস্তাটি, অনেক ক'রে মাথায় তুলে নিলেন। পরে লাঠি ভর দিয়ে, ধীরে ধীরে চল্তে লাগ্লেন। আট দশ বার রাস্তায় বিশ্রাম ক'রে, দেড় মাইল দু' মাইল পথ, পাঁচ ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় চ'লে, সেই চোরের বাড়ীতে এসে হাঁপিয়ে পড়্লেন। বস্তাটি রেখে, চোরকে ডেকে বল্লেন, বাবা। আমি বুড়োমানুষ, আমার উপর একটু দয়া তোমার হ'ল না, এত বড় বস্তাটি, আমার জন্য, বেঁধে রেখে এসেছ। লাঠি ভর ক'রে চল্তে, আমার কষ্ট হয়, আর এত বড় বোঝা কি আমি— বুড়োমানুষ, এ দু' মাইল পথ নিয়ে আস্তে পারি?' চোর, তখন বাবাজীর পায় জড়িয়ে ধ'রে, কাঁদ্তে লাগ্ল। বাবাজী বল্লেন, 'বাবা। এতে তোমার আর কি অপরাধ হয়েছে? অভাবে ক্লেশ পাও, আর আমার ঘরে, অনাবশ্যক জিনিসগুলি রয়েছে, পেলে তোমার উপকার হয়, নিবে না কেন? তবে— আশা ক'রে, বেঁধে রেখে, ফেলে না এলেই হ'ত। আমি যে বুড়োমানুষ।' বাবাজীর এই ব্যবহারে, চোরেরও একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। সাধারণ নীতির বিচারে ত এই চোরকে জেল দেওয়াই ঠিক ছিল, লোকে ইহাই বল্বে।"**

একটু থামিয়া, ঠাকুর, আবার বলিলেন— **"অনেক দিন হয়, প্রচারক অবস্থায় একদিন আমি, একটু বেশী রাত্রিতে, মেছোবাজার দিয়ে, বাসার দিকে যাচ্ছি,, ফুটপাতের উপরে একটি মেয়েকে দেখ্তে পেলাম। ছেঁড়া, খুব ময়লা কাপড় প'রে, সে খুব ব্যস্ততার সহিত, রাস্তার একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাচ্ছে। তার শুষ্ক মলিন মুখ ও এক প্রকার কাতর ভাবে চাহনি দেখে, আমার বুকে এসে লাগ্ল। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'মা। এত রাত্রিতে, এ ভাবে, তুমি দাঁড়ায়ে কেন?' মেয়েটি বল্লে, 'দেখুন, তিন চার দিন, আমার কিছু রোজগার হয় নাই। দু' দিন আমি কিছুই খাই নাই।' তার কথা শুনে, আমি কেঁদে ফেল্লাম। তাকে বল্লাম, 'আর একটু অপেক্ষা কর, দেখ, আজ ভগবান্ কিছু দেন কি না।' এই ব'লে, আমি রাত**

এগারটা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে, কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু হ'তে, পাঁচটি টাকা সংগ্রহ কর্‌লাম। তা দিয়ে, আট আনার খাবার, আড়াই টাকা দিয়ে একখানা ভাল শাড়ী এবং দুই টাকা নগদ নিয়ে, মেয়েটির নিকটে উপস্থিত হ'লাম। মেয়েটিকে নমস্কার ক'রে, ওসব তার হাতে দিয়ে, বল্‌লাম, 'মা। এই খাবার, নিয়ে গিয়ে খাও। আজ ভগবান্, এই তোমাকে দিলেন। আর এই কাপড়খানা প'রে তুমি রাস্তায় দাঁড়িও। কিসে কি হয়, কিছু বুঝি না! এ দিন থেকে, উপাসনায়, ভগবানের কৃপা, বিশেষ ভাবে অনুভব করতে লাগ্‌লাম।"

ওয়াপণ্ডিত ও ঠাকুর।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধারমণবাবুর পুত্র, পাঁচ সাত বৎসরের বালক, আধপাগ্‌লাটে 'ওয়াপণ্ডিত', ধূলা গায়ে নেংটাবস্থায় দৌড়িয়া আসিয়া, তাহাদের বাড়ীর একটি গরুকে ধরিল। ঐ গরুটি লইয়া পণ্ডিত, ঠাকুরের বার চৌদ্দ হাত অন্তরে, পুকুরের ধারে, একটি চারা গাছের সহিত, লম্বা দড়িতে বান্ধিয়া রাখিয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, 'গোঁসাই, গরু রইল, দেখো যেন ছুটে না; আমি আসি।' এই ব'লে পণ্ডিত, দু' হাতে পেছন চাপড়াইয়া, খেলা করিতে দৌড় মারিল। ঠাকুর, ঐ সময়ে, পাশ ফিরিয়া, গরুর দিকে মুখ করিয়া বসিলেন, অন্য কিছু না করিয়া, ভাবাবেশে মগ্ন না থাকিয়া, একটানা, গরুটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় দুইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত, ওয়াপণ্ডিতের আর দেখা নাই। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আশ্রমের ভিতর দিয়া, ওয়াপণ্ডিত যাইতেছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "**পণ্ডিত! এখন তোমার গরুটি নেবে? আমি যে সেই থেকে তোমার গরু দেখ্‌ছি।**" পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিয়া, বলিল, 'ও, গরুটা এখানেই আছে? বেশ, নিয়ে যাই।' এই বলিয়া গরুটিকে লইয়া গেল। ঠাকুরও, আসন হইতে উঠিয়া, শৌচে গেলেন।

ঠাকুরের স্বপ্ন; সাধুতে বিশ্বাস।

গত রাত্রিতে তন্দ্রাবস্থায়, বড়ই সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম, 'ধর্ম্মলাভের জন্য বহুস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঠাকুরের সম্মুখে যাইয়া দেখি, তাঁর মস্তকে সুন্দর জটা, রং ঈষৎ তাম্রবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর; কর ধরিয়া, সটান অবস্থায়, স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি সম্মুখের দিকে, অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন; নিজের অসাধারণ সাধন প্রভাবে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে, যেন অগ্রাহ্য করিতেছেন। ইঁহার নিকটে, আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কিছুকাল নানাস্থানে থাকিয়া, সাধন-ভজন করিলাম। অবশেষে, এই ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্খায়, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি আর তিনি নাই। সেই উগ্রতেজঃসম্পন্ন আকৃতি, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার রূপ অন্য প্রকার। জটাভার বৃদ্ধি পাইয়া, কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ঈষৎ শ্যামবর্ণ স্থূলাকৃতি গোঁসাই, স্থির গম্ভীর শান্তভাবে, মাধুর্য্যরসে ডুবিয়া, নিজের অবস্থায় বিভোর হইয়া, যেন ঢুলু ঢুলু করিতেছেন। সেই চিত্তমোহন রূপের দিকে তাকাইয়া, আমি অবশ হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর,

তখন মাথা তুলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি? তুমি কি চাও, দীক্ষা নিবে?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, নিব।' ঠাকুর বলিলেন, 'পূর্ব্বে যাঁর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলে, তাঁকে যে ত্যাগ করতে হবে।' আমি বলিলাম, 'আপনাকে দেখে, আমি সেই রূপ যে ভুলে গেছি।' ঠাকুর, আমাকে, তখন আবার দীক্ষা দিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে, এ পর্য্যন্ত, ঠাকুরের সেই রূপটি, একমুহূর্ত্তের জন্যও ভুল হইতেছে না; অন্তরে যেন অপূর্ব্ব রূপের একটা ছাপ পড়িয়া রহিয়াছে*। ঠাকুরকে অবসরমত, নির্জ্জনে এই বিষয় বলাতে, ঠাকুর বলিলেন— **"এ সব স্বপ্ন লিখে রাখতে হয়। এক মিনিটের স্বপ্নে, একটা জন্মের ভোগও শেষ হ'য়ে যেতে পারে। আমার জীবনের একটা দিক্, স্বপ্নে পরিস্কার ক'রে দিয়েছে। পূর্ব্বে আমি, কখনও স্বপ্ন সত্য হয়, ইহা বিশ্বাস করতাম না, পরে দেখে দেখে, বিশ্বাস করতে হয়েছে।"**

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, বহুকাল পূর্ব্বে, আমার একবার হার্টডিজিজ্ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল; বেদনা হওয়া মাত্রেই, আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়তাম। এক মিনিট পূর্ব্বেও বুঝতে পারতাম না। কখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি কি মরি, এই আশঙ্কায়, আমার দেহ রক্ষার জন্য, একটি দ্বারওয়ান্ নিযুক্ত হয়েছিল, কোথাও বার হ'তে পারতাম না ব'লে, মনে বড়ই আক্ষেপ হ'ত। মনে হ'ত, যদি কাজ কর্ম্মই কিছু করতে না পারলাম, তা হলে, আর বেঁচে থেকে লাভ কি? এ সময়ে, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের একটি বাসায়, আমি থাকতাম। শেষ রাত্রিতে, স্বপ্নে দেখলাম, জগন্নাথের ঘাটে, অনেক সাধু এসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটি সাধু, গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা, একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে, ধুনি জ্বেলে ব'সে আছেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাকলেন এবং বললেন, 'বাচ্ছা, ইঁহা আয় যাও, দাওয়াই লে লেও, বেমার ছুট্ যায়েগা।' স্বপ্নটি দেখে, জেগে পড়লাম, প্রাণ বড়ই অস্থির হ'ল; ভাবলাম— 'একবার গঙ্গাতীরে যেয়ে দেখি না কেন,' আমি, অমনই বার হ'য়ে পড়লাম। গঙ্গাতীরে, জগন্নাথের ঘাটে গিয়ে দেখি, গঙ্গাসাগরের যাত্রী বিস্তর সাধু ওখানে আড্ডা ক'রে ব'সে আছেন। স্বপ্নে যে স্থানটিতে, আমি, সাধুদর্শন পেয়েছিলাম, ঠিক সেখানে গিয়ে দেখি, সেই সাধুই, ধুনি জ্বেলে ব'সে রয়েছেন। আমাকে দেখে, খুব স্নেহের সহিত 'বৈঠ, বাচ্ছা বৈঠ, দাওয়াই লেওগে?' এই ব'লে, তিনি একটা কৌটা হ'তে, অতি সামান্য পরিমাণে একটু ভস্ম, আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এহি পায় লেও, মূর্চ্ছা তোমার আউর কভি নেহি হোগা। হামারা পাশ দাওয়াই আউর হ্যায় নেহি, রহনেসে তোমারা বেমার একদম্ ছুট্ যাতে।' এই ব'লে, তিনি, আমাকে ধুনি হ'তে কতকগুলি ভস্ম দিয়ে, বললেন, 'কয় রোজ এহি ভসম লেকে শরীরমে আচ্ছা করকে রগড়াও।' আমি তখন উহা নিয়ে এলাম। প্রতিদিন ঐ ভস্ম কয়দিন ধ'রে, গায়ে মাখলাম। সেই সময়ে, আমার ব্রাহ্মবন্ধু অনেকে, আমাকে ভয়ানক কুসংস্কারী ব'লে, মনে করতে লাগলেন। আমার কিন্তু ঐ সময় হ'তে; হার্টডিজেজে আর মূর্চ্ছা হয় নাই। এই ঘটনার পর হ'তে, সাধুদের প্রতি, আমার একটা খুব শ্রদ্ধা এলো। রাস্তা ঘাটে, সাধুবেশ দেখলেই, আমি ভক্তি ক'রে নমস্কার

* এই রূপ অবিকল পুরীতে ঠাকুরের হইয়াছিল।

কর্‌তাম। ভাল মন্দ কিছুই বিচার কর্‌তাম না। মনে হ'ত, 'কার ভিতরে কি আছে, তা ত আমি জানি না। নমস্কার করায় আর দোষ কি? যদি ভাগ্যক্রমে ঐ নমস্কার কোনও মহাপুরুষকে হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে, বিশেষ কল্যাণও ত হ'তে পারে।"

"একদিন আমি মির্জাপুর ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, দেখ্‌তে পেলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি কাঙ্গালবেশ সাধু, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে ছুটে আস্‌ছেন। দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে, আমি তাঁকে নমস্কার কর্‌ব মনে ক'রে, ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আসতেই, আমি, তাঁকে নমস্কার কর্‌লাম। চল্‌তি মুখে, তিনি, আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। তখন মনে হ'ল, যেন আধমণ বরফ, আমার মাথায় কেহ চাপিয়ে দিলে। সমস্ত শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্রে, সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে, বল্‌লেন, 'চলো, বাচ্ছা চলো'; এই ব'লে, খুব দ্রুতপদে যেতে লাগ্‌লেন। আমিও, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্‌লাম। কি ভাবে, কোন্ দিক্ দিয়ে, কোথায় যে গেলাম, কিছুই জানি না। একেবারে যেন মিস্‌মেরাইজড্ হ'য়ে পড়্‌লাম। কত ক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হয়েছি। সাধু, আমাকে একটা গাছের নীচে বসিয়ে, অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃপুনঃ বল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি, তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে, তিনি আমাকে বল্‌লেন, 'না, তা হবে না; তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে তিনিই, তোমাকে খুঁজে নিবেন. ব্যস্ত হ'তে হবে না।' তার পর আমি, তাঁর অনুসরণ কর্‌তে ইচ্ছুক হ'য়ে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্‌লাম। হাওড়ার পোলের উপরে চলতে চল্‌তে, দেখ্‌লাম, হঠাৎ, সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়্‌লেন। এ ঘটনার পরে, সাধুদের প্রতি, আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

"এক বার স্বপ্নে দেখ্‌লাম, 'ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার জন্য, বহুস্থান ঘুরে ঘুরে, একটা স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একখানা সাইনবোর্ড উড়্‌তে উড়্‌তে আমার সাম্‌নে এসে পড়্‌ল। সাইনবোর্ডখানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "এই পথে চল।" লেখার পরেই মুষ্টিবদ্ধ তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করা একখানা হাত, ওতে রয়েছে, দেখতে পেলাম। সাইনবোর্ডখানা শূন্যপথে যেতে লাগ্‌ল। আমি অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য না ক'রে সেই অঙ্গুলিসঙ্কেত ধ'রে চল্‌তে লাগ্‌লাম। হাতখানা, আমার আগে আগে চল্‌ল; আমি, কত বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, দুর্গমস্থানে, পথে-অপথে চ'লে, চ'লে, একটা ভয়ঙ্কর নদীর পাড়ে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম, নদীর যেন কূল কিনারা নাই; সেখানে পঁহুছে দেখি, আর একখানা সাইনবোর্ড, নদীর ঠিক পারেই রয়েছে, তাতে লেখা, "বিশ্বাসীদিগের পারে যাইবার ঘাট।" তার পর আরও কত। এ সব স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়; যথার্থ অবস্থাই, কারও কারও, স্বপ্নে প্রকাশ হয়।"

মহাত্মাপুরুষের চামারীবৃত্তি।

ঠাকুর কথায় কথায় আজ বলিলেন— "একদিন মেছোবাজার ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতা ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে, একটি চামারকে দেখে, তাকে জুতা সেলাই কর্‌তে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি কর্‌লে না। জুতা সেলাই হ'য়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলাম।

সেই পয়সা হ'তে, সে, আমাকে দু'টি পয়সা ফিরিয়ে দিল এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চল্‌ল। আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমি তার পিছনে পিছনে চল্‌লাম। সে গঙ্গাতীরে, বাবু-ঘাটে যেয়ে, তল্‌পি তল্‌পা রাস্তার নীচে, একটা ভাঙ্গা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে, গঙ্গাস্নান কর্‌ল; পরে তিলক করে, সন্ধ্যা তর্পণাদি ক'রে, খিদিরপুরের দিকে চল্‌ল। আমিও, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌লাম। সে, একটি বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌ল। আমিও, ঐ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একটি লোক এসে, আমাকে অতিথি মনে ক'রে, বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যেয়ে দেখি, ঐ চামারটি একজন মহান্ত। তাঁর বিস্তর শিষ্যসেবক আছেন। আখ্‌ড়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। মহান্তকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আপনার এত শিষ্যসেবক, নিজে মহান্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিছুরই ত অভাব নাই, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন?' মহান্ত বাবাজী, আমার প্রশ্ন শুনে, কেঁদে ফেল্‌লেন, এবং হাত জোড় ক'রে, তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে, পুনঃপুনঃ নমস্কার কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন— 'গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্ব্বেই, আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি, আমাকে শাসন ক'রে বল্‌লেন, 'আরে তু কাহে সাধু হুয়া, তুতো চামার হো।' আমার গুরুদেবের সেই বাক্য, আমা হ'তে অন্যথা হবে?—এই জন্য আমি, সেই দিন থেকেই, চামারী ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌ছি। সারা দিন চামারী ক'রে, নিজের আহারোপযোগী চার আনা পয়সা মাত্র পেলেই আমি চ'লে আসি। গুরুদেব, শেষকালে, তাঁর গদিতে, আমাকেই দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও, সাধ্যমত, চামারীবৃত্তি দ্বারা, তাঁরই সেবা ক'রে, দিন কাটায়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, যেন শেষদিন পর্য্যন্ত, আমি, আমার গুরুদেবের সেই বাক্য, রক্ষা ক'রে যেতে পারি।"

"ইঁহাকে দেখার পর, আমার মনে হ'ল, 'এ প্রকার ছদ্মবেশেতে মহাত্মারা যেখানে সেখানে থাক্‌তে পারেন; বাহিরের আকার, বেশভূষা ও আচার ব্যবহার দেখে, যখন তাঁদের চেন্‌বার যো নাই, তখন কার কি অবস্থা, কি প্রকারে বুঝ্‌ব? সেই হ'তে আমি রাস্তায় বা'র হ'লেই, দু' দিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাকেই রাস্তার সম্মুখে দু'পাশে দেখ্‌তে পাই, মনে মনে নমস্কার ক'রে চলি। এতে ক'রে, লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা, সময়ে সময়ে, ঐ প্রকার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান, সাম্‌নে পড়্‌লেই, তাঁদেরও ধ'রে নেওয়া যায়।"

কুলগুরু, গ্রন্থগুরু, স্ত্রীগুরু, সিদ্ধগুরু এবং সদ্‌গুরু সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নোত্তর।

যথার্থ ধর্ম্মলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্খা ও মনের উৎসাহ, অনেকের ভিতরে থাকিলেও, আজকাল উপযুক্ত গুরুর অভাবে, সে বিষয়ে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। যাঁহারা কৌলিক গুরুর

কার্য্য করিতেছেন, দেশের দুরবস্থাবশতঃ, সময়ের গুণে, তাঁদের আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে বা সময়ের প্রভাবে, লোকের মতি বুদ্ধিও এখন অন্য প্রকার। সরল বিশ্বাসে, কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সকলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না, এজন্য অনেকে পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাসের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কেহ কেহ বিপন্ন হইতেছেন। সুতরাং এখন উপায় কি? এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কুলগুরু কাকে বলে? কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে, আজকাল লোকে তেমন ফল পায় না কেন? এতে কোনও প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি?'

ঠাকুর, প্রশ্ন শুনিয়া, এই প্রকার বলিতে লাগিলেন— **"আজকাল গুরুকরণ, বড়ই সমস্যার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁরা গুরু ছিলেন, সব সিদ্ধ পুরুষই ছিলেন। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হ'লেই, তাঁদের কুলগুরু বলা হ'ত। এখন কুলগুরু বল্‌তে, লোকে বংশপরম্পরাগুরু বুঝে। এখন যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্‌ছেন, অনুসন্ধান নিলে জানা যায়, তাঁদের বংশে কেহ না কেহ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও, সিদ্ধপুরুষদের বংশে, যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্‌তেন, সিদ্ধ না হ'লেও, তাঁরা বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষাদিও তাঁরা ভাল জান্‌তেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হ'লে, গুরুরা, তার কোষ্ঠী লইয়া, জন্মলগ্ন ধ'রে গণনা কর্‌তেন; গণনা দ্বারা দীক্ষার্থীর প্রকৃতি, সাত্ত্বিক কি রাজসিক অথবা তামসিক, তাহা জেনে নিয়ে, ঐ প্রকৃতির সহিত, কোন্ দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা স্থির ক'রে নিতেন। পরে ঐ ব্যক্তির দেহ, মন ও প্রকৃতির সহিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের, অনুকূল প্রতিকূল কি প্রকারের যোগাযোগ, তাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তার পর, যে সকল অক্ষর স্মরণে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার গুণানুযায়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিমুখে, তাকে অগ্রসর হ'তে সাহায্য কর্‌বে, তা একটি একটি ক'রে গণনা দ্বারা বা'র ক'রে ফেল্‌তেন। পরে, যে সকল অক্ষরের সংযোজনায়, মন্ত্র উদ্ধার ক'রে, শিষ্যকে প্রদান কর্‌তেন; এবং তদনুযায়ী পূজাপদ্ধতিও ব্যবস্থা কর্‌তেন। এই প্রণালীতে দীক্ষা হ'লে, গুরুর কোন সাহায্য না পেলেও, শিষ্য যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবৎ মন্ত্র জপ ও ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তা হ'লে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং ঐ দেবতার একটা সাহায্য পেয়ে, ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ী, প্রণালীমত দীক্ষা পেয়ে, সাধক যদি রীতিমত চেষ্টা করেন, তা হ'লে, তার একটা ফল হ'তেই হবে। এজন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু, সাধারণ অবস্থায় থাক্‌লেও, শিষ্য, সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে, ঠিক এই প্রণালী ধ'রে, দীক্ষা প্রায় হয় না। শাক্তঘরে একটি বৈষ্ণব প্রকৃতির লোককে, গুরু এসে, বংশপ্রণালী অনুসারে, হয় ত, শক্তির উপাসনাই দিলেন, আবার বৈষ্ণব বংশের, একটি শাক্তভাবের লোককে, হয় ত, বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া, সেই মত নিয়মপদ্ধতি ব'লে গেলেন। এই প্রকার প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে চ'লে, সাধন-ভজন করায়, কোন উপকারই হ'তে দেখা যায় না। তামসভাবের একটি লোকের, সাত্ত্বিক উপাসনা কর্‌তে হ'লে, তার যেমন, প্রকৃতি মন,— এমন কি, শরীরের পর্য্যন্ত অণু পরমাণুর প্রলয় ঘটাইয়া, ওসকল সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত**

কর্‌তে হয়; না হ'লে, সত্ত্বগুণী দেবতার প্রসন্নতা লাভ অসম্ভব। সেই প্রকার সত্ত্বগুণীরও তামস দেবদেবীর উপাসনা কর্‌তে হ'লে, ঐ প্রকার কর্‌তে হয়। এ সব সহজ নয়। এ জন্যই,পনের বৎসর বয়সে কেহ সাধন নিয়া, আশি বৎসর পর্য্যন্ত জপ তপ ক'রেও, একটা দেবদেবীর দর্শন ও কৃপার প্রত্যক্ষতা বিষয়ে, কোনও সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আবার কেহ বা ছেলে বয়সেই, অল্পদিন সাধন-ভজন ক'রে, নিজ উপাস্য দেবতার কৃপা বিষয়ে, পরিষ্কার প্রমাণ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে, যাঁরা গুরুর কাজ করেন, প্রায়ই অন্য কোন বিচার না ক'রে, শুধু বংশের ধারা ধ'রে, তাঁরা সাধন দেন ব'লেই, অনেক অনিষ্ট হ'চ্ছে; কারণ, সাধন-ভজন ক'রে, লোকে ফল না পাওয়াতে, মন্ত্রের উপর, ক্রিয়ার উপর এবং দেবদেবীর উপর একটা অবিশ্বাস এসে পড়ছে। তবে কৌলিক গুরুর নিকট, বিধিমত দীক্ষা বা গুরুশক্তির কোনও সাহায্য না পেলেও, অন্য কোনও অনিষ্টের তেমন সম্ভাবনা নাই। বরং সাধকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাক্‌লে, ওতে উপকারই হয়; কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলের নিকটে, দীক্ষা গ্রহণ করায়, অনেক সময়ে বিষম বিপৎ ঘটে।"

প্রশ্ন— 'আজকাল অনেক পুস্তকেই ত যোগাভ্যাসের প্রণালী সমস্ত লেখা আছে, দেখতে পাই। সে সব দেখে, যোগাভ্যাস করাতে কি তেমন উপকার হয় না?'

উত্তর— "উপকার কি, গ্রন্থাদি দেখে, যোগাভ্যাস কর্‌তে যাওয়া, আরও ভয়ানক। অনেকে ওরকম কর্‌তে গিয়ে হার্ণিয়া, কুষ্ঠ, মস্তিষ্কের রোগ, কখন বা অন্য কোন প্রকার উৎকট রোগে প'ড়ে, একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেন। সাধন-ভজনের কোন ক্রিয়াই, কৌশল না জেনে, শুধু পুস্তক দেখে, অভ্যাস কর্‌তে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিই, শাস্ত্রকর্ত্তারা খুব সঙ্কেতে লিখে গিয়েছেন। ওসব ক্রিয়ার অভ্যাস কর্‌তে হ'লেই, ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকটে গিয়ে, সন্ধানটি জান্‌তে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা কর্‌তে হয়। না হ'লে হয় না।"

প্রশ্ন— 'কোন কোন স্ত্রীলোকও ত গুরু আছেন; তাঁরা দীক্ষা দিচ্ছেন; শুন্‌তে পাই তাঁরা নাকি সিদ্ধা?'

উত্তর— "তা দিন্। তবে সিদ্ধাই হউন আর মহাসিদ্ধাই হউন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর্‌লেও, নারীদেহ কখনও আচার্য্য হ'তে পারে না। গুরুর দেহ সর্ব্বদাই পবিত্র; তাঁকে সেবা ক'রে, স্পর্শ ক'রে, শিষ্য শুদ্ধ হন। শাস্ত্রকর্ত্তারা কোনও কোনও প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে, স্ত্রীশরীর স্বাভাবিকই অশুচি, ব'লে গেছেন। ব্রাহ্মণীও ত যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্‌তে পারেন না; এখন যদি কেহ তাই করেন, কি কর্‌বে? শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও অনুশাসন যাঁরা মানেন না, গ্রাহ্য করেন না, তাঁরা যা ইচ্ছা কর্‌তে পারেন। তাতে আর কথা কি?"

প্রশ্ন— 'মহাপুরুষদের কথামত যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করেন?'

উত্তর— "মহাপুরুষদের কথা ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। তবে শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থার সহিত মিল না হ'তে পারে। তা ব'লেই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তা বলা যায় না। 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা,' এ ত শাস্ত্রেই আছে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য—

মহাপুরুষ কেন, স্বয়ং ভগবান্‌ও যদি কর্‌তে বলেন, অভিমান থাক্‌তে, বিচার বুদ্ধি থাক্‌তে, তা কেহ কর্‌লে, তাকে সেইমত দণ্ডটিও পেতে হয়। ভগবানের কথাতেই ত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' ব'লে, প্রকারান্তরে মিথ্যা কথাটি বলেছিলেন; তাতে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন কই? ভগবান্‌ই ত এজন্য তাঁকে আবার নরকও দর্শন করালেন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরও ঢের আছে। ভগবান্‌ও একটি কম পাত্র নন্ ত! শাস্ত্রকর্ত্তারা সবই দেখায়েছেন।"

এ সকল কথার পরে, সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণে, কি প্রকার ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা, জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর, এই প্রকার বলিতে লাগিলেন— **"বিচারশূন্য হ'য়ে, 'কেহ সিদ্ধ পুরুষ' শুনা মাত্রেই, তাঁর নিকটে গিয়ে, দীক্ষা নেওয়াও ঠিক নয়। সিদ্ধ ত কত রকম আছে! ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবীসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ। যাঁর যা সঙ্কল্প, তিনি তা লাভ কর্‌লেই ত সিদ্ধ হলেন। আমি যা চাই, সে বিষয়ে যিনি সিদ্ধ নন, তিনি আমাকে সেই পথ ব'লে দিতে পার্‌বেন কেন, ওবিষয়ে সাহায্যই বা কি কর্‌বেন? যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সেই পথই মাত্র বল্‌তে পারেন। সিদ্ধ হ'লেই ত আর সর্ব্বজ্ঞ হলেন না। আর সিদ্ধ হ'লেই যে তিনি ধার্ম্মিকও হবেন, তাও বলা যায় না। ধর্ম্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, কত লোক, কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছেন। শুধু যোগাঙ্গ মাত্র অভ্যাস দ্বারা, ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে, কোনও ব্যক্তি চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, নক্ষত্রলোকে সশরীরে অনায়াসে গতিবিধি কর্‌তে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক ছিলেন। সুতরাং কোন সিদ্ধব্যক্তির নিকটেও, সাধন গ্রহণের পূর্ব্বে, তিনি কিসে সিদ্ধ, সেটি বেশ ক'রে জেনে নিতে হয়। সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি লোক, সিদ্ধ নাম শুনেই, যদি একজন কাপালিক বা পিশাচসিদ্ধের নিকটে গিয়ে, দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই প্রণালীমত, মদ মাংসাদি নিয়ে, তামসসাধন কর্‌তে থাকেন, তাতে তাঁর আর কি উপকার হবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাধন ক'রে, সিদ্ধগুরুর সাহায্যসত্ত্বেও, উপকার কিছুই হবে না, বরং অনিষ্টই হবে। এজন্য দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে, সিদ্ধপুরুষ জেনেও, রীতিমত তাঁর সঙ্গ কিছু কাল কর্‌তে হয়। ক্রমে তাঁর আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাধন-ভজন দেখে, যদি তাঁর প্রতি চিত্ত তেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধ ব'লে জানা যায়, তবেই তাঁর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এ প্রকার হ'লে, সিদ্ধ গুরুর সাহায্যে এবং নিজ প্রকৃতির অনুকূল সাধন চেষ্টায় তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।"**

ঠাকুর, এই প্রকার বলিয়া, নীরব হইলেন; পরে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল— 'সদ্‌গুরু কি? তাঁর শিক্ষার বিশেষত্বই বা কি? আর ঐ দীক্ষালাভ হ'লে, কি অবস্থা হয়?'

ঠাকুর, ভাবাবেশে থাকিয়া থাকিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন— **"সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই; তাহা সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। এই দীক্ষা, যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায়, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হ'য়ে থাকে। ভগবানই সদ্‌গুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে তিনি নিজের ইষ্ট দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত**

ক'রে, তাঁরই সেবা পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হ'লে, সেবক যেমন তাহা দেখে লজ্জিত হন, দুঃখিত হন, শিষ্যেরও কোন প্রকার দুর্দ্দশা দেখ্‌লে, এই গুরু তেমনই নিজেরই, সেবা পূজার ত্রুটি হ'য়েছে মনে ক'রে, মলিন হ'য়ে যান। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত নাম, নাম নয়, অক্ষর নয় বা একটা শব্দ নয়; এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি! শিষ্যের ভিতরে এই শক্তি-সঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায়, একবারও কারও লাভ হ'লে, তার নিজের আর কিছুই কর্‌বার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কার্য্য, এমন কি— প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত, সেই এক জনারই ইচ্ছাধীন। কুমীরেপোকার আরসোলা ধরার মত, সদ্‌গুরু, শক্তি-সঞ্চার ক'রে, দীক্ষা দিয়ে, শিষ্যকে ক্রমে আত্মসাৎ ক'রে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে— "দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ'।"

সাধন চেষ্টাই উন্নতির সোপান; নৈরাশ্যের ভরসা।

জীবনের নানা প্রকার দুরবস্থা ভাবিয়া, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে একান্ত নিরাশ হইয়া, ঠাকুরকে বলিলাম, 'ব্রাহ্মসমাজে যত দিন ছিলাম, মনে হয়, বেশ ছিলাম। তখন কেমন একটা সত্যে অনুরাগ, ধর্ম্মে উৎসাহ, সকল দিকেই উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। সব দিকেই একটা সুন্দর অবস্থা ভোগ করেছি। এখন ত সেরূপ আর জীবনে কিছুই দেখ্‌ছি না। একটা কিছু ধ'রে, দু' পাঁচ দিন চেষ্টা কর্‌তে না কর্‌তেই, হয়রান হ'য়ে পড়ি; একটা দোষ দূর কর্‌তে গিয়ে, ভিতরের আরও দশটা গলদ বা'র হ'য়ে পড়ে। হাত পা যেন ভেঙ্গে যায়, মনের উৎসাহ নিবে আসে। এরূপ হয় কেন? সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়ে আমার উন্নতির পরিণাম কি এই হ'ল?'

ঠাকুর বলিলেন— **"এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, প্রায় অনেকেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ে কর্ত্তা, আমার উন্নতি আমিই কর্‌তে পারি, এই অভিমানটি থাক্‌তে, মানুষ ভগবানের দিকে তাকায় না। এই অভিমানটি নষ্ট কর্‌বার জন্যই, এই প্রকার অবস্থা আসা প্রয়োজন। মানুষ যে কিছুই নয়, মানুষের যে কিছুই কর্‌বার সাধ্য নাই, এটি বেশ ক'রে বুঝ্‌তে হবে। না হ'লে, ভগবানের দিকে কেহ দৃষ্টিও কর্‌বে না, উন্নতিও হবে না।"**

এই বলিয়া ঠাকুর, কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে ভাবাবেশে, ঢুলিয়া ঢুলিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন— **"গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম কর্‌তে বলেছেন। এই সংগ্রাম, সাধক মাত্রেরই জীবনে আস্‌বে। নানা প্রকার দুরবস্থায় প'ড়ে, প্রলোভনের সহিত, সাধক সংগ্রাম কর্‌তে থাক্‌বে। এই সংগ্রামে, সাধক কখনও বা প্রলোভনকে পরাস্ত কর্‌বে, আবার কখনও বা প্রলোভনে সাধককে পরাজয় কর্‌বে। এই বিষম সংগ্রামে, অনেক কাল, সাধককে কাটাতে হয়। এসময়ে একমাত্র গুরুদত্ত নামকেই অস্ত্র ক'রে, অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, রিপুকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌তে হয়। সংগ্রামের অবস্থার ন্যায়, এমন ভয়ানক**

অবস্থা, সাধকজীবনে আর নাই। বারংবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সাধক যখন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও রিপুগণ দ্বারা পুনঃপুনঃ পরাস্ত হ'তে থাকে, তখন তার আর ধৈর্য্য থাকে না। 'সাধন-ভজনে কিছুই হয় না, সাধন-ভজন সমস্তই বৃথা,' সাধক এরূপ মনে ক'রে, একেবারে নাস্তিকের মত হ'য়ে পড়ে। যারা দু' চার ধাক্কা খেয়েই, একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে, তাদের ভোগ শেষ হ'তে কালবিলম্ব হয়। আর যারা পুনঃপুনঃ প'ড়েও, গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় না, খুব শীঘ্রই তাদের ভোগ শেষ হ'য়ে যায়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই মতই সংগ্রাম কর্‌তে পারে; কেহ কম, কেহ বেশী। কিন্তু অবশেষে, সকলকেই এই যুদ্ধে পরাস্ত হ'তে হবে। যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্থ হ'য়ে হ'য়ে, যখন একেবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌বে, হাড়মুড় ভেঙ্গে, একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌বে, তখন সাধক বুঝ্‌বে, যে তার ক্ষমতায় আর কিছুই হবার নয়; সে নিতান্তই অসার; একটি সামান্য বিষয়েও, তার কিছুই কর্‌বার সামর্থ্য নাই। তখনই সে, নিজেকে যথার্থ হীন, পতিত, অধম জ্ঞান ক'রে, প্রবল শক্তিশালীর দিকে তাকাবে; অন্তরের সহিত তাঁর আশ্রয় নিবে; তাঁরই উপর একান্ত ভাবে নির্ভর ক'রে, যথার্থ কৃপাপ্রার্থী হবে। নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই; নিজেকে অসার হ'তেও অসার জেনে, একান্ত ভাবে, ভগবানের শরণাপন্ন হ'লেই, "ভক্তিযোগ" আরম্ভ হয়; তখন আর সাধকের কোনও প্রকার ইচ্ছা, চেষ্টা বা স্বাধীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান্ করেন পরিষ্কার জেনে, সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কৃপার উপর নিজেকে ছেড়ে দেয়। ভক্ত নিজেকে ভগবানের চরণে, সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ কর্‌লে, ভগবৎকৃপায়, তখন তার নিকটে নানা তত্ত্ব প্রকাশ হ'তে থাকে। এই সব তত্ত্ব প্রকাশের অবস্থাই "জ্ঞানযোগ" গীতাতে যে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় বলেছেন, তার তাৎপর্যই এই। তীব্র তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য ও প্রাণপণ সাধন-ভজন ক'রেও, যে যথার্থ অবস্থা কিছুই লাভ হয় না, তাঁর কৃপা ব্যতীত যে কিছুই হবে না, এটি পরিষ্কাররূপে বুঝ্‌বার জন্যই সাধন-ভজন। নিজের চেষ্টা, সাধ্য সমস্তই অসার। একমাত্র তাঁর কৃপায়ই সার।"

ঠাকুর, কিছুক্ষণ থামিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন— "খুব সংগ্রাম কর, এই সংগ্রাম, জীবনে আসাও, মহাসৌভাগ্য জান্‌বে। অনেকের জীবনে, এই সংগ্রামই আসে না। সংগ্রাম আরম্ভ হ'লেই বুঝ্‌বে, ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হ'ল। এই সাধনের ভিতরে যাঁরা আছেন, সকলকেই এই সংগ্রামে পড়্‌তে হবে, সকলকেই অন্তরের সহিত সমস্ত রিপুর নিকটে পরাস্ত মান্‌তে হবে। নিজেদের যাহা যথার্থ ভিত্তি, তাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের জায়গায় একবার গিয়ে দাঁড়াইলেই, নিজেকে অতিশয় হীন, পতিত, কাঙ্গাল ব'লে মনে হবে। ঐসময়ে দীনবন্ধু, পতিতপাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর ব'লে, ভগবান্‌কে ডাকা, একটা কথার কথা, শিখা কথা হবে না। নিজের দুরবস্থা অনুভব ক'রে, ভগবানকে ডাক্‌লে, উহা প্রাণের সহিত ডাকা হবে। তখন ভগবান্‌ও দয়া করবেন। নিরাশ হবার কিছুই নাই।"

১২৯৮ সালের— চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

চতুর্থখণ্ড

(১২৯৯ সালের ডায়েরী)

[বৈশাখ, ১২৯৯]

রূপের শোভানষ্টে ভজনে বিরক্তি

গুরুদেব আমার সাধন ভজন ও জীবনের উন্নতি বিষয়ে যতই ভরসা দিন না কেন, আমি আমার ভিতরের দুরবস্থা দেখিয়া, দিন দিন বড়ই হতাশ হইয়া পড়িতেছি। গত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকালে ঠাকুর আমাকে দুইটী নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে বলিয়াছিলেন। প্রথমটি—পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া চলা, দ্বিতীয়টি— প্রয়োজন বোধ হইলে কেবল পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) হইয়াই সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া। এই দু'টির একটি নিয়মও আমি এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করার ফলে আমার দুর্ব্বার কামরিপুর উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে উহার ফেঁক্ড়া অন্য দিক্ দিয়া গজাইয়া উঠিতেছে। স্ত্রীলোক দর্শনের স্পৃহা তেমন বলবতী না থাকিলেও, স্ত্রীলোক আমাকে দেখুক্ — এই লালসায় আমি মালাতিলকে সাজিয়া, সুন্দর বেশ-ভুষা করিয়া থাকি। ঠাকুর আমাকে সেদিন বলিলেন —

ব্রহ্মচারী। আয়নায় মুখ না দেখে' পার না? ব্রহ্মচারীর ওটি ক'রতে নাই।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম,—মুখ না দেখলে তিলক ক'রব কিরূপে? ঠাকুর কহিলেন,— **বাঁ হাতের তেলো এইভাবে সাম্‌নে রেখে', তা'র দিকে দৃষ্টি ক'রে তিলক ক'রো। ক্রমে নিজের মুখ তা'তে দেখ্‌তে পাবে।**

আমি ঠাকুরের কথা মত আন্দাজে ললাটদেশে ব্রাহ্মণোচিত ত্রিপুণ্ড্র আঁকিয়া তদুপরি উর্দ্ধপুণ্ড্র

করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহা ঠিক্ মত সরল না হওয়ায় গুরুভ্রাতারা আমায় উপহাস করিতে লাগিলেন। তিলক-বিভ্রাটে মুখের শোভা নষ্ট হইল ভাবিয়া উদয়াস্ত আমি অস্বস্তি ভোগ কবিতে লাগিলাম। ভিতবের উদ্বেগে সাধনেও আমার বিরক্তি আসিয়া পড়িল। নাম, ধ্যান আমার ধীরে ধীরে ছুটিয়া গেল। তখন রুদ্রাক্ষধারণের স্থানগুলিতে 'লোম্‌ছা' পোড়াব মত একটা জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে এই জ্বালা বৃদ্ধি পাইয়া বাহুর কক্ষাদিতে ফোস্কার মত মরা ছাল উঠিতে আরম্ভ করিল। তখন যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুরকে এসব অবস্থার কথা বলাতে ঠাকুর কহিলেন—

বিধিমতে রুদ্রাক্ষ ধারণ ক'রে নিয়মমত চ'ল্‌লে, তা'তে তম ও রজোগুণ নষ্ট হ'য়ে সাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিতি করে। সর্ব্বদা নামেতে ক'রে ভিতর ঠাণ্ডা না রাখ্‌লে উহা ধারণ ক'র্‌তে নাই,—রোগ জন্মায়। তুমি এখন কিছুদিনের জন্য রুদ্রাক্ষ তুলে রাখ; —তুলসীর মালা ধারণ কর। তা'তেই জ্বালা ক'মে যাবে, উপকার পাবে।

এখন আমি তাহাই করিতেছি। রুদ্রাক্ষ বর্জ্জনে উজ্জ্বল তেজস্বীরূপ হারাইয়া নিরীহ বৈরাগীর মত হইয়াছি। পাছে কেহ আমার এই কদাকার চেহারা দেখে—এই লজ্জায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নতশিরে থাকি। ভিতরে যেন মরার মত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি, —নিয়ত লোকের দৃষ্টির বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা হয়। হায়—ভগবান্! মাত্র রূপের গরিমা লইয়া ছিলাম — রুদ্রাক্ষ ছাড়াইয়া, ঠাকুর তাহাতেও বাদ সাধিলেন। এখন কি লইয়া থাকিব?

সাধকের প্রথম সংযম। স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ ও বীর্য্যধারণ।

আশ্রমস্থ স্ত্রীলোক, পুরুষ সকলেই আমার বেশের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নানা কথা তুলিতেছেন। সাধারণের অজ্ঞাত কোন গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপই ঠাকুর আমাকে এই দণ্ড দিয়াছেন,— এই প্রকার অনুমান করিয়া, কেহ কেহ আমার সম্বন্ধে আলোচনাও করিতেছেন। একটি গুরুভ্রাতা এই ব্যাপারেব সুযোগ পাইয়া একদিন ঠাকুরকে বলিলেন — "ব্রহ্মচারীর রান্নার সময়ে কচি-কচি মেয়েগুলি গিয়ে ব্রহ্মচারীর কাছে বসে, ব্রহ্মচারীও তাদের খুব আদর করে। ব্রহ্মচারী যখন আসনে থাকে তখনও মেয়েগুলি গিয়ে তার আসন ঘেঁসে' বসে, ব্রহ্মচারী কোন আপত্তিই করে না,—বরং ওতে যেন খুব আমোদ পায়। উহার কি এরূপ করা ঠিক?" এ সকল কথা শুনিয়া আমার ভিতর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি আর করিব? আমার তো কিছুই বলিবার যো নাই, — মুখ যে বন্ধ! ঠাকুর উহাদের কথায় আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া সমস্তই যেন স্বীকার করিয়া লইলেন, এবং আমাকে শাসন করিয়া বলিলেন,—

ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'রলে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রবই রাখ্‌তে নাই। স্ত্রীলোকের পানে

তাকাতে নাই, তাঁদের সঙ্গে ব'স্‌তে নাই, তাঁদের সহিত কোনপ্রকার আলাপ ক'রতে নাই। স্ত্রীজাতি যিনিই হউন্ না কেন,—অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন্, আর যুবতীই হউন্, কিম্বা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন্,—সর্ব্বদা তাঁদের থেকে দূরে থাক্‌তে হয়; না হ'লে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। স্ত্রী-দেহ এমনই উপাদানে গঠিত যে, নির্ব্বিকার পুরুষের শরীরকেও তাতে আকর্ষণ করে।—ইহা বস্তু-গুণ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও যে দেহের আশ্রয় গ্রহণ করেন তার কতক অধীনতা তাঁকেও স্বীকার ক'র্‌তে হয়। শাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা এই দু'টি সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মচারীদের অভ্যাস ক'র্‌তে হয়। সাধকাবস্থায় কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-সঙ্গত্যাগ না ক'রলে বীর্য্যধারণ হয় না। অজ্ঞাতসারেও স্ত্রীদেহের সংস্রব ঘট্‌লে, দেহস্থিত বীর্য্য চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। তা'তে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। বীর্য্যধারণ না হ'লে সত্যরক্ষাও সহজে হয় না। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, একাগ্রতা, প্রতিভা ইত্যাদি গুণ আপনা-আপনি সাধকের লাভ হ'য়ে থাকে। এই দু'টি একবার আয়ত্ত হ'লে সমস্ত সিদ্ধিই সাধকের সহজসাধ্য হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই সর্ব্বপ্রথমে সংযমের ব্যবস্থা। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষাই যথার্থ সংযম। এ দু'টি না হ'লে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ বহু দূরে। ধর্ম্মার্থীদের সর্ব্বপ্রথমে এ দু'টির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চ'লতে হয়। ধর্ম্ম একটা কথার কথা নয়। প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে হয়, না হ'লে হয় না।

মা ও গুরু—বিষম সমস্যা। ঠাকুরের তৃপ্তি।

আমার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কথা শুনিয়া মা নাকি দারুণ ক্লেশ পাইতেছেন। দিনরাত তিনি কান্নাকাটি করিয়া কাটাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া অন্নের দিকে চাহিয়া থাকেন, আর চোখের জলে ভাসিয়া যান। দুধ ছাড়িয়াছেন। অনশনে, অর্দ্ধাশনে তাঁহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মা আমাকে চাল, ডাল, ঘৃত, গুড় ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। "স্থূল ভিক্ষা" গ্রহণ করিতে আমার নিষেধ আছে, নিত্য ভিক্ষাই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের ব্যবস্থা। এখন এ সকল সামগ্রী লইয়া আমি কি করি? একদিকে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা; অপরদিকে বৃদ্ধা, দুঃখিনী জননীর বুকে শেল হানা। কোন্‌টি করিব? শুধু যদি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিলেই হইত তাহা হইলেও হয়ত আমি ঐসব বস্তু গ্রহণ কবিয়া মা'কে সন্তুষ্ট রাখিতাম। আমার পরিষ্কার ধারণা, গুরুদেব আমাকে মা অপেক্ষাও অধিক ভালোবাসেন; সুতরাং তাঁর বাক্য লঙ্ঘনে আমার লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কিছুই আসে না। কিন্তু ব্রতলঙ্ঘন আমি কি প্রকারে করিব? এই পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমস্ত ঋষি, মুনি, যোগীদের পরম আদরের সম্পত্তি। ইহা নষ্ট করিলে আমার পিতামাতা এবং যতদূর পর্য্যন্ত যাঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবেন।

এ সকল বিচার আমার ভিতর আসিয়া পড়িল। আমি হোমের জন্য ঘৃত এবং একদিনের মত চাল-ডাল গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই ঠাকুরের ভাণ্ডারে অর্পণ করিলাম। এখন ঠাকুরের সেবায় ঐ চাউল দেওয়া হইতেছে। তিনি উহা ভোজন করিয়া অন্নের বড়ই প্রশংসা করিলেন। বলিলেন--

এই (সেচিপোতা ধানের নূতন) চাউলের ভাত এতই মিষ্টি যে, শুধু নুন্ দিয়া এম্‌নি খাওয়া যায়। ভাতে যেন ঘি মাখা র'য়েছে। বড়ই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এই চাউল মধ্যে মধ্যে আমার জন্য দেশ হ'তে এনো।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। মায়ের হাতে প্রস্তুত করা চাউল ঠাকুর আনন্দের সহিত সেবা করিতেছেন—ইহাতে মা যথার্থই কৃতার্থ হইলেন।

লোভে প্রসাদভোজন, জ্বালা ও প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুদেবের আহারান্তে প্রসাদের থালা বারান্দায় রাখিয়া দেই। পরে স্থান 'মুক্ত' করিয়া উহা সকলকে আমি বাঁটিয়া দিয়া থাকি। আমি হাতে ধরিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহ উহা স্পর্শ করে না। খাওয়ার বস্তুতে আমার দারুণ লোভ, —ভাল বস্তু দেখিলেই জিহ্বায় জল আসে। অনেকে বলেন প্রসাদে লোভ ভাল। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইলেও উহার স্থূল উপাদান শুষ্ক, পর্য্যুষিত বা দুর্গন্ধময়ও হইতে পারে। সুতরাং অনেকের দেহের উপরে তাহারও একটা বিষময় ফল অনিবার্য্য। হয় তো লোভে পড়িয়া ঝাল, মিষ্টি ইত্যাদি সুস্বাদু, গুরুপাক, উত্তেজক বস্তু আহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনিষ্ট করিব—হয় তো এই জন্যই অথবা বহুলোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট কিছু থাকিবে না বলিয়াই দয়াল গুরুদেব স্বহস্তে আমার জন্য প্রত্যহ পৃথকভাবে প্রসাদ তুলিয়া রাখেন। আমার আহারের সময়ে তিনি আমাকে এই প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু জিহ্বার লালসায় অনেক সময়ে আমি তাহা পারি না। আজ উৎকৃষ্ট ছানার ডাল্‌না পাইয়া খাইতে বড়ই লোভ জন্মিল। মনকে বুঝাইলাম—এই উৎকৃষ্ট বস্তু যদি কেহ আমার অজ্ঞাতসারে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে আজ প্রসাদে বঞ্চিত হইব। তারপর শাস্ত্রে আছে, মহাপ্রসাদ 'প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা'।—এই যুক্তি ধরিয়া গুরুবাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া ফেলিলাম। প্রসাদ পাওয়ার পর ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল—ভিতরে একটা জ্বালা উঠিল। এই জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। নামে অরুচি ও বিরক্তি আসিল। ফলে সাধনভজন ছুটিয়া গেল। সারাদিন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম; এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আজ উপবাস করিয়া রহিলাম। কল্য আবার সন্ধ্যার সময়ে আহার করিব।

লোভ-সংযমের উপায়। রিপু দুইটি—জিহ্বা ও উপস্থ।

অবসর মত ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম—লোভের যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করিতে পারি না। ভালো জিনিষ দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়। আসনে বসিয়া যখন নাম করি,—অজ্ঞাতসারে সুস্বাদু বস্তুর কল্পনা আসিয়া পড়ে। নাম, ধ্যান কিছুই হয় না। পূর্ব্বে আমার এরূপ কখনও ছিল না। এখন কি করিব? ঠাকুর কহিলেন—

যা খেতে ইচ্ছা হ'বে, খেয়ে নিও। না খেলে ও ইচ্ছা যাবে না।

আমি — তা হলে আমার একাহারের নিয়ম তো রক্ষা হয় না! না খেলে কি এ ইচ্ছা যাবে না?

ঠাকুর—**না খাওয়াই ভালো। যা নিতান্ত ইচ্ছা হয়, খেয়ে নিও। আর একটি কাজ ক'রো। যে সব বস্তুতে খুব লোভ, তা' পরিতোষ ক'রে নিকটে ব'সে কারোকে খাওয়াইও। উপকার পা'বে। নুন্ ত্যাগ ক'রলে খাবার বস্তুতে লোভ ক'মে যায়। তা' তো আর পারলে না। ব্রহ্মচারী মশায় বলতেন, রিপু মাত্র দু'টি,—জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ সংযম করা সহজ। কিন্তু জিহ্বা সংযত রাখা বড়ই কঠিন। লোভেতে ক'রে স্থূল বস্তুর সঙ্গহেতু ক্রমে জীব জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য মুনি-ঋষিরা কতই কঠোর তপস্যা ক'রেছেন। অনাহারে, গলিত পত্রাহারে কতকাল কাটায়েছেন। অসংযত জিহ্বাদ্বারা কতপ্রকার উৎকট পাপের সৃষ্টি হয়। জিহ্বা বশ করার জন্য ঋষিরা মৌনী হইতেন। লোকের গুণানুবাদ, শাস্ত্রপাঠ ও ভগবানের নাম-কীর্ত্তনাদিতে জিহ্বা ভদ্র ও শুদ্ধ হয়। ক্রমে উহা সংযত হয়ে আসে।**

তীর্থ-পর্য্যটনে সংযম লাভ।

শুনিয়াছি, ব্যবস্থানুরূপ তীর্থ-পর্য্যটন করিলে এসব বিষয়ে সংযম খুব সহজে অভ্যস্ত হয়। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তীর্থ-পর্য্যটনের নিয়ম ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—

তীর্থ-পর্য্যটনে বিশেষ কল্যাণ। দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তীর্থ-পর্য্যটন যৌবনেই ক'রতে হয়। না হ'লে প্রায় হয় না, অনেক বিঘ্ন ঘটে। পর্য্যটনের সময়ে সর্ব্বদা নীচু দিকে দৃষ্টি রেখে' প্রতি পদবিক্ষেপে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ ক'রে চ'ল্‌তে হয়। প্রত্যহ তিন-চার ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্য্যন্ত চ'লে, একটা স্থানে আড্ডা নিতে হয়। সেখানে স্নান-আহ্নিক সমাপন ক'রে, সুবিধা হ'লে কোন দেবালয়ে প্রসাদ পাওয়া যায়। না হ'লে কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রস্তুত অন্ন আহার করা চলে, কিন্তু ভিক্ষান্ন স্বপাক আহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহা কখনও অপবিত্র হয় না, —পরম পবিত্র। শাস্ত্রে উহাকে অমৃত ব'লেছেন। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে

ভজন-সাধনে রাত্রি অতিবাহিত ক'রতে হয়। পর্য্যটনকালে টাকাপয়সা কখনও হাতে রাখতে নাই। কেহ কিছু দিতে চাইলেও নিতে নাই। কোথাও যাওয়ার সুবিধার জন্য কেহ টিকেট ক'রে দিলে নেওয়া যায়। সঙ্গে একটি জলপাত্র রাখতে হয় তা কাঠের করঙ্গ হ'লেই নিরাপদ। পর্য্যটনের সময়ে একখানা কম্বল, কৌপীন, বহির্ব্বাস, একটি জলপাত্র ও একখানা গীতা রাখ্‌লেই যথেষ্ট। কোন দলে না মিশে একাকী বা একটি লোক সঙ্গে নিয়ে চল্‌লেই সব চেয়ে ভাল। সাধুদের জমায়েতের সঙ্গে চল্‌লে তাদের নিয়মে বাধ্য হ'তে হয়। তাতে অসুবিধাও আছে।

তীর্থ-পর্য্যটনকালে পথে যে সকল মন্দির, দেবালয় পড়ে, দর্শন ক'রে যেতে হয়। কোথাও খুব ভাল লাগ্‌লে সেখানে ব'সে পড়'তে হয়। কিছু সময় সেই স্থানে থেকে সাধন ক'রতে হয়। পর্য্যটনকালে একরাত্রির অধিকসময় একস্থানে থাক্‌তে নাই। তীর্থে উপস্থিত হয়ে সর্ব্বপ্রথমে তীর্থগুরু করা ব্যবস্থা। পাণ্ডার নিকটে তীর্থের কর্ত্তব্য সমস্ত জেনে নিয়ে, সেই মত কার্য্য ক'রতে হয়। যে কোন তীর্থে কিছুদিন সংযতভাবে থেকে নিয়মনিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন ভজন ক'রলে তীর্থদেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায়। শুধু নিয়মরক্ষার মত তিনরাত্রিবাস ক'রে গেলে তীর্থের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না।

তীর্থ-যাত্রাকালে কখনও ক্রোধ ক'রতে নাই, ক্রোধেতে ক'রে সাধকের সাধনলব্ধ পুণ্য নষ্ট হয়। হিংসা, দম্ভ, পরনিন্দা পর্য্যটনকালে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। চিত্ত প্রসন্ন রেখে একমাত্র সত্যকেই অবলম্বন ক'রে চল্‌তে হয়। তীর্থযাত্রাসময়ে এসকল নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এ ভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ একবার পরিভ্রমণ ক'রে আস্‌তে বার বৎসর লাগে। এতে জীবনটি বেশ তৈয়ার হয়ে যায়। বিধিপূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটন ক'রলে সংযমটি সহজে অভ্যস্ত হয়—আরও অনেক প্রকার কল্যাণ হয়ে থাকে।

কর্ত্তব্য পালনে বৈরাগ্য লাভ। প্রলোভনে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায়।

মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার কি আরও কর্ম্ম বাকী র'য়েছে? ঠাকুর বলিলেন—

কর্ম্ম আর হ'য়েছে কি? সবই তো বাকী রয়েছে।

১০ই—২০শে বৈশাখ, ১২৯৯।

আমি কহিলাম—সে কর্ম্মের কথা বলি না— শ্রীবৃন্দাবনে ব'লেছিলেন মা দাদাদের নিকটে আমার কর্ম্ম রয়েছে—আমি সেই কর্ম্মের কথা ব'ল্‌ছি।

ঠাকুর—**মা তোমার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছেন বটে—তা হ'লেও যথেষ্ট হয় নাই। তিনি যদি রোগে দীর্ঘকাল কষ্ট পান, সেই সময়ে নিজ হ'তে গিয়ে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য হবে। আর তোমার দাদাদের প্রতিও অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাদের আপদ বিপদে সর্ব্বদাই দেখতে হবে। সকলেরই প্রতি কর্ত্তব্য আছে, এই সব কর্ত্তব্য ক'রে ক'রে ক্রমে বৈরাগ্য জন্মে। এই বৈরাগ্য জন্মিলেই রক্ষা। না হ'লে আবার সংসারে প্রবেশ ক'রতে হয়।**

আমি—সংসারে প্রবেশ কি? আমার কি বিবাহ ক'রতে হবে? আমাব তো বিবাহের কল্পনাও হয় না।

ঠাকুর—**সেই অবস্থা এখনও তোমার আসে নাই। ভবিষ্যতে সেই পরীক্ষা র'য়েছে। তখন যদি স্ত্রী-সঙ্গ কাকবিষ্ঠাবৎ মনে কর, স্ত্রী-সহবাস নিতান্ত অপবিত্র ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ বুঝতে পার তবেই রক্ষা। না হ'লে কি রক্ষা পাওয়ার যো আছে? ভবিষ্যতে অনেক পরীক্ষা। সেই সময়ে ঠিক্ থাক্‌তে পারলেই হোলো। বিষয়ে বাসনা থাক্‌লেই সেই স্থানে বদ্ধ হতে হয়। বৈরাগ্য না জন্মিলে কি ঠিক্ থাকা যায়?**

আমি—ভবিষ্যতে যে সকল পরীক্ষা প্রলোভনে প'ড়ব —কি উপায়ে তা হ'তে উত্তীর্ণ হবো?

ঠাকুর—**উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায় শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। ঐ সময়ে নামে ঠিক্ থাক্‌তে পার্‌লেই হোলো। নামে রুচি জন্মিলে কোন প্রলোভন, পরীক্ষাই কিছু করতে পারবে না। নামে রুচি না জন্মান পর্য্যন্তই বিপদের আশঙ্কা। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌তে কর্‌তেই নামে রুচি জন্মে, তা হ'লেই আর কোন মুস্কিল হয় না।**

সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায়—সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ।

১লা বৈশাখ প্রত্যূষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবিলাম—এ বৎসর খুব নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিয়া ঠাকুরের আদেশ যথামত প্রতিপালন করিয়া চলিব। কিন্তু দু'চারদিন অতীত হইতে না হইতেই দেখিলাম আমার সমস্ত সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিব স্থিব করিয়া আসন হইতে উঠি, সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দু'চার দণ্ড যাইতে না যাইতেই দেখি মনটি কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—সব ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাণায়াম, কুম্ভকযোগে সারাদিন নাম করিব সঙ্কল্প করিয়া খুব দৃঢ়তার সহিত লাগিয়া যাই—দু'চার ঘণ্টার পরেই দেখি মন জল্পনা-কল্পনার রাজ্যে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দু'তিন ঘণ্টা বিশ্রামান্তে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নাম করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—কোথা হইতে দুর্নিবাব অতিরিক্ত নিদ্রা আসিয়া প্রত্যহ আমাকে অবশ করিয়া ফেলিতেছে। যখনই যাহাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করি তখনই

তাহাতে অজ্ঞাতসারে শিথিলতা আসিয়া পড়িতেছে। আমার এরূপ কেন হইল—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল।

ঠাকুর সারারাত্রি একাসনে বসিয়া থাকিয়া, চারটার সময়ে একবার মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য শয়ন করেন। নিদ্রা যান কিনা বলিতে পারি না। রাত্রি ৩৷৷০ টার সময়ে প্রত্যেহই তিনি বাহিরে আসিয়া আমতলায় উপস্থিত হন, এবং উচ্চ হরিধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরকে ঐ সময়ে একাকী পাইয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—মনের একাগ্রতা, সাধনে দৃঢ়তা আমার কিসে জন্মিবে? নিদ্রাও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাধন করিতে পারি না। কি করিব?

ঠাকুর বলিলেন—**উপায় ঐ এক। বীর্য্য যদি স্থির হয়, সমস্তই সহজ হ'য়ে আসবে। ওটি না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক্ মত হয় না। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা—এই যদি ঠিক্ মত প্রতিপালন কর্‌তে পার এক সময়ে ভগবানের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ কর্‌বে। সত্য-প্রতিপালন কর্‌তে হ'লে সত্য কথা, সত্য চিন্তা এবং সত্য ব্যবহার কর্‌তে হয়। জিজ্ঞাসিত না হ'য়ে কখনও কথা বল্‌বে না। জিজ্ঞাসিত হ'লে সত্য ধারণামত আধ ঘণ্টা বল্‌লেও কোন দোষ হবে না। নিজ হ'তে কথা বলা একেবারে কমিয়ে ফেল্‌তে হয়। বীর্য্যধারণও সহজ নয়। কত প্রকারে বীর্য্যক্ষয় হয়। প্রস্রাবের সময়ে যেরূপ কর্‌তে ব'লেছি—সেই মত করো। না হ'লে পেরে উঠ্‌বে না। চেষ্টা ক'রে যাও—ধীরে ধীরে সব হ'য়ে আস্‌বে।**

একটু পরে আবার বলিলেন—**তোমাদের এদিকের ছেলেদের পশ্চিমদেশ অপেক্ষা কু-অভ্যাস বেশী। এ বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা একেবারে নাই। তা'তেই ছেলেরা খারাপ হয়। খুব ছোট সময় হ'তেই কু-অভ্যাস জন্মে। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা সব বিষয়ে ছেলেদের শিক্ষা দেন, কিন্তু যা'তে শরীর মনের বিশেষ কল্যাণ হয়—সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে লজ্জা বোধ করেন। শিক্ষা দেওয়া তো দূরে থাক্ বরং কুদৃষ্টান্ত দেখান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একঘরে রে'খে স্ত্রী পুরুষে অপর ঘরে থাকেন। এসব ছেলেবেলা হ'তে সুযোগ পায় ব'লে ছেলেরা খারাপ দিকে চলে। দিন দিন যেরূপ হ'চ্ছে—তা'তে মনে হয়, আর কিছুদিন পরে বিষম অবস্থা দাঁড়াবে।**

এই বলিয়া ঠাকুর কতগুলি ঘটনা বলিলেন। আমি বলিলাম— কেহ আমাকে বিদ্বেষভাবে মিথ্যা দোষারোপ কর্‌লে আমি তা' সহ্য কর্‌তে পারি না।

ঠাকুর বলিলেন—

উত্তর দিলেই বা লাভ কি? ঝগড়া মাত্র হয়। তা'তে নিজেরই তো ক্ষতি। এ সব বিচার

ক'রে সর্ব্বদা চল্‌তে হয়।

স্বাস্থ্যলাভের উপায়। বিভিন্ন মালা ধারণের উপকারিতা। রুদ্রাক্ষ ধারণের আদেশ।

আজ মেঘাড়ম্বর দেখিয়া সময়ের কিছুই ঠিক্ পাইলাম না। বেলা অবসান অনুমানে ভাবিলাম—ঠাকুর প্রত্যহই ৪টার সময়ে আমাকে বলিয়া থাকেন—

ব্রহ্মচারী। রান্না কর্‌তে যাও—

১৪ই বৈশাখ

আজ বোধ হয় ঠাকুর ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি রান্না ও আহার সমাপনের পর ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। একটু পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—**ব্রহ্মচারী। রান্না কর্‌তে যাবে না?**

আমি কহিলাম—বেলার ঠিক্ পাই নাই। রান্না ও আহার করিয়া নিয়াছি।

ঠাকুর বলিলেন—**সন্ন্যাসীরা আকাশ দেখেই বেলার ঠিক্ পান, আমাদেরই মুস্কিল, ঘড়ি না দেখে বেলা বুঝি না। আহারের পরিমাণ ও সময় খুব ঠিক্ রে'খো। এ দু'টি ঠিক্ রাখ্‌লেই শরীর বেশ সুস্থ থাক্‌বে।**

আজ ঠাকুরের গলায় প্রবালের মালা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রবালের মালা ধারণে কি উপকার হয়? ঠাকুর বলিলেন—**শরীর ঠাণ্ডা রাখে।**

আমি—তুলসীর মালা ধারণেও তো শরীর ঠাণ্ডা রাখে। এও কি সেই প্রকার?

ঠাকুর—**তুলসী ধারণে শরীর ঠাণ্ডা করে, আর দেহ মন সাত্ত্বিক করে। প্রবালে পিত্ত নষ্ট ক'রে শরীর ঠাণ্ডা রাখে, মনের উপরও কিছু কিছু ক্রিয়া করে।**

পদ্মবীজ ও স্ফটিকের উপকারিতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—

পদ্মবীজ ধারণে মন প্রফুল্ল থাকে। স্ফটিকে তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি করে। এজন্য শাক্তেরা স্ফটিক ব্যবহার করেন, ভাল ভাল ফকিরদেরও স্ফটিক ব্যবহার কর্‌তে দেখা যায়। অনেকে স্ফটিকের মালা জপ করেন।

রুদ্রাক্ষত্যাগ করার পর হইতে আমার যে অবস্থা হইয়াছে—ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর বলিলেন—**তুলসীতে উগ্রভাব নষ্ট করে—স্বভাব নম্র ও বিনয়ী করে। রুদ্রাক্ষে উৎসাহ, উদ্যম ও তেজ বৃদ্ধি করে। শরীরও খুব গরম রাখে। কাল হ'তে তুমি আবার পূর্ব্বের মত রুদ্রাক্ষ ধারণ**

কর। শরীর তোমার রুদ্রাক্ষের তেজ ধারণ কর্‌তে পার্‌তো না ব'লেই—উহা তুলে রাখ্‌তে ব'লেছিলাম। এখন উহা আবার নিয়মমত ধারণ কর।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কতক্ষণে দিন শেষ হয়—দেখিতে লাগিলাম।

স্বপ্ন—ক্রোধে পতন।

গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম—ঠাকুরের সহিত একটি নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। শ্রীধর এবং শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ও সঙ্গে আছেন। ঠাকুর বলিলেন—

এই সাধন যাঁহারা পাইয়াছেন, সকলেই বড় লোক, সকলেই মোক্ষলাভ করিবেন। আমাকে বলিলেন—**পূর্ব্বে তুমি সন্ন্যাসী ছিলে। ক্রোধ দ্বারা পতিত হইয়াছ। দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে।**

১৫ই বৈশাখ।

এই কথা শোনার পরই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি অবসর মত ঠাকুরকে স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর মাথা নাড়িয়া স্বপ্নের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সায় দিয়া লিখিয়া রাখিতে বলিলেন।

দীক্ষাকালীন উপদেশ। পরমহংসজীর আদেশ।

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। অনেকে আজ সাধন পাইবেন। সকালে দীক্ষাপ্রার্থীরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার ছোট ভাই রোহিণীর আজ দীক্ষাগ্রহণের কথা ছিল, বড়দাদার ছেলে শ্রীমান্ সজনীর অদ্য বিবাহ বলিয়া রোহিণী আসিতে পারে নাই। মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ঠাকুর দীক্ষাদানের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন—**সাধনপ্রার্থীরা সকলে আসিয়াছেন?** একটি গুরুভ্রাতা বলিলেন—ব্রহ্মচারীর ছোট ভাই রোহিণী আসে নাই। ঠাকুর কহিলেন—**সে আর কী প্রকারে আসবে? তার পরে হবে।**

১৮ই বৈশাখ।

ইহার পর কোঠাঘর লোকে পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া ঠাকুর সাধনপ্রার্থীদিগকে বলিতে লাগিলেন—

১। **সর্ব্বদা সত্য প্রতিপালন কর্‌বে। মনে যাহা যথার্থ প্রতীতি হবে— তাহাই সত্য ব'লে গ্রহণ কর্‌বে। সত্যরক্ষা কর্‌তে হ'লে মিথ্যা কল্পনা, বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। না হ'লে সত্য বলা যায় না। আর জিজ্ঞাসিত না হয়ে কথা বল্‌তে নাই। সর্ব্বদা পরিমিতভাষী হবে। কাহারও নিন্দা করবে না। পরনিন্দা মহাপাপ; নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।**

২। বীর্য্যধারণ কর্‌বে। বীর্য্যরক্ষা যদিও শারীরিক তপস্যা তথাপি ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বীর্য্যরক্ষা না হ'লে সত্য প্রতিপালন হয় না। ইহা দ্বারা সাধনের বিশেষ সাহায্য হয়। যাঁহারা সন্ন্যাসী কোনরূপেই তাঁহারা বীর্য্য নষ্ট কর্‌বেন না। যাঁহারা গৃহী শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহারা ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস কর্‌বেন। অযথা যাঁহারা বীর্য্য নষ্ট করেন তাঁহারা পিতৃমাতৃঘাতী। এই দেহ পিতামাতার বীর্য্যশোণিত দ্বারা উৎপন্ন। কেবল পিতৃঋণ শোধ কর্‌বার জন্যই বীর্য্যত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বৃথা বীর্য্য নষ্ট কর্‌লে পিতৃমাতৃঘাতী, আত্মঘাতী ও ব্রহ্মঘাতী হ'তে হয়। বীর্য্যরক্ষা দ্বারা মনের একাগ্রতা ও শরীরেব সুস্থতা লাভ হয়। বীর্য্যরক্ষা না হ'লে সাধনে উৎসাহ থাকে না। সাধনের উপকারিতাও অনুভব হয় না।

৩। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। ইহাই আমাদের সাধন। প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন ফেলা হচ্ছে—নেওয়া হচ্ছে, তেমন উহার প্রতি লক্ষ্য রে'খে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে।

হঠাৎ একবারে এসব হয় না। বারংবার চেষ্টা ক'রে উঠে পড়ে এই কয়টি বিষয়ে স্থির হ'তে হবে। চেষ্টা থাক্‌লে একসময় এই সব হবেই। সাধনের বিধি বলা হ'লো—এখন নিষেধ বলা যাচ্ছে।

৪। মাংস, উচ্ছিষ্ট ও মাদক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর্‌তে হবে। কঠিন রোগে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা মত মাংস, মাদক ব্যবহার করা যায়, শুধু ঔষধরূপে। প্রয়োজন শেষ হওয়ামাত্র আবার ছাড়্‌তে হবে। মৎস্য আহারে নিষেধ নাই। বিধিও নাই। যা'র যেমন ইচ্ছা। উচ্ছিষ্ট সর্ব্বদাই ত্যাগ কর্‌বে। পিতামাতা পরম গুরু; তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট নয়। প্রসাদজ্ঞানে উহা গ্রহণ করলে উপকারই হয়। উচ্ছিষ্টজ্ঞান হ'লে উহাও ত্যাগ কর্‌বে। পাঁচ বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স, তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট হয়। যে সব শিশুদের ভালমন্দ জ্ঞান হয় নাই—তাহাদের উচ্ছিষ্ট তত অনিষ্টকর হয় না।

৫। কোনপ্রকার দলে বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ থাকবে না। যেখানে পরমেশ্বরের নাম, যেখানে ধর্ম্মের কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, সেখানেই ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার কর্‌বে। সকল ধর্ম্মার্থীদেরই আদর কর্‌বে। কোন সম্প্রদায়কেই অনাদর করবে না। আমাদের কোন দল বা সম্প্রদায় নাই।

৬। স্ত্রীলোক হ'তে সর্ব্বদা সাবধান থাক্‌বে। তাহাদের সঙ্গে এক ঘরে সাধন কর্‌বে না। যে স্থলে গৃহাভাব—তথায় অগত্যা একটি পর্দ্দা দিয়া নিবে। নির্জ্জনে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বস্‌বে না।

৭। যথাসাধ্য পরোপকার কর্‌বে। যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা খুব আদরের সহিত অতিথি-সৎকার কর্‌বেন। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলেরই যাহাতে তৃপ্তি হয়—গৃহী তাহা কর্‌বেন। কোনপ্রকার হিংসা কর্‌বেন না। একটি বৃক্ষের পাতাও বিনা প্রয়োজনে ছিঁড়তে নাই। কাহারও মনে বৃথা কষ্ট দিবে না।

যাঁহারা এখানে দীক্ষা নিতে এসেছেন, শুধু তাঁ'দের জন্যই এসকল কথা নয়। ইহলোক ও পরলোকে যাঁহারা এই সাধনের ভিতরে আছেন—সকলেরই জন্যে পরমহংসজী এই আদেশ কর্‌লেন।

এ সকল আদেশ প্রদানের পর ঠাকুর **জয় গুরু! জয় গুরু!** বলিতে বলিতে ধ্যানস্থ হইলেন; পরে দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন।

এই সময়ে গুরুভ্রাতাদের নানাপ্রকার অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কোঠার ভিতরে বাহিরে সকলেরই মধ্যে হাসি, কান্না, আনন্দ উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুর ক্রমে সকলকে সংযত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। স্ত্রী-পুরুষে আশ্রম পরিপূর্ণ। সকলেরই খুব আনন্দ!

পরিবেশনে বৈষম্য—ঠাকুরের বিরক্তি।

আজ আশ্রমে মহোৎসব। সুখাদ্য সামগ্রী দ্বারা ঠাকুরের ভোগের আয়োজন দেখিলে ভিতর আমার শুকাইয়া যায়; মুখ মলিন হইয়া পড়ে। প্রায়ই উৎকৃষ্ট সুখাদ্য বস্তু স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছি— অথচ নিজে এক কণিকাও খাইতে পাই না। লোভের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি—অন্তরের ক্লেশ একটি লোককেও বলিবার যো নাই। সকলেই আমার ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী। আজ গুরুভ্রাতাদের লইয়া ঠাকুর যখন ভোজন করিতে বসিলেন, পরিবেশনকালে সমস্ত বস্তুই ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে দিয়াছিলাম। ঠাকুর তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সকলের সাক্ষাতেই আমাকে বলিলেন—

"ব্রহ্মচারী! প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় বেশী পরিমাণে খাবার দিলে, উচ্ছিষ্ট বস্তু দেওয়া হয়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আমার দিকে কট্‌ মট্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন—কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন। হায়! উচ্ছিষ্ট বস্তু ঠাকুরকে খাওয়াইতেছি ভাবিয়া আমি একান্ত প্রাণে মনে মনে ঠাকুরের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলাম।

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে আর একবার পরিবেশনের বৈষম্যহেতু কঠোর শাসন করিয়াছিলেন—এক পংক্তিতে ভোজনকারীদিগের মধ্যে পরিবেশনে তারতম্য করিতে নাই— ইহা সাধারণ নীতি, কিন্তু ঠাকুরের বেলায় এই নীতি রক্ষা করিয়া চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। শিষ্যদের পংক্তিতে গুরুর বিশেষত্ব থাকিবেই—ইহা দোষাবহ মনে হয় না; তারপর প্রসাদ রাখিতে গিয়া ঠাকুর অল্প পরিমাণে আহার করিবেন—এই প্রকার ভাবও পরিবেশনকালে স্বতঃই প্রাণে উদয় হয়।

আহারান্তে ঠাকুর আমার জন্য আর আর দিনের ন্যায় স্বহস্তে সুস্বাদু প্রসাদ তুলিয়া রাখিলেন। এ ভাগ্য কাহার হয়? গুরুপাপে লঘু দণ্ড করিয়া —ঠাকুর যাচিয়া অপরিসীম দয়া করিতেছেন। ইহা দেখিয়া কান্না সংবরণ করিতে পারি না। প্রতিদিন ঠাকুরকে নিজহাতে আহার দিয়া থাকি কিন্তু যেভাবে ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া দিতে হয়—একটি দিনও তাহা পারিলাম না। ঠাকুর কেন যে এ পিশাচের হাতে খাবার গ্রহণ করেন বুঝিতেছি না। আজও আমি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া মধ্যাহ্নেই ঠাকুরের প্রসাদ পাইলাম। অমনি দারুণ জ্বালা উপস্থিত হইল। হায় কপাল! গুরুভ্রাতারা আমার হাতে কণিকামাত্র ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরমানন্দে দিন কাটান, আর আমাকে ঠাকুর স্বহস্তে প্রসাদ দেন—তাহা পাইয়াও সমস্তদিন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি, সাধন চলে না—নামও একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়।

কাম, ক্রোধ ও লোভ নরকের দ্বারস্বরূপ।

অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রসাদ পেয়েও আমার জ্বালা হয়—এ কি রকম? ঠাকুর কহিলেন—**নির্দিষ্ট সময়ে একবেলা আহার তোমার নিয়ম। নিময় রক্ষা ক'রে চল্‌লে এ সব হয় না। নিয়মটি রক্ষা ক'রে চ'লো।**

আমি—আমি লোভ সংবরণ করতে পারি না—এই লোভ কি আমার যাবে না?

ঠাকুর বলিলেন—**কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর হাত হ'তে একেবারে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন। এজন্য ঋষি মুনিরা কত ক'রেছেন। কঠোর তপস্যা ও ভজনসাধনদ্বারা অবস্থার একটু উন্নতি হ'লেই এ সকল রিপু এসে সাধককে আক্রমণ করে। নানা প্রকার দুরবস্থায়, প্রলোভনে ফেলে এদের সর্ব্বনাশ করে। বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্যাদ্বারা অত শক্তিলাভ ক'রেও—কামের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেলেন না। পতিত হ'তে হ'লো। বহু চেষ্টায় কামকে একটু দমন করতেই ক্রোধ এসে আক্রমণ করলো। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অধিকারী হ'য়েও বিশ্বামিত্র দুর্জ্জয় রিপু ক্রোধের নিকট পুনঃপুনঃ পরাস্ত হ'তে লাগ্‌লেন; তাঁর সমস্ত তপস্যার ফল নষ্ট হ'য়ে গেল। তখন তিনি নিরুপায় দেখে লোকসঙ্গ ত্যাগ কর্‌লেন, মৌন হ'লেন; তীব্র তপস্যার দ্বারা আবার পূর্ব্ব অবস্থা লাভ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। এ সময়ে লোভের উৎপাত আরম্ভ হ'লো।**

বিশ্বামিত্র আহার ত্যাগ কর্‌লেন। কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দ্বারস্বরূপ। একমাত্র ভগবানের ভজনদ্বারা ইহাদের মুখ ফিরায়ে দিতে পার্‌লেই নিষ্কৃতি। তখন ইহারা ভজনের সহায় হয়, বন্ধু হয়। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম কর্‌লেই ক্রমে এদের উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। এমন সহজ উপায় আর নাই।

ইষ্টমন্ত্র গুরুকেও বল্‌তে নাই।

২০শে, — ২৪শে বৈশাখ।

কয়দিন যাবৎ সাধনভজনে মন বসিতেছে না নিয়ত মার কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছে। হঠাৎ এমন কেন হইল, বুঝিতেছি না। আজ অপরাহ্নে ছোড়দাদা রেহিণীকে লইয়া বাড়ী হইতে আসিলেন। তাঁর মুখে শুনিলাম, মা আমার জন্য কান্নাকাটি করিতেছেন। বুঝিলাম এ জন্যই আমার এত অস্থিরতা। মাকে ঠাণ্ডা করিয়া তাঁর চরণধূলি লইয়া না আসিলে কিছুতেই চিত্ত স্থির হইবে না। মার জন্য প্রাণ বারংবার কাঁদিয়া উঠিতেছে।

আজ রোহিণীর দীক্ষা হইল। "বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা" বিষয়ে আজ ঠাকুর বিশেষ করিয়া বলিলেন। এ বিষয়ে এমনভাবে আর কখনও বলেন নাই।

ঠাকুর কহিলেন—**বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা যত কাল না হবে—তত কাল সাধনের ফল অনুভব হবে না। সাধনে যদি যথার্থ উপকার পাইতে চাও—এ দু'টি রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে।**

গৃহস্থ বৈধভোগের দ্বারা কি প্রকারে কর্ম্ম শেষ করিবে—ঠাকুর তাহা বিস্তারিত রূপে বলিলেন।—**গৃহী ঋতুগামী হবেন। শাস্ত্র-ব্যবস্থামত স্ত্রীসঙ্গ কর্‌বেন। নেশাবস্তু, উচ্ছিষ্ট ও মাংসাহারে সাধন-শক্তিকে একেবারে চেপে রাখে, প্রকাশ হ'তে দেয় না। এ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর্‌বেন। ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকটে প্রকাশ কর্‌বেন না। এমন কি গুরু জিজ্ঞাসা কর্‌লেও বল্‌বেন না।**

দীক্ষাকালে আর আর লোককে যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন, রেহিণীকেও তাহাই দিলেন। আজ গুরুদেব দয়া করিয়া আমার সকল ভ্রাতাদেরই ভার গ্রহণ করিলেন। আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

ঠাকুরের অসাধারণ অনুভব।

আজ মধ্যাহ্নে পাঠান্তে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি—ঠাকুর ধ্যানস্থ—হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—**"জগবন্ধু কুলগাছটি কাটিতে কাটারি নিয়ে বেরিয়েছেন, শীঘ্র গিয়ে বল, যেখানে**

কাট্‌তে মনে ক'রেছেন—তার দেড় হাত উপরে কাটেন।" আমি দৌড়িয়া দক্ষিণের চৌচালার পশ্চিমদিকে কুলগাছের নিকটে পৌঁছিয়া দেখি—জগবন্ধু বাবু কাটারিহস্তে আসিতেছেন। গাছটি কোথায় কাটিবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্থান দেখাইয়া বলিলেন—এখানে কাট্‌বো। আমি বলিলাম—ঠাকুর আরও দেড় হাত উপরে কাট্‌তে বলেছেন। জগবন্ধুবাবু তাহাই করিলেন। দেখিলাম ঐ স্থানে গাছটি কাটায় দু'টি বড় ডাল রক্ষা পাইল, তাহাতে গাছটি বাঁচিয়া গেল।

গতকল্য ঠাকুর পাঠ শুনিতে শুনিতে আমাকে বলিলেন—**ব্রহ্মচারী! কাঁঠাল গাছের চারাটিকে ছাগলে খাচ্ছে—সাত গ্রাস খেতে দিয়ে তাড়িয়ে দাও।** আমি তাড়াতাড়ি কাঁঠালগাছের নিকটে যাইয়া দেখি—ছাগলটি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উহার একটি পাতা চিবাইতেছে। ইহার সাতটি পাতা খাওয়া হইলে তাড়াইয়া দিলাম। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ছাগলটিকে সাত গ্রাস খাইতে বলিলেন কেন? চারাগাছ, সাতটি পাতা খাওয়াতেই যে ওর দফা শেষ। ঠাকুর বলিলেন—**যার যা খাবার জিনিষ, খেতে আরম্ভ করলে বাধা দিতে নাই—অন্ততঃ সাত গ্রাস খেতে দিয়ে বাধা দিতে হয়।**

ঠাকুর কোথায়—আর কাঁঠাল গাছই বা কোথায়—ঠাকুর কি প্রকারে জানিলেন—তাহা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিই হইল না। সেদিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়া ঠাকুরকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন; ঠাকুরের নিকটে ঐ চিঠিখানা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর জগবন্ধু বাবু দ্বারা সমস্তগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পরে জানা গেল চিঠি পড়িয়া উত্তর দিতে গেলে, যথাসময়ে নগেন্দ্রবাবু তাহা পাইতেন না। ঠাকুরের এই প্রকার দূরদৃষ্টি ও অনুভব সর্ব্বদা দেখিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে এখন আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে কোন প্রকার আন্দোলনই আসে না।

মাতাঠাকুরাণীর উপরে বিরক্তি—তাঁর প্রসাদ পাইতে ঠাকুরের আদেশ।

২৫শে বৈশাখ।

ছোড়দাদা রোহিণীকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। রোহিণীর বিবাহ। আমাকে বাড়ি যাইতে পুনঃপুনঃ বলিলেন। মা আমার জন্য খুব ক্লেশ পাইতেছেন। ছোড়দাদা বলিলেন—বিবাহে আত্মীয়স্বজন যাহারা আসিয়াছেন—আমার সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনা শুনিয়া মা'র মন খারাপ হইয়া গিয়াছে—তিনি সর্ব্বদা কাঁদেন আর গোঁসাইকে গালাগালি করেন। এ কথা শুনিয়া অবধি আমার ভিতরে যেন আগুন লাগিয়াছে। মা ঠাকুরকে গালাগালি করেন। মা'র উপরে অত্যন্ত রাগ হইল। আর মা'র মুখ দেখিব না—মনে মনে স্থির করিলাম।

মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহারান্তে আর আব দিনের ন্যায তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম। মন অতিশয় অস্থির। একদিকে বাড়ী যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা—অপর দিকে মা'র উপর ভয়ানক ক্রোধ—তারপর এ সময়ে বাড়ী গেলে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি রক্ষা করিতে পাবিব কি না খুব সন্দেহ—এ অবস্থায় কি করি? মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—ঠাকুর যদি এ বিষয়ে একটা কিছু বলিয়া দেন নিশ্চিন্ত হই। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —**কি ব্রহ্মচারী! বাড়ীতে বিবাহে তোমার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র এল না?**

আমি—শুধু পত্র কেন? লোকও ছ'সাতবার এসেছে।

ঠাকুর—**তবে বাড়ী গেলে না কেন?**

আমি—এ সময়ে আত্মীয়স্বজন বহু স্ত্রীলোক পুরুষ বাড়ীতে এসেছেন। তাঁদের নিকটে মাথাগুঁজে নির্ব্বাক্ হ'য়ে ব'সে থাকা সহজ নয়, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম এ সময়ে প্রতিপালন ক'রে চলা বড়ই শক্ত—তাই এতদিন বাড়ী যাই নাই।

ঠাকুর বলিলেন—**না গিয়ে খুব ভালই করেছ। বিবাহ হ'য়ে গেলে একবার বাড়ী যেও। বাড়ী গিয়ে আর ভিক্ষা করো না। মা ঠাক্‌রুণের প্রসাদ পেও।** ইহার পর ঠাকুর আমাদের বিবাহের নিয়মাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণীর বিবাহে 'কত টাকা পণ নেওয়া হ'ল' ঈষৎ হাসিয়া তাহারও খবব নিলেন। ঠাকুরের সহিত এসব বিষয়ে কথাবার্ত্তায় আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণই সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যার পর খুব উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াও সামান্য অপরাধে পতিত হয়; নিরাপদ স্থান কি তবে নাই?

ঠাকুর কহিলেন—**সদ্‌গুরুর আশ্রয় যাঁহারা পেয়েছেন তাঁহারাই নিরাপদ হয়েছেন। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে কোন ভয়ই থাকে না।**

আমি—তবে ঐ সব মহাত্মারা, মুনি-ঋষিরা কি সদ্‌গুরু লাভ করেন নাই?

ঠাকুর—**সদ্‌গুরু লাভ কি এতই সহজ? বহু জন্ম সিদ্ধিলাভ ক'রে—একমাত্র ভগবানের কৃপায়ই সদ্‌গুরু লাভ হয়। সদ্‌গুরু লাভ হ'লে তাঁরা আর কোন অবস্থা হ'তেই পতিত হন না। তবে কর্ম্ম কাটাবার জন্য তাঁদের অবস্থা কিছু কালের জন্য চেপে রাখা প্রয়োজন হ'তে পারে। নষ্ট কখনও হয় না। সদ্‌গুরু লাভের পর যে কোন অবস্থাই লাভ হোক্ না কেন তাহা একেবারে স্থায়ী। সদ্‌গুরু লাভ হ'লেই সম্পূর্ণ নিরাপদ।**

আমি—সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যদি কেহ আবার অন্যত্র গিয়ে দীক্ষা নেন, সদ্গুরু প্রদত্ত সাধন ত্যাগ করেন, তা হ'লে সদ্গুরুও তাকে ত্যাগ করেন কি?

ঠাকুর—**তা কি আর কখনও হয়? তবে কর্ম্মভোগ শেষ করাইতে কিছুকাল ঘুরাইতে পারেন। কিন্তু তিন জন্মে নিশ্চয়ই কর্ম্ম শেষ করাইয়া নেন্।**

অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই সাধন।

একটু পরে ঠাকুর নিজ হইতে সকলকে বলিতে লাগিলেন—

আমাদের এই সাধন পূর্ব্বে আর কখনও গৃহস্থদের মধ্যে ছিল না। গৃহস্থদের এ সাধন লাভ করা এবারই প্রথম। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই সাধনের প্রচলন ছিল। কেহ ইচ্ছা করলেই অমনি এ সাধন লাভ কর্তে পার্তেন না। বর্ত্তমান সময়ে সংসারের দুরবস্থা দেখে কয়েকজন মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য সংসারীদের মধ্যেও প্রার্থী হ'লে'ই এই দুর্ল্লভ সাধন যাকে তাকে দিয়েছেন। যাদের এ সাধন দেওয়া গিয়েছে, তারা কেহই নিয়মমত এ সাধন কর্ছেন না। এ পর্য্যন্ত একটি লোকও প্রস্তুত হলো না। তাই কিছুকাল পর্য্যন্ত এদের কি অবস্থা দাঁড়ায়, তা দেখবেন। যাদের আশা দেওয়া গিয়াছে, মাত্র তারাই সাধন পাবেন। এ বছর নূতন আর কেহ সাধন পাবেন না—এখন এরূপ আদেশ হলো। সাধন নিয়ে যদি কিছুই করা না হয়—তবে এ সাধন নেওয়া কেন? বৃথা ঋষি-মুনিদের পরম আদরের সাধনপথ কলুষিত করা হয় মাত্র। কাহারও সাধনে নিষ্ঠা নাই। আমাদের সাধনে বেশী কথা নাই—মাত্র তিনটি কথা। যিনি এই তিনটি কথা রক্ষা কর্ছেন, তিনিই সাধন কর্ছেন। অহিংসা, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই তিনটিই এখন আমাদের সাধন। কেহ যদি ঈশ্বর না মানেন, নাম-সাধন না করেন, কিন্তু এই তিনটি গুণ অবলম্বন ক'রে চলেন, তাঁকে আমি ধার্ম্মিক মনে করি। আস্তিকই হউন বা নাস্তিকই হউন, মূলকথা এই তিনটি গুণ থাকা চাই। তার পর প্রেমভক্তির কথা, সে অন্য প্রকার। এ সব গুণ থাকলে প্রেমভক্তি তাঁর লাভ হবেই। সে জন্য আর চেষ্টা করতে হবে না। মনুষ্যের যা' কর্ত্তব্য—ঐ তিনটি লাভ হ'লেই হ'য়ে গেল। ঐ তিনটির একটিতেও যদি শিথিলতা হয়, তা' হ'লে সংকীর্ত্তনে ভাব উচ্ছ্বাসই হোক্—আর নামে অশ্রুপাতই হোক্—কিছুই নয়।

চন্দ্রগ্রহণ—সংকীর্ত্তন—ভাবের ঘরে চুরি, ঠাকুরের শাসন।

বুধবার, ৩০শে বৈশাখ।

আজ চন্দ্রগ্রহণ—আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহর হইতেও বহু গুরুভ্রাতারা আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাহারা নানাস্থানে দলে দলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে ঠাকুর বাহিরে আসিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

আজ এখানে এই শুভক্ষণে কত দেবদেবী, ঋষিমুনি এসেছেন—ইঁহারা কত আনন্দ কর্‌ছেন। তোমরা সংকীর্ত্তন কর।

ঠাকুরের বলামাত্র খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থলে ঠাকুর স্থিরভাবে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি ভদ্রলোক নানপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার নৃত্য আমাদের কাহারই ভাল লাগিল না। বরং বিরক্তি আসিতে লাগিল। ঠাকুর—**"কপটতা ক'রো না, কপটতা ক'রো না"** বারংবার বলিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি আরও ভাবোন্মত্ততা দেখাইতে লাগিলেন। তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাৎদিক্ হইতে ঠাকুর তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া রাস্তার দিকে ধাবমান হইলেন। পরে কীর্ত্তন-অঙ্গনের বাহিরে উহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—

এখানে ভাব দেখাতে এসেছ? ভাবের ঘরে চুরি? —ধর্ম্মের নামে ভাণ?

লোকটি আর পশ্চৎদিকে না তাকাইয়া দৌড়িয়া অদৃশ্য হইল। ঠাকুর কীর্ত্তনস্থলে আসিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণন করিয়া **"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন"** বলিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে দেখিয়া মাতিয়া গেলেন। তাঁহারা মণ্ডলাকারে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। উচ্চ সংকীর্ত্তনের ভাবোদ্দীপক রবে ও মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টার ধ্বনিতে সকলেই দিশাহারা হইলেন। দর্শকবৃন্দের ভাবোচ্ছ্বাসে আনন্দ-কোলাহল আরম্ভ হইল। মহিলাগণের মাঙ্গলিক উলুধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনিতে মিলিত হইয়া আশ্রমটিকে যেন ঘন ঘন কম্পিত করিতে লাগিল। রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধবেশে বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর অচিরে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। নিবিড় নভোমণ্ডলে ক্ষীণ নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিল। জানি না ঠাকুরকে কিরূপ দেখিয়া গুরুভ্রাতৃগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; তাঁহারা 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ' উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রভাবে অভির্ভূত হইয়া তাঁহারা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। রাহুমুক্ত চন্দ্রমা শুভ্রজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুরও **"হরিবোল, হরিবোল"** বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। গুরুভ্রাতারা ধীরে ধীরে সংকীর্ত্তন থামাইয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। আশ্রম নিস্তব্ধ হইল।

সাধনপ্রার্থী একটি ভদ্রলোক আশ্রমে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ গ্রহণের পর ঠাকুর তাহাকে ডাকাইয়া মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া দীক্ষা দিলেন। গ্রহণের পর ঠাকুর আমতলায় গিয়া বসিলেন। অবশিষ্ট রাত্রি ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। ভোরবেলা ঠাকুর শৌচাদি সমাপন করিয়া পূবের ঘরে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। আমিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বাড়ী রওয়ানা হইলাম।

নদীতে ঝড়—দৈবে রক্ষা।

বুড়ী-গঙ্গার পারে আসিয়া স্নান-তর্পণ সারিয়া নিলাম। মাঝ নদীতে গহনা (নৌকা) দেখিয়া, ইঙ্গিত করা মাত্র মাঝিরা আসিয়া আমাকে তুলিয়া নিল। সাধুবেশ দেখিয়া নৌকার সকলেই আমাকে আদর-যত্ন করিয়া বসাইল। কয়েক ঘণ্টা চলিয়া আমরা ধলেশ্বরীর ধারে পঁহুছিলাম। তখন অকস্মাৎ কাল মেঘ উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সম্মুখে ভয়ঙ্কর নদী দেখিয়া সকলেই বিষম বিপদ অনুমানে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মাঝিদিগকে পাড়ি দিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন।

'মীরের-বেগে' মাঝিরা ঝড়-তুফান্‌কে গণ্যের ভিতরেই আনে না। তাহারা নৌকায় পাল তুলিয়া স্বচ্ছন্দে চলিল। মাঝ-নদীতে পঁহুছিলে ঘনঘটায় গভীর গর্জ্জন ও বর্ষণে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইল। নদী বিষম ফাঁপিয়া উঠিল। প্রবল তরঙ্গে নৌকাখানা বেচাল হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ সময়ে তুফানের ঝাপ্‌টা উঠিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঝিরা পাল নামাইবার চেষ্টাও করিতে পারিল না। তাহারা বেসামাল হইয়া 'বদর বদর' ডাক ছাড়িতে লাগিল। একটি তুফানের ঝাপ্‌টায় নৌকা কাৎ হইয়া পড়িল। আরোহীরা, ডুবিলাম ভাবিয়া হতাশ হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আমি গুরুদেবের অভয়চরণ একান্ত প্রাণে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া আছেন মনে হইল। তখন উল্লাসের সহিত চীৎকার করিয়া সকলকে বলিলাম—'ভয় নাই, ভয় নাই—ঠাকুর নিশ্চয় আমাদের রক্ষা কর্‌বেন।' এ সময়ে হঠাৎ একটি তুফানের ঝাপ্‌টা আসিয়া পালটিকে দু'ভাগ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল—নৌকাও সোজা হইয়া নক্ষত্রবেগে পারের দিকে ছুটিল। অদ্ভুত প্রকারে নৌকা গিয়া তীরে ঠেকিল। ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া

গেল। পারেব ঘাট সেবাজদিঘা এখনও বহুদূরে। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা, "আজ যাত্রা অশুভ হইয়াছে —"পক্ষান্তে মবণং ধ্রুবং" বলিয়া পরস্পর তর্ক জুড়িলেন। পবে 'সাধুটি নৌকায় থাকায়ই এ আপদে বক্ষা পাইলাম' এই সিদ্ধান্তই স্থির করিলেন। মাঝিরা কিছুতেই আমার ভাড়া গ্রহণ করিল না। বেলা প্রায় দেড়টার সময়ে নৌকা সেবাজদিঘায় পঁহুছিল। আবোহীরা—'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া পাবে উঠিয়া পড়িলেন। আবার মহা দুর্লক্ষণ আরম্ভ হইল। কাল আকাশে ঘনঘন বিজলী চমক্ ও ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল। সকলেই দোকানঘরে আশ্রয় লইয়া আমাকে বাড়ী যাইতে নিষেধ কবিলেন। আমি উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতিঃ সম্মুখে প্রকাশমান দেখিয়া নির্ভয়ে যাত্রা করিলাম। বৃষ্টি হয় হয় অবস্থায়ও প্রায় ১।।০ ঘণ্টাকাল চলিয়া বাড়ী পঁহুছিলাম। মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া সমস্ত শ্রান্তি দূর করিলাম। দু'তিন মিনিট সময় অতীত হইতে না হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আবম্ভ হইল। একমাত্র ঠাকুরের কৃপাতেই এবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম, ইহা পরিষ্কার বুঝিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিলাম।

বাড়ীতে উপস্থিতি—মায়ের আশীর্ব্বাদ।

বাড়ীতে মেজদাদা ও ছোড়দাদাকে নমস্কার করিয়া নিজ ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন পাতিয়া একমনে নাম করিতে লাগিলাম। বিবাহ উপলক্ষে সমাগত লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ। আত্মীয়-স্বজন সকলে দলে দলে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। আমি মৌন হইয়া রহিলাম। পরে মাতাঠাকুরাণীর আদেশে নানা ব্যঞ্জনে তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আহারেরও সময়ের কিছুই ঠিক রহিল না। কিন্তু তাহাতেও চিত্ত প্রফুল্ল রহিল, নাম সরসভাবে আপনা আপনি চলিল। এ সমস্তই ঠাকুরের দয়া মনে হইতে লাগিল। জয় গুরুদেব!

জ্যৈষ্ঠ।

বাড়ীতে গিয়া প্রথম কয়দিন বেশ ছিলাম। শেষরাত্রে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া স্নানান্তে জপ, পাঠ, হোমাদি নিয়মমত করিতাম। তখন মা আমার জন্য চিঁড়া ভাজা, নারিকেল কোরা, ঘৃত ও চিনি আনিয়া সম্মুখে বসিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। কখনও বা ভিজা চাউল বাটিয়া তাহাতে দুধ চিনি ও নারিকেল কোরা মিলাইয়া খাইতে দিতেন। মা জানিতেন এই দু'টি জিনিষ আমি খুব ভালবাসি। ভজন-কুটীরে থাকিলে মেয়েরা আমার নিকট আসিতে সুযোগ পাইবেন—এই আশঙ্কায় জলযোগের পর বহির্ব্বাটীতে আমতলায় যাইয়া বসিতাম। বেলা প্রায় ১টা পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়ে ভজন-কুটীরে আসিতাম। ছোড়দাদা তখন একটি ডাব আনিয়া আমাকে দিতেন এবং আমার কাছে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার অসাধারণ ভালবাসা ও স্নেহদৃষ্টিতে আমার প্রাণ বড়ই ঠাণ্ডা থাকিত। ঠাকুরের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইত। কখন আমার কি প্রয়োজন তাহা ভাবিয়াই যেন তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। ছোড়দাদার স্বাভাবিক

সেবার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। নিজ জীবনে ধিক্কার আসিত। বিকাল বেলা মাতাঠাকুরাণীর দু'গ্রাস প্রসাদ পাইয়া স্বপাক আহার কবিতাম। আহারান্তে যখন নিজ ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতাম, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাসী স্ত্রীলোক, পুরুষ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নতশিরে থাকিয়া তাহাদের সকলের কথাব জবাব দিতাম। সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন। প্রথম কযদিন এইভাবে আনন্দে কাটিল—পরে দুর্দ্দশা আবম্ভ হইল।

গতকল্য প্রত্যূষে নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে আসনে বসিলাম। হঠাৎ মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। বহু চেষ্টায়ও নাম কবিতে পারিলাম না। তখন আসন ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। মাঠে ময়দানে কতক্ষণ ঘুবিযা বেলা প্রায দশটাব সময়ে 'ছকির বাড়ী'ব জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত তথায থাকিয়া বাড়ী আসিলাম। স্বপাক আহার করিয়া আসনঘরে প্রবেশ করিলাম। নামশূন্যাবস্থায় থাকা কি যে বিষম যন্ত্রণা পবিষ্কার অনুভব কবিতে লাগিলাম। সমস্তটি রাত্রি যন্ত্রণা ও অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম। অদ্য সকালে নিত্যক্রিয়া সমাধানের পর ঢাকা রওনা হইতে প্রস্তুত হইলাম। মা নানাপ্রকার খাবার আনিয়া আদর করিযা খাওয়াইলেন। মা তখন বলিলেন—'তোর যেখানে থেকে শান্তি হয়—সেইখানেই গিয়ে থাক্। সময়ে সময়ে তোকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়—মধ্যে মধ্যে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাস্। আমি তোকে যে সব জিনিষ পাঠিয়েছিলাম—তা' তুই গ্রহণ কবিস্ নাই শুনে বড়ই কষ্ট পেযেছিলাম—তাই তোব গোঁসাইকেও গালাগালি করেছি। মনে কত কষ্ট পেয়ে বলেছি গোঁসাই তা বুঝেছেন। আমার অপরাধ ক্ষমাও করেছেন।' মা'র কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। জলযোগের পর মা'র পদধূলি গ্রহণ করিয়া সেরাজদিঘা রওনা হইলাম। ছোটদাদা অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। অপরাহ্ন ৫টার সময়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহুছিলাম। ঠাকুরকে দর্শনমাত্রই উৎসাহ, আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিল। অবসন্নতা দূর হইল।

ঘৃত পানে ঠাকুরের কৃপা।

ঝোলাঝুলি লইয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছি—কুতুবুড়ী একটি বাটি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—'ব্রহ্মচারী! ভাল ঘি এনেছ—আমাকে একটু দেও'। আমি ঠাকুরের জন্য উৎকৃষ্ট ঘৃত যত্নের সহিত আনিয়াছি—তাহা ঠাকুরকে দেওয়ার পূর্ব্বে কি প্রকারে কুতুকে দিই, একথা একবার মনে হইল। কুতুকে ঘৃত দিতে উদ্যত দেখিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক ঈষৎ হাসিমুখে বালকের মত হাত পাতিয়া আমাকে বলিলেন—

ব্রহ্মচারী। আমার জন্য আন নাই? —আমাকেও একটু দেও।

আমি ঠাকুরের গণ্ডূষ ভরিয়া ঘৃত দিলাম, ঠাকুব উহা পান কবিয়া হাতখানা চাটিতে লাগিলেন

এবং ঘৃতের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

বিক্রমপুরের ঘৃত বড়ই উৎকৃষ্ট—শান্তিপুরের সরভাজা ঘিয়ের মত। ঘরে রেখে দিলে বাহির থেকে ইহার সদ্‌গন্ধ পাওয়া যায়। স্বাদ যেন ক্ষীরের মত।

ঠাকুরের নামে রাখা জিনিষ—তাঁহাকে দেওয়ার পূর্ব্বেই তিনি আগ্রহের সহিত চাহিয়া নিলেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের প্রণালী।

৯ই জ্যৈষ্ঠ।

ঠাকুরের আদেশমত আজ মহাভারত মোক্ষ-পর্ব্বাধ্যায় পাঠ আরম্ভ করিলাম। শ্রবণান্তে ঠাকুর বলিলেন—

মহাভারত মহাসমুদ্র। ইহার কোথায় কি আছে তা' কি কেহ পাঠ ক'রে গেলেই মনে রাখ্‌তে পারে? এ সব গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে ভাল ভাল কাজের কথা তুলে নিতে হয়। পরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের ভিতর হ'তে ও সব শ্লোক নিয়ে মুখস্থ ক'রে রাখতে হয়।

একটু পরে ঠাকুর বলিলেন—

মানুষ যদি হিংসাশূন্য হ'তে পারে, মন হ'তে হিংসার ভাব যদি একেবারে দূর কর্‌তে পারে, তা' হ'লে কোন প্রাণীই তাকে হিংসা করে না। মহা অরণ্যে বাঘভালুকাদির মধ্যেও অনায়াসে নিরাপদে থাকতে পারে। পাহাড়-পর্ব্বতে যে সকল সাধু মহাত্মারা আছেন, মন হ'তে হিংসা দূর ক'রেই তাঁরা স্বচ্ছন্দে রয়েছেন। অহিংসা, সত্য ও বীর্য্যরক্ষা—এই তিনটিই যথার্থ ধর্ম্ম। এই তিনটি হ'লে আর সব আপনা আপনি হয়।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এ সব বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

তোমার কার্য্য তুমি কর—হিংসা অনিবার্য্য।

মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠান্তে ঠাকুরের সম্মুখে আমরা সকলে নিবিষ্টমনে বসিয়া আছি অকস্মাৎ একটা বিড়াল আসিয়া একটি আরজিনা সাপকে ধরিল; আরজিনাটি বিড়ালের মুখে থাকিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সকলেই 'আহা! আহা!' করিয়া উঠিল। আমি সাপটিকে ছাড়াইতে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম। ঠাকুর অমনি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া আমাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন—

১০ই—১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

বসো। হঠাৎ কিছুই করতে নাই। সমস্ত কাজই বিচার ক'রে করতে হয়। স্থির হ'য়ে ব'সে তোমার কাজ তুমি কর। ওকাজ তোমার নয়। ওদিক দেখতে একজন আছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে বা তাঁর ইচ্ছা না হ'লে একটি তৃণও নড়ে না; কেহ কাহাকে বধ করতে পারে না। কোথায় কাহার কি ভাবে মৃত্যু হবে—তাহা তিনিই ঠিক করে রেখেছেন। বিড়ালটি তার বিধিনির্দ্দিষ্ট আহার মুখে তুলে নিয়েছে—তুমি তা' ছাড়াতে ব্যস্ত কেন? জীবহত্যা? তা' কে না করছে? জীবনধারণ করতে হ'লেই জীবহত্যা অনিবার্য্য। বৃক্ষলতা ইত্যাদি যাদের উদ্ভিদ বল, তাদেরও জীবন আছে। সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাদি সমস্তই ঠিক মানুষের মত আছে। বর্ত্তমান দর্শন-বিজ্ঞানাদিতে যাহাই সিদ্ধান্ত করুক না কেন এ কথা যথার্থ। যদি কখনও তেমন অবস্থা হয় সব বুঝতে পারবে। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কত প্রাণী হত্যা হয়, চোখের প্রত্যেকটি পলক তুলতে ফেলতে কত অসংখ্য প্রাণী বধ হয়, তা নিবারণ করবে কি প্রকারে? বৃক্ষলতাপাতাও হিংসা দ্বারা জীবন ধারণ করে। সর্ব্বত্রই হিংসা। তবে আর এক জনের আহারে অন্যে বাধা দিবে কেন? ইহা ভগবানেরই বিধান। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্ত হচ্ছে। মনটিকে একেবারে শান্ত ক'রে ফেল, স্থিরভাবে ব'সে সর্ব্বত্র ভগবানেরই কার্য্য দর্শন কর। তাঁর ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হয় না।

আগ্রহে অতিথি-সেবায় ঠাকুরের কৃপাবর্ষণ।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে প্রেমানন্দ ভারতী মহাশয়ের সহিত কয়েকটি সাধু আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী, সুশিক্ষিত, বি. এ. এম. এ.। কেহ কেহ সরকারী উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া তাঁহাদের জন্য রান্না করিতে বলিলেন। আমি খুব উৎসাহের সহিত রান্না করিতে চলিলাম। ভাণ্ডারে যাইয়া দেখি—ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। সামান্য চাউল, ডাল, নুন, লঙ্কা মাত্র আছে—তাহাও খুব অল্প পরিমাণ। সাদা জলের ভিতরে নুন লঙ্কা ফেলিয়া দিয়া ডাল সিদ্ধ করিয়া রাখিলাম। রান্না শেষ করিয়া অশ্বিনীকে ডাল চাকাইলাম। অশ্বিনী ডাল মুখে দেওয়া মাত্র বলিল—'বাবারে! কি নুন! কাহারও সাধ্য নাই ইহা মুখে দেয়।' আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। কতগুলি জল ডালে ঢালিয়া দিলাম—কিন্তু নুন কমিল না। এদিকে রাত প্রায় আড়াইটা হইয়াছে। ক্ষুধিত সাধুরা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কি করি! নিতান্ত নিরুপায় হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। অতিথিরা যেন তৃপ্তির সহিত আহার করেন. প্রার্থনা করিলাম। সাধুদের ভোজন করিতে ডাকিলাম। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলাম। সাধুরা ডালের সদ্‌গন্ধ ও স্বাদের খুব প্রশংসা করিয়া পরম পরিতোষে

আহাব সমাপন করিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই অবশিষ্ট ডাল খাইয়া বলিলেন—'এমন সুস্বাদু ডাল আশ্রমে কখনও বান্না হয় না।' বুঝিলাম ইহা ঠাকুবের প্রত্যক্ষ কৃপা; তিনি দযা করিযা আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।

মহাসঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দের শক্তি-প্রার্থনা, ভাবের বন্যা—আমার শুষ্কতা। জীবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, পাপপুণ্য—সংস্কার মাত্র। সাধনে সংস্কারমুক্তি।

প্রেমানন্দ ভারতী (সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায) ইনি আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। গপ্ এণ্ড গছিপ্ (Gup and Gossip) কাগজেব সম্পাদক ছিলেন। আমাব ফয়জাবাদে থাকা কালে, প্রায় সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিতেন। সাধনপ্রার্থী হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলি; তখন হইতে ইনি এই ভাবে আছেন। নীলানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপা পাত্র। সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। ধর্ম্মানুবাগে ইঁহারা সকলেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনভাবে দেশে দেশে সঙ্কীর্ত্তন করিযা বেড়াইতেছেন।

উচ্চশিক্ষিত কয়েকজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আশ্রমে আসিয়াছেন, এই সংবাদ অচিরে সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া সাধুদের দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। আজ সঙ্কীর্ত্তনের বিপুল আয়োজন লইয়া বহু সম্ভ্রান্ত লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণে মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তবৃন্দ চতুর্দ্দিকে থাকিয়া করতালি সংযোগে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসীগণ ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর করজোড়ে অনিমেষনেত্রে কিছুক্ষণ সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের স্থির কলেবরে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের আকৃতি অন্য প্রকার হইয়া গেল—তিনি **'জয় শচী-নন্দন, জয় শচী-নন্দন'** বলিতে বলিতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে দেখিয়া উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহারা ভাবাবেশে বিবিধ প্রকারের নৃত্য করিযা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া কীর্ত্তন অঙ্গনে ঘুরিতে লাগিলেন। বিস্মিতনেত্রে দর্শকমণ্ডলী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল। মৃদঙ্গ করতালের ঝম্ ঝম্ ধ্বনিতে সকলেরই হৃদয় নাচিতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে ভাবতরঙ্গে তুফান উঠিল। গুরুভ্রাতারা অনেকে ঠাকুরকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের প্রতি পদ-সঞ্চারে বৃক্ষলতা সহিত আশ্রমটি যেন নৃত্য করিতে লাগিল। কি শক্তিতে জানি না, আজ সমস্তই একাকার। স্ত্রী-পুরুষেরও ভেদাভেদ রহিল না। সকলেই মাতোয়ারা। ভাব-বৈচিত্র্যের বিশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যে সকলেরই চিত্ত অভিভূত হইল। ঠাকুর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীবে সঙ্কীর্ত্তন

থামিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। ভারতী মহাশয় ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— 'শক্তি দেও, শক্তি দেও।' ঠাকুব তাঁহার মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া সুস্থির করিলেন।

আজ মহাভাবের বন্যায় কত লোক ভাসিল, কত লোক ডুবিল। আমি কিন্তু ডাঙ্গায় তপ্ত বালির উপরে দাঁড়াইয়া আনন্দসাগরে সকলকে হাবুডুবু খাইতেই দেখিলাম। বন্যার এক বিন্দু জলেরও স্পর্শ পাইলাম না, ঠাণ্ডা বাতাস এক মুহূর্ত্তের জন্যও গায়ে লাগিল না। ভাবিলাম—হায়! আমার একি দশা হইল? দিন দিন যেন শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়া পড়িতেছি। সঙ্কীর্ত্তনে ভাব উচ্ছাস এক সময়ে আমারও হইত, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের সাময়িক আনন্দে এখন আর স্পৃহা নাই—এখন তীব্র বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম পালনেই তৃপ্তিলাভ করি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"**অহিংসা, সত্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,—এই তিনটিই মানবের যথার্থ ধর্ম্ম। ইহা লাভ না হ'লে কোন উচ্চ অবস্থার অধিকারী হওয়া যায় না।**" প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিচারবুদ্ধির দ্বারা একটু সংযত হইতে যত্ন করিতেছি মাত্র কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের আভাসও এ পর্য্যন্ত স্বভাবে খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রকৃতিটি আমার সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিরোধী। বিচারের ধর্ম্ম ছাড়িয়া কবে আর স্বভাবের ধর্ম্ম লাভ করিব? সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দ সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান, শ্রেষ্ঠজীব। আমা অপেক্ষা তাঁহারা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ভগবানের নামে যাঁহাদের অশ্রুপাত হয়, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে যাঁহারা আত্মহারা হন, তাঁহারা সামান্য নন। যতই তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী, দুরাচারী হউন না কেন—তাঁহারা নমস্য।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্, সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।" হায়! আমি সকল দিকেই ঠাকুরের কৃপায় বঞ্চিত রহিয়াছি, প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলাম—আমার কোন দিকেই কিছু উন্নতি হইতেছে না কেন?

ঠাকুর বলিলেন—**উন্নতি সকলেরই হ'তেছে। ভগবানের রাজ্যে একটি বস্তুও এক অবস্থায় থাকে না। উন্নতি হ'তেছে—ইহা নিশ্চয় জেনো।**

আমি একটু উত্তেজিত অবস্থায় আব্দার করিয়া বলিলাম—কিসে বুঝিব উন্নতি হইতেছে? পূর্ব্বে যে সকল পাপকার্য্য করিতাম না, এখন তাহা করি। পূর্ব্বে যে সকল চিন্তা, কল্পনা ঘোর অপরাধ মনে করিতাম, এখন সে সকলে সুখ পাই। এই প্রকাব সকল বিষয়েই অবনতি দেখিতেছি।

ঠাকুর বলিলেন—**এতে উন্নতির বাধা হয় না। অবনতিও হয় না। এ সকলই বাহিরের। আত্মার উন্নতি প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই হ'তেছে। এখন যাহাকে পাপ বল, পুণ্য বল—সমস্তই সংস্কার। বাস্তবিক এসব কিছুই নয়। ইহা পাপ, ইহা পুণ্য—ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, এই**

প্রকার সংস্কারে আবদ্ধ হওয়াতেই আমরা কষ্ট পাই—উন্নতি দেখ্‌তে পাই না। বৃক্ষ যেমন আপনা আপনি বৃদ্ধি পাচ্ছে—জীবাত্মাও সেই প্রকার আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কার্য্য-কর্ম্মের কোন অপেক্ষা না ক'রে উন্নতিলাভ কর্‌ছে। বৃক্ষকে পোকায় ধর্‌তে পারে—কেহ তার ডাল ভাঙ্গতে পারে—কিন্তু তাতে বৃক্ষের বৃদ্ধি বন্ধ হয় না। পাপ-পুণ্য যাকে বল— তা কিছুই নয়, সংস্কারমাত্র। এজন্য মন খারাপ করা, বৃথা অশান্তি ভোগ করা ঠিক্ নয়। স্বভাবে যাহা করায়ে নেবার করায়ে নিক্, যাহা হবার হ'য়ে যাক্। শুধু দেখে যাও। অশান্তি ভোগ কর কেন? যাহাই কর না কেন নিশ্চয় জেনো অবনতি হচ্ছে না—আত্মার ক্রমশঃ উন্নতিই হচ্ছে। সর্ব্বদা বিচার ক'রে চল। ভিতরে যে সব সংস্কার রয়েছে, তার স্ফুরণ হবেই। কিন্তু তাই ব'লে আত্মার উন্নতি হচ্ছে না মনে ক'রো না। শম, সন্তোষ, বিচার ও সৎসঙ্গ দ্বারা আত্মারও উন্নতি উপলব্ধি হয়। কাম ক্রোধাদিতে আত্মাকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল।

আমি বলিলাম—আত্মার উন্নতি অবনতিতে আমার যায় আসে কি? লাভই বা কি? যদি আমি তাহা না বুঝিলাম। এখন আমার উন্নতি তো আমার পক্ষে অন্যের উন্নতির মতই হইল। আমার যাহাতে কষ্ট অনুভব হয়, সেই ত্রিতাপের জ্বালা, তাহা দূব না হলে আমার উন্নতি বুঝি না।

আরে না! সেরে গেছে।

কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীধর আমার নিকটে বসিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। আমার কথা শেষ হইতেই শ্রীধর খুব হাসিযা হাতনাড়া দিয়া বলিলেন—'আরে না! ওসব কিছু না, সেরে গেছে।' শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—**কি শ্রীধর কি বল্‌ছ?**

শ্রীধব বলিলেন—আমাদের দেশে এক কবিরত্ন ছিলেন। তিনি নাপিত, কবিরাজী কর্‌তেন। একদিন তিনি একটি জ্ব'রো রোগীকে দেখে বললেন—এ রোগ কিছুই না—ঔষধ নেও—খাওয়াও। তিন দিনে রোগ সাববে। চতুর্থ দিনে এসে আরোগ্য স্নান করাবো। বেশ ক'রে যোগাড়যন্ত্র রেখো। রোগী নিয়মমত ঔষধ খেতে লাগলেন, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হ'য়ে বিকারের অবস্থায় দাঁড়ালো। চতুর্থ দিনে ঘরে কান্নাকাটি আরম্ভ হলো। এসময়ে কবিবত্ন এসে বাড়ীর বাইরে থেকেই চীৎকার ক'রে বল্‌লেন—ওগো! যোগাড়যন্ত্র ঠিক আছে ত? আজ আরোগ্য স্নান কবাবো। সকলে কবিরাজকে রোগীর পাশে নিয়ে বসালেন। রোগী তখন আবোল তাবোল বক্‌ছেন, কখনও বা একটু জ্ঞান হ'লে 'উঃ, আঃ, প্রাণ গেল, প্রাণ গেল'

চীৎকার কর্‌ছেন। কবিরত্ন সে দিকে গ্রাহ্য না করে তার হাত ধরে টেনে টেনে বল্‌তে লাগলেন—আরে না! সেরে গেছে। ওঠ্—আরোগ্য স্নান করাই। রোগী যতই বল্‌ছে—যন্ত্রণা আর সইতে পারি না—প্রাণ গেল, কবিরত্ন ততই বলছেন—আরে না! ওসব কিছু না। সেরে গেছে—ওঠ্ আরোগ্য স্নান করাই! শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিলেন, পরে বলিলেন—**সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য—এ সমস্তই সংস্কার। সংস্কার জিনিষটাই মিথ্যা। বিচার দ্বারা এটি বুঝে শান্ত হ'তে চেষ্টা কর।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম—এযে বিষম কথা। সংস্কার হইতেই ভোগের উৎপত্তি হয়। ভোগ আরম্ভ হইলে বরং বিচার দ্বারা শান্ত হইলাম। কিন্তু ভোগ আরম্ভের পূর্ব্বে অন্তর্নিহিত সংস্কারের খোঁজ কি প্রকারে পাইব? অজ্ঞাত সংস্কারের শান্তিই বা কি প্রকারে করিব? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভোগ যে সকল সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়—সেই সকল অজ্ঞাত সংস্কার কি প্রকারে ছাড়ানো যায়? ঠাকুর কহিলেন—**স্বভাবে যার যে সংস্কার আছে—তার সেটী প্রকাশ হইবেই। তবে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর্‌লে দেহ মন নির্ম্মল হয়, চিত্তও শুদ্ধ হয়। তখন দৈহিক, মানসিক কোন প্রকার সংস্কারই আর থাকে না।**

সঙ্কীর্ত্তনে ভারতীর সংজ্ঞালাভ।

একরামপুরে বিহারী মালাকরের ঠাকুরবাটীতে খুব কীর্ত্তনোৎসব চলিয়াছে। প্রেমানন্দ ভারতী প্রভৃতি সাধুরা তথায় গিয়াছেন। আশ্রম হইতেও গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ গিয়াছিলেন। আজ ঠাকুরের নিকটে একজন আসিয়া বলিল—ভারতী মহাশয় ১২/১৪ ঘণ্টা যাবৎ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন—সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করা যায়?

ঠাকুর বলিলেন—**সঙ্কীর্ত্তন কর গিয়ে—জ্ঞান হবে এখন।**

ঠাকুরের কথামত সঙ্কীর্ত্তন করায়—তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইয়াছে। ভারতী মহাশয় আশ্রমে আসিলেন। আমরা সকলেই ভারতী মহাশয় প্রভৃতি সাধুদের সঙ্গে খুব আনন্দে আছি। বাহিরের কতকগুলি লোক আশ্রমে থাকায় প্রাণায়াম করার বড়ই অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু অভ্যাগত সাধুরা যে কয়দিন থাকেন, ঠাকুর খুব আদর-যত্ন করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন।

আকাশ-বৃত্তি সংরক্ষণে ঠাকুরের আদেশ। গুরুভ্রাতাদের অভদ্র আলোচনা—ঠাকুরের এক সঙ্গে ভোজন।

কোন দিন ভাণ্ডারশূন্য হইলেও সামান্য ধার কর্জ্জ করিয়া কিছু বাজার-সওদা আনিবার যো নাই—ঠাকুর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন—**আমার আকাশবৃত্তি—ভগবান্ যেদিন যেমন দেন্**

আমি তা'তেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু না দিলেও তাঁরই দয়া মনে করি। আপনারা কখনও আশ্রমের জন্য ধার কর্‌বেন না। শিশু, রোগী, গর্ভবতী ও নিতান্ত অশক্ত বৃদ্ধের জন্যই মাত্র ধার করা যায়। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন—তাঁদের এই নিয়মের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলা উচিত।

ঠাকুরের অনুশাসন বাক্য শুনিয়া গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ অত্যন্ত দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়াছেন—কিছুদিন হয় তাহাবা অতৃপ্তিকর আহারের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া নিতান্ত বিরক্তিজনক আলোচনা আবম্ভ করিয়াছেন। তাহারা অভদ্র আলোচনার বিষ ঠাকুরের পবিত্র অঙ্গে ছড়াইয়া দিতেছেন। ঠাকুব নির্জ্জনে আহার করেন—তাঁহাব আহার সময়ে ঘরে দরজা বন্ধ থাকে, যোগজীবন ও কুতুবুড়ী ঠাকুবের ও মন্দিরের প্রসাদ পাইয়া থাকে। বুড়ো ঠাক্‌রুণ ও শান্তি প্রভৃতি কখন কি আহার করে, কেহ দেখিতে পায় না। ইহাতে পরিষ্কারই প্রমাণ হয় যে গোঁসাইয়ের ও গোঁসাই পরিবারের আহার এক প্রকাব, আর আশ্রমে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের আহার অন্য প্রকার হইয়া থাকে। ঠাকুরের টাকায় কেহ খায় না। যোগজীবনও রোজগার করিয়া টাকা আনে না। আশ্রমের খরচের জন্য গুরুভ্রাতারা যে যাহা দেন তাহাতে আশ্রমস্থ সকলেরই সমান অধিকার। ঐ টাকা বুড়ো ঠাক্‌রুণ হাতে নিয়া নিজ মতলবমত খরচ করেন কেন? এ সব লইয়া ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে বুড়ো ঠাক্‌রুণের সঙ্গে কাহারও কাহারও দু'চার কথা বচসা হইয়া গিযাছে। ইহার পর ঠাকুর একদিন যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—**যোগজীবন, মধ্যাহ্নে সকলের সঙ্গে চৌচালায় আমাকে খাবার দিস্‌।** সেই হইতে দক্ষিণের চৌচালায় সকলের সঙ্গে ঠাকুর মধ্যাহ্নে আহার করিতেছেন। মধ্যাহ্নে আমার আহার নাই বলিয়া পরিবেশনের ভার আমারই উপর রহিয়াছে।

ভোজন দর্শনে দেবদেবীর আনন্দ।

আহারের সময়ে সকলের সঙ্গে ঠাকুরকে পরিবেশন করা যেমন অসুবিধা, ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া সকলের আহার করাও তেমনিই অসুবিধা। এক মুঠা অন্ন আহার করিতে ঠাকুরের প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া যায়। ভাতের গ্রাস মুখে দিয়া কখন কখন ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। মুখের ভাত মুখেই পড়িয়া থাকে। সময়ে সময়ে কত কি বলেন—সব সময়ে সব কথা বুঝিতেও পারি না। আজ আহার করিতে করিতে সম্মুখের দরজা দিয়া উত্তর দিকে আকাশ পানে কতক্ষণ অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন, পরে **আহা, কি সুন্দর! কি সুন্দর!** বলিয়া চোখ পুঁছিয়া আবার ধীরে ধীরে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সুন্দর কি?

ঠাকুর বলিলেন—**এই যে সব এসেছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি কত দেবদেবী ঋষিমুনি এসেছিলেন। দেখে কত আনন্দ ক'রে গেলেন।**

আমি—কি দেখে তাঁরা আনন্দ ক'রে গেলেন?

ঠাকুর—**তোমাদের আহার দেখে কত আনন্দ কর্‌লেন।**

আমাদের লক্ষ্য।

আমি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের আহার দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আনন্দ করেন?

ঠাকুর বলিলেন—**তা ক'রবেন না? তোমরা কি সাধারণ? তোমাদের যিনি লক্ষ্য, তাঁর চারিদিকে কত যোগী, কত ঋষি, কত দেবদেবী, কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত শিব রয়েছেন। সেই অনন্ত উন্নতির পথে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি বৈকুণ্ঠাদি লোক বিন্দু হইতেও বিন্দু—কিছুই নয়। আমরা যাঁকে চাই—কোটি কোটি অবতার, কোটি কোটি * * * * ভক্ত ও পার্ষদগণ তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘুরছেন। সেই অন্তবিহীন, মহান্ পুরাণ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। অবিরাম সেই দিকেই আমরা চল্‌ব। সর্ব্বত্রই আমরা নিমন্ত্রণ খাব—আনন্দ করব—কোথাও দাঁড়াব না— কারও নিন্দা-প্রশংসায় পড়বো না—পার্ষদ হ'লেই বা কি, কিছু না হ'লেই বা কি? কত ইন্দ্র চন্দ্র হ'লেন, গেলেন। হবেন, যাবেন। এই পথে কোথাও বদ্ধ হ'লেই বিপদ। বদ্ধ কোথাও হব না।** একটু পরে আবার বলিলেন—**এই সাধনপথে চল্‌লে ভগবানের অনন্ত বিভূতি, যাবতীয় লীলা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'তে থাক্‌বে—নৌকায় চলার মত দু'পাশে কতই দর্শন কর্‌বে। শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সর্ব্বত্রই প্রণাম কর্‌বে। আসক্ত কোথাও হবে না। আসক্ত হ'লেই সেখানে বদ্ধ হ'য়ে পড়্‌বে। অগ্রসর না হ'লে নূতন নূতন দর্শন হয় না। নূতন কোন অবস্থাও লাভ হয় না।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্। আমি বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম। সকলের আহার সমাপনের পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিলাম—ঠাকুর এ কি বলিলেন—ঠাকুরের কথায় মনে হইল, সমস্ত লীলা এবং বিভূতির প্রকাশ ও অন্তর্দ্ধানের অতীত নামের প্রতিপাদ্য অজ্ঞাত মহান্ পুরুষই আমাদের লক্ষ্য। নিয়ত অপ্রতিহত-গতিশীল নামে স্থিতিই আমাদের অবস্থা, এইজন্য যে কোন অবস্থার কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি না কেন—তিনি প্রথমে নানা প্রকার উপদেশ ও ব্যবস্থার কথা বলিয়া শেষকালে বলিয়া থাকেন—**শ্বাসে শ্বাসে নাম কর—নামেই সমস্ত লাভ হয়।**

সাধনে আমার চেষ্টা ও নিষ্ফলতা।

আমার চেষ্টায় কিছুই হবে না, দেখিতেছি। ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। যতই উৎসাহের সহিত এক একটা বিষয়ে নিযুক্ত হই—ততই যেন হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়ি। ঠাকুরের কোন একটি আদেশই আমি ঠিকমত রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তিনি আমাকে নিয়ত পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখিতে বলিয়াছিলেন; এতকাল এক প্রকার চলিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তাহাতে আর তেমন মনোযোগ নাই। যতই এই বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত লাগি, ততই, জানি না কেন নিষ্ফল হইয়া পড়ি। সকল বিষয়েই এই প্রকার দেখিতেছি। বাক্য-সংযমের জন্য এক বৎসর যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—এতকাল একপ্রকার ভালই চলিয়াছিল—কিন্তু কিছুকাল যাবৎ বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছি। আমি প্রতিদিন আসন ত্যাগ করার সময়ে সঙ্কল্প করিয়া উঠি—আজ আর কোন কথাই বলিব না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুই এক ঘণ্টা শেষ হইতে না হইতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়। অকস্মাৎ বা অজ্ঞাতসারেই যে সর্ব্বদা এই প্রকার হয়, তাহা নয়। জ্ঞাতসারেও বলার অদম্য প্রবৃত্তি রোধ করিতে অবসর পাই না। অভ্যাসদোষে একটি কথা বলিয়াই অমনি চুপ করি, অনুতাপ হয—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আর বলিব না, কিন্তু একটু পরেই আবার বলিয়া ফেলি। প্রতি ঘণ্টায়ই চেষ্টা হইতেছে—প্রতি ঘণ্টায়ই বিফল হইতেছি। এই প্রকার পুনঃপুনঃ দেখিয়া ও ভুগিয়া মনে হইতেছে— এরূপ কেন হয়? আমার ইচ্ছা অনুসারে যখন আমার কার্য্য আমি করিতে পারিতেছি না তখন নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছাব উপরে আর একটা ইচ্ছা রহিয়াছে। সে আমা অপেক্ষাও বলশালী। এখন ভিতর হইতে বারংবার এই ভাব উঠিতেছে যে একান্ত প্রাণে কাতর হইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় না করিলে, তিনি দয়া করিয়া শক্তি না দিলে, —আমার সাধন ভজন ও সংযমের চেষ্টায় তাঁর আদেশ পালনে কখনও সমর্থ হইব না। গুরুদেব! একবার দয়া কর।

১৭ই—২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

জিহ্বার লালসায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এবার আমি বড়ই নিরুপায়ে পড়িলাম। লোভ-সংববণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর এতকাল তাঁর আদেশমত চলিতে আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন। সমস্ত দিনেরাত্রে গণ্ডূষমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া—অপরাহ্ন ৫টার সময়ে দেড় ছটাক পরিমাণ ডাল চাল সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছি—কোন কষ্টই হইত না। আহারের কঠোরতায় দিন দিন আমার শারীরিক স্ফূর্ত্তি ও মানসিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছিল—হায়! কিছুকাল যাবৎ আমার এ কি দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে? 'লোভ আমার নাই'—এই প্রকার ভ্রান্তসংস্কাবে মুগ্ধ হওয়াতে— ধীরে ধীরে সংযমচেষ্টার উপরে শিথিলতা আসিয়া পড়িল। 'ইহাতে আমার কি হইবে'— এই প্রকার ধাবণায় গুরুবাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক অতি সামান্য সুস্বাদু বস্তুর

রসাস্বাদন করিতে গিয়া এখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**আহারের সময়েই খেও।** ঠাকুরের এই আদেশের উপরে 'প্রসাদ গ্রহণে দোষ নাই'—এই প্রকার শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত করিয়া যখন তখন প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। এখন দেখিতেছি বালকেরাও যে সকল খাবার বস্তুতে অনায়াসে লোভ সংবরণ করিতে পারে, আমি তাহাও পারি না। সহজে না পাইলে চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা হয়। ভিতরের দুরবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইয়াও স্পৃহা ছাড়াইতে পারিতেছি না। কৃপালব্ধ অবস্থাকে স্বোপার্জ্জিত মনে করিলে যে দুর্দ্দশা ঘটে এখন আমার তাহাই ঘটিয়াছে। লোভসংবরণের চেষ্টা একেবারে আসিতেছে না—ইচ্ছা পর্য্যন্ত জন্মিতেছে না। অথচ পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইতেছি। স্থির করিলাম—আমি আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিব। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যদি আমার মতি বিরুদ্ধদিকে ধাবিত হয়—তবে উহা প্রারব্ধবশেই হইল ভাবিয়া ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিব। আর যদি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই আমার চেষ্টা পণ্ড হয়—তাহা হইলে আক্ষেপের আর কি আছে? বরং বুদ্ধিকে সেই মতের অনুগামী করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া আনন্দই করিব। গুরুদেব! কিছুই বুঝিতেছি না—দয়া করিয়া শুভমতি ও শক্তি দিয়া তুমি আমাকে রক্ষা কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত যে 'কিছুই' হয় না—যে কোন অবস্থায় ফেলিয়া তাহা আমাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দেও। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার পানে তাকাইয়া বসিয়া থাকি। ঠাকুর! আমি যে আর পারি না।

গুরুবাক্যের উপরে বিচার বুদ্ধি।

গুরুদেব আমাকে পদে পদে দেখাইতেছেন যে কোন ভাল অবস্থাই নিজের চেষ্টায় লাভ করা যায় না—গুরুদত্ত কোন অবস্থাই নিজে চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে পারি না। এ সকল পুনঃপুনঃ দেখিয়া শুনিয়া এবং বিচারবুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়াও নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান এক কণিকা ছাড়াইতে পারিতেছি না। নানাপ্রকার অবস্থায় ফেলিয়া দয়াল গুরুদেব, আমার যথার্থ প্রকৃতি আমাকে দেখাইতেছেন। এখন আমার অসংযত মনের মলিনতা, কুৎসিত চরিত্রের কলুষতা ও স্বভাবের নীচতাই যেন অস্তিত্বের ভিত্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রবৃত্তি সকল গুরুদেবের ইচ্ছার প্রতিকূলে ধাবিত হইতেছে, প্রতীকারের কোন উপায় পাইতেছি না—কোনোদিকেই কূল-কিনারা দেখিতেছি না। এতকাল অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জনঘরে শয়নকালেও পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে মনে মনে দৃষ্টি রাখিয়াছি। হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে দেখিতাম ঘাড় বাঁকান এবং নজর পায়ের দিকে রহিয়াছে। আজ আমার সেই অবস্থা কোথায় গেল? গুরুদেবের আদেশের উপরে বুদ্ধি-প্রয়োগ না করিয়া যতদিন অবিচারে অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাঁর কৃপায় খুব সহজেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু তাঁর আদেশের বা বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা নিজবুদ্ধি অনুসারে যখন বুঝিয়া লইলাম, পদাঙ্গুষ্ঠে নিয়ত দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্য স্ত্রীলোক দর্শন না করা—এইরূপ যখন সিদ্ধান্ত করিলাম; এবং গুরুবাক্য অক্ষরে

অক্ষরে প্রতিপালন করা—ও তাঁর অভিপ্রায় বুঝিয়া সেইমত কার্য্য করা—এই দুয়ে কোন প্রভেদ নাই এই প্রকার বুদ্ধি যখন আমার জন্মিল, তখনই আমার বিষম সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। স্ত্রীলোক দর্শন না করাই উদ্দেশ্য সুতরাং পদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখা অথবা পায়ের দিকে হেঁট-মস্তকে চাহিয়া থাকা—একই কথা, এইপ্রকার মনে করিয়া দৃষ্টি কিঞ্চিৎ বিস্তার করিতে ইচ্ছা হইল। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা বৃদ্ধি করিয়া স্ত্রীলোকের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন তাহাদের পা দেখিলেই গা দেখিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ মুখে দৃষ্টি করিলে, বুকের কল্পনা আসিয়া পড়ে। আজকাল এ সকল ধ্যানেই আমার দিন কাটিয়া যাইতেছে; কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার চেষ্টা আমার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে গুরুদেবের সহজ বাক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি। গুরুদেব! এখন আমার উপায় কি?

অবসরমত সুবিধা পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—আপনি পদাঙ্গুষ্ঠে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে চলিতে বলিয়াছিলেন; আমি ভাবিলাম স্ত্রীলোক না দেখাই ঐ কথার তাৎপর্য্য; তাই সর্ব্বদা পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি না রাখিয়া অনেক সময়ে পায়ের দিকে মাটির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া চলি; আর দেহ, মন সুস্থ ও শুদ্ধ রাখিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক পরিমাণে স্বপাক আহার করিতে বলিয়াছেন এইরূপ ভাবিয়া অযাচিতরূপে লঘুপথ্য বস্তু কেহ দিলে গ্রহণ করি—ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন—**তাতেই গোলে পড়েছ। ঠিক্ গুরুবাক্য মতেই চল্‌তে হয়। গুরুবাক্যের অর্থ বুঝা কি সহজ? গুরুবাক্য অনুসারে চল্‌লে ক্রমে ক্রমে তার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা যায়।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম গুরুগীতায় পড়িয়াছি—**'মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং'**, সমস্ত মন্ত্রের বা শক্তির মূলই গুরুবাক্য অর্থাৎ গুরুশক্তি। গুরুবাক্য ধরিয়া চলিলে সাক্ষাৎভাবে গুরুর সহিত বা গুরুশক্তির সহিত সম্বন্ধ রাখা হয়। নিজের বিচার, বুদ্ধি, কল্পনা বা অনুমান দ্বারা একটা তাৎপর্য্য ঠিক করিয়া লইয়া সেই মত চলিলে, সাক্ষাৎভাবে গুরুর সহিত সম্বন্ধ রাখা হয় না। গুরুবাক্যই সার।

গায়ত্রীর মাহাত্ম্য। ঠাকুরের ফাঁড়া, —আসনই নিরাপদ।

প্রত্যহ প্রত্যূষে বুড়ীগঙ্গায় যাইয়া স্নান-তর্পণ করি। পরে নিজ আসনে আসিয়া হোমান্তে পাঠ সমাপন করিয়া নাম ও গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি। ঠাকুর গায়ত্রীজপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। গায়ত্রী জপে না কি ব্রহ্মণ্যকেই লাভ হয়। ভাবিলাম, ব্রহ্মণ্যতেজে আমার প্রয়োজন কি? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শ্বাসে শ্বাসে ইষ্টনাম জপে তো আরও বেশী উপকার; শুধু তা করিলে হয় না?

ঠাকুর কহিলেন—**গায়ত্রী জপও করো। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপে যে উপকার, গায়ত্রীজপেও তাই হবে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীজপ অবশ্য কর্ত্তব্য।** আমি গায়ত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ

বৃদ্ধি করিয়া নিতেছি। বেলা ৯ টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। ঠাকুর এই সময়ে গ্রন্থসাহেব ও ভাগবতাদি পাঠ করেন। ১১টার পরে ঠাকুর শৌচে যান। পাতকুয়ার এক কলসী জলে গা ধুইয়া আসনে আসেন। তিলকসেবার পর দক্ষিণে চৌচালায় যাইয়া সকলের সঙ্গে আহার করেন। আহারান্তে আমতলায় ঠাকুরের আসন নেওয়া হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমতলায়ই বসিয়া থাকেন। ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত আমি মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাই। পরে ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া নাম করিয়া কাটাই। ভিক্ষা, রান্না ও আহারাদিতে আমার দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। ঠাকুর বহুবার বলিয়াছেন—**সাধনের জন্য রাত্রিই প্রশস্ত সময়।** কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা পারিলাম না। শ্রীধর উৎপাত করিলেই রাত্রি জাগরণ হয়। তখন বাধ্য হইয়া নাম করি—না হইলে হয় না। আজ সমাধি অবস্থায় ঠাকুর একটি বিষম কথা বলিলেন। শুনিয়া আমাদের সকলেরই হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া গিয়াছে—অদৃষ্টে কি আছে জানি না। আগামী ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনসঙ্কট ফাঁড়া। দেহরক্ষার সম্ভাবনা খুবই কম। মহাপুরুষেরা ঠাকুরকে সর্ব্বদা আসনে থাকিতে বলিয়াছেন। ঠাকুর আসনে থাকিলে মহাত্মারা দেহরক্ষার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে পারিবেন। ঠাকুর আসনে না থাকিলে তাঁদের কোন হাতই থাকিবে না। ঠাকুর বলিলেন—**প্রকৃতির গতিতে যাহা হয় হউক—এ বিষয়ে আমি কোন ইচ্ছাই রাখি না।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি বড়ই ক্লেশে সময় যাইতেছে। ঠাকুরের নিকটে সারাদিনরাত যাহাতে থাকিতে পারি সেরূপ চেষ্টা করিব স্থির করিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতারা অনেকে ঠাকুরের নিকটে থাকেন। স্থানাভাব বশতঃ যোগজীবন ঠাকুরের নিকটে পূবের ঘরে রাত্রে শয়ন করেন। উপস্থিত ঠাকুরের শরীর বেশ সুস্থই দেখিতেছি।

ঠাকুরের বৈষম্যভাব-কল্পনায় পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রম ত্যাগ।

কয়েকদিন হয় শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশয়ের জ্বর হইয়াছিল। ঠাকুর প্রত্যহই তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন শ্রীধর প্রবল জ্বরে ক্লেশসূচক শব্দ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুর তাহার হাত দেখিয়া আসিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের জ্বরের একই প্রকার অবস্থা, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই জানিয়া তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের অভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। ঠাকুরের বৈষম্য ব্যবহার, এ সঙ্গে আর কখনও থাকিব না- -স্থির করিয়া জ্বর আরোগ্যের পরই তিনি আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বাস মহাশয়ও আশ্রমবাসের ক্লেশ, পুনঃপুনঃ অভিমানে আঘাত এবং ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শুনিলাম, তাঁহারা রাস্তায় নানা দুর্ভোগ ভুগিয়া এখন গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। সেইখানেই নাকি থাকিবেন। বাবাজী খুব সেবাপরায়ণ! কোন কষ্টই হইবে না। তিনি উঁহাদের পাহাড়ে থাকিয়া ভজন সাধনের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন, সকলে এইরূপ

বলিলেন।

উঁহাদেব সম্বন্ধে ঠাকুর কহিলেন—**উঁহারা যদি সঙ্গত্যাগী হ'য়ে কাহারও সেবা না নিয়ে উদাসীনভাবে থাকেন, ভজন সাধন করেন, তাহলে এবার একটি ভাল অবস্থা লাভ কর্‌বেন। আর যদি দু'জনে এক সঙ্গে থাকেন ও অন্যের সেবা গ্রহণ করেন, তা হলে আর সে'টি হবে না।**

সাধন কর। গুরুতে নির্ভর বহুদূর।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় গেলেন। আজই বড়ই গরম পড়িয়াছে। মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে নিজ হইতে আমাকে বলিতে লাগিলেন—**লোকের গোলমালে সাধন হয় না বলে তুমি কুটীর কর্‌তে চেয়েছিলে। এখন দেখ আশ্রম বেশ নির্জ্জন হয়েছে—দিনরাত এখন খুব সাধন কর। সাধনের বিষয় কাহাকেও কিছু ব'ল না। সাধনের বিরুদ্ধকথাও কারো মুখে শু'ন না। কোন দিকে দৃষ্টি না ক'রে, খুব দৃঢ়তার সহিত নিজের কাজ নিজে করে যাও। এখন হ'তে তিতিক্ষাটি বেশ করে অভ্যাস করে নাও। বেশ উপকার পাবে। আহার, মাত্র একবারই কর্‌বে। আহারের মাত্রা ও কাল সর্ব্বদাই ঠিক রাখ্‌বে। এই দু'টি ঠিক্ থাকলে কোন অসুখই হবে না। এক তরকারী ভাত অভ্যাস হলে শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাবে। ওটি অভ্যাস হলে নুন দিয়ে জলভাত খাবে। ক্রমে ক্রমে নুন ত্যাগ কর্‌বে। পরে জল রুটি খেতে পার। আহার বিষয়ে খুব সংযত হবে। মানসিক অধিকাংশ বিকার, চঞ্চলতা ও অস্থিরতা শরীরের দরুণ হয়। যে প্রকার আহার গ্রহণ করা যায়, রক্তও সেই প্রকার হয়। মনটিও তদনুরূপই হয়ে থাকে। শুধু জলভাত আহার অভ্যস্ত হলে, দেখ্‌বে শরীর মন কেমন সুস্থ থাকে। আহারে মাত্রা ও সময় ঠিক রাখা বড় সহজ নয়। সময় ঠিক থাক্‌লেও মাত্রা গোলমেলে হয়ে যায়। তীর্থভ্রমণের কালে কোথায় কি জোটে বলা যায় না। বেশী পেলে পরিমাণ মত নেওয়া যায়, কম জুট্‌লেই মুস্কিল। তীর্থ-পর্য্যটন জমাতের সঙ্গে মিশেই ভাল। রাস্তায় বিস্তর প্রলোভন ও ভয় আছে। জমাতে থাক্‌লে সে সকল উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। জমাতে যে সকল সাধুরা থাকেন তাঁদের সাধন ভজন, আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে নাই। যিনি ভজন স্থানে অশান্তি করেন, তিনি সেখানে টিক্‌তে পারেন না; স'রে পড়্‌তে হয়। সাধন না ক'রে কেবল 'গুরু কর্‌বেন', 'গুরু কর্‌বেন' বল্‌লে কিছু হবে না। গুরুকে বিশ্বাস করে, এই সাধনের ভিতরে এমন একটি লোকও এ পর্য্যন্ত হয় নাই।**

গুরুকে বিশ্বাস করা কি সহজ? যিনি গুরুকে বিশ্বাস করেন, তিনি ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করতে পারেন। যতকাল অহঙ্কার আছে, পুরুষকার আছে ততকাল 'গুরু কর্‌বেন' বল্‌লে চলবে না। নিজেরা খাট্‌। নিজেরা না খাট্‌লে কিছুই হবে না। কেহ সাধ্যমত খাট্‌লেই গুরু তাঁকে সাহায্য করেন। গুরুর বাক্যই গুরু। গুরু যাহা ব'লে দেন তাহা কর্‌লেই গুরুর কৃপা লাভ করা যায়।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর, তা হলেই মহাত্মারা তোমাদের মুক্তি দিতে দায়ী। আর তাঁদের আদেশমত যদি কিছুই না কর—তা হলে আর কি হবে? সর্ব্বদা খুব সাধন কর—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর—সমস্তই লাভ হবে—অভাব কিছু থাক্‌বে না।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর কি ভাবে চলিব—
নানা প্রশ্ন ও উপদেশ।

আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর ঠাকুর আমতলায় গেলেন না। পূবের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া রহিলেন। মহাভারত পাঠের পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কখন দেহত্যাগ করেন কিছুই তো নিশ্চয় নাই। এর পর কি করবো? তখন তো একেবারে একলা পড়্‌বো, কি যে হবে জানি না। সে দিন রাত্রে বল্‌লেন— **কামভাব থাক্‌লে বিবাহ ক'রে তাড়াতাড়ি ভোগ শেষ ক'রে নেওয়া ভাল**। পূর্ব্বে আমাকে তিনবার বলেছেন—**তোমার আর গৃহস্থি করতে হবে না**। আপনার সেই বাক্য কি অন্যথা হবে?

২৭শে- ২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

ঠাকুর কহিলেন—**কেন, তোমার কি বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা হয়?**

আমি—আমার ঐ কথা শুনলেও ভয় হয়। ওরূপ ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই—তবে কাম ভাব যখন রয়েছে—তখন সাময়িক উত্তেজনায় কু-ইচ্ছা একেবারে যে হয় না—তাও না। স্ত্রীসঙ্গে আমার খুব অশ্রদ্ধাও আছে।

ঠাকুর বলিলেন—**না, তোমার আর ঘর-গৃহস্থালী হবে না। এ সব সাময়িক উত্তেজনা বা ইচ্ছা কিছুই নয়। এ সব যাবে। স্ত্রীসঙ্গে অশ্রদ্ধা থাক্‌লে আর কোন কথাই নাই। আর আমার দেহত্যাগ হ'লেই বা কি? যা ব'লে দেওয়া হয় তা করলেই আর অভাব থাক্‌বে না। ও সব কথা মনে রাখ্‌লেই হবে। তিন বৎসর জল-ভাত খেয়ে অভ্যস্ত হলে, শুধু শাক সিদ্ধ ক'রে খেও। ব্রহ্মচর্য্যে সত্য, অহিংসা ও বীর্য্যধারণই প্রধান সাধন। আর, নাম খুব কর্‌বে। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্য হ'য়ে গেলে মনের গতি কোন দিকে যায় বুঝ্‌বে। তখন যদি বিবাহ কর্‌তে**

একেবারে ইচ্ছা না হয় তবে গৈরিক ও কৌপীন নিয়ে তীর্থ পর্য্যটন কর্‌বে। জগন্নাথ হ'য়ে ক্রমে চারধাম পর্য্যটন কর্‌বে। অর্থ কাহারও নিকটে চাইবে না। এ বিষয়ে খুব সাবধান থাক্‌বে। খেয়া ঘাটে গিয়ে মাঝিকে পার কর্‌তে প্রার্থনা কর্‌বে। না কর্‌লে সেখানে ব'সে পড়্‌বে।। তীর্থ পর্য্যটনে তেমন ইচ্ছা না হলে য়তদূর পার ততদূর কর্‌বে। তীর্থে গিয়ে সঙ্কল্প ক'রে তুমি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কিছুই কর্‌বে না। নিত্যক্রিয়া মাত্র কর্‌বে। ঠাকুরদর্শন, সাধুসঙ্গ, স্নানাদি কর্‌বে। যত দিন আছ, হোমটি ত্যাগ করো না। অন্যান্য মালা রাখা বা না রাখ, রুদ্রাক্ষ চিরকাল ধারণ ক'রো। উপবীত ত্যাগ ক'রো না। তীর্থ পর্য্যটন হয়ে গেলে একটা স্থানে আসন ক'রে বসো। কাশীতেই ভাল। ব্রহ্মচর্য্যে যেমন সত্য, অহিংসা ও বীর্য্যধারণ প্রধান সাধন, সন্ন্যাসে সেই প্রকার বাসনা ত্যাগ ও সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ উদ্দেশ্য। বাসনাদি ত্যাগ করতে পার্‌লেই এবার পাড়ি দিলে। নিন্দা প্রশংসাতে মনকে যখন স্পর্শ কর্‌বে না, তখনই বুঝ্‌বে বাসনা নষ্ট হয়েছে। এ সকল কথা মনে রেখে চ'লো— তাহলেই আর কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—চিরকালই কি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে?

ঠাকুর—**ভিক্ষা কিছু কথা নয়। অযাচিত ভাবে যাহা পাবে তাহাই নিবে। শারীরিক পরিশ্রমের জন্য ভিক্ষা। একটা স্থানে ব'সে পড়্‌লে, যে যাহা দিবে তাহাই গ্রহণ কর্‌বে তাতে দোষ নাই। একটি কথা মনে রে'খো—কামিনী কাঞ্চন বিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সাবধান থাক্‌বে। আত্মীয়ই হউক—আর পরই হউক—স্ত্রীলোক কাছে ঘেঁস্‌তে দিবে না। আর নিজের কাছে কখনও অর্থ রেখো না। এ কথা কয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রেখো। অর্থ ও স্ত্রীলোক বড়ই ভয়ানক।**

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকে আসক্তি ও অর্থে আসক্তি—এর মধ্যে কোন্‌টি অধিক অনিষ্টকর?

ঠাকুর একটু থামিয়া বলিলেন—**আসক্তি সর্ব্বত্রই অনিষ্টকর। তবে স্ত্রীলোকে আসক্তি অপেক্ষাও অর্থে আসক্তি অধিক অনিষ্টকর। সম্ভোগে অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে আসক্তি কমে। এমনিও সহজে কাটান যায়, কিন্তু অর্থে আসক্তি জন্মিলে কাটান সহজ নয়। অর্থ যতই পাও না কেন তৃপ্তি হয় না। যত পাবে ততই আরও পাইতে ইচ্ছা হয়।**

ব্রহ্মচর্য্য সফল হইল কখন বুঝিব? তীর্থের প্রয়োজনীয়তা কতক্ষণ? ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর কি ভাবে চল্‌লে তাঁর দর্শন পাইব?

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার

আজও ঠাকুর মধ্যাহ্নে আহারান্তে পূবের ঘরে নিজ আসনে রহিলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকটে কেহই থাকে না। কখন কখন শান্তি, কুতু,

বুড়ো ঠাকরুণ ও গেণ্ডারিয়ার মেয়েরা আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া যান। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্রহ্মচর্য্য আমার সফল হইল কখন বুঝিব?

ঠাকুর কহিলেন—**স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ে কল্পনাও যখন একেবারে মনে আস্‌বে না, স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য যখন মনে হবে, তখনই ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হলো বুঝবে।**

এই অবস্থা যদি আমার দশ বৎসরের পূর্ব্বেই লাভ হয়, তাহলে তখন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিব কিনা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ তা পার্‌বে।** আমি বলিলাম—ভিক্ষাতে যে সর্ব্বত্র আতপ চাউলই জুটিবে বলা যায় না। সিদ্ধ চাউল দিলে তাহা গ্রহণ করা যায়?

ঠাকুর কহিলেন—**ভিক্ষান্নে দোষ নাই। উহা সর্ব্বদাই পবিত্র। সিদ্ধ চাউলই নিবে।** জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাকে চিরকাল হোম করতে বলেছেন, কিন্তু এমন সময়ও তো হ'তে পারে যখন হোম করার সুবিধা হলো না—হোমের ঘৃত, বেলপাতা কিছুই যদি না পাই?

ঠাকুর বলিলেন—**হোম করার সুবিধা না হলে আর কি কর্‌বে? তা না কর্‌লে কোন ক্ষতি হবে না। ঘি, বেলপাতা না জোটে—নাই বা জুটল যে কোন ফল, ফুল, পাতা বা খাবার পবিত্র বস্তু মন্ত্রঃপূত ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিবে। অগ্নি প্রজ্বলিত করে যে কোন বস্তু দ্বারা হোম কর্‌বে। প্রত্যহ অগ্নি সেবা চাই।**

আমি—তীর্থ-পর্য্যটনের ফল কি? তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন সিদ্ধ হলো, কখন বুঝবো?

ঠাকুর বলিলেন—**যখন আর তীর্থ-পর্য্যটনে প্রবৃত্তি থাক্‌বে না—যখন নিজের হৃদয়কেই পবিত্র তীর্থ ব'লে মনে হবে, তখন আর তীর্থ-পর্য্যটনে প্রয়োজন নাই। তখন একটা স্থানে ব'সে পড়্‌লেই হলো।**

আমি—তীর্থ-পর্য্যটনের পরে কাশীতে থাক্‌তে বলেছেন, যদি পাহাড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়?

ঠাকুর—**তাহ'লে ত খুব ভালই হয়। তোমার মত বয়সে যদি এই সাধন পেতাম, তা হলে কি আর এসব স্থানে থাকি? তাহ'লে নিশ্চয়ই কোন পাহাড় পর্ব্বতে গিয়ে থাক্‌তাম। এখন আর সে যো নাই। পাহাড়ে যদি থাক তাহলে গ্রীষ্মের সময়ে বদরিকা আশ্রমে আর শীতের সময় হৃষীকেশে থেকো। ঐ সকল স্থানে আহারের কোন অসুবিধা নাই। প্রচুর পরিমাণে তোমার আহার পাহাড়েই জুট্‌বে। অনেক রকম সুখাদ্য ফল আছে—তা খেয়ে অনায়াসে থাকা যায়। তা ভিন্ন, বৌদ্ধদের অনেক মঠ আছে। তাঁরা বড় দয়াল; খুব অতিথি সেবা করেন। ওসব স্থানে থাকার কোন অসুবিধা নাই।**

ঠাকুরের এ সকল কথা শুনিয়া কহিলাম—অনেক দিন যাবৎ একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে খুব ইচ্ছা হইতেছে—কিন্তু সাহস পাইতেছি না।

ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতে বলিলেন—**কেন? বলনা, বল।**

আমি কহিলাম—এরপরে কিভাবে চল্‌লে আপনাকে দেখ্‌তে পাব, কিভাবে চল্‌লে আপনার অভাব আমার কখনও ভোগ কর্‌তে হবে না, জান্‌তে ইচ্ছা হয়। তখন যে কি কর্‌বো ভেবে পাই না।

ঠাকুর বলিলেন—**দেহত্যাগ হ'লেই বা কি? যাহা তোমাকে বলা গিয়াছে তাহা ক'রো, তবেই আর অভাব থাক্‌বে না। সে সময়ে আরও যেখানে সেখানে সর্ব্বদা খুব ঘন ঘন দেখ্‌তে পাবে।**

ঠাকুরকে খুব কাতর ভাবে বলিলাম—আমি অন্য কিছুই চাই না। মুক্তি কি তা চাই না। মুক্তি কি তা আমি জানি না। সেজন্য আমার আগ্রহও নাই। আপনার অভাব যেন আমায় সহ্য করতে না হয় শুধু এই চাই। আপনার আদেশমত চল্‌তে পারবো কিনা জানিনা—তবে, চেষ্টা কর্‌বো নিশ্চয়। যদি ইচ্ছা করে বা আলস্য করে আদেশ মত না চলি, তবে যত রকম শাস্তি আপনার ইচ্ছা আমাকে দিবেন; কিন্তু ঠিক মত চল্‌তে পারি আর নাই পারি—যদি চেষ্টা করি, তাহলেই আপনি আমাকে দয়া কর্‌বেন?

ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ তাই। পার আর নাই পার, চেষ্টা কর্‌লেই হলো। তাহ'লেই আর অভাব থাক্‌বে না নিশ্চয় জেনো।**

আমি —শুনতে পাই মায়িক রূপও নাকি দেখা যায়—তাহ'লে খাঁটি রূপ ও মায়িক রূপ কি প্রকারে বুঝব্‌?

ঠাকুর কহিলেন—**যাহা যখন দর্শন হবে—তখনই তার বিশেষ সম্মান কর্‌বে, ভক্তি কর্‌বে। দর্শনের সময়ে ওসব কিছু মনে করো না। খুব ভক্তি করো, কোন প্রকার সন্দেহ মনে এনো না। আর কারও নিকট কিছু প্রার্থনা করো না। নিজ হতে যিনি যাহা ক'রে যান— তাহাই ভাল। প্রার্থনা কর্‌লেই অনিষ্ট হয়ে থাকে। একথা সর্ব্বদা মনে রেখো।**

আমার পাপে ঠাকুরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত।

৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত

বিধির বিপাকে অনুদয়ে আজ বুড়ীগঙ্গায় স্নান হইল না। বেলা প্রায় ৮টার সময়ে সনাতন বাবুর বাগান বাড়ীতে স্নান করিতে গেলাম। বাঁধান ঘাটের সিঁড়ির উপরে কাপড় রাখিয়া একেবারে গলাজলে নামিয়া পড়িলাম। ডুব দিয়া যেমন মাথা তুলিয়াছি, ছোটপুকুরের অপর পারে পরমাসুন্দরী তিনটি স্ত্রীলোক অকস্মাৎ আমার চোখে পড়িল। সকলেই একবয়সী তরুণ-যুবতী। দৃষ্টিমাত্রে কেমন যেন হইয়া গেলাম। চমকে পড়িয়া

তন্মুহূর্ত্তে চোখ ফিরাইতে ভুলিয়া গেলাম, যুবতীরা চঞ্চলভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে বস্ত্রবিপর্য্যস্ত করিয়া ঘন ঘন আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের অসামান্য রূপের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, হৃৎপিণ্ড আমার দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। অমনি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া দ্রুতপদে আশ্রমে আসিলাম। নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বেলা প্রায় দশটার সময়ে ঠাকুরের ঘরে গিয়া বসিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন—ধীরে ধীরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—**গয়ার পাহাড়ের নিকট ৪ জন ব্রহ্মচারী, সকলেই পাহাড়ে উঠ্‌ছেন। দৃষ্টি পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে। পশ্চাতে এক ব্যক্তি বেতহাতে। ব্রহ্মচারীরা পদাঙ্গুষ্ঠ ছেড়ে দৃষ্টি কর্‌লেই চটাপট বেত। জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন উহারা চতুঃসন সনকাদি ঋষি, যোগ-পন্থার প্রথম প্রবর্ত্তক; যোগ শিক্ষা দেন। যাহা শিক্ষা দেন, নিজেরা না কর্‌লে বেত খান; শিষ্যেরা না কর্‌লেও বেত খান। পিছনে থেকে নারদ বেত মারেন। গুরুগিরি কি ভয়ানক! বাব্বা! আমি কারও গুরু নই। পরমহংসজীই গুরু। তাঁকে আর কে বেত মারবে? তিনি যে ব্রহ্মে যুক্ত স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনিই সব করছেন, আমি কিছুই নই। তিনিই সব। তিনি সবই দেখ্‌ছেন যে যা কর সব দেখ্‌ছেন। ভালও দেখ্‌ছেন, মন্দও দেখ্‌ছেন। ফাঁকি দেওয়ার যো নাই। গুরু সমস্তই জানেন। সাবধান।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। লজ্জায় ও ত্রাসে, বিষম ক্লেশ হইতে লাগিল। ধ্যানভঙ্গের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—শিষ্যের অপবাধে গুরুকে বেত খেতে হয়? ঠাকুর আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া ইঙ্গিতে পিঠ দেখিতে বলিলেন; এবং মমতাপুর্ণ সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বসা অবস্থায়ই একবার মাত্র পাশ হইতে তাকাইলাম—যাহা দেখিলাম—আর পারিলাম না। ঠাকুর আমাকে কোন দণ্ডই দিলেন না; একটি শাসন বাক্যও বলিলেন না। এমন কি, আমার গুরুতর অপরাধের বিষয় তিনি জানেন, আভাসেও এরূপ কিছু প্রকাশ করিলেন না। শিষ্যের উৎকট অপরাধে তীব্র ভোগ গুরু গ্রহণ করিয়া নীরবে ভোগ করিলে, শিষ্যের পক্ষে উহা কিরূপ শাসন তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। অসহ্য যন্ত্রণায় সারাদিন ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলাম।

শিষ্যকে অভয় দান। তোমার হয়ে আমি ভুগ্‌ব।

ঠাকুরের আশ্চর্য্য দয়া ও অসাধারণ সহানুভূতির ফলে, একটি গণ্যমান্য অবস্থাপন্ন গুরুভ্রাতার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। গুরুভ্রাতাটি বড়ই নির্ভীক, একগুঁয়ে এবং সরল প্রকৃতি। একদিন মনোদুঃখে অভিমানপূর্ব্বক অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরকে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন "গোঁসাই! আপনার এ সাধন আপনি ফিরিয়ে নিন। আমি এ সাধন করতে পারব না।"

ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন— **কেন কি হয়েছে?**

গুরুভ্রাতা—হবে কি মশাই? এ সাধন কি কখন আমরা করতে পারি? আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে, সমাজ আছে, দশটা বড়লোকের সঙ্গে সদ্ভাব, আত্মীয়তা রক্ষা করে আমাদের চল্‌তে হয়। আমরা কি এ সাধনের নিয়ম রক্ষা করে চল্‌তে পারি?

ঠাকুর—**শুধু মদ, মাংস, উচ্ছিষ্ট মাত্র খেতে নিষেধ। এ ছাড়া বিশেষ আর নিয়ম কি আছে? মাংস, মদ, না খেয়ে পারবে না?**

গুরুভ্রাতা—মশাই! মদ, মাংস চিরটাকাল খেয়ে এলাম। ওসব না খেলে আর খাব কি? আজকাল ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাখ্‌তে হোলেই্ ওসব খেতে হয়। আমাদের সমাজ আছে, দশ বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে হয়। ঘরেই ত উচ্ছিষ্ট-বিচার চলে না, সমাজে উচ্ছিষ্ট-বিচার রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব।

ঠাকুর—**আচ্ছা, একটু চেষ্টা ক'রো; তারপর না পার্‌লে আর কি কর্‌বে?**

গুরুভ্রাতা—আজ্ঞে ওকথা আমাকে বলবেন না। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌ব না। ও বিষয়ে আমার কোন চেষ্টাই আসে না। কর্‌ব কোত্থেকে?

ঠাকুর—**ভালো, নাম তো কর্‌তে পার্‌বে? তা হ'লেই হবে।**

গুরুভ্রাতা—গোঁসাই! নাম করব কি? ওতো মনেই্ থাকে না।

ঠাকুর—**বেশ, তুমি এক কাজ ক'রো। ঐ সময়ে আমাকে স্মরণ ক'রো। আর এটি জেনে রেখো, তুমি যাহা কিছু অপরাধ কর্‌বে, তার দণ্ড সব আমি ভোগ কর্‌ব। তোমার অপরাধের জন্য তোমাকে আর ভুগ্‌তে হবে না।**

ঠাকুর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়া ছলছল চক্ষে উহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন। তখন গুরুভ্রাতাটি হঠাৎ যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া ঠাকুরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভো! আমার অপরাধের দণ্ড আপনি ভুগবেন? আমার এ প্রাণও যদি যায়—আজ থেকে আর আপনার আদেশ লঙ্ঘন কর্‌বো না। এই বলিয়া গুরুভ্রাতাটি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। এখন দেখিতেছি, তাঁর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ঠাকুরের বিষয়ে আলাপ করার সময়ে তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান; এবং আক্ষেপ করিয়া প্রায়ই বলেন, ঠাকুর আমাকে সূর্য্যের ষাঁড় করে ছেড়ে দিয়েছেন—আব আমার অপরাধের শাস্তি সব তিনি ভুগছেন; আমার প্রতি তাঁর এ দয়ার কি সীমা আছে?

ঝড়বৃষ্টিতে আসনে স্থির।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। ঝড় তুফানের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর ধ্যানস্থ। শ্রীধর ও অশ্বিনীকে লইয়া ঠাকুরের মস্তকে ও দুই পাশে ছাতা ধরিয়া রহিলাম। কোনও প্রকারেই ঠাকুরকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমরাও ভিজিয়া গেলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। জলের ধারায় কাদার উপরে আসনখানা উল্টাইয়া ফেলিলেন এবং পায়ের দ্বারা উহা রগ্ড়াইতে লাগিলেন। তৎপরে পূবের ঘরে যাইয়া গা পুছিয়া বসন ত্যাগান্তে নিজ আসনে বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বৃষ্টির আরম্ভে ঘরে আসিলে আর এভাবে ভিজিতে হইত না, মৃগচর্ম্মখানাও নষ্ট হইত না। ঠাকুর কহিলেন—**আসনে বস্‌লে কি আর সব সময়ে আসা যায়? কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অবস্থা আসে। কখনও কখনও নূতন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ হয়। ঐ সময়ে আসনটি ত্যাগ কর্‌লে সে অবস্থাটি হারাতে হয়। এজন্য মৃত্যু স্বীকার ক'রেও মহাত্মারা আসন ত্যাগ করেন না—আসনে স্থির থাকেন।**

কৃষ্ণসার মৃগের উৎকৃষ্ট চর্ম্মখানা ঠাকুর আজ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন—বড়ই দুঃখ হইল। উহা বুড়ীগঙ্গায় দিতে বলিলেন। বহুক্ষণ আজ ঠাকুর বৃষ্টিতে ভিজিলেন। আজ সমস্ত দিনই থাকিয়া থাকিয়া জল হইল।

ঠাকুরের ভজনস্থান, আম্রবৃক্ষে মধুক্ষরণ।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার—মেঘের লেশমাত্র নাই, খুব রৌদ্র উঠিয়াছে। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারত শ্রবণান্তে বেলা প্রায় ২টার সময় ঠাকুর বলিলেন—**আমগাছ হ'তে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে—দেখ্‌তে পাচ্ছ?** আমি হেঁট মস্তকে থাকি বলিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। ঠাকুর বলামাত্র একটু মাথা তুলিয়া দেখি, গাছ হইতে অবিশ্রান্ত শিশির-বিন্দুর মত কি যেন পড়িতেছে। আমতলার শুষ্ক তৃণপত্র ও তুলসী গাছগুলি তেলপানা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের রোয়াকে ফোঁটা ফোঁটা শিশির-বিন্দুর মত মধু পড়িয়া ভিজিয়া রহিয়াছে। তাহাতে বিস্তর ডেঁয়ে, পিঁপড়া প্রভৃতি আসিয়া জড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিকা গুণ গুণ করিয়া ঘুরিতেছে। একপ্রকার সদ্‌গন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। ঠাকুর আবার বলিলেন—**কি, মধু ব'লে বুঝ্‌তে পারছ?** এ সময়ে শ্রীধর ও অশ্বিনী আসিয়া পড়িলেন; তাঁহারা দু'তিনটি শুষ্কপত্র চাটিতে চাটিতে বলিলেন—বাঃ এতো বেশ মিষ্টি; মধুই বটে। আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। আমি বৃক্ষের নিম্ন শাখার দু'টি পাতা

ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, ঠাকুর শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—**উঃ কি কচ্ছ? ওভাবে পাতা ছিঁড়তে আছে?** আমি পাতা দুইটি হাতে লইয়া দেখিলাম—ঠিক যেন তরল আঠা মাখান রহিয়াছে। চাটিয়া দেখিলাম খুব মিষ্টি। তখন আশ্রমস্থ দশ বারজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম। সকলেই আমপাতার মধুর স্বাদ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমগাছে এরূপ মধু পড়ে নাকি?

ঠাকুর বলিলেন—**শুধু আমগাছ কেন? যে সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার সহিত হোম, যাগ, যজ্ঞ, সাধন ভজন, তপস্যা হয়, অথবা যে সকল বৃক্ষের নীচে মহাত্মা মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হ'য়ে যায়। সময়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধু ক্ষরণ করে। খুব ভক্তির সহিত পূজা কর্‌লে জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধুপোকা পড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হ'ল। জল একটু খেয়ে দেখলাম, মিষ্টি-মধুর গন্ধ। বহু প্রাচীন নিমগাছ, তেঁতুলগাছ দেখেছি, তা থেকে ঝরণার মত মধু পড়ে। কমণ্ডলু ভরে খেয়েছি—পরে অনুসন্ধানে জেনেছি—ওসব বৃক্ষের তলায় কোন সিদ্ধপুরুষের বা মহাপুরুষের আসন ছিল।** এই বলিয়া ঠাকুর একটি বেদের বচন বলিলেন—

***ওঁ মধুবাতাঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ ॥ মাধ্বীর্ণ সন্তোষধিঃ॥ওঁ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্নো বনস্পতিমধুম্মাং অস্তু সূর্য্যঃ॥ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু॥**

অনেকদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি, আসনের বৃক্ষটির গায়ে বহু দেবদেবীর চিত্র পড়িতেছে। ভাবিয়াছিলাম ওসব ভাবুকতার কথা; আজ ঠাকুরের নিকটে দাঁড়াইয়া বৃক্ষটিকে ভাল করিয়া দেখিলাম। সুগোল, স্থূল, প্রাচীন বৃক্ষটি পাঁচ ছয় হাত উর্দ্ধদিকে সরলভাবে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে সমানায়তনে বিস্তারলাভ করিয়াছে। উহার শাখা প্রশাখা, পত্রপল্লবাদি সমস্তই দেখিতে পরম সুন্দর, সতেজ ও জীবন্ত। বৃক্ষের গায়ে ছোট বড় নানা রকমের চটা উঠিয়া স্থানে স্থানে ওঁকার ও বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েও বৃক্ষতলা উত্তপ্ত হয় না; উদয়াস্ত শীতল ছায়া রহিয়াছে। একটু বসিলেই শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়; মন প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। আম্রবৃক্ষের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে ঠাকুরের আসন। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুই পাশে সুন্দর সুন্দর নয়ন

---

* বায়ু মধু বহন করুন। সমুদ্র সকল মধু ক্ষরণ করুন। আমাদের ধান্যাদি ওষধিসমূহ মধুপূর্ণ শস্য প্রদান করুন। রাত্রি সকল মধুরূপ হউক। উষাসকল মধুযুক্ত হউক। পার্থিব ধূলিসমূহ মধুপূর্ণ হউক। আকাশ মধুময় হউক। আমাদের পিতৃগণ মধুযুক্ত হউন। আমাদের বনস্পতিসমূহ মধুফল প্রসব করুক। সূর্য্য মধুময় হউক। আমাদের ধেনুগণ মধুময় দুগ্ধবতী হউক।

স্নিগ্ধকর তুলসী বৃক্ষ। সম্মুখে ধুনির কুণ্ড। আসনের ১৫/২০ হাত অন্তরে দক্ষিণদিকে পরিষ্কার পুষ্করিণী থাকায় বায়ুর স্বচ্ছন্দ গতি। পূর্ব্বদিকে অঙ্গনের পূর্ব্বধারে ছোট ছোট কাঁটা গাছের ও লতার বেড়া; দেখিতে বড়ই মনোরম। সারাদিনই এই স্থানটি নীবর, নিস্তব্ধ, পাখীর কলরব ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। অপরাহ্নে গুরুভ্রাতারা ও দর্শনার্থীরা আসিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুরের সঙ্গে এখানে দেখা সাক্ষাৎ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হয়। মধুময় বৃক্ষ জীবনে আর কখনও দেখি নাই—গাছের সমস্তগুলি পাতা যেন জল দিয়া ধুইয়া রাখিয়াছে—অবিশ্রান্ত উহা হইতে কুয়াসার মত মধুক্ষরণ হইতেছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

কুস্বপ্ন—তার হেতু।

৮ই আষাঢ়।

গত রাত্রি আমার এক বিষম রাত্রি গিয়াছে। দু'টিবার কুস্বপ্নে আমাকে কাতর ও কলুষিত করিয়াছে। শরীর আজ নিস্তেজ, অবসন্ন—মনটিও অবসাদগ্রস্ত, উদ্বেগপূর্ণ। কোন প্রকারে স্নান, তর্পণ ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলাম। ঠাকুরের নিকটে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। শিরঃপীড়ায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলাম। আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইতিমধ্যে এমন কি অনিয়ম করিয়াছি, যাহার ফলে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে? মিষ্টি খাইতে আমার নিষেধ সত্ত্বেও পরশ্বদিন লোভে পড়িয়া কতকগুলি আম ও কাঁঠাল খাইয়াছিলাম। গতকল্য ঝড়বৃষ্টিতে বেলা ঠিক না পাইয়া রাত্রিকালে রান্না করিয়া আহার করিয়াছি। ইহা ছাড়া আর একটি অজ্ঞাত অত্যাচারও ঘটিয়াছে—গতকল্য অপরাহ্নে তিনটার সময়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকটি সুশিক্ষিতা মহিলা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই তিনটি আমার বহু দিনের পরিচিতা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠা ছিলেন। সেই সময়ের একটি মহিলা কিছুকাল পূর্ব্বে আমি কঠোর বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করিয়াছি—সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, শুনিয়া উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। শুনিলাম তাঁহারা নাকি অনিমেষে মনোযোগপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া আমাকেই দেখিয়া গিয়াছেন। আমি হেঁট মস্তকে ছিলাম বলিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই। বোধ হয় তাঁহাদের ভাব-দুষ্ট-দৃষ্টিতে আমার অন্তরের দূষিতভাবকে জাগাইয়া দিয়াছে; তাহারই এই পরিণাম।

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে পদ্মগন্ধ ও মধুক্ষরণ।

আজ ঠাকুরেরও শরীর সুস্থ নয়। মধ্যাহ্নে আমতলায় গেলেন না। আমি মাথার যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিলাম—আজ মহাভারত পাঠ করিতে না বলিলে বাঁচি। ঠাকুর একটু পরেই মাথা তুলিয়া বলিলেন—**আমার মাথাটি একবার**

দেখ ত। পিঁপড়ায় বড় কামড়াচ্ছে। মহাভারত পাঠের পর প্রায় প্রত্যহই কিছুক্ষণ ঠাকুরের মাথা দেখিযা থাকি। জটার ভিতর হইতে রাশিকৃত ছারপোকা ও উকুন বাছিয়া ফেলি। ঠাকুর আজ পিঁপড়ার কথা বলায় ভাবিলাম—মাথায় পিঁপড়া থাকিবে কেন? বোধ হয় উকুন বা ছারপোকায় কামড়াইতেছে। মাথায় হাত দিয়া দেখি, জটার গোড়া একেবারে ভিজা রহিয়াছে। কেহ যেন সমস্ত মাথায় তেল দিয়া রাখিয়াছে। ঘাড়ে ও উভয় কাণের পাশে বিস্তর পিঁপড়া। প্রায় প্রত্যহই জটা বাছিবার কালে ঠাকুরের মাথা সামান্য ভিজা দেখিতে পাই। গরমে, ঘর্ম্মে মাথা ভিজিয়া যায়—আমার এইরূপই ধারণা ছিল। আজ অতিরিক্ত ভিজা দেখিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ সমস্ত মাথা ভিজে গিয়ে জটার গোড়ায় চুলগুলি চপ্ চপ্ করছে। আর একটা সুগন্ধ বের হচ্ছে।

ঠাকুর—**কিরূপে গন্ধ?**

আমি—পদ্মের মত গন্ধ।

ঠাকুর—**হাঁ, তাই। ঐ গন্ধ পেয়েই পিঁপড়া এসেছে।**

ঠাকুরের মস্তক স্পর্শমাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা ধরা কমিয়া গেল, শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল, মনটিও খুব প্রফুল্ল হইল, সরসভাবে আপনা আপনি নাম চলিতে লাগিল। বিস্মিত হইয়া আমি ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিয়া একটু তফাতে যাইয়া বসিলাম; নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমাকে আবার জটা বাছিতে বলিলেন; আমি জটা বাছিতে বাছিতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সমস্ত মাথায় চুলের গোড়ায় সাদা সাদা পাতলা মোমের মত দেখিতেছি, তোলা যায় না—চুলে জড়িয়ে যায়, এগুলি কি?

ঠাকুর—**যা বল্‌লে তাই, মোম। জমাট হয়ে হয়ে ওরূপ হয়েছে।**

আমি—কিছুদিন থেকে আপনার মাথা, ঘামে প্রায় সর্ব্বদাই ভিজা থাকে, দেখ্‌তে পাই।

ঠাকুর—**ঘাম নয়। ঘাম ত শুকিয়ে যায়। ঘাম কি জমে মোম হয়? প্রতিদিন দেখ্‌ছ, বুঝতে পাচ্ছ না?—ওযে মধু।**

আমি—মানুষের শরীর দিয়েও মধু চোয়ায়?

ঠাকুর—**হ্যাঁ, গাছের যেমন দেখেছ তেমনই।** একটু পরে ঠাকুর আবার বলিলেন—**গাছের নীচে বসা এখন সুবিধা নয়, কত ডেঁয়ে, পিঁপড়ে ও মাছি এসে মাথায় পড়ে। এখন ঘরে থাকাই ভাল।**

কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের শরীরে সর্ব্বদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মত দেখিয়া আসিতেছি—বেগে বাতাস করাতেও তাহা শুকায় না দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহও জন্মিয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে

সাহস পাই নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজা গামছা লইয়া নিজেই গা পুঁছিয়া থাকেন, পিঠে হাত চলে না বলিয়া আমি পিঠ পুঁছিয়া দিই। প্রচুর পরিমাণে তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া উঠিলে যেরূপ দেখায়, ঠাকুরকে কয়দিন যাবৎ সেইপ্রকার দেখিতেছি। মানুষের শরীর হইতে ঘর্ম্মাকারে মধু বাহির হয়, কোথাও শুনি নাই, কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। ঠাকুরের এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখিতেছি। স্নিগ্ধ সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সর্ব্বদাই ঘরটি আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। বোল্‌তা, প্রজাপতি ও মধু-মাছি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাথার উপরে দুই চারি পাক ঘুরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; হাতপাখার ঝাপ্‌টা হাওয়াতে তাহারা ঠাকুরের শরীরে বা মস্তকে বসিবার অবসর পাইতেছে না। অসংখ্য পিঁপড়াও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া পড়িতেছে। দেখিলেই উহা ঝাড়িয়া সরাইয়া দিতেছি। ঠাকুর নতমস্তকে মুদ্রিত নয়নে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তৈলধারার মত অবিরল অশ্রুবর্ষণে ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া কৌপীন-বহির্ব্বাস ভিজিয়া যাইতেছে। ধ্যানমগ্নাবস্থায় ঠাকুরের মস্তক প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ধীরে ধীরে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে বামদিকে হাঁটুর উপরে আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় ৮/১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বসেন। পুনঃপুনঃ এইভাবে পড়িয়া উঠিয়া অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ঠাকুরের দেহে যে সকল অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা আমার ব্যক্ত করিবার উপায় নাই; ঠাকুরের অসীম কৃপাতে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছি।

স্বপ্নদোষের হেতু—উপদেশ।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন, মাথা তোলা মাত্র আমার দুর্দ্দশার কথা সমস্ত জানাইলাম।

ঠাকুর কহিলেন—**কতবার তোমাকে ব'লেছি ওতে কোন অনিষ্ট হয় না। অনর্থক সংস্কারে বৃথা কষ্ট পাও কেন? ইচ্ছা করে বীর্য্য নষ্ট কর্‌লেই অপরাধ হয়। তাতে অনিষ্টও হয়।**

আমি—ব্রহ্মচর্য্যে বীর্য্যধারণই প্রধান সাধন। যেরূপে হউক তাহা নষ্ট হলেই কষ্ট হয়।

ঠাকুর—**স্বপ্নদোষ যেরূপ তোমার হয়, তাতে বীর্য্যধারণের কোন ক্ষতিই করে না। বীর্য্যধারণ ঠিক মতই হচ্ছে।**

আমি—ওরূপ হ'লে শরীর যে অসুস্থ হয়—নিস্তেজ, অবসন্ন হ'য়ে পড়ে; মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, সাধন করিতে পারি না, আপনার কাছে ঘেঁষিতেও প্রবৃত্তি হয় না। স্বপ্নদোষ আমার কেন হয়?

ঠাকুর কহিলেন—**ওসব অনেক কারণে হয়। তার উপায় সহজ নয়। তবে সাধারণ**

নিয়মগুলি তো রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার? রসাস্বাদনের লোভটি ত্যাগ কর।

আমি—চেষ্টা তো কম কর্‌ছি না, হয়রান্ হ'য়ে পড়েছি—আর পারি না।

ঠাকুর—**হয়রান্ হ'য়েছ সে কিছু নয়। হয়রান্ হ'লেও চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ কি একদিন দু'দিনের কাজ? এই ব্রহ্মচর্য্য পুর্ব্বে ঋষিকুমারেরা ছত্রিশ বৎসর করতেন। কেহ কেহ বা বার বৎসর করতেন। কিন্তু ছ'টি বৎসরের পুর্ব্বে কখনও ঠিক্ হয় না। তুমিও খুব চেষ্টা কর—হঠাৎ যে হবে তা নয়, ক্রমে ক্রমে সব হবে। কাম, ক্রোধ, লোভাদি যখন ছুট্‌বে—আপনা আপনি ছুট্‌বে। কিন্তু তা বলে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে নাই। অভ্যাস কর্‌তে হয়। এখন খুব অভ্যাস কর।**

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—**যে পথ ধ'রে চলেছ তাতে আহারের নিয়মটি খুব ঠিক্ রেখে না চল্‌লে ক্ষতি হবে। আহারের পরিমাণ যেমন প্রত্যহ সমান থাক্‌বে, আহারের সময়টিরও ব্যতিক্রম না হয়। এ দু'টির কোন প্রকার অনিয়ম হ'লেই শরীর অসুস্থ হবে। নিজের নিয়মের বিরুদ্ধে কারও কোন প্রকার উপরোধ, অনুরোধ শুন্‌বে না। যে কোন প্রকারের মিষ্টি তোমার পক্ষে অনিষ্টকর—বিষবৎ উহা ত্যাগ কর্‌বে।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সমস্তই বুঝিলাম। আমার স্বেচ্ছাকৃত অনিয়মেব কথা উল্লেখ করিয়া যদি এ সকল উপদেশ দিতেন—আমি সহ্য করিতে পারিতাম না! আমার ত্রুটি বিষয়ে কিছুই যেন জানেন না—এ ভাব দেখাইয়া, প্রয়োজনীয় কথাগুলি মাত্র বলিলেন, ইহাতে বড়ই লজ্জিত হইলাম।

আত্মদর্শন, ছায়াদর্শন, জ্যোতিঃদর্শন।

১০ই আষাঢ়।

শেষরাত্রে তন্দ্রাবস্থায় দেখিলাম, আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করিয়া নাম করিতেছি, অকস্মাৎ ঝিকিমিকি করিয়া নিজের রূপ প্রকাশিত হইল। ঠিক যেন আয়নায় নিজের মুখ নিজে দেখিতে লাগিলাম। পরিষ্কার দেখিলাম শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল, পবিত্রমূর্ত্তি, মুণ্ডিতমস্তক, শিখা-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আমার পানে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরেই বাহ্যজ্ঞান হইল, জাগিয়া উঠিলাম। সমস্ত দিন চিত্তটি সরস ও প্রফুল্ল রহিল। মধ্যাহ্নে অবসর বুঝিয়া ঠাকুরকে সমস্ত বলিলাম; তিনি শুনিয়া কহিলেন—**এরূপ দেখা ভালো। জাগ্রতাবস্থায় যখন ওরূপ দর্শন হ'বে তখনই ঠিক হ'লো। একেই আত্মদর্শন বলে। কাম ক্রোধাদি রিপু থাক্‌তে যে আত্মদর্শন হয় তাহা স্থায়ী হয় না। সময়ে সময়ে দর্শন হয় মাত্র। আর রিপু সমস্ত দমন হয়ে গেলে যে আত্মদর্শন হয় তাহা আর ছোটে না স্থায়ী হয়।**

জিজ্ঞাসা করিলাম—কালো, অস্পষ্ট ছায়ার মত অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মনুষ্যাকৃতি যে সর্ব্বদাই এদিকে ওদিকে দেখতে পাই, তাহাও কি এই?

ঠাকুর—**না, তা নয়। সে ভিন্ন। আত্মদর্শন তা নয়।**

আমি—হোমের সময়ে আগুনের মধ্যে গৈরিকবসন পরা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতি দেখ্‌তে পাই—

ঠাকুর—**হাঁ, চিত্ত শুদ্ধ যত হবে ততই উহা পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবে।**

আমি—উজ্জ্বল শুভ্র-জ্যোতিঃ যাহা সর্ব্বক্ষণই চক্ষে লে'গে র'য়েছে, কখনও কখনও তাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখ্‌তে পাই, আবার কোন কোন সময়ে ম্লান হয় কেন?

ঠাকুর—**চিত্ত যত শুদ্ধ ও পবিত্র থাক্‌বে, ঐ জ্যোতিঃ ততই উজ্জ্বল দর্শন হবে। চিত্ত মলিন ও অপবিত্র হলে জ্যোতিঃ অস্পষ্ট হয় ও ক্রমে অদৃশ্য হয়; চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয় আর নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জ্যোতিঃ দেখায়।**

আমি—কিছুকাল যাবৎ কথা বলিতে গেলেই আপনা আপনি মনে আসিয়া পড়ে 'সত্য বলিতেছি কি না'—অমনি কথা বলায় বাধা হয়, ভাবিয়া কথা বলায় কথা অল্পও হ'য়ে পড়ে।

ঠাকুর—**ইহাই প্রণালী; একদিনেই কি সব হয়? প্রণালী ধ'রে চল্‌তে থাক, অবস্থা সময়ে হবে। রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে লক্ষ্য স্থানের জন্য উদ্বেগ ভোগ ক'রে লাভ কি? সত্যবাদী কি একদিনেই হওয়া যায়। এতই সহজ। কথা বলার সময়ে ঐ প্রকার মনে হলেই সত্য কথা বলা যায়। এই প্রণালী। কোন অবস্থালাভের জন্যই ব্যস্ত হ'য়ো না। প্রণালী মত চল্‌লেই তোমার কর্ত্তব্য করা হ'লো, অবস্থা যখন হবার হবে; সে জন্য উদ্বেগভোগ অনর্থক। কাজটি করে গেলেই হলো।**

অবস্থালাভ বা ঠাকুরের সেবাভোগ একই কথা।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম। ঠাকুর প্রাণপণে উৎসাহ উদ্যমের সহিত সাধন ভজন ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে বলিতেছেন, অথচ তাহাতে কোন অবস্থালাভ হইবে —এরূপ কল্পনা করিতেও নিষেধ করিতেছেন। ফলে উদ্দেশ্যশূন্য হইলে কর্ম্মে উৎসাহ বা প্রবৃত্তি জন্মিবে কি প্রকারে? ফলের জন্যই তো কর্ম্ম করা। ঠাকুর পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—'**অবস্থালাভ সাধনসাপেক্ষ নয়, উহা কৃপাসাপেক্ষ।**' অপ্রাকৃত অবস্থা সমস্তই গুরুদেবের হাতে—তিনি দয়া করিয়া দিলেই তাহা পাইবে, নচেৎ সহস্র সাধন ভজনেও উহা লাভ হইবে না। ঠাকুর স্বয়ং ফলদাতা।

তিনি যেমনই পরম দয়াল, তেমনই আবার মহাসমর্থী, সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি আমাকে কৃপা করিতে পারেন, এরূপ প্রত্যাশা সর্ব্বদাই আমি করিতে পারি। ঠাকুরের আদেশ মত কার্য্যগুলি সমস্তই আমি করিয়া যাইব, অথচ তাঁর নিকটে কোন প্রকার শুভ অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করিব না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ঠাকুরের এ কথার তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতেছি না। মনে হইতেছে, ঠাকুরের আদেশে সাধন ভজন ও নিয়ম প্রতিপালন যেমন আমার কর্ত্তব্য, আমাকে যাবতীয় উৎকৃষ্ট অবস্থা দান করাও সেই প্রকার ঠাকুরেরই কার্য্য। আমার কর্ত্তব্যপালনে পদে পদে শিথিলতা ও অক্ষমতা জন্মিতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের কার্য্যে কখনও বিন্দুমাত্র অন্যথা হওয়ার যো নাই; কারণ তিনি মহাসমর্থী। ঠাকুর আমাকে কোন অবস্থা দিন আকাঙ্ক্ষা করা, আর তিনি আমার জন্য কিছু করুন ইচ্ছা করা একই কথা। আমাকে কৃপা করা অর্থই যখন আমাকে সেবা করা দাঁড়াইতেছে, তখন প্রাণান্তেও, ঠাকুর আমাকে কৃপা করুন—কোন অবস্থা দিন, এরূপ ইচ্ছা আমি করিব না। ওরূপ আকাঙ্ক্ষা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই মনে হয়। এই জন্যই বোধ হয় অনুগত ভক্তেরা কোন প্রকার ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শুধু আদেশ পালন ও সেবাতেই পরমানন্দ লাভ করেন। তাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন।

স্বপ্নে গুরুরূপে আদেশও অসত্য হয়।

গতকল্য ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি ভিতরে ভিতরে একটা উদ্বেগ চলিয়াছে। সাধন ভজন ও নিয়ম প্রতিপালনের সহিতই যখন আমার সম্বন্ধ, উহার ফলাফলে যখন আমার কোনও হাতই নাই, তখন কোন অবস্থা লাভের লোভে পড়িয়াই হউক বা অনুরাগবশেই হউক—কার্য্যটি হইলেই হইল, কার্য্যটির সঙ্গেই মাত্র আমার সম্বন্ধ; কিন্তু কোন অবস্থা লাভের লোভে সাধন ভজন করিলে অনিষ্টেরও আশঙ্কা আছে, ঠাকুর এইরূপ বলিলেন কেন? পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—অবস্থা লাভের প্রত্যাশা তো একমাত্র গুরুরই উপরে, সুতরাং অনিষ্ট হবে কিরূপে?

ঠাকুর—**তা কি সহজ? তুমি একটা অবস্থা লাভের জন্য বহুকাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করে আস্‌ছ, হচ্ছে না। একটি সাধু এসে বল্লেন—এরূপ কর, হবে। তখন সেটি না করা কি সহজ কথা? এই প্রলোভন কেহ সহজে ছাড়তে পারে না। ওরূপ ক'রে অনেকেই বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। স্বপ্নেও এরূপ প্রলোভন উপস্থিত হয়।**

আমি—স্বপ্নে দেখলাম গুরু এসে একটা আদেশ ক'রে গেলেন বা উপদেশ দিলেন, তাও কি অসত্য হয়?

ঠাকুর—**হাঁ, তাও হয়, গুরুর রূপে অন্যেও এসে পরীক্ষা কর্‌তে পারেন।**

আমি—তবে উহা গুরুরই আদেশ কি না, সত্য কি মিথ্যা কিরূপে বুঝ্‌ব?

ঠাকুর—**নাম কর্‌লে যদি ঐ রূপ অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলেই বুঝ্‌বে ঠিক নয়। আর নাম কর্‌লেও যদি থাকে তা হলেই সত্য মনে কর্‌বে। নাম কর্‌লে কখনও মায়া অসত্য টিক্‌তে পারে না।**

আমি—স্বপ্নের অবস্থায় যদি নাম কর্‌তে স্মরণ না হয় তা হলে কি কর্‌বো? যথার্থ গুরু কিনা তাই বা কি প্রকারে বুঝ্‌ব?

ঠাকুর—**গুরুকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়। না হলে যদি সন্দেহ হয় সেই উপদেশ মত চল্‌তে নাই। তবে স্বপ্নে সদ্‌গুরু কিছু আদেশ কর্‌লে বা উপদেশ দিলে, সে বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় মনে উদয় হবে না।**

বোলতার দংশন। হিংসাজনিত অপরাধ খণ্ডন। দু'টি হিংসার স্মৃতি। কারও প্রাণে আঘাত দেওয়াও হিংসা।

মধ্যাহ্নে আহারকালে ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়া দরজার ধারে দাঁড়াইয়া আছি। একটি বোলতা আসিয়া হঠাৎ আমার বাম হাতে পড়িয়া কামড়াইয়া গেল। বিষাক্ত ক্ষুদে বোলতা, মনে হইল যেন জ্বলন্ত লোহার কাঠি হাতের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। বারান্দায় আসিয়া দু'চার বার হাত আছড়াইয়া ডলিয়া মলিয়া অতি কষ্টে একটু স্থির হইলাম। ঠাকুরের আহারান্তে মহাভারত লইয়া যেমন ঠাকুরের নিকট বসিয়াছি, আর একটি বড় বোলতা হাতের ঠিক্ সেই স্থানেই আসিয়া উড়িয়া পড়িল এবং হুল বসাইয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে হাতখানা আমার ফুলিয়া উঠিল এবং অবশ হইয়া গেল। একটু পরে মহাভারত পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আর একটি বোলতা আসিয়া ঐ হাতের ধারেই ভন্ ভন্ করিতে লাগিল, এবং পুনঃপুনঃ হাতের উপরে উঠা-পড়া করিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর কহিলেন—**বোলতার প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করেছ?**

আমি—না।

ঠাকুর বলিলেন—**ভগবান্ সর্ব্বভূতে রয়েছেন। হিংসা কর্‌তে নাই, কোনও প্রাণীকেই কষ্ট দিতে নাই। মানুষ তা পারে না বটে, কিন্তু খুব সাবধান হ'তে হয়। আজ তুমি প্রাণী হিংসা করেছ, কতকগুলি প্রাণীকে খুব ক্লেশ দিয়াছ তাই ভগবান্ বোলতার ভিতরে থেকে তোমাকে জানায়ে দিলেন।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্মরণ হইল আজ কতকগুলি প্রাণী হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি। ঠাকুরকে বলিলাম—আজ সকালে আসনে অসংখ্য পিঁপ্‌ড়া উঠেছিল, একটি একটি ক'রে তুলে ফেলা যায় না। তাই অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে ফেলেছিলাম। তা'তে অনেকগুলি মারা গিয়াছে। আপনার আহারের সময়েও চিনি বাছিতে কতকগুলি পিঁপড়ার হাত পা ভাঙা গিয়াছে।

ঠাকুর—**যাক্, ভগবানের বড় দয়া। তোমার দোষ দেখেই তিনি এই শিক্ষা দিলেন। পুনঃ পুনঃ বোল্‌তা এসে একই স্থানে না কামড়ালে তোমার মনোযোগ হ'ত না, এতে তোমার এ পর্য্যন্ত হিংসা জনিত সমস্ত অপরাধ কেটে গেল।**

ঠাকুরকে আমি বলিলাম—একবার ছোটবেলা, তখন আমি নেংটা থাকি, একদিন বৃষ্টির পর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি ছাঁচতলায় জল জমিয়াছে। একটি কেঁচো জল হইতে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না। আমি একটি কাঠি দ্বারা উহাকে জলের উপর তুলিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখিলাম অসংখ্য বড় বড় লাল পিঁপড়ায় উহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে, কেঁচোটি ছট্‌ফট্ করিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইল; মনে হইল, আমি যদি জল হইতে উহাকে না তুলিতাম, কেঁচোটির এ দশা হইত না। কেঁচোটিকে বাঁচাইবার অন্য উপায় নাই বুঝিয়া উহাকে আবার জলে ফেলিলাম। তখন কতকগুলি পিঁপড়া জলে ডুবিয়া মরিয়া গেল, কতকগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। জলের উপরের পিঁপড়াগুলিকে বাঁচাইতে, জল হইতে একটি একটি করিয়া তুলিতে লাগিলাম। কয়েকটি পিঁপড়ায় আঙ্গুলে কামড়াইয়া দিল, তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া সরিয়া পড়িলাম। কেঁচোটির যন্ত্রণার চিত্র এখনও সময়ে সময়ে মনে হয়—ভুলিতে পারি নাই। ছেলেবেলা সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশে কচ্ছপ মৎস্যাদি ধরেছি—কত মেরেছি। তারপর আর একটি গুরুতর অপরাধ ক'রেছিলাম, এখনও সর্ব্বদা তা মনে হয়—ভুলিতে পারি না। একদিন আমার মাতাঠাকুরাণীর আহারের সময়ে একটি বিড়াল ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ কর্‌লো। বিড়ালটিকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা ক'রেও পার্‌লাম না। তখন একখানা মোটা কাঠ বিড়ালের গায়ে ছুঁড়ে মার্‌লাম। কাঠখানা বিড়ালের ঘাড়ে পড়্‌ল। অমনি বিড়ালটি প'ড়ে গেল, নাক কান দিয়ে রক্ত ছুট্‌ল —গর্ভবতী ছিল—পেটের ভিতরে ছানাগুলি নড়চড় ক'রতে লাগল। বড়ই কষ্ট হ'ল; অমনি পুরোহিত এনে বিড়ালের ওজনে লবণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম। সজ্ঞানে জীবনে আর কখনও জীবহত্যা ক'রেছি ব'লে মনে হয় না। ঠাকুর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং **'যাক্, যাক্'** বলিয়া আমাকে থামাইয়া কহিলেন—

তুমি খুবই অন্যায় করেছিলে। উঃ কি ভয়ানক। যা হ'ক, সেজন্য আর তোমার কোনও শাস্তি পেতে হবে না। বোলতার কামড়েই তোমার সকল অপরাধের শাস্তি হয়ে গেল। এ পর্য্যন্ত যত হিংসা করেছ, ওতে সমস্তই নষ্ট হ'য়ে গেল। এখন আর তোমার কোন পাপই

নাই। এখন হ'তে খুব সাবধান হ'য়ে চল। আর কখনও হিংসা ক'রো না। একটি গাছের পাতাও বৃথা ছিঁড়বে না। কারও প্রাণে আঘাত দিবে না। কটুবাক্য দ্বারা কারও প্রাণে দারুণ আঘাত দেওয়াও প্রাণী হিংসার তুল্য পাপ, এটি মনে রেখো।

আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরের কৃপা— প্রত্যেক্ষ অনুভূতি—দৈনিক পাপ স্খালনার্থ পঞ্চসূনার উপদেশ।

আশ্চর্য্য দেখিলাম! ঠাকুরের বাক্যমাত্রে আমার দেহটি হাল্‌কা বোধ হইতে লাগিল। শরীরের যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। চিত্তে প্রফুল্লতা ও মনে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের অসীম দয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলাম। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণীহত্যা করিতেছি, অসংখ্য জীবের ক্লেশের কারণ হইতেছি। সমস্ত জীবনের সৎকার্য্য ও পুণ্যের ফলেও বোধ হয় একটি দিনের দুষ্কার্য্য ও অপরাধের স্খালন হওয়া সম্ভব নয়। ২/১টি সামান্য বোল্‌তার কামড়ে আর কতটুকু পাপের দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তই বা হইতে পারে। সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনাও তো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর অঙ্গভঙ্গের ক্লেশের সহিত তুলনা হয় না। ঠাকুর নিজেকে আড়ালে রাখিয়া আমাকে কৃপা করিতে যাইয়া বোল্‌তার কামড় উপলক্ষ কবিলেন—ইহা পবিষ্কার বুঝিলাম। বহুক্ষণ হয় বোল্‌তায় আমাকে দংশন করিয়াছে, সেই হইতে দৈহিক দারুণ যাতনা ও মানসিক বিষম উদ্বেগ ভোগ করিতেছিলাম। ঠাকুরের বাক্য মাত্রে তাহা অকস্মাৎ অবসান হইল, দেহ মনে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। ইহাতো কল্পনা নয়, কোন প্রকার ভাবুকতাও নয়; সন্দিগ্ধ চিত্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যে ঠাকুরের বাক্যে এত বল, প্রাণে এত দয়া, তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন— তাঁর আশ্রয় আমি পাইয়াছি—আমার মত সৌভাগ্যবান্ কে? আমার আর চিন্তা কি? জিজ্ঞাসা করিলাম—সমস্ত পাপের ফল যদি মানুষকে ভোগ কর্‌তে হয়, তা'হলে একটি দিনের ভোগও একটি জন্মেও শেষ হয় না—উপায় কি?

ঠাকুর—**উপায় সমস্তই ঋষিরা করে গেছেন। প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চসূনা কর্‌লে পঞ্চসূনা জনিত দৈনিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, দেহ প্রবিত্র হয়, চিত্তও নির্ম্মল হয়।** পঞ্চসূনা কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—**চুল্লি, জলকুম্ভ, উদূখল, ঝাঁটা ও শিলনোড়া—এই পাঁচটির দ্বারা জীবহত্যা অনিবার্য্য ব'লে, এই পাঁচটিতে ভগবানের পূজা কর্‌তে হয়। প্রতিদিন সকালে চুল্লী লেপে পরিষ্কার ক'রে জলের কলসী মেজে, উদূখল বা ঢেকি পরিষ্কার ক'রে, ঝাঁটা ও শিলনোড়া ধুয়ে ফুল, চন্দন, জল দিয়ে পূজা ক'রে নমস্কার করতে হয়। এটি সমস্ত গৃহস্থেরই নিত্য কর্ত্তব্য। পঞ্চযজ্ঞও প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী প্রতিদিন করতে হয়। এ সকল লোপ পাওয়াতেই যতপ্রকার অনর্থ ঘট্‌ছে।**

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া পঞ্চসূনা ও পঞ্চযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিলেন।

ঠাকুরের দৈনিক কার্য্য। ফাঁড়াকাটা। কুতুর আরতি—সঙ্কীর্ত্তন।

আষাঢ় মাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের অন্তরে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কোন দিন, কোন সময় ঠাকুরের কি হয়! ঠাকুর সকালে কুটীরে, মধ্যাহ্নে আমতলায় এবং সন্ধ্যার পর রাত্রিতে পূবের ঘরে আপন আসনে অবস্থিতি করেন। মধ্যাহ্নে বৃষ্টি ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিলে ঠাকুর আমতলায় না গিয়া পূবের ঘরেই থাকেন। সকালে চা সেবার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ হয়; বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত অনেক গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের নিকটে বসিয়া উহা শ্রবণ করেন। গ্রন্থসাহেব ও ভাগবতাদি পাঠের পর ১১টার সময় ঠাকুর শৌচে যান। পাতকুয়া তলায় সাধারণের পাকা পায়খানাই ঠাকুর ব্যবহার করেন। শ্রীধর জল তুলিয়া দেন এবং কৌপীন বহির্ব্বাস কাচিয়া আনেন। শ্রীধর অসমর্থ থাকিলে বা অনুপস্থিত হইলে এই কাজ আমাকে করিতে হয়। পণ্ডিত মহাশয় ও নবকুমার বাবুর আশ্রমত্যাগের পর ঠাকুরকে আবার পূবের ঘরেই আহার করিতে দেওয়া হইতেছে। ১২টার সময়ে তিলকসেবার পর ঠাকুর আহার করেন। অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে কেহ থাকেন না। গুরুভ্রাতারা অনেকে আপন আপন কার্য্যস্থলে চলিয়া যান। আশ্রমবাসী গুরুভ্রাতারা আহারান্তে নিজ নিজ আসনে বিশ্রাম করেন। পাড়ার গুরুভগ্নীরা ও কখনও কখনও সহর হইতে মেয়েরা মধ্যাহ্নে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। মহাভারত পাঠ ২টার মধ্যেই হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের জটা বাছিয়া থাকি অথবা হাওয়া করি। অপরাহ্নে প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুর সমাধিস্থ থাকেন। আজ নিয়মিতরূপে যথা সময়ে মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল—ঠাকুর সমাধিস্থ। বেলা প্রায় ১টার সময়ে ঠাকুরের শরীর স্থির নিশ্চল, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্নমাত্র নাই দেখিলাম। আমি পাঠ বন্ধ করিয়া ঠাকুরকে হাওয়া করিতে লাগিলাম। তিনটার সময় ঠাকুর মাথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—**সকলে এসে আ...কে অনেক দূর নিয়ে গেলেন। পরমহংসজী তাঁদের বল্লেন—'একে আরও কিছুকাল দেহে থাক্‌তে হবে।—অনেক কাজ করবার রয়েছে।' এই বলে তিনি আমাকে এনে আবার দেহে প্রবেশ করায়ে দিলেন।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বিষম উদ্বেগের শান্তি হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাহারা আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কোথায় নিয়েছিলেন?

ঠাকুর—**কত দেবদেবী, ঋষি-মুনি ছিলেন। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিলাম না। কত পাহাড় পর্ব্বতে সুন্দর সুন্দর স্থানে বেড়িয়েছিলাম।**

বিকালবেলা বহু লোক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার

অবসর পাইলাম না। ঠাকুর সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আসন হইতে উঠিয়া শৌচে গেলেন। তৎপরে আর আর দিনের মত মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কুতুবুড়ী শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপধুনা ও পঞ্চপ্রদীপাদি লইয়া প্রতিদিনের মত মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। মহাসমারোহে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রত্যহই সঙ্কীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাভগ্নীদের ভাবাবেশ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাহা লিখিতে গিয়া আক্ষেপ হয়; কিছুই প্রকাশ করা যায় না। অতিশয় লজ্জাশীলা অল্পবয়স্কা কুলবধূরাও গুরুজনের সমক্ষে আত্মসংবরণ করিতে পারেন না। তাঁহারা অনেকে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে, বহু জনতার ভিতরে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া পড়েন। সকলেই মত্ত, ভেদাভেদ অধিকাংশ সময়েই থাকে না।

সাধনের অবস্থা— প্রত্যক্ষ অনুভূতি। নিজের উন্নতি না দেখা অকৃতজ্ঞতা।

ঠাকুরের কৃপায় আষাঢ় মাসটি ভালই গেল। নাম করিতে ভিতরে যে বিষম শুষ্কতা ও দারুণ জ্বালা অনুভব হইত তাহা এখন আর নাই। ঠাকুরের কৃপায় নামে এখন আনন্দ পাই। স্থির ভাবে সরুনালে নাম করিতে আরম্ভ করিলে মনটিকে ধীরে ধীরে ভিতরদিকে টানিয়া নেয়; বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। উত্তরোত্তর নামের আনন্দে নিবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি। সমস্ত স্মৃতির অবসান হওয়ায় নামটিই আমার অস্তিত্ব—এরূপ অনুভব হইতে থাকে। অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ দর্শনের নূতনত্বেও চিত্ত আকৃষ্ট হইতে চায় না। নাম ব্যতীত সমস্তই অভিনিবেশের অন্তরায় বলিয়া মনে হয় এবং উহাতে প্রত্যেকটি নামে নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিতে বিঘ্ন বোধ হয়। নাম করি—না অপর শক্তিতে করায়—তাহাও বুঝিতেছি না। স্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়—উহা আমি শ্রবণ করি—এইমাত্র অনুভব হইয়া থাকে। জপকালে নামের অর্থ-ধ্যানে বা তাৎপর্য্য—স্মরণে প্রবৃত্তি হয় না। নাম শুধু অক্ষর নয় বা শব্দ নয়—শক্তিযুক্ত সারবান্ কিছু—এইরূপ মনে হয়। বীজসংযুক্ত সমস্ত নাম অথবা তাহার একাক্ষর স্মরণকালে কখনও কখনও একই প্রকার বোধ হয়। ঠাকুর গায়ত্রীজপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। উহা করিয়া উপকার পাইতেছি। গায়ত্রী ও ইষ্টমন্ত্রে প্রায় একই রকম কার্য্য করে দেখিতেছি। গীতা ও চণ্ডী প্রত্যহ পাঠ করি। সংস্কৃত জানিনা বলিয়া উহার অর্থ বুঝি না। বুঝিতে তেমন প্রবৃত্তিও হয় না। আবৃত্তি মাত্র করিয়া যাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ। ঋষিপ্রণীত সমস্ত শাস্ত্রই ভগবানের রূপবর্ণনা।** ঠাকুরের এই কথা শোনার পর হইতে পাঠকালে মনে হয়—যাবতীয় সত্যই ভগবানের রূপ, শাস্ত্র সত্যেরই বর্ণনা মাত্র—চিদ্ঘন সত্যস্বরূপ ভগবানের রূপেরই কোন অঙ্গের স্তব করিতেছি। ইহাতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টধ্যান প্রস্ফুটিত হয়। কখনও কখনও সঞ্চারীভাবের আধিক্যে শ্লোকসমূহ মন্ত্র বলিয়া মনে হয়, বুঝি আর নাই বুঝি, ঋষিবাক্য শ্রবণ করিলেই ভিতর যেন ঠাণ্ডা হইয়া যায়, অন্তরে

বিমল আনন্দ অনুভব করি। ঋষিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া নানা মতবিরোধ ও অশান্তি। কিন্তু দয়াল ঠাকুর আমাকে ভাষাজ্ঞানশূন্য করিয়া শব্দমাত্র শ্রবণে তৃপ্তিপ্রদান করিতেছেন। মলিন অন্তরে শাস্ত্রোক্ত সদাচারে আকর্ষণ যদিও আমার জন্মিতেছে না, তথাপি ইষ্টবীজের অঙ্কুরোদ্‌গমে উহা একান্ত আবশ্যকীয় মনে হয়। এতকাল কামের উৎপাত ভজনপথে বিশেষ বিঘ্নজনক মনে করিতেছিলাম কিন্তু এখন লোভ তদপেক্ষাও বহুগুণে অনিষ্টকর দেখিতেছি। ঠাকুরকে ভালমন্দ সমস্তই জানাইলাম; ঠাকুর কহিলেন—**নিজের ভিতরে দোষগুলি যেমন দেখ্‌বে উন্নতি কতটা হ'ল তাও সেইপ্রকার দেখ্‌তে হয়। নিজের যথার্থ উন্নতি না দেখ্‌লে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হয়। সাধন ভজনেও উৎসাহ থাকে না। ক্রমে অবিশ্বাস জন্মে। সর্ব্বদা এসব বিচার ক'রে চল্‌বে।**

আমি—নিজের উন্নতি দেখা নাকি অনিষ্টজনক?

ঠাকুর—**না, না, তা না দেখলে হ'বে কেন? অভিমানই অনিষ্টজনক। রিপুর হাত হ'তে মানুষ একদিনেই নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু তা'তে লাভ কি? তেমন আর একটা ধর্‌তে না পেলে, থাক্‌তে পার্‌বে কেন? পাগল হয়ে যাবে।**

আজ ঠাকুরের সঙ্গে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল—বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম।

ঠাকুরের জটা ছিঁড়িবার চেষ্টা—ন্যাস চাহিতে নস্য দেওয়া—অবাক কাণ্ড। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে আদেশ।

মহাভারত পাঠকালে প্রত্যহই ঠাকুর কি যেন এক অমৃতপানের নেশায় বিভোর হইয়া পড়েন। আজ ঠাকুরকে অতিশয় অভিভূত দেখিয়া মহাভারতপাঠ সংক্ষেপ করিলাম এবং ধীরে ধীরে ঠাকুরের জটা বাছিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিলেন—**না, না জটা খুলে কাজ নাই**। আমি কহিলাম— কি বল্‌লেন বুঝ্‌লাম না। ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া মাথা তুলিলেন এবং কহিলেন—**দেখ্‌ছ না। কেমন দুষ্টু। আমার জটা ছিঁড়ে দিতে চায়। বারংবার নিষেধ কর্‌লেও শুন্‌ছে না। একবার যদি একটু সায় দেওয়া যায়, তা হ'লে কি রক্ষা আছে? সবগুলি জটা ছিঁড়ে দেবে।**

শ্রাবণ ১২৯৯।

আমি—কিরূপে ছিঁড়বে? আমি যে এখানে রয়েছি।

ঠাকুর—**তোমার দ্বারাই ছেঁড়াবে। যখনই আমার নেশার মত হয়, তখনই এঁরা এসে আমাকে ধ'রে টানাটানি করেন। একটু আল্‌গা দিলেই দফা শেষ। কি কাণ্ড।** ইহা বলিয়াই

ঠাকুর আবার ঢলিয়া পড়িলেন। আমি কিছুক্ষণ জটা বাছিয়া ঠাকুরের পাশে নিজ আসনে বসিয়া রহিলাম। কিছু সময় পরে ঠাকুর একটু মাথা তুলিয়া ঢুলু ঢুলু অবস্থায় আমার সাম্‌নে হাত পাতিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—**ন্যাস দেও, ন্যাস দেও**। ঠাকুর ইহা বলিয়াই ভাবাবেশে আবার ঢলিয়া পড়িলেন। আমি আসন হইতে উঠিয়া বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াইয়া নিকটস্থ লোহারপোলে উপস্থিত হইলাম, এবং মস্‌লিপটাম্ নস্য এক কৌটা কিনিয়া ঠাকুরের নিকটে আসিলাম। দেখিলাম ঠাকুর একই ভাবে আমার আসনের সাম্‌নে হাত পাতিয়া সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। একটু পরে মাথা তুলিয়া আবার বলিলেন—**দিলে না? দেও ন্যাস দেও**। আমি অমনি কতকটা নস্য ঠাকুরের হাতে ঢালিয়া দিয়া বলিলাম 'এই নিন্ নস্য'। ঠাকুর উহা হাতে লইয়াই আবার ধ্যানস্থ হইলেন। একটু পরে মাথা তুলিতেই আমি বলিলাম—নস্য আপনার হাতে দিয়েছি। একবার নাকে টেনে দেখুন কি রকম। ঠাকুর উহা আঙ্গুলের টিপে ধরিয়া অভিভূত অবস্থাতেই নাকে টানিয়া নিলেন। নাকের ভিতর নস্য প্রবেশ মাত্র হাঁচির উপরে হাঁচি হইতে লাগিল। ভাবের নেশা বোধ হয় ছুটিয়া গেল—হাঁচির উপরে হাঁচি দশ বারটি দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং আমাকে বলিলেন—**এ কি দিয়েছ?**

আমি—আপনি চেয়েছিলেন, তাই নস্য এনে দিয়েছি। আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব উচ্চশব্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমিও বোকার মত না বুঝিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিতে লাগিলাম। হাসিতে হাসিতে আমার পেটে ব্যথা ধরিল। অতি কষ্টে আমাদের হাসির বেগ থামিল। পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হাস্‌লেন কেন? ঠাকুর কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, আরও হাসিতে লাগিলেন। পরে একটু সামলাইয়া নিয়া কহিলেন—**তোমার নিকট ন্যাস চেয়েছি, তুমি নস্য এনে দিয়েছ, বেশ। কেন, তুমি শুন নাই? ব'লে গেলেন কুলদার ন্যাস আছে চেয়ে নেও। তুমি যেমন বোকা।**

আমি—আপনি দেখে শুনে নস্য টেনে নিলেন আর আমি বোকা হলাম? ন্যাস আবার কি? আমি তো নস্য মনে ক'রে লোহারপোল থেকে নস্য এনে দিয়েছি।

ঠাকুর—**ন্যাস কি জান না? অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, তোমার তা আছে—চেয়ে নিতে ব'লে গেলেন।**

আমি—কে ব'লে গেলেন? আমার তো কিছু নাই।

ঠাকুর—**হাঁ তোমার আছে। এই যে পরমহংসজী এসেছিলেন, ব'লে গেলেন**—এই মাত্র কহিয়া ঠাকুর শ্রীমদ্‌ভাগবতখানা আনিতে বলিলেন; আমি উহা ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিলাম। ঠাকুর আমাকে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলেন! আমি পড়িলাম। ঠাকুব কহিলেন—**অর্পণকে ন্যাস বলে। তুমি প্রত্যহ এই ভাবে ন্যাস ক'রো।**

আমি বলিলাম—প'ড়ে কিছুই তো বুঝলাম না—কি ভাবে কর্‌তে হবে? ঠাকুর তখন ঐ অধ্যায়ের শেষ অংশের কয়েকটি শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ; ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস কি ভাবে করিতে হয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন; এবং কহিলেন—**ন্যাসের পর নিজেকে তন্ময়রূপে ধ্যান কর্‌বে, সেই ভাবেই থাক্‌তে চেষ্টা ক'রো।** আগামী কল্য হইতেই এইভাবে ন্যাস করিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্বে প্রতিদিন এইভাবে সারাজীবন আমাকে ন্যাস করিতে হইবে, ঠাকুর এইরূপ বলিলেন।

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই ন্যাস করায় কি হয়?

ঠাকুর কহিলেন—**কর্‌লেই ক্রমে বুঝ্‌বে।**

ঠাকুরের অসাধারণ কৃপায় বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। একটু পরে ঠাকুর আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—**এ সকল আজকাল কেহ জানে না, করেও না। আর শ্রদ্ধা ক'রে করে না ব'লে কেহ জানলেও শিক্ষা দেন না। এসব করায় যে কত উপকার, কর্‌লেই বুঝা যায়। শিক্ষার কত বিষয় রয়েছে। সকলই লোপ পেয়ে গেল। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একটি লোকেও যদি কর্‌তো, কত ছিল; শিক্ষা দেওয়া যেত। বড়ই কষ্ট হয় এসব শিক্ষা দেবার মত কারোকে পেলাম না।**

ইহা বলিয়া একটু পরেই ঠাকুর চোখ বুজিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমি মনে মনে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর! যাহা তোমার ইচ্ছা দয়া ক'রে শিক্ষা দেও। প্রাণপণে আমি চেষ্টা করিয়া যাইব।' শ্রীমদ্‌ভাগবতে যাহা পড়িলাম এবং ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম, এই ন্যাস যথামত করিতে পারিলে আমাদের মন্ত্রের তাৎপর্য্য ও সাধনের লক্ষ্য অতি সহজে সুসিদ্ধ হয়।

ইতিপূর্ব্বে আরও দু'দিন মহাভারত পাঠের পর ঠাকুর আমাকে এই অধ্যায় পাঠ করিতে বলেন। একই অধ্যায় দু'দিন ঠাকুর পাঠ করাইলেন কেন, তখন কিছুই বুঝি নাই। এখন আমার মনে হইতেছে, ঠাকুর এই সাধন আমাকে দিবেন পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁর কৃপা, তাঁর সহানুভূতি আমার কোন প্রকার অবস্থারই অপেক্ষা করে না। ধন্য গুরুদেব! তোমার আশ্রয় লাভ মাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছি—এটি বুঝিবার জন্যই এই সকল সাধনপ্রণালী; তা ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই নয়।

নমস্কারের বিধি ও নিষেধ।

আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুর পূবের ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, একটি গুরুভ্রাতা আসিয়া ঠাকুরের আসনের সাম্‌নে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর একটু চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিলেন—

একি? সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে পড়্‌লেই নমস্কার হ'লো? এদের একটা কিছু জ্ঞান নাই। নমস্কার যদি ভাবের সহিত করে, উভয়েরই উপকার, না হ'লে যিনি করেন এবং যাঁকে করেন উভয়েরই ক্ষতি হয়।

আমি বলিলাম—নমস্কার আমার আসে না। আমি কারোকেই নমস্কার কর্‌তে পারি না। কিন্তু স্বপ্নে দেখ্‌লাম, খুব ভাবের সহিত এখানে নমস্কার কর্‌ছি, আপনি আশীর্ব্বাদ করছেন।

ঠাকুর—**ওরূপ দেখা খুব ভাল। শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত না করলে নমস্কার ক'রো না, ওতে ক্ষতি হয়। ভাবের সহিত করলে উপকার পাবে। নাম কর, নামেই সব হয়। নাম করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা; যিনি সর্ব্বদা নাম করেন, তিনিই যথার্থ সেবা করেন।**

স্বপ্ন—সংসার-শিশুকে ছুঁড়ে ফেল্‌তে হবে।

ঠাকুরকে এইরূপ বলিলাম—একটি স্বপ্ন দেখে মনটা যেন কেমন হযে গেছে, অর্থ কিছুই বুঝি না।

ঠাকুর কহিলেন—**কেন, তুমি তো বেশ ভাল ভাল স্বপ্ন দেখ। কি দেখ্‌লে?**

আমি স্বপ্নটি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম—কোন স্থানে পঁহুছিব সংকল্প করিয়া বাহির হইলাম। কিছুদূর গিযা দেখি, আপনি চৌমাথায় দাঁড়ান। চারটি পথের একটি দেখাইয়া বলিলেন—**এই পথ ধরে সোজা চলে যাও—ঠিক স্থানে গিয়ে পৌঁছিবে।** আমি চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ভয়ঙ্কর বাঘের গর্জ্জন শুনিয়া দাঁড়াইলাম। অনুপায় দেখিযা রাস্তার পাশে একটি প্রাচীরের উপরে উঠিলাম। বাঘ অন্য শিকার পাইয়া তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিল, আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি প্রাচীর হইতে নামিয়া দেখি, আপনি আমার পিছনেই ছিলেন। **ভয় নাই, ভয় নাই** বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি সম্মুখে আর একটি পরিষ্কার প্রশস্ত পথ দেখিয়া সেই পথে চলিব, স্থির করিলাম। কয়েক পা চলিয়াই দেখি, সুন্দর একটি শিশু বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হাত বাড়াইতেছে। আমার বড়ই দযা হইল। শিশুটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম। এই সমযে দেখি আর একটি প্রকাণ্ড বাঘ। সে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। ছেলেটির জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহাকে খুব আঁক্‌ড়াইয়া ধরিলাম। বাঘ আমার সামনে আসিয়া থাবা পাড়িল এবং আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমি তখন বিষম বিপদ্ বুঝিয়া ঘাড়ের ছেলেটিকে পিছনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং বাঘের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া নাম করিতে লাগিলাম। বাঘটি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ করিল এবং আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে পড়িয়া বাঘটি ক্রমশঃ ছোট হইতে লাগিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে

বাঘটি বিড়াল হইয়া গেল। তখন উহাকে দু'এক ঘা মারিতেই মরিয়া গেল, আমিও অমনি জাগিয়া পড়িলাম। এই স্বপ্নটির তাৎপর্য্য কি, কিছুই বুঝিতেছি না।

শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন—**ঠিক্ দেখেছ। খুব সত্যি; এরূপই হয়। লিখে রেখো। ছেলেটিকে ছুঁড়ে না ফেল্‌লে তোমাকে ঐ বাঘে খেতো। ছেলেটি সংসার। স্নেহ-শিশুর রূপ ধারণ ক'রে আছে। উহাকেই কাঁধে নিয়ে চল্‌ছ। ঐ বাঘে সংসারীকেই বিনাশ করে। ঐভাবে বাঘের প্রতি দৃষ্টি করায় যে বিড়ালের মত হ'লো, তাও সত্য। বাঘও বিড়াল হয়। খুব তীব্র বৈরাগ্য না জন্মালে সংসার ছাড়ে না সাবধান।**

মহাপুরুষদের কল্পনাতীত দারুণ ভোগ।

আজ ঠাকুর মগ্নাবস্থায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— **উঃ, কি কষ্ট। কি কষ্ট। দেখা যায় না। পিতামাতার উপরে কি বিষম অত্যাচার। কি ভয়ানক। সমস্ত সংসারেই ধর্ম্মের গ্লানি। আর এখানে থাক্‌তে চাই না। ভগবান্। এবার সব শেষ কর। সরায়ে নেও—আর দেখ্‌তে পারি না। উঃ।**

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন চোখ মুখ পুঁছিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সংসারের দুরবস্থা দেখে মহাত্মারাও ক্লেশ পান?

ঠাকুর—**ক্লেশ মহাত্মারা পান না ত কে আর পান? এসব দেখে তাঁরা যে কষ্ট পান্ তা অন্যে কল্পনাও কর্‌তে পারেন না। সংসারী লোকে তার এক আনিও পায় না। সাধে কি আর মহাত্মারা চলে যান? এসব দেখে সহ্য কর্‌তে পারেন না। চক্ষে পড়ে, না দেখেও উপায় নাই। সমস্ত সংসার পাপে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। ধর্ম্ম আর নাই।**

আমি—এই সংসার ছেড়ে গেলেই কি এসব আর তাঁদের চক্ষে পড়বে না?

ঠাকুর—**এ সংসার ছেড়ে গেলে, এসব দেখ্‌তে তাঁরা এখানে আস্‌বেন কেন? যেখানে থাকেন সেখানকার অবস্থাই দেখেন।**

সহানুভূতিহেতু মহাত্মারা সংসারীলোকের জন্য যে কষ্ট ভোগ করেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। মনে হইল, ক্লেশ ভোগই যদি হয়, তা' হ'লে আর মহাত্মা হ'য়েই বা লাভ কি? ক্লেশের অনন্তনিবৃত্তির জন্যই ত' ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বরং আমরা ঢের ভালই আছি, নিজেদের ভোগমাত্র নিজেরা ভুগ্‌ছি। মহাত্মারা যে অসংখ্য জীবের ভোগ ভুগছেন। আমাদের অপেক্ষা মহাত্মারা সুখী কিসে. ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেই স্মরণ হ'ল, ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন—**আনন্দও**

তাপ। এই কথার অর্থ তখন ঠাকুরের কথায় বুঝিযাছিলাম, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পরে জড়িত। যার যত দুঃখ বোধ, তার তত সুখের অনুভূতি। বিচ্ছেদে যার যত ক্লেশ, মিলনে তার তত আনন্দ। ক্লেশেব স্মৃতি বা সংস্কার না থাকিলে আনন্দের অনুভূতি কি প্রকারে হইবে? দৃশ্যবস্তু বিষয়ে সংস্কারবর্জ্জিত জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও দর্শনের আনন্দ বা দর্শনাভাবের দুঃখ জানে না। ভগবৎপদাশ্রিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা সুখ দুঃখ ও আনন্দ নিরানন্দের অতীত। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সুখ দুঃখাদি অঙ্গীকার কবেন। আবার প্রত্যাহার করাও তাঁহাদেবই ইচ্ছাধীন, সাধারণের সেরূপ নয়। সাধারণে বদ্ধ, আর মহাত্মারা মুক্ত। যাহারা মায়ার অধীন, প্রাবব্ধের অধীন, ছোটই হউক বা বড়ই হউক, তাহাদের সকলেরই সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, গড়ে ঠিক একই প্রকার।

ঠাকুরকে বলিলাম—ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে গুরুগীতা পাঠ করিতে লাগিলাম। নমস্কারমন্ত্র পাঠ যেমন শেষ হইল, অমনি জাগিয়া পড়িলাম। আর একদিন ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় প্রাণায়াম কুম্ভকও চলিতে থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—**এ সব খুব ভাল। দিবসের ঐরূপ নিত্যকর্ম্মগুলি যখন নিদ্রাতেও হবে, তখনই ঠিক্ হ'লো। ওরূপ হ'লে বাসনা কামনা সমস্তই নষ্ট হ'য়ে যায়। ক্রমে ক্রমে নামও নিদ্রাতে হয়। এসব প্রকাশ কর্‌তে নাই, নষ্ট হ'য়ে যায়।**

তৃতীয় বৎসরে ৪ বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দান। ৬ বৎসরেই পূর্ণ হবে।

২০শে শ্রাবণ, শুক্লাদশমী।

অদ্য প্রত্যূষে স্নান করিয়া নূতন উপবীত ও স্ফটিকের মালা লইয়া মন্দিরের সম্মুখে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরকে বলিলাম—গতকল্য আমার ব্রহ্মচর্য্য দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

ঠাকুর বলিলেন—**বেশ, এখন কি চাও?**

আমি—আপনি যা বলবেন। যদি ব্রহ্মচর্য্য আবার দেন, তাই করবো।

ঠাকুর বলিলেন—**ব্রহ্মচর্য্য যা দিয়েছি, তাই কর। ব্রহ্মচর্য্যের যে সকল নিয়ম বলা হ'য়েছে, এখন হ'তে খুব উৎসাহের সহিত তাই কর্‌বে! ব্রহ্মচর্য্য কিছু দীর্ঘকাল না কর্‌লে কিছুই ঠিক্ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যই সকলের গোড়া। এটি ঠিক্ হ'লে অন্যান্য সাধন কিছুই কঠিন নয়। বার বৎসরের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য প্রায় হয় না। নয় বৎসর কর্‌লেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য হ'য়ে যাবে বলেছিলাম—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি ততদিনও লাগ্‌বে না; এভাবে চল্‌লে ৬ বৎসরেই তোমার ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ হবে। দুই বৎসর হ'য়েছে—এখন ৪ বৎসরের জন্য নেও। ছয় বৎসর**

পূর্ণ হ'লে আমাকে জানাইও। ইচ্ছা হ'লে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারবে। ছয় বৎসর ঠিকমত ব্রহ্মচর্য্য করলে এর পর অন্যান্য সাধন স্পর্শ-মাত্র হ'য়ে যাবে। বিশেষ চেষ্টাও করতে হবে না। ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের ভিত্তি। এটি ঠিকমত হ'লে আর কোন উৎপাতই থাকে না। রিপু ছয়টি সংযত করতে পারলেই হলো। কাম ক্রোধাদি রিপুগুলিকে বেশ ক'রে বশ কর। ইন্দ্রিয়সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সাধন। কোনও রিপুর উত্তেজনা ক'মে গেলে তা কোথাও প্রকাশ করতে নাই। প্রকাশ করলে ঐ অবস্থা থাকে না—নষ্ট হ'য়ে যায়। কাম অপেক্ষাও ক্রোধ ভয়ানক। কামরিপু সজন-নির্জ্জন, স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র, সুস্থাসুস্থ বুঝে কাজ করে, কিন্তু ক্রোধের সে সব বিচার নাই। যেখানে সেখানে, যে কোন ব্যক্তির উপরে, সুস্থাসুস্থ যে কোন অবস্থায়, উহা মূর্ত্তিমান হয়। এজন্য ক্রোধকেই চণ্ডাল বলেছেন। ক্রোধের আবির্ভাব মাত্রে সাধক পতিত হয়। ক্রোধটিকে একেবারে দমন করার চেষ্টা কর। লোভের জন্য চিন্তা ক'রো না—ও ঠিক হ'য়ে যাবে। একবারেই ত সব হয় না। নিয়মমত কাজ ক'রে যাও—ধীরে ধীরে সমস্তই ঠিক্ হ'য়ে আসবে। এখন হ'তে অধ্যয়ন কমায়ে দাও। গুরুগীতা এবং এক অধ্যায় ভগবদগীতা নিত্য পাঠ করো। গীতার একটি ক'রে শ্লোক রোজ মুখস্ত করো। সর্ব্বদা নাম করবে। নামে ডুবে থাকবে। নামে যখন অবসাদ আসবে, তখন কিছু সময় পাঠ ক'রে নিবে। বেশী পাঠ নিষেধ। অধিক পাঠে শুষ্কতা আসে। একথা তোমাকে আরও পূর্ব্বে বলবো মনে করেছিলাম। নামে রুচি জন্মিলে আর কিছু না করলেও হয়। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই হয়।

আহারের নিময় যেমন পূর্ব্বে বলেছি—তাই। তবে এখন হ'তে অন্যের রান্না কোন বস্তুই গ্রহণ করবে না। আর, ভিক্ষা, ব্রাহ্মণের বাড়ী ব্যতীত অন্যত্র ক'রো না। তবে এই সাধনের লোক যে কোন জাতি হউন, তাঁদের নিকটে ভিক্ষা করতে পারবে। অর্থ কারও নিকটেই প্রার্থনা করবে না। অর্থের সংস্রব ত্যাগ করবে। অন্য দশ জন যেমন, দাদাদেরও তেমনি মনে করবে। বিশেষ বলে ভাববে না। নিজের জন্য কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখবে না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি যথামত প্রতিপালন করবে। আরও ৪ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর—তাহা হ'লেই সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে। পরে যা করতে হবে, তখন বলা যাবে।

ঠাকুরের কথা শেষ হইলে স্ফটিকের মালা ও পৈতা নিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর ২/৩ মিনিট উহা ধরিয়া থাকিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন—**এই নেও, ধারণ কর।**

আমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্ফটিক ও উপবীত ধারণ করিলাম। আমার উপরে ঠাকুরের অসাধারণ দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। প্রথম বৎসর ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া

বলিয়াছিলেন—**ব্রহ্মচর্য্য অন্ততঃ বার বৎসর করতে হয়। কিন্তু এই ভাবে চল্‌লে তোমার বার বৎসরও করতে হবে না। নয় বৎসরেই হ'য়ে যাবে। তবে এখন এক বৎসরের জন্য নেও।** দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইলে এবার ঠাকুর কহিলেন— **তোমার নয় বৎসরও কর্‌তে হবে না —ছয় বৎসরেই হয়ে যাবে। এবার চার বৎসরের জন্য নেও।**

গুরুতে একনিষ্ঠাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের একমাত্র প্রয়োজন ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। একাগ্র মনে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিতেছি, যদি তিনি আমার ব্রহ্মচর্য্যে সন্তুষ্ট হন ও কৃপা করেন—তাহা হইলে এই করুন. যেন তাঁর শ্রীচরণ ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমাব আনন্দ, আরাম ও অন্তরের আকর্ষণ না থাকে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই যেন এ জীবনের অবলম্বন হয়। এখন আমার মনে হইতেছে, সর্ব্বগুণের আধার সদ্‌গুরুর উপাসনাই সার। অন্তঃবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ জীবের অনন্ত. অসীমের ধ্যান ধারণা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। আমার স্বতন্ত্র পৃথক্ অস্তিত্ব বোধই আমি অসীম অনন্তকে অন্তঃবিশিষ্ট করিতেছি। আর ক্ষুদ্র আমি, গণ্ডূষমাত্র জলে যদি পিপাসার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করি, তাহা হইলে সাগর শুষিবার অনর্থক প্রয়াসে আমার প্রয়োজন কি? অন্তরের পূর্ণ তৃপ্তিই যখন জীবের একমাত্র লক্ষ্য, তখন তাহা ক্ষুদ্র লইয়াই হউক বা বৃহৎ লইয়াই হউক একই কথা। সমস্ত বাসনার নিবৃত্তির অর্থও, নিজের অস্তিত্বমাত্র অনুভূতিতে পরিতৃপ্তি ইহাই বুঝিতেছি। ভগবান্ কাহাকে বলে. জানি না। শুধু লোকের মুখে শুনিয়া অজ্ঞাত বস্তুর জন্য লোভও জন্মিতেছে না। গুরুদেব! দয়া কর, তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে চিত্ত সংলগ্ন হেতু সমস্ত বাসনার উপশমে যেন চিরশান্তি লাভ করি।

মাঠাকুরাণীর ঝুলন, চণ্ডীপাঠে পূজা।

২৪শে শ্রাবণ
রবিবার।

আজ মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর বলিলেন—**আহা কি সুন্দর। কি শোভাই হয়েছে। ঝুলনের সিংহাসনে ব'সে ভগবতী ঝুল্‌ছেন।**

আমি—কোথায় ভগবতী ঝুল্‌ছেন?

ঠাকুর—**তা কি বলা যায়? চোখে পড়্‌লো, দেখ্‌লাম। বোধ হয় ঢাকায়ই।**

আমি—ঢাকায় ত কোথায়ও ওরূপ ঝুলন দেখি নাই, শুনিও নাই। মা'কে ঝুলনে তুল্‌লে হয় না? মা তো আমাদের আদ্যাশক্তি ভগবতী, শুধু চণ্ডীপাঠ কর্‌লে তাঁর পূজা হয় না?

ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ, তাতেই ঠিক্ হয়। কিন্তু কে পাঠ ক'রবে? তুমি রোজ একটু একটু মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করলে পার। কিন্তু নিত্যকর্ম্মের পূর্ব্বে পাঠ করতে হবে। রোজ এক অধ্যায় ক'রে পাঠ ক'রো।** আগামী কল্য হইতে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ মাঠাকুরাণীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিব স্থির করিলাম।

আজ সকালবেলা হইতেই ছেলেদের মনে মহা উৎসাহ। ঝুলনের সাজসজ্জা করিয়া মাকে দোলায় তুলিতে সকলেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষা। তাহারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পত্র-পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মাঠাকুরাণীর মন্দির ও চৌচালার দক্ষিণদিকের বারান্দা পরিপাটি করিয়া সাজাইল। পরে একখানা জলচৌকি সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি রাধাকৃষ্ণ ঠাকুরের সহিত মাঠাকুরাণীকে বসাইয়া দোলাইতে লাগিল। বড়ই চমৎকার শোভা হইল। ঠাকুর দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ছেলেদের সৎ উৎসাহ ও সৎভাবের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই উৎফুল্ল মনে ছেলেদের উৎসবে যোগ দিলেন। বহুলোকের সম্মিলনে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুরুভ্রাতারা ঝুলন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সকলে সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ করিয়া লুটের প্রচুর প্রসাদ সংগ্রহান্তে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

২৫শে—শ্রাবণ,
ঝুলন পূর্ণিমা।

আমগাছের নালিশ, গায়ে পেরেক মেরেছে।

ঠাকুর প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বলিলেন—**আহা! আমগাছটি বড়ই ক্লেশ পেয়েছে, আমাকে বল্‌লে, আমার বুকে পেরেক মেরে রেখেছে, যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই**। ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা আমতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুরের আসনের উপরে চাঁদোয়া টাঙ্গাইবার জন্য গাছটিতে ছেলেরা একটি লোহা পুঁতিয়া রাখিয়াছে। রক্তের মত লাল রস ঐ স্থান দিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরের আদেশ মত তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া ফেলা হইল। প্রতিদিন ঠাকুর সকালে আসন হইতে উঠিয়া যেমন পাখীদের চাউল ছাড়াইয়া দেন, সেই প্রকার আশ্রমস্থ বৃক্ষলতাদির নিকটে যাইয়াও প্রত্যেকটির খবর লইয়া থাকেন, ইহারা নাকি ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন। স্ব স্ব গণ্ডীতে ইহারাও নাকি ঠিক মানুষেরই মত সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন প্রয়োজনে অনুভবশীল। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির দেহ সংরক্ষণ ও পোষণার্থে পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভগবান্ যেমন চৈতন্য সংযোগ করিয়া দিয়াছেন—বৃক্ষলতা, স্থাবর জঙ্গমাদিরও পুষ্টিসাধনকল্পে তিনি সেই প্রকার তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ ইন্দ্রিয়ে যথাযোগ্য চৈতন্য সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্ভুত ভগবানের সৃষ্টি কৌশল!

২৬শে শ্রাবণ,
৮ই আগষ্ট, ১৮৯২।

ভোজনারম্ভে ঠাকুরের শ্রীহস্ত—আমাকে এক গ্রাস দাও।

আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঠাকুর আহারান্তে পূবের ঘরেই রহিলেন। অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে অন্যান্য দিনের মত কাটাইয়া রান্না করিতে আসিলাম। চাল, ডাল, নুন, লঙ্কা ও ঘৃত

একেবারে উনানে চাপাইয়া খিচুড়ি রান্না করিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন—**রান্না যেমন হ'য়ে যাবে, অন্ন অমনি ঢেলে নিয়ে নিবেদন ক'রে আহার কর্‌তে আরম্ভ ক'রো।** আমি উনান হইতে খিচুড়ি কলাপাতার উপরে ঢালিয়া ঠাকুরকে নিবেদনান্তে নমস্কার করিলাম। পরে উত্তপ্ত খিচুড়ি নাড়াচাড়া করিয়া আহারের জন্য যেমন গ্রাস তুলিতে প্রবৃত্ত হইলাম, হঠাৎ দেখি বাহির হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া সর্‌সর্ শব্দে ঠাকুরের হাতখানা পাতার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর ধীরে ধীরে বলিলেন—**ব্রহ্মচারী। তোমার রান্না অন্ন আমাকেও এক গ্রাস দেও আমি খাবো।** আমি অমনি ঐ গ্রাস ঠাকুরের হাতে দিয়া আরও দিব বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর খাইতে খাইতে বলিলেন—**কি চমৎকার স্বাদ। তোমার মত সুস্বাদু অন্ন এদেশে কেহ খায় না। আর অপেক্ষা ক'রো না। প্রসাদ পাও।** আমি ঠাকুরের কথামত আহার করিতে আরম্ভ করিলাম। ঠাকুরের হাতে একটু জল দিতেও স্মরণ হইল না। ঠাকুর উঠানে দাঁড়াইয়া অন্নের প্রশংসা করিতে করিতে শান্তি, কুতু প্রভৃতিকে বলিলেন—**তোম্রা এক একদিন এক একজনে ব্রহ্মচারীর রান্না এক গ্রাস ক'রে খেয়ে দেখিস্। কি অপূর্ব্ব স্বাদ, বুঝ্‌তে পার্‌বি।** আমাকে কহিলেন—**তোমার আহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ। এক গ্রাসের অধিক দিও না। প্রতিদিন এক গ্রাস্ ক'রে দিও।**

আহারের সময়ে ঠাকুরের দয়া স্মরণ করিয়া কেবলই কান্না পাইতে লাগিল। অকস্মাৎ নিজ হইতে ঠাকুর এই দুরাচার পাষণ্ডকে কেন এত দয়া করিলেন, বুঝিলাম না। ৪/৫ সেকেণ্ড পরে যদি ঠাকুর হাত পাতিতেন, তবে আমি কি করিতাম? কোন্ সময়ে আমি আহার করি কোন প্রকারেই কারও জানিবার উপায় নাই। ঠাকুরের সমস্তই অদ্ভুত! এত কাণ্ড দেখিয়াও মনটি আজও গুরুমুখী হইল না। দুর্দ্দশা আর কাকে বলে?

আমার পরমায়ুঃ পরিষ্কার দর্শন।

২৬শে শ্রাবণ
মঙ্গলবার।

আজ মহাভারত পাঠান্তে আমতলায় ঠাকুরের নিকট বসিয়া নাম করিতেছি, মনটি নামে একেবারে ডুবিয়া গেল। নয়ন মুদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মত দেখিলাম—উজ্জ্বল কাল একখানা চতুষ্কোণ মার্ব্বেল পাথরের 'সাইনবোর্ড' আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরের সম্মুখে আমার নিকটে আসিয়া থামিল। তাহাতে অঙ্কিত একখানি মুষ্টিবদ্ধ হস্ত তর্জনীসঙ্কেতে উজ্জ্বল জ্যোতিঃসমন্বিত নিম্নলিখিত সুবর্ণ অক্ষরগুলি নির্দ্দেশ করিতেছে—"প্রাণায়াম ও কুম্ভকযোগে তোমার পরমায়ুঃ (**) বৎসর।" আমার দেখার পরই 'সাইনবোর্ড' খানা উড়িয়া অদৃশ্য হইল। আমিও অমনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঠাকুরকে সমস্ত জানাইলাম। ঠাকুর কহিলেন—**দেখ্‌লে, সে তো ভালোই হ'লো। তবে যা দেখেছ, ঠিক্ তাই যে হবে—তাও বলা**

যায় না। হ'তেও পারে আবার কোন কারণে নাও হ'তে পারে। সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। ঠাকুরের কথায় মনে হইল, মৃত্যুর একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহাই মাত্র দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর ইচ্ছা করিলে যতকাল তাঁর অভিপ্রায় সংসারে রাখিতে পারেন।

ঠাকুরের জটা বাছা— প্রাণধারণ করিতে জীবহিংসা অনিবার্য্য।

মধ্যাহ্নে পাঠের পর প্রত্যহই কিছু সময় ঠাকুরের জটা বাছিয়া থাকি। সম্মুখে বড় জটাটির গোছার ভিতরে স্থানে স্থানে অসংখ্য ছারপোকা বাসা করিয়াছে, এক একটি আড্ডায় প্রায় ৩০/৪০ টি বা ততোধিক ছারপোকা জড় হইয়া রহিয়াছে। একটিকে তুলিতে গেলে অবশিষ্টগুলি ছুটিয়া পালায় এবং জটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হয়। এই জন্য আড্ডার ছারপোকা তুলিতে বৃথা চেষ্টা না করিয়া, অঙ্গুলিদ্বারা উহা একেবারে ডলিয়া ফেলি। মাথার সর্ব্বত্র যে সকল উকুন ও ছারপোকা চলিয়া বেড়ায়, তাহাই মাত্র ধরিতে পারি। রক্ত খেয়ে ছারপোকাগুলি এত পুষ্ট হয় যে স্পর্শ মাত্রে গলিয়া যায়। এইরূপে প্রত্যহ অসংখ্য প্রাণী বধ করিতেছি। কি করিব? উপায় নাই। ভাবিলাম শরীরের বহুবিধ রোগ অসংখ্য বিজাতীয় অনিষ্টকর কীটাণু সমাবেশেই উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঔষধ প্রয়োগে সে সকলের বিনাশ সাধন না করিলে রোগের শান্তি হয় না। দৈহিক উৎকট ব্যাধির উপশমার্থে প্রাণীবধ অপরিহার্য্য। হিংসা বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রণোদিত নয় বলিয়া তাহাতে অন্তরকে স্পর্শ করে না—পাপ বলিয়াও মনে হয় না; বরং রোগের আরোগ্যে প্রাণে আনন্দই অনুভব হয়। ছারপোকা বাছিবার কালে ঠাকুর ধ্যানস্থ থাকেন। আমি কি করি না করি, তাহাতে ঠাকুরের মনোযোগ না পড়িবারই কথা। কিন্তু গোছা ডলিয়া দিলে ঠাকুর মধ্যে মধ্যে **হরিবোল, হরিবোল** বলিয়া উঠিয়া পড়েন। ঠাকুর সোজা উপবিষ্ট থাকিলে আমি পশ্চাৎদিকে হাঁটু গড়িয়া বসিয়া ছারপোকা দেখি, কখনও কখনও বামপার্শ্বেও বসিতে হয়।

হুঁকা-কল্কিভাঙ্গা—তামাক ত্যাগ। ঠাকুরেরর তামাক সেবন।

গতকল্য ঠাকুর আমার মুখের গন্ধ পাইয়া বলিলেন—**তামাক খেয়ে এসেছ? বড় দুর্গন্ধ।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে নিজ আসনে আসিয়া চুপ করিয়া বসিলাম এবং স্থির করিলাম, কল্য হইতে ধূমপান ত্যাগ করিব; না হ'লে ঠাকুরের অঙ্গসেবা আর করিব না। অদ্য প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিয়া হুঁকা কল্কি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া আনিলাম। পরে ফুল জল দিয়া উহা পূজা করিয়া

নমস্কার করিলাম। তৎপরে কল্কির উপরে হুঁকার খোল দ্বারা সজোরে আঘাত করিয়া দুইটিই চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরের চা-সেবার সময়ে গুরুভ্রাতারা এই কথা তুলিয়া খুব হাসাহাসি করিলেন। তামাক না খাওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—**কি? তুমি হুঁকা কল্কি ভেঙে ফেলেছ? কেন? তামাক খেলে মুখে গন্ধ হয় ব'লে? জটার ছারপোকা যখন বাছ্‌বে, মুখ ধুয়ে নিও—তা হ'লেই গন্ধ থাক্‌বে না। সুগন্ধ তামাক খেলেও তো পার। তাতে তামাকের গন্ধ হয় না। তামাক না খেলে যখন কষ্ট হয়, খাবে না কেন? নিষেধ তো নাই। যাও, এখন গিয়ে এক ছিলিম তামাক খাও।**

অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ঠাকুর বলিলেন—**একটি হুঁকা পেলে আমিও তামাক খেতাম।** ঠাকুরের কথা শুনামাত্র গুরুভ্রাতারা দু'তিন জন বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পটুয়াটুলি ও ইস্‌লামপুর ঘুরিয়া সুগন্ধি তামাক ও একটি হুঁকা নিয়া আসিলেন। ঠাকুরকে তামাক সাজিয়া দেওয়া হ'লো। ঠাকুর তামাকে একটি টান দিয়াই কাশিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। **বাবা। এই নেও—রক্ষা কর।** বলিয়া হুঁকাটি সাম্‌নে ধরিলেন। জগবন্ধুবাবু হুঁকাটি প্রসাদী বলিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য লইয়া গেলেন। উহা লইয়া গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একটু মনান্তর হইল।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি আর কখনও পূর্ব্বে তামাক খেয়েছেন?

ঠাকুর—**হাঁ, আমি যে খুব তামাকখোর ছিলাম। কারোকে তামাক খেতে দেখ্‌লেই তামাক খেতে ইচ্ছা হ'তো। একদিন কলিকাতায় রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে একটি বড়লোকের বাড়ীর দরজায় দারোয়ান তামাক খাচ্ছে দেখে খেতে ইচ্ছা হ'লো। তার খাওয়া শেষ হ'তেই আমি কল্কির জন্য হাত বাড়ালাম। দারোয়ান হিন্দুস্থানী, আমাকে খুব গালি দিয়ে তাড়ায়ে দিলে। আমার বড়ই অপমান বোধ হ'লো। ভাব্‌লাম আমি অদ্বৈতবংশের গোস্বামী; একটু তামাকের জন্য একটা সাধারণ দারোয়ান আমাকে এত গালি দিলে? আর আমি তামাক খাব না। সেই হ'তে আর তামাক খাই নাই। জাতির অভিমান, বংশের অভিমান, এ সকলে অনেক সময়ে মানুষকে রক্ষা করে।** একটু থামিয়া আবার বলিলেন—**যাঁরা শরীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁদের অনেকের তামাক খাওয়া প্রয়োজন হয়। অনেকের তামাকে উপকারও হয়। 'রম্‌তা' সাধুরাও একটা কিছু না হ'লে পারেন না—তাঁদের অনেকেই হয় গাঁজা, না হয় চরস অথবা তামাক খেয়ে থাকেন।**

পূর্ব্বজন্মে নিষ্ফল ব্রহ্মচর্য্য, ঠাকুরের সার উপদেশ—সাধন ভজন জেগে থাক্‌বার জন্য, কৃপাই সার।

আজ মধ্যাহ্নে অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি পূর্ব্বে কখনও কি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলাম? ঠাকুর বলিলেন—**হাঁ, গতবারও সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছিলে।**

আমি—আমার কি গতবারও ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হ'য়েছিল?

ঠাকুর—**হাঁ; তবে তা কিছুই হয় নাই।**

আমি—সেদিন আপনি স্বপ্নে আমাকে বলেছিলেন, দশ বৎসর তুমি ব্রহ্মচর্য্য কর্‌লেই সন্ন্যাস অবস্থা লাভ কর্‌বে।

ঠাকুর—**স্বপ্নে যা বলা হয়, তার অর্থ কি সব সময়ে বুঝা যায়? দশ বৎসর বল্‌তে কত সময়, তা তো বলা যায় না।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম, একি সর্ব্বনাশ! গতবার সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভের পরও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। প্রবৃত্তির প্রতিকূলে কোন সাধন ভজনই কি আমি করিয়াছিলাম না? অথবা প্রারব্ধ এতই বলবান্ যে ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না? তবে এবার আবার ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিলেন কেন? মুনি ঋষিদের কলিজার ধন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত এবারও কি আমাদ্বারা কলঙ্কিত হইবে? দু'টি বৎসর প্রাণপণে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াও ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বা দৈহিক বিকারের কোন একটির এপর্য্যন্ত শান্তি হইল না। মনের মলিনতা দূর তো বহু দূরে! কঠোর বৈরাগ্য বা তীব্র সাধন ভজনে আমার সামর্থ্য নাই—প্রারব্ধ কাটিবেই বা কি প্রকারে? শুনিতে পাই, 'ঠাকুরের কৃপায় সবই হয়', কিন্তু ঠাকুরের কৃপার উপরে আমার নির্ভর বা ভরসা কোথায়? প্রাণে যথার্থ কাতরতা না আসিলে নির্ভর বা ভরসা তো অর্থশূন্য কথা। উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত নিরুপায় রোগী যে ভাবে চিকিৎসকের নিকট আরোগ্য আকাঙ্ক্ষা করে, একটি বারও কি আমি সেইভাবে ঠাকুরের পানে তাকাইতে পারিয়াছি? আমার যিনি ঠাকুর তিনি পরম দয়াল, তিনি আবার মহাসামর্থী, বিশেষতঃ আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, ইহা যদি একটুকু বিশ্বাস করিতাম, তা হ'লে আর চিন্তা ছিল কি? সকল দুরবস্থায়ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আনন্দে বগল বাজাইয়া বলিতাম 'সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়, চিরজীবী করিলেন গোঁসাই'—এই সকল ভাবিয়া প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল; দারুণ ক্লেশ হইতে লাগিল। কান্নার বেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ঠাকুর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ঠাকুর সমাধিস্থ ছিলেন—এই সময়ে মাথা তুলিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—**ভগবানের কৃপাই সার। আর কিছুই কিছু নয়। সাধন ভজন শুধু জেগে থাক্‌বার**

জন্য—যেন তাঁর কৃপা এলে ধ'র্‌তে পারি। সাধন ভজন ক'রে কার সাধ্য তাঁকে লাভ করে? সাধন ভজন ক'রে তাঁকে লাভ কর্‌তে হয়, একথা কিছু নয়। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর কৃপা হ'লেই তাঁকে পাওয়া যায়। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—নিজের তৃপ্তির জন্যও লোকে সাধন ভজন করে। মানুষের যেমন ক্ষুধা পায়, পিপাসা পায়, তখন অন্ন জল না পেলে স্থির থাক্‌তে পারে না, অভাবে খুব কষ্ট হয়; ভগবানের নাম নেওয়া, তাঁর পূজা অর্চ্চনা করাও সেই প্রকার। উহা না ক'রে পারা যায় না। কর্ম্ম শেষ না কর্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না—একথাও ঠিক্ নয়। কর্ম্ম শেষ হ'তে কি আর লাগে? তাঁর কৃপা হ'লে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যায়। মহারাণী যখন এম্প্রেস্ হ'লেন তাঁর একটি হুকুমে কত শত লোকের বহুকালের মিয়াদ একেবারে খালাস হ'য়ে গেল। ভগবানের কৃপা হ'লে, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে, সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত প্রারব্ধ, এক মুহূর্ত্তেই শেষ হ'য়ে যায়। তাঁর কৃপাই সব। আর কিছুই কিছু না। কাতরভাবে তাঁরই দিকে তাকায়ে থাক। তাঁর কৃপাই সার।

ন্যাসের উপকারিতা—অনুভূতি পরমানন্দ।

৩০শে শ্রাবণ, শনিবার।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর আমাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে ন্যাস করিয়া দেখিতেছি, ইহা এক অদ্ভুত জিনিস। নিজ শরীরে প্রত্যেকটি তত্ত্বের ন্যাসকালে সেই সেই তত্ত্বের আধার স্থানে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্মৃতি আপনা আপনি সমুদিত হয়। নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া চিত্তটিকে উহাতে নিবিষ্ট করিয়া ফেলে, তখন নামটি আধারে মিলিয়া যায় এবং ঠাকুরের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। একটি তত্ত্বে মনের অভিনিবেশ হইলে তাহা ছাড়িয়া অপরটিতে প্রবেশে অত্যন্ত অপ্রবৃত্তি ও ক্লেশ অনুভব হয়। বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত; ইহার প্রত্যেকটি ইষ্টমন্ত্রে, ইষ্টদেবে ন্যাস করিয়া উহাতে ইষ্টদেবকেই মাত্র দর্শন করিয়া থাকি। এই সময়ে নিজের অস্তিত্ব বুদ্ধি—একমাত্র দর্শনানুভূতি—নাম সংযোগে ইষ্টমূর্ত্তিতে সংলগ্ন হওয়ায়, নাম, নামী ও নামকারী একই হইয়া যায়—পৃথকবোধ আর থাকে না; উহাতে পরমানন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্তটি দিন এই ন্যাস লইয়াই থাকিতে ইচ্ছা হয়। কখনও কখনও ফুল, তুলসী, চন্দন লইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূজা করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ঠাকুরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—যাহা কর, মনে মনে করাই ভাল। বাইরে ওসব কিছু কর্‌তে নাই। ন্যাসের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রেখো। নিত্য-ক্রিয়ার প্রথমেই ন্যাস কর্‌তে হয়। ন্যাসের ভাব সর্ব্বদা অন্তরে রাখ্‌তে হয়।

মনসা পূজা। ইষ্টমন্ত্রে তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর পূজা হয়।

সকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—'আজ মনসাপূজা। আমাদের বাড়ী মনসাপূজা হবে পুরোহিত কোথা থেকে আন্‌ব?

১লা—৭ই ভাদ্র, ১২৯৯ সন।

ঠাকুর বলিলেন—**কেন? ব্রহ্মচারী গিয়ে পূজা ক'রে আস্‌বে।** বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন, পরে ঠাকুরকে বলিলাম—মনসা পূজা কর্‌বো ব'লে দিলেন। কিন্তু আমি তো মনসা পূজা জানি না।

ঠাকুর বলিলেন—**ইষ্টনামে পূজা ক'রো, তাতেই হবে। ঐ নামে তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীরই পূজা কর্‌তে পার।**

আমি ঠাকুরের অনুমতি লইয়া বেলা প্রায় ১টার সময়ে মনসা পূজা করিতে কুঞ্জবাবুর বাড়ী গেলাম। পশ্চিমের ঘরে পূজার বিবিধ প্রকার আয়োজন দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি পূজায় বসিলাম। কুঞ্জবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া পূজার অনুষ্ঠান দেখিয়া একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে তিনি এ সকল পূজার কিছুই আবশ্যকতা মনে করেন না; আর যার-তার দ্বারা এসব পূজা ঠিকমত হয়ও না। কুঞ্জবাবুর এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া আমার প্রাণে একটু লাগিল। যাহা হউক, আমি মনসা দেবীকে আহ্বান করিয়া ইষ্টমন্ত্রে দেবীমূর্ত্তিতে নিজ ইষ্টদেবেরই পূজা করিলাম। দক্ষিণা গ্রহণ করিতে ঠাকুর নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং পূজার পর তাহা না লইয়া আশ্রমে আসিলাম এবং ঠাকুরের নিকট বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর আমাকে পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি সমস্ত বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—**গৃহস্থ-ঘরে এসব পূজা অর্চ্চনা ব্রত উপবাসাদি বিশেষ প্রয়োজন। এতে ধর্ম্ম জাগ্রত থাকে।** অপরাহ্নে কুঞ্জবাবু আসিয়া একটু যেন সলজ্জভাবে আমাকে বলিলেন—"দেখুন, আপনি পূজা ক'রে এসেছেন পরে ঘরখানা আশ্চর্য্য সুগন্ধময় হ'য়েছে; ঐ ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার শরীর-মন ঠাণ্ডা হয়ে গেল; কতবার গিয়ে দেখ্‌লাম—সমস্তটি দিন ঐ ঘরে এমন একটা সুগন্ধ ব'য়েছে যে ওরূপ গন্ধ আর আমি কখনও পাই নাই। মনসা দেবী যেন ওখানে আবির্ভূতা এরূপ পরিষ্কার বোধ হচ্ছে। বড়ই আশ্চর্য্য!"

কুঞ্জবাবুর কথায় আমার আনন্দ হইল, প্রাণে যে ক্লেশ পাইয়াছিলাম তাহা একেবারে মুছিয়া গেল। মনে হইল, এ সমস্তই ঠাকুরের কৃপা। ঠাকুরের পূজা যে স্থলে হইয়াছে তাহা সাধারণের নিকটে অজ্ঞাত থাকিলেও ঠাকুরের একান্ত ভক্তজন সেইস্থলে আপনা আপনি অবশ্যই আকৃষ্ট হইবেন, এবং অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেই স্থানের বিশেষত্বও কিছু না কিছু নিশ্চয়ই অনুভব করিবেন। পূজাটি যে আমার ঠিকভাবে হইয়াছে, কুঞ্জবাবুর এই পরিবর্ত্তনই তাহার একটি নিদর্শন মনে হয়। ঠাকুর দয়া করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিলেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর দয়া কর। সর্ব্বঘটে তোমারই

অধিষ্ঠান বুঝিয়া ও তোমার পূজা করিয়া যেন ধন্য হই।

ঠাকুরের দম্ভের কথা—পৈতা নাই? সূক্ষ্মশরীরে মহাপুরুষের কার্য্য।

আমাদের আশ্রম হইতে দু'তিন মিনিটের পথ দক্ষিণে বড়পুকুরের পূর্ব্বপারে আশানন্দ বাউল একটি আখ্‌ড়া করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তিনি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া থাকেন। ঠাকুরের নিকটে বহুলোকের সমাবেশ দেখিলেই সাধারণতঃ তিনি নিজের অলৌকিকত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার তত্ত্বকথা উপদেশ করিতে থাকেন। যাঁহারা ঠাকুরের মুখে দু'চারিটি কথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় আশ্রমে আসেন, তাঁহারা উহার এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যান। গতকল্য মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া আশানন্দ বলিলেন—গোঁসাই! আমাকে দেখে কি কিছু বুঝ্‌তে পারেন?

ঠাকুর —**কি বুঝব?**

আশানন্দ—আপনার দৃষ্টিশক্তি আছে, কিছু তত্ত্বজ্ঞানও লাভ ক'রেছেন। আচ্ছা, আমার দিকে একবার একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি ক'রে দেখুন দেখি!

ঠাকুর বলিলেন—**কৈ? কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।**

আশানন্দ একটুকু যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কিছুই বুঝতে পার্‌ছেন না? দৃষ্টিটা এখনও ততদূর পরিষ্কার হয় নাই। ভাবুন, আমার ৮/১০ হাজার শিষ্য, সকলেই আমাকে অবতার বলে। তারা যে ভাবুকতা ক'রে বলে তা নয়—তারা বাস্তবিকই এমন সব বিভূতি আমার ভিতরে দেখে যে, তাদের ওরূপ না ব'লেই উপায় নাই। আর দেখুন, শাস্ত্রে কল্কি অবতারের যে সব লক্ষণ আছে, আমার সঙ্গে তার অক্ষরে অক্ষরে মিল।"

ঠাকুর —**কি কি লক্ষণের সঙ্গে মিল আছে?**

আশানন্দ—"কারোকে বল্‌বেন না, আপনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাচ্ছি, এই দেখুন।" এই বলিয়া নাকের এক পার্শ্বে একটি তিল দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন ত? আপনি বুঝি এটা লক্ষ্য করেন নাই?" আমি আশানন্দের ভঙ্গী দেখিয়া কিছুতেই আর হাসি সংবরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুর কোন কথাই না বলিয়া চোখ বুজিলেন; আশানন্দও আপন আখ্‌ড়ায় চলিয়া গেলেন।

আজকাল 'অবতারের' ছড়াছড়ি। অনেকেই অবতারের 'সার্টিফিকেট' পাইতে গোঁসাইয়ের নিকট উপস্থিত হন। পরে নিরাশ হইয়া ক্রোধবশে গালাগালি দিয়া চলিয়া যান। আজ অপরাহ্ন প্রায় ৫ ঘটিকার সময়ে আশানন্দের এক শিষ্য ঠাকুরের নিকটে আসিলেন। পূবের ঘরে বহুলোকের

ভিতরে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং আশানন্দের অদ্ভুত শক্তির বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুরকে বলিলেন—"[illegible] বাবা এখন আর কল্কি পান না? গুণ সকলেই টের পেয়েছে, তাই জঙ্গলে এসে [illegible] সাধু হ'য়ে বসেছেন। অদ্বৈত বংশের কুলাঙ্গার! পৈতে ফেলে, জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট ক'রে [illegible] এখন সর্ব্বনাশ করছেন, হুঁ! ব্রাহ্মণদেরও আবার দীক্ষা দিচ্ছেন, গোঁসাইগিরি করে। [illegible] পৈতা ফেলেছেন?" উহার এই প্রকার গালি শুনিয়া সকলেই অবাক্, ঠাকুরও চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ খুব তেজের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—**"পৈতা নেই? দশগণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দিতে পারি। তুই কি ক'রে দেখ্‌বি? তুই যে অন্ধ!"** কথা শেষ হওয়া মাত্রই সুভড্যা নিবাসী সাধু যদুবাবু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। "একি গো! একি গো!" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই এসময়ে যদুবাবুকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল। ইত্যবসরে সেই গোলমালের ভিতরে আশানন্দের [illegible] বাহিরে আসিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে যদুবাবু ক্রমশঃ সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং [illegible] কোনরূপ কথাবার্ত্তা না বলিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অদ্য মধ্যাহ্নে [illegible] ঠাকুরকে বলিলাম—"লোকটা কাল আপনাকে গালাগালি ক'রে, ভয়ে [illegible] একেবারে [illegible] গেল; না হ'লে আমাদের কারও কারও হাতে হয়ত সে মারই খেতো। আপনাকে [illegible] আর কখনও এমন দম্ভের সহিত এভাবে কারোকে ধমক্ দিতে দেখি নাই।"

ঠাকুর—কি রকম্ কি ব'লেছিলাম কৈ? আমার ত কিছুই মনে নাই।

আমি—[illegible] এখনই বের ক'রে দিতে পারি, তোর চোখ নাই, অন্ধ; দেখ্‌বি কি ক'রে?' এই [illegible] জোর ক'রে তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছেন।

আমার কথা [illegible] বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—কি ব'ল্‌ছ? আমি ওরূপ বলেছি? না, আমি বলিনি ত।

আমি—[illegible] আপনারই ত গলার আওয়াজ পেয়েছি।

ঠাকুর—এ [illegible] যে আমার মুখ দিয়ে বের হয়েছে, আমার মনেই পড়ে না। তবে একটি ব্রাহ্মণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওরূপ কি কি বলেছিলেন বটে। বলেই অমনি তিনি তৎক্ষণাৎ চ'লে গেলেন। তোমরা তা লক্ষ্য কর নাই? একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন—আশ্চর্য্য! মানুষের ভিতর দিয়ে কত প্রকার ঘটনাই হয়। ভগবানের আশ্রিত জনের প্রতি কোনও প্রকার অত্যাচার, অপমান হ'লে তা তাঁরা সহ্য করেন না। মহাপুরুষেরা যে শাসন করেন, দেখা যায়, তা অনেক স্থলে প্রায় এইরূপই হয়। অনেক সময়ে তাঁরা

নিজেরা কিছুই করেন না।

গতকল্য উক্ত ঘটনার পরে হঠাৎ যিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন অদ্য সেই যদুবাবু আশ্রমে আসিয়া সকলের নিকটে বলিলেন—"মহাপুরুষদের সমস্তই অদ্ভুত! লোকটি যখন গোঁসাইকে ঐ রকম গালাগালি ক'র্‌ছিল, একটি গৌরবর্ণ পবিত্রমূর্ত্তি তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোঁসাইয়ের ঠিক দক্ষিণপার্শ্বে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে লোকটাকে খুব ধমক দিয়ে বল্‌লেন, 'পৈতা দেখ্‌বি কি ক'রে? চোখ নাই, তুই ত অন্ধ।' এই সব দেখে শুনে আমি কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। ব্রাহ্মণটিও তৎক্ষণাৎ এইখান থেকে চলে গেলেন।"

যদুবাবুর কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। যদুবাবুর মুখে এই সব কথা না শুনিলে আমার ভিতরের এ খট্‌কা দূর হইত কি না বিশেষ সন্দেহ। হা অদৃষ্ট!

ঠাকুরের মুখে ছোটদাদার কথা—পিতার চরিত্র। তান্ত্রিক সাধন বড় কঠিন।

আজ মহাভারত পাঠের পর পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, ঠাকুর নিজ হইতেই ছোটদাদার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—ছোটদাদা পাঠ্যাবস্থায় পড়া-শুনা ছাড়িয়া কফাশ্রিত বায়ুরোগে দুই বৎসর বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। বহুবিধ চিকিৎসাতেও বিশেষ কিছু উপকার হইল না। এখনও তিনি ঐ রোগে সময় সময় অত্যন্ত যন্ত্রণা পান।

ঠাকুর কহিলেন—**সারদা একটি বিশেষ ব্যক্তি। আহা! এরূপ লোকও আবার সংসারে আসে? বড়ই চমৎকার। এরকম হৃদয় দেখা যায় না, কোন গোলমাল নাই, ভিতর বাহির এক। উহার সেবা ভাব বড়ই অদ্ভুত—সাধারণের মত নয়। উহার প্রকৃতিই ঐ প্রকার, বড়ই সুন্দর।**

ঠাকুর কথায় কথায় আমার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিছুই জানিনা, সুতরাং খুব সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ৪/৫ বৎসর বয়সে পিত্তশূল রোগে পিতা কলিকাতায় গঙ্গার তীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন। সাধনভজনেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পরিবার ভরণ পোষণ করিয়া সমস্ত অর্থ লোকের হিতার্থে ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় কখনও করিতেন না; বরং দেহত্যাগকালে বিস্তর ধার রাখিয়া গিয়াছিলেন। বেলপুকুরের রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে একটি তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বাবার গুরু ছিলেন। সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজন রীতিমত হয় না বুঝিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। বাবার গুরুদেব নানাস্থান অনুসন্ধানের পর বাবাকে পাইয়া আবার গৃহে নিয়া আসেন। তান্ত্রিক সাধনে নাকি কালো মেয়ের প্রয়োজন হয়, এজন্য অধিক বয়সে তিনি

আবার বিবাহ করেন। মদ কখনও খাইতেন না, কিন্তু মহাশঙ্খের মালার জন্য মদ ব্যবহার করিতেন। অনেক সময়ে সমস্ত রাত্রি ঐ মালাজপে কাটাইয়া দিতেন। অত্যন্ত চরিত্রবান্ ছিলেন। বাড়ীতে ও পাড়ার বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাই, তাঁকে কখনও কেহ কোন অবস্থায় ক্রোধ করিতে দেখেন নাই; ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ঠাকুর—**তোমার সেই বিমাতা বুঝি বর্ত্তমান নাই?**

আমি—না; আমার ছোট ভাই রোহিণীকে ছ'মাসের রেখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর—**হাঁ, ছেলে হ'ল ব'লেই তিনি মারা গেলেন। ওসব তান্ত্রিক সাধন বড়ই কঠিন। আজকাল ওতে কৃতকার্য্য হ'তে বড় দেখা যায় না।**

হঠকারিতায় রোগবৃদ্ধি—দুগ্ধপান ব্যবস্থা।

কিছুকাল যাবৎ আমার শরীর পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রোগের হেতু কি নিশ্চয় বুঝিতেছি না। মনে হয়, আহারের অতিরিক্ত কৃচ্ছতাই ইহার কারণ। সকালে একবার একটু চা খাই মাত্র। পরে সন্ধ্যার সময়েও শুধু নুন দিয়া জলভাত খাইয়া থাকি। অন্নের পরিমাণও কমাইয়া ক্রমশঃ জলের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছি; কিন্তু শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। হাত পা কিছুক্ষণ এক অবস্থায় রাখিলেই ঝিম্ ঝিম্ করে ও বেদনা বোধ হয় এবং সময়ে সময়ে আপনা আপনি বিভিন্ন সন্ধিস্থলে খিল ধরে; সাধন ভজনে আর তেমন উৎসাহ নাই। সামান্য চলাফেরাতেও কষ্ট অনুভব হয়। এখন কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে গিয়া সমস্ত বলিলাম।

ঠাকুর কহিলেন—**তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, অভ্যাসটি খুব ধীরে ধীরে ক'র্‌বে। তাড়াতাড়ি কর্‌তে গেলে কিছুই সুসিদ্ধ হয় না, বিঘ্ন উপস্থিত হয়। জলভাত খাওয়া ছেড়ে দাও। খিচুড়ি বা ভাতে সিদ্ধ ভাত খেতে আরম্ভ কর; ঘি একটু বেশী পরিমাণে খেও। এখন কিছুদিন একপোয়া করে দুধ খাও, তা হ'লে অসুখ সেরে যাবে।**

বহুকাল আমি দুধ ছাড়িয়াছি এজন্য এখন দুধ খাইতে একটু আপত্তি করিলাম।

ঠাকুর কহিলেন—**না, কিছুদিন দুধ খেতে হবে। শোওয়ার সময়ে এক বল্‌কা দুধ খেয়ে নিও।**

আমার প্রতি ঠাকুরের দুগ্ধপানের ব্যবস্থা আমার হঠকারিতারই দণ্ড মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কোথায় এখন দুধ পাই ভাবিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। অগত্যা দুধের অনুসন্ধানে আশ্রম হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় একটি হিন্দুস্থানীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে দুধ কোথায় পাওয়া যায় বলিতে পার?" সে বলিল, "কত দুধ আপনার চাই? বিকালে নিলে এক পোয়া

করিয়া দুধ আট সের দরে আমি দিতে পারি। আপনাদের আশ্রমের পাশেই আমার বাসা; আপনার সাম্‌নে আমি দুধ দোহাইয়া দিব।" রাধারমণ বাবুর পশ্চিম দিকের বাগানে এই লোকটি বাস করে দেখিয়া আসিলাম। আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া! হুকুমটি করিবার পূর্ব্বেই তিনি সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

এঁটো বাটলই মাজিল কে?

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রান্না প্রস্তুত না হইলে সেদিন আমার আহার হয় না। নানা কাজের গোলমালে রান্নার সময় অতীত প্রায় দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হওয়াতে রান্না করিতে গেলাম। এই সময়ে হঠাৎ মনে হইল, গতকল্য রান্নার বাসনটি মাজিয়া রাখিতে পারি নাই। আজ মাজিব স্থির করিয়া বারান্দার এক কোণে এঁটো বাটলইটি রাখিয়া দিয়াছিলাম। সন্ধ্যা আসন্ন, এখন বাসন মাজিয়া রান্নার পর নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে আহার শেষ করা অসম্ভব বুঝিয়া, আজ অগত্যা আহারের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। শুধু বাসনটি মাজিয়া রাখিব স্থির করিয়া উহা আনিতে গিয়া দেখি, কে যেন বাটলইটি মাজিয়া রাখিয়া গিয়াছে; দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। কে আমার এঁটো বাসন মাজিয়া রাখিল, একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু আশ্রমস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক পুরুষ কেহই উহা করেন নাই বলিলেন। রান্নার সময় অতিক্রান্ত হইলেও এই ঘটনায় আমার আহার করা ঠাকুরেরই অভিপ্রায় অনুমান করিয়া খিচুড়ি পাক করিলাম, এবং পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিলাম। অমন সুন্দররূপে বাসনটি কে মাজিয়া রাখিল, এই চিন্তায় সারারাত আমার কাটিয়া গেল। সাধারণ সাধারণ ঘটনায়ও পুনঃপুনঃ ঠাকুরের অপরিসীম কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রমশ যেন অবাক্ হইয়া বোকা বনিয়া যাইতেছি। কিন্তু অবিশ্বাসী মন ঠাকুরকে তবুও ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

৫ই ভাদ্র, শনিবার।

সঙ্কল্পমাত্র বস্তুলাভ—অবিশ্বাসী মন।

আজ সকালবেলা হইতে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হোম, পাঠ সমাপনান্তে আসনে বসিয়া আছি; মনে হইল, এ সময়ে বাড়িতে থাকিলে চাল ভাজা খাইতাম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই দেখি, শ্রীযুক্ত বিধু ঘোষ মহাশয়ের কন্যা দামিনী এক বাটি গরম চালভাজা, লঙ্কা ও কাঁটাল বিচি ভাজা আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল "মা আপনাকে খেতে দিয়েছেন।" আর একদিন আহারের পূর্ব্বে কলা খাইতে ইচ্ছা হইল, তখনই ফণিভূষণ পাঁচটি মর্ত্তমান কলা আনিয়া দিয়া বলিল, "দিদিমা আপনাকে এই কলা পাঁচটি খেতে দিয়েছেন।" ইহাতে ঠাকুরের কৃপা একবারও মনে করিলাম না। বুড়ীর অসাধারণ স্নেহের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। গত পরশ্ব সকাল বেলা মুষলধারে

বৃষ্টি হইতে লাগিল; ঘরের বাহির হওয়া যায় না। আসনে বসিয়া মনে করিতে লাগিলাম "ঠাকুর! এ সময়ে গরম চা পাইলে কতই আরাম হইত।" পাঁচ ছয় মিনিট পরেই দেখি, বৃষ্টিতে ভিজিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় গরম গরম চা ও মোহনভোগ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "আপনার কি কোন অসুখ করেছে? গোস্বামী মহাশয় এই চা ও মোহনভোগ আপনার জন্য পাঠাইলেন।" ইহাতেও ঠাকুরের দয়ার কথা মনে হইল না। ভাবিলাম, বোধ হয় বৃষ্টি বলিয়া অধিক পরিমাণে চা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাই চা ভালবাসি বলিয়া ঠাকুর আমার জন্য পাঠাইয়াছেন। হায় কপাল! বিন্দুমাত্র বিশ্বাসের নিদর্শন পাইলে, কোথায় তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিব—না, তাহা না করিয়া কল্পনা দ্বারা, সহজ সত্যেরও মিথ্যা হেতু সৃষ্টি করিয়া এই উদ্ধত ও অবিশ্বাসী মনকে প্রবোধ দিতেছি।

বিগ্রহ বিহারীলালজীকে প্রসাদের জন্য বলা।

গত রাত্রে শান্তিসুধা কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—"বাবা, সনাতন বাবুর আখ্‌ড়ায় বিহারীলালজী ঠাকুর আছেন; তাঁর প্রসাদ একদিন পেতে ইচ্ছা হয়।"

৬ই ভাদ্র, রবিবার।

ঠাকুর বলিলেন,—**কি প্রসাদ পেতে ইচ্ছা হয় বল।**

শান্তি—ভাল মালপোয়া প্রসাদ।

ঠাকুর—**আচ্ছা, বিহারীলালজীকে তোর কথা জানালাম, জগবন্ধু কাল যেন প্রসাদ নিয়ে আসে।**

অদ্য বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় জগবন্ধু বাবু আখ্‌ড়ায় গিয়া আমাদের আশ্রমের নামে প্রসাদ চাহিলেন। শুনিলাম, সেবক খুব আদর করিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ দিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের এখানে প্রত্যহ অন্নভোগই হয়, আজ সকালে হঠাৎ একটি বড়লোক আসিয়া প্রচুর পরিমাণে মালপোয়া ভোগ দিয়াছেন।" আশ্রমস্থ আমরা সকলেই সেই মালপোয়া প্রসাদ পাইলাম। শান্তি বলিলেন,—"এরূপ সুস্বাদু মালপোয়া আর কখনও খেয়েছি ব'লে মনে হয় না।" ঠাকুরের সমস্তই অদ্ভুত! এসব ব্যাপারের হেতু কি দিব? বিশ্বাসের অভাবে আকস্মিক ঘটনা বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিতেছি।

"হাঁ। তোমারও লীলা নিত্য!"—তপস্যার উপদেশ। শ্যামভাবা।

আজ রৌদ্রের বিষম তেজ, ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নে ঠাকুর বলিলেন—**ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেও।** আমি আসন হইতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিতে যেমন উহা ধরিয়া

৭ই ভাদ্র, সোমবার।

টানিলাম ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—**একটু থাম, দেখে নিই। কি সুন্দর পর্ব্বত। হিমালয় দেখা যাচ্ছে**—সোনার মত **শৃঙ্গ, কি চমৎকার।** দেখিতে দেখিতে ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও দরজাটি বন্ধ করিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম এবং ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—**হাঁ, হাঁ, তোমারও, তোমারও লীলা নিত্য।** এই বলিয়া দুর্গাদেবীর স্তবস্তুতি করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্য সংজ্ঞা লাভের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমারও লীলা নিত্য' কাকে বলিলেন?

ঠাকুর কহিলেন—**ভগবতী দুর্গা এসেছিলেন। বল্লেন 'তুমি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা নিত্য বল। কেন? আমার লীলা কি নিত্য নয়? দেখ দেখি।' এই বলে তিনি সব পুত্র কন্যার সহিত প্রকাশ হ'য়ে আশ্চর্য্য লীলা দর্শন করাতে লাগ্‌লেন। বড়ই চমৎকার। তাই বল্‌লাম "তোমারও লীলা নিত্য।"**

ইহার পরে ঠাকুর নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—**যোগ বড় কঠিন কথা। আমাদের এই পন্থাকে ঠিক যোগও বলে না—যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়ে সর্ব্বপ্রথম যে সাধন করেছিলেন—'তপ, তপ' বাণী শ্রবণ ক'রে তিনি যে ভাবে তত্ত্ব জান্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের এই সাধনও তাই। আমাদের সাধন সমস্তই ভিতরের ক্রিয়া, বাহিরের কিছুই** নয়। একটু পরে আবার বলিলেন—**সর্ব্বদা শম, সন্তোষ, বিচার ও সৎসঙ্গ চাই।**

(১) মনের সাম্য অবস্থাকেই শম বলে। নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট সকল অবস্থায়ই মন একই প্রকার অটল অচল থাকবে। বাইরে যমনিয়মের অভ্যাস ও ভিতরে বৈরাগ্য দ্বারা এটি সুসিদ্ধ হয়।

(২) সকল সময়েই সন্তুষ্ট চিত্ত থাক্‌বে, কোন কারণেই যেন মনে উদ্বেগ অশান্তি প্রবেশ না করে। এজন্য সর্ব্বদা খুবই সাবধান থাকা আবশ্যক। অশান্তিই নরক, চিত্ত প্রফুল্ল না থাক্‌লে কোন কাজই হয় না।

(৩) সর্ব্বদা সব অবস্থায় ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, বিচার ক'রে চল্‌বে। কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম কিছুই সৎউদ্দেশ্য ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে কর্‌বে না। ভগবান্‌কে লক্ষ্য রেখে যা কিছু করা যায়, তাহাই সৎ; তাঁকে ছেড়ে সবই অসৎ। প্রতি কার্য্যে এরূপ বিচার ক'রে চল্‌লে আর কোন ভাবনাই নাই। এতেই সমস্ত লাভ হয়।

(৪) প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সৎসঙ্গ কর্‌বে। ভগবান্‌ই সৎ। ভগবৎসঙ্গই সৎসঙ্গ। ভগবদাশ্রিত সাধু সজ্জনগণের সঙ্গও সৎসঙ্গ। তাঁরা কি ভাবে সময়

অতিবাহিত করেন, তাঁদের কার্য্য কলাপ, আচার ব্যবহার কিরূপ তা শ্রদ্ধার সহিত দেখ্‌বে। প্রয়োজন বোধ হ'লে তাঁদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গও কর্‌তে পার। সদ্‌গ্রন্থ, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র পুরাণাদি পাঠও সৎসঙ্গ। তাতে ঋষিদেরই সঙ্গ করা হয়। প্রত্যহই কিছু সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর্‌বে। এখন থেকে বেশ ক'রে এসব নিয়ম রক্ষা ক'রে চ'লো।

একটু পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—**এই চারিটির সঙ্গে আরও চারিটি নিয়ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য—স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ ও দান।**

(১) স্বাধ্যায় শুধু অধ্যয়ন নয়। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করাকেও স্বাধ্যায় বলে, ইহাই প্রকৃত স্বাধ্যায়। নাম কর্‌তে কর্‌তে অবসাদ বোধ হ'লেই কিছুক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে নিবে।

(২) তপস্যা এখন থেকেই খুব অভ্যাস কর্‌বে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যতপ্রকার তাপ আছে, কিছুতেই যেন চিত্তটিকে বিচলিত না করে। ত্রিতাপের জ্বালা বড় জ্বালা। শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, নিন্দা প্রশংসাদিতে মনের অবস্থা যেন একই প্রকার থাকে; ধীরে ধীরে এই অভ্যাস কর্‌বে। সকল অবস্থায় ধৈর্য্যই হচ্ছে তপস্যা।

(৩) শুচি অর্থ, সকল অবস্থায় বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা। মনটিকে যেমন নির্ম্মল রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে, বাহিরেও সেই প্রকার খুব পবিত্র থাক্‌বে। বাহ্য পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজন। শরীর পবিত্র না থাক্‌লে অন্তঃশুদ্ধ হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে নামে যথার্থ রুচি, ভগবানে শ্রদ্ধাভক্তি কিছুই হয় না।

(৪) প্রতিদিনই কিছু দান কর্‌বে। দয়া, সহানুভূতি হ'তেই প্রকৃত দান। প্রতিদিনই কারো না কারো ক্লেশ দূর করতে চেষ্টা কর্‌বে। অন্য কিছু না পারো, কারোকে অন্ততঃ দু'টি মিষ্ট কথাও বল্‌বে—তাও দান। প্রত্যহ এই কয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রেখে চল্‌লে আর কোন চিন্তাই নাই।

ঠাকুর প্রায়ই মগ্নাবস্থায় কত কি বলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহা না হিন্দী, না পারসী, না সংস্কৃত, না ইংরাজী—পরিচিত কোনো ভাষাই নয়। এমন ভাষা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। কতকটা যেন সংস্কৃতের মত মনে হয়। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সমাধির সময়ে আপনার মুখ দিয়ে সংস্কৃতের মত কতকগুলি কথা বের হ'য়ে পড়ে, শুন্‌তে বড়ই সুন্দর। ও কি ভাষা? কিছুই ত বুঝিনা।"

ঠাকুর বলিলেন—**ওঃ! তুমি শুনেছ নাকি? বুঝ্‌বে কি? ও ত পৃথিবীর ভাষা নয়? — গোলকের ভাষা, শ্যামভাষা। ঐ ভাষায়ই সেখানে কথাবার্ত্তা হয়। সংস্কৃত দেবভাষা।**

বিবাহের প্রলোভন। সাবধান, প্রার্থনা করিলেই তাহা মঞ্জুর হইবে।

ভাল উৎপাতেই পড়িলাম! গত বৈশাখ মাস হইতে যোগজীবন আমার পিছনে লাগিয়াছেন। কুতুকে বিবাহ করিবার জন্য ভয়ানক জেদ করিতেছেন। সে দিন ঠাকুরের কাছে ঠাকুরমাও আমাকে বলিলেন, 'কুলদা, তুমি কুতুকে বিবাহ কর—আমার কথা শুন, কল্যাণ হবে। বিয়ে কর্‌লে কি ধর্ম্ম হয় না? গোঁসাই ত বিয়ে করেছেন, তাঁর ধর্ম্ম হয় নাই?' ইত্যাদি। আমি কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া লজ্জায় অধোমুখে বসিয়া রহিলাম। যোগজীবন বলিলেন—"কুতুকে তুমি বিবাহ কর, মাঠাক্‌রুণেরও এরূপ ইচ্ছা ছিল। ওকে বিবাহ কর্‌লে তোমার ধর্ম্মলাভের কোনই ক্ষতি হবে না, বরং অনেক সাহায্য হবে। এমন অসাধারণ মেয়ে বর্ত্তমান সময়ে সংসারে আর আছে কি না সন্দেহ। ওর উপরে ভগবানের বিশেষ কৃপা দেখে অবাক্ হয়েছি। ওকে বিবাহ কর্‌লে তোমার ব্রহ্মচর্য্যের কোন বাধাই ঘটিবে না। তুমি যেমন ব্রহ্মচারী, কুতুও সেই প্রকারই ব্রহ্মচারিণী থেকে তোমার সহধর্ম্মিণী হবে। ওকে নিয়া তোমার সংসার করিতে হবে না। চিরকাল এই আশ্রমে আমাদের সঙ্গেই বাস কর্‌বে। তা ছাড়া, গোঁসাই চিরকালের জন্য ত তোমাকে এ ব্রহ্মচর্য্য দেন নাই! নির্দ্দিষ্ট কালে এ ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে তুমি কুতুকে বিবাহ কর।"

৯ই ভাদ্র,
বুধবার।

এখন দেখিতেছি, আশ্রমে থাকাই আমার পক্ষে শক্ত হইয়া পড়িল। কুতু নিতান্ত ছেলেমানুষটি নয়, বিবাহের বয়স হইয়াছে। সুতরাং লোকপরম্পরায় পুনঃপুনঃ এ সকল কথা শুনিয়া, আমার সম্বন্ধেও উহার স্বভাবতঃই একটু সঙ্কোচ ভাব আসিয়াছে। যোগজীবনের কথা বারংবার শুনিতে শুনিতে আমারও চিত্ত কখনও কখনও চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে। আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, সারাজীবন কুমার থাকিয়া একমাত্র ভগবান্‌কেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিব স্থির করিয়াছি। এ আবার কি উৎপাত আরম্ভ হইল? অবশ্য, কুতুর সদ্‌গুণের তুলনা নাই। তাহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণের অণুমাত্রও আমার সারাজীবনের সাধন-ভজন তপস্যায়ও লাভ করা সম্ভব নয়। যে ঠাকুরের ভুক্তাবশিষ্ট, প্রসাদ বোধে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম মনে করি, কুতু তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের সারাৎসার বীর্য্যসম্ভূতা। উহার সৎসঙ্গে এ জীবন যে পরম পবিত্র ও ধন্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি আমার একনিষ্ঠতা থাকিবে কিরূপে? একমাত্র ঠাকুর ব্যতীত পবিত্র অন্য যে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুতেও আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, উহা আমার লক্ষ্য বস্তু লাভের অন্তরায়, সুতরাং মহা অনিষ্টকর মনে করি। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য উপলক্ষ করিয়া দয়াল ঠাকুরের কৃপায় যদি একমাত্র তাঁর শ্রীচরণে চিত্ত সংলগ্ন করিতে পারি তাহা হইলে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত দেবীরাও আমার সান্নিধ্যে ও সংস্রবে আগ্রহান্বিতা হইবেন। ঠাকুর কিছুকাল হয় একদিন বলিয়াছিলেন—**"বিবাহের প্রলোভন তোমার ভবিষ্যতে। তখন উহা কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেই হ'লো।"**

ঠাকুরের এ ভবিষ্যৎ বাণীর তাৎপর্য্য মনে হয়, আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের সংযমও শুধু এই দেহেরই অবিকৃত অবস্থা লাভের জন্য। মৈথুন বর্জ্জিত ও অনাসক্তরূপে যদি আমার এই পরিণয় হয় তাহা ত সর্ব্বপ্রকারেই আমি লাভবান্ হইলাম। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরের চরণে উৰ্দ্ধরেতা অবস্থার জন্য প্রার্থনা করি। এই সঙ্কল্প করিয়া আজ বেলা ৯।। টার সময়ে দক্ষিণের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া একান্ত প্রাণে নাম করিতে লাগিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিলাম—"গুরুদেব! কিসে আমার যথার্থ হিত, কিসে অহিত, কিছুই বুঝি না; তবু দারুণ যন্ত্রণার সময়ে তোমার দিকে তাকাই। দয়া করিয়া আমাকে উৰ্দ্ধরেতা করিয়া দাও! তাহা না হইলে আমার আর উপায় নাই। কামের টানে এ চিত্ত যদি কামিনীতেই আসক্ত রহিল, তা হ'লে সমস্তটি প্রাণ তোমাকে দিব কিরূপে? দয়া ক'রে আমাকে উৰ্দ্ধরেতা ক'রে তোমাতেই একনিষ্ঠ ক'রে দেও! আর আমার কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই।"

এই প্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুর পূবের ঘর হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। শোনামাত্র আমি ছুটিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দরজার সম্মুখে পঁহুছিতেই ঠাকুর আমার পানে চাহিয়া খুব ধমক দিয়া বলিলেন—**ব্রহ্মচারী খুব সাবধান। প্রার্থনা কর্‌লেই কিন্তু সেটি মঞ্জুর হ'বে। কিসে ভাল, কিসে মন্দ, কিছুই যখন বুঝনা, তখন প্রার্থনা কর্‌তে খুব সাবধান।** ইহা বলিয়াই ঠাকুর আবার ভাগবৎ পাঠ আরম্ভ করিলেন। আমি ধীরে ধীরে নিজ আসনে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি হ'ল? ঠাকুর আমাকে শাসন করিলেন কেন? আত্মার যাহাতে পরম কল্যাণ তাহাইত ঠাকুরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলাম। মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। পরে ধীরে ধীরে একটু স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। একটু পরে মনে হইল, হায় অদৃষ্ট! ঠাকুরের বাক্যে ও ব্যবহারে শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা নাই বলিয়াই ত আমি এরূপ প্রার্থনা করিতেছিলাম; মায়ের কোলে থাকিয়া ছেলে দুগ্ধ পান করিতে করিতে জুজুর ভয়ে চীৎকার করিলে মা একটু ধমকও দিবেন না? ঠাকুর! প্রার্থনা করিয়া যথার্থই অপরাধ করিয়াছি,—দয়া করিয়া ক্ষমা কর।

দাদার নিকট যাইতে অকস্মাৎ অস্থিরতা—ঠাকুরের আদেশ।

আর আর দিনের মত শেষ রাত্রিতে উঠিয়া ন্যাসাদি সমাপনান্তে স্নান-তর্পণ করিয়া আসিলাম। হোমের পর আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, হঠাৎ বড় দাদার কথা মনে হইল। দাদাকে দেখিবার জন্য মনে অত্যন্ত অস্থিরতা আসিয়া পড়িল। কিন্তু এই অস্থিরতার হেতু কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম যে আজই দাদার নিকটে রওয়ানা হইতে ইচ্ছা হইল। দাদা আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে কখনও বলেন নাই,

১১ই ভাদ্র, শুক্রবার

ঠাকুরও কোন প্রকারে এরূপ কোন অভিপ্রায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। ঠাকুরের নিকটে যেরূপ আরামে ও আনন্দে আছি, সংসারে কোথাও তাহার বিন্দুমাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তবে অনর্থক আমার এই দুর্ম্মতি হইল কেন? শুনিয়াছি যথাবিধি তীর্থবাসে, অথবা যমনিয়মের দুর্ভেদ্য বেড়ার ভিতরে থাকিয়া ভগবৎ ভজনে, কিম্বা সর্ব্বোপরি একমাত্র সদ্‌গুরুর অবিচ্ছেদ সঙ্গে উৎকট প্রারব্ধও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বোধ হয়, আমার প্রারব্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীগণ তাঁহাদের ভোগক্ষেত্র এই দেহটি গুরুসঙ্গহেতু বেদখল হইয়া যায় দেখিয়া ত্রাসান্বিত হইয়াছেন; এবং তাই ভোগকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে অবাধগতি দুষ্টাসরস্বতীকে আমার রাশিতে প্রেরণ করিয়া সৎসঙ্গ বিচ্যুতির এইরূপ মতি জন্মাইতেছেন, কিম্বা সর্ব্বনিয়ন্তা গুরুদেবই আমার কোনও কল্যাণকল্পে অকস্মাৎ এইরূপ ভাব আমার ভিতরে সঞ্চারিত করিলেন; কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঠাকুর ধ্যানস্থ। একটু পরেই আমার পানে তাকাইলেন। আমি বলিলাম—"আজ আসনে অন্যান্য দিনের মত বসিয়া নাম করিতেছি, হঠাৎ দাদার কথা মনে হইল। ক্রমে মনটা এত চঞ্চল হইয়া পড়িল, যে নিত্যকর্ম্মও ঠিকমত করিতে পারিলাম না। এইরূপ হইল কেন? অনেক সময়ে ত বিপথে চালাইতে শয়তানেরা দুর্ম্মতি জন্মায়। আপনার সঙ্গ ছাড়াইতে কি এ তাদের কার্য্য? না, আপনারই ইচ্ছায় এরূপ হইতেছে?"

ঠাকুর—**হাঁ, তোমার দাদা অযোধ্যাতে অনেক সময় ভাল সঙ্গ পেতেন। সম্প্রতি যেখানে গিয়েছেন, ভাল সঙ্গের বড় অভাব। এখন কিছুদিন তুমি তাঁর নিকটে গিয়ে থাক্‌লে, তাঁর পক্ষে বড় ভাল হয়; আর তাঁর প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে সেটিও করা হয়। কিছুদিন গিয়ে দাদার কাছে থেকে এস। শীঘ্রই তোমার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।**

গুরুর এই দেহ অনিত্য। ছায়া ধ'রে কায়া পাওয়া যায়।

দাদার নিকটে অবিলম্বে যাইতে ঠাকুরের আদেশ হইল শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—আপনি যেমন বলিবেন, তেমনি করিব। তবে, আপনাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না, পারিও না। বড় কষ্ট হয়।

ঠাকুর—**এরূপ হওয়া ঠিক্ নয়, ইহাও মায়া, বদ্ধতা। গুরু যে বস্তু তা তো এই দেহ নয়। এই দেহের ভিতরে অন্য কিছু, তিনি জড় নন।**

আমি—এ তো বড় বিষম কথা! এই দেহ গুরু নয়, তবে গুরু আবার কে? এই দেহের ভিতরে কি আছে না আছে, আমি ত তা দেখিনি, জানিও না। গুরুর দেহ জড় নয়, নিত্য, এই ত শুনেছি; তাই এই রূপেরই ধ্যান করি। এ যদি কিছু নয়, তবে সবই ত বৃথা!

ঠাকুর—**বৃথা নয়, গুরুর যে দেহ নিত্য, তা এ দেহ নয়। এই দেহেরই ভিতরে ঠিক্ এইরূপই অন্য এক দেহ আছে। তা সচ্চিদানন্দ-রূপ, তাই নিত্য; এই যে দেহ দেখ্‌ছ, এ তারই ছায়া। যেমন আয়নাতে মুখের ছায়া পড়ে ছায়াটি ঠিক মুখেরই অনুরূপ, কিন্তু কোন বস্তু নয় ছায়া মাত্র, এই দেহও সেই প্রকার। তার এই ছায়া দ্বারাই সেই রূপ ধর্‌তে হয় অন্য উ পায় নাই। এই রূপেরই ধ্যান দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ-রূপ চোখে পড়ে। ছায়া না ধরলে সে কায়া পাবে কি ক'রে?**

আমি—এই দেহরূপী ছায়াব ত পরিবর্ত্তন সময সময় হয়, ভিতরের সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যরূপ এই অস্থির চঞ্চল ছায়া ধ'রে কিরূপে পাওয়া যাবে? কোন্ ছায়ার ধ্যান কর্‌ব?

ঠাকুর—**যা পূর্ব্বে দেখেছ।**

আমি—আমি পূর্ব্বে পরে বুঝি না। যখন আমার যেরূপ ভাল লাগে, তাই আমি ধ্যান করি।

ঠাকুর—**তাতেই হবে, তাই কর। সবই নিত্য।**

আমি—আপনার সঙ্গ ছেড়ে যাবাব সময়ে আমার বিপদের আশঙ্কা কিসে? কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হব?

ঠাকুব—**তোমার নিত্যকর্ম্মটি যদি নিয়ম মত ক'রে যাও, তা হ'লে আর কোন ভয় নেই—যেখানেই থাক না কেন, কোন অনিষ্টই হবে না। আর নিত্যকর্ম্ম বন্ধ হ'লেই বিপদের সম্ভাবনা। আর একটি কথা মনে রেখো, সঙ্গেতে অনেক সময়ে ক্ষতি করে, সঙ্গ হ'তে অনেক সময় ভয়ানক প্রলোভন উপস্থিত হয়। হয় ত কেহ বল্‌বেন, এই ভাবে চল, তোমার এই এই অবস্থা লাভ হবে; আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ কর, এক ঘণ্টার মধ্যেই উর্দ্ধরেতা ক'রে দিচ্ছি। উর্দ্ধরেতা হ'তে তোমার বড় ঝোঁক। এসব কথায় পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ। এ সমস্ত প্রলোভনের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াও বড় সহজ নয়। খুব বড় বড় লোকেও এ সব প্রলোভনে পড়ে নষ্ট হয়ে যান। হঠাৎ একটা কিছু লাভ কর্‌তে গেলেই বিপদ্। নিজের কাজ ধীরে ধীরে ক'রে যাও; আর কারো দিকে তাকাতে হবে না। প্রয়োজনমত সব এখান থেকেই হবে। কারো নিকটে কিছু লাভ কর্‌বে মনে ক'রে, সাধু সঙ্গ ক'রো না। আর একটি কথা; দৃষ্টি সর্ব্বদা অধোদিকে রেখো। সাধনের কোন কথা কারোকে ব'লো না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি খুব কড়াক্কড় ভাবে রক্ষা করে চ'লো—কখনও শিথিল হ'য়ো না। তা হ'লেই নিরাপদ।**

ঠাকুরের সমস্ত আদেশই কল্যাণকর—খুঁচিয়ে প্রশ্নে বিপত্তি।

গতকল্য ঠাকুরের কথা শুনার পর হইতে বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। আমার দয়াল ঠাকুরের দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ ছাড়িয়া সেই সুদূর বস্তি যাইতে আমার এ দুর্ম্মতি কেন হইল? ঠাকুরকে ছাড়িয়া কিরূপে দিন কাটাইব? কিন্তু আমার পক্ষে যাহা যথার্থ কল্যাণকর ঠাকুর তাহাই ব্যবস্থা করিতেছেন, সুতরাং আপত্তিই বা করিব কিরূপে? পাকা ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচার করিতে সুচিকিৎসক যেমন রোগীর কাতর আপত্তি শুনিতে চাহেন না, বেশী কান্নাকাটি করিলে অবশেষে অধিক যন্ত্রণাদায়ক পুলটিশ্ দ্বারাই উহা ফাটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন. আমি এখন আপত্তি করিলে, ঠাকুরও হয় ত সেইরূপই করিবেন। ব্যবস্থামত তিক্ত ঔষধ সেবনে রোগ উপশম হইবে, রোগীর এই নিশ্চিত ধারণা সত্ত্বেও যেমন তাহাতে তাহার স্বাভাবিক অরুচি হয়, আমার দশাও সেইরূপই হইয়াছে। এই প্রকার নানা যুক্তিতর্কে চিত্ত একটু স্থির করিয়া ঠাকুরের নিকট গিয়া বসিলাম। ঠাকুর নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন— **বাড়ী গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে, অবিলম্বে পশ্চিমে চ'লে যাও। যেখানেই থাক না কেন, চণ্ডীপাঠ ও হোমটি ঠিক নিয়মমত ক'রে যেও। ব্রাহ্মণের প্রত্যহই অগ্নিসেবা কর্‌তে হয়। সৎসঙ্কল্প করে তুমি এই হোম কর্‌লে সেই সঙ্কল্প তোমার সুসিদ্ধ হবে। আভিচারিক ক্রিয়ার অনর্থেরও এই শান্তি-স্বস্ত্যয়নে নিবৃত্তি হবে। শ্বেত করবী, শ্বেত সরিষা, শ্বেত গোলমরিচ দ্বারা আহুতি দিতে হয়।**

১৬ই ভাদ্র,
বুধবার।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদার নিকটে থাকার সময়েও কি আমার ভিক্ষা করতে হবে?

ঠাকুর—**শুধু ভিক্ষা কেন? সবই কর্‌তে হ'বে। যেখানেই থাক না কেন নিয়ম কিছুই বাদ দিবে না। সমস্তই রক্ষা ক'রে চল্‌বে।**

আমি—দাদার নিকটে কতদিন অন্তর ভিক্ষা কর্‌তে পার্‌ব?

ঠাকুর—**যে দিন আর কোথাও ভিক্ষা না জুট্‌বে, সে দিন দাদার নিকটে কর্‌বে।**

আমি—ভিক্ষা কি শুধু ব্রাহ্মণের বাড়ীই কর্‌ব? না, যে কোন বাড়ী কর্‌তে পারা যায়?

ঠাকুর—**ভিক্ষান্ন সর্ব্বত্রই পবিত্র। সর্ব্বত্রই করা যায়। কিন্তু তোমার পক্ষে তা'ও ঠিক্ হবে না। তুমি সর্ব্বদা স্বপাকেই খেও। নিজের রান্না অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।**

আমি—দেবালয়ে দেবতাকে যা ভোগ দেয়, তা গ্রহণ করা যায়?

ঠাকুর—**ভাল ব্রাহ্মণে রশুই ক'রে ভোগ দিলে প্রসাদ পাওয়া যায়।**

ঠাকুরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, ভয় হইল। কিসে আবার কোন্ কথায় কি আদেশ করিবেন—শেষকালে মহামুস্কিলে পড়িব। সেদিন গুরুভ্রাতা সত্যকুমার গুহঠাকুরতা ঠাকুরকে

বলিলেন—প্রাণায়াম করিতে পারি না বড়ই কষ্ট হয়; কি কর্‌ব?

ঠাকুর বলিলেন—**কষ্ট হ'লে ক'রো না।**

সত্যকুমার আবার ঠাকুরকে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রাণায়াম না কর্‌লে কি কোন অনিষ্ট হবে?

ঠাকুর একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—**পাল্‌টে আস্‌তে হবে।** দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি না করিলে ঠাকুরের মুখ দিয়া এই দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। অদ্য দাদাকে লিখিয়া দিলাম "আমি শীঘ্র বস্তি রওয়ানা হইতেছি। আমার পাথেয় কলিকাতায় ছোটদাদার নিকটে পাঠাইয়া দিন।"

ভীষণ পদ্মা রাস্তায় ঠাকুরের কৃপা।

প্রত্যূষে ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বাড়ী রওয়ানা হইলাম। অপরাহ্নে বাড়ী পঁহুছিলাম। মাতৃদেবীকে দর্শন করিয়া বড়ই আরাম পাইলাম। মা'র সন্তোষার্থে ৭/৮ দিন বাড়ী রহিলাম। মা'র কাছে আহারের কোন নিয়মই রাখিলাম না; যখন যাহা দিলেন, মা'র তৃপ্তির জন্য ভোজন করিতে লাগিলাম। তাহাতে আমার কোন প্রকার ক্ষতিই বোধ হইল না; বরং সাধনে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। মা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দাদার নিকটে যাইতে অনুমতি দিলেন। ২৪শে তারিখে পশ্চিমে যাত্রা করিলাম। ষ্টীমারযোগে গোয়ালন্দ পৌঁছিবার জন্য বাড়ী হইতে ৪/৫ ক্রোশ অন্তর ভাগ্যকুল ষ্টেশনে নৌকাযোগে উপস্থিত হইলাম। পদ্মার রূপ দেখিয়া আতঙ্ক হইল, ঠিক্ যেন রক্তনদী। উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া খরস্রোতে সোঁ সোঁ শব্দে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। জীবনে পদ্মার এরূপ ভয়ঙ্কর আকৃতি আর কখনও দেখি নাই। পদ্মার এপার হইতে অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় না। নদী আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। যথা সময়ে ষ্টীমারে উঠিতে বিছানা ও বস্তা লইয়া মুস্কিলে পড়িলাম, কুলি মজুর পাইলাম না। এই সময়ে দু'টি ভদ্রলোক নিজ হইতে আসিয়া আমার বোঝা তুলিয়া লইলেন এবং ষ্টীমারে চাপাইয়া টিকেট করিয়া দিলেন। আমি ষ্টীমারে আসন করিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার কিছুক্ষণ চলার পরে বিষম হৈ চৈ শব্দ পড়িয়া গেল। তিনটি লোক পদ্মায় ভাসিয়া যাইতেছে শুনিলাম। সারং ষ্টীমার থামাইয়া বহু চেষ্টায় জলীবোট পাঠাইয়া লোক তিনটিকে তুলিয়া আনিল। শুনিলাম তাদের সঙ্গে আরো তিনটি লোক ছিল, কিন্তু তাদের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময়ে ষ্টীমার গোয়ালন্দে পৌঁছিল। "আপনি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ থাকিতে কুলিকে পয়সা দিবেন কেন?" এই বলিয়া একটি ভদ্রলোক আমার জিনিসপত্র তুলিয়া নিয়া ট্রেনে চাপাইয়া দিলেন। ভোরবেলা শিয়ালদহ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ছোটদাদা মেছুয়াবাজারে কিম্বা ঝামাপুকুরে থাকেন, নিশ্চয় জানি না। ১২ নং বাড়ীতে থাকেন, ইহাই

১৭ই হইতে ২৪শে ভাদ্র।

মাত্র স্মরণ আছে।

মুটের মাথায় বোঝা তুলিয়া দিয়া সহরের দিকে চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছি। একটু চলিয়াই আমরা মেছুয়াবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলাম। মুটে কিঞ্চিৎ অগ্রে ছিল; সে চৌমাথায় পৌছিয়াই আমাকে বলিল—"বাবু! কোন্ দিকে যাইবে?" আমার চমক্ ভাঙ্গিল; চাহিয়া দেখি সম্মুখে তিনটি পথ। কোন্ দিকে যাইব ভাবিতেই হঠাৎ ছোড়দাদাই রাস্তার অপরদিক হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি? কুলদা? চল, বাসায় চল।" আমি ছোড়দাদার সঙ্গে ১২ নং ঝামাপুকুরের বাসায় পঁহুছিলাম। তখন পর্য্যন্ত কেউ উঠে নাই; প্রায় সকলেই নিদ্রিত। অচেনা স্থানে চৌমাথার সংযোগস্থলে চল্‌তি মুখে অকস্মাৎ এই ভাবে ছোড়দাদাকে পাইয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা ঠাকুরেরই প্রত্যক্ষ কৃপা বুঝিয়া সারাদিন ঐ ভাবে অভিভূত রহিলাম। কুঞ্জ বিহারী গুহ, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাতে বড় আনন্দ পাইলাম।

অত্যদ্ভুত অনুভূতি ও নামের টান। বিচ্ছেদেই অবিচ্ছেদের সঙ্গ।

অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় আসিয়া নীচে একখানা নির্জ্জন ঘর পাইয়া তাহাতে আসন করিয়াছি। ন্যাস, হোম, পাঠ ও গায়ত্রী জপে বেলা এগারটা অতিবাহিত হয়। পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার আসনে বসি। অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত আমার কি ভাবে চলিয়া যায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। নাম করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঠাকুর সম্মুখে রহিয়াছেন এতই পরিষ্কার অনুভব হইতে থাকে যে তাহাতে বিহ্বল হইয়া পড়ি; ঠাকুরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁহার হাতনাড়া, মুখনাড়া, চোখের ভঙ্গী প্রভৃতি যেন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। অবিরল অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া বস্ত্র পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। কোন গুরুভ্রাতা আসিয়া ডাকিলে হঠাৎ জবাব দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। নামের সঙ্গে চিত্তটি সংলগ্ন হইলেই দেহের অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে ঠাকুর আমাকে নিয়া ফেলেন বুঝিতে পারি না। সেখান হইতে উঠিয়া আসিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়; উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। কথাবার্ত্তায় চলাফেরায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঠাকুরের অনুপম রূপের স্মৃতি একই ভাবে রহিয়াছে। উহা এতই স্বাভাবিক হইয়াছে যে ভুলিবার যো নাই। এখন আমার মনে হইতেছে ঠাকুরের কাছে নিয়ত থাকা অপেক্ষা, দূরে থাকিয়া এভাবে তাঁর সঙ্গ আরও মধুর। সর্ব্বদা ঠাকুরের সম্মুখে থাকায়—সান্নিধ্য হেতু প্রাণ ঠাণ্ডা থাকে, তাঁহার প্রভাবে চিত্ত উদ্বেগশূন্য হওয়ায় অবিচ্ছিন্ন সঙ্গের ঔৎসুক্যও ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়। তখন মনটি শুধু তাঁহাতেই নিবিষ্ট না থাকিয়া স্বভাব বশে অন্যত্র বিচরণ করে। কাজেই সঙ্গে থাকিয়াও বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হয়। ঠাকুরের রূপে, গুণে ও কার্য্যে চিত্তসংলগ্ন থাকিলেই যথার্থ তাঁর সঙ্গ হয়। সেই সঙ্গ তাঁর স্মৃতিতে

২৫শে ভাদ্র হইতে ৩১শে ভাদ্র।

বিচ্ছেদ অবস্থায়ই অধিক। অধিকন্তু ঠাকুরের কাছে থাকায় বাহ্যানুভূতির তুলনায়ই তাঁর মধুরতার আধিক্য; কিন্তু দূরে থাকায় কেবলমাত্র তাঁহাতেই চিত্তনিবিষ্ট হেতু মাধুর্য্যানুভূতি অতুলনীয়। গুরুদেব! তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে চাহিয়াছিলাম না। তাই কি তোমার এই বিরহের অপূর্ব্ব মাধুরী বুঝাইয়া দিলে?

পুরুষকারে ভরসা। কৃপার দান অগ্রাহ্য করার পরিণাম।

তিনদিন তিনরাত্রি এইভাবে অভিভূত হইয়া রহিলাম। চতুর্থদিনে মনে হইল, এই অবস্থা তো আমার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার সম্ভোগে সর্ব্বদা মত্ত না থাকিয়া পুরুষকার সহকারে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই ক্রমশঃ উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং অনন্যমনে এখন তাহাই করি। ইহা করিলেই ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শানুভব সহজে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি রূপাভিনিবিষ্টচিত্তকে চেষ্টাদ্বারা আনিয়া শুধু শ্বাস প্রশ্বাসে সংলগ্নপূর্ব্বক নাম করিতে লাগিলাম। ইহাতে ধীরে ধীরে রূপ ম্লান হইয়া ক্রমে, উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন শুষ্ক নামে শ্বাস প্রশ্বাস চঞ্চল হওয়ায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। শ্বাসে বা নামে কিছুতেই চিত্ত সংযোগ করিতে পারিলাম না। সাধনচ্যুত হইয়া চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলাম। ভিতরের অসহ্য জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আহা! বহু সাধন ভজন তপস্যার ফল যাঁহার ত্রিসীমায় পঁহুছিতে পারে না, ঠাকুরের সেই দুর্ল্লভ কৃপার দান পাইয়া হারাইলাম! ঠাকুর বলিয়াছেন— **ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হ'লে কৃতজ্ঞতার সহিত কাতর প্রাণে তাঁরই পানে তাকাইয়া থাক্‌তে হয়—তাহা হইলে সেটি থেকে যায়।** হায়, হায়! কুবুদ্ধিবশতঃ এই সহজ পথ না ধরিয়া আমি এ কি করিলাম? পুরুষকারদ্বারা তাঁহার কৃপার স্রোত বৃদ্ধি করিতে গিয়া বিপন্ন হইলাম। এখন যে আমার সমস্তই গেল। দয়াল ঠাকুর! আমাকে দগ্ধ করিয়া নিয়া আবার তোমার চরণতলে স্থান দাও।

শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন অমৃত। খিচুড়িতে নারিকেল খণ্ড।

কলিকাতা পঁহুছিলাম। প্রথমদিন কুঞ্জ ও ছোড়দাদা রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিন অচিন্ত্যদাদার বাসায় ভিক্ষা হইল। মুগ ডালের খিচুড়ি উননে চাপাইয়া অচিন্ত্যদাদার সহিত ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিলাম। এ দিকে খিচুড়ি পুড়িয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল। ধোঁয়াতে ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। খিচুড়িতেও চট্‌পট্ শব্দ হইতে লাগিল। অচিন্ত্যদাদা 'সর্ব্বনাশ হইল', 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিলেন। আমি খিচুড়ি নামাইয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। পরে হোম সমাপন করিয়া অচিন্ত্যদাদাকে দু'গ্রাস প্রসাদ পাইতে বলিলাম। আরও কেহ কেহ কিছু কিছু প্রসাদ নিলেন। আশ্চর্য্য এই, ভোজনপাত্রে খিচুড়ি ঢালা মাত্র অপূর্ব্ব সুগন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সমস্ত ঘর, বাড়ী ঐ

গন্ধে আমোদিত হইল। খিচুড়ির অদ্ভুত স্বাদ পাইয়া অচিন্ত্যদাদা কান্দিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধার দান কখনও নষ্ট হয় না—শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন অমৃত—এই ব্যাপারে পরিষ্কাব বুঝিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আহারে বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম।

একদিন মহেন্দ্রদাদার নিকটে ভিক্ষা করিলাম। তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন। চাল, ডাল, নুন, লঙ্কা, ঘৃত, আলু আনিয়া উৎসাহের সহিত আমার রান্নার যোগাড় করিযা দিলেন। উনান ধরাইয়া, খিচুড়ি চাপাইলাম। মহেন্দ্রদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাব আর কি চাই? আমি বলিলাম—যাহা চাই তাহা এখন আর সংগ্রহ হইবে না। এই খিচুড়িতে নারিকেল কুচো পড়িলে বড় চমৎকার হইত। মহেন্দ্রদাদা বলিলেন—আগে বলিলেই পারিতে, এখন আনিতে খিচুড়ি হ'য়ে যাবে। অল্পক্ষণ পরেই খিচুড়ি হইয়া গেল। উহা ঠাকুরকে নিবেদনান্তে হোম কবিযা আহার করিতে বসিলাম। মহেন্দ্রদাদাকেও কিঞ্চিৎ দিলাম। অদ্ভুত ঠাকুরের লীলা—অদ্ভুত তাঁব মহিমা! প্রতি গ্রাস খিচুড়িতে নারিকেলখণ্ড পাইতে লাগিলাম—আমিও অবাক্—মহেন্দ্রদাদাও অবাক্! কি যে কি হইল বুঝিলাম না। দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিতে স্পৃহাও জন্মিল না। প্রতিগ্রাস খিচুড়িতে আনন্দ স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—নাম আপনা আপনি সরস হইয়া উঠিল; ঠাকুরই যেন আমার মুখে আহাব কবিতেছেন বোধ হইতে লাগিল। আহার শেষ হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা অতীত হইল। ধন্য গুরুদেব!

বস্তি রওয়ানা হওয়ার কথা জানাইয়া—কলিকাতায় আমাব পাথেয় পাঠাইতে দাদাকে লিখিয়াছিলাম। দাদা আমাকে সজনীর সঙ্গে বস্তি যাইতে লিখিয়াছেন। সজনীর স্কুলের ছুটি হইতে বিলম্ব আছে—এখানেও আমার থাকার অসুবিধা, ভাগলপুরে যাওয়ার জন্য প্রাণ অকস্মাৎ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—এই অস্থিরতার কারণ কি জানি না—আগামী কল্যই ভাগলপুর রওয়ানা হইব স্থির করিলাম।

প্রেতের আর্ত্তনাদ, ফকিরের বাহন অদ্ভুত বৃক্ষ।
সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি।

হাবড়াতে ট্রেণে চাপিয়া রাত্রি প্রায় ১টার সময়ে ভাগলপুর ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। একটি কুলী সঙ্গে লইয়া খঞ্জরপুরে পুলিনপুরী চলিলাম। আজ ভয়ঙ্কর অন্ধকার। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া 'মশাইয়ের চকে' উপস্থিত হইলাম। বিস্তৃত ময়দানের ভিতর দিয়া রাস্তা, দু'দিকে বড় বড় বৃক্ষ রহিয়াছে। হাসপাতালের বিপরীত দিকে একটি প্রকাণ্ড আমগাছের নিকটে উপস্থিত হওয়া মাত্র অতিশয় যন্ত্রণাসূচক শব্দ শুনিতে পাইলাম। উহা শুনিয়াই চমকিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম; সর্ব্বত্র জন-প্রাণী শূন্য অন্ধকারময়। শব্দটি আমার ১০/১২ হাত অন্তরে গাছের উপব হইতে আসিতে লাগিল। যেন উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত

১লা আশ্বিন হইতে ৪ঠা আশ্বিন।

কোন মুমূর্ষু রোগী গোঁ গোঁ করিতেছে। সময় সময় গোঁ গোঁ শব্দ স্পষ্টও হইতেছে। সঙ্গী কুলী উহা শুনিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল। আমি নাম করিতে করিতে স্বাভাবিক গতিতেই চলিলাম। শব্দটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় দুই মিনিট রাস্তা আসিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

মুটে আমাকে বলিল 'বাবা! এ সব গাছে এক সময়ে বহুলোকের ফাঁসি হইয়াছিল। এ স্থান অতি ভয়ঙ্কর। এই গাছের নীচে চলিবার সময়ে এই প্রকার শব্দ অনেকবার শুনিয়াছি।' আমার মনে হইল হাসপাতালের কোন রোগী মৃত্যুর পরে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। এই প্রকার সুস্পষ্ট প্রেতের আর্ত্তনাদ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই।

ভাগলপুর পঁহুছিয়া মহাবিষ্ণুবাবুর সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। একদিন তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে "কর্ণগড়ে" গেলাম। এই কর্ণগড়ই নাকি কলিঙ্গাধিপতি দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল। বহু বিস্তৃত উচ্চভূমি পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। স্থানটি দেখিয়া প্রাণ যেন উদাস হইয়া গেল। কিছুক্ষণ ওখানে বসিয়া রহিলাম। পরে সরকারী বাগানে গেলাম। বাগানে একটি পুরানো প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিলাম। বৃক্ষটির নাম কেহ জানে না। দশ বার হাত বেড়—অত্যন্ত মোটা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার একটি সরু ডাল ধরিয়া ঝাঁকি দিলে ঝড়ের মত সমস্ত গাছটি নড়িয়া উঠে। জনশ্রুতি, কোন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ফকির পাহাড় হইতে এই বৃক্ষে চড়িয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বৃক্ষ এখানে আছে। বাসায় আসিবার সময়ে রাস্তার ধারে একটি কালীমন্দির দেখিলাম। শুনিলাম, কোন এক সাহেব কালীর অলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেবীর স্থায়ী সেবা-পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত সেবা-পূজা নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। চার পাঁচ দিন ভাগলপুর থাকার পর বস্তি যাইতে অস্থির হইলাম। দাদা ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, ঠাকুরের আদেশ রক্ষার্থে আমাকে বস্তি যাইতেই হইবে। ভাগলপুর আসিয়া ভিক্ষা প্রত্যহই করিলাম। নিত্যক্রিয়ার কোনপ্রকার বিঘ্ন ঘটিল না।

কুক্ষণে যাত্রার দুর্ভোগ। পদে পদে ঠাকুরের দয়া পরবর্ত্তী আদেশই বলবান।

৫ই আশ্বিন,
মঙ্গলবার।

ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে ভাগলপুর হইতে বস্তি রওয়ানা হইলাম। কুক্ষণে যাত্রার কুফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। গাড়ীখানা ষ্টেশন পঁহুছিতে অর্দ্ধ রাস্তায় আসিয়াই অচল হইল। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে জনমানবশূন্য ময়দানে বিষম বিপদে পড়িলাম। ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত এই আপদে আর উপায় নাই মনে করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই একখানা খালি গাড়ী ষ্টেশনের দিকে যাইতেছে দেখিলাম। ঐ গাড়ীখানায় চাপিয়া ট্রেণ ছাড়িবার ৪/৫ মিনিট পূর্ব্বে

ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। তাড়াতাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। সমস্ত রাস্তায় কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বসিয়া পরদিন বেলা প্রায় নয়টার সময়ে বাঁকীপুর ষ্টেশনে নামিলাম। গুরুভ্রাতা ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কুঞ্জ ঠাকুরতা আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধানে অচেনা পথে দারুণ রৌদ্রে তিন চারি মাইল ঘুরিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। কপালের ভোগ—কুঞ্জকে পাইলাম না শুনিলাম, ব্রজেন্দ্রবাবুও জগন্নাথ গিয়াছেন। সুতরাং তখনই আবার দুই প্রহর রৌদ্রে ষ্টেশনে আসিলাম। ক্ষুধায় ও পিপাসায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। মুসাফিরখানার এককোণে পড়িয়া রহিলাম; এই সময়ে একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবা! থোড়া আচ্ছা দুধ হাম লেয়ায়া। গরম গরম পায় লেও, ঠাণ্ডা পানি ভি হ্যায়।" এই বলিয়া তিনি আমার হাতে একটি সন্দেশ দিলেন। প্রায় অর্দ্ধসের পরিমাণ দুধ ও পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পান করিয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। যথাসময়ে বস্তির টিকেট করিয়া ট্রেণে চাপিলাম। দিঘা ঘাটে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম, পরে সন্ধ্যার সময়ে পালিজা ঘাটে পঁহুছিলাম। একটু অধিক রাত্রিতে বস্তির গাড়ি আসিল—সময়মত তাহাতে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। একটি লোক সাধু বেশ দেখিয়া আমাকে কিছু দিতে চাহিল। আমি টাকা পয়সা নেই না বলায় তাহার আরও ভক্তি হইল। সে একমুঠো পয়সা আমার পাশে বেঞ্চের উপর রাখিয়া বলিল—"ক্ষুধা পাইলে রাস্তায় খাবার কিনিয়া খাইবেন, এই পয়সা আপনারই রহিল।" কয়েক ষ্টেশন যাওয়ার পর আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিস কিনিয়া খাইলাম। একটু বেলা হইলে বস্তি পঁহুছিলাম। মুটের মাথায় বিছানা বস্তা তুলিয়া দিয়া দাদার বাসায় উপস্থিত হইলাম। দাদা আমাকে দেখিয়া প্রথমেই বলিলেন—"তুমি নাকি ভিক্ষা করিয়া খাও? আমার এখানে তা কিন্তু হবে না। এ জন্যেই তোমার পাথেয় পাঠাই নাই।" দাদা দুই এক মিনিট কথাবার্ত্তা বলিয়া হাসপাতালে চলিয়া গেলেন। আমি বিষম উদ্বেগে পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন আমি কি করি—ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা স্বপাক আহার, আমার প্রতি ঠাকুরের আদেশ। আবার দাদার নিকটে থাকা, ইহাও এক সময়ের জন্য ঠাকুরের বিশেষ আদেশ। কিন্তু ভিক্ষা করিলে দাদা আমাকে তাঁর নিকটে থাকিতে দিবেন না। এখন একটি করিতে গেলে অপরটি লঙ্ঘন করিতেই হইবে! এ অবস্থায় আমার কোনটি কর্ত্তব্য? দাদার সঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে রাস্তার দুর্ভোগ, নানা প্রকার অনিয়ম ও ঠাকুরের দুর্ল্লভ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এতদূরে আসা সমস্তই নিরর্থক হয়। পক্ষান্তরে দাদাব সঙ্গে থাকিতে পারিলে সমস্তই সার্থক। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা পরবর্ত্তী আদেশই বলবান। সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া দাদার সঙ্গেই থাকিব স্থির করিলাম।

দাদার পাঁচ পয়সা ঘুষ লওয়ার স্বপ্ন সত্য— প্রায়শ্চিত্ত।

বস্তি-হাসপাতাল বড় রাস্তার ধারে, প্রকাণ্ড ময়দানের উপরে। নিকটে কোন লোকালয় নাই, সহর অনেকটা দূরে। দাদার থাকিবার স্থানটিও তেমন সুবিধাজনক নয়। বাহিরে লম্বা একখানা 'খাপবার' ঘর। তার সংলগ্ন একটি ছোট কুঠরী। ভিতরে তিন চারখানা পাকাঘর আছে, তাহাও তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। আমি বাহিরের ছোট ঘরখানায় আসন করিলাম। আমার বস্তি আসিবার হেতু অবগত হইয়া দাদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। হাসপাতালের কাজ কর্ম্মের পর অবশিষ্ট সময় আমারই সঙ্গে থাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রবণে দাদার বড়ই আনন্দ দেখিতেছি। একদিন দাদা বলিলেন—''আমার একটি স্বপ্ন বিষয়ে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলাম। স্বপ্নটি শুনিয়া তিনি কি বলিলেন?''

আমি—স্বপ্নটি আপনি বিস্তৃতরূপে কিছুই ত লিখেন নাই।

দাদা—বিস্তৃত আর কি? শেষ রাত্রিতে দেখিলাম, একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন— 'পাঁচটি পয়সা তুমি ঘুষ লইয়াছ।' স্বপ্ন দেখিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সারাদিন উদ্বেগে কাটাইলাম। আমি ঘুষ নিয়েছি—এ কেমন কথা? জীবনে কখনও কাহারও এক কপর্দ্দকও নেই নাই। ঘুষ নিলে রাজা হইতে পারিতাম—সেদিনও একটি রাজা চল্লিশহাজার টাকা পায়ের কাছে রাখিয়া কান্নাকাটি করিল; সত্য গোপন করিয়া রিপোর্ট করিলে একটি মেয়েও আত্মহত্যা করিত না। কিন্তু জানিয়াও তাহা আমি পারিলাম না। এক পয়সার পান পর্য্যন্ত কেহ আমার বাড়ীতে দিতে পারে না। আর আমি ঘুষ নিয়েছি?

আমি—ঠাকুর আপনার চিঠি শুনিয়া বলিলেন—**স্বপ্ন যথার্থ। কোনদিন কোন সময়ে ঘুষ নিয়েছেন—তিথি নক্ষত্র ধ'রে বলা যায়। দাদাকে লিখে দেও—কোনও দেবালয়ে ভোগের জন্য অথবা সাধু কাঙালীদের সেবার জন্য কিছু দান করেন। তা হ'লেই ঐ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে।** আপনাকে ত এসব কথা লেখা হয়েছিল—আপনি কি তা করেন নাই?

দাদা—না, এখনও তা করি নাই। দেবালয় এখানে নাই—নানক-সাহীদের একটি আখ্ড়া আছে, সেখানে ৫টি টাকা দিয়া আসিব।

মহাত্মা গোবিন্দদাসের বিস্ময়কর কার্য্য।
অন্যের উৎকট ভোগ গ্রহণ।

আমি—সাধু গোবিন্দদাসের কথা আপনি লিখিয়াছেন, তিনি কে?

দাদা—তিনি উদাসীন একটি মহাত্মা—আমাকে রক্ষা করিতেই এখানে আসিয়াছিলেন।

লোক-সঙ্গ এখানে নাই, সর্ব্বদা একাকী থাকিতে হয়। এজন্য একটি সাধুকে রাখিয়াছিলাম। সাধু খুব শক্তিশালী ছিলেন। কাজকর্ম্ম বাদে সারাদিন আমি তাঁর কাছে থাকিতাম। তাঁর হাত-পা টিপিতাম, হাওয়া করিতাম। বাড়িতে খরচ পাঠাইয়া বেতনের অবশিষ্ট টাকাগুলি তাঁরই হাতে দিতাম। তিনি যেমন বলিতেন, তেমনিই খবচ করিতাম। দিন দিন তাঁর উপরে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম, যে তাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইত না। সাধন-ভজনও প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। উপকার তাহাতে কিছুই বোধ করিতাম না, অথচ তাঁকে ভাল লাগিত। আমাকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একদিন গোবিন্দদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দদাস আসিতেই ঐ সাধুটি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় গোবিন্দদাসই তাঁকে সরাইয়া দিলেন। গোবিন্দদাসের সঙ্গে বড়ই আনন্দে ছিলাম। গুরুতে ও সাধন-ভজনে যাহাতে নিষ্ঠা-ভক্তি হয়, তিনি সেইরূপ উপদেশই করিতেন। বড়ই দয়ালু ছিলেন। কারও ক্লেশ দেখিলে, অস্থির হইয়া পড়িতেন। একদিন একটি খোঁড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য আমার নিকটে আসিতেছেন দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আহা! এই গবীব ব্রাহ্মণটির সামনে প্রারব্ধের দারুণ ভোগ। এই ভোগে পড়িলে ইহার জীবন ক্লেশে ক্লেশেই শেষ হইবে। জীবনে আত্মার কল্যাণকর কোন কর্ম্মই আর করিতে পারিবে না।" এসব কথা হইতেছে, এমন সময়ে সেই ভিখারী ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার নিকটে কিছু ভিক্ষা চাহিল। গোবিন্দদাস আমাকে কিছু সময়ের জন্য ভিতরে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

গোবিন্দদাস ভিখারীকে গালি দিয়া বলিলেন—আরে শালা! কাঁহে ভিখ্ মাঙ্গ্‌নে আয়া? মজুরী নাহি কর্‌নে সেক্‌তা।

ব্রাহ্মণ—তোম্‌রা পাছ্ নাহি মাঙ্গ্‌তা।

গোবিন্দদাস —আরে শালা, লুচ্চা। তোহার বাপ্‌কা পাছ্ মাঙ্গ্‌তা হ্যায়?

ব্রাহ্মণ—তুতো—বড়া সাধু বন্‌কে বৈঠা হ্যায়! চুপ রহো। গালি মাৎ দেও।

গোবিন্দদাস অম্‌নি "নিকাল্ শালা, নিকাল্ শালা" বলিতে বলিতে মোটা লাঠি দ্বারা ভিখারীকে এমন প্রহার করিলেন, যে তার একখানা হাত ভাঙ্গিয়া গেল। গোবিন্দদাস তখন আমাকে ডাকিয়া, উহাকে হাসপাতালে নিয়া ঔষধ দিতে বলিলেন। আঘাত গুরুতর ছিল, আমি সাংঘাতিক বলিয়াই রিপোর্ট করিলাম। মামলা আরম্ভ হইল। গোবিন্দদাস আমাকে বলিলেন—বাবু সাব! আব্ দু-তিন বয়ষকো লিয়ে হাম যাতা হ্যায় জেলখানা উস্‌মে ক্যা? ব্রাহ্মণ তো বাঁচ্‌গিয়া! গোবিন্দদাসের দুই বৎসর সশ্রম জেল হইল।

আমি দাদাকে বলিলাম—ঠাকুর গোবিন্দদাসের কথা শুনিয়া, ঢাকার কয়েকটি সম্ভ্রান্ত লোককে তাঁর ক্লেশ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই মত কাজও হইয়াছে। গোবিন্দদাস কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশীর জেলখানায় ছিলেন। গোবিন্দদাসের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিযাছিলেন

যে,—গোবিন্দদাস যথার্থই মহাত্মা। ভিখারী ব্রাহ্মণের উৎকট প্রারব্ধের ভোগ কাটাইতেই তিনি তাঁহাকে প্রহার করেন, এবং তাঁর ভোগ লইয়াই তিনি জেলে যান। মহাত্মাদের কার্য্যের গূঢ় রহস্য বুঝা কঠিন।

অপ্রাকৃত আরতির গন্ধ।

১৫শে আশ্বিন, রবিবার।

গতকল্য মহাষ্টমীতে নিরম্বু উপবাস করিয়া জপ হোম ও চণ্ডীপাঠে সারাদিন অতিবাহিত হইয়াছে। আজ নবমীতেও দিনটি সাধন-ভজনে বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর আহারান্তে বাহিরের আঙ্গিনায় দাদার সঙ্গে বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতেছি, আকস্মাৎ দিব্য আরতির পবিত্র গন্ধ পাইলাম। ধূপ-ধুনা-চন্দন-গুগ্‌গুলাদি জ্বালাইয়া যেন মহা সমরোহে নিকটেই কোথায়ও মায়ের আরতি হইতেছে। এই অদ্ভুত সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু, দাদা ও আমি অনুসন্ধান করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হাঁসপাতালের তিন দিকে ধূ-ধূ মাঠ, একদিকে বড় রাস্তা, তাহারও নিকটে কোন লোকালয় নাই। গন্ধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরম পবিত্র সুগন্ধকে মায়ের অপ্রাকৃত প্রসাদজ্ঞানে প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিতে লাগিলাম। অন্যূন দেড়ঘণ্টাকাল এই গন্ধ আমাদিগকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিল। মনে হইতে লাগিল, যেন ঠাকুরেরই কাছে বসিয়া রহিয়াছি। দাদাও এই গন্ধ পাইয়া বিস্ময়ের সহিত দু'ঘণ্টাকাল একই ভাবে অবাক্ হইয়া রহিলেন।

ভিক্ষা করিতে দাদার অনুমতি।

১৮ই আশ্বিন, বুধবার।

বস্তি আসিয়া কয়েকদিন ভিক্ষা বন্ধ রহিল। প্রত্যহই আহারের সময়ে কান্না পাইতে লাগিল। ঠাকুরকে কাতরভাবে নিজের অবস্থা জানাইতে লাগিলাম। ভিক্ষান্ন বন্ধ হওয়াতে আহারে তৃপ্তি নাই, ভজনে উৎসাহ নাই, মনেও শান্তি নাই। বড়ই দুঃখে দিনরাত কাটিয়া যাইতেছে। আজ দাদা কথায় কথায় বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি ভিক্ষা করিয়া খাও কেন? ভিক্ষায় লাভ কি?" আমি বলিলাম—লাভালাভ ঠাকুর জানেন। তবে আমি তো দেখিতেছি, ভিক্ষান্নে যে তৃপ্তি, ঘরের অন্নে তাহা নাই। ঘরের অন্ন আহারে উৎসাহ উদ্যম যেন নিবিয়া যাইতেছে, মনে সর্ব্বদাই একটা উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। দাদা একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তা হলে আজ থেকেই আবার ভিক্ষা আরম্ভ কর। গুরুর যখন আদেশ—তখন ইহা কর্‌তেই হবে। তবে সহরে তুমি ভিক্ষা ক'রো না।"

সদ্‌ব্রাহ্মণের হস্তে প্রথম ভিক্ষা।

আমি সহরের বাহিরে প্রায় ৩/৪ মাইল অন্তরে পাড়াগাঁয়ে যাইয়া ভিক্ষা করিব স্থির করিলাম। ইহাতে আমার কোন ক্লেশই হইবে না—বরং উহা মনে করিয়া আনন্দই হইতেছে। একাদশীতে নিরম্বু করিয়া গতকল্য দ্বাদশীতেও অন্ন গ্রহণ করি নাই—লুচি খাইয়াছি। অদ্য ত্রয়োদশীতে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে বাসা হইতে ঘটি লইয়া বাহির হইলাম। জীবনে অপরিচিতের নিকটে কখনও ভিক্ষা করি নাই, আজই প্রথম। রাস্তায় চলিতে চলিতে বুদ্ধদেবের কথা মনে হইল। ভগবান্ গুরুদেব যেন বুদ্ধদেব-রূপে আমার অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন, মনে এরূপ একটা ভাব আসিয়া পড়িল। আমি পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। এক সময়ে বুদ্ধদেব-রূপে গুরুদেব এই স্থানে বৈরাগ্যের কি দৃষ্টান্তই দেখাইয়া গিয়াছেন, স্মরণ করিয়া প্রাণ উদাস হইয়া উঠিল। ভিক্ষার জন্য ঘুরিতে ঘুরিতে একটি গৃহস্থ-বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! কি চাই?" আমি বলিলাম—"আপনাদের সকলের আহার হইয়াছে?" তাঁহারা বলিলেন, "মধ্যাহ্নে সকলেই আহার করিয়াছি।"

১৯ শে আশ্বিন,
বৃহস্পতিবার।

আমি—তা হ'লে আমাকে ভিক্ষা দিন্!

তাঁহারা খুব ভক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কয় জন?"

আমি —আমি একা।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খুব শ্রদ্ধার সহিত প্রচুর পরিমাণে চাল, আলু ও নুন আনিয়া দিলেন। আমি নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ভিক্ষান্ন আহার করিয়া আজ বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। যদিও চাউলগুলি বাছিয়া নিলে প্রায় কিছুই থাকিত না, তথাপি রান্নার পরে উহার স্বাদ উৎকৃষ্ট হইল; মনে একটা ভরসা হইল—আজ প্রথম দিনে অপরিচিত স্থলে ভিক্ষায় যখন সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে শ্রদ্ধার অন্ন পাইলাম, তখন প্রত্যহই এই প্রকার পাইব।

ভিক্ষায় তাড়না ও সমাদর।

ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝি না; আজ দুই ক্রোশ পথ চলিয়া ভিক্ষার জন্য একটি কসাই-এর বাড়ী উঠিলাম। ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিতীয়বার একটি মেথরের বাড়ী পঁহুছিলাম। পরিচয় পাইয়া ওখান হইতে চলিয়া আসিলাম। এবং গ্রামান্তরে যাইয়া একটি গৃহস্থের বাড়ী ভিক্ষা চাহিলাম। তাঁহারা হাতে ঠেঙ্গা লইয়া আমাকে তাড়া করিয়া আসিল, আমি দৌড় মারিলাম। তিন বাড়ী ভিক্ষার চেষ্টা করিয়া বাসায়

২০শে আশ্বিন,
শুক্রবার।

আসিলাম। দাদার ঘরে ভিক্ষা করিলাম। দাদা আমার ভিক্ষার দুর্দ্দশা শুনিয়া পুরানো বস্তির বাজারে ভিক্ষা করিতে বলিলেন। বাজারে প্রত্যহই ভিক্ষায় উৎকৃষ্ট বস্তু পাইতে লাগিলাম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করি না দেখিয়া, সকলেই আমাকে মহাত্মা ঠাওরাইল। মিষ্টি, দুধ, রাবড়ি, তরিতরকারি লোকে প্রচুর পরিমাণে দিতে লাগিল। প্রত্যহই প্রয়োজন মত কিছু লইয়া অবশিষ্ট সবই ফিরাইয়া দিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার উপরে সাধারণের শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইল। কখন আমি আসিব ভাবিয়া অনেকেই আমাকে ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এ সব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে পাড়াগাঁয়েও ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। বস্তিতে আসিয়া ভিক্ষান্ন আহারে আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিলাম, পূর্ব্বে আর কখনও তাহা পাই নাই। জয় গুরুদেব!

পর্য্যটন কালে সাধনে নিবিষ্টতা।

২২শে—২৫ শে আশ্বিন, ১২৯৯।

ভিক্ষার সূত্র ধরিয়া ঠাকুর আমাকে পর্য্যটনের এক আশ্চর্য্য উপকারিতা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। পর্য্যটনকালে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্বভাবতঃই স্থূল ও দীর্ঘ হওয়ায়, মনটিকে তাহাতে নিবিষ্ট রাখা খুব সহজ সাধ্য হয়। কিন্তু আসনে স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক স্বাভাবিক সরুনালের অনুগামী হওয়া অতিশয় শক্ত। কারণ, শরীরের অভ্যাসগুণে মনটিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, প্রতিনিয়ত বিষয়ান্তরে আকর্ষণ করে; কিন্তু ভ্রমণকালে সর্ব্বাঙ্গের চেষ্টা পর্য্যটনেই ন্যস্ত থাকায়, চৈতন্য প্রধানতঃ শ্বাসে প্রশ্বাসে সংযুক্ত হয়; তখন নিবিষ্টমনে নামটিকে উহাতে যোগ কবিতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। বোধ হয় পরিব্রাজক, সাধু-সন্ন্যাসী, পরমহংসেরা সাধনে এই অসাধারণ সাহায্য লাভের জন্য সর্ব্বদা পর্য্যটনে থাকেন। আহার নিদ্রা ব্যতীত কোথাও তাঁহারা অধিকক্ষণ একস্থানে অবস্থান করেন না। এতকাল ভাবিয়াছি, যাঁহারা সারাদিনই ঘুরিয়া বেড়ায় তাঁদের আর ভজনসাধন কি? ঠাকুর আমার এই ভ্রম পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন।

উপরি শক্তির অনুভব। প্রেতের উপদ্রব।

রাত্রে নাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ি। যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয়, কে যেন খাটিয়াখানা শুদ্ধ আমার সর্ব্বশরীর ঝাঁকিয়া দেয়। আবার কখনও কখনও এই ঝাঁকুনিতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই ঝাঁকি প্রায় ১ মিনিটকাল, কখন কখন অধিক সময়ও থাকে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এমন কাঁপিতে আরম্ভ করে, যে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে পারি না। এই সময়ে আপনা আপনি খুব নাম চলিতে থাকে, ঝাঁকুনিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলেও দেখি ভিতরে ভিতরে দ্রুতবেগে নাম চলিতেছে।

এইরূপ কেন হয়, অনুসন্ধানে কিছুই বুঝিতেছি না। মনে হয়, কোন শক্তিশালী ফকির আমার হিতোদ্দেশ্যেই এই প্রকাব করিতেছেন। গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া নাম করিবার সময়ে কখন কখন এরূপ ঝাঁকুনিতে আসন শুদ্ধ সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিত। ঠাকুরকে জ্ঞাত করায় তিনি বলিয়াছিলেন—**ওরূপ হওয়া খুব ভাল**। এইরূপ ঝাকুনিতে আমি ভীত না হইয়া বরং আনন্দই অনুভব করিতেছি। এ সব কথা দাদাকে বলায় দাদা কহিলেন—হাসপাতালের মধ্যে থাকায় অনেক সময়ে প্রেতের উপদ্রব দেখিতে পাই। ফয়জাবাদ হাসপাতালে একটি রোগী অনেক দিন ভুগিয়া মারা যায়। তাহার স্থানে অন্য একটি বোগী রাখা হইলে, সে দু'দিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। ক্রমে তিন চারিটি রোগী দিলাম, কিন্তু সকলেই নানাপ্রকার প্রয়োজনের ভাণে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহার হেতু কি জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগীদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—"ঐ বিছানায় যে থাকে রাত্রে একটা প্রেত আসিয়া তা'রই উপর উপদ্রব করে। প্রেত বলে— 'তু হামারা বিস্তারা পর কাঁহে লেটা, তোহারা জান্ লেএঙ্গে।' এই বলিয়া প্রেত তার বুকে চাপিয়া বসে এবং গলা টিপিয়া ধরে। জাগিয়া থাকিলে কিছুই করে না—কিন্তু নিদ্রিত হইলেই এই প্রকার উপদ্রব।" আমি সকলকে বলিয়া দিলাম—"আচ্ছা, আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। নূতন রোগী দিলে তাকে এ সব কথা কেহ বিন্দুবিসর্গ বলিও না।" পরে একটি জোয়ান মর্দ্দ রোগীকে ঐ খাটিয়ায় থাকিতে দিলাম, এবং রোগমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে যাইতে পারিবে না, এই ব্যবস্থায় তাহাকে রাজী করাইয়া নিলাম। পরদিন হাসপাতালে যাইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন ছিলে?" রোগী বলিল—"বাবু সাহেব! এখানে বড় মাথা গরম হয়—রাত্রে ঘুম হয় না।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা আজ ঘুমের ঔষধ দিব।" দ্বিতীয় দিনে সকালে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ক্যায়সা রহা রাত্‌মে?" রোগী বলিল—"বাবু সাব্! আপ কৃপা কর্‌কে হাম্‌কো ছোড় দির্জিয়ে, হাম ইহা নেহি রহেঙ্গে।' আমি উহার কথার কোন উত্তর না দিয়া, যাহারা রোগীদের খাবার দেয়, এবং সেবা শুশ্রূষা করে, তাহাদের খুব ধমক্ দিয়া বলিতে লাগিলাম—"তোমরা আমার রোগীকে কষ্ট দিচ্ছ, ভাল খাবার দেও না, সেবা-শুশ্রূষা কর না, তাই যাইতে চায়। এই রোগী আবার এইরূপ বলিলে তোমাদের তাড়িয়ে দিব।" এই বলিয়া রোগীর খাবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। রোগী চুপ্ করিয়া রহিল। তৃতীয় দিনে দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, রোগী খাটিয়া হইতে নামিয়া বসিয়া আছে। এক হাতে তার মোটা লাঠি—লাঠির মাথায় ঘটি বাঁধা; আর এক হাত হাঁটুর উপরে, বস্তা ধরিয়া আছে—ঠিক যেন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি উহার নিকট পঁহুছিতেই —"বাবু সাবু! সেলাম! আব্ তো হাম চল্‌তি।" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। আমি অমনি ধমক্ দিয়া বলিলাম—"নেহি, তোমারা রয়্‌নে হোগা।" রোগী খুব উত্তেজিত হইয়া আমাকে বলিল—"জাহান দেএঙ্গে ক্যা? নিত্ রাতমে শালা জিন আয়কে, হামারা ছাতিপর বৈঠ্‌তা, আউর মারপিঠ্ কর্‌তা। বোল্‌তা—তোহার জান্ লেএঙ্গে। খাটিয়া ছোড়্‌দে।' হাম সারারাত্ ইহাঁ নিচুমে বৈঠ্‌রয়্‌তে। মই তো কভি নেহি রহেঙ্গে।"

ডাক্তার ওব্রায়েন (O' Brien) তখন ছিলেন, তিনি খাটিয়াখানা সরযূতে ফেলিয়া দিতে বলিলেন।

একটি স্বপ্ন দেখার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে ফিরিয়া যাইতে প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু দাদাকে ইহা বলিতে সাহস পাইতেছি না। দাদা অবসর সময়ে এক মুহূর্ত্তও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চান না। আমি চলিয়া গেলে দাদা নিতান্তই সঙ্গহীন হইয়া পড়িবেন। দাদা নিজে আমাকে অন্যত্র যাইতে বলিবেন এরূপ মনে হয় না। এই সঙ্কটে ঠাকুর যদি কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন তবেই হইবে—না হইলে আর উপায় নাই।

বস্তি ত্যাগ, অযোধ্যায়—হা রাম! উদাস ভাব।

ভাগিনেয় শ্রীমান সুরেন্দ্রের পত্রে জানিলাম, ভাগলপুরে উহাদের বাড়ীতে আবার আভিচারিক ক্রিয়াজনিত নানা উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। আমাকে অবিলম্বে তথায় যাইতে আমার ভগিনীপতি মথুর বাবু দাদাকে তার করিয়াছেন। উহাদের বিশ্বাস আমি ভাগলপুরে থাকিলে যাদুকরেরা কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। দাদাও আমাকে ভাগলপুরে পাঠাইতে ব্যস্ত হইলেন। আকস্মিক এই ব্যাপারে আমার বস্তি ত্যাগের সুবিধা হইল। আমিও যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

১লা কার্ত্তিক, রবিবার।

বস্তিতে আসিয়া দাদার সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। সাধন-ভজনে দীর্ঘকালব্যাপী এমন সুন্দর অবস্থা বড় শীঘ্র ভোগ করি নাই। ঠাকুর সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে—এই ভাবটি যেন একটানা লাগিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরকে স্মরণ করিলেই চক্ষে জল আসে, নামে ঠাকুরের স্মৃতি উজ্জ্বল করে। নিকটে থাকা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া ঠাকুরের ধ্যানেই যে অধিক আনন্দ ইহা এবার পরিষ্কার উপলব্ধি করিলাম। শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা দর্শন করিয়া ভাগলপুরে যাইব, স্থির করিলাম। দাদাকে একাকী রাখিয়া যাইব ভাবিয়া প্রাণ অস্থির হইল। এই সময়ে মাধুদাস বাবার শিষ্য সাধু কানাইয়ালালজী ফয়জাবাদ হইতে দাদাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দাদা খুব আনন্দে থাকিবেন। আমিও সুযোগ বুঝিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভাগলপুর যাত্রা করিলাম। সাড়ে নয়টায় বস্তিতে ট্রেনে চাপিয়া অপরাহ্নে সরযূতীরে 'লকরমণ্ডি' ঘাটে নামিলাম। রাস্তায় ক্ষুধা ও পিপাসায় বড়ই অবসন্ন হইয়াছিলাম। একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আমাকে আসিয়া বলিলেন —"বাবাজী! কিছু খাবেন? পুরী, কচুরী, লাড্ডু কিছু আনিয়া দেই।" আমি বলিলাম—না, বাজারের ওসব আমি খাই না—অযোধ্যা গিয়া হনুমান্‌জীর প্রসাদ পাইব। ভদ্রলোকটি একটি মাটির হাঁড়ি হইতে উৎকৃষ্ট বরফি তুলিয়া আমার সম্মুখে রাখিতে লাগিলেন, বলিলেন—"এই প্রসাদ হনুমান্‌জী আপনার জন্য পাঠাইয়াছেন। হনুমান্‌জীকেই ভোগ চড়াইয়া এই প্রসাদ লইয়া আমি বাড়ী যাইতেছি—স্বচ্ছন্দে আপনি সেবা

অযোধ্যার গুপ্তার ঘাট

এই স্থানেই সরযূ গর্ভে লক্ষ্মণ গুপ্ত হন
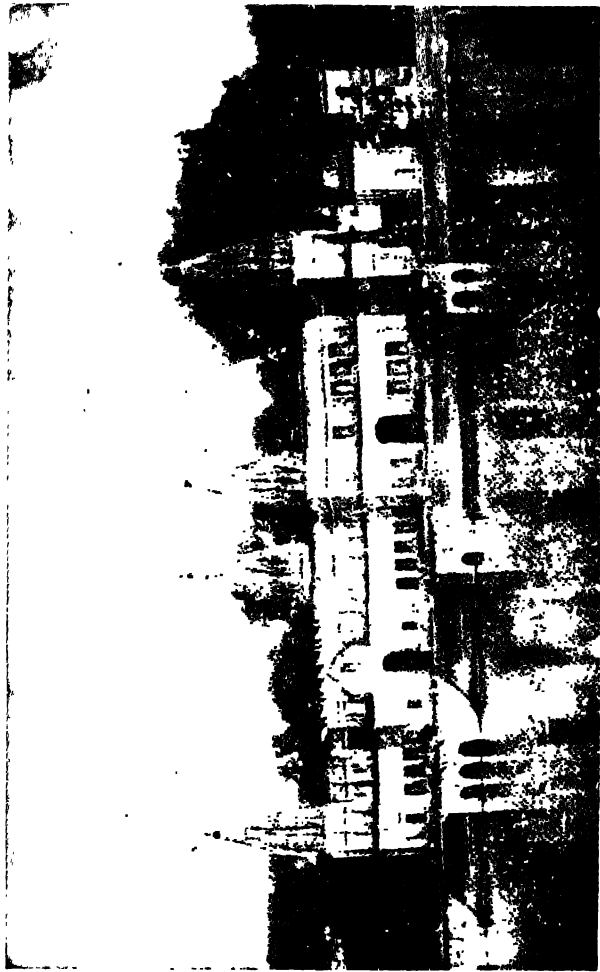
কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাট

করুন।" হনুমান্‌জীকে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বরফি ও সরযূর ঠাণ্ডা জল প্রাণ ভরিয়া খাইলাম। ভক্তরাজ মহাবীরের এত দয়া! স্মরণ করিয়া চক্ষে জল আসিল। পুণ্যসলিলা সরযূর বিশালবক্ষে চড়া পড়িয়াছে দেখিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সরযূকে প্রণাম করিয়া চড়ার উপর দিয়া চলিলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা এখন সরযূর গর্ভে**। চলিতে চলিতে মনে হইল—এই স্থানেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অপ্রাকৃত অযোধ্যা ধাম। রাম আজ কোথায়! রামের কথা মনে হওয়ায় প্রাণ উদাস হইয়া পড়িল। একটা শোকাবেগ উপস্থিত হইল; এবং ভিতর হইতে আপান আপনি "হা রাম! হা রাম!" শব্দ বারংবার উঠিতে লাগিল। আমি কান্দিতে কান্দিতে চলিলাম। সরযূর বালি গায়ে মাখিয়া পুনঃপুনঃ রামকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। তখন সেই পরিষ্কার অভ্রকণার মত সরযূর শ্বেতবর্ণ বালিতে নবদূর্ব্বাদিল শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ্যুতি প্রকাশিত হইল। চড়ার সর্ব্বত্রই সেই স্নিগ্ধ সবুজ জ্যোতিঃ খণ্ডাকারে ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। এরূপ জ্যোতিঃ আর কখনও আমি দেখি নাই। দেখিয়া ভিতরের অবস্থা যে কিরূপ হইল, ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ তোমরা কোথায়?'—এইরূপ ভাব মনে হওয়ায় প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি হিন্দুস্থানী অকস্মাৎ এই মর্ম্মে গাহিতে লাগিলেন—শ্রীরাম এখনও অযোধ্যার বনে বনে সরযূর পাড়ে পাড়ে হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। গানটি শুনিয়াই প্রাণটি যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল। চড়া হইতে নৌকায় চড়িয়া সরযূ পার হইয়া অযোধ্যায় আসিলাম। দেখিলাম অযোধ্যা নীরব নিস্তব্ধ, এত বড় সহরে একটু টুঁ শব্দ নাই। সকলেই যেন রামশোকে ম্রিয়মাণ, অবসন্ন!

কাশীতে পাণ্ডার উপদ্রব। ঠাকুরের শাসনবাক্য স্মরণ। তারাকান্ত দাদার বাসা।

অযোধ্যার পথে পথে কিছুক্ষণ বেড়াইলাম, প্রাণ উদাস উদাস করিতে লাগিল। তখন কাশী যাইব স্থির করিয়া রাণুপালী ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসন মাষ্টার দাদার একটি বন্ধু। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া নিজ বাসায় লইয়া গেলেন এবং নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীদ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। পরে যথাসময়ে কাশীর গাড়ীতে চাপাইয়া দিলেন। আমার গাড়ীতে অন্য লোক না উঠায় বড়ই আরামে রাত্রিযাপন করিলাম। শেষ রাত্রে রাজঘাট ষ্টেশনে নামিলাম। গঙ্গায় স্নান-তর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে মনিকর্ণিকায় পঁহুছিলাম। স্নান-তর্পণ শেষ হইলে পাণ্ডা ও গঙ্গাপুত্রেরা আমাকে শ্রাদ্ধ করিতে জেদ্ করিতে লাগিল। আমি করিব না বুঝিয়া তাহারা আমার ঝোলাকম্বলাদি টানাটানি করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের অত্যাচার ও গালাগালিতে আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, ঠাকুর যদি আমাকে কোন শক্তি দিতেন, তাহা হইলে এই

অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতাম। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছেলেন—**এখন যদি তোমার যোগৈশ্বর্য্য লাভ হয়, সংসার তুমি ছারখার করবে।** ঠাকুরের কথায় তখন আমার বিশ্বাস হয় নাই; বরং আমার মনে হইতেছিল—ঠাকুর কি আমাকে এতই হীন নীচাশয় মনে করেন? আজ দয়াল ঠাকুর আমার সেই সংশয় দূর করিলেন—অভিমান চূর্ণ হইল। আমি বিষম ক্রোধভরে পাণ্ডাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। একজন পাণ্ডা তখন সহসা ভীত হইয়া আমাকে বলিল—"বাবাজী ক্রোধ করিবেন না। তীর্থের কার্য্য আপনারাই তো রক্ষা করিবেন। আপনারা এ সব করিয়া আমাদের মর্য্যাদা না করিলে সাধারণে করিবে কেন? আমি শুনিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। পাণ্ডাকে নমস্কার করিয়া পদধূলি লইলাম। পরে মুটিয়ার অভাবে হাতে ঝোলা, কাঁধে বস্তা লইয়া কেদারঘাটে চলিলাম। রাস্তায় মুটে জুটিল। তারাকান্ত দাদার বাসা বহুক্ষণ তালাস্ করিয়াও পাইলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া ক্লান্ত শরীরে একটি বাড়ীর দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। ঝোলা বস্তা রাখিয়া, মুটেকে বিদায় করিলাম। আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া! ঐ বাড়ীরই একটি মেয়ে আমাকে দেখিয়া ভিতরে গিয়া খবর দিল। এই বাড়ীই তারাকান্ত দাদার, তাঁর স্ত্রী আসিয়া যত্ন করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ নাই। তারাকান্ত দাদা কয়দিন হইল গয়া গিয়াছেন। আমি তেতলায় নির্জ্জন ঘরে আসন করিয়া বসিলাম। নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন কি করি? এই লোকশূন্য বাড়ীতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে, একাকী আমি এখানে কি প্রকারে থাকিব? যদি তারাকান্ত দাদা ৪/৫ টার মধ্যে না আসেন, আজই আমি ভাগলপুর যাত্রা করিব। ঠাকুরের ব্যবস্থা চমৎকার! ঠিক্ বেলা ১১টার সময়ে তারাকান্ত দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর আদরযত্ন ও ভালবাসায় কাশীতে কয়দিন বড়ই আনন্দে কাটাইলাম।

পূর্ণানন্দ স্বামী। কেদারেশ্বর দর্শন। সাধুর আদেশ—
'চলা যাইয়ে ভাগলপুর।'

শুনিলাম, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া এখন তান্ত্রিক সাধন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার নাম এখন ব্রহ্মানন্দ স্বামী। কাকিনিয়ার ছত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাকে নিয়া নিজ আসনে বসাইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আছে দেখিয়া আমি ঐ আসন নমস্কার করিয়া পৃথক আসনে বসিলাম। স্বামিজী যথারীতি নিঃশব্দ প্রাণাযাম করিতেছেন দেখিলাম। মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীকেও দেখিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহার বাড়ীর দ্বারে পঁহুছিয়া দেখি, তিনি তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, একটি লোককে খুব গালাগালি করিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শনান্তে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। মহাত্মাদের কার্য্যকলাপের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝি না। নিজ সংস্কার মত তাঁহাদের বিচার করিয়া অপরাধী

হইতে হয় মাত্র। স্থির করিলাম, কাশীতে আর সাধু দর্শন করিব না। ঠাকুরের নির্ব্বিকার বিগ্রহ-মূর্ত্তিই প্রাণ ভরিয়া দেখিব। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া কেদারের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে প্রবেশমাত্র সমস্ত শরীর অবশ হইয়া পড়িল। কেদারকে স্পর্শ করিয়া যেন ঠাকুরকেই স্পর্শ করিতেছি মনে হইল। তখন প্রাণের অবস্থা যে কি প্রকার হইল বলিতে পারি না। পরম দয়াল ঠাকুর আমার চিরকালের আদরের ধন। ভক্তেরা তাঁর যথার্থ আদর এসব স্থানেই করিতেছেন। পতিত দুরাচারীদেরও সামান্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া, দুর্লভ মুক্তি প্রদান করিতেছেন। জয়-শিব-কেদার! জয় ঠাকুর। ভক্তজনের আদর যত্নে, সেবা পূজায় তুমি চিরকাল সুখে থাক; দূর হইতে দুর্জ্জন আমি, তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

আজ একটি ভাল উদাসীন সাধু আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"আপ্ কাঁহে আব্‌তক্ রহা হ্যায় কাশী? তুরন্ত্ চলা যাইয়ে ভাগলপুর।" শ্বেত সরিষা ও শ্বেত মরিচ ইনিই এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিতে বলিলেন। আমি উহা লইয়া ভাগলপুর যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

দানাপুরে আমাকে গ্রেপ্তারের আয়োজন।

অপরাহ্নে রাজঘাট ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেনে চাপিলাম। মোগলসরাই ষ্টেসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। লোকের অতিশয় ভীড়, অতি কষ্টে একখানা গাড়ীতে একটু স্থান পাইলাম। রেলের বড় সাহেব আমাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আমাকে আসিয়া বলিলেন—"তুমি সাধু, এখানে তোমার ক্লেশ হ'চ্ছে। আমার সঙ্গে এস, ভাল স্থান দিয়া দিচ্ছি।" আমি সাহেবের সঙ্গে চলিলাম। সাহেব আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা নির্জ্জন গাড়িতে বসাইয়া দিলেন। সাহেব অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমি কতকাল যাবৎ সাধু হইয়াছি, এখন কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, সমস্ত খবর নিলেন। দু'তিন ষ্টেসন অন্তর অন্তর সাহেব আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দানাপুর পঁহুছিবার কয়েক ষ্টেশন পূর্ব্বে সাহেবকে আর দেখিতে পাইলাম না, আমার কামরাও চাবিবন্ধ। মনে একটু সন্দেহ জন্মিল। দানাপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে দেখি প্ল্যাটফর্ম্মে কতকগুলি সঙ্গীনধারী গোরা পল্টন দাঁড়াইয়া আছে। একটু পরে গোরা সৈন্যগণ আমারই গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইল। একটি 'মিলিটারি' সাহেব আমার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, একখানা পুস্তকে লিখিতে লাগিলেন। লোকের ভীড় হইয়া পড়িল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে। আমি কাতর প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে একটি চাপরাশী একখানা 'তার' লইয়া ছুটিয়া আসিয়া সেই মিলিটারি সাহেবের হাতে দিল। সাহেব উহা পড়িয়া আমাকে সেলাম দিয়া দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন। কি জন্য এ সব কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার পর দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি চলিয়া গেলে পর একদিন রাত্রি ৮টার সময় হঠাৎ সিভিল সার্জ্জন আসিয়া রোগীর কথা বলিতে বলিতে আমাদের পরিবারের কথা তুলিলেন। আমরা ক' ভাই কোথায় থাকি—তুমি কি কর, সাধু হইয়াছ কেন, কবে আমার এখান হইতে গিয়াছ, সব খবর নিয়া গেলেন। বোধ হয় তোমার সম্বন্ধে খবর জানিতেই রেলের সাহেব সিভিল সার্জ্জনকে তার করিয়াছিলেন। পরে সিভিল সার্জ্জনের তার পাইয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। 'রুশিয়ানরা ভারত আক্রমণ করিবে' গুজব। তোমাকে হয়ত 'রুশিয়ান স্পাই' অনুমান করিয়াছিলেন।"

আবার সেই প্রেতের দারুণ আর্তনাদ প্রত্যক্ষেও বিশ্বাস জন্মে না।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভাগলপুর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। গতবারে যে মুটেকে লইয়া বাসায় গিয়াছিলাম, অদৃষ্টক্রমে এবারেও তাহাকেই পাইলাম। খঞ্জরপুর যাইতে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সাথী হইলেন।

৫ই কার্ত্তিক অমাবস্যা।

সেইবারে যে স্থানে প্রেতের চীৎকার শুনিয়াছিলাম, ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। মুটিয়া বলিল—"বাবা, গতবারের কথা মনে আছে ত?" আমি বলিলাম—"হাঁ, আছে ভয় নাই, চল।" এই বলিয়া ঐ গাছের নীচে যেমন আসিলাম, প্রেতের হৃদয়বিদারক কান্না আরম্ভ হইল। ভয়ানক ক্লেশসূচক সেই বিকট চীৎকার শুনিয়া মুটে ও ব্রাহ্মণটি দৌড় দিল এবং সেই অন্ধকারে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই মধ্যে মধ্যে দ্রুম্ দ্রুম্ করিয়া আছাড় খাইতে লাগিল। "কে গো, কে গো? কেন এমন চীৎকার করছ?" বলিয়া উপরদিকে ও আশে পাশে তাকাইতে লাগিলাম। ভয়ঙ্কর অন্ধকার—কিছুই দৃষ্টিতে পড়িল না। ঠিক যেন বার চৌদ্দ হাত তফাতে থাকিয়া কোন উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত রোগী অসহ্য যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর পর্য্যন্ত এই শব্দ চলিল। কিন্তু একটু পরে অকস্মাৎ নীরব হইল। ব্রাহ্মণটি বলিলেন—মহাশয়! আমি রাজা সূর্য্যনারায়ণ সিংহের গোমস্তা। গভীর রাত্রে এই পথে চলিতে আরও কয়েকবার এইরূপ শুনিয়াছি। এই প্রেতে কাহারও উপরই কোনও উৎপাত করে না; কিন্তু অনেকেই এই স্থানে এই প্রকার চীৎকার শুনিতে পায়।" এ সব শুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম—উঃ! প্রেতের যন্ত্রণা কি ভয়ানক! ইহ পরকালের মধ্যবর্ত্তী আবরণ ভেদ করিয়া ইহার আর্ত্তনাদ আসিয়া আমাদের শ্রবণগোচর হইতেছে। ঠাকুরের নিকট ইহার শান্তির জন্য প্রার্থনা আসিয়া পড়িল। এই ক্ষেত্রে আমার ভিতরের সংস্কার দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইলাম। প্রেতের চীৎকার শব্দ কানে শুনিয়াও পরলোক সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান জন্মিতেছে না। দেখিতেছি, প্রত্যক্ষের মূল্য কিছুই নাই। সত্যবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অন্তরের ভ্রান্ত সংস্কার দূর হয় না—ঠিক যেন দিগ্‌ভ্রমের মত। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় হইতেছে দেখিয়াও তাহা পশ্চিম দিক বলিয়া মনে হয়। ইহার আর উপায় কি? রাত্রি প্রায় একটার সময়ে পুলিনপুরী উপস্থিত হইলাম।

যথার্থ দরদের সেবা। পাঠ বন্ধ ক'রে ঠাকুরের পাখা করা।

বাসায় মহাবিষ্ণুবাবু, অশ্বিনীবাবু ও ছোড়দাদাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঘোর অন্ধকারে দীর্ঘ পথ চলিয়া আসিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম। হাত মুখ ধুইতে যেমন বারান্দায় গেলাম, ছোড়দাদা আমার কল্কীটি নিয়া এক কল্কী তামাক সাজিয়া আমার আসনের ধারে রাখিয়া গেলেন। আসক্তির বস্তু প্রয়োজন মত প্রস্তুত পাইয়া বড়ই আরাম হইল। ছোড়দাদার এই কার্য্যটি দেখিয়া আমি একেবারে অবাক্, মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। আমি ছোট ভাই, কখনও তাঁহার নিকটে এ পর্য্যন্ত তামাক খাই নাই। আমার আরাম হইবে বুঝিয়া, অনায়াসে নিঃসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে আমাকে তামাক সাজিয়া দিলেন। সামান্য সামান্য কার্য্যেও মানুষের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। আহা! কবে ঠাকুর আমাকে ছোড়দাদার মত অসাধারণ দয়া ও সহানুভূতি দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

সেদিন গুরুভ্রাতা মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিলেন—"একবার গরমের সময়ে গোঁসাইয়ের সঙ্গে শান্তিপুরে ছিলাম। মধ্যাহ্নে আহারান্তে তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, আমি নিকটে বসিয়া শুনিতাম। একদিন অতিরিক্ত গরম পড়ায় ভাগবত শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর ঘামিয়াছিল। গোঁসাই ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া একখানা পাখা লইয়া আমাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আমি হঠাৎ জাগিয়া দেখি, গোঁসাই বাতাস করিতেছেন। কোন কথা না বলিয়া ঘুমের ভান করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। ভাবিলাম, ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া গোঁসাই আমাকে হাওয়া করিতেছেন্—করুন, যতক্ষণ অদৃষ্টে আছে ভোগ করি। এ ভাগ্য কাহার হয়? ঘাম শুকাইয়া গেলে শরীর ঠাণ্ডা হইল। তখন গোঁসাই ধীরে ধীরে পাখাখানা রাখিয়া আবার ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। আমিও উঠিয়া বসিলাম। গোঁসাইয়ের আমাদের প্রতি কত মমতা—এই একটি সাধারণ কার্য্যে বোঝ!" এখন মনে হইতেছে, নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ঠাকুরের যে সেবা, তাহা অনেক সময়েই প্রাণশূন্য, অভ্যস্ত ক্রিয়া মাত্র। দয়া ও সহানুভূতি হইতে যে সেবা তাহাই যথার্থ সেবা, দরদের সেবা। ঠাকুর দয়া কর! প্রাণে দরদ ভালবাসা দিয়া যথার্থ সেবক করিয়া লও।

নামের অর্থরূপ। নামে অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতিঃ

ভাগলপুরে ঠাকুর আমাকে বড়ই আনন্দে রাখিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া আসনে বসি। এগারটা পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিয়া যায়। আবার বারোটা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত আসনে থাকি। রাত্রে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত নাম, গান ও সৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা অতিশয় শক্ত বোধ হইতেছে। স্বাভাবিক শ্বাসে প্রশ্বাসে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেই শ্বাস রোধ হইয়া আসে। অনেক সময় আপনা আপনি কুম্ভক হয়। কুম্ভকে শ্বাস প্রশ্বাস কোন প্রকার সংস্রব না থাকায় মনটিও নামেতে একাগ্র হয়। তখন নামটিকে একটি জীবন্ত শক্তি বলিয়া বোধ হয়। নাম করিতে করিতে

আপনা আপনি ঠাকুরের রূপ প্রাণে উদিত হইতে থাকে। এখন দেখিতেছি, নামের সঙ্গে রূপ জড়ানো রহিয়াছে—নামে শুধু রূপকেই প্রকাশিত করে। 'ঘটি' বলিতে যেমন 'ঘ' এবং 'টি' মনে করি না, 'ঘটি' এই শব্দটিতেও মনোযোগ হয় না—ঐ শব্দটি বলা মাত্র যেমন 'ঘটি' বস্তুটিই অন্তরে আসিয়া পড়ে—নাম স্মরণমাত্র সেই প্রকার ঠাকুরকেই দেখাইয়া দেয়। রূপ ছাড়া নাম এখন আর হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া নাম আর চলে না। শ্বাস প্রশ্বাসই নামের শক্তির অনুসরণ করে। নামে যেমন রূপের প্রকাশ হয়, নামেই সেই প্রকার রূপের সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। নাম স্মরণে অন্তরে নিয়ত ঠাকুরের সঙ্গলাভ হওয়ায় ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দৈহিক সংস্কার বশতঃ এই ভালবাসা ক্রমে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পরিণত হইল। দয়াময় ঠাকুর তাঁর অসাধারণ কৃপাগুণে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সকল একে একে এ অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া তাহার মাধুর্য্য সম্ভোগ করাইলেন। এখন আর সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা ঠাকুরের অশেষ গুণরাশির বিন্দুমাত্রও একটি বারের জন্য মনে আসে না। এখন কেবল মনে হয়—তিনি আমাকে ভালবাসেন; আমি তাঁর—তিনি আমার। কিছুদিন যাবৎ অত্যুজ্জ্বল নিবিড় কৃষ্ণ জ্যোতিঃ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হওয়ায় মন প্রাণ যেন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া আছে। সকল জ্যোতিঃ অপেক্ষা এই জ্যোতির মোহিনী শক্তিই অধিক। অবিলম্বে ঠাকুরের নিকটে যাইতে প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

জহ্নুমুনির আশ্রম। ফকির দর্শন।

মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন—এখান হইতে কয়েক ষ্টেশন পশ্চিমে গেলে সুলতানগঞ্জ। এই সুলতানগঞ্জেই জহ্নুমনির আশ্রম ছিল। এই স্থানেই জাহ্নবীর উৎপত্তি। মহাবিষ্ণুবাবুর কথা শুনিয়া সুলতানগঞ্জ যাইতে বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বাসার সকলেই সুলতানগঞ্জ যাত্রা করিলাম। স্কুল বিভাগের একটি সাব-ইন্‌স্পেক্টরের বাড়ী সুলতানগঞ্জে। তিনি খুব যত্ন করিয়া আমাদিগকে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ীতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। স্রোতস্বতী গঙ্গার বিশাল বক্ষঃস্থলে মন্দিরাকৃতি সুগোল একটি পাহাড় দেখিলাম। খেয়া নৌকায় পার হইয়া পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। আশেপাশে চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, প্রত্যেকখানা প্রস্তরেই দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। সমস্ত পাহাড়টিই দেবদেবীর মূর্ত্তি দ্বারা শৃঙ্খলামত প্রস্তুত। মূর্ত্তিগুলি যুগ যুগান্তের হইলেও উহা এত পরিষ্কার ও সুন্দর যে একটির দিকে দৃষ্টি করিলে অপরটি দেখিতে অবসর হয় না। স্বাভাবিক ধারায় গঙ্গা আসিয়া এই স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। পরে আবার স্বাভাবিক ধারায়ই প্রবাহিত হইয়াছেন। শুনিলাম পুরাণে আছে, ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া গঙ্গা যখন সগরকুল উদ্ধারের জন্য সাগর-সঙ্গমে চলিলেন, এইস্থানে উপস্থিত হইতে না হইতে জহ্নুমুনি বলিলেন—"মা! তুমি দয়া করিয়া এই আশ্রমের এক পাশ দিয়া চলিয়া যাও—আমার

আশ্রমটি নষ্ট করিও না।" কিন্তু মুনিব কথা কর্ণপাত না করিয়া গঙ্গা সগর্ব্বে সোজা পথে আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন। তখন মহাযোগী জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষে তুলিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গার শক্তি অপহৃত হইলে ধারাও তৎক্ষণাৎ স্থগিত হইল। ভগীরথ এই বিষম বিপদ দেখিয়া মুনিব চরণে শরণাগত হইলেন; এবং পিতৃপুরুষদেব উদ্ধাবেব জন্য গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিতে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যোগীবর ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ জানু ছেদনপূর্ব্বক গঙ্গার নিষ্ক্রমণের পথ করিয়া দিলেন। এইরূপে গঙ্গা জহ্নুমুনিব জানু হইতে বাহির হইয়া জহ্নুসুতা জাহ্নবী নামে বিখ্যাত হইলেন, এবং শ্রদ্ধাসহকাবে ঋষিব আশ্রম প্রদক্ষিণ কবিয়া ভগীরথের শঙ্খধ্বনিব অনুসবণ কবিলেন। স্থানটি এতই ভজনানুকূল ও এমন মনোরম যে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। অবশিষ্ট জীবন এখানেই আসিয়া অতিবাহিত কবিব—মনে মনে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে লাগিল। গঙ্গা-স্নান কবিযা জহ্নুমুনির চরণোদ্দেশে সেই পুণ্যক্ষেত্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট গোফাব মত ভজন কুটীর আছে, তাহারই একটির সম্মুখে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। বড়ই আনন্দ হইল। অপরাহ্ন প্রায় ৪টাব সময়ে আবার গঙ্গা পার হইযা তীরে আসিলাম। বাসায় আসিতে গঙ্গার ধারে জঙ্গলের ভিতরে বহুকালেব একটি পুরাণো ভাঙ্গা মস্‌জিদ দেখিতে পাইলাম। মস্‌জিদটিতে একসময়ে কতই ভগবানেব নাম হইয়াছিল মনে হওয়ায় উহা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দ্বারে যাইয়া দেখি, দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় দীনহীন কাঙ্গালেব মত লেংটি মাত্র পরিধানে একটি ফকির চুপ করিয়া ঘরের এককোণে বসিয়া আছেন। আমরা দলবলে এইস্থানে উপস্থিত হওয়ায় ফকির সাহেবের ভজনের ব্যাঘাত হইবে শঙ্কা হইতে লাগিল। ফকির সাহেব নিজ ভজনে মগ্ন, এদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বৃদ্ধ ফকির সাহেব কি বস্তু লইয়া এই জনহীন নিবিড় অরণ্যের আবর্জ্জনাপূর্ণ ভাঙ্গা মস্‌জিদের কোণে এ ভাবে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আছেন—ভাবিয়া প্রাণ কেমন হইয়া গেল। ঠাকুর! কবে আমিও একান্তে এইরূপ তোমাকে লইয়া অহর্নিশ আনন্দে কাটাইব। সাব-ইনস্পেক্টর বাবুর আদর আতিথ্যে পরিতোষ লাভ করিয়া রাত্রে ভাগলপুর পঁহুছিলাম।

মনোরমার অদ্ভুত গুরুনিষ্ঠা।

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা কয়েকদিন হয় ভাগলপুরে আসিয়াছেন। মনোরঞ্জনবাবুব স্ত্রী শ্রীমতী মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভগবান্ গুরুদেব মনোরমার ভিতর দিয়া গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, বর্ত্তমানে তেমনটি আর কোথাও শুনি নাই। মনোবঞ্জনবাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ উদ্যমশীল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণেব পর হইতে তাঁর সেই উৎসাহ যেন দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে। এখন নীরবে ও একান্তমনে ভজন সাধনে কালাতিপাত করিতেছেন। পরিবারে ৫/৭টি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও

নিজে, ইহা ছাড়া ২/৪টি উপরি লোকও প্রায়ই আছে। কি ভাবে যে ইহাদের খরচ পত্র চলে, কিছুই বুঝা যায় না। মনোরঞ্জন বাবুর মুখে শুনিলাম যে, ঠাকুরের আদেশ হইল—**ভাগলপুরে চলিয়া যাও, সেখানে গিয়া কিছুকাল থাক।** শ্রীমতী মনোরমা অমনি ভাগলপুরে আসিতে প্রস্তুত হইলেন। হাতে টাকা পয়সা কিছুই নাই, রেলভাড়া কোথায় পাইবেন ভাবিয়া মনোরঞ্জনবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনোরমা বলিলেন—"ঠাকুর আমাকে ভাগলপুরে যাইতে বলিয়াছেন—আমি যাইব। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব; ঠাকুর যদি রেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন রেলে যাইব; না হইলে রেলের লাইন ধরিয়া চলিতে থাকিব। ছেলে পিলে নিয়া তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পার, যাইবে—না হয় থাকিবে।"

সতী মনোরমা, দাতা কালীকুমারের কন্যা কখনও নাকি মিথ্যা কথা বলেন নাই; মিথ্যা সঙ্কল্পও তাঁর মনে উদয় হয় নাই। তিনি নিশ্চয়ই পদব্রজে যাত্রা করিবেন বুঝিয়া মনোরঞ্জনবাবু অগত্যা কন্যার বালা বন্ধক দিয়া কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং কলিকাতার পাট তুলিয়া দিয়া হাওড়া ষ্টেশনে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। যে টাকা আছে তাহা দ্বারা জিনিস পত্র ও ছেলেপিলে লইয়া ভাগলপুর পর্য্যন্ত যাওয়া চলে না। মনোরঞ্জনবাবু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ট্রেণ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, এই সময়ে একটি ভদ্রলোক আসিয়া, কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া মনোরঞ্জনবাবুকে বলিলেন, যে তিনি তাঁহাদের বস্ত্র ক্রয়ের জন্য এই টাকা পাঠাইয়াছেন। মনোরঞ্জনবাবু ঐ টাকার সাহায্যে ভাগলপুর আসিয়াছেন। ভাগলপুরে পঁহুছিয়া পূর্ব্বপরিচিত ব্রাহ্ম বামনদাসবাবুর বাড়িতে উঠিয়াছিলেন। এখন নূতন বাসা ভাড়া করিয়া আছেন। হাতে টাকা পয়সা নাই, খাবারও কোন সংস্থান নাই। এইরূপ অপরিচিত স্থানে এতগুলি 'কাচ্চা বাচ্চা' লইয়া কি ভাবে আছেন—কল্পনাও করিতে পারি না। কখনও অর্দ্ধাশনে কখন বা অনশনে দিনপাত করিতেছেন। শুনিলাম, ইতিমধ্যে একদিন ঘরে কিছুই নাই, ছেলেপিলেগুলি ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাকে গিয়া বলিল— "মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" মা অমনি ঠাকুরের ফটো দেখাইয়া বলিলেন—"বাবা! গোঁসাই তোমাদের বড় ভালবাসেন। তাঁর নিকটে খাবার চাও।" ছেলেপিলেগুলিও অদ্ভুত—পিতা মাতারই প্রকৃতির প্রতিরূপ। একে অন্যকে বলিতে লাগিল—"বেশ ত চল, আমরা গোঁসাইকে গান শুনাই, তিনি সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসেন।" এই বলিয়া করতালি দিয়া গান আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ঘা পড়িল। বাহির হইতে কে যেন চীৎকার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ঘা পড়িল। বাহির হইতে কে যেন চীৎকার করিতে লাগিল— "বাবুজি! দরজা খুলিয়ে!" দরজা খোলা হইল; দেখা গেল, দু'টি মুটিয়া দু'টি বড় বড় 'খাঁচি' ভরিয়া প্রচুর পরিমাণে চাল, ডাল, আটা, ঘি, তরি-তরকারি ও মসলা প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে। তাহারা ঐ সব জিনিস রাখিয়াই চলিয়া গেল। কে পাঠাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"বাবু আওতা হ্যায়।" কিন্তু কে যে বাবু এই সব পাঠাইলেন. তাহার আর কোনই খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। এই প্রকার

ঘটনা মনোরঞ্জনবাবুর ঘরে নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শীঘ্রই আমি ঢাকা যাইব শুনিয়া, মনোরমা আমাকে বলিলেন—"গোঁসাইকে বলিবেন, তিনি যে ভাবে রাখেন সন্তুষ্ট মনে যেন তাঁর দিকেই তাকাইয়া থাকিতে পারি, তাঁকে যেন ভুলি না, এই শুধু আশীর্ব্বাদ করেন।" ইঁহাদের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। গুরুর প্রতি কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর দাঁড়াইলে মানুষ কচি কচি ছেলেপিলে লইয়া এই অবস্থায় এমনভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না। এঁদের সঙ্গলাভে ধন্য হইলাম।

আভিচারিক ক্রিয়ার আপদ্ উদ্ধারার্থে শান্তি হোমের সঙ্কল্প।

৪ঠা—৫ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার-—শনিবার।

ভগ্নীপতি মথুরবাবু মফঃস্বল হইতে আসিলেন। আমাকে বাসায় দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মুখে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহিত হইলাম; মথুরবাবু স্কুল বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সরল বিশ্বাসী, এবং অকপট লোক। বৃহৎ পরিবারের তত্ত্বাবধান ও ছেলেপিলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একটি ঘনিষ্ঠা আত্মীয়াকে বাসায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি প্রথম প্রথম আমার ভগিনীর খুব অনুগতা ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে তার আর সে ভাব রহিল না। সে ব্যতীত সংসার চলিবে না মনে করিয়া, ভগ্নীর সহিত সমান হইয়া চলিতে লাগিল; এবং প্রতিপদে ভগ্নীর সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল। অবিলম্বে ভগ্নী উহাকে সরাইয়া দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। স্ত্রীলোকটির ধারণা ছিল, ভগ্নীর অভাব হইলে সেই সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে। সুতরাং গোপনে ওস্তাদ যাদুকর দ্বারা আভিচারিক কার্য্য করাইয়া ভগ্নীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিল। এই কার্য্যের এক সপ্তাহের মধ্যেই অকারণ রক্তস্রাবে ভগ্নীর মৃত্যু হইল। কিছুদিন হয়, আমার ভাগিনেয় আসিয়া সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির আর এখন কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। ইহাতে সে ভাগিনেয়কেও নষ্ট করিতে আবার সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছে। কয়দিন হইল একদিন অতি প্রত্যূষে মথুরবাবু ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দরজার সম্মুখেই দেখিলেন—আম্রপল্লবসংযুক্ত নারিকেল একটি পূর্ণ কুম্ভের উপরে রহিয়াছে। কুম্ভের গায়ে সিন্দুরে অঙ্কিত যন্ত্র ও দেবীমূর্ত্তি। কলসীর সম্মুখে মৃন্ময়ভাণ্ডে কতকগুলি ছাই ও একখানা পোড়া ঝাঁটা; এবং আশে পাশে পান ও সুপারি ছড়ান রহিয়াছে। মথুরবাবু এই প্রকার দৃশ্য আমার ভগিনীর দেহত্যাগের ৫/৭ দিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং অবিলম্বে আমাকে আসিতে দাদার নিকট তার করিলেন। এ সকল শুনিয়া কি করা কর্ত্তব্য, ভাবিতে লাগিলাম।

বস্তিতে ভাগিনেয় সুরেন্দ্রও পত্র দ্বারা দাদাকে এই বিষয়ের পরিচয় দিয়াছিল। দাদার মুখে শুনিয়া তখনই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, ভাগলপুরে আসিয়া হোম চণ্ডীপাঠ দ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া

আপদের শান্তি করিব। মথুরবাবুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলাম। আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে হোম করিব, স্থিব করিলাম। গোময় দ্বারা একখানা ঘর সুসংস্কৃত কবিয়া তাহাতে যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। বট, অশ্বত্থ ও বিল্বকাষ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইল। শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আগ্রহের সহিত দিন কাটাইতে লাগিলাম।

কিন্তু মথুরবাবুর বিপদ্ শান্তির জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা আমার উচিত কিনা, এ বিষয়ে বিচাব আসিয়া পড়িল। নিজের জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক কার্য্য করিতে ঠাকুর আমাকে নিষেধ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আর্ত্ত ব্যক্তিব আপদুদ্ধাবের জন্য সৎসঙ্কল্পে যথাশাস্ত্র কার্য্য কবিতে ঠাকুর নিষেধ করেন নাই—বরং উৎসাহই দিয়াছেন। সাংসারিক লোকে অনেকেই তো ভগবান্‌কে একেবারে ভুলিয়া বহিয়াছে; ঠাকুরের শরণাগত না হইলে কি উপায়ে আর তাঁদেব কল্যাণ হইবে? বোধ হয়, সেইজন্যই মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবের উদ্ধাবেব জন্য তাঁহাদিগকে নানা প্রকার আপদ বিপদে ফেলিয়া তাঁকে ডাকিতে বাধ্য করেন। ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভের জন্য যদি ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে অর্থ ও কামের জন্য তাঁকে ডাকিব না কেন? প্রার্থনাই যদি কবিতে হইল, তাহা হইলে যে বস্তুর অভাবে আমার ক্লেশ, প্রতীকার কামনায় তাহা সমস্তই ঠাকুরকে নিবেদন করিব। মহাপুরুষদেব মুখে শুনিযাছি, যে কোন ভাবেই ভগবানের নাম করিলেই কল্যাণ—"হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা।" শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে যে শত্রুভাবেও ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া জীব উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে। তারপব দেখিতেছি, সঙ্কল্পিত কার্য্যে সুফল লাভ করিলে, বিপন্ন ব্যক্তির অন্তবে স্বতঃই সহজ শ্রদ্ধার উদয হয। স্বার্থহেতু আশ্রয় লইয়াও জীব তাঁর কৃপায় পরমার্থ লাভ করে। সুতরাং আমাব কোন কার্য্যে আমার ঠাকুরের প্রতি কেহ শ্রদ্ধাবান বা আকৃষ্ট হইলে. তাহাতে আমিও কৃতার্থ হইলাম মনে কবি। এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম।

সর্ব্ব-আপদ-শান্তি —হোম। অপরাধীর হৃৎকম্প।

আজ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া পূর্ব্বের ঘরে প্রবেশ কবিলাম। বাড়ীর সকলেই হোম দেখিতে হলঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। আমিও নিজ আসনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে ন্যাস সমাপন করিলাম। ইতিমধ্যে ফুল-চন্দন-দূর্ব্বা, তুলসী ও নৈবেদ্যাদি পূজাব আয়োজন সমস্ত আসিয়া পড়িল। এক সহস্র ত্রিদল বিল্বপত্র, শ্বেত কববী, শ্বেত সর্ষপাদি আহুতির সামগ্রী সকল হোম কুণ্ডেব সম্মুখে রাখিলাম। চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে মথুরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি সঙ্কল্পে হোম চণ্ডীপাঠ করিব?" তিনি কহিলেন—"আমি তো কারো কোন অনিষ্ট করি নাই; বিনা দোষে যে আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাবই সর্ব্বনাশ হউক।"

আমি বলিলাম—"ওরূপ সঙ্কল্প আমি করিতে পারিব না। শুধু আত্মবক্ষাব জন্য 'সর্ব্ব

আপদশান্তি' সঙ্কল্পে এই কার্য্য কবিতে পারি।'' মথুরবাবু তাহাতেই সম্মতি দিলেন। আমি 'অর্গলা স্তব' হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত চণ্ডীখানা আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। পরে, প্রকাণ্ড হোমকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে ঠাকুরকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলাম। তৎপরে যথাবিধি মন্ত্রঃপূত করিয়া সেই অগ্নিতে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে সহস্র বিল্বপত্র আহুতি দিলাম। শেষে আভিচারিক উপদ্রব শান্তির জন্য শ্বেত করবী প্রভৃতির দ্বারা ১০৮ বার আহুতি প্রদান করিলাম; এবং পূর্ণাহুতি দিয়া অপরাহ্ন ৫টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এই উভয় তিথিতেই এই প্রকার হোম, চণ্ডীপাঠ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিলাম। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই দুই দিনই কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই অনিষ্টকারী স্ত্রীলোকটি বাড়ীতে থাকিতে পাবিল না; পার্শ্ববর্ত্তী হরদাসবাবুর বাড়ীতে গিয়া উদয়াস্ত রহিল। কেহ কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল—''ব্রহ্মচারী কি যে কর্‌ছে বুঝি না। কেন যে কর্‌ছে তাও জানিনা। ঐ কাজের সময়ে বাড়ীতে থাকিতে আমার কেমন যেন ভয় হয়। হোমেব ধোঁযার গন্ধ আমি সইতে পারিনা।'' এইসব শুনিয়া আমার মনে হইল, বিপদ্ উহার খুব নিকট, সুতরাং অচিরেই ভাগলপুর ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। মঙ্গলময় ঠাকুর! তোমারই ইচ্ছার জয় হউক।

হোমের ফল অব্যর্থ—অপরাধীর অদ্ভুত মৃত্যু।

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পর আমার আর ভাগলপুরে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কলিকাতা পঁহুছিয়া কয়েকদিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইলাম। এই সময়ে ভাগলপুর হইতে একখানা পত্র আসিয়া পড়িল। তাহাতে লেখা, মথুরবাবুর বাড়ীর একটি স্ত্রীলোক অকস্মাৎ দুইদিনের কলেরায় মারা গিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে পায়খানায় যাইয়া বিকটাকৃতি অতি দীর্ঘাকাব্ এক ভীষণ কালপুরুষ দেখিতে পান। সে দুই হাত সাম্‌নের দিকে বাড়াইয়া ''আমি তোমাকে নিতে এসেছি'' বলিতে বলিতে উহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি ''মলাম গো'' বলিয়া চীৎকার করিয়া কয়েক পা ছুটিয়া আসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তৎপরেই তাঁর ভয়ানক জ্বর ও দাস্ত হইতে থাকে। দুই দিন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগের পর তৃতীয় দিনে মারা গিয়াছেন। খবরটি পাইয়া আমার বুক 'দুর্ দুর্' করিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, তবে আমিই কি উহার এই অকাল মৃত্যুর কারণ হইলাম? কিছুই ভাল লাগিল না; অস্থির হইয়া পড়িলাম।

৭ই অগ্রহাযণ,
সোমবার।

ঠাকুরের নিকট উপস্থিতি।

১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

বেলা অবসানে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আমতলায় ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। ঠাকুর আমাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। একটু বিশ্রামান্তর ভাণ্ডার হইতে জিনিষ লইয়া রান্না করিতে বলিলেন। আমি দক্ষিণের ঘরে যে স্থানে ছিলাম, সেইখানে আসন করিয়া লইলাম। শ্রীধর, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, যোগজীবন, জগদ্বন্ধু, বিধু ঘোষ ও অশ্বিনী প্রভৃতিকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সন্ধ্যার সময়ে ভাতে সিদ্ধ ভাত রান্না করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। শ্রীমন্দিরে শঙ্খধ্বনি করিয়া কুতুবুড়ী আরতি করিলেন। আরতি দর্শনের পর ঠাকুর পূবের ঘরে আসিলেন। গুরুভ্রাতারা সমবেত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমার শরীর অবসন্ন বলিয়া অধিকক্ষণ তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। নিজ আসনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

আত্মরক্ষার চেষ্টা—ঐ মৃত্যুতে তোমার অপরাধ কি? ইঙ্গিতে কথা সুস্পষ্ট বুঝা।

১১ই—১৪ই অগ্রহায়ণ।

প্রত্যূষে বুড়ীগঙ্গায় স্নান-তর্পণাদি সারিয়া আসনে আসিলাম। ন্যাস, প্রাণায়াম, হোম ও চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। গত ২০শে কার্ত্তিক রাস পূর্ণিমায় (চন্দ্রগ্রহণের রাত্রি হইতে) ঠাকুর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ঠাকুর মৌনী হইলেন কেন, জানিতে ইচ্ছা হইল। ঠাকুর জানাইলেন—পরমহংসজীর আদেশে মৌনী হইয়াছেন। পরমহংসজী এখন ঠাকুরকে ৬ মাস মৌনী থাকিতে বলিয়াছেন শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এই ছয়মাস ঠাকুরের কথা না শুনিয়া কি প্রকারে থাকিব ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর ১১টা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া শৌচে গেলেন। আমিও নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরের আহারান্তে বেলা প্রায় ১২।।০ টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা সময় ভাগবত পাঠ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। এই কয়মাস ভাগলপুর ও বক্তিতে কিরূপ ছিলাম ঠাকুর জানিতে চাহিলেন। আমি ভাগলপুরের দুর্ঘটনার বিবরণ বিস্তারিত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর কারণ তবে কি আমিই হইলাম? ইহাতে কি আমারই অপরাধ হইয়াছে? ঠাকুর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—**তোমার আর অপরাধ কি? তুমি ত কারো কিছু অনিষ্ট করবার জন্য কোন মন্দ উদ্দেশ্যে ওসব করনি? আত্মরক্ষার জন্য 'সর্ব্ব আপদশান্তির' সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুরূপই কার্য্য করেছ। তোমার ক্রিয়ার শক্তি অমোঘ, আভিচারিক শক্তির**

সাধ্য কি তা' পণ্ড করে? তাই ঐ শক্তি পাল্‌টে গিয়ে প্রয়োগকারীর উপরেই পড়েছে। তুমি আর তা'র কি করবে?

ঠাকুর আমাকে উভয় হস্তের অনামিকায় সর্ব্বদা কুশাঙ্গুরী ধারণ করিতে বলিলেন। এবং উপবীত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের উপরে বামহস্ত স্থাপনপূর্ব্বক হোম করিতে বলিলেন।

এটি বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে ঠাকুর অপূর্ব্ব উপায়ে আকারে, ইঙ্গিতে ও কণ্ঠতালুর সাহায্যে একপ্রকার অতি অস্ফুটস্বরে মনের যে সকল ভাব ব্যক্ত করেন, সুস্পষ্টরূপেই আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এটি তাঁরই বিশেষ কৃপা মনে করি। কখনও কখনও ঠাকুর হাতের তালুতে মাটীতে ও শ্লেটে লিখিয়াও যাহা প্রয়োজন জানাইয়া থাকেন। প্রশ্নের উত্তরও এইভাবেই দিয়া থাকেন।

এবার আসিয়া ঠাকুরমাকে বড়ই কাতর দেখিতেছি। অতিশয় পীড়িতা। প্রত্যহই জ্বর হইতেছে— কাশিতেও খুব কষ্ট পাইতেছেন। ঠাকুরমা রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরেই অবস্থান করেন। একটু রাত্রি হইলেই কাশি আরম্ভ হয়। প্রায় সারারাত্রি খণ্ড খণ্ড হলুদ রংয়ের কফ্ উঠিতে থাকে। মাথা বিষম বিকৃত— অধিকাংশ সময় ক্ষিপ্তাবস্থাতেই কাটান। সমস্ত রাত্রি কখনও চীৎকার, কখনও গালাগালি, কখনও বা গান করেন। নিজ মনে এলোমেলো কত কি যে বকেন, কিছুই বুঝি না। এই অবস্থায় রাত্রি যাপন করেন বটে, কিন্তু সারাদিন কোথায় যে কি অবস্থায় থাকেন, কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায় না। গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে, মুসলমানদের ঘরে, কখনও বা ডোবা পুকুরের পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখা যায়। কোন কোন দিন সমস্ত দিনে রাত্রেও খোঁজ পাওয়া যায় না। ঠাকুরের ঘরে রাত্রে যোগজীবন মাত্র থাকেন; ইচ্ছা হইলে শ্রীধরও মধ্যে মধ্যে ধুনি তাপিতে গিয়া বসেন। ঠাকুর এই অবস্থায় ঠাকুরমাকে লইয়া কি ভাবে রাত্রি কাটান বুঝিতেছি না। খবর নেওয়ারও কেহ নাই। ঠাকুর আমাকে রাত্রে তাঁহার নিকটে থাকিতে বলিলেন। আমি আহারান্তে রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের ঘরে যাই; এবং ভোরবেলা পর্য্যন্ত পাগলী ঠাকুরমার খামখেয়ালী হুকুম মত চলিয়া থাকি। সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বালিয়া রাখিতে হয়, রাত্রি বারোটায় ও সাড়ে তিনটায় ঠাকুর হাত মুখ ধুইতে বাহিরে গিয়া থাকেন। তখন একটি লোকের থাকা প্রয়োজন হয়।

ঠাকুরের মাথায় সর্পফণা। বিষধরের অমৃতদান।
সর্পকে ঠাকুরমার শাসন।

১৫ই অগ্রহায়ণ,
শুক্লা দশমী।

ঠাকুরমা রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরেই থাকেন। কিন্তু আজ দুইদিন যাবৎ তিনি ঠাকুরের আসন কুটীরে রাত্রি কাটাইতেছেন। ঠাকুরমার অসুখ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাকুর কুটীরে প্রবেশ করিলে বাহিরে শিকল দিয়া রাখিতে

হয়। দিদিমা আজ কলিকাতা হইতে আসিযাছেন। জগবন্ধুবাবুর সহিত তাঁহাব বিষম ঝগড়া চলিয়াছে। রাত্রি সাড়ে নযটা হইল, ঝগডা থামিতেছে না। কুঞ্জ ঘোষ মহাশয তাঁহার বাড়ী হইতে ঠাকুবের খাবার আনিলেন, ঠাকুর হাত নাড়িয়া জানাইলেন—খাইবেন না। আমরা অনুমান করিলাম, আশ্রমে বিরোধ অশান্তিব জন্যই ঠাকুর হয়ত আহাব করিলেন না। আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাবা সকলেই আহারান্তে নিজ নিজ স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাকে বিছানা করিতে বলিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং আসন কম্বল বগলে লইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমাকে আমতলায় ধুনি জ্বালিযা দিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি ঘরের ধূনি আমতলায় লইয়া গেলাম। এই দারুণ শীতে আমতলায ঠাকুর আসন করিলেন শুনিয়া গুরুভ্রাতারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; আশ্রমে ঝগড়া বিবাদই ইহার কারণ সকলে স্থির করিলেন। ঠাকুর একটু পরে সকলকে জানাইলেন—**আজ ঠাকুরমার বিষম ফাঁড়া। শ্যামসুন্দর আসিয়া বলিয়া গেলেন, আজ রাত্রি টিকিলে আরও কিছুদিন থাকিবেন।** ঠাকুরকে, শ্যামসুন্দর ঠাকুরমার নিকটে গাছতলায় থাকিতে বলিয়াছেন, তাই ঠাকুর আমতলায আসিযাছেন। শ্রীধর, যোগজীবন, বিধুবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সকলকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—**না, ব্রহ্মচারী এখানে থাকিবে।** আমি নিজ আসন লইয়া ঠাকুরের পাশে ধুনির ধারে বসিলাম এবং পরমানন্দে নাম করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে ঠাকুর খাবার চাহিলেন। ঘরে যাহা রক্ষিত ছিল, আনিয়া দিলাম। বাত্রি দুইটার পরে ঠাকুরমা কি অবস্থায় আছেন, একবার খবর নিতে বলিলেন। আমি আসন-কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—ঠাকুরমা সংজ্ঞাশূন্য পড়িয়া আছেন। কিছুক্ষণ ঠাকুরমার হাত পা টিপিয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম, রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, একটি কৃষ্ণবর্ণ সর্প ঠাকুরের বাম অঙ্গ বাহিয়া মস্তকে উঠিয়া একটুক্ষণ ফণা বিস্তার করিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া আবার নামিয়া গেল। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—**ইনি আসনের জাতসাপ। সুবিধা পেলেই আসেন। জটা বেয়ে মাথায় উঠে কপালের উপরে কিছুক্ষণ ফণা ধ'রে থেকে চলে যান।** এই বলিয়া ঠাকুর কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া খাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—আহা! ঐ জল খাচ্ছেন, ওতে যে এখনই সাপে মুখ দিয়া গেল।

ঠাকুব—**সর্পরাজ কমণ্ডলুর জলে অমৃত দিয়া গেলেন। তুমি একটু খাবে?** এই বলিয়া ঠাকুর আমাব হাতে কমণ্ডলু হইতে এক গণ্ডূষ জল ঢালিয়া দিলেন। আমি পান করিয়া দেখিলাম, উহা ডাবের জলের মত মিষ্টি ও সদ্‌গন্ধযুক্ত। জলটুকু পান করিয়া চিত্তটি এতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে ভিতবে সরসভাবে আপনা আপনি নাম চলিতে লাগিল। ঠাকুব বলিলেন—**সাপটি মা'র কাছেও গিয়েছিলেন। মা এবারে বেঁচে গেলেন, ফাঁড়াটি কেটে গেল।** জিজ্ঞাসা করিলাম—সাপটি জটার উপরে ফণা ধ'রে কয়বাব ত ছোঁ মাবলে। সাপ এসে অমনভাবে আপনাব গাযে মাথায় ওঠে কেন?

ঠাকুব—**সরুনালে এই প্রাণায়াম স্বাভাবিক ভাবে চল্‌তে থাক্‌লে তাতে বড় সুন্দর একটি শব্দ হয়। সাপ সেই সুর শুন্‌তে বড় ভালবাসে। বাড়ীর যেখানেই সাপ থাক্ না কেন, দূর হ'তে ঐ সুর শুন্‌তে পায়। আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে ঐ সুর ধরতে গিয়ে গায়ে, ঘাড়ে, মাথায় উঠে পড়ে। নাকের পাশে, কপালের উপরে ফণা বিস্তার ক'রে স্থির হ'য়ে ঐ সুর শুন্‌তে থাকে। সময়ে সময়ে নিজের শিস্‌ও ওতে মিলায়ে দিয়ে বড়ই আনন্দ পায়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছুই অস্বাভাবিক নয়! ওভাবে সাধন চল্‌লে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠ্‌তে পারে। এই সাপে কখনও অনিষ্ট করে না, বরং এদের দ্বারা বিস্তর সাহায্যই পাওয়া যায়। এরা ছোঁ মারে না, শিস্ ফেলে। প্রাণায়াম বন্ধ হ'লেই আবার চ'লে যায়।**

আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা প্রত্যক্ষ করিলাম; মৌন ও মগ্নাবস্থায় থাকিলেও আজ তাঁর শ্রীমুখের দু'চারটি কথা শুনিলাম! সর্প বিষধর—তার মুখেও অমৃত! ইহা প্রত্যক্ষ না করিলেও কখনও বিশ্বাস করিতাম না। যাহা স্বাভাবিক, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অভাবে তাহাও অদ্ভুত, আশ্চর্য্য বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

ভোরবেলা ঠাকুরমা ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন—'তোর আসনের সাপ রাত্রে ভারী বিরক্ত করেছে। কাছে এসে ফণা ধ'রে ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌তে লাগল। যেতে বলি যায় না। তখন এক চড় বসিয়ে দিলাম; অমনি চলিয়া গেল।' ঠাকুরমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম।

কেহ গুরুনিষ্ঠা নষ্ট করিলে প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

১৭ই অগ্রহায়ণ,
১লা ডিসেম্বর ১৮৯২।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী এবার কাশীতে মাণিকতলার মাতাজীর সঙ্গে খুব ঝগড়া ক'রে এসেছে।" কিরূপ ঝগড়া, কেন ঝগড়া, ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলিলাম—মাতাজীর অসাধারণ অবস্থা—দিনরাত সমাধিস্থ থাকেন। অনেক নূতন নূতন তত্ত্বের কথা বলেন শুনিয়া, তাঁকে দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। আমি আমার দু'টি বন্ধুকে লইয়া মাতাজীর দর্শনে গেলাম। গিয়া শুনিলাম মাতাজী সমাধিস্থ। প্রায় এক ঘণ্টাকাল বসিয়া রহিলাম। পরে একপ্রকাব ক্লেশসূচক শব্দ করিতে করিতে মাতাজী চৈতন্য লাভ করিলেন। খবর বা পরিচয় কেহ না দিতেই মাতাজী আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিক[illegible]গিয়া বসিলাম। পরে তিনি আমাদের সংসারের কথা তুলিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ পনেরো মিনিট পবে আলাপে আমার বিরক্তি ধরিল। আমি মাতাজীকে বলিলাম—এসব কথা বলিতে বা শুনিতে আমি আপনার নিকটে আসি নাই। তিনি তখন ধর্ম্মের উপদেশ আরম্ভ করিলেন। প্রথম উপদেশই—"ধর্ম্মেব বেশভূষা ত্যাগ কব।" নীলকণ্ঠবেশ, মালাতিলকাদি আমার গুরুদেবের

আদেশ মতই আমি ধারণ করিয়াছি—তাঁকে বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে উহা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। এসব ধর্ম্মের বেশ কিছু না, এতে কোন উপকারই হয় না, বরং অভিমান হয়—অনিষ্ট হয়; এইরূপ বারংবারই বলিতে লাগিলেন। আমার গুরুদত্ত বস্তুর উপরে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন দেখিয়া, আমি তখন আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না। যাহা মুখে আসিল বলিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আমি যে তোর মা, ছেলে হয়ে মাকে এরূপ বল্‌তে হয়?" আমি বলিলাম—আমার মা'র মত হ'তে আপনার বহু বিলম্ব। মুখে ছেলে বল্‌লেই মা হওয়া যায় না। তিনি কহিলেন—"তোর গুরু 'বিজলি' যে আমাকে মা বলে।"

আমি—তিনি শিয়াল, কুকুর, বিড়ালকেও মা ব'লে স্তব স্তুতি করেন; কিন্তু আমরা তাদের শিয়াল কুকুরই বলি। মাতাজীকে আমি এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া খুব কড়া কড়া অনেক কথা বলিয়াছিলাম। কি করিব? শেষকালে তিনি বলিলেন—"ওরে! আমি তোকে পরীক্ষা করিতে এ সব কথা বলিয়াছি।" আমি কহিলাম, আপনার স্পর্দ্ধা ও সাহস তো কম নয়? সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্রকে আপনি পরীক্ষা করিতে আসেন? আপনার ওজন কতটুকু, আপনি তা ভাবেন না?

ঠাকুর বলিলেন—**সকলের নিকটেই বিনয়ী হবে। সকলকেই খুব শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌বে। তবে তুমি যা ব'লেছ—মাতাজীর সে সব শুনা প্রয়োজন ছিল। ভগবান্‌ই তোমার ভিতর দিয়ে ওসব বলেছেন। গুরুদত্ত বস্তুর উপরে, সাধন ভজনের উপরে, কেহ অবজ্ঞা কর্‌লে, মালা তিলক নিয়ে কেহ টানাটানি কর্‌লে, গুরুনিষ্ঠা কেহ নষ্ট কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, সে স্থলে বজ্রের ন্যায় কঠোর হ'তে হয়—তার প্রতিবিধান কর্‌তে হয়। আর তা' নৈলে ব্যবহারে সর্ব্বদাই পুষ্পের মত কোমল হ'বে—এই ঋষি-বাক্য।**

শ্রীধরের গুরুনিষ্ঠা। তাহার অমানুষিক কাণ্ড—ব্রহ্মচারীকে শাসন। কুকুরের বমি ভক্ষণ।

ঠাকুরের নিকটে কিছুক্ষণ থাকিয়া নিজ আসনে আসিয়া বলিলাম। শ্রীধর আমাকে বলিলেন—ভাই ব্রহ্মচারী! তুমি ত মাতাজীর সঙ্গে ভদ্রভাবে ঝগড়া করেছ! আমি ভাই, চাষা ভূষা মানুষ; রাগ হ'লে অত সভ্য ভদ্র ভাষা মুখে আসে না। এবার বারদীর ব্রহ্মচারীকে চাঁছা ছোলা যা-তা ব'লে গালাগালি ক'রে এসেছি।

আমি—কেন, কি জন্য? কি হ'য়েছিল?

শ্রীধর বলিলেন—আরে ভাই! এবার কি কুক্ষণেই তাঁর নিকটে গিয়াছিলাম। সেখানে সারাদিন আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম। বিকালে ব্রহ্মচারীর নিকটে গিয়া বস্‌তাম। তিনি আমাকে খুব

আদর কর্‌তেন। একদিন বাড়ীভরা লোক, তিনি আমাকে বল্‌লেন—"আরে তুই এতকাল গোঁসাই—এর কাছে থেকে কি লাভ ক'রেছিস্? যে নিজে অন্ধ, সে কি করে অন্যকে পথ দেখাবে? অন্ধ গুরুর সঙ্গ ছেড়ে দে। ছ'মাস তুই আমার নিকটে থাক্। তোকে আমি ব্রহ্মজ্ঞান দেব, আর ঊর্দ্ধরেতা ক'রে দেব।" আগেই আমার মাথাটা সেদিন একটু কেমন কেমন ছিল। তার উপরে ব্রহ্মচারীর কথা শুনে গায়ে যেন আগুন লেগে গেল, আমি সপ্তমে চড়ে গেলাম। আর ঠিক থাক্‌তে পারলাম না। চীৎকার ক'রে একলাফে তাঁর দরজার সাম্‌নে গিয়া পড়্‌লাম। চীৎকারের উপরে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলাম—"ওরে শালা ব্রহ্মচারী! শালার ব্যাটা শালা ব্রহ্মচারী! তুমি না মহাপুরুষ? আমার গুরুকে বল্‌ছ অন্ধ? তিনি কিছু পারেন না? তুমি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দেবে? ঊর্দ্ধরেতা করে দিবে? আরে শালা! এই দ্যাখ তোর মত কত ব্রহ্মচারী আমার এক এক গাছা চুলে ঝুলছে।" এইরূপ যা তা বল্‌তে বল্‌তে বহির্ব্বাস, লেংটি সব খুলে ব্রহ্মচারীর গায়ে ছুঁড়ে মার্‌লাম। ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ আসন থেকে উঠে দু'হাতে আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন; আর বল্‌তে লাগলেন—"ঠিক্ বলেছিস্, ঠিক্ বলেছিস্। তোর অবস্থা দেখে আজ আমি বড় আনন্দ পেলাম। ঠাণ্ডা হ'।" এই সময়ে একটা কুকুর ব্রহ্মচারীর দরজার কাছে বমি কর্‌ছিল। ব্রহ্মচারী আমাকে বল্‌লেন—"আচ্ছা, তোর না ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? ঐগুলি খা দেখি? আমি অমনি বমিগুলি খেতে লাগলাম। তখন ব্রহ্মচারী আমাকে আদর ক'রে আসনের নিকটে বসিয়ে, ভজ্‌লেরামকে খাবার দিতে বল্‌লেন। ভজ্‌লেরাম একথালা উৎকৃষ্ট খাবার নিয়া এলো। ব্রহ্মচারী বল্‌লেন—"আয়! তুইও খা, আমিও খাই। আজ আমি তোর সঙ্গে খাব। তোরই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। গুরুনিষ্ঠা জন্মালে কি আর কিছু বাকী থাকে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাই, তোমার কুকুরের বমি খাওয়ার কথা তো এখন সকলের কাছেই শুন্‌তে পাই। আচ্ছা, বমিগুলো তুমি কি করে খেলে? শ্রীধর বলিলেন—"আরে রাম! বমি কি কেউ খেতে পারে? আমি দেখলাম চমৎকার ক্ষীর মাখা চিঁড়ে, খাবার সময়েও ঠিক্ সেই রকমই স্বাদ পেলাম। এসব কি গোঁসাইয়ের কৃপা ভিন্ন কখনও হয়?" শ্রীধরের মুখে এই সব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। ধন্য গুরুদেব! সর্ব্বত্র তোমার পদাশ্রিতগণের জয় জয়কার হউক।

ব্রহ্মদৈত্যের মালাচুরি। উঠানে মালা প্রাপ্তি—বড়ই আশ্চর্য্য।

২০শে—২৫শে অগ্রহায়ণ।

এবার গেণ্ডারিয়া আসিয়া অবধি মধ্যাহ্নে ঠাকুরের পায়খানা ও স্নানের জল আমিই দিয়া আসিতেছি। আজও পায়খানার জল দিয়া স্নানের জল তুলিতে লাগিলাম। ঠাকুর পায়খানায় গেলেন। দুই তিন মিনিট পরেই ঠাকুর

পায়খানা হইতে হঠাৎ আসিয়া আমার হাতে প্রবালের মালাছড়া দিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন—**মালাছড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। কতকগুলি নিয়েও গিয়েছে।**

আমি—আপনার মালা আবার কে ছিঁড়ে নিল।

ঠাকুর উপর দিকে হাত তুলিয়া কি দেখাইলেন—বুঝিলাম না। ইঙ্গিতে বলিলেন, **রুদ্রাক্ষের তাগাও একবার নিয়েছিল।** তখন বুঝিলাম—এবারও সেই ব্রহ্মদৈত্যেরই কাজ। ঠাকুর আবার পায়খানা গেলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম—বোধ হয় জটায় লাগিয়া হঠাৎ সরু মালাগাছটি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর, অনুমানে ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলিতেছেন। খোঁজ করিলে বাকিগুলি হয় ত পায়খানায়ই পাইব। ঠাকুর পায়খানা হইতে আসিলেন। পরে বলিলাম—অবশিষ্ট মালাগুলি বোধ হয় পায়খানাই আছে, একবার দেখব? ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন—**হাঁ, হাঁ, তা দেখ্‌তে পার। দু একটা পেতেও পার। আর সব নিয়ে গেছে।** আমি পায়খানায় অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটিমাত্র পাইলাম। ঠাকুরের কথামত মালাগুলি গণিয়া দিদিমার হাতে দিলাম। পাছে কেহ উহা ঠাকুরের নিকটে চাহিয়া নেয়, এই আশঙ্কায় দিদিমা তৎক্ষণাৎ উহা কোঠা ঘরে সিন্ধুকের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

আজ ৪/৫ দিন হইল ঠাকুরের গলার মালা ব্রহ্মদৈত্য ছিঁড়িয়া নিয়া গিয়াছে। আজ মধ্যাহ্নে স্নানান্তে বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ঠাকুর, ঘরে আসিবার সময়ে, উঠানের ঠিক মধ্যস্থলে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন; এবং মাটির উপরে পায়ের খড়ম দিয়া পুনঃপুনঃ ঠোক্কর দিতে দিতে ইঙ্গিতে বলিলেন—**এইখানে সেদিন ব্রহ্মদৈত্য মালাগুলি এনে রেখে গেছে। খুঁড়লে পাবে।** আমি অমনি স্থানটি চিহ্নিত করিয়া কাটারি আনিতে গেলাম। ঠাকুর, ঘরে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের কথা শুনাতে সকলেরই উহা দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। আমি মাটি খুঁড়িতে লাগিলাম। অত্যন্ত শক্ত মাটি, পাঁচ ছয় মিনিটে আট নয় ইঞ্চি খোঁড়ার পর দেখিলাম একটি স্থানে প্রবালের সমস্ত গুলি দানা জড় করা রহিয়াছে। যে মাটির মধ্যে মালাগুলি পাইলাম, তাহা আল্‌গা মাটি নয়, দস্তুর মত নীরেট্ শক্ত। তথাপি দিদিমার হাতে সেদিন যে মালাগুলি দিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হইল। দেখা গেল, দিদিমার সিন্দুকের ভিতরে দানাগুলি ঠিকই আছে। মিনিটে মিনিটে যে উঠানের উপর দিয়া লোকের নিয়ত গতায়াত, চারিখানা ঘরের মধ্যবর্ত্তী খোলামেলা সেই উঠানে কঠিন মাটির এত নীচে কি প্রকারে মালা আসিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চার পাঁচ দিন মাত্র পূর্ব্বে ব্রহ্মদৈত্য মালা রাখিয়া গিয়াছে; অথচ এত শক্তমাটির ভিতরে কি করিয়া মালা রহিয়াছে, ইহা আরও আশ্চর্য্য। অবিশ্বাসী মন! ঠাকুরকে আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস-ভক্তি এক বিন্দুও যে বেশী হইতেছে, এমন মনে হয় না। প্রত্যক্ষের উপরেও বিশ্বাস জিনিষটি নির্ভর করে না, ইহাই পরিষ্কার বুঝিতেছি। মাটিতে পোঁতা

মালাগুলিও দিদিমার হাতে আনিয়া দিলাম; মাত্র পাঁচটি প্রবালের দানা, রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের সঙ্গে গাঁথিয়া ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের নিকটে রাখিলাম। ঠাকুর অতঃপর আর প্রবাল ধারণ করিবেন না জানাইলেন।

স্বপ্ন—ঠাকুরের ক্রোড়ে নীল কাক। শক্তি সঞ্চারে অবস্থা—পাদস্পর্শে দেহ অমৃতময়।

আজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পর ঠাকুর আমাকে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—**তুমি তো প্রায়ই সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখ। এখান থেকে গিয়ে কিছু দেখেছিলে?**

২৭শে অগ্রহায়ণ, রবিবার।

আমি—কয়েকটি বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। বাস্তিতে একদিন দেখ্‌লাম—বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া গেণ্ডারিয়া গিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি সাধু আমাকে বলিলেন—"ভাই এ বুদ্ধি কেন? অনর্থক কেন কাশীতে বৃন্দাবনে ঘুরিয়া মর? গেণ্ডারিয়াই থাক না কেন? যেখানে গুরু, সেখানেই ত সকল তীর্থ!" আমি বলিলাম—শুধু অনুমানে তো আর তৃপ্তি হয় না? প্রত্যক্ষরূপে জানা চাই। সমস্ত তীর্থেই একটা স্থান-মাহাত্ম্য আছে। গেণ্ডারিয়ায় সে প্রকার কিছু আছে কি? আর ঠাকুর যে আমার সর্ব্বশক্তিমান্ সদ্‌গুরু ভগবান্, তাহাও তো অনুমানেই বলি; প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু পাই না। সাধু বলিলেন—আচ্ছা, তুমি ভূমির দিকে দৃষ্টি ক'রে ক'রে তোমার ঠাকুরের নিকটে যাও না? আমি তাঁর কথামত গেণ্ডারিয়ার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার নিকটে চলিলাম। চাহিয়া দেখি, অতি সুন্দর, পরিষ্কার নীল জ্যোতির বুদ্‌বুদ্ মাটির সর্ব্বত্র ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অসংখ্য তারার মত বিন্দু বিন্দু জ্যোতির্ব্বিম্ব ভূমির উপরে ফাটিয়া নীল জ্যোতিঃ বিকীরণপূর্ব্বক মিলিয়া যাইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমকে সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হইল। আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, আপনি এই ঘরে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়া আছেন। আমি আপনার পাশে নিজ আসনে বসিলাম। আপনি মাথা তুলিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে এক একবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি কাক উড়িয়া আসিয়া আপনার নিকটে পড়িল। আপনি কাকটিকে তুলিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে কাকটি উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া গেল। আপনি তখন উহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া, উহার পশ্চাৎভাগে ফুৎকার প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে আপনার ভিতরের যে সমস্ত ভাব ও অবস্থা, পাখীর ভিতরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, পাখী সুমধুর ধ্বনিতে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। একটু পরে আপনি পাখীটিকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—**এবার ঠিক হ'য়েছে। যথা ইচ্ছা চ'লে যাও।** পাখীটি তখন দুই তিন ফুট দূরে থাকিয়া আপনার পানেই চাহিয়া রহিল। আপনি আমাকে বলিলেন—**একখানা সংবাদপত্র সাম্‌নের বেড়ায় টাঙ্গাইয়া দেও তো!**

আমি বড় একখানা খবরের কাগজ বেড়ার গায়ে লাগাইয়া ধরিয়া রহিলাম। আপনি ঐ কাগজের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেতপূর্ব্বক পাখীটিকে বলিতে লাগিলেন—**ঐ দ্যাখ্ ব্রহ্মা! ঐ দ্যাখ্ বিষ্ণু! ঐ দ্যাখ্ শিব! ঐ দ্যাখ্ কালী। ঐ দ্যাখ্ দুর্গা!** আপনি এইপ্রকার 'ঐ দ্যাখ্' 'ঐ দ্যাখ্' বলিয়া অসংখ্য দেবদেবীর নাম করিতে লাগিলেন। পাখীও আপনার বলামাত্র ঐসকল দেবদেবী দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। পাখীর এই অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিলাম। জাগিয়া উঠিয়াও নিজেকে জাগ্রত কি নিদ্রিত, কিছুক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন স্বপ্নের দৃশ্যটি চক্ষে লাগিয়া রহিল। স্বপ্নটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া খুব আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—**বড়ই চমৎকার স্বপ্ন, লিখে রেখো!**

দ্বিতীয় স্বপ্ন। গুরুভ্রাতারা সকলে আপনাকে লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শত শত মৃদঙ্গ করতাল একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকের উচ্চ সংকীর্ত্তন ও হুঙ্কার গর্জ্জনে চারিদিক যেন কাঁপিতে লাগিল। আপনি কীর্ত্তনের মধ্যে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। আপনাকে দেখিয়া সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িল। প্রমত্ত অবস্থায় আপনাকে ধরিতে গিয়া, গুরুভ্রাতারা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠের মত নীরস প্রাণে সংকীর্ত্তনের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এবং নিজের দুরবস্থা ভাবিয়া, হা হুতাশ করিতে লাগিলাম। সকলকেই মহাভাবে বিহ্বল দেখিয়া, নিজের উপর ধিক্কার আসিল। আমার মত ঘৃণিত জঘন্য আর কেহ নাই বুঝিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। নিরুপায় হইয়া তখন 'নিতাই! নিতাই! পতিতপাবন নিতাই! কোথা হে?' বলিয়া কাতরভাবে ডাকিতে লাগিলাম। আমার কাতরধ্বনি আপনার কানে গেল। আপনি তখনই উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিলেন এবং দু'হাতে আমাকে ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া, সজোরে মাটিতে আছাড় মারিলেন। আমার হাড়গোড় সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আপনি তখন উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আমার সেই চূর্ণ বিচূর্ণ শরীরের উপরে উঠিয়া পড়িলেন; এবং একবার ডান পায়ে একবার বাম পায়ে ঘন ঘন ভর দিয়া, আমার সর্ব্বাঙ্গে বারংবার মাড়াইতে লাগিলেন। আমার শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে পিচ্ পিচ্ করিয়া সাবানের জলের মত সাদা সাদা ফেনা উঠিতে লাগিল। আপনি তখন উহা গণ্ডূষে গণ্ডূষে তুলিয়া লইয়া, **অমৃত** বলিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে আনন্দ ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। সেই ক্রন্দন রোল শুনিতে শুনিতে আমি জাগিয়া উঠিলাম। এই স্বপ্নটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অবনত মস্তকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সেই কান্নার স্মৃতি অন্তরে রাখিতে এই স্বপ্নটি লিখিয়া রাখিলাম।

তৃতীয় স্বপ্ন। তিন চার দিন হয় দেখিলাম—গুরুভ্রাতারা অনেকে এই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আপনার সঙ্গে রাত্রিযাপন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ নিজ আসন পাতিয়া বসিলেন।

স্থানাভাব, আমি কোথায় যাইব ভাবিয়া আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আপনি আমার আপাদমস্তকে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—**তোমার স্থান আমার পায়ের নীচে। কারো কথায় তুমি এস্থান ছেড়ে কখনও অন্যত্র যেও না।** এই সময় ঠাকুরমার প্রয়োজনে হাতে তালি দিয়া আপনি আমাকে জাগাইলেন। এ সব স্বপ্ন কি সত্য? এ সব স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি? ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন—**তা বল্‌তে নেই। লিখে রাখ্‌তে হয়—পরে বুঝবে।**

আরো কতকগুলি স্বপ্ন ঠাকুরকে শুনাইলাম, তাহা আর প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল না।

ঠাকুরমার সেবা।

৩০শে অগ্রহায়ণ, বুধবার।

ঠাকুরমাকে লইয়া আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। দিন দিন তাঁর উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে। জ্বরও নিয়ত লাগিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে বিষম কাশি আরম্ভ হয়। সর্ব্বাঙ্গে গাঁঠে গাঁঠে অসহ্য বেদনা। সেবা-শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। পরিবারস্থ বা পাড়ার কেহ ভয়ে ঠাকুরমার নিকট ঘেঁষেন না। যোগজীবন তো কোন কালেও সেবা করিতে পারেন না। রোগী দেখিলেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়েন। শ্রীধর বাতজ্বরে প্রায়ই শয্যাগত। ঠাকুর মৌন থাকিয়াও ঠাকুরমাকে নিজের ঘরে রাখিয়া এত উৎপাত অত্যাচার প্রতি রাত্রিতে কি প্রকারে সহ্য করেন, বুঝিতেছি না। কিছুকাল যাবৎ ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে ঠাকুমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ঘণ্টা দুই কাল বিশ্রাম করিয়া, আসন লইয়া ঠাকুরের ঘরে যাই। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় প্রফুল্লচিত্তে ঠাকুরমার সেবায় সারারাত্রি কাটাই। রাত্রি নয়টার পর ঠাকুরমার জ্বর, কাশি ও বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় সমস্ত রাত্রি তৈল ও পুরাণো ঘৃত গায়ে, পায়ে, মাথায় মালিশ করিতে হয়। ঠাকুরমা কখন চীৎকার, কখন গালাগালি, কখন বা গান করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন। সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বলে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেক দিতে হয়। আদার রস ও মধু তিন চারবার খাইয়া থাকেন। বায়ু বৃদ্ধি হইলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা রকম খেয়ালের হুকুম হইয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন না করিলে রক্ষা নাই, চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন। ঐ সময়ে বেগতিক দেখিলে পলাইয়া যাই। বারান্দায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকি। হলুদের রংয়ের খণ্ড খণ্ড কফ্ তুলিয়া ঘরের সর্ব্বত্র ফেলিতে থাকেন। রাত্রে দু'তিনবার উহা পরিষ্কার করিতে হয়। রাত্রি শেষ না হইতেই "রান্না কর্‌তে যা" বলিয়া, ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। যোগাড় যন্ত্র করিয়া ডাল তরকারি ও গরম ভাত, সূর্য্য উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। দু' তিন জনার মত রান্না না হইলে নিস্তার নাই। পছন্দমত রান্না না হইলে, "একি? তোর বাপের মাথা রেঁধেছিস?"—বলিয়া গালাগালি করেন। ভোর হইলেই ঠাকুরমা আহার করিতে বসেন। পাড়ায় মেয়েরা তখন আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুরমা আহার করিতে

করিতে সকলকে প্রসাদ দিতে থাকেন। শীতের সময়ে গরম গরম প্রসাদ পাইয়া, তাঁহারা সকলেই খুব পরিতোষ লাভ করেন। ঠাকুরমার আহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার অন্যত্র যাওয়ার উপায় থাকে না। ঠাকুমার দেহে ঠাকুর স্বয়ং অবস্থান করিয়া আমার সেবা গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাবটি নিয়ত আমার ভিতরে জাগিতেছে বলিয়াই স্থির আছি। আমার এই ভাব যে সত্য, ঠাকুরও তাহা দয়া করিয়া আশ্চর্য্য প্রকারে আমাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দেন। ঠাকুরের কৃপা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া এই সেবাতে উৎসাহ আনন্দ ক্রমশঃ আমার বৃদ্ধিই পাইতেছে। সারাদিনান্তে একবার একপাক আহার করি বলিয়া ঠাকুরমা আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত। অনেক সময়ই আমাকে ধমক্ দিয়া বলেন—"যেমন পেট ভ'রে খাস না, ভাল জিনিস খাস না, মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিস, মৃত্যুকালে মহাপ্রাণী তোর মুখে লাথি মেরে চলে যাবে। ব্রাহ্মণের ছেলে, সারাদিন উপোস ক'রে থাকিস্? আমার ছেলের অকল্যাণ হ'বে। যাঃ! আশ্রম থেকে চলে যা!" এইরূপ বলিয়া প্রায়ই আমাকে তাড়া দিয়া থাকেন। ঠাকুমার গালি সময় সময় কিন্তু বড় মিষ্টি লাগে। মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কখন কখন আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

দিদিমার সহিত ঠাকুরমার অপূর্ব্ব ঝগড়া—তখনই আদর।

দিদিমার সঙ্গে ঠাকুরমার 'সাপ আর বেজী' সম্বন্ধ। দিদিমাকে দেখিলেই ঠাকুরমা যা তা একটা কথা তুলিয়া ঝগড়া জুড়িয়া দেন। "মেয়ে মরেছে, এখন আর এখানে আছ কেন? জামাইয়ের সঙ্গে এখন আর কি সম্পর্ক? এখন আর এখানে তোমার অত গিন্নিপনা খাট্‌বে না; আমার ছেলেকে আমি আবার বিয়ে করাব।" দিদিমা কাজকর্ম্মে এঘর সেঘর করিতে থাকেন। ঠাকুরমাও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এ সব কথা বলিতে বলিতে ঘুরিতে থাকেন। পরে, যখন ঝগড়া বেশ জমিয়া উঠে, দিদিমার সঙ্গে আর পারিয়া উঠেন না, তখন একটু সরিয়া গিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া চোখ্ বুজিয়া বসিয়া থাকেন। দিদিমার বলা শেষ হইলে, অমনি গিয়া আবার দু'চার কথা শুনাইয়া দিয়া আসেন। পুনঃপুনঃ এরূপ করায় দিদিমা আরও রাগিয়া যান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিদিমার আহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুরমা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়েন। পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, দধি, ক্ষীর, মিষ্টি, কলা সংগ্রহ করিয়া আনেন; এবং দিদিমার আহারের সময়ে সে সকল দিয়া খুব আদর করিয়া বলেন—"বেয়ান্! ঝগ্‌ড়ার সময়ে ঝগ্‌ড়া, তা খাবার সঙ্গে কি? নাও, এই সব বেশ ক'রে খাও। আহা! তোমার দুঃখ ক্লেশ কে বুঝ্‌বে? থাক্‌তেও তোমার কেউ নাই। আমি পাগল মানুষ—আমার কথা তুমি গ্রাহ্য ক'রো না।" ইত্যাদি—

নীলকণ্ঠ বেশের মর্য্যাদা।

আজ বেলা ১০টার সময়ে নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে ঘর হইতে বাহির হইলাম। ঠাকুরমা আমাকে দূর হইতে দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; এবং একগাছা ঝাঁটা হাতে লইয়া "ছেলে হ'য়ে বাপের রূপ! দুর্গা পিছু পিছু চলেন! বের হ, বের হ, আশ্রম থেকে বের হ, আজ তোকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো" বলিয়া তাড়াতাড়ি আসিতে লাগিলেন। আমি বেগতিক দেখিয়া দৌড় মারিলাম। পরে এবাড়ী ওবাড়ী ছুটাছুটি করিয়া ঠাকুরমার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— ঠাকুরমা যে বলেন তা কি ঠিক্, না পাগলামী? "ছেলে হয়ে বাপের রূপ, দুর্গা পিছু পিছু চলেন, আশ্রম থেকে বের হ" ব'লে আজ আমাকে তাড়া করেছেন।

ঠাকুর—**মা যথার্থই বলেছেন। ভগবতী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেন।**

আমি—কেন? কোন দোষ পেলে ঘাড় মট্‌কাতে?

ঠাকুর—**না, নীলকণ্ঠ বেশের মর্য্যাদা দিতে।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা'কে স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলাম। আহা! ঋষি-মুনি বন্দিতা, সর্ব্বশক্তির নিয়ন্ত্রী ভগবতী যোগমায়া, দয়া করিয়া এই দুবাচারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরেন! ইহা মনে হওয়ায় প্রাণের অবস্থা যে কি রূপ হইল বলিতে পারি না। মায়ের অপূর্ব্ব চরিত শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ব্যতীত উদয়াস্তে মা'কে একবারও স্মরণ করি না, তবু মায়ের কত দয়া!

ঠাকুরমার অনাচার অত্যাচারের কথা লইয়া কোথাও আলোচনা হইলে, ঠাকুরমা তথায় গিয়া স্থির ভাবে তাহা শুনেন; এবং তাহাদের নিকটে নিজেরই দোষের কথা বলিয়া নিজেকে গালাগালি করিতে থাকেন। সকলে শুনিয়া অবাক্! নিন্দা-প্রশংসা যে ঠাকুরমার ভিতরে কিছু স্পর্শ করে, এরূপ অনুমানও করা যায় না; পাগ্‌লামী বাদ দিলে, ঠাকুরমার মধুর প্রকৃতি লোকালয়ে যথার্থই দুর্ল্লভ। মহা অপরাধীরও ক্লেশ দেখিলে অস্থির হন। অদ্ভুত সহানুভূতিই তাঁর জীবনের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

বিবিধ চক্রদর্শন, তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ত্রিভঙ্গাকৃতি—শালগ্রাম পূজার আদেশ।

১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার।

কিছুদিন যাবৎ আহারান্তে ঠাকুর আমতলাতেই বসিতেছেন। আসনের সম্মুখে ধুনি জ্বালিযা দেই। প্রায় সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত আমতলা নির্জ্জন থাকে। এই সময়ে আমি একঘণ্টা কাল ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া থাকি। পরে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের সহিত নাম করি, ইহাতে বড়ই আরাম পাই। কিছুকাল যাবৎ নাম করার সময়ে

বিবিধ প্রকার-চক্র দর্শন হইতেছে। এই সকল চক্র বা যন্ত্র, শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোক রেখা দ্বারা চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ কখন বা দ্বাদশ কোণাঙ্কিতও দেখিতে পাই। এই সকলের মধ্যস্থল কালো, তাহাতে সময়ে সময়ে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতি পলকের জন্য বিকাশ পাইয়া, তন্মুহূর্ত্তেই আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়। বোধ হয়, এসব চক্র বা যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে দৃষ্টি স্থির হইলে, এই অস্পষ্ট চঞ্চল জ্যোতিটিও স্বরূপ আয়তনে নিশ্চল দৃষ্ট হইবে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**প্রত্যেক চক্রেরই মধ্যে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী অবস্থান করেন।** এই জ্যোতির অভ্যন্তরেই দেবদেবী প্রকাশিত হইবেন মনে হইতেছে। এই সব কল্পনাতীত, চির-অজ্ঞাত, অশ্রুতপূর্ব্ব বস্তু যখন এভাবে আপনা আপনিই অকস্মাৎ প্রকাশিত হইতেছে, তখন আর চেষ্টা দ্বারা মূল অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? যাহা হইবার, ঠাকুরের কৃপায়ই হইবে।

নাম করিতে করিতে চক্ষে পড়িল—ঠাকুরের মস্তকোপরি কিঞ্চিদূর্দ্ধে শূন্যমার্গে নীলাভ কাল-চক্র বেষ্টিত অনুপম ওঁকার মূর্ত্তি। তাহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুত্রয় হইতে উজ্জ্বল শুভ্র-চ্ছটা তির্য্যগ্‌ভাবে সংযুক্ত হইয়া, একটি মনোহর ত্রিভঙ্গাকৃতি গঠিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে উহা আকাশে মিলাইয়া গেল। পুনরায় উহা দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইতে লাগিল, ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্র ঐ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—একি দর্শন করিলাম? এরূপ দর্শন করিলাম কেন?

ঠাকুর ইঙ্গিতে অস্ফুট স্বরে কহিলেন—**তুমি শালগ্রাম পূজা করো, বিশেষ উপকার পাবে।** আমি শুনিয়াই অবাক্! ভাবিলাম—একি হ'ল? এ নূতন কর্ম্মভোগ আবার কেন?

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—শালগ্রাম পূজা করিতে বলিলেন, উহা কি প্রকারে করিব?

ঠাকুর বলিলেন—**শাস্ত্রব্যবস্থানুরূপ শালগ্রাম পূজা করবে।**

আমি কহিলাম—ভগবানের দ্বিভুজ, মুরলীধর, চতুর্ভুজ অথবা অষ্টভুজরূপ আমি ভাবিতে পারিব না—ওসকলে আমার কোন আকর্ষণ নাই—আমি ভাগবানের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, শালগ্রামে বা যে কোন স্থানে তাহারই ধ্যান করিতে পারি।

ঠাকুর—**তুমি তাহাই ক'রো** বলিয়া, শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে কয়েকটি শ্লোক আমাকে পড়িতে বলিলেন এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের ন্যাস সমাপনান্তে শালগ্রামের পূজা যে ভাবে করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন। শ্লোক কয়টির অনুবাদ যথা—

(৪৭) যে ব্যক্তি সহসা আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি বেদ বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধির সমন্বয় করিয়া তদনুসারে কেশবের পরিচর্য্যা করিবেন।

(৪৮) আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহা হইতে আগমার্থ অবগত হইয়া স্বীয় অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষের অর্চ্চনা করিবে।

(৪৯)　শুদ্ধচিত্ত হইয়া মূর্ত্তিবিশেষের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি দ্বারা স্বীয় দেহ সংশোধন করতঃ ন্যাসাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিবে।

(৫০)　অর্চ্চনার পূর্ব্বে যথালব্ধ উপচার সহকারে যন্ত্রাদি শোধন দ্বারা পুষ্পাদি দ্রব্য, সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা ভূমি, অব্যগ্রতা দ্বারা আত্মা, অনুলেপনাদি দ্বারা স্বীয় শরীরকে অর্চ্চনা কার্য্যের যোগ্য করিয়া আসনে জল প্রেক্ষণ করিবে।

(৫১)　পাদ্যাদি কল্পনা পূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করত সমাহিত চিত্তে অঙ্গন্যাস, করন্যাস সহকারে মূল মন্ত্রযোগে অর্চ্চনা করিবে।

(৫২)　সাঙ্গোপাঙ্গ ও পার্ষদ সহিত অভিমত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় মন্ত্রদ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্রভূষণ,—

(৫৩)　গন্ধ, মাল্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নানা উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করতঃ বিধিবৎ স্তব করিয়া হরিকে নমস্কার করিবে।

(৫৪)　আপনাকে তন্ময়রূপে ধ্যান করতঃ হরির মূর্ত্তি পূজা করিবে। পরে মস্তকে নির্ম্মাল্য সৎকার পূর্ব্বক দেবতার মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করত পূজা সমাপন করিবে।

(৫৫)　যে ব্যক্তি এইরূপ তান্ত্রিক কর্ম্মযোগানুসারে অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি অথবা স্বীয় হৃদয়ে আত্মভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তিনি অচিরাৎ মুক্তিলাভ করেন।

তাপিবার জন্য ধুনি নয়। ধুনি নির্ব্বাণ।

৩রা-৪ঠা
পৌষ পর্য্যন্ত।

ঠাকুর রাত্রি ৩টার সময় একবার বাহিরে যান। ধুনির ধারে কলসী ভরিয়া জল রাখিয়া দেই। ঐ জল গরম হইয়া থাকে, ঠাকুরকে হাত মুখ ধুইতে দেওয়া হয়। আজ ঠাকুরমার অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায়, রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত তাঁকে লইয়া ব্যস্ত রহিলাম। বুক বেদনা ও অবসন্নতা বেশী বোধ হইতে লাগিল। ধুনির পাশে আমি শয়ন করিলাম। শ্রীধরও আসিয়া ধুনির পাশে বসিলেন। রাত্রি ৩টার সময়ে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। শোওয়া অবস্থায়ই ঠাকুরের খড়মজোড়া ঠাকুরের আসনের ধারে রাখিয়া দিলাম। শ্রীধরকে এক ঘটি জল কলসী হইতে ভরিয়া দিতে বলিলাম। শ্রীধর আমার কথা গ্রাহ্যই করিল না। ঠাকুরও শ্রীধরের নিকটে ইঙ্গিতে জল চাহিলেন। শ্রীধর একবার কলসীর মুখে ঘটিটি ঠেকাইয়াই সামান্য জল ঢালিয়া দিয়া আবার ধুনি তাপিতে লাগিলেন। ঠাকুর হাতে ঘটি না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীধরের মাথা গরম হইলেও ঠাকুরের কার্য্যে এরূপ অগ্রাহ্যভাব আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি খুব বিরক্তির সহিত শ্রীধরকে বলিলাম—স'রে বসে ধুনি তাপ, ভজন কর।

এ সব বাজে কাজ তোমার নয়। তারপর নিজেই অগত্যা ঘটিতে জল ভরিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর জলঘটি হাতে লইয়া অমনি জ্বলন্তধুনিতে ঢালিয়া দিলেন, ধুনি নির্ব্বাপিত হইল। আর এক ঘটি জল দিলাম, ঠাকুর তাহা লইয়া বাহিরে গেলেন। আমার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, বুঝি শ্রীধরের উপরে বিরক্ত হইয়া অথবা আমারই ব্যবহারে কষ্ট পাইয়া ঠাকুর ধুনিতে জল ঢালিলেন। ঠাকুর ঘরে আসিয়া বলিলেন—**সে সময়ে একটি মহাত্মা আমার নিকটে দাঁড়ায়ে বল্‌লেন—"তাপ্‌বার জন্য এখানে ধুনি রাখা ঠিক নয়। ধুনি নির্ব্বাণ কর।" ঐ কথা শুনেই আমি ধুনিতে জল ঢেলে দিলাম। পূর্ব্বেও এক বার আমাকে ওরূপ বলেছিলেন—কিন্তু খেয়াল ছিল না। এখন ধুনির কুণ্ডটি ভেঙ্গে ফেল।** ঠাকুরের কথামত তৎক্ষণাৎ কুণ্ডটি ভাঙিয়া ফেলিলাম।

ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট—চিম্‌টা, কমণ্ডলু, ত্রিশূল ধারণের অধিকার।

মধ্যাহ্নে আর আর দিনের মত ঠাকুরের আসনের সম্মুখে আমতলায় ধুনি জ্বালিয়া দিলাম। ভাগবত পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধু সন্ন্যাসীরা আসনের সাম্‌নে ধুনি রাখেন কেন? গাঁজা, চরস ও খাওয়ার সুবিধার জন্য এবং শীতে ঠাণ্ডা না লাগে এই উদ্দেশ্যেই সাধুরা আগুন রাখেন মনে করিয়াছিলাম। গতরাত্রে যাহা বলিলেন. তাহাতে তো বুঝিলাম, ধুনি রাখার অন্য তাৎপর্য্য আছে। কি জন্য সাধুরা ধুনি রাখেন?

ঠাকুর অস্পষ্টস্বরে কখনও বা লিখিয়া বলিলেন—**ধুনির সাধন আছে। অগ্নিই ইষ্টনাম, এইরূপ ধ্যান রেখে, কাম-ক্রোধাদি ইন্ধন তাহাতে আহুতি দেন। ধুনির অগ্নির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্‌তে কর্‌তে, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অগ্নির তেজ বৃদ্ধি কর্‌তে থাকেন; আর কুন্দী সকল কখনও কাম, কখনও ক্রোধ ইত্যাদি কল্পনা করে নাম অগ্নি দ্বারা তা দগ্ধ করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওরকম এক একটি কুন্দী ভস্ম না হয়, আসন ছাড়েন না—অবিশ্রান্ত নাম করেন। এক একটি কুন্দী এই ভাবে দগ্ধ কর্‌তে পার্‌লে, তাঁদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। স্পর্দ্ধা ক'রে একে অন্যকে বলেন 'হাম দু'মণ কুন্দী ফুক্ দিয়া', কেহ বলেন—'হাম তিন মণ ভসম্ কিয়া।' শুধু অগ্নি তাপার উদ্দেশ্যে সাধুদের ধুনি নয়। ধুনির সাধন বড়ই উৎকৃষ্ট।**

আমি—সাধুরা যে চিম্‌টা, কমণ্ডলু, ত্রিশূল ধারণ করেন, তাহারও কি সাধন আছে? ধুনি খুঁচিবার জন্য চিম্‌টা, জল খাওয়ার জন্য কমণ্ডলু এবং হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ত্রিশূল—এইই ত মনে করি।

ঠাকুর—**সাধুদের এ সমস্তই এক একটা পরীক্ষা পাশ করে গ্রহণ কর্‌তে হয়। জিহ্বা**

সংযত হলে চিম্‌টা ধারণের অধিকার হয়। চিম্‌টা ধারণ করে প্রথমেই বাক্ সংযত কর্‌তে হয়। কমণ্ডলু ধারণেরও অধিকার আছে। কমণ্ডলু ভ'রে নির্ম্মল ঠাণ্ডা জল সম্মুখে রেখে সাধক তার শীতলতা, স্থিরতা ও সাম্যভাবের সহিত মনের যোগ রেখে ভগবানের নাম কর্‌বেন। তাঁর অন্তর সর্ব্বদাই শীতল জলের মত ঠাণ্ডা থাক্‌বে, কিছুতেই উত্তপ্ত হবে না। আর চিত্ত সর্ব্বদা অবিকৃত ও সাম্যভাবে পূর্ণ থাক্‌বে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ যাঁর করায়ত্ত—তিনিই মাত্র ত্রিশূলধারণের যথার্থ অধিকারী।

স্বপ্ন—ঠাকুরের ছিন্ন জটা লইয়া ক্রন্দন।

অধিক রাত্রে ঠাকুরমার অসুখ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; দু'বার তাঁকে পায়খানায় নিতে হইল। পুরাণো ঘৃত মালিশ করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। শরীর আমার বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। ঠাকুরমাকে সেক দিবার জন্য ঘরে যে অগ্নি রাখা হইত, উহা সম্মুখে রাখিয়া ঠাকুরের চরণতলে শয়ন করিলাম। ঠাকুর যেন আমাকে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছেন, এইভাবে অভিভূত থাকিয়া নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি প্রায় তিনটার সময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া পড়িলাম। কি দেখিলাম, ঠাকুর জানিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম—সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। আপনি মাথার তিনটি মাত্র জটা রাখিয়া অবশিষ্ট ছাঁটিয়া ফেলিলেন। আমি উহা নিত্য পূজা করিব মনে করিয়া তুলিয়া লইলাম। এই সময়ে কুঞ্জ ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার নিকটে ঐ জটা চাহিলেন। আমি তাঁকে একটি দিলাম। জটা স্পর্শ করিয়া আমাদের যে কি হইল বলিতে পারি না। জটার দিকে তাকাইয়া আমাদের হু হু শব্দে কান্না আসিয়া পড়িল। একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে করিতে একবার ভিতরে যাইতে লাগিলাম, আবার বাহিরে আসিতে লাগিলাম, আর উচ্চৈঃস্বরে আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে লাগিলাম—"আমার জানি কি হ'ল গো! গৌরাঙ্গ বলিতে নয়ন ঝরে।" এই সময়ে হাতে তালি দিয়া আপনি আমাকে জাগাইলেন। ঠাকুর স্বপ্ন শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, কিছুই বলিলেন না।

গোয়ালিনীর ঘোল দান। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলেই তো সর্ব্বনাশ।

ন্যাস করার পর ঠাকুরের আদেশমত আমি হোমাগ্নিতেই পূজা করিয়া থাকি। পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে ও বিধিমত পূজা করিতে বড়ই আরাম পাই। আজ একটি ভাল বেল পাইলাম। পানা করিয়া উহা পূজার সময়ে ভোগে লাগাইতে ইচ্ছা হইল। ঘোল দিয়া বেলের পানা ঠাকুর ভালবাসেন।

কিন্তু ঘোল কোথায় পাইব, ভাবিতে লাগিলাম। একটু পরেই একটি গোয়ালিনী "দধি নেবে গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমি অমনি ছুটিয়া গোয়ালিনীকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোল আছে?" গোয়ালিনী বলিল "কতটা চাই?" আমি বলিলাম—"আধসের"। আমার নিকটে গোয়ালিনী পাত্র চাহিল। পাত্র নিতে আসিয়া আমার মনে হইল, পয়সা নাই। তখন গোয়ালিনীকে বলিলাম "না গো ঘোল নিবনা। আমার পয়সা নাই।" গোয়ালিনী চলিয়া গেল। ২/৩ মিনিট ঘুরিয়া গোয়ালিনী আবার কি ভাবিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—"গোঁসাই পাত্র দিন, আপনার নিকট হইতে আমি পয়সা নিবনা, যত ঘোল ইচ্ছা আপনি নিন্।" আমি একটু দ্বিধা করিতেই গোয়ালিনী বলিল—"আপনি এ ঘোল না নিলে সমস্ত ঘোল আমি এখনই ফেলিয়া দিব।" আমি অগত্যা পাত্র দিলাম। প্রায় দেড়সের ঘোল গোয়ালিনী সন্তুষ্ট মনে দিল। আমি ভাবিলাম মনে যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল, ঠিক্ ঠাকুর তাহাই জুটাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের এই কৃপার দান আমি আগ্রহের সহিত গ্রহণ না করিয়া অগ্রাহ্য করিলে গুরুতর অপরাধী হইব। আমি প্রচুর পরিমাণে বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলাম। প্রসাদ পাইয়া সকলেই খুব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

ঠাকুর আমাকে অনুশাসন করিয়া বলিয়াছিলেন—**ব্রহ্মচারী! প্রার্থনা করলেই কিন্তু তাহা মঞ্জুর হবে! সাবধান!** সেই হইতে ভাল-মন্দ কোন প্রার্থনাই আমি করি না। কিন্তু এখন দেখিতেছি প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা হইলেই ঠাকুর তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রার্থনা করি আর নাই করি তাহার অপেক্ষাও রাখেন না। ইহাতে একদিকে আমার যেমন আনন্দ হইতেছে, অপর দিকে তেমনই উদ্বেগও আসিতেছে। মনটি ত সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখী। নিত্য নূতন বিষয় লাভেই মনের আনন্দ। ঠাকুর যদি আমাকে এই আনন্দ দিতে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় মাত্রই জুটাইয়া দেন, তাহা হইলে আর সর্ব্বনাশের বাকি কি থাকিবে? দিন দিন পরমার্থ ভুলিয়া বিষয়েই ত জড়াইয়া পড়িব। মঙ্গলময় ঠাকুর! তুমি কিসে কি কর, তোমার অভিপ্রায় কি —কিছুই বুঝিনা। এখন মনে হইতেছে তোমারই ইচ্ছা, তোমারই হাত সর্ব্বত্র—এটি পরিষ্কার দেখিলেই নিশ্চিন্ত। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনা কামনার নিবৃত্তি নাই, পরম শান্তি লাভেরও আর অন্য উপায় নাই।

মানসপূজা—ঠাকুরের সহানুভূতি। ঠাকুরের খেলা।
উপদেশ—অর্থে অনর্থ। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এক।

পূজাতে আজ বেশ আনন্দ লাভ করিলাম। ঠাকুরের নিকট ভাগবত পাঠের সময়ে কান্না সম্বরণ করিতে পারিলাম না। থামিয়া থামিয়া পাঠ সমাপন করিলাম। নামে বড়ই সুন্দর ভাব আসিল। নাম ফাঁকা অক্ষর নয়। নাম সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বীজ। শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এই নামের উপাসনা করিলে, ইচ্ছানুরূপ নামকে যে কোন রূপে, গুণে, আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। আমি নামকে তুলসী,

চন্দন, পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ অর্পণ করিতে লাগিলাম। খুব তেজের সহিত নাম করিতে করিতে ঠাকুরকে ঐরূপে সচন্দন তুলসী দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ, এক একবার চম্‌কিয়া উঠিয়া আমার দিকে আড়ে আড়ে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন; এবং ঈষৎ হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া, আমার আনন্দ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে আমার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। আহারান্তে সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে নিজ আসনে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুরকে আজ বড়ই প্রফুল্ল দেখিলাম। আসন ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি নানা প্রকার অভিনয় করিতে লাগিলেন। লাঠি ভর দিয়া খোঁড়া বুড়ার মত চলিতে আরম্ভ করিলেন। একটু পরে লাঠি রাখিয়া আসনে বসিলেন; পরে কচি খোকার মত সমস্ত ঘরে হামা দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এক একবার হাত পাতিয়া খাবার চাহিলেন। নানা প্রকার ইঙ্গিত করিয়া শিশুটির মত কত আবদারই জানাইতে লাগিলেন! ঠাকুরের এইসব শিশুর মত নৃত্য করা ও খেলা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুর আসনে বসিলেন। পরে কথায় কথায় গোয়ালিনীর ঘোল দেওয়ার কথা তাঁহাকে জানাইলাম। শুনিয়া ঠাকুর অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—**অর্থ সঞ্চয় না কর্‌লে অভাব কখনও হবে না ভগবান্‌ই সমস্ত চালিয়ে নেবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থ সঞ্চয় তো দূরের কথা—স্পর্শও কর্‌তে নাই। যদি এ রকম কর্‌তে পার, তা হলে অভাব কখনও ভোগ কর্‌বে না। যখন যা আবশ্যক, অনায়াসে আপনা আপনি জুটে যাবে। অর্থ সঞ্চয় থাক্‌লে, ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না। অর্থে একেবারে বেঁধে ফেলে, ধ্যান ধারণার সময়েও অর্থ চিন্তা হয়। ইহাতে একেবারে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। হাতে যা আস্‌বে তৎক্ষণাৎ তা ব্যয় ক'রে ফেল্‌বে। তা হলেই উপর হ'তে আবার পাবে। যা পাবে তা এম্‌নি দু'হাতে বিলায়ে দেবে, তা হ'লেই অজস্র আস্‌ছে দেখ্‌তে পাবে। অর্থ হাতে থাক্‌তে ভগবানে নির্ভর হয় না। পঞ্চাশটি টাকায় তোমাকে বেঁধে রেখেছে। প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও গরীব দুঃখীকে দিয়ে উহা ব্যয় ক'রে ফেল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অর্থ সঞ্চয় নিষেধ।** ঠাকুর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—**খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এক। একটুকুও ভিন্ন নন। যাঁদের নিকটে এই তত্ত্ব প্রকাশ হয় নাই, তাঁরাই ভেদ বুদ্ধিতে দেখেন। বস্তুতঃ একই বস্তু, দুই নয়। খ্রীষ্টের ক্রশ, কৃষ্ণের চূড়া ও মহাদেবের ত্রিশূল এই তিনে ওঁকার হয়েছে।**

সেবাভিমানে নরক ভোগ।

ঠাকুরমার সেবার আনন্দ-উৎসাহে কিছুকাল কাটাইলাম। কিন্তু এখন ভয় হয়, পাছে সেবাপরাধে পড়িয়া যাই। গতরাত্রে দশটার সময়ে ঠাকুরমা একবার পায়খানায় গেলেন। রাত্রি ৩টার সময়ে দারুণ শীতে তাঁহাকে আবার পায়খানায়

৬ই পৌষ,
মঙ্গলবার।

নিতে হইল। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, চলিতে পারেন না। বাতের বিষম বেদনা, সমস্ত রাত্রি ঘৃত মালিশ করিয়া কখন বা সেক দিয়া কাটাইতে হইল। সেক দেওয়ার জন্য অগ্নি জ্বালিতে অকস্মাৎ একটি স্ফুলিঙ্গ গিয়া ঠাকুমার পায়ে পড়িল; ঠাকুরমার অম্‌নি "পুড়িয়ে মার্‌ল, পুড়িয়ে মার্‌ল" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ উঃ' করিয়া ক্লেশসূচক শব্দ প্রকাশ করিলেন। আমার প্রাণটি কাঁপিয়া উঠিল। অগ্নিকণা কিন্তু গায়ে লাগা মাত্রই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তথাপি ঠাকুরমার অস্বাভাবিক চীৎকার! মনে বড়ই দুঃখ হইল। আমি আর সেক দিব না স্থির করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মহেন্দ্রবাবু আবার সেক দেওয়ার জন্য আমাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—**দরকার নেই।** আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, ঠাকুর আমার ভিতরের ভাব বুঝিয়াই বুঝি নিবৃত্ত করিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত অনুগত হইয়া সেবা করিলে তাহাতে জীবনের যে মহৎ কল্যাণ অতি সহজে সাধিত হয়, সাধন ভজন তপস্যাতে বহুকালেও তাহা হওয়া দুষ্কর। অভিমান নষ্ট করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাব প্রাণে আনাই সেবার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি, সেবায় দিন দিন আমার অভিমান বৃদ্ধিই হইতেছে। আশঙ্কা হয়, রন্তিদেবের মত আমার সেবার পরিণাম অধোগতি না হয়। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন যে, রন্তিদেব যৌবনে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রতিদিন বিবিধ উপচারে, রাজভোগে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। এক দিবস দুর্ব্বাসা ঋষি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ভোজন করিতে চাহিলেন। রাজা তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া, ভোজন করাইতে বসাইলেন। ঋষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনান্তে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন একগাছা চুল অন্নের ভিতরে দেখিয়া ঋষি পাত্রত্যাগ করিলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রন্তিদেবকে বলিলেন—"প্রত্যহ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া অভিমান হইয়াছে! ব্রাহ্মণ কি ভোজন করেন একবার দেখ না—এতই অশ্রদ্ধা ও অমনোযোগিতা! নরকস্থ হও!" যে সেবাতে জীবের অভিমান নাশহেতু পরমপদ লাভ হয়, সেই সেবাতেই রন্তিদেবের অভিমান বৃদ্ধি হেতু নরক ভোগ করিতে হইল। ঠাকুর পরম দয়াল, সেবাপরাধ কখনও গ্রহণ করেন না, তাই রক্ষা। না হলে কি দুর্গতিই না হইত!

ভোরবেলা আহারান্তে ঠাকুরমা খুব আদর করিয়া আমাকে বলিলেন—"তোমাকে অনেক সময় কত কি বলি। তাতে তুমি কিছু মনে ক'রো না। জানইতো, রোগে রোগে আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।" ঠাকুরমার স্নেহপূর্ণ বাক্যে আমার প্রাণ আবার সরস হইয়া উঠিল।

ঠাকুর সদাশিব—সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা।
ধুনির বিভূতির অদ্ভুত গুণ—সূক্ষ্মরূপ দর্শনের উপায়।

ঠাকুরমার আহারান্তে বেলা ৮টার সময়ে স্নান করিলাম। পরে দূর্ব্বা, চন্দন, তুলসী ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া আসনে বসিলাম। ন্যাস, হোম, পূজা ও পাঠ সমাপন করিতে বেলা প্রায় ২টা বাজিল। তৎপরে ভাগবত লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আজ সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া আমতলায় বসিয়া আছেন—সম্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুরকে ভস্মমাখা দেখিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে কথা দিদিমাকে বলিয়াছিলাম। ভাগবত শেষ করিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আমার সাক্ষাৎ সদাশিব, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কোটি কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি, বিভূতিরূপে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে লোমকূপ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, মনে হইতে লাগিল। আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, উহা গঙ্গাজল বিল্বপত্র ধ্যানে ঠাকুরের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে লাগিলাম। আনন্দে এতই অশ্রুপাত হইতে লাগিল যে, ঠাকুরের দিকে বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না। একান্ত মনে দেহাভ্যন্তরে, মণিপুরে ঠাকুরকে বসাইয়া, প্রাণের সাধে পূজা করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে, আড় নয়নে, ক্ষণে ক্ষণে আমার পানে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কি আনন্দে যে এই কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তাহা আর প্রকাশ করিবার উপায় নাই।

৭ই পৌষ, বুধবার।

রান্না করিতে যাওয়ার সময় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধুরা গায়ে ভস্ম মাখেন কেন?

ঠাকুর—**ধুনিতে সাধুরা হোম করেন। প্রসাদ জ্ঞানে বিভূতি নিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখেন—ঐ ভাবেই অভিভূত থাকেন। গায়ে ভাল করিয়া ভস্ম মাখিলে লোমকূপ সমস্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-বাদলে শরীরের উত্তাপ সমান থাকে, তাতে কোন অসুখ হয় না। পাহাড় পর্ব্বতে এমন গাছ আছে, যার ভস্ম গায়ে মাখ্‌লে সাধুদের চোখে দেখা যায় না। স্বচ্ছন্দে হিংস্র জন্তুর মধ্যেও চলা ফেরা করেন।**

আমি—মানুষ কাছে থাক্‌লে চোখে দেখা যাবে না, একি কখনও হয়?

ঠাকুর—**হবে না কেন? খুব হয়। বস্তুর প্রতিবিম্ব চক্ষে পড়্‌লেই তো তা দেখ্‌তে পাবে। ঐ ভস্ম গায়ে মাখ্‌লে চক্ষু তার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারে না। সকল বস্তুরই কি প্রতিবিম্ব মানুষের চক্ষে পড়ে? প্রেতের রূপ কি দেখিতে পাও? অথচ কুকুর তা দেখে। অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুকুর সময়ে সময়ে লাফিয়ে উঠে, জনপ্রাণী শূন্য স্থানেও দৌড়িয়ে গিয়ে কুকুর চীৎকার কর্‌তে থাকে। এ সব লক্ষ্য করে দেখেছ?**

আমি—আমাদের চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কি ঐরূপ হ'তে পারে না?

ঠাকুর—**হাঁ, খুব পারে। ছ'টি মাস অবাধে সন্ধ্যা থেকে ভোরবেলা পর্য্যন্ত আলো না দে'খে যদি জেগে থাক্‌তে পার, তা হ'লে চোখ ক্রমে এমন হ'বে যে সূক্ষ্ম শরীর অনায়াসে দেখ্‌তে পাবে। প্রণালী মত দৃষ্টি সাধনেও হয়।**

ঠাকুরের কথা বুঝিলাম। কিন্তু স্থূলবস্তু চক্ষের সাম্‌নে থাকিলে তাহা দেখা যাবে না, ইহা যে বড়ই বিস্ময়কর! ধারণায় আসিল না। ঠাকুরের কথায় একটু দ্বিধা জন্মিল। মনে মনে দৃষ্টান্ত খুঁজিতে লাগিলাম। অবশ্য বায়ু, বস্তু হইলেও তাহার রূপ আমরা দেখিতে পাই না; এবং নিরাধারে অতি স্বচ্ছ জলেরও রূপ পরিষ্কাররূপে চক্ষে পড়ে না; কিন্তু স্থূলবস্তু চক্ষের সম্মুখে, অথচ দেখিতে পাই না, এই প্রকার দৃষ্টান্ত তো অনুসন্ধানে পাইতেছি না। ঠাকুরের দয়ায় এই সময়ে চণ্ডীর একটি শ্লোক মনে আসিল—দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥

কোন প্রাণী দিনে দেখিতে পায় না—রাত্রে দেখে; কেহ দিনে দেখে, রাত্রিতে দেখিতে পায় না। আবার কোন কোন প্রাণী, দিনে ও রাত্রে একই প্রকার দেখে। মনে হইল, যদিও সমস্ত জীবের দর্শন ক্রিয়া একমাত্র চক্ষুদ্বারাই নিষ্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবান্ এমনই উপাদানে ও অদ্ভুত কৌশলে এই চক্ষু গঠিত করিয়াছেন যে, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকেও কারো কারো দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অবরোধ করে, দিবালোকের রূপও তাহাদের চক্ষে পড়ে না। আবার কোন কোন প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি আলো বা অন্ধকারের কোন অপেক্ষাই রাখে না, দিনে রাত্রে একই প্রকার দেখে। আলো বা অন্ধকারের রূপ আমাদের মত তাহাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না। এই সকল দৃষ্টান্ত যখন রহিয়াছে তখন বস্তু বিশেষের প্রতিবিম্ব আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এই প্রকার যুক্তিতে মনটিকে প্রবোধ দিয়া ঠাকুরের কথায় দ্বিধাশূন্য হইলাম।

ঠাকুরকে বলিলাম—কাঠের এমন গুণ যে তার ভস্ম ক'রে গায়ে মাখ্‌লে দেখা যাবে না, এ কখনও শুনি নাই।

ঠাকুর—**শুন্‌বে কি? দর্শন-বিজ্ঞানে কতটুকু পেয়েছে—কতটুকু জানে? এই দেখ, এই কাঠ বহু পুরানো হ'য়ে যখন ঘুন্‌ঘুনে হয়, এর মধ্যে এক প্রকার কীট জন্মে। কাঠ খানা ফুট ফুট বিন্দু বিন্দু ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝরির মত হ'য়ে যায়। ঐ কাঠ আগুনে দিলে যেমন দপ্ দপ্ জ্বল্‌তে থাকে, কাঠের ভিতর থেকে ঐ কীটগুলি বে'র হ'য়ে অগ্নি খেতে আরম্ভ করে। সে রকম কাঠ পেলে দেখাবো। নিজেও পেলে, পরখ্ ক'রে দেখো। অগ্নিভুক্ জীবও আছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে কি তা স্বীকার করে?**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে করিলাম—এ কাঠও তেমন দুর্ল্লভ নয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ

যীশু খৃষ্ট

বুদ্ধদেব

গুরু নানক

গুরুসেবার অন্তরায়। গুরুভ্রাতাদের সহিত ঝগড়া।

১১ই পৌষ,
২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২।

দেখিতেছি, গুরুর সেবায় যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের দুর্ভোগের সীমা নাই। গুরু শিষ্যদের সাধারণ সম্পত্তি, গুরুর নিকটে শিষ্যেরা সকলেই সমান এই ভাব সকলেরই অন্তরে বদ্ধমূল। কিন্তু কেহ গুরুর সেবায় থাকিলে, গুরুর একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হইলে, অবশিষ্ট গুরুভ্রাতারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ঈর্ষাযুক্ত হন। তাঁহারা ঐ সেবক গুরুভ্রাতার সামান্য একটু ত্রুটি পাইলেই, তাহাতে নানারূপ রং চং দিয়া গুরুর নিকটে লাগান। গুরু উহার উপরে একটু বিরক্তিভাব দেখাইলেই যেন তাঁহারা কৃতার্থ হন। রাত্রি জাগরণ ও অপরিমিত পরিশ্রমাদিতে আমার শরীর দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতেছে। গতকল্য বেদনার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুইয়া পড়িয়াছিলাম, ঠাকুরমার সেবা ঠিকমত করিতে পারি নাই। ঠাকুর আমাকে কয়েকদিন বাড়ীতে গিয়া মা'র নিকটে থাকিতে বলিয়াছেন। শীঘ্রই আমি বাড়ী যাইব স্থির করিয়াছি। আমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, বাড়ী যাইব, শুনিয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরের কাছেই আমাকে বলিলেন—"মশাই! ব্রহ্মচর্য্য করেন, আপনার আবার অসুখ হয় কেন? ব্রহ্মচর্য্যব্রতের নিয়ম রক্ষা ক'রে চল্‌লে কখনও কি অসুখ হতে পারে? ঠিকভাবে চল্‌তে না পারেন, ব্রহ্মচর্য্য ছেড়ে দিন্ না? আমাদেরই মত থাকুন। এতে যে ঠাকুরের কলঙ্ক হয়!" গুরুভ্রাতাদের অনর্থক গায়ে পড়িয়া এরূপ আক্রমণে বড়ই কষ্ট হইল। ভাবিলাম, একবারে আসল সারকথা খোলাখুলি শুনিয়ে দিয়ে, আজ এমনভাবে উহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেই, যেন আমার বিরুদ্ধে ঠাকুরের নিকটে আর কখনও কেহ এভাবের কিছু না বলেন। এইরূপ ভাবিয়া আমি কহিলাম—'ঠাকুর যদি আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়ে তাহাতে অটল রাখিতে পারেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য দিন, ঠাকুরের সঙ্গে স্পষ্টতঃ এই সর্ত্তেই আমি এ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়াছি। ব্রতভঙ্গ যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ত্রটি স্বয়ং ঠাকুরেরই হইয়াছে, অতএব এজন্য তাঁকেই শাসন করুন।' আমার কথা শুনিয়া, এই সময়ে ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া, আমার কথায় সায় দিয়া, মাথা নাড়িতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা আমাকে আবার বলিলেন—সকালবেলা আপনি এমন সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি তুলে গাছের শোভা নষ্ট করেন কেন? ওতে কি গাছের কষ্ট হয় না?

আমি বলিলাম—আমাদের জন্য তুল্‌লে গাছের যথার্থই কষ্ট হতো। কিন্তু ঠাকুরের চরণে দিবার জন্য তুলি—এতে গাছের আনন্দই হয়। ফুল তুল্‌তে গাছের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেই মনে হয়, তাদের তুলে নিয়া ঠাকুরের চরণে দেই এই আকাঙ্ক্ষায় আমার পানে তারা যেন আগ্রহের সহিত চেয়ে আছে! যে সব ফুল তুলি না, মনে হয়, সেগুলি নিরাশ হ'য়ে দুঃখ করে। একটি গুরুভ্রাতা বলিলেন—"মশায়! ও সব ভাবের কথা ছেড়ে দিন। হিংসাদ্বারা কি পূজা হয়?"

আমি—হিংসা কার্য্যে নয়, হিংসা ভাবে। ফুল তোলার কথা কি বলছেন? হিংসাশূন্য হয়ে, অনায়াসে আনন্দের সহিত কাঁচা মাথা কেটে, ঠাকুরের চরণে দিতে পারি, যদি জানি তিনি ওতে আনন্দ পাবেন। ঠাকুর ফুল পেয়ে আনন্দলাভ কর্‌বেন, বৃক্ষও কৃতার্থ হবে, ফুল তুল্‌বার সময়ে আমার মনে এই ভাবই থাকে। ফুল, দূর্ব্বা, তুলসীদ্বারা পূজা করা, এ ঋষিদেরই ব্যবস্থা, আমাদের সৃষ্ট নয়। গুরুভ্রাতাদের সহিত এই সব আলোচনার সময়ে ঠাকুর ধ্যানস্থ রহিলেন।

শালগ্রামের জন্য আক্ষেপ।

ঠাকুর আমাকে 'লক্ষণযুক্ত শালগ্রাম' পূজা করিতে বলিয়াছেন, এই শালগ্রাম কোথা হইতে কি প্রকারে সংগ্রহ করিব, বুঝিতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছেন, অযোধ্যাতে এক একটি মন্দিরে সহস্র সহস্র শালগ্রাম আছেন। চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে। দাদাকে আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র এ পর্য্যন্ত পান নাই। ঠাকুরের আদেশের পর হইতে, দিন দিন আমার শালগ্রাম পূজার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফুল চন্দননাদি দ্বারা অগ্নিতে পূজা করিয়া এখন আর তৃপ্তি হয় না। ফুল, চন্দন, তুলসী-বিল্বপত্র দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে যে ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করিব—সে সৌভাগ্য বোধ হয় কখনও আমার হইবে না। ঠাকুর স্বয়ংই তাহাতে বাধা দিবেন। অথচ তাঁহার আদেশমত তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপ সুলক্ষণযুক্ত সুশ্রী শালগ্রামশিলা, নিজ মনে স্বাধীনভাবে পূজা করিয়া কবে কৃতার্থ হইতে পারিব, জানি না। কবে ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে সুন্দর শিলা জুটাইয়া দিবেন!

ঠাকুরের পূজা। পাইতে চাও—না দিতে চাও?

আজ বেলা প্রায় দশটার সময়ে একটি শ্রদ্ধাবান্ গুরুভ্রাতা পূবের ঘরে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া পূজা করিতে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন; হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া তাঁহার পানে চাহিলেন। ভাগ্যবান্ গুরুভ্রাতাটি তখন পুষ্প, চন্দন, তুলসী লইয়া সাগ্রহে ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। আমি ভাবিলাম—এ সুযোগ আর ছাড়ি কেন? আমি অবিলম্বে তুলসী, দূর্ব্বা, পুষ্পাদি লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং ঠাকুরের বামপার্শ্বে কাতরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল; ভাবিলাম, এমন কি পূণ্য করিয়াছি যে, আজ ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করিব! ঠাকুর এই সময়ে সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—**কি? পূজা করবে? বেশ, কর। যদি কিছু পেতে চাও, চরণে দেও; আর, আমাকে যদি কিছু দিতে চাও, আমার মাথায় দেও।** এই বলিয়া মাথাটি একটু বাড়াইয়া দিলেন। মনে হইল—ঠাকুরের নিকটে আর কি চাহিব? যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ভগবানের ভাণ্ডারে আর নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও

মনোরম, দয়াময় ঠাকুর তাহা তো নিজেই আমাকে দিয়াছেন। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি প্রভু আমার, আজ আমা হইতে কিছু পাইতে মাথা বাড়াইয়াছেন, হায়! হায়! দীনহীন অধম আমি, আমার এমন কি আছে, যে তাঁহাকে দিব? মনে মনে প্রার্থনা আসিল—"ঠাকুর! জন্মজন্মান্তরে যদি আমার কখন কিছু সুকৃতি থাকে, তাহা এবং তোমার সঙ্গলাভে ও সাধন ভজন বা সেবা পূজায় যা কিছু ফল দিয়াছ ও দিবে, তাহা সমস্তই আমি তোমাকে এই প্রদান করিলাম; দয়া করিয়া গ্রহণ কর।" এই বলিয়া হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলি বক্ষে ধরিয়া ঠাকুরের মস্তকে অর্পণ করিলাম। পরে ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর স্নেহ-স্নিগ্ধ সুমধুর স্নেহদৃষ্টিতে দু'একবার আমার দিকে চাহিয়া চোখ বুজিলেন। জয় গুরুদেব!

ভোগের পূর্ব্বে প্রসাদ। মেজদাদার সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

১৪ই পৌষ হইতে
১৭ই পৌষ।

মেজদাদা ঢাকা আসিয়াছেন, অদ্য বাড়ী যাইবেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন। আমি ভোরবেলা ঠাকুরমার জন্য রান্না করিয়া প্রস্তুত রহিলাম। মেজদাদা ঠাকুরকে দর্শন করিতে আশ্রমে আসিলেন। ঠাকুরকে পূবের ঘরে প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া রহিলেন। এই সময়ে ঠাকুরের চা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মেজদাদাকেও চা দিতে বলিলেন। মেজদাদা ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া চা পান করিবেন প্রত্যাশায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর নিজের চা নিবেদন করিয়া পান করিতে ছোট বাটিতে লইয়া যেমন উহা মুখের সাম্‌নে তুলিলেন, মেজদাদা অমনি প্রসাদের জন্য বাটিটি ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন, ঠাকুর তর্ন্মুহূর্ত্তেই উহা মুখে না দিয়া মেজদাদাকে ঢালিয়া দিলেন। মেজদাদা একটু অপ্রস্তুত হইয়া সলজ্জভাবে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর মেজদাদাকে চা পান করিতে বলিলেন, এবং কথায় কথায় বলিলেন—**বোম্বাই ছাপা একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ আনিয়া পড়িবেন।** মেজদাদা চলিয়া গেলেন, পরে ঠাকুর কহিলেন—**তোমার মেজদাদা বেশ চাপা, বুদ্ধিমান লোক। বৈরাগ্যপ্রধান প্রকৃতি, শুধু বিশ্বাসের অভাবে বাঁধা রয়েছেন। বিশ্বাসের ছিটা ফোঁটা পেলে কোথায় গিয়ে ছুটে পড়বেন, খোঁজ খবর পাবে না। এখন বিশ্বাস জন্মালে কি চলে? কর্ম্ম যে কাটা চাই। তোমারা চারিটি ভাই পরস্পর পরামর্শ করে এবার এসেছ। প্রকৃতি এক এক জনার এক এক প্রকার; কিন্তু গড়ে সকলেই এক রকম।**

অযাচিত দান—কচুরি, আদা, ছোলা।

ঠাকুরের অনুমতি লইয়া মেজদাদার সঙ্গে বাড়ী যাত্রা করিলাম। নদীর পাড়ে পঁহুছিয়া মেজদাদা নৌকা ভাড়া করিলেন এবং আমাকে তথায় রাখিয়া কোন প্রয়োজনে সহরে গেলেন।

আমার ভগ্নীর কথা মনে হইল। তিনি আমার নিকটে খাস্তা কচুরি খাইতে চাহিয়াছিলেন। হাতে মাত্র দুইটি পয়সা আছে, তাহাই লইয়া বাঙ্গালা বাজারে খাবারের দোকানে উপস্থিত হইলাম। ময়রাকে দু'টি পয়সা দিয়া বলিলাম—এতে যত খানা হয়, খাস্তা কচুরি আমাকে দেও। ময়রা কিছুক্ষণ আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"মিষ্টি কিছু নিবেন না?" আমি বলিলাম—না; পয়সা নাই। ময়রা আর কিছু না বলিয়া একটি চুবড়িতে অমৃতি, রসগোল্লা প্রভৃতি উপাদেয় কতকগুলি মিষ্টি তুলিয়া এবং তাহার উপরে দশখানা খাস্তা কচুরি দিয়া বলিল—"এই দয়া করিয়া নিয়া যান, আমি আপনার কাছে পয়সা নিব না।" অযাচিত রূপে যাহা পাইলাম, তাহা ঠাকুরেরই ইচ্ছায়, তাঁর প্রসাদ মনে করিয়া গ্রহণ করিলাম। নৌকায় আসিয়া স্নান-তর্পণ করিয়া বসিয়া আছি, বড়ই পিপাসা পাইল। আশ্রম হইতে কিছু আদা ছোলা খাইয়া আসিলে সুবিধা হইত, পুনঃপুনঃ এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা আমার এক বাল্যবন্ধু ললিতমোহন গাঙ্গুলী স্নান করিতে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সে আমার নিকটে আসিয়া বলিল—"ভাই, বাড়ী যাচ্ছ? বেশ, আমার ভজন-কুটীরটি তোমাকে একবার দেখে যেতে হবে।" এই বলিয়া নদীর পাড়ে তার বাসায় আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। আমি তার বাসায় গেলাম। তখন সে কতকগুলি আদা, ভিজা ছোলা ও গুড় আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"ভাই, শেষ বেলা বাড়ী গিয়া পঁহুছিবে। দয়া করিয়া সামান্য এই একটু জলযোগ করিয়া যাও।" খুব তৃপ্তির সহিত তার শ্রদ্ধার দান ভোজন করিয়া নৌকায় আসিলাম। বারংবার মনে হইতে লাগিল—ভবিষ্যতে আমার যাহা প্রয়োজন আমি তাহা বুঝি না, ভবিষ্যতে আমার কখন কি আকাঙ্ক্ষা হইবে কিছুই জানি না; অথচ ঠাকুর তাহা বুঝিয়া আমার সমস্ত অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, একি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী পঁহুছিলাম। মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছায় তাঁহারই নির্দ্দেশমত রান্না করিয়া প্রসাদ পাইলাম। বহুদিন পরে আজ পাড়ার বৃদ্ধদের পদধূলি মস্তকে লইয়া বড়ই আনন্দ হইল। সকলেই আমাকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শুনিয়াছিলাম, চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে হইলে বৃদ্ধদের হইলে পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতে হয়। একথা যে যথার্থ, পরিষ্কার তাহা অনুভব করিলাম।

স্বপ্নে শালগ্রাম ও গোপালপূজা।

বাড়ীতে আসিয়া দুইটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। ১৫ই পৌষ রাত্রি আড়াইটার সময়ে দেখিলাম, একটি সুগোল, সুশ্রী শালগ্রাম ঠাকুরকে ধ্যান পূর্ব্বক পরমানন্দে ফুল, তুলসী, দূর্ব্বা, চন্দনাদি দ্বারা

উহা পরিপাটীরূপে সাজাইতেছি। পূজা সমাপন হইতেই জাগিয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গের পরও কিছুক্ষণ ঐভাবে অভিভূত রহিলাম। তৎপরদিন আবার দেখিলাম—বাড়ীর গোপাল ঠাকুরকে খুব ভক্তির সহিত পূজা করিতেছি, এমন সময় ঠাকুরের সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সিংহাসনের একটি পায়া, দুইটি পায়া, ক্রমে তিনটি পায়া শূন্যে উঠিয়া পড়িল; কেবল একটি পায়া মাত্র ভূমি সংলগ্ন রহিল। ভাবিলাম—ঠাকুর বুঝি এইবার গোলোকে চলিলেন। ঐ সময়ে চাহিয়া দেখি—২/৩ মাসের শিশুর মত ঠাকুর আমার সিংহাসনে চিৎ হইয়া হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছেন। আমি একটু দৃষ্টি করিতেই হঠাৎ গোপাল মাটিতে নামিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। আমিও তখন ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে জাগিয়া পড়িলাম। এই গোপালের আকৃতিটি অনেকটা যেন দাউজীর মত।

মনোমুখী হইয়া চলার ফল। গুরুসঙ্গের প্রভাব।

ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া বাড়ী আসিলে প্রতিবারেই দেখি সাধন ভজনের উৎসাহ আনন্দ ধীরে ধীরে নিবিয়া যায়, নিত্যকর্ম্মের নিয়ম-বন্ধনে আবদ্ধ থাকি বলিয়া বাহিরে রক্ষা পাই বটে, কিন্তু ভিতরে অন্যপ্রকার হইয়া পড়ি। বাড়ীতে সৎসঙ্গের বড়ই অভাব। বিষয়ীলোক ও স্ত্রীলোকদের সঙ্গ ছাড়িবার উপায় নাই। নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা ও সম্ভোগ বাসনায় চিত্ত কলুষিত না করে, এজন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। যদিও নিজের ভাবেই নিজেকে রক্ষা করে, এবং নিজের ভাবেই নিজেকে বিনাশ করে সত্য, তথাপি দেখিতেছি, অনেক সময়ে অন্যের ভাবেও চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলে। নিয়ত সকল দিকে নজর রাখিয়া সতর্ক থাকাও সহজসাধ্য নয়। এতকাল সদ্‌গুরুর সঙ্গ এবং সাধন ভজন করিয়াও যদি এত ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়, তাহা হইলে আমার আর কি হইল? ছাগল ভেড়ার ভয়ে সর্ব্বদাই যদি হাতে লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তবে আর ঠাকুর কি করিলেন? ঠাকুরের আদেশ পালনে লক্ষ্য না রাখিয়া, শুধু নিজ প্রকৃতি বশে চলিলে কতদূর কি হয়, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। আহারের নিয়ম তুলিয়া দিলাম; যে যাহা দিতে লাগিল, তাহাই খাইতে লাগিলাম। অতিরিক্ত লঙ্কা, মিষ্টি ও গব্যবস্তু কিছুই বাদ দিলাম না। স্ত্রীলোকের সঙ্গেও মিলিয়া মিশিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। এইভাবে চলার ফলে এই কয়দিনেই যে নিজের অধঃপতন কতদূর হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। সাধনের প্রথমাবস্থায় সদ্‌গুরু বা সাধুসজ্জনের সঙ্গ ব্যতীত, চিত্ত কিছুতেই সুস্থির ও নির্ম্মল থাকে না, ইহা এক্ষণে অতি পরিষ্কাররূপেই বুঝিলাম। বাড়ীতে আর ৪/৫ দিন কোনও প্রকারে কাটাইয়া, অচিরে ঢাকা রওয়ানা হইলাম। উত্তপ্ত, রুক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রজড়িত অপবিত্র দেহ যেরূপ গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ, সুশীতল ও নির্ম্মল হয়, ঠাকুরের দর্শনমাত্র আমার তেমনই বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুর! দয়া করিয়া এইভাবে ফেলিয়া-তুলিয়া তোমার অসীম মাহাত্ম্য তুমি না বুঝাইলে, কে

তোমাকে বুঝিবে?

আশ্রমে আসিয়াই পুনরায় ঠাকুরমার সেবায় লাগিয়া গেলাম। বাড়ীতে ৪/৫ দিন থাকিয়া কতপ্রকার দুর্ভোগ ভুগিয়াছি, অবসর মত ঠাকুরকে জানাইতে ব্যস্ত হইলাম। বড়দিনের ছুটিতে এখন বহু গুরুভ্রাতারা নানা দিক হইতে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ভক্ত গুরুভ্রাতাদের শুভ-সম্মিলনে আশ্রমে যেন নিয়ত উৎসব চলিয়াছে। সহর হইতেও শত শত ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। আশ্রমটি যেন সর্ব্বদাই গম্ গম্ করিতেছে।

বীর্য্যধারণের উপায় ও উপকাররিতা। উর্দ্ধরেতা হওয়ার উপায় ও ফলাফল। নাস্তি প্রাণায়ামাৎবলম্।

১৮ই পৌষ।
১লা জানুয়ারী ১৮৯৩।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের নিকটে আমতলায় আসিয়া বসিলেন। বীর্য্যধারণ না করিলে এই সাধনের উপকাররিতা সহজে উপলব্ধি হয় না, এই কথা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা এই সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহীর পক্ষে বীর্য্যরক্ষার সহজ উপায় কি? এবং তাহার উপকারিতাই বা কি? আর উর্দ্ধরেতা না হইলে কি জীবের উদ্ধার হয় না? ঠাকুর লিখিয়া ও সময় সময় অস্ফুটস্বরে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন—**বীর্য্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে চল্‌তে হবে। এখন একেবারে বন্ধ রাখা উচিত হবে না। কারণ গৃহীর ব্যবস্থা ভিন্ন। যাঁরা বিবাহিত, তাঁদের ২/৩টি সন্তান হলেই বীর্য্যরক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল পুরুষের ইচ্ছা হ'লে হবে না। এ কার্য্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সাহায্য চাই। স্ত্রীর ইচ্ছা না হ'লে পুরুষ সক্ষম হবে না। বীর্য্যরক্ষা দ্বারা শরীর নীরোগ হয় এবং মন সুস্থ হয়। যদি কোন কারণে বীর্য্যরক্ষা না হয়, তাতে মুক্তির ব্যাঘাত হয় না; তবে সাধন পথের বিঘ্ন হয়। এই জন্য বীর্য্যরক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাণায়ামে ও বীর্য্যরক্ষায় শরীর মন সবল ও সুস্থির হয়। বীর্য্যরক্ষার চেষ্টা কর্‌তে হবে। নিজের শক্তিতে না কুলালে কখনও কিন্তু কোনরূপ বাহিরের ঔষধাদি উপায়ের দ্বারা নিবারণ করা উচিত নয়। পৃথক শয়নের ব্যবস্থা আছে। বীর্য্যের গতি উর্দ্ধদিকে কর্‌বার জন্য এক প্রকার সাধন আছে। তাতে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে করাতের মত কেটে কেটে পথ করে। তাহা অতিশয় কষ্টকর। এজন্য সে প্রণালী ভাল নয়। অসহ্য বেদনা হয়—সহ্য করা যায় না। কিন্তু একবার সেই প্রণালী ধর্‌লে ছাড়া যায় না। এজন্য অধিকাংশ সাধক ঐ 'বজ্রলি' প্রণালীর পক্ষপাতী নয়। সহজ উপায়—প্রস্রাব একবারে কর্‌বে না। ধীরে ধীরে, রেখে রেখে কর্‌বে। একটু প্রস্রাব হ'লেই টেনে নিয়ে আবার প্রস্রাব কর্‌বে—আবার টেনে নেবে। স্ত্রী সহবাসের সময়েও বীর্য্যত্যাগ**

না করে টেনে নিতে চেষ্টা কর্‌বে। গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রীসহবাসের যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে চলা উচিত। ঋতুস্নানের পর ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়। তাতেও অষ্টমী, নবমী, একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী ও পক্ষান্ত বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অবশিষ্ট যে কয়েক দিন থাক্‌বে, তা'তে কোন কারণে অপরাগ হ'লে অন্য সময়েও তিন চারি দিন স্ত্রীসঙ্গ করা যায়। সঙ্গমের সময়ে ধৈর্য্যের সহিত বীর্য্যের গতিরোধ কর্‌তে হয়। উভয়ের সম্মতিতে উভয়েরই একসময়ে রোধের চেষ্টায় কুম্ভক কর্‌তে হয়। তা হ'লে, একটি নাড়ী আছে—তার ভিতর দিয়া উভয়ের রেতঃ উৰ্দ্ধদিকে গমন করে। এটি বিশেষ সাবধানতার সহিত কর্‌তে হয়। এই 'সহজলি' মতে সাধন কর্‌লে, সহজেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। গুরুর উপদেশ মত এই সব কর্‌তে হয়, নইলে বিপদ। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা সম্যক্ প্রকারে ছ'টি মাস কেহ কর্‌লে সে নিশ্চয় বাক্‌সিদ্ধ হ'তে পার্‌বে। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তা বলপূর্ব্বক কেহই নিবারণ কর্‌তে পারে না। কত ইন্দ্র, চন্দ্র এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পরাস্ত হয়েছেন। কেবল ভগবানের শরণাপন্ন হ'য়ে নাম কর্‌লেই সহজে প্রবৃত্তি দমন হয়। বাহ্যিক উপায় কিছু নয়, নাম কর্‌তে কর্‌তে আপনিই সমস্ত চ'লে যাবে। প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। তা অভ্যাস হ'লে; প্রাণায়ামও স্বাভাবিক হ'য়ে যায়, বীর্য্যও স্থির হয়। প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। কুম্ভক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কুম্ভক কর্‌লে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ব্যাধি নষ্ট হয়। প্রতিদিন কুম্ভক ও তার সঙ্গে যদি বীর্য্যধারণ হয়, তবে শরীরটি যথার্থ দেবমন্দির হয়, রোগ-শোক দূর হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সঙ্গে প্রাণায়ামাদিও সাধন কর্‌তে হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম সাধন কর্‌তে প্রথম প্রথম শ্বাসে শ্বাসে লক্ষ্য রেখেই নাম করতে হয়। ক্রমে মেরুদণ্ড দিয়ে যে শ্বাস বয়, তাহার সঙ্গেপরিচয় হয়। তখন তার সঙ্গে নাম জপ কর্‌লে সহজেই সব আশা পূর্ণ হয়। প্রাণায়াম। অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল কর্‌তে হয়। শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে প্রাণায়াম কর্‌তে নেই। আসন ক'রে ব'সে ব'সে প্রাণায়াম কর্‌তে হয়। প্রাণায়ামের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা ভাল। শেষরাত্রি প্রাণায়ামের প্রশস্ত সময়। প্রথম প্রথম আধ ঘণ্টার অধিক সময় করার প্রয়োজন নাই। ক্রমে সময় বৃদ্ধি করতে হয়। একবারে অর্দ্ধঘণ্টা অবিচ্ছেদে করতে না পারলে থেমে থেমে কর্‌বে। কর্‌তে কর্‌তে বাধা পড়্‌লে অবসর মত আবার ক'রে, ঐ সময়টি পূরণ ক'রে নিতে হয়। মুখ খুলে বা বুজে প্রাণায়াম করা যায়। প্রাণায়ামের সময়, খুব নাম করবে, নাম কখনই বন্ধ রাখ্‌বে না, প্রাণায়ামের শব্দ অল্প অল্প অন্যে শুন্‌লে ক্ষতি নাই। তবে না শুন্‌লেই ভাল। উচ্চ শব্দ, অন্যে শুন্‌লে তার ক্ষতি হ'তে পারে। শিশুর নিকটে, বালকের নিকটে করতে নাই। গুরুর উপদেশ ছাড়া, কেহ দেখে বা শুনে ওরূপ কর্‌তে গেলেই বিপদ। জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচে প্রাণায়াম কর্‌তে বাধা নাই। খালি পেটে, ক্ষুধা বোধ হলে, প্রাণায়াম

করায় ক্ষতি হয়। পেট ফাঁপ্‌লে, মাথা ধর্‌লে বা কোন রোগের দরুণ প্রাণায়াম কর্‌তে ক্লেশ হলে প্রাণায়াম কর্‌তে নাই। কুম্ভক না হওয়া পর্য্যন্ত, যোনীমুদ্রা কর্‌লে ক্ষতি হয়। প্রাণায়ামে দেহ নীরোগ হয়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য নিবারিত হয়, মন সুস্থির হয়—অন্তরীক্ষে বিচরণের ক্ষমতা জন্মে, দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, পরমার্থ-শক্তি প্রবুদ্ধ হয়। ঋষিরা বলিয়াছেন—"নাস্তি প্রাণায়ামাৎ বলম্‌।" পাতঞ্জল দর্শনে ব্যাসভাষ্যেও লিখিত আছে—"তথাচোক্তং, তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।" তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্টতর তপস্যা আর নাই; তদ্দ্বারা চিত্তের ময়লাসকল বিধৌত হয়, এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

যাহাদের স্বপ্নদোষ হয়, শয়ন সময়ে ভগবানের মাতৃবাচক নাম বেলপাতায় বা তুলসীপাতায় লিখে বালিশের নীচে রেখে নিদ্রা যাবে। যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, নাম কর্‌বে। নিজের ইচ্ছায় কিছু না ক'রে, গুরু যাহা বলে দেন, তাহা যতটুকু পারা যায়, করা কর্ত্তব্য।

যোগের একটি অঙ্গ প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের অর্থ এই যে অন্য দিকে মন গেলে তাহাকে ফিরায়ে আনা। নাম কর্‌তে কর্‌তে যে অবস্থা হয়, বা যাহা দর্শন হয়, তাহা ধ'রে রাখার নাম ধারণা। হঠাৎ অবস্থা খুলে যায় না। ক্রমে ক্রমে সব লাভ হয়। দৃষ্টি সাধন কর্‌লে মন স্থির হয়। বৃক্ষ, আকাশ, জল, অগ্নি যথাপ্রণালী এ সকলের দিকে চেয়ে দৃষ্টি-সাধন কর্‌তে হয়। আত্মা প্রস্তুত হ'লে পর, ভগবৎ দর্শন আরম্ভ হয়। তখন আর সংশয় থাকে না। কাম, ক্রোধ, বাসনা-কামনা, এ সকল কিছুই থাকে না। ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবদেবী দর্শন হয়; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কুলদেবতা অথবা যিনি যে দেবতাকে ভালবাসেন, তাহাই তাঁহার নিকটে প্রথম প্রথম প্রকাশ হয়। বেদ, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র কিভাবে হ'য়েছে, সৃষ্টি কিরূপে হ'য়েছে এই সকল প্রকাশিত হ'তে হ'তে মায়া চ'লে যায়। তখন সমস্ত ব্রহ্মময় হয়। ক্রমে ভগবল্লীলা দেখা যায়। ভগবান্‌ই চরম লক্ষ্য।

উর্দ্ধরেতা হ'লে লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী। উর্দ্ধরেতা হ'লে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ বড় সাধারণ নয়। স্ত্রীসঙ্গতে যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাও ঐ আনন্দ সহস্রগুণে অধিক। কিন্তু উহা শারীরিক, উহা লাভ ক'রে লোকে লক্ষ্য ভুলে যায়। মনে করে, ইহাই ব্রহ্মানন্দ। এখানেই অনেকে বদ্ধ হয়। দুর্ব্বাসা উর্দ্ধরেতা ছিলেন। তাঁর অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করতেন না। অবশেষে এতই বেশী অপরাধী হ'লেন যে, তাতে তাঁর সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেল। উর্দ্ধরেতা বরং না হওয়া ভাল। উর্দ্ধরেতা হ'লেই যে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তা নয়, একটি লোক দিনে দশবার স্ত্রীসঙ্গ কর্‌লেও যদি তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, ভগবান্‌কে লাভ করতে পারে। উহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

কিন্তু একজন ঊর্দ্ধরেতা হ'য়েও যদি অহঙ্কারী হয়, তার কিছুই হবে না।

ধর্ম্মের আকারে মনোমুখী কুবুদ্ধি, তার পরিণাম।

২২শে পৌষ,
বৃহস্পতিবার।

কিছুকাল যাবৎ আমি যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছি। এখন ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া ভিতরে আগুন ধরিয়া গেল। আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! ভ্রান্ত বুদ্ধিতে ঠাকুরের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারিয়া বিপথগামী হইয়াছি। এখন এই অভ্যস্ত দোষগুলির সংশোধন করা অতিশয় দুষ্কর দেখিতেছি। বিচার বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম—বিধিমত চলার চেষ্টাই "সাধন"। এই সাধনে আমাদের লাভ কি? লাভালাভ সমস্তই তো আমাদের গুরুর হাতে। চেষ্টা যত্ন করিয়া কিছুই যখন হয় না, শুধু এক গুরুর কৃপাতেই যখন সব হয়, তখন বৃথা এত সাধন—ভজনের কঠোরতা করিয়া কষ্ট পাই কেন? পক্ষান্তরে দেখিতেছি—তীব্র সাধনে বরং অনিষ্টই হয়। ঠাকুরের কৃপায় যদি কোন ভাল অবস্থা লাভ হয়, নিষ্ঠাচারী কঠোর সাধক মনে করিবে, উহা তাহারই চেষ্টার ফলে হইয়াছে। ভগবানের কৃপার দান লাভ করিয়াও সে উহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে, তাহার গুরুস্থানে গুরুতর অপরাধীই হইতে হইবে। অতএব বিনা আয়াসে, বিনা সাধন ভজনে, যদি আমার কোন অবস্থা লাভ হয়, তাহাই ত আমি গুরুদেবের বলিয়া, সহজে গ্রহণ করিতে পারিব, এইভাবে ধর্ম্মের আকারে স্বেচ্ছাচারী ও মনোমুখী অসৎ বুদ্ধি উৎপত্তি হওয়াতে চিত্তকে আমার তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমি পুরুষকারমূলক ক্লেশ-স্যাধ্য সংযমাভ্যাস ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখন দেখিতেছি, হিতে বিপরীত করিয়া বসিয়াছি। আহারের নিয়ম তুলিয়া দিয়া বিষম লোভী ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির না রাখাতে স্ত্রী-মূর্ত্তি সময় সময় দেখিতেছি, তাহাতে আমার নিস্তেজ কাম রিপুর পুনরুত্থান হইয়াছে। বাক্যসংযমের অভ্যাস ত্যাগ করায় এখন অতিরিক্ত বাচালও অভিমানী হইয়া উঠিয়াছি। সাধন ভজনে আগ্রহ না থাকায়, দমে দমে কুম্ভক ও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম লইবার চেষ্টা আর নাই। ইহাতে মনের স্থিরতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা একেবারে হারাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, বাক্‌সংযম ও বীর্য্যরক্ষা দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা বা বাক্-সিদ্ধ হইলেই বা কি হইল? শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিয়াও যখন পূর্ণকাম হওয়া যায় না, উহা যখন শুধু গুরুরই কৃপাতে হয়, তখন অনর্থক উৎকট সাধনে, কেন আর বৃথা ক্লেশ ভোগ করিয়া মরি? ঠাকুরের প্রতি মমতা, তাঁহার উপরে একান্ত ভালবাসা, এবং অবিচ্ছেদে তাঁর সঙ্গলাভই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছি। কিন্তু, কুগ্রহের দুর্ব্বিপাকে আমার বুদ্ধির এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? যাঁহাকে ভালবাসিতে চাই, যাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে চাই, তাঁহার অবাধ্য হইলাম কেন? যাঁহাকে যথার্থ

ভালবাসি, তাঁহার তৃপ্তির জন্য কি না করিতে পারি? আনন্দের সহিত ঠাকুরের আদেশ রক্ষার আগ্রহই তো তাঁহার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। ঠাকুরের আদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে কোন প্রকার যত্ন না করিয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহা প্রতিপালনের আনন্দ অনুভব করাই আমার কর্ত্তব্য। কুবুদ্ধি বশতঃ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমি এ কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি! এখন কি উপায় করিব, ভাবিযা অস্থির হইয়াছি।

ধর্ম্মবুদ্ধিতে অধর্ম্মে পড়ি কেন? এখন উপায় কি?

আজ কোন কোন গুরুভ্রাতার সহিত আলাপে জানিলাম, তাহাদেরও আমারই মত অবস্থা। সকলে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভিতরের অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্ম ছাড়া তো কিছু চাহি না, তবে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে কেন? ধর্ম্মবুদ্ধিতে অধর্ম্ম করিয়া যে জ্বালা ভুগিতেছি, তাহা এখন কিসে যায়?

ঠাকুর উত্তরে জানাইলেন—**বাহিরে যেমন গ্রহাদির প্রভাব হয়, ভিতরেও সেইরূপ। যাঁহারা সাধন ভজন করেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে উহা অনুভব করেন। পূর্ব্বকালে সাধকগণ ইহাকে ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলেছেন। মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণও ইহাকে শয়তান ব'লে থাকেন। ইহার হাত হ'তে বড় কেহই নিস্তার পান নাই। কেবল মহাদেব, শুকদেব, বুদ্ধদেব ও হরিদাস ঠাকুরই রক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথমে কামক্রোধরূপে, পরে বাসনাকামনারূপে, তাতেও যদি না পারে, তা হ'লে ধর্ম্মরূপে এসে সাধকের সর্ব্বনাশ করে। ইহার একমাত্র ঔষধ, ধৈর্য্য ধ'রে পড়ে থাকা, আর শ্বাসে শ্বাসে নাম করা। রোগীর ঔষধ খেয়ে খেয়ে, ঔষধে আর রুচি থাকে না। যন্ত্রণায় অস্থির, তবু ঔষধ খেতে হয়। কারণ অন্য উপায় নাই। সাধনও সেই প্রকার কর্‌তে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হয়েছে, তাহার ফলভোগ ক'রে মুক্তি পেতে হ'লে, অনেক জন্ম ঘুরে ঘুরে তাহা শেষ কর্‌তে হয়। আর ভগবৎ নামের গুণে সহজে মুক্তি হয়। কিন্তু বিঘ্ন এই যে, নামে রুচি হয় না। দুঃখকষ্ট সমস্ত চারিদিকে। অগ্নিকুণ্ডে পড়ে নাম কর্‌তে হবে। প্রহ্লাদচরিত্র ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আহারের বস্তুতে বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস, হস্তীপদতলে, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ; চারদিকে বিপক্ষ, অস্ত্রাঘাত; সহায় কেবল হরিনাম। অবশেষে প্রহ্লাদেরই জয় হলো। ভগবান্ নরসিংহরূপে প্রকাশিত হ'য়ে তাঁহাকে রক্ষা কর্‌লেন। এই সাধনপথও সেইরূপ, জ্বালা-যন্ত্রণার ভিতর দিয়া যেতে হবে। এসব অগ্নি পরীক্ষা, ইহাতে যত পোড়া যাবে, ততই বিশুদ্ধ হবে। ইহা নানারূপে সাধকের**

প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুসারে তাহাকে অধিকার করে। এই যন্ত্রণায় আমি আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলাম। পরমহংসজী রক্ষা করেন। জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ দগ্ধ কর্‌তে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই যন্ত্রণাই মুক্তির হেতু। ইহা যাহার হয়, সে কৃত্রিম ধর্ম্মের ভাণ কর্‌তে পারে না। পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্ম্মের আনন্দ হয়, তাহা বিড়ম্বনা। যেমন রোগী কুপথ্য খেয়ে সুখী হয়। প্রথমে যন্ত্রণায় শুকায়ে শুকায়ে নীরস হবে। বিষয়রস এক বিন্দু থাক্‌তেও ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রণার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাবে। তখন বুঝ্‌বে। এখন শ্বাসে শ্বাসে নাম কর, সমস্ত যন্ত্রণার অবসান তাতেই হবে।

প্রশ্ন—কতকাল আমাদের এ যন্ত্রণা ভুগ্‌তে হবে?

ঠাকুর—তা বলা যায় না। এখনও আমাকে পরীক্ষা কর্‌তে আসেন। সে দিন হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের ভিতরে চারটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক। তাহারা নানাপ্রকারে আমাকে পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হ্‌লেন না, তখন দুই কলসী মোহর আমার সম্মুখে রেখে বল্‌লেন—'তুমি এসব গ্রহণ কর।' আমি বল্‌লাম—উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তখন উহারা বল্‌লেন—'আমাদিগকে শিষ্য কর।' আমি বল্‌লাম—তোমরা কে? উহারা কহিলেন—'আমরা পতিতা নারী—আমাদিগকে উদ্ধার কর।' আমি বল্‌লাম—মাথার চুল মুড়াও, অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র ত্যাগ ক'রে, ছিন্নবস্ত্র পরিধান ক'রে এসো। ইহা শুনে তাহারা হেসে বল্‌লেন—'আমাদের চিন না? আমরা যে মায়ার দাসী। কত কাল আমাদের চরণ সেবা করেছ। এখন দিন পেয়ে চিন্‌ছ না? ভাল, তোমার কল্যাণ হৌক্—আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।' ইহা ব'লে তাহারা চলে গেলেন।

নাবালক গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রের প্রশ্নে ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

বানরিপাড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত নারায়াণ ঘোষ মহাশয়ের নাবালক পুত্র অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের কতিপয় জটিল প্রশ্নে ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

প্রশ্ন — আমাদের কি ত্রাণ হইবে?

উঃ — হাঁ, হাঁ হবে।

প্রঃ — আপনাকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহা বুঝিতে পারেন?

উঃ — **হাঁ, হাঁ।**

প্রঃ —যতবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়াছিলাম শুনিয়াছিলেন?

উঃ — **হাঁ, হাঁ।**

প্রঃ — গুরু কি সর্ব্বত্র?

উঃ —**হাঁ।**

প্রঃ — তবে আপনি আমাদের নিকটে সর্ব্বদা থাকেন?

উঃ —হাঁ। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—**নাম করিতে থাক, চোখ খুলিয়া যাইবে—তখন সকল বুঝিবে।**

প্রঃ —আপনার নিকট সাধন লইলে না কি রিপুর উত্তেজনা বাড়ে?

উঃ — **হাঁ, সাধন লইলে রিপুর উত্তেজনা বাড়ে, যেমন নির্ব্বাণকালে আগুন বাড়ে বাড়িয়াই চিরকালের তরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়।**

প্রঃ — রিপু উত্তেজিত হইলে উপায়?

উঃ — **রিপুর উত্তেজনায় পড়িলে নামের উত্তেজনাও বাড়াইতে হয়।**

প্রঃ —ভগবদ্ভক্ত ও যাঁহারা তাঁহাদের শরীরে লীন হইয়া যান উভয়ের প্রভেদ কি?

উঃ —**ভক্ত লীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতুল আনন্দের অধিকারী।**

প্রঃ —মহাপ্রভুর ভক্তগণ কি সকলেই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন?

উঃ —**হাঁ।**

প্রঃ —তাঁহার কত সহস্র ভক্ত ছিলেন সকলেই সিদ্ধ ইহা কিরূপে?

উঃ — **হাঁ, তাঁহারা ভগবানের প্রতি অবতার কালে সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন। এইভাবে সমস্ত কাল চলিবে।**

প্রঃ —(অভয়বাবু) নরোত্তম ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়াছেন, তাহাই কি?

উঃ — **হাঁ, তাহা সুসত্য জানিবে।**

প্রঃ — মহাপ্রভু কি স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ?

উঃ — **হাঁ।**

প্রঃ — অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি একমাত্র ঈশ্বর তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে নবদ্বীপে মানুষরূপে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

উঃ — **হাঁ, যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হয় ত এক সময়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন, তাহা জীবে কি বুঝিবে?**

প্রঃ — নিত্যানন্দ কি?

উঃ — **অংশাবতার, বলরাম।**

প্রঃ — অদ্বৈত?

উঃ — **অংশাবতার—মহাবিষ্ণু।**

প্রঃ — বুদ্ধদেব কি স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ?

উঃ — **হাঁ।**

প্রঃ — যীশুখৃষ্ট মাছমাংস খাইতেন কেন?

উঃ — **তৎকালীন লোকের মাছমাংস খাওয়া প্রকৃতিগত ছিল বলিয়া, তিনিও সে সম্বন্ধে অজ্ঞবৎ হইয়া খাইতেন।**

প্রঃ — তিনি কি?

উঃ — **স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।**

প্রঃ — সকলে ত ইহা বিশ্বাস করে না?

উঃ — **বিশ্বাস করেনা বলিয়া কি যাহা প্রকৃত কথা তাহা বলিবে না।** (এই ভাব প্রকাশ করিলেন)

প্রঃ — আপনি সকলের নিকট বলিতে পারেন যে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

উঃ — **স্বচ্ছন্দে।**

প্রঃ — রাম কৃষ্ণ রূপাদি যেরূপ পুস্তকে ব্যক্ত আছে তাহা ঠিক, না রূপক?

উঃ — **না, না সব ঠিক্ ঠিক্।**

প্রঃ — ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে চৈতন্যলীলাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তখন দুই অংশ অবতার ও স্বয়ং অবতীর্ণ।

উঃ — **হাঁ, এমন লীলা আর হয় নাই।**

প্রঃ — বেশীই বা কি হইল, মাত্র এই ক্ষুদ্র ভারতের অল্পস্থানেই তাঁহার প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন?

উঃ — **না, সে লীলার তো শেষ হয় নাই। কেবল তাঁহারা কয়েকদিন থাকিয়া উঁকি মারিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। দেখনা এখন খৃষ্টানাদি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন দিন আসিবে, যখন সমস্তই মৃদঙ্গময় হইবে।**

প্রঃ — কলিযুগে ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইলেন অন্যান্য যুগে ত এত নহে?

উঃ — **কলিযুগে অনেক অবতার। আরও অবতীর্ণ হইবেন।**

প্রঃ — বর্ত্তমান সময় কি কলি যুগ?

উঃ — **হাঁ।**

প্রঃ —কলিযুগের অবতারের কি কোন বর্ণ নির্ণয় আছে?

উঃ —**না, তা কিছু নাই।**

প্রঃ — কলিযুগ তো ধন্য হইল?

উঃ —**হাঁ, হাঁ।**

প্রভু বলিলেন—**অবতার তিন প্রকার—পূর্ণাবতার (অবতীর্ণ) অংশাবতার ও শক্ত্যাবতার।**

প্রঃ — যাহাতে ঐশী শক্তির প্রকাশ হয়, তিনিই কি শক্ত্যাবতার?

উঃ —**হাঁ।**

প্রঃ —আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি অনুভূত হইলে আমরাও কি শক্ত্যাবতার হইলাম?

উঃ —**হাঁ,** (উপহাস করিয়া বলিলেন) **এই তো অবতার আছ।**

প্রঃ — সৌভাগ্যক্রমে কোন মহাজনের হৃদয়ে ভগবানের প্রকাশ হইল, তখন তাঁহাকে অংশাবতার বলা যায় কি?

উঃ -- **হাঁ, তাহা হইতে পারে।**

প্রঃ — তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কি নিতাই অদ্বৈত শ্রেষ্ঠ?

উঃ — **নিতাই অদ্বৈত ভগবানের অঙ্গ। ইঁহারা আদি হইতে তাঁহাতে আছেন।**

প্রভু বলিলেন—**নানক অংশ অবতার।**

প্রঃ —মহম্মদ কি?

উঃ —**তিনি একজন মহাপুরুষ।**

প্রঃ —তিনি কি খোদার দোস্ত ছিলেন?

উঃ— **হাঁ, ছিলেন, তাতে কি?**

প্রঃ — কালী দুর্গা কি রূপক, না ঐ প্রকার রূপাদি আছে?

উঃ— **না, না। উহা ঠিক্ ঠিক্।**

প্রঃ — উঁহারা কি?

উঃ— **উঁহারা তিনিই।**

প্রঃ — সে কি প্রকার?

উঃ— **ঈশ্বরের অনন্ত ভাব।**

প্রঃ — (অভয় বাবু) আপনি বলিয়াছিলেন যে সহস্র সহস্র কৃষ্ণ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি সত্য?

উঃ— **হাঁ, হাঁ তাহা সত্য জানিবে।**

প্রঃ — অনেকে বলেন যে, অন্য সাধু মহাত্মাদিগকে সেবা করিবার অথবা তাঁহাদের সঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? গুরুকে ভক্তি করিলেই সব হইল, ইহা কিরূপ?

উঃ—**যাহারা অন্য সাধুভক্তদিগকে ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা গুরুকেও ভক্তি করিতে জানে না।**

প্রঃ — আপনি নাকি যাহার যেমন বিশ্বাস তাহাকে তেমন বলিয়া থাকেন?

উঃ— **না তাহা নহে; কিন্তু জ্বররোগে কুইনাইন্ সেবনীয়, আমাশয়ে উহা বিষবৎ।**

প্রঃ —কথা যাহা প্রকৃত, তাহাই বলেন?

উঃ— **হাঁ।**

প্রঃ — গোঁসাই! প্রেমভক্তি লাভ হইবে কিসে?

উঃ— **প্রেমভক্তি সহজ নহে। উহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। কাহারও কাহারও সৌভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে। এখন পড়, বিবাহ কর, অর্থ কর, তারপর শুভাদৃষ্ট হইলে, তোমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।**

আমাকে আরও বলিলেন-—**তোমার পক্ষে পিতৃপূজা, পিতৃআজ্ঞা পালনেই সব হইবে।**

প্রঃ — প্রেমভক্তি কেহ কাহাকে দিতে পারে না?

উঃ— **না।**

প্রঃ — নিত্যানন্দ প্রভু নাকি প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন?

উঃ— **হাঁ, তিনি পারেন।**

প্রঃ — তিনি এখন কোথায়?

উঃ— **সর্ব্বত্র।**

প্রঃ — অদ্বৈত প্রভু?

উঃ— **সর্ব্বত্র।**

প্রঃ — মহাপ্রভু?

উঃ— **সর্ব্বময়।**

প্রঃ — শঙ্করাচার্য্য কি মুক্তপুরুষ ছিলেন?

উঃ— **হাঁ, অংশাবতার শিব।**

প্রঃ — তিনি ভগবানে লীন হইয়াছেন?

উঃ— **না।**

প্রঃ — ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন বোধহয় যেন কত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ও মানুষের মত ব্যবহার দেখা যায়, ইহা কিরূপ?

উঃ— **মনুষ্য প্রকৃতি অনুসারে না চলিলে মানুষ ধরা যাবে কেন?**

প্রঃ — নিতাই অদ্বৈত উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উঃ— **কেহ ছোট বড় নহে, উভয়ে সমান।**

প্রঃ — শঙ্করাচার্য্যকে তো আর জন্ম-গ্রহণ করিতে হইবে না?

উঃ— **তাহা কে জানে, ভগবানের আদেশ হইলে হইতে পারে।**

প্রঃ — গোঁসাই! আমি একটি বর চাই।

উঃ— **কি বর?**

প্রঃ — আপনাতে যেন কদাচ আমার ভক্তি বিশ্বাস টলে না ও আপনি প্রকৃত যে জিনিস, তাহা যেন বুঝিতে পারি।

উঃ— **হাঁ; তথাস্তু।**

প্রঃ — বিশ্বাসভক্তি তো টলিবে না?

উঃ— **না।**

প্রঃ — মাছ খাইব কি না?

উঃ— **অপরাধ মনে হইলে খাইবে না।**

প্রঃ — আমার পক্ষে মাছ খাওয়ার সম্বন্ধে কি করিব?

উঃ— **তোমার যাহা ইচ্ছা।**

প্রঃ — আমার তো না খাইতে ইচ্ছা, কিন্তু গুরুজন অসন্তুষ্ট হইবেন সেজন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

উঃ— **তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিবে, পা ধরিয়া বলিবে যেন তাঁহারা মাছ ত্যাগের অনুমতি দেন।**

প্রঃ — আপনি আমাদের দেশে যাইবেন না?

উঃ— **ভগবান্ নিলে যাইব।**

প্রভু বলিলেন—"**গান কর**"—গান হইতে লাগিল।

প্রভু বলিলেন— **হরি বোল! হরি বোল!** সবে হরি বলিতে লাগিল। প্রভু নাচিতে লাগিলেন। প্রভু! তোমাতে আমার ভক্তি বিশ্বাস হৌক্। প্রভু! অধমকে কি তোমার চরণে স্থান দিবে? এ জঘন্যকে তোমার ভক্তবৃন্দের দাস করিয়া দেও ও তাহাদের প্রেমের পাত্র কর। জয় প্রভু! পরম কারুণিক অবতার।

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু,
অদ্ভুত যাঁর প্রয়াস।
হিয়া আগুয়ান্ তিমির জ্ঞান-সমুদ্র
সুচন্দ্র কিরণে কুরু নাশ।

প্রভু বলিলেন—**নাম করিতে থাক, নাম করিতে করিতে কত কি দেখিবে, শুনিবে, তার প্রতি আর লক্ষ্য না করিয়া নাম করিতেই থাকিবে।**

প্রঃ— গোঁসাই, আমার অহঙ্কার বিনাশ করিবার জন্যই কি প্রথম সাধন পাইবে না বলিয়াছিলেন?

উঃ— **হাঁ।**

প্রভু বলিলেন—**"ওঁ হরি" ভাবাবেশ অচৈতন্য হইলে এই নাম শুনাইতে হয়।**

উলঙ্গ মায়ের নৃত্য—গোঁসাইয়ের আনন্দ।

শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বাবু ছুটীর সময়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিলেন। কলিকাতায় তিনি অনেকের নিকটে ঠাকুরের অসাধারণ গুণ ও অলৌলিক অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। তাহাতে ঠাকুরকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল। তিনি আশ্রমে পঁহুছিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলেন! ক্রমশঃ সহরের গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ বহুলোকের সমাগমে আমতলা পরিপূর্ণ হইল। ঠাকুর কখন অস্ফুট স্বরে কখন বা লিখিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। আমতলায় ঠাকুরের কাছে বহুলোকের সম্মিলন দেখিয়া, হঠাৎ আজ কি ভাবিয়া, পাগ্‌লী ঠাকুরমার বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি এক দৌড়ে ঠাকুরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং পরিহিত বস্ত্রখানা মস্তকে বাঁধিয়া, সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় গান করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর হর্ষোৎফুল্ল ছলছল চক্ষে ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া, পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে তাঁহার নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিয়া, **'আহা হা হা'** বলিতে লাগিলেন। ঠাকুবমা যতক্ষণ নৃত্য কবিলেন, ভক্তিগদগদ ভাবে ঠাকুর ততক্ষণই তাঁহার নৃত্যের তালে তালে তুড়ি দিয়া ঠাকুমার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। ঠাকুরমা এইভাবে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া, আশ্রমের দক্ষিণ দিকে —পুকুরের অপরপারে চলিয়া গেলেন। সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্। হরিনারায়ণ বাবু পরে বলিলেন—''এই একটি ঘটনা দেখিয়াই আমি গোঁসাইকে চিনিয়া লইলাম। আর কোন সংশয় বা পরীক্ষা করার প্রবৃত্তিই রহিল না। মানুষ কখনও কি এরূপ করিতে পারে!''

শ্রদ্ধা ও গুরুকরণ বিষয়ে প্রশ্ন। ধর্ম্মের অন্তরায়।

গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরকে শ্রদ্ধা, গুরুকরণ ও ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর কি—এই সব কথা জিজ্ঞাসা কবিলেন। ঠাকুর কখনও লিখিয়া কখনও বা অস্ফুটস্বরে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর—**মুক্তপুরুষকে সহজে চিন্‌তে পারা যায় না। মুক্তপুরুষের ভাব ও ভাষা অত্যন্ত গভীর। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেন। ব্যবহারও অনেক সময় এমন করেন যে, সাধারণে তাতে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাও হয় না। শাস্ত্রে আছে—যাদের শ্রদ্ধা বিকাশ পায় নাই, ধর্ম্মের জন্য তাহারা নানা গুরুর আশ্রয় লইতে পারে; যেমন, মধুকর এক পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে যায়। কিন্তু তাতে যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয় না। সময় হইলে শ্রদ্ধা আপনা আপনি বিকাশ পেতে থাকে, তখন একটা স্থানেই মন স্থির হয়। ইহা তন্ত্রের মত। উপনিষদের মত**

এই যে, যতদিন শ্রদ্ধা না জন্মিবে গুরুকরণ করবে না।

শ্রদ্ধা হ'লে পৈত্রিক গুরুর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। কিন্তু পৈত্রিক গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হবে শাস্ত্রে এরূপ কিছু নাই। কুলগুরুর নিকটে দীক্ষা লবে এরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু 'কুলগুরু' শব্দের অর্থ পৈত্রিক গুরু নয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যাঁর জাগ্রত হয়েছে তিনিই কুলগুরু। শাস্ত্রে আছে, শিষ্য গুরুকে এবং গুরু শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বেন। যদি উভয়ে শাস্ত্রমত লক্ষণযুক্ত হন তবে দীক্ষা হবে। অপাত্র হইতে দীক্ষা লইলে বা অপাত্রকে দীক্ষা দিলে কোন ফল লাভ হয় না। মনু মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয়ে কিছু বলেন নাই। যিনি বেদ পড়ান, সেই আচার্য্য গুরু সম্বন্ধেই বলেছেন। বেদ উপনিষদেও আচার্য্য গুরুর বিষয়ই আছে। বেদ উপনিষদে যাহা আছে তাহা শুধু ব্রাহ্মণের জন্য। মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয় তন্ত্রে, সনৎকুমার সংহিতায়, গৌতম সংহিতায় ও নারদ পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে আছে।

যদি স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয়, তবে সেই গুরুবংশের কাকেও উপগুরু ক'রে, তাঁর নিকট হ'তে সমস্ত পূজাপদ্ধতি শিক্ষা ক'রে পুরশ্চরণ কর্‌লে উপকার হয়। ইহা দেশাচার, শাস্ত্রশাসন নয়। আজকাল শাস্ত্রমত দীক্ষা হয় না। সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষা লইতে কোন বিচার নাই। দিন-ক্ষণ কিছুই দেখ্‌তে হয় না। কোন লক্ষণ দ্বারা সদ্‌গুরু চিন্‌তে পারা যায় না। অনেক জন্ম সাধন ভজন কর্‌লে, উপযুক্ত সময়ে ভগবৎকৃপায় সদ্‌গুরু চিন্‌তে পারা যায়। গুরুলাভ না হলেও ব্যবস্থা মত চল্‌তে হয়। শাস্ত্রমত চল্‌লে ঠক্‌তে হয় না।

গুরুতে বিশ্বাস হলেই ধর্ম্মলাভ হয়। কিন্তু তা তো আর সহজে হয় না। ধর্ম্ম সাধন কর্‌লে, অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন সেইরূপ কর্‌লে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে। যতদিন অন্তরে সংশয় আছে ততদিন তার কার্য্য হবেই। যেমন কাম, ক্রোধ, লোভাদি ভিতরে থাক্‌লে, কিছুতেই তা অতিক্রম করা যায় না, সংশয়ও সেইরূপ। ইহা আত্মার একটি অবস্থা। একমাত্র নাম জপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ সংশয় নষ্ট হবে। তখন বিশ্বাস আপনা হ'তেই আস্‌বে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই উপায়।

যিনি যেভাবে ধর্ম্মাচরণ কর্‌ছেন—করুন। আমি কাকেও নিন্দা কর্‌ব না, বরং যদি কিছু প্রশংসার থাকে তাই বল্‌ব। ভগবান্ কর্ত্তা, তিনি কাকে কি ভাবে উদ্ধার কর্‌বেন, আমি তার কি জানি? ইহা মনে করে চুপ করে থাকাই ভাল। ধর্ম্মার্থীদের কখনও কারোকে কোন বিষয় লইয়া পরিহাস করা ঠিক নয়। পরনিন্দা সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। প্রত্যেকেরই মধ্যে কিছু না কিছু গুণ আছে। দোষের অংশ ত্যাগ করে, গুণের অংশ গ্রহণ কর্‌বে। তাতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। দোষের আলোচনা কর্‌লে, আত্মা অত্যন্ত মলিন হয়। কারও দোষের আলোচনা কর্‌লে,

ক্রমে সেই দোষ নিজের মধ্যে এসে পড়ে। বিদ্বেষপূর্ব্বক একজনকে অপরের নিকট হেয় কর্‌বার জন্য, যে কোন কথা বা ভাব প্রকাশ করা হয়, তাহাই পরনিন্দা। বিদ্বেষপূর্ব্বক সত্যকথা বল্‌লেও পরনিন্দা হয়। যাহা কারও উপকারার্থে বলা যায়, তাহা পরনিন্দা নয়। যেমন, পিতা দোষের কথা বলেন। কারও দোষ বল্‌তে হলে, কেবল তার উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই বল্‌তে হবে; কারও প্রাণে আঘাত না লাগে, এমনভাবে বল্‌তে হবে। ধর্ম্ম জীবন লাভের পক্ষে পরনিন্দা যত অনিষ্ট করে, কাম ক্রোধাদি কিছুতেই তত করে না।

মাতালের আনন্দে ঠাকুরের আনন্দ।

ভাগবত পাঠের পর অপরাহ্ন প্রায় সাড়ে তিনটার সময়ে একটি মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোক মদ খাইয়া, নেশায় টলিতে টলিতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। জড়িতস্বরে—"সাধু দর্শন কর্‌তে এসেছি—সাধু কৈ?" পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। পাছে আমরা তাহাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেই, বোধ হয় এই জন্য, উহার কথা শুনিয়াই, ঠাকুর উহাকে ঘরে নিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা উহাকে পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুরকে দেখিয়া মাতালের মহাস্ফূর্ত্তি হইল। সে অনায়াসে ঠাকুরের সম্মুখে বসিযা, হাত মুখ নাড়িয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। ঠাকুরের সহানুভূতিসূচক মৃদু মৃদু হাসি এবং ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দেওয়া দেখিয়া, মাতালের উৎসাহ আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে ক্রমে ঠাকুরের কোলের উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। এক একবার হাসিতে হাসিতে ঠাকুরের আসন ঘেঁসিয়া বসিয়া কত কি বলিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার মাথায় গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। এসব কাণ্ড দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইলাম। আমাদের ভিতরে বিরক্তি ও ক্রোধের জ্বালা উপস্থিত হইল। কিন্তু কি করিব? ঠাকুর উহাকে লইয়া আনন্দ করিতেছেন, আমাদের কিছু বলিবার যো নাই। অবশেষে মাতাল হাসিতে হাসিতে ঠাকুরের ঊরু ও আসনের উপরে বমি করিয়া ফেলিল। তখন আর ঠাকুরের অনুমতির কোন অপেক্ষা না করিয়া, উহাকে টানিয়া বাহিরে নিলাম; এবং একেবারে রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম।

ঠাকুরকে বলিলাম—মদখোর মাতালকে ত শাসনই কর্‌তে হয়। ওকে লইয়া আপনি এত আনন্দ কর্‌লেন কেন?

ঠাকুর আমার দিকে কিছুক্ষণ ছল ছল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। পরে অস্ফুটস্বরে বলিলেন—**সংসার জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। সকলেরই মুখ বিমর্ষ। কারও মুখে একটু হাসি নেই, প্রাণে আনন্দ নেই। মদখোর মাতালকেও যদি প্রাণ খুলে হাস্‌তে দেখি, একটু আনন্দ কর্‌তে দেখি, বড় আরাম পাই—আনন্দ হয়।**

একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতালকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং কোন নেশাখোরকে দান করা কি উচিত?

ঠাকুর—**যারা নেশাখোর, না খেয়ে থাক্‌তে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণা পায়, তাদের যদি কেহ কিছু না দেয়, চুরি কর্‌বে। ভগবান্ কি করেন? তিনি মাতালের মদ, এবং বেশ্যারও উপপতি জুটায়ে দেন।**

ভক্তি কিসে হয়? জ্ঞানদ্বারা কি ভগবান্‌কে লাভ করা যায়?

কয়েকটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—ভক্তি কিসে হয়? আমাদের ভক্তি হয় না কেন?

ঠাকুর—**নিজেকে অভক্ত, দীনহীন, কাঙ্গাল মনে ক'রে যদি ভগবানের চরণে প'ড়ে থাকেন, তা হলে ভক্তিদেবী অবশ্যই কৃপা কর্‌বেন। কিন্তু, আমি ভক্ত, এই অভিমান যেখানে, ভক্তিদেবী সেখানে গমন করেন না। যাহা দ্বারা ভগবান্‌কে ভজনা করা যায়, তাহাই ভক্তি। সাধকগণ এই ভক্তিকে বৈধী ও অহৈতুকী এই দুই ভাগ করেছেন। বৈধীভক্তি চারি প্রকার—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। অভক্তি, শুষ্কতা, পাপ, তাপ এ সকলে প্রাণটিকে যখন কাতর ক'রে ফেল্‌বে, ভগবানের নাম লইতেও অবিশ্বাস হবে, সেই সময়ে দীনহীন কাঙ্গালের মত করজোড়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা, তাঁর নাম করা—ইহাই প্রকৃত আর্ত্ত ভজন। শুষ্কতায় ও অবিশ্বাসে নাম লইলেও তাহা বৃথা হয় না। তিক্ত ঔষধ বিরক্তির সহিত সেবন কর্‌লেও রোগের শান্তি হয়। ভগবানের নামে পাতকী উদ্ধার হয়, ইহা বস্তুগুণ। বস্তুগুণ কিছুর অপেক্ষা করে না। অগ্নিতে হাত দিলে পুড়্‌বেই। অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রে ভগবান্ কি প্রকার সুশৃঙ্খলায় যথানিয়মে চালাচ্ছেন, ভাব্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। প্রত্যেকটি পদার্থে দৃষ্টি কর্‌লে সমস্তেরই তত্ত্ব অসীম ব'লে বোধ হয়! সমস্তেরই নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনও আছে। আমরা একটু ঝড়-তুফান, গ্রীষ্ম-বর্ষার আধিক্য দেখ্‌লেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে অতিক্রম ক'রে বিচার করি। অসন্তোষ প্রকাশ করি। ইহার মূলে অবিশ্বাস, অবিশ্বাসের মূলে স্বার্থ, পরনিন্দা হিংসাদ্বেষ; ইহা হ'তেই যত দুর্গতি উপস্থিত হয়। এ জন্য, ধার্ম্মিকের একটি প্রধান লক্ষণ —তিনি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না আত্মপ্রশংসা বিষতুল্য মনে করেন। হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবানের কার্য্যে অবিশ্বাস হলেই অসন্তোষ। মনুষ্যের জ্ঞানে সৃষ্টবস্তুরই বিচার করা যায়, ভগবত্তত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানের অধীন নয়। ঋষিরা এজন্য পরাবিদ্যা, অপরাবিদ্যা—এই দুইভাগে জ্ঞানকে বিভক্ত করিয়াছেন।**

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।।

বাক্য, মন অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠ গুরু হতেই তাঁকে লাভ করা যায়; তদ্ভিন্ন অন্যত্র তাঁকে পাওয়া যায় না। মানুষ ক্ষুদ্র কীট, তার এত অভিমান যে, সে ভূমা ঈশ্বরকে জান্‌বে। কখনই নয়। মানুষের জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানা তো দূরের কথা, নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকেও জান্‌তে পারে না।

মাতৃদেবীর পুঁথির শ্রোতা আমি।

২৬শে—২৯শে পৌষ।
ইং ১৮৯৩।

মাতাঠাকুরাণী আমলকী দ্বাদশীর ব্রত করিবেন। তাঁহার আদেশমত ঠাকুরের সম্মতিক্রমে বাড়ী পঁহুছিলাম। মেজদাদা, ছোটদাদাও শীঘ্রই বাড়ী আসিবেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান সাধারণ নয়। সমারোহ খুবই চলিয়াছে। আমাদের জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধব যেখানে যিনি আছেন, অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। পৌষ মকরসংক্রান্তির দিন হইতে পুঁথি পাঠ আরম্ভ হইবে। শ্রোতা কে হইবেন, তাহা এখনও ঠিক্ হয় নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধ, রামায়ণ অথবা মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ অপেক্ষা একখানা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করাই ভাল; ইহা ভাবিয়া, আমি অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠের প্রস্তাব করিলাম। মা এবং আর আর সকলে তাহাই সঙ্গত মনে করিলেন। শ্রোতা কে হইবেন তাহা লইয়াও আলোচনা চলিতে লাগিল। জেঠামহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি শ্রোতা হউন্, মাতাঠাকুরাণীর এরূপই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। শ্রোতা যিনি হইবেন, তিনি ব্রতীর প্রতিনিধিরূপে সংযত হইয়া পুঁথি শুনিবেন। শ্রবণফল তাহার কিছুই হইবে না। ব্রতীরই হইবে। সুতরাং মা'র প্রতিনিধি করিয়া তাঁহাকে শ্রবণফলে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা হইল না। সকলের সম্মতিক্রমে আমিই শ্রোতা হইব, স্থির হইল।

ধর্ম্মের ভাণে বিপরীত বুদ্ধি। স্বপ্ন—দুর্দ্দশার একশেষ।

কিছুকাল যাবৎ ধর্ম্মের ভাণে বিপরীত বুদ্ধি হওয়ায় আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। মনে হইয়াছিল—ভগবান্ গুরুদেবের কৃপাতেই যাবতীয় অবস্থা লাভ হয়; সুতরাং সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া, একান্তপ্রাণে, কাতরভাবে, তাঁর কৃপাপ্রার্থী হইয়া পড়িয়া থাকাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বকার্য্যের যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করা, এবং নিজেই চেষ্টার দ্বারা কোন অবস্থা লাভ করিব, এই প্রকার অভিমানে সাধন ভজন করা গুরুদ্রোহিতা বৈ আর কিছুই নয়। কিছুদিন যাবৎ এই বুদ্ধিতে আমি ঠাকুরের

প্রীতিকর আদেশ প্রতিপালনেও উদাসীন হইয়া রহিয়াছি; এবং সাধন ভজন, তপস্যা সংযমাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে এখন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুরের আদেশমত চলিয়া, যে সকল অদ্ভুত অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম, আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, এখন তাহা হারাইয়াছি। কিন্তু আমার অবস্থা যতই হীন হউক না কেন, ঠাকুরের কৃপা-লব্ধ একটি অবস্থার দিকে তাকাইয়া নিজেকে বড়ই অসাধারণ ভাগ্যবান ভাবিয়াছিলাম। ভজনশীল, সাধননিষ্ঠ গুরুভ্রাতারা যে কামরিপুর উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, তাহার অণুমাত্র অস্তিত্বও আমার দেহে নাই, এমন কি, উহা যে আর কখনও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে তাহাও মনে হইত না। সুতরাং নানা দুরবস্থা সত্ত্বেও সাধারণ গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুর আমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছেন, এই প্রকার ধারণা আমার অন্তরে নিয়ত বদ্ধমূল ছিল। ঠাকুর আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—**এসব অবস্থার কথা কোথাও প্রকাশ ক'রো না, প্রকাশ করলে থাকে না—নষ্ট হয়ে যায়।** কিন্তু গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথার স্রোতে পড়িয়া, ঠাকুরের আদেশ একবারও মনে আসে নাই আবার কখনও কখনও মনে হইলেও ভাবিয়াছি, যাহা মূল সহিত একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কি প্রকারে? ফলে, কথায়বার্ত্তায় অনেকেরই নিকটে আত্মদম্ভের পরিচয়ও দিয়াছি। গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করা এবং অন্ধ অহঙ্কার বশে তাঁর কৃপার দানকে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বলিয়া মনে করা, এই দুইটি গুরুতর অপরাধে ঠাকুর আমাকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? তাই, দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া আশ্চর্য্য প্রকারে আমার যথার্থ দুরবস্থা এখন বুঝাইয়া দিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখিলাম—কতকগুলি পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া, আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং সম্মুখে আসিয়া পাশ কাটিয়া সহাস্যমুখে চলিয়া যাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ছবির ছায়ারও এতই অনিবার্য্য প্রভাব যে, তাহাতে আমার চিত্তটিকে একেবারে আবরণ করিয়া ফেলিল, মন হইতে উহা কোনপ্রকারেই দূর করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় দিন আবার ইহা অপেক্ষাও মনোহর চিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ ইহাই এখন আমার স্মরণ, মনন ও সম্ভোগের বিষয় হইয়া পড়িল। বাড়ীতে থাকিয়া এইরূপ দুঃসহ দুর্দ্দশার ফলে অহর্নিশি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে জানাইলাম—ঠাকুর! এখন আমি কি উপায়ে রক্ষা পাই? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

স্বপ্নে আদেশ।

২৮শে পৌষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম। আমার দীক্ষাকালে ঠাকুরকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ পবিত্রমূর্ত্তি, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দীর্ঘাকৃতি, মুণ্ডিত-মস্তক গুরুদেবই যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ঈষৎ হাস্যমুখে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে নমস্কার করা মাত্রই জাগিয়া পড়িলাম। ইহার একটু পরেই পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইলাম। তখন শুনিলাম, ঠাকুর আমাকে বলিতেছেন—

বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়, মৌনী হও। সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলাম—তাইত! এ কি শুনিলাম? ও কথাই বা কেন বলিলেন? বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়—কথাটি সুন্দর ও নূতনও বটে; কিন্তু ইহার অর্থ কি? বিষয়ালাপ, দোষালোচনা ও মিথ্যাবাক্যদ্বারা জিহ্বা দূষিত হইতে পারে; তা ছাড়া বাক্যের আর কি দোষ আছে? স্বপ্নদর্শনের পর আর একটি বিশেষ আশ্চর্য্য ঘটনা এই দেখিতেছি যে, জটামণ্ডিত, স্নিগ্ধ, প্রসন্নমূর্ত্তি, স্থূলকলেবর গুরুদেবের বর্ত্তমান যে বিরাট রূপ প্রতিনিয়ত আমার স্মৃতিপথে প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশমান ছিলেন, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে এখন স্বপ্নদৃষ্ট সেই পূর্ব্ব রূপই সর্ব্বদা চক্ষের উপর ভাসিতেছে। ঠাকুরের বর্ত্তমান রূপ কিছুতেই আর মনে আনিতে পারিতেছি না। স্বপ্নশ্রুত ঠাকুরের বাক্যের ও এই রূপান্তের তাৎপর্য্য কি ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল—সদ্‌গুরু ও মহাপুরুষদের বাক্য-তাৎপর্য্য আমাদের ব্যাকরণ, অভিধান অথবা পার্থিব বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা বোধগম্য করা যায় না। মহাপুরুষেরা দয়া করিয়া যাঁহার প্রতি উহা প্রয়োগ করেন, তিনি যাহা বুঝেন, সাধারণতঃ তাহাই ঐ বাক্য ও কার্য্যের যথার্থ তাৎপর্য্য। কারণ, মহাপুরুষদের চেষ্টা ও কার্য্য কখনও ব্যর্থ বা অনর্থক হয় না। তাঁহারা যাঁহাকে যাহা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন, মহাপুরুষদের কৃপাতে তিনি তাহাই বুঝেন। স্বপ্নদর্শনে আমার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে যে ঠাকুরের ইচ্ছা আমি মৌনী হই, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া, সংযতভাবে ঠাকুরের তীব্রতপস্যান্বিত সেই তমোনাশক উজ্জ্বল পাবনমূর্ত্তির ধ্যানে অনুক্ষণ তন্ময়ভাবে অবস্থান করি। ইহা স্থির করিয়া পরদিন প্রাতে মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক স্নানান্তে মৌন ব্রত অবলম্বন করিলাম। নির্জ্জন সাধনকুটীরে থাকিয়া বারংবার একান্ত প্রাণে ঠাকুরের বর্ত্তমান সস্নেহ স্নিগ্ধমূর্ত্তি স্মৃতিতে আনিতে বহু চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহা আর মনে আসিল না। ৫/৬ ঘণ্টা ক্রমাগত এই চেষ্টা করিয়া অবশেষে হয়রান্ হইয়া পড়িলাম। মাথা ধরিয়া গেল; প্রাণের অসহ্য জ্বালায় 'হা হুতাশ' করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের সেই মুণ্ডিতমস্তক রূপই চিত্তে উদিত হইতে লাগিল। অগত্যা তাহারই ধ্যানে মনোনিবেশ করিলাম।

আগন্তুক আত্মীয়স্বজনেরা আমার সহিত আলাপাদিতে কত আনন্দলাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। আমাকে মৌনী দেখিয়া, তাঁহারা কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। আমারও প্রাণে খুব কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিব! ঠাকুরের অভিপ্রায় মনে করিয়া, সঙ্কল্পমত মৌনব্রতে স্থির হইয়া রহিলাম। মাতাঠাকুরাণী আমার কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিলেন না।

ব্রতসাঙ্গ। মা'র প্রতি ঠাকুরের কৃপা।

২৯শে পৌষ মকরসংক্রান্তির দিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর আমলকী দ্বাদশীর ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। এই ১৭/১৮ দিন কি ভাবে যে চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। বহুলোকের সমাবেশে

২৯শে পৌষ হইতে
১৭ই মাঘ।

বাড়ীতে এতদিন নিয়তই যেন একটা উৎসব সমারোহ লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর শ্রীপঞ্চমী, মাঘীসপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য তিথিগুলির সংযোগে, সকলেরই অন্তরে অবিরাম আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছে। পাড়ার ও সমীপবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ প্রত্যহই অপরাহ্নে পুঁথি শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইতেন। গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক পুরুষই রামায়ণ শ্রবণে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। শুদ্ধ, সদাচারী ব্রাহ্মণের মুখে ভক্তিভাবে রামায়ণের ব্যাখ্যা শুনিয়া কি যে আনন্দলাভ করিলাম বলিতে পারি না। ভগবৎপ্রসঙ্গের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে এতদিন যেন মুগ্ধ হইয়া কাটাইলাম। আজ মাতাঠাকুরাণীর ব্রত- সাঙ্গ হইবে। সকালবেলা হইতেই সকলে উৎসাহের সহিত স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাহির বাটীর অঙ্গনে ব্রত-সম্ভার সমস্ত যথাসময়ে সুসজ্জিত হইল। পবিত্র বেদীতে শালগ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধ পুরোহিত পূজায় বসিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরাদি বিবিধ বাদ্য চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। মহিলারা দলে দলে মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধূপ-ধুনা, গুগ্গুল্ চন্দনাদির সুগন্ধে বাড়ীটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দীনহীনা কাঙ্গালিনীর মত মাতাঠাকুরাণী শালগ্রামের পানে তাকাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে থাকিয়া ব্রতপূজা দেখিতে লাগিল। সাত্ত্বিকভাবে সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে মনে হইল, যেন ব্রতাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রতস্থলে আবির্ভূতা হইয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রসন্নভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর দয়াময় শ্রীভগবান্ ভক্তের যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণে লালায়িত ও সমুৎসুক, ইহা স্মরণ হওয়া মাত্র আমার কান্না পাইল। আমি সাষ্টাঙ্গ হইয়া একান্তপ্রাণে প্রার্থনা করিলাম—"ঠাকুর! দয়া করিয়া আমার মা'কে তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও।" ব্রত যথাসময়ে সাঙ্গ হইল। মাতাঠাকুরাণী ব্রতফল ভগবানের চিরশরণ অভয় শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

পাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী ৫/৬টি গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সমাদরের সহিত ভোজন করান হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে লোক আসিয়া, পরম আহ্লাদের সহিত ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে পুঁথিপাঠ আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মাসিমাতাঠাকুরাণী আসিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন—"ওরে গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—তুই কথা বলেছিস্— তোর মৌন ভঙ্গ হইয়াছে।" সে কথায় কোন আস্থা না দেখাইয়া পুঁথি পাঠ শুনিতে অবহিত হইলাম। অতঃপর পাঠক মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কা হইতে আযোধ্যায় আনিয়া, সিংহাসনে বসাইয়াই পুঁথি শেষ করিতে উদ্যোগ করিলেন। আমি ভাবিলাম, এরূপ হইলে বড়ই অসঙ্গত হইবে। অগত্যা তখন বাধ্য হইয়াই আমি মৌন ভঙ্গ করিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলাম—"বৈকুণ্ঠেশ্বরকে মর্ত্তভূমি অযোধ্যায় আনিয়া রাজা করিয়া রাখিলেও নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। পাঠক মহাশয় আমার কথা বুঝিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন, এবং তথায় সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক

আনন্দসূচক জয়ধ্বনি করিয়া পুঁথি শেষ করিলেন। আমিও শ্রুতিফল মাতাঠাকুরাণীর অনুমতিমত ঠাকুরেরই শ্রীচরণে সমর্পণ পূর্ব্বক ধন্য হইলাম।

রামায়ণ শ্রবণে বিবিধ সঞ্চারী ভাব।

এই সতের আঠার দিন রামায়ণ শ্রবণকালে, ঠাকুর আমাকে যে কি ভাবে কৃপা করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। পাঠারম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একান্তপ্রাণে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহারই এই অতীত লীলা শ্রবণ করিতে আহ্বান করিতাম। মনে হইত তিনি আসিয়া, শালগ্রামে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক শ্রুতিসুখকর আপন নির্ম্মল অপূর্ব্ব চরিতাখ্যান শ্রবণ করিতেছেন। ঠাকুরের সুস্নিগ্ধ নব-দূর্ব্বাদল -শ্যাম অপরূপ রাম কলেবর ধ্যান করিয়া চিত্ত আমার তাঁহার চরণে একান্তরূপে সংলগ্ন হইয়া পড়িত। এই সময়ে দয়াল ঠাকুর আমার ভিতরে নানা ভাবের সঞ্চার করিতেন। কখনও ঋষিগণের, কখনও ভক্তরাজ হনুমানের, কখন লক্ষ্মণের, কখন কৌশল্যার এবং কোন সময়ে বা সীতার ভাব সঞ্চার করিয়া, আমাকে তাহাতে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়া ফেলিতেন। বাহ্যস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া তৎকালে ঐ ভাবেই মগ্ন হইয়া থাকিতাম। পাঠ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তৈলধারার মত অবিরল অশ্রু বর্ষণ হইত।

বউদের গেণ্ডারিয়া যাওয়া ও দীক্ষা। ঠাকুরের উপদেশ।

২১শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

সকাল বেলা উঠিয়াই ঢাকা যাত্রা করিবার যোগাড় করিতে লাগিলাম। মেজবধূঠাকুরাণী আসন্নপ্রসবা। নয় মাস গর্ভ অতীত হইয়াছে। তিনি আমার সঙ্গে পিতামাতার নিকটে ঢাকা যাইবেন। আমি ভাবিলাম, এই সঙ্গে ছোটদাদার ও রোহিণীর স্ত্রীকেও ঢাকা লইয়া যাইতে পারিলে বড় সুবিধা হয়। ঠাকুরের নিকটে ইহাদিগকে দীক্ষা দেওযাতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। অভিভাবকেরা সকলেই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লওয়ার বিরোধী। জানিতে পারিলে কখনই ঢাকা যাইতে অনুমতি দিবেন না। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে না বলিয়াও পারিব না। সুতরাং এ অবস্থায় উহাদিগকে লুকাইয়া বা জোর করিয়া না নিয়া গেলে উপায় নাই। এইরূপ ভাবিয়া আমি পাল্কীওয়ালাদের পাল্কী আনিতে খবর দিলাম। কাকারা জানিতে পারিয়া তাহাদের ধমকাইয়া তাড়াইলেন। ইহা লইয়া পাড়ার মুরুব্বি ও অভিভাবকদের সঙ্গে আমার বিষম ঝগড়াও হইল। অবশেষে আহারান্তে সকলে যখন বিশ্রাম করিতে গেলেন, পাল্কী ও বেহারা আনিয়া বউদের লইয়া আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে সন্ধ্যার সময় গিয়া সেরাজদিঘা পঁহুছিলাম, এবং সেখান হইতে বড় একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ছোটদাদার সঙ্গে বউদের লইয়া ঢাকা যাত্রা করিলাম। সারারাত্রি বেশ সুনিদ্রায় আরামে কাটাইয়া, ভোরবেলা ঢাকা কলঘাটে আসিয়া

উপস্থিত হইলাম।

মেজবৌঠাক্‌রুণের শরীর অতিশয় 'কাতর হইয়া পড়িল। বেদনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভাবিলাম, এবার বিপদ ঘটিল! এখন এ অবস্থায় কোথায় যাই? তাঐ মহাশয়ের বাসায় গেলে আর গেণ্ডারিয়ায় আসা হইবে না। অথচ এদিকে বৌঠাক্‌রুণের অবস্থা দেখিয়াও মনে হয়, প্রসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। কি করি? কোথায় যাই? বড়ই বিপন্ন হইয়া কাতরভাবে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম।

২২শে মাঘ,
শুক্রবার।

মাতাঠাকুরাণীর ব্রতসাঙ্গের প্রণামী দশটি টাকা ও দধি ক্ষীবাদি ছোটদাদার দ্বারা ঠাকুরের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। দীক্ষা দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে এইভাবে বউদের আনিয়া নৌকায় রাখিয়াছি, ঠাকুরকে ইহাও জানাইতে বলিয়া দিলাম। ছোটদাদা গেণ্ডারিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বউদের লইয়া, নৌকায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। দীক্ষাপ্রার্থীদের সচরাচর ঠাকুরের নিকটে প্রথমে দীক্ষা প্রার্থনা করিতে হয়, তারপর ঠাকুর দয়া কবিয়া সম্মতি দিলে, কোন নির্দ্দিষ্ট তাবিখে তাহাদের উপস্থিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমি ঠাকুরকে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র না জানাইয়া, তাঁহার অভিপ্রায় বা আদেশের অপেক্ষা মাত্র না করিযা, ইহাদিগকে দীক্ষা দেওয়াইতে আনিযাছি। ঠাকুর কি বলিবেন, জানি না। বড়ই দুশ্চিন্তা ও ভয় হইল। একান্তপ্রাণে ঠাকুরকে প্রাণের আকাঙ্খা নিবেদন করিলাম। যাহা হউক, এদিকে ছোটদাদা ঠাকুরের নিকটে পঁহুছিযা, আমার সমস্ত কথা জানাইলে, ঠাকুর যেন একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— **যাও, শীঘ্র তাঁদের আশ্রমে নিয়া এস বিলম্ব ক'রো না। এখনই দীক্ষা হ'বে।** ছোটদাদা ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এই খবব দেওযা মাত্রই আমি সকলকে লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর তখন চা সেবা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—**কি? তুমি আসন্নপ্রসবা বউকেও দীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছ? এ অবস্থায় যে দীক্ষা হয় না, তুমি জান না?**

আমি বলিলাম—আমি জানি। আপনি দযা ক'রে গর্ভস্থ সন্তানকেও শক্তিসঞ্চার কব্‌বেন, এই আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁকে এ অবস্থাযও এনেছি।

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—**বউদের প্রস্তুত থাক্‌তে বল, আমি চা খেয়ে নেই। এখনি দীক্ষা হবে।**

বউরা প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর চা সেবাব পর আপন কুটীরে যাইয়া বসিলেন। বউদিগকে লইয়া গিয়া ঠাকুরেব সম্মুখে বসাইলাম। স্থানাভাব বশতঃ কেহ ঐ ঘবে স্থান পাইলেন না। ঠাকুর আমাকে তাঁর বামপার্শ্বে বসিতে বলিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ **গুরু ওঁ গুরু ওঁ** বলিয়া নীরব হইলেন। পরে উপদেশ দিতে লাগিলেন—(উপদেশের সংক্ষিপ্ত সারাংশ)

১। সত্য কথা বল্‌বে, মিথ্যা কথা বল্‌বে না।

২। সর্ব্বজীবে দয়া কর্‌বে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সকলেরই প্রতি দয়া কর্‌বে।

৩। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। রাম কৃষ্ণের মত তাঁদের সেবা পূজা কর্‌তে হয়। তা হ'লে সহজেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। তানা পার্‌লেও পিতামাতাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌তে হয়, সর্ব্বদা তাঁদের বাধ্য হ'য়ে চল্‌তে হয়।

৪। অতিথি সেবা কর্‌বে। উপযুক্ত আহারাদি দিয়া সেবা কর্‌তে না পার্‌লেও, অগত্যা একখানা আসনে বসিয়ে একগ্লাস জলও দিতে হয়, দু'টি মিষ্টি কথা ব'লে বিদায় কর্‌তে হয়। অতিথি রুষ্ট হ'য়ে গৃহ থেকে না যান, এ বিষয়ে মনোযোগী হ'তে হয়।

৫। পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে, পুরুষে নারায়ণ ও স্ত্রীতে লক্ষ্মীরূপে বিদ্যমান রয়েছেন। এটি ভাবের বা কল্পনার কথা নয়, সত্য কথা। পরস্পর পরস্পরকে ঐভাবে দেখে শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌তে হয়। এই ভাবে চল্‌লে সে পরিবার ঋষিপরিবার হয়। অশান্তি কখনও সে পরিবারে প্রবেশ করে না।

৬। পরনিন্দা কর্‌বে না। বিদ্বেষপূর্ব্বক কারও মর্য্যাদা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার চেষ্টাই নিন্দা। বাক্যদ্বারা, কার্য্যদ্বারা, হাস্যপরিহাস দ্বারা, এমন কি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও নিন্দা হয়। এই নিন্দা নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর পাপ।

৭। মাংস আহার ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ। মৎস্য আহারে নিষেধ নাই, কিন্তু মৎস্য আহারেও ক্ষতি করে। সাধনপথে উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য আহারও ত্যাগ কর্‌তে হয়। যতদিন মৎস্য আহারে প্রবৃত্তি আছে, জোর ক'রে ছাড়ার প্রয়োজন নেই। পিতামাতা, শ্বশুরশ্বাশুড়ী, স্বামী, জ্যেষ্ঠ ভাই—এদের ভুক্তাবশিষ্টকে উচ্ছিষ্ট বলে না; তা প্রসাদ। এ ভিন্ন সকলেরই উচ্ছিষ্ট বিষবৎ ত্যাগ কর্‌বে।

৮। গুরু যে মন্ত্র দেবেন তা কোথাও প্রকাশ করবে না। প্রকাশ কর্‌লেই তার শক্তি হ্রাস হ'য়ে যায়। মাটির নীচে যেমন বীজ থাকে ইষ্টমন্ত্রও সেই প্রকার হৃদয়ে গোপন রাখ্‌তে হয়।

৯। শরীর-মন-শুদ্ধির জন্য দু'বেলা অন্ততঃ একবার প্রাণায়াম কর্‌বে। এটিও খুব গোপনে করবে। অন্যে না জানে।

বড়দাদা, ছোটদাদা যে নাম পাইয়াছেন, বউরাও তাহাই পাইলেন। বেলা প্রায় ৯টার সময়ে দীক্ষা শেষ হইয়া গেল। মেজ বৌঠাক্‌রুণের প্রাণায়াম খুব ভাল হইল, দীক্ষার পরই তাঁর শরীর

অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তিনি পিত্রালয়ে যাইতে অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু দিদিমা আহার না করিয়া যাইতে দিলেন না। বেলা প্রায় ৩টার সময়ে উহারা সকলে লক্ষ্মীবাজার তাঐ মহাশয়ের বাসায় গেলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

শালগ্রাম ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি। মহাপুরুষদের বিচরণকাল। তাঁদের কৃপা উপলব্ধির উপায়।

২৩শে মাঘ, শনিবার।

ঠাকুর আমাকে শালগ্রাম পূজা করার আদেশ করার পর হইতে দিন দিনই আমার শালগ্রামের জন্য উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে কিন্তু কখনও শালগ্রামের কল্পনাও ত করি নাই। অযোধ্যা হইতে আমার জন্য শালগ্রামের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি আসিয়াছে। উহা দেখিয়াই আমার ব্রহ্মতালু জ্বলিয়া গেল। আমি উহা ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম—দাদার একটি বন্ধু বুঝিতে না পারিয়া, শালগ্রাম না পাঠাইয়া, এই লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি পাঠাইয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন—**তা তোমার যদি ইচ্ছা হয় উহাই পূজা কর্‌তে পার।**

আমি সোজা বলিলাম—আমার মূর্ত্তিপূজা কর্‌তে একেবারেই ইচ্ছা নাই।

ঠাকুর—**বেশ, পিতলের বা অন্য কোন ধাতুগঠিত মূর্ত্তি পূজা ক'রো না। লক্ষণযুক্ত স্বাভাবিক শালগ্রাম পূজা ক'রো। এদিক্ ওদিক্ ঘুরে অনেক চেষ্টা অনুসন্ধান কর্‌তে হয়। তবে তো জোটে।**

আমি—ঠাকুরের পূজা যে শিলাতে কর্‌ব, তা সুশ্রী না হ'লে তৃপ্তি হবে না। এজন্য লক্ষ্মণযুক্ত হ'লেও বিশ্রী শিলা পূজা কর্‌তে পার্‌ব না।

ঠাকুর—**না, না, তুমি লক্ষণযুক্ত খুব সুশ্রী শালগ্রামই পাবে; তাই পূজা করো।**

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর রাখ্‌তে ইচ্ছা হয়—রাখ্‌তে পারি কি?

ঠাকুর—**হাঁ, খুব পার। তবে ওসব পূজা না ক'রে রাখা ঠিক নয়। সেবা পূজা ভোগাদির সুব্যবস্থা ক'রে ওসব ঠাকুর রাখ্‌তে হয়। সেইরূপ না কর্‌লে রাখ্‌তে নাই।**

প্রশ্ন—কোন্ কোন্ সময়ে সাধন কর্‌লে মহাপুরুষদের কৃপা লাভ করা যায় ও বুঝা যায়?

ঠাকুর—**রাত্রি একটার পর মহাপুরুষেরা বাহির হন। একটা হ'তে চারটা পর্য্যন্ত তাঁরা বিচরণ করেন। ঐ সময়ই সাধনের প্রশস্ত সময়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ধ'রে**

একটা স্থানে ব'সে কিছুদিন নাম করলে, মহাপুরুষদের কৃপা বুঝা যায়। কয়েকবার প্রাণায়াম ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সে নাম করতে হয়। বিছানায় ব'সে মশারির ভিতরে থেকে নাম করলেও চলে—কোন ক্ষতি হয় না। নাম করার সময়ে মহাপুরুষেরা সামনে এসে দাঁড়ান, এবং সাহায্য করেন। তখন তাঁদের গাত্রগন্ধ পাওয়া যায়। ধূপ ধূনা-গুগ্‌গুল্ চন্দনাদির গন্ধ, কখনও পবিত্র হোমধূমের গন্ধ, কখনও বা গাঁজা লবাঙ্গের গন্ধ ও সুগন্ধি ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। কখনও তাঁদের দর্শনে, কখনও বা তাঁদের বাণী শ্রবণেও তাঁদের জানা যায়। নানাপ্রকারে মহাপুরুষেরা কৃপা করেন ও নিজেদের পরিচয় দেন।

দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর কহিলেন— **যদি সাধন গ্রহণের জন্য চিত্ত বাস্তবিকই ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, তা হ'লে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। লোকের নিকটে শুনে প্রবৃত্তি হ'লে ঠিক নয়। সামান্য বস্তু ক্রয় করতে হলেও কত দেখে শুনে গ্রহণ করে। যিনি সাধন গ্রহণ করবেন তাহা শাস্ত্র-সদাচার সম্মত কি না বিশেষ রূপে অবগত হ'য়ে তবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁর নিকটে সাধন গ্রহণ করবেন তাঁর সঙ্গ কিছুকাল ধ'রে করতে হয়। সাধন গ্রহণের পূর্ব্বে গুরুর উপরে শত সন্দেহ হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধন গ্রহণের পর একটি ঘটনাতেও গুরুর উপরে সন্দেহ জন্মিলে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই জন্যে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জেনে শুনে, তবে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।**

ঠাকুরের আদেশ বুঝা শক্ত। এ বিষয়ে নানা প্রশ্নোত্তর।

মাতাঠাকুরাণীর ব্রতোপলক্ষে ১৭ দিন যে মৌনী ছিলাম তাহা বারংবার মনে হইতে লাগিল। চিত্তটি তখন নিয়তই কেমন অন্তর্ম্মুখী ছিল, সর্ব্বদাই নামে বিভোর থাকিতাম। ঠাকুরের স্মৃতি অনুক্ষণ অন্তরে জাগরুক ছিল। মৌনী হইলে আবার সেই অবস্থা লাভ হইবে ভাবিয়া মৌনী হইতে ইচ্ছা হইল। ইতিপূর্ব্বে শ্রীধর কয়েকদিন যাবৎ মৌনী হইয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "ভাই, মৌনী হইলে কেন? ঠাকুর কি তোমাকে আদেশ করিয়াছেন?" শ্রীধর লিখিয়া উত্তর দিলেন— "ভাই! বাক্য অনর্থের মূল। বাক্যদ্বারা অনেকের প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি। বাক্য না বলাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত মনে স্থির করিয়া, আমি নিজ হইতেই মৌন হইয়াছি—এ গোঁসায়ের আদেশ নয়।" শ্রীধরের বাক্য আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। আমি মৌনী হইলাম। ঠাকুর আমাকে কোন কথা অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করায়, তাহার উত্তর আমি ঠাকুরেরই মত ইঙ্গিতে বা অস্ফুটস্বরে দিতে লাগিলাম। দু'চার বার এরূপ করায় ঠাকুর বিরক্ত হইয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—**ওকি?**

ওরূপ কর্‌ছো কেন? তুমি কি মৌনী হ'য়েছ? আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম—"হাঁ।" ঠাকুর বলিলেন—**মৌনী হ'লে কেন?** আমি বলিলাম—আপনি আমাকে বলেছিলেন— **বাক্যদ্বারা জিহ্বা উচ্ছিষ্ট হয়। মৌনী হও।** ঠাকুর কহিলেন—**আমি বলেছিলাম! সে কি রকম?** আমি বলিলাম—"বাড়ীতে যখন ছিলাম, তখন স্বপ্নে একদিন আপনি আমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। তাই সেখানেই ১৭ দিন মৌনী ছিলাম। তারপর মৌন ভঙ্গ হয়। আবার এখন তাই মৌনী হয়েছি।"

ঠাকুর—**স্বপ্নে আমি বলেছিলাম? আমার এই চেহারা তুমি দেখেছিলে?**

আমি—আপনার এই চেহারা দেখি নাই, কিন্তু পরিষ্কার আপনারই কথা শুনেছিলাম। আমারও নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল যে আপনিই বলিলেন।

ঠাকুর—**যিনি বলেছিলেন তাঁর চেহারা কি প্রকার দেখেছিলে? আমাকে দেখেছিলে?**

আমি—শুদ্ধ, শান্ত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, একটি ব্রাহ্মণ দেখেছিলাম। দেখামাত্রই আমার নিশ্চয় ধারণা হয়েছিল, আপনি।

ঠাকুর—**আমি নই। ও তোমারই প্রকৃতি, তোমারই ভিতরের রূপ তোমার নিকটে প্রকাশ হ'য়ে ওই রকম বলেছিল।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম—হায়! হায়! আমারই প্রকৃতি আমার নিকটে ঠাকুরের ভাবে প্রকাশিত হইয়া আমাকে বিপথগামী করিল! তা হলে আর উপায় কি? আমিই যদি আমাকে ইষ্ট বুঝাইয়া অনিষ্টের পথে চালাই, তা হলে আর রক্ষা করিবে কে? কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তা হলে তো বড় বিপদ? স্বপ্নে আপনার আদেশ যথার্থ আপনারই কি না, কি প্রকারে বুঝিব?

ঠাকুর—**স্বপ্নে আমার বর্ত্তমান রূপ দেখ্‌লে—তার আদেশই আমার আদেশ মনে করবে। তা হলেও গুরু যতকাল জীবিত থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে, সে মত চল্‌তে নাই। গোলমাল সময়ে সময়ে হয়।** ঠাকুরের কথায় বুঝিলাম—তাঁহার রূপ দর্শন না করিয়া, শুধু কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য পাইয়াই ঠাকুরের বাণী মনে করা ঠিক্ নয়। আশানন্দের শিষ্যকে যে সেদিন একটি মহাপুরুষ শাসন করিয়াছিলেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অবিকল ঠাকুরেরই মত ছিল। সে সব কথা শুনিয়া একটি লোকও তখন উহা ঠাকুরের কথা নহে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুতরাং ঠাকুরকে না দেখিয়া শুধু তাঁর বাণী শ্রবণ করিলে, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না।

ঠাকুর কহিলেন—**বীর্য্যধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত মৌনী হওয়া ঠিক নয়। এ অবস্থায় মৌনী হ'লে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। অনেকের পাথরী রোগ জন্মে। মৌনী হ'য়ো না—বাক্যসংযম কর। প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে অনেকে মারা যায়।** ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম।

নৃত্যগোপাল গোস্বামীর ঠাকুরকে পরীক্ষা।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামীর একটি কথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল। সকালে প্রায় ৭৷৷০ টার সময়ে ঠাকুর চা-সেবা করেন। ঐ সময় নৃত্যগোপাল (ডাকনাম নেপাল গোঁসাই) গেণ্ডারিয়া আসিয়া আমতলায় ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "আমি একান্ত মনে গোঁসাইয়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম—গোঁসাই! তুমি যদি রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের সহিত অভেদ হও, প্রত্যক্ষ ভাবে আমাকে একটু কৃপা করিয়া পরিচয় দেও। গোঁসাই চা-সেবার পর কখনও আসন হইতে উঠেন না; কিন্তু ঐ সময়ে তিনি চা-সেবার পরই ধীরে ধীরে আমতলায় আসিয়া, আমার মাথায় তাঁর চরণখানা তুলিয়া দিলেন। এবং একটি কথাও না বলিয়া নিজ আসনে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনায়ই আমি তাঁর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং তাঁর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করি।" নেপাল গোঁসাই রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের বড়ই কৃপাপাত্র।

২৬ হইতে ৩০শে মাঘ।

ঠাকুরের চিঠি—তফাৎ থাকাই সার কথা।

কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া মহা গোলমাল লাগিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা চলিতেছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে বহুলোক তাঁহার দৃষ্টান্ত দূষণীয় মনে করেন। সুতরাং ঠাকুরেরই মত তাঁহাকেও আচার্য্যপদে রাখিতে চাহেন না। ব্রাহ্মসমাজ নগেন্দ্রবাবুকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন; এবং অবিলম্বে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার উত্তর দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু ওবিষয়ে একখানা পত্র লিখিয়া ঠাকুরের নিকটে পরামর্শ চাহিয়াছেন। ঘটনা ক্রমে ঐ চিঠি ঠাকুরের নিকটে পঁহুছিতে বহু বিলম্ব হইল। পত্রখানা পড়িয়া দেখা গেল, দিন কয়েক পূর্ব্বে ঠাকুর একদিন নিজ হইতে নগেন্দ্রবাবুকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে এই পত্রের উত্তর অক্ষরে অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। এই পত্র পাইয়া ঠাকুর নগেন্দ্রবাবুকে জবাব দিলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কখনও তাহা পঁহুছিত না। আমাদের অনেকে এই ঘটনা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সম্প্রতি ঠাকুরকে জেনারেল কমিটির সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছেন। ঠাকুর ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়া তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন, যথা—**তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভিতরে নাই। যাহা সত্য তাহাই জানিতে হইবে। সুতরাং যাগ-যজ্ঞ, তিলকমালা, জটা-জুট, ভস্ম, ব্রত কিছুকেই অবজ্ঞা করা যায় না। এ জন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ সত্যবস্তু জানিতে কতই শিক্ষার প্রয়োজন।**

তিনি মৌনী হইয়াছেন। তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্ব্বভূতে ভগবদধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকট প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন, বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এ সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এ জন্য তিনি বলেন তফাৎ থাকাই সার কথা।

ভাবুকতায় ঠাকুরের ধমক্।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভিতরের কুচিন্তা, কুকল্পনা, সংশয়, সন্দেহ কিসে যাইবে?

১লা হইতে ১৪ই ফাল্গুন।

ঠাকুর—যে নাম পেয়েছ তাতেই সব যাবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে ঐ নাম জপ কর।

গুরুভ্রাতা—তা কি আপনার কৃপা ভিন্ন হবে? আমার আর কি ক্ষমতা আছে?

ঠাকুর—ওসব ভাবুকতা ছেড়ে দাও। ওতে কোন উপকার হয় না। অধিক ভক্তি দেখালে নিজের ক্ষতি হয়। কৃপার কথা অনেক পরে। এখন কৃপা বুঝ্‌বার শক্তি নাই। যতদিন মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ, এ সমস্ত আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা কর্‌তে হবে। এই চেষ্টাই সাধন—নাম করা। আমি পারি না—এসব কথা ভাবুকতা মাত্র, যতদিন মানুষের নিজের ইচ্ছা, চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে, ততদিন ওসব কৃপার কথা কিছু না। নিজেরই পরিশ্রম কর্‌তে হবে, না হ'লে কিছু হবে না।

ভগবানে চিত্ত সমর্পণ, অচলা ভক্তি কিরূপে হয়।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—অবিশ্বাস সন্দেহে তো সর্ব্বদাই ক্লেশ পাইতেছি। ভগবানের চরণে চিত্ত সমর্পণ, তাঁহাতে অচলা ভক্তি কিরূপে হইবে? ঠাকুর লিখিয়া, কখনও বা ইঙ্গিতে জানাইলেন—শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ভক্তমাল এই সমস্ত গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করলে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অনুসারে অচিরে বিশ্বাস জ'ন্মে থাকে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করলে, অনেক জন্মের সুকৃতি বলে ভগবৎ-ভজনে প্রাণে ব্যাকুলতা আসে। সেই সময়ে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ মত অকপটে ভজন সাধন কর্‌লে, ভগবান্ কৃপা ক'রে সাধককে আপন দাস ব'লে মনোনীত করেন, এবং তাকে দর্শন দেন। সমস্ত সুন্দর বস্তু যিনি রচনা করেছেন, সেই পরম সুন্দরের শ্রী-অঙ্গের কোন এক অংশ দর্শন কর্‌লেও মানুষ কখনই তাঁর চরণছাড়া হ'তে পারে না। ঋষিগণ বলিয়াছেন—প্রথমে, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা —যোগ আত্মাতে পরমাত্মাকে লাভ;

তৃতীয় অবস্থা—ভগবৎ সম্বন্ধ, পূজা-অর্চ্চনা; এই অবস্থায় তাঁর রূপ দর্শন হয়। সেই রূপ—সচ্চিদানন্দ। তাহা একবার দর্শন হলে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

প্রথমে যদি আমি ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত এরূপ অভিমান হয়, চারিদিক হ'তে লোকে ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন কর্‌তে থাকে, তখন যদি আমার অন্তর ধর্ম্মহীন, অসাধু, অজ্ঞান ও অভক্ত হয়, তবে পূর্ণ সম্মান বজায় রাখ্‌তে গিয়ে, মানুষ ক্রমেই কপট হ'য়ে ঘোর পাপের মধ্যে ডুব্‌তে থাকে। এজন্য লোকের সমক্ষে যত হীন, মলিন রূপে পরিচিত হই ততই মঙ্গল। এই বিপদ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য ঋষিরা চারিটি উপায় বলেছেন—১। স্বাধ্যায়—(ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও নামজপ); ২। সৎসঙ্গ; ৩। বিচার—(সর্ব্বদা নিজের অন্তর পরীক্ষা কর্‌তে হবে; যদি আত্মপ্রশংসা ভাল লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়, তবে আপনাকে নরকগামী মনে কর্‌তে হবে, ধর্ম্মভ্রষ্ট মনে কর্‌তে হবে); ৪। দান—দান শব্দে দয়া বলেছেন। কাহারও প্রাণে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া। কাহারও শরীরে বা মনে, বাক্য ও ব্যবহারের দ্বারা কোন প্রকার ক্লেশ দিলে দয়া থাকে না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মনুষ্য সর্ব্বজীবেই দয়া করা কর্ত্তব্য।

এই স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, বিচার ও দান প্রতিদিন সাধন কর্‌তে হবে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয় শাসন কর্‌তে অভ্যাস করাও প্রয়োজন বলেছেন; এই উপায়ে সহজেই বাসনা কামনার নিবৃত্তি হয়।

ধর্ম্মলাভের সহজ উপায়—নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থা।

একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কিছুই তো করিতে পারি না। ধর্ম্ম কিরূপে লাভ হইবে?

ঠাকুর—জীবনটিকে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অভ্যস্ত কর্‌তে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগ্‌লেও ঔষধ গেলার মত কর্‌লে ক্রমে রুচি জন্মে। প্রাতঃকালে উঠে, স্নান ক'রে একঘণ্টাকাল প্রাণায়াম ও নাম। পরে একঘণ্টা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, তার পর বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গের সেবা। নিকটে দুঃখীলোক থাকলে তাহার তত্ত্বাবধান করতে হয়। আহারের পর নিদ্রা যাওয়া ঠিক্ নয়। দিবানিদ্রায় বুদ্ধিনাশ ও আয়ুক্ষয় হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে অধ্যয়ন কর্‌তে হয়। অপরাহ্নে অল্প ভ্রমণ। সন্ধ্যার সময়ে

নাম-গান, প্রাণায়াম ও নাম জপ। তৎপরে পরিমিত আহার ক'রে শয়ন করবে। ইহা অভ্যস্থ হ'লেই সহজে ধর্ম্মলাভ হবে।

কুঅভ্যাসে বিষফল।

বহুদিন যাহা অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার ফলও বহুদিন থাকে। অনিয়মে চলিয়া যে সকল কুঅভ্যাস জন্মিয়াছে, এখন কত চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়াইতে পারিতেছি না। কুঅভ্যাসের কার্য্যগুলি যেন এখন আমার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিনই সঙ্কল্প করিয়া শয্যা হইতে উঠি—'আজ এই প্রকার চলিব।' কিন্তু দুই একঘণ্টা পরেই দেখি, উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে কোন্ অবসরে সঙ্কল্পের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলি, কিছুই বুঝিতে পারি না। ধীরে ধীরে আহারের অনিয়মে লোভ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এখন আর উহা সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সকল স্বেচ্ছাচারের মধ্যে এইটিই আমার স্বভাবকে বেশী কলুষিত করিয়াছে। দৃষ্টিও এখন আর পূর্ব্ববৎ পদাঙ্গুষ্ঠে স্থির থাকে না, বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। আর যে কোন কালে পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে পারিব, সেরূপ ভরসাও নাই। বাক্যসংযমের কথা আর কি বলিব? যেমনই ঠাকুরের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, অসাধারণ ফললাভেচ্ছায় অতিরিক্ত হঠকারিতা করিয়াছিলাম, তেমনই ঠাকুর এখন সুদে আসলেই ফলভোগ করাইতেছেন। বাক্য সংযত না হওয়ায় মন সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ—ভিতরে দৃষ্টি আর নাই। পদে পদে সত্যভ্রষ্ট হইতেছি। নামটি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রাণায়াম কুম্ভকাদি যথারীতি না করায়, শ্বাস প্রশ্বাস অপরিমিত হ্রস্ব ও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। ফলে এখন আর বীর্য্যও স্থির নাই, চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সিংহের সহিত শৃগাল কুকুরের যুদ্ধ যে প্রকার অসম্ভব, বাক্যের সহিত আমার এই সংগ্রামও তদ্রূপ মনে হইতেছে। হায়! এখন কি করি! ঠাকুরের আদেশ একটিও রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের আদেশ মত কার্য্য হয় না কেন? তিনিই গড়েন, তিনিই ভাঙ্গেন।

ঠাকুরের আদেশ প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিয়াও যখন পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে লাগিলাম, তখন ভিতরে সন্দেহ জন্মিল, এরূপ হয় কেন? ঠাকুরের আদেশ মত চলিতে আমি চেষ্টা করিতেছি, তাতে আমাকে বাধা দেয় কে? সদ্গুরু তো সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁহার বাক্য ও তাঁহার শক্তি একই বস্তু। তাঁহার বাক্য অলঙ্ঘনীয়—তাঁহার শক্তি অমোঘ। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছামাত্রে হইতেছে, তাঁহার আদেশ তো প্রয়োগমাত্রেই সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমাতে তাহা হইল না কেন? গুরুবাক্যের সহিত যখন আমার ইচ্ছার বিরোধ নাই, তখন তাহা সফল হওয়ার প্রতিকূলে দাঁড়ায় কে? এমন শক্তিশালীই বা কে আছে? এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল। মীমাংসার জন্য

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আজ আর কোন উত্তরই দিলেন না। শেষে মনে হইল যে, কিছুকাল পূর্ব্বে ঠাকুরকে আমিই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, চেষ্টা করিয়াও আপনার আদেশ মত চলিতে পারি না কেন? তখন ঠাকুর যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতেই ত আমার বর্ত্তমান প্রশ্নের সুস্পষ্ট মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তখন বলিয়াছিলেন—**আমি যা বল্‌ব, তাই যদি কর্‌তে পার্‌বে, তবে তো সিদ্ধই হলে। কতই বল্‌ব— যত দূর পার ক'রে যাও। আর যা না পার তার জন্য কষ্ট পেয়ো না। মনে ক'রো, অন্য কোন শক্তিতে তোমায় ঐ ভাবে চালিত কর্‌ছে—ওতে তোমার কোন হাত নাই, অপরাধও নাই।**

তারপর সেদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনার আদেশ মত ন্যাস করিলে তো সমস্ত দেহ মন ভগবান্‌কেই অর্পণ করা হয়, উহার পর যে সকল অপরাধ, অনিয়ম হঠাৎ হইয়া পড়ে তাহা কি বাস্তবিকই আমি করি?

ঠাকুর বলিলেন—**না, ওসব তুমি কর না।** ঠাকুরের কথায় বুঝিতেছি, আদেশ করেনও তিনি আবার ভাঙ্গেনও তিনি। শুধু কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃই সংস্কার হেতু কষ্ট পাই। কিন্তু এই কষ্ট ভোগেই ক্রমশঃ এইভাবে আমার স্তূপীকৃত প্রারব্ধের ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চল্‌লে তোমাদের যাবতীয় কর্ম্মই শাঁখের করাতের মত উঠ্‌তেও কাট্‌বে, পড়্‌তেও কাট্‌বে।**

গুরুতে একনিষ্ঠতা সুদুর্ল্লভ।

ঠাকুর যতই আশা ভরসা দিন না কেন, কিছুদিন যাবৎ প্রাণটা বড়ই উদাস উদাস বোধ হইতেছে। সর্ব্বদাই মনে হইতেছে, এতকাল কি করিলাম? বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, তাহার একটি অবস্থা বা কথারও তো সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিলাম না। ভগবান্ গুরুদেব আমার সকল প্রকার কঠোর কর্ত্তব্য কাটাইয়া তাঁর শান্তিময় চরণতলে আশ্রয় দিয়াছেন এবং তাঁর দেব-দুর্ল্লভ সেবায় অধিকার দিয়া নিয়তই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন। তাঁহার সহিত চিরদিনের নিত্যসম্বন্ধ যাহাতে স্থাপিত হয় তাহারও সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ম্মতি-বশতঃ আমি তাঁহার আদেশ পালনে একটিবারও ত তেমন ভাবে চেষ্টা করিলাম না। প্রায় তিন বৎসর হইল, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে কতপ্রকার অবস্থাই ভোগ করিলাম। এ পর্য্যন্ত কখন সাধনে উৎসাহ কখনও নিরুৎসাহ, কখন দৃঢ়তা কখনও আবার শিথিলতা, দিন তো এই ভাবেই চলিয়া যাইতেছে। ঠাকুরের বহু আদেশের মধ্যে একটিও যে স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হায়, হায়! তবে আমার দশা কি হইবে? শুনিয়াছি শাস্ত্রে আছে, 'কঠোর সাধন, ভজন, তপস্যা এবং বহু জন্মের সুকৃতি বলেও সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করা যায়

না।' অথচ পতিত-পাবন, দয়াময় প্রভুর অযাচিত কৃপাতেই তাহা আমি অনায়াসেই লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমার তাহাতে কি হইল। ঠাকুর এয়ে বানরের গলায় মুক্তাহার পরাইয়াছেন। বস্তুর মাহাত্ম্য আমি তো কিছুই বুঝিলাম না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুনিয়াছিলাম,—

"কোটী জীবের মধ্যে একটি ব্রহ্মজ্ঞানী, কোটী ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে একটি তত্ত্বজ্ঞ, কোটী তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে একটি কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু গুরুতে একনিষ্ঠ সুদুর্ল্লভ।"

সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ হইলেই তাঁহাতে একনিষ্ঠতা লাভের অধিকার জন্মে। সদ্‌গুরুর আশ্রিত জনগণের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাঁর আদেশ পালন। তাঁহাতে একনিষ্ঠতা লাভই তাহাদের আত্মার চরম কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ ও একমাত্র লক্ষ্য। শুনিয়াছি, অবিচারে গুরুর বাক্য ধরিয়া চলিলেই ক্রমে ক্রমে গুরুতে একনিষ্ঠতা জন্মে। কিন্তু আমার তাহাতে মতি জন্মিল কই? গুরুদেবের কোন একটি আদেশ ধরিয়া কিছুদিন চলিয়া আশানুরূপ ফল অবিলম্বে (হাতে হাতে) না পাইলে অমনি সন্দিগ্ধ, চঞ্চল ও হতাশ হইয়া পড়ি আর কুবুদ্ধিবশতঃ মতিচ্ছন্ন হইয়া ঠাকুরের কৃপাবাণীর উপরে দোষারোপ করি। হায়, হায়! ঠাকুরের আদেশ পালনে আমার অচলা আকাঙ্ক্ষা জন্মিল না, তার প্রতি একটুকুও নির্ভর বা নিষ্ঠা হইল না। আমার আর কল্যাণের আশা কি?

তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী।

ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত বিধি নিয়ম একমাত্র গুরুতে একনিষ্ঠতা লাভের জন্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন্ নিয়মটি আমি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছি? প্রথম বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল---

১। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে কিছুক্ষণ সাধন কর্‌বে। পরে শুচি-শুদ্ধ হ'য়ে আসনে বসে নিত্যক্রিয়া কর্‌বে। গীতা এক অধ্যায় পাঠ কর্‌বে।

২। স্বপাক আহার কর্‌বে। আহার বিষয়ে কোন প্রকার অনাচার না হয়—সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখ্‌বে। দিনরাতে একবার মাত্র আহার কর্‌বে। আহারের মাত্রা ও কাল নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। অধিক মিষ্টি, ঝাল, অম্ল, লবণাদি সর্ব্বদা পরিহার কর্‌বে। মিষ্টি ও অম্লে কাম, ঝাল ও তীক্ষ্ণ বস্তুতে ক্রোধ, লবণে লোভ, এবং গব্য বস্তুতে মোহ বৃদ্ধি করে। এসব উত্তেজক বস্তু ত্যাগ কর্‌বে।

৩। সামান্য বসন পর্‌বে, সামান্য শয্যায় শয়ন কর্‌বে। দিবানিদ্রা ত্যাগ কর্‌বে।

৪। কারও নিন্দা কর্‌বে না। কারও নিন্দা শুন্‌বে না। কাকেও কষ্ট দিবে না। সকলকেই সন্তুষ্ট রাখ্‌বে। মানুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতার যথাসাধ্য সেবা কর্‌বে।

৫। বিচারপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করবে। সত্য বাক্য বলবে। সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা করবে। কথা খুব কম বলবে।

৬। যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ করবে না।

৭। গোপনে নিজের সাধন করবে। পবিত্র আসনে বসবে। নিজের কার্য্যে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখবে।

প্রথম বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে শ্রীগুরুদেবের এই কয়টি আদেশই বিশেষ। দ্বিতীয় বৎসরে বিশেষ আদেশ—

১। ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্—কোন স্ত্রীলোকের দিকেই তাকাবে না। কোন স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসবে না। স্ত্রীলোকের কোন প্রকার সংস্রবেই থাকবে না।

২। সর্ব্বদা হেঁট মস্তকে থাকবে। দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে রাখবে। কিছুকাল পদাঙ্গুষ্ঠে স্থির রাখতে পারলে দৃষ্টি-শক্তি খুলে যাবে, যে দিকে তাকাবে—যাবতীয় বস্তু চক্ষে পড়বে। মাটি, জল, আকাশ, সমস্ত ভেদ ক'রে দৃষ্টি চলবে।

৩। বাক্য সংযম করবে। জিজ্ঞাসিত না হ'লে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হ'লেও বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করলে উত্তর দিবে না। উত্তর দেওয়ার সময় খুব বিবেচনা ক'রে, অতি সংক্ষেপে সত্য উত্তরটি দিবে।

৪। অপরাহ্ণ ৪টার পরে স্বপাক আহার করবে। কাহারও রান্না ডাল, তরকারী ইত্যাদি 'সক্‌ড়ী' কোন বস্তু খাবে না। একবার মাত্র আহার করবে। তবে অন্য সময়ে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হ'লে সামান্য কিছু জলযোগ মাত্র করবে। বাজারের মিঠাই, মুড়ি, চিঁড়া, খই, বা ছাতু কিছুই খাবে না।

৫। সর্ব্বদা কুম্ভকযোগে নাম করবে—প্রতিদমে, একটি শ্বাস প্রশ্বাসও যেন বৃথা না যায়। ** চক্রে সর্ব্বদা মন স্থির রাখতে চেষ্টা করবে।

৬। প্রতিদিন হোম করবে। গায়ত্রী অন্ততঃ আড়াইশত জপ করবে। সকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গুরুগীতা পাঠ করবে। মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠ করবে। সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা বা এগারটা পর্য্যন্ত ঘুমাবে বাকী রাত্রি সাধন ক'রে কাটাবে।

৭। ভিক্ষান্ন আহার করবে। তিন বাড়ী পর্য্যন্ত ভিক্ষা করতে পারবে। ভিক্ষান্ন সর্ব্বদাই পবিত্র। একপাক আহার করবে। সঞ্চয় ত্যাগ করবে।

এবার ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ উপদেশ

১। ক্রোধ দুর্জ্জয় রিপু, স্বজন-নির্জ্জনতার অপেক্ষা করে না। ক্রোধ জন্মিলে পূর্ব্ব তপস্যার ফল নষ্ট হয়—মানুষ চণ্ডাল হয়। ক্রোধ সংযমের চেষ্টা করবে।

২। গীতার দু'একটি শ্লোক নিত্য মুখস্থ কর্‌বে। পাঠ কমায়ে নাম বেশী কর্‌বে। নাম কর্‌তে কর্‌তে অবসাদ বোধ হলে অধ্যয়ন কর্‌বে।

৩। কারও অগ্নিপক্ক কোন বস্তু খাবে না। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মাত্র ভিক্ষা কর্‌বে। গুরুভ্রাতাদের বাড়ীতেও ইচ্ছা হ'লে ভিক্ষা কর্‌তে পার—তাতে কোন বিচার নাই।

৪। অর্থ কারও নিকট প্রার্থনা কর্‌বে না। এ বিষয়ে সহোদর ভ্রাতাদেরও অন্যান্যের মতই মনে কর্‌বে: অর্থ বা অন্য কোন বস্তু সঞ্চয় কর্‌বে না।

৫। বাক্য সংযম কর্‌বে। কারও প্রতিবাদ কর্‌বে না। সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ কর্‌বে। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌বে। শ্বাস প্রশ্বাসে নাম কর্‌বে।

৬। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পরে গায়ত্রী সহস্রবার জপ কর্‌বে। যেমন বলা গিয়াছে, বিধিমত প্রতিদিন ন্যাস ও পূজা কর্‌বে। শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা ও গুরুগীতা পাঠ কর্‌বে।

ঠাকুর একদিন রাত্রে বলিলেন—**আমার দু'টি কথা ধরিয়া থাক তাতেই সমস্ত লাভ হবে। বীর্য্যধারণ ও সত্যকথা। এই দু'টি প্রতিপালন কর্‌লে নিশ্চয়ই একদিন ভগবানের কৃপা লাভ কর্‌বে। সত্য বল্‌তে হলেই বাক্যসংযম কর্‌তে হয়। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি হ'লেই বীর্য্য আপনা আপনি স্থির হয়ে আস্‌বে।**

গুরু-শিষ্যে দেবাসুর সংগ্রাম। মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যম্।

ঠাকুরের এতগুলি আদেশের মধ্যে দু পাঁচটিও আমি আজ পর্য্যন্ত অবাধে যথাযথ রক্ষা করিতে পারি নাই। অনিবার্য্য কারণেই যে এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাও বলিতে পারি না। কিছুকাল কোন একটি আদেশমত চলিয়া একটা ভাল অবস্থা লাভ হইলেই ঐ অবস্থার সম্ভোগে, মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তখন আর আদেশ রক্ষার দিকে একেবারেই মনোযোগ থাকে না। আবার মনোযোগ করিলেও ভাবি, কোন অবস্থাই তো ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না। কিন্তু ঠাকুরের কৃপা অহৈতুকী, সাধন ভজন তপস্যা, এসবের কিছুরই অপেক্ষা করে না। সর্ব্বনিয়ন্তা ঠাকুর যাহাতে তাঁহার কৃপার দিকে সাধকের দৃষ্টি না পড়ে, শুধু সেই জন্যই সাধন ভজন তপস্যাকে অসাধারণ অবস্থা লাভের নিমিত্ত করিয়া, এক বিষম কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুরের উপর বিশ্বাস ভক্তি একবার জন্মিলেও তাহা কিছুকাল পরে থাকে না কেন, জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছেন—**তোমাদের চেষ্টা থাক্‌বে পুনঃ পুনঃ গড়ন ও স্থাপন। আর আমার চেষ্টা থাক্‌বে তাহা ভাঙ্গন।** এখন দেখিতেছি, ইহা লইয়াই সারাজীবন এইভাবে গুরু-শিষ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়াছে। কখনও হাত-পা ভাঙ্গিয়া নিরাশ হইয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি, আবার নিয়ম পালনে একটু

কৃতকার্য্য হইলেই ফললাভে নিজকে প্রধান ভাবিয়া অভিমানবশে দম্ভ করি। এই দম্ভের পরই ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁর কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতে আবার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। যতদিন কায়মনোবাক্যে একান্ত কাতরভাবে ঠাকুরের শরণাপন্ন ও অনুগত না হই, তাঁহাকেই অনন্যশরণ, একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করি, ততদিন কিছুতেই আর এই দণ্ডাঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কোন নিয়ম প্রণালী প্রতিপালনে কিংবা শত যত্ন চেষ্টা করিয়াও কখনও কোন প্রকার স্থায়ী ফললাভ হয় না, যদি তাহা গুরুর মুখ হইতে আদেশ বা উপদেশরূপে বাহির না হয়। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—"মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং" যে মন্ত্র স্মরণে জীব উদ্ধার হইয়া যায়, সেই মন্ত্রের মূলই গুরুর বাক্য। আদেশ-উপদেশ ও মন্ত্র এ সমস্তেরই মূল অর্থাৎ জীবনীশক্তি একমাত্র ঐ গুরুবাক্যে। শ্রীগুরু-মুখনিঃসৃত না হইলে, মন্ত্রে জীবোদ্ধারের শক্তি সঞ্চারিত হয় না। গুরুর বাক্যই গুরুশক্তি। গুরুর বাক্য ধরিয়া থাকিলেই গুরুর সহিত সম্পূর্ণ যোগ থাকে। শিষ্যের নিকটে গুরুর বাক্যে লঘুগুরু তারতম্য বা ইতর বিশেষ নাই; সমস্তই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সমফলদায়ক। সদ্‌গুরুর বাক্যই সার। তাঁর বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নয়। এই নরাধমকে তিনি যে দয়া করিয়া বহু আশা দিয়াছেন, কেবল তাহাই একমাত্র ভরসা। ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বিশ্বগুরু ঋষিরাও বারংবার বলিয়াছেন—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে।
বিকশতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।।

পশ্চিমাকাশে সূর্য্যোদয়, গিরিশৃঙ্গে পদ্মের উদ্ভব, পর্ব্বতের প্রচলন এবং বহ্নির শীতলতা সম্ভব হইলেও সজ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। সজ্জন অর্থে ভগবজ্জন, সদ্‌গুরুর বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নয়, ইহা বিশ্বাস হইলেই ত সব হইল। ভগবান্ গুরুদেব দয়া করিয়া এই শুভামতি দিন যেন আর কখনও তাঁর বাক্যে দ্বিধা বুদ্ধি বা সংশয় না জন্মে। এখন হইতে আবার ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি উৎসাহের সহিত যথামত প্রতিপালন করিব, স্থির করিলাম। এজন্য যদি আমাকে লোকালয় ছাড়িতে হয় এবং সেজন্য ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া পাহাড় পর্ব্বতেও যাইতে হয়—তাহাও আমি স্বচ্ছন্দে করিব।

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ—শ্রীগুরুর ধ্যানকে কল্পনা বলে না।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**আমাদের এই সাধনে কোন প্রকার কল্পনা নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন্ রূপে কখন্ কার নিকটে প্রকাশ হবেন, কে বল্‌তে পারে? ভগবানের নাম**

কর। নাম কর্‌তে কর্‌তে যেরূপে তিনি প্রকাশ হবেন, তাই ধরে নিবে। পূর্ব্ব হতে কোন রূপের কল্পনা কর্‌তে নাই।

আবার এইরূপও বলিয়াছেন—**ভগবানের রূপের অন্ত নাই। কখন্ কোন্ রূপে তিনি কার নিকট প্রকাশ হন্, কিছুই বলা যায় না। যখন যেরূপেই তিনি প্রকাশ হন না কেন, ভক্তি কর্‌বে। কিন্তু কোন রূপেই বদ্ধ হবে না। নাম কর্‌তে কর্‌তে তাঁর অনন্তরূপের প্রকাশ হ'তে থাকে—শুধু একটি রূপ ধরে থাক্‌লে হবে কেন?**

ধ্যান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সর্ব্বশেষ ঠাকুর বলিযাছেন—**ভগবান্‌কে আর কে দেখ্‌তে পায়। গুরুই ভগবান্। নাম কর্‌তে কর্‌তে গুরুর ভিতর দিয়া ভগবানের অনন্তরূপ, অনন্ত বিভূতি বিকাশ পেতে থাক্‌বে।**

ঠাকুরের এ কথায় এই বুঝিয়াছি যে—কোন রূপের ধ্যান করিতে হইলে, গুরুর মূর্ত্তিই ধ্যান করিতে হয়। কাবণ সদ্‌গুরু হইতেই ভগবানের যাবতীয় রূপের প্রকাশ। এই জন্য ভগবান্ সদাশিবও বলিয়াছেন—"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ।" আর যখন তখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ধ্যানশূন্য মনে নাম করিতে করিতে শ্রীগুরুর রূপই অন্তরে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে, কিছুতেই তাহা ছাড়ান যায় না। সুতবাং, আমি সদ্‌গুরুর সচ্চিদানন্দ রূপই ধ্যান করি। কিন্তু গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ প্রায়ই আমাকে বলেন—"তুমি কল্পনার উপাসনা কর। গুরুর রূপ ধ্যান ইহাও কল্পনা। কারণ গুরুর রূপও এক প্রকার থাকে না—পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অনিত্য।"

গুরুভ্রাতাদের কথায় আমার মনে খট্‌কা জন্মিল। আমি যাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া তো ভগবান্ পূর্ণ; প্রতি অণুপরমাণুতেও কি তিনি পূর্ণরূপেই আছেন?

ঠাকুর—**হাঁ। প্রতি অণুপরমাণুতেও তিনি পূর্ণ রূপে অবস্থান কর্‌ছেন।**

পূর্ণের অংশও পূর্ণ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ব্রহ্ম পূর্ণ, এই কার্য্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই জগতের প্রকাশ হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ সেই পূর্ণব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, কেবলমাত্র পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে।

আমি—তা হ'লে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো প্রতি অণুপরমাণুতে রহিয়াছে।

ঠাকুর—**হাঁ। প্রতি অণুপরমাণুর ভিতরে যে ভগবান্ আছেন, তাঁর ভিতরে সমস্তই রহিয়াছে।**

আমি—তা হ'লে আমার নখাগ্রে ভগবানের পূর্ণ অধিষ্ঠান বলিয়া কলিকাতা সহরটিও আছে, এরূপ যদি চিন্তা করি, তাহা কি মিথ্যা কল্পনা হইবে?

ঠাকুর—**না, ওকে কল্পনা বলে না।**

আমি—সমস্তই তো পরিবর্ত্তনশীল। পূর্ব্বে গুরুর একপ্রকার রূপ দেখিয়াছি, এখন আবার তাহারই অন্যপ্রকার রূপ দেখিতেছি। এখন পূর্ব্বের রূপ ধ্যান করিলে তাহা কি কল্পনা হইবে?

ঠাকুর—**প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের সমস্ত রূপই ভগবানে নিত্যরূপে রয়েছে। ওরূপ ধ্যান কল্পনা নয়। অসত্যেরই কল্পনা। যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা কখনও হয় নাই, যেমন 'আকাশকুসুম', 'ঘোড়ার ডিম।' সত্য বস্তুর চিন্তাকে ধ্যান বলে, তাহা কল্পনা নয়।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না; কোন্ কথায় কি বলিয়া, শেষকালে আবার বিষম বিপদে পড়িব। মনে মনে প্রশ্ন আসিল—সদ্‌গুরু তো নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্! তা বলিয়া কি 'রামাশ্যামা' গুরুকেও ভগবান্ ভাবিতে হইবে?

এই প্রশ্ন আর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। আমার পক্ষে অনাবশ্যক, বিশেষতঃ ইহার মীমাংসা ইতিপূর্ব্বেও বহুবার শুনিয়াছি।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**অগ্নি সর্ব্বত্র থাক্‌লেও, সেই অগ্নিদ্বারা যেমন কোন কার্য্য হয় না—তাহা কেহ পায় না;—অগ্নির আবশ্যক হ'লে যে স্থানে উহার বিশেষ প্রকাশ—চুল্লী, প্রদীপ প্রভৃতি হ'তেই তা গ্রহণ কর্‌তে হয়, সেই প্রকার ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হলেও তাঁকে লাভ কর্‌তে বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁর উপাসনা কর্‌তে হয়। ঋষিরা আটটি স্থান নির্দ্দেশ করেছেন—গুরু, সূর্য্য, শালগ্রাম, অগ্নি, জল, আত্মা, পিতা, মাতা—এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী। চক্‌মকিতে লৌহ ঘর্ষণে যেমন সহজে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঐ সব স্থানে ভগবদ্‌ধ্যানেও সেই প্রকার ইষ্টবস্তু খুব সহজে প্রকাশিত হন। পিতা- মাতা, স্বামী যেমনই হউন না কেন, প্রত্যক্ষ দেবতা মনে ক'রে, তাঁদের সেবাপূজা করা কর্ত্তব্য; প্রতি কার্য্যে তাঁদের অনুগত হ'য়ে চল্‌তে হয়। গুরু সম্বন্ধেও শিষ্যের সেই প্রকার। ভগবৎ জ্ঞানে গুরুর সেবাপূজা কর্‌তে হয়। অবিচারে তাঁর আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে হয়। ভগবান্‌কে লাভ কর্‌তে ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। ইহা ঋষিদের ব্যবস্থা।**

গুরু যেমনই হউন না কেন, অকপটে তাঁর সেবাপূজা ও শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া এবং অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করিয়া, শিষ্য যে সিদ্ধিলাভ করেন এদেশে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্বামীও যেমনই হউক না কেন, স্ত্রী পতিব্রতা হইলে তাঁহার অসামান্য জীবন সমস্ত স্ত্রীজাতির আদর্শ হয়।

দৃষ্টিসাধন, পঞ্চভূত এবং জ্যোতিঃ সারূপ্য—নাম সাধন।

মধ্যাহ্নে আমতলায় ভাগবত পাঠান্তে ঠাকুরের নিকটে যখন বসিয়া থাকি বড়ই আরাম পাই, সময় কি ভাবে চলিয়া যায় বুঝিতে পারি না। ঠাকুর ধ্যানস্থ থাকেন। আমি ঠাকুরের স্নিগ্ধ পবিত্র মনোহর মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া নাম করিতে থাকি। এই সময়ে প্রত্যেকটি নাম একটা সারবান বস্তু বলিয়া অনুভব হয়। নামস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের রূপ অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোহর হয়। উত্তরোত্তর উহার মাধুর্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। আজকাল প্রতিদিনই নানাপ্রকার চক্রদর্শন হইতেছে। কোন্ সূত্র ধরিয়া উহা কোথা হইতে উদ্ভূত, কিছুই বুঝিতেছি না। অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক শুভ্র তারে এই সকল চক্র অঙ্কিত। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ, অষ্টকোণ বা দ্বাদশকোণ চক্রও দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটিরই মধ্যস্থল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু মেলিয়া বা বুজিয়া ঠিক্ একই প্রকার দর্শন হয়। ইহা কি দৃষ্টিসাধনের ফল, না, নামেরই পরিণাম—বুঝিতেছি না। একই ভূতে দৃষ্টিসাধনের ফলে বহু রঙ্গের অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শন হইতেছে। দৃষ্টি সাধন সম্বন্ধে ঠাকুরকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। অবসর পাইয়া বলিলাম—শুনিয়াছি পঞ্চভূতেই দৃষ্টিসাধন করিতে হয়। কি অবস্থা হইলে একটির পর আর একটি ধরিতে হয়?

১৫ই—৩০শে ফাল্গুন।

ঠাকুর—**গুরুর আদেশ ব্যতীত এ সব কখনও কিছু কর্‌তে নাই, বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে। দৃষ্টিসাধন প্রথমে বৃক্ষে। বৃক্ষে যখন অনায়াসে, অনিমেষে, বিনা অশ্রুপাতে একঘণ্টাকাল এক বিন্দুতে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে পার্‌বে তখন আকাশে অভ্যাস কর্‌বে। নীল আকাশে একটি স্থানে দৃষ্টি স্থির কর্‌তে হয়। অর্দ্ধঘণ্টাকাল আকাশে দৃষ্টি স্থির হ'লে, স্রোতোজলে। স্রোতোজলে একঘণ্টা অভ্যস্ত হ'লে, নির্ব্বাতস্থানে ঘৃতের প্রদীপ রেখে তাতে দৃষ্টি স্থির কর্‌তে হয়। অন্ততঃ দু'ঘণ্টাকাল দীপে অভ্যাস হ'লে সূর্য্যে আরম্ভ কর্‌বে। সূর্য্যোদয় হ'তে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সূর্য্যে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌বে। কিন্তু সম্পূর্ণ বীর্য্যধারণ না হ'লে সূর্য্যে দৃষ্টিসাধন কর্‌তে নাই—অনিষ্ট হয়। এজন্য গৃহস্থদের নিষেধই আছে।** এই প্রশ্নে ঠাকুর আমাকে দৃষ্টিসাধনের ক্রম ও প্রণালী পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—**বলিলেন—খুব সাবধানতার সহিত বিশেষভাবে গুরুর নিকটে সঙ্কেতটি জেনে নিয়ে তবে এই ত্রাটক সাধন কর্‌তে হয়।**

আমি—কোন্ ভূতের কিরূপ জ্যোতিঃ? এক ভূতেও তো নানা রকম জ্যোতিঃ দেখা যায়?

ঠাকুর—**ক্ষিতির জ্যোতিঃ পীতবর্ণ। অপের জ্যোতিঃ শুভ্রবর্ণ। তেজের লাল। মরুতের জ্যোতিঃ নীল এবং ব্যোমের জ্যোতিঃ নবজলধর গাঢ় কৃষ্ণসংযুক্ত নীলবর্ণ।**

আমি—এই সকল জ্যোতিঃ কোনটি কোন গুণের? কোনটিই বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

ঠাকুর—**অপ জ্যোতিঃ শুভবর্ণ—সাত্ত্বিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তেজের জ্যোতিঃ লাল, রজোগুণী। মরুতের জ্যোতিঃ নীল—রজঃ-সত্ত্ব। ব্যোমজ্যোতিঃ—তমঃ-সত্ত্ব। কিন্তু প্রত্যেকটি ভূতেই দৃষ্টিসাধন কালে সকল জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে দর্শন হয়।**

আমি—নাম করিতে করিতে এমন অবস্থা হয় যে, দেহের প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত নাম করে? একটি রূপ চিন্তা করিতে করিতেও নাকি সেইরূপই হইয়া যায়?

ঠাকুর—**নাম কর্‌তে কর্‌তে এমন অবস্থা হয় যে, শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু, প্রতি অণু পরমাণু নাম করে। এ কল্পনা নয়—প্রত্যক্ষ সত্য। এ অবস্থায় মহাত্মারা বস্ত্রদ্বারা দেহ আবরণ করে রাখেন, গায়ে বিভূতি মাখেন। যেরূপ ধ্যান করা যায়, ধীরে ধীরে দেহটিও ক্রমে সেইরূপই হয়।**

আমি—বাহিরের কোন অনুষ্ঠান দ্বারা কি বীর্য্যপাত বন্ধ করা যায় না?

ঠাকুর—**সর্ব্বদা যোনিমুদ্রা ক'রে বস্‌তে পার্‌লে বীর্য্যপাত বন্ধ হয়।**

আমি—এই সাধন যাঁহারা পেয়েছেন সকলেই কি দৃষ্টিসাধন ও যোনিমুদ্রা কর্‌তে পারেন?

ঠাকুর—**হাঁ, খুব পারেন।**

এইছা দিন নেহি রহেগা।

আসন-কুটীরে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া যখনই বসি, দেওয়ালে ঠাকুরের স্বহস্তে লেখা—'এইছা দিন নেহি রহেগা' চক্ষে পড়ে। অম্‌নি মনে হয়, এই কথা ঠাকুর আমারই জন্য লিখিয়া রাখিয়াছেন। বুঝি এই শুভদিন বেশী দিন আর আমার ভাগ্যে নাই। স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। দুরাদৃষ্টবশতঃ নিয়ত তাঁর সঙ্গ করিয়াও তাঁকে চিনিলাম না। মুহূর্ত্তমাত্র যাঁহার সঙ্গ পাইতে ঋষি-মুনি, দেব-দেবীরাও লালায়িত, তাঁহাকে নিয়ত নিকটে পাইয়াও আদর, যত্ন বা মর্য্যাদা করিতে পারিলাম না। ভগবান্ কতবারই তো অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁর মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ না হইলে সাধারণতঃ কেহই তাঁহাকে ঠিক্‌ভাবে বুঝিতে বা জানিতে পাবে নাই। অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁর ভক্ত সঙ্গীরা শেযে—'হায়! কি বস্তু হারাইলাম!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ দিন পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া কাটাইয়াছেন। এবার আমার অদৃষ্টেও বুঝি তাহাই ঘটিবে! এখন আমার কি সুখের দিনই যাইতেছে, ঠাকুরের এই দুর্ল্লভ সঙ্গ কতকাল আর পাইব! কর্ম্মবিপাকে কোন দিন, কোন সময় কোথায় গিয়া যে পড়িব, কিছুই তো নিশ্চয় নাই; সুতরাং সময় থাকিতে এখন প্রাণ ভরিয়া আমার ঠাকুরকে দেখিয়া লই। এই ভাব মনে আসাতে মনটিকে আমার

এতই ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে, কান্নার বেগ কিছুতেই আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠাকুরের সম্মুখেই শব্দ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। একান্তপ্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করিলাম— "ঠাকুর! তোমাতে ঐকান্তিক ভালবাসা দেও, আর অবিচ্ছেদে যেন তোমার সঙ্গলাভ করি, দয়া করিয়া শুধু এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।" এই সময়ে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি ধ্যানস্থ। তাঁর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়াছে, অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; মাঝে মাঝে এক একবার মাথা তুলিতেছেন, আবার ঢলিয়া পড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। আমিও বেলা অবসান দেখিয়া তখন রান্না করিতে চলিয়া আসিলাম।

শ্রীধরের সহিত ঝগড়া—ভাগবতে কালির দাগ। পাহাড়ে যাইতে আদেশ।

সকাল বেলা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্থিরভাবে আসনে বসিয়া আছি, অকস্মাৎ শ্রীধর আমার রাশিতে ভাব হইলেন। চোখ বুজিয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে আমাব সম্মুখে আসিলেন, এবং আমার হোমের ঘৃতেব বোতলটি হাতে লইয়া প্রজ্বলিত হোমাগ্নির উপরে তাহা একেবারে উপুড় করিয়া ধরিলেন। ঘৃত সংযোগে সহসা অগ্নি 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন চোখ মেলিয়া দেখি, শ্রীধর চঞ্চলনেত্রে ঘন ঘন আমাব দিকে তাকাইতেছেন—আর প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ঢালিবার জন্য ব্যস্ততার সহিত দু'হাতে বোতলটি ধরিয়া খুব ঝাঁকাঝাঁকি করিতেছেন। আমি 'একি একি' বলিয়া বোতলটি ধরিয়া ফেলিলাম।

শ্রীধর. "দ্যাখ্, ঐ আগুন দ্যাখ্, ঐ আগুন দ্যাখ্" বলিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলেন। আমার ১৫ দিনের হোমের ঘি এই ভাবে ২।৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই শ্রীধর সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া, মাথাটা আগুন হইয়া উঠিল। খুব উত্তেজিত হইয়া শ্রীধরকে বলিলাম—একি! কি করলে! হাত দু'খানা এখন মুচ্‌ড়ে ভেঙে দি! সাহস তো বড় কম নয়! শ্রীধর কহিলেন—কেন ভাই! কি দোষ দেখ্‌লে যে হাত ভাঙ্‌বে?

আমি—আর দোষ কাকে বলে? অত্যন্ত গুরুতর দোষ! আমার ঘি আমাকে না ব'লে তুমি কোন্ আক্কেলে সমস্তটা আগুনে ঢাল্‌লে?

শ্রীধর—বল্‌লে কি আর তুমি দিতে পার্‌তে? অগ্নিদেবকে ঘৃত ভক্ষণ করালাম—তা দোষ হলো?

আমি—আমার এত পরিশ্রমের সংগ্রহ এই খাঁটি হোমের ঘিটুকু তুমি শুধু শুধু আগুনে

পোড়ালে, এ দোষ না তো কি?

শ্রীধর—ওহে! স্বার্থ বুদ্ধিতে কিছু কর্‌লেই দোষ? তুমি স্বার্থের জন্যই হোম কর, আগুনে ঘি ঢাল। আমি তো আর তা কবি নাই! আমার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব। তখন আর আমি শ্রীধরের কথা সহিতে পারিলাম না। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—ভাল চাও তো এখনো বল্‌ছি চুপ কর — না হলে মার খাবে, হাতে হাতে নিঃস্বার্থ ফলটি পাবে।

শ্রীধর—"বেশ, এই চুপ করি" বলিয়া চোখ বুজিলেন। শ্রীধরের এই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্যেব ভাব দেখিয়া বিষম রাগ হইল। মারিব বলিয়া ক্রোধভরে হাত দেখাইতে যেমন হাতখানা সজোরে নাড়া দিলাম, হঠাৎ অমনি তাহা সম্মুখস্থ কালির দোয়াতে গিয়া লাগিল। দোয়াতে কালি ছিটিয়া গিয়া আসনময় একাকার হইল, এবং খানিকটা কালি গিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের মার্জ্জিনে পড়িল। যথাসাধ্য ঐ কালি গামছা দিয়া উপর উপর পুঁছিয়া রাখিলাম। অমন সুন্দর নূতন ভাগবত খানির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে ভারি কষ্ট হইতে লাগিল।

বেলা প্রায় ১টার সময় আর আর দিনের মত ভাগবত পাঠ করিতে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আজ কুটীরে বসিয়া আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর ভাগবতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—**ও কি?**

আমি—হঠাৎ দোয়াত পড়িয়া গিয়া খানিকটা কালি লাগিয়াছে। ঠাকুর যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—**ভাগবতে কালির দাগ!** পাছে আর কোন প্রশ্ন করেন, ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। কি ভাবে কালি পড়িয়াছে কিছুই বলিলাম না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া রহিলাম, এবং পাখা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে কয়েকটি গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামী হরিমোহনের উপরে কটাক্ষ করায় ঠাকুরের বিরক্তি ও শাসন।

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথায় কথায় কোন্ কোন্ গুরুভ্রাতাব সাধনপথে কি কি বিঘ্ন বলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমার সম্বন্ধে বলিলেন—**এর একটু প্রতিষ্ঠার ভাব আছে। এইটুকু যদি না থাক্‌তো এতদিনে খুব সুন্দর অবস্থা লাভ কর্‌ত।** গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে ঠাকুর আমাকে এইরূপ বলিলেন শুনিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। কষ্টও হইতে লাগিল। ভাবিলাম—ঠাকুর প্রতিষ্ঠার ভাব আমার ভিতরে কি দেখিলেন? আমি তো কিছুই খুজিয়া পাই না। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কখন কি করিয়াছি কিছুই তো স্মরণ হয় না। পাছে আমার ভিতরে প্রতিষ্ঠার ভাব আসে, সেই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর আমাকে সতর্ক করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, যদি প্রতিষ্ঠার ভাবই আমার ভিতরে না থাকিবে, তাহা হইলে গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে আমার দোষের কথা ঠাকুরের মুখে

শুনিয়া, আমি এমন লজ্জিত ও দুঃখিত হই কেন? ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি এই প্রতিষ্ঠার ভাব কি প্রকারে ত্যাগ কর্‌ব?

ঠাকুর—**তুমি আর কি? কত বড় বড় লোক এই প্রতিষ্ঠার ভাব ছাড়াতে পার্‌ছেন না। শ্বাসে শ্বাসে নাম কর— সমস্ত দোষই ওতে কাট্‌বে। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠার ভাব একটি রোগ—এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হয়।**

একটু থামিয়া ঠাকুর আমাকে আবার বলিলেন—**তুমি গিয়ে কিছুকাল পশ্চিমে থাক না? উপকার পাবে।**

আমি—আপনার সঙ্গ ছেড়ে আমার কোথাও থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। স্বামী হরিমোহনের মত একবার যাওয়া আর একবার আসা—এরূপ বৈরাগ্য করে লাভ কি?

ঠাকুর আমার কথায় হরিমোহনের উপর কটাক্ষ শুনিয়া, খুব বিরক্তির সহিত ধমক্ দিয়া বলিলেন—**স্বামীজীকে সামান্য মনে ক'রো না। তোমাকেও তাঁর মত অনেকবার যাওয়া আসা কর্‌তে হবে। বৈরাগ্য লাভ কর্‌তে, শান্ত অবস্থা পেতে এখনও ঢের দেরী।** ভাগবত দেখাইয়া বলিলেন—**এই কালির দাগ তুল্‌তে বহুকাল যাবে। এখন হয়েছে কি?**

ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া, আমি অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলাম। কোন কথা না বলিয়া, শঙ্কিত, বিষণ্ণ মনে চুপ করিয়া রহিলাম। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—**সর্ব্বদা বিচার ক'রে চল্‌বে। যাতে অভিমান হয় এমন কিছুই কর্‌বে না। কোন বিষয়েরই অনুকরণ কর্‌বে না। প্রত্যেকটি বস্তু গ্রহণে, রক্ষণে ও ত্যাগে সর্ব্বদা বিচার চাই। যার উদ্দেশ্য ভগবান্ নন্, তা যাই হ'ক্ না কেন, দূরে নিক্ষেপ কর্‌বে। যা তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তা কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে নাই। যাতে প্রতিষ্ঠা হয়, তা বিষবৎ ত্যাগ কর্‌বে। জটা, মালা, তিলকাদি যা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাতেও যদি অভিমান জন্মে, প্রতিষ্ঠার হেতু হয়, তৎক্ষণাৎ দূর ক'রে ফেল্‌বে। এ সব বিষয়ে নিয়ত দৃষ্টি না রাখ্‌লেই বিপদ। ধর্ম্মাভিমান বড় ভয়ানক। অন্য অপরাধের পার আছে, কিন্তু এই ধর্ম্মাভিমানের পার নাই। যত প্রকার অভিমান আছে, তার মধ্যে ধর্ম্মের অভিমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। সাবধান থেকো। সাধন, ভজন, তপস্যা, অধ্যয়ন, কথাবার্ত্তা, বেশভূষা যে কোন বিষয়ে অভিমান বা প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আস্‌বে—বিষম রোগ মনে ক'রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্‌বে।**

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কহিলেন—**এখন পশ্চিমে কোন স্থানে গিয়ে সাধন কর। কাশীতে বা চিত্রকূটে গিয়ে থাক, উপকার হবে।**

আমি বলিলাম—পশ্চিমে যে কোন স্থানে থাক্‌লেই হবে?

ঠাকুর—**হাঁ; দু'মাস চারমাস ক'রে এক এক স্থানে থেকে, স্বাধীনভাবে সাধন ভজন কর্‌লে বেশ উপকার পাবে। তাই কর।**

আমি—আমার কল্যাণের জন্য যেখানে যেয়ে থাক্‌তে বল্‌বেন, সেখানেই যাব। তবে আমার আপনার কাছেই থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। আপনার নিকটে থাকায় বেশী উপকার—আমার এই ধারণা।

ঠাকুর —**তা কিছু নয়। এখন নিকটে না থেকে, দূরে থাক্‌লেই তোমার বরং বেশী উপকার হবে। নিকটে, দূরে কিছু নয়।**

ঠাকুরেব এসব কথার পর আমি পশ্চিমেই যাইব স্থির করিলাম।

কালির দাগে চণ্ডী পাহাড়। বিস্ময়কর চিত্র—ভগবদ্ বিধান।

সকাল বেলা উঠিয়া কোন প্রকারে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলাম। প্রাণে দারুণ ক্লেশ হইতে লাগিল। এতকাল সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, ঠাকুর আমাকে কি এবার নির্ব্বাসন দিলেন? মনঃকষ্টে অনেকক্ষণ আসনে পড়িয়া রহিলাম। মধ্যাহ্নে যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। এক অধ্যায়ের অধিক আজ আর ভাগবত পাঠ কবিতে পারিলাম না। খুব কাঁদিতে লাগিলাম। ঠাকুর মগ্ন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া, সস্নেহে আমাব পানে তাকাইয়া বলিলেন—**তোমার ভাগবতখানা দেও ত।** আমি ভাগবতখানা ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর একদৃষ্টে সেই কালির দাগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—**দেখেছ? কি সুন্দর পাহাড়। কাল তো এমনটি দেখি নাই। সুন্দর একটি পাহাড়ের চিত্র হয়েছে। অতি চমৎকার। পাহাড়টির নীচে একটি নদী, পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপরে একটি সুন্দর মন্দির। মন্দিরের চূড়ার ধ্বজাটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার উঠেছে।** কিছুক্ষণ চিত্রটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কুঞ্জবাবু প্রভৃতিকে বলিলেন—**দেখ, কি সুন্দর পাহাড়ের চিত্র।** সকলেই দেখিয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর আমাকে কহিলেন—**এরূপ পাহাড় যেখানে দেখ্‌বে—সেখানেই আসন কর্‌বে। এখন যেভাবে চল্‌ছ ঠিক সেইভাবেই চল্‌বে। কাহারও কথায় বিচলিত হ'য়ো না।**

কুঞ্জবাবু—যথার্থই কি এইরূপ পাহাড় কোথাও আছে?

ঠাকুর—**হাঁ, ঠিক্ এইরূপ পাহাড়ই আছে। কাল তো এমনটি দেখি নাই। আজই এই পাহাড়ের চিত্র দেখ্‌ছি। আশ্চর্য্য।**

কুঞ্জবাবু—এরূপ পাহাড় কোথায় আছে?

ঠাকুর—**তা খুঁজে দেখ্‌লেই পাবে।**

কুঞ্জবাবু—ভারতবর্ষে হাজার হাজার পাহাড় আছে। ছেলে মানুষ, কোথায় গিয়ে ঘুর্‌বে, খুঁজে

বার কর্‌তেই কত কাল যাবে। পাহাড়টি কোথায় ব'লে দিন। আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতারা সকলেই ঠাকুরকে আমার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর পাহাড়টি কোথায়, পাহাড়ের নাম কি, সহজে বলিতে চাহিলেন না। পরে অনেক সাধ্যসাধনা ও অনুরোধের পর কহিলেন—**হরিদ্বারে চণ্ডীপাহাড়। এই পাহাড়ে একে যেতে হবে বলেই এই চিত্র পড়েছে। গিয়ে উপকার হবে। দেখ, কোন সূত্রে কি হয়।**

আমি এ সকল কথা শুনিযা অবাক্ হইয়া গেলাম। ভগবানের বিধান বুঝিয়া মনের ক্লেশ দূর হইল, এবং পাহাড়ে যাইতে উৎসাহ জন্মিল।

ঠাকুর কহিলেন—**এখনও সেখানে শীত। এই মাসের পরে যেও।** মাতাঠাকুরাণীর অনুমতির জন্য ঠাকুর আমাকে বাড়ী হইয়া যাইতে বলিলেন।

পাহাড়ে যাইতে মায়ের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ।

মাতাঠাকুরাণীব অনুমতি লইতে বাড়ী আসিলাম। অবসরমত মাকে সমস্ত কথা বলিলাম। মা কহিলেন—এই অল্পবয়সে একাকী পাহাড় পর্ব্বতে থাক্‌বি কিরূপে? গোঁসাই তোকে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বেন মনে করেই, আমি তাঁর হাতে তোকে দিয়েছি। এখন সঙ্গছাড়া করে, এই বয়সে একা তোকে তিনি পাহাড় পর্ব্বতে পাঠাবেন? আমি বলিলাম—আমি যথার্থ ধর্ম্মলাভ করি, এই আকাঙ্ক্ষা যখন তুমি আমাকে তাঁর চরণে অর্পণ ক'রেছ, তখন যেখানে গিয়ে থাক্‌লে আমার কল্যাণ হবে, তাই তো তিনি ব্যবস্থা কর্‌বেন। ঠাকুর কখনও আমাকে সঙ্গছাড়া কর্‌বেন না। যেখানেই থাকি, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বেন। এখন প্রসন্নমনে, সন্তুষ্টভাবে তুমি আমাকে অনুমতি না দিলে আমার এদিক ওদিক দু'দিকই গেল।

মা বলিলেন—না না। গোঁসাই যখন বলেছেন—গুরুবাক্য, যেতেই হবে। তবে ছেলেমানুষ একাকী গিয়ে পাহাড় পর্ব্বতে কি ভাবে থাক্‌বি মনে হলে কষ্ট হয়।

আমি—পাহাড়ে আমার কোন কষ্টই হবে না। আমার সমস্ত ব্যবস্থাই গোঁসাই সেখানে ক'রে রেখেছেন। লোকালয় নিকটে আছে। ভিক্ষার অসুবিধা নাই। আহার প্রচুর জুট্‌বে। সে ভাবনা ক'রো না।

মা—আচ্ছা, সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় থাকিস্—মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিস্। গোঁসাই যেমন বলেন, তেমনই চল। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি পাইয়া, আমি ঢাকায় রওয়ানা হইলাম। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। মা সকলকে ধমক্ দিয়া কান্না থামাইলেন। বলিলেন—যাওয়ার সময়ে চোখের জল ফেল্‌তে নাই;

দুর্ল্লক্ষণ, এতে অমঙ্গল হয়।

মদনোৎসবে মহাবিষ্ণুর সঙ্কীর্ত্তন—ঠাকুরের আনন্দ। দীক্ষা।

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া দেখিলাম, আশ্রম লোকে পবিপূর্ণ। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে গুরুভ্রাতৃগণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উৎসাহ-আনন্দে সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া সকলেই ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ করিতেছেন। গেণ্ডারিয়ার ছেলেরা এবারও মাতাঠাকুরাণীর মন্দির পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিলেন। মা'কে বিবিধপ্রকারে সাজাইয়া আনন্দে মাতিলেন। ঠাকুরও ছেলেদের আনন্দে আনন্দ করিয়া, সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে সহর হইতে বহুলোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। জানি না কেন, আজ কীর্ত্তন তেমন জমিল না। সময়ে সময়ে ঠাকুর অস্বস্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাগলপুর হইতে মহাবিষ্ণুযতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিছানাপত্র আমার আসনের পাশে ফেলিয়া আমতলায় কীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং কুটীরের দ্বারে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন; ঠাকুরকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। দুই তিন মিনিট পরেই অবসর পাইয়া, বিষ্ণুবাবু নিজের রচিত মদনোৎসবের সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর গানের প্রথম চরণটি শুনিয়াই আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; এবং **জয় রাধে, শ্রীরাধে** বলিতে বলিতে আমতলায় আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মধুর নৃত্যে সকলেরই প্রাণে আনন্দ উৎসাহ সঞ্চার হইল। গুরুভ্রাতারা করতালি সংযোগে নৃত্য করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিষ্ণুবাবুর সহিত গাহিতে লাগিলেন—

চল লো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে মৃগমদে আজি সাজাব লো;
আজি মনসাধ সব মিটাব লো,
আজি প্রাণে প্রাণে বঁধু বাঁধিব লো।।
আয়লো ললিতে, চললো চম্পকা,
ডাকে প্রাণসখা আয়লো বিশাখা,
আয় শুক শারী, সব পরিহরি,
হরি সনে হোলি খেলিব লো।।
হাসি হাসি জোছনা রাশি,
ঢালে শশী প্রেম বিলাসী,
পিক কুহু বলে পবন দোলে,

ঐ শুন বাঁশী ডাকিছে লো।।
বকুল বেল যুথী মালতী,
চামেলী চাঁপা কনক জ্যোতি,
তুলি অতুল তমাল ফুল,
বঁধুয়ার গলে দিব লো।।
আয আয় যত আহিরী ঝিয়ারী
আবির চন্দন নে লো থালা ভরি,
ক্ষীর সর ননী বাঁধলো যতনে
গোপনে সেধনে খাওয়াবো লো।।
হাতে হাতে ধরি নাথে ঘেরি ঘেরি,
নাচিব গাহিব সব সহচরী,
মন প্রাণ ভরি হেরিব মুরারি,
গলা ধরি বামে দাঁড়াব লো।।
হরিদাস ভাসে নয়নের জলে,
লুটায়ে গোপীর চরণ তলে,
বলে ব্রজবালা সে চিকন কালা,
এইবার তোরে দেখাব লো।
(এই বার তোরে দেখাব লো।।)

আজ ঠাকুর মধুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন। বিবিধ প্রকারে অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে দেখিয়া, দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া পড়িল। এই সময়ে ঠাকুর এক একবার বিষ্ণুবাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। বহুক্ষণ পরে সঙ্কীর্ত্তন থামিল। কিন্তু গুরুভ্রাতাদের ভাবোচ্ছ্বাস আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে অনেকে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ দারুণ যন্ত্রণা প্রকাশ পূর্ব্বক হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঘন ঘন হাত নাড়া দিয়া—**গাও গাও মধুর করে গাও, মধুর করে গাও,** বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণুবাবু নৃত্য করিতে করিতে মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে.
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।
শুন ওহে বনমালী, আমরা ভাঙ্গবো তোমার নাগরালি,
কুঙ্কুম মারিব তোমার রাঙ্গা চরণে।।

এই সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে আবির, কুঙ্কুমাদি পড়িতে লাগিল। ঠাকুরের পদাশ্রিত সকলেই মনের সাধে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আবির ছুড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও—**জয় রাধে, শ্রীরাধে** বলিয়া প্রচুর পরিমাণে আবির সকলের গায়ে দিতে আরম্ভ করিলেন। মদনোৎসবের মধুর কীর্ত্তনে সকলেই আজ মাতোয়ারা। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত এইভাবে আনন্দ করিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আসিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—**আজ গান কর্‌লেন কে?** আমি অমনি বলিয়া ফেলিলাম—মহাবিষ্ণুবাবু ভাগলপুর হইতে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই গান করিলেন। ঠাকুর খুব সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—**কাল প্রাতেই তাঁর দীক্ষা হবে বলে দিও।** আমি বিষ্ণুবাবুকে দীক্ষার সংবাদ দিয়া, রাত্রি ১২টার সময়ে একরামপুর পঁহুছিলাম। সজনীর বাসায় উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ভোর বেলায় গেণ্ডারিয়া যাইতে বলিয়া আসিলাম। সজনীর দীক্ষার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি।

২৬শে ফাল্গুন, বুধবার।

প্রত্যুষে সজনী আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঠাকুরকে উহার দীক্ষা কথা বলায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—**তোমার দাদার অনুমতি আছে তো? অভিভাবকের অনুমতি ভিন্ন তো হয় না।** আমি বলিলাম—দাদা এতে আনন্দই কর্‌বেন। এখন আর তাঁর অনুমতি কিরূপে নিব?

ঠাকুর—**যাক তুমিও তো ওর অভিভাবক। তা তোমার অনুমতিতেই হবে।** এই বলিয়া মহাবিষ্ণুবাবুর সঙ্গেই সজনীর দীক্ষা হইবে বলিলেন। সজনী ও মহাবিষ্ণুবাবু নদীতে স্নান করিতে গেলেন। ঠাকুর চা সেবার পর উহাদের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—চা সেবার পর দীক্ষা হইবে শুনিয়া উহারা নিশ্চিন্ত আছে। ঠাকুর কহিলেন—**দীক্ষার একটা শুভ মুহূর্ত্ত আছে। সেই সময় অতীত হ'লে ঠিক্ হয় না।** এই কথা শুনিয়া আমরা ছুটাছুটি করিয়া উহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। বেলা প্রায় ৯টার সময়ে দীক্ষা হইল। ঠাকুর সাধারণতঃ যে নাম দিয়া থাকেন উহাদিগকে তাহা দিলেন না। সজনী যে নাম পাইল, আমাদের পরিবারের কেহ তাহা পায় নাই। এ পর্য্যন্ত তিনটি নাম আমাদের পরিবারে দিলেন। সজনীর দীক্ষাতে বড়ই নিশ্চিন্ত হইলাম।

মহাবিষ্ণুবাবুর সহিত ঝগড়া—সন্ধ্যা করিতে ঠাকুরের আদেশ।

মধ্যাহ্নে ভাগবতপাঠের পর ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, বিষ্ণুবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন নানা কথা প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু ইহারা কেহ সন্ধ করে না কেন? আপনি কি এদের সন্ধ্যা কর্‌তে নিষেধ করেছেন? লোকে ইহাদের সম্বন্ধে না· আলোচনা করে, শুন্‌তে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু তাদের কিছু বল্‌তে পারি না, কারণ ইঁহারা বলেন—সকলে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই—ঠাকুর সন্ধ্যা কর্‌তে বলেন নাই।

ঠাকুর—**কেন? সাধন দেওয়ার সময়ে প্রথমেই তো বলে দিই—দেশগত, সমাজগত ও কুলক্রমাগত রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি, সব বজায় রেখে সাধন পথে চল্‌বে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে চলা উচিত, সর্ব্বদাই তো বলি, ইহারা না মান্‌লে কি আর করা যায়? কথা মত কে আর চলে?**

আমি সন্ধ্যা করি না বলিয়া, বিষ্ণুবাবু ভাগলপুরে প্রায়ই আমার সহিত ঝগড়া করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যা না করা অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া আমাকে শাসাইতেন। এখন ঠাকুরের কথায় বল পাইয়া, তিনি আমাকে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী! তুমি সন্ধ্যা কর না কেন? ঠাকুর তো তোমাকে নিষেধ করেন নাই?" ঠাকুরের সম্মুখে বিষ্ণুবাবুর কথায় আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। কিন্তু বিষ্ণুবাবুর মুখ বন্ধ করিতে ঠাকুরেব কাছেই তর্ক আরম্ভ করিলাম। বলিলাম—সন্ধ্যা করি কি না, তুমি কিরূপে জান্‌লে? সন্ধ্যা তো মন্ত্র, তার মূল সদ্‌গুরুর বাক্য। ঠাকুরের আদেশ মতই চল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি, আর তুমি বল, আমি সন্ধ্যা করি না? কি রকম?

বিষ্ণুবাবু—তোমার উপনয়নকালে যে বৈদিক সন্ধ্যার উপদেশ হয়েছিল, তা তুমি কর?

আমি—সেই দীক্ষাকে তো আমি দীক্ষাই মনে করি নাই। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ক'রে, তাহা তো একেবারেই ত্যাগ করেছিলাম। তাই আবার ব্রহ্মচর্য্য নিয়াছি। এই ব্রহ্মচর্য্যে যাহা যাহা আদেশ, তাহাই যথাসাধ্য প্রতিপালনের চেষ্টা কর্‌ছি। আর তুমি অনায়াসে বল্‌ছ, আমি সন্ধ্যা করি না? তুমি তো ভয়ানক লোক দেখছি। আমাদের ঝগড়ায় চাপা দিয়া, ঠাকুর আমাকে বলিলেন—**উপবীত থাক্‌লেই সন্ধ্যা কর্‌তে হয়। সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য—নিত্যকর্ম্ম। প্রত্যহ সন্ধ্যা কর —উপকার পাবে।** ঠাকুরের এই কথা শোনা মাত্র আমাব মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। আমি বলিলাম—সন্ধ্যা টন্ধ্যা আমি কর্‌তে পাব্‌ব না। যা ব'লে দিয়েছেন তাই কর্‌তে পারি না, আবার সন্ধ্যা?

মহাবিষ্ণু—ওহে সন্ধ্যা না কর্‌লে পাপ হয়। সন্ধ্যা কর্‌তে এত ভয় কেন?

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তুমি চুপ কর। পাপ-পুণ্যের ধার ধারি না। সে বিচার কর্‌বাব কর্ত্তা একজন আছেন। গায়ত্রী জপেই সব হয়—জান?

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—**না, না, তুমি সন্ধ্যা করো। সন্ধ্যা কর্‌লে উপকার পাবে; শুধু গায়ত্রী জপে ঠিক্ হয় না।**

আমি—হাঁ, যত বোঝা পারেন, আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিন। যে সকল নিত্যকর্ম্ম আমাকে বেঁধে দিয়েছেন, তা ঠিকমত কর্‌তে শেষরাত্রি হ'তে বেলা আড়াই প্রহর লাগে। ইহার উপরে ত্রিসন্ধ্যা কর্‌তে হলে আমার দফা শেষ। আদেশ হ'লে তো কর্‌তেই হবে। ও সব আমাকে বল্‌বেন না।

ঠাকুর—**ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা নিতান্তই প্রয়োজন। সন্ধ্যা আহ্নিক কর, উপকার হবে।**

আমি—যে সময় ব'সে সন্ধ্যা কর্‌বো, সে সময়টা ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌লে তো আরও বেশী উপকার হবে?

ঠাকুর—**না সন্ধ্যা কর্‌লে ইষ্টনাম জপ করার মতই উপকার হবে।**

আমি—সন্ধ্যা করায় ইষ্টনাম জপ করার মত ফলই যখন হয়, তখন জপ কর্‌লেই তো হলো। আবার সন্ধ্যার প্রয়োজন কি?

ঠাকুর—**প্রয়োজন আছে। আমাদের এই সাধনে যে, লোকের শীঘ্র তেমন উন্নতি দেখা যায় না, তার হেতু, ক্ষেত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঋষিদের সময়ে আশ্রমানুযায়ী নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁরা ক্ষেত্রটি একেবারে পবিত্র ক'রে নিতেন। পরে এই পারমহংস ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌তেন। তাই ফলও খুব শীঘ্র লাভ হতো।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি 'কপালের ভোগ' মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে সময়ান্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম—অনেকেই বলে, গুরু নিজ হ'তে যদি কিছু বলেন, তা হ'লেই তাঁর আদেশ। লোকের কথায় যাহা বলেন, তাহা যথার্থ তাঁর আদেশ নয়। আমাকে সহস্রবার গায়ত্রীজপ কর্‌তে বলেছেন, আমি তাই করি। আমার মনে হয়, বিষ্ণুবাবুর কথায় সায় দিতে ওসব কথা আমাকে বলেছেন। যার পক্ষে যা নিতান্ত কর্ত্তব্য দীক্ষাকালেই তো বলেন। দীক্ষার সময় তো সন্ধ্যার কথা আমায় বলেন নাই?

ঠাকুর একটু বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—**খেয়ে আঁচাবে, হেগে শোচাবে, এসব কথাও কি দীক্ষার সময়ে বল্‌তে হবে? যে সকল অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম তা তো কর্‌বেই। প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ ক'রে না বল্‌লে কর্‌বে না? শাস্ত্র-সদাচার মত চল্‌বে, একথা তো বলাই হয়।**

আমি আর কিছু বলিতে সাহস পাইলাম না। ঠাকুরের আদেশমত অগত্যা সন্ধ্যা করিব স্থির করিলাম।

আমি—সন্ধ্যা না কর্‌লে কি কিছু হবে না? আমাদের মধ্যে কয়জন আর সন্ধ্যা করে?

ঠাকুর—**ব্রত ভিন্ন ভিন্ন। যাঁরা গৃহস্থ তাঁদের একপ্রকার; আর সারাজীবন যাঁরা ধর্ম্ম নিয়ে থাক্‌বেন তাঁদের অন্যপ্রকার। তোমার ধর্ম্ম নিয়েই জীবন যাপন কর্‌তে হবে। সুতরাং, নিত্যকর্ম্মের কিছুই তোমার বাদ দেওয়া চল্‌বে না। সন্ধ্যা কর্‌তে কোন কষ্ট নাই। কয়দিন একটু অভ্যাস কর্‌লেই হবে। পরে ওতে আরাম পাবে—উপকারও হবে।**

আমি বলিলাম—এতক্ষণ আমি বুঝি নাই। এখন মনে হইতেছে, সন্ধ্যার ব্যবস্থা আমার উপর করিয়া আমাকে বিশেষ কৃপাই করিলেন। অবিচ্ছেদে শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করা অত্যন্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, হয় না। কিন্তু পূজা-অর্চ্চনা, হোম-পাঠ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে অনায়াসে আরামের সহিত দিন কাটান যায়। এসকলে সময় অতিবাহিত করা ও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিয়া সময় ব্যয় করার ফল যদি ঠিক একই হয়, তবে এ সমস্ত কাজ দিয়া তো আমাকে বিশেষ কৃপাই করিলেন!

ঠাকুর—**হাঁ, যা ব'লেছি তাই গিয়ে কর। সন্ধ্যা, হোম, গায়ত্রী, পাঠ এসকল করায় তোমার নাম করার মতই উপকার হবে।**

আমি—সন্ধ্যায় তো নানাপ্রকার রূপ ধ্যান কর্‌তে হয়, আমি ওসব চতুর্ভুজ, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ ধ্যান কর্‌তে পার্‌ব না। ও সব আমার একেবারেই আসে না। আমি ইষ্টদেবতার রূপ অন্তরে রাখিয়া সন্ধ্যার মন্ত্রগুলি মাত্র আওড়াইয়া যাইব; এবং ওসব মন্ত্র আমার ঠাকুরেরই স্তব, তাঁরই রূপ বর্ণন মনে করিব। এরূপ কর্‌লেই হইবে তো?

ঠাকুর—**হাঁ, তাই করো। ওতেই হবে।**

আমি—শালগ্রাম ত আমার জুটিল না। যদি জুটিয়া যায়, কি প্রকারে অভিষেক ও পূজা করিব?

ঠাকুর—**গায়ত্রীজপে অভিষেক ও যথাশাস্ত্র প্রণালীমত তাঁর পূজা করো। শালগ্রামের পূজাপদ্ধতি কিন্‌তে পাওয়া যায়।**

আমি—শালগ্রাম কি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তে হবে, না একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখ্‌ব?

ঠাকুর—**শালগ্রাম সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌বে। ছোট কণ্ঠশালগ্রাম পাওয়া যায়। উহা কৌটায় করে সঙ্গে সঙ্গে রাখ্‌তে হয়। সাধুরা উহা গলার ভিতরে কণ্ঠায় রাখেন।**

আমি—শুনিলাম এবার নাকি আমার অনেক পরীক্ষা। চিম্‌টার বাড়িও নাকি অনেক খেতে হবে। চিম্‌টার বাড়ি খাওয়াইতে আর তফাৎ করিয়া দেন কেন? আপনিই তো চিম্‌টার বাড়ি মারিয়া সঙ্গে রাখিতে পারেন। আর আমি কি পরীক্ষা দেওয়ার মত হইয়াছি? আমাকে আবার পরীক্ষা কেন?

ঠাকুর—**আসনে স্থির থেকো, কোন ভয় নাই। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ কর্‌লেই চিম্‌টার বাড়ি খেতে হয়।**

আমি—পাহাড়ে থাকার যদি তেমন অসুবিধা হয়, তবে পাহাড়ের ধাবে থাক্‌তে পার্‌ব কিনা?

ঠাকুর—**খুব পার্‌বে। হরিদ্বারে গিয়ে যেখানে ভাল লাগ্‌বে, সেইখানেই থাক্‌বে। তাতেই পাহাড়বাস হবে।**

আমি—আপনাকে যদি দেখ্‌তে খুব ইচ্ছা হয়, তখন কি কর্‌ব?

ঠাকুর—**যখন তেমন ইচ্ছা হবে চ'লে আস্‌বে। মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্রও লিখ্‌তে পার্‌বে।**

আমি—হরিদ্বারে যাওয়ার খরচ কি এখান হ'তেই সংগ্রহ করে নিব?

ঠাকুর—**না, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাওয়ার ভাড়া এখান থেকে নিয়ে যেও। আর সমস্ত রাস্তায়ই জুটে যাবে।**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। হরিদ্বারে যাইতে অস্থিরতা আসিয়া পড়িল।

অভয় কবচলাভ। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ —ভয় নাই।

আজ শেষরাত্রে হরিদ্বার যাত্রা করিব সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুরকে জানাইলাম। ঠাকুর খুব আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটি ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছি ঠাকুরকে বলায়, তিনি উহা শুনিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম—পাহাড়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়া, আপনার শ্রীচরণে বিদায় নিতে যেমন নমস্কার করিলাম, আপনি একটি তাগা আমার দক্ষিণ বাহুতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন—**তোমাকে এই অভয় কবচ দিচ্ছি, পাহাড়ে পর্ব্বতে যেখানে ইচ্ছা গিয়ে থাক—আর কোন ভয় নাই।** আপনার এই আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—**বেশ দেখেছ, স্বচ্ছন্দে চলে যাও, কোন ভয় নাই।**

২৯শে ফাল্গুন, শনিবার।

গোয়ালন্দে সিপাহীর তাড়া! কুলীর ডিপোতে আটক থাকা। ঠাকুরের অদ্ভুত ব্যবস্থা।

আজ সারাদিন ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। ক্ষণে ক্ষণে ঠাকুর স্নেহ মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমাকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। আজ সমস্তটি দিন আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। আহারান্তে রাত্রি ১১টার সময়ে দক্ষিণের ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। শেষরাত্রে ঠাকুর আমাকে জাগাইতে যোগজীবনকে পাঠাইয়া দিলেন। যোগজীবনের ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম। শৌচাদি সমাপনান্তে ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধোলাইগঞ্জ ষ্টেসনে রওয়ানা হইলাম। চার পাঁচটি গুরুভ্রাতা আমার সঙ্গে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের 'কেলে' কুকুরটি তিন চার বার আসিয়া পায়ের উপর পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। 'কেলে' ষ্টেসন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। গাড়ীতে উঠিবার পরে 'কেলে' চীৎকার করিতে লাগিল। সকালবেলা নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিয়া গোয়ালন্দের স্টীমারে উঠিলাম। সন্ধ্যার পর গোয়ালন্দ উপস্থিত হইলাম। জিনিসপত্র লইয়া স্টেশনে নামিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এখন কোথায় যাই। আসন, ঝোলা, কম্বল, ঘটি লইয়া পাঁচ মিনিটও চলিতে পারি শরীরে এমন

সামর্থ্য নাই। এদিকে রিক্ত হস্ত, কুলীর সাহায্য লইবারও উপায় নাই। তা ছাড়া যাইবই বা কোথায়? ষ্টেসনের অনতিদূরে বিস্তৃত ময়দানের ধারে একটি বড় গাছ দেখিয়া তাহারই নীচে যাইয়া আসন করিয়া বসিলাম; এবং নিরুপায় হইয়া একান্ত প্রাণে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে একটি বিকটাকার হিন্দুস্থানী সিপাহী আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধমক্ দিয়া বলিল—"কোন্ হ্যাঁয় রে? ক্যাত্না মাল চুরি কিয়া?" আমি উহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সিপাহী আমাকে বলিল—"চল্—হামারা সাথ্ চল্।" আমি জিনিসপত্র ঘাড়ে লইয়া, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, এবং একটি প্রকাণ্ড কুলী ডিপোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সিপাহী আমাকে একটি কোঠার বারান্দায় রাখিয়া চলিয়া গেল। প্রায় আর্দ্ধঘণ্টা পরে একটি বাবু আসিয়া আমার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমাকে বলিলেন—"আমার সঙ্গে আসুন।" একটি কুলী আমার আসন কম্বলাদি ঘাড়ে লইয়া, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমি বাবুটির সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই তিনি তাঁর স্ত্রীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—"কোথা গো! শীঘ্র এস। দেখ এসে, তোমার জন্য একটি সুন্দর কুলী ধরে এনেছি।" স্ত্রী দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া, আমার পায়ের উপর পড়িল; এবং নমস্কার করিয়া খুব বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"একি দাদা! আপনি হঠাৎ এখানে কোথা হইতে এলেন? আমাকে চিন্তে পাচ্ছেন? আমি যে আপনার বোন্ প্রবাসিনী!" আমি আমার পিস্তুতো ভগিনীকে ওখানে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। প্রবাসিনী আগ্রহে আমার থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া অনতিবিলম্বেই রান্নার জোগাড় করিয়া দিল। খিচুড়ী রান্না করিয়া, আহারান্তে তাঁহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া শ্রান্তদেহে শয়ন করিলাম। পরদিন আমার সমস্ত খবর জানিয়া লইয়া, ভগ্নী স্বামীকে বলিল—"দাদার হাতে একটি পয়সাও নাই। যাহাতে কলিকাতা আরামে পঁহুছিতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন।" যথাসময়ে ভগ্নীপতি আমাকে ইন্টারক্লাশের একখানা টিকেট করিয়া দিয়া, গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। আমি স্বচ্ছন্দে পরদিন প্রত্যূষে শিয়ালদহ পঁহুছিয়া ভাগিনেয়ের বাসায় উঠিলাম। ছোটদাদাও এখন এই বাসায়ই থাকেন। তিন চার দিন আমাকে কলিকাতায় অপেক্ষা করিতে হইল।

কলিকাতায় এই কয়দিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইলাম। বেলা দশটা পর্য্যন্ত আসনের কার্য্য করিয়া শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় যাইতাম। তথায় অপরাহ্ন চারটা পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতাম। রাত্রে ভাগিনার বাসায়ই থাকা হইত।

তারকনাথ দর্শন। বিপত্তি। আশ্চর্য্যরূপে গয়ায় পঁহুছান।

বাবা তারকনাথকে দেখিতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। আমি তারকেশ্বর যাইব স্থির করিলাম। আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ছোটদাদা আমাকে তারকেশ্বরের টিকেট করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার সময়ে

১লা চৈত্র,
সোমবার।

তারকেশ্বরে পঁহুছিলাম। কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব, কিছুই স্থির নাই। একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তারকেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই কোন একটা স্থানে পড়িয়া থাকিব মনে করিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসন হইতে বাহিরে যাইব এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল—"বাবাজী! আপনাকে একবার ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, এই অনুরোধ করিয়াছেন।" আমি লোকটিব সহিত ষ্টেসন মাষ্টারের কামরায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। অনেকক্ষণ ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে প্রচুর গরম দুধ ও মিষ্টি আমার আহারের জন্য আনিলেন। ভোজনের পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর একটি কামরায় আমার থাকিবার সুব্যবস্থা করিলেন। আরামে বেশ সুনিদ্রা হইল। সকাল বেলা উঠিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের একটি লোকের সহিত মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে ঠাকুরের আরতি দর্শন হইল। স্নানান্তে তারকনাথের পূজা করিব, স্থির করিয়া, মন্দিরের সংলগ্ন পুকুরপাড়ে গিয়া বসিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই মহামায়ার প্রভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম। 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' করিয়া স্নান তর্পণ করিয়া মন্দিরে গেলাম। তারকনাথকে জল বিল্বপত্র দিয়া মনের সাধে পূজা করিলাম। পরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কোথায় যাই? ঠিক এই সময়ে একটি ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন—"বাবাজী! দয়া করিয়া একবার আমার বাড়ী চলুন।" আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার জন্য হোমের আয়োজন করিয়া দিয়া, বিবিধ প্রকার ফল, মিষ্টি, দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কোন প্রকারে এখন রাণীগঞ্জ পঁহুছিতে পারিলে সেখানে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তাঁহার নিকট হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিবার রেল ভাড়া পাইব এই প্রত্যাশায় রাণীগঞ্জ যাওয়ার ইচ্ছা হইল। বৈদ্যনাথে আমার যাওয়ার অভিপ্রায় মনে করিয়া ষ্টেসন মাষ্টার আমাকে অযাচিত ভাবে নিজ হইতেই একখানা টিকেট করিয়া দিলেন। আমি বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলাম।

৩রা চৈত্র,
বুধবার।

রাত্রি ৯টার সময়ে রাণীগঞ্জ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত রাণীগঞ্জে আছেন মনে করিয়া ষ্টেসনে নামিলাম। তাঁহারা বাসা খাঁরগুলী বাজার। দু তিন জনকে জিজ্ঞাসা কবায় তাহারা বলিল—"সে বাসা প্রায় এক ক্রোশ তফাৎ হইবে—এই রাস্তা ধরিয়া যাও।" আমি আসন, ঝোলা কাঁধে লইয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে একাকী ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকটা পথ চলিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। তখন একটি ভদ্রলোকের বাড়ীর রোয়াকে আসন, ঝোলা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বাড়ীর একটি ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে দেবেনবাবুর বাসাব ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে খুব আদর

করিয়া ঘরে নিয়া বসাইলেন, এবং বলিলেন—এই বাসাই দেবেন বাবুর। দেবেন দাদা আমাব পত্র পাইয়াও বিশেষ কার্য্যানুরোধে বর্দ্ধমান গিয়াছেন, এবং চারপাঁচদিন তথায় থাকিবেন, বলিলেন। শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। দেবেন দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অনায়াসে হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়ার সুব্যবস্থা হইবে, শুধু এই ভরসা করিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু হায়! একি সর্ব্বনাশ হইল! একটি ষ্টেসন যাওয়ারও সংস্থান নাই, এখন কোথায় যাই! সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। গদির গোমস্তাটি আমাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান কবিয়া যথাবিধি হোম, পাঠ ও ন্যাসাদি কবিলাম। কয়েকটি ভদ্রলোক আমার নিত্যক্রিয়া দেখিয়া খুব আনন্দলাভ করিলেন এবং আমাকে কিছু কিছু প্রণামী দিয়া পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঠিক গয়া পর্য্যন্ত পঁহুছিবার ভাড়া ঠাকুর আমাকে এইভাবে দয়া করিয়া জুটাইয়া দিয়াছেন। হরিদ্বারে যাওয়ার সময়ে গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। আমি যথা সময়ে ষ্টেসনে আসিয়া গয়ার টিকেট করিলাম, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে গয়া যাত্রা করিলাম।

গয়ায় থাকার সুব্যবস্থা।

৫ই চৈত্র,
শুক্রবার।

অধিক রাত্রে বাস্তিকপুর ষ্টেসনে নামিতে হইল। ষ্টেসনের বারাণ্ডায় অপরাপর যাত্রীদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিলাম। খুব ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, সাধুবেশ দেখিয়া একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজ হইতে আধ পোয়া লুচি ও মিষ্টি আনিয়া আমাকে আহার করিতে দিলেন। তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিয়া শয়ন করিলাম। সকাল বেলা গয়ার ট্রেণ আসিলে, তাহাতে চাপিয়া প্রায় ৯টার সময়ে গয়া পঁহুছিলাম। শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় এই গয়াতেই আছেন, শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বাসা কোথায় জানি না। অচেনা সহরে তাঁহার বাসা খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। চানচৌরা নামক স্থানে আসিয়া একটি বাঙ্গালী যুবককে দেখিয়া মনোরঞ্জন বাবুর বাসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোকটি আমাকে অতিশয় শ্রান্ত দেখিয়া তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে আমি একটু সুস্থ হইলে, আমাকে তিনি ঐ বাসায় পঁহুছাইয়া দিবেন বলিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বাসার সকলেই আমাকে খুব আপনার করিয়া লইলেন; এবং সাদরে আমার স্নান, সন্ধ্যা- তর্পণ ও হোমাদির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাহিরের একখানা নির্জ্জন ঘর আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যে কয়দিন গয়াতে থাকিব এই বাড়ীতেই যাহাতে আমি আসন রাখি তজ্জন্য ইঁহারা সকলেই বিশেষ জেদ্ করিতে লাগিলেন। অগত্যা আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। শ্রীযুক্ত হীরালাল, মতিলাল, কৃষ্ণলাল ও নন্দলাল বাবু সস্নেহে ঠিক যেন সহোদরের মতই আমার

প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইংরাজী সুশিক্ষিত ও জাতিতে কায়স্থ হইলেও ইঁহাদের আচার ব্যবহার সদাচারী সদ্‌ব্রাহ্মণের মত। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে অল্পকাল মধ্যেই আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। সর্ব্বদাই কেহ না কেহ আমার নিকটে থাকিতেন। সকালে চা খাওয়া হইতে আহারান্তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়ত আমার নিকটে থাকিয়া ইঁহারা প্রয়োজনমত সেবা করিতে লাগিলেন। এ সমস্ত আমার ঠাকুরের অপরিসীম দয়া মনে ভাবিয়া, আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের উপরে ছাড়িয়া দিলে, তিনি কি ভাবে যে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করেন ইহাই দেখিবার বিষয়।

গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়। রঘুবর বাবা।
শেষ-চক্র সংগ্রহ।

বিকালবেলা নন্দলাল বাবুর সহিত আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গেলাম। সিদ্ধ রঘুবর বাবাজীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া খুব আদর করিয়া বসাইলেন, এবং আশ্রমটি দেখাইলেন। সমতল, প্রায় দুই কাঠা, আড়াই কাঠা জমির উপরে আশ্রম। গোদাবরীর রাস্তা হইতে তিন চার মিনিট উত্তরদিকে চলিয়া, বামে মুরলী, ও দক্ষিণে আকাশগঙ্গা পাহাড়। কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উভয় পাহাড়ের সন্ধিস্থলে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের পশ্চিম গায়ে বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করিলাম; এবং মহাবীরজীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া নমস্কার করিলাম। মূর্ত্তির সম্মুখে ৭।৮ হাত প্রস্থ ১০।১২ হাত লম্বা একটি বাঁধান আঙ্গিনা। আঙ্গিনার পূর্ব্বদিকে মহাবীরজীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি বেলগাছ। এই বেলগাছের নীচে আঙ্গিনা হইতে প্রায় দেড় ফুট উঁচুতে, ৬ ফুট দীর্ঘ ৪ ফুট প্রস্থ পরিষ্কার একখানা প্রস্তর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাতা রহিয়াছে। বাবাজী কহিলেন—দীক্ষালাভের পরে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ঠাকুর ঢুলিতে ঢুলিতে এই বেলতলায় প্রস্তরের চটাঙ্গের উপরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। এবং ১১ দিন ১১ রাত্রি অবিচ্ছেদে একই ভাবে সমাধির অবস্থায় তিনি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবাজী নিয়ত নিকটে থাকিয়া ঠাকুরের দেহরক্ষা করিতেন। এই প্রস্তরখণ্ডের গা ঘেঁসিয়া পূর্ব্বদিকে একটি প্রকাণ্ড পাথরের চটাঙ্গ। এই চটাঙ্গের নীচে একটি সুন্দর গোফা। প্রায় ৪ ফুট প্রস্থ ও ৬ ফুট লম্বা হইবে। ঠাকুর এই গোফার ভিতরে বসিয়া অনেকদিন নির্জ্জন-সাধন করিয়াছিলেন।

আশ্রমের উত্তরপ্রান্তে দুইখানা কোঠা ঘর। পূর্ব্বদিকের ঘরখানা বাবাজীর ভাণ্ডার। এবং সংলগ্ন পশ্চিমে তাঁহার আসন-কুটীর, উভয় ঘরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে প্রায় পাঁচ ফুট প্রস্থ ১৮।২০ ফুট লম্বা দরদালান। এই দালানের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসীদের থাকিবার বড় একখানা কোঠা ঘর, ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায়ই মহাবীরজী প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের পশ্চিম

দিকে প্রায় ২৫।৩০ ফুট নীচুতে সুন্দর আকাশগঙ্গা ঝরণা, একটি কুণ্ড জলে পরিপূর্ণ রাখিয়া, কল কল শব্দে দক্ষিণে নিম্ন ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের দক্ষিণে বেলগাছ, পূর্ব্বে বট, অশ্বত্থ এবং উত্তরে নিমগাছে ছাতার মত সমস্ত আশ্রমটিকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। আশ্রমে বসিয়া দক্ষিণদিকে সমস্ত গয়া সহর, বিষ্ণুপদের মন্দির ও ফল্গুর অপর পারে রামগয়া পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়।

আশ্রমের পূর্ব্বদিকে প্রায় দুইশত ফুট সোজা উঠিয়া ঠাকুরের দীক্ষার স্থান। নতশিরে থাকা হেতু তাহা আমার নজরে পড়িল না। পাহাড়ের সম্মুখের ও নিম্ন দিকেব সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। বাবাজী আমাকে বেলগাছের নীচে বসাইয়া অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন—"হরিদ্বারের পাহাড়ে তোমার যাওযার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি এই পাহাড়ে আমার আশ্রমে থাক, এখানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভজন সাধন কর। আমি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তোমাকে খাওয়াইব। আমিই তোমাকে এখানে আনিয়াছি। তোমাব গুরুজীকে আমি সব সংবাদ দেই। তিনি ইহাতে সন্তুষ্টই হইবেন।" আমি বলিলাম—আমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার অপর আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহাই করিব। হরিদ্বারেই যাইব নিশ্চয় করিয়াছি। বাবাজী বলিলেন—"আচ্ছা, এখন তুমি যাও, কিন্তু এর পর আমি তোমাকে এখানে আনিব।" বাবাজীর নিকটে লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম চাওয়াতে, তিনি একটি নখপরিমিত সর্পাঙ্কিত শিলাচক্র দেখাইয়া বলিলেন—"এটি বড় উৎকৃষ্ট চক্র। ইচ্ছা হইলে নিতে পার। ইহার নাম 'শেষ'। এই চক্রটি নেপালের নরসিংহ নদী হইতে আনিয়াছিলাম। ঐ নদীতে তুলসী, চন্দন, পুষ্পাদিদ্বারা শালগ্রাম উদ্দেশে পূজা করিলে শিলাচক্র নিকটে আসেন। গামছা বা বস্ত্র পাতিয়া রাখিলে উহার উপরে উঠিয়া পড়েন; তখন তুলিয়া নিতে হয়। কোন কোন শালগ্রামের ভিতরে সুবর্ণ থাকে, উপরে চিহ্ন দেখিয়া বুঝা যায়। ওখানকার পাহারাওয়ালারা উহা বাহির করিয়া লয়, এই চক্রটি আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, দুর্ল্লভ বস্তু বলিয়া, এতকাল গোপনে রাখিয়াছি।" বাবাজীর এ সকল কথা কিছুই আমার মনে লাগিল না। মনে হইল, কাল কষ্টি পাথরের উপরে সুনিপুণ কারিগরের দ্বারা একটি সর্পের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাবাজীর কথায় শিলাটি সঙ্গে করিয়া আনিলাম। হেঁট মস্তকে থাকার দরুণ পাহাড়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাবাজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, নন্দবাবুর সহিত বাসায় আসিলাম।

বাড়ীর মেয়েরা খুব শ্রদ্ধার সহিত আমার রান্নার যোগাড় করিয়া দিলেন। দিবসান্তে আহার করিয়া আরামে শয়ন করিলাম।

নিঃসম্বল মনোরঞ্জন বাবু। ফল্গুতে স্নান।

৭ই চৈত্র, রবিবার।

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় গুরুদেবের আদেশক্রমে সপরিবারে গয়াতে আছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রেবতী বাবু, বেণী বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারাও সঙ্গে রহিয়াছেন। একটি পয়সাও আয় নাই, সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তির উপরে নির্ভর। অপরিচিত স্থানে বহু পুষ্যি লইয়া, নিঃসম্বল অবস্থায় যেভাবে তিনি দিন কাটাইতেছেন, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। সংসারে এরূপটি কোথাও আছে কি না জানি না। গয়াতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহার বাসার কোন খোঁজ পাই নাই—দেখাও হয় নাই। আজ তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল, ঠাকুরের কৃপায় মনোরঞ্জন বাবুলোকপরম্পরায় আমার কথা শুনিয়া, বেলা প্রায় ৮টার সময়ে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন—"ফল্গুতে জল আসিয়াছে, চলুন স্নান করিয়া আসি। ফল্গু অন্তঃসলিলা। এ সময়ে কখন জল দেখা যায় না। উত্তপ্ত বালি একটুকু খুঁড়িলেই বরফের মত নির্ম্মল শীতল জলে গর্ত পরিপূর্ণ হয়। সর্দ্দিজ্বরের ভয়ে কেহ এই জলে স্নান করে না।" জল আসিয়াছে শুনিয়া, মনোরঞ্জন বাবুর সহিত স্নান করিতে গেলাম; অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলে বহুক্ষণ থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া স্নান-তর্পণ করিলাম। শুনিয়াছি, ফল্গুতে স্নানান্তে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে বালির পিণ্ড দিতে হয়। পরে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষরা উদ্ধার হইয়া যান; আমি তিন মুষ্টি বালি লইয়া, পিতা ও পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত্যর্থে প্রদান করিলাম। পরে বিষ্ণুপদে যাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি ও কল্যাণার্থে, জল তুলসীদ্বারা পূজা করিয়া বাসায়, আসিলাম। হোম সমাপনান্তে গরম চা পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম।

সূক্ষ্মতত্ত্ব—অতীন্দ্রিয়।

অপরাহ্নে মুন্সেফ্, সব্‌জজ, উকিল, ডেপুটি প্রভৃতি কতকগুলি সুশিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিলে তাহাতে যে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ হয়, তার কি কোন প্রমাণ আছে?" আমি বলিলাম—এ বিষয়ে আমিও একবার কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু সে সব প্রমাণ গ্রহণের যোগ্যতা তো আমাদের নাই। সূক্ষ্ম পারলৌকিক তত্ত্ব স্থূল জাগতিক দৃষ্টান্তে কি প্রকারে বুঝা যাইবে? অতীন্দ্রিয় বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বুঝিতে চাই। তাহা কি কখনও হয়?" আমি তাঁহাকে বলিলাম—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। জ্ঞেয় বিষয় এমন কি থাকিতে পারে, যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা বুঝা যাইবে না? তিনি কহিলেন—"যিনি কখনও কোন বস্তু জীবনে দেখেন নাই—জন্মান্ধ, তাঁহাকে কি কেহ দৃষ্টান্তদ্বারা দৃশ্য বস্তু ও বিচিত্র কারুকার্য্য বুঝাইতে পারে? সহস্রবার বলিলেও তিনি দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিবেন না। জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ,

ত্বকের সমস্ত বিষয়ই বুঝিবেন; কিন্তু চক্ষুর গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ থাকিবেন। সেই প্রকার ভগবানের সৃষ্ট এমন বহু বিষয় আছে যাহা ষষ্ঠ, সপ্তমাদি ইন্দ্রিয় বিকশিত হইলে জানিতে পারা যায়। একমাত্র সাধনের দ্বারাই সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হয়। 'অতীন্দ্রিয়' অর্থ—আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত।'' এই সময়ে একটি সাধু আমার কথায় বাধা দিয়া উহাদিগকে বলিলেন, সাধনবলে দৈহিক আবরণ ভেদ হইলে, এই ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারাও সাধক সাধারণের অগম্য কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও পারলৌকিক জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারেন। এই কথা লইয়া ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ চলিল, আমিও বাঁচিলাম। ভগবানের অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জ্ঞানলাভের জন্য জীবাত্মার চতুর্দ্দিকে অনন্ত দ্বার রহিয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইলেও, তাহা দ্বারা শুধু স্থূল পঞ্চ ভূতেরই জ্ঞানমাত্র লাভ করা যায়। সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করাব অধিকার হয় না। আজ ধর্ম্মালোচনায় দিনটি আনন্দে অতিবাহিত হইল।

বুদ্ধগয়া দর্শন।

ফল্গুতে ঠাণ্ডা জলে বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়াছিলাম। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। মনোরঞ্জনবাবু আমাকে বুদ্ধগয়ায় লইয়া যাইতে আসিলেন। হীরালালবাবু কয়েকখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন, বেলা প্রায় ১টার সময়ে আমরা সকলে বুদ্ধগয়ায় রওয়ানা হইলাম। রাস্তায় আমার জ্বর হইল। মাথাধরায় শরীর, মন অস্থির হইয়া পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দিরাদি কিছুই দর্শন করিতে পারিলাম না। এই মন্দির এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি বহুশতবৎসর বালিব নীচে চাপা ছিল। কিছুকাল হয় সরকার এ সকল উদ্ধার করিয়াছেন। এখনও কত জিনিস মাটির নীচে পড়িয়া আছে বলা যায় না। আমি কোনও প্রকারে মন্দিরটি দর্শন করিয়া, উহার পশ্চাৎ দিকে বোধিদ্রুমের তলায় গিয়া বসিলাম। একান্তমনে ভগবান্ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়া, নাম করাতে বড়ই আরাম পাইলাম। মন্দির পরিবেষ্টনের প্রান্তভাগে নূতন মন্দিরে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম. শরীরের অবস্থা অতিশয় কাতর বোধ হওয়ায় অবিলম্বে বাসায় চলিয়া আসিলাম; এবং প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। বাড়ীর বাবুরা সহরের বড় ডাক্তার আনাইয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ৫।৭ দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হইলাম। অসুখের সময়ে মতিবাবু আমার নিকটে থাকিতেন। ঠাকুরের কথা শুনিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। আমি তাঁহার নিকটে ঠাকুরের কথা কহিতাম; ইহার ফলে তিনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিলেন। জানিলাম অচিরেই তিনি দীক্ষালাভ করিবেন।

সাধুর আক্রোশে ভূতের উপদ্রব।

মতিবাবু প্রভৃতির নিকটে তাহাদের পারিবারিক একটি দুর্ঘটনা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একটি সাধুর আক্রোশে এই পরিবার ভূতের উপদ্রবে বিষম বিপন্ন হইয়াছিলেন। সাধুটি ইহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ভিক্ষা করিতে আসিতেন। অবাধে ভিক্ষা পাওয়ায় তিনি দু'একদিন অন্তর অন্তর আসিতে লাগিলেন। ইচ্ছামত জিনিস না পাইলে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক গালাগালি করিতেন। একদিন গৃহস্বামী উঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, দ্বারবানকে বলিলেন—'উহাকে বাহির করিয়া দাও, আর কখনও এখানে না আসে।' দ্বারবান সাধুকে নাকি কিছু অপমান করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। সাধু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, "আরে পাষণ্ডি! সাধু নেহি মান্‌তা হ্যায়? আচ্ছা হাম্‌ভি দেখ্ লেয়েঙ্গে।" এই বলিয়া "নরশিং নরশিং" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে চিমটাদ্বারা দ্বারে তিনটি ঘা মারিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পরই এই বাড়ীতে ভূতের বিষম উপদ্রব আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পর সমস্ত ঘরের জানালা দরজা বন্ধ থাকিলেও আকস্মাৎ দুড়ুম দুড়ুম শব্দে খুলিয়া যাইত। প্রদীপ লণ্ঠনাদি হঠাৎ একেবারে নির্ব্বাণ হইত; ইট, পাট্‌কেল, ধূলা, বালি শূন্য হইতে ঘরের মধ্যে পড়িতে থাকিত। আহারের পাত্রে ময়লা, রাবিশ, হাড় প্রভৃতি কোথা হইতে আসিয়া পড়িত। এই অবস্থায় কয়দিন আর থাকা যায়? বহু চেষ্টায়ও কোন প্রকার প্রতীকার করিতে না পারিয়া, অবশেষে সকলে বাঁকীপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানেও ঠিক্ এই প্রকার উপদ্রবই হইতে লাগিল। তখন আরাতে একটি শক্তিশালী ফকিরের সন্ধান পাইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, শঙ্খ ধ্বনি করিয়া ভূতকে তাড়াইয়া দিলেন। সেই হইতে আর কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। ঘটনাটি শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। কি ভাবে কোথা হইতে শূন্যপথে এ সকল ইট, পাট্‌কেল, রাবিশ, ময়লা আসিয়া পড়ে, কে এ সকল লইয়া আসে, দরজা জানালা কে বন্ধ করে, প্রদীপাদি কি প্রকারে এককালে নির্ব্বাণ হয়, প্রত্যক্ষ করিয়াও কিছুই বুঝা যায় না। এ সকল অলৌকিক কার্য্য যাহাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সাধক সাধনবলে সেই সকল পরলোকগত আত্মার উপরে আধিপত্য ও শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারেন, ইহা আরও বিস্ময়কর।

ব্রজমোহনের অলৌকিক দীক্ষা।

পাঁচ ছয়দিন শয্যাগত থাকিয়া সুস্থ হইয়া উঠিলাম। পথ্য পাইয়াই কুঞ্জের নিকটে আরায় যাইতে ব্যস্ত হইলাম। আমার হাতে কিছুই নাই জানিয়া বাবুরা আমাকে আরা পর্য্যন্ত যাওয়ার টিকেট করিয়া দিলেন। ১৬ই চৈত্র কুঞ্জের নিকটে পঁহুছিলাম। কুঞ্জের জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয় আবগারী বিভাগের ইনস্‌পেক্টর। আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। যে কয়দিন কুঞ্জের নিকটে রহিলাম, ঠাকুরের প্রসঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইলাম। গেণ্ডারিয়া থাকাকালীন কুঞ্জদের কুলপুরোহিত

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দীক্ষার বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কুঞ্জের নিকটে ঘটনাটি জানিতে আগ্রহ জন্মিল। জিজ্ঞাসা করায় কুঞ্জ বলিলেন— পুরোহিত মহাশয়ের ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের বড়ই আকাঙ্ক্ষা জন্মে, কিন্তু তাঁর অবস্থা অতিশয় শোচনীয়—গেণ্ডারিয়া যাওয়ার সামর্থ্য নাই। তাই তিনি কাতর হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইতে লাগিলেন। একদিন পুরোহিত রাত্রে আহারের পর শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছেন, অধিক রাত্রিতে "ব্রজমোহন, ব্রজমোহন" ডাক শুনিয়া, ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং চাহিয়া দেখেন ঠাকুর সম্মুখে দাঁড়ান, পুরোহিতকে বলিলেন—'শীঘ্র স্নান করে এস—এখনই তোমার দীক্ষা হবে।" ব্রজমোহন স্নান করিয়া আসিলেন। কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুরের কথামত তাঁহাকে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে যাইতে লাগিলেন। ঘরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পুরোহিত পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঠাকুর নাই। তখন ব্যস্ততার সহিত ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতর ঠাকুর বসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর ব্রজমোহনকে সম্মুখে বসাইয়া যথামত দীক্ষা দিলেন, দীক্ষার পর ব্রজমোহন ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, মাথা তুলিয়া দেখেন, ঠাকুর আর নাই। ব্রজমোহন এদিক সেদিক একটু খুজিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন এবং নিদ্রিত হইলেন। সকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ব্রজমোহনের রাত্রির কথা স্মরণ হইল, একটু দ্বিধাভাব আসিতেই ভিজা ছাড়া কাপড় দরজার ধারে পড়িয়া আছে দেখিয়া সংশয়শূন্য হইলেন। অমনি গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ঠাকুরতা ও রজনী ঠাকুরতার নিকটে যাইয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাঁহারা ঐ ঘটনার সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ঠাকুরকে জানাইলেন। ঠাকুর উত্তরে লিখিলেন—**ঘটনা সত্য, কিন্তু উহাকে আবার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।**

বস্তি যাত্রা। দাদার অপূর্ব্ব দীনভাব।

আরাতে আসিয়া শরীর সুস্থ রহিল না। কুঞ্জের সহিত কয়েকদিন আনন্দে কাটাইয়া কাশী যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। কাশীতে রামকুমার বিদ্যারত্ন (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) ও তারাকান্ত দাদা (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) আছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় পছন্দমত শালগ্রাম সংগ্রহ হইতে পারিবে; এবং ত্রিসন্ধ্যাটিও ভালরূপে শিখিয়া লইতে পারিব। আসন, ঝোলা বাঁধিয়া, আমি কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময় কুঞ্জ বলিলেন—"কাতর শরীর লইয়া কাশীতে আর যাওয়া কেন, ওখানে গেলে নানা অনিয়মে শরীর আরও অসুস্থ হইয়া পড়িবে। অবিলম্বে পাহাড়ে যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিবে। বরং দাদার নিকটে বস্তি যাওয়া ভাল।" আমিও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়া বস্তি যাত্রা করিলাম। কুঞ্জ একখানা মধ্যম শ্রেণীর টিকেট করিয়া দিলেন। লাইনের দু'দিকে নিবিড় শালবন দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহার মধ্যে ঠাকুরকে দেখিতে পাই কি না অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পর দিন বেলা প্রায় ৭টার সময়ে দাদার বাসায়

উপস্থিত হইলাম। দাদা তখন আহ্নিক করিতেছিলেন। দাদার নিকটে না যাইয়া বাহির বারান্দায় আসন করিয়া বসিলাম। পূজা সমাপনান্তে দাদা আমার নিকটে আসিলেন। দাদাকে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। দাদার আর সেই স্থূল চেহারা নাই, শরীরটি একেবারে হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। দাদা করযোড়ে নমস্কার করিতে কবিতে আমার সম্মুখীন হইলেন। দাদার চরণ দু'খানা সামান্য মাত্র ভূমি সংলগ্ন রহিয়াছে মনে হইল। দাদাকে দেখিয়াই আমি দণ্ডাবৎ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু দাদা কিছুতেই আমাকে চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না। আমি দাদার চারিটি ভাইবোনের ছোট, তথাপি দাদার এই প্রকার ভাব, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। দাদার চেহারাটি তপস্যাপূর্ণ উজ্জ্বল সাত্ত্বিক বৈষ্ণবের মত হইয়াছে। তাঁহার স্নেহপূর্ণ স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আমি ঠাণ্ডা হইলাম। দাদার এরূপ দীনভাবাপন্ন মূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই। ঠাকুর দাদাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—**তোমার বড়দাদা একেবারে আলাভোলা মানুষ, অসাধারণ সরল, সংসারের কিছুই জানেন না। ফয়জাবাদে তাঁর সব কাণ্ড দেখে আমরা সকলে অবাক্ হ'য়েছি। একেবারে বালকের মত বিশ্বাসটি বড় সুন্দর।** দাদাকে দেখিয়া ঠাকুরের এই সকল কথা আমার স্মরণ হইল। দাদা আমাকে স্নানাহ্নিকান্তে জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন; এবং শালগ্রামের কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া হাসপাতালে চলিয়া গেলেন।

বস্তিতে স্বাস্থ্য লাভ।

দাদার বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন যে ঘরখানায় গতবারে ছিলাম, তাহাতেই আসন করিলাম। শেষ রাত্রি হইতে পুনরায় নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত দিবসের কার্য্যগুলি ঘড়ি ধরিয়া করিতে লাগিলাম। ভোরবেলা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ঠাকুর আমাকে তাঁর নামে ও ধ্যানে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখেন। আহা! কবে জনশূন্যস্থানে পাহাড়-পর্ব্বতে যাইয়া তাঁহার মনোহর রূপের ধ্যানে দিবারাত্রি বিভোর হইয়া থাকিব? কবে ঠাকুর আমার চতুর্দ্দিক শূন্য করিয়া তাঁহার শান্তিময় শ্রীচরণে চির আশ্রয় প্রদান করিবেন? অচিরে পাহাড়ে যাইতে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু শরীর অতিশয় খারাপ দেখিয়া দাদা তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন—"কিছুদিন যথামত আহারাদি করিয়া শরীর সুস্থ করিয়া লইতে হইবে।" দাদা আমার পুষ্টিকর আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সময় সময় ঔষধও দিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। ৬।৭ দিনের মধ্যেই দাদার ব্যবস্থা মত চলিয়া শরীর আমার বেশ সুস্থ হইল। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে ভিক্ষায় চাউল জুটিবে না অনুমানে দাদা আমাকে ডাল রুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। পরে শুধু নুন রুটি খাইতে লাগিলাম। শরীর তাহাতে আমার কয়েক দিনের মধ্যেই খুব সবল ও সুস্থ হইল। পাহাড়ে পাছে ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার জ্বর হয়, সেই আশঙ্কায় দাদা আমাকে একটি তুলার আল্‌খিল্লা এবং কন্দমূল খুঁড়িবার জন্য একখানা বড় চিম্‌টা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

একটি রূপার সুন্দর কৌটা আমাকে দিয়া বলিলেন—"ইহার ভিতরে শালগ্রাম রাখিয়া কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিও। না হইলে চুরি হইয়া যাইবে।"

শালগ্রাম পূজা ও ত্রিসন্ধ্যা আরম্ভ।

রঘুবর বাবাজীর নিকট হইতে যে 'শেস-চক্রটি' পাইয়াছিলাম, এতকাল তাহা ঝোলাতেই বদ্ধ ছিল। এখন জল, তুলসী, ফুল, চন্দনাদি দিয়া তাহা পূজা করিতে লাগিলাম। উহা আমার পছন্দমত সুশ্রী নয় বলিয়া, পূজাটিতে তেমন আরাম পাইতেছি না। সন্ধ্যা করিবারও একটা প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় প্রতিদিন আমি ত্রি-সন্ধ্যা করিতেছি। কিন্তু সন্ধ্যার আচমন, আপমার্জ্জন ও অঘমর্ষণাদি কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। সমস্ত মন্ত্রেরই ত তাৎপর্য্য স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং সন্ধ্যাও আমার ঠাকুরেরই শ্রীঅঙ্গের বর্ণনা মাত্র করিয়া যাইতেছি। সন্ধ্যাপাঠ কালে ঠাকুরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্টরূপে যেন চক্ষে পড়ে। তাহাতে কি যে আনন্দ অনুভব করি, প্রকাশ করিতে পারি না। আজ-কাল মনে হইতেছে যেন সমস্ত দিনটিই ঠাকুরের উপাসনায় যাইতেছে।

সাবেকের প্রতি সমাদর।

কিছুকাল পূর্ব্বেও ফয়জাবাদে দাদাকে মহা ভোগসুখে থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এখন তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্যের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি।

অযোধ্যা হইতে দাদার ধর্ম্মবন্ধুগণ সময় সময় তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য এখানে আসিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কয়েকটি দিন কাটিয়া গেল। দাদার মুখে বাবু হরিসিংহের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থাকিয়া, তিনি যেরূপ দীনভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহা বড়ই অদ্ভুত।

দাদা কহিলেন—এক দিবস আমি হরিসিংহের বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম; তাঁহার আসবাব, জিনিসপত্র, বাড়ী ঘর দেখিয়া তাঁহাকে অসাধারণ ধনী বলিয়া মনে হইল। বাড়ীর ভিতরে একখানা মাটীর জীর্ণ খোলার ঘর দেখিয়া আমার স্ত্রী হরিসিংহের পরিবারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন সুন্দর বাড়ীর ভিতরে এই খোলার ঘরখানা কেন রহিয়াছে?" তিনি ছল ছল চক্ষে বলিলেন—"এই ঘরই আমার লক্ষ্মী, আমার স্বামী যখন ১০ টাকা বেতনে চাকরী করিতেন, তখন আমরা এই ঘরখানাতেই থাকিতাম। এই ঘরে থাকিয়াই আমার যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য। এখন এ ঘর কি আমি ত্যাগ করিতে পারি? বর্ষা বাদলে শীতে গ্রীষ্মে বারমাস আমরা এই ঘরেই থাকি। যতকাল রামজী সংসারে রাখিবেন, এই ঘরখানায়ই থাকিব। এ সকল ঐশ্বর্য্য যাঁহাদের ভাগ্যে আসিয়াছে, তাঁহারা ভোগ করিবে।" শুনিলাম হরিসিং এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। বহু ছত্র ও ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে আছে।

প্রতি মাসে সহস্র সহস্র টাকা পরহিতার্থে ব্যয় করেন। রাজ-প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াও সাবেক কুটীরখানি ছাড়েন নাই। নিজেরা স্ত্রীপুরুষে তাহাতেই বাস করেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

শ্বাসে প্রশ্বাসে সাধন তত্ত্ব।

বস্তি সহরে কোন প্রসিদ্ধ দেবালয় বা সাধু মহাত্মা আছেন কিনা, দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন—নানক সাহিদের একটি আখ্‌ড়া আছে। তাহা ছাড়া আরও দু'একটি দেবালয় আছে। কিন্তু তাহা তেমন প্রসিদ্ধ নয়। বৌদ্ধ লামা-গুরুরা সময় সময় এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা পর্য্যটন করিয়া চলিয়া যান।

শুনিয়াছিলাম—এই বস্তিই নাকি প্রাচীন কপিলাবস্তু। এই স্থানেই রাজপুত্র শাক্যসিংহ, গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। এই স্থানেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ত্রিতাপ জ্বালায় জীবকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া, তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অতুল রাজৈশ্বর্য্য ও যৌবনসুলভ সম্ভোগাদি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্ব্বক গভীর অরণ্যে কঠোর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন। কিন্তু ছয় বৎসরকাল অদম্য অধ্যবসায়ে আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা নানা প্রণালীতে যোগাভ্যাস করিয়াও তিনি "সত্যতত্ত্ব" উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অবশেষে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দুঃখের মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া নির্ব্বাণের এক অভিনব পথ আবিষ্কার করিলেন। পরদুঃখকাতর, সদয়হৃদয় বুদ্ধদেব শুধু নিজে নির্ব্বাণলাভে পরিতৃপ্ত না থাকিয়া, জীবের কল্যাণার্থ মনোবিজ্ঞান-সম্মত এরূপ অমূল্য সাধনপ্রণালী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যাহার অনুসরণে আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে; এবং যুগযুগান্তর হইতে মানবসভ্যতার উপর আর্য্যধর্ম্মের যে প্রভাব চলিয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ তাহার আরও বিস্তার সাধন করিতেছে। ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় আমরা যে সাধন লাভ করিয়াছি, বৌদ্ধ-সাধনের সহিত অনেকাংশে তাহার সাদৃশ্য আছে।

বুদ্ধদেব নানা প্রকার সাধনপ্রণালীর মধ্যে দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধনপন্থার সর্ব্বাধিক বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রিপিটক ও বিশুদ্ধিমার্গ প্রভৃতি গ্রন্থে উহার বহুল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে রোহিলাশ্ববগ্‌গে তিনি বলিয়াছেন—

"অপিচাহং আবাস ইমস্মিং এব ব্যামমত্তে কলেবরে সন্নিব্বি সমানকে
লোকঞ্চ পন্নপেমি লোকসমুদয়ঞ্চ লোকনিবোধঞ্চ পতিপদন্তি" ইত্যাদি—

সাড়ে তিন হাত পরিমাণ এই শরীরে যেখানে চৈতন্য ও মন রহিয়াছে, সেই স্থানে জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ও রহিয়াছে; এবং এই সংসারাবর্ত্ত হইতে পরিনির্ব্বাণের পথও রহিয়াছে।

আবার কায়গতাসতি বা দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধনপ্রণালীতে আনাপানাসতি বা শ্বাস-প্রশ্বাসে মনঃসংযোগ করিয়া সাধন করাই প্রশস্ত। আনয়তি অর্থে শ্বাস গ্রহণ, পানয়তি অর্থে প্রশ্বাস ত্যাগ বুঝায়। সতি শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, পালি ভাষায় 'সতি' শব্দে, প্রতি নিমেষে প্রতি মুহূর্ত্তে যে ব্যাপার সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে জাগ্রতভাবে মনঃসংযোগ করিয়া থাকাই সূচিত হয়। ধ্যান করিবার পূর্ব্বে মনকে লক্ষ্য বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিবিষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। চঞ্চলতা, জড়তা, নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি আসিয়া একাগ্রতা নষ্ট না করে এ জন্য চেষ্টা যত্ন দ্বারা মনকে সর্ব্বদা সচেতন রাখিতে হয়। তাই বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রেও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে—সাধক অরণ্যে, বৃক্ষমূলে অথবা কোন উপাধিশূন্য নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পদ্মাসনে উপবেশন করেন। দেহ সরল ও সোজাভাবে রাখিয়া, নাসিকার অগ্রভাগে চিত্ত স্থির কবিয়া, সাধনের বিষয় বা ধ্যেয় বস্তুতে মনঃসংযোগ করেন। তৎপবে বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে সাধন আরম্ভ করেন।

১। স সতো অস্সসতি সতোব পস্সসতি।

তিনি স্মৃতিশীল হইয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ কালে তাহার পরিষ্কার অনুভূতি হইতে থাকে যে, তিনি শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, এবং প্রশ্বাস ত্যাগ কালেও তাহার জানা থাকে যে, তিনি প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। এইরূপে তিনি স্মৃতিশীল হইয়া অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতে দৃষ্টি না করিয়া, কেবল বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করেন।

২। দীঘং বা অস্সসন্তো দীঘং অস্সসামীতি পজানাতি,
দীঘং বা পস্সসন্তো দীঘং পস্সসামীতি পজানাতি,
রস্সংবা অস্সসন্তো রস্সং অস্সসামীতি পজানাতি,
রস্সং বা পস্সসন্তো রস্সং পস্সসামীতি পজানাতি।

শ্বাস-প্রশ্বাসের টান যদি লম্বা হয়, তবে তিনি (সাধক) দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন, এবং দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, ইহা তিনি জানেন। শ্বাস প্রশ্বাস যদি ছোট হয় তবে তিনি (সাধক) সেইরূপ খর্ব্ব শ্বাস গ্রহণ করিতেছেন এবং সেইমত ছোট প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ইহাও তিনি জানেন।

৩। সব্বকায় পটিসংবেদী অস্সসামীতি সিক্খতি,
সব্বকায় পটিসংবেদী পস্সসামীতি সিক্খতি।

তিনি (সাধক) সর্ব্বাঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন বা কম্পন বা টান অনুভব কবিতেছেন,

এরূপভাবে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

এ স্থলে সর্ব্বাঙ্গ অর্থে—বুদ্ধদেবের মতে—নাভি হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত বুঝায়; যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাসের উৎপত্তি ও অবসান নাভি হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ আছে।

৪। পস্সম্ভয়ং কায়সংখারং অস্সসামীতি সিক্খতি,
পস্সম্ভয়ং কায়সংখারং পস্সসামীতি সিক্খতি।

শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখায় দেহের সংস্কার প্রস্রম্ভিত বা বিলুপ্ত হইবে এরূপভাবে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিব—ইহা তিনি শিক্ষা করেন।

উক্ত চারিটি সূত্র লইয়া প্রথম চতুষ্ক করা হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার জ্ঞান, দ্বিতীয়টিতে শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব দীর্ঘ হওয়ার জ্ঞান, তৃতীয়টিতে সর্ব্বশরীরব্যাপী শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য হওয়ার জ্ঞান, এবং চতুর্থটিতে দেহসংস্কার ত্যাগে নিরোধাভিমুখী হওয়ার জ্ঞান সূচিত হইতেছে।

৫। পীতি পটিসংবেদী অস্সসামীতি সিক্খতি,
পীতি পটিসংবেদী পস্সসামীতি সিক্খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রীতি উন্মেষক—এই ভাবের শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

৬। সুখ পটিসংবেদী অস্সসামীতি সিক্খতি,
সুখ পটিসংবেদী পস্সসামীতি সিক্খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই সুখ উৎপত্তি হইতেছে, এই ভাবের শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

৭। চিত্তসংখারং পটিসংবেদী অস্সসামীতি সিক্খতি,
চিত্তসংখারং পটিসংবেদী পসসসামীতি সিক্খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই চিত্তসংস্কারের অর্থাৎ উপেক্ষা, বেদনা ইত্যাদির উন্মেষ হইতেছে এই প্রকার শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

৮। পস্সম্ভয়ং চিত্তসংখারং অস্সসামীতি সিক্খতি,
পস্সম্ভয়ং চিত্তসংখারং পস্সসামীতি সিক্খতি।

চিত্তসংস্কার প্রশমিত, দমিত, শান্ত ও নিরোধ করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া দ্বিতীয় চতুষ্ক করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় চতুষ্কে

বলা হইয়াছে, দেহের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিলে মন অন্তর্ম্মুখী হয়, বিক্ষিপ্ততা কমিয়া যায়, এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়; তাহাতে প্রীতি, সুখ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বা ভাবের উদ্রেক হয়। তারপর আবার এই চতুষ্কের শেষভাগে এই চিত্তবৃত্তিগুলিরও নিরোধ করার কথা বলা হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বনে ভিতরের প্রত্যেকটি ভাব প্রথমে জাগাইয়া তুলিয়া তৎপরে তাহা দ্বারাই উহা সমূলে উৎপাটনের কৌশল বুদ্ধদেব বলিয়া দিলেন।

৯। চিত্ত পটিসংবেদী অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
চিত্ত পটিসংবেদী পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

উপরি উক্ত উপায়ে চিত্ত বৃত্তিবিহীন হইলে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে সেই চিত্ত বিকাশ হয়; এইরূপ বৃত্তিবিহীন চিত্তকে প্রকট করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

১০। অভিপমোদয়ং চিত্তং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
অভিপমোদয়ং চিত্তং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই চিত্ত অভি প্রমোদিত অর্থাৎ আনন্দময় হইতেছে এই ভাবের শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

১১। সমাদহং চিত্তং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
সমাদহং চিত্তং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে চিত্ত সাম্যভাবাপন্ন বা সমাহিত হইতেছে, এই ভাবে চিত্তকে সম্যক্ সমান ভাবে স্থাপন করিতে করিতে সমাহিত বা সমাধিযুক্ত করিতে করিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

১২। বিমোচয়ং চিত্তং অস্‌সসামীতি সিক্‌খতি,
বিমোচয়ং চিত্তং পস্‌সসামীতি সিক্‌খতি।

প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই 'পঞ্চনিবারক' অর্থাৎ নির্ব্বাণের পাঁচটি প্রতিবন্ধক—অবিদ্যা, অস্মিতা, আনন্দ প্রভৃতি পঞ্চভাব হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, শুদ্ধ বুদ্ধাবস্থাপন্ন হইতেছে, এই ভাবে সাধক শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন।

নবম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত এই চারিটি সূত্র লইয়া তৃতীয় চতুষ্ক করা হইয়াছে। তৃতীয় চতুষ্কে ইহা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে যে, চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলেও মূল চিত্তটি থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথমে তাহাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া লইতে হইবে; তাহাতে আনন্দ অবস্থা লাভ হইবে। আনন্দের আতিশয্যে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে একাগ্র হইবে। এইবারে তীক্ষ্ণ একাগ্রতা সহকারে পরীক্ষা করিয়া, চিত্তের গুপ্ত সংস্কারাদি যাহা কিছু থাকে দূরীভূত করিতে হইবে। সুখ, প্রীতি, আনন্দ প্রভৃতি সমস্তই নির্ব্বাণের

বিরোধী। এই সকলকে নির্ম্মূল করিয়া শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে।

সর্ব্বশেষে চতুর্থ চতুষ্কে 'আনাপানাসতির' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বনে সাধনের সহিত 'বিদর্শন ভাবনা' করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সাধনে চিত্তের যে বিশুদ্ধি জন্মে তাহা সাময়িক ও অসম্পূর্ণ। যেমন পানাপুকুরে ঢিল ছুড়িলে কিছুক্ষণের জন্য ফাঁকা হইয়া আবার উহা বুজিয়া যায়, সাধনের দ্বারা চিত্ত সর্ব্বসংস্কার রহিত হইলেও সংস্কারের মূল থাকিয়া যায়। সুযোগ পাইলে উহা আবার গজাইয়া আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। উহাকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিতে হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসে 'অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা' বলিয়া প্রত্যয় জন্মাইতে হইবে। তখন বৈরাগ্যের উদয় হইবে। কোনও অবস্থাতেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হইবে না। এই প্রকারে নিরোধের দিকে অগ্রসর যতই হইবে ততই সমস্ত বিসর্জ্জিত বা পরিত্যক্ত হইবে। তখনই নির্ব্বাণ লাভ।

সাধক তৃতীয় চতুষ্কের অবস্থায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে 'বিদর্শন ভাবনা' সম্ভবপর হয় না। নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা, বিচার-বিতর্ক, ভুল-ভ্রান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি মনের ভাব বর্ত্তমানে সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি সংস্কার মাত্র। বাস্তবিক তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। কেননা, আমি যাহা পাপ বলিয়া মনে করি, অন্যে তাহাই পুণ্য বলিয়া বুঝিতে পারে। এই সমস্ত সংস্কারবশতঃই আমাদের মিথ্যা ধারণা জন্মিয়াছে—অসার, ক্ষণস্থায়ী সংসারকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি। জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারকে পরম সুখের স্থান মনে করিতেছি। সমস্ত বস্তুতেই 'আমার, আমার' করিয়া আসক্ত হইতেছি। অনিত্য, দুঃখদ, অনাত্মা জগৎকে নিত্য, সুখকর ও পরমাত্মার প্রকাশমান অবস্থা মনে করিতেছি। এই সমস্ত ভ্রান্তি দূর না হইলে, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত অবস্থা লাভ হয় না। ইহা দূর করিবার জন্যই সাধন ভজন। যেমন প্রথমে বড় বৃক্ষের ডালপালা ছাঁটিয়া, গোড়া কাটিয়া দেওয়ায় উহা পড়িয়া গেলে মাটীর নীচ হইতে শিকড় তুলিয়া ফেলা সহজ হয়, তেমনি প্রথমে উপরে উপরে, ভাসা ভাসা সংস্কারগুলি নষ্ট করিয়া, ক্রমে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত সংস্কার উচ্ছেদ করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত 'বিদর্শন ভাবনা' স্বতঃই জাগ্রত হয়। কারণ, তখন মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসই অনুধ্যানের বিষয় থাকে, কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাস কোনও মুহূর্ত্তে এক অবস্থায় স্থির থাকে না। ইহা নিয়তই গতিমান ও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, সমস্তই অনিত্য বোধ হইবে। এই সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসই যত দুঃখের কারণ, ইহা আত্মা নয়—এইরূপ প্রতীতিও জন্মিবে। এই জন্য শ্বাস প্রশ্বাসই অনিত্য, দুঃখদ, ও অনাত্মা বলিয়া প্রতীতি হইবে। কিন্তু 'বিদর্শন ভাবনা' স্থলে আমরা প্রথম হইতেই গুরুদত্ত অপ্রাকৃত শক্তিযুক্ত নাম করি। সর্ব্বসংস্কার রহিত হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসে একাগ্রতা সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে, তখন 'বিদর্শন ভাবনাই' করি আর নামই করি তাহা শ্বাসে প্রশ্বাসে মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে বিদর্শন ভাবনায় অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা বলিয়া প্রতীতি জন্মে, শ্বাসে প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিতে গেলেও ধ্যানের চরমাবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসই নাম, নামই শ্বাস প্রশ্বাস, এরূপ অনুভূতি জন্মে। তখন নামে

কোনও অর্থবোধও জন্মায় না, কোনও রূপের সংস্কারও জাগায় না। স্বভাব হইতে নাম আপনা আপনি হয়; আমি নিশ্চেষ্ট দর্শকের ন্যায় তাহার অনুভব মাত্র করিতে থাকি। এ অবস্থা সম্বন্ধে বাক্য-ভাষায় আর কিছুই প্রকাশ করা যায় না। আর্য্যঋষিরা ইহাকেই 'অবাঙ্মনসগোচর'—বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন, ইহা "অচিন্তেয়ানি ও অচিন্তিতব্যানি" অর্থাৎ চিন্তার বিষয় নয়, চিন্তা করাও যাইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"পতিসোতাগম্মং নিপুনং গম্ভীরং অনুং বাগরত্তা ন দক্খতি তমোখন্দেন আবতা"

রাগদ্বেষযুক্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম গভীর সত্য দেখিতে পায় না। জ্ঞানীরা দেখিলেও প্রকাশ করিতে পারেন না।

চিন্তারাজ্যের অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা একটি ঘটনা হইতে বিশেষরূপে বুঝা যায়। আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবুর স্ত্রী মনোরমা দেবী একসঙ্গে ৪৮ ঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে সমাধিস্থ থাকিতেন। এ বিষয়ে ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন—মাত্র নামানন্দে মগ্ন আছেন, এখনও হয়েছে কি? আস্তিক্য বুদ্ধিই জন্মে নাই। ভাবাভাব রহিত হইয়া, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থায় উপনীত না হইলে তত্ত্ব প্রকাশ পায় না, এবং প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রলাপ বাক্য। এ জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিরুত্তর থাকিতেন; এবং জিজ্ঞাসুকে তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপথে চলিয়া, লক্ষ্যস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করার উপদেশ দিতেন। ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেন—শুধু শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করে যাও—সমস্ত অবস্থা তাতেই লাভ হবে। কিন্তু কি অবস্থা লাভ হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, অথবা নামের প্রতিপাদ্য বস্তু সম্বন্ধেও কোনও প্রকার ধ্যান ধারণা করিতে উপদেশ দেন নাই। সহজ শ্বাস প্রশ্বাসে মনসংযোগরূপ অত্যুর্ব্বরা সাধনক্ষেত্রে শক্তিমান গুরু যে কোনও বীজ বপন করুন না কেন, অতি সহজেই তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া, ক্রমে উহা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে নানক, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সাধন অবলম্বনেই আপন আপন ইষ্ট বস্তু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও এই সাধনের সফলতা বিষয়ে মহাত্মা গম্ভীরানাথজী এবং আমাদের ঠাকুর ইহার ফললাভ সম্বন্ধে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশের প্রারম্ভে ও শেষে বলিয়াছেন—

"একায়নো অয়ং ভিক্খবে....নিব্বানস্স সচ্ছি কিরিয়ায়, যদিদং চত্তারো সতিপট্ঠানো।" ইত্যাদি —অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের পক্ষে ইহাই একমাত্র পথ।

শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই।

"আমতং তেসং বিরুদ্ধং যেসং কায়গতাসতি বিরুদ্ধা।"

যাহারা কায়গতাসতি অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসাদি দেহতত্ত্ব অবলম্বনে সাধন করার বিরোধী, তাহারা নির্ব্বাণেরও পরিপন্থী। ইহাই বুদ্ধের চরম সিদ্ধান্ত।

সর্ব্বশেষে এই সাধনের ফলাফল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন।

"তিট্ঠতু ভিক্খবে অদ্ধমাসো যোহি কেচি ভিক্খবে ইমে চত্তারো সতিপট্ঠানো এবং ভাবেয়্যং সত্তাহং তস্স দ্বিন্নং ফলানং অঞ্ঞতরং ফলং পটিকংখং দিট্ঠেব ধম্মে অঞ্ঞাসতি উপাদিসেসে অনাগামিতা।"

হে ভিক্ষুগণ! যিনি অর্দ্ধমাস কিম্বা সপ্তাহ কাল এই সাধন করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং দেহান্তে অনাগামি হন।

শুনিয়াছি ঠাকুরও বলিয়াছেন—**লামা-গুরুদিগের আচার ব্যবহার ও তাঁহাদের সাধনপ্রণালী না দেখিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝা যায় না। উহাই একমাত্র পন্থা।** গত ২৪শে পৌষ তারিখে গুরুভ্রাতাদিগকে উপদেশ করার সময়েও ঠাকুর বলিয়াছেন—

একমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ দ্বারা আত্মার সমস্ত পাপ, সংশয় নষ্ট হইবে। তখন বিশ্বাস আপনা হইতেই আসিবে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।

ওঁ গুরু।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ

পঞ্চমখণ্ড

(১৩০০ সালের ডায়েরী)

বস্তি ত্যাগ। নীরব অযোধ্যায় রাম নাম।

ভগবান গুরুদেবের কৃপায় দাদার সঙ্গে পরমানন্দে ২/৩ সপ্তাহকাল বস্তিতে কাটাইলাম। শরীর অনেকটা সুস্থবোধ হওয়ায় পাহাড়ে যাইতে অস্থিরতা জন্মিল। হরিদ্বার যাইতে দাদার নিকটে অনুমতি চাহিলাম। তিনি করজোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসন্নমনে আমাকে অনুমতি দিলেন। মহাতীর্থ অযোধ্যায় শত শত মন্দিরে সুলক্ষণযুক্ত মনোরম শিলাচক্র রহিয়াছেন—দাদার বন্ধুদের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ হইতে পারে, এই প্রত্যাশায় অযোধ্যা যাত্রা করিলাম। বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন রাত্রি বারটায় দাদার শ্রীচরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া বস্তি ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। প্রত্যুষে সরযূ তীরে লকরমণ্ডি ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

১২ই - ১৪ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল।

পূণ্যতোয়া সরযূর নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া শরীরটি ঠাণ্ডা হইল, মনও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি পরমানন্দে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে "জয় রাম, জয় রাম" বলিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলাম। এই সেই দয়ার সাগর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকৃত লীলাভূমি শান্তিময় অযোধ্যা—যাহার ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়া কত যোগী ঋষি তপোধনগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, আজও কত মহাপুরুষ ছদ্মবেশে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন! সুর-মুনিবন্দিত নিত্য অযোধ্যাধামে কত দেবর্ষি মহর্ষিগণ আজও অলক্ষিতভাবে রহিয়াছেন এবং সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করিয়া রাম নাম গান করিতেছেন—এই সকল কথা মনে হওয়াতে প্রাণ আমার উথলিয়া উঠিল। আমি ইহলোক-পরলোকবাসী মহাপুরুষগণের চরণোদ্দেশে নমস্কার করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলাম। দেখিলাম—বহুজনতাপূর্ণ অযোধ্যা নীরব নিস্তব্ধ। এত বড় সহর কিন্তু লোক-কোলাহল কিছুই নাই, সর্ব্বত্র সকলেরই মুখে সময়ে সময়ে 'রাম রাম, জয় রাম, সীতারাম' বাহির হইতেছে। কাহারও মুখে বৃথা কথা নাই—কথার

পূর্ব্বে সকলেই রাম নাম বলিতেছে। খরিদ্দার—দোকানীকে বলিতেছে—'রামজি, ভাইয়া রাম রাম হ্যায়? রাম দানা দেও, রাম রস চাহি!' গাড়োয়ান গোয়ালা প্রভৃতি ঘোড়া গরুকে 'রাম রাম' বলিয়া তাড়া দিতেছে—কথা আরম্ভে সকলেরই মুখে রাম নাম! এ রূপটি আর কোথাও দেখি নাই।

হনুমান গৌড়ি দর্শনে ঠাকুরের স্মৃতি। মহাপুরুষ দর্শন।

ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম—'প্রাচীন অযোধ্যায় একমাত্র হনুমান গৌড়িই ঠিক আছে। পর্ব্বে পর্ব্বে ঐ স্থানে হনুমান, বিভীষণ, অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি ঋষিগণ আসিয়া থাকেন।' ভক্তরাজ মহাবীরের আবাসভূমি হনুমান গৌড়ি দেখিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। আমি গুরুদেবের শ্রীচরণ অন্তরে রাখিয়া হনুমান গৌড়িতে পঁহুছিলাম। অযোধ্যার সাধারণ স্থান হইতে এ স্থান অনেকটা উচুঁ। কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া মহাবীরের মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়। প্রশস্ত সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বানর রহিয়াছে দেখিলাম। তাহারা মানুষের গা ঘেঁসিয়া চলিতেছে—কোন প্রকার ভয় নাই। আমি সিঁড়ির উপরে উঠিয়া মহাবীরের মন্দিরের সম্মুখে গেলাম! ঠাকুরের কথা আমার মনে হইল। ঠাকুর আমার ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু অবস্থায়, স্খলিতপদে কোন প্রকারে সিঁড়ির উপরে উঠিয়া গড়াইতে গড়াইতে মন্দিরের নিকটে আসিয়াছিলেন। পরে মহাবীরকে দর্শন করিয়া তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল—তিনি ভাব-বিভোর অবস্থায় কতক্ষণ এই স্থানে পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কথা ভাবিয়া আমার কান্না আসিয়া পড়িল। আমি পুনঃপুনঃ মহাবীরকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম— ভক্তরাজ! তোমার দর্শন বৃথা হয় না, দয়া করিয়া এই জঘন্য দুরাচার, অবিশ্বাসী নাস্তিককে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কণিকামাত্র চরণরজ লাভে কৃতার্থ হইয়া আমার পরম দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবার অধিকারী হইতে পারি—তাঁহার অবিচ্ছেদ সঙ্গ ও একান্ত আনুগত্যই যেন এই জীবনের সম্পদ হয়। দেখিলাম মহাবীরের মন্দিরের বিস্তৃত অঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই নিবিষ্টমনে রামায়ণ পাঠ শুনিতেছেন। বহুসংখ্যক বানরও শ্রোতাদের গা ঘেঁসিয়া হেঁটমস্তকে বসিয়া আছে—যেন একান্ত মনে তাহারাও পাঠ শুনিতেছে। সুন্দরাকাণ্ড পাঠ হইতেছে। বহু জনতার ভিতরে একটি শুভ্রকেশ তেজ-পুঞ্জ-কলেবর বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কিছুক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। রামায়ণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তিনি যেন ভাবের অতলজলে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের যে কি অবস্থা হইল বলিতে পারি না—মনে হইল ঐ বেশে আমার ঠাকুরই বসিয়া আছেন। তাঁহার চরণধূলি লইতে আকাঙ্ক্ষা হইল কিন্তু পাঠান্তে তিনি লোকের ভিড়ে কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন ঠিক পাইলাম না।

বৈদান্তিকের উপর শোক সঞ্চার।

মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অযোধ্যা ষ্টেসনে পঁহুছিলাম এবং একখানা টিকেট করিয়া ফয়জাবাদ যাত্রা করিলাম। ফয়জাবাদ ষ্টেসনে নামিয়া দাদার বন্ধু বাবু জালিম সিংহের বাসায় উপস্থিত হইলাম। জালিম সিং আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বাহিরের একখানা ভাল ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জালিম সিংকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, আপনাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? আপনার কি কোন অসুখ

হইয়াছে? দাড়ি, গোঁফ, চুল এভাবে পাকিয়া গেল কিরূপে?" জালিম সিং কহিলেন—"ভাই সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। আমার পুত্রটি কিছুকাল হয় মারা গিয়াছে। আমার স্ত্রী তাহার শোকে পাগলের মত হইলেন। আমার কিন্তু কিছু লাগিল না। সর্ব্বদা বেদান্তের আলোচনা নিয়া থাকি—স্ত্রীকে আমি বেদান্ত উপদেশ দিতে লাগিলাম। তিন দিন আমার উপদেশ শুনিয়া স্ত্রী ঠাণ্ডা হইলেন— তাঁর শোকাগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হইল—কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতরে তাঁর জ্বালা প্রবেশ করিল, আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি দাড়ি, গোঁফ, মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে।" শোকে এতটা হয় কখনও পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি এ সব কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

ভগবানের নাম করা সহজ নয়।

জালিম সিংহের একটি দয়ার কার্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। পোষ্টাফিসের একটি পিয়ন কোন অপরাধে কার্য্যচ্যুত হইয়া জালিম সিংহের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল— "বাবু সাব্! চাকরি গেল, আমার উপায় কি? আমি যে অনাহারে মারা যাইব।" জালিম সিং কহিলেন—"আচ্ছা, তুমি ৬টা হইতে ১১টা এবং ১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'সীতারাম, সীতারাম' জপ কর, আমি তোমাকে আট আনা প্রতিদিন দিব—তোমার বেতন অপেক্ষাও তিন চারি টাকা বেশী পাইবে। লোকটি খুব সন্তুষ্টির সহিত রাজী হইল, এবং পরদিন হইতে জপে লাগিবে বলিয়া গেল। তিন চার দিন লোকটি কোন প্রকারে জপ করিল। পরে একদিন জালিম সিংকে সেলাম দিয়া বলিল—"বাবু সাব্! এ কাম হাম্‌সে নেই হোগা— দোসরা নক্‌রি দে-জীয়ে—নেহি তো হাম চলা যাতে ঘর।" লোকটি চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য! একটি স্থানে বসিয়া ভগবানের নাম করা এতই কষ্টকর?

অযোধ্যার আশ্রম ও দেব-মন্দির।
হিরণ্যগর্ভ চক্র লাভ।

ফয়জাবাদের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বলদেবপ্রসাদ এবং লালতাপ্রসাদ প্রভৃতি দাদার বন্ধুগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা আমাকে অযোধ্যার বড় বড় মন্দির ও আশ্রমে লইয়া গিয়া শালগ্রাম দেখাইলেন। এক এক মন্দিরে সহস্র সহস্র শালগ্রাম দর্শন করিলাম। কিন্তু একটিও আমার পছন্দমত হইল না। প্রাচীন অনেক মন্দিরেই নানা আকারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণযুক্ত শিলাচক্র ধামা ভরিয়া রাখিয়াছে—দেখিলাম তুলসী-চন্দন মিশ্রিত জলধারা এক সঙ্গে তাঁহাদের স্নান হয়। পূজা ভোগ আরতিও এক সঙ্গেই হইয়া থাকে। বিগ্রহের সম্মুখে কয়েকটি বিশিষ্ট শালগ্রাম রহিয়াছে তাঁহাদেরই মাত্র সাজসজ্জা পূজাভোগাদি বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে। বহুকাল যাবৎ এ সকল বিগ্রহের সেবা পূজা ভোগ আরতি অবাধে প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে—ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এক একটি আশ্রমে শত শত কখন বা সহস্রাধিক সাধুরও অবস্থান হয়। সকলেই আপন আপন আসনে উপবিষ্ট—কেহ নিবিষ্টভাবে নাম জপে মগ্ন আছেন

কেহ ধুনির সম্মুখে ধ্যানস্থ, কেহ বা রামায়ণ পাঠে বিভোর—দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অসংখ্য লোকের আবাসস্থান, এই সকল আশ্রম নীরব ও নিস্তব্ধ—কখন কখন কোন কোন স্থানে "রাম রাম সীতারাম' ধ্বনি মাত্র হইতেছে, সমস্ত আশ্রমই ভগবদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ—দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম।

কোনও প্রসিদ্ধ মন্দিরের ভজনানন্দী বৃদ্ধ মহান্ত আমাকে একটি শিলাচক্র দিয়া বলিলেন—"আপনি এটি গ্রহণ করুন—ইহার নাম হিরণ্যগর্ভ। বহুকাল এই মন্দিরে ইনি শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আমি ইহা ঠাকুরেরই ইচ্ছা মনে করিয়া শালগ্রামটি গ্রহণ করিলাম; কিন্তু পছন্দমত হইল না। স্থির করিলাম, আর আমি শালগ্রাম সংগ্রহের চেষ্টা করিব না—ঠাকুরের বাক্য অন্যথা হইতে পারে না, সুন্দর শালগ্রাম আমার নিশ্চয়ই জুটিবে— যত দিন না জোটে এটিই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিব।

গুপ্তারঘাটে শ্রীরামচন্দ্রের অন্তঃলীলা স্মরণে শোকোচ্ছ্বাস।

কয়েকটি সৎসঙ্গীর সঙ্গে ফয়জাবাদের পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তারঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ঘাটের শাস্ত্রীয় নাম গোপ্রান্তর। অযোধ্যা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ অন্তরে সরযূর তীরে এই ঘাট অবস্থিত। ঘাটটি সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত বড়ই সুন্দর। ঘাটের উপরে সুচারু কারুকার্য্য সমন্বিত কয়েকটি মন্দির তাহাতে রামসীতা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভাল ভাল ভজনানন্দী সাধু মহাত্মারা আসিয়া এই স্থানে নির্জ্জন বাস করেন। সাধন-ভজনের জন্য এই স্থান বড়ই উপযোগী। ঘাটের উপরে বসিয়া সরযূ দর্শন করিতে লাগিলাম। কত কথা মনে আসিতে লাগিল! এক সময়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্ত্যলীলা এইস্থানেই অবসান হয়—সেই সময়ের দারুণ মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল প্রাণে উদয় হওয়ায় আমার শরীর মন শিথিল হইয়া আসিল। আহা! সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবানও নিয়তিকে অতিক্রম করেন না। স্বেচ্ছাকৃতবিধানে স্বয়ং আবদ্ধ হইয়া সংসারের অশেষ যন্ত্রণা সাধারণ লোকের মতই ভোগ করেন। শুনিয়াছি বিধির বিধানানুসারে ক্রূরকর্ম্মা কালপুরুষ ভগবান ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরামকে বলিলেন—"বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি বিষয় বলিবার জন্য আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমাদের কথোপকথন কালে যদি কোন ব্যক্তি আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়েন তাহা হইলে তিনি আপনার বধ্য হইবেন; ইহা আপনি অঙ্গীকার করিলে আমার বক্তব্য বিষয় আপনাকে বলিতে পারি।" কালপুরুষকে ঋষি প্রেরিত দূত জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন এবং চিরানুগত দৃঢ়কর্ম্মা লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া নির্জ্জনস্থলে কালপুরুষের কথা শুনিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ অমোঘতেজা ঋষি দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমার কোন বিশেষ প্রয়োজনে এখনই আমি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" লক্ষ্মণ বলিলেন—'ভগবন্! আপনার যাহা প্রয়োজন দয়া করিয়া আমাকে আদেশ করুন, আমি এখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেছি।' দুর্ব্বাসা বলিলেন— "ওহে! না কিছুতেই তাহা তোমা দ্বারা হবে না—আমি রামকেই চাই। যদি তুমি

রামের নিকট যাইতে আমাকে বাধা দেও আজ এখনই শ্রীরাম সহিত সমস্ত অযোধ্যা দগ্ধ করিয়া চলিয়া যাইব নিশ্চয় জানিও।" লক্ষ্মণ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন ভাবিলেন—ঋষিকে যদি শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে যাইতে বাধা দেই—এখনই তিনি সমস্ত অযোধ্যা ধ্বংস করিবেন, আর আমি যদি ঋষির আগমন সংবাদ শ্রীরামকে দেই, আমিই মাত্র বধ্য হইব। সুতরাং তাহাই করা সঙ্গত। ঋষির কথা বলিবার জন্য লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত হইলেন—কালপুরুষ "সিদ্ধকাম হইলাম" বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র ঋষির নিকটে করজোড়ে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনার বিশেষ প্রয়োজনীয় কি বিষয় আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে আদেশ করুন।" ঋষি বলিলেন—আমি পেট ভরে খাব বহুকাল অনশনে আছি—আমাকে খাওয়াও। শ্রীরামচন্দ্র ঋষিকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইলেন। এই সামান্য বিষয় লক্ষ্মণ দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না; রামকেই চাই—ঋষির এই প্রকার জেদ শুধু নিয়তিবশেই হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণকে অতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন—"আপনার জনের পক্ষে ত্যাগ বা বধ উভয়ই সাধুগণের চক্ষে সমান। সত্যরক্ষার্থে অদ্য আমি তোমাকে বর্জ্জন করিলাম।" শ্রীরামের একান্ত ভক্ত লক্ষ্মণ, রামশূন্য জীবন বৃথা মনে করিয়া সরযূতে ঝাঁপ দিলেন। সরযূ উজান বহিয়া লক্ষ্মণকে এইস্থানে লইয়া আসিলেন—লক্ষ্মণ "জয় রাম, জয় রাম" বলিতে বলিতে এইস্থানেই অন্তর্ধান হইলেন। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ "রাম রাম" বলিয়া সরযূতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং লক্ষ্মণেরই অনুগমন করিবেন স্থির করিলেন। ইহার পর অচিরেই রামচন্দ্র সরযূতে উপস্থিত হইলেন। তখন অযোধ্যাবাসী জনমানব পশু পক্ষী সকলেই "হা রাম, হা রাম" বলিতে বলিতে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। "প্রাণারাম রামকে ছাড়িয়া কি প্রকারে আমরা দেহ ধারণ করিব," ভাবিয়া তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরামের সঙ্গেই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তখন ভক্তবৎসল রামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের লইয়া এই স্থানেই সরযূর অতল জলে চিরতরে অদৃশ্য হইলেন। সেই সময়ের দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শোকাভিভূত অবস্থায় কতক্ষণ ঘাটে পড়িয়া রহিলাম, পরে সন্ধ্যার পরে জালিম সিংহের সহিত বাসায় আসিলাম।

ভীষণ স্বপ্ন—মাতার প্রতি অত্যাচার।

শেষ রাত্রিতে অতি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক একটি স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া পড়িলাম। কত প্রকার উদ্বেগই মনে আসিতেছে—হায়! মা আমার পরম সৌভাগ্যবতী হইয়াও আমা দ্বারা অভাগিনী হইয়াছেন। মা'র এক পলকের স্নেহদৃষ্টির ধার—শত শত জন্মেও কণিকামাত্র শোধ করা যায় না! হায়, আমি সেই স্নেহময়ী মা'কে চিনিলাম না! গত রাত্রে মার প্রতি যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি—মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্মরণ-ক্লেশকর ভীষণ স্বপ্নের স্মৃতি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়—ঠাকুরের শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা। এই অভিপ্রায়েই ডায়েরীর এই স্থলে স্বপ্ন বিবরণ আর লিখিলাম না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঠাকুরকে এই 'স্বপ্ন' বৃত্তান্ত বিস্তারিত বলিয়া এইপ্রকার স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা

১৫ই বৈশাখ।

রহিল। ফয়জাবাদ আমার নিকট শ্মশান হইল— এখন যত শীঘ্র হয় এই স্থান ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচি।

হরিদ্বারে হরগৌরীর অনুপম জ্যোতিঃদর্শন।

ফয়জাবাদে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। পাহাড়ে যাইতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। যথাসময়ে ষ্টেসনে যাইয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে লাকসার ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল। দু' এক ষ্টেসন অগ্রসর হইয়াই হরিদ্বারে পাহাড় দেখিতে পাইলাম। দেবাদিদেব মহাদেব ভাবে বিভোর হইয়া অহর্নিশি ঢুলু ঢুলু অবস্থায় এই পাহাড়েই নাকি উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন। পরমারাধ্যা ভগবতী পার্ব্বতী স্বামীরূপে মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য এই পাহাড়েই কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। আমি একান্তপ্রাণে সদ্‌গুরুরূপী সদাশিবকে স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলাম। প্রাণ আমার কাঁদিয়া উঠিল। আমি হর-পার্ব্বতীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুলপ্রাণে পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। জ্বালাপুর পঁহুছিয়া নীল পর্ব্বতের উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গ সকল সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। উহাতে অসংখ্য শ্বেত ও নীল জ্যোতিঃ ক্ষণপ্রভার ন্যায় ঝিকি-মিকি করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই লয় পাইতেছে, দেখিলাম। এই জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু সকল কখনও খণ্ডাকারে, কখনও বা একাধারে মিলিত হইয়া অপূর্ব্বজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হরিদ্বার ষ্টেসনে পঁহুছিলাম।

১৬ই বৈশাখ।

আমি নতশিরে নিম্নদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্বচ্ছভূমির অভ্যন্তর হইতে স্বর্ণবর্ণ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ব্বিম্ব সকল বিবিধ আবর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

মহামায়া ভগবতীর অনুপম রূপের ছটা মনে করিয়া বারংবার উহাকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। চিত্ত আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে, ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। মা যোগমায়ার অস্থি গঙ্গাজলে, এই কুণ্ডেই সমাহিত হইয়াছিল মনে পড়িল। এখানে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে ঘাটের উপরে একখানা কুটীরে বসিয়া স্থিরভাবে নাম করিতে লাগিলাম।

জলদান ব্রত।

বেলা প্রায় দুইটার সময়ে, 'কোথায় থাকিব' মনে হওয়ায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। অমনি ঝোলাঝুলি একটি মুটিয়ার মাথায় তুলিয়া কনখলে রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে চলিলাম। দারুণ রৌদ্রে উত্তপ্ত ধূলাবালির উপর দিয়া কিছুক্ষণ নগ্নপদে চলিয়া অত্যন্ত ক্লেশ হইতে লাগিল, পা আমার পুড়িয়া যাইতে লাগিল। এ সময়ে কোথায় যাই কোন স্থানে গিয়া দাঁড়াই, ভাবিতে লাগিলাম। কিছুদূর চলিয়া দেখি—রাস্তার বামদিকে একটি আশ্রমের দ্বারে গৈরিকধারী বৃদ্ধ একজন সন্ন্যাসী জলদান করিবার জন্য বসিয়া আছেন। বরফতুল্য সুশীতল জল কয়েকটি জালা ভরিয়া রাখিয়াছেন। শ্রান্ত পথিকদের দেখিলেই তাহাদের ডাকিয়া জল প্রদান করেন এবং শীতল বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করেন। বেলা এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সাধুর ইহাই কার্য্য। সন্ন্যাসীর

কার্য্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। পিপাসার্ত্ত পথিকেরা প্রচণ্ড রৌদ্রে কাতর হইয়া যখন এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং বড় বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসিয়া জলপানে ঠাণ্ডা হয়েন তখন তাঁহারা কেমন তৃপ্তি লাভ করেন, ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল সাধুর এই কার্য্য পরমধর্ম্ম। যিনি শত শত পিপাসার্ত্তকে সুশীতল জলদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার কার্য্যে যে আনন্দ লাভ করেন, কঠোর তপস্যা ব্রত নিয়ম যাগ যজ্ঞাদিতে কখনও তেমন সন্তোষলাভ করেন না। সদাচারভ্রষ্ট নিতান্ত দুরাচার কোন ব্যক্তি যদি শুধু এই জলদান ব্রতই অবলম্বন করেন, ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়েন।

সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া হরিদ্বারে আমার আসার উদ্দেশ্য জানাইলাম। তিনি খুব সন্তুষ্টির সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—নিশ্চয় তোমার সুবিধা হইবে। ভগবান সদিচ্ছা পূর্ণ করেন।

রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রয় গ্রহণ।
মক্ষিকার উৎপাতে রক্ষা।

সাধুব নিকট হইতে বাহির হইয়া আমি রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বারে একটি লোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বামিজী। আমি রামপ্রকাশ মহান্তের সহিত দেখা করিতে চাই, তিনি কোথায়? তিনি বলিলেন—'আপনার কি প্রয়োজন বলুন—আমিই রামপ্রকাশ মহান্ত।' আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া হরিদ্বারে আমার আসিবার কারণ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম এবং যতদিন পাহাড়ে থাকার সুবিধা না হয় এই আশ্রমেই থাকিতে পারিব কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া থাকিবার অনুমতি দিলেন এবং শিষ্যদের ডাকিয়া আমাকে দোতালায় লইয়া যাইতে বলিলেন। আমি আরও আদর পাওয়ার মানসে মহান্তের পরিচিত আমার একটি বন্ধুর কথা বলিয়া তাহার একখানা অনুরোধ-পত্র মহান্তের হাতে দিলাম। তিনি একটু দেখিয়া পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন— 'একে আমি চিনি না। এখানে কত বাঙ্গালী আসেন যায়েন। বাপ মা ছাড়িয়া তাদের স্মরণ করিতে তো আমি সাধু হই নাই; আপনি আমার নিকটে আসিয়াছেন, এখন আপনাকেই আমি চিনি। আপনি অতিথি আমার দেবতা—এখানে চিঠিপত্রের প্রয়োজন হয় না—আপনি এদের সঙ্গে চলুন।' আমি মহান্তের শিষ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মহান্তও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। উপরে উঠিয়া সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র, ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য মৌমাছি আসিয়া পড়িল। আমার অগ্রগামী কয়জন সাধু সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে আমাকে চীৎকার করিয়া "শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন" বলিতে লাগিল। সিঁড়িতে পা না দিতেই মক্ষিকারা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং ভন্ ভন্ করিয়া আমার অনাবৃত অঙ্গের সর্ব্বত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। আমি নিরুপায় দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মহান্ত আমাকে ধাক্কা দিয়া একপাশে সরাইয়া উপরে উঠিয়া পড়িলেন। আমিও ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি—মহান্ত এবং তাঁহার দুই তিনটি শিষ্য মেজেতে পড়িয়া আহা, উহু, গেলাম, ম'লাম করিতেছেন; প্রত্যেককে অন্ততঃ ১৫/২০ টি স্থানে মক্ষিকা দংশন করিয়াছে। আমার হাতের চাপে পড়িয়া একটি মক্ষিকা আমাকে সামান্য দংশন করিয়াছে বটে,

কিন্তু অসংখ্য মৌমাছি সেই সময় গায়ে পড়িয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। দংশন স্থানেও ৪/৫ মিনিটের অধিক সময় বেদনা রহিল না। ইহা পরিষ্কার গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আর কি বলিব? এই ঘটনায় মহান্ত ও তাঁহার শিষ্যগণ আমাকে শক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ ঠাওরাইয়া লইলেন। মন্দ নয়! "ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে" —এ যে তাহাই হইল!

রামপ্রকাশ মহান্ত আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। তাঁর থাকার পাশের ঘরে আমাকে আসন করিতে বলিলেন। চণ্ডী পাহাড় অথবা তন্নিকটবর্ত্তী যে কোন স্থানে আমার থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন স্বীকার করিলেন। আগামী কল্য চণ্ডী পাহাড়ে যাইয়া স্থান দেখিয়া আসিব স্থির করিলাম। মহান্ত তাঁহার একটি শিষ্যকে আমার সহিত যাইতে আদেশ করিলেন। রাত্রিটি কোন প্রকারে কাটাইলাম। মোটা মোটা রুটি, লুণ ও লঙ্ক' দিয়া আহার হইল। উহাদের রশুন দেওয়া ডাল আমি খাইতে পারিলাম না।

চণ্ডী পাহাড়ে যাত্রা। গঙ্গার বন্ধন।

শ্রীযুক্ত রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে থাকিয়া আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। নিত্যকর্ম্ম করিবার কোন প্রকার সুবিধাই এই স্থানে নাই। মহান্তজীর একটি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডী পাহাড়ে রওয়ানা হইলাম। কনখল ও হরিদ্বারের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—গঙ্গার অপর পার পর্য্যন্ত একটি পোল রহিয়াছে। লোকে এই পোলকে 'দাম' বলে। সরকার বাহাদুর গঙ্গাবক্ষে কতকগুলি সুন্দর প্রস্তরময় থাম (পিলার) প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে লৌহ কপাট বসাইয়াছেন। এই কপাট বন্ধ করিয়া গঙ্গার জল দাম সংলগ্ন একটি বিস্তৃত কাটা খাল দিয়া চালাইয়া দেন। খাল পরিপূর্ণ করিয়া যেটুকু জল থাকে, তাহাই মাত্র গঙ্গার স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত হয়। তাহা অতি সামান্য ৮/১০ হাত প্রস্থ ও ২/৩ হাত গভীর হইতে পারে। গঙ্গার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। অন্তর যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এক সময়ে যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, ঋষিদের সেই ভবিষ্যৎ বাণী মনে পড়িল—"ক্বচিৎ ছিন্না ক্বচিৎ ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী। ভবিষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞে, তদৈব প্রবলা কলিঃ।" আমি চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিতে কাঁদিতে মা গঙ্গাকে বলিলাম—পতিতোদ্ধারিণি আনন্দদায়িনি মা! যদি ভগবান গুরুদেব আমাকে কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী করেন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে সেই শক্তি তোমার বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রয়োগ করিব। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন যেন তোমার বন্ধন-শেল আমার বুকে বিদ্ধ থাকিয়া, আমাকে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করে।

১৮ই - ৩০শে বৈশাখ
১৩০০ সাল।

তপস্যার স্থান নির্দ্দেশ।

দাম পার হইয়া পঁহুছিয়া দেখি, চণ্ডীর রাস্তার বামপার্শ্বে গঙ্গার উপরে একটি সুন্দর আশ্রম। তথায় প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে একখানা পর্ণ কুটীর, তাহাতে একটি সাধু বাস করেন। সাধুর নাম আত্মানন্দ, তিনি আমাদিগকে খুব আগ্রহের সহিত আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমরা আশ্রমে প্রবেশ

করিয়া বট-বৃক্ষমূলে বসিলাম। স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। আশ্রমের নীচে পশ্চিমদিকে স্বচ্ছসলিলা পতিতপাবনী গঙ্গা কল কল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছেন। গঙ্গার পাড়ে মায়াপুরী হরিদ্বার, তৎপশ্চাৎ বিল্বকতীর্থ শোভিত মনোরম বিল্বকেশ্বর পাহাড়। উত্তরে গঙ্গার বিস্তৃত চড়া তৎপরে হিমালয়ের ক্রমোন্নত পর্ব্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে আশ্রমের অনতিদূরে গঙ্গার নির্ম্মল নীল ধারা—তদুপরি নীল সরস্বতীর আবির্ভাব স্থল নয়নরঞ্জন নীল পর্ব্বত উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গসমূহে শোভামান। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে শ্রীচণ্ডী প্রতিষ্ঠিতা। তাই লোকে ইহাকে "চণ্ডী পাহাড়" বলে।

আমার ভাগবত গ্রন্থে পাহাড়ের যে চিত্র পড়িয়াছিল—এই স্থান হইতে পাহাড়ের দৃশ্য অবিকল সেই প্রকার। পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর রূপ দর্শনে ঠাকুরের রূপ উজ্জ্বলরূপে জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চোখ আর ফিরাইতে পারিলাম না, স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। নামটি জীবন্তশক্তিরূপে আপনা-আপনি বাহির হইতে লাগিল। কতক্ষণ যেন অভিভূত হইয়া রহিলাম। পরে মহান্তের শিষ্য সহিত চণ্ডী পাহাড়ে যাত্রা করিলাম। ফিরিবার সময়ে আবার আশ্রম হইয়া যাইতে আত্মানন্দ জেদ করিয়া বলিলেন। আমি স্বীকার করিলাম। ভজনের অনুকূল এমন একটি স্থান ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাহ—স্থানটি ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইতে লাগিল।

আশ্রম হইতে পাহাড়টি দেখিয়া মনে হইয়াছিল ৫/৭ মিনিট অন্তর; কিন্তু চলিতে চলিতে বুঝিলাম অর্দ্ধ ক্রোশের কম নয়। চণ্ডী পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। রাস্তা অতি দুর্গম। উভয় পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। শুনিলাম, তাহাতে অসংখ্য হিংস্র জন্তুর বাস। স্থানে স্থানে সংকীর্ণ পথের সংলগ্ন ভয়ঙ্কর গভীর অন্ধকার গহ্বর। একটু পদস্খলন হইলেই কোন অতলতলে গিয়া পড়িব—জানি না। এক সময়ে জিমনাস্টিক ভাল অভ্যস্ত ছিল বলিয়া পাহাড়ে উঠিতে কষ্ট হইল না।

চণ্ডী পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে মা চণ্ডীর মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বহু দর্শনার্থী পাহাড়টিকে পরিপূর্ণ করিয়া আছে। মায়ের পূজা দিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে। আমিও মা'কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। নীচে নামিয়া পাহাড়ের পাদদেশে নরমাংসাশী সিদ্ধ অঘোরী কামরাজের আশ্রম দেখিলাম। আশ্রমটি একেবারে নির্জ্জন। সমস্ত পাহাড়ে একটিও লোকালয় নাই। ব্যাঘ্র ভল্লুক সমাকীর্ণ এই মহাবনে একাকী বাস সহজ শক্তির পরিচয় নয়।

নীলধারা পার হইয়া দামপাড় আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী আমার হরিদ্বারে আসার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, এই আশ্রমে যে কোন স্থানে একখানা কুটীর করিয়া আমাকে থাকিতে বলিলেন। চণ্ডী পাহাড়ে থাকা সহজসাধ্য নয় তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। চণ্ডী পাহাড়ে ভজন- কুটীর করিয়া থাকা একেবারে অসম্ভব। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুর বাস, আর ওখান হইতে ভিক্ষা করারও নিতান্ত অসুবিধা। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ আসিয়া হরিদ্বার বা কনখলে ভিক্ষা করিতে হইবে। তারপর বর্ষার সময়ে নীলধারা পার হওয়ার উপায় নাই। বর্ষার পূর্ব্বেই ৩/৪ মাসের আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কোন আপদ্-বিপদ্ ঘটিলে সব অন্ধকার- একটি

জন-প্রাণীও চক্ষে দেখা যাইবে না। আত্মানন্দের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, চণ্ডী পাহাড়ে আর বর্ত্তমান অবস্থায় থাকা অসম্ভব। আত্মানন্দ আমাকে বলিলেন—দাদা। তুমি এখানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন কর। আমি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে খাওয়াইব এবং সর্ব্বদা তোমার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিব। আমিও দেখিতেছি—এই স্থান হইতে আমার কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। ভজনের অনুকূল এমন একটি স্থান জীবনে কোথাও দেখি নাই। ভাবিলাম— আসিবার সময় ঠাকুর যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এমন কিছু বুঝায় না যে চণ্ডী পাহাড়েই আমাকে থাকিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন— এরূপ পাহাড় যেখানে দেখ্‌বে সেইখানেই আসন কর্‌বে। চণ্ডী পাহাড় এক এক স্থান হইতে এক এক প্রকার দেখায়, কিন্তু এখান হইতে পাহাড়ের দৃশ্য ভাগবতের চিত্রের অনুরূপ; সুতরাং এই স্থানে থাকাই বোধ হয় ঠাকুরের ইচ্ছা।

আত্মানন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত এই আশ্রমে সম্প্রতি তাঁহার কুটীরেই আমাকে থাকিতে বলিলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। দামপাড়ে থাকিব মনে করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সকল রকমেই এই স্থান সুবিধাজনক। আমি সঙ্গীটিকে সঙ্গে লইয়া রামপ্রকাশ মহান্তের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। মহান্ত আমার মুখে দামপাড় ও পাহাড়ের সমস্ত কথা শুনিয়া আমাকে দামপাড়ে থাকিতেই বলিলেন। সহজে সহরের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা পাওয়া যায়, ভজনের এমন একান্ত নির্জ্জন স্থান দামপাড়ের মত আর নাই। মহান্তের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া কল্যই দামপাড়ে যাইব স্থির করিলাম।

ভজন – কুটীর প্রস্তুত।

পাঁচ ছয় দিন যাবৎ দামপাড়ে আসিয়াছি। ঘর একখানা প্রস্তুত করাইতে আত্মানন্দকে বিস্তর খোসামুদি করিতেছি— আত্মানন্দও খুব চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে মজুর জুটিতেছে না। হরিদ্বার বা কনখল হইতে কেহ দামপাড়ে আসিতে চায় না। আত্মানন্দের ঘরে একপাশে আসন করিয়া আছি— ঘরখানা খুব ছোট, নানা বস্তুতে পরিপূর্ণ। অবিশ্রান্ত প্রবল বাতাস ও প্রচণ্ড রৌদ্রের জন্য বাহিরে বসা যায় না। বটগাছের নীচে বসিতে খুব আরাম, কিন্তু চণ্ডী দর্শনার্থী যাত্রীরা যাতায়াতের সময় বেলা প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত দলে দলে আসিয়া এই গাছের তলায় বিশ্রাম করেন। আত্মানন্দ তাহাদেব তামাক জল দিয়া সেবা করেন— তাহারাও দু'চার পয়সা দেওয়াতে আত্মানন্দের বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু আমার বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। নিত্যকর্ম্ম বন্ধ হওয়ায় আমার মনের ও শরীরের সুখ নাই। বিষম বিরক্তি ও যন্ত্রণা হইতে লাগিল। শরীরও ক্রমশঃ কাতর হইয়া পড়িল।

সপ্তম দিন ভোরবেলা নিত্যকর্ম্মের সুবিধা করিতে না পারায় এতই কষ্ট হইল যে, ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—গুরুদেব! এবার নিরুপায় হইয়া তোমার দিকে তাকাইতেছি—ঘরের ব্যবস্থা করিয়া না দিলে এই ক্লেশ আমি সহ্য করিতে পারিব না—ঠাকুর! ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দেও, নাহলে আমি আবার তোমারই নিকটে উপস্থিত হইব। নিজের চেষ্টায় কিছুই হইবে না, পরিষ্কার বুঝিলাম। আশ্চর্য্য গুরুদেবের দয়া! সকালবেলা শৌচান্তে স্নান করিয়া

আশ্রমে আসিয়া দেখি ক্যানেলের ম্যানেজার বাবু মজুর লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। আত্মানন্দ কথায় কথায় তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন— একটি ব্রহ্মচারীর ঘরের অভাবে বড়ই কষ্ট হইতেছে- মজুর জুটিতেছে না। এই কথা স্মরণ হওয়ায় ম্যানেজার বাবু আজ ৫টি মজুর লইয়া আসিয়াছেন। আত্মানন্দ মজুরদিগকে আমার পছন্দ মত ঘর প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন। আত্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাহার কুটীরের সম্মুখে আমার ঘর করি। কিন্তু তাহাতে ভজনের বহু বিঘ্ন ঘটিবে বুঝিয়া প্রায় ১৫০ হাত তফাতে স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। একটী পুরান ঝাপড়া শিংশপা বৃক্ষের মূলে কুটীর আরম্ভ হইল। আনন্দে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঘরখানা দুই তিন দিনের মধ্যেই হইয়া গেল। আমার বড়ই পছন্দ মত হইয়াছে। কুটীরখানা ৬ ফুট প্রস্থ ও ৮ ফুট দীর্ঘ করিয়াছি। আসনে বসিলে সম্মুখে হিমালয় পর্ব্বত, বামে অর্দ্ধ-মিনিট অন্তরে গঙ্গা ও মায়াপুরী, দক্ষিণে নীলধারার উপরে বিশাল নীলগিরি— দেখিতে বড়ই মনোরম। যেদিকে তাকান যায় চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। উত্তরাভিমুখে আসন করিয়া সামনে হোমকুণ্ড করা হইল। আত্মানন্দের অনমুতি লইয়া ভজন-কুটীরে প্রবেশ করিলাম এবং রুটিন্ অনুসারে উৎসাহের সহিত সাধন-ভজন করিতে লাগিলাম।

ভিক্ষায় বিপদাশঙ্কা—মহামায়ার খেলা।

দামপাড়ে আসিয়া সাত দিন আত্মানন্দের কুটীরে রহিলাম। আমি ভিক্ষা করিব শুনিয়া আত্মানন্দ খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন— দাদা! সেটি হবে না, যতদিন আমার ঘরে থাকিবে আমার যাহা জোটে তাহাই খাইবে। তোমার ঘর হইলে ভিক্ষা করিয়া খাইও। আমি আত্মানন্দের আশ্রয়ে আছি— তাই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেদ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। আত্মানন্দ ৪/৫টি গরু পোষেন, প্রচুর দুগ্ধ হয়— প্রত্যহ আমাকে অর্দ্ধ সের দুধ দিতে লাগিলেন।

অতি প্রত্যূষে স্নানান্তে নিজ কুটীরে আসন করিয়া বসিলাম। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত সাধনে পরমানন্দে কাটাইলাম। ভিক্ষায় যাইতে প্রস্তুত হইয়া আত্মানন্দকে জানাইলাম। আত্মানন্দের নিকটে কয়েকটী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাকে বলিলেন—হরিদ্বারে বিস্তর সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা আছে। মধ্যাহ্নে আহারের সময়ে উপস্থিত হইলে ডাল-রুটি পাওয়া যায়, কিন্তু কাঁচা ভিক্ষা কেহ দেয় না, নিয়ম নাই। গৃহস্থেরা কাঁচা ভিক্ষা— ডাল আটা দিয়া থাকে। অপরাহ্নে অসময়ে আপনি কোথায় গিয়া ভিক্ষা কর্‌বেন? আমি গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা করিব শুনিয়া তাঁহারা সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন— তা হলেই হয়েছে?.আপনি আর যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু গৃহস্থদের বাড়ি কখনও ভিক্ষায় যাবেন না। আমি বলিলাম—কেন, সর্ব্বত্রই ত গৃহস্থদের বাড়ী লোকে ভিক্ষা করে? সন্ন্যাসীরা বলিলেন— তা আমরা জানি। সর্ব্বত্র তো এই মায়াপুরী নাই? এখানে যে মহামায়ার বিষম খেলা। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে কখনও এই বেশে গৃহস্থ বাড়ীতে যাবেন না। মেয়েরা বড়ই উৎপাত করে। সাধু-সজ্জন, সিদ্ধপুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিলে— সেই পুত্র সবল সুস্থ সর্ব্ববিষয়ে গুণবান ও দীর্ঘজীবী হইবে— এদিকে কারো কারো এই বিশ্বাস, তাই তাহারা

সাধুদের পাইলে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যায়— পশ্চাতে থাকিয়া কেহ বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। পরে যে প্রকারে হউক সাধুদের সর্ব্বনাশ করে।

আমি। গৃহস্থদের বাড়ীতে কি একটি বই মেয়েছেলে থাকে না? তাদের কি কারো নিকট লজ্জা ভয় নাই? সন্ন্যাসীরা বলিলেন— মধ্যাহ্ন আহারের পর পাণ্ডারা বাড়িতে থাকে না, যাত্রী ধরিতে যায়। তারপর অপকর্ম্ম করিলেই লজ্জা ও অপমানের ভয়। কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কিছু ত তাহারা করে না। সাধু সজ্জন দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইলে বংশ উদ্ধার হইবে— ইহাই তাহাদের সংস্কার। সদ্‌বুদ্ধিতে যাহা করে তাহাতে আর লজ্জা ভয় কি? কৃতকার্য্য হইলে বরং তাহারা গৌরব মনে করে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। সৃষ্টিছাড়া এদের আচার-ব্যবহার!

জয়পুরের মহারাজার গুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলিলেন— "নিরুপদ্রবে থাকিতে পারিলে বিপদের স্থানে যাবেন কেন? দেখুন আমি অল্প বয়সে উপনয়নের পর দণ্ড লইয়া বাহির হই, কয়েক বৎসর নবদ্বীপে থাকিয়া টোলে অধ্যয়ন করি। পরে দেশ-ভ্রমণে কয়েক বৎসর কাটাই। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি হরিদ্বারে আসি। ভগবানের কৃপায় তখন আমার গুরু লাভ হয়। একটি নৈষ্ঠিক মহাত্মার নিকট আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ৪৯ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশমত সদাচার রক্ষা করিয়া সাধন-ভজনে কাটাই। অদম্য উৎসাহ-উদ্যমে গুরুর সঙ্গে নানাস্থানে থাকিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করিয়া আমার নিজের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। আমি স্বাধীনভাবে চলিব স্থির করিয়া গুরুর সঙ্গত্যাগ করিলাম এবং পুনরায় হরিদ্বারে আসিলাম। কিছুদিন আমি বেশ ছিলাম। পরে ভিক্ষার, ব্যাপারে স্ত্রীলোকের সংস্রব হেতু তাহাদের প্রলোভনে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। বৃদ্ধাবস্থায় ৫০ বৎসর বয়সে আমি চিরকালের জন্য ব্রহ্মচর্য্য রত্ন হারাইলাম। আমার সর্ব্বনাশ হইল। ৩/৪ মাস পর্য্যন্ত আমার খেয়ালই হইল না— কি করিতেছি, পরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমার হুঁস হইল। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া গুরুর নিকটে উপস্থিত হইলাম। গুরুদেব দয়া করিয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সন্ন্যাস ব্রত দিয়া দিলেন। তাই বলি স্ত্রীলোকের প্রলোভনকে সহজ ভাবিবেন না!" দণ্ডীস্বামীর কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। মনে হইল— আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দম্ভপূর্ব্বক গুরুসঙ্গ ত্যাগ করারই এই পরিণাম। আমি দুই ক্রোশ রাস্তা ঘুরিয়া একটি ধর্ম্মশালা হইতে খোসা সহিত কড়ায়ের ডাল ও আটা ভিক্ষা করিয়া আশ্রমে আসিলাম। ভাবিলাম— একমুঠা আটা ও এক ছটাক ডালের জন্য এত পরিশ্রম ও এত সময় নষ্ট করা সহজ পরীক্ষা নয়।

স্থূল ভিক্ষার প্রয়োজন ও আদেশ।

প্রতিদিন দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ যাতায়াতে হয়রান হইয়া একমুঠ আটা সংগ্রহ করিতে বড়ই বিরক্তি জন্মিল। সাধুরাও আমাকে— নিত্য ভিক্ষা করা এস্থানে থাকিয়া অসম্ভব, গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলেই দাম খুলিয়া দেয়, তখন এস্থান হইতে কোথাও যাতায়াতের উপায় থাকে না। নিত্য ভিক্ষার চেষ্টায় প্রত্যহ দুই ঘন্টা কাটাইলে, ভজনেরও বিষম বিঘ্ন। সাধুদের কথা আমার ভাল বলিয়াই

মনে হইল। আমি ঠাকুরকে এ স্থানের সমস্ত অবস্থা লিখিয়া স্থূল ভিক্ষা করিব কিনা জানিতে চাহিলাম। ঠাকুর পত্রোত্তরে আমাকে স্থূল ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। আমি হৃষ্টমনে একদিন ভিক্ষায় যাহা সংগ্রহ করিলাম, দু' তিন সপ্তাহ তাহাতে স্বচ্ছন্দে চলিবে। মহান্তেরা আমার হোম-ঘৃতেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ভিক্ষায় চাউল জোটে না, কড়ায়ের ডাল, আটা, লুন, লঙ্কা, ইহাই মাত্র পাওয়া যায়। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে, হরিদ্বার কনখল দিনের বেলায় অগ্নিময়। কয়েকদিন নিত্য ভিক্ষার ফলে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বিষম জ্বরে শয্যাগত হইলাম।

তন্দ্রায় প্রসাদ লাভ—জ্বর আরোগ্য।

আমার জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আত্মানন্দ প্রত্যূষে উঠিয়া গো-সেবা করেন। পরে বেলা ৮টার সময় ভিক্ষায় চলিয়া যান। মধ্যাহ্নে কোন কোন দিন আশ্রমে আসেন। অধিকাংশ সময়েই বাহিরে থাকেন। সমস্ত দাম পাড়ের চড়ায় চণ্ডীর যাত্রী ব্যতীত একটি লোকও চক্ষে দেখা যায় না। জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইতে লাগিলাম। পিপাসা পাইলে একটু জল দেয়, এমন লোক নাই। জনমানব শূন্য নির্জ্জন কুটীরে পড়িয়া জ্বরের যন্ত্রণায়, সময়ে সময়ে বেহুঁস হইতে লাগিলাম। ভাবিলাম এবার বুঝি প্রাণ যায়। ঠাকুরকে স্মরণ হইল। কাতরপ্রাণে তাঁর দিকে তাকাইয়া বলিলাম—"দয়াময়। তুমি না আমাকে স্বহস্তে অভয় কবচ পরাইয়া দিয়াছিলে? আজ আমার দশা দেখ।" ঠাকুরকে ক্লেশ জানাইয়াই আমি সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। মূর্চ্ছিত বা তন্দ্রাবস্থায় দেখিলাম—ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি—অত্যন্ত পিপাসা পাইল। আমার পাশে কতগুলি উৎকৃষ্ট মনাক্কা রহিয়াছে দেখিলাম। ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিল! আমি মনাক্কাগুলি ঠাকুরের সম্মুখে নিয়া ধরিলাম। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্তগুলিই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ৪/৫টি মাত্র নিজে খাইয়া অবশিষ্টগুলি আমাকে দিয়া বলিলেন—"এই নাও, এ সব নিয়া খাও।" আমি যোগজীবনকে কিছু দিয়া বাকীগুলি মুখে ফেলিয়া দিলাম। উৎকৃষ্ট মনাক্কা খাইতে খাইতে জাগিয়া পড়িলাম। জাগ্রতাবস্থায়ও মনাক্কা চিবাইতেছি বুঝিয়া অবাক হইলাম। আমি আসনে উঠিয়া বসিলাম এবং খানিকটা জল খাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শরীর আমার সম্পূর্ণ সুস্থবোধ হইতে লাগিল। জ্বরে যে বিষম যাতনা পাইতেছিলাম, তাহা কল্পনাও করিতে পারিলাম না। শরীর বেশ সবল, সুস্থ, ঝর্‌ঝরে বোধ হইতে লাগিল। আমি আসনে বসিয়া রুটিন্ অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। যথাসময়ে ভিক্ষালব্ধ কড়ায়ের ডাল ও রুটি ধুনিতে প্রস্তুত করিয়া আহার করিলাম।

হরিদ্বারে নিত্যকর্ম্ম।

সাধনের কুটিরখানা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। উত্তরমুখে আসন করিয়াছি। দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে বড় বড় জানালা থাকায়, ঝাঁপ তুলিয়া দিলে ঘরখানা পরিষ্কার খোলা মেলা হয়। যে দিকে তাকান যায়, বিশাল পাহাড়শ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা। আবার জানালা বন্ধ করিলে ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া পড়ে। এই স্থানটি বেশ উঁচু, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেখা যায়। স্থানের প্রভাব

এমনই চমৎকার যে আসনে বসিলে আপনা আপনি চিত্তটি জমাট হইয়া আসে। ধ্যানেতে ঠাকুরের স্মৃতি ক্রমশঃই ঘন হইতে থাকে। অবিরল অশ্রুবর্ষণে পরমানন্দে দিনটি কি ভাবে চলিয়া যাইতেছে, বলিতে পারি না। আহারান্তে আসনেই বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, শয়নেও অপ্রবৃত্তি আসিয়া পড়িল। ঠাকুরের অপরিসীম দয়ায় এতই অভিভূত হইয়া রহিয়াছি যে দিনরাত যেন একটা নেশায় কাটিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে বুঝি, ঠাকুর চিরকালের মত এখানেই আমাকে রাখিলেন।

বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ শেষ রাত্রি ৩টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তখন হাত মুখে জল দিয়া আসনে বসি, এবং ধুনিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোম করি। পরে প্রাণায়াম ও নামে ভোর পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আসন হইতে উঠিয়া নীলধারার পারে বেলবাগে চলিয়া যাই। সহস্র সহস্র বিল্ববৃক্ষে এই স্থানটি পরিপূর্ণ। কদ্‌বেলের মত ছোট ছোট শ্রীফল এ সব বৃক্ষের তলায় নিয়তই পড়িয়া থাকে। শৌচান্তে স্নান-তর্পণ করিয়া দুটি বেল লইয়া কুটীরে আসি। ভোরবেলা আত্মানন্দ আমাকে অর্দ্ধ সের দুধ দিয়া যান; আমি আত্মানন্দকে চা দেই, নিজেও খুব তৃপ্তির সহিত চা পান করি। বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ ও ন্যাস সমাপন করিয়া পাঠ করি। ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া, কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং ঘর লেপনাদি বাহিরের কার্য্য করি। ১২টার সময়ে স্নান সন্ধ্যা করিয়া শ্রীফল খাইয়া থাকি। পরে স্থিরভাবে ৩টা পর্য্যন্ত আসনে বসিয়া নাম ও ধ্যানে কাটাইয়া দেই। তৎপরে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীরে আসি। ধুনির অগ্নিতে ছোট একটি ঘটীতে ডাল চাপাইয়া দেই। শুধু লুণ, লঙ্কা দিয়া জলে উহা সিদ্ধ করিয়া থাকি। হাতে চাপ্‌ড়াইয়া একখানা টিক্কর প্রস্তুত করিয়া ধুনিতে পোড়াইয়া লই। পরম তৃপ্তির সহিত উহা ঠাকুরকে ভোগ দিয়া, প্রসাদ পাই। নিদ্রাবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত আসনে বসিয়া নাম করি। তৎপরে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল আরামে নিদ্রা হয়।

আমার প্রার্থনায় ঠাকুরের বিষম ভোগ।

আমার পছন্দ মত ঘরটি বেশ প্রস্তুত হইয়াছে। মনে করিলাম এখন আর কোন চিন্তা নাই। এবার দেহ মন অঙ্গার করিয়া সাধন-ভজন তপস্যা করিব। কিন্তু ঠাকুরের অভিপ্রায় কি বুঝিতেছি না। অকস্মাৎ বিষম উৎপাত উপস্থিত হইল। তাহাতে ঘরে থাকা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ভোরবেলা স্নানান্তে কুটীরে আসিয়া দেখি, নানাজাতীয় অসংখ্য কীট ঘরময় হইয়া রহিয়াছে। মুড়ির মত বড় বড় অতি জঘন্য কুৎসিত পোকা এত পরিমাণে ঘরে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে ২/৫ ইঞ্চি স্থানও ফাঁক নাই। সকল দিক হইতেই পোকাগুলি আসনে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। বহুবার ঝাড়ু দিয়াও এ সব পোকা সরান গেল না। অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তরই ঘর যেমন, তেমন। পোকায় উহা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আসনে বসিয়া সারাদিন কেবল শরীর হইতে পোকা বাছিয়া কাটাইলাম। ইহার উপর আর একটি অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক উপাধির সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া চোখে, মুখে, নাকে, কানে এবং সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া পিড়্ পিড়্ করিতে লাগিল। এই মাছি এমনই ভয়ানক যে বস্ত্রদ্বারা সরাইলেও নড়িতে চায় না। উঠিলে তখনই আবার গায়ে আসিয়া পড়ে। নিতান্ত অস্থির হইয়া আমি ধুনিতে কাঠ চাপাইলাম এবং দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘর অন্ধকার

ब्रह्मकुण्ड हरिद्वार

ব্রহ্মকুণ্ড
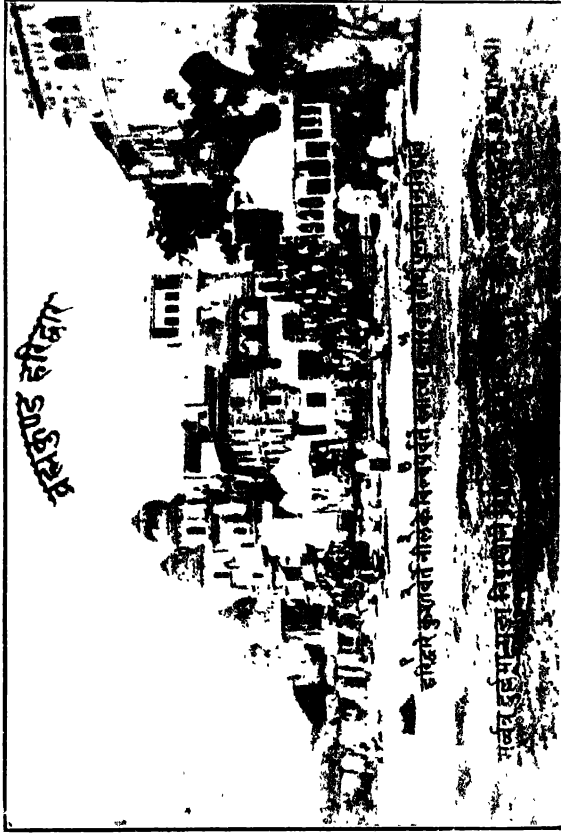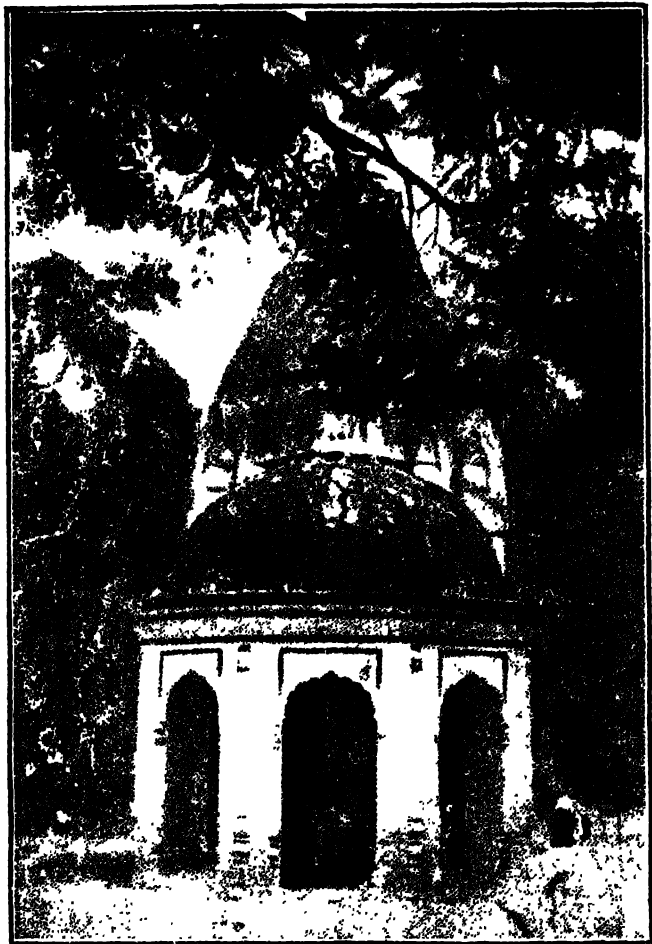
বিল্বকেশ্বর

করিলাম কিন্তু কোন ফলই হইল না, একটি মাছিও সরিল না—লাভের মধ্যে ধূমে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এ যে কি বিষম যন্ত্রণা প্রকাশ করা যায় না।

এই সকল উৎপাতের মধ্যে আর একটি বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা উপস্থিত হইল। আসনে বসা মাত্রই জানি না কি এক অজ্ঞাত শক্তিতে চিত্তটিকে আমার ভিতরের দিকে টানিয়া নিতে লাগিল। মধুময় ইষ্টনাম অনায়াসে, স্মৃতিপুষ্ট হইয়া আপনা আপনি জাগিয়া উঠিল। ইহার প্রভাবে শরীর আমার অবশ হইয়া আসিল। নিবিষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে প্রবল ইচ্ছা জান্মিল, কিন্তু দুরন্ত মাছি ও পোকার দৌরাত্মে অস্থির হইতে লাগিলাম। ১৫/২০ মিনিট অন্তর অন্তর ঘর-বাহির করিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। দুই দিন দুই রাত্রি এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। তৃতীয় দিন অপরাহ্নে ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলাম—"গুরুদেব! আর আমি পারি না, এই ক্লেশ আর আমি সহ্য করিতে পারিব না। হয় তুমি অচিরে এই উৎপাতের শান্তি কর, না হয় আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি অন্তরে রাখিয়া এই সংসার হইতে চিরতরে বিদায় হই। তোমার নামে তোমার ধ্যানে ডুবাইয়া না রাখিলে এ জীবনধারণ আমার পক্ষে নরকভোগ মাত্র! ঠাকুর, দয়া কর!" ক্লেশ শান্তির জন্য এই প্রকার কত কি প্রার্থনা করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

শেষ রাত্রিতে একটী স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পূবের ঘরে, ঠাকুর নিজ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। যোগজীবন, কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা আপন মনে হাসি গল্প করিতেছেন, কেহই ঠাকুরের দিকে তাকাইতেছেন না। অসংখ্য কুৎসিত পোকা ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে উঠিয়া কিল্ বিল্ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে ভন্‌ভন্ করিয়া নাকে, মুখে, চোখে বসিয়া পড়িতেছে। ঠাকুর নিস্পন্দ, স্থির! আমি উহা দেখিয়া পুনঃপুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। একখানা পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম কিন্তু তাহাতে একটী মাছিও উঠিল না, একটি পোকাও নড়িল না। আমি অন্য উপায় না পাইয়া একটি একটি করিয়া পোকা তুলিয়া ফেলিতে লাগিলাম—এই অবস্থায় জাগিয়া পড়িলাম।

আসন ত্যাগ করিয়া বেলবাগ চলিয়া গেলাম। শৌচান্তে স্নান করিয়া কুটীরে আসিয়া দেখি, একটি পোকা বা মাছি সমস্ত ঘরে নাই। আমি অবাক হইয়া ঘরে ও বাহিরে পোকা ও মাছি খুঁজিতে লাগিলাম। ৮/১০ টি পোকা ঘরে একটি স্থানে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি হইল, এত মাছি পোকা কোথায় গেল। পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল গতকল্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহারই এই ফল। ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং আমার উৎকট ভোগ—আমি ভোগ করিতে চাহি না দেখিয়া—নিজেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং জঘন্য মাছি পোকার দংশন স্থিরভাবে আসনে বসিয়া সহ্য করিতেছেন। ইহাতে প্রাণ আমার জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম—হায় আমি কি করিলাম. সুশীতল গঙ্গাজলে সচন্দন তুলসীপত্র ও গন্ধ পুষ্প নিমজ্জিত করিয়া যাঁহার চরণযুগলে একবার অর্পণ করিলে অনন্তকালের প্রারব্ধ নিমেষে অন্তর্হিত হয়, আমার আরামের জন্য সেই দয়াল ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আমার ভোগ্য কুৎসিত কৃমিকীট

ছড়াইয়া দিতে একটুকু দ্বিধা করিলাম না! হায়, হায় কি করিলাম! ঠাকুর ধমক্ দিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন "ব্রহ্মচারী! সাবধান, প্রার্থনা করিলেই কিন্তু তাহা মঞ্জুর হবে। সাবধান থেকো।" আমি ঠাকুরের সেই কথার অর্থ তখন বুঝি নাই। এখন কি করিব, প্রাণ আমার জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আমি আকুলপ্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলাম—"গুরুদেব, তোমার বাক্য অন্যথা হইতে পারে না—আমার সমস্ত প্রার্থনাই তো তুমি মঞ্জুর করিবে। এখন কাতরপ্রাণে শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার ভোগ আমাকেই দেও। প্রসন্নমনে আমি তাহা ভোগ করিব। আর যেন প্রার্থনা আমার প্রাণে কখনও উদয় না হয়, আশীর্ব্বাদ কর।" ঠাকুরের সুন্দর মুখমণ্ডল, কৃমিকীট ও মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—মনে আসায় সমস্তটি দিন আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। এই যাতনা যে কি বিষম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। প্রার্থনায় আমার অত্যন্ত ধিক্কার আসিয়া পড়িল। প্রতিজ্ঞা করিলাম জীবনে আর কখনও প্রার্থনা করিব না। সন্ধ্যার সময়ে অকস্মাৎ, ঠাকুরের সহাস্য স্নেহদৃষ্টি অন্তরে আসিযা পড়িল। তাঁহার পরম পবিত্র সুন্দর মুখশ্রী চিত্তে যেন ছাপ পড়িয়া গেল। ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব দয়ার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। জয় গুরুদেব!

উচ্ছিষ্ট মুখে খাবার দিলে উচ্ছিষ্ট দেওয়া হয়।

একটি স্বপ্ন দেখিলাম—ঠাকুর আমাদের বাড়ী গিয়াছেন। মহা সমারোহে তাঁহার সেবা ভোগের আয়োজন হইতে লাগিল। মা রান্না করিতে গেলেন। ঠাকুরের জলযোগের জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল একখানা থালায় রাখিয়া গেলেন। আমার জন্য আর একখানা থালায় খাবার রহিয়াছে দেখিলাম। ঠাকুরের সেবার জন্য রক্ষিত ফল ফলারি ঠাকুরকে দিবার জন্য নিয়া চলিলাম। আমার খাবারগুলিও বাম হস্তে নিলাম। উৎকৃষ্ট বস্তু ঠাকুরের ভোজন পাত্রে দেখিয়া আমার লোভ হইল। অমনি ঐ পাত্র হইতে কিছু ফল মাটিতে পড়িয়া গেল। ঐ সকল বস্তু ভূমি হইতে তুলিয়া মুখে ফেলিতে লাগিলাম, এবং চিবাইতে চিবাইতে ঠাকুরের ও আমার খাবার লইয়া চলিলাম। মনে করিলাম ঠাকুরের খাবার ফল তো কতকটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং বাম হাতে ধরা আমার খাবার-সামগ্রী সকল ঠাকুরকে দিব; আর তাঁহার খাবার বস্তু আমি খাইব। ঐ সময় মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—ওকি! খেতে খেতে ঠাকুরের ভোগের বস্তু নিয়ে যাচ্ছিস্। ও সব যে এঁটো হয়ে গেল। আমি মাকে বলিলাম—মুখ ও ডান হাত আমার উচ্ছিষ্ট, বাম হাত পরিষ্কার আছে। ঠাকুরের খাবার পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমার খাবার জিনিষ তাঁকে দিব ভাবিয়াছি। মা বলিলেন—তা হবে না। বাম হাতে ধরিয়া খাবার কোন বস্তু ঠাকুরকে দিতে নাই। আর এঁটো মুখে খাবার বস্তু ধরিলে, তাহা ভোগে লাগে না। এ কথা শুনিয়াই আমি জাগিয়া পড়িলাম।

স্বপ্নে আজ মাতাঠাকুরাণীর উপদেশ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। মা'র কথা যে যথার্থ ঠাকুরের একদিনের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহা পরিষ্কার বুঝিলাম। যোগজীবন একদিন আহারান্তে না আঁচাইয়া আর একটি গুরুভ্রাতাকে বাম হাতে খাবার বস্তু দিতেছিলেন। ঠাকুর যোগজীবনকে বলিলেন— "খেয়ে উচ্ছিষ্ট মুখে অন্যকে খাবার দিলে, উচ্ছিষ্ট দেওয়া হয়—এই সাধারণ আচার জানিস্ না। এঁটো মুখে সকড়ি বস্তু দিতে নাই।"

সাধনে যোগমায়ার কৃপা।

শরীরের অবস্থা কয়েকদিন যাবৎ ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দিন দিন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি। আত্মানন্দের সঙ্গে যে কয়দিন আহার করিয়াছিলাম, পরিমাণের কোন নিয়ম ছিল না। আহার খুব পেট-ভরা হইত। দুগ্ধও দু'বেলা প্রায় অর্দ্ধসের খাইয়াছি। আহার কমাইতে যাইয়া দেখিলাম— তাহাতে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ভাত খাওয়া এখানে সহ্য হয় না—শরীরে রসের সঞ্চার হয়, পায়খানা হয় না, শরীর বিষম অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভিক্ষায় সাধারণতঃ বুটের ছাতু পাওয়া যায়। তাহা একদিন খাইলে ৪/৫ দিন আর কিছু খাইতে হয় না, পেট খারাপ হইয়া পড়ে। শরীর বেশ সুস্থ সবল থাকিলে এবং সকল প্রকার আহারে দেহ অভ্যস্ত হইলে নিত্য ভিক্ষা করিয়া দেহরক্ষা এ স্থানে সম্ভব। যে পর্য্যন্ত শরীর বেশ সুস্থ না হয়, ততদিন আহারের দস্তুর মত সুবন্দোবস্ত প্রয়োজন। না হইলে সাধন-ভজন দূরের কথা, প্রাণরক্ষাই কঠিন। শরীর কাতর হইলে দেহে যন্ত্রণা থাকিলে, মন আর ভাল থাকিবে কি প্রকারে? সাধন-ভজন করিবার প্রবল ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু শরীরে অবসন্নতা হেতু তাহা কিছুই হইয়া উঠিতেছে না। ঠাকুরের কৃপায় শরীরে যেদিন আমার কোন গ্লানি হয় নাই, সেদিন ভজন-সাধনে উদয়াস্ত কি ভাবে গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। আনন্দে যেন মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে এমন অবস্থা হইয়াছে যে নির্জ্জনে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। অবিরল অশ্রুধারায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভজনের অনুকূল নানাস্থানে বহু চেষ্টায় মনের যে একাগ্রতা জন্মাইতে পারি নাই, এখানে আসনে বসামাত্র, স্থানের অসাধারণ প্রভাবে আপনা আপনি তাহা হইয়াছে। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিলেই, বিনা আয়াসে সমস্তগুলি ইন্দ্রিয়শক্তি নিজ হইতে অর্ন্তমুখ হইয়া পড়ে। গুণময়ী যোগমায়ার অসামান্য গুণ, এই মহাতীর্থের যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায়, একটু স্থির হইতে চেষ্টা করিলেই পরিষ্কাররূপে প্রাণে অনুভূত হইতে থাকে। জয় মা আনন্দময়ী যোগমায়ে! তোমার যে অপরিসীম দয়া তৈলধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত আমার উপরে বর্ষণ হইতেছে, তাহার বিন্দুমাত্র অনুভবের অবস্থা কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান কর। তোমার কৃপায় গুরুদেবের মনোহর লীলা দর্শনে দিন রাত্রি মুগ্ধ হইয়া থাকি।

নামে ও ধ্যানে পরমানন্দ সম্ভোগ।

ভগবান গুরুদেবের কৃপায় আমার ভজন-বিঘ্নকর বাহিরের উপদ্রবগুলির অচিরেই অবসান হইল। একান্তভাবে নিশ্চিন্তমনে সাধন করিবার এমন সুযোগ জীবনে আর নাও ঘটিতে পারে—ইহা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। হায়! এই শুভ সময় অধিক দিন বুঝি আমার থাকিবে না, নিয়ত ইহা মনে হইতে লাগিল। আমি অবিরাম ভগবদ্ ধ্যানে অহর্নিশি অতিবাহিত করিব, সঙ্কল্প করিয়া সাধন-ভজনে লাগিয়া গেলাম। শেষ রাত্রে যথা সময়ে আসন হইতে উঠিয়া নীলধারার দিকে চলিয়া যাই, শৌচান্তে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করি। তৎপরে দেহকল্প বিধি অনুসারে ২/৩ টি ত্রিদল বিল্বপত্র একটুকু চিনি ও ঘৃতের সহিত মিলাইয়া সেবন করি এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা

জল পান করি। পরে ধূনি প্রজ্বলিত করিয়া আসনে বসি। নিত্য হোম সমাধা করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করি। ১২৯৬ বার জপ করিয়া সঘৃত বিল্বপত্রে তাহার দশমাংশ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি; পরে ন্যাস আরম্ভ করি। ন্যাসে দেড় ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়; বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এইভাবে কাটাই। অতঃপর আসন হইতে উঠিয়া, গৃহ মার্জ্জন, জল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্নান করি। বেলা ১২টার সময়ে আবার আসনে বসি। অপরাহ্ন ৫।।০ টা পর্য্যন্ত নামে ও ধ্যানে অতিবাহিত হয়। এ সময়ে দয়াল ঠাকুর আমাকে কি ভাবে রাখেন প্রকাশ করিবার উপায় নাই। হরিদ্বারের পাহাড় - পর্ব্বত বৃক্ষলতা সমস্তই যেন ভগবৎ ভাবে মগ্ন। মহামায়ার অসীম শক্তি প্রভাবে সকলেই যেন অভিভূত। যে দিকে তাকাই ঠাকুরের মনোমুগ্ধকর রূপের স্মৃতি প্রত্যক্ষবৎ প্রকাশিত হইয়া আমাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া রাখে। দিবসান্তে কান্না পায়, হায়! আজিকার মত এই আনন্দ শেষ হইল!

১লা - ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল।

তীব্র তপস্যায় ভজন লোপ।

শুনিয়াছি—শুভাশুভ, সুখদুঃখাদি সমস্ত অবস্থাই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ঠাকুরের কৃপা অনুভূতির দুর্লভ অবস্থাও কতদিন আমার অদৃষ্টে আছে জানি না। কোন দিন কোন সময়ে কি সূত্র ধরিয়া ইহা চলিয়া যাইবে, কিছুই নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং যতক্ষণ ঠাকুর দয়া করিয়া এই অবস্থায় রাখেন মনের সাধে প্রাণপণে সাধন-ভজন করিয়া যাই। পাছে শুভক্ষণ চলিয়া যায়, এই উৎকণ্ঠায় দিনরাত একাগ্রমনে ভজন-সাধন করিতে লাগিলাম। যোগভূমির অসাধারণ প্রভাবে তীব্র তপস্যার আকাঙ্ক্ষা আমার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি রীতিমত কঠোরতা আরম্ভ করিলাম। উদয়াস্তে গণ্ডুষমাত্র জলও গ্রহণ না করিয়া একাহার ধরিলাম। এতদিন খোসাসহিত কড়ায়ের ডাল সিদ্ধ করিয়া, কখনও বা পাহাড়ের চেনা অচেনা বৃক্ষলতার নূতন, নধর ডগা পাতা লুণজলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক আটার সহিত খাইয়াছি। তাহাতে শরীর বেশ সবল সুস্থ হইয়াছিল, মনের উৎসাহ, উদ্যম, তেজস্বিতা এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সর্ব্বদা সম্ভোগ করিয়াছি। এখন আমি এক ছটাকেরও কম আটা ছানিয়া হাতের তেলোতে চাপড়াইয়া ধুনির ভিতরে ফেলিয়া দেই, ভস্মের ভিতরে উহা গুঁজিয়া দিয়া উপরে আগুন চাপা দিয়া রাখি। অর্দ্ধ ঘন্টা পরে তুলিয়া দেখি, সুন্দর কচুরির মত ফুলিয়া গিয়াছে। লুণ, মরিচের সহিত উহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই। খুব ক্ষুধা বশতঃই হউক অথবা ঠাকুরের কৃপায়ই হউক, পরম তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিয়া থাকি। এই কঠোরতায়ও আমার আশা মিটিতেছে না।

কয়দিন যাবৎ আমার শরীর অতিরিক্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যথাসময়ে আসন হইতে উঠিয়া শৌচাদি ক্রিয়া ও স্নানাহ্নিক সমাপন করিতে পারি না। এক মিনিট দূরে স্থিত গঙ্গা হইতে এক কলসী জল আনিয়া হাঁফাইয়া পড়ি। পথে ২/৩ বার বিশ্রাম করিতে হয়। আসনে অধিকক্ষণ বসিতে পারি না। সময় সময় শুইয়া কাটাই, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়। এদিকে অবসন্নতা এত অধিক যে হাত, পা নাড়িতে কষ্ট হয়। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। এই অবস্থায়ও আমার তপস্যার প্রবৃত্তি, কঠোরতার আকাঙ্ক্ষা কমিতেছে না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।"

সকল ধর্মকর্ম্মের পূর্ব্বে শরীর রক্ষা। শরীর অসুস্থ থাকিলে 'আহা উহু' করিয়াই তো দিনরাত কাটাইতে হয়। দৈহিক যন্ত্রণা কিছুতেই তো উপেক্ষা করিতে পারি না। ভজন-সাধন করিব কি প্রকারে? ভাবিয়াছিলাম সকল প্রকার রস ত্যাগ করিয়া দৈহিক বিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি অতিরিক্ত হটকারিতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। সাধুরা আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিতেছেন—যাহাতে শরীর অসুস্থ হয়, দেহ নষ্ট হয়, জানিয়া শুনিয়া আপনি তাহা করিতেছেন; ইহাতে আপনার আত্মহত্যা করা হইতেছে। এখন আমার আক্ষেপ হইতেছে, শরীরে যদি কোন ক্লেশ না থাকিত, দিন রাত ঠাকুরের নামে মগ্ন হইয়া থাকিতাম। সঙ্কটে পড়িয়া পরিষ্কার বুঝিলাম, যাঁহারা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ধর্ম্মলাভার্থে তাঁহারা মনমুখি হইয়া চলিলে যে দশা ঘটে আমার তাহাই হইয়াছে। ঠাকুর! দয়া কর। তোমার আদেশ না পাইয়া, তোমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও যেন অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। আমি ডাল তরকারীর দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া আহার করিব। দুঃখও কতকটা আত্মানন্দ হইতে পাইব। শরীরটিকে এখন সবল সুস্থ নীরোগ রাখাই আমার সার ধর্ম্ম মনে হইতেছে। আগামী কল্য হইতে আমি অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের আদেশ মত চলিব সঙ্কল্প করিলাম।

স্বাভাবিক আহারে ঠাকুরের কৃপা।

গতকল্য অপরাহ্ন ৫টার পরে পেট ভরিয়া ডাল-রুটি আহার করিয়াছিলাম। আজ পায়খানা পরিষ্কার হইয়াছে। কয়দিন মলের সহিত রক্ত পড়িয়াছিল, আজ আর তাহা হয় নাই। হাতে পায়ে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে বেদনা ছিল, তাহাও কমিয়াছে। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছি। দিনটি কঠিন মত কাটাইতে কষ্টবোধ হইল না। গতকল্য আহারের সময় ঠাকুরকে ডাল-রুটি নিবেদন করিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঠাকুরকে বলিলাম—গুরুদেব, আমি নিতান্ত অপাত্র। তপস্যা আমার কার্য্য নহে। শরীরের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, আজ আমি কঠোরতায় জলাঞ্জলি দিতেছি। দয়া করিয়া একবার তুমি এই ডাল-রুটিতে দৃষ্টিপাত কর। তোমার প্রসাদ পাইতেছি বুঝিয়া কৃতার্থ হই। ঠাকুরকে কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি, আশ্চর্য্য ব্যাপার! ডাল ও রুটির উপরে ৭/৮ টি সরিষাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ খণ্ডাকারে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে। এই জ্যোতিঃ নীলাভ গাঢ় লাল বোধ হইতে লাগিল। যতক্ষণ আহার করিলাম, উজ্জ্বল মনোরম জ্যোতির্বিন্দু সকল আমার চক্ষে লাগিয়া রহিল। ৭/৮ মিনিটকাল এই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে আনন্দের সহিত আহার সমাপন করিলাম। আজও সমস্ত দিন চিত্তটি বেশ প্রফুল্ল রহিয়াছে।

৮ই—১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

অদ্য মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার সময়ে কুম্ভক-যোগে যখন ধ্যান করিতেছিলাম, অকস্মাৎ ললাটদেশে একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। অল্পকালের মধ্যেই ঐ জ্যোতিঃ চমৎকার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই জ্যোতির বর্ণ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। লাল, নীল, সবুজাদি কিছুই নয়; অথচ ইহাদের প্রত্যেকটিরই যেন উজ্জ্বল আভা পরস্পরে মিলিত হইয়া একটি সুন্দর স্বতন্ত্র জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতির্ম্মণ্ডলের চতুর্দ্দিক, হইতে শুভ্রনীল সংযুক্ত ছটা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া নভোমণ্ডলে

ছড়াইয়া পড়িতেছে। জ্যোতির্ব্বিন্দুর মধ্যস্থলে নখ-পরিমিত একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ, অতি চঞ্চল ভাবে ক্ষণে প্রকাশিত, ক্ষণে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এই চঞ্চল জ্যোতিটি কি, ইহার আকৃতি কি প্রকার, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। রামধনুর ৭টি বর্ণের বহির্ভূত বলিয়া ইহার আর সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। ধ্যান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উহা লীন হইয়া গেল। এই জ্যোতিঃ এতই সুন্দর, এতই মনোমুগ্ধকর যে শরীর মন যতই অসুস্থ ও উদ্বেগপূর্ণ থাকুক না কেন, দর্শনমাত্রে চিত্ত প্রফুল্ল ও বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। দর্শনের স্পৃহা ও উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম— গুরুদেব! তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে তোমা অপেক্ষা সুন্দর মনোহারী যদি কিছু থাকে, তাহা যেন চিরকালের জন্য আমার নিকট অপ্রকাশ থাকে, এই আশীর্ব্বাদ কর।

আমার দৈনিক কর্ম্ম।

কয়েকদিন বিধিমত আহার করিয়া শরীর আমার বেশ সবল ও সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। আমি সাবেক রুটিন্ মত চলিতে লাগিলাম। প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তর আসনে বসি। গায়ত্রী জপ করিয়া নারায়ণকে গঙ্গাজল তুলসীপত্র প্রদান করি। শালগ্রামকে ১২টি তুলসীপত্র দিতে আমার প্রায় ২ ঘন্টা কাটিয়া যায়। তৎপরে চণ্ডী, গীতা, চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ করি। ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া ঘর ঝাড়ু দেই। গোময় দ্বারা সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া ফেলি। পরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ধুনির পাশে আনিয়া রাখিয়া দেই। তৎপরে ডাল বাছিয়া অর্দ্ধ ঘটী জলে ভিজাইয়া রাখি। আটাও দেড় ছটাক আন্দাজ ছানিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দেই। অনন্তর পূজার বাসন ও একটি কলসী লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া যাই। বাসন মাজিয়া স্নানান্তে এক কলসী জল লইয়া চলিয়া আসি। ১২টার সময়ে আসনে বসিয়া নারায়ণকে শ্রীফল নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই। পরে ৫টা পর্য্যন্ত ঠাকুর আমাকে তাঁর নামে, ধ্যানে কি ভাবে অভিভূত করিয়া রাখেন, বলিতে পারি না। ৫টার পরে আত্মানন্দের কুটীরের ধারে---বটবৃক্ষমূলে বসিয়া থাকি। চণ্ডী দর্শনার্থী বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত তৎকালে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনায় আনন্দ হয়। ৬টার সময় ঐ আটা হাতে চাপড়াইয়া টিক্কর প্রস্তুত করি। জ্বলন্ত কুন্দার নীচে, ধুনির ভিতরে উহা রাখিয়া, কুন্দার গায়ে ডালের ঘটিটি বসাইয়া দেই। একটু লুণ ও লঙ্কা উহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিতে গঙ্গায় চলিয়া যাই। স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া এক ঘন্টা পরে আসনে আসি। সুপক্ক টিক্কর ও সুসিদ্ধ ডাল ঠাকুরকে নিবেদন করিযা পরম তৃপ্তিতে প্রসাদ পাই। শয়ন করিতে রাত্রি ১০টা হয়।

অহৈতুকী জ্বালা। নিত্যক্রিয়ায় নিবৃত্তি।

শেষ রাত্রে হোমান্তে নীলধারায় শৌচ-ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসনে আসিলাম, আজ শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইতেছে। ভাবিলাম, খুব নিবিষ্টমনে সাধন-ভজন করিয়া দিনটি পরমানন্দে অতিবাহিত করিব। কিন্তু আসনে বসিয়া ন্যাস আরম্ভ করিতেই দেখি, ভিতরটি একেবারে শূন্য

হইয়া গিয়াছে। ধ্যেয় বস্তু যে কোথায়, বহু চেষ্টায়ও খোঁজ পাইলাম না। আমি বেগতিক দেখিয়া শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম কিন্তু তাহাতেও চিত্ত বসিল না। তখন সংক্ষেপে পূজা শেষ করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলাম। পাঠ করিতেও বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তখন সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—আজ এমন হইল কেন? অনেক অনুসন্ধানেও কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। জ্বালা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইল যে আসনে বসিতে পারিলাম না, একবার ঘর একবার বাহির করিতে লাগিলাম। মাথা আগুন হইয়া উঠিল, ঠাকুরের উপরে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। ভাবিলাম— বিনা কারণে ঠাকুর আমাকে জ্বালাইতেছেন। এই জ্বালা আমি সহ্য করিতে পারিব না। এই জ্বালা নিবৃত্তির জন্য যে কোন কার্য্য আমি করিব। ভিতরে বাহিরে সমস্তই সংসার শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি অসহ্য উদ্বেগে অস্থির হইয়া আসনে শুইয়া পড়িলাম। ২/৩ ঘণ্টা কাল ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম। মনে হইতে লাগিল, সংসারে সদসৎ এমন কোন বস্তু নাই যাহা লইয়া আমি ক্ষণকাল আরাম পাইতে পারি। জল্পনা-কল্পনা অনেক করিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সমস্তই নিরস বোধ হইতে লাগিল। পরে স্থির করিলাম, ভালই লাগুক আর মন্দই লাগুক রুটিন্ মত কাজগুলি শুধু করিয়া যাই। আনন্দ নিরানন্দের মালিক একজন। তিনি আনন্দ না দিলে আর কোথা হইতে পাইব? আমি সময় ধরিয়া যথামত নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিলাম। এই নিত্য-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট দিন বেশ আরামে কাটিয়া গেল। এত জ্বালা-যন্ত্রণা শুষ্কতার ভিতরেও দেখিলাম, আমার চেষ্টার অপেক্ষামাত্র না করিয়া নামটি আপনা আপনি চলিতেছে—ইহাই আশ্চর্য।

১৫ই - ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

দণ্ডীস্বামীর নিকট ত্রিসন্ধ্যার উপদেশ।

আমাদের আশ্রমের ধার দিয়া চণ্ডীপাহাড়ে যাইবার পথ। বহু যাত্রী, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী এই আশ্রমে বিশ্রাম করিতে আসেন। দু'দিন হয় একটি বৃদ্ধ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এই স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। এদিকে ইনি দণ্ডীস্বামী বলিয়া বিখ্যাত। সন্ধ্যা ও শালগ্রাম পূজা পদ্ধতি, ঠাকুর আমাকে কাহারও নিকটে জানিয়া নিতে বলিয়াছিলেন। এতকাল আমি উপযুক্ত লোকের অপেক্ষায় ছিলাম। দণ্ডীস্বামীকে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয়ে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। ত্রিসন্ধ্যা ও শালগ্রাম পূজার বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে উহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অদ্য বেলা প্রায় ১২টার সময় নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত শিখিয়া নিলাম। দণ্ডীস্বামী বলিলেন—ত্রিকালীন সন্ধ্যা করিতে হইলে ব্রহ্ম-যজ্ঞাদি করা নৈষ্ঠিকদের একান্ত কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠ করিয়া সপ্তর্ষি ন্যাস করিতে হয়, পরে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিয়া সন্ধ্যা সমাপনান্তে আবার শান্তিযজ্ঞ পাঠ করিতে হয়, তবেই সন্ধ্যাক্রিয়া যথাবিধি সুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার কোন অঙ্গ সংক্ষেপ করিলে সম্যক্ উপকার পাওয়া যায় না। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা যথারীতি করিলে সমস্ত উপাসনা তত্ত্ব, উহাতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ব্রহ্মণ্যতেজ লাভ করিতে হইলে সন্ধ্যাই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সন্ধ্যার সমস্ত ক্রম ও প্রকরণ এবং শালগ্রাম পূজার পদ্ধতি দণ্ডীস্বামীর নিকট শিখিয়া লইলাম। আজ মধ্যাহ্নে অন্য কোন কাজই হয় নাই। অপরাহ্ন ৪টার সময়ে হোম করিয়া

স্তবাদি পাঠ করিলাম। ৫ শ্লোক চণ্ডী ও ৫ শ্লোক গীতা পাঠ করিয়া শ্রীমৎভাগবৎ নমস্কার করিয়া রাখিয়া দিলাম। কাষ্ঠ সংগ্রহ ও আহারের যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার সময়ে স্নান করিলাম। সায়ং সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে রান্না করিয়া ডাল ও অন্নভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিলাম। আহারে বড়ই তৃপ্তি হইল।

বৃষ্টিতে ভিজা—ঠাকুরের উপর অভিমান।

আজ ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি। আমার কুটীরের চালার খড় এখনও বসে নাই। তাই স্থানে স্থানে জল পড়িতে লাগিল। স্রোতের মত জল পড়িয়া আমার আসন-ঘরের মেঝে ভাসাইয়া দিল। মাথা রাখিবারও একটু স্থান রহিল না। তখন শালগ্রামের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি নিজ আসনে পরমসুখে বসিয়া আছেন আর আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন হাসিতেছেন। বিন্দুমাত্র জলও শালগ্রামের আসনের ধারে পাশে নাই। দেখিয়া বড়ই অভিমান জন্মিল। ভাবিলাম— যাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটে, যাঁহার ইচ্ছায় এই ভয়ঙ্কর ঝড় তুফানে সমস্ত উলট্-পালট্ করিয়া দিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে কি আমার মাথাটি এই বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না? অসীম শক্তিশালী ভগবান পূর্ণরূপে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন কিন্তু আমার দুঃখে তিনি উদাসীন। আমি শালগ্রামকে বলিলাম— ঠাকুর। নিজে আরামে বসিয়া থাকিয়া আমাকে ভিজাইয়া মজা দেখিতেছ। ভাল, অবিলম্বে তুমি এই ঝড়বৃষ্টি বন্ধ কর, না হলে আর কিছুক্ষণ দেখিয়া আমি তোমাকে আকাশের নীচে বৃষ্টিতে রাখিয়া তামাসা দেখিব। আসনে স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। চিত্তটি নিবিষ্ট হইয়া আসিল। গায়ে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইল। চাহিয়া দেখি ঘরেও আর বৃষ্টি পড়িতেছে না। অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি পড়ায় নূতন চালার খড়গুলি বোধ হয় বসিয়া গিয়াছে, তাই জলপড়া বন্ধ হইয়াছে। বাহিরের ঘটনা পরম্পরা দেখিয়া যুক্তিবিচারে যাহাই বুঝি না কেন, চৈতন্যযুক্ত মহাশক্তিই প্রতি অণুপরমাণুকে চালিত, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। আমার ঠাকুর আমার দুঃখ দেখিয়া আমারই আরামের জন্য এই বৃষ্টি বন্ধ করিলেন—আমি ইহাই মনে করি। এই ঝড় পূর্ব্ববঙ্গের 'কাল বৈশাখীর' মত।

একি প্রলোভন, না ঠাকুরের দয়া?

আজ সকালে ন্যাস ও পূজা শেষ করিয়া আসনে বসিয়া আছি, কনখলের একটি ধনী পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া কনখল ও মায়াপুরীর মধ্যে একটি বড় বাগানে শিব স্থাপনার্থে সুন্দর একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাকে করজোড়ে খুব কাতরভাবে কহিলেন—প্রভু দয়া করিয়া আপনি আমার শিবালয়ে আসিয়া বাস করুন। আপনার সকল প্রয়োজনীয় বস্তু জুটাইয়া আমি দিনরাত আপনার সেবায় পড়িয়া থাকিব। বাগানবাড়ী, দেবালয় এবং ঠাকুর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত আপনাকে অর্পণ করিব। আপনার আহারাদি কোন প্রয়োজনেই ভিক্ষা করিতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া দিনরাত আপনি ভজনানন্দে থাকিবেন। আমি নিঃসন্তান, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে আমার যাহা কিছু আছে—দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না।

পাণ্ডাজীকে আমি বলিলাম— আমার বাড়ীঘর আছে। অভাবে পড়িয়া আমি সাধু হই নাই। ভিক্ষা আমার ব্রতের নিয়ম, তাই আমি ভিক্ষা করি। ঘরে আমার অন্ন, পরে খায়। কোন মন্দিরে গিয়া মহান্তগিরি করিতে আমার বাসনা নাই। হরিদ্বারে ও কনখলে আমার থাকার বিস্তর স্থান জোটে। আমি নির্জ্জনতা ভালবাসি বলিয়াই এখানে আসিয়াছি। আপনি অন্য লোক দেখুন। আমি আসন তুলিয়া অন্যত্র যাইব না। এখানে থাকা আমার গুরুর আদেশ। পাণ্ডা আমাকে অনেক ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া এবং সুবিধার দিক দেখাইয়াও যখন মতি জন্মাইতে পারিল না, তখন নিরাশ মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শুনিলাম, অনেক লোক এই বাগানবাড়ীতে মন্দিরের মালিক হইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা কি মহামায়ার পরীক্ষা না ঠাকুরের দয়া! গুরুদেব, দয়া কর। তোমার হাতের গড়া জিনিস কারো সামান্য অঙ্গুলির টিপে যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। আমার সাধ্য কি কোন প্রলোভনে নিজকে রক্ষা করি।

১৮ই —১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

মদ্যপায়ীর হাতে পড়া। জ্যোতির্ম্ময় শালগ্রাম।

আজ আত্মানন্দের নিকটে কিছুক্ষণ ছিলাম। আত্মানন্দ আমাকে একটি বোতল দেখাইয়া বলিল- গুণী দাদা, তোমার জন্য এই উৎকৃষ্ট রস আনিয়াছি। তুমি একটু খাও। আমি বোতলটি হাতে করিয়া মদের গন্ধ পাইয়া অবাক্। ভাবিলাম— আত্মানন্দ মদ খায়, আমি যদি বলি এসব আমি খাই না, আত্মানন্দ লজ্জা পাইবে; অভিমানে আঘাত লাগিলে অনায়াসে আমাকে তাড়াইয়া দিবে। আমি আত্মানন্দকে বলিলাম— আ' রাম। তুমি এই দুর্গন্ধ রস খাও। ভাল মদ আনিতে পারনা? এই জিনিস খাইলে আমার প্রাণই যাবে। আত্মানন্দ আর একটি বোতল আমাকে দিয়া বলিল, ইহা অতি উৎকৃষ্ট। ইহাই তোমার জন্য আনিয়াছি। ইহা তোমায় খাইতেই হইবে। আমি উহা হাতে লইয়া বলিলাম- এসব দেশী মদ কখনও আমি খাই নাই, সহ্য ত হবেনা। তুমি কোন সঙ্কোচ না করিয়া, এসব যেমন খাইয়া থাক অনায়াসে খাও। মদের বোতল ফিরাইয়া দেওয়াতে আত্মানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন— দাদা, মদ তো খাবেনা। আচ্ছা, এই কচুরি দু'খানা নিয়ে খাও। আমি উহা লাইয়া আসনে আসিলাম এবং খাইব সম্মত হইয়া নিয়া আসিয়াছি বলিয়া, সেবা করিলাম। কচুরি খাওয়ার ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মনটি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। শরীরও অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। আমি আজ আর আসনের কোন কাজই করিব না, স্থির করিলাম। সন্ধ্যাটি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক করিতেই হইবে বলিয়া আবার আসনে চাপিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা করিতে করিতে শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম— শালগ্রামটি জ্যোতির্ম্ময়। আমি উহার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সন্ধ্যা করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য ঠাকুরের কৃপা। দেখিলাম কাল প্রস্তরের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শ্বেত নীল মিশ্রিত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইয়া পড়িতেছে। উহা দেখিতে দেখিতে আমার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অবশিষ্ট দিনটি বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। কচুরি খাইয়া মাথা ধরিয়াছিল, হোম করার পর কমিয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময়ে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ডাল-রুটি ভোগ লাগাইলাম। প্রসাদ পাইয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

শালগ্রাম চুরি।

এই স্থানে আসিয়া বানরের বড়ই উপদ্রব ভোগ করিতেছি। প্রায় প্রতিদিনই বানর বেড়ায় ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া কিছু-না-কিছু অনিষ্ট করিয়া যায়। কল্য কতকটা ঘৃত নষ্ট করিয়া গিয়াছে। আজও হোমের ঘৃত সব নষ্ট করিল। ঘৃতের অভাব হওয়াতে কনখলের একটি বর্দ্ধিষ্ণু পাণ্ডার নিকট একটি সাধুকে পাঠাইয়াছিলাম। সাধু কিছুক্ষণ পরে আসিয়া আমাকে বলিল, আমি ঐ পাণ্ডার নিকটে আর যাইব না। তাহার সহিত আমার ঝগড়া হইয়াছে। আপনার জন্য সে ঘৃত রাখিয়াছে কিন্তু আমার হাতে সে দিবে না— এ জন্যই ঝগড়া। আপনাকে যাইয়া নিয়া আসিতে বলিয়াছে। আপনি একবার যান্ না। তার বাড়ী ত দূরে নয়। আপনি না আসা পর্য্যন্ত আশ্রমে আমি থাকিব। সাধুর কথা শুনিয়া আমি ঘরে ঝাঁপ বাঁধিয়া কনখলে চলিলাম। আত্মানন্দও দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে ষ্টেসনে চলিল। দণ্ডী স্বামী আজ নর্ম্মদায় যাইবেন। কনখলে যাইয়া পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার আসার উদ্দেশ্য জানিয়া বলিলেন—"ঐ সাধু আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমি ঘৃতের কোন কথা তাহাকে বলি নাই।" আমি শুনিয়া অবাক্। নিজ আশ্রমে রওয়ানা হইলাম। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই আমার যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। কুটীরের সম্মুখে যাইয়া দেখি দরজাটি দড়ি দিয়া বাঁধা রহিয়াছে কিন্তু ঠেঙ্গা লাগান নাই। দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি ঘর যেমন তেমন। কোন জিনিষই স্থানচ্যুত হয় নাই কিন্তু তবু আমার শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। অত্যন্ত জল পিপাসা পাইয়াছিল। ঠাকুরকে একটু মিষ্টি নিবেদন করিয়া দিতে ইচ্ছা হইল। আমি আসনে স্থির হইয়া বসিয়া কিছু মিষ্টি ও জল শালগ্রামের আসনের সম্মুখে ধরিলাম। নিবেদন কবিতে গিয়া দেখি শালগ্রাম নাই। আমার মাথাটি যেন ঘুরিয়া গেল। ইন্দুরে, বান্দরে নিয়া যাইতে পারে অনুমানে কুটীরে ও বাহিরে তন্ন তন্ন করিয়া তালাস করিলাম। কোথাও চিহ্নমাত্র পাইলাম না। পরে আরও খুঁজিয়া দেখিলাম— শালগ্রামের আসনটিও নাই। কাল মার্ব্বেল পাথরের চারি ইঞ্চি পরিবেষ্টিত চতুষ্কোণ সুন্দর সিংহাসনখানাও অপহৃত হইয়াছে। কয়েকখানা ভাল পূজার বাসনও গিয়াছে। গৈরিকধারী নব-পরিচিত সাধুর আর খোঁজ নাই। শালগ্রাম নিবে বলিয়াই সে আমাকে ফাঁকি দিয়া ঘৃত আনিতে পাঠাইয়াছিল। হায়, হায়! এখন আমি কি করি। আমারই গুরুতর অপরাধে শালগ্রাম ২টি চুরি গিয়াছে। চোরের উপরে আমার একটুকুও বিরক্তি জন্মিতেছে না। তার দোষ অপেক্ষা আমার অপরাধ অনেক বেশী।

দণ্ডী শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকটে শালগ্রাম পূজার পদ্ধতি জ্ঞাত হইয়া, প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল— বিধিমত শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করি, কিন্তু আমার তখন মনে হইয়াছিল, বিধিমত পূজা আরম্ভ করিলে, এই শালগ্রাম আর আমি ছাড়িতে পারিব না। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন। সুলক্ষণাক্রান্ত সুশ্রী শালগ্রাম পূজা করিও। কিন্তু এই শালগ্রামের কলেবর আমার তৃপ্তিকর হয় নাই। মহাত্মারা হাতে ধরিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আনিয়াছিলাম। পছন্দমত সুন্দর একটি শালগ্রামের আকাঙ্ক্ষা যখন আমার ভিতরে রহিয়াছে এবং ঠাকুরও যখন আমাকে বলিয়াছেন— ঐ প্রকার আমার জুটিবে, তখন আর এই শালগ্রাম বিধিমত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন কি? শালগ্রামের উপরে

আমার এই প্রকার অনাদর হওয়াতেই বোধ হয়, শালগ্রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শালগ্রাম হারাইয়া সমস্ত দিন ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম। এখন শালগ্রামের অভাবে কি পূজা করিব। এই উদ্বেগে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ঠাকুর কি করিবেন তিনিই জানেন। শালগ্রাম যাওয়ায় আমার ভিতর যেন শূন্য হইয়া গেল। যেরূপেই হউক শালগ্রাম একটি সংগ্রহ করিতেই হইবে। আগামী কল্য শালগ্রাম অনুসন্ধান করিতে বাহির হইব, স্থির করিলাম। হরিদ্বার ও কনখলে অনেক ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডারা আমাকে "গুণী দাদা" বলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তাঁহাদের নিকটে যাইব।

হরিদ্বারে শালগ্রাম অনুসন্ধান।

অদ্য সকালে নিত্যক্রিয়া কোন প্রকারে সমাপন করিয়া কনখলে একটি সম্ভ্রান্ত পাণ্ডার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং আমার অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া একটি লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। পাণ্ডা বড় ভাল লোক। আমাকে লইয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক শালগ্রাম দেখাইলেন; কিন্তু একটিও আমার পছন্দমত হইল না। নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে বেলা ১২টার সময়ে শ্রীযুক্ত বিহারীলালজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। ইনি একজন বিখ্যাত বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী। আমাকে দেখিয়া তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। যেভাবে আদর-যত্ন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে লাগিলেন তাহাতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বলিলেন— শালগ্রাম এখানে দুর্লভ নয়, যতটি ইচ্ছা করেন দিতে পারি কিন্তু আপনি যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম চাহেন তাহা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মচারী আমাকে কিছু আহার করিতে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু আমি দিবসান্তে রাত্রে আহার করি জানিয়া কচুরি ও বর্ফি নিয়া আসিতে বলিলেন। আমি কিছু খাবার বাঁধিয়া নিয়া শালগ্রাম তালাস করিতে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বাহির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানেও একটি শালগ্রাম পাইলাম না। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, কল্য সকালে আসিবেন, আমি আপনাকে লক্ষণযুক্ত শিলা দিব। তাঁর কথায় নির্ভর করিয়া বেলা শেষে আশ্রমে আসিলাম। শালগ্রামের জন্য কি যে অশান্তি ভোগ করিতেছি, একমাত্র ঠাকুরই জানেন। মনে হইতেছে, গঙ্গার তীর হইতে একটি প্রস্তর তুলিয়া লইয়া পূজা করি।

২০শে —২৩ শে জ্যৈষ্ঠ।

শালগ্রাম সংগ্রহ। চণ্ডীপাহাড়ে চণ্ডী দর্শন। রাস্তা ভুল বিপদের আতঙ্ক।

সকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া বেলা ৯টার সময় কনখলে গেলাম। ব্রাহ্মণটির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত একটি বড় সিধা দিলেন। চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত, লঙ্কা কিছু দিনের মত চলিবে। ব্রাহ্মণ আমাকে একটিশালগ্রাম দিয়া বলিলেন— নিন, এই শালগ্রামটি আমার সাত পুরুষের বড় জাগ্রত ঠাকুর। এই শিলার নাম 'লক্ষ্মী নৃসিংহ'। কয়েক দিন পূজা করিলেই ইঁহার প্রভাব বুঝিবেন। আমি শালগ্রামটি হাতে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলাম— যত কাল আমি পছন্দমত সুগোল সুশ্রী শালগ্রাম না পাই, এইটিই রাখিব, পূজা করিব। আমার আকাঙ্ক্ষামত শালগ্রাম জুটিলে এটি আবার আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন—

আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাৎ যঃ দাতারং প্রতিষেধক।
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্যস্তু স পাপিষ্ঠ ততোধিকঃ।।

আমি আপনাকে যাহা দিলাম তা তো পুনরায় নিতে পারি না। আপনি অন্য কারোকে দিয়া দিবেন। আমি শালগ্রামটি লইয়া আশ্রমে আসিলাম এবং যথামত পূজা করিলাম। ভালই লাগিল। শিলাটি আয়তনে একটু বড়। ঠিক গোলাকৃতি নয়, মসৃণও নয়।

শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামী এই আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে বহুসংখ্যক মীরাটী ভদ্রলোক ও পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুরুষ আছেন। সকলেই স্বামিজীর শিষ্য। স্বামিজীর বাড়ী হুগলি জেলায় ছিল। স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, ৭/৮ বৎসর হইল চলিয়া আসিয়াছেন। কাশীতে রামানন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীবেশে বহুস্থান পর্য্যটন করিতেছেন। খেচরী মুদ্রায় ইনি সিদ্ধ বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোক ইহার শিষ্য হইয়াছেন। খুব কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগের ঔষধাদি জানেন বলিয়া এই অঞ্চলে কেশবানন্দের বিশেষ প্রতিপত্তি। অর্থাদি যাহা কিছু অর্জ্জন করেন, সাধু সেবা ও গরীব দুঃখীদের ক্লেশ নিবারণার্থে অকাতরে ব্যয় করেন। কেশবানন্দের সহিত আলাপে বড়ই আরাম বোধ হইল। ঠাকুরের পরিচয়ে কেশবানন্দ আমাকে খুব আদর করিলেন। কেশবানন্দ নিঃশব্দে প্রাণায়াম এবং খেচরী মুদ্রা করিয়া আমাকে দেখাইলেন। খেচরী মুদ্রা এত সহজে করিলেন যে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। এই আশ্রমে কেশবানন্দ আরও ২/৩ বার আসিয়াছেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য ও ভজনের উপযোগিতা দেখিয়া তিনি এই আশ্রমটি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আত্মানন্দের নামে ২টি ভাণ্ডারা দিয়াছেন। আত্মানন্দ ইঁহার ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব দেখিয়া, ইঁহারই নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামিজী আত্মানন্দকে কয়েকখানা ঘর এবং কয়েকটি গরু বাছুর জুটাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজীর সঙ্গে ২টি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী শিষ্য আছেন। একজনের নাম বরদানন্দ অপরের নাম জ্ঞানানন্দ। শুনিতেছি ব্রহ্মচারীরা এখানেই থাকিবেন।

অদ্য যথাসময়ে হোম করিয়া অতি প্রত্যূষে স্নান তর্পণান্তে কুটীরে আসিলাম। কেশবানন্দ স্বামী আমাকে তাঁর সঙ্গে চণ্ডী পাহাড়ে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি বেলা ৬টার সময়ে স্বামিজীর

২৪শে—২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

সঙ্গে চণ্ডী পাহাড়ে যাত্রা করিলাম। স্বামিজীর ২০/২৫টি শিষ্যও আমাদের সঙ্গে চলিল। আমরা 'জয় মা চণ্ডী' বলিতে বলিতে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বহু লোকের যাতায়াতে রাস্তাটি বেশ সুগম হইয়া আছে। ইতিপূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলাম তখন পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। রামপ্রকাশ মহান্তের শিষ্যটিকেই মাত্র সময়ে সময়ে দেখিয়াছিলাম। এবার ভাবিলাম, এই হিমালয় পর্ব্বতে কত মুনি ঋষি রহিয়াছেন, ঠাকুরের দয়া হইলে অনায়াসে তাঁহাদের দর্শনলাভ হইতে পারে; ঠাকুরকেও এই পাহাড়ে অনায়াসে দর্শন পাইতে পারি। আমি দু'পাশে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য এবং ভীষণ জঙ্গল দেখিয়া বড়ই আমোদ পাইতে লাগিলাম। এই প্রকার পাহাড়ে সকল জন্তুই থাকিতে পারে। পাহাড়ের নিম্নস্তরে কোন কোন স্থানে মহাপুরুষদের তপস্যার গোফা আছে বলিয়া মনে হইল। অধিক নীচে বলিয়া পরিষ্কার লক্ষ্য হইল না। যে সঙ্কীর্ণ পথটির উপর দিয়া চলিলাম তাহার পাশেই প্রায় আড়াই শত হাত

নীচু স্থান, অনেকদূর পর্য্যন্ত রহিয়াছে দেখিলাম। দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া মা চণ্ডীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

শুনিলাম, পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পিতা বা পিতামহ এই মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি ছোট হইলেও ইহা প্রস্তুত করা যে কত শক্ত ব্যাপার, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন। তখনকার অতি দুর্গম পথে দু'ক্রোশ দূর হইতে জল ও মন্দির প্রস্তুতের উপকরণ কি প্রকারে আনিয়াছিল ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

বহুকষ্টে পাহাড়ে উঠিয়া শ্রীচণ্ডী দর্শন করিয়া প্রাণটি আনন্দে ভরিয়া গেল। সম্মুখে আর একটি উচ্চ শৃঙ্গে 'অন্নপূর্ণা' আছেন শুনিলাম। আমরা পরমোৎসাহে অন্নপূর্ণার মন্দিরে পঁহুছিলাম। মাকে পরিক্রমা করিয়া দর্শন ও স্পর্শ করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। একটি বৃদ্ধাকে রাস্তায় দেখিয়া অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। বৃদ্ধার বয়স প্রায় ৮০ হইবে। সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। হামা দিয়া ১৪/১৫ হাত অগ্রসর হইতেছে, আবার হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িতেছে। এক হাত দেড় হাত কোন প্রকারে সরিয়া পড়িলে কোন্ অতল গর্ত্তে যাইয়া পড়িবে, খোঁজও পাওয়া যাইবে না। বৃদ্ধার সঙ্গে একটিমাত্র স্ত্রীলোক। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে সে বুড়িকে হাতে ধরিয়া পার করিতেছে। এই প্রকার হামা দিয়া কত কালে বৃদ্ধা মায়ের মন্দিরে পঁহুছিবে, জানি না। নামিবার সময়ে তো আরও বিপদ। বুড়ির অবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম— গুরুদেব! তুমি তো কখনও কারো ক্লেশ দেখিয়া সহ্য করিতে পার না। এই বুড়ির অবস্থা তো তুমি দেখিতেছ। ইহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার শ্রীচরণ দর্শন লাভার্থে জীবিতাশা বিসর্জ্জন দিয়া মন্দিরের দিকে ধাবিত। ইহার যতই উৎকট প্রারব্ধ থাকুক না কেন, তুমি ইহাকে দয়া করিও। বুড়ির অবস্থা দেখিয়া, আমার এতই কষ্ট হইতে লাগিল যে, আমি বুড়ির জন্য ঠাকুরকে কিছু না বলিয়া পারিলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বুড়ির চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে স্বামিজীর শিষ্যেরা বহুদূর চলিয়া গেলেন। আমি নিঃসঙ্গ হইয়া একটি ভয়ঙ্কর পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিলাম। কোন কোন স্থানে মূল রাস্তা হইতে ২/৩টী রাস্তাও গিয়াছে। সে সব স্থানে বড়ই মুস্কিল। অদৃষ্টক্রমে ঠিক পথে না চলিয়া কাঠুরিয়াদের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে জনপ্রাণীশূন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এই রাস্তারও দুধারে সঙ্কীর্ণ পথ আছে। কোন্ পথে কোথায় যাইয়া পঁহুছিব, নিশ্চয় নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। নিবিড় অরণ্য, স্থানে স্থানে বন্য জন্তুর চীৎকার, একটি লোক কোথাও নাই। নিরুপায় ভাবিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি উপায়ান্তর না পাইয়া যে পথে আসিয়াছি, ফিরিয়া সেই পথেই চণ্ডীর দিকে চলিলাম। কিছুক্ষণ চলিয়া চণ্ডীর যাত্রী পাইলাম। তাহাদের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলাম। সিদ্ধ অঘোরী কামরাজের আশ্রম দর্শন করিয়া নীলধারায় স্নান করিলাম। পরে অপরাহ্ন ৩টার সময়ে সকলে একসঙ্গে আশ্রমে আসিলাম।

কেশবানন্দ স্বামী।

কেশবানন্দ স্বামীর সঙ্গ দিন দিনই ভাল লাগিতেছে। গুরুর আদেশ মত ভারতবর্ষে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া, সাধু ধর্ম্মার্থীদের সেবা ও সুবিধা করাই নাকি ইহার ব্রত। তাই ইঁহার কোন সম্প্রদায়

বুদ্ধি নাই। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী দেখিলেই তার সেবায় নিযুক্ত হন। অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক ইঁহার আশ্রয় নিয়াছেন। তাঁহারা সহস্র সহস্র অর্থ ইঁহাকে দান করেন। ইঁনি সেই অর্থ মুক্তহস্তে সাধু সেবায় ব্যয় করেন। ব্রহ্মচারীদের উপরে ইঁহার বিশেষ আকর্ষণ। ব্রহ্মচারীরা নিরাপদে ভজন-সাধন-তপস্যা করিতে পারে লোকালয়ের সন্নিকট এইরূপ স্থান বড়ই দুর্ঘট। এই দাম পাড় ব্রহ্মচারীদের বাসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান মনে করেন। শুনিলাম এই স্থানটি ক্রয় করিয়া একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য কেশবানন্দ দরখাস্ত করিয়াছেন, দরখাস্ত নাকি মঞ্জুর হইয়াছে। মূল্য নিশ্চয় হইলেই ক্রয় করিয়া আশ্রম প্রস্তুত আরম্ভ করিবেন।

কেশবানন্দ স্বামী আমার কার্য্যকলাপ, সাধন-ভজন গোপনে অনুসন্ধান করিয়া আমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিলেই এই আশ্রমে স্থায়ীভাবে আসন করিতে অনুরোধ করেন। এই আশ্রমে বরদানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি কয়েকটি ব্রহ্মচারী থাকিবেন। স্বামিজী এই স্থানটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম করিয়া ইহার সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার ও সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আমার উপর রাখিতে চান। খরচপত্র যাহা আবশ্যক তিনিই চালাইবেন। আমি কেশবানন্দকে বলিলাম—আত্মানন্দ বহুকাল যাবৎ এস্থানে আছেন। তারই উপরে সমস্ত ভার, দেন না কেন? স্বামিজী বলিলেন—আপনি এতদিন উহার সঙ্গে থাকিয়া কি উহার প্রকৃতি এখনও বুঝেন নাই? আমি বলিলাম—আমি ৩/৪দিনেই জানিয়া নিয়াছি। এখানে আমি আরও কিছুদিন থাকিতে পারিব কিনা সন্দেহ হয়। লোকটি বড়ই ভজন-বিরোধী। স্বামিজী বলিলেন—আপনার উপর কি কোন অত্যাচার করিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম—আমার আর কি করিবে? তবে মদ খেয়ে, স্ত্রীলোক এনে সারারাত্রি মাতামাতি করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা কি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বাসের যোগ্য? কেশবানন্দ শুনিয়া অবাক্। আমি স্বামিজীকে উহার ঘর অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। স্বামিজী আত্মানন্দের ঘরে প্রবেশ করিয়া ২টি মদের বোতল বাহির করিলেন; আত্মানন্দকে যথেষ্ট গালাগালি করিলেন। আমার আদেশাধীন হইয়া আত্মানন্দ না চলিলে, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিবেন বলিলেন। কেশবানন্দ আমার নামে ১টি বৃহৎ ভাণ্ডারা দিয়া হরিদ্বার ও কনখলের সাধুদের আমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক তাহাদের সেবা করিলেন। সাধুদের ভিতর আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। কেশবানন্দ আমাকে এক জোড়া ধুতি, এক সের ঘৃত, তৈল, প্রদীপ, রান্না করিবার একটি পাত্র আনিয়া দিলেন। জ্ঞানানন্দ ও বরদানন্দকে আশ্রমে রাখিয়া অপর শিষ্যগণ সহিত তিনি মীরাটের দিকে যাত্রা করিলেন।

সাধন চেষ্টার নিষ্ফলতা। বস্তু তাঁর হাতে—দাতা তিনি।

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে চলিল। এখানে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম, ঋষি মুনিদের তপস্যার পরম পবিত্র যোগ্যভূমি মায়াপুরী হরিদ্বারে আসিয়াছি। এখানে শরীর যদি সুস্থ থাকে, সাধন-ভজনের নির্জ্জন মনোরম স্থান পাই, এবং সাধন-বিঘ্নকর কোন বিপত্তি (বাহির হইতে) উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মনের সাধে, প্রাণের ক্ষোভ মিটাইয়া একবার ভজন-সাধন করিব। ঠাকুরের কৃপায় আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। কুটীরটিও ভজনের অনুকূল। অতি সুন্দর স্থানে, শিংশপামূলে প্রস্তুত

হইয়াছে। বাহির হইতেও কোন প্রকার উপাধিই এখন আর নাই কিন্তু তথাপি ভজনে মন বসিল না। ভজনে কিসে মন বসে আবার কেন বসে না, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া হয়রান হইলাম।

২৭শে —৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০।

হেতু কিছুই ধরিতে পারিলাম না। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম, সাধক-জীবনে অহৈতুকী জ্বালা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। উহা এতই বিষম যে সাধক উহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। উহাতে সমস্ত বাসনা-কামনা দগ্ধ করিয়া অভিমানকে ভস্মীভূত করে। কিছুদিন যাবৎ দেখিতেছি, চিত্ত অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নামে আনন্দ নাই, নাম করিতে পারি না। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা ও বিরক্তি আসিয়া পড়ে। অস্থির হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠি। উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া-তুলিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। কখনও নাম করিব স্থির করিয়া খুব উৎসাহের সহিত আসনে বসি, পাঁচ মিনিট নাম করিতে না-করিতে মনটি কোথায় চলিয়া যায়। নামটি একেবারে ভুলয়া যাই। বহুক্ষণ পরে চৈতন্য হয়। তখন আবার নাম করিতে আরম্ভ করি। এরূপ কেন হয় কিছুই বুঝিতেছি না। কোন দিন আবার এমনও দেখিতেছি—মন অতিশয় বিরক্তিপূর্ণ, কিছুই ভাল লাগিতেছে না। ভাবিলাম আজ আর আসনে বসিব না, নিয়মিত সন্ধ্যাটি বা ন্যাসটি মাত্র কোন প্রকারে সারিয়া নেই—এই স্থির করিয়া আসনে বসিলাম, আর উঠা হইল না। আপনা-আপনি চিত্তটি 'নামে' 'ধ্যানে' এতই নিবিষ্ট হইয়া পড়িল যে ঠাকুর আমাকে চোখের জলে একেবারে ডুবাইয়া রাখিলেন, সারা দিনে আর মাথা তুলিতে দিলেন না। এই প্রকার কেন হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বিরক্তিপূর্ণ অস্থির চিত্ত বিনা চেষ্টায় অকস্মাৎ কেন স্থির ও প্রফুল্ল হয়, এবং উৎসাহপূর্ণ সরস হৃদয় বিনা কারণে হঠাৎ কেন নীরস ও শুষ্কতাপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই বুঝিতেছি না। তবে সময়ে সময়ে নিরপেক্ষ একটা মহাশক্তির প্রভাবে যেন এই সমস্ত ঘটিতেছে মনে হয়। পুনঃপুনঃ এই মহাশক্তির পরিচয় পাইয়াও ইহার উপরে নির্ভর করিতে পারিতেছি না। সংগ্রাম করিয়া বারংবার পরাস্ত হইতেছি। হাত পা ছাড়িয়া দিয়া, নিজে আর কিছু করিব না স্থির করিতেছি—কিন্তু জানি না কেন ভিতর হইতে আবার চেষ্টার জন্য উৎসাহ উদ্যম আসিয়া পড়ে—এই চেষ্টা না করিয়াও উপায় নাই, আবার করিয়াও লাভ নাই। ঠাকুর লোভের বস্তু সম্মুখে ধরিয়া হাত বাড়াইয়া নিতে উৎসাহ দিতেছেন কিন্তু উহা পাইতে হাত বাড়াইলেই অমনি উহা সরাইয়া লইতেছেন। বস্তু তাঁর হাতে—দাতা তিনি। তিনি না দিলে কোথা হইতে পাইব। তবে ঠাকুর যে আমাকে লইয়া এভাবে খেলা করিতেছেন—আমাকে কাঁদাইয়া আমোদ পাইতেছেন— ইহা মনে করিয়া সময় সময় আনন্দ পাই। জয় গুরুদেব।

বিচার বুদ্ধিতে নিরম্বু একাদশী ভঙ্গ ও অনুতাপ।

এখানে আসিয়া একদিনও নিরম্বু একাদশী করিতে পারিলাম না। কোন না কোন প্রকারে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আজ নিশ্চয়ই নিরম্বু করিব সঙ্কল্প করিলাম। এই স্থির করিয়া সারাদিন আসনে বসিয়া নাম করিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার সময়ে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আসনে বসিতেও কষ্ট হইতে লাগিল। নাম বন্ধ হইয়া আসিল। ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। আর আর দিন কিন্তু

এই সময়ে আমার রান্নাও হয় না। একাদশীর উপবাস আমার এখন পর্য্যন্ত আরম্ভই হয় নাই— আমার তো উপবাস কল্য। একাদশীর নামেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ কি বিষম সংস্কার। আহারের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধিও সেইদিকে দাঁড়াইল। ভাবিলাম, এই প্রকাব উপবাসে লাভ কি? ভগবানের উপাসনার জন্যই তো উপবাস। এই উপবাসে তো আমার ভজনের বিঘ্ন করিতেছে—নাম চলিতেছে না, ক্ষুধায় অস্থির, মন বিরক্তিপূর্ণ, শরীরও দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। কল্যও সারাদিন একরূপ উপবাস। কল্য আর উঠিবার শক্তি থাকিবে না—দিনটিই বৃথা যাইবে। সুতরাং একদিন উপবাস করিয়া দু'তিন দিন পড়িয়া থাকা অপেক্ষা পেট ভরিয়া আহার করিয়া সুস্থ শরীরে ভজন-সাধন করাই তো সঙ্গত। ভজন-বিরোধী যাহা তাহা যতই কল্যাণকর হউক না কেন, উহা পাপ, বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ সকল ভাবিয়া আমি কিছু আহার করিব স্থির করিয়া চা প্রস্তুত করিলাম। উহা পান করিয়া সুস্থ হইলাম।

৩১শে — ৩২শে জ্যৈষ্ঠ।

নিরম্বু একাদশীতে যে কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাতে আস্থা থাকিলে অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী আরামের জন্য তাহা কখনও ভঙ্গ করিতাম না। ১৫ দিনের পাপরাশি দগ্ধ কবিবার জন্য ভগবৎ-বিধানে দুর্লভ একাদশী তিথি জীবের ভাগ্যে সমাগত হয়। চতুর, সুবুদ্ধিমান হইলে কখনও আমি এই সুযোগ অগ্রাহ্য করিতাম না। ঠাকুর যাহাতে তোমার আনন্দ, সেই শাস্ত্রানুগত সুবুদ্ধি প্রদান কর।

উত্তপ্ত ডাল পড়ার জ্বালা—প্রার্থনায় নিবৃত্তি।

গতকল্য শুধু চা পান করিয়া একাদশীর উপবাস করিয়াছি। আজ চা ও বেলের সরবৎ খাইলাম। সন্ধ্যার পরে খুব ক্ষুধা পাইল। আকাঙ্ক্ষা হইল ডাল ভাত রান্না করিয়া পেট ভরিয়া আহার করিব। ধুনিতে লোভ বশতঃ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ডাল চাপাইলাম। ডাল নামাইবার সময়ে হঠাৎ হাত হইতে বাসনটি পড়িয়া গেল। কতকগুলি ডাল আমার হাতে, পায়ে, মুখে, বুকে আসিয়া পড়িল। ভযানক উত্তপ্ত ডাইল যে যে স্থানে লাগিল জ্বলিয়া উঠিল। আমি স্পর্শ মাত্রে "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিয়া স্থির হইয়া বসিলাম এবং অগ্নিদেবকে বলিলাম—হে অগ্নি! একি করিলে? কোন অপরাধে আমাকে তুমি এই শাস্তি দিলে? অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হওয়ায় ডাল চাউলের পবিমাণ কিছু বেশী নিযাছিলাম। আমার ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করিতেছি দেখিয়াই কি তুমি আমাকে এই শাসন করিলে? প্রত্যহ তিন বেলা সঘৃত বিল্বপত্র আহুতি দিয়া আমি তোমার তেজ বৃদ্ধি করি। সেই তেজকে আমারই উপর প্রয়োগ করিলে? আমার একদিনের একটিমাত্র অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিলেন না? আমি এই জ্বালা কি প্রকারে সহ্য করিব। অমনি মনে হইল, অগ্নি কে? আমার ঠাকুরই তো অগ্নিরূপে আমার আহুতি গ্রহণ করেন। তেজের একমাত্র আধার তো তিনিই। ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—গুরুদেব, তোমার কৃপার দানকে আমি শাস্তি মনে করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক মিনিটও আমার জ্বালাভোগ হইল না। আপনা আপনি জ্বালা একেবারে নির্ব্বাণ হইল।

চণ্ডীদেবীর মন্দির

নমপাড়ু আশ্রম

লোভের প্রতিফল। অসৎ পরিগ্রহে অশান্তি।

আমার আহারের সমস্ত বস্তু ফুরাইয়া গিয়াছে। রামপ্রকাশ মহান্তের নিকট ভিক্ষায় যাইব স্থির করিলাম। শুনিলাম হরিদ্বারের সর্ব্বপ্রধান মহান্ত নানকপন্থী শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামী আজ ভাণ্ডারা দিবেন। কনখল ও হরিদ্বারের সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আত্মানন্দ আমাকে তাহার সহিত তথায় যাইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি স্থূল ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য রামপ্রকাশ মহান্তের নিকট উপস্থিত হইলাম। আত্মানন্দ সঙ্গে ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম আত্মানন্দকে দেখিয়া রামপ্রকাশ অধিক পরিমাণে ভিক্ষা দিবেন। কিন্তু উল্টা হইল। ভিক্ষা চাহিতেই আত্মানন্দকে রামপ্রকাশ বলিলেন—আপনি আশ্রমধারী সন্ন্যাসী বড় বড় ভাণ্ডারা আপনার আশ্রমে হয়। এই ব্রহ্মচারীকে একমুষ্টি অন্ন আপনি দিতে পারেন না? একে ভিক্ষা করিতে হয়! আত্মানন্দ বলিলেন—ভিক্ষা ইঁহার বৃত্তি তাই করেন। ইনি যদি আমার ভাণ্ডারের বস্তু গ্রহণ করেন, অনায়াসে প্রয়োজন মত সব পাইতে পারেন। কিন্তু ইনি তাহা নেন না। রামপ্রকাশ মহান্ত আর আর বার যে প্রকার ভিক্ষা দিয়া থাকেন, এবার তাহাও দিলেন না। আত্মানন্দকে দেখিয়াই তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। ওখান হইতে আত্মানন্দ আমাকে নানা বস্তুর লোভ দেখাইয়া কেশবানন্দের আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমিও প্রচুর সামগ্রী পাইব আশায় সদাব্রতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ভাগ্যবশতঃ সেখানে কয়েকখানা কচুরি ও কয়েকটিমাত্র লাড্ডু পাইলাম। একখানা বস্ত্রও পাওয়া গেল। উহা লইয়া আশ্রমে প্রস্থান করিলাম। পথে আপনা আপনি মনটি আমার বিরক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিনা কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি বন্ধ হইয়া গেল। মনটি অতিশয় উদ্বেগপূর্ণ ও বিষম অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, একি হইল! অকস্মাৎ এই প্রকার হওয়ার কারণ কি? ভাণ্ডারার বস্তু গ্রহণ করিতে আমার একেবারে ইচ্ছা ছিল না, কেবল আত্মানন্দের জেদে গ্রহণ করিয়াছি। বোধ হয় ঐ অপরাধেই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল। সদাশয় সজ্জন মহাত্মাবা ভাণ্ডারার অধিকারী হইলেও, যাহাদের হস্তে উহা বিতরণ করা হয়, তাহাদের অসৎভাবের সংস্পর্শে বস্তু কলুষিত হয়—গ্রহণকারীকেও তাহা স্পর্শ করে। আমি আশ্রমে পঁহুছিয়াই ভাণ্ডারার পক্কান্ন মিষ্টান্নগুলি ও বস্ত্রখানা আত্মানন্দকে দিয়া দিলাম। ঐ সকল বস্তু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববৎ নাম চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য গুরুদেবের শিক্ষা ও দয়া! এইভাবে না শিখাইলে কি আমার আর নিস্তার আছে।

১লা আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

মন্ত্রশক্তি।

আজ সন্ধ্যা করিতে আসনে বসিয়াছি; একটি লোকের মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিতে লাগিলাম। বাহিরে যাইয়া দেখি, লোকটি বিচ্ছুর দংশনে গেলাম মর্‌লাম বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আত্মানন্দকে বলায় সে উহা লইয়া তামাসা করিতে লাগিল। পাহাড়ী বিচ্ছুর কামড়ে মানুষ মরিয়া যায় শুনিয়াছিলাম। দাদা বলিয়াছিলেন দংশনের যন্ত্রণা এ পর্য্যন্ত যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে পাহাড়ী বিচ্ছুর মত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বিষ আর আবিষ্কার হয় নাই। আমি আত্মানন্দের

উপর বিরক্ত হইয়া বরদানন্দের নিকটে যাইয়া বলিলাম। বরদানন্দ তখনই ওঝার জন্য বাহির হইল। আত্মানন্দ তখন খুব উৎসাহের সহিত কনখলে যাইয়া একটি ওঝা লইয়া আসিল। ওঝাটির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম। সে আশ্রমে পঁহুছিয়াই রোগীকে একবার দেখিয়া ১০/১৫ ফুট দূরে গিয়া দাঁড়াইল এবং দম বন্ধ করিয়া কয়েকটি কাঁচা পাতা হাতে কচ্‌লাইয়া মাটিতে রস ফেলিতে লাগিল। বিচ্ছুর বিষ উরু পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ওঝা প্রথম দমে হাঁটু পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় দমে পায়ের নালা, তৃতীয় দমে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত বিষ নামাইল। চতুর্থ দমে রোগী সম্পূর্ণ যন্ত্রণাশূন্য হইয়া উঠিয়া বসিল। পরে অর্দ্ধঘণ্টা পথ হাঁটিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। ওঝাটি ভদ্রলোক নয়, মুটে মজুর শ্রেণীর—সাধারণ লোক। ভগবানের রাজ্যে কত কি আছে, কিছুই জানি না। সাধারণ লোকের ভিতরে যে সকল বিদ্যা ও মন্ত্র শক্তি আছে, বড় বড় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার ত্রিসীমানায়ও পঁহুছিতে পারেন না।

ভয়ানক শুষ্কতায় ঠাকুরের কৃপা বর্ষণ।
শালগ্রামে নীল জ্যোতি।

প্রত্যূষে যথামত প্রাতঃশৌচাদি সমাপন করিয়া, আসনে বসিলাম। বহু চেষ্টায়ও নিত্যকর্ম্মে মনটিকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। জানি না কেন, আজ মন আপনা আপনি বিরক্তিপূর্ণ। অনেক চেষ্টায়ও প্রাণে সরস ভাব আনিতে পারিলাম না। নাম বোঝার মত ভার বোধ হইতে লাগিল। ধ্যেয় বস্তুর উদ্দেশই পাইলাম না। নীরস নাম অস্বাভাবিক শ্বাসে-প্রশ্বাসে সংযোগ করার চেষ্টায় হয়রান হইয়া পড়িলাম। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বোধ হইতে লাগিল। আমি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া, আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুরের উপরে অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। কোন একটা হেতুকে সূত্র করিয়া চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত বা মলিন হইলে, মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। না হ'লে ঠাকুরের ইচ্ছায় এ সমস্ত ঘটিতেছে না বলিয়া উপায় কি? আমি ঠাকুরের উপর অভিমান করিয়া, কত কি বলিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার দৃষ্টি শালগ্রামের উপরে পড়িল। শালগ্রামের রূপ দেখিয়া অবাক্ হইলাম। দেখিলাম—শিলার কলেবরে নানাস্থানে অত্যুজ্জ্বল গাঢ় নীল জ্যোতিঃ, জোনাকিপোকার মত পুনঃপুনঃ জ্বলিয়া উঠিয়া আবার লয় পাইয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ ধরিয়া এই অনুপম জ্যোতির খেলা দর্শন করিলাম। জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে চিত্তে আমার সরস ভাব আসিল। নামও সরস এবং সতেজভাবে আপনা আপনি ফোয়ারার মত ভিতর হইতে উঠিতে লাগিল। ঠাকুরের স্মৃতি চিত্তে উদিত হওয়ায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।

২রা আষাঢ়।

ছায়ারূপ দর্শনে খেদ আতঙ্ক। প্রার্থনা—'দর্শন দিও না'।

আজ সকালবেলা হইতে সমস্ত দিন, সাধন-ভজনে খুব আনন্দে গেল। ঠাকুরের স্মরণে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রশস্ত দিবালোকে সম্মুখের আকাশে পরিষ্কার ঠাকুরের ছায়া আজ আবার প্রকাশ হইল। ছায়াটির আকার ঠাকুরেরই অনুরূপ। ক্রমশঃ উহা ঘন হইয়া স্থূল ও খর্ব্ব হইতেছে মনে হইল। আমি তখন চোখ বুজিয়া ছায়ার নিকটে কাঁদিয়া পড়িলাম এবং বলিতে লাগিলাম—ঠাকুর। আর আমাকে দর্শন দিওনা। ছায়া দর্শন হলেই ভয়ে আমি অস্থির হই—পাছে তুমি প্রকাশ হইয়া

পড়। ছায়ায় দৃষ্টি না করিয়া পুনঃপুনঃ চারিদিকে চঞ্চলভাবে তাকাইতে থাকি। চোখ একবার বুজি, একবার মেলি—যেন দর্শন না হয়। তোমার ছায়া জানিয়াও আমি অগ্রাহ্য করি। ঠাকুর দয়া করিয়া যদি আমাকে তুমি দর্শন দাও, তবে এইটুকু কৃপা কর—যেন দর্শনের পূর্ব্বে তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি ভালবাসা জন্মে। ইহা না হইলে তোমাকে আদর করিব কিরূপে? বিশ্বাস ভক্তি ভালবাসা অন্তরে না থাকিলে তোমার দেবদুর্লভ দর্শনও তো ছায়াবাজী দেখার মত হইবে। ঐ প্রকার দর্শন না হওয়া আমি শতগুণে ভাল মনে করি। সময়ে সময়ে তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু তাহা হিতাহিত জ্ঞানে নয়, প্রাণের স্বাভাবিক টানে। প্রাণের বস্তুকে যদি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে না পারি, আদরের বস্তু যদি অনাদরে চলিয়া যায়—তাহলে আমার সেই দর্শনে লাভ কি? ঠাকুর তোমাকে আদর করিতে পারি, সেপ্রকার অবস্থা না দিয়া কখনও আমাকে দর্শন দিওনা—আমি যতই কান্নাকাটি করি না কেন, সমস্ত অগ্রাহ্য করিও, তোমার চরণে এই আমার প্রার্থনা। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া অন্তর্ধান করিলেন, কিন্তু বিমল আনন্দ প্রাণে সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। আজ সমস্তটি দিন যেন অন্য রাজ্যে কাটাইলাম।

৩রা আষাঢ়, ১৩০০।

লোক সেবায় সাধন স্ফূর্ত্তি।

আজ রাত্রি ৩টার সময়ে জাগিলাম। ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে। কিছুক্ষণ আসনে স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিলাম। তন্দ্রাবেশ হওয়ায় আবার শুইয়া পড়িলাম, একটু পরেই আবার উঠিতে হইল। বৃষ্টির জল গায়ে পড়িতে লাগিল। গুরুগীতা পাঠ করিয়া কিছু কাল ধ্যান করিলাম। মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে। নীলধারায় চলিয়া গেলাম। শৌচাদি সমাপন করিয়া আসনে আসিয়া বসিলাম। বৃষ্টি থামিয়া গেল। আজ পাহাড়ের দৃশ্য বড়ই মনোরম। নীলবর্ণ পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ উঠিতেছে। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় চোখ আর ফিরাইতে পারিলাম না। ঠাকুরের কলেবর মনে করিয়া বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। ভাব-উচ্ছ্বাসে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

১১ই আষাঢ়।

আজ একাদশী, নিরম্বু করিব। আহারের কোন উৎপাত নাই ভাবিয়া, ভোরবেলা হইতে খুব একটা উৎসাহ আনন্দ ভিতরে চলিয়াছিল। আসনে বেশ নিবিষ্টভাবে বসিয়া আছি—এক গ্লাস দুধ লইয়া আত্মানন্দ আসিয়া বলিলেন—"দাদা, আজ বড় ঠাণ্ডা, চা চাই।" আমি বলিলাম—"আজ একাদশী, আমি নিরম্বু করবো—তোমরা গিয়ে চা করে' খাও।" আত্মানন্দ বলিল—"বরদানন্দ, জ্ঞানানন্দ তো চা প্রস্তুত করিতে জানে না।" আমি কোন উত্তর না দেওয়ায়, আত্মানন্দ দুঃখিত মনে চলিয়া গেল। আমি উৎপাত শান্তি হইল মনে করিয়া, নাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু নামে আর মন বসিল না। বহুচেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বের ভাব অন্তরে আনিতে পারিলাম না। মনে শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম অকস্মাৎ একি হইল? একি আত্মানন্দ প্রভৃতিকে চা না করিয়া দেওয়ার ফল? আমি অমনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং আত্মানন্দের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নিজ হইতে সমস্ত আয়োজন করিয়া উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত করিলাম। আত্মানন্দ, বরদানন্দ ও জ্ঞানানন্দ বৃষ্টির সময়ে ঠাণ্ডাতে গরম গরম চা পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আমিও এক গ্লাস চা ঠাকুরের জন্য নিয়া আসিলাম। ঠাকুরকে চা নিবেদন করিতেই আমার কান্না পাইল।

চা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সুখময় স্মৃতি প্রাণে উদয় হইল। সমস্তটি দিন নামানন্দে বিভোর হইয়া কাটাইলাম, ঠাকুরের একটি কথা আজ সারাদিন মনে হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনা সময়ে, ভাবভক্তি কিছুই আস্‌ছে না—প্রাণ শুষ্ক কাঠের ন্যায় কি কর্‌ব, ঠিক কর্‌তে না পেরে রাস্তায় বাহির হ'য়ে একটি কুলির পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার কর্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণ সরস হ'য়ে উঠ্‌ল। তখন গিয়ে উপাসনা কর্‌লাম। উপাসনা খুব ভাল হ'ল। আর একদিন শুষ্কতায় কিছু ভাল লাগ্‌ছেনা, উপাসনায় মন বস্‌ছেনা—একটি দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলাম—আর অমনি মনটি সরস হ'ল, উপাসনাও খুব ভাল হ'ল।**

শুনিয়াছি, যে কোন কারণে কেহ কারো প্রাণে ক্লেশ দিলে, তাহা দ্বারা ভগবৎ উপাসনা হয় না। শুনিয়াছি, ভগবৎভক্ত কোন ব্যক্তির সৎ আচরণেও ভ্রম প্রযুক্ত যদি কেহ প্রাণে আঘাত পায়, তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার ভগবৎ উপাসনার ফল একবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বর্ষার প্রারম্ভে বিষময় গঙ্গা—স্নানে বিপত্তি।

১২ই আষাঢ়,
দামপাড়, হরিদ্বার।

আজ রাত্রি সাড়ে তিনটায় জাগিলাম। দেখি, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বৃষ্টির জল পড়িবে ভাবিয়া আসন হইতে শোওয়ার স্থান পৃথক্ করিয়াছি। কিন্তু, দূরদৃষ্টবশতঃ সবই বৃথা। বিছানায় জল পড়িতে লাগিল। সমস্ত ঘর ভিজিয়া গেল। আসনের উপরে কোন প্রকারে একটু আচ্ছাদন করিয়া ধুনি জ্বালিলাম। হোম, সন্ধ্যা-তর্পণাদি যথানিয়মে সমাপন করিয়া চায়ের জল চাপাইলাম। বাহিরে যাইতে আজ আর ইচ্ছা হইল না।

গতকল্য গঙ্গাস্নানের সময়ে একটি সাধু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারিজী, এ সময়ে গঙ্গাস্নান করিবেন না, গঙ্গা স্পর্শও না করা ভাল। ওরূপ করিলে বিপদে পড়িবেন—গঙ্গা এখন 'রজঃস্বলা'।" আমি ভাবিলাম, লোকটার বোধ হয় মাথার গোলমাল আছে—না হ'লে গঙ্গা স্পর্শ করিতে নিষেধ করে? আমি স্বচ্ছন্দে গঙ্গায় নামিয়া অবগাহন করিলাম। উপরে উঠিয়া গা পুঁছিবার সময়ে দেখি সর্ব্বাঙ্গ চুল্ চুল্ করিতেছে। অসম্ভব চুল্‌কানিতে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন সেই সাধুটিকে যাইয়া বলিলাম—"ভাই, তোমার কথা না শুনিয়া বিপদে পড়িয়াছি। এখন কি করি বল।" সাধু আমাকে সর্ব্বাঙ্গে গোবর মাটি মাখিয়া নীলধারার সমীপবর্ত্তী বদ্ধ খালে স্নান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিয়া কতকটা সুস্থ হইলাম। সাধু বলিলেন—বর্ষার প্রারম্ভে পর্ব্বতের সমস্ত আবর্জ্জনা এবং বহুপ্রকার বিষ ধুইয়া জল আসিয়া গঙ্গায় পড়ে। তাই ঐ জল ভয়ানক বিষাক্ত হয়—স্পর্শ করিলেও নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে।" আমি বলিলাম—দেশে তো বর্ষায় গঙ্গাজল অনিষ্টকর হয় না? সাধু বলিল—"গঙ্গা চলিতে চলিতে রৌদ্র, হাওয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভূমি সংযোগে পরিষ্কার হ'ন।" আজও আমার শরীরে নানাস্থানে আমবাতের মত চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। হাঁটু ও ঘাড়ে বেদনা হইয়াছে। গলায় 'টন্‌সিল্' ফুলিয়াছে। খালের জল ছাড়া কিছুদিন আর উপায় নাই। স্নানাহার সমস্ত উহাতেই করিতে হইবে। কিন্তু পরে এই

গঙ্গার জলের সঙ্গে খালের যোগ হইলেই বিষম বিপদ। তখন জলাভাবে এ স্থান হইতে হয়ত সরিতে হইবে।

বিক্ষিপ্ত ও উদ্বেগপূর্ণ মন। অন্যের কল্যাণকামনায় চিত্ত সুস্থির। গায়ত্রী জপে অষ্টদল পদ্মস্থিত কেন্দ্রে নীলজ্যোতিঃ দর্শন।

সকালে ঠাণ্ডা লাগাইতে সাহস হইল না। আসনে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। নামে মন বসিল না, বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ভয়ানক বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝাপ্টা হাওয়া—ঘরের সর্ব্বত্রই ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। আমি সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া আসনে বসিলাম। আসনের উপরে আচ্ছাদন দেওয়াতেও জল পড়া নিবারণ হইল না। পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কত প্রকার ভাবই মনে আসিতে লাগিল। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় মুনি-ঋষিদের কথা মনে পড়িল। এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে কত মুনি-ঋষি অনাবৃত শরীরে বৃক্ষমূলে বসিয়া ভগবৎ ধ্যানে বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহাদের কথা ভাবিয়া কান্না পাইল। ঠাকুরকে বলিলাম— দয়াময়, আজ এই সময়ে, এই পর্ব্বতে কত যোগী-ঋষি বৃষ্টিতে ভিজিয়া নিমীলিত-নয়নে একাগ্রভাবে তোমার দর্শন পাইতে অহর্নিশি ধ্যান করিতেছেন।—আহা! তোমার কণিকামাত্র কৃপা পাইতে তাঁহারা কতই না ক্লেশ করিতেছেন! যদি দয়া করিবে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদেরই কর। তোমার পতিতোদ্ধারণ পবিত্র নাম জগতে জয়যুক্ত হউক। আমি তোমার সর্ব্বমঙ্গলময় অনুপমরূপ বহুকাল দেখিয়াছি—আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। যাঁহারা তোমাকে একবারও ভাবিয়াছেন, একবারও তোমার নাম লইয়াছেন—দয়া করিয়া তাঁহাদের তুমি দর্শন দিয়া, চিরকালের মত কৃতার্থ কর। তোমার ভক্তজনের আনন্দ দেখিয়া ত্রিজগৎ ধন্য হউক।

এইভাবে প্রার্থনা করিতে করিতেই কি যে হইয়া গেলাম, প্রকাশ করিতে পারি না। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত ঠাকুর আমাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া রাখিলেন। জয় গুরুদেব! বেলা ১২টার পরে আসন হইতে উঠিলাম। ঘর মুক্ত ও যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, নীলধারার খাল হইতে জল আনিলাম। এক ঘণ্টা সময় বাহিরের কাজে গেল। ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আসনে রহিলাম। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুর যথেষ্ট কৃপা করিলেন। মধ্যাহ্ন হোমের পর যদিও আজ্ঞাচক্রে ধ্যান রাখিয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলাম কিন্তু বহুদিনের অভ্যস্ত বলিয়া অষ্টদল পদ্মই প্রকাশিত হইল। পরিষ্কার বুঝিবার জন্য পদ্মের পাপড়িগুলি পৃথক্ পৃথক্ গণিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু পারিলাম না। পাপড়ির চতুর্দ্দিকে রশ্মির উজ্জ্বল ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। আমি পদ্মের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত মণ্ডলাকার সুনীল চক্রে দৃষ্টি রাখিয়া নাম করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেন্দ্রস্থিত চক্র নীলজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে। সময় সময় শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি ধারণ করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই আবার বিলয় পাইতেছে। সংখ্যাপূর্ণ হইলে গায়ত্রী জপ ছাড়িয়া দিলাম। জ্যোতিঃ ও অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নামে ও ধ্যানে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

জ্যোতিঃ দর্শন চেষ্টায় বিফলতা।

বর্ষা আরম্ভে তিন মাসের আহার সংগ্রহ।

সকালে প্রায় ৫টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া আসনে বসিলাম। শরীর আজ অতিশয় কাতর। ঘাড়ের ও গলার বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠাণ্ডায় বাহিরে যাইতে সাহস হইল না। সন্ধ্যা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ইত্যাদি যথারীতি করিলাম। ৮টার সময় শরীর আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। ভাবিলাম, বাহিরের কাজ করা যাউক, তাতে যদি একটু সুস্থ হই। আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম।

১৩ই আষাঢ়।

৮টার সময় ঘর 'মুক্ত' করিয়া, হোমকাষ্ঠ প্রস্তুত করিলাম। তৎপরে বাসন লইয়া নীলধারায় চলিয়া গেলাম। আজ পায়খানা হইল না। মাথা খুব ধরিল। রাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি মশায় কামড়াইয়াছিল, সে সব স্থানে চুল্‌কানি আরম্ভ হইল। নিতান্ত অবসন্ন শরীরে আসনে আসিয়া বসিলাম। আসনে কিছুক্ষণ বসার পর শরীর আপনা-আপনি সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। আমি সন্ধ্যা, হোম ১২টার মধ্যে সারিয়া লইয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, গতকল্য এই সময়ে অষ্টদল পদ্ম দর্শন হইয়াছিল। মনটিকে স্থিরভাবে চক্রে বসাইয়া গায়ত্রী জপ করিলেই, আজও সেইরূপ দর্শন হইতে পারে। আমি পুরাদমে কুম্ভক করিতে লাগিলাম। প্রত্যেকটি দমে দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত পুরাদমে কুম্ভক যোগে নাম, ধ্যান ও গায়ত্রী জপে কাটাইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুই দর্শন হইল না। চক্র, পদ্ম, জ্যোতিঃ বা রূপ কল্পনায়ও একবার আনিতে পারিলাম না। আমি করিব বলিয়া কিছু করিতে গেলেই যে বিফল হই—ইহা ঠাকুরেরই পরম দয়া! শুধু কৃপার ফলই যে ভোগ করিতেছি, তাহা বুঝাইতেই ঠাকুরের এ সব খেলা।

প্রায় ৫টার সময় বরদানন্দ আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট পঁহুছিতে, তিনি আমাকে বলিলেন—এখানে আমাদের চারি মাস বাস করিতে হইলে যে সব বস্তুর প্রয়োজন, তাহা আসিয়াছে। গতকল্য স্বামী কেশবানন্দ একটি মারাঠী সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোককে, আমাদের খবর নিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া, আমাদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে বরদানন্দকে অনুরোধ করিলেন। বরদানন্দ দুই আড়াই মাসের প্রয়োজন মত চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি আনাইয়াছেন। তাহা আমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট টাকা ভদ্রলোককে ফিরাইয়া দিলেন। আত্মানন্দ তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইল। তার ইচ্ছা ছিল আরও কিছু আদায় করে। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পোলের বাঁধ কবে খুলিয়া দেয় নিশ্চয় নাই। বাঁধ খুলিয়া দিলেই হরিদ্বার, কনখলের দিকে আর যাওয়ার উপায় নাই। নৌকা চলিতে পারে না। যতদিন পোল আবার না প্রস্তুত হইবে—এই দামপাড়ের চড়াতেই থাকিতে হইবে।

বরদানন্দ তিন মাসের মত আমাকে সমস্ত জিনিষ নিতে বলিলেন। আমি প্রায় ৮/৯ সের আটা, ৫ সের ডাল, ৪ সের চিনি, ৫ সের ঘৃত, এবং লুণ, লঙ্কা প্রয়োজন মত নিলাম। ঠাকুর দয়া

করিয়া এই বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে এই স্থান হইতে নিশ্চয়ই সরিয়া পড়িতে হইত। সঞ্চিতান্ন না থাকিলে লোকসংস্রবশূন্য দামপাড়ে থাকা সম্ভবই হইত না।

মণিপুর চক্রে ধ্যানের ফল। ক্রোধে নাম, ধ্যান লোপ।

বৃষ্টি-বাদলে বড়ই গোলমাল করিতেছে, দেখিতেছি। আজও যথাসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। ৪টার সময়ে জাগিলাম। বিছানা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। তন্দ্রাবেশ হইল, কিন্তু নাম চলা বন্ধ হইল না। সাড়ে পাঁচটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা, হোম, চণ্ডীপাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলাম। ত্রাটক ও কুম্ভক যোগে পাঁচশত গায়ত্রী জপ হইল। ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নাম জপ করিলাম। অবিচ্ছেদ কুম্ভকের সহিত মণিপুরে বসিয়া নাম করিতে বড়ই আরাম বোধ হইল। ঠাকুর আমাকে এইস্থানে বসিয়া সময় সময় নাম করিতে বলিয়াছিলেন। এই চক্রে বসিয়া নাম করাতে চিত্ত নামে খুব নিবিষ্ট হয়। ঠাকুরের ধ্যান কিন্তু থাকে না। নামের উৎপত্তি স্থানের অনুসন্ধানেই অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হয়। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির দিকে লক্ষ্য করিলেই, উহা যেন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কুম্ভক করিতে বড়ই আরাম বোধ হয়। এই চক্রে ধ্যান অভ্যাস অল্প আয়াসে সংযম আয়ত্ত হয়। শুনিয়াছি, মুগ্ধকর্ত্রী নাকি এই চক্র হইতেই ধ্যান প্রভাবে বিকশিত হইয়া পড়ে। ১০টার পর আসন ত্যাগ করিলাম। ১১টার মধ্যে শৌচাদি কার্য্য, বাসন মাজা এবং স্নান সমাপন করিয়া আসনে আসিয়া বসিলাম।

১৪ই আষাঢ়।

সন্ধ্যা শেষ করিয়া ৩০০ গায়ত্রী জপ করিতে ১২টা বাজিল। ১২টা হইতে ১টা পূজায় কাটাইলাম। তৎপরে ন্যাস আরম্ভ করিলাম। ন্যাস কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে হইল—পরে জানি না কি ভাবে, কোন্ ফাঁকে মনটি কখন নাম-ধ্যান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। হুঁস হইলে দেখিলাম, আত্মানন্দ ও বরদানন্দের উপরে আমার অত্যন্ত ক্রোধ ও বিরক্তি জন্মিয়াছে। উদ্বেগ ও ক্লেশে ভিতরটা আমার ছারখার হইয়া গিয়াছে। আমি অল্প আহার করি, তাই ঘৃত চিনি প্রভৃতি বিভাগে আমাকে তাহাদের অপেক্ষা কম দিয়াছে—ইহাই তাহাদের অপরাধ! হায় কপাল! আমি আবার পাহাড়ে তপস্যা করিতে আসিয়াছি! এ স্বভাবের হীনতা তো একটুকুও গেল না!

কর্ত্তা তিনি—তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত জুটিতেছে।

অদ্য শেষ রাত্রি হইতে অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত বাহিরের নিত্য আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত আসনেই কাটাইলাম। নামে, ধ্যানে সমস্ত দিনটি বেশ আনন্দে গেল। আগামী কল্য জালিম সিং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এক বাক্স ভাল চা সঙ্গে করিয়া আনিবেন লিখিয়াছেন। আমার চা ফুরাইয়া গিয়াছে, ২/৩ দিন চলিতে পারে। ফয়জাবাদ হইতে তিনি সাহারাণপুর বদলি হইয়াছেন। এখানে আসিয়া একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি। পাহাড়ের নীচে জনমানবশূন্য স্থানে আসিয়া রহিয়াছি, এ স্থানেও আমার যাবতীয় প্রায়েজনীয় বস্তু আসিয়া জুটিতেছে, কারো নিকট অভাবেও জানাইতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

১৫ই আষাঢ়।

"একটু তফাতে গিয়ে থাক্‌লে ভগবানের কৃপা বুঝ্‌তে পার্‌বে।" আমি তো প্রতি কার্য্যেই ঠাকুরের হাত দেখিতেছি—কিন্তু তবু সে বিষয়ে একটা নিশ্চয় ধারণা জন্মিতেছে না। কর্ত্তা তিনি—পাহাড়ে-পর্ব্বতে, নির্জ্জন বন-জঙ্গলেও তিনি রাজভোগে রাখিতে পারেন, আবার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রাজ অট্টালিকায়ও তিনি দীন-দুঃখী করিতে পারেন। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাতেই সমস্ত ঘটিতেছে, আর সকলই অসার! ঠাকুর! তুমিই যে সর্ব্বেসর্ব্বা, সর্ব্বনিয়ন্তা, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই যে সকল অশান্তি-উদ্বেগ, আপদ্-বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিঃসঙ্গ সমান বোধই নিরাপদ।

প্রত্যূষে শৌচাদি কার্য্য শেষ করিয়া আসনে বসিলাম। ১১টা পর্য্যন্ত আসনের কাজ করিয়া চণ্ডী ও গুরুগীতা পাঠান্তর আসন হইতে উঠিলাম। আজও সংখ্যা পূর্ব্বক নিয়মিত দশ হাজার জপ করা হইল। পরে বাসন মাজিয়া, স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে আসনে বসিলাম। প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত আসনে রহিলাম। কিন্তু বড়ই নীরস শুষ্কতায় দিন অতিবাহিত হইল। ভালই লাগুক্ আর মন্দই লাগুক্, নিয়মমত আসনের কাজ প্রত্যহ করিয়া যাইব, ঠিক করিলাম। ভাল না লাগিলে করিব না, ইহা ঠিক নয়।

১৬ই আষাঢ়,
ইং ১৮৯৩।

অদ্য বেলা প্রায় ৩টার সময়ে চোখ বুজিয়া আসনে বসিয়া আছি, একদল যুবতী স্ত্রীলোক অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কুটিরে প্রবেশ করিল। "দণ্ডবৎ, স্বামিজী" বলিয়া তাহারা আসনের সম্মুখে বসিল এবং সিকি, দুয়ানি, পয়সা দিতে লাগিল। আমি টাকা, পয়সা গ্রহণ করি না বলায়ও, তাহারা বিরত হইল না। তখন আত্মানন্দকে ডাকিয়া উহা দিয়া দিলাম। মেয়েগুলির সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব অসাধারণ, পাঞ্জাবী বলিয়া বোধ হইল। ধমক্ দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিব ভাবিতেই, ভিতরে বাধা পাইলাম। মনে হইল—দম্ভপূর্ব্বক নিষ্ঠারক্ষা করিতে গিয়া, তেজঃ প্রকাশে কারো প্রাণে ক্লেশ দেওয়া অপেক্ষা বিপদ্‌কালে গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণে রাখিয়া নাম করিতে পারিলেই যথার্থ কল্যাণ। স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিব, তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প আহ্লাদ-আমোদ করিব, তাদের লইয়া মজিয়া থাকিব-ইহাও যেমন কাম; তাদের নিকটে বসিব না, তাদের প্রতি দৃষ্টি করিব না, তাদের কোন সম্বন্ধে থাকিব না। তাদের সঙ্গ বিষ ভাবিয়া সর্ব্বদা একান্তে থাকিব—ইহাও তেমনি কাম, প্রকারভেদ মাত্র স্ত্রীলোকের সঙ্গ নিঃসঙ্গ উভয়ই যখন সমান বোধ হইবে তখনই নিরাপদ্—না হ'লে বাসনা-কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম কই? সাধারণ লোকে যে সকল স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য গ্রাহ্যের ভিতরই গণ্য করে না, বিষধর সর্প মনে করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আমি ভয়ে পলায়ন করি, এরূপ যখন আমার অবস্থা তখন আর নিরাপদ্ হইব কিরূপে? নিজের নিষ্ঠা রাখিতে গিয়া অপরের উপর বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলে নিষ্ঠা বজায়ের উপকার অপেক্ষা অনিষ্টই যে অনেক বেশী।

নামের উৎপত্তি স্থান—নাভিচক্র।

একটি কুস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি ৪টার সময় জাগিয়া পড়িলাম। ১২ শত জপ করিয়া আসন হইতে উঠিলাম। শৌচাদি সমাপন করিয়া ৫টার সময় আসনে বসিলাম। নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর বরদানন্দ

ও ঈশ্বরানন্দের সহিত চা পান করিলাম। শরীর আজ বড়ই অবসন্ন, মন তদপেক্ষাও অধিক নিস্তেজ, উৎসাহশূন্য। ভাবিলাম—আসনে বসাই সার হইবে। কিন্তু ঠাকুরের কৃপা অদ্ভুত। নাম করিতে করিতে ধ্যান আসিয়া পড়িল, তাহাতে একটু নিবিষ্ট হইতেই নূতন একটা অবস্থা অনুভব করিলাম। দেখিলাম—নাভিচক্র হইতে অতি সূক্ষ্ম স্বরে, অথচ পরিষ্কার ভাবে নাম আপনা-আপনি উঠিতেছে। ইহার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুর কোন প্রকার সংস্রবই নাই, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এতকাল বায়ুর সহিত নাম সংযুক্ত বোধ হওয়ায়, উহা বায়ুরই একটা রকম মনে হইত; কিন্তু আজ দেখিতেছি নাম অতি সূক্ষ্ম, অথচ সুস্পষ্ট একটা সারবান কিছু। উহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব—মন প্রবিষ্ট হয় না। সময় সময় দেখিতেছি, কুম্ভককালেও অভ্যন্তরস্থ বায়ুতেই নামটিকে চালায়—আজ অনুভব হইতেছে বায়ু বাহিরেব স্থূল বস্তু, নাম অতি সূক্ষ্ম, সম্পূর্ণ আলগা, স্বতন্ত্র জিনিষ। বায়ুতে নাম সংযুক্ত হইলে বায়ুর চঞ্চলতাবশতঃ নামও তদ্রূপ মনে হয়। এখন অনুভব করিতেছি—নামের উৎপত্তিস্থান নাভিচক্র। ইহাতে প্রবেশের ক্ষমতা আমার নাই। গভীর অজ্ঞাত স্থান হইতে জপের আলোড়নে, ঘুরপাক খাইয়া জলবিম্ব যেমন উঠিয়া থাকে, নামও নাভিচক্রের কোন অলক্ষ্য স্থান হইতে বায়ুতে যুক্ত হইয়া সেই প্রকার আকারে বাহির হইতেছে। নাম বাস্তবিক করি না—উহার ধ্বনি শ্রবণ করি মাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু, শব্দ শ্রবণে সাহায্য করে।

১৭ই আষাঢ়।

ত্রিসন্ধ্যা কি ভাবে করি।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকটে সন্ধ্যার ক্রম শিখিয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা করিতেছি। সন্ধ্যোপাসনার সময়ে ঠাকুর আমাকে যে আরাম দিতেছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রাতঃসন্ধ্যা করার পূর্ব্বে গায়ত্রী ন্যাস করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করি। পরে আপোমার্জ্জনা করিয়া "ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষি" মন্ত্রটি ঠাকুরেরই স্তব স্তুতি মনে করিয়া পাঠ করি। এই সময় মনে হইতে থাকে, ঠাকুর আমার সম্মুখে বসিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতেছেন। তৎপরে ১২ বার প্রাণায়াম করিয়া প্রতি প্রাণায়ামে, "ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠের সহিত উহার প্রত্যেকটি শব্দ গুরুদেবেরই রূপ বর্ণনা ভাবিয়া মণিপুরে ঠাকুরের স্বাভাবিক প্রকটরূপ ও বর্ণ ধ্যান করি। অনন্তর হৃদয়ে ঠাকুরেব যে কালরূপ দর্শন করিয়াছি, তাহা ধ্যান করিয়া প্রতি কুম্ভকে ২ বার করিয়া সমস্তটি মন্ত্র স্মরণ করি। এই প্রকার ১২ বার কুম্ভক করিয়া ২৪ বার ঐ মন্ত্রটি পাঠ করি। তদনন্তর আজ্ঞা চক্রে প্রতি কুম্ভকে তিনবার ঐ মন্ত্র পাঠের সহিত ঠাকুরের যে শুভ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, তাহাই ধ্যান করিয়া থাকি। ১২ বার এই কুম্ভকে ৩৬ বার মন্ত্র পাঠ হয়। এই প্রকার মানসে ঠাকুরকে বিশেষ বিশেষ চক্রে স্থাপন করিয়া, মন্ত্র পাঠে ধ্যান করাতে বড়ই আনন্দ পাই। 'আপোহিষ্ঠেতি, সিন্ধুদ্বীপ ঋষি' মন্ত্র পাঠকালে ঠাকুর সমস্ত জলে মিশিয়া রহিয়াছেন ভাবিয়া, তাহা সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিই। আচমনে ঠাকুরকে জল সহিত উদরস্থ করিয়া ধ্যান করি। পরে অঘমর্ষণ মন্ত্র ঠাকুরেরই স্তব মনে করিয়া, উহা পাঠান্তর গণ্ডূষপূর্ণ জলসহ ঠাকুরকে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকি তৎপরে

১৯শে আষাঢ়, ইং ১৮৯৩।

ভিতর হইতে পাপরূপী পুরুষ ঐ জলে আকৃষ্ট হইল ধ্যানে বাম নাসা দ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া উহা ঠাকুরেরই পরম পবিত্র চরণযুগলে স্থাপন করি। অঘমর্ষণ জপকালে পাপরূপী পুরুষ জলে মিশিয়া গেল কল্পনায় তাহাকে সজোরে তিনবার প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া নাকি বধ করিতে হয়। আমিও প্রথম প্রথম তাহাই করিতাম। কিন্তু ঐ প্রকার করাতে, আমার বড়ই প্রাণে লাগে। পাপরূপী পুরুষ যদি কেহ থাকেন, তিনি মহা অপরাধী বা অনিষ্টকারী হইলেও বধার্হ নহেন। বধ কাহাকেও করিতে নাই, সকলেই ভগবানের সৃষ্ট—তাঁহারই লীলার সাহায্যকারী। তাই ভগবানের ঐ অত্যাচারী পুত্রকে তাঁরই শ্রীচরণে কখন বা তাঁরই ক্রোড়ে শান্তভাবে স্থাপন করি। 'উদত্যমিত্যাস্য' ঠাকুরেরই স্তব ভাবিয়া, ঠাকুরকেই ধ্যান করি। তদনন্তর আজ্ঞা চক্রস্থিত গুরুদেবকে ধ্যানে রাখিয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী কুম্ভক সহিত জপ করি। অবশিষ্ট মন্ত্র সকল ঠাকুররেই শ্রীরূপের বর্ণনা মনে করিয়া আবৃত্তি পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা শেষ করি। মানসে ঠাকুরের অনুপম রূপ সম্মুখে রাখিয়া, সন্ধ্যার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি অক্ষর ঠাকুরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে ভাবিয়া কি যে আরাম পাই, তাহা আর প্রকাশ করিতে পারি না। সন্ধ্যার একটি শব্দেরও অর্থ অথবা একটি মন্ত্রেরও তাৎপর্য্য আমি জানি না। চৌদ্দ শাস্ত্র আঠার পুরাণ আমার ঠাকুরেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা মনে করি। শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠে ও মন্ত্রের আবৃত্তিতে ইষ্ট মূর্ত্তিই বিকাশ পায় দেখিতেছি। ধন্য গুরুদেব! কোথা হইতে আমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিলে।

চিত্তের একাগ্রতায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অনুভব।

রাত্রি ১২টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সুনিদ্রা আর হইল না। কখন জাগ্রতাবস্থায়, কখন তন্দ্রাবস্থায় নাম করিতে করিতে প্রভাত হইল। যথামত সন্ধ্যা, হোম, ন্যাস, পূজা সমাপন করিলাম। নামে চিত্ত এত নিবিষ্ট হইল যে, ১২টা বাজিয়া গেল—আসন ত্যাগের প্রবৃত্তি হইল না। আজ এক নূতন অবস্থা অনুভব করিলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে তাহাতে চিত্ত যখন অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া পড়িল—বাহিরের সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হইল। তৎপরে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও অতিশয় বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। পরিষ্কার মনে হইল, যেন প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস ঝড়, তুফান। এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করিতে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নামে চিত্ত একাগ্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কুম্ভক হইতে লাগিল। কিন্তু পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করিলে, যথার্থ কুম্ভক হয় না। সমস্ত ইন্দ্রিয় ছি৴ দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বায়ুর স্বাভাবিক গতির ঘাত-প্রতিঘাতে, কুম্ভকাবস্থায়ও চিত্তটিকে বিক্ষিপ্ত ও তরঙ্গায়িত করে। দেখিতেছি—মনটি কুম্ভককালে শ্বাস-প্রশ্বাস বর্জ্জিত একান্ত স্থানে অবস্থান করিলেও, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসই তথায় প্রবেশের একমাত্র পথ। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, চিত্ত স্থির হইলে শিরা ধমনী দিয়া সর্ব্বশরীরে যে রক্তের প্রবাহ চলে গঙ্গাধারার ন্যায় তাঁহার কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

২০শে আষাঢ়। ১৩০০।

নাম ও নামী এক।

আজ সাধন করিবার সময় মনে হইল, মহাত্মা, মহাপুরুষদের মুখে বহুবার শুনিয়াছি—নাম

ও নামী এক। ইহার অর্থ কি বুঝিতেছি না। তবে এইমাত্র মনে হয় যে প্রত্যেকটী শব্দই তো এক একটি বস্তু নির্দ্দেশ করে। শব্দ স্মরণ বা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটি যেন চক্ষে পড়ে। 'জল' বলামাত্র 'জ' এবং 'ল' কেহ ভাবে না—জ এবং ল শব্দের উপরেও কারো লক্ষ্য পড়ে না, তরল বস্তু জলটিই মাত্র মনে হয়। এইরূপ প্রত্যেকটি শব্দেরই তাৎপর্য্য কোন একটা বস্তু । বস্তুটি নির্দ্দেশ করিবার জন্যই শব্দ। ঘটী, বাটী, ভাত, রুট প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ মাত্র ঐ বস্তুগুলি স্মরণ হয়। ইষ্ট নামেও সেই প্রকার, যিনি তাৎপর্য্য ইষ্টনাম স্মরণ মাত্রে তাঁহাকে মনে পড়িলেই নাম জপ সার্থক। ভগবানও বলিয়াছেন—

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি-পরমাংগতিম্।।

ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক জপেরই বিশেষত্ব বলিয়াছেন। নামের সঙ্গে ইষ্ট স্ফূর্ত্তি হইলেই নাম ও নামী এক হইল মনে করি। এখন ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝি না।

শালগ্রামের শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত স্বেদবিন্দু।

আজ সকালে শৌচান্তে গঙ্গার ধারে জলের উপরে একটি সুন্দর কাল প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম। প্রস্তরটি সুগোল, চেপ্টা, উপবীত আকারে একটি শ্বেত রেখায় বেষ্টিত—দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ভাবিলাম—এটিও তো চক্রধারী স্বাভাবিক শিলা, দেখিতে যখন এত সুন্দর, তখন এটিকে নিয়া পূজা করিতে দোষ কি? আমি প্রস্তরটি তুলিয়া লইলাম এবং কুটীরে আসিয়া আমার শালগ্রামের পাশে রাখিয়া দিলাম, আসনের নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত আছি। একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া এক বাক্স উৎকৃষ্ট চা এবং শালগ্রাম চক্র দিয়া বলিলেন—বাবু জালিম সিং আপনাকে ইহা দিয়াছেন। শালগ্রামটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এতকাল যে শালগ্রাম পূজা করিয়া আসিয়াছি তাহা অপেক্ষা এটি সুশ্রী। এটি পূজা করিব ভাবিয়া আমার শালগ্রামের সঙ্গে রাখিয়া দিলাম। গঙ্গা হইতে যেটি আনিয়াছিলাম তাহা মসৃণ করিতে ঘৃতের হাঁড়িতে ডুবাইয়া রাখিলাম। শালগ্রাম পূজা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সুতরাং জালিম সিংহের প্রদত্ত শালগ্রাম আর পূজা করিলাম না। কল্য হইতে করিব স্থির করিলাম। সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার শালগ্রামকে বলিতে লাগিলাম—"শালগ্রাম, আগামী কল্য আমি তোমাকে পরম পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিব। অনেকদিন আমি তোমাতে আমার ঠাকুরকে পূজা করিয়াছি। ঠাকুর দয়া করিয়া তোমার কলেবরে আমাকে তাঁহার বিস্তর বিভূতিও দর্শন করাইয়াছেন। তোমার শরীর জ্যোতির্ম্ময় অণু পরমাণুতে গঠিত তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু আমি কি করিব, আমার তো কর্ত্তব্য আমার ঠাকুরকে উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করা। জালিম সিংহের শালগ্রামটি অপেক্ষাকৃত সুশ্রী, সুতরাং তাহাতেই কল্য হইতে ঠাকুরের পূজা আরম্ভ করিব। এতকাল তোমাতে ঠাকুরের পূজা করিয়াও, তোমার প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ জন্মিল না—ভগবৎ ইচ্ছায়ই যখন এই শালগ্রামটি আসিয়াছেন, তখন ইহাতেই ভগবানের পূজা করা বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায়।" এইপ্রকার কত কি বলিয়া স্থির মনে ঠাকুরের নাম করিতে

২২শে আষাঢ়।

লাগিলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে শালগ্রামের দিকে চাহিয়া দেখি—আবাক্ কাণ্ড! পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু পড়ার মত শালগ্রামের সর্ব্ব কলেবরে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি অমনি উহা হাতে লইয়া দেখিলাম। কোথাও একটি জলবিন্দুর সহিত অপরটি সংযুক্ত নয়—অতি ক্ষুদ্র পৃথক্ পৃথক্ ঘর্ম্মাকার অসংখ্য ফুট ফুট জলবিন্দু শালগ্রামের অঙ্গে কি প্রকারে জন্মিল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শুষ্ক বস্ত্রাসনের উপরে শালগ্রাম বসিয়া থাকেন। তুলসীপত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। বেলা ১১টার সময়ে প্রচণ্ড রৌদ্র, ঘরের ভিতর বাহির উত্তাপে পরিপূর্ণ—শালগ্রামে জলবিন্দু কোথা হইতে আসিল? জলবিন্দুগুলি পরস্পব মিলাইয়া গেল না কেন? এই শালগ্রামের গা ঘেঁসিয়া জালিম সিংহের শালগ্রাম রাখিয়াছি, তাহাতে তো এক কণিকাও জলবিন্দু দেখা যায় না! একি আশ্চর্য্য! আমি শালগ্রামটি রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—বুঝি এটিকে বিসর্জ্জন দিয়া জালিম সিংহের শালগ্রাম কল্য হইতে পূজা করিব শুনিয়াই, এই শালগ্রামের কষ্ট হইয়াছে, তাই এইভাবে উহা জানাইতেছেন। আমি শালগ্রামটি ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া পুঁছিয়া সিংহাসনের উপরে রাখিলাম এবং বলিতে লাগিলাম—শালগ্রাম, আমার সঙ্কল্প বুঝিয়া কি তুমি কষ্ট পাইয়াছ? আমি তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিব না। জালিম সিংহের শালগ্রাম যেমন রহিয়াছেন তেমনি থাকিবেন। পূজা আমি তোমারই করিব। জালিম সিংহের শালগ্রাম যে চৈতন্যযুক্ত তাহার তো কোন প্রমাণ পাই নাই, যদি পাই তখন বুঝিব।

বেলা ১১টার সময়ে আসন হইতে উঠিলাম। কাষ্ঠ সংগ্রহ, বাসন মাজা এবং স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া ১২টার সময়ে আসনে আসিলাম। আসনে বসিয়া শালগ্রামের দিকে দৃষ্টি করতেই দেখি—আমার শালগ্রাম যেমন তেমনি রহিয়াছেন আর জালিম সিংহের শালগ্রামটি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। অসংখ্য স্বেদবিন্দু শালগ্রামের সর্ব্বাঙ্গে ঘামাছির মত বাহির হইয়াছে। আমি শালগ্রামটিকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া সচন্দন তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিয়া রাখিয়া দিলাম। সমস্ত দিনে আর কোন শালগ্রামই ঘামাইল না। শালগ্রামের সর্ব্বাঙ্গে এই প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেদবিন্দু নির্গত হওয়ার হেতু কি সারাদিন ভাবিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একটা অদ্ভুত কার্য্য দেখিলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আমার প্রকৃতি। যা তা একটা কারণ পাইলেই সন্তুষ্ট হই, কিন্তু ঐ সব কারণের হেতু কি ভাবিলেই চক্ষুস্থির—তখন বুদ্ধি—বিদ্যায় কিছুই পাই না, অবাক্ হই মাত্র।

শিবানন্দ স্বামী ও তাঁহার সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম।

আজ একটি তেজঃপুঞ্জ কলেবর পরম সুন্দর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আমাদের আশ্রমে আসিয়া আসন করিলেন। ব্রহ্মচারীর বয়স আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক—মহারাষ্ট্রীয় দেহ, নাম শিবানন্দ দেখিয়া বড়ই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপে জানিলাম—তাঁহার নিকট একটি সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম আছে—তিনি নিত্য উহা পূজা করেন। গণ্ডকী নদীর পাড়ে আট ক্রোশ স্থান ঘুরিয়া তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আর একটি ছিল, তাহাই এক ব্রহ্মচারী উহার সঙ্গে সঙ্গে চারি বৎসর থাকিয়া, নানাপ্রকার সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া—আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এটি তাহা অপেক্ষাও

উৎকৃষ্ট বলিয়া নিজের জন্য রাখিয়াছেন। শালগ্রামটি আমি দেখিতে চাইলাম। শিবানন্দ খুব আগ্রহের সহিত উহা আমাকে দেখাইলেন। উহার দিকে দৃষ্টি করিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম—একি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ সুগঠন শালগ্রাম আপনা আপনি কি প্রকারে প্রস্তুত হইল? অতি সুদক্ষ সুনিপুণ শিল্পকরও এমন নিখুঁতভাবে একটি শালগ্রাম গড়িতে পারে কিনা সন্দেহ। নীলাভ, কৃষ্ণবর্ণ, সুগোল শালগ্রামটি আপন দীপ্তিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। এত মসৃণ—মনে হয়, সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব উহাতে লক্ষিত হয়। আমার সমস্ত মনপ্রাণ শালগ্রামের অসামান্য রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আমি শিবানন্দকে বলিলাম—আপনার শালগ্রামটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রকার একটি শালগ্রাম কি প্রকারে আমি পাইব বলিয়া দিবেন? শিবানন্দ বলিলেন—আপনার যখন শালগ্রামে এত অনুরাগ তখন উহা আপনি পাইয়াছেন মনে করুন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আপনাকে ঐরূপ একটি শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া দিব। আমি বলিলাম—গণ্ডকী নদী তো বহুদূরে—এখানে আপনি কি প্রকারে জুটাইবেন? যদি না পারেন—তবে কি করিবেন? আপনার আশার বাক্য তো আমার অদৃষ্টে বিফল হবে না? শিবানন্দ উত্তর করিলেন—যাহা বলিয়াছি তাহার অন্যথা হবে না—যদি না জোটে—আমার শালগ্রামই আপনাকে দিব। শিবানন্দের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল—বুঝিলাম ঠাকুর আমার আকাঙ্ক্ষা ষোল আনা পূর্ণ করিবেন। শিবানন্দের যথার্থ সদ্গুনের প্রশংসা করিয়া কয়েকটি কথা বলাতেই তাঁহার অন্তরের সদ্ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিল। শিবানন্দ খুব পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন—"গুণী দাদা! তুমি জেনে রাখ, শালগ্রাম তুমি পাইয়াছ।"

অদ্ভুত স্বপ্ন—ঠাকুরের চরণামৃত পান।

২৩শে আষাঢ়,
১৩০০।

শেষ রাত্রে উঠিয়া মাথাটি ভার ভার বোধ হইতেছে। শরীর নিতান্ত অবসন্ন। জ্বর হইয়াছে। ভাবিলাম—ভোগের জন্যই তো রোগের উৎপত্তি। অদৃষ্টে ভোগ থাকিলে যথায় যেভাবে থাকি না কেন, রোগে ধরিবেই। আহার-বিহার, চলা-ফেরা, সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা নিয়া ষোল আনা নিরাপদ ব্যবস্থায় থাকিয়াও তো লোকে রোগে পড়িতেছে। দেহধারীর রোগ, ভোগ অবশ্যম্ভাবী, এজন্য আর নিত্যক্রিয়ায় বাধা দিব কেন? আমি প্রত্যুষে স্নানাহ্নিক করিলাম। ২/৩ ঘণ্টা পরেই শরীর সুস্থবোধ হইল।

গত রাত্রিতে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি—তাহার স্মৃতিতে আমার সারাদিন আনন্দ, স্ফূর্তিতে কাটিয়া গেল। স্বপ্নটি এই—গেণ্ডারিয়ায় পূবের ঘরে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বসিয়া আছি, ঠাকুরকে মনে হইল। অমনি যাইয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। ঠাকুর বলিলেন—চরণামৃত পান কর। আমি 'চরণামৃত কোথায়' বলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছি—ঠাকুর আমার মাথাটি টানিয়া পায়ের উপর চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন—"অঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া চরণামৃত পান কর।" আমি চুষিতে লাগিলাম—দুগ্ধধারার মত সুস্বাদু রস আসিয়া আমার মুখ ভরিয়া যাইতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণ পান করিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং অবাক্ হইয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঠাকুর বলিলেন—

"কেমন পান কর্‌লে? চরণামৃত যে অমৃত, তাতে আর সন্দেহ আছে?" আমি বলিলাম—হাঁ, এখনও আছে। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হই নাই। ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া আবার মাথাটি চরণের উপর চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন—"আবার চোষ, বেশ ক'রে চোষ।" আমি আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া আবার চুষিতে লাগিলাম। মুখ ভরিয়া সুস্বাদু, সুগন্ধ চরণামৃত আসিতে লাগিল। আগ্রহের সহিত চরণামৃত পান করিতে করিতে জাগিয়া পড়িলাম। স্বপ্নটির ভাব নিয়ত অন্তরে থাকায় সমস্তটি দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হইল। চরণামৃতের গুণ আমি জানি না—কোন কালে কল্পনাও করি নাই; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ঠাকুরের চরণামৃত পান করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। সারাদিন চিত্তটি সরস ও প্রফুল্ল রহিল, ৫ মিনিটের জন্যও ঠাকুরের স্মৃতি বিলুপ্ত হইল না। আহা! কবে আমার এমন শুভাদৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের চরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইব!

রুদ্রাক্ষে শালগ্রাম দর্শন।

শিবানন্দের শালগ্রাম দর্শনের পর হইতে আমি যেন কেমন হইয়া গিয়াছি। অহর্নিশি শালগ্রামটি যেন চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে যে কোন অবস্থায় থাকি ৫ মিনিটের জন্যও শালগ্রামটি ভুলিতে পারিতেছি না। ঠাকুরকে স্মরণ করিলেই মনে হয়, দয়াল ঠাকুর আমার ঐ শালগ্রামটির ভিতর বসিয়া আছেন! আমার শালগ্রাম পূজার সময় পুনঃপুনঃ মনে হইতে থাকে যেন ঐ শালগ্রামটিই পূজা করিতেছি! শালগ্রামটির জন্য চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। পূজার সময় মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলাম—গুরুদেব! দয়া করিয়া আমাকে তুমি সুস্থির কর, না হলে সাধন-ভজন করিব কিরূপে? সামান্য একটু শিলাখণ্ডের জন্যও আমার এত আসক্তি? একটি পুতুল দেখিয়া তাহা পাইতে কচি ছেলের যেমন বাপ-মার নিকট আব্দার, তোমার নিকটও আমার তেমন আব্দার করিতে ইচ্ছা হইতেছে। শিলার লোভ আমার অন্তর হইতে একেবারে তুলিয়া নেও; না হলে উহা আমাকে দিয়ে সুস্থির কর। এই উদ্বেগ অশান্তি আর আমি সহ্য করিতে পারি না। শিবানন্দ যখন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, তখন তাহার আন্তরিক প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেও। মঙ্গলময় তুমি, তোমার ইচ্ছা বিনা যখন কিছুই হয় না, তখন এই সকল ভোগ তোমারই কৃপার দান মনে করিয়া যেন আদর করিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ কর। মনে মনে এই প্রকার ভিতরের উদ্বেগ ঠাকুরকে জানাইতেছি, অকস্মাৎ শিবানন্দ আসিয়া আমার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। শিবানন্দ বলিলেন—"গুণী দাদা, কল্যই হরিদ্বার হইতে যেমন তুমি একটি চিহ্ন নিবে, তোমার নিকট হইতেও একটি নিশানি আদায় করিব।" আমি বলিলাম—"কি আদায় করিবে বল?" শিবানন্দ আমার গলার রুদ্রাক্ষ ছড়াটি চাহিল। শুনিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। আমি বলিলাম—তোমার শালগ্রামের মত সহস্র শালগ্রাম পাইলেও এই রুদ্রাক্ষের একটি দানার সঙ্গে বিনিময় করিতে পারি না। এই মালা—আমার গুরুদত্ত। অন্য যাহা হয় তোমাকে আমার একটি নিশানি দিব। শিবানন্দ বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হবে।" শিবানন্দ চলিয়া গেলেন, পরে মনে হইল—শালগ্রাম পাওয়া বড়ই শক্ত সমস্যা দেখিতেছি। রুদ্রাক্ষ

২৭শে আষাঢ়।
ইং-১৮৯৩।

না পাইলে শিবানন্দ কখনই শালগ্রাম দিবেন না। শালগ্রাম আমার পক্ষে বড়ই দুর্লভ, কিন্তু রুদ্রাক্ষ তো তেমন দুর্লভ নয়। এক ছড়া কাশী হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া, ঠাকুরের দ্বারা স্পর্শ করাইয়া নিলেই তো পারি। তাহাই করি না কেন? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে স্নানে যাইবার জন্য আসন হইতে উঠিলাম। মালাগুলি খুলিবার সময়ে হাতে লাগিয়া অকস্মাৎ রুদ্রাক্ষ মালাছড়া ছিঁড়িয়া, আসনের উপর ছড়াইয়া পড়িল। আমি অমনি উহা কুড়াইয়া রাখিতে গিয়া দেখি— প্রত্যেকটি রুদ্রাক্ষ, শিবানন্দের শালগ্রাম। অবাক্ কাণ্ড। আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। অর্দ্ধ মিনিটের জন্য এই দর্শন হইলেও সারাদিন ইহার স্মৃতিতে ভিতর আমার তোলপাড় করিতে লাগিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**চিরকাল এই মালা ও উপবীত ধারণ কর্‌বে। সন্ন্যাস অবস্থা হ'লেও ত্যাগ কর্‌বে না। অগ্নি সেবাও যাবজ্জীবন কর্‌বে।** হায়—আমি এমনই পাষণ্ড—সামান্য শিলাখণ্ডের লোভে আমার গুরুদত্ত বস্তু অন্যকে দিব সঙ্কল্প করিতেছিলাম। ঠাকুর, কতকাল তুমি আমাকে লইয়া এরূপ খেলা খেলিবে? তোমার আমোদ—আমার যে প্রাণ যায়! আর আমি শালগ্রাম চাহিব না। ঠাকুর, তুমি আমার তো কিছুরই অভাব রাখ নাই। জয় গুরুদেব! তোমার এসব খেলা যেন মনে থাকে।

সুলক্ষণাক্রান্ত শালগ্রাম প্রাপ্তি।

২৮শে আষাঢ়।

ভগবানের কৃপায় ৫/৬ টি সমবয়স্ক ব্রহ্মচারী আশ্রমে একত্র হইয়াছি। সকলেই খুব উৎসাহশীল, ধর্ম্মপিপাসু ও কঠোর সাধক। বরদানন্দ, জ্ঞানানন্দ, কিছুকাল যাবৎ এখানে আছেন। ঈশ্বরানন্দ, শিবানন্দ ও ফণিদাদা ব্রহ্মচারী সম্প্রতি আসিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম আলাপে বড়ই আরাম পাই। শালগ্রামের জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া সকলেই শিবানন্দকে তাঁহার শালগ্রামটি আমাকে দিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দ্বাদশীর দিন শিবানন্দ আমাকে শালগ্রাম দিবেন, স্বীকার করিলেন। আত্মানন্দ, শিবানন্দের 'দিব-দিচ্ছি' কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আমাকে বলিল—"দাদা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ঐ শালগ্রাম নিশ্চয়ই তোমাকে দিব। শিবানন্দের কথায় আমার সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে—না হ'লে স্বীকার করিয়াও দিতেছে না কেন? শাস্ত্রে আছে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' ইহা তো মুনি-ঋষিদের কথা। সুতরাং শালা ন্যাংড়া যখন স্নান করিতে যাইবে, আমি উহার শালগ্রাম সরাইয়া রাখিব। যখন জিজ্ঞাসা করিবে, শালগ্রাম কি হইল? বলিব গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী চড়ায় আমাদের সঙ্গ পাইয়া, তোর শালগ্রাম চতুর্ভুজ হইয়া স্বর্গে গিয়াছে। কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস কর, তোকেও চতুর্ভুজ করিয়া স্বর্গে পাঠাব। ন্যাংড়া গোলমাল করিলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাড়াইয়া দিব। ওকে আমি একবার ঠুকেছিলাম।" আত্মানন্দের অসম্ভব কার্য্য নাই ভাবিয়া উহাকে ওরূপ করিতে নিষেধ করিলাম।

শিবানন্দ আমাকে দ্বাদশীতে পারণের পরে শালগ্রাম দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি পারণের পূর্ব্বে যাইয়া, শিবানন্দকে সাষ্টাঙ্গ করিয়া বলিলাম—দাদা, ভুক লাগা। হুকুম হয় তো প্রসাদ পায়—লেই! শিবানন্দ বলিলেন—হাঁ, বেসক্ পায় লেও।

আমি শিবানন্দ প্রভৃতিকে চা দিয়া, শ্রীফল ও চা পান করিলাম। পরে আসনে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১টার সময় শুভক্ষণ জানিয়া, শিবানন্দের নিকট উপস্থিত হইলাম। শিবানন্দ আমাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন—"শালগ্রাম লে যাও।" আমি বলিলাম— শুধু শালগ্রাম নয়, তোমার আশীর্ব্বাদও চাই। পাছে রুদ্রাক্ষ মালা বা ওরূপ কোন বস্তু চাহিয়া বসে, এই সন্দেহে বলিলাম—এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন শালগ্রাম আবার তোমাকে ফিরাইয়া দিতে না হয়। আমার কয়েকটি শালগ্রাম আছে, একটি তুমি নেও। তোমার শালগ্রাম পূজা বাধা হলে, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। শিবানন্দ সন্তুষ্টমনে আমার কথায় সম্মত হইলেন। শিবানন্দকে আমার শালগ্রামটি দিয়া উহার শালগ্রামটি নিয়া আসিলাম। একখানা গেরুয়া বস্ত্র উহাকে দিব বলাতে, শিবানন্দ খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

অন্যের প্রশংসা শ্রবণে অভিমানে আঘাত।

২৯—৩২শে আষাঢ়

আজ শুনিলাম, গঙ্গার বাঁধ খুলিবে। বর্ষার জল খুব বেশী হইয়াছে। দামের কবাট খুলিয়া দিলে হরিদ্বার কনখলে যাওয়ার আর উপায় থাকিবে না। এই বেলবাগের চড়ায়ই থাকিতে হইবে। বরদানন্দ, ঈশ্বরানন্দ প্রভৃতি আজই এস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন। ফণিদাদা আসিয়া আমাকে বলিলেন—"ভাই, তুমি এখন কি করিবে? সহরের সর্ব্বপ্রকার সংস্রবে বঞ্চিত হইয়া, এই চড়ায় ২/৩ মাসের মত কি প্রকারে এখানে থাকিবে। হরিদ্বারে, গঙ্গার উপরে ঐ পাহাড়ে আমার গোফা আছে। বার মাস ওখানেই আমি থাকি। একটি ব্রাহ্মণ আমার যাহা কিছু আবশ্যক প্রদান করেন। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার সঙ্গে থাকিতে পার। ঐ ব্রাহ্মণ তোমাকেও খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া রাখিবেন।" আমি ভাবিয়া দেখিলাম—যথার্থই এই স্থানে ২/৩ মাস থাকা অসম্ভব। আমি ফণি দাদার গোফাটি দেখিতে চাহিলাম। বেলা ১০টার সময়ে ফণি দাদার সঙ্গে হরিদ্বার রওনা হইলাম। দামের উপর যাইয়া দেখি কেশবানন্দ আসিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি আমাদিগকে ফিরিয়া তাঁহার সহিত আশ্রমে যাইতে বলিলেন। অন্যত্র থাকার ইচ্ছা করিয়াছি শুনিয়া তিনি অনুমান করিলেন, আত্মানন্দের কোন গর্হিত আচরণ অসহ্য হওয়াতে, আমার দামপাড় ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমরা কেশবানন্দের সঙ্গে আশ্রমে আসিলাম। গঙ্গার বাঁধ খুলিতে আরও ২/৫ দিন বিলম্ব হইবে শুনিলাম। সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া এখানেই এই কয়দিন থাকিব স্থির করিলাম। এস্থান ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। কেশবানন্দ স্বামীর সহিত আশ্রমে আসিয়া অনেক আলাপ হইল। বর্ষার সময়ে আমাদের থাকার ও সাধন-ভজনের কোন অসুবিধা না হয় তাহা দেখিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন। ভাবিয়াছিলাম, ফণি দাদার সঙ্গে হরিদ্বারে যাইয়া থাকিব। ঠাকুরের তাহা ইচ্ছা নয়—তাহা হইল না। আমরা সকলেই চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কেশবানন্দজীর কথায় সে সঙ্কল্প সকলেই ত্যাগ করিলাম।

মধ্যাহ্নে আমি আমার আসনে বসিয়া নাম করিতেছি, কেশবানন্দ অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বসিয়া আশ্রমের শান্তি—অশান্তি আলোচনা করিতে লাগিলেন। আত্মানন্দ ইতিমধ্যে দু'দিন কয়েকটি ইয়ারের সঙ্গে মদ খাইয়া সারা রাত্রি যে উৎপাত করিয়াছিল, তাহাও জানিলেন। আত্মানন্দকে

৩/৪ দিনের মধ্যেই অন্যত্র চালান দিবেন বলিলেন। ব্রহ্মচারীদের নিকটে স্বামীজী আমার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২/১ টি কথা কানে আসিল—উহা আমার বড়ই ভাল লাগিল। ভিতরে একটু গর্বিত হইয়া ভাবিলাম, এবার স্বামিজীকে বলিব— "স্বামিজী! আমাদের কল্যাণই তো আপনার উদ্দেশ্য, আমাদের কার্য্যাকার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দোষের সংশোধনই তো আপনার কার্য্য, কিন্তু আপনি কেবল আমার গুণেরই প্রশংসা করেন দেখিতেছি। একটি দোষের উল্লেখ করিয়া তো তাহা ত্যাগ করিতে অনুশাসন করেন না? আপনি দোষের কথা না বলিলে কি প্রকারে তাহা ত্যাগ করিব? এসব ভবিতেছি, স্বামিজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজীর নিকট বসিতেই তিনি খুব উৎসাহ দিয়া আমাকে আশ্রমে থাকিতে বলিলেন। আত্মানন্দের অত্যাচার, উপদ্রবের কথা তুলিয়া বলিলেন — তোমাদের সকলের সাধন-ভজনে কোন প্রকার বিঘ্ন না হয়, সেজন্য আত্মানন্দকে অবিলম্বে সরাইয়া দিব। স্বামিজী ব্রহ্মচারীদের ভজন-নিষ্ঠার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—এখানে যে কয়টি আছেন, তাদের মধ্যে ফণিভূষণ ব্রহ্মচারী সর্ব্বোত্তম, উঁহার আর তুলনা নাই। স্বামিজীর মুখে এই কথাটা শুনিয়া ভিতরে গিয়া লাগিল, মাথাটি গরম হইয়া উঠিল; কেশবানন্দের উপরে বিরক্তি জন্মিল। ভাবিলাম, দু'চার কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দেই। কে সর্ব্বোত্তম, কে মধ্যম, কে অধম তাহা কেশবানন্দ কি প্রকারে জানিলেন? তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন না অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন সাধন-ভজন লইয়া আছি—বাজে কথা বাজে কার্য্য কাকে বলে জানি না, সৎগুরুর আশ্রয় পাইয়াছি, এসব সত্ত্বেও ফণিভূষণ আমা অপেক্ষা প্রশংসার পাত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন? আমার আর স্বামিজীর নিকটে বসিতেও ভাল লাগিল না। নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম। এক একবার মনে হইতে লাগিল, স্বামিজী তো আমার বা ফণিভূষণের সঙ্গ কখনও করেন নাই। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট তিনি কি প্রকারে বুঝিবেন? বোধ হয়, এই সব ভিক্-মাঙ্গা পেটসর্ব্বস্ব ব্রহ্মচারীরাই আমার কোন দোষের কথা স্বামিজীকে বলিয়া থাকিবে। আসনে বসিয়াও কিছুক্ষণ সকলের উপরে একটা বিরক্তি, আক্রোশ রহিল। পরে হঠাৎ ঠাকুরের স্মৃতিতে মোহ কাটিয়া গেল। ভাবিলাম—হায় রে কপাল! আমি আবার সাধন-ভজন করিতে পাহাড়ে আসিয়াছি! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমার প্রকৃতির দোষ দেখাইতে স্বামিজীকে অনুরোধ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। স্বামিজী আমায় কোন দোষের কথাই বলেন নাই। অন্যের যথার্থ গুণের প্রশংসাই মাত্র করিয়াছেন। অন্যের প্রশংসা শুনিয়া আমার সহ্য হইল না—বুক শুকাইয়া গেল, ভিতরে অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! হা অদৃষ্ট! প্রকৃতি যখন আমার এত নীচ—তখন সাধন-ভজন সমস্তই আমার ভণ্ডামী; শুধু প্রশংসালাভের জন্যই যাহা কিছু করিতেছি। অন্যের প্রশংসা শুনিয়া অশান্তির জ্বালা—ইহা অপেক্ষা স্বভাবের নীচতা আর কি হইতে পারে? ঠাকুর! এই জঘন্যকে তোমার পরম পবিত্র শ্রীচরণে আশ্রয় দিলে কি প্রকারে? স্বভাবের হীনতা দেখিয়া সমস্ত দিন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কাটাইলাম। বুঝিলাম, অন্যের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি করা—সঙ্গে সঙ্গে 'আহা উহু' করিয়া দুঃখপ্রকাশ করা সহজ, কিন্তু অন্যের সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া শুনিয়া আনন্দ করা সহজ নয়, বড়ই কঠিন।

বাস্তু সাপ দর্শনে আতঙ্ক।

শিবানন্দের নিকট হইতে শালগ্রামটি পাইয়া মনটি প্রফুল্ল হইয়াছে। শেষ রাত্রে উঠিয়া হোম, সন্ধ্যা, আহ্নিক, ন্যাস, পূজা, পাঠ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইতে লাগিলাম। মনে করিলাম, এই আনন্দে ঠাকুর আমাকে যত কাল রাখিবেন—এই আসন ত্যাগ করিব না। যথাবিধি শালগ্রাম পূজা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল কিন্তু শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা আমার জানা নাই। এতকাল নিজের মনোমত নাম জপ করিয়া শালগ্রামকে তুলসী গঙ্গাজল দিয়াছি। এখন শাস্ত্রবিধিমত পূজা করিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় আশ্রমস্থ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। এক একজন এক এক প্রকার পদ্ধতি বলিলেন তাহাতে আমার শ্রদ্ধা জন্মিল না। ফণি দাদা আমাকে বলিলেন—"বহুকাল হয় একটি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—যাঁহার জীবনে একদিনও ত্রিসন্ধ্যা বাদ যায় নাই—আমাকে শালগ্রাম পূজা-পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শালগ্রাম পূজা কখনও আমায় করিতে হয় নাই। সেই কাগজখানা আছে কিনা, জানি না। পুস্তকের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।" ফণি দাদা বহুক্ষণ পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করিয়া অতি জীর্ণ একখানা কাগজে 'শালগ্রাম পূজা-পদ্ধতি' পাইলেন। আমাকে আনিয়া দিয়া বলিলেন, "গুণীদাদা, তোমার প্রয়োজন হইবে বলিয়াই, এতকাল এই কাগজখানা আমার নিকটে রহিয়াছে।" আমি উহা নিয়া, সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। শুভদিনে শুভক্ষণে ঠাকুরকে শিবানন্দের কণ্ঠ-শালগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি পূজা করিব সঙ্কল্প করিলাম। বরদানন্দ আমাকে বলিলেন—"দাদা, যেদিন শালগ্রাম অভিষেক করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে, সেইদিন শালগ্রামকে পরিপাটিরূপে ভোগ দিয়া আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইও।" আমি বরদানন্দের উপরেই সেই কার্য্যের ভার দিলাম। খরচ যাহা পড়ে আমি দিব বলিলাম। আগামী দ্বাদশীতে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য করিব। সেই দিন হইতে আমার ব্রহ্মচর্য্যের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে।

১লা—৭ই শ্রাবণ, দামপাড়, রবিবার।

বেলা ৯টার সময়ে আসনে বসিয়া নিঃশব্দ প্রাণায়ামের সঙ্গে নাম করিতেছি, পশ্চাৎ দিকে বেড়ার বাহিরে, ঠিক যেন কাঁধের উপরে 'ফোঁস্ ফোঁস্,' 'খট্ খট্' শব্দ হইতে লাগিল। আমি অমনি আসন হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম একটি বৃহদাকার কৃষ্ণসর্প বেড়া ফাঁক করিয়া ভিতরে আসার চেষ্টা করিতেছে। ঐ বেড়াটি ঠেস দিয়া আমি আসনে বসি। সর্পটি কোন প্রকারে শক্ত বেড়া ভেদ করতে পারিলেই প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িবে। আমি বরদানন্দ প্রভৃতিকে ডাকিতে লাগিলাম। শব্দ শুনিয়াই সর্পটি অদৃশ্য হইল। কখন কোন্ দিকে গেল ঠিক করিতে পারিলাম না। আত্মানন্দ ও বরদানন্দ আমাকে বলিলেন—"একটি ভয়ঙ্কর প্রচীন জাতসাপ এই শিশু গাছের তলায় গর্ত্ত করিয়া আছেন। আপনার আসনের সংলগ্ন ঠিক পশ্চাৎ দিকে বেড়ার বাহিরেই তাহার বাসা। বেড়ার বাহির হইতে ঐ গর্ত্তটি আপনার আসনের নীচে গিয়াছে। আপনি আসনে বসিলেই জাতসাপের মাথার উপরে আপনাকে বসিতে হয়। এইভাবে এই স্থানে আসন রাখা ভাল মনে হয় না। আসনের স্থান পরিবর্ত্তন করুন। এইটি বহু পুরাতন বাস্তু সাপ। কখনও কারো কোন অনিষ্ট করে না। এখানে এইরূপ একটি সাপ আছে অনেকেই

জানে। বাস্তু সাপের দর্শনলাভ দুর্লভ। আপনি সৌভাগ্যবান—অনায়াসে দেবাংশী সাপের দর্শন পাইলেন।" উহাদের কথা শুনিয়া আসনে আসিয়া বসিলাম। নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া ১১টার সময়ে উঠিলাম। বেলা ১২টার সময় সন্ধ্যাহোম করিয়া আসনে বসিলাম, এবং খুব সরুনালে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিতে লাগিলাম। সর্পটিকে মনে পড়ায় প্রার্থনা আসিল—"সর্পরাজ। আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা কর। তোমার পরিচয় না জানায় আমি তোমার অপমান করিয়াছি। তোমাকে তাড়াইয়া দিতে বরদানন্দ আত্মানন্দকে ডাকিয়াছি। কি করিব? প্রকৃতিগত সংস্কারে, তোমাকে আদর করিবার আমার ক্ষমতা নাই। তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়, দুরে থাকিয়া একবার দর্শন দাও—তোমাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হই।" অতঃপর আসনে বসিয়া নিবিষ্টমনে নাম করিতেছি—অকস্মাৎ সম্মুখের জানালায় 'সর্ সর্' শব্দ হইতে লাগিল। চোখ মেলিয়া দেখি, সম্মুখের বেড়ার ফাঁক দিয়া বৃহদাকার কৃষ্ণ সর্প কুটীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রায় এক হাত ভিতরে আসিয়া বিস্তৃত ফণা দক্ষিণে বামে হেলাইয়া 'ফোঁস্ ফোঁস্' করিতেছে। আমি দেখিয়াই ভয়ে আসন ত্যাগ করিয়া দু'এক লাফে বাহিরে আসিয়া পড়িলাম এবং ব্রহ্মচারীদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সকলে আসিয়া পড়িল। সর্পটি গৃহে প্রবেশ করিয়া লোকের তাড়া পাওয়ার কোন দিক্ দিয়া চলিয়া গেলেন। সর্পটির ঘরে প্রবেশের চেষ্টা কেন? এ কি মানুষের গায়ের গন্ধ পাইয়া, না নিঃশব্দ প্রাণায়ামের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া—বুঝিতেছি না। এ যে ঘরে বসিয়া সাধন-ভজন করাও বিষম শক্ত হইয়া উঠিল। সাপের রূপ ভাবিলেই যে আতঙ্কে প্রাণ যায়।

আমাকে উর্দ্ধরেতা করিতে সিদ্ধপুরুষের আগ্রহ।

আজ একটি পর্য্যটক সন্ন্যাসী চণ্ডী পাহাড়ে যাইতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর চেহারা দেখিয়া মনে হইল—কোন শক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ হইবেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলাম। আমাদের আগ্রহ অনুরোধে, তিনি একদিন এই আশ্রমে থাকিতে সম্মত হইলেন। সমস্ত দিন আমরা সকলে সকল কাজ ফেলিয়া তাঁহারই সঙ্গ করিলাম। সন্ন্যাসীর আমার প্রতি বড়ই কৃপাদৃষ্টি হইল। তিনি আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারিজী! আপনাকে আমার বড়ই ভাল লাগিতেছে। আপনার দেহ দেখিতেছি, সাধন-ভজন-তপস্যার খুব অনুকূল। গঠন বড়ই চমৎকার। আপনাকে একটি দুর্লভ অবস্থা প্রদান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনার নাভিকুণ্ডটি ৫/৭ মিনিটের জন্য যদি আমাকে স্পর্শ করিতে দেন, উহা নাড়িয়া নাড়িভুঁড়ি যথাযথরূপে স্থাপন করিয়া দিলে, আপনার বীর্য্যের গতি উর্দ্ধদিকে হইবে—বিনা আয়াসেই উর্দ্ধরেতা হইবেন। আমি ওরূপ করিতে প্রস্তুত আছি, আপনি রাজী আছেন কি? সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী একটু পরে আবার কহিলেন—"বহু সাধন-ভজন তপস্যা ও সংযমাদি করিয়া যে অবস্থা লাভ করা সুদুর্লভ, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহা লাভ করিতে পারেন। আপনার কি ইহাতে প্রবৃত্তি হয় না?" আমি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে বলিলাম—আমার গুরুদেব দিতে অসমর্থ, এমন অবস্থা কি আপনি আমাকে দিবেন? আমার গুরুতে একনিষ্ঠা জন্মে এবং ব্যাভিচারে আমার প্রবৃত্তি না হয় আপনি আমাকে দয়া করিয়া শুধু এই আশীর্ব্বাদ করুন। আমি আর কিছু চাই না।

ঠাকুরের জটা। চণ্ডীর রূপ। 'সর্ব্ব দেব ময়ো গুরু'।

শেষ রাত্রে নিয়মিত সময়ে জাগিয়া সন্ধ্যা করিতে করিতে ভোর হইল। ভূতাপসরণ, আসনশুদ্ধি ও বহুপ্রকার ন্যাসান্তে বিধিমত গণেশাদি দেবতা সকলের পূজা করিলাম। মূল ন্যাস করিতে বেলা অধিক হইল। আজ মনে হইতে লাগিল—শালগ্রাম আসার পর হইতে প্রত্যহই একটি না একটি সন্তুষ্টির বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দেখা যাক, আজ ঠাকুর কি বস্তু আনেন। ইহা ভাবিয়া পূজার চেষ্টায় আছি—এমন সময়ে ছোড়দাদার প্রেরিত একখানা তসরের ধুতি আসিল। পাইয়া কত যে আনন্দিত হইলাম বলিতে পারি না। শিবানন্দকে একখানা পবিত্র বস্ত্র দিব কথা দিয়াছিলাম। আজ ঠাকুর দয়া করিয়া সেই দায় হইতে মুক্ত কবিলেন। শিবানন্দকে উহা দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

আজ মা—যোগমায়া আমাকে বড়ই কৃপা করিলেন। শ্রীচণ্ডী পাঠকালে বড়ই সুন্দর একটি ভাব আসিল, বহুকাল যাবৎ চণ্ডী পড়িতেছি বটে, কিন্তু চণ্ডীর উপরে শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিল না। ভালবাসিতে চাহি বটে, কিন্তু জানি না কেন পারি না। আজ হঠাৎ মনে হইল, চণ্ডী কে? গুরুদেবের কোন্ অঙ্গে চণ্ডীর আবাসস্থান! ইহা ভাবিতেই ঠাকুরের সম্মুখের জটাটি মনে আসিতে লাগিল। যতদিন হইতে ঠাকুরের পূজা করিয়া আসিতেছি, মানসে কোন দিনই শ্বেতপুষ্প বা তুলসী ঠাকুরের সাম্নের জটায় দিতে পারি নাই। লাল জবা ও বিল্বপত্রই, জানি না কেন, দিতে ইচ্ছা হইয়াছে। একদিন একটি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—ঠাকুর সম্মুখের বড় জটাটি ছিঁড়িয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন— "ইহা তুমি নেও।" ঠাকুরকে এই স্বপ্ন বলিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন— 'এই জটা শক্তি'। সুতরাং ভগবতী যোগমায়া অথবা কালী এই জটাতে রহিয়াছেন।" ঠাকুরের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিন হইতেই এই জটার ধ্যান আমার চলিতেছে। এই জটাটি বড়ই ভাল লাগে। এই জটা ছাড়িয়া ঠাকুরের ধ্যান কখনও আমি জটার সৃষ্টির পরে করিতে পারি নাই। মনে হয়, তাই বুঝি মা ভগবতী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিজের স্থানে—এই চণ্ডী পাহাড়ে আনিয়াছেন। আজ চণ্ডীকে গুরুদেবের জটায় ভাবিয়া স্তব পাঠের সময় কান্না আসিল। ঠাকুর আমার স্বয়ং ভগবান, তাঁর এক একটি অঙ্গে এক একটি দেবতা রহিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও এই দেহেরই ভিতরে। মা, চণ্ডী আদ্যাশক্তি, পরাশক্তি—সকলের উপরে। তাই ঠাকুর তাঁকে মস্তকে স্থান দিয়াছেন। ভগবতীর পায়ের নীচে ভগবান হর শয়ান রহিয়াছেন। আমরা শাক্ত—এই শক্তিই আমাদের কুলদেবতা। জয় মা— কালী! জয় মা— ভগবতী! জয় মা— সিদ্ধেশ্বরী!

দেবদেবীর প্রতি পূর্ব্বে আমার একটা অশ্রদ্ধা ছিল। ঠাকুরের এক এক অঙ্গে এক এক দেবতার অধিষ্ঠান। পড়িয়া শুনিয়াও এমন একটা সংস্কার জন্মিয়াছে, এখন আর কোন দেবতাকেই অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। দেবতা কেন—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই আমার ঠাকুরের অঙ্গীভূত—সকলেরই শক্তি এক ভগবান। এই সমস্ত লইয়াই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের পূর্ণতা। একটিও বাদ দিবার বা তুচ্ছ করিবার উপায় নাই। ইহা বাগানের ফুলগাছ নয় যে, একটি চারা তুলিয়া ফেলিলে অন্যটিকে

স্পর্শ করিবে না। বৃক্ষের যেমন শাখা-প্রশাখা, ইহাও নিশ্চয় তেমনই। সমস্ত সৃষ্টি ঠাকুরের অবয়ব—কাকে ছোট কাকে বড় বলিব?—মূলে সবই এক। যখন যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য সাধিতে যত শক্তির প্রয়োজন, ঠাকুর তাহাই করিতেছেন। সুতরাং একটি অঙ্গুলীতে হাতে বা পায়ে—এই একই শক্তির কার্য্য। এত দিন মহা অপরাধ করিয়াছি। কত দেব-দেবী, ঋষি, মুনি, সাধু ও মহাত্মাকে অগ্রাহ্য করিয়াছি—বলিয়াছি, আমি এক গুরুরই অধীন—আর কারো ধার ধারি না। আমি কি অজ্ঞানেই ছিলাম। গুরু যাঁকে বলি, এই সমস্ত লইয়াই যে তাঁহার স্বরূপ, 'সর্ব্ব দেবময়ো গুরু'। জয় গুরুদেব! তুমিই সব! তুমিই সব!

তৃতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য শেষ। কণ্ঠ-শালগ্রাম।

হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যে আমার নাম 'গুণী দাদা ব্রহ্মচারী' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলে মন্ত্র, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী কামাখ্যা দেবীর এলাকায় আমার জন্মস্থান। সুতরাং নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র আমার জানা আছে—ইহাই অনেকের সংস্কার। হৃষীকেশ হইতে কয়েকটি সাধু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারিজী! আপ্‌কো পাছ হৃশীকেশছে আয়া হ্যায়। হাম লোকনকো কুছ্ গুণ বাৎলাইয়ে। শালা মচ্ছর বড়া দিক্ কর্‌তা হ্যায়। আসনমে বৈঠনে নেহি দেতা। বড় কাট্‌তা হ্যায়।" সাধুদিগকে 'আমি কিছু জানি না' অনেক বুঝাইয়া বলাতে, বুঝিলেন। দর্শনার্থী যাঁহারা আসেন তাঁহারাও আমাকে মহাগুণী মনে করিয়া নানা গুণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আত্মানন্দ আমাকে মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করে এবং যাত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দর্শন করাইয়া পয়সা লয়; সেই পয়সা দ্বারা সে মদ আনিয়া খায় আর সারা রাত্রি মাতলামী করে। --ভজন-সাধন বিষম বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে। এ স্থান বোধ হয় এবার ছাড়িতেই হইবে।

গত বৎসর ঠাকুর আমাকে পুনশ্চ দুই বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছিলেন। অদ্য তাহার এক বৎসর শেষ হইল। আগামী কল্য চতুর্থ বর্ষের ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইবে। কল্য শালগ্রামের অভিষেক করিব; ইচ্ছা করিয়াছি। ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া উঁহাতে স্থাপন পূর্ব্বক বিধিমত পূজা আরম্ভ করিব। শালগ্রামে ইষ্ট পূজাই বোধ হয় আগামী বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অনুষ্ঠান হইবে। শালগ্রামটি কণ্ঠ- শালগ্রাম—পূজা শেষ হইলেই কণ্ঠায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। ঠাকুরও আমাকে কণ্ঠ-শালগ্রামের কথাই বলিয়াছিলেন। একটি মার্ব্বেলের মত এটির আয়তন দাদা শালগ্রাম কণ্ঠায় রাখিতে একটি রূপার কৌটা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিতেছি এই শালগ্রামটি তাতে বেশ ধরিবে। শালগ্রাম কণ্ঠেই থাকিবেন।

কণ্ঠ-শালগ্রাম অভিষেক ও পূজা।

অদ্য আমার শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা হইবে। অতি প্রত্যুষে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, শৌচান্তে নীলধারায় স্নান-তর্পণ করিয়া আসিলাম। আসন শুদ্ধির পর আসনে বসিয়া, অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ব্যাপক ন্যাস ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস সমাপনান্তে প্রাণায়াম কুম্ভক দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিলাম।

তৎপরে তুলসী চন্দনাদি সংগ্রহ করিয়া, শালগ্রাম পূজার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পঞ্চগব্য দ্বারা শোধিত করিয়া বিধিমত পঞ্চামৃত দ্বারা শালগ্রামকে স্নান করাইলাম। পরে নির্ম্মল গন্ধবারি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সিংহাসনে তুলসী পত্রোপরি শালগ্রামকে স্থাপন করিলাম। তৎপরে ঠাকুরকে স্মরণ পূর্ব্বক খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর! আজ পর্য্যন্ত আমার কোন আকাঙ্ক্ষা তুমি অপূর্ণ রাখ নাই। আশাতীত কৃপালাভ করিয়াছি। শালগ্রাম পূজার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তুমিই প্রাণে দিয়াছ। যেমন বলিয়াছিলে, শালগ্রামটিও ঠিক তেমনই তোমার কৃপায় জুটিয়াছে। এখন দয়া করিয়া তুমি এই শিলার প্রতি অণু-পরমাণুতে অবস্থান কর—শালগ্রামটি তোমারই কলেবর হউক। দেবদেবী আমি কখনও বুঝি না, ভগবানকেও জানি না।—আমার সুখ-শান্তি, আরাম-আনন্দের আধার তোমাকেই মনে করি। ক্ষুদ্র আমি তোমার হাতের সামান্য এক গণ্ডূষ জলে আমার পিপাসার পরিতৃপ্তি! আমি তাহাই চাই। তোমার নদী-নালা সমুদ্র প্রভৃতিতে আমার প্রয়োজন কি? ঠাকুর, যতকাল শালগ্রামে তোমার পূজা করিব—আশীর্ব্বাদ কর, যেন এমন ভাবে করি, যাহাতে তোমার আনন্দ হয়; এইপ্রকার প্রার্থনা করিতে করিতে শালগ্রামটি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইলাম। তৎপরে বক্ষে স্থাপন করিয়া কাতরপ্রাণে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলাম। এই সময় ঠাকুর আমাকে চক্ষের জলে ভাসাইতে লাগিলেন। পরিষ্কার মনে হইতে লাগিল—ঠাকুর আনন্দ করিতে করিতে শালগ্রামে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে তাঁহার অসাধারণ কৃপার পরিচয় দিলেন। শালগ্রামটি হাতের তালুতে করিয়া উহা বুকের উপর ধরিয়া রাখিতে কষ্ট হইতে লাগিল—অত্যন্ত ভারি বোধ হইল। আমি অমনি উহা আসনের উপরে রাখিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর নারায়ণের পূজা আরম্ভ করিলাম। ১০৮ বার ইষ্ট মন্ত্র সংযোগে গায়ত্রী জপ করিয়া এক একটি সচন্দন তুলসী ঠাকুরের অঙ্গ বিশেষে অর্পণ করিতে লাগিলাম। ঐ ভাবে ১০৮টি তুলসীপত্র দিতে বেলা প্রায় ৩টা হইল। এই সময়ে ঠাকুরের কৃপায় তৈলধারার মত অবিরাম অশ্রু বর্ষণ হইল। পূজা সমাপন হইতেই বরদানন্দ কিস্তর লুচি, তরকারি, মোহনভোগ, পায়স আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সকলেই খুব পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। একটি ভাল ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা একটি সিধা প্রস্তুত করিয়া দান করিলাম। সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কণ্ঠ-শালগ্রাম পূজার পরে কৌটায় করিয়া কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিলাম। ঠাকুরকে বুকে রাখিয়াছি এই স্মৃতিতে সারাদিন আনন্দে অতিবাহিত হইল।

৮ই শ্রাবণ।

ঠাকুরের নিকট যাইতে চিঠি—আমার বিচার।

আজ সকালে দু'খানা পত্র পাইলাম। দু'খানাই গেণ্ডারিয়া হইতে আসিয়াছে। জনৈক গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন—"গোঁসাই বলিলেন, যখনই থাকিতে ইচ্ছা হইবে না—কেবল লজ্জার খাতিরে থাকিতে হইতেছে বুঝিবে, তখনই চলিয়া আসিবে। যতক্ষণ আনন্দ স্ফূর্ত্তি ততক্ষণ থাকিবে।" পত্র পাঠ করিয়া মনে হইল, লেখার একটু কারিগরি আছে। যোগজীবন লিখিয়াছেন—"গত রাত্রে বাবা আমাকে বলিলেন, 'ব্রহ্মচারীকে হরিদ্বার হইতে আসিতে

৯ই শ্রাবণ।

বল।' তাঁরই কথামত লিখিলাম।" যোগজীবনের পত্রখানা পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুরের সঙ্গলাভের অযোগ্য আমি, ঠাকুর আমাকে আবার ডাকিয়াছেন, ভাবিতেই চক্ষে জল আসিল। সঙ্কল্প করিলাম, অচিরেই গেণ্ডারিয়া যাত্রা করিব। মধ্যাহ্নে আসনে বসিয়া কতক্ষণ নাম করার পরে মন আমার ফিরিয়া গেল। ভাবিলাম—যখন ঠাকুরের অনন্ত আকাশব্যাপী ছায়ারূপ ক্রমশঃ ছোট ও ঘন হইতে হইতে প্রমাণ আকার ধারণ করে এবং উহা ধীরে ধীরে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইতে থাকে, আমি তখন চঞ্চল নয়নে দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে দৃষ্টি করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করি, "ঠাকুর দয়া কর—আমাকে দর্শন দিওনা। আদরেব বস্তু যতদিন আদর করিতে না পারিব, দর্শন চাই না। তোমার কৃপায় যদি কখনও আমার বিশ্বাস-ভক্তিলাভ হয়, তোমাতে একান্ত অনুরাগ জন্মে, তোমার যাহাতে যথার্থ আনন্দ ও তৃপ্তি তাহা আমাকে দিয়া করাইয়া নেও—তবেই তোমার নয়ন-মন স্নিগ্ধকর ঐ ভুবনমোহন রূপ দর্শন করাও, না হইলে তোমার স্মৃতি লইযাই যেন এ জীবন শেষ হয়, আশীর্ব্বাদ করিও।" বিশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা ঠাকুর যতদিন দয়া করিয়া আমাকে না দিবেন ততদিন এ ঠাকুর দর্শন তো দর্শনই নয়। সুতরাং নিকটে গিয়া লাভ কি? এই অবস্থায় ঠাকুরের ত্রিসীমায়ও যাইব না।

আজ শেষ রাত্রি হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনটি ঠাকুরের নামে-ধ্যানে পরমানন্দে কাটিয়া গেল। নারায়ণের দিকে তাকাইলে শরীর-মন বড়ই শীতল হয়। চিত্তটি সরস ও প্রফুল্ল হয়। সন্ধ্যার পরে ধুনির হোমাগ্নিতে ডাল-রুটি প্রস্তুত কবিযা ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। প্রসাদ পাইয়া খুব তৃপ্তি হইল।

ঠাকুরের নামে ও ধ্যানে নিত্য নূতন অবস্থা সম্ভোগ।

ঠাকুর আমাকে আকাঙ্ক্ষামত শালগ্রামটি জুটাইয়া দিয়া, কি যে আনন্দে রাখিয়াছেন, বলিতে পারিনা। শেষ রাত্রি হইতে সমস্ত দিনের কার্য্যগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথারীতি সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

১০ই শ্রাবণ, ১৩০০।

হোম, ন্যাস, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা-পাঠ প্রত্যেকটি কার্য্যেই ঠাকুর আমাকে বিশেষভাবে কৃপা করিতেছেন। একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে যখন বিভোর করিয়া ফেলে, রুটিন্ মত অপরটি পরিতে আমার কষ্ট হয না; —আহার করিতে করিতে একটি উপাদেয় বস্তু ত্যাগ করিয়া অপরটি ধরার মত মনে হয। প্রত্যেকটি কার্য্যেরই যখন ঠাকুর একমাত্র লক্ষ্য, তখন প্রত্যেকটি কার্য্যই তো তাঁহাব সম্বন্ধে মধুময। প্রতিদিন মনে হইতেছে, ঠাকুর কতদিন আর আমাকে এই আরামে রাখিবেন। ঠাকুরের নামও প্রতিদিন এক, ধ্যানও এক, অথচ তাহা হইতে নিত্য নূতন ভাব উচ্ছ্বাস আনন্দের উদ্ভব— এ বড় অদ্ভুত। ঠাকুরের আর এক অপরিসীম কৃপা এই—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে, সচন্দন তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল দ্বারা ঠাকুরের পূজা করিতে করিতে জাগিয়া পড়ি। প্রায়ই দিবসের নিত্যক্রিয়াগুলি, রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় করিয়া থাকি। যে কয়দিন ঠাকুর আমাকে এই অবস্থায় রাখিবেন, এখানেই থাকিব। গেণ্ডারিয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সাধন-ভজনের প্রতিকূল যে সকল উপাধি সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেছে তাহা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলার যথেষ্ট উপায় এখনও আছে। সেজন্য মহামায়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইব কেন? যেদিন শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে নিত্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ সুখাদ্য

আসিতেছে। এই চক্র যাহার নিকটে থাকেন তাহার নাকি বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। তা হ'লে তো বিষম বিপদ্।

মহামায়ার শাসন। পুনরায় ঠাকুরের আদেশ চিঠি। বিষম সমস্যা। আসন তোলায় মন উচাটন।

১১ই—২৫শে শ্রাবণ।

ভগবতী মহামায়া এবার আমাকে তাঁর দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধায় ফেলিয়া ঘুরপাক দিয়া বেশ রঙ্গ দেখিতেছেন। কয়েকদিন যাবৎ কখন কখন আমি তাঁর বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। সময় সময় নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলিতেছি। কি উপায়ে আমি এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইব জানিনা।

পাঞ্জাবের কোন ভদ্র পরিবারের অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ২০/২২ বৎসরের একটি যুবতী আমাদের আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন। স্বামী সম্প্রতি সাধু হইয়াছেন। তাঁহারই অনুসন্ধানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মেয়েটি একাকিনী হরিদ্বারে আসিয়াছেন। স্বামী হরিদ্বারে নিশ্চয়ই একবার চণ্ডীদর্শনে যাইবেন অনুমানে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। এই স্থানে থাকিয়া স্বামীর খবর নেওয়া খুব সহজ, তাই আত্মানন্দ, বরদানন্দ প্রভৃতির নিকট কান্নাকাটি করিয়া এখানে ২/৫ দিন বাস করিবার অনুমতি নিয়াছেন। আমি এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আত্মানন্দ আমাকে শাস্ত্র আওড়াইয়া বুঝাইল, —"দাদা! আত্মদানেও বিপন্নকে রক্ষা করিতে হয়; কেহ আশ্রয় চাহিলে তাহাকে কোন অবস্থায়ই ত্যাগ করিতে নাই।" আশ্রমস্থ অনেকেরই উহাকে রাখিবার ইচ্ছা বুঝিয়া আর গোলমাল করিতে প্রবৃত্তি হইল না। 'চাচা আপন বাঁচা' ভাবিয়া নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলাম। এখন দেখিতেছি বিষম উৎপাতে পড়িলাম। মেয়েটির থাকিবার স্থান আমার কুটীরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, একটি শূন্য ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মানন্দ উহাকে বলিয়াছে "আরে তিন চার দিন এখানে থাক্ আমি তোর আদ্‌মিকে এনে দিব। আমার বহুৎ সিদ্ধায় জানা আছে। তোর আদ্‌মি যমালয়ে থাক্‌লেও, তাকে আমি টেনে আন্‌ব, নিশ্চয় জানিস্। তারপর গুণী দাদা একটা গুণ বাৎলাইয়া দিলেই মরদ চিরকাল তোর সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার মত থাক্‌বে। গুণী দাদা বড় ক্রোধী, তাঁকে একটু খুসী রাখ্‌তে চেষ্টা কর্।" আত্মানন্দ জানে আমি যদি কোনও আপত্তি না করি, স্ত্রীলোকটিকে যতকাল ইচ্ছা আশ্রমে রাখিতে পারিবে। আত্মানন্দের কথার ভাব বুঝিয়া আমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যুবতী নিপুণতার সহিত নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। আমি উহাকে সরাইবার জন্য প্রত্যহ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীদের নিকট জেদ করিতে লাগিলাম। কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। কয়দিন হয় উহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকেস্ত্রী লইয়া এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলায়, সে আজ যাই, কাল যাই, বলিয়া দিন কাটাইতেছে। আমি একটু জেদ করিয়া বলায় এখন সে পরিষ্কার বলিতেছে—"আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইবে না। যতকাল ইচ্ছা আশ্রমে থাকিবে।" আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। বুঝিলাম, আত্মানন্দ প্রভৃতি তাহাকে আশ্রমে থাকিতে ভিতরে ভিতরে উৎসাহ দিতেছে। একদিন তুমুল ঝগড়ার পর, আমি উহাকে জোর করিয়া বাহির করিবার জন্য ক্যানেলের

ম্যানেজার প্রভৃতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—দেখুন, আমি বড় বিপন্ন হইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি। বহু দূরদেশ হইতে আমি নির্জ্জনে, নিরাপদে ভগবানের নাম করিব বলিয়া দামপাড় গঙ্গার চড়ায় একটি কুটীর করিয়া রহিয়াছি। এতকাল বেশ আনন্দে ছিলাম। সম্প্রতি এক পাঞ্জাবী তাহার যুবতী স্ত্রীকে লইয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছে। তাকে বিপন্ন দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম। এখন সে আর অন্যত্র যাইতে চায়না। সে ফৌজদারী করিবে, তবু আশ্রম ছাড়িবে না বলিতেছে। এ সময়ে আপনারা দয়া করিয়া যাহাতে নিরাপদে ভজন-সাধন কবিতে পারি, তদ্রূপ একটু ব্যবস্থা করুন। ম্যানেজারবাবুও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বিস্তৃতভাবে সকল কথা শুনিয়া দুইটি চাপ্‌রাশি লইয়া আশ্রমে আসিলেন এবং বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক পাঞ্জাবীকে আশ্রম হইতে সরাইয়া দিলেন। সে আশ্রম সীমার বাহিরে, গঙ্গায় যাইবার পথে, একটি বৃক্ষমূলে আসন করিয়া বসিল—প্রতিহিংসা নেওয়াই যেন তার অভিপ্রায়। সন্ধ্যার পর প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অনাবৃত স্থানে, গঙ্গার উপবে পাঞ্জাবী আছে মনে করিয়া, তাহার জন্য বড় কষ্ট হইতে লাগিল। অধিক রাত্রিতে দু'বার তাহার অনুসন্ধান করিলাম। এই দুর্য্যোগের সময তাহাদের আনিয়া আশ্রমে রাখিব ভাবিলাম কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

আজ নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে, বাসন মাজা ও কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য বেলা ১১টার সময় কুটীর হইতে যেমন বাহিরে আসিলাম বরদানন্দ একখানা কার্ড হাতে লইয়া, আমাকে দিয়া বলিলেন—ভাই ব্রহ্মচারী, দেখ মহামায়ার কাণ্ড। এ স্থান মহামায়ার, তিনিই সকলকে শাসন করেন। তিনি ভিন্ন অন্যে কাহাকেও শাসন করে, তিনি তাহা সহ্য কবিতে পারেন না। দেখ, কাল তুমি একজনকে তাড়াইয়াছ, আজই তোমার নামে সমন জারী হইয়াছে। কার্ডখানা পড়িয়া দেখিলাম—কোন গুরুভ্রাতা লিখিয়াছেন, "তোমার ঠাকুর বলিলেন, 'ব্রহ্মচারী ঢাকা চলিয়া আসুক।' তুমি পত্র পাঠ ঢাকা রওনা হইবে। তুমি আর যাহা যাহা জানিতে চাহিয়াছ তাহা ঢাকাতে আসিলে জানিতে পারিবে।" পুঃ- আসিতে বিলম্ব করিও না।

গুরুভ্রাতাটির পত্র পড়িয়া অবাক্। এইপ্রকার পত্র হঠাৎ আবার কেন লিখিলেন, ভাবিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে ঐ গুরুভ্রাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে একটু দুমনা হইয়াছিলাম—ঠাকুরের যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় ঠাকুর আমার মনের ভাব জানিয়াই গুরুভ্রাতাটিকে পুনরায় পরিষ্কার করিয়া চিঠি লিখিতে বলিয়াছেন। তাই ঢাকা যাইতে এই আদেশ।

ঠাকুরের আদেশপত্র পাইয়া বিষম সমস্যায় পড়িলাম। গেণ্ডারিয়া যাওযার কথা মনে হইলে বুক আমার কাঁপিয়া উঠে। পাহাড়ে আসিবার সময়ে ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের বলিয়াছিলেন—**"ব্রহ্মচারী এবার হয় এদিক্, না হয় ওদিক্ হবে। হরিদ্বার গিয়ে ঠিক মত চল্‌তে পার্‌লে খাঁটি ব্রহ্মচারী হ'য়ে সন্ন্যাসী হবেন, না হ'লে গৃহস্থালী কর্‌তে হবে।"** এবার গেণ্ডারিয়া গেলে ঠাকুর আমাকে গৃহস্থ হইতে বলিবেন, না সন্ন্যাস পথে চালাইবেন—জানিনা। সে যাহা হউক, উপস্থিত হরিদ্বার ছাড়িয়া যাইতে আমার একেবারেই ইচ্ছা হইতেছে না। এখানে দিন দিন শরীর আমার সুস্থ হইতেছে। সাধন-ভজনে উৎসাহ আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরের নামে, ধ্যানে পরমানন্দে সারাদিন

কাটাইতেছি। আশ্রমে কোনপ্রকার উৎপাত অশান্তিও আর নাই। সকল দিকে এত আরামে রাখিয়া, ঠাকুর কেন আবার আমাকে আহ্বান করিতেছেন, বুঝিতেছি না। ভজনের এমন উৎকৃষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব মনে করিয়া কান্না পাইল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম, 'গুরুদেব! কি জন্য তুমি কি করিতেছ কিছুই বুঝিনা। রোগী ডাক্তারকে হিতকারী জানিয়াও পাকা ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচার কালে, যেমন অনিচ্ছা ও আতঙ্ক প্রকাশ করে এবং 'আহা-উহু' চীৎকার করিয়া ডাক্তারকে গালি দেয়, আমারও অবস্থা সেই প্রকার হইয়াছে। আমার কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না,—দারুণ ক্লেশ হইতেছে। এই স্থানের উপর যাহাতে আমার বিরক্তি জন্মে তাহা করিয়া দেও। না হ'লে এ স্থান ত্যাগ করা আমার অতিশয় ক্লেশকর হইবে।' মনের দুঃখ ঠাকুরকে জানাইয়া নিয়ম মত নিত্যক্রিয়া করিতে লাগিলাম—কিন্তু সময় সময় ঠাকুরের আদেশ স্মরণ করিয়া মনে বিষম উদ্বেগ হইতে লাগিল। এইস্থানে আমার যতই আসক্তি হউক না কেন—এখানে ভজনে আমি যতই আনন্দ পাইনা কেন, ঠাকুরের আদেশ কি প্রকারে অগ্রাহ্য করিব, এই ভাবিয়া স্থানের উপরে বিরক্তি জন্মাইতে আসনটি তুলিয়া ফেলিলাম এবং কুটীরের বাহিরে বিল্বমূলে, কখনও বা শিংশপাতলে বসিয়া নিত্যকর্ম্ম করিতে লাগিলাম। আসন তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"সাধুদের আসন তুলিলে, সেই স্থানে আর টিকিতে পারেন না। অন্যত্র গিয়ে আসন না করা পর্য্যন্ত স্থিরও হইতে পারেন না।" বিষম উদ্বেগে আমারও ভজন-সাধন ছুটিয়া গেল। অবিলম্বে ঢাকা পঁহুছিব, স্থির করিলাম।

হৃষীকেশ যাত্রা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান। ভীমগড় ও সপ্তস্রোত দর্শন। তপস্বী সাধু।

এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আসন তুলিয়া ফেলিয়াছি। একদিনও আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকটে যাইব বলিয়া ভিক্ষা করায় ৬।।০ টাকা আমার জুটিয়াছে।এখন এই স্থান ত্যাগ করিলেই হয়। এতদিন হরিদ্বারে রহিলাম, হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী তীর্থগুলি একবার দর্শন করিলাম না। এমন কি আসন ছাড়িয়া হরিদ্বারেরও ঠাকুর-বিগ্রহাদি কিছুই এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। দু'চার দিন এই সকল তীর্থস্থান দেখিতে ইচ্ছা হইল। সেইমত আমি ঝোলাঝুলি বাঁধিয়া হৃষীকেশ, লছমন্ ঝোলা প্রভৃতি দেখিতে প্রস্তুত হইলাম। অতি প্রত্যূষে আসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া চা পান করিলাম। তৎপরে বরদানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া এক্কা গাড়ীতে হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। হৃষীকেশে যাওয়ার সময়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে ইচ্ছা হইল। আমি ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে এক্কা রাখিয়া যাত্রীদের স্নানের তামাসা দেখিতে লাগিলাম। অসংখ্য পাঞ্জাবী যুবতী চিরন্তন প্রথা অনুসারে সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে, স্বামী, শ্বশুর, ভাসুরের সহিত এক ঘাটে স্নান করিতেছে দেখিয়া অবাক্ হইলাম। পাঞ্জাবী মেয়েরা লজ্জাশীলা হইলেও, পরিধেয় বস্ত্র উপরে রাখিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জলে নামে। পরিচিত অপরিচিত যে কেহ থাকুক না কেন, ভ্রূক্ষেপ নাই। পুরুষ ছেলেরাও তাহাদের পানে তাকায় না। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিয়া হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ যাওয়ার সময়ে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর

গোফা দেখিতে পাইলাম। এই সকল গোফাতে এক সময়ে কত ভজনানন্দী সাধু সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। এখন এ সব স্থান শূন্য—জন-প্রাণী কিছুই নাই। দেখিয়া এ সকল গোফায় থাকিতে লোভ জন্মিল। কিছুদূর চলিয়া ভীমগড়ে উপস্থিত হইলাম। এখানে নাকি প্রবল পরাক্রমশালী ভীম নিজের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে ভাগীরথী-গঙ্গার প্রবাহ স্থগিত রাখিয়াছিলেন। ভীমের নয়নরঞ্জন শিষ্ট, শান্ত প্রফুল্ল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভীমের মন্দিরের সম্মুখে একটি পুকুর। এই পুকুরে গঙ্গার জল নলের ভিতর দিয়া আসিয়া অপর দিকে অবিরাম চলিয়া যাইতেছে। শুনিলাম, দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরকার বাহাদুরই নাকি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থানটি বড়ই মনোরম। ভীমগড় হইতে সপ্তস্রোতে চলিলাম। সপ্তস্রোতে পঁহুছিতে রাস্তা একটু দুর্গম; কিন্তু মনের উৎসাহ-আনন্দে পথের ক্লেশ কিছুই অনুভূত হইল না। পতিতপাবনী গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই স্থানে আসিয়া সপ্তর্ষিগণের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। জগজ্জন-পূজ্য ঋষিগণের মর্য্যাদা করিতে তিনি সপ্তধা বিভক্ত হইলেন এবং ঋষিগণের সাতটি আশ্রমই পরিক্রমা পূর্ব্বক আবার এক ধারায় মিলিত হইয়া নিম্নদিকে প্রবাহিত হইলেন। সপ্তস্রোতের চারটি ধারা আমি দেখিতে পাইলাম। সংযোগ-স্থলে স্নান করিয়া, সন্ধ্যা ও দেব-দেবী, ঋষি, মুনি, পিতৃপুরুষ প্রভৃতির তর্পণ করিলাম। গঙ্গার উপরে পাহাড়ের ধারে কয়েকটি সাধু কুটীর করিয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। তিনি সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত ধুনি রাখিয়া জপে মগ্ন রহিয়াছেন। এক একবার জপ শেষ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন,—সমস্ত দিন এই ভাবেই জপে অতিবাহিত হয়। কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না—মৌনী। আর একটি জটাজুটধারী কৃশকায় দীর্ঘাকৃতি উদাসী গঙ্গার ভিতরে একটি প্রস্তরের উপরে সূর্য্যাভিমুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শুনিলাম, ইনি উদয় হইতে সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া অস্তকালে সূর্য্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিজ কুটীরে চলিয়া যান্। সাধুদের ভজন-নিষ্ঠা, কঠোর তপস্যা ও অধ্যবসায় দেখিয়া নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। সাধুদের প্রণাম করিয়া হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম। সপ্তস্রোতের পাহাড়শ্রেণী দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না। মনে হইল— এই সকল পাহাড়ের কোন একটিতে শোক-সন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র আসিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।—ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় ভগবান্ বেদব্যাস এই স্থানেই সমরনিহত কুরুগণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করাইয়াছিলেন। অবশেষে এই স্থানেই পূর্ণকাম ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত হোমাগ্নিতে কলেবর আহুতি দিয়া অক্ষয়লোক লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ধর্ম্মাবতার মহামনা বিদুর দূর হইতে পর্ব্বতোপরি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃ তাঁহাতে সঞ্চার পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ আমি এই সপ্তস্রোতের সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহস্থজনগণ ও বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। তৎপরে বেলা অবসানে হৃষীকেশ পঁহুছিলাম।

হৃষীকেশে পঁহুছিয়া একটি ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার আমাদিগকে খুব যত্ন করিয়া দোতলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন সকালবেলা হৃষীকেশের নানা স্থান দর্শন করিলাম। ছোট ছোট কুটীরে সাধুরা আপন আপন সাধন-ভজনে রত দেখিয়া, বড়ই আনন্দ হইল। হৃষীকেশের গঙ্গায় স্নান, তর্পণ করিয়া বড়ই আরাম পাইলাম।

একটু বেলায় সামান্য জলযোগ করিয়া লছমন্‌ঝোলায় রওনা হইলাম। লছমন্‌ঝোলায় দেখিলাম—সাধুদের থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই। লছমন্‌ঝোলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, লছমন্‌জীকে দর্শনান্তে পুনরায় হৃষীকেশে পঁহুছিলাম। হৃষীকেশে রাত্রিবাস হইল।

বিল্বকেশ্বর পাহাড়ে বিল্বকেশ্বর মহাদেব।

প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান-তর্পণান্তে হরিদ্বারে যাত্রা করিলাম। কতকদূর যাইয়া সতীর তপোবন দেখিতে পাইলাম। এ সকল পাহাড়-পর্ব্বতের প্রভাব এতই অদ্ভুত, মনে হয়, যে কেহ শুধু পড়িয়া থাকিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। একটি নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

"হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
স্নাত্বা কন্‌খলে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।"

আমি কনখলে পঁহুছিয়া সতী যেখানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই দক্ষযজ্ঞস্থান দর্শন করিলাম—এবং সেই সময়ের চিত্র স্মরণ করিয়া দেব-দেবী, ঋষি-মুনি প্রভৃতিকে নমস্কার করিলাম। পরে বিল্বকেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির গঠন-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। তপোধন মুনি ঋষিগণের তপস্যার সুবিধার জন্যই যেন এই স্থানটি নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিদ্বারের সম্মুখে উচ্চপর্ব্বতের মধ্যস্থলে বিল্বকেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত; বিস্তৃত পর্ব্বতের অভ্যন্তরে হইলেও এই স্থানটি স্বতন্ত্র পাহাড় বলিয়া মনে হয়। অতি গভীর পরিখা দ্বারা এই স্থানটি মণ্ডলাকারে বেষ্টিত। পরিখার ধারে পর্ব্বতের গায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গোফা রহিয়াছে। পরিখার অপর পারে নিবিড় অরণ্যময় ভীষণ পাহাড়। শুনিলাম পরিখায় গঙ্গাজল প্রবাহিত হয়। বিল্বকেশ্বর পাহাড়ে পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় হইতে কোন বন্য-জন্তুর এখানে আসিবার উপায় নাই। স্থানটি নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, বহুসংখ্যক প্রাচীন বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। বিরক্ত সাধু সন্ন্যাসীদের ভজন-সাধনের পক্ষে এমন একটী স্থানও এপর্য্যন্ত দেখি নাই। যোগী-ঋষিদের তীব্র তপস্যার অগ্নি পাহাড়ের সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে থাকিয়া এই স্থানটিকে অগ্নিময় করিয়া রাখিয়াছে। এই আগুনের আঁচ অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। একটু স্থির হইয়া বসিলেই আপনা-আপনি চিত্তটি জমাট্ হইয়া আসে। বিল্বকেশ্বর মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আশ্রমের দিকে প্রস্থান করিলাম।

আজ দ্বাদশী, বিকালে কিছু ছোলাভাজা শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া দিয়া খাইলাম। ঢাকা চলিয়া যাইব বলিয়া বরদানন্দ আমাকে আজ খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত রাজী হইলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী ভ্রাতাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করায় বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। বরদানন্দ, শিবানন্দ, ফণিভূষণ, ঈশ্বরানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারীদের মধুর সঙ্গে এতকাল বড়ই আরামে কাটাইলাম। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য যাঁহারা সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন—এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাঁহারা দেশে দেশে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া দিন কাটাইতেছেন এ সংসারে তাঁহারা সাধারণ নন।

হৃষীকেশে যাওয়ার পূর্ব্বেই আসন তুলিয়া ফেলিয়াছি। আসন তোলার দরুণ আশ্রমে আসিয়া ঘরে মন বসিতেছে না—এত শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি বলিয়া বিষম অস্থিরতা আসিয়াছে। কখন ঘরে, কখন বেলতলায়, কখন গঙ্গাতীরে বসিয়া কোনমতে বার হাজার নাম ও বার শত গায়ত্রী জপ করিলাম। আজই এই স্থান ত্যাগ করিব স্থির করিয়া আসন বাঁধিয়া ফেলিলাম। বরদানন্দ আসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"আজ তোমার যাওয়া হবেনা—আজ ত্র্যহস্পর্শ।" আমি আর কি করিব? কল্য নিশ্চয় যাইব, স্থির করিয়া রাখিলাম। ফণি দাদা, শিবানন্দ, ঈশ্বরানন্দ প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে দিনটি অতিবাহিত হইল।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩০০।

হরিদ্বার ত্যাগ। গঙ্গার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। জ্বালাপুর যাত্রা ।

গতকল্য গঙ্গার জল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর আট ইঞ্চি উঠিলে পোলের তক্তার সমান হইবে। সুতরাং আর ৩/৪ ইঞ্চি জল বৃদ্ধি পাইলেই তক্তা তুলিয়া ফেলিবে। কল্যই তক্তা তুলিবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল। ক্যানেলের ম্যানেজার বলিয়াছেন—আমাকে সংবাদ না দিয়া পোল খুলিবেন না। আমি নিশ্চিন্ত আছি। আজই আমি এস্থান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম। সারাদিন ঘর-বাহির করিয়া কাটাইলাম। গঙ্গার ধারে যাইয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, গঙ্গে। এতদিন তোমার সুশীতল চরণতলে আশ্রয় লইয়া পরমানন্দে কাটাইলাম; এখন আমার গুরুদেবের নিকট যাইতেছি; আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়াময়ি! যদি দয়া কর, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমার ঠাকুরকে আমি সকল তীর্থের মূলাধার, তাঁর চরণযুগলকে সকল তীর্থের সার জানিয়া তাঁহাতেই অনন্যমনে ভক্তি করিতে পারি; সুখ-সম্পদ যাহা কিছু আরাম ঐ চরণছায়াতেই লাভ করি—তাঁর চরণ ছাড়া আর কিছুতেই যেন আকৃষ্ট না হই।"

২৭শে শ্রাবণ।

গঙ্গাস্নানের পর ৪টার সময় আহার করিলাম। ঝোলা, বস্তা বাঁধিয়া ষ্টেসনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। এই সময়ে মনে হইল, ঘরের এবং বাহিরের সমস্ত জিনিষ, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত আমার জন্য কাঁদিতেছে। আমি ধুনচিতে ধূপধুনা চন্দনাদি জ্বালাইয়া ঘরের ও বাহিরের সমস্ত বস্তুর আরতি করিতে লাগিলাম এবং প্রত্যেকটিরই চরণোদ্দেশে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিতে লাগিলাম—সমস্তই আমার জীবন্ত বোধ হইতে লাগিল। প্রায় এক ঘন্টা আমার এসব কার্য্যে গেল, পরে আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের আলিঙ্গন করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। জ্বালাপুরের ষ্টেসন্‌মাষ্টার আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহুবার অনুরোধ করিতেছেন; তথায়ই নামিব স্থির করিয়া জ্বালাপুরের টিকেট করিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে জ্বালাপুর ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। রাত্রি ও পরদিন জ্বালাপুরের ষ্টেসন্‌ মাষ্টারের সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনায় আনন্দলাভ করিয়া, জালিম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে সাহারাণপুর যাত্রা করিলাম। সাহারাণপুরে যাইতে জালিম সিং বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ৩০শে শ্রাবণ বেলা ৯টার সময়ে সাহারাণপুর পঁহুছিলাম। জালিম সিং খুব আদর করিলেন। রাত্রে তাঁহার কোয়ার্টারে রহিলাম।

ভজন প্রতিকূল সাহারাণপুর। জ্বালা-যন্ত্রণার কারণ নির্ণয়।

সাহারাণপুর পঁহুছিবার পর, জালিম সিং আমাকে খোলা-মেলা, নির্জ্জন ও পরিষ্কার একখানা ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আসন করিয়া বসিলাম। জালিম সিং আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই কয়েকদিন তাঁহার নিকটে থাকি আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এস্থানে একদিন থাকিয়াই বুঝিলাম, থাকা সহজ নয়। সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও, এইস্থানে ভজনে মন বসে না। এরূপ কেন যে হয় জানি না। আসনে স্থির হইয়া বসিতে উদয়াস্ত চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু ১০মিনিটের জন্যও এ পর্য্যন্ত পারিলাম না। ভজন-সাধন ছুটিয়া গেল; মাথা আগুন হইয়া উঠিল। আসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজগুলি কোনরকমে সমাধা করিয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বেড়াইয়াও আরাম নাই। কি যে যম-যাতনা ভোগ হইতে লাগিল, প্রকাশ করার জো নাই। আমি জালিম সিংহকে সকল কথা খুলিয়া বলায় তিনি বুঝিলেন। তিনিও বলিলেন, "ভজন-সাধনের ভাব-বিরোধী, এইপ্রকার স্থান আমিও ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। বোধ হয় দুনিয়াদারী ছাড়া এইস্থানে ধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। জালিম সিং আমাকে একখানা বল্কলাম্বর দিলেন। আরও কম্বলাদি অনেক জিনিষ নিতে জেদ করিতে লাগিলেন, অনাবশ্যক বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলাম না। আমাকে সাহারাণপুরে রাখিতে জালিম সিংহের অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া ৪/৫ দিন রহিলাম। কিন্তু, বহু চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও, একটি দিন একঘন্টার জন্য সুস্থির হইতে পারিলাম না। নাম করা যায় না, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। ধ্যানের বিষয় কোথায় গিয়াছে, খোঁজ-খবর পাইতেছি না। অনর্থক রাজসিক ও তামসিক ভাব সকল কোথা হইতে আসিয়া মনটিকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। চিত্তও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। এই জ্বালা-যন্ত্রণা অস্থিরতার কারণ কি, অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল। আমি খুব দৃঢ় হইয়া আসনে বসিলাম। বহু চেষ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ধরিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি, নাভিমূল হইতে একপ্রকার উত্তাপ উঠিয়া মেরুদণ্ডে গিয়া লাগিতেছে। মেরুদণ্ডের সেইস্থান সুর্ সুর্ করিয়া একপ্রকার জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে। ঐ জ্বালার গ্যাস্ বুকে ও মস্তকে গিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে প্রাণ-মন অস্থির করিয়া সময় সময় ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তুলে। এ সমস্তই শারীরিক। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের উৎপত্তি ও উত্তেজনা শুধু শারীরিক ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও ও সকলের এতই পরাক্রম যে, উহারা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া স্থূলত্বে পরিণত করে। ঠাকুর, এসব উৎপাত আর কতকাল?

১লা—৩রা ভাদ্র, ১৩০০।

স্বপ্নে ঠাকুরের অপ্রাকৃত প্রসাদ।

৭ই ভাদ্র অপরাহ্ন ৬টার সময়ে ফয়জাবাদের টিকেট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। রাত্রে কোন কষ্ট হইল না। অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছিল। একজন বৈষ্ণব সারারাত্রি বসিয়া আমাকে বাতাস করিলেন। বহুবার নিষেধ করাতেও তিনি থামিলেন না। অপরিচিত সাধুর এইপ্রকার দয়া আমার উপরে কেন হইল জানি না—সকলই ঠাকুরের খেলা মনে করি। শেষ রাত্রিতে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম।

স্বপ্নটি এই,—"পশ্চিমাঞ্চলে নানা স্থানে ঘুরিয়া একদিন বেলা অবসানে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। যোগজীবন আমার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজ হইতে না বলিলে প্রসাদ পাইব না, স্থির করিয়া, আমি ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে প্রসাদ পাইতে বলিলেন। আমি ঠাকুরের নিকটে বসিয়া উহা পাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রসাদে কোন স্বাদই পাইলাম না। কোন রসই প্রসাদে নাই কেন ভাবিতে লাগিলাম। এই সময়ে একপ্রকার গন্ধ প্রসাদ হইতে বাহির হইতে লাগিল। গন্ধ ঠাকুরের গাত্রগন্ধের ন্যায়—শরীর মন স্নিগ্ধকর পদ্ম-গন্ধের অনুরূপ। এই গন্ধ এতই মধুর যে, আমি উহাতে মুগ্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি, এই গন্ধে আকর্ষণ করিয়া লইল। আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। এমন সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল।" স্বপ্নটি দেখিয়া অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠাকুরের কথা পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন---যথার্থ প্রসাদ যদি পাওয়া যায়, তাতে কোন আস্বাদই পাবে না—একপ্রকার সুগন্ধ মাত্র পাবে।

বস্তি যাত্রা।

বেলা প্রায় ৯টার সময় ফয়জাবাদ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। ষ্টেসন্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু, আমাকে দেখিয়াই আগ্রহের সহিত আসিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরমানন্দে দিনটি কাটাইলাম। নিত্যকর্ম্মের কোন বিঘ্ন ঘটিল না। সন্ধ্যার পর রান্না করিয়া আহার করিলাম।

প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচান্তে মহেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অযোধ্যা ঘাটে পঁহুছিলাম। সরযূর শীতল জলে স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইলাম। সন্ধ্যা তর্পণ সারিয়া, ষ্টেসন ঘাটে উপস্থিত হইলাম। অসংখ্য লোকের ভিড় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। সংখ্যাতিরিক্ত লোক জাহাজে উঠিয়া পড়ায়, লাঠি চালাইয়া একদল লোক সাধারণকে জাহাজে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল। আমি নিরুপায় দেখিয়া, একজন উচ্চ-কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাবু সাব্! হাম পড়ে রহেঙ্গে?" কর্ম্মচারীটি আমাকে বলিলেন, "আপ সাধু হ্যায, চলা আইয়ে সিধা, কই নেহি রোখেগা।" যাহারা লাঠি মারিতেছিল, আমাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিল। আমি জাহাজে উঠিয়া বস্তির টিকেট করিয়া বসিলাম। অল্পক্ষণ পরেই লকরমণ্ডী ঘাটে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া বালিচড়া পার হইয়া ট্রেন পাইলাম। ট্রেনে বসিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় ১০টার সময়ে বস্তি ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে একখানা এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া হাসপাতালের দিকে চলিলাম। ভদ্রলোকটি রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের বাহিরে, দরজার সম্মুখে এক্কা রাখিয়া আমি নামিয়া পড়িলাম। রাস্তার পাশে জলাশয় দেখিয়া প্রয়োজনে তথায় গেলাম। এসময় এক্কাওয়ালা গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছাড়িয়া দিল। আমার ঝোলা-ঝালী, গাঠ্‌রী-বস্তা সমস্ত লইয়া এক্কাওয়ালা পলায়ন করিল। আমি এক্কার পিছনে পিছনে একটু ছুটিয়া হয়রান হইলাম। আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া হাসপাতালে চলিয়া আসিলাম। দাদা আমাকে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

এক্কাওয়ালাকে ধরিতে আর কোন বিশেষ চেষ্টা হইল না। আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি দাদা খরিদ করিয়া দিলেন। কণ্ঠ-শালগ্রাম, কণ্ঠে ছিলেন। কম্বলাদি কতকগুলি জিনিষপত্র জ্বালাপুর হইতে দাদার নামে পার্শ্বেল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সুতরাং কতকগুলি জিনিষ চুরি যাওয়াতেও বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। দাদার নিকট ৩/৪ দিন থাকিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু দাদার এই মমতায় এতই আরাম বোধ হইল যে অধিক দিন বস্তিতে থাকিতে হইল।

কলিকাতায় অভয়বাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের সংবাদ।

১৮ই ভাদ্র ১৩০০ সাল।
৯০/৫ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা।

বস্তিতে কয়েকদিন কাটাইয়া কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। রাস্তায় বেশ আরামে কাটাইয়া বেলা প্রায় ১০টার সময়ে হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা দেখিয়া একখানা গাড়ীতে ভাগিনেয়দের বাসায় ঝামাপুকুরে আসিয়া উঠিলাম। ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হওয়ায় অবিলম্বে স্নান-আহ্নিক সমাপন করিয়া শালগ্রামকে এক পয়সার মটরভাজা ও সরবৎ নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ পাইলাম। শূন্য বাসায় ভাল লাগিল না। এখানে সৎসঙ্গীও পাইব না জানিয়া, নিকটে শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় চলিয়া আসিলাম। তিনি খুব আদর যত্ন করিয়া আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নীচে একখানা পরিষ্কার ঘরে আমি আসন করিলাম। শ্রীযুক্ত অভয়বাবু আমার গুরুভ্রাতা, পূর্ব্বপরিচিত, সৎসঙ্গী ও পরম সুহৃৎ। কলিকাতায় যে দু'চার দিন থাকিব, এই স্থানেই অবস্থান করিয়া ঢাকা যাইব, মনে মনে স্থির করিলাম; কিন্তু অভয়বাবুর মুখে শুনিলাম, ঠাকুর ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়া লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আছেন। সঙ্গে গেণ্ডারিয়া আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অভয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুরের এ সময়ে অকস্মাৎ কলিকাতা আসিবার কারণ কি?"

অভয়বাবু বলিলেন—গত শ্রাবণ মাসে গোঁসাইজীর গলায় ঘা হইয়া কয়দিন বড় পড়িয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গলায় ক্যান্সার হওয়াতে, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। গোঁসাইয়েরও গলার ঘা যদি বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় শিষ্যেরা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতা লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করাইতে হয় নাই। তিনি সুস্থ হইয়াছেন। রাখালবাবু খুব আগ্রহের সহিত নিজ বাড়ীতে রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ঠাকুরের কি বিনা চিকিৎসায়ই গলার ঘা সারিয়া গেল? অভয়বাবু উত্তর করিলেন,—গেণ্ডারিয়া হইতে কলিকাতা আসার সময়ে গোয়ালন্দ ষ্টীমারে পরলোকগত প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয় প্রকাশ হইয়া গোঁসাইজীকে বলেন, আপনার গলার ঘা সাধারণ অসুখ, কালকচুর রস ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবেন, সারিয়া যাইবে। গোঁসাই কলিকাতা আসিয়া তাহাই করিলেন। ঘাও সারিয়া গিয়াছে। এখন বেশ সুস্থ আছেন। ঠাকুরের সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিতির বিষয় শুনিয়া প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল। কতক্ষণে ঠাকুরের নিকটে যাইব তাহাই মনে হইতে লাগিল।

হৃষীকেশ মন্দির

লছমন ঝোলা

ঠাকুর দর্শন। সঙ্গে থাকার অনুমতি।

বেলা প্রায় ২টার সময়ে অভয়বাবুর সহিত সুকিয়া ষ্ট্রীটে রওয়ানা হইলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীটের প্রায় শেষভাগে রাস্তার দিকে গাড়ীবাবান্দাওয়ালা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঠাকুর এই বাড়ীর দোতলায় আছেন শুনিলাম। অভয়বাবুকে অগ্রগামী করিয়া পশ্চিমদিকের বাহিরের লোহার ঘুরান সিঁড়ি দিয়া দক্ষিণদিকে গাড়ীবারান্দায় উপস্থিত হইলাম। আহারান্তে ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুর হলঘরের কতকাংশ পর্দা খাটাইয়া একাকী আসনে বসিয়া থকেন; সুতরাং ওখান হইতেই ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম— "ঠাকুর! দয়া করিয়া পাহাড় হইতে যেমন টানিয়া আনিলে, তোমাতে বিশ্বাস-ভক্তি দিয়া অবশিষ্ট দিন তোমারই সঙ্গে রাখ— এই আকাঙ্ক্ষা করি।" ঠাকুর এই সময় মগ্নাবস্থায় ছিলেন, অস্পষ্ট "হুঁ হুঁ" শব্দে আমার প্রার্থনায় সায় দিয়া মাথা তুলিয়া বসিলেন, এবং আমাকে দেখিয়া স্নেহপূর্ণ হাসিমুখে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন— **"এখন কোথা হ'তে এ'লে? হরিদ্বার হ'তে কবে এসেছ? আজ আহার হয়েছে কিনা?"** আমার আহার হয় নাই বলাতে, ঠাকুর যোগজীবনকে ডাকিয়া বলিলেন—**"কিছু খাবার এনে দে।"** যোগজীবন উৎকৃষ্ট খাবার আনিয়া ঠাকুরেব নিকট ধরিলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে দিবাভাগে আহার, বিশেষতঃ মিষ্টি খাওয়া, আমার পক্ষে নিষেধ থাকিলেও, ঠাকুরই আমাকে সম্মুখে বসাইয়া রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি স্বহস্তে প্রদান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইলেন। পরে একটু সময় চুপ করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের এত আদর-যত্ন পাইয়াও আমি উদ্বেগশূন্য হইতে পারিলাম না। ঠাকুরের কথা মনে হওয়ায় ভিতরে বিষম তোলপাড় আরম্ভ হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন.—**"এবার ব্রহ্মচারী হয় এদিক্ না হয় ওদিক্ হবে। হরিদ্বারে গিয়ে ঠিক মত চল্‌তে পার্‌লে খাঁটী ব্রহ্মচারী হ'য়ে সন্ন্যাস পথে চল্‌বে না হয় গৃহস্থালী কর্‌তে হবে।"** এবার আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। পাহাড়ে থাকা আমার সার্থক হইয়াছে কি না, ঠাকুর আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া চিরকালের মত সন্ন্যাসপথে চালাইবেন কি না অথবা গৃহস্থালী করিতে পাঠাইবেন ঠাকুরই জানেন। এ বিষয়ে ঠাকুরের পরিষ্কার কথা না পাওয়া পর্য্যন্ত আর শান্তি নাই। আমি এ সকল ভাবিতেছি এমন সময় ঠাকুর খাতায় লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি পড়িলাম—**"তোমাকে যে উদ্দেশ্যে পাহাড়ে পাঠান হয়েছিল তাহা সফল হইয়াছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে অথবা যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পার। আজই তুমি এখানে আসন আনিতে পার।"** ঠাকুরের দয়া দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ঠাকুর আমার শালগ্রামটি দেখিতে চাহিলেন। আমি কণ্ঠ হইতে উহা খুলিয়া ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর একটু সময় উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন— **"চক্রটি খুব ভাল।"** আমি আজই সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিব স্থির করিয়া, ঠাকুরকে জানাইলাম এবং প্রণাম করিয়া অভয়বাবুর সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসিলাম। ভাতে সিদ্ধ ভাত কোন প্রকারে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলাম। অপরাহ্ন ৫টার সময়ে প্রসাদ পাইয়া ঝোলাঝুলি সহিত সুকিয়া ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। ৪১নং বাড়ীর পশ্চিমদিকের গলিপথে কয়েক ফুট উত্তরদিকে চলিয়া ঘুরান লোহার সিঁড়ি পাইলাম। উপরে উঠিয়া পশ্চিমদিকেব সরু বারান্দা দিয়া বাড়ীর দক্ষিণে প্রকাণ্ড গাড়ীবারান্দায় পঁহুছিলাম। বাড়ীর পশ্চিমের কোঠাখানা

রাখালবাবুর বৈঠকখানা ঘর। উহার ভিতরে টেবিল, চেয়ার, সাজসজ্জা, আস্‌বাব্ দেখিয়া অবাক্ হইলাম। এই বৈঠকখানা ঘরের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে উহা অপেক্ষা বড় একখানা হলরুম। ঠাকুর এই হলরুমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গাড়ীবারান্দায় যাওয়ার দরজার ২/৩ ফুট উত্তরে দেওয়াল ঘেঁসিয়া পশ্চিমমুখে আসন করিয়াছেন। আমি গাড়ীবারান্দার উপর গিয়া দেখি— বহুলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; হলরুমও লোকে পরিপূর্ণ। আমি ঘরের সম্মুখে, বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ামাত্র ঠাকুর আমাকে দেখিয়া "হুঁ হুঁ" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে যাইতেই ঠাকুর আমাকে তাঁর বামপার্শ্বের দরজার পশ্চিমধারে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া উত্তর মুখে আসন পাতিতে বলিলেন। ঠাকুরের আসন হইতে প্রায় চারি হাত অন্তরে উত্তর মুখে আমি আসন করিয়া বসিলাম। ঠাকুর ইঙ্গিতে বলিলেন— "দিন রাত তুমি এখানেই থাকিও।" ঠাকুরের এই অসাধারণ দয়া দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

পরলোক সম্বন্ধে কথা। গীতা ও ভাগবতের ধর্ম্ম।

আজ গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে পরলোক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মৃত্যুর পরে সকলকেই কি একস্থানে যাইতে হয়? মৃত বন্ধুবান্ধবরা কেহ পরলোকের পরিচয় দেন না কেন?"

ঠাকুর লিখিলেন— "মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, পরলোক জানিতে ব্যাকুল হয়। পরলোকের কথা শুনে, বলে। কিন্তু মরিয়া গেলে সে ব্যক্তি নিজের বন্ধুদের নিকট আসিয়া কোন কথা বলিতে যত্ন করে না। — ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরলোক সকলের পক্ষে এক প্রকার নহে। ধার্ম্মিক, যিনি নানা কামনা করিয়া ধর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার পরলোক এক; যিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহার অন্যপ্রকার। পাপীদিগের প্রকৃতি অনুসারে নানাপ্রকার পরলোকের অবস্থা। এজন্য যাঁহারা পরলোকে যান, সক্ষম হইলেও, পৃথিবীর লোকদিগকে তাহা বলা প্রয়োজন মনে করেন না। - বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।"

প্রশ্ন— 'গীতার ধর্ম্ম ও ভাগবতের ধর্ম্ম কি এক? ইহাতে কি একই অবস্থা লাভ হয়?'

ঠাকুর লিখিলেন—"ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবৎ এই দুইখানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্য স্বরূপ। গীতা এবং ভাগবতের প্রণালী মত সাধন করিলে ঋষিদিগের প্রাণের কথা— 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়; তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের দুইটি ভাব নিত্য এবং লীলা। নিত্য সাধন গীতা দ্বারা হয়; লীলা সাধন ভাগবৎ দ্বারা হয়। 'ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি, শোকং তরতি চাত্মবিৎ। রসোব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দি ভবতি নান্যথা।' ব্রহ্মবিৎ পরমপদ লাভ করেন, আত্মাবৎ শোক হইতে মুক্ত হন। রস স্বরূপ ব্রহ্মের রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়—অন্য উপায়ে আনন্দ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ, ভগবত্তত্ত্ব—এই তিন প্রকার সাধন ইহার অভ্যন্তরে।"

ভক্তি ভালবাসা নয়। ভক্তি গোপনীয়া।

প্রশ্ন—'ভক্তি ও ভালবাসা, সবই কি মায়া?'

ঠাকুর—"ভক্তি ভালবাসা নয়। ভক্তি ভজন, ভালবাসা আসক্তি। পুত্রকে স্নেহ করি, বন্ধুকে

ভালবাসি, এ সকল মায়া। পুত্রকে পূজা করি, কন্যাকে পূজা করি, স্ত্রীকে ভক্তি করি, পূজা করি। পূজা কি?—ভগবানের পাদপদ্ম সেই ভাবে পূজা করিলে—ভক্তি। এসব মায়া নয়।"

প্রশ্ন— ভক্তি কি প্রকারে লাভ হয়? রক্ষাই বা কি প্রকারে করা যায়?

ঠাকুর— "ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না। যাহার হয় সেই ধন্য। ভক্তিতে বিচার নাই। পুত্র ধূলি মাখা থাক, আর পরিষ্কার থাক্—পিতা অমনি তাকে কোলে তুলে নেন। পুত্র হওয়ার পূর্ব্বে অপত্যস্নেহ কে জানে, কেহই বুঝে না। ভক্তি অহৈতুকী,— ভাল-মন্দ বিচার করেন না। ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য—তিনজন বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তিদেবী বৃন্দাবনে যাইয়া যুবতী হইলেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য বৃদ্ধই রহিলেন। ভক্তি কৃপণের ধনের ন্যায় গোপনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা যুবতীর স্তনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বালিকা মুক্ত দেহে ঘুরিয়া বেড়ায়, যুবতী হইলে স্তন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে। স্বামী ব্যতীত পিতা মাতা গুরুজনে কেহ তাহা দেখিতে পান না—ভক্তিও তদ্রূপ ভগবান ব্যতীত সকলেরই নিকট সঙ্গোপনে, গোপনে রক্ষণীয়া। প্রথম প্রথম যখন ভাবের উচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল, একটু চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিতাম—লোকে দেখুক। পরে দেখি—ইহা কি করিয়া গোপন করিব? তখন ইহা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে গোপন করিতে ইচ্ছা হইত। ভক্তি গোপনীয়া।"

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা," লোকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেই ক্ষতি। যেমন কোন বৃক্ষে ফল ধরিলে, কালো হাঁড়িতে চূণের দাগ দিয়া অথবা খড়ের মানুষ দিয়া রাখে, সেই রকম সাধনের অবস্থা লাভ হইলে বালক, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আবরণ দিয়া রাখিতে হয়। ইহা অপেক্ষা এক জন যদি গালাগালি দেয়, তাহাতেও উপকার হয়। ভাব ইত্যাদি চেপে রাখাই ভাল। খুব চেষ্টা করিতে হইবে, না পারিলে নিরুপায়। মোটে কিছু না হয়, চুপ করে বসে থাকে সেও ভাল, কিন্তু কিছু হ'লে প্রকাশ ক'রলেই সর্ব্বনাশ। কুকুর বানরকে লাই দিলেই ঘাড়ে চড়িবে। অন্য সাধুকে [illegible] করলে [illegible], ঘরে ঢুকে গিয়ে বসে থাকে, কিছু খাবার দিলে ত খেলে। প্রতিষ্ঠা [illegible]।

সন্ধ্যার সময়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনের আনন্দে সকলেই মাতিয়া গেলেন। ঠাকুর নির্ব্বাত প্রদীপের মত একই ভাবে সমাধিস্থ। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর স্বহস্তে, হরিরলুটের বাতাসা চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ গুরুভ্রাতারা ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আনন্দ করিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন। আমি ঠাকুরের তিন চারি হাত অন্তরে নিজ আসনে শয়ন করিয়া সুখে রাত্রি কাটাইলাম।

শেষ রাত্রি ৪টার সময় জাগিলাম। উঠিয়া দেখি সকলে নিদ্রায় অভিভূত। ঠাকুর নিজ আসনে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া বাড়ীর কোথায় জল, কোথায় কল, কোথায় পায়খানা, কিছুই জানিয়া নিতে পারি নাই। সুতরাং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায় চলিয়া গেলাম। সেখানে শৌচান্তে স্নান করিয়া শালগ্রামের জন্য ফুল তুলসী গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া সুকিয়া স্ট্রীটে আসিলাম। নিয়মিত সন্ধ্যা, তর্পণ ও ন্যাস করিয়া শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম। বেলা ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শালগ্রামকে

১৯শে—২০শে ভাদ্র।

গঙ্গাজল তুলসীপত্র অর্পণ করিলাম। ঠাকুরের নিকটে বসিয়া শালগ্রাম পূজায় বড়ই আনন্দ পাইলাম। সাড়ে তিনটার সময়ে অভয়বাবুর বাড়ী যাইয়া ভিক্ষান্ন রান্না করিয়া শালগ্রামকে ভোগ দিলাম। আহারান্তে সন্ধ্যার সময় সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিলাম। দর্শনার্থী বহুলোক ঠাকুরের আসন ঘর (হলরুমটি) পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, দেখিলাম।

শাসনে নয়, ভালবাসায় সংশোধনঃ
অতিথির অবৈধ আব্‌দার পূরণ করা উচিত কি না?

একটি অবস্থাপন্ন কৃতবিদ্য গুরুভ্রাতা, ছেলের দুশ্চরিত্র ও অবাধ্যতায় ক্লেশ পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ছোট ছোট ছেলে পিলেরা কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'লে তাদের কিভাবে শাসন করা যায়?"

ঠাকুর—"শাসন করা ক্রোধ পূর্ব্বক করিলে শাসনের ফল হয় না। ধীরভাবে বিচারকের ন্যায় বালকদের শাসন করা প্রয়োজন। তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু শুনিলে, বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে। ছেলে-পিলেদের সর্ব্বদা অসৎ সঙ্গে যাইতে নিষেধ করা, অসৎ সঙ্গের দোষ নানা পুস্তক হইতে দেখান; — ইহাতে না শুনিলে অন্য প্রকার শাসন—প্রহার নহে। কঠোর শাসনের দ্বারা ভাল হইবে না। এ কলির ধর্ম্ম—কালগুণে এসব হইবে। উহাদিগকে পিতামাতা সর্ব্বদা ঐ অন্যায় কার্য্যের বিষময় ফল দেখাইবেন। এ যুগে শাসনের দ্বারা কোন ফল হইবে না—ভালবাসিয়া সংশোধন করিতে হইবে। পিতামাতার কথায় যদি সন্তানের মর্ম্মে আঘাত লাগে, তাহাতে প্রায়ই মৃত্যু হয়;—নতুবা গৃহত্যাগ করে।"

একজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গুরুজ্ঞানে অতিথি-সেবা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু অতিথি যদি মদ গাঁজা খাইতে চাহেন, অথবা ঐরূপ একটা অন্যায় জেদ করেন, তাহার কোন প্রতিবাদ করিব কি না?'

ঠাকুর— "অতিথির ধর্ম্মমতে ভ্রম থাকিলে তাহার সংশোধন করিয়া অতিথি-সেবা করিবে না। তখন তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর যদি তিনি থাকেন, তবে তাঁহার মতের অবৈধতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতিথির অর্থ— যিনি কোন দিন আসেন নাই, অথচ ক্ষুধার্ত্ত। অতিথি গুরু, তিনি যাহা সেবা করেন তাহা দিতে বাধ্য। অতিথির নাম-ধাম কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। ক্ষুধার সময়ে তাঁহাকে সংশোধন করিতে বসা, নিষ্ঠুরতা। ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন না হইলে যিনি নেশার জন্য মাদক সেবন করেন—সে অতিথিকে মাদক দ্রব্য দিতে বাধ্য নহি। বাহিরের মদ শরীরের উপর কার্য্য করে। যদি নেশা না হয় তবে ইহা ধর্ম্ম-পথের বাধক নহে। কিন্তু কাম ক্রোধ—ইহার মত মাদক আর নাই। এই মাদকে ধর্ম্ম নষ্ট হয়; ভগবান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহা যিনি ত্যাগ না করেন, তিনিই মাদক সেবন করেন।"

সন্ধ্যার সময়ে সংকীর্ত্তনের খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে আনন্দ করিয়া গুরুভ্রাতারা চলিয়া গেলেন।

কলিকাতায় ভিক্ষায় অসুবিধা। ঠাকুরের ভাণ্ডার হইতে ভিক্ষা নিতে আদেশ।

আজও শেষ রাত্রে উঠিয়া অভয়বাবুর বাড়ী গেলাম। শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে ফুল-তুলসী সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের নিকট আসিলাম। সন্ধ্যা, তর্পণ, হোম এবং ন্যাস করিতে বেলা ৯টা হইল। চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি ঠাকুরের ৩/৪ হাত অন্তরে বসিয়া পাঠ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বিশেষতঃ তিনি ১১টা পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। আমি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিয়া ১২টি সচন্দন তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল শালগ্রামকে প্রদান করিলাম। পরে অপরাহ্নে ৩টা পর্য্যন্ত নাম জপের সঙ্গে ঠাকুরের রূপ শালগ্রামে ধ্যান করিয়া তুলসী গঙ্গাজল ঠাকুরের চরণে দিলাম। আহারের জন্য বড়ই অসুবিধা উদ্বেগ বোধ হইতেছে। কলিকাতা শহরে ভিক্ষার বড় অসুবিধা। অপরিচিত স্থলে নিন্দা ও অবজ্ঞা ভোগ হয়, পরিচিত স্থলেও লজ্জা, সঙ্কোচ ও অভিমানে বাধা দেয়। সাড়ে তিনটার সময়ে আসন ছাড়িয়া উঠিলাম এবং ভিক্ষায় বাহির হইলাম। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ী ভিক্ষা করিয়া, তথায়ই রান্না করিয়া প্রসাদ পাইলাম। কল্য আবার কোথায় ভিক্ষা করিব ভাবনা আসিল, উদ্বেগও বোধ হইতে লাগিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে ভিক্ষার অসুবিধা জানাইলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র, ঠাকুর একখানা কাগজে লিখিয়া যোগজীবনকে দিলেন এবং উহা দিদিমাকে শুনাইতে বলিলেন। যোগজীবন আমাকেও পড়িয়া শুনাইলেন;— "ব্রহ্মচারী যতদিন কলিকাতা থাকিবেন, অন্যত্র ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। এখান হইতে নিজের প্রয়োজন মত বস্তু গ্রহণ করিয়া পাক করিয়া খাইবেন। এখানকার সমস্তই ভিক্ষান্ন। এজন্য অন্য স্থানে ভিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। যদি ইচ্ছা হয়, মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করিতে পারেন। আহারের মাত্রা ও সময় স্থির না থাকিলে শরীর ভগ্ন হয়। শরীর অসুস্থ হইলে সাধন-ভজন কিছুই হয় না। সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।" ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আমার উপরে দেখিয়া বড়ই অনন্দ হইল। আগামী কল্য হইতেই ঠাকুরের ভাণ্ডার হইতে আমি একপাকে রান্না করিবার মত বস্তু গ্রহণ করিয়া প্রসাদ পাইব, স্থির করিলাম।

যোগজীবন কর্ত্তৃক ঠাকুরমা'র শ্রাদ্ধ। ঠাকুরের তিন গণ্ডূষ জলদান।

এই কয়েকদিন শালগ্রাম পূজার পর অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণবাবুর বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়াছি। তথায় মেয়েরা আমাকে বড়ই যত্ন করেন। উনুনটি ধরাইয়া ভিক্ষার উপকরণ সম্মুখে আনিয়া দেন। নিজের প্রয়োজন মত একপাকে রান্নার বস্তু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী সকল ফিরাইয়া দেই। ভাতে ভাত, কখনও বা খিচুড়ি রান্না করিয়া তৃপ্তির সহিত ভোজন করি। ঐ সময়ে, ঐ বাসায়, অনেক গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অভয়বাবু প্রভৃতির মুখে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিলাম। আমি হরিদ্বারে ছিলাম বলিয়া এ সকল কথা কিছুই জানি নাই। ঠাকুরের লীলা-কাহিনী, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ শুনিতে ও ভাবিতে বড়ই আনন্দ পাই। তাই, অতীত কয়েকটি ঘটনার বিষয় যেমন শুনিলাম, ডায়েরীতে লিখিতেছি। শুনিলাম, গত চৈত্রমাসের শেষ ভাগে আমাদের পরমারাধ্যা ঠাকুরমাতা স্বর্ণময়ী দেবী ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে, ঠাকুরের সম্মুখে দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর সন্ন্যাসী; সুতরাং মাতার শ্রাদ্ধ-কার্য্য ও পিণ্ডদানে অধিকার নাই বলিয়া, পুত্র যোগজীবনকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে কেশববাবুর নববিধান মন্দিরের পশ্চাৎদিকে ৯০/৫ নম্বর শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসায় উঠিলেন। তথায় থাকিয়া একাদশ দিবসে যোগজীবনকে লইয়া গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান্ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া যোগজীবন দ্বারা কুলপ্রথা অনুসারে যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ-কার্য্য সমাধা করিলেন। এ সময়ে ঠাকুরও স্বয়ং তিন গণ্ডুষ গঙ্গাজল লইয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। ঠাকুর তখন লিখিয়াছিলেন,—"মাঠাকুরুণ যোগজীবনের শ্রাদ্ধ ও আমার প্রদত্ত তিন গণ্ডুষ গঙ্গাজল আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।" শ্রাদ্ধান্তে ঠাকুর যোগজীবন প্রভৃতিকে লইয়া বাসায় আসিলেন।

শ্রাদ্ধবাসরে মুকুন্দের কীর্ত্তন। কীর্ত্তনে শক্তি-সঞ্চার।

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাগণ বাসার সংলগ্ন সম্মুখের বিস্তৃত জমিটি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ছাউনি দিয়া কীর্ত্তনের আসর পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর বাসায় পঁহুছিবামাত্র, ভক্ত কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ দাসের মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে দর্শকবৃন্দ আসিয়া কীর্ত্তনস্থল পরিপূর্ণ করিল। ঠাকুর শিষ্যগণ সহিত কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ভূমিতে লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে দাঁড়াইলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ঠাকুর ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ভাবাবেশে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, —"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন! হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। —কলি জীবের ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই।" ঠাকুরের এই হৃদয়স্পর্শী মধুর বাণী বালক বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই অন্তরে প্রবেশ করিল। সকলেরই গণ্ড বহিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রেমমঙ্গল মধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ কম্পিত হইতে লাগিল। মস্তকের লম্বিত জটাভার খাড়া হইয়া উঠিল। ঠাকুর সম্মুখে পশ্চাতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে [illegible] হরিধ্বনি হইতে লাগিল। সমাগত ব্যক্তিগণ বিস্ময়ের সহিত ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুরের [illegible] কণ্ঠের হরিধ্বনিতে কি জানি কি এক মহাশক্তি সঞ্চারিত হইল। দর্শকমণ্ডলী নানা স্থানে ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সংকীর্ত্তনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া বহুক্ষণ সমান উদ্যমে চলিল। মহাভাবের বন্যায় ভক্ত গুরুভ্রাতারা দিশাহারা হইলেন। ঠাকুর কতক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। চারিদিক্ হইতে গগনভেদী হরিধ্বনি উত্থিত হইল। ঠাকুর ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। তখন সংকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি ধীরে ধীরে নীরব হইল।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া কাঙ্গালীদের চাউল, ডাল ও পয়সা বিতরণ করাইলেন। সহরের গুরুভ্রাতাভগ্নিগণ পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভে ধন্য হইলেন। বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত হইল।

ঠাকুরমা'র মৃত্যুতে তত্ত্ব প্রকাশ। জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা কেন?

গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "ঠাকুরমা দেহত্যাগের পর কি করিলেন? সাধারণ লোকের দেহত্যাগের পর কি হয়?" ঠাকুর লিখিলেন—"মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হয়। মৃত্যুর তিন ঘন্টা পূর্ব্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া, ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ঘুরিতে থাকেন। দেহ ঘর হইতে বাহিরে আনিলে প্রশস্ত আকাশে আত্মা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হয় তবে পিতৃলোকে অথবা মাতৃলোকে লইয়া যান এবং তাঁহাকে লইয়া এক বৎসর কাল আনন্দ লাভ করেন। এক বৎসর পরে যাঁহার যেরূপ কর্ম্ম সেইরূপ অবস্থা লাভ করেন। এই এক বৎসর শ্রাদ্ধের ফল ভোগ করেন। পাপাত্মা হইলে এক বৎসর উৎকট পাপ যন্ত্রণা ভোগ করেন। এই প্রকার অনেক ঘটনা মাতা জানাইতেছেন। ইহা আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা।"

একটি ব্রাহ্মভাবাপন্ন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—জীবাত্মা পরলোকগত কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ করে? দুঃখী-দরিদ্র, কাঙ্গালদের না খাওয়াইয়া শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা কেন? ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—"জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,—এই ত্রিবিধ দেহেতেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। স্থূল দেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইলে এবং স্থূল দেহ গ্রহণ করে। উত্তম পদার্থ হইলে প্রতিগ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহে কেবল আহারের বস্তু দর্শন মাত্র তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। কারণ শরীরে, শরীর নিজে কিছু করিতে পারে না। কোন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ যদি খাদ্যবস্তু জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, তদ্দ্বারা পরলোকবাসীর কারণ দেহের তৃপ্তি হয়,—ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হয়। এইজন্যই শ্রাদ্ধ পাত্র ঘৃত, পায়স ব্রাহ্মণকে দেওয়ার প্রথা আছে।" ঠাকুর পরলোকে আত্মার তৃপ্তি, পুষ্টি ও মুক্তি বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন।

ঠাকুরমা'র শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে ঠাকুরের লেখা—"যথাবিধি গয়ায় পিণ্ডদানে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়। মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃলোক মাতৃলোকদিগের সহিত আসিয়া সকলেই আমাকে বলিলেন যে, একাদশ দিবসে যোগজীবন তাঁর শ্রাদ্ধ করিবে,—তাঁর নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিবে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে ও দুঃখীকে দান করিবে। অপর পক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিবে। অপর পক্ষে, আশ্বিন মাসে দান—যথাসাধ্য তণ্ডুল বস্ত্র, জলপাত্র, ফল-মূল, খাদ্যবস্তু ইত্যাদি। শাস্ত্রমতে এখন পিণ্ডদান হইতে পারে না। উন্মাদ রোগের সময় যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না হইতে মৃত্যু হইয়াছে। এজন্য হয় এক বৎসর পরে কুশ-পুত্তল করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, অথবা অপর পক্ষের সময় গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে। এখন মাত্র তণ্ডুল, বস্ত্র, ভোজনপাত্র, জলপাত্র এবং অন্যান্য বস্তু তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখীদিগকে দান করিতে হইবে।"

ঐ সময় ঠাকুরমা'র দেহত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও লিখিলেন—"আমার মাতাঠাকুরাণী বিধুর কোলে দুধ খাইতেছিলেন, এমন সময়ে আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখি এখন বাহিরে

নেওয়া কর্ত্তব্য। বাহিরে নিয়া শোয়াইলাম। মুখের সুন্দর শোভা হইল। মনে হইল যেন সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া শান্তি পাইলেন। ঠিক এই সময় আমার পানে তাকাইয়া রহিলেন। চারিদিকে হরিনাম হইতেছিল। কেলে কুকুর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল।

পরমহংসদেবের উৎসবে নিমন্ত্রণ।

আজ জন্মাষ্টমী। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধিস্থানে আজ খুব সমারোহের কীর্ত্তনোৎসব। ঠাকুর সশিষ্যে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। গুরুভ্রাতারা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। আমাকে সকলে যাইতে বলিলেন। ঠাকুর না বলিলে আমি নিজে হইতে যাইতে সাহস পাই না, সকলকে জানাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলেই তো আপনার সঙ্গে উৎসবে যাইবে, ব্রহ্মচারী যাইবে না? ঠাকুর বলিলেন,— **"যেতে আর আপত্তি কি। তবে শালগ্রাম পূজা শেষ করে, ইচ্ছা হলে যেতে পারে।"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া বুঝিলাম; আমার যাওয়া হবে না। আমি ৩টা পর্য্যন্ত শালগ্রামকে তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া নিয়ম মত পূজা করিলাম। পরে শূন্য বাসায় থাকিতে আর ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর বাসায় গেলাম। অভয়বাবুর বাসার ছোট ছেলেপিলেগুলিও ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়াছে। পরিবারটিতে ধর্ম্ম যেন সর্ব্বদাই বিরাজমান। খেলা করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী বাসার একটি ছোট বালিকা, অভয়বাবুর ভাইঝি—রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিল! — "হাঁ ভাই, তোর গুরু তো ভগবান, আমার গুরু ভগবান নন?" রাধারাণী উত্তর করিল—"হাঁ ভাই, সকলেরই গুরু ভগবান; তবে কারো ভেবে চিন্তে, কারো সত্যি সত্যি।" মেয়েটির বয়স ৬ বৎসর মাত্র।

১৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার। ১৩০০।

সত্যদাসীর অলৌকিক অবস্থা ও দীক্ষা।

অভয়বাবুর ভাগিনেয়ী বালিকা সত্যদাসীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বজন্মে সে কোন পাহাড়বাসী মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছিল। তাঁহারই কৃপায় সময় সময় বালিকার গুরুস্মৃতি হয়। তখন সে ফুল চন্দন সংগ্রহ করিয়া, গুরুর আসনের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করে। এই পূজার সময়ে কখন কখন ভক্তিভাবে বাহ্যসংজ্ঞাবিলুপ্ত হয়। ৩/৪ ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ হইয়া থাকে। যুক্তবর্ণের ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় গুরুর স্তব-স্তুতি করে; তখন গুরুর চরণ-চিহ্ন পরিষ্কাররূপে আসনে পড়ে। মহাপুরুষের আবির্ভাবের লক্ষণ সমস্ত পুনঃপুনঃ দেখিয়া বাসার সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। ঠাকুরের এই বাসায় আসিবার ৪/৫ দিন পূর্ব্বে সত্যদাসীকে তাঁহার গুরু বলিলেন—"মা, এখানে খুব শীঘ্রই এক মহাপুরুষ আসিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিও।" সত্যদাসী গুরুকে বলিল—"আপনি তো রয়েছেন, আবার অন্যের কাছে দীক্ষা কেন?" মহাপুরুষ বলিলেন—"বর্ত্তমান যুগে কতকগুলি লোক ইঁহার আশ্রয় পাইয়া মোক্ষলাভ করিবে—ইহাই ভগবানের বিধান।" ঠাকুর মাতৃশ্রাদ্ধ করাইতে যোগজীবনকে লইয়া ৪/৫ দিনের মধ্যেই এই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যদাসী ঠাকুরের নিকট গুরুর আদেশ জানাইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিল। ঠাকুর বলিলেন—**"তোমার গুরুর আদেশ**

আমার শিরোধার্য্য। অবিলম্বেই তোমাকে দীক্ষা দিব।" অচিরেই ঠাকুর সত্যদাসীকে সাধন দিলেন। সাধনের সময়ে গুরুশক্তি প্রভাবে সত্যদাসী আসন হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঘরের ভিতরে শূন্যে অবস্থান করিয়াছিল। ধন্য সত্যদাসী! ধন্য গুরুদেবের অসাধারণ কৃপা! এই কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সত্যদাসীর নানা প্রকার অলৌকিক অবস্থা দেখিয়া, তাহার পিতামাতা রোগ অনুমানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং সত্যদাসীর কল্যাণের জন্য পুনঃপুনঃ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর তাহাতে লিখিলেন—**"সত্যদাসীর পিতামাতা তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না! কারণ ইঁহারা কখনই এরূপ অবস্থা দেখেন নাই। সংসারের সমস্ত লোক পীড়া বলিয়া চীৎকার করিতেছে। একজন কি দু'জন যদি বলে পীড়া নহে, তাহাতে কোন ফল হয় না। তবে রোগ বলিয়া মহাত্মাদিগকে আরাম করিয়া দেও বলিয়া, পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলে অবজ্ঞা করা হয়। মহাত্মাগণ 'রোগ নয়', বলিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, সেকথা না শুনায় লাভ কি? পীড়া কোথায়? জ্বর আছে? ভেদ বমি কি হয়? উদরে ব্যাথা আছে? হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ, প্লীহা, পাকাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয়, এ সমস্তে শারীরিক পীড়া আছে? যদি না থাকে, তবে পীড়া নাম কেন?"**

মোহিনীবাবুর দীক্ষায় অনুভূতি।

শুনিলাম, এই বাসায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রণবাজপুর নিবাসী, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, সত্যনিষ্ঠ, পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপা তাঁহার উপরে অসাধারণ। সাধন গ্রহণের পর তাঁর অবস্থা বড়ই অদ্ভুত হইযাছিল।- শুনিয়া আনন্দ হইল। দীক্ষাগ্রহণের পরই মোহিনীবাবুর যে অবস্থালাভ হইয়াছিল, ছোড়্‌দাদার ডায়েরী হইতে অতি সংক্ষেপে তাহা আমি এই স্থানে তুলিয়া দিলাম। মোহিনীবাবু লিখিয়াছেন— "আমি রাত্রি ১টার সময়ে দীক্ষা পাইয়া, পরদিন প্রত্যূষে যেমন নীচে নামিয়াছি, আমার হঠাৎ সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব্ব তড়িৎ প্রবাহ সর্ সর্ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে আপনা আপনি গুরুদত্ত নাম, মিষ্ট হইতে মিষ্ট হইয়া চলিতে লাগিল। আমি এক আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলাম। যে দিকে তাকাই সমস্তই আনন্দ ক্ষরণ করিতেছে; গাছ, লতা, পাতা, সমস্ত পৃথিবী সুবর্ণ বর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল।—আমি মধুময় হইয়া গেলাম। আর আনন্দবেগ ধারণ করিতে পারিলাম না। পাখীগুলি ডাকিতেছে; যেন মধুবর্ষণ করিতেছে; সমস্তই মধুরং, মধুরং, মধুরং মধুরং। এই অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন প্রায় মাসেক কাল সম্ভোগ করিয়াছি।"

মোহিনীবাবুর সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, বিনয়, উপাসনায় ভাব-উচ্ছ্বাসের প্রবণতা দেখিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। মোহিনীবাবুর দ্বারা ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত যোগ-ধর্ম্মের যথার্থ পরখ্ হইবে, ব্রাহ্মেরা অনেকে এরূপ মনে করিয়াছিলেন। মোহিনীবাবুর সঙ্গলাভে তাঁহারা উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইয়া ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল হয় তাঁহারাও ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

জ্ঞানবাবুর দীক্ষা।

শুনিলাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী আনগুণা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয়ের দীক্ষাও এই বাসায় হইয়াছিল। তাঁহার দীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা সকল বড়ই সুন্দর। সংসারে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির ভিতরেও ঠাকুর নিজ জনকে কি ভাবে আকর্ষণ করিয়া চরণতলে স্থান দেন, জ্ঞানবাবুর দীক্ষাগ্রহণ তাহার একটি নিদর্শন। এই সম্বন্ধে জ্ঞানবাবু নিজে যাহা ছোটদাদার ডায়েরীতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়া দিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম। জ্ঞানবাবু লিখিয়াছেন--- "আমি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলাম। পদ্ধতি মত উপাসনায় অশ্রু পুলকাদি ভাব হইত, কিন্তু কোন ভাব স্থায়ী হইত না, প্রাণের অভাবও মিটিত না। এ সকল বিষয় গোঁসাইয়ের শিষ্য আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্তকে জানাইলে তিনি বলিলেন— "গুরুকরণ না হ'লে ধর্ম্মের কোন ভাব স্থায়ী হয় না।" তিনি গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা লইতে উপদেশ দেন। গোঁসাই তখন শ্যামবাজারে ছিলেন। আমি দেবেন দাদার সঙ্গ-গুণে গোঁসাইয়ের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, প্রত্যহ কলেজে না যাইয়া বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতাম। গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেবেন দাদাকে জানাইতে বলিলাম। দেবেনদা গোঁসাইকে আমার কথা জানাইলে, গোঁসাই বলিলেন —"উহার বীর্য্য অত্যন্ত তরল হইয়াছে। শীঘ্র পড়া ছাড়িয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া না গেলে, পাগল হইয়া যাইবে।" তাহাতে দেবেনদা জিজ্ঞাসা করিলেন- তবে এখন ইহার কি কর্ত্তব্য? গোঁসাই বলিলেন—"উহার পক্ষে এখন কাশী যাইয়া বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার আরতি দর্শন, গঙ্গাস্নান ও সাধু-দর্শন কর্ত্তব্য।" আমি গোঁসাইয়ের আদেশমত শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের এক শিষ্যের সঙ্গে কাশী পঁহুছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন -- সাধু-দর্শন মানসে আপনি আমার নিকট আসিলেন, আমি আপনাকে দীক্ষা দিব---এই অভিপ্রায়ে গোস্বামী মহাশয় আপনাকে কাশী পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদের প্রথা মত পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলাম। তৎপরে রাণীগঞ্জে আসিয়া দেড়মাস রীতিমত সাধন করিলাম। কিন্তু তাহাতে অন্তরের সমস্ত সরসভাব শুকাইয়া গেল। প্রত্যুতঃ প্রাণে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হইল। এই সময়ে আমি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নগেন্দ্রবাবুর পরামর্শে গোঁসাইকে সমস্ত অবস্থা লিখিয়া জানাইলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। ১২৯৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাজলে এই সাধন ত্যাগ করিলাম। বৈশাখ মাসে ভূতানন্দ স্বামী কলিকাতায় আসিলেন। আমি রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতাম। গভীর রাত্রিতে তাঁহাকে জীবনের ব্যাকুলতার পরিচয় দেই এবং লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে দীক্ষা পাওয়ার কথা বলি। তিনি উত্তরে বলিলেন— "আরে বেটা তোম্ এইছা বুরবাক্ হ্যায়। পাঁচ রুপিয়ামে যোগ মিল্‌তা হ্যায়, যো লাখ রুপিয়ামে নাহি মিল্‌তা হ্যায়?" গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লইতে ইচ্ছা করিয়াছি শুনিয়া তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হো যায়গা।"

তৎপরে গোস্বামী মহাশয় এই বৎসর বৈশাখ মাসে কলিকাতায় আসিয়া অভয়বাবুর বাসায় উঠিলেন। আমি দেবেনদার নিকট খবর পাইয়া তথায় যাই এবং নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিনে ভোর

রাত্রি ৪টার সময়ে সাধন পাই। সাধন পাইবার সময় ভিতরে যেন একটা বৈদ্যুতিক স্রোতের মত অনুভব করিলাম। তাহাতে আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। এখন আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণের অভাব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা পাওয়ার বিবরণ ঠাকুরকে বলাতে তিনি বলিলেন—"ইহা তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। ইহাতে তোমার কল্যাণই হইয়াছে।"

সদাশিবরূপে ঠাকুরকে দর্শন। ভাণ্ডার অফুরন্ত।

এই বাসায় ঠাকুরের অবস্থানকালে সহরের গুরুভগিনীরা মধ্যাহ্নে আসিয়া ঠাকুরকে ফুল-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিতেন। এই পূজার সময়ে গুরুভগিনীরা কখন কখন ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। একদিন ব্রাহ্মভাবাপন্ন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়, মেয়েদের পূজা দেখিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দরজা যেমন একটু ফাঁক করিলেন, দেখিলেন—ঠাকুর সদাশিবরূপে বসিয়া আছেন। শুভ্র জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, তিনি ধ্যানস্থ। ইহা দেখিয়াই গুরুভ্রাতাটি বম্ বম্ বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শুনিলাম, গুরুভগিনীরা কেহ ঠাকুরের চরণে ফুল-চন্দনাদি দিতে পারিতেন না;— কেবল মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে সচন্দন পুষ্পমাল্যে ঠাকুরকে সাজাইতেন।

প্রতিদিনই মধ্যাহ্নে অভয়বাবুর বাসায় মহোৎসব ব্যাপার হইত। ৪০/৫০ জন লোক প্রসাদ পাইতেন। একদিন ঠাকুরের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দায়, মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করিতেছেন— 'আজ কি হইবে, ভাণ্ডারে যে চাউল বাড়ন্ত।' ঠাকুর অমনি মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন—" জালায় চাউল আছে, দেখ গিয়ে।" মেয়েরা বলিলেন—"আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কিছুই নাই।" ঠাকুর বলিলেন—"আচ্ছা, আর একবার গিয়া দেখনা।" ঠাকুরের কথামত তাঁহারা গিয়া জালায় হাত দিয়া দেখিলেন—অর্দ্ধ জালার অধিক চাউল রহিয়াছে। অভয়বাবু ও হরিনারায়ণবাবুর স্ত্রীর মুখে শুনিলাম—যতদিন গোঁসাই ঐ বাড়ীতে ছিলেন, জালার চাউল আর ফুরাইল না। ঠাকুর ১৫/১৬ দিন ঐ বাসায় থাকিয়া ঢাকা গেলেন। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে নিয়া যাইতে খুব আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠাকুর স্বীকার করিয়াছিলেন, আবার যখন কলিকাতা আসিবেন, রাখালবাবুর বাড়ী যাইয়া থাকিবেন। তাই, এবার সুকিয়া ষ্ট্রীটে।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা।

বেলা অবসানে অভয়বাবুর বাড়ী হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গুরুভ্রাতাদের লইয়া ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের উৎসব খুব সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বাসায় আসিয়া সকলেই পরমহংসদেবের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিল। ঠাকুরও অনেক কথা বলিলেন। গয়াতে দীক্ষা গ্রহণের পর, ঠাকুর কলিকাতা আসিয়া বরাহনগর মণি মল্লিকদের বাগানে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে দেখিয়াই বলেন—"একি! তোমার যে গর্ভলক্ষণ হ'য়েছে!" ঠাকুর তখন তাঁহাকে দীক্ষালাভের সমস্ত পরিচয় দেন। পরমহংসদেব

শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আর একবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দর্শন মানসে যান। পরমহংসদেব একটু অসুস্থ ছিলেন। শিষ্যেরা ঠাকুরকে নিকটে যাইতে বাধা দিতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন হাতে তালি দিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর সম্মুখে যাওয়া মাত্রেই পরমহংসদেব বলিলেন, "আহা! তোকে দেখে যে আমার হৃদ্‌পদ্মটি ফুটে' উঠ্‌ল!" এই বলিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। একবার ঠাকুর পশ্চিমাঞ্চলে বহুস্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিলেন। একদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "এত তো ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখ্‌লি, বল দেখি?" ঠাকুর কহিলেন—"কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বার আনা, কোথাও চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোল আনা এখানে।" পরমহংসদেব শুনিয়া ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে ঠাকুর লিখিলেন—"একদিন পরমহংসদেব কেশববাবুকে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন যে, 'আজ কেশব আমাকে পূজা করেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, উহাব লোকেরা পাছে টের পায়। তা দরজা বন্ধই থাক্‌বে।' কেশববাবু প্রকাশ্যে উঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে, এতদিন সকলে উদ্ধার হইয়া যাইত।"

ইহার পরে ঠাকুর আবার লিখিলেন— "কেশববাবুর মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শরীর মৃতদেহের ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'গোঁসাই। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইল না। পথহারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশা হইতেছিল, এমন সময় এই পীড়া।' আমাকে বলিলেন —'তুমি নাকি নূতন মত অবলম্বন করিয়াছ?' আমি বলিলাম—'নতূন পুরাতন বুঝিনা। ভগবানকে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমাজে, তখন কিছুই ছিলনা। সুতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া গোল করিতে আসি নাই। ভগবানকে পাইলাম ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না, যে কোন উপায় ধরিতে হয় ধরিব। বাহিরের উপায় কিছুই নয়। মৃত্যুকালে আমি কৃতার্থ, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমি সত্য— ইহা বলিয়া মরিব, এই আকাঙ্ক্ষা। আশীর্ব্বাদ করুন।' কেশববাবু বলিলেন— 'এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে। যদি আরোগ্য লাভ করি তোমাকে ডাকইব।' দুঃখের বিষয় তাঁহার লীলা সংবরণ হইল।"

এঁড়েদহে ও সপ্তগ্রামে অস্বাভাবিকরূপে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন।

একদিন ঠাকুর পরমহংসদেবের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে বলিলেন—"ভগবানের বিগ্রহাদি ও চিত্রপট, এখন ভাবশুদ্ধরূপে প্রায়ই অঙ্কিত হয়না।" পরমহংসদেব শুনিয়া বলিলেন,— "তুমি, এঁড়েদহে মন্দিরের বারান্দায় যে চিত্রপট আছে, তা দেখেছ?" ঠাকুর বলিলেন—"না।" পরমহংসদেব বলিলেন—"ঐ চিত্রপট খুব ভাবশুদ্ধরূপে আঁকা হ'য়েছে। এক সময়ে গিয়ে দেখে এসনা?"

ঠাকুর বলিলেন— **"আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে হ'তে পারে।"** তখন পরমহংসদেব যাওয়ার একটা দিন স্থির করিয়া দিলেন। ঠাকুর ঐ দিন পরমহংসদেবের সহিত এঁড়েদহে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন,— দরজা বন্ধ। তখন উঁহারা বাহিরে থাকিয়া, ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী (মহাপ্রভুর সময়ের) একটি বৈষ্ণবের সমাধি দর্শন করিলেন। ঠাকুর ভাবাবেশে তথায় লুটাইতে লাগিলেন। পরে ঐ স্থান হইতে আসিয়া বিগ্রহের আঙ্গিনার পাশে একখানা ঘরে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরকে ভাবাবেশে বিহ্বল দেখিয়া পরমহংসদেব গান ধরিলেন। ঠাকুর ঐ সময়ে আঙ্গিনায় পড়িয়া গড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকার পর ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি বিগ্রহ দর্শনের জন্য মন্দিরের নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, তখনও দরজা বন্ধ। পূজারী ভিতর দিক্ হইতে সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া পশ্চাদ্দিকের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর দরজার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ অমনি দরজাটি খুলিয়া গেল। সকলেই দেখিয়া অবাক্! সঙ্গীরা সকলে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিলেন, অপর কোন দিকে দরজা খোলা আছে কিনা? কিন্তু সকলেই মন্দিরের পশ্চাৎ দিকের দরজা তালাবন্ধ দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পূজারী আসিয়া দরজা খোলা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং প্রসাদী মালা পরমহংসদেব ও ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন। পরমহংসদেব বারান্দার সেই সুন্দর চিত্রপটখানা ঠাকুরকে দেখাইয়া চলিয়া আসিলেন। এই প্রকার ঘটনা আর একবার থেপাড়ায় হইয়াছিল।

শ্রীধরের মুখে শুনিলাম—ঠাকুর একদিন মহেন্দ্রবাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের লইয়া, সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পাটে, ষড়ভুজ মহাপ্রভুর বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পূজারী দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, ভিতর হইতে মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দরজা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করায় বলিলেন— "পাঁচ সিকা প্রণামী না দিলে, দরজা খুলিব না।" ঠাকুর পূজারীর জেদ্ দেখিয়া বলিলেন—**"তাহ'লে দর্শন করবো না।"** ঠাকুর আর কিছু না বলিয়া মন্দিরের আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই— মন্দিরের দরজা তখন অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন— **"মহাপ্রভু দরজার পাশে দাঁড়ায়ে আমাদিগকে উঁকি মেরে দেখ্ছেন।"** ভিতর হইতে খিল দেওয়া দরজা অকস্মাৎ আপনা-আপনি খুলিয়া গেল দেখিয়া, পূজারী নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে ঠাকুরের নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমা চাহিলেন। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ও ঐ ঘটনা এই প্রকারই হইয়াছিল, বলিলেন।

ঠাকুরকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া রটনা করায় জনৈক শিষ্যকে ঠাকুরের শাসন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমবয়স্ক আমাদের একটি ব্রাহ্মগুরুভ্রাতা বলিলেন— **"গোস্বামী মহাশয়ের যাহা কিছু লাভ হয়েছে সমস্তই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপায়। পরমহংসদেবের নিকটেই উনি দীক্ষা নিয়েছেন। 'মানস সরোবরের পরমহংস**

পরমহংস' যে উনি বলেন, ও কথা কিছু নয়। আমি তো বহুকাল ওঁর সঙ্গে সঙ্গে। গয়াতেও সঙ্গে ছিলাম। মানস সরোবরের পরমহংসের নিকট দীক্ষা নিলে আমি কি জানিতাম না?" গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এ সকল কথা শুনিয়া প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা গোঁসাইকে নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এখন গোঁসাইয়ের শিষ্যরাও, যদি ঐরূপ মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে গোঁসাইয়ের কথায় সাধারণের সন্দেহ আসিতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে পরিষ্কার মীমাংসা নিতান্তই আবশ্যক। এই ভাবিয়া মিত্র মহাশয় সকলের সাক্ষাতে ঠাকুরকে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ঠাকুর গুরুভ্রাতাটিকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন— **"মানস সরোবরের পরমহংসজীর নিকটে আমি দীক্ষা নেই নাই, রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকটে দীক্ষা নিয়েছি,— একথা আপনি কোথায় পেলেন? আপনি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। আপনি এখনই এখান থেকে চ'লে যান। আপনার মুখ দেখতে নাই।"** — সকলের সমক্ষে গুরুভ্রাতাটিকে এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া শাসন করাতে, গুরুভ্রাতাটি অভিমানে দারুণ আঘাত পাইলেন এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

আমার শালগ্রাম সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা;
শালগ্রাম পূজা।

শেষ রাত্রে উঠিয়া শৌচান্তে, গঙ্গায় যাইয়া স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ সমাধা করিয়া আসিতে ভোর হইল। রাস্তায় যাতায়াতে প্রায় হাজার গায়ত্রী জপ করিলাম। আজ একাদশী— হরিবাসর। ভগবানের নাম করিয়া দিনটি কাটাইব মনে করিয়া আনন্দ হইল। ন্যাসান্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ করিয়া গঙ্গাজল তুলসীপত্র শালগ্রামকে অর্পণ করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ৩টার সময় পূজা শেষ হইল।

২২শে আষাঢ়, বুধবার।

ঠাকুর আজ বেলা ৩টার সময়ে অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া, আমার শালগ্রামটি চাহিলেন। আমি উহা ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর শালগ্রামটি লইয়া বারান্দায় গেলেন। বাম হস্তের তালুতে উহা রাখিয়া একদৃষ্টে উহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তুড়ি দিতে দিতে "হরি বোল, হরি বোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শালগ্রামটি আমার হাতে দিয়া নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। ঠাকুর একটু স্থিরভাবে থাকিয়া একখানা খাতায় লিখিয়া সকলের নিকট ধরিলেন। সকলে পড়িলেন— **"ব্রহ্মচারীর শালগ্রামে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী মহাবিষ্ণু, চারিদিকে ক্ষীরোদ সমুদ্র, গলে বনমালা, কর্ণে কুণ্ডল।"** অস্ফুটস্বরে বলিলেন—**"ভারতবর্ষে এইরূপ শালগ্রাম আর দু'টি আছেন; একটি কোন সাধুর নিকটে আর একটি নর্ম্মদার তীরে। ইনি ক্ষীরোদার্ণবশায়ী অষ্টভুজ মহাবিষ্ণু।"**

ঠাকুর শালগ্রামের অনেক মাহাত্ম্য বলিলেন—ঠাকুর বলিলেন— **"এটি বড় উৎকৃষ্ট চক্র। এরূপ চক্র বড় দুর্লভ। মহাবিষ্ণু ইহার ভিতরে থাকিয়া নিজের ভিতর হইতে একটি একটি**

করিয়া দশটি অবতার প্রকাশ করিয়া আমাকে দেখাইলেন। দেখাইয়াই আবার উহা ভিতরে নিলেন।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম— এ আবার কি? শালগ্রামের মধ্যে আমি তো একমাত্র গুরুদেবেরই পূজা করি। তিনি কি তবে মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু তো অনন্তদেব। অনন্তদেব তো স্বয়ং ভগবান নন? এই ভাবিয়া মনটি একটু উদ্বিগ্ন হইল। তখন ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি ঠাকুরের রূপটি খুব সুন্দর গৌরবর্ণ হইয়াছে। মনে হইয়াছিল, গৌরাঙ্গ প্রভুই স্বয়ং ভগবান। নিত্যানন্দই অনন্ত। শালগ্রামে বুঝি গৌরাঙ্গ নাই। গুরুদেব বুঝি নিত্যানন্দ প্রভু! আমার এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বোধ হয় ঠাকুর গৌর হইলেন। এমন সুন্দর গৌরবর্ণ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঠাকুরকে দেখি নাই। আর আর দিন ঠাকুর আমার দিকে বাম পার্শ্ব রাখিয়া এমনভাবে বসেন যে, ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের বামদিকই মাত্র আমার দৃষ্টিতে পড়ে; কিন্তু অদ্য দেখিলাম, ঠাকুর আমার দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া আছেন এবং সময় সময় আমার পানে সরল স্নিগ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন। ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন— "গুরুর চক্ষুতে বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিও।" ঠাকুর আড় হইয়া বসাতে তাঁহার সমস্ত ললাট বা চক্ষুর্দ্বয় দেখিতে পাইতাম না, এজন্য অদ্য সকালে ঠাকুরকে সাম্‌না সাম্‌নি দেখিতে মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ঠাকুর বুঝি তাহাই মনে করিয়া, এখন আমার আশা পূর্ণ করিলেন। শালগ্রাম মধ্যে আমি গুরুদেবেরই পূজা করি। মহাবিষ্ণু, জিষ্ণু, আমি বুঝি না। ঠাকুর শালগ্রামে স্বয়ং আমার পূজা গ্রহণ করেন কিনা, পরিষ্কার বুঝিবার জন্য, অদ্য আমি ফুল, তুলসী ঠাকুরের শ্রীচরণোদ্দেশে শালগ্রামে অর্পণ করিতে করিতে মনে মনে বলিলাম— 'ঠাকুর! বাস্তবিকই যদি তুমি ইহার ভিতরে থাকিয়া আমার পূজা গ্রহণ কর, তবে এই তুলসী তোমার চরণে দিতেছি, তুমি যে ইহা পাইলে তাহা আমাকে জানাও।' এই কথা বলিয়া তুলসী দেওয়ামাত্র, ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখি, ঠাকুর চঞ্চল দৃষ্টিতে শালগ্রামের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া খপ্ করিয়া নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ করে ধরিলেন এবং বাম করে করঙ্গ হইতে জল লইয়া, শালগ্রামের পানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ দু'তিন বার ধুইয়া ফেলিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন। আমি ঐ পদাঙ্গুষ্ঠেই তুলসী দিয়াছিলাম। তুলসী দেওয়ার সময়ে আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। মনে হইতেছিল— ঠাকুর যেন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন— ভিন্ন ভিন্ন শালগ্রাম পূজায় কি একই ফললাভ হয়? শালগ্রাম পূজায় কি উপকার হয়? ঠাকুর লিখিলেন— "সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মনুষ্যের এই তিন গুণ। এই তিন গুণের সঙ্গে প্রত্যেক শালগ্রাম চক্রের মিলন আছে। যে চক্রের সহিত সাধকের অধিক মিল, সেই চক্র সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিলে, ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ দেখা যায়।"

নিরম্বু একাদশীর নিয়ম ও ফল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ঠাকুর আকার-ইঙ্গিতে আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং একাদশী নিরম্বু করি বলিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। পুনঃপুনঃ সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া

খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হরিদ্বারে নিরম্বু একাদশী করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও পারি নাই, তাহা ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর বলিলেন— "তাতে কোন ক্ষতি হয়নি।" জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন— 'একাদশী করায় যথার্থই কি কোন ফল হয়?'

ঠাকুর বলিলেন— "প্রকৃতরূপে একাদশী কর্‌তে পার্‌লে তার ফল পাওয়া যায়। প্রকৃতরূপে একাদশী কর্‌তে হ'লে, পূর্ব্বদিনে সংযম কর্‌তে হয়। একাদশীর দিনে নিরম্বু থাক্‌তে হয়। তার পর দিন পারণ কর্‌তে হয়। কিন্তু একাদশী কর্‌তে প্রথম প্রথম দু'একবার কষ্টবোধ হয়। পরে অভ্যাস হ'য়ে গেলে খুব আমোদ বোধ হয়। একাদশীর দু'রকম উপকার। প্রথমতঃ, অনেক দিনের ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জ্বরের এবং অন্যান্য অনেক রোগের উপকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, মনের সঙ্গে শরীরের এবং শরীরের সঙ্গে তিথি-নক্ষত্রের যোগ থাকাতে, একাদশীতে নাম, সাধন-ভজন কর্‌তে বেশ মনোনিবেশ হয়। একাদশীর দিন জল খেতে হ'লে গাছ্ থেকে ছিঁড়ে, নিয়ে ফল খাওয়া উচিৎ নয়। ডাব-নারকেল বা অন্যান্য ফল খাওয়া ভাল নয়। বেল একটু ভাল, কিন্তু তাও প্রশস্ত নয়। পাহাড়ে ফুটি, শিঙ্গাড়া ভাল—তা খুব হাল্কা ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক। অতি অল্প জল খেতে হয়। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব দু'মতের একাদশীর উপবাস। গৃহীদের দশমী-বিদ্ধ একাদশী অর্থাৎ স্মার্ত্তমতে করা ভাল। ভেকধারী বৈষ্ণবেরা দ্বাদশীযুক্ত একাদশী করেন। শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়েরা প্রথমোক্ত একাদশী করেন এবং স্মৃতিমতে চলেন। নিত্যানন্দ বংশের গোস্বামীরা বৈষ্ণব মতে একাদশী করেন।"

মুক্তি, পরলোক, শ্রাদ্ধ-তর্পণ ও রুগ্নাবস্থায় অলৌকিক দর্শনাদি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

আজ বহুলোক আসিয়া হলঘর পরিপূর্ণ করিয়া বসিল। অনেকে ঠাকুরকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। তন্মধ্যে দু'চারটি কথা লিখিয়া রাখিতেছি। একজন প্রশ্ন করিলেন— "যাঁহারা মুক্ত হ'ন তাঁহারা আবার সংসারে আসেন কি?' ঠাকুর লিখিলেন— "মুক্তি অনেক প্রকার। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণ-দেহ। বাসনা লয় হইলে স্থূল-দেহের লয় হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম এবং কারণ-দেহ থাকে। সূক্ষ্মদেহ যে যে বাসনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় হইলেও কারণ-দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিবৃত্তি না হইলে কারণ-দেহের লয় হয় না। এই কারণ-দেহের লয়েই সম্পূর্ণ মুক্তি। কারণ-দেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্বিঘ্ন অবস্থায় পঁহুছায় না। দু'টি একটি বাসনার আতিশয্যেও সূক্ষ্ম-দেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ হইতে পারে। কারণ-দেহ গেলেই সে সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দের আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যায়। সেখানে সর্ব্বদাই তার ভগবানের লীলা দর্শন হইয়া থাকে। ইহাকে গোলকধাম—কৈলাস বলে। নাম করিতে করিতে প্রকৃতই এ সব অবস্থা লাভ হয়।"

"শাস্ত্রকর্ত্তারা মুক্তিলাভ বিষয়ে কি সুন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন। গয়ায় পিণ্ডদানে লোকের উপকার হয়। যাহার এ সম্বন্ধে কোন সংস্কার নাই, তাহার উপকার না হইতে পারে। বিশ্বাস অনুরূপ কার্য্যই উপকারী। গয়ায় পিণ্ড দিলে উপকার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। চেহারা

পর্য্যন্ত বদল হইয়া যায়। সূক্ষ্ম-দেহের দর্শনে পুষ্টি হয়, স্থূল-দেহের আহারে পুষ্টি হয়; কারণ-দেহ কেবল লোকের শুভ ইচ্ছায় পুষ্টিসাধন করে। এখানে পুষ্টি শব্দে সন্তোষ বুঝিতে হইবে। গয়ায় পিণ্ড, —দেখিয়া সূক্ষ্ম-দেহের বাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল মনের শুভ ইচ্ছা হইতে কারণ-দেহের নাশ হইয়া থাকে।"

জিজ্ঞাসা করা হইল— এই সাধন যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কি উপকার হইতেছে?— তাঁহাদের সকলেরই মুক্তিলাভ হইবে?

ঠাকুর লিখিলেন— "সকলেই উপযুক্ত সময়ে এই সাধন পাইয়াছেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হইলে, দীনবন্ধু দয়া করেন। অভিমানী দয়ার পাত্র নহে। বাহিরের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে। প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে এ সাধনের উপকারিতা অনুভব করিবে। জন্মান্তরের অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। কার্য্য করুক আর নাই করুক, ভিতরে যে বীজ পড়িয়াছে, তাহাতে সময়ে অবশ্যই ফললাভ করিবে। পূর্ব্বে যে পাপ অতি সহজে করা গিয়াছে, তাহাতে যদি এখন বোধ হয় যে, কে যেন বাধা দিতেছে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এ সাধনে তাহাকে ধরিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল শুভ ইচ্ছা ছিল না, তাহা যদি এখন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা সাধনের ফল বুঝিতে হইবে। এমন কোন কল-কৌশল নাই যে, হাতে হাতে মুক্তি হইবে।"

একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন— পিতৃলোকে সকলেরই কি যাইতে হয়?

ঠাকুর— "যাহাদের কর্ম্ম আছে, তাহাদেরই পিতৃলোকে যাইতে হয়।"

প্রশ্ন—যাহাদের গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন আছে কি?

ঠাকুর— "যাহাদের গয়াতে পিণ্ডদান যথাবিধি হইয়াছে, তাহাদের পুনরায় শ্রাদ্ধ মাটিতে জল ঢালার ন্যায়।"

প্রশ্ন— তবে তর্পণকে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ধরেছে কেন?

ঠাকুর— "নিত্য তর্পণের কথা ভিন্ন; উহা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রত্যেক বংশে এক একজন ক'রে পিতৃদেবতা আছেন। এই তর্পণ করাতে তাঁদের তৃপ্তি হয়। সকলরেই তর্পণ করা বিশেষ প্রয়োজন।"

প্রশ্ন— মৃত্যুর পরে ভূত কাহারা হয়?

উত্তর— "অনেক দিন রোগে ভুগিতে ভুগিতে একটি অবিশ্বাস জন্মে। সাধারণতঃ তাহারাই ভূতযোনী প্রাপ্ত হয়।"

একটি গুরুভ্রাতার অত্যন্ত কঠিন পীড়া হইয়াছিল। সেই সময়ে তাহার কতকগুলি অলৌকিক অবস্থা হইয়াছিল। তাহা ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর লিখিলেন— "পূর্ব্ব শরীরের পুরাতন পরমাণু পরিবর্ত্তনের সময়ে নানাপ্রকার অবস্থা হয়। এই সময়ে কোন কোন দেহে, জ্বরবিকার, কোন কোন দেহে উদরি, কোন দেহে নিউমোনিয়া, এইরূপ অবস্থা হয়। প্রলয় হইতে সৃষ্টি, সৃষ্টি

হইতে প্রলয় যাহা হইবে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। আমার দ্বারভাঙ্গায় ও ঢাকায় এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গায় সাতজন ডাক্তার একমতে বলিলেন, অদ্য ৩ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু হইবে। সেই দিন সন্ধ্যা হইতে আমি উঠিয়া বসিলাম। তিন দিন পরে কলিকাতা আসিলাম। ঢাকাতেও মৃত্যু হইবে বলিয়া ডাক্তার মত প্রকাশ করিল; আমি উঠিয়া বসিলাম।"

ঠাকুরের মমতা।

রাত্রি ৪টার সময়ে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আরম্ভ করিলাম। গতকল্য নিরম্বু করিয়াছি। শরীর দুর্ব্বল, গঙ্গায় আজ যাওয়া হইবে না। প্রতিদিনের মত ১০মিনিট বিশ্রামান্তে ঠাকুর সাড়ে চারটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিলেন। অমনি আলমারী খুলিয়া আমার হাতে একটি পাথরের বাটি দিয়া কতকগুলি রসগোল্লা দেখাইয়া বলিলেন— **"এসব নিয়ে তোমার শালগ্রামকে ভোগ লাগায়ে প্রসাদ পাও।"** গতকল্য ঠাকুরের আলমারীতে রসগোল্লা দেখি নাই। আমার শয়নের পর তিনি আমার জন্য রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছেন। কোলের ছেলের ক্ষুধা পাইলে, মা যেমন কোন দিকে না তাকাইয়া তাকে খাওয়াইতে অস্থির হইয়া পড়েন, ঠাকুরও সেইরূপ আমাকে রসগোল্লা দিয়া উহা তাড়াতাড়ি খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বারংবার বলিতে লাগিলেন—**"শালগ্রামকে নিবেদন করে, প্রসাদ পাওনা!"** আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। গতকল্য নিরম্বু একাদশী করিয়া রহিয়াছি। অথচ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই ঠাকুর আমাকে রসগোল্লা খাইতে পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। মমতাবশতঃ ঠাকুর চিরন্তন প্রথাও মনে হয় ভুলিয়া গেলেন। শৌচ, স্নান, শালগ্রামের পূজা কিছুই হয় নাই। আমি ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী না হই, এই অভিপ্রায়ে বলিলাম— আমি এখনও পায়খানা যাই নাই, স্নানও করি নাই। ঠাকুর শুনিয়া বোধ হয় বুঝিলেন, আমার পায়খানার বেগ হইয়াছে। তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— **"যাও, যাও, পায়খানায় যাও।"** আমিও অমনি নীচে চলিয়া গেলাম। ঠাকুরের ঘরে যে সকল গুরুভ্রাতারা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলে এখনও উঠেন নাই। আমি শৌচান্তে স্নান করিয়া আসনে আসিলাম। শালগ্রামকে স্নান করাইয়া কয়েকটি তুলসী প্রদান করিলাম। পরে রসগোল্লা শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া তন্ময়ধ্যানে উহা ভোজন করিতে লাগিলাম। ঠাকুর এই সময়ে এক-একবার স্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি পরমানন্দে রসগোল্লা খাইতে লাগিলাম। **এই সময়ে ঠাকুরের চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। ঠাকুর চা সেবা করিতে লাগিলেন। আমার চা খাওয়ার অভ্যাস বহুদিনের। কিন্তু তাহা এখানে পাওয়ার জো নাই। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি গুরুভ্রাতাই মাত্র চা পাইয়া থাকেন। আমার চা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। আমি মনে মনে ঠাকুরকে বলিলাম— ঠাকুর! চা এখানে খাওয়ার যখন সুবিধা নাই, তখন খাওয়ার স্পৃহা দয়া করিয়া তুলিয়া নেও। এই সময়ে ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া, পাত্র হইতে বাটি দ্বারা চা তুলিয়া উহা আমাকে নিতে বারংবার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। নিজ হইতে**

২৩শে ভাদ্র,
৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঠাকুর যাচিয়া প্রসাদ দিতেছেন দেখিয়া, পরম সৌভাগ্য জ্ঞানে উহা আমি গ্রহণ করিলাম; এবং খুব আনন্দের সহিত প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। সাধারণ সাধারণ কার্য্যে ঠাকুরের অসাধারণ দয়া, দুর্দ্দৈবদোষে এখন আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা বটে, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় এমন একদিন আমার আসিতে পারে, যখন ঠাকুরের এ সকল কার্য্য স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি লুটাপুটি খাইব।

ঠাকুর মধ্যাহ্ন ১২টার সময়ে আহার করিতে ভিতর-বাড়ীতে গেলেন। আমিও মধ্যাহ্নিক সন্ধ্যা, সমাপন করিয়া নারায়ণ পূজা আরম্ভ করিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে ঠাকুর স্নান আহার করিয়া আসনে আসিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি তাহাতে মন না দিয়া শালগ্রাম পূজা করিতে লাগিলাম।

তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ। স্বপ্নে তত্ত্ব প্রকাশের উপদেশ।

জনৈক গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে নাকি মানুষ সুখী হয়? তত্ত্বজ্ঞানীর প্রধান লক্ষণ কি?'

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন,— **একটি তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলেই চরিত্রে লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সে ব্যক্তি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করিবে না; নিজের প্রশংসা বিষতুল্য বোধ করিবে। বৃক্ষ, লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য সর্ব্বজীবে তাঁর দয়া হইবে। যাহার জীবে দয়া নাই, পরনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা আছে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। বাহিরে অনেক পূজা-অর্চ্চনা, জপ-তপ করিয়াও যদি হিংসা থাকে, তাহা ধর্ম্ম নহে। অহিংসা না হইলে ধর্ম্ম হয় না।**

বিচার বিহীন কখনই হইবে না। দয়াতেও বিচার চাই। যতটুকু সাধ্য ও কর্ত্তব্য ততটুকু মাত্র দয়া করিবে। অতিরিক্ত দয়া করিয়া অনেক বড় বড় সাধু মারা গিয়াছেন। দয়া করিতে যোগীদের খুব বিচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহারা বিষম বিপদে পতিত হইবেন। যোগী যখন দেখিবেন, এই ব্যক্তিকে এই পরিমাণে দয়া করিলে প্রকৃত উপকার হইবে, তখনই তিনি দয়া করিবেন।

কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে নিজেদের উৎকৃষ্ট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া লিখিলেন,—**সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, শেষ রাত্রে একটু নিদ্রা গেলে, সমস্ত বিষয় স্বপ্নে দেখা যায়। দিবা নিদ্রা বিশেষ অপকারী—তাহাতে বুদ্ধিনাশ ও সাধনের অনিষ্ট হয়। রাত্রিতেও নিদ্রা বেশী উচিত নহে। বসিয়া সাধন করিবার সময়ে, কিছুক্ষণ পরে আলস্য তন্দ্রার আর্বিভাব হয়,—তাতে কিছু অপকার করে না। এরূপ বসিয়া বসিয়া যোগনিদ্রায় অনিষ্ট হয় না। তখন অনেক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়,—দর্শন প্রভৃতিও হয়। তবে, জোর করিয়া এরূপ করিবে না। যদি কেহ কখনও কোন স্বপ্নে কোনও তত্ত্বলাভ করেন, তাহা কি প্রকাশ করিতে আছে? যে বলে এবং যে শুনে— উভয়েরই অনিষ্ট। স্বপ্নে কোন আশ্চর্য্য কিছু দেখিলে, গুরু সম্বন্ধে কোন শক্তির কিছু প্রকাশ দেখিলে, তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। সব কথাই কি ঢাক-ঢোল লইয়া**

বাজারে বলিয়া বেড়াইতে হইবে? যতটুকু বিশ্বাস করিবে, ততটুকু ফল পাইবে। ভগবান নিজে আসিয়াও যদি বলেন, 'আমি ভগবান আসিয়াছি' তাহা হইলেও সন্দিগ্ধ আত্মা সে কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। স্বপ্নের কথাই যদি বিশ্বাস করিত, তবে এতদিনে সকলে উদ্ধার পইত। কেহ কিছু বিশ্বাস করে না। পূর্ব্বে অনেকানেক স্বপ্ন দেখান হইত। দেখিতে পাই, কেহ কিছু বিশ্বাস করে না। এ জন্য এখন আর দেখান ঠিক মনে হয় না। বিশ্বাসের কেহ কিছু পাইলে, তাহা প্রকাশ করিলে অবিশ্বাস আসে; এবং তজ্জন্য ভুগিতে হয়। স্বপ্নে কেন, প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কেহই কিছু বিশ্বাস করিতেছেন না, বলিলেও বিশ্বাস হয় না।

দেব দেবী কল্পনা নয়। সাধনের সপ্ত সোপান। ত্রিবিধ কর্ম্ম। উদ্ধারের উপায়।

ঠাকুরকে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'কালী, দুর্গা প্রভৃতি কি কল্পনা, না, সত্য সতাই কিছু?' ঠাকুর লিখিলেন,— " এ সমস্ত কিছুই কল্পনা নহে। সাধনের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সাধকেরই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রথম ব্রহ্ম, দ্বিতীয় আত্মা, তৃতীয় ভগবান। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য সমস্তই ব্রহ্মময় দর্শন করেন, —সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সে দেখিতে পায় যে, সে কোন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা চালিত হইতেছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সেই শক্তিতে ব্যাপ্ত এবং চালিত হইতেছে। ইহার পরেই ভগবৎ দর্শনেই অবস্থা লাভ হয়। তখন ব্রহ্মের লীলা দর্শন হইতে থাকে;— কালী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবতা প্রত্যক্ষ হয়,—রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ দৃষ্টিগোচর হন। সমস্ত ঋষিগণ এবং কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি অবতার ও সাধকগণ ইহার প্রমাণ দিতেছেন। ইহা জল্পনা-কল্পনা নহে।"

প্রশ্ন— 'মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব কি প্রকারে ক্রমোন্নতি লাভ করে?'

ঠাকুর লিখিলেন— নূতন মনুষ্যজন্ম—তাহারা কুকি, ভীল প্রভৃতি নিরক্ষর বন্য লোকের মধ্যে দশ জন্ম পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে;—পরে নিকটবর্ত্তী লোক-সমাজে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ অনেক জন্ম পরে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। বিষয়জ্ঞান প্রথম জন্ম হইতেই লাভ হইতে থাকে। মনুষ্যের মধ্যে জড়ত্ব, বৃক্ষত্ব, জীবত্ব, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, একত্ব ও রস।—মনুষ্যের এই সমস্ত সোপান, অথবা সপ্ত ভূমি। যেরূপ ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ প্রকাশিত হয়; মনুষ্যাত্মা সেইরূপ প্রথম প্রথম সপ্তসোপান আরোহণ করিয়া, 'রসোবৈ সঃ' এই শব্দ সর্ব্বদা গান করে।

প্রশ্ন—'সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্ম কাহাকে বলে? কি উপায়ে এই সকল কর্ম্ম কাটাইয়া জীব উদ্ধার হয়?'

ঠাকুর— চৌরাশি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া একবারই মনুষ্য হয়। সেই জন্মে যে কর্ম্ম করে তাহাকে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান বলে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শেষ করিতে অনেকবার জন্ম

মৃত্যু হয়; তাহা মানব জন্মের ঘটনা মাত্র। এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ,— এই ত্রিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া মায়া হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি ভগবানের ভজন পূজন না করে—তবে পুনর্ব্বার অধোগতি আরম্ভ হইয়া পুনঃ চৌরাশি লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিতে থাকে। মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে ও বলার মত বলে, ডাকার মত ডাকে, অর্থাৎ যেমন শিশু মা শব্দ শুনে, মা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মা শিশুর নিকট দৌড়িয়া আসেন।

শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে আদেশ—না পারায় ঠাকুরের ভরসা দান।

গতকল্য শালগ্রাম পূজার সময়ে একবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—ধ্যানটি কোথায় রাখিব? ঠাকুর বলিলেন,— "শালগ্রামে।" এতকাল আমি নাভিমূলে ধ্যান করিয়া আসিয়াছি। এখন আমার ইচ্ছা হয়, সময়ে সময়ে হৃদয়ে ধ্যান করি। যাহাতে হৃদয়ে ধ্যান করিতে অনুমতি পাই, তাহারই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। শালগ্রামে ধ্যান রাখার কথা শুনিয়া, আজ তাহা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন প্রকারেই চিত্ত নিবেশ করিতে পারিলাম না। বারংবার আপনা আপনি অজ্ঞাতসারে নাভিচক্রে ধ্যান আসিতে লাগিল। বারংবারই আবার শালগ্রামে মন স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই প্রকার পুনঃপুনঃ চেষ্টায় অতিশয় শ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা এই প্রকার চেষ্টা যত্নেও শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে অসমর্থ হওয়ায়, ঠাকুরের উপর ক্রোধ জন্মিল। ধ্যান-ধারণা, পূজা-অর্চ্চনা কিছুই হইল না। মনে হইতে লাগিল যেন ভিতরের একটা নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল। ঐ সময় এক একবার ভিতরের অসহ্য জ্বালায় ও বিরক্তিতে কান্না আসিয়া পড়ল। কখনও বা ধ্যান ছাড়িয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনে করিলাম চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ঠাকুরের নিকট যা' তা' কল্পনা করিব। ঠাকুরকে না ভাবিয়া, সহজে যাহা ভাবিতে পারি শালগ্রামে তাহাই ভাবিব। ঠাকুর যেমন আমার অন্তরের বস্তু লইয়াছেন, ঠাকুরকেও আমি তেমনই স্থানভ্রষ্ট করিব,— তাঁহার আসনে স্ত্রীমূর্ত্তি বসাইব,—শিলাচক্র হইতে ঠাকুরকে সরাইব। আবার মনে হইল, এত গোলমালের প্রয়োজন কি? শালগ্রামটিকে একটা আঘাতেই চুরমার করিয়া ফেলি না কেন? এই ভাবিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, দাঁত কড়মড় করিতে লাগিলাম; এবং হরিদ্বারের পাথরটি হাতে লইয়া ঘা মারিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু ভিতরে অকস্মাৎ বাধা পাইয়া বিরত হইলাম। তখন ভাবিলাম, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা যাউক্—'হৃদয়ে বা আবার নাভিতে ধ্যান করিতে পারি কি না? শালগ্রামে ধ্যান আমা দ্বারা হইবে না।' এই সময়ে ঠাকুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইলেন। আমার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভিতরের জ্বালায় মাথা অত্যন্ত গরম হইয়াছিল। মাথায় যন্ত্রণা এবং সর্ব্ব শরীর 'ছন্ছন্' করিতেছিল। ঠাকুর আমার দিকে স্নেহ-দৃষ্টি করিয়া আমাকে কথা বলার অবসর দিলেন। আমি অর্দ্ধ কান্নার স্বরে বলিতে লাগিলাম—বিস্তর চেষ্টা করিয়াও আমি শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে পারিতেছি না। শালগ্রামে ধ্যান রাখিতে না পারায় আজ আমার পূজা হইল না। দিনটা আমার বৃথা গেল, মনে হইতেছে। আর নাভিচক্রে ধ্যান ছাড়িয়া, শালগ্রামে ধ্যানের চেষ্টায় যেরূপ কষ্ট পাইয়াছি,—জীবনে এমন কষ্ট

কখন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয় যেন প্রাণের একটা বস্তু আপনি ছিঁড়িয়া নিয়াছেন।

ঠাকুর বলিলেন— "প্রথম প্রথম শালগ্রামে ধ্যান রাখ্‌তে পার্‌বে কেন? শালগ্রামে ধ্যান করার অবস্থা অনেক পরে হয়। শালগ্রামে ধ্যান কর্‌তে না পার্‌লে ভিতরেই ধ্যান করো। শালগ্রামে ধ্যান করার চেষ্টা ধীরে ধীরে কর্‌তে কর্‌তে পরে ক্রমে ঠিক হ'য়ে যাবে।" একটু পরে ঠাকুর লিখিলেন—"শালগ্রাম পূজা বড় কঠিন। কারণ মূলাধার প্রভৃতির কেবল একচক্রে সহজে মন স্থির করা যায়, কিন্তু শালগ্রাম চক্রে মন স্থির করা সহজসাধ্য নহে। সাধক দৃষ্টি সাধন অর্থাৎ যোগ অভ্যাসের পর শালগ্রাম চক্র ভেদ করিতে পারিলে, এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তখন প্রত্যেক পরমাণুতে বিষ্ণু দর্শন করা যায়। এই কারণে প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ শালগ্রাম চক্র পূজা ও ধ্যান করিয়া আসিতেছেন।"

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমি সুস্থ হইলাম। হৃদয়ে বা দেহস্থ অন্য কোন চক্রে ধ্যান করা অপেক্ষা শালগ্রামে ধ্যান করা উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ ও শক্ত জানিয়া, শালগ্রামেই ধ্যান যেন করিতে পারি এই ইচ্ছা হইল। কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হইবে? চেষ্টা সাধ্যে তো কুলায় না।

ঠাকুরের দয়ায় শালগ্রামে ধ্যান ও তাহাতে আনন্দ।

অদ্য মধ্যাহ্নে শালগ্রাম পূজার সময়ে একবার ভাবিলাম, ধ্যানটি কোথায় রাখি! শালগ্রামে ধ্যান রাখা তো হয়ই না, কিন্তু উহাই নাকি উৎকৃষ্ট। সুতরাং নাভিচক্রে ধ্যান করিলেও, সময় সময় দু'পাঁচ মিনিটের জন্য শালগ্রামেও দৃষ্টি করিব। তারপর ঠাকুর যখন হয় করাইয়া নিবেন। আমার চেষ্টা-যত্নে কিছুই হইবে না। এই স্থির করিয়া শালগ্রামকে প্রণামান্তর, উহাতে যেন ধ্যান রাখিতে পারি,—ঠাকুরের চরণে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া শালগ্রামে দৃষ্টি করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের আশ্চর্য্য দয়া দেখিলাম। ঠাকুরকে শালগ্রামে একবার ভাবিয়া, যেমনই উহাতে ধ্যান রাখিতে চেষ্টা করিলাম, ঠাকুরের অপরিসীম কৃপায় উহাতে যেন নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম;—চক্ষু আর অন্যদিকে আনিতে পারিলাম না। মনটি শালগ্রামের ভিতরে ঠাকুরের রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়িল;—অন্য কোন দিকে টলিল না। একইভাবে তিনটি ঘণ্টা আমার কাটিয়া গেল। আমি এই অবস্থা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। নাভি বা হৃদয়ের দিকে সময় সময় তখন ইচ্ছা করিয়া দৃষ্টি দিতে লাগিলাম; কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে আর ভাল লাগে না। শালগ্রামেই অধিক আনন্দ। বুঝিলাম, ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে দয়া করিলেন। কল্য যেভাবে ধ্যানের চেষ্টায় আমার মাথা ধরিয়াছিল, শরীর গরম ও মন অত্যন্ত উদ্বেগে অস্থির হইয়াছিল, আজ অনায়াসে আপনা-আপনি তাহা হইয়া গেল; কোন চেষ্টাই করিতে হইল না। ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? আমি ঐ সময়ে ঠাকুরের চরণে নমস্কার করিয়া মনে মনে একান্তভাবে বিশ্বাস ও প্রেম প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের পাশে বসিয়া শালগ্রামে ঠাকুরের পূজা—এ যে কত আনন্দ, তাহা বলিতে পারি না। পূজার সময়ে ঠাকুর আমার পানে সময়ে সময়ে আড়-চোখে তাকাইতে লাগিলেন। সে সময়ে ঠাকুরের চোখের ও মুখের যে কি শোভা তাহা প্রকাশ করা যায় না। কখন কখন দু'এক সেকেণ্ডের জন্য চোখে চোখ পড়াতে

২৪শে ভাদ্র।

আমি একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম! আমি উচ্ছ্বাস কোন প্রকারে চাপিতে পারিলাম বটে কিন্তু অশ্রুনীরে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম।

এইভাবে ৩টা পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিব উদ্যোগ করিতেছি, ঠাকুর ইঙ্গিতে আমাকে বলিলেন— "শালগ্রাম পূজা শেষ হ'লে তুমি স্তব পাঠ কর না? নমস্কার মন্ত্র প'ড়ে শালগ্রামকে নমস্কার কর না?" আমি কহিলাম— এখানে উচ্চৈঃস্বরে স্তব পড়িতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ঠাকুর বলিলেন— "শালগ্রাম পূজা ক'রে উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ ক'রো, আর নমস্কার মন্ত্র প'ড়ে শালগ্রামকে নমস্কার ক'রো, এতে সঙ্কোচ ক'রো না।" শালগ্রাম পূজার পর মনে মনে 'নমস্তে সতে তে' ইত্যাদি স্তব আমি প্রতিদিনই পড়িয়া থাকি, কিন্তু নমস্কার মন্ত্রটি অনেক সময় মনে থাকে না। আমার মনে হইল উহা পড়িয়া শালগ্রামকে নমস্কার করিতেই ঠাকুর আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। হরিদ্বারে যাওয়ার পূর্ব্বে ঠাকুর গেণ্ডারিয়ায় একদিন একটি নমস্কার মন্ত্র স্বহস্তে লিখিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন— "রাত্রে শয়নকালে এবং ঘুম হ'তে উঠ্‌বার সময়, সাধন কর্‌তে ব'সে এবং সাধনের পর উঠ্‌বার সময় ভগবানকে স্মরণ ক'রে এই মন্ত্র প'ড়ে নমস্কার ক'রো। ভগবৎবুদ্ধিতে যেখানে যখন নমস্কার কর্‌বে এই মন্ত্র প'ড়ে ক'রো। ভগবানের অন্তর্দ্ধানকালে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঋষি, মুনি, দেব-দেবী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী এই মন্ত্র প'ড়ে ভগবানকে নমস্কার ক'রেছিলেন। এই মন্ত্র প'ড়ে ভগবানকে নমস্কার কর্‌লে— সেই নমস্কার ভগবানের চরণে পৌঁছাবে এরূপ বর আছে।" এই বলিয়া ঠাকুর স্বহস্তে লিখিত নমস্কার মন্ত্রটি আমাদিগকে দিলেন এবং গুরুভ্রাতাদের সকলকে ইহা জানাইতে বলিলেন। মন্ত্রটি এইঃ—

আমি মন্ত্র পড়িয়া শালগ্রামকে নমস্কার করিলাম।

আমি মন্ত্র পড়িয়া শালগ্রামকে নমস্কার করিলাম।

চারিদ্বার রক্ষার উপায়।

অপরাহ্ন ৪টার সময়ে গুরুভ্রাতারা আসিয়া ক্রমে ক্রমে হলঘরটি পরিপূর্ণ করিলেন। বাহিরেরও অনেক লোক আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অহরহ পাপ-সঞ্চয় করি, কি উপায়ে তাহা সংযত রাখা যায়? ঠাকুর লিখিয়া দিলেন—

১। যে ব্যক্তি, অক্ষঃক্রীড়া, পরস্বাপহরণ ও নীচ জাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না—তাঁহার হস্ত-দ্বার রক্ষিত হয়।

২। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাবী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যা বাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন—তাঁহার বাক্-দ্বার সুরক্ষিত হয়।

৩। যে ব্যক্তি অতি ভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহ রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিত আহার ও প্রতিনিয়ত সাধুগণের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠর-দ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

৪। যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্বে সম্ভোগের জন্য অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ ও পরস্ত্রী-গমন না করেন, এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় স্ত্রী-গমন না করেন তিনি উপস্থ-দ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

যে মহাত্মা ঐরূপে চারিদ্বার রক্ষা করিতে পারেন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া গণ্য করা যায়। যাঁহার ঐ চারিদ্বার রক্ষিত না হয় তাঁহার সমস্ত কার্য্য বিফল হয়।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আহারে ভিন্ন রিপুর উত্তেজনা।
আহারে ধর্ম্মের যোগ।

জিজ্ঞাসা করা হইল, কি কি বস্তু আহারে কোন্ কোন্ রসে কোন্ কোন্ রিপু বৃদ্ধি হয়? রিপুদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, আমাদের আহারাদি বিষয়ে কি নিয়মে চলা উচিত?

ঠাকুর লিখিলেন— বালক শৈশবে নিজে মলত্যাগ করিয়া নিজে ভক্ষণ করে, এবং অতি আনন্দে হাস্য করে; কিন্তু পিতা-মাতা ঘৃণায় নাকে হাত দেন। সেই প্রকার ক্রোধী যদি লঙ্কা সর্ষপ পিত্ত বৃদ্ধিকর, উত্তেজক বস্তু ভোজন করে; কামুক যদি মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মধু এবং মিঠাই ইত্যাদি খায়; লোভী যদি অধিক তিক্ত খায়; অহঙ্কারী যদি অধিক মসুরের ডাল খায়; সংসারমোহে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অম্বল খায়; অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়; তাহা হইলে ঐ শিশুর ন্যায় আহার করা হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ দেখিয়া অবাক্ হন।

মৎস্য, মাংস, অধিক লঙ্কা, অধিক সর্ষপ, অধিক অম্ল, অধিক মিষ্ট, মধু, ক্ষীর, ইত্যাদি এই সমস্ত আহার এবং মসুর ডাল মাসকড়াই, এ সকল কামোদ্দীপক। কাম-ক্রোধ মনের কার্য্য। মনের শারীরিক পরিণতি। যাহতে শরীরের উত্তেজনা হয় এমন বস্তু আহার না করা ভাল। আহার যাহা অভ্যস্ত তাহা হঠাৎ ত্যাগ করা উচিত নয়। যাঁহারা অধিক লঙ্কা খান, হঠাৎ লঙ্কা ছাড়িলে

পীড়া জন্মে। এ সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতি উত্তম। শুশ্রুত, চরকে অভ্যস্ত আহার কিরূপ এবং রোগ বিনিশ্চয় গ্রন্থ—(যাহাকে নিদান বলে, তাহার টীকা—বিজয় রক্ষিতের টীকাতে) অভ্যস্ত পথ্যাপথ্যের বিষয় লেখা আছে। এ বিষয় অন্য শাস্ত্রে লেখা নাই।

আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ আছে। কারণ, শরীর ও আত্মা একত্র আছে। এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্কা খায় না, তাঁহাকে লঙ্কা দিলে সমস্ত দিন শরীরে জ্বালা হইবে, ধর্ম্মসাধন রহিত হইবে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—মৎস্য আহারে কি অপরাধ হয়?

ঠাকুর লিখিলেন— "যাহার যাহা আহার তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু যদি আমার মনে মৎস্য মাংস আহার দোষ জ্ঞান হয় তবে ত্যাগ করিতেই হইবে।

কাম-ক্রোধ অধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে।

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও লিখিলেন— কাম-ক্রোধ অধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতির মধ্যে থাকিত না। কাম-ক্রোধের অবৈধ ব্যবহারই পাপ। যাহার প্রকৃতি যেরূপ, সে তদনুরূপ কার্য্য করে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির তিনটি অবস্থা। এই তিন অবস্থা যতদিন থাকিবে, তাহার সহিত সংগ্রাম হইবে। কাম-ক্রোধ যদি বৈধভাবে চালিত হয় তাহা অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করে, তাহাতে শত শত নরহত্যা হয় তথাপি তাহা অধর্ম্ম নহে। যতদিন কাম-ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে। মনে উদয় হইলেই অপরাধী নহে। মনে উদয় হইলে যদি নিবারণের চেষ্টা করি, তাহা হইলে পাপ নহে। তাহাতে ইচ্ছা পূর্ব্বক, আনন্দসহ যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে। যতদিন ত্রিগুণের অধীন থাকিব, ততদিন গুণ অনুসারে আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে। যদি তোমার ভগবানের নাম অবলম্বন থাকে, তবে ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইতে থাকিবে। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে। মনুষ্য সমাজ যাহা পাপ-পুণ্য স্থির করিয়াছে ভগবান তাহার দ্বারা তাহা দেখিয়া সে ভাবে বিচার করেন না;—তিনি মনুষ্যের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

নিমের পাতায় উত্তেজনা কমে। রোজ ৩টি কোমল নিমপাতা চর্ব্বণ করিয়া অল্প একটু জল খাইতে হয়।

শালগ্রাম আরতির আদেশ। কাম ও প্রেম।

বিকালে ঘড়ি দেখিয়া ঠাকুর আমাকে রান্না করিতে যাইতে বলিলেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যে উনন ধরান, রান্না, হোম, আহার ও ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা সমস্ত করিতে হইবে। আমি ভিতর-বাড়ী যাইয়া দিদিমার নিকট হইতে ডাল, চাউল নিয়া উনন ধরাইয়া রান্না করিলাম। পরম তৃপ্তিতে আহার করিয়া, বাসন মাজিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে

ঠাকুর আমাকে শালগ্রামের আরতি করিতে বলেন। আরতির সরঞ্জাম আমার কিছু নাই, সুতরাং ধূপধুনা দিয়া সাধারণভাবে শালগ্রামের আরতি করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তনের পর ঠাকুর— "**'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।' হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'** 'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ'।। —এই ৩টি শ্লোক পাঠ করিয়া '**হরিবোল হরিবোল হরিবোল**' বলিয়া হরিলুটের বাতাসা স্বহস্তে ছড়াইয়া দিলেন। প্রসাদ পাইয়া গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া সৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। কাম সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন উঠিল। ঠাকুর লিখিলেন–– "**কাম শারীরিক গুণের সামিল। বহির্ম্মুখ থাকিলেই কাম, শরীর হইতে বিছিন্ন হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া পড়িলেই প্রেম। তখন আত্মার অঙ্গ অথবা আত্মা। শারীরিক গুণ সহজে ছাড়েনা। আহার সংযম একমাত্র ব্যবস্থা। যাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম করেন তাঁহারা, এ নিয়ম পালন করিতে পারেন না। কিন্তু বিষয়-কর্ম্ম না থাকিলেও বাসনা, কামনা, পাপ যায় না।**"

রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে ঠাকুর আমাকে শয়ন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ঠাকুরের চরণতলে শয়ন করিলাম।

দৈনিক কার্য্য।

এবার আসিয়া দেখিতেছি, ঠাকুর ৪টার সময়ে একবার শয়ন করেন মাত্র। সাড়ে চার ফুট আসনের উপরে ঠাকুর হাত পা ছড়াইয়া লম্বা হইয়া শোন না; দক্ষিণ পার্শ্বে কাত হইয়া পা দু'টি গুটাইয়া লয়েন এবং উত্থিত বাম পদের উরু এবং হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পদের পাতা স্থাপন পূর্ব্বক, ডান হাতের বাহুপরি মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করেন। এই একই ভাবে শয়ন, গেণ্ডারিয়া হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এক দিনের জন্যও অন্যপ্রকার দেখি নাই। গেণ্ডারিয়ায় ঠাকুর ৪টার সময়ে অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য শয়ন করিতেন। তখন কিছুক্ষণ নিদ্রিত হইতেন। ট্রেনের শব্দ পাইয়া ঠিক সাড়ে চারটার সময়ে আসনে উঠিয়া বসিতেন; কিন্তু, এখন ঠাকুর নিদ্রিত হন বলিয়া মনে হয়না। কারণ, ঘড়িধরা ঠিক ১০মিনিট পরেই নিজ হইতে আসনে উঠিয়া বসেন, এবং ভোরকীর্ত্তন করতাল বাজাইয়া করিতে থাকেন। ঠাকুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে আমি নীচে চলিয়া যাই। শৌচান্তে গঙ্গায় জগন্নাথ ঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ করিয়া বাসায় আসি। রাস্তায় এক ভদ্রলোকের বাগান হইতে ফুল-তুলসী শালগ্রামের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনি। সাতটা হইতে সাড়ে সাতটার মধ্যে ঠাকুর চা সেবা করিয়া থাকেন। আমি চা বহুকাল যাবৎ খাইয়া আসিতেছি; কিন্তু এখানে চা চাহিলে পাইব না, ইহা বুঝিয়াই বুঝি ঠাকুর দু'একবার চা মুখে দিয়া নিজ পাত্র হইতে প্রায় অর্দ্ধেক চা আমাকে ২/৩ দিন দিলেন। গুরুভ্রাতারা মহামুস্কিলে পড়িলেন। ঠাকুর আমারই জন্য পরিমাণের কম, চা সেবা করেন ভাবিয়া গুরুভ্রাতারা আমাকে অগত্যা চা দিবেন স্থির করিলেন। ঠাকুরকে চা দিয়া আমার চা আনিতে একটু বিলম্ব হইলেই ঠাকুর আমাকে

৪১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

চা দিয়া ফেলেন—ইহা দেখিয়া সকলেই আমার উপর অতিশয় বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন, এবং ঠাকুরকে চা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকেও চা দিতে লাগিলেন। আমার চায়ের ব্যবস্থা করিতে ঠাকুরের এই কৌশল দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। চা পানের পর ন্যাস সমাপন করিয়া শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করি। ঠাকুরের নিকট 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি' গ্রন্থ পাঠ হইতে থাকে। এই পাঠ প্রায় এক ঘণ্টাকাল হয়। তৎপরে ঠাকুর 'গ্রন্থসাহেব' ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ করেন। এই পাঠ বড়ই মধুর। এগারটার সময়ে ঠাকুর ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান। শৌচান্তে স্নান করিয়া প্রায় ১২টার সময়ে আহারে বসেন। দিদিমা, শান্তি ও কুতুবুড়ি মাত্র আহারের সময়ে ঠাকুরের নিকট থাকিতে পারেন। ১২টার পরে আসনে বসিয়া ঠাকুর ৩টা কখনও বা ৪টা পর্য্যন্ত একই ভাবে অবস্থান করেন। এই সময়ে ঠাকুরের গণ্ড বাহিয়া তৈলধারার ন্যায় অশ্রুবর্ষণ হইয়া থাকে। প্রায় ৪টার সময়ে গুরুভ্রাতাগণ ও সহরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সকল আসিয়া পড়েন। তাহাদের সঙ্গে ঠাকুর আকারে-ইঙ্গিতে আলাপাদি করিতে থাকেন। আমার রান্নার সময়টি কিন্তু, ঠাকুর কখনও ভোলেন না। ঘড়ি দেখিয়া প্রত্যহই বলেন,— **"ব্রহ্মচারী। তোমার সময় হ'য়েছে, রান্না কর্‌তে যাও।"** আমি অমনি রান্না করিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাই। উনন ধরাইয়া ভাতে সিদ্ধ ভাত রান্না করিতেও এক ঘণ্টার কমে হয় না। তৎপরে হোম, আহার, বাসন-মাজা প্রভৃতি শেষ করিতে নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায় অতিবাহিত হইয়া যায়। কুতু আমাকে ডাল কখন বা তরকারী রান্না করিতে জেদ করে। আমার সময়ে তাহা কুলায় না দেখিয়া, ৪টার সময় উননটি ধরাইয়া রাখে। রান্নার সামগ্রী সকলও প্রায়ই সংগ্রহ করিয়া দেয়। কুতুব আসাধারণ সহানুভূতি ও মমতায় দিন দিন উহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি।

আহারান্তে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর তখন আমাকে শালগ্রামের আরতি করিতে বলেন। আমি ধূপধুনা জ্বালাইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে ত্রিদীপ দ্বারা শালগ্রামের আরতি করি। আরতি শেষ হইলে সন্ধ্যা-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। আমিও বারান্দায় যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করি। সংকীর্ত্তনের গোলমালে সন্ধ্যা ঠিকমত হয় না। বড়ই বিরক্তি বোধ হয়। সংকীর্ত্তন প্রায় দেড় ঘণ্টায় শেষ হইয়া যায়। আমি তখন নিজ আসনে আসিয়া বসি। রাত্রি ৯টা হইলেই ঠাকুর আমাকে শয়ন করিতে ইঙ্গিত করেন। ঠাকুরের আহারের পূর্ব্বেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়ি। গুরুভ্রাতারা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গ করিয়া আপন আপন আবাসে চলিয়া যান। কেহ কেহ ঠাকুরের ঘরেই শয়ন করেন।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে আমি জাগিয়া পড়ি। তখন হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসি এবং একখানা বড় পাখা হাতে লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে থাকি। ঠাকুর এই সময়ে একবার শৌচে যান। এই সময়ে প্রায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক আলাপ হয়, গল্প হয়, নানা প্রশ্নের মীমাংসা হয়। নিজ হইতে ঠাকুর সমাধি অবস্থায় যাহা যাহা বলেন তাহা শুনিয়া থাকি। তৎপরে রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জলপান করেন। পরে ৪টার সময়ে আসনে কাত হইয়া ১০মিনিটের জন্য বিশ্রাম করেন।

গুরু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

আজ অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি গুণের অধীন? আমার মনে মনে এই ভাব ছিল যে, সদ্‌গুরুর আশ্রিত ব্যক্তিরা সদ্‌গুরুরই অধীন, অন্য কিছুরই অধীন নয়—ঠাকুর এই প্রকারই বলিবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুর লিখিলেন,— **"হাঁ, সকলেই গুণের অধীন। গুরুর অধীন মানুষ অনেক পরে হয়। অতি অল্প লোকেই গুরুর অধীন।"** একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি প্রকারে চলিলে গুরুতে বিশ্বাস জন্মে? ঠাকুর লিখিলেন— **"গুরুতে বিশ্বাস হওয়া অতি কঠিন। বিশ্বাস হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিলে—বিশ্বাস হইবে, মনে হইল; আশ্চর্য্য দেখিলাম, তখন মনে হইল, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যদি বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য দেখিলাম, মনে হইল, এ লোকটা ভেল্কি জানে। আমাকে ভেল্কি দেখাইতেছে। এই উপায়ে বিশ্বাস হয় না। একজন বসিয়া, সেই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, ঘরে সেই বেড়ায়, একই সময়ে এইরূপ বিবিধ ঘটনা—সাধারণ মনুষ্যকে দেখাইলে কি বুঝাইলে, বুঝে না। এ জন্য নিজে সাধারণ লোকের মতই চলিবে, নতুবা গোলমাল হয়। এ সকল বিষয় গোপন রাখাই ভাল। খুলে বলা ভাল নয়। বিশ্বাস হইবার একমাত্র পথ এই,—গুরু যাহা উপদেশ দেন তাহা আচরণ করা। আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ হইলেই, বিশ্বাস হইবে।"**

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন— ভগবানের উপসনা করিতে কি গুরুর একান্তই প্রয়োজন? গুরু ছাড়া কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না?

ঠাকুর লিখিলেন—**"মানব-জীবনে যাহা কিছু শিক্ষা করি, তাহাতেই গুরুর প্রয়োজন। সংসারের মধ্যে যাহা দর্শন করি, শ্রবণ করি, ঘ্রাণ করি, স্পর্শ করি, আস্বাদ করি, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিয়াও যদি সেই সমস্তের তত্ত্ব জানিতে হয়, তবে ঐ সকল বিষয় যিনি অবগত আছেন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে হয়। সেইরূপ ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, জগৎ আছে—এগুলি সহজজ্ঞানে সকলেই জানে। যদি কেহ সহজজ্ঞানে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার উত্তর জানিতে চান, তবে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্ ভিন্ন অন্য পণ্ডিত ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দানে অধিকারী নহেন। এজন্য গুরু ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।**

ঠাকুর আবার লিখিলেন—**"হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় প্রায় লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩জন যথার্থ তত্ত্বদর্শী। আর সকলে বেশভূষা-সম্প্রদায় ও মতামত লইয়া ব্যস্ত। ঐ তিনজনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সাধুরা এত কঠোরতা করিয়াও তত্ত্বলাভ করেন না কেন?' তিনি হিন্দিতে বলিলেন—'বাবা, আমি ক্ষুদ্র কীট কি বলিব?' অনেক ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে বলিলেন—এখন কেহ ভগবানকে চায় না। মান, মর্য্যাদা, মহান্তগিরি চায়। তাহা পায়। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।"**

প্রশ্ন— কি প্রকারে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়? সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে উপকার হয় না? তাদের বাক্যে তো বিশ্বাস হয় না?

ঠাকুর— **"বেদবেত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মেতে শান্তিলাভ করিয়াছেন—এইরূপ গুরুকে অবলম্বন করিবে। যিনি ব্রাহ্মণ, বাসনাহীন, সমস্ত রিপু যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার সমস্ত শরীর নির্ম্মল অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে গরিষ্ঠা ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন—এমন গুরুকে আশ্রয় করিবে।"**

ঠাকুর আবার লিখিলেন— **"যাঁহারা যথার্থ মহাজন, তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হইবে। লোকের মুখে শুনিয়া যে অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক কি সাধু, তাহাতে উপকার হয় না। বিশেষতঃ প্রকৃত সাধু কে, তাহা শুনিলে বুঝা যায় না। এজন্য পূর্ব্বপুরুষদিগের পথে চলিতে চলিতে প্রকৃত সাধুর সহিত দেখা হইলে সকল দিকে নিরাপদ্। প্রত্যেক গুরুরই বাক্যের সহিত একটা না একটা শক্তি আছে; বিশ্বাস পূর্ব্বক করিলে তাহা নিশ্চয়ই কার্য্য করিবে। গুরুবাক্য বোধ হইয়াও বিশ্বাস হয় না। প্রত্যেক বাক্যে বিশ্বাস হওয়া,—পূর্ব্বজন্মের সাধনের সঙ্গে বিশেষ যোগ আছে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ঋষিবাক্যের বিরুদ্ধে উপদেশ যিনি দেন তিনি আর্য্য, ঋষি-শাস্ত্র মতে গুরু নহেন।**

জিজ্ঞাসা করা হইল— গুরুর নিকট নাকি অন্যের পূজা করিতেই নাই?

ঠাকুর লিখিলেন— **"গুরুর অনুমতি থাকিলে করিতে পারে। গুরুতে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান দর্শন হইলে, পৃথক্ স্থানে গুরু ভিন্ন পূজা নিষেধ।**

আজ বহুক্ষণ ধরিয়া গুরু বিষয়ে আলোচনা হইল। ঠাকুরকে শালগ্রামে পূজা করি, ঠাকুরেরই আদেশমত। না হ'লে শিববাক্যমতে আমার নরক হইত—

"গুরু সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্য দেবতাং।
স যাতি নরকে ঘোরে সা পূজা বিফলা ভবেৎ।।"

ঠাকুরের মৌন থাকা সম্বন্ধে অভিমত।

২৫শে—৩০শে ভাদ্র,
৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া দেখিতেছি, বিস্তারিত ডায়েরী লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। উদয়াস্তের মধ্যে ১৫ মিনিট সময়ও আমি অবসর পাই না। বিকালে ও রাত্রে ঠাকুরের যে সকল অমূল্য উপদেশ শুনিয়া থাকি, পেন্‌সিল দ্বারা আল্‌গা কাগজে তাহা লিখিয়া রাখি। কিন্তু দিন তারিখ অনেক সময় জানা না থাকায়, ঠিকমত সুশৃঙ্খলভাবে, তাহা ডায়েরীতে তুলিয়া নেওযা যাইতেছে না। সুতরাং উপদেশ ও ঘটনা ঠিক ঠিক হইলেও, সময়ের ওলট্-পালট্ অনেক স্থলে হওয়ার সম্ভাবনা। মধ্যাহ্নে শৌচ, স্নান ও ভোজনার্থে ঠাকুর যখন ভিতর-বাড়ী যান, তখন অবসর ও নির্জ্জন পাইয়া আল্‌গা কাগজের লেখা ও ঠাকুরের লিখিত খাতার নকল, যথাসাধ্য করিতেছি।

পরমারাধ্য পরমহংসজীর আদেশ মত ঠাকুরের মৌন থাকার কাল বহুদিন হয় অতীত হইয়াছে। ঠাকুর এখনও কেন মৌন আছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় লিখিলেন— **"মৌন থাকিতেই ভাল লাগে। কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।"** দিনের বেলা ঠাকুর সকলরেই কথার উত্তর সাদা খাতায় পেন্‌সিলে লিখিয়া দেন। রাত্রে অস্ফুটস্বরে, কখন বা আমাদের মত পরিষ্কার ভাবে কথা বলেন।

সুতরাং ঠাকুরের লিখিত ভাষা ও মুখের উপদেশ যাহা লিখিয়া রাখিতেছি, একপ্রকার হইতেছে না। আমরা ঠাকুরের একটি মুখের কথা শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইলাম মনে করি। আবার অনেকে ঠাকুরের মৌনাবস্থাই আকাঙ্ক্ষা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে দিন আসিয়া ঠাকুরের লেখা খাতা পড়িয়া বলিলেন— "গোঁসাই যদি আরও কিছুকাল মৌন থাকেন, বড় কল্যাণ হয়,— আমরা অনেকগুলি নূতন জিনিষ পাইব। গোঁসাই মৌনই থাকুন। এই খাতা অপূর্ব্ব একখানা গ্রন্থ হইবে।"

শালগ্রামের ঘর্ম্ম। শালগ্রাম পূজায় সাধারণের বিদ্বেষ।

আজ উনন ধরাইয়া রান্না করিতে একটু বিলম্ব হইল। যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারিব না ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং, আগুন আগুন খিচুড়ি শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া অমনি কৌটায় বন্ধ করিলাম। প্রতিদিনই ভোগ নিবেদনের পর শালগ্রামের সম্মুখে ধূপধুনা জ্বালাইয়া একটু সময় বসিয়া থাকি। আজ আর তাহা করিতে অবসর পাইলাম না। তাড়াতাড়ি আহার করিয়া, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর ঐ সময়ে খুব ব্যস্ততা দেখাইয়া বলিলেন,— "শীঘ্র শালগ্রাম খোল। ভোগ দিয়াই শালগ্রামকে কৌটায় বন্ধ ক'রে রেখেছ! গরমে ঠাকুর যে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্ছেন,—হাত গুটায়ে ব'সে কষ্ট প্রকাশ কচ্ছেন। শীঘ্র বাতাস কর—এই পাখা নেও।" এই বলিয়া ঠাকুর আমাকে পাখা দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ কৌটা হইতে শালগ্রাম খুলিয়া দেখি, শিশিরবিন্দুর মত শালগ্রামের সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম বহিয়াছে। দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। হায়, ঠাকুরকে আমি এত ক্লেশ দিলাম। তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনবাবু ও শ্রীপতিবাবু আসিয়া শালগ্রামকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত বাতাস করায়, ঠাকুরের শরীর শীতল হইল। ঘাম শুকাইয়া গেল। তখন ঠাকুর বলিলেন— "এখন শালগ্রামকে কৌটায় রাখ। শালগ্রামকে ভোগ দিয়ে আরতি ক'রো। একখানা চামর আনায়ে নেও। চামরের হাওয়া বড় ঠাণ্ডা। উহা দ্বারাই শালগ্রামকে বাতাস করতে হয়।" দু'দিনের মধ্যেই চামর আসিল। এখন আবার কাঁসরের জন্য বারংবার বলিতেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় একখানা ছোট কাঁসর অভয়বাবু আনিয়া দিলেন। আরতির সময় ঠাকুর স্বয়ং উহা বাজাইয়া থাকেন।

আজকাল সন্ধ্যার সময়ে শালগ্রামের আরতিতে বড়ই ধূমধাম হয়। খোল করতাল তালে তালে বাজিতে থাকে। আমি পরমানন্দে আরতি করি। এই আরতি দেখিয়া অনেকেই খুব আনন্দ-উৎসাহ প্রকাশ করেন। আবার কেহ কেহ বিরক্তও হন। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মভাবাপন্ন, ঠাকুরকে কাঁসর বাজাইতে দেখিয়া তাঁহারা বড়ই দুঃখিত ও বিস্মিত। আর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মেরা বলেন, "একি? গোঁসাইয়ের কাছে পৌত্তলিকতা আরম্ভ হইল? তিনিই বা কেন ইহা প্রশ্রয় দিতেছেন?" গোঁড়া হিন্দু গুরুভ্রাতারা বলিতেছেন—

"এ আবার কেমন পূজা, গুরুদেবের নিকটে শালগ্রামের আরতি! দেখে গা জ্বলে যায়। আরতি কর্‌তে হয়, গুরুরই আরতি কর। গুরুর কাছে শালগ্রামের আরতি কেন?" সাধারণের এ সকল বিরক্তির ভাবে আমি বিষম ফাঁপরে পড়িলাম। ব্রাহ্ম বা হিন্দু কেহই আমাকে সহানুভূতি করিতেছেন না; বরং যাহাতে শালগ্রামে আমার অশ্রদ্ধা হয়, এমনই সব কথাই বলিতেছেন। সকলের বিরুদ্ধভাবে আমার যে কি অবস্থা ঘটিবে, বলিতে পারি না। গুরুদেবই আমার ভরসা। দেখা যাক্, কতদূর কি দাঁড়ায়।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধে নানা কথা।

কয়েকটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— দীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে শাস্ত্রে কি প্রকার ব্যবস্থা আছে? সদ্‌গুরুর নিকটে যে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেই সদ্‌গুরু কি প্রকার? আপন আপন গুরুকে তো সকলেই সদ্‌গুরু বলে? ঠাকুর লিখিলেন— দীক্ষা সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা। বৈদিক নিয়মে, বেদ-বেদান্ত-বেত্তা, আশ্রমী—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমের যিনি নিয়মিত আচার প্রতিপালন করেন,—এমন বেদজ্ঞ, সদাচারী, আশ্রমী ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরু শব্দ-বাচ্য। বৈদিক সদ্‌গুরুর নিকট কেবল ব্রাহ্মণ ওঁকার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন,— অন্য জাতির অধিকার নাই। দ্বিতীয় তান্ত্রিক। কলিতে যে সকল দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, বৈদিক আশ্রম ও সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারি বর্ণের এবং সমস্ত বর্ণশঙ্কর মনুষ্যের অধিকার আছে। তন্ত্র সাধনের তিনটি সোপান,— পশু, বীর, দিব্য। এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্র-চৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধ মন্ত্রের সহিত ওঁকার যোগ হইয়া থাকে। সিদ্ধ মন্ত্রে যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ব বর্ণকে ওঁকারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেন। সত্য, সত্য, সত্য,—শিববাক্য।

প্রশ্ন— আমাদের দেশে পঞ্চ উপাসনা প্রচলিত আছে। আমাদের কি প্রকার উপাসনায় কল্যাণ হইতে পারে?

ঠাকুর— পঞ্চ দেবতার পূজা বিষয়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার মীমাংসা আছে। অত দূর অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ না হইলে, প্রচলিত প্রণালীমত চলিলেই হইতে পারে। উপাসনা দুই নিয়মে প্রচলিত—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বঙ্গদেশে বৈদিক উপাসনা প্রচলিত নাই বলিলেই হয়, কেবল গায়ত্রী-সন্ধ্যা ব্রাহ্মণগণ করেন। তাহার উপর তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়া থাকেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর এই পঞ্চ দেবতার কোন এক দেব-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। প্রতিদিন পূজার সময় ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা অগ্রে করিয়া, পরে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়। ইহাতে

নিষ্ঠা হইলে সমস্তই লাভ করা যায়। 'নারদ-পঞ্চরাত্রে' ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে—'হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করিলেই ভববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। মূল কথা,—শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্মলাভ হয়।

প্রশ্ন— বিশ্বাস-ভক্তি নাই, অথচ দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা,— এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য?

ঠাকুর— **নিজের বিশ্বাস না হইলে মন্ত্রাদি লওয়া কেবল সমাজের নিয়ম রক্ষা করা। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়, ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিয়া, ক্রমে শাস্ত্রানুসারে চলিতে চলিতে একটি কিছু ধরিয়া বিশ্বাস করে। নতুবা ভগবান্ মানবাত্মাতে যে ধর্ম্মভাব দিয়াছেন তাহাতে স্বাভাবিক বিশ্বাস হইলে চলিতে পারে। শাস্ত্রে অথবা আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাস না থাকিলে, যদি ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা হয়, তবে পূর্ব্বপুরুষগণ, দেশের প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকগণ, যে পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন সেই মহাজনদিগের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।**

ভীষণ স্বপ্ন— মাতৃহত্যা।

আজ সকালবেলা হইতে মা'কে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোন্ প্রাণে মার নিকট যাইব—মা'কে দেখিব?—স্বপ্নে মা'র উপরে যে বিষম ব্যবহার করিয়াছি—তাহা স্মরণ হইলে বুক কাঁপিয়া উঠে—ক্লেশে প্রাণ ফাটিয়া যায়। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন পরে ঠাকুরকে বলিলাম—ফয়জাবাদ হইতে চণ্ডী পাহাড়ে যাওয়ার দিন আমি একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওরূপ স্বপ্ন আমি দেখ্‌লাম কেন—মনে হ'লে প্রাণ বড় অস্থির হয়।

ঠাকুর আমার কথা শেষ না হইতে সমস্ত জানেন এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—**"হাঁ, হাঁ, স্বপ্নটি বল না—শুনি।"** আমি কহিলাম—কুতু, মাঠাক্‌রুণ ও যোগজীবনের সহিত আপনার নিকটে বসে আছি—অকস্মাৎ দেখ্‌লাম আমার মা একটু দূরে আড়াল থেকে আমাকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছেন—আপনি তখন মা'কে দেখে বল্‌লেন—"তোমার ঐ মা'কে বধ কর্‌তে পার? নেও এই খাঁড়াখানা নেও।" আপনি বলা মাত্র আমি খাঁড়া হাতে নিয়ে মা'কে বধ কর্‌তে ছুটলাম—ভাবলাম আপনার আদেশমত মাকে এখন বধ করি—পরে আপনার পায়ে পড়ে কেঁদে মা'কে পুনর্জ্জীবিতা কর্‌বো। মা'র নিকট পঁহুছিয়া এক ঘায়ে মা'কে দু'ভাগ ক'রে ফেল্‌লাম। তখনই আমি কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। খাঁড়াখানা হাতে লয়ে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লাম। ঐ সময়ে আপনি আসন হ'তে উঠে—ছুটে আমার নিকটে এলেন—এবং আমাকে বুকে জড়ায়ে ধর্‌লেন। আমি অমনি স্থির হলাম। আপনি বল্‌লেন—এর চিহ্ন রাখ্‌তে নাই। মাটিতে পুঁতে ফেল। আমি অবিলম্বে একটি গর্ত্ত ক'রে মা'কে পুঁতে ফেল্‌লাম। তখন আপনি আমাকে হাতে ধরে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গেলেন—আর অমনি

জেগে পড়লাম। ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"**সুন্দর স্বপ্ন দেখেছ—ও ভেবে উদ্বেগ কেন? ঐ মা তোমার গর্ভধারিণী নয়। মায়া পিশাচী মাতৃরূপে আড়াল থেকে তোমাকে উঁকি মেরে দেখছিল—তাকেই বধ করেছ।**"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার প্রাণটি ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ক্লেশের আর লেশমাত্র রহিল না। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্বপ্নে কি জীবনের যথার্থ উন্নতি লাভ হইতে পারে? ঠাকুর বলিলেন— "**খুব পারে। একটা সুদীর্ঘ জীবন জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত ২/৫ মিনিটের স্বপ্নে কাটিয়া যায়। সব স্বপ্নই অলীক নয়।**" গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার কথা মনে হইল। তিনি বলিয়াছিলেন—তিন রাত্রি শৃঙ্খলা মত পর পর একই স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। জন্ম হইতে সমস্ত বাল্যকাল প্রথম রাত্রে, পরে যৌবনকাল দ্বিতীয় রাত্রে—তৎপরে বৃদ্ধাবস্থা মৃত্যু পর্য্যন্ত তৃতীয় রাত্রে—এইপ্রকার একজন্ম শিশুকাল হইতে ৬০/৭০ বৎসরে মৃত্যু পর্য্যন্ত—একদিন একদিন করিয়া স্বপ্নে ভোগ হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভাবে উপাসনা কি?

আজ অপরাহ্নে বৈষ্ণবভাবাপন্ন কয়েকটি কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে পরস্পর আলোচনার পর জানিতে চাহিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— রাধাকৃষ্ণ উপাসনার অধিকার কখন হয়? পঞ্চদেবতার উপাসনার পরে কি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা?

ঠাকুর লিখিলেন— **ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, অনেক জন্মগ্রহণ করিতে করিতে জীবের ধর্ম্মে মতি হয়। প্রথম গণেশ উপাসনা, পরে সূর্য্যের উপাসনা, পরে শৈব, তৎপরে বৈষ্ণব অতঃ পর শাক্ত,—এই শক্তি উপাসনার পর মুক্তি। তখন রাধাকৃষ্ণ উপাসনার অধিকার জন্মে। ঐ সময়ে যদি সদ্‌গুরুর কৃপা হয়, তবে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বসুধা পান করিয়া কৃতার্থ হয়। ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব। মাধুর্য্যভাবের উপাসক বৈষ্ণব। রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ উপাসক যদি ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক হন, তবে তাহাদিগকে শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য মতই, ঐশ্বর্য্য উপাসক বলিতে হইবে। কালী, দুর্গা, শিব, সূর্য্য, গণপতি, নারায়ণ উপাসক যদি মাধুর্য্যভাবের উপাসক হন, তবে তাহাদিগকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতা তাহার প্রমাণ। শিব-পার্ব্বতী, রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ,—এই সমস্ত যদি মাধুর্য্যভাবের হয়, তাহা হইলেই পরাধর্ম্ম হইবে। আর ঐশ্বর্য্যভাবের হইলে ঈশ্বরোপাসনা হইবে। রামপ্রসাদের মত বৈষ্ণব কে? কালী, দুর্গা এ সব নাম শাক্ত নহে। শাক্ত ঐশ্বর্য্যে।**

"সেবা, বন্দনা আউর অধীনতা।"

কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— প্রতিদিন আমরা গান করি, 'সেবা, বন্দনা আউর অধীনতা, সহজে মিলওয়ে গোঁসাই'— এ কথার অর্থ কি?

ঠাকুর উত্তর দিলেন,— দীন-হীন, বিনীত হ'ওয়া অপেক্ষা ভগবানকে লাভের আর সহজ উপায় নাই। সেবা, বন্দনা ও অধীনতা,— ইহাই সকল প্রকার সাধন হ'তে শ্রেষ্ঠ ও সহজ। অনেক লোককে, অনেক মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়েছে কিন্তু তাঁরা ইহা হ'তে ভগবান লাভের আর সহজ উপায় বল্‌তে পারেন নাই। আমারও বিশ্বাস, ইহা হ'তে আর সহজ কিছু নাই। এই শ্রেষ্ঠ সাধন ও সহজ সাধন। এতে ভগবানের প্রতি মহাভাব এনে দেয়। কায়মনোবাক্যে সকলের অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদির সাধ্যানুসারে সেবা কর্‌তে হবে। দয়া সহানুভূতি না হ'লে যথার্থ সেবা হয় না। যেমন নিজের প্রয়োজন হ'লে তা পূর্ণ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার অন্যের প্রয়োজন যদি মনে লাগে, তবে তা পূর্ণ কর্‌তে ব্যাকুলতা জন্মে। মা শিশুর সেবা করেন—ঐভাবে। শিশুর অভাব দেখ্‌লে মা অস্থির। এরই নাম সেবা। না হ'লে ভিতরে অনুরাগ নাই, দেখা-দেখি কিছু খেতে দিলাম, অথবা অন্য প্রকার সাহায্য কর্‌লাম—তাহাকে যথার্থ সেবা বলে না। বৃক্ষ-সেবা, পতি-সেবা, সন্তান-সেবা, প্রভু-সেবা, ভৃত্য-সেবা, পত্নী-সেবা,—ঐভাবে হ'লেই সেবা, নইলে সেবা নাম করা উচিত নয়। যেখানে সেবা কর্‌তে গিয়ে অভিমান হয়,—নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয়—সেখানে সেবা কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই, তাতে অপকার হবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বন্দনা—সকলের বন্দনা কর্‌তে হ'বে। যেখানে যতটুকু সত্য পাওয়া যায়, সেখানে ততটুকু গ্রহণ কর্‌বে। যা'র মধ্য হ'তে বা যে কোন স্থান হ'তে সত্য পাওয়া যায়, কি উপদেশ শুনা যায়, সেই স্থানকে, সেই বস্তু কি সেই ব্যক্তিকে বিশেষরূপে বন্দনা কর্‌তে হবে। ভগবানের নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে সেই সত্য পালন কর্‌তে পার এতে যদি ব্যাকুলতা না আসে, তা হ'লে যাতে ব্যাকুলতার জন্য ব্যাকুলতা আসে তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর্‌তে হবে। তবেই সত্য হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। নিজের শক্তিতে কোন সত্য পাওয়া যায় না। যে সময়ে নিজে অতি দীনহীনভাবে ঐ সত্য প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় এবং আত্মা অতি দীন ভাব, বিনীত ভাব ধারণ করে তখনই ভগবানের অসীম দয়াতে সেই সত্য হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়ে জীবনকে ধন্য করে। এ রকম না হ'লে সত্য পাওয়া যায় না; পরিবর্ত্তনও ঘটে না।

বন্দনা তিন প্রকার—কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক। কায়িক বন্দনা—ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম, হাতজোড়, নমস্কার ইত্যাদি। বাচনিক বন্দনা— তাঁকে বা সেই জিনিষকে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি। মানসিক—বন্দনা—মনেতে ঐরূপ বন্দনার ভাব।

যাঁর নিকট হ'তে ঐরূপ সত্য পাওয়া যায়; তাঁকে অনাদর কিম্বা হাস্য-বিদ্রূপ করা উচিত নয়। গুরুজ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁর নিকট বিনীত থাক্‌তে হবে। তবেই বিশেষ ফল পাওয়া যাবে।

অধীনতা—সবাই গুরুজন। সকলেরই অধীন হবে। তাঁদের নিকট বিনীত ও অধীন থাক্‌তে হবে। সকলকেই প্রভু মনে কর্‌বে। তাঁদের দেখে ভীত হবে। তাঁদের মহিমা কীর্ত্তন কর্‌বে। সকলেই যেন তোমাকে আপন বলে মনে কর্‌তে পারে। এরূপ কর্‌লে আর দেরী নাই। এসব বিষয় কোথাও বল্‌তে নাই;—এসব ভাব গোপন রাখলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এক দিবস ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে আলোচনা সভায় ডাক্তার পি, কে, রায়ের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**"বিশ্বাস লাভ কর্‌তে হ'লে বিশ্বাসীর পদানত হ'তেই হবে।"**—সে কথা মনে হইল। ঠাকুর একটু অপেক্ষা করিয়া লিখিলেন—

(১) ঋষিমার্গ—পথ। (২) শুদ্ধি—পরম সাধন। (৩) জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—জীব নিস্তারের উপায়। (৪) বিশ্বাস—ধর্ম্ম-ভিত্তি। (৫) জীবন গঠন—ব্রত। (৬) সত্যপথ—অবলম্বনীয়। (৭) প্রেম ও প্রীতি কথা—যথার্থ কথা। (৮) একজনই উপাস্য। (৯) একাগ্রতা—সুস্থাবস্থা। (১০) সংশয়—পীড়া। (১১) সাধুসঙ্গ—ঔষধ।

ঠাকুর 'সেবা, বন্দনা আউর অধীনতা' এবং এই প্রকার প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন শুনিয়া, গুরুভ্রাতারা খুব তৃপ্তিলাভ করিলেন।

স্বপ্নে আশীর্ব্বাদ।

কিছুদিন যাবৎ ভিতরের দুরবস্থা দেখিয়া বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। ঠাকুর আমাকে এত আদর করিতেছেন, এত ভালবাসিতেছেন, চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষাগ্নির তাপে নিজ শ্রীঅঙ্গের সুশীতল ছায়ায় আমকে এত ভাবে ঠাণ্ডা রাখিতেছেন; কিন্তু আমি ঠাকুরের জন্য কি করিতেছি? ঠাকুরের অবিরল কৃপাধারা, যাহা নিয়ত আমার উপরে বর্ষিত হইতেছে, তাহা অনুভবের অবস্থা আমার এখনও হইল না। বহুকাল যাবৎ দু'টি অবস্থা লাভের জন্য অন্তরে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ঠাকুর তাহা পুরণ করিতেছেন কই? ঠাকুরের কৃপায় অসাধারণ অবস্থা লাভ করিয়া তাহা সম্ভোগ করিবার প্রবৃত্তি যদি আমার না জন্মিল তাহা হইলে ঠাকুরের এই কৃপাবর্ষণের প্রয়োজন কি? আজ খুব আকুলভাবে মনে মনে ঠাকুরের চরণে জানাইলাম—গুরুদেব! তুমি আমাকে এত দয়া করিতেছ, কিন্তু বিশ্বাস-ভক্তি অভাবে তাহা আমি ভোগ করিতে পারিতেছি না। যদি যথার্থই তুমি আমাকে সুখী করিতে চাও, কৃতার্থ করিতে চাও, তাহা হলে তোমাতে স্বাভাবিক স্থির বিশ্বাস ও একান্ত ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আপনার করিয়া লও। না হ'লে তোমার স্মৃতি ও সংস্রবের চিত্র চিরকালের জন্য অন্তর হইতে কাড়িয়া লও। এই অবিশ্বাস ও শুষ্কতার জ্বালা আর আমি সহ্য করিতে পার্রি না। সারাদিন নামের সঙ্গে এইভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে আমার দিন কাটিয়া গেল।

রাত্রে যথাসময়ে শয়ন করিয়াও নিদ্রা হইল না। বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। অধিক রাত্রে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং আর আর দিনের মত ঠিক সময়ে জাগিতে পারিলাম না। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমাকে হাতে তালি দিয়া জাগাইলেন। আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়া ঐ সময়ে ঘুমের ঘোরে কাঁদিতেছিলাম। হাততালির শব্দ পাইয়া জাগিয়া পড়িলাম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—**"কি দেখ্‌লে?"** আমি বলিতে লাগিলাম—'দেখিলাম, আমি একটি আকস্মিক আপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলাম। তখন একান্ত নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখনই দেখিলাম, আপনি আমার সম্মুখে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। একটু পরেই আপনার সমাধি ছুটিতে লাগিল। তখন একবার

আমার দিকে তাকাইলেন এবং 'চোঁ চোঁ' শব্দে তালু হইতে জিহ্বা টানিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে লাগিলেন। আমাকে নিকটে দেখিয়া নমস্কার করিলেন এবং পদধূলি নিতে হাত বাড়াইলেন। আমার তখন মনে হইল, পদধূলি দিব কি না? গুরুকে পাদস্পর্শ করিতে দেওয়া তো মহাপাপ। তখনই আবার ভাবিলাম, আমি তো দিতে চাইনা, তিনিই নিতে চান; তাঁর যাহাতে তৃপ্তি তাহাতে আমি বাধা দিব কেন? গুরু দ্বারা আমার কোন প্রকারই অনিষ্ট বা অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। গুরু কোন্ কার্য্যে কি ভাবে কাহার কল্যাণ করেন তাহা আমি কি জানি? নিশ্চয়ই আমারই কল্যাণের জন্য ঠাকুর ইহা করিতেছেন। এই ভাব আসামাত্র, আর আমি আপত্তি করিলাম না। আপনাকে অনায়াসে পায়ের ধূলি দিলাম। আপনি উহা মস্তকে ধারণ করিয়া, আমাকে কোলে নিতে হাত বাড়াইলেন। আমি তখন ঝাঁপাইয়া আপনার কোলে যাইয়া শিশুর মত শুইয়া পড়িলাম। আপনি আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলাম—আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। তখনই আপনার হাতের তালিতে আমি জাগিয়া পড়িলাম। ঠাকুর স্বপ্ন শুনিয়া 'হুঁ হুঁ' করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বপ্ন—কথায় সায় দিলেন। আমি হাত মুখ ধুইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। একটুকু পরেই দেখি ঠাকুর ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন এবং আমার দিকে এক-একবার তাকাইতেছেন। আমি ঠাকুরের চরণে দৃষ্টি রাখিয়া নাম করিতে লাগিলাম।

জীবের স্বাধীনতার সীমা।

আজ শনিবার। বহুলোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। জনৈক গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মানুষের কি কিছু স্বাধীনতা আছে?'

ঠাকুর লিখিলেন—**হাঁ, স্বাধীনতা কিছু আছে। যেমন একটা গরুর গলায় দড়ি বাঁধা থাকিলে দড়ি যতটা লম্বা, ঘুরিতে-ফিরিতে পারে,—দড়ির অতিরিক্ত যাইতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যও আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু মাত্র ততটুকুই স্বাধীনভাবে করিতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ, যতদূর হইতে দৃশ্য দেখে, শব্দ শুনে, তাহার উপরে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের ছেলেকে যেমন ভালবাসে অন্যের ছেলেকে তেমন ভালবাসিতে পারে না। হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে সে প্রকার ভাব আনিতে পারে না; সুতরাং মনুষ্য বাঁধা গরুর মত স্বাধীন। মোহ অজ্ঞানতা যতদিন, ততদিন জীব আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেক জীবের এক একটি কার্য্য আছে। সেই কার্য্য সাধনের জন্য যতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহা আছে। যেমন গরুর গলায় যতটুকু দড়ি বাঁধা, চলিতে পারে। সমস্ত জীব কেবল উপাধিতে আবৃত বলিয়া অন্ধবৎ আছে। উপাধি যত কাটে ততই দেবত্ব লাভ করে। এই জন্য জীবকে চিৎকণ বলিয়াছেন। জীব মুক্ত, শিব।**

ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ কি দোষ? ধর্ম্মের লক্ষণ।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় সাধন-ভজন কিছুতেই করা যায় না; সুতরাং ধর্ম্মের জন্য সংসার ত্যাগ করা কি দোষ?

ঠাকুর লিখিলেন—মানুষ কিছুদিন সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে এবং তাপে দগ্ধ হইলে, —অগ্নি পরীক্ষিত হইলে, যেখানে যাউক, কেহ নষ্ট করিতে পারে না। মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র যদি যায়, তবে অনেক পতনের কারণের মধ্যে পতিত হইতে হয়। সেই সময়ে সাবধান না হইলেই সর্ব্বনাশ। ধর্ম্মপথে থাকিবে। ইহাতে সংসার থাকে থাকুক না হয় যাউক। অসত্য অবলম্বন করিয়া কখনই কেহ অর্থ করিবে না, বরং ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইবে। ধর্ম্ম সতীর মত, দাতার মত, ভক্তের মত এবং বীরের মত রক্ষা করিতে হইবে। যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয়। মানুষে কি করিতে পারে? স্বয়ং ভগবান ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

কেহ বলিলেন—"শাস্ত্র পুরাণাদিতে তো ধর্ম্মের কত লক্ষণ দিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা তো কিছুই বুঝি না।"

ঠাকুর—"টাকা, শরীর, ধর্ম্ম। উহাদের উপযুক্ত ব্যবহারই ধর্ম্ম। সকল বিষয়ের অপব্যবহার, অপব্যয়ই পাপ। কীর্ত্তনে একটু নৃত্য করিল, একটু ভাব হইল, ইহাকেই এখন ধর্ম্ম বলে। ইহা ধর্ম্ম সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ,—সত্য, ন্যায়, জীবে দয়া, পিতামাতা ও গুরুজনে ভক্তি, সৎসঙ্গে স্পৃহা, পরস্ত্রী দর্শনে সাবধানতা, পরধনে অলোভ,—এইগুলি প্রথম অঙ্গ। হরিনামের ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে প্রথমে ঐগুলি দেখা যায়। উহা না হইলে জীবনে ধর্ম্মের আরম্ভই হইল না।

একদিন অন্নপূর্ণার মা গোঁসাইকে বলিলেন—'বাবা আমি বড় টাকা হারাই, আমার কি হবে?' গোঁসাই বলিলেন—"যিনি টাকা হারান, তিনি সবই হারান, তিনি ধর্ম্মও হারান। টাকা হারাবার জিনিষ নহে, দান কর। আমি গেঁজে ক'রে টাকা ল'য়ে যাই, খরচ হ'য়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন—শাস্ত্রে ভগবান লাভের ব্যবস্থা ও সাধন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন?

ঠাকুর—"শিশুর আহার একপ্রকার, বালকের একপ্রকার, যুবকের একপ্রকার, বৃদ্ধের একপ্রকার, আবার রোগীর একপ্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টিলাভ করে। একজনের আহার অন্যজনকে দিলে জীবন নষ্ট হয়। সকলের এক নিয়মে হয় না। শরীরের প্রকৃতি মানসিক প্রকৃতি ভিন্ন; সুতরাং নিয়মও ভিন্ন ভিন্ন।"

ঋষিবাক্যই সার।

অদ্য ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। অনেক কথার পর তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'গোঁসাই! মানুষের মুখ চেয়ে, লোকলজ্জা ক'রে জীবন নষ্ট কর্‌লাম। এখন লোকে বড়লোক বলে, সেই অভিমানেই মারা গেলাম—যথার্থ ধর্ম্ম হ'ল না। লোকের লজ্জায় ধর্ম্ম হারালাম, কিন্তু লোকের কিছুই হ'ল না—ক্ষতি আমারই হ'ল। ঠাকুর প্রতাপবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর্‌বেন। কেবল ইংরাজী ভাবে থাক্‌বেন না। উপকার পাবেন।"

ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি লোকের সহিত, আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ এবং শাস্ত্রসদাচার বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর, ঠাকুর লিখিলেন— **ধর্ম্মের নূতন কথা বলিতে সেই ঋষিদিগেরই শক্তি ছিল। তাঁহারা দয়া করিয়া যে সকল ধর্ম্মমত শাস্ত্ররূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তাঁহাদের উপদেশ যথার্থরূপে পালন করিতে ইচ্ছা হয়। এখন শারীরিক, সামাজিক ও অন্যান্য অনেক কারণে প্রকৃত শাস্ত্র, সদাচারের অনুগত হওয়াও কঠিন বোধ হইতেছে। ঋষিবাক্যই সার,—এখন ইহাই বুঝিতেছি।**

একাগ্রতা লাভের উপায়।

কিছুদিন হয় দেশপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও র‍্যাঙ্গলার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন এবং ঠাকুর সকলকে কিছু সময়ের জন্য অন্য ঘরে যাইতে বলিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ঠাকুর লিখিলেন—**"যাওয়ার সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'গোঁসাই জীবন বৃথা গেল। মনে করিতাম ধর্ম্ম হইয়াছে; এখন দেখি, কিছুই হয় নাই।' এই কষ্ট নিবারণের উপায়।"** ঠাকুর উত্তর কি দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন। বসু মহাশয় খুব তৃপ্তিলাভ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এক দিবস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিলেন। সে সকল কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ব্রজেন্দ্রবাবু যাওয়ার সময়ে রাখালবাবু প্রভৃতিকে বলিয়া গেলেন—"সমস্ত 'ফিলসফির' উপর গোঁসাই হেগে দিয়েছেন। কোথায় দাঁড়িয়ে যে তিনি কথা বলেন কিছুই বুঝ্‌লাম না, সে অগাধ সমুদ্রে প্রবেশও কর্‌তে পার্‌লাম না।"

আজ নিষ্ঠাবান কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন তো কিছুতেই স্থির হয় না? একাগ্রতা কি প্রকারে লাভ করা যায় ?

ঠাকুর লিখিলেন—**একাগ্রতার অভ্যাস অনেক প্রকার। কিন্তু যতপ্রকার আছে, সমস্তই সাময়িক। যতক্ষণ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণই অল্প অল্প মনঃস্থির হয়, এ জন্য বাহিরের উপায় সাময়িক মাত্র। মনের সঙ্কল্প-বিকল্প নষ্ট না হইলে চিত্তের একাগ্রতা হয় না। ভগবান আছেন, এটি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এই তিনটিই একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রথমে স্মরণ—সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বঘটনায় স্মরণ, দ্বিতীয় মনন—অস্তিত্ব বোধ হইলেই মন সেই দিকে আপনা হইতে যায়,—যেমন সর্পেরা আলো দেখিলে চোখ আর ফিরাইতে পারে না। তৃতীয় নিদিধ্যাসন—গরু যেমন জাওর কাটে। স্মরণে, মননে যাহা স্বাদ পাইয়াছে পুনঃপুনঃ তাহা ভোগ করা। এই তিনটিই একাগ্রতা লাভের বিশেষ উপায়।**

প্রশ্ন—মনের উপরে আমাদের কর্ত্তৃত্ব হয় না কেন?

ঠাকুর—**"মনের সঙ্কল্প-বিকল্প সর্ব্বদাই হইতেছে। ইহাতে মন অস্থির হয়, মনের উপর কর্ত্তৃত্ব আসে না। ইহার প্রধান কারণ, দুইটি ইন্দ্রিয় প্রবল,—জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ অনায়াসে লোকে**

দমন করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বাকে সহজে বশে আনা যায় না। কেহ নিন্দা করিল, কটু বাক্য বলিল, জিহ্বা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিল। এই জিহ্বা বশীভূত হইলে নিন্দা প্রশংসায় চঞ্চল করিতে পারে না।"

ঠাকুর আবার লিখিলেন—সাধুসঙ্গ, সর্ব্বদা নিত্যানিত্য বিচার অর্থাৎ সংসারের অসারতা চিন্তা এবং মনে মনে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম জপ করা,—এই সকল উপায় গ্রহণ করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়—মনের উপর কর্ত্তৃত্ব জন্মে।

মণিবাবুর মা ও ভগ্নীর কথা।

মণিবাবুর মা ও ভগ্নীর ঠাকুর দর্শনের কথা সংক্ষেপে ছোটদাদার ডায়েরী হইতে এই স্থানে তুলিয়া দিলাম—

মণিবাবু—এই বাটীতে গোস্বামী মহাশয়ের অবস্থানকালে আমাদের অঞ্চলের অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে যান। কিন্তু আমার মায়ের দর্শন হইল না। তিনি চলিতে অসমর্থা এই কথা গোঁসাইকে বলায় তিনি বলিলেন—"আমি বাদুড়বাগান যাবার সময় তোমাদের বাড়ী হ'য়ে যাব।" আমি আফিসে গেলাম মা'কে বলিয়া গেলাম যে, গোঁসাইকে ঠাকুরঘরে বসাইও। এক টাকার সন্দেশ আনাইয়া তুমি স্বহস্তে ঠাকুরকে খাওয়াইও। অফিস হইতে আসিয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম—'মা, গোঁসাই এসেছিলেন? তাঁকে কেমন দেখলে?' মা বলিলেন—'তোমার গোঁসাই বেশ। তিনি ঠাকুরঘরে আসনে বসিবামাত্র ঠাকুরঘর আলোকময় হইয়া উঠিল। ঠাকুর সিংহাসন হইতে নামিয়া গোঁসাইর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পরে সিংহাসনে উঠিলেন।' আমি বলিলাম—'মা! এও কি হয়?' পরে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"মা কি কখন মিথ্যা কথা কন্?" মণিবাবুর ভগ্নী শ্রীমতী ভোগমায়া আজ আমার নিকটে ঠাকুরের সম্বন্ধে গল্প করিলেন।—আমি ও ডাক্তার অমৃত মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী (ব্রহ্মজ্ঞানী) ও আমার ভাজ (গুরুভগ্নী) সৌরীন্দ্রের মাতা তিনজনে একদিন বেলা ২টার সময় বাদুড়বাগানের ৩৩নং গোপাল মিত্রের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেইদিন তিনি একটি গান গাহিয়াছিলেন সেটি এই— 'ধরম্ করম্ সকলি গেল লো, শ্যামাপূজা আর হ'লোনা।' গানের পর মাঠাকরুণকে লইয়া মাণিকতলায় মা'র বাড়ীতে যাই। তিনি আমার মাঠাকুরাণীকে একটি গান গাহিতে বলেন। মাঠাকরুণ গাইলেন— 'হরি হে তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে, তোমার মহিমা ভক্ত ভিন্ন কে আর জানে।'

তৎপরদিন আমরা পুনরায় গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বদিনের সঙ্গীতের মর্ম্ম বুঝিতে চাই। তিনি বলিলেন— "রাধারাণী সখীদিগকে বল্ছেন— (আয়ান ঘোষের ইষ্টদেবী কালী) আমি শ্যামা-পূজা কর্তে চাই কিন্তু শ্যাম আসিয়া দর্শন দেন। আমি আর কি করব? আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু হয় না, শ্যামা পূজাও হয় না। সুতরাং আমার কিছু হ'ল না।" গোস্বামী মহাশয় আবার বলিলেন— "যখন তোমরা নিজের ইষ্টদেবকে বা গুরুকে

ধ্যান কর্‌বে তখন তিনি যে মূর্ত্তিতে দর্শন দিবেন তাকেই আদর কর্‌বে। যদি কুকুর বিড়াল আসেন তা'হলে তাকেও আদর কর্‌বে—ধ্যান ভঙ্গ কর্‌বে না।" তারপর অমৃতবাবুর স্ত্রী বলিলেন—'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি' তবে কি ক'রে অন্য মূর্ত্তি আস্‌বে? গোস্বামী মহাশয় বলিলেন— **"আপনারা যে এক ব্রহ্ম বলেন সেই ব্রহ্মই গুরু। এই মস্তকেই গুরু আছেন। ব্রহ্মতালুতে গুরু রয়েছেন। আপনারা যে নিরাকার মূর্ত্তি ধ্যান করেন, তাঁকে ডাকেন, তিনিও এই গুরু, তিনি অনন্ত, তাঁর অন্ত নাই। যখন ধ্রুব বনে গিয়ে তাঁকে ডেকেছিলেন তখন তিনি ধ্রুবের পেছনে থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। যখন বাঘ আস্‌ছেন—তখন ধ্রুব তাঁকে বল্‌ছেন—তুমি আমার ইষ্টদেব এলে? কিন্তু সে বাঘটাও ধ্রুবের কোন হিংসা ক'রল না। তারপর সেই অনন্ত নারদ মূর্ত্তি হ'য়ে এসে তাঁকে দীক্ষা দিলেন। আপনারা যা করেন তাও ঠিক। কিন্তু গুরু না কর্‌লে শীঘ্র দেখা পাওয়া যায় না।"** তখন অমৃতবাবুর স্ত্রী বলিলেন—গুরুর মূর্ত্তি কিরূপ ভাব্‌বো? গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন— **"শিবের যে মূর্ত্তি সেই মুর্ত্তি ধ্যান কর্‌বে।"** আমি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম— 'যে গুরু বর্ত্তমান আছেন সেই গুরুকেই কি ধ্যান কর্‌ব?' তাতে তিনি বল্‌লেন— **"মস্তকে ধ্যান কর্‌বেন শিবমূর্ত্তি জটাজূটধর, গঙ্গা জটায় কুলুকুলু কর্‌ছেন, সাপ জড়ায়ে আছেন। আর এ ধ্যান কর্‌তে পারেন তো আরো ভালই হয়, যে মা ভগবতী পাশে ব'সে আছেন।"**

আমি সেই সময় দেখ্‌তে পেলাম গোস্বামী মহাশয়ের মূর্ত্তি শিবমুর্ত্তি, দুই স্কন্ধে দু'টি সর্প ফণা ধরে আছেন, একটি সর্প মস্তকের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া ফণা ধরিয়া রহিয়াছেন এবং বাম উরুর উপরে মাতাঠাকুরুণ অন্নপূর্ণারূপে ব'সে আছেন। হাতে গলে রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে লাল শাড়ী। চরণ দু'খানি রাঙা টুকটুক কর্‌ছে—এই মুর্ত্তি আমরা তিনজনেই দেখ্‌লাম।

দেবদেবীর আবির্ভাব।

আজ ৫টার সময়ে রান্না করিতে যাইয়া দেখি, কুতু আমার রান্নার জোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। কুতুর এইপ্রকার নিঃস্বার্থ সেবার ভাব দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। উহার গুণে উহার প্রতিদিন দিন আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। পাহাড় হইতে এবার আসার পর শান্তি, দিদিমা প্রভৃতি সকলেই আমাকে খুব আদর-যত্ন করিতেছেন। ইহা আমার পক্ষে নূতন।

গতরাত্রি প্রায় ৩ঘটিকার সময়ে আমি ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতেছি দেখিলাম, ঠাকুর পা দু'টি ছড়াইয়া দিয়া নিজেই টিপিতেছেন। ঐ সময়ে আমি গিয়া পা দু'টি ধরিলাম এবং টিপিতে লাগিলাম। ঠাকুর একটু সময় পরে আমাকে বলিলেন— **"একি। একি। তোমার *সঙ্গে সঙ্গে তোমার নারায়ণটিও যে। এ কেন? (নারায়ণকে)* তুমি কেন? আহা কি সুন্দর, কেমন সুন্দর সূর্য্যমণ্ডল,—তার মধ্যে নারায়ণ। এমন উৎকৃষ্ট চক্র বড় দেখা যায় না। গোপাল ভট্টের যে শালগ্রাম চক্র ছিলেন,—যিনি বিগ্রহ হ'য়ে এখনও শ্রীবৃন্দাবনে রাধারমণ নামে পূজিত হ'তেছেন, তাহাও এইরূপ অষ্টভুজ মহাবিষ্ণু-চক্র।"** ঠাকুর বহুক্ষণ ধরিয়া এই শালগ্রামের মাহাত্ম্য বলিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমি চতুর্ভুজ অষ্টভুজ বুঝি না। আমি যাঁকে

ধ্যান করি তিনি উহাতে আছেন কিনা এবং উহাতে থাকিয়া আমার পূজা গ্রহণ করেন কিনা? ঠাকুর লিখিলেন—**"হাঁ নিশ্চয়। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা কর্‌তে কর্‌তে সকলই প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে।—চতুর্ভুজ অষ্টভুজও প্রকাশ পাবে। এ সংসারে চতুর্ভুজ পর্য্যন্তই প্রকাশ। গৃহস্থেরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুরই পূজা করেন। বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্তই তাঁরা যেতে পারেন। অষ্টভুজ লাভ কারো কারো ভাগ্যে হয়।"**

এই প্রকার অনেক কথার পর, একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া একবার দক্ষিণে একবার বামে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং আওড়াইয়া আওড়াইয়া বলিতে লাগিলেন— **"কি, তুমি কোথা হ'তে এসেছ? গুষ্‌করা থেকে? বেশ! গৃহস্থেরা তোমার সেবাপূজা কেমন কচ্ছেন? তুমি আবার কোথা থেকে?—তোমার সিংহাসন কোথায়? শ্যামসুন্দর! লোকে তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন তো?"** এইপ্রকার বহু ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া ডাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। এসব আলাপ কানে শুনিলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি উঁহাদের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়া, গুরুদেবের চরণ ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলাম; এবং নিজ আসনে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্যামসুন্দর, রাধাগোবিন্দ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি ঠাকুরদের সহিত আলাপ করিয়া কোথাকার কোন্ ঠাকুর পরিচয় গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তর বিদায় দিলেন। আমি যেন নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় অবাক্ হইয়া রহিলাম। ঠাকুরের এসব কি, কিছুই বুঝিতেছি না।

অলৌকিক দর্শনে লাভ কি?

এই সময়ে ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া কচি বালকটির মত 'হুঁ হুঁ' করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং আব্দারে ছেলের মত হাত পাতিয়া পুনঃপুনঃ খাবার চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরের হাতে একটু মিষ্টি ও কমণ্ডলুর জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "এবার কি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ হইবে আর বিশ্বাস জন্মিবে?" ঠাকুর বলিলেন—**"হাঁ, তা নিশ্চয়ই। তোমার কেন, যাঁরা অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের ভিতরে নিতান্ত দুরবস্থায় আছেন, তাঁদেরও হ'বে। দু'দিন আগে আর পরে, হ'তেই হবে।"** আমি বলিলাম— 'একটিবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি ভক্তি-বিশ্বাস-ভালবাসার চক্ষে আপনাকে দেখে আমার মৃত্যু হয়; জীবন আমার সার্থক মনে করব।' ঠাকুর বলিলেন— **"যে ভাবে চল্‌ছ, যেরূপ ধ্যান, পূজা কর্‌ছ, সেইরূপ ক'র। তাতেই ক্রমে ক্রমে সব হ'য়ে আস্‌বে,— বিশ্বাস-ভক্তি সব জন্মাবে। বিশ্বাস কখনও দে'খে শু'নে হয় না। অনেকে *বলে যে, অলৌকিক একটি কিছু দেখলেই বিশ্বাস হ'বে। কিন্তু তা' ভুল। অনেককে অনেক* দেখান গিয়েছে। তাতে তাদের কোন লাভ তো হয়ই নাই, বরং ক্ষতিই হ'য়েছে। বিশ্বাস যে জিনিষ, তা দেখ্‌লে-শুন্‌লে হয় না। উহা ভগবানের কৃপাতেই লাভ হয়। তুমি অলৌকিক কিছু দেখ্‌তে চাও?"** আমি বলিলাম—'অদ্ভুত বা অলৌকিক আমি কিছু দেখ্‌তে চাই না। আমি কিছু দেখে যদি তা আপনা অপেক্ষা আমার অধিক ভাল লাগে, তা হ'লেই তো আমার সর্ব্বনাশ! সুন্দর কিছু দেখ্‌বার কৌতূহল আমার অন্তরে যেন উদিত না হয়।'

ঠাকুর— "তুমি যেমন কর্‌ছ করে যাও,—ওতেই সব হবে। আপন সাধন-ভজনের কথা কোথাও প্রকাশ কর্‌লে থাকে না;—অনিষ্ট হয়। সাবধানে থেকো। যার যেরূপ ভজন, তিনি নিষ্ঠাপূর্ব্বক কর্‌বেন। প্রত্যেক সাধক আপন আপন মর্য্যাদা, রক্ষা ক'রে চল্‌বেন;— ইহা শিব বাক্য।"

এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। আমিও বাতাস করিতে লাগিলাম।

মা কালী ও ঠাকুর।

কিছুক্ষণ পরে ভাবাবেশে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— মা, বুড়ি মা, তুমি এমন কেন? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই কেন? সারা দিন রাত ছেলেকে ফেলে কোথায় থাক? চব্বিশ ঘণ্টা তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব'সে থাকি। এত সময় ব'সে থাক্‌লেও তোমার একবার ছেলে ব'লে মনে হয় না? লোকে আবার তোমায় বলে 'দয়াময়ী'। দয়া তো তোমার ভারি! চব্বিশ ঘন্টা ছেলে ফেলে থাক। ছেলে দিন রাত ব'সে থাকে। আবার এসেও কথাবার্ত্তা নাই। কেবল খেতে দে, ক্ষুধা পেয়েছে; ব'লে গোলমাল কর। যদি কোন দিন খাবার কিছু না থাকে, দিতে না পারি, তাহ'লে অমনি আমার রক্ত খেয়ে যাও। আমার রক্ত না খেলে কি তোমার পেট ভরে না? সাধে কি তোমায় নির্ব্বোধ বলি? মেয়েমানুষের কোন কালে বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি থাক্‌লে দশ হাত কাপড় পরে'ও কাছা দেওনা কেন? বুদ্ধি নাই ব'লেই ছেলের কষ্টও বোঝ না— ইত্যাদি—প্রতিদিন শেষ রাত্রে ঠাকুর মা কালীর স্তব-স্তুতি করেন। কখনও বা শ্যামা বিষয়ক গান করেন। যথা,—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে; শ্যামা নাম বিনা না শুনে শ্রবণে।
সন্ধ্যা-পূজা কিছুই না মানে, সদা রহে শ্যামার চরণ ধ্যানে।।
যে জন শ্যামার চরণ ক'রেছে স্থূল, সহজে হ'য়েছে বিষয়েতে ভুল।
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, বল তার মূল হারাবে কেমনে।।
রাজা রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে, লোকে নিন্দা শুন্‌বে কেনে।
তার আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, শ্যামা নামামৃত পীযূষ পানে।।"

আবার কোন কোন দিন কালীর সঙ্গে ঝগড়াও করেন। গেণ্ডারিয়া থাকিতেও প্রত্যহ শেষ রাত্রে মা কালীর আবির্ভাব হেতু ঠাকুরের নানাপ্রকার ভাব দেখিয়াছি। এ সময় ঠাকুর প্রায়ই ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু অবস্থায় থাকেন।

ঠাকুরের চাহনি।

গুরুভ্রাতারা অনেকে প্রতিদিন যতই আমার শালগ্রামে নিষ্ঠা ভঙ্গ করিবার জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর ততই আমাকে দয়া করিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই ঠাকুর আমাকে ঠাণ্ডা

রাখিতে বিশেষভাবে কৃপা করিতেছেন। শালগ্রাম পূজার সহানুভূতি দেখাইতে কখনও নিজ হস্তে ঠাকুর আটা চিনি ঘৃত মাখিয়া ভোগের জন্য শালগ্রামকে দিয়া থাকেন; কখনও বা ডাব সরবৎ আনাইয়া শালগ্রামের জন্য রাখিয়া দেন। শালগ্রাম পূজা প্রায় আড়াইটা তিনটার সময় শেষ হয়। ঐ সময়ে আমারও কখন ক্ষুধা, কখন পিপাসা পায়। বোধ হয় এই জন্যই ঠাকুর ঐ সময়ে কিছু খাবার শালগ্রামকে দিয়া প্রসাদ পাইতে বলেন। কোন কোন দিন খাবার-মিষ্টি আলমারী হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলেন— "খেয়ে নেও। শালগ্রামের প্রসাদ হ'য়েছে,— খেয়ে ফেল।" ওসব বস্তু শালগ্রামকে নিবেদন করিতে হইলেই দু'পাঁচ মিনিট অন্ততঃ বিলম্ব হইবে। এই বিলম্বটুকুও ঠাকুরের যেন সহ্য হয় না। তিনি নিজেই শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া আমাকে দিয়া থাকেন। ঠাকুরের এসব দয়াতে যেমনই আমি উৎসাহ আনন্দে প্রফুল্ল রহিয়াছি,— গুরুভ্রাতারা তেমনই বিরক্ত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছেন। শালগ্রাম—পূজার সময়ে ঠাকুর কখনও কখনও আমার পানে নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে চাহিয়া, আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। সম্মুখের জটা মুখের উপর ধরিয়া, উহার ভিতর দিয়া 'দুষ্টু' ছেলের মত তাকাইয়া আমার দৃষ্টি পড়া মাত্র, আবার মুখ ঢাকিয়া ফেলেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের চক্ষে চোখ পড়িলেই কেমন যেন হইয়া পড়ি। সারাদিন ঐ চাহনি আর ভুলিতে পারি না, কি যে আনন্দে ঠাকুর আমাকে রাখিয়াছেন, বলিতে পারি না।

নিত্য ভজনে সম্বন্ধ।

কিছুদিন যাবৎ ঠাকুরকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। নাম করার সঙ্গে সঙ্গে নামী অর্থাৎ ইষ্টমূর্ত্তি যখন সুস্পষ্ট প্রতি নিয়ত অন্তরে উদয় হইতে থাকেন, তখন ঘন ঘন ঘনিষ্ঠতা হেতু তাঁহার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। সংসারে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও আনন্দজনক, ইষ্টদেবে সেই ভাবই আরোপ করিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয়। ইষ্টদেবের স্নেহ মমতা ভালবাসার ভিতর দিয়া যে ভাব অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করে, সর্ব্বদা তাহারই ধ্যান-ধারণা দ্বারা ইষ্টদেবের সহিত একটা স্থায়ী সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়। আমার কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের উপর কোন একটা ভাবই স্থির হইল না! বৈষ্ণবদের শান্ত, দাস্য, সখ্যাদিভাব ব্যতীত, অন্য কোন ভাব মানব-প্রকৃতিতে আছে কি না, জানি না। ঠাকুরের সদয় ব্যবহারে যখন যে ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠে তখনই তাহা লইয়া ভজনে দিন কাটাই। সুতরাং কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাব এ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় নাই। এইভাবেই থাকিব, না কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব রাখিয়া উপাসনা করিব— তাহা জানিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'কি ভাবে সাধন করিব? যখন যে ভাব ভাল লাগে, তখনই সে ভাব লইয়া সাধন করিব, না সর্ব্বদা একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব অন্তরে রাখিয়া, সেই ভাবে করিব?' ঠাকুর লিখিলেন—"যখন যাহা ভাল লাগে তাহা লইয়া সাধন করিলে একটি কোন অবস্থা দাঁড়ায় না; যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে, সর্ব্বদা তাহাই অন্তরে পোষণ করিয়া সাধন করিবে।" আমি ঠাকুরের কথায় বুঝিলাম—ঠাকুর

যথার্থই আমার সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক, নিজের করিয়া লইলেন। অনেক দিন যাবৎ ঠাকুর, হাব-ভাবে, আকার-ইঙ্গিতে, কথায়-বার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমার অন্তরে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিতেছেন, বুঝিলাম— ঠাকুরের সঙ্গে সেই ভাব লইয়াই আমার সম্বন্ধ। আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। দয়াল ঠাকুর! দয়া করিয়া আমাকে বিশ্বাস-ভক্তি—ভালবাসা দেও। দূরে থাকিয়া ভালবাসিতে চাই না—যদি কখনও ভালবাসি তবে যেন মনে প্রাণে এক হয়ে ভালবাসিতে পারি। যতদিন লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ থাকিবে ততদিন ভালবাসার ঐকান্তিকতা জন্মে না। লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ দূর হইলেই তোমার উপরে প্রকৃত ভালবাসা ও প্রেম জন্মিবে। এই প্রেমই চাই। যাঁকে ভালবাসিব, তাঁকে লইয়া মাখামাখি করিব—কখনও তাঁকে কোলে করিব, কখনও তাঁর কোলে [illegible]—কখনও তাঁর পায়ে লুটাব, তাঁকে মাথায় রাখিব আবার কখনও তাঁর কাঁধে উঠিব,— ইহা যে প[illegible]ন্ত না হবে সে পর্য্যন্ত ভালবাসা কোথায়? ঠাকুর কবে আমাকে দয়া করিয়া সে অবস্থা দিবেন?

সাধন সঙ্কেত।

আজ একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন— ধর্ম্মজীবন গঠনের প্রকৃষ্ট প্রণালী কি?

ঠাকুর লিখিলেন— **চিত্তের স্থিরতা লাভ করাই ধর্ম্মার্থীর প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ, সমস্তই এই স্থিরতা লাভের উপর নির্ভর করে। সাধুগণ স্থিরতা লাভের নানা উপায়ের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নাম সংকীর্ত্তন, উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ আশু ফলপ্রদ। এই জন্য সাধকদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা, ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও স্তব-স্তুতি পাঠ করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। চঞ্চলমতি বালককে যেমন উচ্চৈঃস্বরে আপনার পাঠ আবৃত্তি করিয়া তাহা অভ্যস্ত করিতে হয়, চঞ্চলমতি সাধককেও সেইরূপ সজনে নির্জ্জনে প্রথমাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে স্তব-স্তুতি ও সঙ্গীতাদি করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হয়। নাম-সাধন ও প্রাণায়াম প্রভৃতিও চিত্তের স্থিরতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণিত আছে।**

প্রতিদিন একই স্তব পাঠ, একই সংকীর্ত্তন গান, একই নাম জপ করা বিধেয়। সঙ্গীতে সংকীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে অনেকে নিত্য নূতন সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেদিন যেরূপ ভাবের উদয় হইল, সেদিন তদনুরূপ কীর্ত্তনাদি করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সাধক ভাবের অধীন হইয়া পড়েন, ভাব তাঁহার অধীন কখনও হয় না। ভাব স্রোত বন্ধ করা কখনও উচিত নহে সত্য, কিন্তু ভাবের বশ হওয়া অকর্ত্তব্য—একে ত ভাব বিকাশের ব্যাঘাত, অপর চরিত্র গঠনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। প্রবল ভাবাবেশ হইলে সে ভাবকে অসঙ্কুচিতভাবে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়াই উচিত; কিন্তু সর্ব্বদাই আপনাকে এরূপ ভাবের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয়—যাহাতে ভাব আসিলে পূজা আরাধনা প্রভৃতি হইবে, না আসিলে হইবে না। কিন্তু যেদিন যেরূপ ভাব আসে, সেদিন কেবল সেরূপ ভাবের সঙ্গীত পাঠাদি করিলে পরিণামে সাধক বস্তুতই একেবারে আত্মশক্তিহীন হইয়া ভাবের বশীভূত হইয়া পড়েন। এই কারণেই একটি

নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ঠা সহকারে, একটা নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্তের স্থিরতা, ভাবের গাঢ়তা এবং চরিত্রের শক্তি সাধিত হইয়া থাকে।

যেমন পাঠ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে, তেমন আসন সম্বন্ধেও একটা স্থিরতা থাকা ভাল। প্রতিদিন সাধনের সময় একই আসনে, একই গৃহে, একই দিকে অভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। যেমন শয্যা বা শয়নগৃহ পরিবর্ত্তন করিলে সকলেরই প্রথম প্রথম অল্পাধিক পরিমাণে সুনিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ আসন, স্থান বা অভিমুখ পরিবর্ত্তন করিলে, সাধনের কালে চিত্ত-স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। প্রাচীনকালে গুরূপদেশ হইতে সাধনার্থিগণ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই এই সকল সাধন সঙ্কেত শিক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানের বৈপ্লাবিক ভাবে সে সকল শিক্ষা-প্রণালী বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, অনেকেরই পক্ষে এই সকল সামান্য সাহায্যও দুর্লভ হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা আত্ম চেষ্টাতে ধর্ম্মসাধন করিবার প্রয়াসী, তাহাদিগকে এ সকল সঙ্কেত বলিয়া দেয় এমন কেহই নাই, অথচ এ সকল সঙ্কেত না জানাতে যে সাধন তিন সপ্তাহে হইত, তাহা তিন বৎসরেও হইতে পারে না। এই সকল অতি সামান্য উপদেশের অভাবেই অনেক সরল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি বহুকালব্যাপী চেষ্টার পরেও স্ব স্ব ধর্ম্মজীবনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত করিতে পারেন না।

ন্যাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা।

আজ নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'আপনি আমাকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ন্যাস করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ তত্ত্বের ন্যাস কি ভাবে করিতে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিতে অবসর পাই নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়া নিজের বুদ্ধিমত ন্যাস করিয়া যাইতেছি। ঠিক মত হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতেছি না— সন্দেহ হয়। তাহাতে ঠাকুর লিখিলেন— **"ন্যাস কিরূপ কর? কিসে সন্দেহ বল?"** আমি যে ভাবে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতের ন্যাস করিয়া থাকি, ঠাকুরকে পরিষ্কার করিয়া বলিলাম। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন— **"এসব ঠিকই হ'চ্ছে। তারপর?"** আমি—'পঞ্চতন্মাত্রের ন্যাস—শব্দের—কর্ণে, স্পর্শের—হৃদয়ে, রূপের—নাভিতে, রসের—জিহ্বাতে, ও গন্ধের—পায়ুতে করিয়া থাকি।'

ঠাকুর বলিলেন—**"না, ওরূপ নয়। শব্দ-তন্মাত্রের—কৃষ্ণবর্ণে, স্পর্শের—নীলবর্ণে, রূপ-তন্মাত্রের—রক্তবর্ণে, রস-তন্মাত্রের—শ্বেতবর্ণে, এবং গন্ধ-তন্মাত্রের—পীতবর্ণের রূপধ্যানে কর্‌তে হয়।"**

আমি— এ সব রূপের ধ্যান কি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, না কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে রাখিব?

ঠাকুর—**"হৃদয়ে, ললাটে অথবা সহস্রারে।"** মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের ন্যাস যে ভাবে যে যে স্থানে করি, ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর কহিলেন—**"ঠিক্ ঠিক্ই হ'তেছে, তবে চিত্তের সহস্রারে কর্‌তে হয়।"**

আজ আমার অনেকগুলি সন্দেহের বিষয় সংশোধিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'কিরূপ ধ্যান সর্ব্বদা রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব? ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া

বলিলেন— **"এসব খুব গোপনে কর্‌তে হয়,—কোথাও প্রকাশ ক'রো না।"** জয়, দয়াল ঠাকুর! এ সব সাধন তুমি আমাকে কেন দিতেছ, জানি না। তোমার রূপ ধ্যান করিতে করিতে কবে আমি, তুমি হইব!

গুরুব্রহ্ম অর্থ কি? আমাদের গুরু কে?

আজ অপরাহ্নে বহু গুরুভ্রাতা ঠাকুরের নিকট আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম ও গুরুসম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর লিখিয়া কখন বা অস্ফুটস্বরে বলিয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন— গুরুব্রহ্ম এ কথার অর্থ কি?

ঠাকুর লিখিলেন— **শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এক অবস্থা আসে, তাহাতে গুরু দর্শন হয় এবং গুরুর মধ্যে নামের চৈতন্যরূপ দর্শন হয়। তখনই গুরু ও ব্রহ্ম এক হইয়া যান। যাঁহাদের ঐরূপ অবস্থা ও দর্শনলাভ হয়, তাঁহাদেরই নিকটে গুরু ব্রহ্ম।**

জিজ্ঞাসা করা হইল— আমাদের গুরু কে? আপনি কখন কখন পরমহংসজীর কথা বলেন।

উত্তর— **তোমরা গুরু বলিতে আমাকে বুঝিবে। পরমহংসজী আমার গুরু। তিনি আমাকে নাম দিয়াছেন, আর আমি তোমাদের নাম দেই।**

নাম-সাধনে কি অবস্থা হয়? অদ্বৈতবাদ কি?

প্রশ্ন— শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিলে কি অবস্থা লাভ হয়? ভগবানকে লাভ করিয়া কি তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া যায়?

ঠাকুর লিখিলেন-- **শ্বাসে-প্রশ্বাসে এই নাম-সাধনই যথার্থ সাধন। ইহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা—আসিবে, বিশ্বাস পাইবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে নানাপ্রকার দর্শন হইয়া থাকে। ভগবান যে আমাদের অনেক দূরে আছেন, তাহা নহে, — তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে বর্ত্তমান। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে পাপরাশি জ্বলিয়া গেলে, তাঁহার দর্শনলাভ হয়। এই ভাবে নাম করিতে করিতে সম্মুখে একখানা আরশীর মত প্রকাশিত হয়। গ্রহ-উপগ্রহাদি সমস্তই স্পষ্টভাবে দৃষ্টিভূত হয়, ক্রমে অন্তরের ময়লানাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়! তখন মনুষ্য-জন্ম সফল হয়। মনুষ্য যতই কেন উন্নত হউক্ না, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। কেহ যদি সমুদ্রগর্ভে, সমুদ্র পরিমাণ করিবার জন্য অহঙ্কার করিয়া ডুব দেয় এবং যদি তাহার পৃথক্ ভাব জ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা—মনুষ্য চিদানন্দ-সাগরে ডুবিলেও তাহার সেই প্রকার অবস্থা হয়। অন্য লোক মনে ভাবে যে, সে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার পার্থক্য বোধ থাকে, তখন সে ভগবানের রাস-লীলা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্য হয়। যখন জীবাত্মা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে তখন সে কখনও মধুর সাগরে, কখন বা চিনির সাগরে ডুবিয়া থাকে।—ইহা কেবল কল্পনামাত্র, কেননা সেই আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা**

যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন, কেন এই আনন্দে থাকিলাম। মধুরং, মধুর, মধুরং।

ঠাকুর আবার লিখিলেন— "অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার একপ্রকার অবস্থা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইলে তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, ব্রহ্মসত্তাই দেখেন। অনন্তসাগরে একটি জল-কণা প্রবেশ করিলে সে চারিদিকে হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডুবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষিগণ, মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিবেন কেন? ইহাই পরম গতি, পরম সম্পদ।

পঞ্চকোষ ভেদের লক্ষণ।

জনৈক গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন— 'জীবাত্মা পঞ্চকোষের ভিতরে আছেন শুনিতে পাই। পঞ্চকোষের কোন্ কোষ ভেদ হইল তাহা কি লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইবে?"

ঠাকুর লিখিলেন— "অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকেনা। প্রাণময় কোষ ভেদে, শারীরিক উত্তেজনা থাকেনা। মনোময় কোষভেদে সঙ্কল্প-বিকল্প যায়। বিজ্ঞানময় কোষ ভেদে সংশয়-বুদ্ধি থাকেনা; আর আনন্দময় কোষ ভেদে পার্থিব আনন্দে মুগ্ধ করিতে পারেনা।" যে সকল চক্র আমাদের শরীরে আছে তাহার সহিত আত্মাব কোন সম্বন্ধ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর লিখিলেন—'চক্র শরীরে ছয়টি। ইহার সহিত বাহিরের শক্তির যোগ। স্থূল শরীরে, সূক্ষ্ম শরীরে, কারণ শরীরে তারপর আত্মাতে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উপদেশ শুনিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝা যায়না।"

অতি-নিদ্রায় ঠাকুরের অনুশাসন।

কলিকাতা আসিয়া এতদিন বড়ই আরামে কাটাইয়াছি। দিনরাত ঠাকুরের অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভে, একটানা সাধন-ভজন করিয়া কি যে আনন্দলাভ করিয়াছি প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। কিন্তু,

১লা আশ্বিন,
৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

কিছুদিন যাবৎ বড়ই উদ্বেগভোগ হইতেছে। প্রত্যহই গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আফিস-আদালত হইতে একেবারে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর তাঁহারা আপন আপন বাড়ী-ঘরে চলিয়া যান। আবার অনেকে আফিস হইতে বাসায় যাইয়া আহারান্তে সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত, তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্পাদি করিয়া, ঠাকুরের ঘরেই শয়ন করেন। এই শ্রেণীর গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুর হলঘরের এককোণে নিজ আসনে বসিয়া থাকেন, বাকী সমস্ত ঘরই খালি থাকে। সুতরাং ম্যাটিং-করা হলঘরে যাহার যেখানে ইচ্ছা পড়িয়া থাকেন। আজকাল প্রায় ৮/১০ টি লোক এই ঘরে নিত্য শয়ন করিতেছেন। আমি রাত্রি সাড়ে এগারটা-বারটার সময় যখন উঠি, সকলকেই নিদ্রায় অভিভূত

দেখি। মহেন্দ্রবাবু, মণিবাবু, অচিন্ত্যবাবু প্রভৃতি ৩/৪টি গুরুভ্রাতা কোন কোন দিন জাগিয়া থাকেন। রাত্রি ১১টা হইতে সাড়ে চা'রটা পর্য্যন্ত ৮/১০টি গুরুভ্রাতার এক সময়ে বিবিধ প্রকার নাক ডাকার 'ঘড়্ ঘড়্', 'ফড়্ ফড়্,' বিরক্তিকর শব্দে আমার মাথা আগুন হইয়া যায়। ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকেন বলিয়া, তাঁহার এই সকল শব্দে কোন উদ্বেগই বোধ হয় না। সমস্তটি ভোগ আমাকেই ভুগিতে হয়। গুরুভ্রাতাদের 'ঘড়্ ঘড়ানি' শব্দে—নামে মন বসে না, ঠাকুরের ভাবাবেশের ও সমাধির কথাগুলি পরিষ্কার শুনিবার সুবিধা হয় না। পাখা করিতে করিতে এক একবার উঠিয়া কোন গুরুভ্রাতাকে চিৎ হইতে কাৎ করিয়া দেই, কাহাকেও হাত ধরিয়া টানিয়া পাশ ফিরিতে বলি, আবার কারো কারো 'ঘড়্-ঘড়ানি' কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া নাকে, মুখে কাপড়, জামা চাদর যাহা পাই চাপা দিয়া সরিয়া পড়ি। সারা রাত আমাকে ৬/৭ বার আসন হইতে উঠিয়া এই সব নিয়া থাকিতে হয়। স্থির হইয়া অর্দ্ধঘণ্টাও এক ভাবে বসিয়া নাম করিতে পারি না। ঠাকুর ৩টার সময়ে বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়া একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জল খান এবং গুরুভ্রাতাদের নাকের 'ঘড়ঘড়ানি' শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, অতি-নিদ্রার অশেষ দোষ বলিতে থাকেন। গুরুভ্রাতারা অনেকে তাহা শুনিয়া অথবা পুনঃপুনঃ আমার টানা হেঁচ্ড়ানিতে উদ্ব্যস্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাখালবাবুর বৈঠকখানা ঘরে, সুখে নিদ্রা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে আমার আরো অসুবিধা হইয়াছে। যখন তখন ধাক্কা দিয়া উহাদের শব্দ বন্ধ করার সুবিধা পাইতেছি না।

ঠাকুর সকলকে ৩টার সময়ে উঠিয়া সাধন করিতে, বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিতেছেন না। ঠাকুর সন্দেশ, রসগোল্লার লোভ দেখাইয়া কাহাকেও বাগে আনিতে পারিতেছেন না। প্রত্যহই শেষ রাত্রের জন্য অর্দ্ধসের তিনপোয়া সন্দেশ রসগোল্লা আসে। ঠাকুর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আমাকে দিয়া বলেন— **"সকলকে দিয়া দেও।"** আমি নিদ্রিত গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে বসিয়া, 'রসগোল্লা,' 'রসগোল্লা,' বলিতেই কেহ কেহ ধড়্মড়িয়া উঠিয়া বসেন এবং রসগোল্লা লইয়া বাহিরে চলিয়া যান। কেহ কেহ চোখ বুজা অবস্থায়ই বিছানায় বসিয়া রসগোল্লা মুখে দেন এবং হাতখানা মাথায় পুঁছিয়া আবার শয়ন করেন। আবার কোন কোন গুরুভ্রাতা মাথাও না তুলিয়া চোখ বুজা অবস্থায়ই রসগোল্লা পাওয়ার জন্য ঘন ঘন হাতখানা নাড়িতে থাকেন; এবং 'রসগোল্লা' পাইয়া উহা মুখে দিয়া আবার পূর্ব্ববৎ নাক ডাকাইতে থাকেন। আর যে সকল গুরুভ্রাতারা 'রসগোল্লা' শব্দে, উহা পাইবার জন্য শুধু হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকেন, আমি সর্ব্বশেষ রসগোল্লা তুলিয়া তাঁহাদের নাকের উপরে রস নিঙ্ড়াইয়া দিয়া, সজোরে রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দেই। শ্বাস টানিতে যাইয়া নাকের ভিতরে রস যাওয়ায় কেহ কেহ দমবন্ধ হইয়া উঠিয়া পড়ে এবং রাগিয়া যা ইচ্ছা তাই গালি দিতে দিতে বাহিরে চলিয়া যায়। আমি ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি বলিয়াই রক্ষা পাই। সকল কার্য্য আমি ঠাকুরের অভিপ্রায়ের অনুকূলেই করিতেছি মনে করিয়া তৃপ্ত থাকি। কয়দিন এদের ভাব দেখিয়া অবশেষে ঠাকুর নিদ্রিত ব্যক্তিদের ডাকিয়া প্রসাদ দিতে বারণ করিয়াছেন। এখন জাগ্রত গুরুভ্রাতাদের প্রসাদ বণ্টন করিয়া অবশিষ্ট

আমিই খাইয়া থাকি। সকালে গুরুভ্রাতারা ইহা লইয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করেন। গত রাত্রে ঠাকুর ইঁহাদের শাসন করিয়া বলিলেন— "মানুষের নিদ্রা দেখে বুঝা যায়, তার ভিতরে কোন গুণ প্রবল। নিদ্রাকে জোর করে ত্যাগ কর্‌তে হবে। জোর ক'রে ত্যাগ না কর্‌লে, সহজে ত্যাগ হয় না। জীবন মানুষের কয়টি দিনের জন্য। ৫০/৬০ বৎসরের জীবন, অর্দ্ধ সময়ই চাক্‌রী-বাক্‌রী বাহিরের কাজে যায়, তারপর যে সময়টুকু থাকে তা'ও আহারাদি কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। অবশিষ্ট যে সময় থাকে, তা' নিদ্রায় ব্যয় কর্‌লে, সাধন-ভজন কর্‌বে কখন? সারাদিন আহারের চেষ্টা, আর রাত্রে নিদ্রা—এই অবস্থায়ই সময় যাচ্ছে। ভগবানের নাম কবে কর্‌বে। যাদের দিবসে আহারের চেষ্টা কর্‌তে হয় না, তার ও নাম করেনা; কেবল গলাবাজী কর্‌বে আর রাত্রে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমাবে। বাবুদের সাধন কর্‌তে বল্‌লে, প্রাণায়াম কর্‌তে বল্‌লে, বলেন— 'মশায প্রাণায়াম কর্‌তে হাঁপ ধরে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে, বড় কষ্ট হয়। যদি বলি ব'সে নাম কর, বলে— 'মশায় ঘুম পায়, বিরক্তি বোধ হয়, নাম মনে আসে না।' যদি বলি, শুধু আসনে ব'সে থাক, বলে—'মশায় বড় ঢুল পায়।' এরূপ কর্‌লে আর সাধন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? সাধন-ভজন কর্‌বেনা, কেবল পরনিন্দা, পরালোচনা কর্‌বে আর বল্‌বে— 'আমার কাম যায়না কেন? ক্রোধ যায়না কেন? কেনইবা যাবে? কাম, ক্রোধ যা'তে যায়, তাহার তোমরা কি কর? একটি ঘন্টাও যদি স্থির হ'যে বসে নাম কর, তা'হলেও কথা বল্‌তে পার। এক ঘণ্টা নাম কর্‌লেও সাধনের একটি উপকারিতা বুঝ্‌তে পার,—তা কর কই? রাত্রে এদের নিদ্রাবস্থা দেখ্‌লে বড়ই কষ্ট হয়। নিদ্রায় নিদ্রায়ই দিন কেটে গেল। যাদের মোহ বেশী,— তমোগুণ বেশী, — তাদেরই নিদ্রা বেশী, মোহেতে নিদ্রা হয়। নিদ্রা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোহও নষ্ট হ'য়ে যায়।" এইরূপ প্রায় ১৫/২০ মিনিট বলিয়া ঠাকুর নিদ্রিত লোকদের জাগাইতেই যেন উচ্চৈঃস্বরে একটি গান করিতে লাগিলেন, —গানটি তাড়াতাড়ি সমস্ত লিখিতে পারিলাম না, মধ্যের একটুমাত্র এই —

—অলসে ঘুমাবে যত, অজ্ঞানে ঘেরিবে তত,
জীবনের সত্য জ্যোতিঃ নয়নে আর হেরিবে না।
হাসিছে শমন দেখ ....
এখনও সময় আছে, উঠে গাও শ্যামা গুণ।

প্রায় প্রতিরাত্রেই ঠাকুর নিদ্রাত্যাগের বিষয় কিছু-না-কিছু উপদেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সময়ে অধিকাংশ লোকই নিদ্রাবস্থায় থাকেন।

দিবানিদ্রার অপকারিতা। যোগতন্দ্রার লক্ষণ।

কয়েকদিন হয় একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন— নিবিষ্টভাবে নাম করিতে করিতে আমার তন্দ্রার মত হয়। বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কিন্তু ভিতরে পরিষ্কার জ্ঞান থাকে। নাম যে করিতেছি,

তাহা বুঝিতে পারি—এ আবার কি অবস্থা, এমন হয় কেন? ঠাকুর লিখিলেন—"**এই প্রকার অবস্থা হ'লে, তুমি ভাগ্যবান—একে যোগতন্দ্রা বলে—সাধারণ নিদ্রা নয়। যোগনিদ্রা হ'লে, ক্রমে সমাধি অবস্থা লাভ হয়।**"

গুরুভ্রাতাটি ঠাকুরের কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আহারান্তে প্রত্যহই তিনি রাখালবাবুর বৈঠকখানা ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়েন। ২/৩ঘণ্টা সময় নাক ডাকিয়া স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়া থাকেন। তাঁর নাকডাকা বন্ধ করিতে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকে, তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, ধমক্ দিয়া বলেন— 'আমাকে জাগালে কেন? আমার নিদ্রা কি তোমাদের মত নিদ্রা? গোঁসাই বলেছেন— আমার এ সাধারণ নিদ্রা নয়; যোগতন্দ্রা। কিছুকাল এই ভাবে চল্‌লে শীঘ্রই আমার সমাধি হবে। সাবধান! আমাকে যোগতন্দ্রা অবস্থায় কখনও তোমরা বিরক্ত করিও না।"

দিনের বেলায় যাহারা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া একটুকু নাম করিতে ইচ্ছা করেন, এই গুরুভ্রাতাটির নাক ডাকার শব্দে তাহাদের বড়ই বিঘ্ন হয়। আজ মহেন্দ্রবাবু গুরুভ্রাতাটির কথা উল্লেখ করিয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "এই ব্যক্তির নাক ডাকার শব্দে আমরা একটু স্থির হ'য়ে নাম করিতে পারি না। আমরা সময় সময় উহার নাক ডাকার শব্দ বন্ধ করিতে ডাকিলে, আমাদের ধমক্ দিয়া বলেন, 'গোঁসাই ব'লেছেন— এ আমার যোগতন্দ্রা, শীঘ্রই সমাধি হবে।' এ যে বিষম উৎপাত। ঠাকুর লিখিলেন,— "**উহার এ যোগনিদ্রা নয়—রোগ। চিকিৎসা প্রয়োজন। ব'লে দিবেন,—এখানে দিনের বেলা ব'সে ব'সে না ঘুমায়! দিবানিদ্রা গুরুতর অপরাধ। ব্রাহ্মণ বালকদের উপনয়নের সময় প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হয়, 'মা দিবাস্বাপ্সী। আমি দিবসে নিদ্রা যাব না।' দিবানিদ্রায় আয়ুক্ষয় হয়, বুদ্ধি নষ্ট প্রাণ নষ্ট হয়। বংশ লোপ হয়। যত প্রকার উৎকট পীড়া, দিবানিদ্রা তাহার আদি কারণ। এত যে দোষ, এত যে ক্ষতি, তবু কয়জন লোক দিবানিদ্রা যায় না?**"

প্রশ্ন করা হইল— যোগতন্দ্রা কি কি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাবে?

ঠাকুর লিখিলেন—"**প্রথম—নাম করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া নিদ্রার ন্যায় হইবে। দ্বিতীয়—নিদ্রাভাব আসিলে মধ্যে মধ্যে একরূপ ভাষার কোন কোন কথা শুনা যাইবে। তৃতীয়—ভবিষ্যৎ অবস্থার দর্শন স্বপ্নের ন্যায় হইবে। শরীরে কোন জ্ঞান থাকিবেনা কিন্তু ভিতরে জ্ঞান থাকিবে।**"

একটু পরে ঠাকুর আবার লিখিলেন— **প্রয়োজন থাকিলে নিদ্রার অভাবে পীড়া হয়, ইহাও সত্য। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না গিয়া, ৪টার পর যদি অর্দ্ধ ঘন্টা বিশ্রাম করে তা'তে নিজের জীবনের ঘটনা জানা যায়।**

তপস্যা ও পুরুষকার।

একজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবৎ কৃপায়ই যখন সমস্ত হয়, তখন তপস্যা ও পুরুষকারের প্রয়োজন কি?'

ঠাকুর লিখিলেন—পুরুষকার যদি কার্য্য না করে, তবে প্রকৃত আত্ম-পরিচয় হয় না। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের তপস্যা পাঠ করিলে, এ বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। পুরুষকার কৃষিকার্য্যে কৃষকের কার্য্যের ন্যায়। কৃষক ভূমি প্রস্তুত করে, শস্য রোপণ করে, এই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য— তাহার পরে আর তাহার ক্ষমতা নাই। আকাশ হইতে জল বর্ষণ না হ'লে,সে জল সেচন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আন্তরিক উদ্যম—তপস্যা। ইহা প্রযুক্ত হইলেই মেঘ হইতে জল বর্ষণের ন্যায় কৃপা বর্ষণ হয়।

ঠাকুর একটু থামিয়া আবার লিখিলেন,—"তপস্যা দ্বারা আত্মা যত নির্ম্মল হইবে, ততই নিজকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে। কিন্তু তপস্যা দ্বারা নিজকে নিকৃষ্ট মনে করিলেও শরীর, মনকে শাসন করিতে একপ্রকার অহঙ্কার জন্মে, তাহাতে মনে হয় আমি স্বাধীন। আমি মুক্ত, আমি মনুষ্য এই ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে আছে, তপস্যা দ্বারা ইহা প্রবল হয়। এই সময়ে আত্ম-সমর্পন করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পারি না। মনে করিয়া গেলাম—আমার সমস্ত অর্পণ করিয়া আসিব। কিন্তু অমনি ভিতর হইতে যেন রোদন আসে। কে যেন নিষেধ করে, পারিবে না। এখন যদি বলে মর, তবে কি করিবে? যদি বলে স্ত্রী, পুত্র ত্যাগ করিয়া—কৌপীন পরিধান করিয়া বনে যাও—তখন কি করিবে? এই মানসিক সংগ্রাম, প্রত্যেক সাধকের অন্তরকে আলোড়িত করে। এইজন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘা কাটিতে কাটিতে অস্থি ভেদ করিয়া মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ তাহা ধরিয়া, কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ শুনা কথায় অথবা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছু স্থির করিবে না। আপনাকে বিচার করিয়া যাহা যথার্থ আমার অবস্থা, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিবে। যদি আমার আত্মার ভাব হয়, অবস্থা হয়; তবে চুপ করিয়া তাহার গতি দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব। ধর্ম্মভাব পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে দেবতা করিল। আমি সেই পতিত, এইরূপ হইলাম কিরূপে? অতি আশ্চর্য্য। আর যদি পাপ ভিতরে চোরের মত লুকাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দিন সাধন-ভজন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাকে নরকে আনিল কিরূপে ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইব। শ্রেয়, প্রেয়, দুইটি ক্রিয়া মানুষের অভ্যন্তরে কার্য্য করে। তপস্যা দ্বারা, সৎ-সঙ্গ দ্বারা আত্মার ধর্ম্ম-বল প্রবল হয়— তখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ভগবৎ আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

চন্দনঘসা ও ঔপাসনা।

আর আর দিনের মত রাত্রিতে ১২টার সময়ে জাগিয়া আসনে বসিলাম। নিয়মিতরূপে সকালবেলা পর্য্যন্ত নাম একটানা চলিল না। কখনও তন্দ্রা কখনও নাম, কখনও বা ঠাকুরের কথা শুনিয়া সময় কাটান গেল। শেষ রাত্রে আরতির সময় প্রত্যহই যেরূপ হয়— আজও সেই প্রকারই হইল। ঠাকুর কাঁসর বাজাইলেন। তৎপরে ঠাকুর রসগোল্লা দু'টি আমাকে দিয়া শালগ্রামকে ভোগ দিতে বলিলেন। আমি উহা ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া রাখিয়া দিলাম। খুব

ভোরে স্নান, সন্ধ্যা তর্পণাদি সারিয়া ফুল সংগ্রহ করিলাম। বিস্তর ফুল জুটিল। বাসায় আসিয়া, ঠাকুর পূজার আয়োজন করা গেল। চন্দন ঘসিবার সময়ে গতকল্য ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন— "দশমাসের গর্ভবতীর মত ধীরে ধীরে চন্দন ঘস্‌তে হয় এবং তাতে নিজেকে মিশাইয়া দিতে হয়।" আজ চন্দন ঘসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কৃপায় খুব একটি ভাব আসিয়া পড়িল। মনে হইল, এই চন্দনই ধন্য— ইহা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। বারংবার আমি চন্দনকে নমস্কার করিতে লাগিলাম, এবং চন্দনের সঙ্গে মিশিয়া যেন ঠাকুরের চরণে লাগিতে পারি—এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এই চন্দন ঘসাই, সকল পূজা-অর্চ্চনা। অন্য পূজার আর প্রয়োজন কি? এই অধিকার পাইলেই আমার পক্ষে ঠাকুরের বিশেষ দয়া ভাবিব। চন্দন ঘসা শেষ হইলে, উহা ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলাম।—তিনি আঙ্গুলে করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন,—অবশিষ্ট শালগ্রাম পূজার জন্য রাখিলাম। এই সময়ে চা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর চা সেবার পূর্ব্বেই আমার পরিমাণ মত চা আমাকে দিলেন। আমি উহা শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইলাম। গতকল্যের রসগোল্লা দু'টিও খাইলাম। রসগোল্লা দু'টি খাইতে, আমার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। অন্যান্যকে না দিয়া, ঠাকুরের দেওয়া বস্তু নিজে ভোগ করা যেন কেমন লাগিল। কিন্তু কাকে কি দিব?—বহুলোক,—তাই, নিজেই খাইলাম। জলখাওয়ার পরে ন্যাস করিতে লাগিলাম, খুব আনন্দ হইল। এই সময়ে জনৈক বাউল আসিলেন এবং সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তাঁর সঙ্গীত খুব লাগিয়া গেল। সকলেই ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে, গুরুভ্রাতা পরেশবাবু ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য একখানা মলিদা চাদর আনিয়া দিয়াছিলেন। আজ ঠাকুর তাহা মনোহর দাস বাবাজীকে দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বাবাজী খুব সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। একদিনও ব্যবহার না করিয়া, ঠাকুরের এ ভাবে মলিদা দান গুরুভ্রাতাদের কাহারই ভাল লাগিল না।

যথার্থ দান ও দানের পাত্র।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজীকে ঠাকুর নূতন মলিদার চাদরখানা দিলেন দেখিয়া অনেকে মনে দুঃখ পাইলেন। অপরাহ্ন প্রায় ৪টার সময়ে একটি গুরুভ্রাতা উৎকৃষ্ট একখানা ফ্লানেলের চাদর আনিয়া ঠাকুরকে দিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া গায়ে দিয়া বসিলেন। দু'টি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন— 'এই চাদরখানাই বা কয়দিন আপনি গায়ে দিবেন? বাবাজী কাল আসিলে, তাকেই হয়ত কাল আপনি এখানাও দিয়া ফেলিবেন। আপনি ব্যবহার না করিয়া দিলে, আমাদের বড় কষ্ট হয়।' ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের কথা শুনিয়া, চাদরখানা ছুড়িয়া ফেলিলেন; এবং লিখিয়া দিলেন—"সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগই দান। যাহাকে দিবে সে অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও, দাতা কিছু বলিতে পারেন না। কারণ তখন সে বস্তু তাহার নহে। দাতা যদি কিছুমাত্র মনে করেন যে, আমার অভিপ্রায় মত আমার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে,—ইহাকে

দান বলে না,—ইহাকে গচ্ছিত রাখা বলে। শাস্ত্রে ইহাকে ন্যস্ত বস্তু বলিয়াছেন। ন্যস্ত বস্তু অর্থাৎ এরূপ দান করা ও গ্রহণ করা উভয়ই পাপ। তোমাদের মনে এ ভাব আছে।

আমি যাচ্ঞা করি না। যদি আমার কোন ব্যবহারে যাচ্ঞার ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা আমার অপরাধ সন্দেহ নাই। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য ভিন্ন আর কিছুই নহি। সুতরাং আমার ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে। যখনই ত্রুটি দেখিবে তখনই বন্ধুভাবে বলিবে,— মনে মনে রাখিও না। যিনি আমার দোষ দেখাইয়া দেন তিনি আমার পরম বন্ধু;—আমি তাঁহাকে ভালবাসি। হাজার রসগোল্লা দেও, কাপড় দেও—তাহাতে ভবি ভোলে না, কেবল দোষ দেখাইলে ভোলে। ভগবৎ কৃপায় তোমাদের মঙ্গল হউক।"

জনৈক গুরুভ্রাতা কহিলেন— সকলেই কি দানের পাত্র? যে যাহা চাহিবে তাহাকেই কি তা দিতে হইবে? আমরা তো দানের পাত্রাপাত্র বুঝি না?

ঠাকুর—যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে, সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে। যে খোষামোদ করে, সে দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লজ্জা, মান এবং বংশমর্য্যাদা, প্রত্যুপকার— প্রত্যাশা,—এ সমস্ত ভাবে দান, অপাত্রে দান,—প্রকৃত দান নহে। স্বর্গ-কামনা, পাপ-মোচন, পরকালের জন্য সংগ্রহ ইত্যাদি ভাবে দান করিলে তাহা দান মধ্যে গণ্য নহে। দান করিয়া অনুতাপ হইলে, তাহা দান নহে। যেমন পিপাসা হইলে অতি ব্যগ্রতার সহিত জলপান করে—সেইরূপ যিনি প্রকৃত দাতা তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি দুঃখ দূর করিতে পারেন তাহাতে কুণ্ঠিত হন না। দান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা দাতা,—মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন।

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন— আমার এখানে যাহারা আসিবে তাহাদিগকে আর কেহই কিছু বলিবে না। অনেক সময়ে তাহাদের অপেক্ষা তোমাদের দ্বারা অনিষ্ট হয়। আমার এখানে তোমাদের বিশেষ অধিকার নাই। তোমাদের যেমন অধিকার,—তেমন সমস্ত নর-নারীর। আমার একটু সেবা-শুশ্রূষা কর বলিয়া আপনার, আর সকলে পর,— ইহা কখনও ভাবিবে না। আর আমার এখানে যিনি আসিবেন— তাঁর সমস্ত ভার তাঁরই উপর। যেমন তীর্থাদিতে যায়। 'গোঁসাইয়ের নিকট গেলাম, কেহ খাইতে দিল না,'—এখানে কুটুম্বিতা নাই- চক্ষুলজ্জা নাই। আমি এইভাবে আছি—যে, প্রতিদিন ভিক্ষারূপে যাহা দেন তাহা গ্রহণ করি। এখানে আমার নিজের কিছুই নাই;—যখন যাহা ঘটে, পরামর্শ দি। অনেক সময় আমার স্বপাক খাইতে ইচ্ছা হয়; অসুবিধা বলিয়া তাহা করি না। যাহারা টাকা-কড়ি দিয়া তুষ্ট করিতে যায়, তাহারা চিরদিনই ধর্ম্মরাজ্যে নিন্দিত। ভগবান তাহাদের দোষ তাহাদের অন্তরে মাখাইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন;—তাহাতে তাহারা ঐহিক, পারত্রিক হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা আর শাস্তি কি? যাঁহারা ভগবৎ-ভক্ত তাহারা একটু জানিতে পারিলে আর তাহাদের গৃহে পদার্পণ করেন না। ইহাও অল্প শাস্তি নহে।

অবিশ্বাস ও ধ্যানেতে জ্বালা।

বাবাজী বিদায় হইলে, ঠাকুর স্নানাহার করিতে ভিতর-বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, গোপালভট্ট গোস্বামী যে চক্র পূজা করিয়া ধ্যান প্রভাবে তাহা হইতে রাধারমণ বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমার এই চক্রও তাহাই। ইহা শুনিয়া অবধি মনে মনে আমার দৃঢ় সঙ্কল্প অসিয়াছে, এই শালগ্রাম চক্রে ঠাকুর পূজা করিতে করিতে, ইহার উপরে ঠাকুরের শ্রীরূপ প্রকট করিব। আমি একান্তপ্রাণে, ঐ ভাবে শালগ্রামে গঙ্গাজল তুলসীপত্র অর্পণ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে ঠাকুর আহারান্তে আসনে আসিয়া বসিলেন এবং শালগ্রামের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, আমার পূজা দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমার অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি, সর্ব্বশক্তিমান, স্বয়ং পরমেশ্বর, সম্মুখে থাকিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, আমার পূজা হৃষ্টান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছেন— এই ভাবটি প্রাণে উদয় হওয়ায়—ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ঠাকুরের নিকট বিশ্বাস-ভক্তির জন্য, অত্যন্ত ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে অবিশ্বাস বিষম বিষ মনে হইতে লাগিল। যত প্রকার ক্লেশ আছে, অবিশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইতে লাগিল। আমি খুব একান্তপ্রাণে কত কি প্রার্থনা করিলাম। এই সময়ে ঠাকুর এক একবার আমার পানে তাকাইতে লাগিলেন। আমার কিন্তু ঠাকুরের উপর বড়ই অভিমান জন্মিল। আমি ঐ অভিমানে, মনে মনে, ঠাকুরকে না বলিলাম এমন কিছুই নাই। অবশেষে স্থির করিলাম—এই অপরাধী জীবন রাখিয়া লাভ কি? আত্মহত্যা করাই ভাল। অবিশ্বাস জনিত ক্লেশ আর সহ্য করিতে পারিব না। কিছু বিষ আনিয়া রাখিব। ঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের প্রতি যখন ছিটা ফোঁটা বিশ্বাসও জন্মিবে, সেই সময়ে বিষ পান করিয়া, ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে ঐভাব লইয়া দেহত্যাগ করিব। মনের ক্লেশে, কতপ্রকার যে আত্মহত্যা করার সঙ্কল্প আসিল ও এই বিষয়ে দৃঢ়তা জন্মিতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। যখনই হউক আত্মহত্যা আমার করিতেই হইবে। অবিশ্বাস লইয়া লক্ষ বৎসর জীবিত থাকাও কিছুই নয়; বিশ্বাস লইয়া এক মিনিট বাঁচিলেও জীবন ধন্য। আজ সর্ব্বদা এই ভাবেই প্রার্থনা চলিল। 'ঠাকুর! একবার আমাকে এক মিনিটের জন্য বিশ্বাস দেও—বিশ্বাস-ভক্তির সহিত এক মিনিট তোমার শ্রীরূপ দর্শন করিয়া দেহপাত হউক,—পরে সহস্র বৎসরের জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি। আর অপরাধী করিও না। অবিশ্বাস দূর কর। আমার আর কিছু চাহিবার নাই। এইভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নামের সহিত প্রার্থনা করিতে করিতে শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িল, অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইতে লাগিল। শরীরে শীতের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। একটু পরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি মণিপুরে ধ্যান করিতে করিতে ঐ স্থানে উত্তাপ বোধ হইতে লাগিল; যেন কেহ থাকিয়া থাকিয়া আগুনের সেক দিতেছে। নিঃশব্দ প্রাণায়ামের দমের সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ এই জ্বালা আগুনে পোড়ার মত এতই বৃদ্ধি হইল যে, সাধন ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু তাহাও পারিলাম না। জ্বালা তীব্র হইলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা আরাম আসিতে লাগিল। এই আরাম ঝাল খাইয়া আরামের মত বা চুল্‌কাইয়া সুখ পাওয়ার মত। কষ্টবোধ হইলেও

ছাড়িতে প্রবৃত্তি হইল না। আজ সহস্রারে ধ্যানকালে গাড়ীর চাকার মত জ্যোতির্ম্ময় শ্বেত বৈদ্যুতিক চক্র ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এই অবস্থার পর, ঠাকুর রাখালবাবুকে দেখিয়া আমার জন্য ঘৃত মিশ্রিত গরম দুধ আনিতে বলিলেন। উহা খাইয়া আমি একটু সুস্থ হইলাম। ঠাকুর আজ সময় সময় আমার প্রতি এক একভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিতে যে কত স্নেহ, কত দয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহা বলা যায় না। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম— 'ঠাকুর! আর তুমি আমার প্রতি এইভাবে তাকাইও না। তোমার এই দৃষ্টি আমার প্রতি কেন? আমি ঐ দৃষ্টি ভোগ করার, ঐ স্নেহ-মমতা ধারণ করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যদি তোমাতে যথার্থ বিশ্বাস ও একান্ত ভক্তি না দেও তবে আর এ জীবনে আমার পানে তুমি চাহিও না, এবং আমিও যেন আর তোমাকে না দেখি। আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাউক!" এই প্রকার প্রার্থনার সহিত নাম কবিতে করিতে দিনটি বড়ই সুখে অতিবাহিত হইল।

যোগ কি? যোগের অবশ্য পালনীয় উপদেশ।

আহারের পরে সন্ধ্যার সময়ে আসনে যাইয়া দেখি ঘর-ভরা লোক। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন হইতেছে, ঠাকুর তাহার উত্তর দিতেছেন। একজন প্রশ্ন করিলেন—'যোগ কাহাকে বলে? যোগ ও ভক্তিযোগ— সব যোগই কি এক?'

ঠাকুর— যদ্দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়,—সমস্তই যোগ। 'সংযোগঃ যোগমিত্যুক্তঃ জীবাত্মা পরমাত্মনঃ',— জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহাকেই যোগ বলে। ইহা ভিন্ন যে যোগ, তাহাকে হঠযোগ কহে। কেবল নাম জপ, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ভক্তিযোগের অঙ্গ। কেবল শ্রীহরি নাম জপ, ইহাও যোগ। প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের বহিরঙ্গ। ইহা করিলেও হয়, না করিলেও হয়। বৈষ্ণব স্মৃতি— 'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে গোস্বামিগণ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, দেখিবেন। গুরুদেবের নিকট শ্রীহরি নাম দীক্ষা গ্রহণ করিবে; তবে তাহা ফলদায়ক হইবে,—ইহাই শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে, ঋষিদের পথের অনুসরণ হয় না।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাঁহারা যোগসাধন করেন—কি কি অনিষ্টকর ভাব তাঁহাদের সাধন বিষয়ে অন্তরায়?

ঠাকুর বলিলেন— ১। লজ্জা, ২। ঘৃণা, ৩। ভয়, ৪। শোক, ৫। জুগুপ্সা, ৬। কুল, ৭। শীল, ৮। জাতি— এই অষ্টপাশ যোগের বিশেষ অন্তরায়। —আমাদের সাধনে যে সকল বিষয় বিশেষ অনিষ্টকর ঠাকুর তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন—যাহা বলিলেন, কিছু বুঝিলাম না। লজ্জাও কি অন্তরায়?

ঠাকুর লিখিলেন— লজ্জা অতিক্রম করিতেই হইবে। লজ্জা থাকিলে কাহারও কিছু হইবে না। লজ্জার মাথা একবারে খাইয়াই আমার মনুষ্যত্ব লোপ হইয়াছে। আমার পাপ-পুণ্য কিছুই নাই। আমার ছেলে,—আমরা অমুক,—এইরূপ সংস্কার চলিয়া গিয়াছে।

পর-সেবাই ধর্ম্ম। একস্থানে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিবেন। একজনের দ্বারা কার্য্য আদায় করিলে অপরাধ হইবে। অভিমান কি সহজে যায়? কাম ছাড়িব, ক্রোধ ছাড়িব, লোকে সাধু বলিবে,—এই অভিমান সকলের অপেক্ষা শত্রু। অভিমানকে কেবল পর-সেবা ও পরোপকার দ্বারা জয় করিতে হইবে। সংসারে তোমাদের চেয়ে যাহাদিগকে ছোট মনে কর, তাহাদের সেবা করিতে হইবে। আমার সেবা করিয়া কোন ফল নাই—কেবল ভস্মে ঘৃত দিতেছ। সেবায় বিরক্ত হইলে, সে সেবায় কোন ফল হইবে না।

কাহারও প্রতি দ্বেষ-হিংসা করিবে না। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।' হিংসা অর্থ, হনন করিবার ইচ্ছা। হন্ শব্দে আঘাত বুঝায়। কোন ব্যক্তির প্রাণে আঘাত না লাগে, এরূপভাবে বলিতে হইবে। মারিলেই যে হিংসা হয় তাহা নহে। হিংসা যদি অন্তরে থাকে এবং ক্রোধপূর্ব্বক অথবা স্বীয় তৃপ্তির জন্য বধ করিলে হিংসা হয়। অন্তরে হিংসা থাকিলে লীলা দর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্য হৃদয় হিংসাশূন্য হয়, তখনও লীলা দর্শন হইতে পারে। বাহিরে অনেক পূজা-অর্চ্চনা, তপ-জপ করিয়াও যদি হিংসা থাকে,—তাহা ধর্ম্ম নহে। অহিংসা না হইলে ধর্ম্ম হয় না। কাম, ক্রোধেও এত অপকার করে না। কখনও অন্যের দোষ দেখিবে না, কেবল নিজের দোষ দেখিতে হয়। আত্মীয় স্বজনের দোষ, সংশোধনার্থে দেখান যায়,—কিন্তু ঘৃণা করিবে না। নিজকে সর্ব্বদাই অতি নীচ বলিয়া দেখিতে হইবে। কখনও যেন অহঙ্কার ভাব মনে না আসে। অন্য স্ত্রীকে দেখিয়া নমস্কার করিতে হয়। পথে চলিতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি করিয়া চলিবে। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে অথবা দুইবার শ্বাস-প্রশ্বাসে একবার নাম-সাধন করিতে হয়। সত্য কথা বলিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বদাই বিবেচনার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে। না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলিতে নাই।

নাম করিয়া ফল পাই না কেন?
শুষ্কতায় কর্ত্তব্য।

জনৈক গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— প্রতিদিনে আপনার মুখে নামের কত মাহাত্ম্য শুনিতেছি। শাস্ত্রকারেরাও নামের অসংখ্য মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু নাম করিয়া তাহার একটি ফলও তো পাইতেছি না? আমাদের এই দুর্দ্দশা কেন?

ঠাকুর লিখিলেন— শাস্ত্রকার মুনি ঋষিরা ভগবানের নামের যেমন অসংখ্য মাহাত্ম্য বলিয়া গিয়াছেন,- নাম করিয়া যাহারা পাপ করে তাহাদিগকেও ভয়ানক অপরাধী বলিয়াছেন। নাম—অপরাধ, এমন পাপ আর নাই। তৃণের মত নীচ হ'য়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হ'য়ে, মান্য ব্যক্তিকে মান্য ক'রে, নিজে অভিমান ত্যাগ ক'রে নাম কর্‌লে, নামের ফল তখনই পাওয়া যায়। তবে ঐ সকল অবস্থা সৎসঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরু আজ্ঞা পালন, পিতা মাতা গুরুজনদিগের এবং ভগবৎ ভক্তদিগের সেবা দ্বারা লাভ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম— 'নাম করিতে শুষ্কতা বোধ হইলে এবং বিরক্তি আসিলে নাম করিব, না ছাড়িয়া দিব?'

ঠাকুর বলিলেন— **প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগ্‌লেও, ঔষধ গেলার মত কর্‌লে ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচি হইলে, তাহার ঔষধ নামই। যেমন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হয়, তখন মিশ্রিও তিক্ত লাগে; —ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রি,—খাইতে খাইতে মিশ্রি মিষ্টি লাগিতে থাকে। আনন্দ না পাইলে নাম করিব না,— যখন ভাল লাগিবে তখনই নাম করিব,—এই ভাব ব্যবসাদারী। ভাল আমার লাগুক্ আর নাই লাগুক, আদেশমত নাম করিতেই হইবে। নাম দ্বারা ক্রুশ বিদ্ধ হইতে হইবে। এই ক্রুশ বিদ্ধ হইলেই পরে পুনরুত্থান হয়।**

গুণাতীত হইলেও তাপ থাকে।

প্রশ্ন করা হইল— 'যতদিন গুণ আছে, ততদিনই কি তাপ থাকে?'

ঠাকুর— **ত্রিগুণ নষ্ট হইয়া গেলেও তাপ থাকে। ভগবৎ দর্শনের অভাবই তাপ।**

প্রশ্ন— ত্রিতাপ কখন যায়?

ঠাকুর— **কর্ত্তৃত্ব যতদিন আছে ততদিন তাপ যায় না। ত্রিতাপ না গেলে মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত ব্যক্তিরা কর্ম্মত্যাগ করেন না, অনাসক্ত হইয়া বালকের ক্রীড়াবৎ, উন্মাদবৎ তাঁহারা সকল কার্য্যই করিয়া যান। কেন যে করেন তাহা তাঁহারাও জানেন না। ভিতরে অকর্ত্তা ও বাহিরে কার্য্য,—মহাপুরুষদের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিলে কোন তাপই স্পর্শ করে না। যুক্ত-ভক্ত হইলে তাপ থাকে না।**

এখন কুলগুরু প্রদত্ত সাধন করিব কি না?

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ সামন্ত বংশের বহু গণ্যমান্য লোক এই বাড়ীতে ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'আমাদের কুলগুরু আছেন, তাঁহার নিকট আমরা দীক্ষা নিয়াছি। এখনও আমরা সেই দীক্ষানুযায়ী সাধন করিতে পারিব কি না?'

ঠাকুর বলিলেন— **"না, তা হবেনা। হয় এই সাধন কর, না হয় সেই কুলগুরু প্রদত্ত সাধনই কর। দু'টা এক সময়ে চল্‌বে না। একটা ধর।"** গুরুভ্রাতা কয়টি বলিলেন—'তিনিও আমাদের কুলগুরু, তাঁর দীক্ষা মত কি প্রকারে না চলিয়া পারি?' ঠাকুর বলিলেন—**"ওরূপ হ'লে তোমরা এখানে দীক্ষা নিলে কেন? দীক্ষা নেওয়া তাহ'লে তোমাদের অন্যায় হয়েছে। কুলগুরুর সাধন নিয়েই তোমাদের থাকা উচিৎ ছিল। যাক্ কুলগুরু প্রদত্ত সাধন কর্‌লে এই সাধন আর ক'র না।"** এই সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন।

সামন্ত কুলতিলক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতা, একদিন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন— **"আরো কিছুদিন অপেক্ষা**

কর্‌লে ভাল হয়।" তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন— "বেশ, তাই হ'বে। তবে আমাকে আপনি অভয় দিন,— আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে আমার মৃত্যু না হয়।" ঠাকুর অমনি তাঁহাকে সেই দিন (২৮শে ভাদ্র) রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে দীক্ষা দিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার কতকগুলি লোক ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের নিকট বিদায় হইয়া যাওয়ার সময় ঠাকুর বলিলেন—"বর্দ্ধমানে আমার একটি বন্ধু আছেন- দেবেন্দ্র সামন্ত। আপনারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন,—উপকার পাবেন। দেবেন্দ্র দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ—অমনটি বড় দেখা যায় না।"

আজ রান্না করিতে যাইতে একটু বিলম্ব হইল। ভিতর-বাড়ীতে যাইয়া দেখি, কুতু ও হরিনারায়ণ বাবুর স্ত্রী আমার উনন ধরাইয়া রান্নার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রান্না করিয়া শালগ্রামকে ভোগ দিয়া হোমান্তে প্রসাদ পাইলাম; এবং যথাসময়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার পর আর আর দিনের মত শালগ্রামের আরতি করিয়া আমি বারান্দায় শয়ন করিলাম। গুরুভ্রাতারা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

প্রার্থনায় ঠাকুরের সহানুভূতি।

সকালবেলা স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণান্তে ফুল সংগ্রহ করিয়া বাসায় আসিলাম। শালগ্রামটিকে নমস্কার করিয়া আসনে বসামাত্রই, ঠাকুর আমাকে সুস্নিগ্ধ, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দয়া করিলেন। খুব ভাবের সহিত ন্যাসাদি করিয়া পূজা আরম্ভ করিলাম। আজ গুরুদেবের দয়ায় অশ্রুজলের আর বিরাম নাই। খুব নাম করিতে লাগিলাম। নামের সঙ্গে প্রার্থনা অবিশ্রান্ত চলিল। মনে মনে ঠাকুরকে জানাইতে লাগিলাম—'ঠাকুর! আর এই ক্লেশ দিও না। তুমি তো দয়াল, দয়াল হ'য়ে এরূপ নির্দ্দয় কিরূপে হ'লে? আমাকে বিশ্বাস-ভক্তি দিয়ে, যে কষ্ট ইচ্ছা দেও; আপত্তি কর্‌ব না। তোমাতে বিশ্বাস ও ভালবাসা না জন্মান পর্য্যন্ত তোমার দয়াই ধর্‌তে পার্‌ছি না। প্রতি রাত্রিতে আমাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াইয়া ভুলাও কেন? রসগোল্লা দিতে পার, বিশ্বাস-ভক্তি দিতে এত কৃপণতা কেন? তোমার ভাণ্ডারে তো কোন বস্তুরই অভাব নাই! যে বস্তুর অভাব থাকে তাহা দিতে আপত্তি হ'তে পারে। তোমার অভাব কিসের? আর রসগোল্লা ও বিশ্বাস, এ দু'টির মধ্যে তারতম্য আমার নিকটে। কিন্তু তোমার নিকট তো এ দু'টিই অতি তুচ্ছ বা সমান, তবে দিতে এত কষাকষি কেন?'

বহুক্ষণ এ প্রকার প্রার্থনার সহিত নাম চলিল। ঠাকুর এই সময় মধ্যে মধ্যে আমার দিকে আড়-চোখে তাকাইতে লাগিলেন। আজ এমন সুন্দর সুন্দর সব প্রার্থনা আসিয়া পড়িল যে, এখন আর তাহা লিখিবার সাধ্য নাই। সেই প্রার্থনা আমার বিফলে গেল না। ৪টার সময়ে ঠাকুর আমার পানে তাকাইয়া চক্ষু টিপিয়া ও ঘাড় নাড়িয়া আমার ভাবে সহানুভূতি জানাইলেন। আমিও চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে রান্না করিতে ভিতর-বাড়ী চলিয়া গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই

ভাতে সিদ্ধ ভাত রান্না করিলাম; এবং শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইয়া অবিলম্বে ঠাকুরের নিকট চলিয়া আসিলাম।

ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের হেতু। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আধুনিক কি পুরাতন?

বহু গুরুভ্রাতা ও বাহিরের ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট উপস্থিত দেখিলাম। তাঁহারা ঠাকুরের সহিত নানা প্রশ্নালাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন— "শাস্ত্র ও সদাচার ধরিয়া থাকিলে ঠকিতে হয়না। পুরাতন লইয়া বসিয়া থাকিলে লাভ আছে। আমি যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিলাম, নিজের বুদ্ধিতে নয়। একদিন সীতানাথ মহাপ্রভুকে লইয়া গেলেন; গিয়া বলিলেন,—'ওরে ব্রাহ্মসমাজেব কাজ হইয়াছে,— এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হ'।' এখন দেখিতেছি নির্ভরই একমাত্র শান্তি! কিন্তু এমনই মানুষের দুর্ভাগ্য, কিছুতেই নির্ভর হয়না। ঘুরে ফিরে নানা কষ্ট পেয়ে কিছুই কর্‌তে পারেনা। চারদিকে লোক নির্ভর হ'তে দেয়না। নিজের চেষ্টায় কিছুই হয়না; এটি বিশ্বাস হ'লেই যথার্থ উপকার।"

একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম নূতন না শাস্ত্রে ইহা আছে?' ঠাকুর লিখিলেন— "শ্রীচৈতন্য যেভাবে প্রচার করিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। অতি পূর্ব্বে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র, সর্ব্বদা একত্র নাম গান করিতেন। অহিংসাই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে প্রীতি, তৃণের মত নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ, সর্ব্বদা হরিনাম স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন ইত্যাদি ভাব এই চারিজন প্রচার করিয়া যান। এজন্য তাঁহাদিগকে আদি বৈষ্ণব বলে। 'সনৎকুমার-সংহিতা' অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব উপাসনা অদ্যাপি প্রচলিত। কালের গতিতে এই বৈষ্ণব ভাব ম্লান হইয়া যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড প্রচারিত হয়। ক্রমে এতদূর মলিন হইয়াছিল যে, মহাপ্রভু যখন জন্মগ্রহণ করেন, মনসা পূজা, বিষহরির গান এবং দুই একটি স্তোত্রমন্ত্রই ধর্ম্ম ছিল। এ সময়ে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লোকের নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে জনসমাজে অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ বৈষ্ণব মধ্যে তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ৫/৭ জন যাঁহারা আছেন দেখা যায়, তাঁহারা অধিক সময় নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন! সময়ে সময়ে একত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াও কৃতার্থ হন।"

ঠাকুর আবার লিখিলেন— প্রথমে বটতলায় যে চৈতন্যভাগবত ছাপান হইত, তাহাতে আছে যে, একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন— 'তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।' তিনি বলিলেন—'তুমি দেশে দেশে এইরূপ ঘুরিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিব? 'মহাপ্রভু বলিলেন'—ইহার কারণ আছে। তুমি যতই প্রেমভক্তি বিলাও না কেন, আমাদের অন্তর্দ্ধানের পর, ইহার আর মাহাত্ম্য থাকিবেনা। যদি আমাদের বংশধর থাকে, তবে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার বিশেষ আদর করিবে; তাহা হইলেই সব

ঠিক থাকিবে। আমি সন্ন্যাস লইয়াছি, গৃহী হইতে পারিব না। তোমাকে ও অদ্বৈত প্রভুকে সন্তান জন্মাইতে হইবে।' এজন্য নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ্ করেন। ইহা আজকালকার চৈতন্যভাগবতে নাই। সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক বৃত্তান্ত বাদ দিয়া বর্ত্তমান বহি ছাপান হয়। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস নিয়াছিলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

গৈরিক গ্রহণ করাতে কোন গুরুভগ্নীকে নিষেধ উপদেশ।

ভরত-মিলন, কুরুক্ষেত্র মিলনাদি যাত্রার প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বিধবা কন্যাটিকে লইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মেয়েটি খুব অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন— আমাদেরই গুরুভগিনী। বিশুদ্ধভাবে সদাচারসম্মত জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন। পরিধানে গৈরিক বসন। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের সময়ে দিদিমা ও শান্তি প্রভৃতির সহিত তিনি হলঘরে চিকের আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছিলেন। ঠাকুর কীর্ত্তনান্তে; ঘর হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া, মেয়েটিকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মেয়েটির পিতার নিকটে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া কহিলেন—"দেখ মা, গেরুয়া বস্ত্র যোগ বস্ত্র, উহা গৃহীদের পর্‌তে নাই। তুমি ঐ গেরুয়া বস্ত্র প'র না। আর কোন সাধু-মহাত্মার নিকট কিছু শিক্ষা লইতে যেও না। নিজে গীতা পাঠ ক'রো না,—গীতা অন্যের মুখে শ্রবণ কর্‌তে হয়। বহুশাস্ত্র পাঠ ক'রো না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুনঃপুনঃ পাঠ ক'রো। আমি ৩২ বার প'ড়েছি। চৈতন্যচরিতামৃতই তোমার একমাত্র সঙ্গী জেনো। সাধন-ভজন সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। কোন বিষয় জান্‌বার জন্য বেশী উদ্বেগ হ'লে, আপনিই জান্‌তে পার্‌বে।" মেয়েটি বলিলেন—আমি যেখানে থাকি, সাধনের লোক কেহ আমার সঙ্গী নাই।

ঠাকুর বলিলেন—মা, তোমার চৈতন্যচরিতামৃতই সঙ্গী, আর কোন সঙ্গীর দরকার নাই। ভাল ক'রে নাম কর,—সকলই জান্‌তে পার্‌বে।

বীর্য্যধারণ ব্যতীত যোগসাধন হয় না। উর্দ্ধরেতাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

সংকীর্ত্তনান্তে আজ ঠাকুর নিজ হইতে গুরুভ্রাতাদের কতকগুলি উপদেশ দিলেন। সংক্ষেপে লিখিতেছি। ঠাকুর বলিলেন—"আজকাল যোগ করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে। যোগ কর্‌তে হলে বীর্য্যধারণ তাঁর কর্‌তেই হবে। বীর্য্যধারণ না কর্‌লে যোগ সহজসাধ্য হয় না। এজন্য পূর্ব্বকালে যোগাভ্যাস কর্‌বার জন্য মুনি ঋষিরা নির্জ্জন বনে ও পাহাড় পর্ব্বতে, যথায় স্ত্রীলোকের কোন প্রকার উৎপাত নাই, তথায় গিয়া বীর্য্যধারণটি প্রথমেই অভ্যাস করে নিতেন। যোগ কর্‌তে হলে বীর্য্যধারণ কর্‌তেই হবে; না হ'লে হবে না। বীর্য্যস্থির হ'লে চিত্তটি স্থির হয়। বীর্য্য চঞ্চল হ'লে, মন কিরূপে স্থির হবে? মন স্থির হ'লেই, ক্রমে সব হয়ে আসে। প্রেম ভক্তি বীর্য্যধারণের উপর নির্ভর করে না বটে, কিন্তু বীর্য্যধারণে যোগের বিশেষ সাহায্য হয়। প্রেম ভক্তি স্বতন্ত্র বস্তু, উহা ভগবানের কৃপায়ই লাভ হয়ে থাকে। বীর্য্যধারণ করা সহজ নয়। ইহা

একবার হয়ে গেলে দেহের আর কোন অসুখ থাকে না। তবে পূর্ব্ব হ'তে যে সকল রোগ থাকে তা' অবশ্য একেবারে যায় না।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—গৈরিক বসন ও জটা যাঁহারা ধারণ কর্‌বেন তাঁদের বীর্য্যধারণ করা চাই। বীর্য্যধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল ধারণ কর্‌লে অপরাধ হয়। ঐ সকল গ্রহণ ক'রে যদি বীর্য্যপাত হয় তবে চৌদ্দপুরুষ নরকে যায়,—ঋষিরা এরূপ অভিশাপ দিয়ে গেছেন। কেবল ইহা নয়,—যে ব্যক্তি উহা ধারণ করে সেও পশুপক্ষী ইত্যাদি যোনীতে গিয়া জন্ম নিতে বাধ্য হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—যাহারা ঊর্দ্ধরেতা হয়, তাদের সকলেরই কি একই প্রকার অবস্থা? ঠাকুর বলিলেন—"যাঁরা বীর্য্যধারণ করেন তাঁদের সকলের এক অবস্থা হয় না। যাঁরা ভক্তি পথে চলে ঊর্দ্ধরেতা হন তাঁদের এক প্রকার অবস্থা, আবার জ্ঞানপথে চলে যাঁরা ঊর্দ্ধরেতা হন তাঁহাদের অন্য অবস্থা। হঠযোগ করেও ঊর্দ্ধরেতা হয়; তাঁদের আবার অন্য প্রকার অবস্থা।" আজ সংকীর্ত্তনের পর একটু অধিক রাত্রে শয়ন করিলাম। গুরুভ্রাতারা বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিলেন।

ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া ত্যাগের পূর্ব্বাভাষ। রহস্যপূর্ণ আসন ত্যাগ। মহাশঙ্খমালা।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আর যাইবেন কি না, গেণ্ডারিয়া যাইয়া আর থাকিবেন কি না, এই বিষয় লইয়া গুরুভ্রাতাদের মধ্যে নানাপ্রকার আলোচনা চলিয়াছে। আমারও ধারণা ঠাকুর গেণ্ডারিয়া গেলেও তথায় বেশী দিন আর বাস করিবেন না। গেণ্ডারিয়া বাসের বাধ্যবাধকতা ঠাকুরের শেষ হইয়াছে। ঠাকুরের পরম মনোরম ভজন-কুটীরের গোফাঘরে রহস্যময় যে অদ্ভুত আসনটি ছিল অকস্মাৎ একটি বিস্ময়কর কারণে ঠাকুর তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর যখন ঐ আসনে আর বসিবেন না, তখন গেণ্ডারিয়ায় থাকার প্রয়োজনই বা কি আছে তাই আমার সন্দেহ হয়। ঠাকুরের এই আসন ত্যাগের ঘটনার সহিত আমার ছিটা-ফোঁটা সম্বন্ধ আছে অনুমানে সেই সময়ের ঘটনাটি আজ এই স্থানে ডায়েরীতে লিখিতেছি—

চণ্ডী পাহাড়ে রওয়ানা হওয়ার দু'চার দিন পূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণদর্শন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। দুই তিন দিন বাড়ীতে থাকিয়া মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর যখন আমি গেণ্ডারিয়া রওয়ানা হইলাম, চলন মুখে মা আমাকে সরকারী বাড়ী শালগ্রাম নমস্কার করাইতে লইয়া গেলেন। শালগ্রাম প্রণামের পর ঐ বাড়ীর ভিতর একখানা কোঠাঘরে মা আমাকে লইয়া গিয়া আমাদের একটি সিন্দুক খুলিলেন এবং একগাছা মালা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'তোর ঠাকুরকে কর্ত্তার এই জপের মালা ছড়াটি দিস্। তিনি এই মালাটি প্রত্যহ আহ্নিককালে জপ কর্‌তেন। এতকাল এটি আমি গোপনে রেখেছি—

কেহ ইহার খবর জানে না। কয়দিন যাবৎ তোর ঠাকুরকে দিব ভেবে রেখেছি।' আমি বলিলাম—মা! এ যে হাড়ের মালা—ঠাকুর ইহা নিয়া কি কর্‌বেন? মা বললেন—'তুই তা বুঝ্‌বি না। এটি সাধারণ হাড় নয়, মহাশঙ্খের মালা। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যায় চণ্ডাল মর্‌লে তার অস্থি দিয়া এই মালা হয়। এ বড় দুর্লভ বস্তু। এ জিনিস কি তা তোর ঠাকুর বুঝ্‌বেন।' আমি মালা ছড়া লইয়া গেণ্ডারিয়া পঁহুছিলাম। নির্জ্জনে ঠাকুরকে পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—এই মালা ছড়া আমার বাবার জপের ছিল– মা আপনাকে দিতে দিয়েছেন। ঠাকুর হাত পাতিয়া উহা নিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—**"কিছুদিন যাবৎ এরূপ একছড়া মালার ইচ্ছে হয়েছিল। আশ্চর্য্য, দেখ ভগবান জুটায়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট মহাশঙ্খের মালা।"** ঠাকুর মালা ছড়া হাতে রাখিলেন। সময় সময় তাগা সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ বাহুতে উহা ধারণ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর প্রত্যহই গোফাঘরের আসনে কিছু সময়ের জন্য বসিয়া থাকেন—এই মালা ছড়া লইয়া তৃতীয় দিনে বসার পর মালাগাছটি আসনে রাখিয়া আসিলেন। পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় আর দিনের মত ঐ আসনের সম্মুখে ধুনি জ্বালিতে এবং আসনের ভয়ঙ্কর কালসর্পকে দুধকলা খাবার দিতে গোফাঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন—আসনের উপরে প্রায় ২ফুট উচ্চ উইটিপি (উইমাটির স্তূপ) উঠিয়া রহিয়াছে। মহাশঙ্খের মালাটিও তাহারই মধ্যে পড়িয়াছে। কুঞ্জবাবু তখনই ঠাকুরকে গিয়া জানাইলেন। ঠাকুর কহিলেন—**"ভালই হয়েছে, উহা আর পরিষ্কার ক'রে দরকার নাই। যেমন তেমনই থাক।"** সেই দিন হইতে ঠাকুরের গোফাসনে বসা বন্ধ হইয়াছে।

ঠাকুরকে মালাটি দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—মহাশঙ্খের মালা কখন ধারণের অধিকার জন্মে? ঠাকুর বলিয়াছিলেন—**"সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হ'লে এ মালা ধারণের অধিকার হয়।"** আজ শুনিলাম উইস্তূপটি প্রথম দিনে যতটা হইয়াছিল—তাহা অপেক্ষা আর এক ইঞ্চিও বৃদ্ধি পায় নাই—পাথরের মত শক্ত হইয়া রহিয়াছে। জানি না এতকালের আসন মহাশঙ্খের মালা রাখার দরুণই এইরূপ হইল কি না। আমার কিন্তু এই মালাই ঠাকুরের আসন ত্যাগের হেতু বলিয়া মনে হয়।

তান্ত্রিক সাধনের উপকারিতা।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বেদমতে বহু বৎসর সাধন ক'রে যে বস্তু লাভ হয়, তন্ত্রমতে কিছুকাল সাধনেই কি সেই ফল লাভ হয়ে থাকে?'

ঠাকুর বলিলেন—**"শিববাক্য কি কখন মিথ্যা হ'তে পারে?—নিশ্চয়ই লাভ হয়। জীবের প্রতি দয়া ক'রে মহাদেব তাদেরই কল্যাণের জন্য এই তন্ত্র সঙ্কলন ক'রে গেছেন।"**

আমি বলিলাম—তন্ত্রে তো কেবল মারামারি, কাটাকাটি ও ব্যাভিচার লইয়াই সাধন-ভজন? সংযত ও গুণাতীত হওয়া বিষয়ে তন্ত্রে কি কোন উপদেশ নাই? তন্ত্র কি সমস্তই শাক্তমতে?

ঠাকুর—**তন্ত্র কেবল শক্তি বিষয়ে হ'বে কেন? পঞ্চদেবতারই তন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আছে। বৈষ্ণব**

তন্ত্র, শৈব তন্ত্র, এই প্রকার সকল উপাসনারই তন্ত্র আছে। সংযমাদি বিষয়ে তন্ত্র মধ্যে খুব আছে। 'জ্ঞান-সঙ্কলনী' তন্ত্রখানা একবার পড়ে দে'খো। তন্ত্রের উদ্দেশ্য ও অর্থ কেহ বোঝে না। তাই না বু'ঝে সাধন কর্‌তে গিয়ে মারা পড়ে।

শাস্ত্র বুঝা সুকঠিন।

কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শাস্ত্র ছাড়া আমাদের তো আর উপায় নাই? কিন্তু শাস্ত্রও তো কিছুই বুঝি না, কোন বিষয়েই তো পরিষ্কার মীমাংসা কোন শাস্ত্রে পুরাণে পাই না?'

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন—বেদ ও উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে পারা সুকঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে, ধর্ম্মের জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে পারে না। আদি পর্ব্বে একটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাব মীমাংসা শান্তি পর্ব্বে রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সমগ্র অংশ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। মনুসংহিতায় এক বিষয়, তাহার ব্যবস্থা 'বৃদ্ধ গৌতম-সংহিতায়'। নির্ব্বাণ তন্ত্রে এক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রুদ্রযামলে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায়, সামবেদ সংহিতায় একটি আখ্যায়িকা তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে ইত্যাদি। সুতবাং সমস্ত শাস্ত্র না পড়িলে, শাস্ত্রের মত বলা বিড়ম্বনা ও অজ্ঞানতা মাত্র।

ভজনানন্দ সম্ভোগে অভিমানের বিষম আক্রমণ। অবিশ্বাসের আগুনে সমস্ত ছারখার। ঠাকুরের অযাচিত প্রসাদলাভে শান্তি।

রাত্রি ১২টার সময়ে হাত-মুখ ধুইয়া আসনে বসিলাম। ঠাকুরকে বাতাস করিতে লাগিলাম। ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ঠাকুর একই ভাবে সমাধিস্থ অবস্থায় বসিয়া থাকেন। দেব-দেবী, ঋষি-মুনি, মহাত্মা ও প্রেতাত্মা সকল এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা আসিয়া কি করেন—ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন—তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি না। ঠাকুর কখনও স্তব-স্তুতি করেন, কখনও ধমক্ দিয়া শাসন করেন—কিন্তু কাহার প্রতি কি ব্যবহার করেন তাহাও জানি না। সুতরাং এ সব ভাবাবেশের কথা লিখা বড়ই কঠিন দেখিতেছি। ভাবাবেশের কথা যখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না, তখন উহা আর লিখিব না সঙ্কল্প করিলাম।

রাত্রি সাড়ে চা'রটার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া স্নান তর্পণাদি সমাপনান্তে পুষ্প চয়ন করিয়া বাসায় আসিলাম। চা পানের পর বেলা ১০টা পর্য্যন্ত ন্যাসাদি কার্য্যে অতিবাহিত হইল। এগারটার সময়, ঠাকুর ভোজনার্থে ভিতরে গেলেন—আমি শালগ্রাম পূজা আরম্ভ করিলাম। আজ শালগ্রাম পূজার সময়ে নানা প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হওয়ায়, খুব প্রহৃষ্টমনে ঠাকুরকে গঙ্গাজল তুলসীপত্র অর্পণ করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ১২টার সময়ে নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন। আমি তখন ভাবিতেছিলাম—বহুজন্মের সাধন-ভজন সত্ত্বেও

৮ই আশ্বিন।

যে দুর্লভ বস্তু যোগীজনেরও অগোচর রহিয়াছে—তেত্রিশ কোটী দেবতা যাঁহার নরলীলা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া করজোড়ে অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন, অনায়াসে তাঁর কৃপায় তাঁর সঙ্গ অহরহ করিতেছি।—আমা হইতে আর ভাগ্যবান কে? এই সব ভাব মনে করিয়া, যখন গদগদ ভাবে ঠাকুরের পানে তাকাইতেছিলাম, সেই সময়ে ঠাকুর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া নিজ হইতেই আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমি তখন ভাবে অতিশয় অভিভূত ছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম— এ আবার কি? আমি মহা অপরাধী, তথাপি মৌনাবস্থায়ও ঠাকুর আমার পানে তাকাইয়া, মুখ নাড়িয়া কত কথাই বলিতেছেন। আমি কিন্তু কোন কথাই বুঝিলাম না। কানেও সকল কথা পঁহুছিল না। কেবল ঠাকুরের মুখপানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাঁহার হাতমুখ নাড়ার অপূর্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম এবং তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। ঐ সময়ে আমার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। চক্ষু হইতে অবিরাম ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। স্বেদ, কম্প, অশ্রুপুলকাদি ভাবে শরীরটিকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। ঠাকুর ৪/৫ মিনিট আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি আর ঠাকুরের দিকে চাহিতে না পারিয়া চোখ বুজিলাম। ঐ সময়ে ঠাকুরের অনুপম রূপের ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল। কতক্ষণ এইভাবে ঠাকুর আমাকে রাখিলেন, জানি না। ঠাকুরের স্মৃতি-পূত, তরঙ্গশূন্য, নির্ম্মল অন্তরে কতক্ষণ নিবিষ্টভাবে নামে মগ্ন ছিলাম, ঠাকুরই জানেন। এই সময়ে আমার অজ্ঞাতসারে অভিমান-অসুর, কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র ধরিয়া শারীরিক বিকারের দিকে দৃষ্টি করিল, বুঝিলাম না। আমি ভাবিতে লাগিলাম— অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভাব বহুভাগ্যে ভগবৎ কৃপায় মনুষ্যের ভিতরে সঞ্চারিত হয়। আজ আমার তাহা হইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা খুব উন্নতির লক্ষণ। নিশ্চয়ই আমার এই সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই ভাব যাহাতে আরো বৃদ্ধি পায়, চেষ্টা করিয়া দেখি। এই মনে করিয়া খুব তেজের সহিত নাম করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই আর মনটি ঠাকুরের দিকে নিতে পারিলাম না। অতলজলে প্রবল স্রোতে পড়িলে যে দশা ঘটে, আমার তাহাই হইল। স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে আর ঠাই পাইলাম না। ক্ষীণ অভিমান শরীরের সাত্ত্বিক বিকারের দিকে নজর করিয়া, 'রক্তশোষার' মত পুষ্ট হইয়া পড়িল,— ইহাতে পূর্ব্বের সরস ভাবটি চলিয়া গেল। যতই সময় যাইতে লাগিল ততই শুষ্কতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে অকস্মাৎ একটি ঘটনাকে হেতু করিয়া, ঠাকুরের উপর আমার অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া পড়িল। পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে শ্রীধর 'সটক্' জ্বরের যন্ত্রণায় 'ছট্‌ফট্' করিতেছেন। সময় সময় মূর্চ্ছা হইতেছে। ঠাকুরের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছেন। ঠাকুর পরম দয়াল, সামর্থী হইলে তাঁর একান্ত ভক্ত শ্রীধরের এ অবস্থায় উদাসীন রহিয়াছেন কি প্রকারে? এই বিষয়টি আপনা আপনি ভিতরে উঠিয়া অন্তরটিকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। ঠাকুরের উপরে অবিশ্বাস-সন্দেহের ভাব আসিয়া পড়িল; পরে একটির সহিত আর একটি ধরিয়া, ঠাকুরের উপরে সংশয়ের কত কারণই কল্পনা করিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে নেশাখোর মানুষের মত নিজের ঝুঁকিতে চলিতে চলিতে দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। অবিশ্বাস ও সন্দেহের ঘর্ষণে ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এ সময়ে বুঝিলাম, কোথা হইতে কোথায়

আসিয়া পড়িয়াছি। ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখি অবিশ্বাসের বিষম জ্বালা উঠিয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে 'হু হু' করিয়া সেই অনিবার্য্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে ঠাকুরের স্মৃতি ও ধ্যান ভস্ম করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে,—নামটি সময় সময় চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনুভব নাই,—অসার শুষ্ক বায়ুর 'ফোঁস ফোঁসানি' মাত্র হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বালা এত বাড়িয়া গেল যে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া নাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইল। অসহ্য যাতনায় স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজের চুল, দাড়ি টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিলাম, হাত কামড়াইতে লাগিলাম, শরীরের নানা স্থানে আঘাত করিতে লাগিলাম—ঠিক যেন পাগলের মত। কোন কোন গুরুভ্রাতা আমার ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া, বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমা হইতে তিন চার হাত অন্তরে সমাধি অবস্থায় উপবিষ্ট; কিন্তু ভিতরের অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহাও ভুলিয়া গেলাম। এই সময়ে শালগ্রামের উপরে ক্রোধ জন্মিল। শালগ্রাম পূজা তো বন্ধ করিয়াছিলাম। আর উহা পূজা করিব না স্থির করিয়া, পূজোপকরণ, ফুল-তুলসী প্রভৃতি কুড়াইয়া লইয়া শালগ্রামের উপরে সজোরে ছুঁড়িতে লাগিলাম। এই সময়ে ৫/৭ মিনিটের জন্য নামও বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তখনই আবার উহা আপনা-আপনি অত্যন্ত দ্রুতভাবে চলিল। আমার জ্বালা যখন নিবারণ হইল না,—অবিশ্বাস সন্দেহও দূর হইল না দেখিলাম, তখন ঠাকুরের উপর ক্রোধ জন্মিল। ঐ সময় আমি অতিশয় দৃঢ়তার সহিত আসনে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া ভিতরের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, অশান্তি-উদ্বেগ, নাম দ্বারা ঠাকুরের উপরে চালাইতে লাগিলাম। ভিতরের আবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া অতিশয় উত্তেজিতভাবে কট্‌মট্‌ দৃষ্টি দ্বারা এক একবার ঠাকুরকে টলাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু, ঠাকুর নিজভাবে স্থির আছেন দেখিয়া আমার আসুরিক তেজ আরও বৃদ্ধি পাইল। ক্রোধ ও অভিমানে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। অবিশ্বাসের জ্বালা কত ভয়ানক,—আমিই বুঝিলাম। এরূপ যন্ত্রণা আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কেবল জ্বালাতেই দগ্ধ হইলাম তাহা নহে, উহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে একপ্রকার উত্তাপ উঠিল,—তাহা ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে গিয়া ধাক্কা দিয়া দু'তিন সেকেণ্ড অন্তর অন্তর ঝিলিক্‌ মারিতে আরম্ভ করিল। এই ঝিলিকে আমার হৃদয় যেন ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তারপর ঠাকুরের উপর তীব্র দৃষ্টি করিয়া আরও বিপদে পড়িলাম। ভাবিয়াছিলাম ঠাকুরকে আজ আমার সকল জ্বালা-পোড়াদিয়া জ্বালাইয়া মারিব; কিন্তু, দয়াল ঠাকুর আমাকে সুন্দররূপে সেই বেয়াদবির শাস্তি দিলেন। ৫/৬ মিনিট ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাতে আমার চক্ষে একপ্রকার বেদনার অনুভব হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই বেদনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, আর ঐ দিকে চাহিতে পারিলাম না;—চক্ষু 'টন্‌টন্‌' করিয়া ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার বোধ হইল, চক্ষে অতিরিক্ত রক্ত এক স্রোতে আসিয়া পড়াতে, চোখের ভিতরের পর্দ্দা বুঝি ফাটিয়া যাইতেছে। তখন চক্ষের যন্ত্রণা বুকের ঝিলিক্‌ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশদায়ক বোধ হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চোখ বুজিলাম এবং নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে লাগিলাম। এই সময় ঠাকুর 'হরিবোল, হরিবোল' বলিয়া বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিলেন। অতি স্নেহভাবে আমার দিকে চাহিয়া

বলিলেন—**"কি ব্রহ্মচারী, ক্ষুধা পেয়েছে? এই নেও—এই সন্দেশ শালগ্রামকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাও। পরে রান্না কর্‌তে যাও।"**

ঠাকুরের অসাধারণ স্নেহদৃষ্টি ও স্বহস্তে প্রদত্ত সন্দেশ পাইয়া, আমার ভিতর ঠাণ্ডা হইয়া গেল। আমি সন্দেশ খাইয়া রান্না করিতে চলিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না, হোম, আহার, কোন প্রকারে সমাপন করিয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম।

প্রেতের আক্রোশে শুভকার্য্যে বিঘ্ন। পিণ্ডদানে ব্যবস্থা।

৯ই আশ্বিন।

অদ্য মধ্যাহ্নে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহঠাকুরতার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন—'অনেক দিন যাবৎ অশ্বিনী কাজকর্ম্মের চেষ্টায় আছে, কিন্তু কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। অনেক বড় বড় লোক উহার চাকরীর চেষ্টা করিতেছেন। কাজ হ'য়ে হ'য়েও সামান্য কারণে বাধা পড়িতেছে। এরূপ হইতেছে কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—**"প্রেতের আক্রোশ আছে বলিয়াই উহার কাজকর্ম্ম হইতেছে না। প্রেতের শান্তি না হ'লে, কাজের সুবিধা হ'বেও না।"**

অশ্বিনীর দাদা বলিলেন—'কেন আমার মাতার তো গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হ'য়েছে। তাঁর আর আক্রোশ থাক্‌বে কেন? আর অশ্বিনীর উপরই বা আক্রোশ কেন?'

ঠাকুর—**"যে পিণ্ড দেওয়া হ'য়েছিল, তাহা সে পায় নাই। এ বিষয়ে স্বপ্নে অশ্বিনীকে বলা হ'য়েছিল,—অশ্বিনী তাহা স্মরণ রাখিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করে নাই। এ জন্যই অশ্বিনীর উপর আক্রোশ।"**

অশ্বিনীবাবুর দাদা বলিলেন—'না, অশ্বিনী কোন স্বপ্ন দেখে নাই তো?'

ঠাকুর—**"আচ্ছা, তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।"**

অশ্বিনীবাবুর দাদা অশ্বিনীবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অশ্বিনীবাবু বলিলেন—'একদিন রাত্রে স্বপ্নে মাতার ক্লেশসূচক চীৎকার শুনিয়াছিলাম। কি যে বলিয়াছিলেন—বুঝিতে পারি নাই, পরে ভুলিয়া গিয়াছি।' ঠাকুর প্রেতের ক্লেশ শান্তির জন্য পুনরায় পিণ্ড দিতে বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'গয়াতে পিণ্ড দিলেই প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়, ইহাই তো জানিতাম। পিণ্ড দিলেও পিণ্ড পায় না এমনও হয় নাকি?'

ঠাকুর—**"একজনার পিণ্ড পুত্র গিয়া দিলেও, পৌত্র, প্র-পৌত্রাদিরও আবার পিণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যদি কারো পিণ্ডদান, প্রেতাত্মা না পায়, এজন্য বংশের যে কেহ গয়ায় যাবে তারই পূর্ব্বপুরুষগণের ও জ্ঞাতি-স্বজনের পিণ্ড দেওয়ার নিয়ম।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম—পিণ্ড দিব, অথচ প্রেতাত্মা তাহা পাইবে কিনা, নিশ্চয় নাই,—এরূপ সন্দেহ লইয়া পিণ্ড দিতে উৎসাহ হইবে কেন?

ঠাকুর লিখিলেন—**যথাবিধি পিণ্ড দিলে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রেতাত্মা উদ্ধার হয়; কিন্তু সে মত তো দেওয়া হয় না। যিনি পিণ্ড দিবেন তিনি যান আরোহণ করিবেন না, পদব্রজে গয়া**

পঁহুছিবেন। পরে, একাহার হবিষ্য করিয়া শুচিশুদ্ধভাবে, সংযত হইয়া ভজন-সাধনে এক মাস কাল গয়া বাস করিবেন। মৃত্তিকায় বাহু-উপাধানে শয়ন করিবেন। তৎপরে শাস্ত্র ব্যবস্থামত পিণ্ডদান করিবেন।—এইভাবে পিণ্ডদান হ'লে নিশ্চয়ই তাহা প্রেতাত্মা পায় ও উদ্ধার হয়। ইহার অন্যথা হইতে পারে না,—ঋষিবাক্য। কিন্তু সেভাবে তো পিণ্ড দেওয়া হয় না। তবে গদাধর বড়ই দয়াল; তাই যিনি যেভাবে দিন না কেন, তিনি গ্রহণ করেন। তাই, প্রেতাত্মা উদ্ধার হয়। বিশেষ কোন অনিয়ম-অনাচার হইলে—গদাধর যদি তাহা গ্রহণ না করেন;—এজন্যই বারংবার দিতে হয়; দিতে দিতে যদি কোন বার কারো দেওয়া লেগে যায়।"

আজ আমার একটি বিষম সংশয় দূর হইল। নিতান্ত দুরাচারী ব্যক্তি, হেলায়-শ্রদ্ধায়, যেন-তেন প্রকারে, একবার গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করিলেই যদি পূর্ব্বপুরুষগণ অনায়াসে উদ্ধার হয়, তাহ'লে তো মুক্তিলাভ বড়ই সহজ হইয়া যায়। মুক্তি সদাব্রত ভারতবর্ষের যেখানে-সেখানে, কিন্তু অসংখ্য কণ্টকাবরণ ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ ও বাসাধিকার তেমনই ঋষিরা দুরূহ করিয়া গিয়াছেন।

নরক আছে কি না? পরলোকে পিতৃপুরুষের কার্য্য।
বাসনারূপ জন্ম।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—'শাস্ত্রপুরাণাদিতে যে নরকের বর্ণনা রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহা আছে কি না? যমদূত কি?'

ঠাকুর লিখিলেন—"শাস্ত্রে যেরূপ নরকের বর্ণনা আছে, নরক প্রকৃতই তদ্রূপ। যমদূত, বিষ্ণুদূত সকলই সত্য। মৃত্যুর পরে ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃ-পুরুষও মৃত্যু সময়ে উপস্থিত থাকেন। যাঁহার আত্মা নরকে যাইবে, পিতৃপুরুষগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। পিতৃপুরুষগণও একেবারে মায়ার অতীত নহেন। তাঁহারাও ত্রিগুণের অধীন।"

একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—"পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাহারা মুক্ত, কেবল তাঁহারা উপস্থিত হইয়া, মৃত আত্মাকে পিতৃলোকে লইয়া যান। যাহাদের অল্প কর্ম্ম থাকে, তাহারা শৈশবে দেহত্যাগ করে। যাহারা নরহত্যাকারী, মনুষ্যদ্রোহী, এইরূপ পাতকী, তাহারা জন্মে আর মরে—পুনঃপুনঃ গর্ভ-যাতনা শাস্তি। যেমন এই পৃথিবী, সেইরূপ এমন গ্রহ উপগ্রহ আছে,—যেখানে স্বর্গ, নরক ভোগ হয়।"

প্রশ্ন—মৃত্যুর পরে আবার কখনও জন্ম হয়?

উত্তর—মৃত্যুর পরে সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। তথায় ক্রমে ক্রমে তাহার বাসনা বৃদ্ধি হয়। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই একজন পিতৃপুরুষ থাকেন। লোকের মৃত্যুর পরে, তিনি তাহার যে অবস্থা, তাহা তাহাকে বলিয়া দেন। বাসনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতে হইবে, এমত নহে। সৌরজগৎ বলিয়া আমরা যাহাকে জানি, ঐরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে। তাহাদের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, পিতৃপুরুষ কোন্ স্থানে তাহার জন্ম হইবে, বলিয়া দেন। সে তদনুযায়ী প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, অবস্থা অনুসারে নানা গ্রহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে জন্ম না হইলে যে একজন মুক্ত হইল তাহা নহে। অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে। স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক এরূপ নহে। কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন; সেখানেও বাসনা আছে। এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। অবস্থানুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা একরকম নহে। সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের ত এক গ্রহে হয় না।

স্ত্রী-পুরুষের মেশামেশিতে শাসন।

পূজার ছুটি আরম্ভ হইযাছে। নানাস্থান হইতে গুরুভ্রাতারা ঠাকুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত, পাগ্‌লা সতীশ, বিধু মজুমদার, ললিত গুপ্ত, ছোড়দাদা ও কুঞ্জ ঠাকুরতা প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে সুকিয়া ষ্ট্রীটেই থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে এখানেই আহারাদি করেন। আবার যাঁহাদের কলিকাতায় বার মাস থাকা হয়, তাঁহারা আহারের জন্য একবার মাত্র বাসায় যান। সকালবেলা ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকে। মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন করিতে, দলে দলে মধ্যাহ্নে আসিয়া পড়েন। বেলা ১২টার পর ঠাকুর আহারান্তে আসনে আসিয়া বসিলে মেয়েরা ধীরে ধীরে হলঘরে প্রবেশ করেন। হলঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ঠাকুরের আসন। এই ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে দরজা দিয়া ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। মেয়েমহলের সংলগ্ন, হলরুমের উত্তরাংশে ৬/৭ ফুট স্থান লইয়া চিকের আড়ালে মেয়েদের বসিবার স্থান। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকট তিনটা পর্য্যন্ত পুরুষেরা কেহ বড় থাকেন না। তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাখালবাবুর বৈঠকখানা-ঘরে বিশ্রাম করেন। পুরুষেরা ঠাকুরের ঘরে না থাকায় মেয়েদের সংখ্যাধিক্য হইলে, কখন কখন চিকের আবরণ খুলিয়া দেওয়া হয়; তখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রীলোক ঠাকুরের নিকট আসিয়া পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, ঠাকুরের আসনের পাশেই বসিয়া পড়েন। ঠাকুর ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাহাদিগকে দূর হইতেই নমস্কার করিয়া চিকের আড়ালে বসিতে বলেন। ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, আমার সঙ্গে তাঁহার ঝগ্‌ড়া হয়। আমার ভাষা অতিশয় কর্কশ ও অপমানজনক মনে করিয়া, অনেকে দিদিমা'র নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া থাকেন। তাহা ঠাকুরের কানেও আসে। বাবুরা আসিয়া পড়িলে, মেয়েরা অগত্যা চিকের আড়ালেই থাকেন, অথবা ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান। সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইলে, সংকীর্ত্তনের সময়ে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হয়। মেয়েরাও চিকের ভিতরে অতি কষ্টে স্থান লইয়া থাকেন। সংকীর্ত্তন বেশ জমাট হইলে, ঠাকুর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। তখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে মেয়েরা কখন কখন চিক তুলিয়া দেন। ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্যে অনেক সময় গুরুভ্রাতারা বেহুঁস অবস্থার নৃত্য করিতে করিতে

১২ই আশ্বিন।

মেয়েদের দিকে গিয়া পড়েন। কখন কখন স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ না থাকার মত হয়। ঠাকুর কিছুদিন যাবৎ এই বিষয়ে সাবধান হইতে গুরুভ্রাতাদের পুনঃপুনঃ বলিতেছেন। কিন্তু, কেহই তাহা মানিয়া চলিতে পারিতেছে না। অদ্য ঠাকুর এ বিষয়ে বহুলোকের মধ্যে সকলকে শাসন করিয়া বলিলেন,—"স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদাই খুব সাবধানে না থাক্‌লে চল্‌বেনা। যে ভাবে বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী পুরুষে মেশামেশি দেখা যাচ্ছে তা' কিছুকাল চল্‌লে শেষে বাউলদের মত ক্রমে নানাপ্রকার ব্যাভিচার আমাদের ভিতরেও আরম্ভ হ'বে। এখন হ'তে সকলেরই খুব সাবধান হ'য়ে চলা আবশ্যক। এসব বিষয়ে শিথিল হ'লে, বিষম অনর্থ ঘট্‌বে। স্ত্রী পুরুষ কখনও একাসনে বস্‌বেনা। এমন কি ভগিনী ও কন্যার সঙ্গেও বস্‌তে সাবধান হ'বে। বয়স্থা কন্যার সঙ্গেও পিতার ব্যাভিচার হ'তে পারে। এরূপ অনেক ঘটনা হ'য়েছে। তোমাদের চরিত্র ভাল হ'লেই যে এরূপ ব্যাভিচার তোমাদের দ্বারা অসম্ভব তা' মনে ক'রোনা। সহস্র ভাল হ'লেও এ বিষয়ে বড়াই চলেনা। স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তাঁর কন্যার পিছনে কামোন্মত্ত হ'য়ে ধাবিত হ'য়েছিলেন। যোগীশ্বর মহাদেবও এই পাকে ঘুরেছেন। ইহা কেবল একটা কল্পনা নয়। সত্য সত্যই এ বিষয়ে কেহ অভিমান কর্‌তে পারেনা। চুম্বক ও লোহার যেমন পরস্পর সন্নিকর্ষে মিলন হয়, ঠিক সেইরূপ সহস্র ভাল হ'লেও স্ত্রী পুরুষ একত্র হওয়া মাত্র একের দেহ অন্যের দেহকে আকর্ষণ কর্‌বে। তোমরা ইচ্ছা না কর্‌লেও দেহের ধর্ম্মে, দেহের স্বভাবে, দেহের গুণে, অন্য দেহকে যে আকর্ষণ কর্‌বে তা' তোমরা কি প্রকারে বাধা দিবে? স্ত্রী ও পুরুষের শরীরে এমন উপাদান আছে যে, তা'তে উভয় দেহ নিকটবর্ত্তী হ'লেই একে অন্যকে চা'বে—টান্‌বে। কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন পুরুষের থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকদেরও কখনও পুরুষদের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়। আমি এখানে বস্‌লে অনেক সময়েই স্ত্রীলোকেরা এসে আমাকে স্পর্শ ক'রে নমস্কার করে। কতদিন নিষেধ ক'রেছি,—কেহই কথা গ্রাহ্য করেনা। আমি কি জিতকাম হ'য়েছি? আমার কি কাম হ'তে পারেনা? আমাকে বিশ্বাস কি? দূর থেকে যার ইচ্ছা হয় নমস্কার কর্‌বে, আর পর্দার আড়ালে স্ত্রীলোক বস্‌বে। সর্ব্বদা এখানে বস্‌বারই বা প্রয়োজন কি? সংকীর্ত্তনের সময় ভাবে স্থির থাক্‌তে না পে'রে স্ত্রী-পুরুষ একত্র হ'য়ে যায়। যাঁরা সংকীর্ত্তনে যোগ দেন তাঁরা সকলেই যে সাধু তা' তো নয়—বাহিরের অনেক খারাপ লোকও এসে থাকে। সুতরাং এসব বিষয়ে পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক হ'য়ে না চল্‌লে, একটা গোলমাল ঘট্‌তে কতক্ষণ? বহুস্থানে দেখা গিয়েছে, প্রথম প্রথম ভাবের সময় স্ত্রী-পুরুষের ভেদ না থাকায়, পরস্পর পরস্পরকে ধর্‌তে থাকে; পরেসেই ভাব চলে যায়,—নকল ভাব দেখায়ে ব্যভিচার আরম্ভ করে। খুব সাবধান হও, সকলেই খুব সতর্ক হও। না হ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যাবে, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও বদমায়েসী আরম্ভ হবে। এ সম্বন্ধে খুব কড়াক্কড়ি হ'য়ে চলা আবশ্যক। যদিও পাপ ভাবে নয়, তাহ'লেও স্ত্রী-পুরুষে মিশ্‌তে দিতে সাহস হয় না। অনেকস্থলে সামাজিক সম্ভ্রম নষ্টের ভয়, নিজের সুনাম নষ্টের ভয়, এ সকল না থাক্‌লে সহজেই ব্যভিচার কর্‌তে পারে। যেখানে ধর্ম্মভয় সেখানে আশঙ্কা অল্প। আজকাল ধর্ম্মভয় নাই বল্‌লেই হয়।

পাপ—পরিত্রাণের উপায়।

কেহ বলিলেন—'পাপ কি? এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার সংস্কারও তো আমাদের নাই। কি উপায়ে পাপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়?' ঠাকুর কহিলেন—"স্বভাবের বিপরীত কার্য্যই পাপ। আধ্যাত্মিক পাপ, শারীরিক পাপ, মানসিক পাপ, সামাজিক পাপ, অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ইত্যাদি। সামাজিক—চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক, এই তিন প্রকার পাপ লোকে দেখে না। সামাজিক পাপ, ইহা নিবারণ জন্য রাজ্যশাসন, সমাজশাসন। পরমেশ্বর এই সমস্ত হইতে রক্ষা করবার জন্য লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, নিন্দা, প্রশংসা এই সমস্ত মনুষ্যের আত্মায় দিয়াছেন। ডাকাত, লম্পট. এমন লোকও যদি কাহাকে অন্যায় কর্‌তে দেখে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার শাসন করে। এই অবস্থা আছে ব'লেই রক্ষা পাওয়া যায়।

ভোগে ভোগক্ষয়। দৈহিক ও আত্মিক সম্বন্ধ। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান।

কোন একটি শিক্ষিত পদস্থ গুরুভ্রাতা, স্ত্রী-বিয়োগে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, ঠাকুরের নিকটে আসিলেন এবং নিজের দুরবস্থা, জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবদিগের দুর্ব্ব্যবহার প্রভৃতি বলিয়া, বিবাহ করা সঙ্গত কি না এবং বিবাহ করিলে সাধনে বিঘ্ন ঘটিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। পরলোকগত স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলনে সম্ভাবনা আছে কি না জানিতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি করিয়া বলিলেন—"এখন হঠাৎ স্থির হওয়া কঠিন! বিবাহ কর্‌লেই যে সাধনের অনিষ্ট তা নয়; বরং অবস্থানুসারে বিবাহ কর্‌লে উপকার হয়। নিজের যে বিষয়ে ভোগ, তা না হ'লে বিষয়ে পুনঃপুনঃ টানে। এখন শোক আছে, তা' যখন থাক্‌বে না—তখন বার্দ্ধক্যে নিজের প্রবৃত্তির সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করা দুঃসাধ্য। এজন্য অনেক সন্ন্যাসী বহু বৎসর বনে, গুহায় অনাহারে তপস্যা করেও, পুনরায় সংসারী হ'তে বাধ্য হয়েছেন। তবে, নিজের চিত্ত বুঝা কঠিন। এজন্য শাস্ত্রকাররা ব'লেছেন যে, গৃহস্থাশ্রম সাধকের দুর্গ। স্ত্রী-পুরুষে সংসার করা পাপ নয়। সংসার ক্ষয় কর্‌বার জন্য সংসার কর্‌লে উপকার হয়। লাভ কিছুই নাই, কিন্তু প্রয়োজন আছে,— নিজের নিজের ভোগ কাটাবার জন্য। ভোগ ক'রে ভোগ ক্ষয় সহজ। কৃপার পথে একটু আসক্তি থাক্‌লে, তা' যদি একটু ছিঁড়ে, তখন বড় বেশী লাগে।"

একজন প্রার্থনা কর্‌ল্, 'প্রভো! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার বল্‌তে আমার আর কিছু যেন না থাকে,—সমস্তই তোমার।' পরমেশ্বর উত্তর কর্‌লেন, 'হে মানব, এমন কথা ব'লো না, আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দেও,—অবশিষ্ট সমস্ত তোমার থাক্। তুমি জান না যে, তুমি কি কথা বল্‌ছ।'মানুষটি কাতর হ'য়ে বল্‌ল, 'প্রভো! তা' হ'বেনা, আমার আর যেন কিছুই না থাকে— সব তোমার হো'ক।' তখন পরমেশ্বর সেই মানুষটির বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-বন্ধু একে একে সমস্ত নষ্ট ক'রে পুত্রটিকেও যখন নিয়া যান, তখন সে কেঁদে বল্‌ল, 'প্রভো! কি কর্‌ছ? আমি যে আর সহ্য কর্‌তে পারি না।' তখন ভগবান তার সমস্ত প্রত্যর্পণ করে বল্‌লেন, 'এই নেও!—

আগেই বলেছিলাম, এ তোমার কর্ম্ম নয়। এজন্য কৃপার প্রার্থী হওয়া বড়ই পরীক্ষার পথ। যদি আসক্তিবদ্ধ না থাকে তবে কষ্ট হয় না। তোমার বয়স অল্প, এখনও অনেক দিন সংগ্রাম করতে হ'বে।'

এখন আমাদের দেশে ঠিক নিয়ম মত চল্‌ছে না। বৈদ্যশাস্ত্রে আছে—নারী ১৪ হইতে ১৬ ও পুরুষ ২৫ হইতে ৩০, এই বয়সে বিবাহ মঙ্গলের কারণ। একটু সময় যাক্,—বিবাহ কর্‌লে কি মঙ্গল, পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন শোকের সময়.—শোক-মোহ দৈহিক সম্বন্ধ-জনিত। সম্বন্ধ দুই প্রকার,—দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক সম্বন্ধ সহজে হয় না। একবার হ'লে আর সে সম্বন্ধ কখনও নষ্ট হয়না। আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল। যে উভয় আত্মার একমাত্র লক্ষ্য তাঁদেরই আত্মিক সম্বন্ধ হয়। দৈহিক সম্বন্ধ-জনিত শোক-মোহ অস্থায়ী, অনিত্য,—এজন্য অশৌচ বলে। অশৌচ-কালগত না হ'লে, উভয় দিকে স্থির হয় না। অশৌচ-কাল-গত হ'লে ক্রমে সম্বন্ধ অনুভব হ'য়ে থাকে। আত্মিক সম্বন্ধে শোক নাই,—বিরহ। সে বিরহ আশা-জনক এবং নিত্যকাল স্থায়ী। এরূপ আত্মিক সম্বন্ধ হ'লে মিলন হয়। দূরে থাক্‌লেও উভয়ের মধ্যে একটি সূত্রে বন্ধন থাকে, –তাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়। এসব দেখ্‌লে বিশেষ উপকার হয়। সংসার বাস্তবিক অসার। সহোদর ভাই ভগিনী, এ যদি আপনার না হয় তবে সংসারের আকর্ষণ কি? বনের পশুতে ও মানুষে প্রভেদ কি? পশু প্রতিবাসীকে সেবা কর্‌তে জানে না, মানুষ প্রতিবাসীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। যে নিরাশ্রয়কে সেবা না ক'রে সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।"

একটু পরে ঠাকুর আবার বলিলেন—"স্ত্রী-জাতিকে যত সম্মান কর্‌বে তত নিজে পবিত্র থাক্‌তে পার্‌বে। যাঁকে সম্মান করি, তাঁকে কুৎসিত, দূষিতভাবে দৃষ্টি করা যায় না। বঙ্গদেশে স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করা যেন একটা উপহাসের বিষয়। উত্তর-পশ্চিমে স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্মান আছে। বোম্বাই, মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে নারী জাতির সম্মান অধিক, তাতেই সব বীর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ জাতি কেবল নারী জাতিকে সম্মান ক'রে জগতের মধ্যে প্রধান জাতি হয়ে উঠ্‌ল। পুরাণে আছে যেখানে নারী জাতির সম্ভ্রম সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্ত্তমান। ইংরাজ জাতির মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ বিরাজ কর্‌ছেন; যদি এখন বাবুদের বল যে, নারী জাতিকে সম্মান কর, তখনই তাঁরা 'হো, হো' ক'রে হেসে উঠ্‌বেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, জনকের সভায় গার্গী উপস্থিত হ'লে সমস্ত ঋষিগণ উঠে সসম্ভ্রমে তাঁকে নমস্কার কর্‌লেন। গার্গীর পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞান, পরিধানে বস্ত্র নাই, উলঙ্গিনী। শাণ্ডিল্যা-তপস্বিনী, গরুড় তাঁর প্রভাব দেখে মনে কর্‌লেন,—রাত্রি প্রভাত হ'লে এঁকে পিঠে ক'রে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। শাণ্ডিল্যা তাঁর অন্তর জান্‌লেন। অমনি গরুড়ের দু'টি পক্ষ খ'সে পড়্‌ল। গরুড় স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই উপলক্ষে নারীকে সম্মান কর্‌বার উপদেশ দিয়েছেন। স্কুল-কলেজে, এখন শিক্ষা হচ্ছে কেবল চাকরির জন্য, চরিত্র গঠন কর্‌বার জন্য কে শিক্ষা করে?"

কল্পনাতীত সহানুভূতি—এ কি মানুষে পারে?

ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম,—"**মায়াতীত না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ ও শান্তি স্থায়ী হয় না; লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা।**" ঠাকুরের নিকটে আসিয়া মনে করিয়াছিলাম, যতদিন ঠাকুরের কাছে থাকিব ততদিন আর কোনপ্রকার উৎপাতগ্রস্ত হইতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর আমার শান্তির অবস্থা অধিকদিন রাখিলেন না। হায়! আজ আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! পাহাড় হইতে যখন ঠাকুর-দর্শনে আসিলাম, ঠাকুর দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার বাম দিকে ৩/৪ হাত অন্তরে আসন করিতে বলিলেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দিন রাত প্রায় অবিচ্ছেদে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া আসিতেছি। পরম পবিত্র আনন্দময় গুরুদেবের সম্মুখে থাকিয়া, তাঁর পূজা অর্চ্চনায় কি যে আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। নিত্য নূতন ভাব ও অনুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া দিনরাত যেন নেশাখোরের মত অভিভূত ছিলাম। আজ কয়দিন হয় কর্ম্মদোষে সে অবস্থা আমি হারাইয়াছি। হৃদয় আমার শ্মশান হইয়াছে;—অহর্নিশি চিতানলে দগ্ধ হইয়া হা-হুতাশে সময় কাটাইতেছি। ভোরবেলা দেড় ঘণ্টা কাল ঠাকুরের কাছ-ছাড়া থাকিতে হয়; কিন্তু তখনও আমি গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ ও ঠাকুর পূজায় পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত থাকি। মধ্যাহ্নে ঠাকুর যখন ঘণ্টা দেড়-ঘণ্টার জন্য স্নান ভোজনার্থে ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান, তখনও আমি শালগ্রাম-পূজায় নিযুক্ত থাকি। তৎপরে অপরাহ্নে দেড়ঘণ্টা সময় ঠাকুর আমাকে আহারের জন্য ছুটি দেন। ঐ সময়ের মধ্যে উনন ধরাইয়া রান্না, হোম, আহার, বাসন মাজা ও ঘর 'মুক্ত' করিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন সময়েই আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে অবসর নাই। অবসরের মধ্যে রান্না করিতে যে সময়টুকু লাগে তাহাই মাত্র। কিন্তু তখনও ঠাকুর দর্শনাকাঙ্ক্ষী গুরুভগিনীদের সমাগমে মেয়েমহল পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং, রান্না করিতে বসিয়াও অনেক সময়েই হেঁট্‌মস্তকে শালগ্রামের দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকিতে হয়। এতটা সত্ত্বেও একটি দিন মাত্র ২/৩ মিনিটের জন্য কুতুর দিকে দৃষ্টি করিয়া অস্থিপঞ্জর আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।—এখন উহার ছবি আর এ অন্তর হইতে কিছুতেই সরাইতে পারিতেছি না। নিয়মিত সাধন-ভজন সবই করিতেছি,—জল[illegible]পাবক-স্বরূপ গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের প্রভাবও নিয়ত সম্ভোগ করিতেছি, ইহা সত্ত্বেও আমার এই দশা। অন্তরের উত্তেজনা কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। আজ ১২টার পর শালগ্রাম-পূজায় মন লাগিল না। কোনপ্রকারে নিয়মরক্ষা করিলাম। বিষম উত্তেজনা দেখিয়া আমি খুব নাম করিতে লাগিলাম। প্রাণায়াম কুম্ভকও খুব তেজের সহিত চালাইলাম; কিন্তু কিছুতেই স্থির হইতে পারিলাম না। উত্তেজনার প্রবল স্রোত যখন আসিতে লাগিল, তখন নাম-ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্তই ভাসাইয়া নিয়া চলিল। তুফানের ঝাপ্‌টা যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে উত্তেজনাও আমার তদ্রূপ বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে ক্রমে উহা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, ঠাকুরের নিকটেও আর আমি বসিতে পারিলাম না;—একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম,—'কয়দিন যাবৎ কুতুর উপরে

আমার ভয়ানক আকর্ষণ আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আর বহু চেষ্টাতেও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কখন কি করিয়া ফেলি বলিতে পারি না। আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম।' আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর আমার দিকে একদৃষ্টে স্নেহভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"যে বয়েস, তা'তে এতো হ'তেই পারে। এ'তো কিছু অস্বাভাবিক নয়।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন— "একটু দূরে দূরে থাক্‌তে পার না?"

আমি বলিলাম—'না, এখন আর পারি না। আমার চেষ্টা এখন নিয়ত কাছে কাছে যাওয়া, দূরে থাক্‌ব কিরূপে? আমি সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজ্‌ছি। সাম্‌লা'তে না পার্‌লে, আমি সজন-নির্জ্জনতারও কোন অপেক্ষা কর্‌ব না, পরে যা' হয় হবে।'

ঠাকুর বলিলেন—"কর্ত্তা ভগবান। তাঁরই ইচ্ছায় সব। দেখ, কি হয়।" এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। একটু পরে বলিলেন—

"কামের উৎপাত তোমা অপেক্ষাও আমি অধিক ভুগেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে একবার আমি পাঞ্জাবে গিয়াছিলাম। তখন একদিন আমি ধর্ম্মোপদেশ কর্‌ছি,—জনতায় স্থান পরিপূর্ণ,—একটি ৮/৯ বৎসরের বালিকা নিকটে উপবিষ্ট ছিল। ঐ সময় আমি তাকে দেখে, এতদূর মোহিত হ'য়েছিলাম যে, বহুলোকের মধ্যেও আমি ঐ বালিকাটিকে আক্রমণ কর্‌তে অস্থির হয়ে পড়্‌লাম,—কোন চেষ্টাতেই চিত্ত সংযম কর্‌তে পার্‌লাম না। সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ কর্‌লাম। বক্তৃতার পরে, মেয়েটি যখন বাড়ী চল্‌ল, আমি তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেলাম। তারপর এ বিষয় মনে করে এত অনুতাপ হল যে, আমি আত্মহত্যা কর্‌তে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে 'রাভী' নদীর ধারে উপস্থিত হ'লাম। সদ্‌গুরু লাভ হ'লনা,—বৃথা জীবনে এসব উৎপাত ভোগের প্রয়োজন কি, মনে ক'রে, দেড়মণ দু'মণ একখানা পাথর কোমরে বাঁধলাম। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে যেমন উদ্যত হ'লাম,—পিছন দিক্ থেকে একটি বৃদ্ধ ফকির অকস্মাৎ এসে আমাকে জড়ায়ে ধর্‌লেন এবং বল্‌লেন, 'বাচ্চা ঘাবড়াও মৎ,—গুরু তোমার হ্যায়,—ব্যখৎমে মিল্ যায়েগা। এইছা মৎ কর।'—এই বলিয়া ফকির সাহেব অন্তর্দ্ধান কর্‌লেন,—আমি আর তাঁকে দেখ্‌তে পেলাম না। এ ঘটনার পরই আমি একটি গান লিখ্‌লাম,—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত পাবক যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তোমার নামের গুণে, তরে মহাপাপীজনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়।

অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়?
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধ'রে দেও চরণে আশ্রয়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ভাবিলাম—নিজ-জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগকে ঠাণ্ডা করিতেই বুঝি ঠাকুর এসব পাকচক্রে ঘুরিয়াছিলেন। আমি ভিতরের আরও অনেক দুরবস্থার কথা জানাইয়া খুব আক্ষেপ করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম—'আমার যেরূপ কু-অভ্যাস ও ভিতরের দুরবস্থা, তাতে এ জীবনে যে কিছু হ'বে, এমন আশা করতে পারি না। আর এতদিন সাধন-ভজন করে কিছু যে আমার হ'য়েছে তা'ও মনে হয় না।' ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং আমাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন,—**"কি? কি বললে? এতদূর অকৃতজ্ঞ? বলছ কিছু হয় নাই? ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, ইন্দ্রলোকের সমস্ত সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য পেলে তা' নিয়ে কয়দিন থাকতে পার একবার ভেবেছ? যে দুর্লভ বস্তু পেয়েছ তা' যখন প্রত্যক্ষ করবে তখনই বুঝবে কি হয়েছে। অভাব আর কিছুই নাই; তবে ইহা নিজে প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত বলা ঠিক নয়। একেবারে নির্ভয় হ'য়েছ। শুধু তুমি কেন, যাঁরা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছেন তাঁরা সকলেই নির্ভয় হয়েছেন। তারপর এটি নিশ্চয় জে'ন—নরকেও যদি যাও সেখানেও বুকে ক'রে রাখবার একজন আছেন। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের চেপে রেখেছি, যদি একটু আলগা দিই তাহ'লে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মুহূর্ত্ত মধ্যে 'জয় রাম, জয় রাম' বলে রাস্তায় বের্ হ'য়ে পড়বে।"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমি একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলাম। সর্ব্বদা ঠাকুরের কথাই মনে হইতে লাগিল। আহারান্তে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। ঠাকুরের আলোক সামান্য সহানুভূতির বিষয় ভাবিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। এই প্রকার সহানুভূতি কোথাও দেখি নাই, শুনি নাই বা শাস্ত্র পুরাণাদিতে পড়ি নাই। ঠাকুরের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া, যুবতী কুমারী কন্যা, নানাস্থানে তাঁহার বিবাহের পাত্র অনুসন্ধান হইতেছে। এই সময়ে এই পরিবারের মধ্যে থাকিয়া আমি তাঁহার প্রতি যে জঘন্য পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট,—ইহা পরিষ্কার জানিয়াও ঠাকুর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না বা উদ্বেগ বোধ করিলেন না! আমাকে ত অনায়াসে সরাইয়া দিতে পারিতেন; অথবা দিদিমাকেও একবার বলিতে পারিতেন যে, ব্রহ্মচারীর চাল-চলনের উপর একটু দৃষ্টি রাখিবেন—তাহাও করিলেন না। এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কাহাকেও জানিতে দিলেন না, বরং আমার ক্লেশ প্রাণে এতই অনুভব করিলেন যে, সাধারণ আচার ভুলিযা গিয়া, নিজ-জীবনের ঘটনা সকল বলিয়া আমাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন। একি কোন ঋষি মুনি বা দেবদেবী এ পর্য্যন্ত পারিয়াছেন? সারা রাত্রি আমি এ বিষয় ভাবিয়া কাটাইলাম। কামভাব বা সাধন-ভজনের দুরবস্থা আমি একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কেবল মনে হইতে লাগিল—'ঠাকুর এ কি করিলেন? যাহা কোনকালে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, ঠাকুর এবার তাহাই যে দেখাইলেন। ধন্য

দয়াল ঠাকুর! তোমার এই অসীম দয়া, দরদ্ ও সহানুভূতি যেন আমি কোনকালে কোন অবস্থায় বিস্মৃত না হই,—এই আশীর্ব্বাদ কর।' সেই দিন হইতে কুতুর উপরে কুভাব আমার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গেল।

ঠাকুরের প্রার্থনা—তুমিই সব।

আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুরের হাতের লেখা খাতাতে একটি সুন্দর প্রার্থনা ও দু'একটি উপদেশ লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—"হে প্রভো! কত যে তোমার করুণা ভুলিব না এ জীবনে! হে ঠাকুর, তুমিই সব! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার রচনা, তোমার দয়ার পরিচয়! তুমি পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, প্রভু তুমি, দাস তুমি, রাজা প্রজা, স্বামী স্ত্রী সকলই তুমি! চোর ডাকাত, সাধু লম্পট, সকলই তুমি! সমস্ত প্রশংসা, স্তব-স্তুতি ভালবাসা, সকলই তোমার! তুমি বাজীকর কেবলই ভেল্কি খেল! সার তুমি, বস্তু তুমি, প্রয়োজন তুমি! ইহলোক, পরলোক, স্বর্গলোক, যমলোক, সত্যলোক, জনলোক, তপলোক, ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক, মাতৃলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক সকলই তুমি! আমি কিছু না! কিছু না, ছাই ভস্ম; কিছুই না! তুমি আমার ঘরবাড়ী, তুমিই আমার দর্পণ! মধুর তুমি, মধুর তুমি, মধুর তুমি! মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং!!"

ইহার পরই ঠাকুর লিখিয়াছেন—ভগবান আমাকে বলিলেন,—"আমার জিনিস যেখানে ইচ্ছা রাখ্‌বো—হয় নরকে না হয় স্বর্গে—তাতে তুই কিছু বল্‌তে পার্‌বি না।"

"নিজে কিছুই স্থির কর্‌তে নাই। ভগবৎ ইচ্ছায় নির্ভর করে থাক্‌তে হবে। নিজের হাতে ভার নিলেই কষ্ট। যে ঘটনা ভগবৎ ইচ্ছায় হয়, সে ঘটনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"একটি মনুষ্যকে বিশেষরূপে ভালবাসা, ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। যতদিন ভিতরে রোগ আছে তাহা নিবারণের যত্ন করিতে হইবে। কিন্তু যদি নিজের ক্ষমতায় নিবারিত না হয় তাহাতে আমি দায়ী নহি। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, জগদীশ্বর নিজে সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র খেলুড়ে। পঞ্চভূত, গ্রহ-উপগ্রহ, সাগর-নদী-পর্ব্বত, বন-উপবন, মরুভূমি, বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ পশুপক্ষী, নিজে হইয়া আমোদ করিতেছেন। পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী-কন্যা, বেশ্যা-লম্পট, চোর-ডাকাত, পণ্ডিত-সাধু, রাজা-প্রজা, উপাস্য-উপাসক, মুক্তিদাতা,—সমস্তই তিনি!!"

সাধনেব ক্রম ও তাহার উপকারিতা।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্রহ্মচর্য্যাদিতে প্রতি বৎসর যে সকল নূতন ব্রত নিয়ম দেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের নিয়মগুলিও কি প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবে? সাধনের ক্রম কি?"

ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—ক, খ অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম,—পরে যে পুস্তক পড়ি, প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ আছে। ক, খ ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও

সেইরূপ। এক একটি প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে এই দেহই আমি, এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীর-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা, এ সমস্ত করিতে হয়। যিনি না করেন তিনি দেহ ও আত্মা যে কি তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পাবেন না। পরে, সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে হইলে দেবতা সকলের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে,—তজ্জন্য দেবোপাসনা। সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে,—আর সমস্ত কিছু নহে,—এরূপ বোধ হয়। আমি এবং ব্রহ্ম—এক কি ভিন্ন, ইহার জন্য যোগ। এই যোগ,—প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে, আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন। যথার্থ যোগ সাধিত হইলে, ভগবান কিরূপে জগতে বিরাজ করেন তাহা প্রত্যক্ষ হয়,—তখন ইহলোক, পরলোক এক হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া, এইরূপ ক্রম, সাধন-প্রণালী লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে, যেটুকু সাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে। পরের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। এখন সমস্ত বিশৃঙ্খল। কিছুই প্রকৃতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুর হয়-- ইহা কৃষকের গুণ নহে, সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মের গুণ। সাধন ক্রমও তদ্রূপ। মনুষ্যের প্রকৃতির মধ্যে যত ধর্ম্মভাব আছে, সমস্ত ভাবের পোষণ এই সাধনে হয়। সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা, পরাধর্ম্ম, সমস্তই ইহার অন্তর্গত,—ইহারই মধ্যে সমস্ত।

রাখালবাবুর হোম করিতে আগ্রহ। 'দেবতার ছাঁচ দর্শন'।

আজ আমাদের বাড়ীর মালিক লাখুটিয়ার জমিদার, ঠাকুরের পুরাতন বন্ধু ও ভক্তশিষ্য শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারী যে হোম করে, বড় সুন্দর। আমারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। করিতে পারি কি?'

ঠাকুর--"**খুব পারেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার উপবীত গ্রহণ করতে হ'বে। এমনি নেওয়ায় হবে না। ত্রিসন্ধ্যা না করলে, হোম করার অধিকার হয় না।**" রাখালবাবু ঠাকুরের কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। রাখালবাবু এক সময়ে ঠাকুরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মমতাবলম্বী হইয়াছিলেন, আবার এখন তাঁরই কৃপায় অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে তিনি ব্রাহ্মণোচিত গায়ত্রীজপ ও পিতৃপুরুষের তর্পণাদি কার্য্য নিয়মিতরূপে পরম শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমার নিত্যক্রিয়া এবং শালগ্রাম পূজাদি দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমার প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সহানুভূতি করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ স্নেহ-মমতায় এই দুর্দ্দিনেও আমার প্রাণ বড়ই আরামে আছে। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অন্তরীক্ষে একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার চক্র দর্শন করিয়া ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন,—

"**উহা দেবতার ছাঁচ। বিশেষভাবে স্থিরদৃষ্টিতে দেখ্‌লে, ওর মধ্যে সেই দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। বিশেষ স্থিরতার দরকার।**" সাধনকালে রাখালবাবু সময় সময় ধূপধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধ পাইয়া থাকেন। ঠাকুরকে বলায়, ঠাকুর কহিলেন—"**কোন মহাপুরুষ আস্‌লে ঐরূপ সুগন্ধ পাওয়া যায়। এ মহাত্মাদের পরীক্ষা মাত্র। একথা প্রকাশ করা উচিত নয়। প্রকাশ করলে কিছুদিনের মত বন্ধ হ'য়ে যায়। পরে আবার সেইরূপ হ'তে থাকে। মহাত্মাদের গাত্রগন্ধে মন প্রফুল্ল হয়।**

ক্রমে তাঁহারা মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন; শেষে উপকার ক'রে থাকেন। যখনকার ঘটনা, তখন প্রকাশ না ক'রে পরে প্রকাশ করলে কোন অপকার করে না।"

রাখালবাবুর মহত্ত্ব। উদ্বেগে আবার দেবকুমার।

আর আর দিনের মত বেলা ১১টার সময়ে ঠাকুর আজ ভিতর-বাড়ী চলিয়া গেলেন পরে মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আসনের তিনধারে রাশীকৃত ফুল মালা পাতা ছিল, মহেন্দ্রবাবু তাহা কুড়াইয়া ফেলিলেন—পরে বামহস্তে আসনের কতকাংশ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঝাঁটা দ্বারা আসনের নীচ পরিষ্কার কবিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে রাখালবাবু উহা দেখিয়া মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—ওকি মশায়—ঝাঁটা যে ঠাকুরের আসনে লাগ্‌বে—কি কচ্ছেন? মহেন্দ্রবাবু রাখালবাবুর কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। রাখালবাবু আবার বলিলেন—মশায়! আসনে যে ঝাঁটা লাগ্‌ছে। তখন মহেন্দ্রবাবু ঝাঁটা লইয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সজোরে কয়েক ঘা চটাচট রাখালবাবুকে মারিয়া আবার নিজ কাজে নিযুক্ত হইলেন। রাখালবাবুর খুব লাগিল কিন্তু তিনি একটি কথাও না বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে উপরে চলিয়া গেলেন।

আহারান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন পরে ঠাকুরের নিকট এই কথা উঠিল। ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুর ঐ কার্য্যে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"মহেন্দ্রবাবুর ওরূপ করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। রাখালবাবু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে দ্বারবানকে হুকুম দিলে যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পার্‌তেন—তাহা করেন নাই। ইহাতে রাখালবাবুর অসাধারণ ধৈর্য্য ও স্বভাবের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।" রাখালবাবুর উপরে এই প্রকার ব্যবহারে গুরুভ্রাতারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি—যাহার বাড়ীতে থাকা—তাহাকেই ঝাঁটা মারা মহেন্দ্রবাবুর এই বিষম সাহসের হেতু কি কিছুই কিন্তু বুঝিলাম না।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়াছি পরে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ করার অবসর আমার ঘটে না। সমস্ত দিনরাত্রে ঠাকুরের সঙ্গে দু'চারটি কথা যাহা হয়—তাহা ছাড়া মৌনই থাকি। একটি কথা বলিবার লোক পাই না। ভগবান গুরুদেবের কৃপায় কয়েকদিন যাবৎ কথা বলিবার আমার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গী জুটিয়াছে। শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর পুত্র শ্রীমান দেবকুমার নিতান্ত বালক হইলেও তাহার সঙ্গে আমি দিন দিন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি।

বেলা ১১টার সময়ে ঠাকুর যখন স্নানভোজনার্থে ভিতর-বাড়ী চলিয়া যান, দেবকুমার প্রত্যহই আমার নিকট আসিয়া থাকে। শালগ্রাম নমস্কার করিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া এমন মমতার সহিত আমার পানে তাকাইতে থাকে যে, আমি উহাকে টানিয়া আসনের পাশে না বসাইয়া পারি না। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু বলে না বটে কিন্তু যতক্ষণ কাছে থাকে, পায়ে গায়ে মাথায় হাত বুলায়। গা ঘেঁসিয়া বসিতে আরাম পায়, আমারও উহাকে এত ভাল লাগে যে, শালগ্রামের পূজা ছাড়িয়া উহাকে গায়ে জড়াইয়া নিয়া আদর করিতে থাকি। উহার নির্ম্মল কোমল অঙ্গের স্পর্শ এতই আরামপ্রদ যে, তাহাতে আমার শরীর মন শীতল হইয়া যায়, চিত্ত প্রফুল্ল

হইয়া উঠে। যেদিন দেবকুমার আমার নিকট আসিতে একটু বিলম্ব করে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। ভাগ্যবান দেবকুমারের জন্ম ১১ই মাঘ শুভ মাঘোৎসবের দিনে হয়। উহার অন্নপ্রাশনের সময় ঠাকুর স্বহস্তে উহার মুখে অন্নপ্রদান করেন এবং আদর করিয়া 'দেবকুমার' নাম রাখেন। দেবকুমারের চেহারা যেমনই সুন্দর, সুশ্রী ও লালিত্যময়, প্রকৃতিও তেমনই অসাধারণ মোলায়েম ও মমতাপূর্ণ। দেবকুমার ছয় সাত বৎসরের বালক হইলেও ইহার সঙ্গলাভে বড়ই আরামে আছি।

হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম।

আজ কয়েকটি গুরুভ্রাতার প্রশ্নে ঠাকুর হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম সম্বন্ধে লিখিলেন— (১) **পাপ বোধ (২) পাপ-কর্ম্মে অনুতাপ (৩) পাপে অপ্রবৃত্তি (৪) কুসঙ্গে ঘৃণা (৫) সাধু-সঙ্গে অনুরাগ (৬) নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি (৭) ভাবোদয় (৮) প্রেম।**

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। মুখে যাহা বলিলেন, লিখিবার অবসর পাইলাম না—তাঁহার মৌনাবস্থার খাতাতে যাহা পাইলাম,—মাত্র তাহাই নকল করিয়া রাখিলাম।

অদ্বৈতবাদী ফকির । জাতিভেদ কাহাকে বলে?

১৬ই আশ্বিন।

আজ ঠাকুর গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীধর ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্‌ যে স্থানে সারকুলার রোডে মিশিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে একটি মস্‌জিদের দোতলায় উপস্থিত হইলেন। তথায় এক মুসলমান ফকির নির্জ্জনে আপন ভজনে মগ্ন ছিলেন। ঠাকুর সশিষ্যে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ফকির সাহেবের নিকট বসিয়া রাইলেন। ফকির সাহেব কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'এই মস্‌জিদে যেমন কথার প্রতিধ্বনি হয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ ভগবানেরই একটি প্রতিধ্বনি।' ঠাকুর ফকির সাহেবের সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে রাস্তায় আসিয়া ঠাকুর ফকির সাহেবের প্রশংসা করিয়া গুরুভ্রাতাদের বলিলেন,—**"ফকির সাহেব অদ্বৈতবাদী। জগৎ ও ঈশ্বর এক—এই দৃঢ়জ্ঞান হওয়া মুখের কথা নয়। এই সমস্ত উপাসনা কলির মনুষ্যের পক্ষে কঠিন। এজন্য কেবল নাম অবলম্বন প্রত্যেক উপাসনার ব্যবস্থা।"**

বাসায় আসিয়া মহেন্দ্রবাবু বর্ত্তমান জাতিভেদ সম্বন্ধে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর লিখিলেন,—**"ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ শূদ্র প্রকৃতি এবং শূদ্রকুলজাত হইয়া কেহ ব্রাহ্মণ প্রকৃতি হইতে পারেন। কিন্তু এ সমস্ত ভেদ বুঝিবার শক্তি সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ ভিন্ন অপরের নাই। এই জন্য প্রকৃত জীবের পক্ষে সমাজগত জাতিভেদ মানিয়া চলাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণবংশে শতকরা হয় ত ৩০টি শূদ্র জন্মগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু শূদ্রবংশে ব্রাহ্মণ প্রকৃতি জীবের সংখ্যা হয়ত শতকরা ২০জনও হইবে না। এই জন্য ধর্ম্মরক্ষার্থে এবং বিশুদ্ধি রক্ষার অভিপ্রায়ে জন্মগত প্রকৃতি অধিকারের ভেদ মানিয়া লওয়াই নিরাপদ। সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ্‌ থাকিতে হইলে স্বপাকে আহারই প্রশস্ত। অধিকাংশ স্থলে দুঃসাধ্য।"**

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন,—"জাতি কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র নহে। স্ত্রী-পুরুষ জাতি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এসকলও জাতি। এই জাতিভেদ যখন যাইবে—তখনই জাতিভেদ গেল। শুকদেবের জাতিভেদ ছিল না, বেদব্যাসের জাতিভেদ ছিল। ব্রাহ্মসমাজে গেলে বা উপবীত ত্যাগ করিলে, ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া হয় না; যথার্থ ধর্ম্মার্থী হইয়া যাওয়া চাই। যাহার তাহার খাওয়ায় জাতিভেদ নাই, তাহা নহে। জাতিভেদ যাওয়া সমবুদ্ধি।"

বিভিন্ন শাস্ত্রে আহার-বিহার। গঙ্গাস্নানে জীবের গতি।

জনৈক খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— শরীর মন ও আত্মার কল্যাণকর আহার-বিহার সম্বন্ধে উপদেশ আমরা কোথায় পাইতে পারি?

ঠাকুর লিখিলেন—"সাংখ্যযোগে কপিলদেব পঞ্চতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি লইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নিরুপণ করিয়া, প্রত্যেক তত্ত্বের সহিত শরীর-মনের কি সম্বন্ধ এবং আত্মার সহিত শরীর-মনের কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক করিয়া আহার-বিহার সকল ঠিক ঠিক রূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, পাতঞ্জল দর্শন, মৈত্রেয় উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, তন্ত্র, রুদ্রযামল ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক লিখিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আহার-বিহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।"

আজকাল আমরা অনেকগুলি গুরুভ্রাতা একসঙ্গে অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যাই। জগন্নাথ ঘাটে একসঙ্গে সকলে পরমানন্দে স্নান করিয়া বাসায় আসি। গঙ্গাস্নানে কি যে আনন্দ হয় বলিতে পারি না। আজ বাসায় আসিয়া গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'গঙ্গাস্নানে যথার্থই কি জীব উদ্ধার হয়?'

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর দিলেন— "যদি শাস্ত্র মান্য কর তবে 'গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ, যোযনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।'— গঙ্গা হইতে চারিশত ক্রোশের, মধ্যে 'গঙ্গা, গঙ্গা' বলিয়া যেখানে স্নান করিবে, তাহাতে উদ্ধার হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে, এরূপ যাহার বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই তাহা লাভ করে। গঙ্গাজলের অশেষ মহিমা। গঙ্গা হিমালয়ের অতি উচ্চ শিখর হইতে নামিয়াছেন। অনেকানেক ঔষধি ইহার মধ্যে আছে। গঙ্গা মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, পরে গঙ্গাজলে স্নান করা উচিত।"

শিষ্যের অপরাধে ক্ষমা ভিক্ষা! দোষদৃষ্টি দূষণীয়।

একজন গরীব ব্রাহ্মণ আজ আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিলে কোন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে গালি দেন এবং তাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠাকুর উপরে থাকিয়া, তাঁহার দু'এক কথা শুনিতে পাইয়াই খুব ব্যস্ত হন; এবং ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, তাঁহার পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া গুরুভ্রাতাটির অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করেন। পরে সাদরে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দেন।

আমাদের একটি বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা কাহারও প্রতি কোন অপরাধ করায় তাহা ঠাকুরের কর্ণগোচর হয়।

ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন— "এই সকল উৎকট দোষের ভারেই তো তিনি উঠ্‌তে পার্‌ছেন না, কিন্তু তাঁহার ভিতরে কতগুলি অসামান্য গুণও আছে। তোমাদের সকলের ভিতরই কতগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে। শুধু সে গুণমাত্র থাক্‌লে, তোমরা এতদিনে কোথায় উ'ড়ে যে'তে,—জগৎ তোমাদের ধ'র্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু ভগবানের এমনই কৌশল যে, কতকগুলি দোষের বোঝা মাথায় দিয়া তিনি তোমাদের টে'নে রেখেছেন, উ'ড়ে যেতে দিচ্ছেন না। লোকের দোষের দিকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি না রে'খে গুণের দিকে লক্ষ্য রাখাই ভাল।"

জাতিস্মর বালক।

আমাদের ভবানীপুরের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, মহাশয় কালীঘাটের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নামে একটি ৬/৭ বৎসরের ছেলেকে লইয়া ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ছেলেটি বয়স অনুরূপ একটু চঞ্চলস্বভাব হইলেও ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরকে স্থিরভাবে দর্শন করিতে লাগিল। ঠাকুর ছেলেটিকে খুব আদর করিয়া সম্মুখে বসাইলেন এবং নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে থিয়োসফিষ্ট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সাব্‌জজ এবং ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মুন্সেফ প্রভৃতি কয়েকটি দেশ-বিখ্যাত. সুশিক্ষিত ভদ্রলোক ঠাকুবকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন— "আপনারা যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন। এই ছেলেটি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।" ভদ্রলোকেরা প্রথমে ঠাকুরের কথা শুনিয়া একটু যেন দুঃখিত হইয়াছিলেন; পরে ছেলেটির মুখে দু'চারটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঐ সকল প্রশ্নোত্তর শুনিয়াও কিছু বুঝিলাম না। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ভগবান অবতীর্ণ হইলে, এবার কি ভাবে তিনি কার্য্য করিবেন?' সুরেন্দ্রনাথ বলিল— 'এবার যিনি অবতার, তিনি শুধু জ্ঞান বা শুধু ভক্তি লইয়া কার্য্য কর্‌লে চল্‌বে না। এবার বুদ্ধদেবের জ্ঞান এবং মহাপ্রভুর ভক্তি নিয়ে কাজ কর্‌তে হবে— না হ'লে তাঁ'র কথা গ্রাহ্য হ'বে না।'

২০শে আশ্বিন।

একটি বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিলেন— 'বাবা! ভক্ত বড না ভগবান বড়?'

ছেলেটি বলিল— 'বড়, ছোট বল্‌তে হ'লে ভক্তই বড়।'

বৈষ্ণবটি বলিলেন— 'ভগবান তো অনন্ত, অসীম। তাঁ হ'তে বড় কি প্রকারে হইবে?'

ছেলেটি— 'যাঁকে অনন্ত অসীম বল্‌ছেন, তাঁকে যিনি সসীম ক'রে নিজ হৃদয়ে বদ্ধ ক'রে রাখেন, তিনি তাঁর চেয়ে ছোট হবেন কিরূপে?'

ছেলেটি এই প্রকার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন— শুনিয়া সকলেই অবাক্।

ঠাকুর বলিলেন— "ছেলেটি জাতিস্মর। ভবিষ্যতে দেশে একটি বিখ্যাত লোক হবেন। কিন্তু জাতিস্মরত্ব আর বেশী দিন থাক্‌বে না।"

গুরুবাক্য লঙ্ঘনে সত্যপালন। সমস্যা।

আমাদের গুরুভ্রাতা, পোষ্টাফিসের ডেপুটি কনট্রোলার জেনারেল শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন, 'আপনি এবার আমার বাড়ী একদিন পদার্পণ করবেন বলেছিলেন। আমার বড় আকাঙ্ক্ষা— একদিন আপনাকে নিয়া যাই। কবে যাবেন?' ঠাকুর উমাচরণবাবুর কথা শুনিয়া একটু সময় স্থির হইয়া রহিলেন পরে বলিলেন— "আচ্ছা, আপনি যেদিন বল্‌বেন সেইদিনই যাব।" উমাচরণবাবু একটা দিন ঠিক করিয়া ঠাকুরকে জানাইয়া চলিয়া গেলেন এবং বাড়ী যাইয়া দস্তুরমত একটি উৎসবের আয়োজন করিলেন। পরে যথাকালে ঠাকুরকে নিতে আসিলেন। ঠাকুর অপরাহ্নে বাহির হইয়া প্রথমে কালীঘাটে যাইয়া মা-কালী দর্শন করিলেন। পরে মনোরঞ্জনবাবুর অনুরোধে তাঁর বাসায় গেলেন। মনোরঞ্জনবাবুর একটি ছেলের ৪/৫ ডিগ্রি জ্বর— বিকারের অবস্থা। ঠাকুর তাহার বিছানার ধারে গিয়া বসিলেন। মনোরমা ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন। ঠাকুর ছেলেটির মাথায়-গায়ে হাত বুলাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং উমাচরণবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুকুন্দদাসের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল কিন্তু ঠাকুর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, হঠাৎ তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। ঠাকুর বাসায় আসিতে ব্যস্ত হইলেন। উমাচরণবাবু কিছু জল খাওয়াইতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর অগত্যা একগ্লাস সরবৎ খাইয়া চলিয়া আসিলেন এবং ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে এই জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ঠাকুর তিন দিন, তিন রাত্রি প্রায় বেহুঁস অবস্থায় কাটাইলেন। পরে আপনা আপনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই জ্বরে ঠাকুর এতই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন যে, সাধারণ শরীর হইলে বোধ হয় তাহাতে মৃত্যু হইত। রোগ উপশমের পর ঠাকুর বলিলেন— "কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তা' ফুটা'লে যেমন গরম হয়, শরীরটি সেইরূপ দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় দেহ থেকে স'রে বস্‌লাম। অম্‌নি মনে হ'ল দেহের ভোগটি ক'রে নিতে হবে,—আল্‌গা থাকা ঠিক নয়। তাই আবার প্রবেশ কর্‌লাম। তিন বার এরকম ক'রে ভুগ্‌তে হ'ল। পূর্ব্বে শরীরের একটু পীড়া হ'লেই মন খারাপ হ'ত। এখন দেখি, শরীর ও আত্মা, সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি বস্তু। যেমন হিমালয়ের নিকটে গেলে শরীরে শীত বোধ হয়, সেইরূপ শরীরে কোন ব্যথা কি পীড়া হ'লে জানা যায় মাত্র, ভোগ হয় না,—ভোগ শরীরেই হয়।"

এই প্রকার বিষম রোগের হেতু কি জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—"ঐ সময়ে পরমহংসজী একটা নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত আসন ত্যাগ ক'র্‌তে নিষেধ করেছিলেন (বোধ হয় এই ভোগটিই কাটিয়ে দিবার জন্য)। কিন্তু উমাচরণবাবু এ'সে আমাকে অনুরোধ করায়, ভাব্‌লাম,—এখন কি করি? নিজের বাক্য রক্ষা ক'রে সত্য-পালন করি, না,—পরমহংজীর আদেশ পালন ক'রে ঐ বাক্য অগ্রাহ্য করি। সত্য-পালন কর্‌ব, ইহাই স্থির ক'রে উমাচরণবাবুর বাড়ী গেলাম। গুরুবাক্য লঙ্ঘন ক'রে সত্যপালনও যে অপরাধ এবার তাহাই বুঝাইলেন।"

মহরমে ভিস্তিদ্বারা ঠাকুরের জল দান। অহিংসা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

মুসলমানের মহরম পর্ব্বের ঘটনা বড়ই মর্ম্মভেদী। কোন ব্যক্তি উহা শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদের নাতি হাসেন ও হোসেন সপরিবারে সৈন্য-সামন্ত সহিত কার্‌বালা প্রান্তরে বিপক্ষের চক্রান্তে জল অভাবে দারুণ পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ শোকাকুল প্রাণে তাঁহাদের স্মরণ করিয়া দলে দলে রাস্তায় বাহির হন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সজোরে বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক রাস্তায় চলিতে থাকেন। হাসেন হোসেনের পিপাসা শান্তির জন্য রাস্তায় জল ঢালিতে ঢালিতে তাঁহারা অগ্রসর হন। ঠাকুর বারান্দায় দাঁড়াইয়া উহা দেখিয়া হাসেন হোসেনের তৃপ্ত্যর্থে ভিস্তিদ্বারা জল আনাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঢালাইতে লাগিলেন। হাসেন হোসেনের মৃত্যু বিবরণ শুনিয়া প্রাণের যে কি অবস্থা হয় বলা যায় না। একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্ম কি এক এক জাতির এক এক রকম?'

ঠাকুর লিখিলেন—"অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, যিনি ভগবদ্ভক্ত,—তাঁহার ধর্ম্ম অহিংসা। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, রাজ্যশাসন। মারামারি, কাটাকাটি করিয়া, বহুজন্ম ঘুরিতে যদি ব্রাহ্মণ হয় তবেই তাহার ঐ অবস্থা। মনুষ্যত্ব যেমন উন্নত হইবে, তদ্রূপ তাহার কার্য্য সাধারণ মনুষ্য হইতে ভিন্ন হইবে।

ধর্ম্মসাধন দুই প্রকার। যাঁহারা প্রবৃত্তির অধীন তাহাদিগের প্রবৃত্তি-ধর্ম্মকে শাক্তধর্ম্ম নাম দিয়াছেন; নিবৃত্তি ধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে—শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।"

বলির অভিমানে বামন অবতার।

ঠাকুর আজ কথায় কথায় বামনদেবের কথা খাতায় লিখিলেন—"ভগবান প্রথমে বামনাবতার হইয়া, বলি নামে মানবাত্মারূপ অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। মনুষ্য সংসারে ধর্ম্ম করিতে বসিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করে, আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণের রাজা। মনুষ্যের এই ধর্ম্মাভিমান দেখিয়া পরমেশ্বর বামন হইয়া অর্থাৎ আত্মার আত্মা হইয়া মনুষ্যের নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন। ত্রিপাদ শুনিতে সামান্য, কিন্তু উহাই জীবের সর্ব্বস্ব। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—ভগবান এই ত্রিপাদ অধিকার করিলে, তখন বিরাটমূর্ত্তি ধরিয়া জীবের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া পাতালে ছিলেন। এইরূপ যে ব্যক্তি ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীবকে আর ভাবিতে হয় না।"

মনোহর দাস বাবাজীর আখ্‌ড়ায় সংকীর্ত্তন।
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নৃত্য।

শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজী আজ ঠাকুরের নিকট আসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"প্রভু দয়া ক'রে এ কাঙ্গালের জীর্ণ আখ্‌ড়ায় একবার পদধূলি দিতে হবে।" বাবাজী

বড়ই নিষ্কিঞ্চন, মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে খোল-করতাল সংযোগে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন, তখন এই বাবাজীকেই তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই বাবাজী ঠাকুরের পরিচিত। ঠাকুর বাবাজীর অনুরোধে সম্মত হইলেন; এবং যথাসময়ে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে তথায় গিয়া সমবেত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার ল্যাণ্ডো গাড়ীতে করিয়া ঠাকুরকে নিয়া চলিলেন। আখ্‌ড়ায় কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব দশটি মাদল লইয়া সংকীর্ত্তন মানসে রাস্তার উপরে ঠাকুরের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কীর্ত্তনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে **"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন"** বলিয়া ভাবোন্মত্ত অবস্থায় স্খলিতপদে কীর্ত্তনস্থলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহার যে কিছু উৎকৃষ্ট গাত্রাবরণ—শাল, বনাত, মলিদা ইত্যাদি ছিল ঠাকুরের গমন-পথে আগ্রহের সঙ্গে সকলে তাহা পাতিয়া দিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব বাবাজীরা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ভাবাবেশে আকুল হইয়া গান ধরিলেন ঃ—

২৫শে আশ্বিন।

"বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে, —
নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।
ঐ আমাদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
জেনে আয় জাহ্নবী-তীরে—হরি বলে কে;
হরি বলে কেরে—জয় রাধে বলে কে?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে, নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে?

গানের দু'একটি পদ গাইতে গাইতে সকলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নৃত্য করিতে করিতে সকলে বাবাজীর আখ্‌ড়ায় প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর বাবাজীর বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া দশটি মাদল বাজাইয়া মহাসমারোহের সহিত সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভাবাবেশে বহুলোক সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ঠাকুর কীর্ত্তনান্তে হরিরলুঠ বাতাসা প্রদান করিয়া, সশিষ্যে বাসায় আসিলেন।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—'সংকীর্ত্তনকালে যে ভাবোচ্ছ্বাসে লোক নৃত্য করে—অনেক সময় তাহা বিরক্তিকর বোধ হয়।'

ঠাকুর লিখিলেন—**"কীর্ত্তনে ভাব তিন প্রকার হয়। সত্ত্বভাবে উপস্থিত লোক উপকৃত হয়। রজঃভাবে অন্য লোকের কখনও উপকার, কখনও অপকার হয়। এজন্য সংবরণ করিবে। তমঃভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়;—কারণ, তমোগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতালা হইয়া লম্ফ ঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেকে খোঁড়া হয়, ঘরের দ্রব্যাদি**

নষ্ট হয়,—বালকগণ ভয় পাইয়া চীৎকার করে। কেহ কেহ ভক্তিভাব প্রকাশ করিবার জন্য শরীর সঙ্কোচ করে। এই ভাব বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজে অত্যন্ত প্রবল—শরীর সঙ্কোচ করা, নত করা, বাক্য সঙ্কোচ করা ইত্যাদি। ভক্তির স্বভাব হইতে যাহা হয় তাহা সুন্দর। দেখাইবার জন্য হইলে দৃষ্টিকটু হয়। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি ভাব ভিন্ন সংকীর্ত্তনে যে ভাব হয়—তাহা নামোন্মত্ততা। না মাতিয়া নাচিলেই দোষ,—যেমন মদ না খাইয়া মাত্‌লামী।"

পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার।

একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক খুব আগ্রহের সহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন -- পরমেশ্বর সাকার না নিরাকার?

ঠাকুর— শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছু ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তত্তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—কর্ত্তা নিজে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকার, নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্তসাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে বাগানের মালি যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয়-উদ্যানে উপস্থিত হইলে, অহঙ্কার-মালি দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থান করে। "প্রভো। আমি দাস," মালির মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালি বন্দনা করিলে শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

দীক্ষাপ্রার্থী ব্রাহ্মের প্রতি উপদেশ।

একজন ব্রাহ্ম-সমাজের ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকটে আসিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঠাকুর লিখিলেন — "ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীমত উপাসনা, এতদিন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইলে সেই প্রণালীতে যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। হঠাৎ অন্য সাধন গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। মহর্ষি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন। ধর্ম্ম-সাধন কোন প্রকার কল কৌশল নহে যে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া হাতে হাতে ফল পাবেন। ধর্ম্ম-সাধন করিবার জন্য জগতে নানাপ্রকার প্রণালী আছে। সেই অসংখ্য প্রণালীর একটি মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ধর্ম্মলাভ করিতে যত্ন করিয়া থাকি। এই প্রণালীতে

সাধন করিলে, কেহ শীঘ্র, কেহ বিলম্বে ফললাভ করিয়া থাকেন। অনেক বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ নিরাশ হইয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রণালীমত কার্য্য করেন। ভগবৎ কৃপা ভিন্ন কোন প্রণালী দ্বারা সহজে কিছু হয় না। যখন একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন হঠাৎ কিছু করা ভাল নহে। আমাদের কার্য্য-কলাপ ভাল করিয়া আলোচনা করুন—পরীক্ষা করুন। লোকের মুখে কিছু শ্রবণ করিয়া হঠাৎ তাহাতে প্রবেশ করা উচিত নহে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন — "আমরা যে সাধন করি তাহা স্বপ্ন নহে, — প্রত্যক্ষ ঘটনা। তবে সময় না হইলে ইহা কেহই পান না। যদি আপনার জমি প্রস্তুত হয় এবং সময় হয়, আপনি যেখানেই থাকুন ঘরে বসিয়াই পাইবেন। কিছু হওয়া, জমি প্রস্তুত নহে। জমি প্রস্তুতের অর্থ ভিন্ন। তাহা সাধন পাইলে বুঝা যায়; নতুবা বুঝা যায় না।"

এই ভদ্রলোকটি দীক্ষার জন্য নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিলে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, ঠাকুর লিখিলেন,— "পরে আসিবেন, এখন আমার শরীর সুস্থ নয়। শরীর, মন, আত্মা সুস্থ থাকিলে, শক্তি-সঞ্চার বিশুদ্ধরূপে হয়। প্রদীপ যদি প্রজ্বলিত থাকে, তাহা হইতে সহস্র প্রদীপ জ্বালান যায়। কেবল তৈল, শলিতা, তৈলাধার এ সমস্ত আছে কিন্তু প্রদীপ না জ্বলিলে তাহা হইতে একটি প্রদীপও জ্বলে না। অগ্নি সর্ব্বত্র আছে, ইহা বলিলে দীপ জ্বলে না। যে উপায় দ্বারা অগ্নি জ্বলে, তাহা না করিলে কিছুতেই দীপ জ্বলে না। মানবীয় শক্তিও এইরূপ।"

এ সাধনে ব্রাহ্মসমাজের লোক অধিক কেন? শক্তি-সঞ্চার।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—"আমাদের এই সাধন তো ঋষি-পন্থা—সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের ইহাতে এত আর্কষণ হইতেছে কেন? ব্রাহ্মভাবের লোকই বোধ হয় এই সাধনে অধিক?"

ঠাকুর বলিলেন— "যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাইয়াছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, কতগুলি ভাল বৃক্ষের বীজ একত্র হইয়াছে। তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব বৃক্ষ আছে। কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ বাহির করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইতেছে না।"

গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন— "ছেলে-পিলে যাহারা ধর্ম্ম কিছু বুঝে না, বর্ণ জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই— শিশু, তাহাদিগকে সাধন দেওয়া কিরূপ?"

ঠাকুর লিখিলেন—"শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। সকল সময়েই সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়া দেওয়া যায়। নারদ শুকদেবকে গর্ভাবস্থায় শক্তি দিয়াছিলেন। চক্ষুতে পীড়া হইলে তজ্জন্য ঔষধ সেবন করিলেন। শরীরের অন্য কোন অঙ্গে সে ঔষধের ক্রিয়া হইবে না;— কেবল চক্ষুতেই প্রকাশ পাইবে। সেই প্রকার যাহাকে শক্তি-সঞ্চার করিবেন, নাম তাহারই উপর ক্রিয়া করিবে, গুরুকে মনে রাখিতে পারে, এমন অবস্থায়ই দেওয়া উচিত।"

প্রশ্ন —'শক্তি-সঞ্চার কি?'

ঠাকুর লিখিলেন—**"ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। একটি মহাপুরুষের শক্তি—তাহা দ্বারা সেই শক্তিকে,— যাহাকে পরমাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বলে,—জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি-সঞ্চার বলে। ঐ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিতাবস্থায় আছে। তাহা শক্তি-সঞ্চার দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করে। যাহারা অনবরত শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিয়া, উহাকে আর ঘুমাইতে দেয় না, তাহাদের শক্তি বেশি খেলিতে থাকে।"**

ঠাকুর কথায় কথায় লিখিলেন —**"এবার অনেক লোককে অনেক প্রকার কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু লোক স্থির হইতেছে না। এবার মহাপুরুষগণ নিজেরা কিছু করিবেন না; —উপযুক্ত শিষ্যের দ্বারা করাইবেন।"** ঠাকুর এ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। মহাপুরুষেরা নাকি এখন হইতে নানাভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু কি আবার অবতীর্ণ হইবেন?
মহাপ্রভুর শিষ্যাদি সম্বন্ধে কথা।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'এই যুগে নাকি আরো দুইবার মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবেন?'

ঠাকুর লিখিলেন—**"চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু আর দুইবার শচীমাতার গর্ভে জন্মাইবেন। সেই সময়ের বৈষ্ণবগণ, তাহার এই অর্থ জানিতেন যে, আর দুই কলিযুগে এই শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। এইজন্য যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজ ও নরোত্তম ঠাকুর হরিনামে সমস্ত দেশ প্লাবিত করেন, তখন তাঁহাদিগকে তিন প্রভুর আবেশ অবতার বলিয়াছিলেন। আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ—এই কলিতেই হইতেছে ও হইবে। শ্রীবৃন্দাবনে একদিন গৌর শিরোমণি মহাশয় আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া লইয়া বলিলেন যে, 'এখন মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া হুজুগ্ উঠিবে। কিছুকাল পূর্ব্বে পাবনা জেলায় একবার উঠিয়াছিল। এ সকল হইতে সাবধান থাকিবেন।' কেহ কেহ বলেন, গীতায় আছে,—'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য' ইত্যাদি। যত অবতার হইয়াছেন, সেই যুগে একবারই হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ প্রভৃতি একবার মাত্র, শ্রীরামচন্দ্র একবার, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবার মাত্র। কলিতেও মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য একবার মাত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ কলি যতদিন বর্ত্তমান, তিনি ততদিন কলির জীবের উদ্ধার করিবেন। তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে যে, আবার জন্মাইবেন? যখন যেখানে কৃপা করিবেন, আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ, এই তিন ভাবে কার্য্য করিবেন এবং করিতেছেন।"**

প্রশ্ন করা হইল—'মহাপ্রভুর কি কোন শিষ্য ছিলেন।'

ঠাকুর লিখিলেন—**"হাঁ, তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ছিলেন। সাড়ে তিনজন বলা হইয়াছে। তাঁহারা শুধু শিষ্য নহেন, তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ সাধন শিক্ষা দিতেন এবং সাধারণ হইতে কিছু অন্যভাবে সাধন প্রণালী শিখাইয়াছিলেন।"**

'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে— শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান বলিয়া স্বীকার করেন নাই; অথচ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে,— যাহা অবলম্বন করিয়া শিশিরবাবু লিখিয়াছেন,— তাহাতে তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। শিশিরবাবু লিখিয়াছেন— 'শ্রীচৈতন্যের ভিতরে সময় সময় ভগবানের আবেশ হইত। এই পুস্তকের নাকি শিক্ষিত সমাজে খুব প্রচার। এই পুস্তক পাঠের ফলে, সকলেই নাকি এখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিতেছেন।' ঠাকুর শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—"যাঁহারা মহাপ্রভুর উপাসনা করেন, তাঁহারা উহা স্পর্শও করিবেন না। জগতের সকলে একবাক্যে আবেশ আবির্ভাব বলিলেও মহাপ্রভুর উপাসক ভক্তেরা তাহা গ্রাহ্য করিবেন না—শুনিবেন না। যাঁহারা চৈতন্য-মন্ত্রে সাধন করেন, সেই সকল বৈষ্ণবের ধ্যান করিতে করিতে একটি ভাব-মূর্ত্তি মুদ্রিত হয়। যেমন ভাবময় মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, সেইরূপ বাহিরের কতগুলি উদ্দীপনের অবস্থা আছে,— যেমন নবদ্বীপ ধাম। এখন যদি মূর্ত্তির সঙ্গে না মিলে এবং ধাম নবদ্বীপ না হয়, তবে সেই সকল বৈষ্ণব নূতন কিছু কখনই গ্রহণ করিবেন না। যাহারা হুজুগ্ করিতেছে, তাহারা যথার্থ শ্রীচৈতন্য উপাসক নহে।'

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন—"কোন কোন ব্যক্তি, মহাপ্রভু সম্বন্ধে দুই একখানি পুস্তক লিখিয়া বলিতেছেন যে, 'আমারই শ্রীগৌরাঙ্গকে উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করিলাম।' —ইহার ন্যায় ধৃষ্টতার কথা আর কি আছে? সূর্য্য অন্ধকারে পড়িয়াছিল, শিশিরবিন্দু সূর্য্যকে জগতে প্রকাশ করিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। মহাপ্রভুর একজন সঙ্গী বলিলেন, 'ভট্টাচার্য্য, আমি যাহা মহাপ্রভুর বিষয়ে বলিতেছি, কিছুদিন পরে তুমিও তাহাই বলিবে।' বাস্তবিক তাহাই হইল।"

আজ মহাপ্রভু সম্বন্ধে এবং তাঁহার ভক্তদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। মুকুন্দ ও দামোদরকে মহাপ্রভুর শাসন করা বিষয়ে, ঠাকুর লিখিলেন— "মুকুন্দকে বাস্তবিক দণ্ড করা হয় নাই। অন্য লোক মুকুন্দকে না বুঝিয়া নিন্দা করিত যে, মুকুন্দের কিছুতে দৃঢ়তা নাই। সেইটি লোকের ভ্রম। তাহা দেখাইবার জন্যই মহাপ্রভু মুকুন্দকে বলিলেন, যে লক্ষ জন্মের পরে পাইবে। মুকুন্দ ঐ কথা শুনে, 'পেয়েছি, পেয়েছি' বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তখন মহাপ্রভু সকলকে বুঝাইলেন যে, মুকুন্দের মত কাহারও দৃঢ়তা নাই। অনেক সময় দামোদর, বৈষ্ণবদের অপমান করিতেন। দামোদর না বুঝিয়া অনেক সময় রসভঙ্গ করিতেন,— এই জন্যই নবদ্বীপে পাঠাইলেন। যখন শ্রীনিবাস পুরুষোত্তমে গেলেন— মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে স্বরূপ দামোদর প্রভৃতিকে মৃতপ্রায় দেখিলেন।"

শালগ্রাম পূজায় উপাধির সৃষ্টি—লোকের বিষদৃষ্টি।

পূজার ছুটি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরের যে সকল গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের সঙ্গ মানসে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শীঘ্রই সকলে আপন আপন স্থানে চলিয়া যাইবেন। এতদিন ইঁহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। আমারও বোধ হয়, আর অধিক দিন এস্থানে

থাকা হইবে না। শালগ্রাম পূজা করিয়া এতকাল বড়ই আনন্দে ছিলাম, কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে ধীরে ধীরে উৎপাত আসিয়া আমার সেই শান্তি দূর করিয়া দিতেছে। বহুলোকের বিষদৃষ্টিতে, আমাকে বড়ই উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। শালগ্রাম পূজা করি বলিয়া, ব্রাহ্মবন্ধুগণ আমাকে আর পূর্ব্বের মত দেখেন না। কুসংস্কারী হইয়াছি ভাবিয়া নিকটেও ঘেঁসেন না, অথচ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া একে অন্যের নিকটে আমার সংস্কারের জন্য আক্ষেপ করেন। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা আরও ভয়ানক। ঠাকুরের নিকট শালগ্রামের আরতি করি, সুতরাং শালগ্রামকে ঠাকুর অপেক্ষা বড় মনে করি, এইরূপ ভাবিয়া আমার প্রতি বক্রদৃষ্টি করেন। ঠাকুর এসব দেখিয়া শুনিয়া দু'তিন দিন আমাকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্মচারী, তুমি কাশীতে অথবা গয়াতে কিম্বা অযোধ্যাতে গিয়া নির্জ্জনে সাধন কর। তা হ'লে ঠিকমত কাজ চল্‌বে,—উপকারও খুব পা'বে। এসব স্থানে হট্টগোলের মধ্যে লোকের চোখের উপর তোমার সাধনে তেমন সুবিধা পা'বে না।"

১লা—৭ই কার্ত্তিক।

এই সময় আমার সাধনের অবস্থা খুব সুন্দর চলিতেছিল। ঠাকুরের দয়ায় সর্ব্বদাই সরস ভাব থাকিত। তাই ঠাকুরের এই কথা শুনিয়াও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে, মনে করিলাম না। ঠাকুরকে বলিলাম— "যতদিন আপনার কাছে থাকিয়া সাধন-ভজন ঠিকমত চালাইতে পারি, ততদিন আর অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হয় না। তেমন বিঘ্ন ঘটিলে অন্য কোন দিকে চলিয়া যাইব।"

ঠাকুর আমাকে বারংবার সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে— "যেভাবে পূজা কর, কারো নিকটে তাহা প্রকাশ ক'রো না। ভজনের বিষয় গোপন রাখ্‌তে হয়। প্রকাশ কর্‌লে ক্ষতি হ'য়ে থাকে।" অর্থাৎ, শালগ্রামে যে ইষ্টদেবের পূজা করি, তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা'—এই কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে।

এখন শুনিতেছি, শালগ্রাম-পূজা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তাঁহারই একটি শিষ্য করে, অথচ তিনি তাহাতে কোন বাধা না দিয়া বরং ঐ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন,—এইরূপ কথা তুলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদের নাকি একটি কমিটি বসিয়াছে। যে সকল গুরুভ্রাতা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, তাঁহারা এই কমিটিতে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং ঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিয়াও কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যহ দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শালগ্রামের আরতির সময়ে স্বহস্তে কাঁসর বাজাইয়া থাকেন। এজন্য ব্রাহ্মগুরুভ্রাতাগণ ভারি ক্লেশ পাইতেছেন। তাঁদের এই অশান্তির মূল, আমি বলিয়া, দিন দিন তাঁহারা আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। যখন তাঁহারা আমার নিষ্ঠা ভঙ্গ করিবার জন্য নানা কথা বলিয়া থাকেন, তখন এক কথায়ই তাঁদের মুখ বন্ধ করিয়া দেই। বলি,— তোমাদের গুরুজীর হুকুম মতই আমি শালগ্রাম পূজা করিতেছি,—ইহা আমি নিজের ইচ্ছামত করিতেছি না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা মর্ম্মান্তিক যাতনা পান; অথচ আমাকে কিছু বলিতে পারেন না। ব্রাহ্মদের এবং গোঁড়া হিন্দুদের যতই আমার উপর তীব্রদৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ঠাকুরও ততই শালগ্রাম পূজার সহানুভূতি করিয়া ও শালগ্রামের নানা মাহাত্ম্য বলিয়া, আমাকে নিষ্ঠা পূর্ব্বক পূজা করিতে খুব উৎসাহ

দিতে লাগিলেন। এক একদিন তিনি নির্জ্জনে বলিতেন —**"কারো কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য ক'রো না। কারো কথায় জবাব না দিয়া নিজ মনে নিষ্ঠাপূর্ব্বক শালগ্রাম পূজা ক'রে যাও। লোকের কথা গণ্য ক'রো না।"** সাধারণের বিরক্তিজনক দৃষ্টিতে আমাকে যেটুকু গরম করিত, ঠাকুরের এক মুহূর্ত্তের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহা একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া দিত। ঠাকুরের সস্নেহদৃষ্টি স্মরণ করিয়া পরমানন্দে, অশ্রুপাতে সারাদিন কাটাইতাম।

যোগ-সঙ্কট

এই সময় ঠাকুরের কৃপায় নানা প্রকার অবস্থা আমার অনুভবে আসিতে লাগিল। কোন দিন নাম করিতে করিতে নাভিস্থলে উত্তাপ বোধ হইত। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা এত বৃদ্ধি হইত যে, নাভির ভিতরে জ্বালা বোধ হইত। কখনও বা ঐ জ্বালার উত্তাপ নাভির বরাবর মেরুদণ্ডে গিয়া লাগিত। তখন তথায় একরূপ দাহ অনুভূত হইত, যাহা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। যেদিন মেরুদণ্ডে ঐ প্রকার উত্তাপ লাগিত, সেইদিন সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বলিতে থাকিত; তখন কিছুই আমার স্থির থাকিত না,— শরীর, মন সমস্তই অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িত। ভিতরের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা হইত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাত করিতাম। কখন কখন জ্বালা নিবারণের জন্য বাহিরে যাইয়া বাতাস করিতাম, কিন্তু কোন উপায়েই এই যন্ত্রণা নিবারণে সমর্থ হইতাম না। শারীরিক জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। বড়ই ক্লেশের অবস্থা। কোন দিন নাম খুব দ্রুত চলিলে, কাঁধ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দু'পাশের দু'টা শিরায় টান ধরিত এবং নাম চলার সঙ্গে উহা আরো বৃদ্ধি পাইত। নাকটিও শিরার টানে ধরিয়া যাইত। কোন দিন মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া পড়িত; চক্ষু বেদনা হইত।

আজ্ঞাচক্রে ধ্যান রাখিয়া গায়ত্রী জপের সময়ে সেইস্থানে একপ্রকার সুড়সুড় অনুভব হইতে থাকিত। পরে ঐ স্থানে জ্বালা আরম্ভ হইত। এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হইত যে, যেন আগুন লাগাইয়া দিয়াছে; এইপ্রকার সময় সময় অনুভব হইত। কিন্তু জপ না করিলে এই জ্বালা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিত। ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন— **"নাম কর্‌তে কর্‌তে একটা সময় আসে যখন শরীরে ও মনে নানাপ্রকার জ্বালা হ'তে থাকে। উহা সাধনেরই একটা অবস্থা। এই সময় কখন কখন শরীর আগুনে পুড়্‌লে যেমন জ্বালা হয় তেমনই জ্বালা হ'তে থাকে। সময় সময় হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান ও নাড়ি-ভুড়ি টান্‌তে থাকে। এই ক্লেশ বড় সহজ ক্লেশ নয়। —অনেকে এই যন্ত্রণায় সাধন-ভজন ছেড়ে দেয়। ইহাকে যোগ-সঙ্কট বলে। খুব সাবধানতার সহিত এই সময়টা ভালমতে কাটায়ে দিতে পার্‌লেই হয়। এই সময় মিশ্রির সরবৎ, ডাব ও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস খেতে হয়। শরীর ঠাণ্ডা ও অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌লে গরম ঘি সৈন্ধব দিয়া পান কর্‌তে হয়। এরূপ কর্‌লেই ঐ সকল যন্ত্রণার শান্তি। যোগ-সঙ্কট অবস্থা একবার কাটায়ে যেতে পার্‌লে আর কোন উৎপাতই থাকে না। সাধন কর্‌লে উহা সকলেরই একবার ভুগ্‌তে হ'বে। পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা শিষ্যদের দেহ মন শুদ্ধ কর্‌তে তুষানল কর্‌তেন। এখন আর তাহা চলে না। নামানলেই দগ্ধ ক'রে এখন সেই কাজ করায়ে নেন।"**

আমার যখন এই সকল জ্বালা আরম্ভ হইল, তখন ঠাকুর এক একদিন ঘৃত গরম করিয়া খাইতে বলিতেন। কোন দিন সরবৎও খাওয়াইতেন। নাম ছাড়িয়া শুইয়া থাকিতেও কোন কোন সময় বাধ্য করিতেন। এ সমস্ত উপাধি উপস্থিত হইলে, ঠাকুর যখন যাহা করিতে আদেশ করিতেন, তাহা করিলেই ঐ যন্ত্রণার উপশম হইত। এই সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, যখন আমার আরম্ভ হইল, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের ভাবও আসিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—বুঝি আমার যোগ-সঙ্কটের অবস্থা হইয়াছে। যোগ-সঙ্কট অবস্থা সাধকদের যোগ আরম্ভের পরেরই একটা অবস্থা, —তবে আমি বুঝি যোগী হইলাম। এই প্রকার অভিমান ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ— শালগ্রাম পূজা দেখিয়া গুরুভ্রাতারা অনেকে মনে করিতেছেন, দিন দিন আমার অবনতি হইতেছে। তাঁহারা বলেন, তোমার রাগমার্গ ধরিবার অবস্থা আসিতে এখনও বহুকাল দেরী! বিধিমত শালগ্রাম পূজা করিতে করিতে রাগ জন্মিলে তখন আপনা আপনি এ সকল পূজা ছুটিযা যাইবে। আমরা বিধিকার্য্য গতবারই শেষ করিয়া আসিয়াছি। তাই এবার আব বাহ্য পূজার ধার ধারি না। এ সকল কথা বলিয়া, কেহ কেহ আমাকে খুব নির্য্যাতন করিতেন। তাই, যখন শালগ্রাম পূজা করিতে করিতে আমার অশ্রুপাত হইত, তখন সময়ে সময়ে মনে হইত,— আমার এই অশ্রুপাত ও ভাবের অবস্থা, শালগ্রামপূজাদ্বেষীরা একবার দেখিলে বুঝিত যে, শুধু শুষ্ক কাষ্ঠ চিবাই না, তাতে রস পাই! ঐ সকল বিদ্বেষীরা নিকটে আসিলে, জোর করিয়া ভাব আনিয়া অধিক পরিমাণে অশ্রুপাত যাহাতে হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতাম! ভগবানের চক্ষু সর্ব্বত্র। তিনি আমার প্রতিষ্ঠার উপরে মুষলাঘাত করিলেন। এইরূপ চেষ্টায়, আমার কোন ভাবই বৃদ্ধি পাইত না; বরং যেটুকু ভাব পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিত, তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইত,— চিহ্নও থাকিত না। মুখমণ্ডলে গদগদভাবের আভা যাহা থাকিত, তাহাতে বিরক্তির ছায়া পড়িত। ঠাকুর আমাকে এই সময়ে একদিন বলিলেন—"**প্রশংসার ভাবে তোমার ভিতরের রস শুকায়ে যাচ্ছে,—সতর্ক থেকো।**" আমার বর্তমান দুরবস্থার ইহাও একটি কারণ।

তৃতীয়তঃ— ঠাকুর শালগ্রাম পূজার প্রকৃত রহস্য বা গুরুপূজার তত্ত্ব গোপন রাখিয়া যথাবিধি পূজা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি পারিলাম না। যখন নানা জনে নানা কথায় আমাকে জব্দ করিতে লাগিল এবং পূজার উপরে নানা কুৎসিত কথা বলিয়া আমাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিতে লাগিল, তখন তাহাদিগকে জব্দ করিতে, পূজার রহস্য বলিতে লাগিলাম। একদিন একটি গুরুভাই বলিলেন, 'তুমি যে শালগ্রামে পূজা কর, আমি তাহার উপরে প্রস্রাব করি।' আমি বলিলাম— 'তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি প্রস্রাব কর; আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি পূজা করি। কিন্তু আমার ঠাকুরকে চিনিতে না পারিয়া এসব কথা বলায়, তোমার অপরাধ হইতেছে। তুমি যাঁহার পূজা কর, যাহাকে গুরু বল, তাঁরই হুকুম মত এই শিলাতে তাঁরই পূজা করি।' আর একজনে বলিল,— 'তুমি যাহা পূজা কর, তাহা আমরা একটি রাস্তার পদদলিত নুড়ি হইতে বেশী কিছুই মনে করি না। এসব পূজা, আমরা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া জানি। নিতান্ত অজ্ঞের জন্যই এসব বহিরঙ্গ সাধন।' আমি বলিলাম.— 'পাথরটিকে আমিও পাথর বিনা আর কিছুই

মনে করি না, কিন্তু ঐ পাথরের অণু-পরমাণুতে ওতোপ্রতভাবে যে চৈতন্যশক্তি— গুরুদেব পূর্ণ অবয়বে রহিয়াছেন, যাঁহাকে তুমি পূজা কর, — আমিও তাঁহারই পূজা করি। বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ বুঝিতে তোমার এখনও বহু দেরী। নাম সাধনও বহিরঙ্গ সাধন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একদিন গেণ্ডারিয়া আমতলায় বলিয়াছিলেন—"এমন অবস্থা আসে, যখন নামটিও ছুঁটে যায়।" অন্তরঙ্গ একমাত্র ভগবান। সাধন-ভজনাদি ভগবানকে লাভের উপায়—সমস্তই বহিরঙ্গ। যাহার যাহাতে কল্যাণ হয়, গুরুদেব তাহাই তাহাকে করিতে আদেশ করেন। গুরুর আদেশে ইতর-বিশেষ নাই।

কোন কোন গুরুভাই বিরক্তির সহিত উত্তেজিত হইয়া বলেন,"গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্য দেবতাং, স যাতি নরকে ঘোরে সা পূজা বিফলা ভবেৎ।" আপনার এসব কুবুদ্ধি কেন? গুরুর নিকটে পাথর পূজা কেন? এতে আপনার অপরাধ হইতেছে। ইহা দেখাতেও আমরা অপরাধী হইতেছি। শেষ রাত্রিতে ঘণ্টা কাঁসরের ধ্বনিতে গোঁসাইয়ের উদ্বেগ করেন, ইহা আমাবা সহ্য করিতে পারিব না। আপনি সাবধান হইবেন। আমরা গুরু ছাড়া অন্য কিছু জানি না।' আমি বাধ্য হইয়া বলিলাম— 'কাঁসর ঘণ্টা, ইচ্ছা করিয়া নাড়ি না, ঠাকুর আমাকে ঐরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। শালগ্রামকে আমি গুরু ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। শালগ্রামে আমি গুরুদেবেরই পূজা আরতি করি। ঠাকুর আমাকে পরিষ্কার বলিয়াছেন,— "শেষ রাত্রে ৪ টার সময় আরতি কর্‌তে হবে। যদি কখনও আমার অসুস্থাবস্থায় ঐ সময়ে শুয়ে পড়ি,— আরতি বন্ধ রাখ্‌বে না। কাঁসর ঘণ্টার শব্দে আমার কোন উদ্বেগ হয় না।" ঠাকুরের এসব কথা শুনিয়াই আমি নিয়ম মত আরতি করিতেছি। আপনাবা বিরক্ত হইলেও আমার প্রতি ঠাকুরের যাহা আদেশ, লঙ্ঘন করিতে পারি না।'

এইপ্রকার প্রত্যহই গুরুভ্রাতারা, নানাপ্রকার অপ্রীতিকর কটুবাক্যে আমার প্রতি বিরক্তি ও রোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা শুনিতেন যে শালগ্রামে আমি গুরুদেবেরই পূজা করি, লজ্জিতভাবে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতেন। এটি যে আমি মহা অপরাধ করিয়াছি, তখন বুঝিতে পারি নাই। ঠাকুর সর্ব্বদাই পূজার ভাব ও রহস্য গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন। এই প্রকার শালগ্রাম পূজা লইয়া, গুরুস্থানে বহু অপরাধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সকল অপরাধের আগুন একেবারে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাধন-ভজন নিয়মিত চলিলেও, এই আগুনের জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইলাম না। গুরুভ্রাতাদের প্রায় সকলেরই তীব্র বিষদৃষ্টিতে আমার জ্বালা-যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি মহা বিপদে পড়িলাম। সাধন-ভজনের সময় আরো বাড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কিছুতেই আর মানাইল না। যে আগুনে ধরিল, তাহা শিখা বিস্তার করিয়া আমাকে অহরহঃ দগ্ধ করিতে লাগিল। যতদিন আশা ছিল, ততদিন ধৈর্য্যও রহিল। যখন ভিতরের অবস্থা বুঝিয়া, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম, ভিতরে বিষম হাহাকার উঠিল,—অসহ্য যাতনায় পীড়িত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ হইলাম। এই সময়ে ৫/৭ মিনিটের জন্য প্রাণে শান্তি আসিত না; সুতরাং, কোন প্রকারে নিত্যকর্ম্মগুলি সমাপন করা হইত মাত্র। ভিতরের

আরাম নষ্ট হইয়া, যতই বিরক্তি ও জ্বালা জন্মিতে লাগিল, ততই নিত্যকর্ম্মও সংক্ষেপ হইতে লাগিল। আসনে বসিতে ইচ্ছা হইত না, নীরস প্রাণে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়াও আরাম পাইতাম না, বরং বিরক্তি বোধ হইত। একদিন রাত্রি ৩ টার সময় ঠাকুরকে বলিলাম—'ভিতরের যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারি না। নাম, ধ্যান, সাধন-ভজন সমস্ত আমার ছুটিয়া গিয়াছে। দিনরাত আমি জ্বলিয়াপুড়িয়া মরিতেছি। এবার বোধ হয় নাস্তিক হইলাম। এখন কি করব?' ঠাকুর বলিলেন—**"নাস্তিক হ'বে না, তবে এ সময়ে স্থানান্তরে যাওয়া ভাল। এখানে লোকের দৃষ্টিতে তোমাকে শুষ্ক ক'রে দিতেছে। যতই এখানে থাক্‌বে ততই এই শুষ্কতা বৃদ্ধি পাবে। লোকের দৃষ্টি বড় বিষম। জীয়ন্ত গাছ লোকের দৃষ্টিতে শুকায়ে যায়—দেখ নাই?"**

আমি বলিলাম—'একথা আমি বুঝি না। সহস্র লোকের রুক্ষদৃষ্টিতে আমাকে শুষ্ক কর্‌বে কিরূপে? আমি যে আপনার দৃষ্টিতে সর্ব্বদা রহিয়াছি! গুরুভ্রাতারা আমাকে যে শালগ্রাম পূজার জন্য নানাপ্রকার বলিত—এখন আর তেমন বলে না। তাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ইষ্টদেবের পূজা শালগ্রামে করি শুনিয়া তাহারা এখন নির্ব্বাক হইয়াছে; কিন্তু পূজায় আমার পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি আসিতেছে না। নামে বিষম শুষ্কতা। ধ্যানও ছুটিয়া গিয়াছে!'

ঠাকুর—**"শালগ্রামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান ক'রো। শালগ্রামের ধ্যান শাস্ত্রে যেমন আছে, তুমি তেমন কর না?"**

আমি—"না, আমি তো অন্য কিছুরই ধ্যান করি না। নিজের ইষ্টদেবেরই ধ্যান করি। অন্য কিছুতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না।"

ঠাকুর—**"তবে তুমি মানুষের পূজা কর? শালগ্রামে মানুষের পূজা অপরাধ। শালগ্রামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান যথাশাস্ত্র কর্‌তে হয়। তোমাকে পূর্ব্বেই স্থানান্তরে যেতে বলেছিলাম, তখন সে কথা গ্রাহ্য কর্‌লে না। এখন এখানে যতই বেশী কাল থাক্‌বে ততই ক্ষতি হবে। কাল থেকে যথাশাস্ত্র শালগ্রামের পূজা ও ধ্যান ক'রো।"**

পূজার ভেদ প্রকাশে গুরুতর শাসন। শালগ্রাম ত্যাগ।

ঠাকুরের কথায় আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। ভাবিলাম—এ কি হইল? ঠাকুর যে পলকে যুগ-প্রলয় করিলেন! কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, যেখানে সেখানে শালগ্রামে গুরুদেবের পূজা করি বলাতে ঠাকুর ঐ পূজা ছাড়াইয়া দিলেন। হায়! আমি ঠাকুর পূজার বিশেষ অধিকার পাইয়াছিলাম। লোকের নিন্দা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে, ঠাকুরের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি আনিতেছিলাম এবং ঐ প্রকার ভেদ প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যতে বিষম অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিলাম। তাই, ঠাকুর সহজে চারিদিক্ রক্ষা করিলেন! আমি কিন্তু মারা পড়িলাম, ইহা পরিষ্কার বোধ হইতেছে। ঠাকুর আজ আমাকে খুব তেজের সহিত অন্যত্র যাইতে বলিলেন। আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং কল্যই এখান হইতে চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। হায়! যদি দু'চার দিন পূর্ব্বে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতাম, তবে আর এসব সঙ্কটে পড়িয়া, ধাক্কা খাইয়া, সরিতে হইত না।

যে রাত্রিতে ঠাকুর আমাকে এইপ্রকার শাসন করিলেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে কোন প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইলাম; এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি আমার অগোচরে ঠাকুরকে বলিলেন—'ব্রহ্মচারী বড় ক্লেশ পাইতেছে। বোধ হয়, সে আর এখানে থাকিবে না। আপনি যদি বলেন তাহা হইলে উহাকে আমি নির্জ্জনে থাকার বন্দোবস্ত তেতালায় করিয়া দিতে পারি—আপনি কি বলেন?'

ঠাকুর কহিলেন—"**উহার নির্জ্জনে থাকাই ভাল। মানুষের চক্ষু ভাল নয়। ছেলেটিকে দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে এমন শুষ্ক ক'রে দিয়েছে যে এই অবস্থা কিছুদিন থাক্‌লে অনায়াসে আত্মহত্যা ক'রে ফেল্‌বে। সর্ব্বদা একজনের উপরে ওরূপ বহুলোকের তীব্র দৃষ্টি পড়্‌লে সাধ্য কি যে সে ঠিক থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে বৃক্ষলতাকে পর্য্যন্ত শুকায়ে ফেলে, এমনই ভয়ানক। মানুষ আর কি? আমি এজন্য পূর্ব্ব হ'তেই উহাকে স্থানান্তরে যেতে বলেছিলাম। ছেলেমানুষ তখন বুঝে নাই;—এখন ভয়ানক বিপদে পড়েছে। তেতালায় উহার ইচ্ছা হ'লে থাক্‌তে পারে—আমার আপত্তি নাই।**"

ঠাকুর যখন এ সকল কথা, রাখালবাবুকে বলিতেছিলেন তখন আমি বারান্দায় থাকিয়া সমস্ত শুনিলাম। শালগ্রাম পূজা করিতে হইলে উহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে—ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া অবধি, আমার প্রাণে যেন 'হু হু' করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সজন-নির্জ্জনে আমার কি হইবে? ঠাকুরের নিকটে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান, আমি করিতে পারিব না। যদিও মনুষ্য—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, স্থাবর-জঙ্গম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ, ষড়ভুজ সমস্তই আমার ভগবান গুরুদেবের একমাত্র চৈতন্যময় শক্তির আলোড়নে বিচিত্রভাবে তাঁহারই স্থূলত্বে বিকাশ,—আকার বিভিন্ন হইলেও মূলে সকলেই এক,—তথাপি ঠাকুরের যে রূপের সহিত, আমার চিত্তের আরাম, আনন্দ ও শান্তির বিশেষ সম্বন্ধ তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যটি ধরা দারুণ ক্লেশকর। নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্য মনে করিলাম, যে কোন বস্তুর পূজাতে মূলে একমাত্র ভগবান গুরুদেবেরই উপাসনা হয়,—এইজন্যই বুঝি, ঠাকুর আমাকে বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলায়, ঠাকুরের উপাসনা হইতে যে আমাকে ছাড়াইয়া দিলেন, তাহা মনে হয় না। কোনও শাস্তি যে দিলেন—তাহাও মনে করি না। কিন্তু, কি করিব!—উহা যে আমার সাধ্যাতীত ও রুচিবিরুদ্ধ।

বেলা ১১টার সময় আর আর দিনের মত ঠাকুর স্নানে যাওয়ার পর, আমি আমার আসন তুলিয়া, জিনিস-পত্র লইয়া ঝামাপুকুর ভাগিনেয়দের বাসায় গেলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীট ত্যাগ করিয়া আসার সময়ে পূজনীয় রাখালবাবু আমাকে তাঁহার তেতালায় নিয়া রাখিতে খুব চেষ্টা-যত্ন করিলেন; কিন্তু, ঐ বাড়ীটি আমার নিকট আগুনের মত বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর অত্যন্ত অভিমান জন্মিল। সুতরাং কারো কোন কথা না শুনিয়া একেবারে ঝামাপুকুরে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায় গেলাম। তথায় মহেন্দ্রবাবুকে দেখিলাম। তিনি আমাকে গোঁসাইয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া আসার হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মহেন্দ্রবাবুকে,

সুযোগ পাইয়া সমস্ত কথা বলিলাম। শাস্ত্রীয় প্রণালীমত, ঠাকুর শালগ্রামে বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিয়াছেন,— তাহা আমি পারিব না। তাই শালগ্রাম কাহাকেও দিয়া দিব স্থির করিয়া আসিয়াছি। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন,—'তোমার শালগ্রাম পূজা সম্বন্ধে গোঁসাইকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"যেভাবে পূজা কর্‌ছে ওরূপ নির্ব্বিঘ্নে ক'রে যেতে পার্‌লে বিশেষ উপকার হ'বে"—ঐ পূজা তুমি ছাড়িবে কেন?'

আমি—'শালগ্রামে, মানুষের পূজা করা না কি অপরাধ? কিন্তু আমি তো মানুষের পূজা করি না। আমার তো মনে হয় আমি শাস্ত্রসম্মত পূজাই করিতেছি। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ। গুরুদেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।'— ইহা তো শিববাক্য,— মিথ্যা হইবে কিরূপে? চতুর্ভুজ বিষ্ণুই হউন, আর দ্বিভুজ মুরলীধরই হউন, সকলেই তো গুরুর অঙ্গীভূত বা তাঁর সহিত অভিন্ন। একমাত্র গুরুর পূজাতেই তো তেত্রিশ কোটী দেবতা, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সাক্ষাৎ ভগবানের পূজা হয়। সুতরাং শালগ্রামে গুরুর পূজাতে, বিষ্ণু বাদ পড়িলেন, কিরূপে? অশাস্ত্রীয়ই বা হইল কিরূপে?' ঠাকুর বলিলেন—'শালগ্রামে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ধ্যান পূজা কর। —না হ'লে শালগ্রাম পূজা ছেড়ে দেও।" আমি এখন উহা ছাড়িতে পারতেছি না, রাখিতেও পারিতেছি না,— বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি।' মহেন্দ্রবাবু আমার সমস্ত কথা ঠাকুরকে বলিবার জন্য সুকিয়া ষ্ট্রীটে রওনা হইলেন। আমি অভয়বাবুর বাসায়ই ভিক্ষা করিয়া যথাসময়ে রান্না ও আহার করিয়া ঝামাপুকুর আসিলাম।

পরদিন সকালবেলা, নিত্যক্রিয়া কোনমতে সম্পন্ন করিলাম। বেলা ৯টা হইতে না হইতেই, ঠাকুরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম, ঠাকুরের নিকট আর যাইব না, কিন্তু তাহা পারিলাম না। ৯টার সময়েই সুকিয়া ষ্ট্রীটে, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সকলেই আমার জন্য অত্যন্ত আক্ষেপ করিতেছিল। ঠাকুরও আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, গুরুভ্রাতাদের নিকট আমার প্রতি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি ওখানে পঁহুছিবামাত্র, ঠাকুর একমুখ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আসন কোথায় নিয়েছ?" আমি বলিলাম—'ঝামাপুকুরে।' ঠাকুর আমাকে কি যেন বলিতেছিলেন, কিন্তু আমি অভিমানে ফুলিয়া ঠাকুরের দিকে একবার তাকাইলামও না। ঠাকুরও চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শৌচাদিতে গেলেন। ঐ সময়ে আমার নিকট অনেক গুরুভ্রাতা আসিয়া আমার ক্লেশে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অদ্যই আমি শালগ্রামের একদিক করিব শুনিয়া, তাঁহারা কেহ কেহ খুব আগ্রহের সহিত চক্রটি চাহিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। কারণ তাঁহারাই শালগ্রামের প্রধান বিরোধী ছিলেন। আহারান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন। তখন ঘর নির্জ্জন হইল। সকলেই আহার করিতে গেলেন। আমিও ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলাম— 'কয়েকটি কথা আমি বলিতে চাই!'

ঠাকুর কহিলেন— হাঁ, খুব বল। আমি বলিতে লাগিলাম— 'শালগ্রাম পূজা আমি নিজ ইচ্ছায় ধরি নাই। আপনি গেণ্ডারিয়াতে ন্যাসের যখন ব্যবস্থা করেন, তখনই' —এইমাত্র বলার পরেই ঠাকুর বলিলেন— "হাঁ, তা জানি। তারপর মোট কথা কি বল?' আমি বলিলাম—

'দেবদেবী আমি কিছু বুঝিনা। এতদিন যেভাবে শালগ্রাম পূজা করিয়া আসিয়াছি সেরূপ পূজা করিতে যদি নিষেধ করেন, তবে উহা আমি পূজা করিতে চাইনা। শালগ্রামটিকে যাহা করিতে বলেন,— করিব।'

ঠাকুর বলিলেন,—"তবে তুমি শালগ্রাম পূজা ছেড়ে দেও। পূর্ব্বে যাহা কর্‌তে তাহাই কর। শালগ্রামটি কারোকে দিয়ে ফেল। যাকে দিলে শালগ্রামের সেবা-পূজা হবে, তাকেই দেও। আমাদের এই পথে এক নামেই সব হয়। শালগ্রাম পূজার যাহা প্রয়োজন তাহা তোমার হ'য়েছে। এখন উহা না কর্‌লে কোন ক্ষতিই নাই। পূজা কর্‌তে যদি ইচ্ছা হয়, শাস্ত্র মত ক'রো।"

সন্ধ্যা, গায়ত্রী, হোমাদির আবশ্যকতার উপদেশ।

আমি—'তবে শালগ্রাম পূজা ছাড়িয়া দেই? আর অন্যান্য বিষয়েও সাধারণ হইতে কিছু বিশেষত্ব রাখিতে চাইনা। আর দশজনকে যেমন রাখিয়াছেন, আমাকেও সেইভাবে রাখুন। সন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদি কিছুরই আমার ইচ্ছা নাই। দশজনার মত মাত্র নাম করিব, আর আপনার নিকটে পড়িয়া থকিব।'

ঠাকুর বলিলেন— "ভাল, দশজনার মতই চল। তবে গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যাটি ছেড়ো না। সন্ধ্যা করায় কেহ তোমাকে ধাক্কা দিবে না। সহস্র লোকের মধ্যেও অনায়াসে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে যেখানে সেখানে শুধু মন্ত্র প'ড়ে সন্ধ্যা কর্‌তে পার্‌বে। ইহাতে কারো মনে বাজ্‌বে না। সন্ধ্যা, তর্পণ ও গায়ত্রী-জপ ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম। এসব ঠিকমত ক'রো; বিশেষ উপকার পাবে।"

ঠাকুর আবার বলিলেন—"একদিন পরমহংসজীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম—নানাপ্রকার যথেচ্ছাচারে আমি এতকাল চলেছি, সমস্তই তো উড়ায়ে দিয়েছিলাম, তবে এমন কি করেছিলাম, সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হ'ল? পরমহংসজী বল্‌লেন—এক গায়ত্রী তুমি ত্যাগ কর নাই, তাতেই এই শক্তি লাভ কর্‌লে। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেও আমি একদিনের জন্যও গায়ত্রী-জপ ছাড়ি নাই।"

আমি— 'আচ্ছা, সন্ধ্যা, তর্পণ, গায়ত্রী-জপ করিতে বলিতেছেন, করিব। হোমটি না করিয়া পারি কি না? হোম কর্‌তে নট্‌খট্‌ অনেক।'

ঠাকুর বলিলেন— "হোমটিও ক'রো। ওটি তোমার পক্ষে আবশ্যক। বেশী কিছু না ক'রে, একখানা কাঠ জ্বালায়ে একটু ঘৃত দিয়ে কয়েকবার আহুতি দিতে মুস্কিল কি? হোম ছেড়ো না।"

আমি—'ভিক্ষা করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়, আর উদ্বেগও হয়। আহারের নিয়মও ঠিক থাকে না। ভিক্ষা না করিয়া পারি কি না?'

ঠাকুর—"ভিক্ষার প্রয়োজন কি? যখন যেখানে থাক্‌বে তখন সেখানে আহারাদি কর্‌বে। ভিক্ষার দরকার নাই।"

আমি—'আহার অন্যান্যের সঙ্গে করিতে পারি কি না?'

ঠাকুর—**"আহারটি স্বপাকেই ক'রো। ইহাতে সুস্থ থাক্‌বে, আরো অনেক উপকার পাবে। অন্যের রান্না খেও না। আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক রেখে স্বহস্তে রান্না করে খেও। ভিক্ষা নাই কর্‌লে।"**

আমি বলিলাম—'শালগ্রাম-পূজা যখন করিব না, তখন আপনার সঙ্গে থাকিতে পারিব কি না?'

ঠাকুর—**"তা পার্‌বে না কেন? শালগ্রাম পূজা নিয়া সঙ্গে থাকা অসম্ভব। গেণ্ডেরিয়া হ'লে পার্‌তে। এসব স্থানে নানাভাবের লোক। তাই তাদের দৃষ্টিতে নিজেকে রক্ষা ক'রে চল্‌তে পার্‌বে না।"** এসব কথা বলিয়া ঠাকুর আমাকে পুনরায় ওখানে আসন আনিতে বলিলেন। ঠাকুরের কথামত অমনি আমি ঝামাপুকুরে উপস্থিত হইয়া, ঝোলাঝুলি জিনিসপত্রসহ আসন লইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে পঁহুছিলাম। সুকিয়া ষ্ট্রীটে পঁহুছিবার পূর্ব্বে ভাইপো শ্রীসজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে শালগ্রাম পূজার বাধা-বিঘ্নের সমস্ত বিবরণ জানাইয়া, শালগ্রামটি তাঁহাকে দিয়া আসিলাম। সজনী, উহা পূজা করিবে বলিয়া খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। আমি গতকল্য সুকিয়া ষ্ট্রীট ত্যাগ করামাত্রই জনৈক গুরুভ্রাতা, আমার স্থানে আসন পাতিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্রই ঠাকুর বলিলেন—**"ঐ আসন তুলে রাখ,—তুমি ওখানে আসন কর।"**

শালগ্রাম পূজায় ইষ্টানিষ্ট বিচার।

আমি ঠাকুরের কথামত তাহাই করিলাম। আমার অবশিষ্ট নিত্যকর্ম্মও ঠাকুরের পূজা শালগ্রামে যেমন করিতাম, এখনও সেইপ্রকারই মনে মনে করিতে লাগিলাম। শিলাচক্রটি এতকাল সম্মুখে ছিল, এখন তাহারই অভাব হইল মাত্র। এই অভাবে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। শিলাচক্র থাকাতে সর্ব্বদা শিলাতেই দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইত; কখন কখন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতাম। এখন উহা না থাকাতে সর্ব্বদা ঠাকুরের উপর দৃষ্টি রাখিবার সুযোগ হইল। শালগ্রাম-পূজা ছাড়াইয়া ঠাকুর আমার কল্যাণই করিলেন। শালগ্রাম-পূজা ছাড়াইয়া দিয়া ঠাকুর আমার কি কি কল্যাণ করিলেন, এবং উহা ধরিয়া থাকিলে কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল, তাহা মনে আসিতে লাগিল—শালগ্রাম পূজার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে একটা অভিমান জন্মিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম—ঠাকুর তো দীক্ষা বহুলোককে দিয়াছেন। অবস্থাও তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আমা অপেক্ষা উত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও শালগ্রামে স্বয়ং ঠাকুরের পূজা করিতে অধিকার দেন নাই। আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা না থাকিলে, এই প্রকার পূজার ব্যবস্থা, আমার উপরেই বা হইল কেন? দু'দিন পরে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেব দেবীর মত যে ঠাকুর আমার ঘরে ঘরে পূজিত হইবেন, ঠাকুর বর্ত্তমানে, আমি তাঁকে শালগ্রামে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক সময়ে যেমন গোপালভট্ট গোস্বামী শালগ্রাম

পূজা করিয়া ইচ্ছামত শালগ্রাম হইতে বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঠাকুর বর্ত্তমান থাকিতে আমিও সেইপ্রকার, এই শালগ্রামে ঠাকুরের আকৃতি ফুটাইয়া তুলিব। শালগ্রামে এই অল্পকাল, ঠাকুরের ধ্যান-ধারণার ফলে পরিণামের সূত্র যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইত না, মনে হয়। গুরুদেবের দয়ায়, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রামের কলেবরে আমার ঠাকুরের তাম্রবর্ণ আভা বিকাশিত হইয়াছে, দেখিয়াছি। ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইয়া নিশ্চয়ই ঠাকুরের আকারে পরিণত হইত। ভাবিলে বড় দুঃখ হয় যে, আমা দ্বারা তাহা আর হইল না। শালগ্রাম পূজা করিতে গিয়া, কতগুলি কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ঠাকুরকে দু'তিনবার যাহা ভোগ দেই, তাহা প্রসাদ পাইতে পাইতে আমার আহারের পরিমাণ ছুটিয়া গিয়াছে। ঠাকুর আমাকে যে সকল দ্রব্য পান ও ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ঠাকুরেরই সাক্ষাতে প্রসাদ বলিয়া পাইতেছি। এই প্রকার আহারের অনিয়মে আমার শরীর খারাপ হইয়াছে। মনটিও শরীরের গুণে বাধ্য হইয়া বিক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ও আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তারপরে ঠাকুর-পূজা করিতে গিয়া বহু রাজসিক ভাব আনিতে বাধ্য হইয়াছি। ঠাকুরকে খুব সাজাইব, খুব ধূমধাম করিয়া পূজা-আরতি করিব, সকলে যাহাতে এই ঠাকুরকে ভক্তি করে এমন সব বাহ্য আড়ম্বর করিব,—ভাবিয়া রজোগুণে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম। নানাপ্রকার রাজসিক ভাব, যাহা আমার মনে পূর্ব্বে কখনও উদয় হয় নাই,—শালগ্রাম পূজার দরুণ তাহা আসিয়া দিন দিন অন্তরে আবদ্ধ হইতেছিল, শালগ্রাম আমার পূজা করিতে হইলে, কতকগুলি রাজসিক কাণ্ডে যে জড়িত হইয়া পড়িতাম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঠাকুর শালগ্রামের জন্য আমাদ্বারা কয়দিনের মধ্যেই কাঁসর, ঘণ্টা, চামরাদি পূজার সরঞ্জাম খরিদ করাইয়া আনিয়াছেন। আবার বলিয়াছিলেন, তাঁবুর মত একটি ছোট খাট আবরণ হইলে ভাল হয়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন আমার ভয়ও হইতেছিল। ঠাকুরের মুখে ঠাকুর পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা শুনিয়া, আপত্তি করিতে পারিতাম না। কিন্তু ভয় হইতেছিল পাছে পরিণামে পূজার উপকরণ হেতু বিষম বিপাকে পড়িতে হয়। গুরুদেব বাহ্যপূজা বন্ধ করিয়া এ সকল আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিলেন। জয় গুরুদেব! তোমারই জয়!

কলিতে ধার্ম্মিকের দুঃখ, অধার্ম্মিকের সুখ।
দুর্ভিক্ষাদি অনর্থের হেতু। কলিতে ব্রহ্মনাম।

আজ সকালে বহুলোক ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পাঠের পর ঠাকুরকে তাঁহারা বলিলেন— 'যাঁহারা সাধন-ভজন করে, ভগবানের নাম লয়, সত্যপথে চলে, ধার্ম্মিক ও সদাশয়, সংসারে তাঁহাদেরই যত কষ্ট। যাহারা জাল, জুয়াচুরি করে, অন্যের সর্ব্বনাশ করে, ক্রূরপ্রকৃতি, ধর্ম্মের নামগন্ধও জানে না, তাহারা তো বেশ সুখেই আছে দেখিতেছি। ইহার কারণ কি?'

১২ই কার্ত্তিক।

ঠাকুর লিখিলেন—**"এখন রাজা কলি। ধর্ম্ম করলে পুরস্কার নাই। রাজাকে যদি তুমি অমান্য কর, সাজা পাইবে। যদি অধর্ম্ম কর, তাঁর আজ্ঞা পালন করা হইবে। তুমি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের**

আনুগত্য করিতেছ, তবে কলিকে আশ্রয় করিলে কই? যে কলির মতে চলিবে, তার পুরস্কার। কলি রাজা;—এখন সত্যপথে চলিলে মানাবে কেন? যে দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিতে পারে, এ যুগে তারই পক্ষে লাভ। এমন কতই দেখা যাইতেছে। তাই বলিয়া কি ভগবানের রাজ্য উঠিয়া গিয়াছে? মহাভারতের একটি আখ্যায়িকায় আছে যে, কলির রাজত্ব আরম্ভ হইলে ধার্ম্মিকগণ ক্লেশ পাইতে লাগিলেন; অধার্ম্মিক সুখে আছেন। কলিকে যে মান্য করিবে—সে সুখে থাকিবে; কিন্তু সময় সময় যখন কলির প্রজাগণ অত্যন্ত পাপাচরণ করিবে—তখন ভগবান প্রথমে সাবধান করিয়া দিবেন। তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে নানাপ্রকার শাস্তি,—দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আনাইবেন; তাহাতেও যদি নিবৃত্তি না হয়, তবে দুষ্টদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য অবতীর্ণ হইবেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প হইয়া কলির প্রজাগণ নষ্ট হইবে। যাহারা ইংরাজী পড়ে, তাহারা এসব শুনিয়া হাসিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপক—তাঁহারাও কলির পক্ষ হইয়া শাস্ত্রবাক্যে উপহাস করিবে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর লিখিলেন—"এদেশে পূর্ব্বে বড় কখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই। দুর্ভিক্ষের চেহারা ঠিক পিশাচের মত,—দেখিলে মনে হয় যেন ভূত, প্রেত, পিশাচে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতে আছে,—'একবার দুর্ভিক্ষ হয়, ঋষিগণ জলের সেওলা খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া চণ্ডালের পচা মাংস চুরি করিয়া খাইতে বসিয়া নিবেদন করিবেন, তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া, নিষেধ করিলেন এবং বারি বর্ষণ করিলেন। তখন মাংসাহার প্রচলিত ছিল। গোধূম, ধান্য এবং ফলমূলও অনেক প্রকার খাদ্য ছিল। এক প্রকার খাদ্য অভ্যস্ত হইলেই, শীঘ্র শীঘ্র দুর্ভিক্ষ হয়। তাহা কলিতে হইবে। কারণ মনুষ্যের পাপে অন্যান্য খাদ্য হ্রাস হইবে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও কমিবে, গাভীর দুগ্ধ হ্রাস হইবে। এজন্য পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ হইবে; তাহাতে কাতর হইয়া যদি ভগবানকে ডাকে তবেই মঙ্গল।"

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষের হেতু কি?

উত্তর—"এখন সহজে দুর্ভিক্ষ হয়। কারণ পূর্ব্বের ন্যায় দ্রব্যের বিনিময় হয় না। পূর্ব্বে ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তাহা নাই। অধিকাংশ লোক কোন শিল্পকার্য্য না করিয়া চাকুরী করিতেছে। কলিকাতার দিকে অনেক কল-কারখানা হওয়াতে, কেহ কৃষি প্রভৃতি কার্য্য না করিয়া টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করে। রেলওয়ে, কয়লার খনি প্রভৃতি অনেক স্থলে টাকা উপার্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বকার কৃষকেরা কৃষিকার্য্য ভুলিতেছে। মনে করে, টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করিব। কেবল বর্দ্ধমান, বীরভূম, নোয়াখালি, বরিশাল, রংপুর, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এইরূপ কতগুলি স্থানে কৃষিকার্য্য হইতেছে। তাহা সমস্ত বঙ্গদেশ ভাগ করিয়া লইতেছে। সুতরাং চাউলের মূল্য কিরূপে কমিবে? ইহার উপর আবার বিলাতে চাউল যায়।"

প্রশ্ন—কলির জীবের উদ্ধারের জন্য কি প্রকার দীক্ষা মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে?

ঠাকুর—"কলিতে ব্রহ্মনামের দীক্ষা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন কলিজীবের গতি নাই;—ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ মত দীক্ষিত হইতে হইলে হৃদয় প্রস্তুত

কিনা দেখিতে হইবে। এইজন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্র যাহাদের দেববাক্য বলিয়া বিশ্বাস আছে, কেবল তাঁহারাই সেই উপদেশের অনুসরণ করিতে পারিবেন।"

'ভূমৈব সুখম্' । সত্যই আদর্শ।

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'সংসারে সুখ কিসে পাওয়া যায়?'

ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—**'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' ভূমা, অর্থাৎ—যাহার জন্ম-মৃত্যু নাই,—তাহাতেই সুখ। অন্ত-বিশিষ্ট বস্তুতে সুখ নাই। যাহার অন্ত আছে, একদিন তাহা থাকিবে না; সুতরাং তাহাতে আসক্ত হইলে, নিশ্চয়ই দুঃখ পাইবে। ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সত্য নিষ্ঠার আদর্শ। পিতৃ-সত্য পালন জন্য ১৪ বৎসর বনে বাস করিলেন। রাজধর্ম্ম প্রজারঞ্জন জন্য সীতা ত্যাগ করিলেন। সত্যরক্ষার জন্য লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিলেন। একি মনুষ্যের সাধ্য? সীতাতে সম্পূর্ণ অনুরাগ, তখনকার রাজারা হাজার হাজার বিবাহ করিতেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এক-পত্নীক, যজ্ঞস্থানে স্বর্ণ-সীতা'। সীতা যে সতী, তাহাতে রামের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সমস্ত দেবতা তাহার সাক্ষী দিয়াছিলেন। এই সত্য যখন জাতীয় ধর্ম্ম হয় তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করে।**

চিত্রে চন্দন প্রদান ঃ অদ্ভুত রহস্য।

প্রত্যূষে শৌচান্তে ঠাকুর যখন আসনে আসিয়া বসিলেন, গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ উৎকৃষ্ট ফুল, তুলসী, চন্দনাদি আনিয়া ঠাকুরের নিকট ধরিলেন। ঠাকুর সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া নিত্যপাঠ্য গ্রন্থাদির উপরে ছড়াইয়া দিলেন। পরে চন্দনের বাটিতে অঙ্গুলি ডুবাইয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, হরগৌরী, কালীদুর্গা, প্রভৃতি দেবদেবীর ছবিতে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম—রাম-সীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত ছবির চরণেই ঐ চন্দন গিয়া পড়িয়াছে। ১৫/ ২০ ফুট অন্তরে ৮/ ৯ ফুট উর্দ্ধে ঐ সকল ছবি রহিয়াছে। ঠাকুর আসনে বসিয়া তাঁহাদের চরণোদ্দেশে চন্দন ছিটান মাত্র এতদূরে কি প্রকারে তাঁহাদের ঠিক চরণেই গিয়া তাহা পড়িল, বুঝিলাম না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লক্ষ্মণের গায়ে বা পায়ে এক ফোঁটাও চন্দনও পড়ে নাই। ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন—**"লক্ষ্মণের গায়ে পায়ে চন্দন পড়বে কেন? লক্ষ্মণ যে ব্রহ্মচারী।"** এই বিষয়টি ভাবিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

১৫ই কার্ত্তিক।

ঠাকুরের উপদেশ । জীবনের কথা।

সংসারে কেহ সুখী নয়।

কথায় কথায় ঠাকুর লিখিলেন—**"যাঁহারা সাধুর নিকট উপদেশ শুনেন,—কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করেন না,—তাঁহারা চক্‌মকি পাথরের মত। চক্‌মকি পাথর জলের মধ্যে ফেলিয়া রাখ, অথবা প্রতিদিন সহস্র কলস জল তাহাতে ঢাল, তথাপি যখন ঠুকিবে, তখনই আগুন**

বাহির হইবে। যতদিন মনের কার্য্য থাকে, ততদিন স্ত্রী-পুরুষে, অথবা বিষয়-বিষয়ীতে আকর্ষণ থাকে। মন লয় হইলে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে; কিন্তু কার্য্য স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আকর্ষণ থাকে না। এ সম্বন্ধে আমি শাস্ত্রের কথা বলি না। নিজে আমি অত্যন্ত কামুক, ক্রোধী ছিলাম। এই দুই রিপু আমার খুব প্রবল ছিল। ব্রাহ্মসমাজে কত চেষ্টা করিলাম,—গেল না। পরে সাধন লইয়াও অনেক কষ্ট পাইলাম। সেবার যখন সমস্ত রাত্রি জাগিতে লাগিলাম, কেন জাগি তাহা জানিনা, শুইতে ইচ্ছা হয় না,—একদিন বৃন্দাবনে ভোরে শুইয়া আছি,—আমার সমস্ত শরীরে ছারপোকা ধরিয়াছে,—হাজার হাজার ছারপোকা! মনে হইল, একি? আমার বোধ নাই কেন? তারপর হইতে দেখি কাম ক্রোধ বোধ নাই। বেড়া একটি,—একপাশে আমি অপর পাশে শ্রীধর। শ্রীধরের দিকে একটি ছারপোকাও নাই। ঐ সময়ে শরীরের সমস্ত পরমাণু পরিবর্ত্তন হইতেছিল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, উর্দ্ধরেতা হইলে বড় লাভ। চেষ্টা করিতে গিয়া যখন তাহার কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন দেখি মহাকষ্ট। কারণ মেরুদণ্ডের অস্থি যেন করাত্ দিয়া কাটিতে থাকে—যতদিন পথ প্রস্তুত না হয়।

মায়া—"বাস্তবিক মায়া কি? যদি বল, সংসারে পরম সুখে আছি, ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে?—একটু বিচার করিয়া দেখ। অধিকাংশ স্থানে ভয়ানক প্রতারণা। কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কৃত্রিম প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভালবাসিতেছে; কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত। কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে, কোন স্থানে পিতা পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সুখী হইতেছে। তবে সংসারে মধ্যবিত্ত লোকদিগের ভিতর কৃষকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ সেখানে যথার্থ ভালবাসা দুর্লভ। বস্তুতঃ ধনীদিগের ন্যায়, যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্য ভালবাসিতেছে, হাসিতেছে, মুখপানে চাহিয়া আছে;—রোগে শুশ্রূষা অর্থের জন্য!—এইরূপ সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে সংসারে যথার্থ সুখী কে, ইহা বাহির করা সুকঠিন। তবে যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই,—এরূপ লোক যদি সংসারে থাকে তাহারাই সুখী। ইহাদের সংসার, সংসার নহে—স্বর্গ। আর সকলই অসার! অসার! অসার। এক হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নাই। যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায়? বরং বিচার করিয়া সংসার দেখিলে, অসারই বোধ হইবে। প্রকৃত মায়া হরিনামে, সংসারে কোন্ সুখের জন্য মায়া হইবে?"

গুরুপরিবারের দীক্ষার কথা।

১৮ই কার্ত্তিক।

আজ অপরাহ্নে রান্না করিতে করিতে দিদিমাকে তাঁহার ও মা-ঠাক্রুণের দীক্ষা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমা বলিলেন—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে প্রচারক নিবাসে থাকার সময়ে একদিন মাঠাক্রুণ ঠাকুরকে বলিলেন—"মেয়েরাও তো সাধন নিচ্ছে—আমি কি পেতে পারি না?"

ঠাকুর—**"পাবে না কেন? চাইলেই পাও।"**

দিদিমা—গুরু কর্‌লে তাঁকে তো নমস্কার করতে হয়? প্রসাদ পাইতে হয়?

ঠাকুর—**"তা কেন? পঞ্চ রসের একটি ফুটে উঠ্‌লে আর সকল ভাবেরও স্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবও তো এরূপ দিয়াছিলেন।"** সাধন মাঘোৎসবের পরে কোন সময়ে হয়। উপদেশ দেন— **"মাংস, উচ্ছিষ্ট, মাদক খাইতে নিষেধ। যাজ্ঞবল্ক ঋষি যে নামে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন তাই আপনারা গ্রহণ করুন। সদা সর্ব্বদা নাম কর্‌বেন।"** মাঠাকরুণ নাম শ্রবণ মাত্র—দর্শনলাভ করিয়া সংজ্ঞাশূণ্য হইলেন। প্রাণায়াম দেখিবারও অবসর হইল না। সন্ধ্যার সময় প্রাণায়াম দেখাইতে ঠাকুর মাঠাক্‌রুণ ও দিদিমাকে উপরে লইয়া গিয়া বসিলেন। তখন মাঠাক্‌রুণ বলিলেন—"শান্তিপুরে সিড়িতে, আমি যাকে দে'খে ভয় পেয়েছিলাম, পাকাদাড়ি লালমুখ,—আজ তাকেই তো দেখ্‌লাম।"

ঠাকুর লিখিলেন—"তুমি ভাগ্যবতী। এই যে পাকাদাড়ি লালমুখ, তিনি অদ্বৈত প্রভু! **সেই সময়েই তোমাকে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। আমি তো তখন এসব বিশ্বাস কর্‌তাম না—পাষণ্ড ছিলাম।"** কিছুদিন পরে শান্তি, কুতু, ফণী, সুরো প্রভৃতির দীক্ষা হয়। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর দীক্ষা বর্দ্ধমানে রাজার নন্দনকাননের শিবমন্দিরে ফাল্গুন মাসে হইয়াছিল। ঠাকুর তথায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে গিয়াছিলেন। দীক্ষাকালে যোগজীবনের অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছিল।

সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্য সকলের পক্ষে এক নয়।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে বলিলেন—সত্য-মিথ্যা কি, পাপ-পুণ্য কি, অনেক স্থলে বুঝিতে পারা যায় না।

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন— "মিথ্যা—যাহার লক্ষ্য অসৎ। সত্য—যাহার লক্ষ্য সৎ। **কর্ম্ম ছাড়িয়া অনেক সময় নাম করিতে পারা যায় না। নাম না করিয়া বসিয়া থাকিলে হয় পরনিন্দা, না হয় পরচিন্তা, কিম্বা বৃথা চিন্তা, অথবা বিবাদে দিন কাটিবে। শেষে তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা, ইহাতেই সময় যায়।** সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যাইয়া দেখিয়াছি— কোন স্থানে তাস, **কোন স্থান বিবাদ, কোন স্থানে গল্প, কোন স্থানে দু'একজন ধ্যানে মগ্ন, জপে মগ্ন। 'পাপ পাপ' কথা—শেখা কথা। পাপ বোধ হইয়াছে কি না?**—একটু পাপ-চিন্তা হইলে অনুতাপে ছট্‌ফট্ করিতে হয়। এ কার্য্য পাপ, এ কার্য্য পুণ্য—ইহা সকলের পক্ষে এক কথা নয়। যে কার্য্যে আমার **ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়** —তাহাই পাপ; যাহাতে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই পুণ্য। **বাল্যকাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া এবং গ্রন্থাদি পড়িয়া,—ইহা পাপ, ইহা পুণ্য—এই সংস্কার হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পাপ কি, পুণ্য কি? নরহত্যা করিলে পাপ হয়। চট্টগ্রামে সেদিন একটি মেয়ে নরহত্যা করিল। সকলে বলে, 'খুব ক'রেছে, উত্তম কার্য্য হ'য়েছে।' —এখানে নরহত্যা গণ্য হইতেছে না। চুরি পাপ,—কোন স্থানে পুণ্যও হয়। বাহিরের কার্য্য মানুষে দেখে। ভগবান অন্তরের**

উদ্দেশ্য দেখেন। চুরি লোকে পাপ বলিতেছে— কোন স্থানে ভগবানের চক্ষে চুরি পুণ্যও হইতেছে। যদি চুরি, ডাকাতি, লম্পটতা এ সকল মন্দ জানিয়াও করে, তবে তাহাকে লোকে নিন্দা করিবে। কারণ তাহা ভগবানের ব্যবস্থা। ঐ নিন্দাতে তাহার উপযুক্ত সময়ে আত্মদৃষ্টি আসিবে।"

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। শীতল-ষষ্ঠীর কথা।
স্বামীর অমর্য্যাদায় উৎকট রোগ।

আজ গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপাদি করিতে করিতে সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়া স্ত্রীলোকদের স্বামীর প্রতি দুর্ব্বিনীত ভাব সম্বন্ধে বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একটি গুরুভ্রাতা নিজের স্ত্রীর উৎকট রোগ কিসে আরোগ্য হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া একটি গল্প বলিলেন (শীতল ষষ্ঠীর গল্প)— "ব্রহ্মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সরস্বতী পলাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা খুঁজে খুঁজে এক মাঠে এলেন। সেখানে আমের বাগান, তাতে মুকুল হয়েছে। সম্মুখে যবের আবাদ—তাতে শিস্ ধরেছে। সেখানে ষষ্ঠী দেবী বসে আছেন। 'ও ষষ্ঠী। আমাদের তাকে দেখেছ?' 'কেন ঠাকুর, তিনি কি পালায়েছেন?' 'হাঁ গো, সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব।' 'বলি, দেখেছ?' 'তাকে দেখালে কি দিবেন?' 'তুমি আমাকে শীতল কর্‌বে, তোমাকে 'শীতলষষ্ঠী' ব'লে পূজা চালাবো।' 'ঐ দেখ ঠাকুর, আমগাছে। আগেই আমরা বলেছিলাম—'মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শিখাইও না।' এই শীতল-ষষ্ঠী। অল্প লেখাপড়া শিখে 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' হয়।"

পরে লিখিলেন— "পতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে, পতিকে সর্ব্বদা কটুবাক্য বলিলে নারীর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিতে হয়;— ইহা শাস্ত্রকর্ত্তারা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। এ রোগের একমাত্র ঔষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পতি দেবতা, পতি অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যতায় পতিত হইলেও নারীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবৎ শক্তি জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিবেন। এজন্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনকার কবিরাজেরা তাহা জানেন না। শুশ্রুত, চরক, বাগভট্টে ব্যবস্থা আছে।

স্ত্রী-পুরুষের ভগবৎ লক্ষ্য হইলে, তাঁহারা সতী ও সৎ। যথার্থ সতী অতি দুর্লভ! —সতী হইলে তবে পতিব্রতা। স্ত্রী যদি স্বামীকে নিঃস্বার্থ ভালবাসে তবে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার শরীর আপনা হইতে মৃত হইবে; সাধু সাধুতে—শান্ত, সেবক-সেব্যে—দাস্য; বন্ধু বন্ধুতে—সখ্য; পিতামাতার—বাৎসল্য এবং স্ত্রী-পুরুষে—মধুর। নিজের কর্ম্ম সকলেই করিতেছে, সম্বন্ধ বোধ,—আমার আমার,—এই মোহ।"

শ্রীধরের কীর্ত্তি।

১। আজ শ্রীধর দ্বিপ্রহরের সময় আহার না করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। মাথার কিছু ঠিক নাই। পথে-বিপথে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দুইটার সময়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ভবানীপুরে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য মহাশয় শ্রীধরকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া দরজার নিকট আসিলেন। শ্রীধর অমনি শাস্ত্রী মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়? আপনার কাম গেছে? শিবনাথবাবু বলিলেন— প্রায়। এত ব্যস্ত কেন? এসো, বিশ্রাম কর। এ সময়ে এই দারুণ রৌদ্রে এসেছ কেন? শ্রীধর কহিলেন— এই কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌তে। এখন আমি চল্‌লাম। আমার অনেক কাজ আছে— এই বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া তিলার্দ্ধ না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিলেন। শিবনাথবাবু অবাক্!

২। ঠাকুর যখন অভয়বাবুর বাসায় ছিলেন, শ্রীধর একদিন অভয়বাবুর ঘরে গিয়া বসিলেন। অভয়বাবু কোন প্রয়োজনে তাঁহার একটি বাক্স খুলিলেন শ্রীধর অমনি তাঁহার নিকটে গিয়া হাত পাতিয়া বলিলেন—'দেও টাকা দেও'। অভয়বাবু কিছু না বলিয়া অমনি ৫টি টাকা শ্রীধরের হাতে দিলেন। শ্রীধর উহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় তিনটার সময়ে শ্রীধর বাসায় আসিয়া একেবারে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রবাবু শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— কি শ্রীধর? টাকা নিয়ে কি কর্‌লে? ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—কিসের টাকা। মহেন্দ্রবাবু তখন অভয়বাবুর টাকা দেওয়ার কথা বলিলেন। ঠাকুর কহিলেন—"কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে চাওয়া মাত্র শ্রীধরকে টাকা দেওয়া ঠিক হয় নাই। সকলেরই একটা মর্য্যাদা আছে, প্রয়োজনেই টাকা ব্যয় করিতে হয়। না হ'লে উহার মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়। অভয়বাবু এভাবে টাকা অপব্যয় কর্‌লে, টাকার অভাব ভোগ কর্‌বেন।" শ্রীধর ঠাকুরের কথা শুনিয়া খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং টাকা পাঁচটি ট্যাঁক হইতে খুলিয়া লইয়া অভয়বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—নেন মশায়, টাকা নেন। অভয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন- -তবে নিয়েছিলে কেন? শ্রীধর বলিলেন—টাকা সঙ্গে থাক্‌লে কি প্রকার তড়িৎ খেলে, তাতে শরীর মনের কিরূপ অবস্থা হয়- দেখ্‌বার জন্য টাকা নিয়েছিলাম। এখন আপনার টাকা আপনি নিন্—আমিও বাঁচলাম।

৩। একদিন শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট কাঁটাল পাইয়া তাহা খাওয়ার জন্য একখানা পাথরের থালায় ছাড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন। শ্রীধর তখন অন্যত্র ছিলেন। হঠাৎ আসিয়া দূর হইতে উহা দেখিয়া পণ্ডিতের ঘরের দ্বারে পঁহুছিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হায় পণ্ডিত! তুমি যে ঠ'কে গেলে, উৎকৃষ্ট পাতক্ষীর ঠাকুর হাতে ধ'রে সকলকে দিচ্ছেন, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন পণ্ডিত মশায় কোথায়? আর তুমি এখানে কাঁঠাল ছাড়াচ্ছ? পণ্ডিত মহাশয় শুনিয়া অমনি লাফাইয়া উঠিলেন এবং ছুটিয়া ঠাকুরের নিকট চলিলেন—ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের ঘরের দ্বারে পঁহুছিবামাত্র ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া আবার চোখ বুজিলেন। পণ্ডিত তখন লজ্জিত হইয়া নিজ কুটীরের দিকে আসিতে

লাগিলেন—দূর হইতে দেখিলেন শ্রীধর ছাড়ান কাঁঠালগুলি গপ্ গপ্ করিয়া মুখে ফেলিতেছেন আর চঞ্চলদৃষ্টিতে পণ্ডিতের পানে তাকাইতেছেন। পণ্ডিত শ্রীধরের কীর্ত্তি দেখিয়া দরজায় থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন— একি? তুমি একি কর্‌ছ? কাঁঠালগুলি সব মেরে দিলে। শ্রীধর অবশিষ্ট ৩/ ৪ কোয়া কাঁঠাল পণ্ডিতের দিকে ছুড়িয়া দিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন—'নেও আর খাব না—খাওয়ার জিনিসে নজর দিলে।' এই বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বলিলেন—উঃ! তুমি এমন বিষম লোক? মিথ্যা কথা বল্‌তে একটু ভাব্‌লে না। শ্রীধর বলিলেন—'কি বল্‌লে পণ্ডিত? মিথ্যা কথা! আরে কথা আবার সত্য হয় কিরূপে? কথা তো মায়ার কার্য্য—মায়া নিজেই মিথ্যা, কথা কিরূপে সত্য হবে? গুরুর নামই সত্য, আর সব মিথ্যা, যাও এখন ব'সে নাম কর—আর কাঁঠাল খাও।'

স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্তকে জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে উপদেশ।
নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না—ঠাকুরের আত্মজীবনের কথা।

আজ একটি গুরুভ্রাতা স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া ঠাকুরের নিকটে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর লিখিলেন—"বিপদে অধৈর্য্য হইলে, ততই বিপদ চাপিয়া ধরে। অধীর হইলে কিছু লাভ নাই; বরং উপায় গ্রহণে ব্যাঘাত হয়। বিবাহের ইচ্ছা হইলেই যে করিতে হইবে তাহা নহে। যখন আপনাকে কিছুতে সংবরণ করা যায় না, তখন বিবাহ করা উচিত। লোকের পরামর্শে বিবাহ করা উচিত নহে। কিছুদিন আপনাকে পরীক্ষা করিয়া পরে স্থির করিতে হয়। স্ত্রী যুবতী হয়—পুরুষের বয়স অধিক হয়—স্ত্রী কখনই সন্তুষ্ট থাকে না। প্রায় স্থলেই ব্যভিচার দেখা যায়—কোন ঘটনা ভালও দেখিয়াছি।"

ঠাকুর একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—"জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই হইবে। রাজা পৃথু, জনক, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ, দুর্য্যোধন, রাবণ, কংস,—ইঁহারা কত দিগ্‌বিজয় করেছেন, কিন্তু তাঁহারাও শ্মশানে ভস্মীভূত। যাঁরা অবতার—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, বলরাম,—ইঁহারাও দেহত্যাগ করিয়াছেন। জন্ম-মৃত্যুর যে কি রহস্য জানিয়াও নিস্তার নাই। এই মৃত্যু কত মঙ্গলের জন্য তাহা অনেকে চিন্তা করেন না। একজন চিররোগী, অসহ্য যন্ত্রণা;—যদি মৃত্যু না হয়, তাহার উপায় কি? কত জীব-জন্তু মরিতেছে, কে তাহার খবর লয়? কতস্থানে কত নরনারীর মৃত্যু হইতেছে, তাহা কে জানে? আমার বাটীর ঘটনা হইলেই আমার চিন্তা। রোজ এক লক্ষ লোক জন্মায়, এক লক্ষ মরে। প্রদীপের তৈল ফুরাইলে নিবিয়া যায়,—মৃত্যুও সেইরূপ। সংসারে যাদের আসক্তি, তাদেরই মৃত্যু ভয়।

এই পাখা যদি যত্নপূর্ব্বক রাখ, শত বর্ষ থাকিবে, কিন্তু মানুষ থাকিবে না,—ইহা কখনই মনে হয় না। আমার যখন ১২ বৎসর বয়স, সেই সময়ে, আমাদের একজন খেলিবার সঙ্গী মরিয়া যায়। আমাদের একটি মেটে-দেল্‌কো ছিল, তাহাতে প্রদীপ রাখিয়া রাত্রিতে পড়িতাম ও খেলা করিতাম। ঐ সঙ্গীটি মরিলে, একদিন ঐ দেল্‌কো দেখিয়া মনে হইল

যে, এই মাটির বস্তুটি আছে,— সে নাই, ইহা হইতে পারে না। তাহার পর যে কাঁঠালতলায় খেলা করিতাম, সেই গাছটি দেখিয়াও মনে হইল,—কাঁঠাল গাছ আছে, সে কোথায়? অবশ্যই আছে। ঐ সকল ভাব মনুষ্যের স্বভাবে আছে—ইহার পরের অবস্থা যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ না হ'লে হয় না।

মৃত্যু দিন-রাত্রির মত স্বাভাবিক কার্য্য। জন্ম-মৃত্যু—একই মোহ। যখন জন্ম-মৃত্যু, বৃক্ষের পত্র পতিত হওয়া ও গজান-বৎ বোধ হইবে, তখনই আমি কি, যথার্থ বুঝিতে পারিবে। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা দেখে এমন মনে হয়—উহা কিছুই নহে। মনে যদি শুভ ইচ্ছা আসে তখন ভগবানের সেবা উদ্দেশ্যে করিলে, বন্ধন কাটিয়া যায়। যখন যাহা প্রয়োজন; ভগবৎ ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। যথার্থ যদি শিশুর মত থাকিতে পারি, তাহা হইলে মাতা সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন।"

নিজের ইচ্ছা-চেষ্টায় কিছুই হয় না, ভগবৎ ইচ্ছাই সব,—ইহা বুঝাইতে ঠাকুর নিজ জীবনের কথা লিখিয়া দিলেন—"যখন চিকিৎসা করিতাম, এই ঔষধটি দিলেই ঐ রোগ আরাম হইবে। ক্রমে দেখি তাহা হয় না। ঐরূপ দেখিতে দেখিতে তখন বুঝিলাম যে, ঔষধ কিছুই নহে। ভগবানের কৃপা চাই। প্রচার করিতে গেলাম, প্রথম যেখানে যাই,—সমস্ত লোক একমনে শোনে, সাহায্য করে। ক্রমে দেখি, লোকের অন্য ভাব, আমার কথায় কিছু হয় না। তখন বুঝিলাম,—আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বক্তৃতার ক্ষমতা কিছুই নহে;—ভগবৎকৃপাই সমস্ত। ঐইরূপে পুরুষকারে আঘাত খাইয়া খাইয়া এখন বুঝিতেছি,—আমি কিছুই নই; অসারের অসার। ভগবানই সর্ব্বকর্ত্তা,—ঐহিক পারত্রিক বিধাতা। আমার নিজের জীবন চিন্তা করিয়া দেখি, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম। অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক হইলাম। পরে ব্রাহ্ম-সমাজে গেলাম। প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছা কিছুই নহে। যাহার যখন সময় হয়, মরিয়া যায়। মৃত্যুর পর জন্ম হইলে তখন পূর্ব্বের কিছুই মনে থাকে না। তাহাতে আর দুঃখ কি? যতক্ষণ না জন্ম হয়, ততক্ষণ পূর্ব্বের কথা মনে থাকে। সমস্ত ঘটনাই মঙ্গলের জন্য—ইহাতে সন্দেহ নাই।"

একটু পরে ঠাকুর নিজ হইতে লিখিলেন—"এখন যে 'আমি' এই 'আমি' পড়িয়া থাকিবে; ভগবৎ ভাব বা স্বরূপ যথার্থ 'আমি' গুরুশক্তি লইয়া উঠিয়া যাইবে। স্বরূপের তাৎপর্য্য শান্ত, দাস্য। শাস্ত্রেই আছে যে, যেরূপ চিন্তা, কার্য্য সমস্ত জীবনে করে, মৃত্যুকালে তাহারই চিন্তা আসে। দৃষ্টান্ত ভরত। মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি সকলের ভাগ্যে হয় না। জীবনে যেমন চিন্তা, স্বপ্নেও সেইরূপ— মৃত্যুকালেও ঐরূপ। গুরুতর পাপ করিলে অথবা কোন বস্তুতে কি জন্তুতে অত্যন্ত আসক্তি হইলে, অধোগতি হয়। ভরত হরিণ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জড়ের মত রহিলেন। এইবারই মুক্ত হইলেন। আত্মা নির্ম্মল হইলেও সেই মুহূর্ত্তে জন্ম হইতে পারে,—নির্ম্মল কিন্তু বাসনা আছে।"

সকল বাসনাই কি অনিষ্টকর?

ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে একটি গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—বাসনা কাকে বলে? সকল বাসনাই কি আত্মার উন্নতির পথে অনষ্টিকর?

ঠাকুর লিখিলেন—"**আমার খুব ধর্ম্ম হউক লোকে মান্য করিবে; স্বর্গভোগ হউক, আমি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া জগৎ উদ্ধার করি, ধন দেও, যশ দেও, পুত্র-কন্যা দেও ইত্যাদি বাসনা। তোমার দাস কর, সখা কর, ভক্ত কর, সমস্ত বাসনা হইতে মুক্ত কর। নিজের সুখের ইচ্ছা ভোগ। যতক্ষণ নিজের সুখ-ইচ্ছা আছে—সে দাস কি সখা হইতে পারে না। আমিত্ব নাশ একেবারে হয় না। উহা বাসনা। নিজের জন্য তহি বাসনা। আমাকে মুক্ত কর, ইহাও বাসনা;—কিন্তু এ বাসনা ভাল।**"

অসামান্য শক্তিলাভের উপায় ঃ
মহাপুরুষের বত্রিশ লক্ষণ।

আমি ভাবিয়াছিলাম, শালগ্রাম পূজা ছাড়িয়া দেওয়াতে সাধন-ভজনে আমার অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় দেখিতেছি, আমার কোন অনিষ্টই হয় নাই; বরং ঐ পূজা ছাড়িয়া দেওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ভাল আছি। পূর্ব্ববৎ নিয়মিত সন্ধ্যা তর্পণ ন্যাসাদি কার্য্য প্রতিদিন কবিতেছি। শালগ্রাম নাই বটে; কিন্তু মনে মনে ফুল, চন্দন, তুলসী, প্রভৃতি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রীতিমত ঠাকুর-পূজা করিয়া থাকি। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজায় অধিক আনন্দ পাইতেছি। গুরুভ্রাতারাও এখন আর কেহ আমার বিরুদ্ধ নন্। বেশ আরামে আছি। সাধন-ভজন, নাম-ধ্যান ছুটিয়া যাওয়ায় যে বিষম অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, রিপুর উত্তেজনা ও অত্যাচারে উত্তপ্ত হইয়াছিলাম, ঠাকুরের কৃপায় বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি তাহা প্রশমিত হইয়াছে। কতদিন ঠাকুর এ অবস্থায় রাখিবেন জানি না।

অন্যান্য দিনের মত অপরাহ্নে গুরুভ্রাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোগ-সাধন করিলে নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তিলাভ হয়,—শুনি। আমরা এতদিন সাধন পাইয়াছি,—কিছুই তো বুঝিলাম না? যাহা বলিয়াছেন, যতটা পারি করিতেছি, কিন্তু ব্রহ্ম কি, ভগবান কি;—কিছুই তো বুঝিলাম না।"

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর দিলেন—"**পূর্ব্বে আচার্য্যগণ সাধকদিগকে শেষ যে লক্ষ্য তাহা বলিতেন না। কেবল পথের উপদেশ দিতেন। এজন্য তাঁহারা গোলে পড়িতেন না। এখন আমরা অনেক বিষয় জানিয়াছি, অথচ প্রকৃত জানা হয় নাই। পথে চলিলে, ক্রমে দেখা যায় যে, গম্যস্থানের নিকট যাইতেছি। প্রথমে সে বিশ্বাস হয় না। মুখে বলিলে ফল নাই। ঠিক সময় মত যাহা, তাহা না হইয়া, অসময়ে কিছু হইলেই বিশৃঙ্খল। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে আর উপার্জ্জন করা কঠিন। ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত; প্রারব্ধ কেবল কথা।**"

ঠাকুর আবার লিখিলেন—"উপনিষদে আছে, বরুণের নিকট তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—'ব্রহ্ম কি?' উত্তর—'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া যাহা জানিল,—বলিল যে, 'ব্রহ্ম অন্ন।' উত্তর—'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'ব্রহ্ম প্রাণ।' 'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল— 'ব্রহ্ম মন।' 'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'বিজ্ঞান।' 'তপস্যা কর।' তপস্যা করিয়া বলিল—'আনন্দ।' ইহার পরে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হইল। তখন উপদেশ।

লোকে কোন কাজ করিবে না,—কেবল শক্তি চায়। তোমরা এক বৎসর বীর্য্যরক্ষা কর; এবং মিথ্যাকথা বলিও না,—মিথ্যা কল্পনাও করিও না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের বাক্‌সিদ্ধি হইবে। লোকে শক্তি শক্তি করে, শক্তিলাভ অতি তুচ্ছ পদার্থ। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান এবং সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন—তাঁহাদের পিছে পিছে শক্তি সকল আসিতে থাকে;—কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিও করেন না। যেদিন ২৪ ঘণ্টায় একটি শ্বাস-প্রশ্বাস বৃথা না হইয়া, নাম চলিবে, সেইদিনই সিদ্ধিলাভ হইবে। আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু তথাপি বলিতেছি—আমি সাধন পাইয়াছি পর ৩ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম ঠিক হইয়াছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঠিক হইয়া যায়। আমাদিগের সাধনপথ—সত্যযুগের ঋষিপথ। এই পথে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের সহিতই আমরা মিশিতে পারি। কিন্তু গৃহীদিগের সামাজিক রীতি-নীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আত্ম-প্রশংসা না করা, কাহারও স্থায়ী বিশ্বাস নষ্ট না করা, ধর্ম্মের বুজ্‌রুগী না করা,—সাধুর সামান্য লক্ষণ। সাধু বেশীর ঐগুলি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে, হৃদয় নিহিত ধর্ম্মভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয় এবং পাপ সকল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে,—তিনিই সাধু।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—বাহিরে, শরীরের কোন লক্ষণ দ্বারা কি মহাপুরুষদের ধরা যায় না?

ঠাকুর—"শাস্ত্রে মহাপুরুষের ৩২টি লক্ষণ দিয়াছেন ঃ—

পঞ্চ দীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তং ষড়ুন্নতঃ।

ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণোমহান্।।

নেত্র, পাদ, করতল, অধর, ওষ্ঠ, জিহ্বা, নখ, —এই সাত অঙ্গ রক্তিম। বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ,—এই ছয় অঙ্গের তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট, বক্ষ,—এই তিন অঙ্গ বিস্তার। গ্রীবা, জঙ্ঘা, শিশ্ন,—এই তিন অঙ্গের খর্ব্বতা। নাভি, স্বর, বুদ্ধি,—এই তিনের গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু (গণ্ডদেশের উপরিভাগ—চোয়াল) ও জানু,—এই পাঁচ অঙ্গের দীর্ঘতা। ত্বক, কেশ, লোম, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব,—এই পাঁচ অঙ্গের সূক্ষ্মতা। এ সমস্ত মহাপুরুষের লক্ষণ।"

পালনীয় উপদেশ।

প্রশ্ন—'উপদেশ তো অনেক শুনিলাম, আমাদের বিশেষ পালনীয় কি, বুঝিতেছি না?'

ঠাকুর—"(১) শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম চাই। (২) বল বৃদ্ধি চাই। (৩) রেতঃরক্ষা চাই।"

প্রশ্ন—"শারীরিক পরিশ্রম কি?"

উত্তর—"প্রাণায়াম—দু'বেলা।'

প্রশ্ন—'মানসিক পরিশ্রম কি?'

উত্তর—"এক নাম জপ, কীর্ত্তন সদালাপ।"

প্রশ্ন—'বলবৃদ্ধি কিরূপ?'

উত্তর—"শারিরীক বল ও মানসিক বল।"

প্রশ্ন—'রেতঃরক্ষা কিরূপ?'

উত্তর—"আসন করা, মুদ্রা করা, স্ত্রীলোক দর্শন না করা, স্পর্শ ও আলাপ না করা। (৪) সকল গুরুভ্রাতাদের ভালবাসা, সাধনের প্রধান অঙ্গ। (৫) গুণ দেখাই ভাল। দোষ দেখিলে, নিজে দোষী সাব্যস্ত হইবে। (৬) ধৈর্য্য চাই। (৭) গুরুত্যাগে ভবেৎ মৃত্যুঃ। (৮) সংসার বৃক্ষ ছেদন না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া কঠিন। (৯) খৃষ্টানের ন্যায় বিশ্বাসী, বৈষ্ণবের ন্যায় ভক্ত এবং মুসলমানের ন্যায় নিষ্ঠাবান হইতে হইবে।"

অপবিত্র হাতে ঠাকুরকে খাবার দিতে উদ্যোগ। বিনিময়ে ঠাকুরের বরদান।

কয়েকদিন হয় কি ভয়ানক অপরাধজনক কার্য্য হইতে দয়াল ঠাকুর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ভাবিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। একদিন রাত্রি প্রায় তিনটার সময়ে অকস্মাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম। অমনি স্বপ্নদোষ হইল। তখনই জাগিয়া উঠিলাম। মনটি বিরক্তিপূর্ণ হইল, মাথা গরম হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম—এতকাল সাধন, ভজন, তপস্যাদি করিয়া আমার আর কি হইল! এক বীর্য্যধারণের জন্য যে এত করিলাম তাতো কিছুই হইল না। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এক পরিমাণে আহার করায় পেট ভরিয়া একদিনের জন্যও খাই নাই। বহুকাল যাবৎ এক-চতুর্থাংশ জল দ্বারা পূর্ণক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছি। সারাদিন সাধন-ভজনে কাটাই। বাজে আলাপ, বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না। ২৪ঘণ্টা নতশিরে থাকিয়া ঠাকুরের সঙ্গ করিতেছি, তাঁর শরীরের আঁচ সর্ব্বদা পাইতেছি। এত করিয়াও আমার এ দশা! মনের বিকার গেল না, দেহ শুদ্ধ হইল না। আমার সমস্ত চেষ্টাই তো ব্যর্থ হইল দেখিতেছি। ঠাকুরের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়াই বা কি হইতেছে। তিনি তো আমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। না হ'লে তাঁর ৩/৪ হাত অন্তরে নিদ্রিত অবস্থায় আমার বীর্য্যপাত হয়, আর তিনি মজা দেখেন। ইচ্ছা করিলে কি এ আপদে তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন না? ইচ্ছা করা ব্যতীত তাঁর কি এতে কোন

পরিশ্রম করিতে হয়? এ সকল ভাবিয়া ঠাকুরের উপরে অতিশয় অভিমান জন্মিল। তিনিই আমাকে ভোগাইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার উপর ক্রোধ হইল। এই সময়ে ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারী দু'খণ্ড মিশ্রি দেও, আমি জল খাব।" আমি বিরক্তিপূর্ণ মনে অপবিত্র হস্ত স্বত্ত্বেও উহা থাক্‌গিয়ে মনে করিয়া ঠাকুরকে মিশ্রি দিতে আলমারীর নিকট গেলাম। ঠাকুর তখন আমাকে বলিলেন— "ব্রহ্মচারী! খাবার দেবার পূর্ব্বে হাত ধু'য়ে নিতে হয়; এই জল নেও।" এই বলিয়া কমণ্ডলুর জল দিতে হাত বাড়াইলেন। আমি সামান্যমাত্র জল হাতে লইয়া উহা মেজেতে ছড়াইয়া ফেলিলাম এবং মিশ্রি দিতে উদ্যত হইলাম। হাত কিছুই পরিষ্কার হইল না। ঠাকুর তখন আবার বলিলেন— "হাত একটু ভাল ক'রে ধু'য়ে নিলে হয় না?" আমি তখন লজ্জিত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম এবং হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া আসিয়া ঠাকুরকে মিশ্রি দিলাম। ঠাকুর মিশ্রি মুখে দিয়া জলপান কবিলেন। তিন চারদিন যাবৎ নিয়ত এই বিষয় মনে হওয়ায় আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। কথায় কথায় আজ আমি মহেন্দ্রবাবু, মোহিনীবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের নিকট এই বিষয় বলিলাম। তাঁহারা শুনিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন এবং অত্যন্ত গালাগালি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন— 'তুমি এইভাবে ঠাকুরের সেবা কর বলিয়াই ঠাকুরের যত অসুখ। ঠাকুরের নিকটে যাহাতে আর তুমি থাকিতে না পার আজই আমরা তা করিব।' এই বলিয়া উহারা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমার দুষ্কার্য্যের কথা ঠাকুরকে বলিয়া কহিলেন—'ব্রহ্মচারী যখন এত নোংরা তখন তার হাতে আপনি কোন সেবা গ্রহণ না করেন আমাদের ইচ্ছা। আপনার যত রোগ সমস্ত ব্রহ্মচারীর সেবার দরুণ। বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শুক্র, যে অনায়াসে গুরুকে খাওয়াইতে পারে, গুরুর নিকটে তাকে এক মিনিটও থাকিতে দেওয়া যায় না।' মহেন্দ্রবাবু যখন এ সকল কথা ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম। উঁহার কথা শেষ হইতেই আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! মহেন্দ্রবাবু যা বল্‌লেন তা কি ঠিক? তুমি যথার্থই কি ওরূপ করেছিলে?" আমি বলিলাম—'মহেন্দ্রবাবু যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য, যথার্থই আমি নোংরা হাতে আপনাকে মিশ্রি দিতে গিয়াছিলাম।' ঠাকুর আমার সত্য কথা শুনিয়া খুব আনন্দলাভ করিলেন, ছলছল চক্ষে সস্নেহদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন—"এখন থেকে তোমার ঐ হাতে যা' আমাকে দিবে পরম পবিত্র মনে ক'রে আমি তা' গ্রহণ কর্‌বো। একটি কাজ ক'রো —যা' নিজে খেতে পার না তা' আমাকে দিও না।"

হায়! হায়!! আজ আমি কি করিব? মাথা খুড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। দেখিতেছি এমন কোন পাপকার্য্য দুর্ব্যবহার করিতে পারি না যাহাতে ঠাকুরের স্নেহ-মমতা-দয়াকে অতিক্রম করিতে পারি। ধন্য ঠাকুর! এই ঘৃণিত পাষণ্ডকেও তুমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ! তোমার এ দয়া যে আমার অসহ্য হইল। এখন আমি কি করি! বহুজন্মের ভজন, সাধন, তীব্র তপস্যায় যে অবস্থা মানুষের লাভ হয় না, আমার জঘন্য কার্য্যের প্রতিফলে তাহা তুমি অনায়াসে আমাকে দিলে! তোমার প্রতি অত্যাচারের দণ্ড, অত্যাচারীর প্রতি তোমার সস্নেহ দয়া ব্যবহার—একি অদ্ভুত কাণ্ড!

প্রকৃত স্বভাব দুর্ব্বোধ্য।

ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক অবস্থায় হিজ্‌লি-কাঁথি, এক দস্যুর বাড়ী বিপন্নাবস্থায় গিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন। কথায় কথায় তাহা লিখিলেন—"আমি এবং আরো দুই জন হিজ্‌লি-কাঁথি গিয়াছিলাম। যখন কাঁথিতে পঁহুছিলাম তখন রাত্রি ঘোর অন্ধকার মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি। আমরা পথ না পাইয়া এক ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পায়ে একটি মানুষ ঠেকিল; সেটি স্ত্রীলোক। হঠাৎ উঠিয়া আলো জ্বালিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময়ে পুরুষটি আসিল। ভীমের মত। জিজ্ঞাসা করিলঃ'তোমরা কে?' আমি বলিলাম—আমরা পথিক, পথ হারাইয়াছি। মাষ্টারের বাসায় যাইব। সে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দিয়া আসিল। যতদিন ছিলাম;—আলাপ করিত। তাহাকে দেখিয়া স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বলিলেন—'ইহাকে কোথায় পাইলেন?' এ দিনের বেলায় ডাকাতি করে! পথে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা ইহার স্বভাব।"

একজন বলিলেন—'মানুষের সাধারণ কার্য্য দেখিয়া ভিতরের অবস্থা বুঝা যায় না। স্বভাব মানুষের এই একরকম, পরেই আর একরকম দেখা যায়। যথার্থ স্বভাব যে কি;—কার্য্য দেখিয়া ধরা যায় না।'

ঠাকুর—"যতক্ষণ শরীর, মন, আত্মার ঐক্য না হয়, ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে। স্বভাবই ধর্ম্ম। সমস্ত মনুষ্য—স্বভাবে, একতাও আছে,—স্বতন্ত্রতাও আছে। কেবল মনুষ্য বলিয়া কেন,—সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকেরই স্বভাবে একতা ও বিচিত্রতা আছে। আমি যেমন সকলের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে এক—তেমনই আবার ভিন্ন। এজন্য, মনুষ্য রুচি-বিভিন্ন। আমার শরীর, মন, আত্মার যখন ঐক্য হইবে তাহাই স্বভাব, তাহাতেই আমার মঙ্গল। সমস্ত জগতের যে সকল বস্তু স্বভাবে আছে তাদেরই আনন্দ। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ-লতা, ফল-মূল, পশু-পক্ষী সমস্ত আনন্দময়। মনুষ্যও যতটুকু স্বভাবে থাকে ততটুকু আনন্দ পায়। মনুষ্যের স্বভাব যত বিকশিত হয়, আনন্দও তত প্রকাশ হয়। যাহারা পাপ চিন্তা, পাপ কার্য্য দ্বারা স্বভাবকে বিকৃত করিয়াছে, তাহারা নিরানন্দ ভোগ করে। পাপে শরীর রুগ্ন হয়;—মন অপবিত্র হয়; পুণ্যলাভ করিয়া, স্বভাব লাভ না হইলে আনন্দ পায় না। রোগ ও পাপ যন্ত্রণায় জীবন গত হয়।

ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, ইহাও একপ্রকার উন্মত্ততা;—বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন। মস্তিষ্কের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য অংশ সকল আছে। তাহার যে অংশে পীড়া হয়—তাহারই বিকৃত অবস্থা। যেমন অন্ধ দেখে না; কিন্তু আত্মার দেখিবার শক্তি আছে।"

পরে ঠাকুর আবার লিখিলেন—"দেবতা ও অসুর উভয়ে একই পিতার সন্তান। দেবতা যিনি, তিনিও অসুর হইতে পারেন,—অসুরও দেবতা হইতে পারেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'দেবাসুরা প্রজাপত্যাঃ। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন তাঁরা দেবতা। যাঁরা নিজের বুদ্ধিতে চলেন—তাঁরা অসুর।"

আজ দীপান্বিতা—সমস্ত সহর আলোকময়। যাহার যেমন সাধ্য নানাপ্রকার দীপমালায় আপন আপন বাড়ীঘর সুসজ্জিত করিয়া, মা কালীর আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছে। আজ সকলেরই মনে আনন্দ উৎসাহ। কলিকাতা সহর আজ সকলকে লইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। আমাদের বাড়ীতেও আজ খুব সংকীর্ত্তনোৎসব। সন্ধ্যার পরই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীধর, বিধু ঘোষ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ সকলেই মাতিয়া গেলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। সংকীর্ত্তনের পর হরিলুট বিতরণ করিয়া ঠাকুর আসনে বসিলেন।

২৩শে কার্ত্তিক।

'নেদং যদিদমুপাসতে।' ভগবৎলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

একজন প্রশ্ন করিলেন—'দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা কি মুক্তি লাভ হয় না? ভগবানে কি উপায়ে ভালবাসা জন্মাবে?—ভগবানের উপাসনা কখন করিতে পারিব?'

ঠাকুর—চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—এ সমস্ত দেবতার যাহারা পূজা করে, তাহারা সকাম পূজা করে। তাহারা এই সকল দেবতা ভিন্ন আর কিছু পাইবে না। ব্রহ্মকেও দেবতা বলিয়া পূজা করিলে দেবতাই লাভ করিবে। 'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যে আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে প্রাপ্ত হই। উপনিষদে—'নেদং যদিদমুপাসতে।—ইহার তাৎপর্য্য যে—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন দ্বারা লোকে যে সকল বস্তুর উপাসনা করে, অর্থাৎ—ইন্দ্রিয় ও মনের যত বিষয়, তাহা, আমি নহি। আমি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনগ্রাহ্য বস্তু হইতে অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন। বাক্য, মন, চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, এই সমস্ত দ্বারা যাহা উপাসনা করে, তাহাও আমি নহি। অর্থাৎ—আমি সৃষ্ট বস্তু নহি। উপনিষদে যে বলিয়াছেন 'নেদং যদিদমুপাসতে' এটি উপদেশ মাত্র বোধ হয়। যত দিন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়গণ বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, ততদিন শরীর ছাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশের দুটি পথ; উপায় এক। কোনও উপায়ে একবার ভগবানকে দর্শন করিলে, তখন শরীরে দৃষ্টি থাকে না। সহজেই শরীর মনে থাকে না। কিন্তু এ অবস্থা সকলের ঘটে না। এজন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিতে হইবে। এ ভালবাসা লাভ করিবার জন্য অহিংসা অভ্যাস করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কষ্ট দিব না; কেহ আমাকে প্রহার করিলে, গালি দিলে, এমন কি সর্ব্বনাশ করিলেও তাহার অমঙ্গল কামনা করিব না। এইরূপে দ্বেষ-হিংসা নষ্ট হইলে প্রাণে ভালবাসা আসে। সেই ভালবাসা কোন স্থানে অর্পণ করিয়া, তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবানকে লাভ করা যায়।

মগ্নাবস্থার কথা।

শেষ রাত্রে মা কালীর আবির্ভাবের পর মগ্নাবস্থায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—বিধু মজুমদার ও কুঞ্জ ঠাকুরতা লিখিলেন—

নূতন নূতন ঘট স্থাপন করা হ'ল, জীবের আর ভয় নাই, মৃদু মন্দ বাতাসে পতাকা দুল্‌ছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ কর।

উজ্জ্বল নিশান উড়্‌ছে, ডঙ্কা পড়েছে। শিশুদের কাঁচা ঘুম ভেঙ্গো না, তাহলে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়্‌তে পারে।

যাহারা প্রথমে এসেছে, তাহারা পাছে যাবে,' যাহারা পাছে এসেছে তাহারা প্রথমে যাবে।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হউক, আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন কর, ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কর। দেহে ঘট স্থাপন কর, পূজা কর, মর্য্যাদা কর, সেবা কর, মর্য্যাদা না কর্‌লে মা চলিয়া যান, পূজা না কর্‌লে থাকেন না।

স্ত্রীলোক সকল মায়ের মত দেখ্‌তে হবে, মা জননী, সেই বিশ্বজননী মা, গর্ভধারিণীর সমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে মা'কে দেখে প্রণাম কর। মা আনন্দময়ী যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি একটি নারীকে যদি সেই ভাবে ভালবাস্‌তে পার, সে দেবী! দেবী! দেবী! তাঁহাকে প্রণাম কর্‌লে পাপ দূর হয়। এরূপ যদি পার, এক দিনে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পার। চণ্ডীদাস যেমন রজকিনীর দ্বারা করেছিল। লোকে দোষ দেয়, ও কিছু নয়, মিথ্যা কথা, নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে, তার মরণ ভাল।

ধূলি হতে হবে, মাটি হতে হবে, জ্যান্তে মরা হতে হবে, যতদিন ভিতরে অহং ভাব আছে, তত দিন মাথার উপর পাহাড় পর্ব্বত, ভগবান দর্পহারী, কোন রকমে একটু অহংকার হলেই এগালে এক চড় ওগালে এক চড়, নাকমলা, কানমলা, মারে বাপ্‌রেও বল্‌তে দেবে না, এতে যদি হ'লো তো হ'লো, নতুবা ঘাড় ধরে একেবারে কোথায়, ফেল্‌বে তার ঠিক্ নাই।

সাধন ভজন করে আমার এই অবস্থা লাভ হয়েছে, আমার এত উন্নতি হয়েছে এই ভাব যদি মনে হয়, তাহা হলেও রক্ষা নাই, ভগবানের বিচার নিক্তির কাঁটার মত। লক্ষ্মণ,সীতার পায়ের দিকে মাত্র তাকাইতেন, তিনি কি আর কিছুই দেখিতেন না? তাহা নহে, তিনি সমস্তেরই পায়ের দিকে তাকাইতেন, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, সকলরেই নিকটে অবনত হবে। এই প্রকার হতে পার্‌লেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়, ইহা হ'লে আকাশে অল্প সাদা মেঘ থাক্‌লে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায়, সেইরূপ দেখা যায়। তখন ধনুকধারী রামচন্দ্র সঙ্গে থাকেন।

অজ্ঞাত অপরাধে লীলা দর্শন বন্ধ,— রূপ গোস্বামী ও খোঁড়া বৈষ্ণবের কথা।

যথার্থ ধর্ম্মলাভের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় কত সূক্ষ্ম, ভগবৎ সঙ্গ লাভ হইলেও তাহা দীর্ঘকাল ভোগ করা কত কঠিন ঠাকুর তাহা বুঝাইতে অনেক কথা বলিলেন। হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দার প্রবৃত্তি অন্তরে থাকিতে ধর্ম্মলাভ কখনও হয় না। অজ্ঞাতসারেও যদি একনিষ্ঠ ভগবৎভক্তের কোন প্রকার কার্য্য ব্যবহার কাহারও অপ্রীতিকর বা উদ্বেগকর হয় তন্মুহূর্ত্তে তিনি ভগবৎ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হ'ন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর শ্রীরূপ গোস্বামীর একদিনের একটি

ঘটনা বলিলেন। শুনিলাম— শ্রীরূপ গোস্বামী যখন রাধাকুণ্ডে ভগবৎ ভজনে অহর্নিশি মগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহার অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মথুরাবাসী একটি বৈষ্ণব তাঁহাকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব বাবাজী বৃদ্ধ এবং খোঁড়া ছিলেন। প্রাণের একান্ত অনুরাগে তিনি যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মথুরা হইতে প্রায় ১৪/১৫ মাইল চলিয়া রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে রূপ গোস্বামী রাধাকুণ্ড তীরে উপবিষ্ট থাকিয়া রাধাকৃষ্ণের জলকেলী দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীমতী গোপীগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক জল ছিটাইয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদের চক্র ভেদ করিয়া পালাইবার ফাঁক পাইলেন না দেখিয়া রূপ গোস্বামী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব বাবাজী তখন কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থাকিয়া উহা দেখিয়া ভাবিলেন—'আমি খোঁড়া চলিতে আমার আঁকা বাঁকা অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া রূপ গোস্বামী বিদ্রূপ করিয়া হাসিলেন। সুতরাং ইহার নিকট যাইয়া আর কি হইবে!' বাবাজী দূর হইতে রূপ গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মনদুঃখে মথুরায় চলিয়া গেলেন। এদিকে রূপ গোস্বামীরও লীলা দর্শন বন্ধ হইয়া গেল। রূপ গোস্বামী লীলা দর্শন অকস্মাৎ বন্ধ হইল দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বলিয়া, এখন উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন গোস্বামী শুনিয়া কহিলেন,—'নিশ্চয়ই কোন বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হইয়াছে, না হ'লে এমন হয় না।' রূপ গোস্বামী বলিলেন—'নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া লীলা দর্শন করিতেছিলাম। সেখানে কেহই তো ছিল না।' সনাতন গোস্বামী বলিলেন—'অনুসন্ধান কর'। রূপ গোস্বামী আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন—বৃদ্ধ একটি বাবাজী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রূপ গোস্বামীকে দর্শন করিতে মথুরা হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দর্শন না করিয়া আবার স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। রূপ গোস্বামী তখনই মথুরায় যাত্রা করিলেন, এবং অনুসন্ধানে বাবাজীর খোঁজ পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার ওভাবে দেখা না করিয়া ফিরিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবাজী তখন সমস্ত বলিলেন। রূপ গোস্বামী তখন তাঁহার হাসির কারণ প্রকাশ করিয়া বলাতে বাবাজী লজ্জিত হইলেন। রূপ গোস্বামী তাঁহার অজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চলিয়া আসিলেন। পরে তাঁহার আবার লীলা দর্শন আরম্ভ হইল। ঠাকুরের কথায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে "লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ—স চ মে প্রিয়ঃ" কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম।

শাস্ত্র-সদাচারের অনুসরণই একমাত্র নিরাপদ্।

একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাঁহারা শাস্ত্র-সদাচার মানেন না, অথচ মহাত্মা মহাপুরুষ, তাঁদের ব্যবস্থানুসারে চলিলে কি আত্মার উন্নতি হয় না?"

ঠাকুর—"**শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্যপথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় তাহাও যাইবে না। কারণ দৈবাৎ দুই এক ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে অন্যপথে সদ্‌গতি পাইতে পারেন।**

কিন্তু যাদের প্রথম আরম্ভ, তারা মহাঘোর অন্ধতামসে ঘুরিয়া বেড়ায়। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্র বিশ্বাস করিলে আর ভয় থাকে না। ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র এবং ঋষিগণ যেরূপ সদাচার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়। শাস্ত্র পাঠে প্রতারণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শাস্ত্র না জানিলে সমস্তই অবিশ্বাস হয়। যদি জানা থাকে তবে সত্য-অসত্য প্রভেদ করা যায়। একব্যক্তি জ্বরে কুইনাইনে উপকার পাইয়াছে, আমার জ্বর নাই,—আমি, কেবল বড়লোকের কথা বলিয়া, কুইনাইন খাইব কেন? এজন্য যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেক বিষয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, তাঁহাদেরও যুক্তি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।—ইহা শাস্ত্রেরই উপদেশ। আমরা ঋষিবাক্য ও সদাচারের দাসানুদাস।

বন্ধুবিহীন জীবনের দুর্গতি।

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুহীন ব্যক্তির কত দুর্দ্দশা লিখিলেন—"পুত্র অপেক্ষাও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। 'পুত্রং পিণ্ড প্রয়োজনাৎ,'—বন্ধু চিরদিনই বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই,—প্রয়োজন নাই। বন্ধুর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্তি। এমন বন্ধু যাহার নাই সেই বন্ধুহীন। পূর্ব্বকালে বন্ধু সকলেরই দুই একজন অবশ্যই থাকিত। এমন বন্ধু পাওয়া এখন অতি অসম্ভব। মতে মতে মিলনে বন্ধুতা নহে; এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য,—ইহা বন্ধুতা নহে। বাস্তবিক বন্ধুলাভ অসম্ভব হইয়াছে। বন্ধু পাওয়া দূরের কথা,—মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়—এরূপ বিশ্বাসী লোকই দুর্লভ। বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে যাহা বলিয়াছ,—তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে; তাহা লইয়া উপহাস করিতেছে। ইহা কালের অবস্থা। নিজের মনের সুখ দুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে, হৃদয় ক্রমে কুটিল হইতে থাকে। কুটিলতা মহাপাপ। লোকে যদি কোন প্রকার সাধন-ভজন না করে, কেবল সরলতার প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। সরল-হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সহস্র যাগ-যজ্ঞ, সাধন-ভজন করিলেও নরকগামী হয়। কপট-হৃদয় সর্ব্বদাই অসত্য চর্ব্বন করে; অসত্য রোমন্থন করে। এক বন্ধুহীনতায় এত দুর্গতি।

সঙ্কোচ এই জন্যই জনসমাজে প্রবেশ ক'রেছে যে পবিচিত কি অপরিচিত,—যদি তিনি সমদুঃখী না হন;—তবে এক ঘটনাকে অন্যরূপে বুঝিয়া দেশে দেশে নিন্দা প্রচার করে।

মতান্তরে বিশেষ হৃদয়-বন্ধুর সহিত বিরোধ হয়; — বন্ধু শত্রু হ'ন। বিরোধী মতকে ঘৃণিত করিবার জন্য সেই মতের লোকদিগকে মিথ্যা মিথ্যা দোষারোপ করে,—চরিত্রে কলঙ্ক দেয়। এজন্য খৃষ্ট সমাজে কত নরহত্যা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজেও অনেক হইয়াছে, হইতেছে। সকল দেশে, সকল সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের বহির্ভাগ অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ড লইয়া দলাদলি। এই অবস্থা ভেদ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম,—যাহা জীবনে মরণে সহায়,—তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ধর্ম্মের মতামত লইয়া বিবাদ অনেক পরিমাণে চলিয়া যাইবে। এই মত ধর্ম্ম বিদায় না হইলে, সত্যধর্ম্মের শোভা বিস্তার হইবে না।

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার লিখিলেন—"যে বস্তু ভালবাসি, তাহার সম্বন্ধে যত ভাল কথা শুনিয়াছি, বলিতে ইচ্ছা স্বাভাবিক। নিজের অবস্থা বলিয়া, বলিলে দোষ হয়—প্রশংসা প্রচারে দোষ নাই। যাহার প্রতি যে আদর কর্ত্তব্য তাহা না হইলে সংসারে সে বস্তু থাকে না। বৃক্ষ রোপণ কর, পশু পালন কর,—যদি আদর না হয় তাহাও থাকে না।"

কীর্ত্তনে ভাবাবিষ্ট মুসলমানের সমাদর।

ঠাকুর শান্তিপুরের একটি ঘটনা লিখিলেন—"নীলকণ্ঠের গানে অনেক উপকার হইয়াছে। নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে। শান্তিপুরে আমি স্নানে যাইতেছি, শুনিলাম গান হইতেছে। একটু গান শুনে যাই। বেলা ৪টার সময় শান্তিপুরে এক ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে গান হইতেছে। একটি মুসলমান মগ্ন হইয়া শুনিতেছে, চক্ষে জল পড়িতেছে। একজন গোস্বামী গিয়া—'ওঠ বেটা, তুই এখানে কেন? একি হাট বাজার?' নীলকণ্ঠ হাত যোড় করিয়া বলিল, 'প্রভু, একি! কৃষ্ণনামে আবার জাতি বিচার! হরিদাস যবন হইয়াও হরিনামে জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি—যাঁহাকে আপনি 'ওঠ বেটা' বলিতেছেন, এখন দেবতারা উহার চরণধূলি প্রার্থনা করিতেছেন।' এক গান রচনা করিয়া গাহিলেন।"

সমাজের উন্নতি পথে ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

আজ ঠাকুর সমাজের উন্নতি পথে ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে লিখিলেন—"ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজত্ব নাই। ইংরাজ রাজত্ব দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। তবে সময়ে সময়ে যে অত্যাচার দেখা যায়, তাহা রাজত্বের দোষ নহে, রাজকর্ম্মচারীর দোষ। যখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার হয় নাই, তখন টোলের ছাত্রদের যেরূপ ভয়ানক অবস্থা দেখিয়াছি তাহা মনে করিতেও ভয় হয়। সাধারণে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন। জমিদারের অথবা রেসমের বা নীলের কুঠিতে চাকুরী করিতেন। তাহাদের অধিকাংশ ঘুষ লওয়া, ব্যভিচার, প্রজা উৎপীড়ন, মিথ্যা সাক্ষ্য,— এ সমস্ত কার্য্যকে গৌরব মনে করিতেন। মামা বাড়ীতে বেশ্যা আনিয়াছেন; আমাকে মামী ঠাকুরাণী ডাকিয়া বলিলেন। আমরা ৫/৬ ভাই, মাসতুতো ভাই একত্র হইয়া লাঠী লইয়া 'মার মার' করিয়া উপস্থিত। তাহাতে লজ্জা নাই, বরং ভয় প্রদর্শন করিলেন। এখন সেই লোক কেবল বয়সের পরিবর্ত্তনে ভাল, তাহা নহে। সময়ের একটা শাসন আছে;—তাহাতে অনেকের সংশোধন হয়। এই পরিবর্ত্তনের কারণ, ইংরাজী শিক্ষা এবং ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। অনেক ইংরাজীওয়ালা বাবু লোকও শাস্ত্র ও মহাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন। শাস্ত্র-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। যখন তাহারা ক্রিয়াশীল হইবে, তখন অপূর্ব্ব ঘটনা হইবে। এখন ইংরাজের কথা বাবুরা শুনেন— এজন্য ইংরাজ দ্বারা কার্য্য করান হইতেছে।"

প্রশ্ন। 'রামমোহন রায় কি নূতন একটা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন?'

ঠাকুর লিখিলেন—"যাহার যাহা শাস্ত্র, তাহা অবলম্বন করিয়া রামমোহন রায় মহাশয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। রামমোহন রায় ধর্ম্ম দুই ভাগ করিয়া বিচার করিতেন। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও

সামাজিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম,—খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের সামাজিক ধর্ম্ম। রামমোহন রায় মহাশয় ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করেন।—এখন সেই পথ-হারা হওয়াতেই নানা দিকে গতি।"

ঠাকুরের মুখে শুনিলাম তিনি প্রচারক অবস্থায় একদিন চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময়, এমন একটা স্থানে গিয়া পড়িলেন যেখানে ধারে-কাছে কোন লোকালয় নাই। সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠ। অন্ধকার রাত্রি রাস্তা দেখা যায় না। আকাশে মেঘ উঠিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বহুদূরে একটি আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া ঠাকুর পথে বিপথে চলিয়া এক জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর যখন জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইলেন জমিদার তখন প্রচুর পরিমাণে মদ খাইয়া বৈঠকখানার ঘরে মাত্‌লামি করিতেছিলেন। বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন এবং নেশার ঝোঁকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন জমিদারের নিকটে উপস্থিত হইলেন, ঠাকুরের কম্বল জড়ান প্রকাণ্ড চেহারা, হাতে লাঠি, মাথায় পাগ দেখিয়া জমিদার বলিলেন—'কে হে তুমি এখানে কেন?' ঠাকুর বলিলেন,—**'দেখ্‌ছ না? আমি যমদূত।'** মাতাল তখন ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমাকে নিও না বাবা ক্ষমা কর, আমি আর মদ খাব না।' ঠাকুর অবশিষ্ট রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন গ্রামের দশটি লোক জমিদারের বাড়ীতে একত্র করিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলেই শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদার ৩/৪ দিন ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে খুব আগ্রহের সহিত আদর যত্ন করিয়া রাখিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলেন। ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া তিনি এত মুগ্ধ হইলেন যে জীবনে আর কখনও মদ খাইবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর দীক্ষা দিয়া চলিয়া আসিলেন। এক বৎসর পর ঠাকুরের হঠাৎ একদিন তার কথা স্মরণ হইল। ভাবিলেন—"জমিদারটি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়াছিলেন, কি অবস্থায় আছেন একবার দেখে আসি।" ঠাকুর অনেক কষ্টে জমিদারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, জমিদার মদ খাইয়া নেশায় বিভোর। ঠাকুর তাঁহার নিকটে পঁহুছিয়া দেখিলেন তিনি নেশার ঘোরে মত্ত হইয়া উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া আছেন, আর আপন মনে কত কি বলিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন,— **"কি, এ অবস্থা কেন? আমাকে চিন্‌তে পারেন?"** জমিদার বলিলেন—'আপনাকে আবার চিন্‌তে পার্‌বো না? আপনার কথায় তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তাড়ায়ে দিয়ে একটা নিয়েছিলাম। এবার দেখুন সেই একটাকেও তাড়ায়ে দিয়ে পরমহংস হ'য়ে বসে আছি।'

ঠাকুর কয়েকদিন জমিদারের নিকটে থাকিয়া তাঁহার কু-অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিয়া চলিয়া আসিলেন। জীবনের অবশিষ্ট দিন জমিদারটি সদ্‌ভাবে কাটাইয়াছিলেন।

শুনিলাম ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় শান্তিপুরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। আফিং, গাঁজা, চণ্ডু, গুলি এবং মদ্যপানাদি ভদ্রলোক ছোটলোক কেহই দোষণীয় মনে করিত না। বেশ্যা রাখাও একটা গৌরবের কার্য্য মনে করিত। ব্রাহ্মেরা দেখিলেন এই অবস্থার অচিরে

পরিবর্ত্তন না হইলে দেশ উজাড় হইয়া যাইবে। ভগবানের নাম কেহ নেয় না, ধর্ম্মের কথা কেহ শুনে না। সংশোধন হইবেই বা কি প্রকারে? সকলে যুক্তি করিয়া ঠিক করিলেন মাতাল নেশাখোর্‌দের দু'আনা, একআনা, তিন আনা করিয়া দিয়া উপাসনালয়ে নিবে। তাহারা অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল স্থির হইয়া বসিয়া উদ্বোধন প্রার্থনাদি শুনিবে এই প্রকার যুক্তি করা হইবে। নেশাখোরেরা অনেকে পয়সার লোভে উপাসনায় যোগ দিতে সম্মত হইল। উপাসনা-ঘর লোকে পরিপূর্ণ দেখিয়া ব্রাহ্মদের খুব আনন্দ। সকলেই মনে করিলেন তাহাদের উপদেশ শুনিয়া বিশেষ উপকার হইবে। দু'পাঁচদিন সকলেই খুব স্থির হইয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। পরে একদিন উদ্বোধন শেষ হইতেই একটি বৃদ্ধ নেশাখোর হাই তুলিতে তুলিতে আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আঃ কি অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ কর্‌লাম!' একটু তফাৎ থাকিয়া আঙ্গুল মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে আর একজন বলিলেন—যা' বল্‌লি ভাই; আমারও ঐ কথা।' অপর একটি লোক মিট্ মিট্ করিয়া উহাদের পানে তাকাইয়া বলিল, 'উপাসনা তো হ'য়ে গেল, আর কেন? চল্‌না এখন আনন্দ করি গিয়ে?' তখন নেশাখোরেরা সকলে বাহির হইয়া পড়িল। ২/৪ দিন ব্রাহ্মেরা এই প্রকার কাণ্ড দেখিয়া পয়সা দিয়া উহাদেব আনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। পরে বহুচেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য লইয়া সমাজের দুর্নীতি নিবাবণে অনেকটা কৃতকার্য্য হইযাছিলেন।

বস্তুতঃ বেদ বিভিন্ন নয়। পরা ও অপরাবিদ্যা।

একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গুরুভ্রাতা—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিরা লিখিয়াছেন,—'বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

বাস্তবিক কি, এক বেদের সঙ্গে অন্য বেদের সংস্রব নাই? তাঁরা পরব্রহ্মকে কি উপায়ে লাভ করিতেন? পরাবিদ্যা কাহাকে বলে?

ঠাকুর লিখিয়া দিলেন,—"ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ এক। তাহার শিক্ষার জন্য তাহাকে চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত চারি বেদ শিখিতে হইলে ৩৬বৎসর সময় আবশ্যক। সুতরাং সকলে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। এক ভাগ কি দুই ভাগ অধ্যয়ন করে। সুতরাং যিনি যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই আচার্য্য হন। এজন্য 'বেদা বিভিন্নাঃ'। বেদ যে ভিন্ন তাহা নহে,—যেমন হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন, বস্তুতঃ এক শরীর মাত্র। যিনি সাম বেদের আচার্য্য, তিনি যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন না; অথবা যজুর্ব্বেদের মধ্যে সাম বেদের বিষয় নাই। যজুর্ব্বেদ শিক্ষা কর,—যজুর্ব্বেদীর নিকট যাইতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ বেদ-বেত্তা পাওয়া যায়, সেখানে 'বেদা বিভিন্নাঃ' নহে। ব্যাস—বকরূপী ধর্ম্মে লিখেছেন,—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত।—গুহা শব্দের অর্থ, মুনষ্যের হৃদয়। এই শ্লোক উপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা। ঋক্ বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এ সমস্ত অপরাবিদ্যা। যাহা দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাই পরাবিদ্যা,

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। তাহা মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে। এক এক ঋষি এক এক বেদ বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিক্ষা করিতে হইবে। মানবাত্মার ভিতরে যদি প্রবেশ করিতে পার তবে সমস্ত লাভ হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা আত্মামধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। বেদ শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম।"

একটু থামিয়া আবার লিখিলেন—"**জীব সমষ্টির মধ্যে যে ঈশ্বর, তাহাকেই হিরণ্যগর্ভ বলে। জড়-উপাসনা,—পঞ্চভূত। হিরণ্যগর্ভ-উপাসনা,—জীব সমষ্টি, বাসুদেব। ঈশ্বরোপাসনা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। পরব্রহ্ম-উপাসনা—নির্গুণ। এই চারি ভিন্ন আরো আছে,—সে অবস্থা মুক্তির পর। জড়, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, নির্গুণ,—এ সমস্ত উপাসনা জন্ম-জন্মান্তর করিতে করিতে পরাধর্ম্মে অধিকার হয়। কিন্তু পরাধর্ম্ম লাভ হইলেও পূর্ব্বের ঐ উপাসনা চতুষ্টয় নষ্ট হইবে না। প্রত্যেক উপাসনাতে সে পরাধর্ম্ম দেখিতে পায়। মুক্তির পরে যে অবস্থা হয় তাহাকে পরাধর্ম্ম বলে। কেবল ঋষিদের মধ্যে ছিল। এজন্য উপনিষদে, ঋক্ বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ধর্ম্ম সংহিতায় পরাধর্ম্মের উল্লেখ আছে। তাহার অধিকারী সকলে নহে; এজন্য সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ ভাবে থাকিলে তবে পরাধর্ম্ম কি তাহা বুঝা যায়।"**

একজন প্রশ্ন করিলেন—তান্ত্রিক সাধনে তুলসী ব্যবহার নিষেধ কেন?

ঠাকুর লিখিলেন—"**বামাচার মতে যাহারা মহাশঙ্খের মালায় কারণ ব্যবহার করেন, তুলসী ও গঙ্গাজলে তাহার প্রেত শক্তি নষ্ট হয়। তাহাতে তাদের সাধন হয় না। ক্রমে বীরভাব হইতে যখন দিব্যভাবে যায়, তখন কোন প্রভেদ থাকে না।"**

১৬ই আশ্বিনের ঝড়। ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা।

বিখ্যাত ১৬ই আশ্বিনের ঝড়ে যে যুগপ্রলয় ঘটিয়াছিল ঠাকুর সে সম্বন্ধে লিখিলেন—"**১৬ই আশ্বিনের ঝড় বুধবার। তখন আদি সমাজ ঝড়ে উলট্-পালট্ হইতেছে। সন্ধ্যাকালে ছাদের উপরে গিয়া মনে হইল, অদ্য বুধবার। কোমর বেঁধে বাহির হইলাম। হ্যালিডে ষ্ট্রীটে গিয়া একগলা জল,—ক্রমে সাতার। পথের দুই ধারে মৃতদেহ অগণ্য ভাসিতেছে। সমাজে গিয়া দেখি, সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে গিয়াছে! পরদিন মেডিকেল কলেজে মৃতদেহ রাশীকৃত করিয়াছে। ইংরাজ, ইহুদী, কাফ্রী, মগ, উড়ে, বাঙ্গালী, স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন। গঙ্গাতীরে গিয়া দেখি, নৌকা নাই। নৌকার কাঠ ও পেরেক পড়িয়া আছে। জাহাজ রাস্তার উপরে রহিয়াছে। পরদিন নৌকা করিয়া শান্তিপুর গেলাম। পথে অসংখ্য নৌকা ডুবিয়াছে। মৃতদেহ ভাসিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, স্ত্রীলোক; কোট পেন্টালুন, ঘড়ীর চেন, সঙ্গে নোট, একটি বাবু পড়িয়া আছেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, শৃগাল, জলে ভাসিতেছে, রাস্তায় পড়িয়া আছে।—ভয়ঙ্কর দৃশ্য!"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঘরে মানুষ স্থির থাকিতে পারেনা, এমন দুর্য্যোগে ঝড়, বৃষ্টি তুফান মাথায় লইয়া, গঙ্গাজল সাঁতরাইয়া আপনি ব্রাহ্মসমাজে গেলেন কেন?

ঠাকুর—"আমরা যে কয়টি ব্রাহ্ম ছিলাম—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম—সপ্তাহে বুধবার ও রবিবার—উপাসনায় সমাজে গিয়া যোগ দিব।"

প্রশ্ন—ঐ দিনে অন্য সব ব্রাহ্মেরাও কি গিয়াছিলেন?

ঠাকুর—"না আর কেহ যাইতে পারেন নাই। যখন ফিরিয়া আসি, দেখি কেশব বাবু পাল্কীতে যাচ্ছেন। তখন দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে আবার উপাসনা কর্‌লাম।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। আকস্মিক জীবন মরণ সঙ্কটে মৃত্যু স্বীকার করিয়াও বাক্য রক্ষণার্থে বিপদ সাগরে ঝাঁপ দেওয়া বড়ই অদ্ভুত মনে হইল।

বিবেক সংস্কার-গত। ভগবৎ আদেশ—অতি দুর্লভ।

অপরাহ্নে সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক ঠাকুরের নিকট আসিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের পর একটি নববিধান সমাজের ব্রাহ্ম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিবেক কি ঈশ্বরের আদেশ নয়?'

উত্তরে ঠাকুর লিখিলেন—"বিবেক ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন চণ্ডালের ছায়া মাড়ায় তাহা হইলে সে পাপ মনে করে; বিবেকে বলে, ছায়া মাড়াইও না। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি পরে ব্রাহ্ম হয়, তবে তাহার বিবেকে উল্টা বলিবে। তাহাতেই দেখা গেল, যে বিবেক পূর্ব্বে তাহাকে নিষেধ করিত, এখন আবার সেই বিবেকই তাহাকে প্রবৃত্ত করিতেছে।"

ব্রাহ্মটি আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজকাল অনেকেই আদেশ, প্রত্যাদেশের দোহাই দেন। পরমেশ্বরে আদেশ কি প্রকারে বুঝা যায়?'

ঠাকুর লিখিলেন—প্রত্যাদেশ নানাপ্রকার হয়। পরলোকের আত্মা উপদেশ করিলে এবং কোন মহাত্মা সূক্ষ্ম দেহে থাকিয়া উপদেশ করিলে, তাহাকেও প্রত্যাদেশ বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাদেশ ভগবৎ-আদেশ। বিশেষ চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে ভগবৎ-আদেশ শুনা যায় না। ভগবৎ আদেশ বিবেক নহে, মনের ভাব নহে। ভগবৎ-আদেশ আত্মাতে শ্রবণ করা যায়। প্রকৃত প্রত্যাদেশ জীবনে দুই একটির অধিক হয় না। একটি হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি থাকে। 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'—ইহা বুদ্ধদেব শুনিয়া জগৎকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য 'জীবে দয়া, নামে রুচি'—ইহা শুনিয়া, জগৎকে মত্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট 'ভগবৎ সেবাতে জীব উদ্ধার হয়—একজন দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না।'—এইরূপ যিনি যে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, তাহা গৃহের কোণে লুক্কাইত থাকে না; তাহা জগৎময় ব্যাপ্ত হয়। ঋষিগণ যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহাই উপনিষদ্‌রূপে বর্ত্তমান। প্রত্যাদেশ সত্য, পতিতপাবন, জ্বলন্ত, উৎসাহপূর্ণ, মধুর। তাহার সহিত কাহারও অনৈক্য হয় না।

বাল্যকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। সেই ব্যক্তির সহিত ঘটনাক্রমে ২০ বৎসর দেখা হয় নাই। একদিন হঠাৎ সেই বন্ধু নাম ধরিয়া ডাকিলে, তাহার স্বর কিরূপে চিনিতে পারি—

ইহা যেমন প্রকাশ করিতে পারি না—তদ্রূপ ঈশ্বরাদেশ কিরূপে জানা যায় তাহাও কেহ বুঝাইতে পারে না।

ঠাকুরের লেখা খাতা দেখিতে দেখিতে একস্থানে একটি সুন্দর কবিতা দেখিলাম। ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া কোন্ গুরুভ্রাতা বা ভগ্নীর এ লেখা, জানি না। ভাল লাগিল তাই ডায়েরীতে তুলিয়া রাখিলাম।—

ডুবুক তোমার প্রেমে জগৎ-সংসার,
মাতুক তোমার প্রেমে জীবন সবার।
প্রেমময়! প্রেমময় কর এ ভুবন
আলোকিত কর নাথ আমার জীবন।
সকল জীবেরে প্রভু, করিবারে পার
নিজে হ'লে তুমি নাথ মানুষাবতার।
আঁধারে আলোক তুমি, অসারের সার
তোমায় ভুলিয়া মোর কিসের সংসার।

ঠাকুরের বন্য মহিষ ও ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা। মনঃ সংযমে অহিংসা।

প্রচারক অবস্থায ঠাকুর একবার বাঘ ও বন্য মহিষের সম্মুখে পড়িয়া, যে ভাবে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত ঘটনা বলিলেন।—শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঐ বিষয় লিখিয়া রাখিলেন—যথা—'ঠাকুর ময়মনসিংহ হইতে সেরপুর, বগুড়া অঞ্চলে যাইতেছিলেন। সঙ্গে একজন পথ-প্রদর্শক ছিল। কিছুদুর যাইয়া পথ ভুলিয়া কেশেবনের মধ্যে পড়িলেন। দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বন্য মহিষ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তখন কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বাতাসে কেশেবন ফাঁক হওয়াতে, এক গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। স:ে র লোকটিকে বলিলেন,—"চল শীঘ্র ঐ গর্ত্তে প্রবেশ করি।" সে বলিল—ঐ গর্ত্তে হয়ত কোন হিংস্র জন্তু আছে, উহার মধ্যে যাইয়া কি মারা যাইব? তখন ঠাকুর বলিলেন—"উপরে থাকিলেও তো মারা যাইব? উহার ভিতরে গেলে সুস্থিরভাবে ভগবানের নাম দুই একবারও তো করিতে পারিব।"—এই বলিয়া সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে মহিষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং উহাদিগকে না পাইয়া ক্রোধে শিং ও ক্ষুর দ্বারা সেই স্থানের ভূমি একেবারে চষিয়া চলিয়া গেল। পরে তাঁহারা আস্তে আস্তে গর্ত্ত হইতে উঁকি মারিয়া, বন্য মহিষ না দেখিয়া, বাহির হইলেন এবং রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। কিছুদুর যাইয়া দেখিলেন, দৌড়াইয়া এক হরিণ আসিতেছে। তখন সঙ্গের লোকটি বলিল,—'এই হরিণের পেছনে বাঘ আছে। এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম, আর এক বিপদ উপস্থিত।' এই কথা শুনিয়া, ঠাকুর নিরুপায় দেখিয়া, হাতে তালি দিতে

লাগিলেন। হরিণ তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল,—তালি শুনিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। কিছু পরেই বাঘ দেখা যাইতে লাগিল। সেও তাহাদের দিকে না আসিয়া হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। এই ভাবে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। পুনরায় সেই সঙ্গীসহ চলিতে চলিতে এক বাগানে আসিয়া সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন। বাগানের লোক উঁহাদিগকে জলযোগ করাইয়া, এখানে স্থান নাই, আমরা টঙ্গে থাকি—বিশেষতঃ এই স্থান অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বলিয়া, তাঁহাদিগকে এক নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া আসিলেন। এই ঘটনাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা উপলব্ধি করিয়া, ঠাকুর ইহা প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকেন, এইরূপ বলিলেন।

একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'চেষ্টা তো যতটা পারি করিতেছি, কিন্তু মনঃসংযম হয় না কেন?'

ঠাকুর—"যাহাকে অপকারী, শত্রু বলিয়া মনে কর, যাহার অনিষ্টচিন্তা কর;—অকপটে তাহার সেবা কর। যাহাতে তাহার হিত হয়, এরূপ আচরণ কর। হৃদয়ের অভ্যন্তরে শত্রুতা থাকিলেই কিছুতেই মনঃ স্থির হইবে না। ভিতরে পচা ঘা রাখিয়া উপরে মলম দিলে, সমস্ত শরীর পচিয়া যায়।"

অর্থ বুঝিয়া নাম করার ফল। কর্ম্ম ও নির্ভরতা।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—অন্য সাধন-ভজন না করিয়া শুধু যদি ভগবানের নাম কবা যায়—তাহাতে কি কল্যাণ হয় না? ভগবানের নাম করার অধিকার তো সকলেরই আছে?

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর দিলেন,—"পাঁচ বৎসরের শিশু, তাহাকে ক্ষেত্র-তত্ত্ব কিম্বা জ্যোতিষ শিক্ষা দিলে ফল হইবে না। অথচ সাধারণ সত্যে সকলেরই অধিকার আছে। জগৎকে একমাত্র নাম উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু কাহার নাম,—ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হয়। এক নামে অনেক বস্তু বুঝায়। যেমন হরি শব্দে সূর্য্য, চন্দ্র, অশ্ব, সিংহ, বানর, এ সমস্ত বুঝায় এবং পাপহারী ভগবানকেও বুঝায়। এজন্য নামের সঙ্গে সেই নামের বাচ্যকে, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইতে হয়। ব্রহ্মনামে—জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে, আত্মা, জ্ঞান, বেদ এরূপ অনেক অর্থ আছে। এজন্য প্রথমেই বস্তুজ্ঞানের প্রয়োজন। এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন,—এই বিশ্বাস যাহার আছে তাহাকে কেবল নাম উপদেশ দিলেই হয়; অন্য উপদেশের প্রয়োজন হয় না। সকলেই মুখে বলে, একজন কর্ত্তা আছেন;—ইহা বিশ্বাস নহে। কারণ, একটু বিপদ্ আপদ্ হইলেই আর কর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারে না। শিশু যেমন মাতার প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ স্বাভাবিক নির্ভর হইলে, তখন যুক্তি-তর্ক অন্তর্হিত হয়। যে আর কিছু জানে না—কেবল শিশুর ন্যায় রোদন করে,—সেই শিশুর ন্যায় অন্তরের অবস্থা হইলেই,—এক নামেই নামীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

একটু অপেক্ষা করিয়া ঠাকুর নিজ হইতেই আবার লিখিলেন—"লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার হয়। তবে নিজের বিবেক মত

না চলিয়া যদি মনুষ্যের মতে ও আজ্ঞানুসারে ধর্ম্ম করি, তাহাতে হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া নিজের বিবেক মত চলিলে বিশেষ উপকার হয়। ধর্ম্মের জন্য যাহা ভাল লাগিবে তখনই তাহা করিবে।—মানুষের দিকে চাহিবে না। মানুষ যখন অধর্ম্ম করে, প্রথমে নারায়ণ তাহাকে নিবারণ করেন।—যখন কিছুতেই শুনেন না, তখন নারায়ণ পলায়ন করেন। নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও ধীরে ধীরে চলিয়া যান। থাকে কেবল পূর্ব্ব গৌরব। পুরাতন গৌরব বহন করিতে করিতে মস্তকে ক্ষত হয়—ক্ষতের দুর্গন্ধে লোকে নিকটে যাইতে দেয় না, তাহাতে হয় বিবাদ। লোকেরা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়; ঘরে এসে গৃহিণীকে প্রহার করে। নল-রাজা পর্য্যন্ত ঘোল খাইয়াছেন। সুরাপান, জুয়া-খেলা, ব্যভিচার দুঃখের মূল। নাম যত করিবে ততই উপকার পাইবে। মনুষ্যের নিজের ক্ষমতা যতক্ষণ আছে, তাহাকে পরিশ্রম করিতেই হইবে। এখন 'নির্ভর'—ও সব কথা কিছু নয়।

দাবানল হইতে মহাপুরুষের কৃপায় রক্ষা।

আজ ঠাকুর কথায় কথায় তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা সকলেই শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। ঘটনাটি এই—'দীক্ষালাভের পূর্ব্বে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিতে ঠাকুর একবার চন্দ্রনাথের দিকে গিয়াছিলেন। লোকের মুখে শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে, সময় সময় প্রাচীন মহাপুরুষদের দেখা যায়। নানাপ্রকার বাঘ, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পাহাড় পরিপূর্ণ। বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া ঐ পাহাড়ে কাহারও যাওয়া সম্ভব নয়। ঠাকুর মহাপুরুষদের দর্শন করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। অদৃষ্টে যাহা হয় হবে,—স্থির করিয়া, তিনি একাকী এ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠিলেন। চারিদিক তাকাইয়া দেখিলেন, অসংখ্য পাহাড়শ্রেণী, একদিকে একটি নদী। নদীর উপরে পর্ব্বত সোজাভাবে উঠিয়াছে। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম দেখিয়া, ঠাকুর স্থির হইয়া বসিলেন এবং ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ পাহাড়ে আগুন লাগিল। আগুন দেখিতে দেখিতে বিস্তারলাভ করিয়া, পাহাড়ের তিনদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ঠাকুর এই বিপদ্ দেখিয়া, উঠিয়া পড়িলেন। অগ্নি বায়ু সংযোগে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। ঠাকুর রাস্তার অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, দাবানলে সমস্ত পাহাড় অগ্নিময় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য বন্য জন্তু রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে অগ্নির দিকে চাহিয়া আছে। অগ্নি ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে ঊর্দ্ধদিকে 'হুহু' শব্দে উঠিয়া পড়িতেছে। বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, গরু প্রভৃতি বন্য জন্তুসকল একটু পরেই পর্ব্বতের উপরে চীৎকার করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঠাকুর তখন পর্ব্বতের ধারে নদীর উপরে বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। অগ্নির উত্তাপ পর্ব্বতের উপরে অসহ্য হইয়া উঠিল। এই সময়ে অকস্মাৎ কে যেন দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুরকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সহস্রাধিক ফুট উচ্চ পর্ব্বত হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন। শূন্যপথে ঠাকুর সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। মহাপুরুষ ঠাকুরকে নদীর পাড়ে রাখিয়া অদৃশ্য হইলেন। সংজ্ঞালাভের পর ঠাকুর নদীর ধারে ধারে চলিয়া লোকালয়ে আসিয়া পঁহুছিলেন। ঠাকুর এই মহাপুরুষকেও প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকেন।

নানক ও কবীরের ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—'কবীর ও নানকের ধর্ম্মে কি কোন পার্থক্য আছে? যত সাধারণ লোক কবীর-পন্থী, নানক-সাহীরা সব ভদ্রলোক।—এ কেন?

ঠাকুর লিখিয়া উত্তর করিলেন—"কবীর ও গুরু নানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। কবীর জোলা ছিলেন,—এজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তাঁহার মত গৃহীত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমে মেথর, ডোম, চামার এ সমস্ত জাতি কবীর পন্থী। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে, তাহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরু নানক ক্ষত্রিয় ছিলেন; এজন্য সকলের মধ্যে তাঁহার মত অবাধে গৃহীত হইয়াছে। গুরু নানক কথায় কথায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এ সকল মান্য করিয়া তদনুসারে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি পুনঃপুনঃ 'মনমুখ' অর্থাৎ শাস্ত্রহীন পথ—ইহার অপকারিতা দেখাইয়াছেন।"

প্রশ্ন—'শুনিতে পাই অমৃতসরের মন্দিরে দিনরাত ২৪ঘণ্টা অবাধে ভজন চলিতেছে।—ইহা কি প্রথম হইতেই?'

ঠাকুর—"গুরু নানকের পর যিনি চতুর্থ গুরু হ'ন—তাঁহার নাম গুরু রামদাস। তিনি অমৃতসরে গুরুদরবার মন্দির ও সরোবর স্থাপন করিয়া, সমস্ত দিন রাত ভজন প্রচলিত করেন। চার দণ্ডমাত্র অবকাশ থাকে। তখনও মন্দিরে কেহ কেহ ধ্যানস্থ থাকেন। সমস্ত দিন রাত্রি সঙ্গীত, পাঠ, স্তব, আরতি, একসঙ্গে মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন,—এই চার শত বৎসর সমান উৎসাহে চলিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিকমাস শেষ হইতে চলিল। মফঃস্বল হইতে যে সকল গুরু-ভ্রাতারা পূজার ছুটিতে ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হওয়াতে, একে একে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিযা গিয়াছেন। শুনিতেছি ঠাকুর এখন আর গেণ্ডারিয়া যাইবেন না। গেণ্ডারিয়া আশ্রম এখন প্রায় শূন্য। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় আশ্রম দেখাশুনা করেন। ঠাকুর যখন গেণ্ডারিয়া হইতে অসুস্থাবস্থায় কলিকাতা আসেন, তখন শান্তি, জগবন্ধুবাবু, কুতু, দিদিমা, যোগজীবন, শ্রীধর, বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের সঙ্গে আসিযাছিলেন। শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস ও শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থাকা অসুবিধা বোধ করিয়া পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা আসিয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর কলিকাতা আসার পর তাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গেই ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ বিশ্বাস মহাশয় অভয়বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সামান্য বেতনে একটি চাকরী জুটাইয়া নিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় আহারাদির ব্যবস্থা অন্যত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট সময় এখানেই থাকেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ঠাকুর অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সেবা করিতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর সুস্থ বলিয়া তাহার কোন সেবারই এখন প্রয়োজন হয় না। প্রত্যহ সকালে যথাসময়ে চা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াই, বিধু বাবুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। শুনিতেছি, পরিবারাদি গেণ্ডারিয়ায় রাখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শীঘ্রই তিনি একবার তথায় যাইবেন। আমারও একবার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইতেছে মাতাঠাকুরাণী আমাকে দেখিতে ব্যস্ত

হইয়াছেন। আমারও সময় সময় মাতাঠাকুরাণীর কথা মনে হইলে দেখিবার জন্য প্রাণ অস্থির হয়। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে এই মাসের শেষাশেষি একবার বাড়ী যাইব মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলাম।

শঙ্করাচার্য্যের পরিবর্ত্তন।

আজ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরকে বলিলেন—'শঙ্কারাচার্য্য তো অদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁহার স্তোত্রের ন্যায় সরস মধুর ও সুললিত স্তোত্র তো খুঁজিয়া পাই না?'

ঠাকুর লিখিলেন—"তিনি প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া, তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। পরে হালে পানি না পাইয়া যখন দ্বৈতভাব আশ্রয় করিলেন, তখনই তাঁহার প্রাণ সরস হইল। আমাকেই কেন দেখ না। কালাপাহাড় তো হইয়াছিলাম। কেবল বলিতাম 'ভাঙ্গ্‌রে, ভাঙ্গ্‌রে!' ঠাকুর-দেবতা কিছু নয়, কোন অবতার কিছু নয়—কোন তীর্থ কিছু নয়। এখন দেখ কি অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিতে পাইয়াছি, ইহা সমস্তই সত্য। শুষ্ক মতের উপর মানুষ কতদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?"

সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ।

সাধন, ভজন, তপস্যার উপযোগী স্থান কোথায়—জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর লিখিলেন—সাধন-ভজনের স্থান, যথার্থ উপযুক্ত হিমালয়। তারপর নর্ম্মদা, গোদাবরী, গঙ্গা, যমুনা, এই সকল নদীতীরে প্রস্তরময় স্থান ভাল। পাঞ্জাবে রাভী নদীর তীরে স্থান ভাল। বঙ্গদেশ নানা কারণে উপযুক্ত নহে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা—সমস্তই বিরোধী। প্রথমতঃ বঙ্গদেশে কেবল অনার্য্য লোকের বাস ছিল। এদেশে যে সকল আর্য্য আসিলেন, তাঁহারা শাপগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদের বাসস্থান গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে বরিশাল যাইতে যে খাল ছিল, তাহা এখন কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা পদ্মার শাখা। নদীর নাম 'হাউলিয়া'।

ত্রিপুরার অস্থি প্রস্তর হইয়াছে। কতক অস্থি, কতক প্রস্তর এরূপও আছে। ত্রিপুর অসুর ছিল। তিনটা পুরী নির্ম্মাণ করিযাছিল;—লৌহপুরী, রৌপ্যপুরী, সুবর্ণপুরী। এই জন্য তাহার নাম ত্রিপুর হইযাছিল। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতার সঙ্গে মিলিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন; এ কারণ মহাদেবের নাম ত্রিপুরারী।

প্রতি গ্রাম ৪ শত বৎসর পরে পরিবর্ত্তন হয়—ইহার মধ্যে জঙ্গল সহর হয়, সহর জঙ্গল হয়। যেখানে পাহাড় ছিল সেখানে নদী। দারজিলিঙ্গে বসিয়া পর্ব্বত দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বোধ হইল যেন সমুদ্রের ঢেউ চলিয়া যাইতেছে—এক শৃঙ্গ, শৃঙ্গ, শৃঙ্গ। দারজিলিঙ্গে গিয়া যত নীচে ছিলাম, সমস্ত বৃক্ষলতা ঘর-বাড়ী, নদী প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ দেখিলাম। ক্রমে উঠিতে উঠিতে যখন উচ্চ শিখরে উঠিলাম তখন সমস্ত একাকার বোধ হইল।

একটি আকাশে যেন সমস্ত আবৃত হইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্মের সোপানে সোপানে বাস্তবিক সেই অনন্ত, ভূমা পুরুষের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহার সত্ত্বাতে সমস্ত ঢাকা, নিশ্চয়ই বোধ হইবে। তখন পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করাও অসাধ্য।

ঠাকুর আজ হিমালয়ে নীলপদ্ম বিষয়ে লিখিলেন—"হিমালয়ে বরফের উপর বিস্তর নীলপদ্মের বন। পদ্ম ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে। হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। তাহাতে পদ্মবন। বরফ পড়িলে পদ্ম বরফ ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়। হিমালয়ে একপ্রকার ঝিঁ ঝিঁ পোকা আছে, তাহাকে দেবঘণ্টী বলে। দূর হইতে মনে হয়, কোন দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে,—এই তিনবার শব্দ করে। ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে এক প্রকার ঝিঁ ঝিঁ পোকা আছে—তাহারা যখন শব্দ করে, মনে হয় যেন তানপুরা বাজিতেছে।"

নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমৎ নরোত্তম দাস ঠাকুরকে মহাপ্রভুর আবেশাবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ প্রার্থনাবলী অতুলনীয় মহারত্ন। তিনি সারাজীবন ওরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া গেলেন কেন, জানিবার জন্য কেহ কেহ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর নরোত্তম দাস ঠাকুরের অনেক কথা বলিলেন। তন্মধ্যে যাহা আমার প্রাণে বিশেষভাবে স্পর্শ করিল মাত্র তাহাই লিখিতেছি।

শুনিলাম, নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর যখন পরিচয় পাইলেন এবং সগণে তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন জানিলেন, তখন 'হায় কি হইল' তাঁর সঙ্গ অথবা তাঁর সঙ্গীর সঙ্গ আমি পাইলাম না, এখন এ জীবনে আর কি কাজ! এই প্রকার আক্ষেপ করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভুগণের ভিতরে একমাত্র শ্রীমৎ লোকনাথ গোস্বামী জীবিত ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার দর্শনাকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকনাথ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে একখানা কুটীরে নির্জ্জন ভজনে অহর্নিশি মগ্ন থাকিতেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর রাজপুত্র ছিলেন। সেই সময়ে ১৪ লক্ষ টাকা তাঁর সম্পত্তির আয় ছিল। তিনি সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিরাগী হইয়া সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে পঁহুছিয়া জানিলেন অতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী জীবনে কাহাকেও দীক্ষাদান করেন নাই আর করিবেনও না। নরোত্তম ঠাকুর অনেক কান্নাকাটি করিয়াও তাঁহার আশ্রয় পাইলেন না। পরে স্থির করিলেন—তাঁর আশ্রম সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। আশ্রমে যত জলের প্রয়োজন হইত; নরোত্তম দূর যমুনা হইতে তাহা কলসী ভরিয়া নিয়া আসিতেন। উদয়াস্তে নরোত্তম দাসের মস্তকের ভিজা বীড়া খুলিবার অবসর হইত না। একদিন লোকনাথ প্রভু ধ্যানাবস্থায় দেখিলেন নরোত্তমের মস্তকে ভিজা বীড়া থাকার ফলে ভয়ানক ঘা হইয়াছে এবং তাহাতে পোকা পড়িয়াছে। কিন্তু নরোত্তমের তাহাতে খেয়াল নাই, তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। দয়ালু লোকনাথ প্রভুর প্রাণ তখন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি নরোত্তমকে ডাকিয়া আনিয়া দীক্ষা দিলেন। এবং একনিষ্ঠ হইয়া একান্তপ্রাণে

ভগবানের সেবাপূজা ধ্যান ধারণায় দিন অতিবাহিত করিতে আদেশ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর তাহাই করিতে লাগিলেন। একদিন একটি পিপাসার্ত্ত লোক জলপান করিতে কুঞ্জে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাহা শুনিয়া পূজা ছাড়িয়া উঠিলেন; এবং সুশীতল জল পিপাসার্ত্তকে পান করাইয়া ঠাণ্ডা করিলেন। লোকনাথ প্রভু নরোত্তমের ঐ কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া কহিলেন,—বাবা নরোত্তম! তুমি বাড়ী চলিয়া যাও। সেখানে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রে সেবা পূজা কর। আর অতিথিশালা ক'রে অতিথি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল, দুঃখী, দরিদ্রদের পরিপাটী ক'রে সেবা কর। তাহাতেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হবে। একনিষ্ঠ হ'য়ে একান্তভাবে ভগবানেব সেবার অধিকার অনেক পরে। সেই অধিকার জন্মালে তার আর অন্য কর্ত্তব্য থাকে না। ভগবানের সেবা ছাড়িয়া যাহাদের লোক সেবার প্রবৃত্তি হয়, লোক-সেবাই তাহাদের কর্ত্তব্য। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিলে শাখা প্রশাখা ফুল ফল সকলেরই তাহাতে পুষ্টি হয়। এই জ্ঞান জন্মালে সে আর অন্য পূজা করিতে পারে না। নরোত্তম দাস ঠাকুর গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে আসিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন গুরুর আদেশমত কাটাইলেন। তাঁর প্রার্থনা সকল পড়িয়া কান্না সম্বরণ করা যায় না।

বিধিহীন ভক্তি উৎপাতের কারণ।

প্রশ্ন—'সাধারণ বাউল বৈষ্ণব ও সাধারণ লোকদেব মধ্যেও খুব ভাব-ভক্তি দেখা যায়—অথচ আমাদের তাহা হয় না কেন?'

ঠাকুর লিখিয়া জানাইলেন—**"শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ করাই পরম সাধন। গোস্বামী পাদগণ লিখিয়াছেন যে, স্মৃতি-শ্রুতি, পঞ্চরাত্র বিধি বিনা ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের কারণ হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (বৈষ্ণবদের ভক্তি-দর্শন শাস্ত্র) লিখিয়াছেন যে, বাহিরের নৃত্যাদি দেখিয়া ভাব অনুমান হয় না। ভাবের লক্ষণ,—কর্ম্ম করিতে করিতে যে বিবেক বৈরাগ্য সময় সময় প্রকাশ হয়, সেই সব নিষ্কাম ভাবে করিতে ইচ্ছা হইতে থাকে।—নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম শেষ হয়—তখন বিশ্বাসের রাজ্য।"**

একটু থামিয়া ঠাকুর বৈষ্ণবদের ভজন-সাধন ও বেশ সম্বন্ধে লিখিলেন—**"হরিভক্তি-বিলাসে যে প্রণালীতে ভজন-সাধন ব্যবস্থা দেখা যায়, সে প্রণালী এখন প্রচলিত নাই;—বিরল। পূর্ব্বে পণ্ডিতদের মস্তকের মধ্যে শিখা থাকিত,—চারিদিকে ক্ষৌর করা হইত। ইহাই মহাপ্রভুর সময়ে সকলেই ভদ্রপণ্ডিত বেশ বলিয়া ধারণ করিতেন। এখন বৈষ্ণবদিগের বেশের মধ্যে গণ্য।"**

বৌদ্ধ সাধনপ্রণালী শাস্ত্রানুমোদিত কি না?

একজন গুরুভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৌদ্ধসাধন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কি না? কোন বেদে বা পুরাণে কি তাহার বিষয়ে উল্লেখ আছে?'

ঠাকুর—**"হিমালয়ের বৌদ্ধ লামাদিগের মঠ আছে। আমি সেখানে গিয়া কিছুদিন ছিলাম।**

তাহাদের সাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ হইল। শাক্যসিংহ প্রথম সাধনে ঐ জোয়ার-ভাঁটা ভোগ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পূর্ব্ব শিক্ষা, যাহা আত্মার অঙ্গ হয় নাই,—তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন এক একটি সত্য লাভ হইতে লাগিল, এবং তাহাই আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া, বুদ্ধত্ব আলিঙ্গন করিল। এখনও বৌদ্ধ লামাগণ ঐ প্রণালীর অনুসরণ করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ যদি দেখিতে চান তবে পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া হিমালয়ে বৌদ্ধ মঠে গিয়া, অধ্যয়ন করুন। অনুবাদে অনেক ভুল। লামা গুরুদিগের আচার ব্যবহার, তাদের সাধন প্রণালী না দেখিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।"

"বৌদ্ধশাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক। অথর্ব্ব বেদে যোগের উপদেশ অধিক। যত তন্ত্র সে সব তাপনী শ্রুতির অনুগত। বৌদ্ধদিগের উপাসনা এ তন্ত্রমূলক। যখন বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ হয়, তখন ঐরূপ বচন পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হয়। শাস্ত্র নিজে পড়িলে বুঝা যায় না। অধ্যাপকের নিকট পড়িলে শাস্ত্রে সামঞ্জস্য বুঝা যায়।"

অন্য জীব অপেক্ষা মানুষ বড় কিসে?

আজ ঠাকুর পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির কৃতজ্ঞতা ও অদ্ভুত কার্য্যাদি বিষয়ে গেণ্ডারিয়ার নানা ঘটনা তুলিয়া জানাইলেন;—"পশু-পক্ষী,—ইহাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। এজন্য নিকটে যে মনুষ্য দ্বারা একটি অন্নও পাইয়াছে, তাহাকে তাহারা স্মরণ করে। মৃতব্যক্তির জন্য যতক্ষণ দুঃখ থাকে, ততক্ষণ তাহারা নীরব থাকে—ইহাই স্বাভাবিক অশৌচ। ইহারা অশৌচান্তে স্নান করে। বড় ইন্দুর, বাচ্চা ইন্দুরকে আহার আনিয়া দিতেছে। মাকড়সা তাহার জাল পাতিয়াছে—খাবার পড়িবার জন্য। জালের এক অংশ বাচ্চা মাকড়সাদের খেলিবার জন্য, খাবার সংগ্রহের জন্য অপর অংশ। ঢাকায় কুটীরের মধ্যে ইন্দুর, পিপীলিকা, মাকড়সা এবং অন্যান্য কীট কিছু খাবার আমার জন্য কুটীরে আনিলে, ইন্দুর বাহিরে আসিয়া কিচ্‌কিচ্ করে—একখানা রুটি দিলে তবে যাইবে—নতুবা কিচ্‌কিচ্ করিয়া কাঁদিতে থাকিবে। পিঁপড়া সকল খাবার না পাইলে আসনে, শরীরে উঠিয়া বিরক্ত করে। মাকড়সা জালে দুলিতে থাকে। অল্প কিছু পাইলে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। মানুষ ও ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব আছে। সেইরূপ সর্প, ব্যাঘ্র ইহাদের সঙ্গেও মানুষের সদ্ভাব আছে। সমস্ত জীব জন্তু, নিজের নিজের কার্য্যে তাহারা শ্রেষ্ঠ। আমি মাকড়সার মত জাল বুনিতে পারি না; বাবুই পক্ষীর মত বাসা করিতে পারি না। চিনি ও ধূলা মিশাইয়া পৃথক করিতে আমার ক্ষমতা নাই, কিন্তু পিপীলিকার আছে।"

ঠাকুর মাকড়সা সম্বন্ধে গেণ্ডারিয়ায় একদিন লিখিয়াছিলেন—"আমগাছ তলায় তুলসীগাছে একটি মাকড়সা বহুদিন পর্য্যন্ত আছে। দুই দিবস হইতে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া আমগাছের আড়ালে আসিয়াছে। কেন বাসা সরাইল বুঝিতে পারি নাই। কল্য রাত্রিতে যখন ঝড় হইল, তখন বুঝিলাম যে, ঝড় হইবে, পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, এমন স্থানে বাসা করিয়াছে যেখানে

ঝড় না লাগে। দুই তিন দিন পূর্ব্বে, ঝড় হইবে জানিয়াছে। কোন্ দিক হইতে ঝড় বহিবে তাহাও জানিয়াছে। এখন দেখ, মাকড়সা মনুষ্য হইতে কিসে ক্ষুদ্র। ভগবানের অনন্তরাজ্যে কেহ ছোট বড় নহে। সকলে এক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রত্যেক জীবজন্তুর স্বীয় স্বীয় জীবন যাপনে উপযোগিতা প্রত্যেককে প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য বৃথা অহঙ্কার করে।"

রেবতীবাবুর কীর্ত্তন। অসাধারণ কণ্ঠধ্বনি।

ঠাকুর যখন ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজে প্রচারক নিবাসে ছিলেন সেই সময় হইতেই দেখিয়া আসিতেছি,—একটি দিনের জন্যও ঠাকুরের সন্ধ্যা কীর্ত্তন বাধা যায় নাই। প্রত্যহ সন্ধার সময়ে ধূপধুনা গুগ্‌গুল চন্দনাদি জ্বালাইয়া, ধূনচি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হয়। ঠাকুর উহা নমস্কার করিয়া নিজে নিজে করতাল বাজাইয়া গাহিয়া থাকেন—**"হরিসে লাগি রহরে ভাই, তেরা বনত বনত বনি যাই;" "প্রভুজি য়্যায়সা নাম তোঁহার, পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার।"** ঠাকুরের নিয়মিত সন্ধ্যাকীর্ত্তন হইয়া গেলে সম্মিলিত গুরুভ্রাতৃগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই কীর্ত্তনে এক একদিন এক এক প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস ও আনন্দ দেখা গিয়াছে। ঠাকুরের একান্ত প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয় যখন খোলে তালি দিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন-গৃহস্থিত বিক্ষিপ্ত, চঞ্চলচিত্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর ক্ষণকালের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে; তখন তাহারা উৎকণ্ঠার সহিত অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের পানে তাকাইতে থাকেন। রেবতীবাবুর কণ্ঠনাদের সহিত ঠাকুরের অন্তরের কি যোগাযোগ আছে, জানি না। তাঁহার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই ঠাকুরের স্থির কলেবর চঞ্চল হইয়া পড়ে; এবং উহা দক্ষিণে বামে হেলিতে দুলিতে থাকে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং দেহস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশী থর থর কম্পিত হওয়ায়, ঠাকুরকে অস্থির করিয়া ফেলে। তিনি আর আসনে বসিয়া থকিতে পারেন না।—একেবারে লাফাইয়া উঠেন এবং নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। তাড়িত যন্ত্রের সহিত সূক্ষ্ম তার সংযোগে বিবিধাকার পুতুল যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে নৃত্য করিতে থাকে, রেবতীবাবুর ভাবোদ্দীপক অসাধারণ কণ্ঠধ্বনি ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনায় পরিপুষ্ট হইয়া, অলক্ষিত সূত্রে ভক্তবৃন্দের চিত্ত ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ভাবাবেগে প্রমত্ত করিয়া তোলে। তখন গুরুভ্রাতারা ভাবাবেশে মত্ত হইয়া, নানা প্রকার নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। ঠাকুর হরিধ্বনি করিয়া দক্ষিণ হস্ত যখন পুনঃপুনঃ সম্মুখের দিকে সঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন, তখন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির আনন্দপ্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলে। গুরুভ্রাতারা নানা প্রকার হুঙ্কার গর্জ্জন এবং অদ্ভুত আস্ফালন করিতে করিতে ভাবোন্মত্ত অবস্থায়, ঠাকুরকে পরিক্রমণ পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন। নানাভাবের সমাবেশে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি ক্ষণকাল কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় পড়িয়া যান। সংকীর্ত্তনের আনন্দ কোলাহলও ক্রমশঃ নীরব হয়। গুরুভ্রাতারাও ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হন।

আজ ছুটির দিন। সকালেই আজ বহু স্ত্রীলোক পুরুষ ঠাকুর দর্শনার্থে সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে প্রকাণ্ড হলঘরটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বারান্দায়ও

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন

শ্রীশ্রীভক্তরাজ মহাবীর

দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। রেবতীবাবু গান করিবেন শুনিয়া, সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের চা সেবার পর মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। ঠাকুর দুই একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। রেবতীবাবু গাহিলেন—

তব শুভ সম্মিলনে, প্রাণ জুড়াব হৃদয় স্বামী।
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি।।
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, গোপীজনগণ সনে,
তোমার নৃত্যপদ সেবি প্রভু, কৃতার্থ হইব আমি।।
হৃদয়ে ধরি' শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে,
আমার পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াব তাপিত প্রাণী।।
অখিল লীলারসে, ডুবাব মানস হে,
আমি সকল ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।।
(আমার আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে।)
পিরীতির সেজ, হৃদয়ে বিছাব হে
রসে মিশামিশি হ'য়ে, হব আমি তুমি, তুমি আমি।।

গানের দুই এক পদ গাইতেই, ঠাকুরের চেহারা অন্যপ্রকার হইয়া গেল। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল; ওষ্ঠধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ শরীরটি গৌরবর্ণ হইল, হর্ষপুলকে সর্ব্বাঙ্গি শিহবিতে লাগিল। ঠাকুর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দক্ষিণ হস্ত ললাট প্রান্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক, নেত্রাবরণ করিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বামহস্ত কটিদেশে বিন্যাস করিয়া মধুরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে স্ত্রীলোক পুরুষের কান্নার রোল উঠিল। ঠাকুর তখন আচম্বিতে বহির্ব্বাস মস্তকোপরি তুলিয়া দিয়া, ঘোমটা টানিতে লাগিলেন; এবং বিবিধ প্রকারে অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ কবিলেন। ঠাকুরের দীর্ঘাকৃতি প্রকাণ্ড শরীরটি, দেখিতে দেখিতে খর্ব্ব হইয়া পড়িল একটু পরেই ঠাকুব উপুড় হইয়া বামহস্তে বহির্ব্বাসের আঁচল ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে টোপর হইতে মুড়ি মুড়্কি বাতাসা ছড়ানোর মত সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে কি যেন ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে কি যে কাণ্ড উপস্থিত হইল প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

আজ হুঙ্কার, গর্জ্জন নাই—উদ্দণ্ড লম্প ঝম্ফ নাই। নূতন ভাবে, বিচিত্র প্রকারে ঠাকুরের নৃত্য দেখিয়া, অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ভাবাবেশে ধরাশায়ী হইলেন।— এমনটি আর কখনও দেখি নাই। ধন্য রেবতীবাবু! ধন্য রেবতীবাবু! উহার কীর্ত্তনে ঠাকুরের যে আনন্দ তাহার একদিনের চিত্রও যেন স্মৃতিতে রাখিয়া জীবন শেষ করিতে পারি।— ঠাকুর! এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শুনিলাম রেবতীবাবুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া একটি সাধু আকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি, বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী রাস্তায় সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দরজার পাশে থাকিয়া তিনি কিছুক্ষণ রেবতীবাবুর গান শুনিলেন। পরে যাওয়ার সময়, সেখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে বলিলেন—'যিনি গান করিতেছেন, সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার তেমন দক্ষতা না থাকিলেও,— স্বরটি কিন্তু অসাধারণ!— শুধু ভগবৎ ভজনের জন্যই ভগবানের বিশেষ কৃপায় কোন কোন ভাগ্যবান এই প্রকার কণ্ঠনাদ লাভ করেন। এই নাদে ভগবান আকৃষ্ট হন,—সঙ্গীত শাস্ত্রে আছে।'

ঠাকুর আজ কথা প্রসঙ্গে লিখিলেন—**"ভগবানের কার্য্য দেখিয়া দেখিয়া লোক এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ভগবানের প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয় না। রবিঠাকুর গান করিলেন, লোকে কত প্রশংসা করে। ভগবান কি আশ্চর্য্য কৌশলে বাক্‌যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার মনের যেমন ভাব হইবে—সেইরূপ বাক্‌যন্ত্রে শব্দ হইবে। রাগ-রাগিণীর কোন রূপ নাই,—মানুষের মনের ভাব মাত্র। সেই ভাব মনে আসিবামাত্র—নানা রাগ-রাগিণী কণ্ঠার শিরাতে বাজিতে থাকিবে। নিরাকার ভাব সাকার হইয়া রাগ-রাগিণীরূপে পরিণত হইতেছে। ইহার প্রশংসা কেহ করে না। কণ্ঠার শিরা কয়েকটিমাত্র—তাহাতে সমস্ত সুর প্রকাশ হয়। উচ্চ, নীচ, হ্রস্ব, প্লুত-বিবিধ শব্দ—ঐ শিরাগুলিতে বাজিতেছে।"**

আমার ডায়েরী—ঠাকুরের স্পর্শ।

অদ্য আহারান্তে মধ্যাহ্নে ঠাকুর আসনে বসিয়া আছেন, ঘন ঘন আমার বাঁধান সুন্দর ডায়েরীখানার উপর নজর করিতে লাগিলেন। পরে আমাকে বলিলেন—**'ওখানা কি গ্রন্থ?'** আমি বলিলাম, আমার ডায়েরী। ঠাকুর তখন হাত পাতিয়া বলিলেন—**'দেখি'**। আমি ঠাকুরের হাতে ডায়েরীখানা দিলাম। ঠাকুর উহার গোড়ার দিকে একবার খুলিয়া অমনি কতকগুলি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিলেন। সেখানেও ২/৪ সেকেণ্ড নজর করিয়া একেবারে শেষ দিকে খুলিলেন। তখনই আবাব উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন— **'বেশ! রেখে দেও।'**

ঠাকুর পড়িলেন না, অথচ দু'তিনবার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দিলেন কেন বুঝিলাম না। ঠাকুরের অযাচিত স্পর্শে ডায়েরী যে আমার পরম পবিত্র হইয়া গেল, সন্দেহ নাই। আমাকে উৎসাহ দিতেই বুঝি ঠাকুর এরূপ করিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন—**'ব্রহ্মচারী যা লিখ্‌ছেন একশত বৎসর পরে তা দেশে শাস্ত্র হ'বে।'** ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, বারদীর ব্রহ্মচারী বোধ হয় কোন গ্রন্থ লিখিতেছেন। ঠাকুর তাঁহারই কথা বলিলেন। এখন পর্য্যন্ত কিন্তু ওরূপ গ্রন্থের কোন খবর পাই নাই। পরিহাসচ্ছলেও যিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নাই, একসময়ে শাস্ত্র পুরাণের মত তাঁর বাক্য যে লোকে সমাদরে গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ঠাকুরের কুম্ভে গমনের হেতু। গোঁসাই-শূন্য গেণ্ডারিয়া।

প্রয়াগে এবার পূর্ণকুম্ভ। শুনিতেছি ঠাকুর কুম্ভমেলায় যাইবেন। ঠাকুর কুম্ভমেলায় কেন যাইবেন, জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—**"অতি প্রচীন ৩/৪টি মহাপুরুষ এবার কুম্ভমেলায়**

আস্‌বেন।লোকালয়ে কখনও উঁহারা আসেন নাই। বদরিকাশ্রম হইতে শত শত ক্রোশ উত্তরে হিমালয়ের দুর্গম স্থলে উঁহারা থাকেন। আমাকে দয়া ক'রে কুম্ভমেলায় যেতে আদেশ ক'রেছেন,—তাই তাঁদের দর্শন করতে যা'ব।"

আমি—মহাপুরুষেরা আস্‌বেন কেন? তাঁরা কি কুম্ভে স্নান করতে আস্‌বেন?

ঠাকুর—স্নান করতে তাঁরা আসবেন না, তাঁদের আসার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। দেশে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় ম্লান হ'য়ে প'ড়েছে। এক একটি মহাত্মার উপর এক এক দেশের ভার অর্পণ ক'রে তাঁরা চ'লে যাবেন। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার এবার কাঠিয়া বাবার উপরে দিবেন স্থির হ'য়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বাঙ্গালা দেশের ভার কার উপরে দিবেন? ঠাকুর শুনিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে আমার দিকে একটু চাহিয়া রহিলেন পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"তা কি এখন বলা যায়?

জিজ্ঞাসা করিলাম—কুম্ভযোগে স্নানের যদি অসাধারণ বিশেষত্ব না থাকে, তাহ'লে মাস ব্যাপী এই মেলা কেন? ইহা কি আধুনিক? রামায়ণ মহাভারতে কোথাও তো এই কুম্ভমেলার কথা নাই?

ঠাকুর—আধুনিক নয়—বহুপ্রাচীন। রামায়ণে ইহার উল্লেখ আছে। মুনি ঋষিরা মাঘ মাসে প্রয়াগে ভরদ্বাজ-আশ্রমে সকলে সমবেত হইতেন। একমাস কাল তাঁহারা প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে বাস ক'রে কুম্ভযোগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান ক'রে আপন আপন আশ্রমে চ'লে যেতেন। কুম্ভমেলা সাধুদের কংগ্রেস্। কুম্ভযোগ সাধুদের সম্মিলনের সঙ্কেতকাল। এই সময়ে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধুরা একটি স্থানে মিলিত হ'য়ে সাধন-ভজনে তপস্যা সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ জন্মিলে, পরস্পরে আলাপ আলোচনায় তাহা মীমাংসা ক'রে নিতেন। এই সম্মিলনের ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য—এখন সে সব নাই। এখন স্নান লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি এই দেখা যায়।

কুম্ভমেলা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন। শুনিয়া বুঝিলাম, খুব শীঘ্রই তিনি কুম্ভমেলায় যাইবেন। প্রয়াগে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গোবিন্দবাবুকে লিখিয়া একখানা বাড়ী ভাড়া করিতে গুরুভ্রাতাদের বলিলেন। এ বিষয়ে চেষ্টা চলিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী আমাকে দেখিতে বড়ই অস্থির হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া আসিলে ঠাকুরের নিকট স্থির হইয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী যাত্রা করি। এই স্থির করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে যাইব বলিয়া ঠাকুরের অনুমতি চাহিলাম। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। কার্ত্তিকের শেষ সপ্তাহে আমি ঢাকা রওয়ানা হইলাম। শ্রীমান সজনীর নিকটে শালগ্রামটি রহিয়াছেন। বাড়ীতে উহা নিয়া রাখিলে মাতাঠাকুরাণীর গোপালের সহিত উঁহার সেবা পূজা যথামত চলিবে বুঝিয়া শালগ্রামটি সঙ্গে লইয়া চলিলাম।

ছোড়দাদার বন্ধু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা মহাশয় আর কিছুদিন পরেই বাড়ী যাইবেন। তিনি আমাকে একবার তাঁহার বাড়ী বানরিপাড়া যাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ ও জেদ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম।

বেলা অবসানে দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহুছিলাম। আশ্রম জনমানব শূন্য দেখিয়া আমি ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী দক্ষিণের ঘরের উত্তর বারান্দায় একাকী গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মু'টের ঘাড়ে জিনিষ পত্র দেখিয়া আমাকে বলিলেন—'এই ঘরে ছেলে পিলে নিয়ে আমি থাকি—আপনার আসন পূবের ঘরে নিন।' আমি পূবের ঘরে ঠাকুরের আসনের স্থান বাদ দিয়া আসন করিলাম। তৎপরে বারান্দায় বসিলাম। আমার খবর পাইয়া পাড়ার সমস্ত মেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিলেন,—কেহ কেহ অবসাঙ্গ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, আবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'গোঁসাই কি আর গেণ্ডারিয়া আসিবেন না? আপনি আসিলেন গোঁসাই কই?' কেহ বলিলেন—'গোঁসাই সুস্থ আছেন তো? আমাদের কি মনে করেন?' আমি তাঁহাদের মলিন বেশ, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা ও নিস্তেজ্ ভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখ পাইলাম। গোঁসাই ছাড়া হইয়া এই কয়মাসে তাঁহারা কি হইয়াছেন, দেখিয়া অবাক্ হইলাম। কোন প্রকারে তাঁহাদের কথার দু'একটি উত্তর দিয়া শৌচে চলিয়া গেলাম। স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, আমার রান্নার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। যথা সময়ে আমি রান্না আহার সমাপন করিলাম। পরে আমতলায় কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আসনে আসিয়া শয়ন করিলাম।

ঠাকুর শূন্য আশ্রমে কোন প্রকারে ৪/৫দিন কাটাইলাম। এই সময়ে আশ্রমে থাকা যে কি কষ্টকর বলা যায় না। কয়েকমাস পূর্ব্বেও যে আশ্রম ভজনানন্দী গুরুভ্রাতাদের সংকীর্ত্তন মহোৎসবে, শাস্ত্র পাঠ ও সদালোচনায় অহর্নিশি গম্‌গম্ করিত, আজ তাহা জনমানব শূন্য, নীরব নিস্তব্ধ। শ্রীযুক্ত কুঞ্জঘোষ মহাশয় সকালে একবার ঠাকুরের ভজন-কুটীরে ধূপ ধুনা দেখাইয়া থাকেন এবং এক অধ্যায় চৈতন্যচরিতামৃত এবং গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া চলিয়া যান। সারাদিনে আর তিনি আশ্রমে আসেন না। শ্রীমান ফণিভূষণ প্রত্যহ সকালে মা-ঠাক্‌রুণের নিয়মিত পূজা করেন এবং সন্ধ্যার সময়ে আরতি করিয়া থাকেন। আরতির সময়ে কাহাকেও মন্দিরের সম্মুখে দেখা যায় না। বিকালবেলা কোন কোন দিন গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আসিলে আমতলায় মন্দিরের রোয়াকে অথবা পুকুরপাড়ে ঘাসের উপরে কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া যান। এবাড়ীর ওবাড়ীর মেয়েরা সকালে, মধ্যাহ্নে ও বিকালে ক্ষণে ক্ষণে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন, পুতুলের মত কিছুক্ষণ আমগাছের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, কেহ বা আসিয়া যেখানে সেখানে ঘাসের উপরে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়েন; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যান। কিছুকাল পূর্ব্বেও গেণ্ডারিয়ার যে সকল মেয়েকে ব্রজমায়ীদের মত হর্ষোৎফুল্ল মনে সম্মুখে পশ্চাতে হাত দোলাইয়া মহাস্ফূর্ত্তিতে নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছি, আজ তাহাদের শুষ্কতাপূর্ণ

বিষাদ মাখা মলিন মুখশ্রী দেখিয়া এবং ক্লেশসূচক কাতরস্বরে ক্ষণে ক্ষণে হা হুতাশ শুনিয়া অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলাম। ঠাকুর প্রত্যহ প্রত্যূষে আসন হইতে উঠিয়া উঠানে দূর্ব্বাঘাসের উপরে পাখীদের চাউল দিতেন। কত প্রকারের পাখী আসিয়া আনন্দ করিয়া উহা খাইত। এখন সে সব স্থানে চাউল দিলেও পাখীরা আসে না, চাউল খায় না। উদয়াস্ত নানা শ্রেণীর পাখীর কলরব যে আমগাছে বিরাম ছিল না, আজ সেই গাছে একটি পাখীও নাই—পাখীরা গাছ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন ঠাকুর যে সকল বৃক্ষলতার নিকটে যাইয়া দাঁড়াইতেন এবং কাণ পাতিয়া তাহাদের কথা শুনিতেন ও ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন, কত আদর করিতেন—দেখিতেছি, সেই সকল বৃক্ষলতা পত্রশূন্য হইয়াছে—শুকাইয়া যাইতেছে। ঠাকুরের স্মৃতি চিতানলের মত জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত বাসনা কামনা দগ্ধ করিতেছে, প্রাণে শূন্য উদাসভাব আসিয়া পড়িতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—বাড়ী চলিলাম।

অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে বাড়ী পঁহুছিলাম। মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় লইলাম। মা আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মায়ের স্নেহপূর্ণ করস্পর্শে আমার শরীর শীতল হইল—প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। অন্তরে তরঙ্গশূন্য বিমল আনন্দের ধারা বহিল; আমি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। স্নানান্তে রান্না করিয়া আহার করিলাম। পরে পাহাড়-বাসের গল্প করিয়া অনেক রাত্রি কাটাইলাম। মা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। মায়ের স্নেহ মমতার পার-কিনারা নাই।

বাড়ীতে অবস্থান। মায়ের নিত্যকর্ম্ম। পাড়াগাঁয়ের ধর্ম্ম।

বাড়ীতে মাঠাকরুণের নিকটে বড়ই আরামে দিন অতিবাহিত হইতেছে। প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান তর্পণাদি করিয়া আসনে আসিয়া বসি। সন্ধ্যা হোম সমাপন করিয়া ন্যাসাদি কার্য্যে বেলা ৯টা হয়। পরে প্রায় ২ঘণ্টা সময় মা'কে গীতা চণ্ডী প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনাই। এগারটার সময় আবার স্নান করি। পরে স্থির ভাবে আসনে বসিয়া নাম করি। মা বারমাস প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করেন। এক হাঁড়ি জলে গোবর গুলিয়া ভিতর বাড়ী, বাহির বাড়ী, রাস্তাঘাট পায়খানার পথ সর্ব্বত্র গোবর ছড়া দেন। পরে ঐ সকল স্থানে ঝাড়ু দিয়া বাড়ীটি পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। তৎপরে গোবরজলে সকল ঘরের বারান্দা, পইটা সুন্দররূপে লেপিয়া থাকেন। তখন পর্য্যন্ত নিদ্রা হইতে কেহ উঠে না। সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই মা স্নান করেন। ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়া বাড়ীতে আসেন এবং এক ঘটি জলে তুলসীকে স্নান করান, মন্ত্র পড়েন—'তুলসী তুলসী বৃন্দাবন, তুমি তুলসী নারায়ণ, তোমার শিরে ঢালি জল, অন্তঃকালে দিও ফল।' মা তুলসীকে নমস্কার করিয়া ফুল দুর্ব্বাদি চয়নান্তে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করেন। ঠাকুর পূজার সমস্ত আয়োজন রাখিয়া গৃহকার্য্যে রত হন। কখন চাউল ডাল ঝাড়া বাছা, কখন খৈ মুড়ি ভাজা, কখন বা ধানসিদ্ধ করা, ধান রৌদ্রে দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে বেলা

এগারটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন—পরে নিজের রান্নার জন্য রসুই ঘরে প্রবেশ করেন। হবিষ্যান্নের সমস্ত মা নিজেই আয়োজন করেন; অন্যের সাহায্য নেন না। রান্নার সময়ে মা কচি কচি মেয়েগুলিকে ডাকিয়া খেলার উননে রান্না করিতে বলেন। খুকিরা উৎসাহের সহিত শাক পাতা, লতা, ডাঁটা, যাহার যাহা ইচ্ছা সংগ্রহ করিয়া নিয়া আসে। মা ঐ সকল কুটিয়া শুক্‌তা, ঝালের ঝোল, অম্বলাদি প্রস্তুত করিতে বলেন। কোন ঝোল রাঁধিতে কি তরকারী দিতে হয়, কোন তরকারীতে কি বাটনা প্রয়োজন, মা তাহা উঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। উহাদের পুতুল ছেলে-মেয়েদের কি প্রকারে কোলে নিবে, দুধ খাওয়াইবে, দুধ খাওয়াইতে কিরূপে ঝিনুক ধরিবে; ছেলেকে ঘুম পাড়াবে, শয়ন করাইবে, সমস্ত মা উহাদিগকে খেলার ছলে শিক্ষা দেন। গৃহকার্য্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কোন কোন দিন আমি মা'র রান্না করি। আমার পছন্দ মত সামগ্রী মা আমাকে রান্না করিতে বলেন এবং সম্মুখে বসিয়া জপ করিতে করিতে কি প্রকারে উহা রান্না করিতে হইবে বলিয়া দেন। রান্না হইয়া গেলে মা শালগ্রাম নমস্কার করিতে দু'মিনিট অন্তরে সরকারী বাড়ী যান। শালগ্রাম নমস্কার করিয়া আসিতে মা'র প্রায় ১ঘণ্টা সময় লাগে। ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যায় বলিয়া আমি প্রায়ই রাগ করি। মা আমাকে একদিন বলিলেন—"ঠাকুর নমস্কার করতে যাই, তুই রোজ এত রাগ করিস্ কেন?" আমি বলিলাম—"মা ঠাকুর নমস্কার করিতে তুমি এতক্ষণ কাটাও কেন?—আমরা কি ঠাকুর নমস্কার করি না? মা—"তোদের এক ঠাকুর, ঝুপ ক'রে পড়িস্ আর নমস্কার ক'রে উঠিস্। আমার তো সেরূপ নয়। আমি আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত ঠাকুর দেখেছি প্রত্যেকটিকে স্মরণ ক'রে একবার ক'রে নমস্কার করি—তাতেই এত বিলম্ব হয়—এক ঘণ্টার কমে হয় না।"

আমি— অযোধ্যা, কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবনাদি স্থানে যত ঠাকুর দেখেছি সকলকেই তুমি প্রতিদিন নমস্কার কর?—ভুল হয় না?

মা—ভুল যদি হয়, সেই ঠাকুরই আমাকে মনে করাইয়া দেন।

আমি—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম মুখে উপুড় হ'য়ে দাঁড়ায়ে ক'ড়ে আঙ্গুল পুনঃপুনঃ মাটিতে ঠেকাও, আর ঐ হাত কপালে ছোঁয়াও; ওর মানে কি?

মা—গাজী পীর এদের একুশবার করিয়া সেলাম দেই।

আমি—তুমি এত ঠাকুর দেবতাকে নমস্কার কর—মুসলমানদের গাজী পীরকে কর, আমার গোঁসাইকে একবার মনে কর না?

মা—আরে গোঁসাইকে যে আমি ঘুম থেকে উঠার সময়ই সকলের আগে নমস্কার ক'রে উঠি।

আমি—কেন আমার গোঁসাইকে তুমি নমস্কার কর কেন?

মা— তোরা যে গোঁসাইকে ভগবান বলিস্। যদি তাই হয়—আমি ঠকে যাব, তাই করি। মার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আহার করিতে করিতে যাহা ভাল লাগে, মা আমার হাতে তুলিয়া দেন। এই প্রকার ৪/৫ গ্রাস প্রসাদ মা'র হাত হইতে পাইয়া থাকি। আহারান্তে মা ছেলেদের ডাকিয়া এক এক গ্রাস অন্ন দিয়া থাকেন। আহারের পরে মা নিদ্রা যান না; দু'তিন বাড়ী ঘুরিয়া তাহাদের খবর নেন। তিনটার সময়ে মহাভারত পাঠ করি। মা পাড়া-পড়শীদের লইয়া তাহা শ্রবণ করেন। অপরাহ্নে আমি রান্না করি—মা সমস্ত যোগাড় করিয়া দেন।

গ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভিতরে উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলেও, সনাতন ধর্ম্মের প্রভাব সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে কম নয়। সারাদিন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ও পরিশ্রান্ত চাষারা সন্ধ্যার পর কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বা বাউল বৈষ্ণবদের আখ্ড়ায় সমবেত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করে। একটি দিনও তাহাদের ও কার্য্যে বাধা হয় না। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর, অন্ততঃ ৪/৫ বাড়ীতে শনি পূজা হয়। নারায়ণ সেবাও সপ্তাহে ২/৪ বাড়ী হইয়া থাকে। উঠানের মধ্যস্থলে শালগ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে যখন গ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা বসিয়া যান, এবং উচ্চকণ্ঠে মধুর স্বরে সকলে একসঙ্গে পুঁথি পাঠ করেন তখন মনে হয় যেন ঠাকুর আবির্ভূত হইলেন। পুঁথি পাঠের পর ব্রাহ্মণেরা চাউলের গুঁড়ি, কলা ও গুড় দুধের সঙ্গে মিলাইয়া সিন্নি প্রস্তুত করেন এবং ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া পরম পরিতোষে সকলে প্রসাদ পান।

আমি বাড়ী আসিয়াছি পর প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় গ্রামের বাউল, বৈষ্ণব, যুগী, কাপালিক, নমশূদ্রেরা, খোল করতাল লইয়া আমাদের বাড়ী আসিয়া থাকে এবং পরমোৎসাহে গৌর, কীর্ত্তন, হরিসংকীর্ত্তন গান করে। আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সংকীর্ত্তন করিয়াও উহারা তৃপ্তি লাভ করে না। নামের আনন্দে ভাবোচ্ছ্বাস উহাদের কাহারও কাহারও ভিতরে দেখা যায়। নামে ভক্তি উহাদের স্বাভাবিক। ইহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি।

ছোট লোক বাউল বৈরাগীদের ভিতরে একটি নূতন দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। দেবতার নাম 'ত্রিনাথ'। সন্ধ্যার সময়ে ইতর শ্রেণীর লোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন কোন গৃহস্থদের বাড়ী উপস্থিত হয় এবং ত্রিনাথের গান করে—

দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।
আরে দমে দমে লইও রে নাম কামাই নাহি দিও।
সারাদিন ক'রো রে ভাই গৃহবাসের কাম, সন্ধ্যা হ'লে লইও রে ভাই ত্রিনাথের নাম।
আমার ঠাকুর ত্রিনাথে যে করিবে হেলা, দুটি চক্ষু উপাড়িয়ে নেকালিবে ঢেলা।
আমার ঠাকুর ত্রিনাথ যা'র বাড়ী যায়, একপয়সার গাঁজা দিয়া তিন কলকি সাজায়।

এই গান করিতে করিতে তাহারা গাঁজায় দম দিতে থাকে; আর খুব মাতামাতি করে। পরে মুড়ি-মুড়কি নারিকেল বাতাসা ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পায়। গ্রামে প্রত্যেকটি গৃহস্থের বাড়ীতেই প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট দেবতাদের পূজা হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা সকলে করিতে পারে না, তাহা ব্যতীত লক্ষ্মী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ছোট বড় সকলেরই ঘরে

যথামত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ী প্রতিমাসে মেয়েরা ২/৩ টি করিয়া ব্রত করে। ব্রত-পূজাদির আয়োজন কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই করিতে হয় বলিয়া বারমাস ইহাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। মেয়েদের কোন কোন ব্রত বিষম তপস্যা। এই তপস্যা আমা দ্বারা হওয়া সম্ভব মনে করি না।

মা যখন সূর্য্য-পূজা করেন দেখিয়া অবাক্ হই। শেষ রাত্রে উঠানের মধ্যস্থল গোময় দ্বারা লেপিয়া স্নান করিয়া আসেন। পরে সূর্য্য নারায়ণের মূর্ত্তি নানা রঙ্গের চালের গুঁড়ি দ্বারা অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করেন। তৎপরে সূর্য্য পূজার যাবতীয় সামগ্রী সূর্য্যের সম্মুখে সাজাইয়া, সূর্য্য উদয়ের অপেক্ষা করিতে থাকেন। সূর্য্য যেমন উদয় হইতে থাকেন, সূর্য্যকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান হন এবং সূর্য্যের পানে দৃষ্টি রাখিয়া জপ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর প্রকাণ্ড ধূনুচিতে ধূপ-ধুনা চন্দন গুগ্‌গুলাদি নিক্ষেপ করেন। সূর্য্য যেমন উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকেন মা'র দৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে থাকে। এইপ্রকার সূর্য্য অস্তগামী হইলে মাও পশ্চিম মুখ হ'ন। একভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন কাটান। সূর্য্য অস্ত হইতে থাকিলে মা আবার সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তখন পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সারাদিন অনাহারে একভাবে প্রচণ্ড রৌদ্রে সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও মা অবসন্ন হন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

এইপ্রকার আর২/৪টি ব্রত আছে, যাহার অনুষ্ঠানের কঠোরতা সহজ নয়। গ্রামে অধিকাংশ গৃহস্থ বাড়ীতেই মেয়েদের ব্রতপূজা উপবাসাদি দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম।

রাত্রি প্রায় ১০ টার সময়ে মা'র শয়ন ঘরের বারান্দায় আমি শয়ন করি। শয়নকালে কচি খোকাটিকে লইয়া গর্ভধারিণী যেমন করে, মা'ও আমাকে লইয়া তেমন করিয়া থাকেন। আমার নিদ্রা না হওয়া পর্য্যন্ত বিছানার ধারে বসিয়া মা আমার গায়ে হাত বুলান—মাথা চুলকান। সময় সময় অস্পষ্ট মন্ত্র পড়িয়া পেটে আঙ্গুলের টোকা দেন। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! এ কি কর্‌ছ?

মা বলিলেন—'[illegible]ক্ষা বেঁধে দি।' আমি—'কেন এতে কি হয়?' মা—''জানিস্ না? ঘুমের সময় কোন আপদ বিপদ ঘটবে না, ভূত প্রেত অপদেবতায় কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না। ডেয়ে পিপড়া, ইন্দুর বিড়ালেও কামড়াবে না। এখন আর কথা বলিস্ না চোখ বুজ্—ঘুমো।" মা'র অসাধারণ স্নেহের কথা ভাবিয়া চোখের জলে আমার বালিস ভিজিয়া যায়। আহা! এমন মা'র গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়াই ঠাকুর আমাকে তাঁর দেবদুর্লভ শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছেন।

বরিশালে অবস্থান। আত্মার উন্নতির লক্ষণ সম্বন্ধে অশ্বিনীবাবুর প্রশ্নের উত্তর।

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহঠাকুরতা আমাকে তাঁহাদের বাড়ী বানরিপাড়া যাইতে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতেছেন। পরশু একটি স্বপ্ন দেখিলাম—'বেলা অবসানে ভিক্ষা করিতে কুঞ্জবাবুদের

বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের অসাধারণ কৃপায় কুঞ্জবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী অনেক অলৌকিক অবস্থা লাভ করিয়াছে, শুনিয়াছি। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার হাতে অন্নগ্রহণই আমার তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য। কুসুম আমার সংবাদ পাইয়া ভিক্ষা লইয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন দেখিলাম, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি একটি মহাপুরুষ আচম্বিতে প্রকাশিত হইয়া কুসুমকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার শরীরে লীন হইয়া গেলেন। কুসুমের কাঁধে মহাপুরুষের হাত দুখানা মিলিয়া গেল; কুসুম চতুর্ভুজা হইল। কুসুম চারিহাতে ভিক্ষান্ন লইয়া আমাকে প্রদান করিল। ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই জাগিয়া পড়িলাম।' স্বপ্নটি দেখার পর বানরিপাড়া যাইতে আরো আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমি প্রায় ১মাস কাল মাতাঠাকুরাণীর চরণতলে পরমানন্দে থাকিয়া বানরিপাড়া রওয়ানা হইলাম। অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে বরিশাল পঁহুছিলাম। আমার ওখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই কুঞ্জ বরিশালে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ দাস মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। গোরাচাঁদবাবুর আদর যত্ন ভালবাসায় ৫/৬ দিন আমাকে যেন মুগ্ধ করিয়া রাখিল। গোরাচাঁদবাবু সহরের সর্ব্বপ্রধান উকীল হইলেও কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। সদাচার সদনুষ্ঠানে বাড়ীটি যেন দেবালয়। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া বারমাস তিনি গো-সেবা করেন। গোয়ালঘর, জল তুলিয়া নিযা নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। গরুর খুর ধোয়া, গা হইতে গোবর পরিষ্কার করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য নিজে করিয়া থাকেন। গরুকে খাবার দেওয়া, জল দেওয়া, কোন কার্য্যই চাকরের উপর নির্ভর করেন না। এইরূপ সুচারুরূপ গো সেবা আমি কোথাও দেখি নাই। দরিদ্র কতকগুলি ছেলেকে বাড়ীতে রাখিয়া সমস্ত খরচ দিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন, সাধন ভজনেও অনুরাগ খুব, ঠাকুরের উপর নিষ্ঠা অসাধারণ।

স্বদেশ প্রেমিক কর্ম্মবীর গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সম্প্রতি তিনি 'ভক্তি-যোগ' নামে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে উপহার দিলেন। পুস্তকখানা খোলা মাত্রই চক্ষে পড়িল 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।' ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'কামীদের কাম ভোগের দ্বারা উপশম হয় না।' পড়িয়া অশ্বিনীবাবুকে বলিলাম,—দাদা! আপনার ব্যাখ্যা মতে শাস্ত্র বিরোধ পড়ে। কারণ বিধিপূর্ব্বক ভোগে কামের নিবৃত্তি হয়; ইহা সকল শাস্ত্রেই আছে।

অশ্বিনীবাবু বলিলেন—ঐ শ্লোক তো শাস্ত্রেরই, ভোগনিবৃত্তি হইলে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়-এবাভিবর্দ্ধতে' এই কথার তাৎপর্য্য থাকে না। আমি বারদীব ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট ঐ শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম তাহা বলিলাম,—'ঐ শ্লোকে ভোগের কথা নাই—উপভোগ কথাটি আছে। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে স্বেচ্ছাচারে ভোগ তাহাই উপভোগ। এই উপভোগেই সাম্য হয় না। কিন্তু বিধিপূর্ব্বক ভোগে সাম্য হয়।' অশ্বিনীবাবু শুনিয়া একটু সময় চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, আগামী সংস্করণে ওটি সংশোধন করিয়া দিব—ব্যাখ্যাটি ভুলই করিয়াছি।

অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন--আচ্ছা ভাই, আত্মার উন্নতি হইতেছে কিসে বুঝিব?

আমি—আপনি কি বুঝিয়াছেন তাহা জানিতে চাই। অশ্বিনীবাবু বলিলেন—'সত্য, দয়া, বিনয়, সরলতা, পরোপকার, উৎসাহ, উদ্যম, তেজস্বিতা এসব যাহার দেখা যায় তাহারই আত্মার উন্নতি হইতেছে মনে করি।

আমি—আমি তাহা মনে করি না। ভয়ে বা প্রশংসা লাভের লোভে ঐ সকল গুণের অনুষ্ঠান অনেকে করিতে পারে; তাতে তাহাদের প্রকৃতি ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইয়াছে, মনে করা যায় না।

অশ্বিনীবাবু—তুমি তা হ'লে কি লক্ষণে আত্মার উন্নতি বুঝ?

আমি—যাহার চিত্ত গুরুতে আকৃষ্ট তারই আত্মা উন্নত মনে করি।

অশ্বিনীবাবু—তোমার কথা বুঝিলাম না। এ কথার কি কোন যুক্তি আছে?

আমি—যুক্তি এই, গুরুতে সকলেই সকল সদ্‌গুণ আরোপ করে, গুরুকে সর্ব্বগুণময় মনে করে। এই গুরুতে আকর্ষণ হইলে, সদ্‌গুণে তার আকর্ষণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাহিরে অবস্থায় পড়িয়া একজনে যাহাই করুক না কেন, তার চিত্ত যদি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্তর সৎমুখী; চিত্ত সৎমুখী হইলেই তার আত্মা উন্নতিশীল বলিতে হইবে। অশ্বিনীবাবু আমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং 'বাঃ! বেশ বলেছ ভাই, বেশ বলেছ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিনা আগুনে অন্নপূর্ণার রান্না অন্ন।

আমি অশ্বিনীবাবুর বাড়ী হবিষ্যান্ন করিয়া গোরাচাঁদবাবুর বাড়ী আসিলাম। শ্রীযুক্ত হরকান্ত বাবু, শিববাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ৫/৬ দিন বরিশালে আনন্দে কাটাইলাম। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঠাকুরতার সহিত বহু গুরুভ্রাতার জন্মস্থান পুণ্যভূমি বানরিপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। গুরুভ্রাতারা অনেকে ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে খুব আদর করিয়া কুঞ্জদের বাড়ী লইয়া গেলেন এবং দোতালায় একখানা নির্জ্জন ঘরে আসন পাতিয়া দিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলে চলিয়া যাওয়ার পরে কুঞ্জের স্ত্রী কুসুম আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল। কুসুমকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই উহার সরলতা মাখা পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। কুসুমকে বলিলাম—কুসুম! আজ তোমার হাতে আমার ভিক্ষা। এখন চা নিয়ে এস। কুসুম বলিল,— 'ঠাকুরের আদেশ মত ভিক্ষান্ন আপনার জন্য রেখেছি; চাও প্রস্তুত করেছি—এই বলিয়া চা আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিল এবং শুষ্ক অন্নপ্রসাদ আমার হতে দিয়া বলিল— 'এই নিন ভিক্ষা, ঠাকুর আপনার জন্য রাখ্‌তে বলেছিলেন।' আমি চা পান কর্‌তে কর্‌তে কুসুমকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কুসুম এই অন্নপ্রসাদ কোথায় পেলে, আর ঠাকুরই বা কেন ইহা আমায় দিতে বলেছেন?

কুসুম—একদিন ভাতের হাঁড়ি উননে চাপাইয়া আগুন ধরাইতে বস্‌লাম। ভিজা কাষ্ঠ উননে দিয়া খড়ে আগুন ফেলিয়া পুনঃপুনঃ ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলাম। আগুন নিবিয়া যাইতে লাগিল।

ধুঁয়াতে চোখ জ্বলিতে লাগিল, মাথা ধরিল। ঐ সময়ে ভগবতী—অন্নপূর্ণা প্রকাশিত হ'য়ে বল্লেন—'মা। কষ্ট হ'চ্চে; আচ্ছা তুমি একটু স'রে বস, আমি আজ রান্না করে দিচ্ছি। আমি উনন হ'তে একটু স'রে বস্লাম। কতক্ষণ পরে চেয়ে দেখি ভাত ফুট্ছে, অথচ উননে আগুন নাই। আমি ফেন ঝরাইয়া অন্ন অমনি ঠাকুরকে নিবেদন করে দিলাম। ঠাকুর তখন প্রকাশিত হ'য়ে বল্লেন—'ব্রহ্মচারী আস্ছেন, একগ্রাস তার জন্য রেখে দেও।' তাই আপনার জন্য একগ্রাস শুকাইয়া রেখেছিলাম। অন্নপূর্ণার রান্না অন্নই আপনাকে ভিক্ষা দিলাম। কুসুমের কথা শুনিয়া কুঞ্জকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। কুঞ্জ কহিলেন—'ওদিনের কথা আর জীবনে ভুল্ব না, অগ্নিশূন্য রান্না—অদ্ভুত ব্যাপার। অনেক গুরুভ্রাতারা আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন; উনন ধরাইতে চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু উননে এক বিন্দুও আগুন নাই। দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন। প্রসাদ পাইয়া সকলেই তখন ভাবে অভিভূত। আমার সাক্ষাতেই এই ঘটনা হয়।' এসব শুনিয়া আমি প্রসাদ পাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। ভিতরে একটা ভাবের স্রোত চলিতে লগিল। কিছু অন্নপূর্ণার রান্না অন্ন কুসুম হইতে চাহিয়া লইয়া ঝোলায় রাখিয়া দিলাম।

মহাপুরুষ সাজালের দর্শন। ঠাকুরের কৃপায় সুস্বাদু খিচুড়ি।

বানরিপাড়া আসিয়া আমার নিত্যকর্ম্ম যথামত চলিতেছে। সকালবেলা হইতে মধ্যাহ্ন ২টা পর্য্যন্ত সাধন-ভজন পাঠ ইত্যাদিতে কাটাইতে লাগিলাম। অপরাহ্ন ৩টা হইতে গুরুভ্রাতাবা আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাহাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ঠাকুরতার অনুরোধে একদিন তাহার বাড়ীতে ভিক্ষা করিলাম। ঐ দিন সাজালের দর্শন পাইলাম। সাজাল জাতিতে মুসলমান। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'সাজাল পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ।' সাজালের বয়স প্রায় ৬০/ ৬৫ বৎসর অনুমান হয়। দেখিতে কৃশ হইলেও শরীর বেশ সুস্থ। বাড়ী ঘর কিছুই নাই। কখন বৃক্ষতলে, কখন খালের ধারে, অনাবৃত মাঠে ময়দানে রাত্রিযাপন করেন। সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ান। ধর্ম্মকথা কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে গুরুনিষ্ঠা,—গুরুভক্তি বিষয়ে উপদেশ করেন। দেবদেবীদের দর্শন করিয়া স্তবস্তুতি করেন। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাজালকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করে। সংকীর্ত্তনে সাজালের মহাভাব হয়। ঠাকুরের নামে সাজালের অশ্রুবর্ষণ হয়—হর্ষপুলকাদির উদগমে অবসাঙ্গ হইয়া পড়েন। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গলাভে বড়ই আনন্দপ্রকাশ করেন। আমি সাজালকে নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম এবং ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। সাজাল আমার পানে ২/৩ বার তাকাইয়া গুরুভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'উনি কি মাইয়া না পুরুষ? সাজালের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল এবং সাজালকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি দেখ? সাজাল—'ভাবে তো বুজি মাইয়া মানুষ।' কুঞ্জ—তুমি ইহার দাড়ি গোঁপ দেখ না?

সাজাল—'হ্যার লাইগাইত জিগাইলাম।' সাজালের কথাবার্ত্তা অনেক সময় অসংলগ্ন ও অর্থশূন্য পাগলের প্রলাপের মত বোধ হয়—সাধারণে উহাকে পাগল বলিয়াই মনে করে। সাজালের নিকটে বসিয়া বড়ই আরাম পাইলাম। দেহমন যেন মধুময় হইয়া গেল।

অপরাহ্নে রান্না করিতে যাইব, গুরুভ্রাতারা সকলে আমাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন—'ভাই! আজ তোমার হাতে রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেও, আমরা প্রসাদ পাইব। আমি গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। গুরুভ্রাতারা সাত সের চাউল, পাঁচ সের ডাল এবং প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী যোগাড় করিয়া খিচুড়ি রান্না করিতে দিলেন। আমি উহা দেখিয়া অবাক্। এত অধিক পরিমাণে রান্না জীবনে কখনও করি নাই। কি আর করিব, ঠাকুরের নাম লইয়া রান্না চাপাইলাম। ডাল চাল সুসিদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু খিচুড়ির উপরে প্রায় ৩/৪ ইঞ্চি জল হাঁড়ির ভিতরে রহিয়াছে দেখিলাম। গুরুভ্রাতারা বলিলেন আজ সরবৎ খাওয়া হইবে। আমি হাঁড়ি নামাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভোগ লাগাইয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। ১৫ মিনিট পরে দরজা খুলিয়া দেখি খিচুড়িতে এক ফোঁটাও জল নাই। সকলে প্রসাদ পাইয়া খুব পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন এবং বলিলেন—"ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'ব্রহ্মচারীর মত সুস্বাদু অন্ন কেহ খায় না।' আজ ঠাকুরের কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইল।" আমি বুঝিলাম, ঠাকুরের কৃপায়ই আজ খিচুড়ি এত সুস্বাদু ও সকলের তৃপ্তিকর হইয়াছে। প্রসাদ পাইয়া রাত্রে আসনে আসিলাম।

ঠাকুরের কৃপায় কুসুমের আহার ত্যাগ। কুসুমের হাতে ভোজনে অদ্ভুত অবস্থা।

বানরিপাড়া আসার পর প্রতিদিনই কোন না কোন গুরুভ্রাতা আমাকে তাঁহার বাড়ী ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমিও এক এক দিন এক এক বাড়ী ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। এই ভিক্ষা এক উৎসব ব্যাপার। পাড়ার সমস্ত গুরুভ্রাতারা প্রতিদিন আমার রান্না খিচুড়ি প্রসাদ পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। একদিন কুসুম আমাকে বলিল—'আপনি তো বেশ কচ্ছেন, প্রতিদিনই গুরুভ্রাতাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাচ্ছেন—আমার নিকট একদিনও আপনি ভিক্ষা কর্‌বেন না, এতে আমার কষ্ট হয় না?' আমি কুসুমকে বলিলাম—'আজ তোমার হাতে আমার ভিক্ষা কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট বস্তু দিবে, যাহা কখনও আমি খাই নাই।'

কুসুম বলিল—'আচ্ছা তাহাই হবে।' নিত্যকর্ম্ম বেলা ২টা পর্য্যন্ত করিয়া অবশিষ্ট দিন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সদালাপে কাটাইলাম। অপরাহ্নে কুসুম আসিয়া বলিল—'চলুন, এখন আমার হাতে ভিক্ষা নিবেন।' আমি ও কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে নিচে একখানা পরিষ্কার ঘরে গিয়া দেখি, ভোগ রান্নার উপাদেয় সামগ্রী সমস্ত রহিয়াছে, আজ শুধু দুইজনার মত, কিন্তু প্রায় ১সের চাউলের খিচুড়ি রান্না হইবে। সন্ধ্যার সময়ে খিচুড়ি রান্না চাপাইলাম। কুঞ্জ ও কুসুম তাহাদের প্রতি ঠাকুরের অসাধারণ কৃপার কথা বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। উহাদের কথা শুনিয়া প্রাণ সরস হইয়া উঠিল। আহা! কবে আমি কুঞ্জ কুসুমের মত ঠাকুরের অনুগত হইব।

আমি কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কুসুম! আহার ত্যাগ তোমার কি প্রকারে হইল? সারাদিনরাত্রে এক গণ্ডূষ জল বা একগ্রাস অন্ন গ্রহণ না করিয়া এত বড় শরীরটি কি প্রকারে রক্ষা পাইতেছে? সমস্ত দিন তোমার বিশ্রাম নাই। সংসারের কুটনা, বাটনা, বাসনমাজা, রান্না প্রভৃতি সমস্তই তো কর্‌তে হয়, অনাহারে থাকিয়া এ সমস্ত তুমি কি প্রকারে কর? তোমার শ্রান্তি বোধ হয় না? ক্ষুধা পিপাসা পায় না? মুনি ঋষিরা আহার ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ সমাধিতে থাকিতেন—পুরাণে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীতে আহার ত্যাগী কেহ আছে এমন শুনি নাই। তীব্র তপস্যা দ্বারা পাহাড়বাসী সাধুরা আহার ত্যাগের চেষ্টা অনেকে করেন, কিন্তু এযুগে কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া আহার ত্যাগে কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে, জানিতে ইচ্ছা হয়।'

কুসুম বলিল—'পাড়াগাঁয়ে কতপ্রকার অসুবিধা কত সময়ে মেয়েদের ভোগ কর্‌তে হয় জানেন তো? বর্ষা বাদলে ক্লেশের অবধি থাকে না। একদিন রান্না করিয়া সকলকে খাওয়াইতে অনেক বেলা হ'য়ে গেল। অনেকগুলি বাসন্‌ মাজিতে ঘাটে লইয়া গেলাম। বাসন মাজিতে মাজিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। দয়াল ঠাকুর অমনি আমার সম্মুখে জলের উপর প্রকাশিত হইলেন। আমি কাঁদিয়া বলিলাম—বাবা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আমি আর সহ্য করিতে পারি না। ফুল তুলসী আমার কিছুই নাই—আজ আমি তোমাকে কি দিয়ে পূজা কর্‌বো? আমার এই ক্ষুধাকেই পদ্ম করিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রদান করিলাম। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। ঠাকুর ঈষৎ হাস্যমুখে সকরুণ দৃষ্টিতে আমার পানে একটু সময় চাহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার আর ক্ষুধা পিপাসা নাই। শরীরে আমার কোন অসুখ নাই। দিন দিন যেন আরো সুস্থবোধ করিতেছি; সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হই না। কোন সাধন-ভজনে আমার এই অবস্থা হয় নাই—শুধু ঠাকুরের কৃপায়। অনেক দিন তো হয়ে গেল, আর কতদিন এই অবস্থায় রাখিবেন তিনিই জানেন।' কুসুমের কথা শুনিতে শুনিতে খিচুড়ি রান্না হয়ে গেল। আমি উহা নামাইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিলাম এবং স্থির ভাবে বসিয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। কুঞ্জ কুসুমও একান্ত মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিল। প্রায় ১৫ মিনিট একভাবে থাকিয়া কুসুমকে বলিলাম—কুঞ্জকে একখানা পাতা করিয়া দেও, আমরা আনন্দ করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাই, আর তুমি বসিয়া দর্শন কর। কুসুম তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে করযোড়ে আমাকে বলিল—'আপনি দয়া করিয়া আমার একটি আকাঙ্খা আজ পূর্ণ করুন।'

আমি—আচ্ছা বল; আমার ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় পূর্ণ করিব।

কুসুম—আপনি যখন বাড়ী ছিলেন, তখন একদিন দেখ্‌লাম—আপনি আমার নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—'আমার ক্ষুধা পেয়েছে, আমাকে কিছু খাবার দেও।' আমার নিকট ঠাকুরের প্রসাদ ছিল, আমি তাহা আনিয়া আপনার মুখে দিতে লাগিলাম, আপনি খুব আনন্দের সহিত উহা খাইতে লাগিলেন।'

আমি—আমাকে তো ইতিপূর্ব্বে কখনও তুমি দেখ নাই, ভিক্ষার সময় আমাকে কি ঠিক এই রূপই দেখেছিলে?

কুসুম—ঠিক এই রূপই দেখেছিলাম। তবে কপালে এই প্রকার তিলক ছিল না। বিভূতির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া লাল সিঁদুরের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়াছিলেন।

কুসুমের কথা শুনিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। কারণ বাড়ীতে যতদিন ছিলাম যথার্থই আমি ঠাকুরের চরণ-রুলি দ্বারা লাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়াছিলাম। আমি ঠাকুরেরই ইচ্ছা মনে করিয়া কুসুমের অনুরোধে সম্মত হইলাম এবং বলিলাম—'আমাকে তুমি নিঃসঙ্কোচে হাতে ধরিয়া খাওয়াও আমার তাতে আনন্দই হবে। তোমার হাতে ঠাকুরের প্রসাদ বহুভাগ্যে লাভ হয়।' কুসুম ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কুঞ্জের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আমার বামপার্শ্বে যাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তৎপরে উভয় হস্ত দ্বারা আমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইয়া আমার মস্তক উহার বাম বাহু'পরি স্থাপন করিয়া জড়াইয়া ধরিল এবং নিঃসঙ্কোচে স্বাভাবিক ভাবে পুনঃপুনঃ যথেচ্ছ আদর করিতে লাগিল। কুসুম এক একবার ভাবাবেশে ঢুলিতে ঢুলিতে আমার উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কুঞ্জ পুনঃপুনঃ নাম উচ্চারণ করায়, কুসুম কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার মুখে প্রসাদ দিতে লাগিল। আমি ভোজন করিতে লাগিলাম। কুসুম যখন আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্রোড়ে বসাইল, আমার তখন পরিষ্কার অনুভব হইল ঠাকুরের কোলে বসিয়াছি। অকস্মাৎ ঠাকুরের দেহের পদ্মগন্ধ পাইয়া মত্ত হইয়া পড়িলাম। কুসুমের কলেবরে পরম সুখদ ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের অনুপম স্পর্শ পাইয়া অভিভূত হইলাম। ঠাকুরের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহারই শ্রীহস্তে তাঁহার প্রসাদ পাইতেছি এই ধ্যানে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। আমার সমস্ত বাহ্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইল। অনুভব একমাত্র স্পর্শ সুখেই নিবিষ্ট হইল। কি যে এক অব্যক্ত আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই অবস্থা আমার অধিক সময় রহিল না। কুসুমের অসাধারণ ধ্যান প্রভাবে আমাকে দেহ হইতে আল্গা করিয়া দিল। আমি দেখিতে লাগিলাম, কুসুমের ক্রোড়ে ঠাকুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন, কুসুম তাঁহার মুখে খিচুড়ি তুলিয়া দিতেছে, ঠাকুর আনন্দ করিয়া তাহা ভোজন করিতেছেন। আহারের সময়ে ঠাকুরের শ্রীমুখের শোভা দেখিতে দেখিতে আমি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলাম। বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইল। প্রায় ঘণ্টাধিক সময় এইভাবে অতিবাহিত হইল। পরে ভাবাবেশে কুঞ্জের 'জয় গুরু, জয় গুরু' চীৎকারে আমার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন কুসুমও আমাকে ছাড়িয়া দিল; কিন্তু তখনই আবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। আমি উঠিয়া ঘরের মেঝেতে কতক্ষণ পড়িয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম একি হইল, একি দেখিলাম। কুঞ্জ হাপুস হুপুস কাঁদিতেছে—কুসুম সমাধিস্থ। খিচুড়ির দিকে অনুসন্ধান নিয়া দেখি, উহা প্রায নিঃশেষে হইয়াছে। দু'এক মুঠো মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার মত ৫/৭ জনার পুরা খোরাক অনায়াসে আমার উদরস্থ হইয়াছে। কিন্তু ৪/৫ গ্রাস খাইয়াছি মাত্র আমার মনে আছে। অবশিষ্ট প্রসাদ যে পাইয়াছি, তাহা আমার একেবারে মনে হইতেছে না। অপরিমিত ভোজনে আমার কোন ক্লেশ নাই—

উদ্বেগ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায়ই রহিয়াছি। কুসুমের সমাধি রাত্রি প্রায় ৩টার সময়ে ভঙ্গ হইল। জয় দয়াল গুরুদেব! তোমার এই অসাধারণ কৃপার কথা যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত অন্তরে জাগরুক থাকে। এই প্রার্থনা!

গুরুভ্রাতা ব্রজমোহন।

গতকল্য চা পানের পর আসনে বসিয়া আছি, একটি ভদ্রলোক আসিয়া করযোড়ে ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। পরিধানে তাঁহার মলিন জীর্ণ বসন, চেহারা শীর্ণ হইলেও তেজঃপুঞ্জ, মুখশ্রী কাঙ্গালের মত। পুনঃপুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করায়ও তিনি ঘরে আসিয়া বসিলেন না। তখন তাঁহাকে হাতে ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তিনি বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভাব প্রবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি নিজকে সম্বরণ করিতে না পারায় মেজেতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন এবং 'জয়গুরু', 'জয়গুরু' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কুঞ্জও তখন ভাবাবেশে বেহুঁস হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে উঁহাদের সংজ্ঞালাভ হইলে ভদ্রলোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। জানিলাম—ইনিই সেই ব্যক্তি। যাঁহাকে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া অবস্থান কালে একদিন গভীর রাত্রিতে এই বানরিপাড়ায় প্রকাশিত হইয়া দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। ঘটনাটি পরিষ্কাররূপে জানিতে কৌতূহল হওয়ায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোকটি বলিলেন—'আমি বড় গরীব, পুরোহিতের কাজ করি। সব দিন পেটভরা আহারও জোটে না। ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হইল। বানরিপাড়া হইতে গেণ্ডারিয়া যাওয়ার আমার ক্ষমতা নাই, তাই ঠাকুরকে কাতরভাবে জানাইলাম। পরে একদিন রাত্রে ঠাকুর আসিয়া আমাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমি যেমন পাপী, ঠাকুরও তেমনই দয়াল। তাই তাঁর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।' পুরোহিত ঠাকুরের নাম শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী। কুঞ্জের নিকট ইঁহার সম্বন্ধে যেমন শুনিয়াছিলাম ইনিও ঠিক সেই প্রকারই বলিলেন।

ঠাকুরের যোগৈশ্বর্য্য।

এই কথা শুনিয়া গত বৎসরের ঠাকুরের একটি অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের কথা মনে হইল। একদিন গেণ্ডারিয়ায় আমি নিত্যহোম সমাপনান্তে বেলা ৮টার সময়ে আসনে বসিয়া আছি; শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় আসিয়া বলিলেন—ব্রহ্মচারী মশায়! এখন কি আপনার বল্‌বার অবসর হবে? আমি বলিলাম—'কি বল্‌বো বলুন।'

বক্সী মহাশয়—কা'ল যে আপনাকে ঠাকুর বলিলেন?

আমি—'ঠাকুর কখন কি বলেছিলেন আমার মনে নাই।'

বক্সী—'গত রাত্রে ১০টার সময়ে ঠাকুর যখন আপনাকে লইয়া আমার বাড়ী গিয়াছিলেন, তখন আপনাকে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, এই ব্রহ্মচারীর নিকটে কাল গিয়ে তুমি সন্ধ্যামন্ত্র

প্রণালী এবং গায়ত্রী ন্যাসাদি শিখে নিও, আর প্রত্যহ সন্ধ্যা ক'রো।' বক্সী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং ভিতরের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—আচ্ছা চলুন, ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া নেই। এই বলিয়া বক্সী মহাশয়কে লইয়া পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর চা সেবার পরে নিমীলিত নয়নে স্থির হইয়া আসনে বসিয়াছিলেন, বক্সী মহাশয়কে লইয়া দরজায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই ঠাকুর চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচারী! বক্সী মহাশয়কে সন্ধ্যা গায়ত্রী—তাহার নিয়ম প্রণালী সমস্ত বলিয়া দেও।"

আমি আর কিছু না বলিয়া বক্সী মহাশয়কে লইয়া আসিলাম এবং সমস্ত সন্ধ্যাদির মন্ত্র পদ্ধতি বলিয়া দিলাম। অবাক্ কাণ্ড! এই ঘটনাটিতে আমার প্রাণ তোলপাড় করিয়া তুলিল। একই ব্যাক্তি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রচার কার্য্য করেন, ইহা সাধু মহাত্মা পুরুষদের যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা কোন কালে সম্ভব হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাই নাই। একমাত্র ভগবানই এই প্রকার লীলা করিয়াছেন। ঠাকুরকে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে ঠাকুরের ভগবত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার উত্তরে ঠাকুর সলজ্জভাবে আমতা আমতা করিতে থাকেন, কখন বা নির্ব্বাক—চুপ থাকেন। ঠাকুরের ঐ সময়ের ভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। তাই এই সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন কবি নাই। বক্সী মহাশয়ের নিকটে ঠাকুর যখন গিয়াছিলেন তখন রাত্রি ১০টা। ঐ সময়ে কীর্ত্তনান্তে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নিজ আসনে বসিয়া ঠাকুর হাসি গল্প করিতেছিলেন। আর আমি তখন নিদ্রিত। ঠাকুর দেহটিকে সমাধিস্থ রাখিয়া যথায় তথায় বিচরণ করেন, এই প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে বহুস্থলে পাইয়াছি। কিন্তু নিজে স্থূল দেহে প্রকাশিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপ পরিগ্রহ বা প্রকট করিলেন কি প্রকারে তাহা তো কিছুই বুঝিতেছি না। কোন কোন স্থলে ভগবানের লীলা অপেক্ষাও ভক্তের লীলা অধিকতর অদ্ভুত দেখা যায়। কিন্তু এই প্রকার লীলা একমাত্র ভগবানেরই একচেটিয়া শুনিয়াছি। ঠাকুর! তোমার যে সকল লীলা শ্রদ্ধার সহিত শুধু দর্শন করিলেই কৃতার্থ হইয়া যাই, তাহার অনর্থক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি আমার যেন না হয়।

বানরিপাড়ায় অবস্থান।

বানরিপাড়া আসিয়া গুরুভ্রাতাদের আদর-যত্ন, ভালবাসায়, সময় বড়ই আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরুভ্রাতা সকলে একত্র হইয়া সঙ্কীর্ত্তনোৎসব করিয়া থাকেন। এই সংকীর্ত্তনে অনেকেরই অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই একের প্রতি অন্যের সদ্ভাব সহানুভূতি দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। শুনিলাম, গ্রামের প্রবল প্রতাপ জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ঘোষ মহাশয় গুরুভ্রাতাদের অত্যন্ত বিরোধী। যে কোন প্রকারে তিনি গুরুভ্রাতাদের জব্দে রাখিতে চেষ্টা করেন। গোঁসাইয়ের শিষ্যদের প্রতি তিনি অতিশয় বিরক্ত। গুরুভ্রাতাদের

মুখে এসকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা জন্মিল। অপরাহ্নে ভিক্ষা করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখা মাত্র, সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া খুব সমাদরে আহ্বান করিলেন এবং উচ্চ আসনে বসাইয়া পদধূলি নিতে হাত বাড়াইলেন। আমি করযোড়ে নমস্কার করিয়া পা দু'টি গুটাইয়া নিলাম। তিনি একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আপনি চরণধূলি নিতে বাধা দিচ্ছেন কেন? উহা যে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি, বাপ পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ ইহা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কোন কালে আপনারা বাধা দেন নাই—আজ আমাকে বাধা দিবেন?' এই প্রকার অনেক বলিয়া তিনি পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আমার আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায়, ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ভিক্ষা চান বলুন?' তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন কতকগুলি টাকাকড়ি চাইব এবং তাহাই তিনি দিবেন। আমি হবিষ্যের জন্য ভিক্ষা চাহিতেছি জানিয়া গৃহের উৎকৃষ্ট তরকারী, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। তাহা হইতে আমার পরিমাণ মত চাউল ও একটি মাত্র আলু, কিঞ্চিৎ ঘৃত, নুন গ্রহণ করিতে দেখিয়া অবাক্ হইলেন—আমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিল। শ্রীনারায়ণবাবু বলিলেন—'দেখুন এই গ্রামে অনেকগুলি লোক গোঁসাইয়ের শিষ্য হয়েছে, তাহারা বড়ই একগুঁয়ে। সামাজিক আচার কিছু তারা মানে না। যাহা তাহাদের ইচ্ছা দলবদ্ধ হ'য়ে তাহাই করে। জাতি বিচার করে না। কারো শাসন মানে না—আমাকে তো গ্রাহ্যই করে না। এই জন্য উহাদের উপর আমার সদ্ভাব নাই। আমি বলিলাম—'শুনিয়াছি আপনি এই গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। প্রভাবশালীরা অত্যাচারী হ'লে আশে পাশে লোক বাঁচিতে পারে না। শক্তি যাহার অধিক ধৈর্য্যও তাহার অসাধারণ। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, এদের আচার ব্যবহার দেখে ঠাণ্ডা হবেন। গোঁসাই তো কারোকে সমাজ নীতি, কুলপ্রথা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে বলেন না!' শ্রীনারায়ণবাবু আমার কথায় খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—'গোঁসাই মহাপুরুষ। তিনি কি কখনও যা তা বলিতে পারেন? দেখুন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা,—তাহাকে উহারা সমাজে তুলিতে চায়। বেশ তো—ভাল কথা, সামাজিক প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তুলুক—কারো কোন আপত্তি হবে না। কিন্তু উহারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়াই সমাজে তুলিতে জেদ করিতেছে। গোঁসাই কিন্তু 'তার' করিয়া জানাইয়াছেন—"Do pryaschitta as Samaj asks", (সমাজ যেমন চায় সেইভাবে প্রায়শ্চিত্ত কর)। তিনি মহাপুরুষ, তাঁর কথা কি অন্যায় হ'তে পারে। কিন্তু দেখুন, গোঁসাইয়ের ঐরূপ আদেশ সত্ত্বেও, এ ব্যাটারা প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া সমাজে তুলিবে, জেদ করিতেছে। এ জন্য সমাজের কারো সঙ্গে ওদের সদ্ভাব নাই। বহুলোক এক দলে হ'লেও তারা যদি সামাজিক প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া চলে কে তাহা সহ্য করিবে? শ্রীনারায়ণবাবুর কথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল। আমি আসিবার সময়ে তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পদধূলি গ্রহণ করিলেন। গুরুভ্রাতারা ভাবিয়াছিলেন আমাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবেন। বাবু খুব সদ্ভাবে মিশিয়াছেন শুনিয়া গুরুভ্রাতারা সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন।

১৪/১৫ দিন হইল বানরিপাড়া আসিয়াছি। কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে বড়ই আনন্দে এই দুই সপ্তাহ কাল কাটাইলাম। কুসুমের অবস্থা অদ্ভুত ও অলৌকিক। উহার একটির ভিতরেও আমার প্রবেশ অধিকার নাই। শুধু দেখিলাম, আর বিস্মিত হইতে লাগিলাম। কত চেষ্টা, যত্ন; নাম, ধ্যান, উপাসনা করিয়া সমাধি অবস্থা লাভ হয়; কুসুমের সেই সব কিছুই করিতে হয় না। ঠাকুরকে স্মরণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া আসনে বসা মাত্র পলকের মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়ে। স্থানাস্থান কালাকাল কোন অপেক্ষা নাই। এই প্রকার সহজ সমাধি কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। দুই সপ্তাহকাল দিবারাত্রি কুঞ্জ কুসুমের সঙ্গে নিয়ত বাস করিয়া তাহাদের যে সুন্দর অবস্থা দর্শন করিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই—উহা স্মরণের ও ধ্যানের বিষয়। সুস্পষ্টভাবে কুসুমের অসাধারণ অবস্থা ডায়েরীতে লিখা থাকিলেও তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমি সাহস পাইলাম না। 'প্রত্যক্ষ বিষয়ও প্রমাণ করিতে না পারিলে সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না' আমার প্রতি ঠাকুরের এই অনুশাসন। জয় দয়াল ঠাকুর! ভক্ত লইয়া তোমার লীলাখেলা—যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা স্মরণে রাখিয়া যেন এ জীবন শেষ করিতে পারি।

আজ কুঞ্জের মুখে শুনিলাম, ঠাকুর বহু গুরুভ্রাতা ভগ্নীদের লইয়া প্রয়াগ চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ঠাকুরের নিকট যাইব স্থির করিয়া কুঞ্জকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কলিকাতায় অভয়বাবুর বাড়ী উঠিলাম। সকল গুরুভ্রাতাদের নিকটে আমার কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলাম। ছোড়দাদাও কুম্ভমেলায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কয়েকটি টাকা ভিক্ষা করিয়া প্রয়াগ যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ছোড়দাদারও ভাড়া সংগ্রহ হইল। আমাদের সঙ্গে কুঞ্জ এবং অশ্বিনী বৈরাগী যাইতে প্রস্তুত হইল। আমরা যথাসময়ে হাওড়া পঁহুছিয়া প্রয়াগ যাত্রা করিলাম।

প্রয়াগে উপস্থিতি। আপদে গোঁসাইয়ের ডাক।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। আপন আপন জিনিষপত্র লইয়া আমরা ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। কুঞ্জ ও অশ্বিনী তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল এবং ছোড়দাদাকে ও আমাকে শীঘ্র গাড়ীতে উঠিতে তাড়া দিতে লাগিল। আমি ও ছোড়দাদা উঠিয়া পড়িলাম। কোচম্যান জিজ্ঞাসা করিল—'বাবু, গাড়ী কোথায় নিব?' ধর্ম্মশালায় না অন্য কোন স্থানে?' কুঞ্জ তখন অশ্বিনীকে বলিল—'বল্ না গাড়ী কোথায় যাবে; গোঁসাই কোথায় আছেন?' অশ্বিনী বলিল—'তুই বল্ না।' কুঞ্জ বলিল—'তুই বল্না। 'তুই বল্না—তুই বল্না বলিয়া উহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। আমি বেগতিক বুঝিয়া একটি কথাও না বলিয়া ঝোলা ও আসন লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। উহারা আমাকে বলিল,—নেবে যাচ্ছিস্ যে? গোঁসাই কোথায় আছেন বল্?' আমি ধীরে ধীরে—'গোঁসাই সর্ব্বত্র' বলিয়া সরিয়া পড়িলাম এবং একটি গাছের তলায় আসন করিলাম। গাড়োয়ান খুব বিরক্ত হইয়া উহাদিগকে বলিল—'বাবুরা তো বেশ ভদ্রলোক। এই শীতে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া গাড়ীতে

উঠিয়া ঝগড়া জুড়িলেন! নাবুন মশায়, নাবুন গাড়ী থেকে; নেমে ঝগড়া করুন, না হয় বলুন কোথায় যাব।' তখন উহারা সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। অশ্বিনী অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া বলিতে লাগিল—'শালারা সব গজমুখ্যু—গোঁসাইয়ের কাছে যাবে বলে এসেছে। অথচ তাঁর ঠিকানা জেনে আসে নাই।'

কুঞ্জ—তুইও তো এসেছিস্, তুই জেনে আসিস্ নাই কেন?

অশ্বিনী—আরে আমি যে তোর সঙ্গে এসেছি, তুই যেখানে যাবি আমিও সেখানে যা'ব। ঠিকানায় আমার প্রয়োজন কি?

কুঞ্জ—থাক্, এখন ঝগড়া থাক্; এখন কি করা যাবে তাই বল্। সয়তান তো 'গোঁসাই সর্ব্বত্র' ব'লে গাছতলায় গিয়ে আসন করেছে। ও ওতো গোঁসাইয়ের ঠিকানা জানে না। এখন উপায় কি?

অশ্বিনী—আরে উপায়ের জন্য ভাবনা কি? যা বলি তাই কর্। আপন আপন কম্বল বস্তা সকলে ঘাড়ে নে, আমার পিছনে পিছনে চল। তোদের ঠিক্ গোঁসাইয়ের নিকটে নিয়া পঁহুছাব। গোঁসাই একদিন একটা স্থানে থাক্‌লে পরদিন শহরময় রাষ্ট্র হয়, আর এতদিন তিনি এখানে আছেন কেহ তাঁকে জানে না? শহরে এমন কোন ভদ্রলোক আছে যে গোঁসাইয়ের খবর পায় নাই? যাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো সেই গোঁসাইয়ের কথা ব'লে দিবে।

কুঞ্জ—তা হ'লে তুই যা। এখন রাত্রি দশটা, এই দারুণ শীতে গোঁসাইয়ের খবর বল্‌তে ভদ্রলোকেরা রাস্তায় ঘুর্‌ছে—তুই কারোকে জিজ্ঞাসা করে আয়, তারপর আম্‌রা যাব।

অশ্বিনী—আমি একা যেতে পার্‌বো না, তুইও চল্।

কুঞ্জ—তোর তো বেশী যেতে হবে না। এখান হ'তে বের হ'লেই তোর মত কত ভদ্রলোক রাস্তায় পাবি। সারা রাতই তো তারা রাস্তায় ঘুরে।

অশ্বিনী—চুপ শালা, এবার কিল খেয়ে মর্‌বি।

অশ্বিনী উহার নিকটে না থাকিয়া, আমার নিকটে আসিল, আমি বুঝলাম লক্ষণ ভাল নয়—এবার আমার রাশীতে। আমি ধীরে ধীরে আসন ঝোলাকাঁধে তুলিয়া নিলাম, এবং ছোড়দাদাকে বলিলাম,—চলুন শহরে যাই, ঠাকুরকে বেশী খুঁজতে হবে না, তিনিও আমাদের খুঁজ্‌ছেন। ছোড়দাদা আমার সঙ্গে চলিলেন দেখিয়া, কুঞ্জ অশ্বিনীও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পৌষের বিষম শীতে অচেনা পথে, ঘাড়ে বোঝা লইয়া চলিতে লাগিলাম। কোথায় যাইব কিছুই ঠিক নাই; রাস্তাও অন্ধকার। শীতে শরীর অবশ ও পরিশ্রমে শরীর কাতর হইয়া পড়িল। বড় বড় রাস্তায় ও গলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলেই খুব হয়রাণ হইলাম। অশ্বিনী পশ্চাতে পড়িয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল,—'আরে, আরে কত ঘুরাবি? আমি যে আর পারি না।' আমি বলিলাম—'আর ঘুরাব না, এখন সোজা আমার পিছনে পিছনে চল্। তুই তো আমাদের সকলের চেয়ে মর্দ্দ! আমাদের মধ্যে আমার মত দুর্ব্বল তো কেহ নাই, আমার বোঝাটা তোর ঘাড়ে নিয়ে আমাকে

একটু সাহায্য কর্ না।' অশ্বিনী বলিল—দাঁড়া এবার তোকে আস মিটিয়ে সাহায্য কর্‌বো। তোকে যে নাগাল পাই না- তাই তোর রক্ষা। এইভাবে কোন্দল-আলাপে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাস্তবিকই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে একটি বড় রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি শব্দ কাণে আসিল,—"ব্রহ্মচারী, আমি যে এখানে, এসো"। শব্দটি ঠাকুরের শব্দ বুঝিয়া আমরা সকলেই থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের দক্ষিণ পাশের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন বুঝিলাম। ভিতর হ'তে একজন গুরুভাই দরজা খুলিয়া দিল, দেখিলাম ঘরে গোঁসাই। আমরা রোয়াকে জিনিষ পত্র রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরের ঘরে অনেকগুলি গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন দেখিলাম। তাঁহারা আমাদের আসন, ঝোলা প্রভৃতি ঘরে নিয়া গেলেন। ঠাকুরকে দর্শন কবিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আহারান্তে ঠাকুরের ঘরে সুখে নিদ্রা হইল। জয় গুরুদেব!

চড়ায় কুম্ভমেলার স্থান দর্শন।

শেষ রাত্রে ঠাকুর করতাল বাজাইয়া ভোর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমরা সকলে আসনে উঠিয়া বসিলাম। ঠাকুরের কীর্ত্তন হইয়া গেলে, আমি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। স্নানের পর বাসায় আসিয়া সকলের সঙ্গে চা পান করিলাম। তৎপরে ঠাকুরের ঘরে যাইতেই ঠাকুর আমাকে আসন করিতে বলিলেন। ঘরের এক কোণে ঠাকুরের আসন। আমি কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অন্য দিকে আসন করিলাম। অন্যান্য স্থানে যেমন ঠাকুর ২৪ ঘণ্টা একটা রুটিং মত চলেন, এখানেও দেখিলাম ঠাকুরের সমস্ত কাজই সেই মত চলিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়খানা গ্রন্থ পাঠ হইলে পর ঠাকুর গ্রন্থসাহেব, ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠ করিতে লাগিলেন। এগারটার পর ঠাকুর শৌচে গেলেন। গুরুভ্রাতারাও সকলে মিলিত হইয়া স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা হাসিগল্পে আনন্দ করিতে লাগিলেন।

শুনিলাম ঠাকুর ১০/১২ দিন হয়, দিদিমা, শান্তি, কুতুবুড়ী, যোগজীবন, জগবন্ধুবাবু, মহেন্দ্রবাবু, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, শ্রীধর ও বিধু ঘোষ প্রভৃতিকে লইয়া প্রয়াগধামে আসিয়াছেন। আসিবার সময়ে রাস্তায় শোনপুরে হরিহরছত্রের মেলা দেখিতে বাঁকিপুরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঘোড়া, গরু, উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত অসংখ্য পশু বিক্রয়ার্থে এই মেলায় আনীত হয়। নানা সম্প্রদায়ের সাধু সজ্জন ধর্ম্মার্থিগণও এই মেলায় সমবেত হইয়া থাকেন। 'বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যাতে' এই প্রকার বৃহৎ মেলা আর কোথাও হয়, শুনা যায় না। দীর্ঘকালব্যাপী এই মেলায় নানাবিধ বস্তু বিক্রয়ার্থে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। ঠাকুর এই মেলা দেখিয়া এলাহাবাদে আসিয়া সাগঞ্জে একখানা বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বাড়ীতে ৬/৭ খানা ঘর। বড় রাস্তার উপরে একখানা মাত্র হলরুম, তাহাতে ঠাকুর আসন করিয়াছেন। ভিতর বাড়ী চক্‌মিলান—তাহাতে প্রায় ৩০/৪০ জন গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন। উপরে দু'খানা ঘর আছে, তাহাতে মেয়েরা থাকেন। এ পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে স্থানের কোন প্রকার অসংকুলান হয়

নাই। প্রয়াগে আসিয়া ঠাকুর কুম্ভমেলায় আসিতে অনেক গুরুভ্রাতাকে চিঠি দিয়াছেন। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক গুরুভ্রাতারা আসিয়াছেন।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। কমণ্ডলুটি আমাকে লইতে বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন। আমি কমণ্ডলু হাতে লইয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। গুরুভ্রাতারাও, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা অনেক রাস্তা হাঁটিয়া ঠাকুরের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটি ত্রিবেণী। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এইস্থানে মিলিত হইয়াছেন। প্রয়াগে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী এবং যমুনা পূর্ব্ববাহিনী। শুভ্রবর্ণা গঙ্গা ও নীল যমুনার মিলনস্থান একটি পরিষ্কার রেখার মত দেখায়। সরস্বতী অন্তঃসলিলা। স্থানটি বড়ই মনোরম। এই দুই স্রোতস্বতীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ দুর্গ। এই দুর্গের ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের অক্ষয়কীর্ত্তি, 'অক্ষয়-বট' আজও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এখানে পুরাকালে ঋষিবর ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রম ছিল। এই আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত বনগমনকালে কিছু সময় অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সমস্ত মুনি ঋষিগণ এই আশ্রমে সমবেত হইয়া কল্পবাস ও ত্রিবেণীতে স্নান করিতেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য অসাধারণ বলিয়া ঋষিগণ প্রয়াগধামকে তীর্থরাজ বলিযা গিয়াছেন।

ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগা।	তাঁহা হোয় মুনি ঋষয় সমাজা।
জিনহি রামপদ অতি অনুরাগী।।	জঁহি জে মজ্জন তীরথ রাজা।।
তাপস শম দম দয়া নিধানা।	মজ্জহি প্রাত সমেত উছাহা।
পরমারথ পথ পবম সুজানা।।	কহহি পরস্পব হরিগুণ গাহা।।
মাঘ মকরগত ববি যব হোই।	ব্রহ্মনিরূপণ ধর্ম্মবিধি বর্ণহি তত্ত্ববিভাগ।
তীরথ পতিহি আর সব কোই।।	কহহি ভক্তি ভগবন্তকী সংযুতজ্ঞানবিরাগ।।
দেব দনুজ কিন্নর নরশ্রেণী।	ইহি প্রকার ভরি মকর নহাহি।
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী।।	পুনি সব নিজ আশ্রম যাহি।।
পূজহি মাধব পদ জল জাতা।	প্রতি সংবত অস হোয় অনন্দা।
পরশি অক্ষয় বট হর্ষিত গাতা।।	মকর মজ্জ গবনহি মুনি বৃন্দা।।
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।	শ্রীমৎ তুলসীদাস কৃত রামায়ণ,
পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন।।	বালকাণ্ড।

গঙ্গার অপর পারে বহু বিস্তৃত চড়ার উপরে কুম্ভমেলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেল্লার অনতিদূরে সরকার বাহাদুর একটি সুদৃঢ় নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া সাধারণের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সেতু পার হইয়া চড়ায় উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাজল হইতে চড়াটি ৬/৭ ফুট উঁচুতে; সমতল জমাট বালি ৫/৬ মাইল বিস্তৃত, ধুধু করিতেছে।

ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী, উদাসী মহান্তেরা আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন মত স্থান লইয়া তাহা বেড়া দ্বারা বেষ্টন করিয়া নিয়াছেন। এক মাইলের অধিক স্থানও কোন কোন সম্প্রদায় নিজেদের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে সন্ন্যাসীদের, পরে নানকসাহী উদাসী প্রভৃতির, তৎপরে বৈষ্ণবগণের স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনির্দ্দিষ্ট স্থানও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ সাধু সজ্জন ধর্ম্মার্থিগণ ছাতা খাটাইয়া থাকিবেন। কাহারাও বা অনাবৃত আকাশের নীচে ধুনিমাত্র রাখিয়া দারুণ মাঘের শীতে দিনরাত্রি অতিবাহিত করিবেন শুনিতেছি। প্রতি বৎসর প্রয়াগে গঙ্গাতীরে কল্পবাস করিবার জন্য সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহস্থ এইস্থানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত মাঘ মাস গঙ্গার ধারে থাকিয়া, প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও দিবসব্যাপী ভজন-সাধন করিয়া থাকেন। এবার মেলার দরুণ সাধুদের সংখ্যাই এত অধিক যে, চড়ায় গৃহস্থদের স্থান সংকুলানের সম্ভাবনা কম। এইজন্য অনেক সাধু প্রয়াগের পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে ও গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ঝুঁসি এবং এলাহাবাদ হইতে মেলার চড়ায় যাতায়াতের জন্য গঙ্গা যমুনার উপর দুইটি বড় পোল প্রস্তুত হইয়াছে।

এই মেলাতে যিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান নেতা, তিনিও সমস্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের থাকিবার জন্য অনেকগুলি স্থান নিয়াছেন। আমরাও তাঁহার নিকট হইতে এক বিঘা জমি লইয়াছি। ঠাকুর সেই স্থানটি দেখিবার জন্য চলিলেন। আমরা প্রায় ১৫/২০ মিনিট চলিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জলের জন্য একটি কূপ খনন করা হইতেছে ৮/১০ ফিট খুড়িতেই ২/৩ ফিট পরিষ্কার জল উঠিয়াছে। ঠাকুর অনেকক্ষণ ঐস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং আমাদেরই জমির একধারে লোহার কড়া মাথায় দিয়া একটি লোক কাত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন—**"আহা কি চমৎকার। মস্তক হ'তে শুভ্র জ্যোতি চারদিকে ছড়ায়ে পড়েছে। অসাধারণ মহাপুরুষ।"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া লোকটির দিকে তাকাইয়া দেখি, নেংটী-পরা কালবর্ণ দৃঢ়কায় একটি লোক বালির উপরে পড়িয়া ঠাকুরের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিতেছে। ঠাকুরের কথা শুনিয়াও মহাপুরুষের প্রতি আমাদের লক্ষ্য পড়িল না। আমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসার দিকে রওয়ানা হইলাম। ২/১ মিনিট চলার পরই দেখি মহাপুরুষটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঠাকুরের সম্মুখে আসিলেন এবং ঠাকুরের চলার কোন অসুবিধা না করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে চলিলেন। নানাপ্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া, দুই হস্ত দ্বারা ঠাকুরকে আরতি করিতে করিতে 'আহা আহা' শব্দে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিকে দৌড়িয়া অদৃশ্য হইলেন। ঠাকুর উঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমরা গঙ্গার তীরে তীরে পোলের নিকটে আসিলাম। ঠাকুর বলিলেন—**"কাল যখন চড়ায় বেড়াই, ব্রহ্মচারী ও সারদাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লাম; তখনই মনে হ'লো, এসে পড়্‌লো।"** সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা বাসায় পঁহুছিলাম। সংকীর্ত্তনানন্দে রাত্রি ৯টা কাটিল, তৎপরে সকলের আহার ও বিশ্রাম।

বেণীমাধব ও আর আর বিগ্রহ দর্শন। ঠাকুরের দান।

আজ ঠাকুর চা সেবার পর গ্রন্থাদি নমস্কার করিয়া বেণীমাধব দর্শন করিতে বাহির হইলেন। কমণ্ডলুটি হাতে লইয়া গুরুভ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইল। রাস্তার দুই পার্শ্বে কাঙ্গালী ও সাধুরা পয়সা চাহিতে লাগিল। ঠাকুর সকলকেই ২/৪ পয়সা করিয়া দিতে দিতে তামাসা করিয়া বলিলেন—**'আজ তো হাম বড়া দাতা বন্ গিয়া। দো পয়সা চার পয়সা দেনে লাগা।'** ইহা শুনিয়া যাহার যাহা হাতে ছিল ঠাকুরকে দিতে লাগিল। ঠাকুর তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া সকলে স্নান করিলাম। ঠাকুর বেণীমাধব দর্শন করিতে চলিলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বেণীমাধবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। এক টাকার বাতাসা আনাইয়া বেণীমাধবকে ভোগ দিলেন এবং বলিলেন—**"এই স্থানে মহাপ্রভু কিছুদিন ছিলেন।"** মন্দির হইতে বাহির হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাট দেখাইয়া বলিলেন—**"এই স্থানে মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে দশ দিন ধ'রে শিক্ষা দিয়েছিলেন।"** কিছু অধিক বেলায় আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় পঁহুছিলাম।

কথায় কথায় ঠাকুর বলিলেন—**"অনেক তো ঘুর্‌লাম, কিন্তু তেমন একটি সাধু দেখ্‌তে পেলাম না। সাধু বল্‌তে বেণীমাধবকেই দেখ্‌লাম, তাই তাঁকে কিছু দিয়া আস্‌লাম।"**

ঠাকুর এই কথা কেন বলিলেন, জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন—**"বেণীমাধব সাধুর বেশে এসে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন।"**

ঠাকুরের নানা দেবালয় দর্শন।

আজও ঠাকুর ৩ টার সময়ে আসন হইতে উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও সকলেই ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঠাকুরের পায়ে বেদনা—অধিক দূর চলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয়ের কথামত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ ঠাকুরের জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন। ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুরের কমণ্ডলু আমার হাতে, তাই আমাকে তাঁহার গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন। মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। বিধুবাবু কোচ ম্যানের পাশে বসিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গুরুভ্রাতারা দেখিলেন—বিষম মুস্কিল, হাঁটিয়া চলিলে ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। তখন তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত যিনি যে গাড়ী পাইলেন, ভাড়া স্থির না করিয়া তিনি তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতাদের ৫ খানা গাড়ী হইল। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানাস্থানে, গঙ্গাতীরে, দেবালয়ে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আসিলেন; গুরুভ্রাতাদের গাড়ী কয়খানাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িল। গাড়ী বাড়ীর দরজায় পঁহুছানমাত্র গুরুভ্রাতারা দুপ্ দাপ্ নামিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। গাড়োয়ানরা দেড়া ভাড়া হাঁকিয়া ভাড়ার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু ঠাকুরের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি চীৎকার

শুনিয়া নিজ হইতেই গাড়োয়ানদের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। হরিদাসবাবু মাসব্যাপী মেলায় থাকিতে পারিবেন না,—তাই এই সময় ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের পর গুরুভ্রাতারা আহার সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

ল্যাংগাবাবা। গুরুভ্রাতাদের কাণ্ড।

গতকল্য ঠাকুর কথায় কথায় বলিয়াছেন যতদিন তিনি চড়ায় না যাইবেন, প্রত্যহই গঙ্গা তীরে কখনও বা মেলাস্থানে গিয়া সাধুদের দর্শন করিয়া আসিবেন। আহারান্তে গুরুভ্রাতারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ঠাকুর আর আর দিনের মত তিনটার সময়ে যেমন বাহির হইয়া পড়িলেন, গুরুভ্রাতারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যে সকল গুরুভ্রাতার টাকা পয়সা কিছুই নাই, কোনপ্রকারে মেলা দেখিতে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম খুব বেশী। তাঁহারা ঠাকুরকে পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের জন্য একখানা গাড়ী রাখিয়া ২/৩ খানা গাড়িতে চাপিয়া বসিলেন। ঠাকুর আজ আর চড়ায় গেলেন না। গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে জীর্ণ কুটীরে একটি সাধু বাস করেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সাধু ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে যেন মাতিয়া গেলেন। কতপ্রকারে ঠাকুরকে স্তব-স্তুতি, আদর-যত্ন করিয়া, নিজ কুটীরের সম্মুখে নিয়া বসাইলেন। সাধু অতি বৃদ্ধ, বয়স নব্বই বৎসর, সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন। লোকে সাধুকে ল্যাংগাবাবা বলে। হরিকথা প্রসঙ্গে তাঁহার অশ্রু কম্প হইতে লাগিল দেখিয়া, গুরুভ্রাতারা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুর বাসায় পঁহুছিলেন। গুরুভ্রাতাদের গাড়িগুলিও আসিয়া উপস্থিত হইল। গতকল্যের মত গুরুভ্রাতারা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাসবাবু ঠাকুরের ও নিজের গাড়ীভাড়া মিটাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য গাড়োয়ানরা গাড়ীভাড়ার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। তখন গুরুভ্রাতারা একে অন্যকে বলিতে লাগিল—ওরে! গাড়োয়ান ভাড়ার জন্য চীৎকার করছে, শুনতে পাচ্ছিস না? সে অমনি উত্তর করিল—'কৈ আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তুই শুনছিস্? তুই গিয়ে যা ব্যবস্থা কর্।' যাহারা ২/৪ টাকা দিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'থাম ভাই, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না' বলিয়া ঘটী হাতে লইয়া দৌড় মারিল। কেহ বা প্রস্রাব করিতে চলিল। কেহ কেহ দরজা আড়াল দিয়া ঘরের ভিতরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর অবশিষ্টগুলি তামাক সাজিয়া ঘন ঘন কলকিতে ফুঁ দিতে লাগিল। অর্থশালী গুরুভ্রাতা একমাত্র হরিদাসবাবু, তিনি বুঝিলেন গতিক ভাল নয়। গাড়োয়ানদের চীৎকারে ঠাকুর বিরক্ত হইবেন। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সমস্তগুলি গাড়ীর ভাড়া আজও চুকাইয়া দিলেন। হরিদাসবাবু প্রয়াগে আসার পরদিন হইতে ভাণ্ডারের সমস্ত খরচ দিয়া আসিতেছেন। তাহার উপরে আবার গুরুভ্রাতাদের এই কৌশলের চাপ। সুতরাং একটু বিরক্ত হইলেন এবং গুরুভ্রাতাদের কারো কারোকে বলিলেন—কল্য হইতে আর তিনি গাড়ীভাড়া দিবেন না এবং ঠাকুরকে বলিয়া গুরুভ্রাতাদের এ সব ব্যবহারের একটি প্রতিবিধান করিবেন।

সন্ধ্যার পরে আর আর দিনের মত ঠাকুরের নিকট সংকীর্ত্তন হইল। সহরের অনেক ভদ্রলোক এই সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গুরুভ্রাতাদের ভাবাবেশের অবস্থা দেখিয়া অবাক্। শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় ঠাকুরকে দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন। ঠাকুর প্রয়াগে আসার পর তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সকলের সঙ্গে মিশিতেছেন। বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপে, এস্থানে তিনি ডাক্তারি করিয়া থাকেন।

ঠাকুর কথায় কথায় ল্যাংগাবাবার কথা তুলিয়া তাঁহার ভাবভক্তি এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাত্রে জলযোগের পর ঠাকুর মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের বলিলেন—**"হরিদাস বাবুর উপরে বড়ই অত্যাচার হচ্ছে, গাড়ী ভাড়া আর তাঁর নিকট হ'তে নিবেন না।"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা বিষম উদ্বেগে পড়িলেন। কল্য কাহার নিকট হইতে অত টাকা গাড়ীভাড়া আদায় করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। সবল সুস্থ হইলেও ঠাকুর গাড়ীতে চলিলে হাঁটিয়া যাইতে যে কারো প্রবৃত্তি হয় না।

আজ সকালে আমাদের পরম আত্মীয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কানপুর হইতে আসিলেন। মন্মথদাদাকে দেখিয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলাম। ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমাদের অদৃষ্টক্রমে মন্মথদাদার দুই দিনের অধিক থাকা হইবে না, উকীল মানুষ— হাতে বড় মামলা, শীঘ্রই আবার কানপুর যাইবেন। মন্মথদাদা যে দু'তিন দিন রহিলেন, ভাণ্ডারের সমস্ত ব্যয় তিনিই বহন করিলেন। গুরুভ্রাতাদের বেড়াইবার গাড়ীভাড়াও সন্তুষ্ট চিত্তে তিনিই দিলেন। মন্মথবাবু চলিয়া যাওয়ার পর হরিদাসবাবুও বোলপুরে যাইতে ব্যস্ত হইলেন। কি প্রকারে দৈনিক খরচ চলিবে ভাবিয়া সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। গুরুভ্রাতাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তেমন অবস্থাপন্ন কেহ আসিতেছেন না। সকলেই নিঃস্ব কোন প্রকারে ধার-কর্জ্জ করিয়া মাত্র রেলভাড়াটি লইয়া আসিয়াছেন। ২/৫ জন মাত্র স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গুরুভ্রাতা আছেন, তাঁহারা আর কয়দিন দৈনিক খরচ চালাইতে পারেন?

আশ্রমে কাজের বিভাগ। ঠাকুরের ভিক্ষা ও দান। ঠাকুরের আকাশবৃত্তি।

আজ সকালে কয়েকজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি প্রভৃতি কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিতাকাঙ্খী ভদ্রলোকের সহিত মিলিত হইয়া বৈঠক করিলেন। আলোচনা হইতে লাগিল, কি প্রকারে দৈনিক খরচ চলিবে। তাঁহাদের হাতে যাহা কিছু ছিল তাহাতো নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এখন উপায় কি? ঠাকুর কুম্ভমেলায় এক মাস থাকিবেন এবং সাধু সন্তদের ভাণ্ডারা দিবেন। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন এই মহৎকার্য্যে পাঠাইতে পারেন এই মর্ম্মে গুরুভ্রাতাদের নিকট চিঠিপত্র অনেকদিন হয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেহই তো কিছু পাঠাইতেছেন না। এখন প্রতিদিন মাসাধিক কাল এই বিপুল খরচ কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবে? উঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠাকুর যদি দিদিমা, শান্তি, কুতুবুড়ী, যোগজীবন, জগবন্ধু এবং যাঁহারা ঠাকুরের সঙ্গে আছেন শুধু তাঁহাদের লইয়া থাকেন তাহা হইলে কোন অভাবই ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু দলে দলে

যে সকল গুরুভ্রাতা এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং দিন দিনই আসিতেছেন, তাঁহারা যদি নিজেদের ভার নিজেরা বহন না করেন, তা'হলে অবস্থা বড়ই বিষম হইবে। খাওয়ার অভাবে সকলকে পলাইতে হইবে। এ বিষয়ে পাকাপাকি একটা মীমাংসা করিবার জন্য উঁহারা ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরকে বলিলেন—'মশায়। আমরা আপনাকে একটি কাজের কথা বল্‌তে এসেছি।' ঠাকুর—**'কি কাজের কথা বলুন?'** উঁহারা বলিতে লাগিলেন—'দেখুন এখানে স্ত্রী পুরুষে প্রায় ৪০/৪৫ জন আছেন। এত দিন তো কোন প্রকারে চ'লে গেল, এখন দৈনিক খরচ চল্‌বে কিরূপে ভেবে আমরা বড়ই উদ্বেগ ভোগ কর্‌ছি। আয়ের দিক তো কিছুই নাই। অথচ খরচ প্রতিদিনই আছে। এখানে যাঁরা আছেন, এদিকে তাঁদের কারো লক্ষ্য নাই। খাবার সময়ে পাত পেতে বসেন, পেটভরে খান, আর সারাদিন বাজে গল্পে হুঁকা কলকি তামাক লইয়া ঝগড়া ক'রে সময় কাটান। সাধন ভজনও নাই—কিছুই নাই। এ সব ভ্যাগাবণ্ড (Vagabond) ক্লাশ, জোয়ান মর্দ্দ নিষ্কর্ম্মা কুড়ের দল আশ্রমের কোন কাজই কর্‌বে না—বল্‌লে ঝগড়া কর্‌বে। বিষম মুস্কিল। এরা যদি নিজেদের ভার নিজেরা নি'য়ে থাকেন, তা'হলে আর কোন অসুবিধা থাকে না।' ঠাকুর শুনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—**'আহা! এদের ওরূপ বল্‌তে নাই। এরা সকলেই ভদ্রলোক, সকলেরই ঘরে খাবার পরবার আছে—দয়া ক'রে আমার কাছে রয়েছেন। এরাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু।'** ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভিতরের বেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ অশ্রু-কম্প পুলকে অভিভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্রুপূর্ণ নয়নে কম্পিত কলেবরে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন। কারো কারো বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। অভিযোগকারী বাবুরা এদের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্‌। ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিলেন—**'আশ্রমে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সকলেরই কিছু না কিছু আশ্রম সেবার কাজ নিয়ে থাকা উচিত, না হ'লে অপরাধ হয়। আপনারা সকলেই আশ্রমের কাজ বিভাগ ক'রে নিন। তা'হলেই আর কোন অশান্তি থাক্‌বে না। আপনারা আমাকেও একটা কাজ দিন।'** ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই লজ্জায় হেঁট মস্তকে নীরব রহিলেন। ঠাকুর তখন বলিলেন—**'আচ্ছা, আমি সকলকে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াব, এই ভার আমি গ্রহণ কর্‌লাম। এখন তোমরা যার যা ইচ্ছা আমাকে ভিক্ষা দেও।'** এই বলিয়া আঁচল পাতিলেন। তখন গুরুভ্রাতাদের যাহার যাহা ছিল, ঠাকুরকে আনিয়া দিলেন। ভিক্ষায় প্রায় ১৬০/১৭০ টাকা হইল। ঠাকুর উহা নিজ আসনের নীচে রাখিয়া দিলেন। ৫/৬ দিনের মত আশ্রম-খরচ চলিবে ভাবিয়া গুরুভ্রাতারাও নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠাকুর সকলকে বলিলেন—**'আমার একটি কথা স্মরণ রাখ্‌বেন; আমার আকাশ-বৃত্তি। একদিনের জিনিষ অন্যদিনের জন্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় রাখ্‌বেন না। যে দিন যা আস্‌বে সমস্তই ব্যয় ক'রে ফেল্‌বেন।'** গুরুভ্রাতারা সকলেই ঠাকুরের কথা শুনিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের ভিতরে আশ্রমের সমস্ত কাজ বিভাগ করিয়া লইলেন। রামযাদববাবু বহুকাল এস্থানে আছে, এজন্য তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর (বি.এল.) সহিত বাজার সরকার করা হইল। জগবন্ধুবাবু এবং শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ভোগরান্নার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। মহেন্দ্র দাদা মহুরী হইলেন।

জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্যও গুরুভ্রাতারা আগ্রহের সহিত যিনি যাহা পারেন গ্রহণ করিলেন। সকলেই খুব উৎসাহের সহিত আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নিষ্কর্ম্মা গুরুভ্রাতাদের ভিতরেও একটা উৎসাহের স্রোত বহিল।

মাঘ মাসের অধিক দিন বাকী নাই। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ সাধু চড়ায় আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। গঙ্গার ধারে এপারেও অসংখ্য সাধু অনাবৃত স্থানে আসন করিয়া বসিয়াছেন কাঙ্গালী, দুঃখী দরিদ্রও বিস্তর। সহরটি লোকে পরিপূর্ণ। সারাদিন ভিক্ষুকের অভাব নাই। প্রত্যহই ভিক্ষুকের চীৎকারে অস্থির থাকিতে হয়। আজ হাতে টাকা পাইয়া ঠাকুর যে যাহা চাহিলেন, দিতে লাগিলেন। ৪/৫ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ৪০/৫০ টাকা উড়িয়া গেল। তিনটার পর ঠাকুর বাহির হইলেন। অবশিষ্ট টাকাগুলিও সঙ্গে করিয়া লইলেন। গঙ্গার তীরে পঁহুছিতেই ৪/৫ টি সাধু ঠাকুরকে দেখিয়া বলিলেন, 'স্বামীজী! দো রোজ হাম ২৫ মূরত ভুখা হ্যায়— মেহেরবাণী কিজিয়ে।' কেহ কেহ আসিয়া বলিলেন—'মহারাজজী! ধুনীকা লক্ড়ী নাহি হ্যায়। ভজন তো একদম বন্ধ হো গিয়া, আব ক্যা করে।' কেহ, 'পানি পিনেকা লোটা নেহি হ্যায় বাবা'; কেহ বা 'গাঁজা নেহি হ্যায়'; আবার একদল আসিয়া বলিল—'স্বামীজী! জারামে হাম লোক তো মর্ যাতা হ্যায়—একঠো কর্কে কম্বলি হুকুম হোয়।' প্রার্থীরা যেমন চাহিতে লাগিলেন ঠাকুরও সেই মত ১০/১৫/২০/২৫ টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্তগুলি টাকা বিতরণ করিয়া ঠাকুর বাসায় ফিরিলেন। ঠাকুরের এই প্রকার অবিচারে অর্থব্যয় সম্বন্ধে অনেকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন। কল্য কি প্রকাবে এতগুলি লোকের আহারাদি হইবে ভাবিয়া অনেকেই অশান্তিতে পড়িলেন। খাওয়াবার ভার ঠাকুর নিয়াছেন; কল্য ঠাকুর কি করিবেন এই দুশ্চিন্তায় অনেকের রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না।

আজ শেষ রাত্রে অন্যান্য দিনের মত ঠাকুর ভোর কীর্ত্তন করিয়া আসনে বসিয়া আছেন। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক ঠাকুরের সম্মুখে দরজার বাহিরে রোয়াকে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন—'স্বামীজী! কৃপা কর্কে হুকুম কিজিয়ে, সেবাকা ওয়াস্তে থোড়া কুছ হাম ভেজ দেই।' ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। কতজন লোক ঠাকুরের সঙ্গে আছি, লোকটি খবর লইয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই দু'টি ভারী প্রচুর প্রমাণে চাল, ডাল, আটা, ঘি, তৈল, চিনি, মিশ্রি, সুজি, আলু, কপি, বেগুন, শিম, শাক, লেবু, দুধ, দই, পেয়ারা, পাঁপর, রাবড়ি, সন্দেশ, ও বিবিধ প্রকার মসল্লা, তামাক, টিকে, দেশলাই, পান, সুপারী ইত্যাদি যাবতীয় সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। গুরুভ্রাতারা সকলেই দেখিয়া অবাক্, আজ বিবিধ প্রকার রান্না করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ভোজনান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন। ঠাকুর ভাণ্ডারের কর্ত্তাদের ডাকিয়া বলিলেন—'**অদ্যকার মত জিনিষ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত কাঙ্গাল দুঃখীদের বিলাইয়া দিন। আমার আকাশ-বৃত্তি। একটি জিনিষও যেন কল্যকার জন্য ভাণ্ডারে না থাকে।**' ঠাকুরের আদেশ মত তাহাই করা হইল। গুরুভ্রাতারা বৈঠক করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, ঠাকুর এ কি করিলেন, ভাণ্ডারায় যাহা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল অনায়াসে কল্যও চলিত। জিনিষপত্র দেখিয়া কল্যকার জন্য আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, ঠাকুর যে সব সারিলেন।

অপরাহ্নে ঠাকুর রামযাদববাবু প্রভৃতিকে বলিলেন—'আপনারা ২/৪ দিনের মধ্যেই চড়ায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন, আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না।' শুনিলাম চড়াতে যে স্থানটি আমাদের নেওয়া হইয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে মজবুত টাট্টি দিয়া ঘেরাও করা হইয়াছে। রান্না করিবার ঘর ও ভাণ্ডার ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। ঠাকুরের জন্য একটি পায়খানাও শীঘ্রই হইবে। এখন তাঁবুটি সংগ্রহ হইলেই চড়ায় যাওয়ার আর কোন অসুবিধা থাকে না। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যথাসাধ্য আমাদের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আর আর দিনের মত সন্ধ্যার সময়ে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গুরুভ্রাতারা ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে দর্শকগণের সমাগমে রাস্তা লোকে পরিপূর্ণ হইল। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পর ঠাকুর হরিলুট দিয়া আসনে বসিলেন। দিনটি বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। রাত্রে গুরুভ্রাতারা সকলে মাড়োয়ারী প্রদত্ত মিষ্টান্ন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। কোন কোন গুরুভ্রাতা আগামী কল্য কি প্রকারে আহারের সংস্থান হইবে, ভাবিতে লাগিলেন। আবার মর্দ্দ নিষ্কর্ম্মা গুরুভ্রাতারা বলিতে লাগিলেন, আহারাদির ভার যখন ঠাকুর নিয়াছেন তখন আর ওসব বাজে চিন্তা কেন? আমি প্রত্যহই ভাণ্ডার হইতে চাল ডাল লইয়া স্বপাক আহার করিতেছি।

ঠাকুর ভোর কীর্ত্তনান্তে আসনে বসিয়া আছেন। আজও সেই মাড়োয়ারী আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন—'স্বামীজী। মেহেরবান কর্‌কে হুকুম দেজিয়ে, আজ ভি হাম ভাণ্ডারা যো কুছ্ বনে ভেজ দেই।' ঠাকুর একটু সময় তাঁর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সম্মতি দিলেন। বেলা ৮টার মধ্যে কল্যকার মত সমস্ত জিনিষ আসিয়া পড়িল। ঠাকুরের আদেশ মত আজও প্রয়োজন মত জিনিষ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ভিখারীদের বিতরণ করা হইল। এখনকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গোবিন্দবাবু আমাদের তাঁবুর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। রামযাদববাবুর নিকট শুনিলাম, গোয়ালিয়রের মহারাজার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার দীনকর রাও বাহাদুর আমাদিগকে একটি সুবৃহৎ তাঁবু ৪/৫ দিনের মধ্যেই আনাইয়া দিবেন। ঠাকুরও চড়ায় যাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতিদিনই সাধুদের বড় বড় জমাত আসিয়া পড়িতেছে। চড়ায় নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি প্রায় লোকে পরিপূর্ণ হইল। এ পাড়েও খালি স্থান আর দেখা যায় না। কেহ কেহ ছাতা খাটাইয়া এবং অধিকাংশ সাধু ধুনি জ্বালিয়া অনাবৃত অবস্থায় গঙ্গাতীরে জলের ধারে বাস করিতেছেন।

আজও ভোর বেলা মারোয়াড়ী ভিক্ষা দিতে আগ্রহ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন—'নেহ্‌ই, সো নেহি হোগা। সাধুলোক্‌ন্‌কা এইসা রীতি নেহি হ্যায়; আজ আপ্‌সে কুছ্ নাহি লেয়েঙ্গে।' মাড়োয়ারী বলিলেন—'ঘর্‌মে হামারা গৌয়া হ্যায়—বহুত দুধ হোতা হ্যায়, হুকুম হয় তো ৫/৬ সের ভেজ দেই।' ঠাকুর তাহাতেও আপত্তি করিলেন। বেলা প্রায় ৮টা হইল। সকলেই আহারের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঠাকুরের কোন প্রকার উদ্বেগই নাই। তিনি নিশ্চিন্তভাবে আসনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে একটি সাধুর আকাঙ্খা জানাইয়া বলিলেন—'প্রভু। সাধু ভাণ্ডার দিতেছেন, তিনি দয়া করিয়া সশিষ্যে সেই আশ্রমে আপনাকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।' ঠাকুর আনন্দের সহিত সম্মতি

প্রকাশ করিলেন। মধ্যাহ্নে সাধুর আশ্রমে যাইয়া সকলেই প্রসাদ পাইলেন। সাধু ৩০ বৎসর কাল ঐ আশ্রমে আসন করিয়া ভজন সাধন করিতেছেন। আশ্রম ছাড়িয়া একদিনের জন্যও তিনি অন্যত্র যায়েন নাই। এই সাধু কি প্রকারে ঠাকুরের পরিচয় ও সন্ধান পাইলেন—জানি না। আজ ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন,—'তোমাদের তাঁবু সংগ্রহ হোক্ আর নাই হোক্ পরশু আহারের পর আমি চড়ায় গিয়া বালির উপরে আসন ক'রে ব'স্‌ব।' ঠাকুরের কথা শুনিয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতা চড়ায় কতদূর কি হইয়াছে অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁবুরও জন্যও কতকগুলি গুরুভ্রাতা গোবিন্দবাবুর নিকটে গেলেন। তাঁবু পাওয়া গেল, তাহা খাটাইবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। ছাউনীতে যাইয়া থাকার অনুষ্ঠানের আর কিছুই বাকি নাই সংবাদ আসিল। তাঁবুটি খাটান হইলেই হয়। চড়াতে যাইব মনে করিয়া গুরুভ্রাতারা খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। মেয়েদের সাধুমণ্ডলীর ভিতরে থাকার ব্যবস্থা নাই, তাঁহারা সময় সময় যাইয়া ছাউনীতে থাকিবেন এবং সন্ধ্যার সময় আবার বাসায় চলিয়া আসিবেন, ঠাকুর এই ব্যবস্থা করিলেন।

আজ গুরুভ্রাতারা চড়ায় যাইয়া দেখিয়া আসিলেন প্রকাণ্ড একটি তাঁবু খাটান হইয়াছে। ভাণ্ডার ঘর, রান্না ঘর পূর্ব্বে হইয়াছিল। ঠাকুরের জন্য একটি পায়খানাও তাঁবুর পশ্চাৎ দিকে প্রস্তুত হইয়াছে। এখন তাঁবুতে যাইয়া থাকার আর কোন অসুবিধা নাই। দারুণ মাঘের শীতে গঙ্গার চড়ায় বাবুদের মধ্যে অনেকেরই থাকা অসম্ভব। যাঁহারা একটু সুখাভ্যস্ত তাঁহারা সারাদিন চড়ায় থাকিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিবেন—এইরূপই ঠিক হইল। ৩০/৪০ জন গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে নিয়ত চড়ায় বাস করিবেন। এ পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা ৫০ জনেরও অধিক হইয়াছে। ক্রমে আরো বৃদ্ধি পাইবে। ভগবানের কৃপায় তাঁবুটি যাহা পাওয়া গিয়াছে সচ্ছন্দরূপে ৩০/৪০ জন লোক বিছানা করিয়া থাকিতে পারিবে। গুরুভ্রাতারা উৎকণ্ঠার সহিত রাত্রি প্রভাতের আকাঙ্খা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা কীর্ত্তনান্তে জলযোগ করিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

চড়ায় যাত্রা। পথে মাধোদাস বাবাজীর আশ্রম দর্শন। পরমহংসজীর আবির্ভাব ও ঠাকুরের অভ্যর্থনা। সংকীর্ত্তনে মহাভাবের তুফান।

আজ অতি প্রত্যূষে আমরা সকলে গঙ্গায় গেলাম। স্নানের পর অন্য কোথাও না যাইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। ঠাকুরের চা সেবার পর চড়ায় কখন আমাদের যাওয়া হইবে, খবর নিতে বহুলোক আসিতে লাগিল। আহার বেলা ১২টার মধ্যেই শেষ হইল। গুরুভ্রাতাদের উৎসাহ আনন্দ আজ আর শরীর-মনে ধরে না। তাঁহারা কেহ কেহ গান, কেহ কেহ বাজনা, কেহ কেহ বা নানাপ্রকার আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তিনটার সময়ে চড়ায় যাত্রা করিবেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই গুরুভ্রাতারা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যাইয়া গঙ্গার পাড়ে পোলের ধারে ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করিবেন। ঠাকুরের পায়ের বেদনা এখনও সারে নাই। আড়াইটার পরই ৫/৬ খানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া পড়িল। সকলের বিছানা কম্বলাদি সকালেই চড়ায় পাঠান হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা হাঁটিয়া যান না, ৫/৭ জন এক এক গাড়ীতে উঠিয়া

পড়িলেন। বিধু ঘোষ, মহেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আমরা ৪/৫ জন ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। গাড়ী প্রশস্ত রাজপথ দিয়া পোলের দিকে চলিল। গঙ্গাতীরে পঁহুছিবার ৩/৪ মিনিট বাকী থাকিতে ঠাকুর গাড়ী থামাইতে বলিলেন। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, ঠাকুর দক্ষিণ পাশে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই গাড়ী বিদায় করিয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া দেখি—উহা গৃহস্থ বাড়ী নয়, একটি সাধুর আশ্রম। আশ্রমটি দেওয়াল বেষ্টিত। অঙ্গনের দক্ষিণ দিকে একটি কুঠরীতে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত আছেন। বাম দিকে বড় দালান, অনেক লোক তাহাতে থাকিতে পারে। বিস্তৃত অঙ্গনের অপর দিকে ফুল ও তুলসীর সুন্দর বাগান। একটি বৃদ্ধ সাধু মহাপ্রভুর মন্দিরে ছিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিত কলেবরে করযোড়ে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সাধুর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সাধু ঠাকুরকে ধরিয়া নিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে বারান্দায় বসাইলেন এবং ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবাবেশে সাধুর শরীরে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সাধুর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, ঠাকুরও সমাধিস্থ। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল; সাধুও চৈতন্যলাভ করিলেন। সাধু ঠাকুরকে বলিলেন—"আপনি যে এখানে আসিবেন, প্রভু সে খবর আমাকে সকালেই দিয়াছেন। পূজার সময়ে তিনি বলিলেন—'আজ বিজয় আমাকে দেখ্‌তে আসবে—তার জন্য প্রসাদ রেখে দিস্‌।' আমি আপনার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ রেখেছি।" ঠাকুর উহা চাহিলেন। উৎকৃষ্ট লাড্ডু, মালপোয়া প্রভৃতি প্রসাদ সাধু ঠাকুরকে আনিয়া দিলেন। ঠাকুর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া গুরুভ্রাতাদের উহা দিয়া দিলেন। প্রসাদের স্বাদ ও গন্ধ বড়ই তৃপ্তিকর। উহা পাইয়া সকলেরই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠাকুর তখন চড়ায় যাইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাবাজীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"এখন আমরা চড়ায় যেতেছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।' তিনি কহিলেন—'বীজ তুমি বুনিযাছ, গাছ হউক—ফুল ফল হউক, তুমি তাহা ভোগ কর, আমার আপত্তি কি!' অতঃপর ঠাকুর ধীরে ধীরে হাঁটিয়া পোলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

গুরুভ্রাতারা সকলেই ঠাকুরের জন্য পোলের ধারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর যখন পোলের উপর দিয়া চড়ার দিকে চলিলেন, বহু গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অসংখ্য সহরবাসী ভদ্রলোক ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ঠাকুর পোল ও চড়ার সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে বেষ্টন পূর্ব্বক অনিমেষে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর করযোড়ে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে চড়ার দিকে চাহিয়া চঞ্চলদৃষ্টিতে কি যেন দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আদেশে অমনি খোল করতাল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঠাকুরের মুখমণ্ডল রক্তিমাভ ও স্ফীত হইয়া উঠিল। লম্বিত জটাভার ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময়ে আচম্বিতে শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি মুণ্ডিতমস্তক এক মহাপুরুষ বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া আসিয়া 'আও মেরা প্রাণ', 'আও মেরা প্রাণ' বলিতে বলিতে ঠাকুরকে বাহুদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক জড়াইয়া ধরিলেন।

তখনই ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদসঞ্চারে গুরুভ্রাতাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান গুরুভ্রাতারা অনেকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন। আমার এক হস্তে ঠাকুরের দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু, সুতরাং পাদস্পর্শে প্রবৃত্তি হইল না। মহাপুরুষ আমারও মস্তকে হাত বুলাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন। মহাপুরুষের করস্পর্শে গুরুভ্রাতারা মাতিয়া উঠিলেন; অমনি তাঁহারা গান ধরিলেন—

'নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম নামব্রহ্ম বল ভাই।
হরি নাম বিনা জীবের আর গতি নাই '

গানের সঙ্গে সঙ্গে গুরুভ্রাতারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চড়ায় উপস্থিত হইলেন। শ্রবণ-মঙ্গল সংকীর্ত্তন রব বাদ্যধ্বনিতে মিলিত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহাভাবের তুফানে পড়িয়া সকলে দিশাহারা হইলেন। বিধু ঘোষ মল্লবেশে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইলেন এবং এক একবার ফিরিযা ঠাকুরকে দেখিয়া স্পর্দ্ধার সহিত ঘন ঘন বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। শ্রীধর মধুর নৃত্য করিতে করিতে 'জয় নিতাই', 'জয় নিতাই' বলিয়া কম্বল বহির্ব্বাস উড়াইয়া চলিলেন। ভাবাবেশে বিভোর হইয়া গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের দক্ষিণে বামে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী বাবুভায়ারা ভাব-তুফানের ঝাপ্টায় পড়িয়া স্খলিতপদে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুর ভাবোন্মত্ত অবস্থায় দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে ছুটাছুটি কবিয়া দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। আসনধারী ধ্যাননিষ্ঠ ভজনানন্দী সাধুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দৌড়িয়া সংকীর্ত্তন স্থলে আসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের মনোমোহন রূপ দর্শনে তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্লাবনে তৃণগুচ্ছের ন্যায় প্রবল ভাবস্রোতে হাবুডুবু খাইয়া সকলে ভাসিয়া চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখি গৌরবর্ণ উজ্জ্বলমূর্ত্তি স্থূল কলেবর একটি মহাপুরুষ, ঠাকুরের দিকে সজলনয়নে তাকাইয়া আছেন। মহাপুরুষের পুণ্যদ্যুতিপুলকিত অঙ্গ থর থর কম্পিত হইতেছে। বাধাপ্রাপ্ত জলস্রোতের ন্যায় ঠাকুর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আনন্দ কোলাহলের হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড় ঠেলিয়া আমরা ছাউনী সমীপে উপস্থিত হইলাম। ছাউনীতে প্রবেশ করিয়াও কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন হইল। তাঁবুর সম্মুখে ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সাধুরা সকলে স্ব স্ব আসনে চলিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতারা যিনি যেখানে হয়, ভূমিতে পড়িয়া অভিভূত হইয়া রহিলেন। ছাউনীস্থল নীরব নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়া ভাণ্ডারঘর, রসুইঘর দেখিলেন। পরে কূয়া ও ছাউনীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। তাঁবুটি খোলামেলা, দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া, খাটান হইয়াছে। তাঁবুর ভিতরে যাইয়া দেখি পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া তাহার উপরে চাটাই পাতিয়া রাখিয়াছে। ঠাকুর উত্তরদিকে ধার ঘেঁসিয়া তাঁহার আসন করিতে বলিলেন। আমাদের আসন— বিছানার সহিত সংশ্রব না থাকে এমনভাবে ঠাকুরের আসন পাতা হইল। সম্মুখে একটি ধুনির কুণ্ড রহিল। ঠাকুর আসনে বসিলেন। গুরুভ্রাতারাও তাঁবুর ভিতরে যাহার যেখানে ইচ্ছা আসন

কম্বল পাতিলেন। পাগলা সতীশ, কুঞ্জ, অশ্বিনী, ছোড়দাদা, অভয়বাবু ও আমি ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন করিয়া বসিলাম। ঠাকুরের সম্মুখে ধুনি প্রজ্বলিত হইল। ঠাকুর করতাল বাজাইয়া সন্ধ্যা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে হরিরলুট হইল।

ঠাকুর নিজ আসনে উপবিষ্ট, তিন দিকে গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আসিবার সময় আপনি যে সাধুটির আশ্রমে গিয়াছিলেন, তিনি কে?'

ঠাকুর—'তিনি একজন মহাপুরুষ, নাম মাধোদাস—আমার গুরুভ্রাতা। ৩০ বৎসর ওই স্থানে থেকে নির্জ্জনে ভজন কর্‌ছেন। কোথাও যান না। সহরে কেহ উঁহাকে জানে না।'

মহেন্দ্রবাবু—"চড়ায় উঠিবার সময় 'আও মেরা প্রাণ' বলিয়া কে আপনাকে আদর ক'রে জড়িয়ে ধরলেন?"

ঠাকুর একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছলছল চক্ষে বলিলেন—'তিনি আমার গুরুদেব—পরমহংসজী। তিনি ভিন্ন কে আর আমাকে আদর কর্‌বেন? তাই তিনি এসেছিলেন।' এই বলিয়া চুপ করিলেন। ঠাকুরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বহুচেষ্টায় বেগ সম্বরণ করিলেন। একটু পরে মহেন্দ্রবাবু আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পরমহংসজী তো গৌরবর্ণ; কিন্তু এঁকে শ্যামবর্ণ দেখ্‌লাম? পরমহংসজী নিজ দেহে না অন্য দেহ পরিগ্রহ ক'রে এসেছিলেন।'

ঠাকুর—"তিনি নূতন দেহ সৃষ্টি কর্‌তে পারেন, কিন্তু সেভাবে আসেন নাই। নিজের দেহেও আসেন নাই। একটি পরমহংসের দেহে প্রবেশ ক'রে এসেছিলেন।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাকুরের সহিত সৎপ্রসঙ্গে কাটাইয়া গুরুভ্রাতারা নিদ্রিত হইলেন। ঠাকুর সমস্ত রাত্রি একইভাবে আসনে বসিয়া রহিলেন।

কুম্ভমেলায় অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা।

শেষ রাত্রে ঠাকুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা সকলেই আসনে উঠিয়া বসিলেন। ভোর হওয়ামাত্র সকলে চড়ার পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম এবং শৌচান্তে স্নান করিয়া তাঁবুতে আসিলাম। বিধুবাবু প্রচুর পরিমাণে চা প্রস্তুত করিয়াছেন । তাঁবুতে বসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে সকলেই চা পান করিলাম। আজ ঠাকুর সাধুদের পরিক্রমায় বাহির হইবেন, সুতরাং নিত্যপাঠের গ্রন্থ কয়খানা প্রণাম করিয়া আসন হইতে উঠিলেন। গঙ্গার ধার ধরিয়া ঠাকুর উত্তর দিকে যাইতে লাগিলেন। আমরাও ৩০/৪০ জন ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে পশ্চাতে স্থানের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। সুরতরঙ্গিনী গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে মুনি ঋষি সেবিত পবিত্র প্রয়াগধাম অবস্থিত। পূর্ব্বপাড়ে পরম রমণীয় সাধু-সন্ন্যাসিগণের ভজনস্থান ঝুঁসি। এই দুইয়ের মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড একটি চড়া, দেখিতে

স্বামী ভোলানন্দ গিবি

মহাত্মা গম্ভীরানাথজী

ঠিক একটি দ্বীপের ন্যায়। এই দ্বীপসদৃশ চড়াই কুম্ভমেলার স্থান। চড়াবাসী সাধু-সন্ন্যাসী ও সহরবাসী সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য কেল্লার অনতিদূরে উত্তর দিকে সরকার বাহাদুর যেমন একটি নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন, মাইলাধিক ব্যবধানে দারাগঞ্জ হইতে ঝুঁসিতে পঁহুছিবার জন্যও আর একটি সুদৃঢ় পোল প্রস্তুত হইয়াছে। চড়াবাসীরা এই পোল দিয়া অনায়াসে সহরে বা ঝুঁসিতে যাতায়াত করিতে পারেন। প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গার পাড়ে জলের উপরে যে সকল স্থানে প্রতিবৎসর কল্পবাসীরা এই সময় আসিয়া বাস করেন, এবার সে সকল স্থানে বিবিধ ধর্ম্মার্থীদের থাকিবার জন্য সহস্র সহস্র তৃণকুটীর প্রস্তুত হইয়াছে। চড়া হইতে এই স্থান হাট বাজারের মত বহু জনাকীর্ণ দেখিতে লাগিলাম। চড়ার পূর্ব্ব দিক দিয়া তাঁবুতে ফিরিবার সময়ে দেখিলাম অনতিবিস্তৃত গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসিতে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও তাঁবু শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে—ঠিক যেন একটি লোক পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ বন্দর। এই দুইটি স্থানে কত লোক রহিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সাধারণের অনুমান অন্যূন ৮/৯ লক্ষ লোক হইবে। আর বিস্তৃত চড়াতে সাধু সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী ধর্ম্মার্থীদের বাস এ পর্য্যন্ত বার লক্ষেরও অধিক শুনিতেছি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয় যে, এত লক্ষ লোকের নিয়ত বাসস্থলে কাহারও যত্র-তত্র যাতায়াতের কোন প্রকার অসুবিধা নাই। এত লক্ষ লোকের মধ্যে যে কোন দর্শকের যে কোন সাধু মহাত্মাকে খুঁজিয়া নিতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হয় না। ইহা সরকার বাহাদুরের অসাধারণ কৌশল ও শৃঙ্খলার ফল।

জমাট বালি মাটির সমতল চড়াটি দীর্ঘে অন্যূন ৫/৬ মাইল হইবে, প্রস্থেও অর্দ্ধ মাইল অনুমান হয়। মেলা বসিবার ২/৩ মাস পূর্ব্বেই সরকার বাহাদুর এই চড়ার উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ৪/৫ টি বড় রাস্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই রাস্তা কয়টি প্রায় ২০ ফুট চওড়া, সমব্যবধান ও সোজা। আবার পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ১৫/২০ টি পথও ঐ প্রকার প্রশস্ত ও সোজা করিয়াছেন। এই প্রকার শৃঙ্খলামত রাস্তা করায় অনেক গুলি সমচতুষ্কোণ চত্তর হইয়াছে। প্রত্যেকটি চত্তরের চতুর্দ্দিকেই ২০ ফুট রাস্তা থাকায় চত্তরগুলি বেশ খোলা মেলা। এই প্রকার চত্তর প্রায় ৪০/৫০ টিরও অধিক রহিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসিগণ এই সকল চত্তরে শৃঙ্খলামত তাঁবু খাটাইয়া, ছাতা পুতিয়া, অথবা অনাবৃত স্থলে আকাশের নীচে ধুনি জ্বালিয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেকটি চত্তরেই দুই তিনটি কূয়া আছে। চত্তরের চতুর্দ্দিকে রাস্তার উপরে ২/৩ মিনিট অন্তর পুলিস প্রহরী রহিয়াছে। এই মেলাতে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর নিরুদ্বেগ ভজন-সাধন ও নিরুপদ্রবে বসবাসের জন্য সরকার বাহাদুর কত কি করিতেছেন কিছুই জানি না। তবে সম্প্রতি একটি বিষয়ে রাজপুরুষদের অসাধারণ কর্ম্মকৌশল ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতেছি। লক্ষ লক্ষ সাধু এই মেলাতে অহর্নিশি অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের পায়খানা, ময়লা ও আবর্জ্জনা প্রতিদিন দু'বেলা কিভাবে পরিষ্কার হইতেছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ব্যাপারে সরকারী কার্য্যতৎপরতা বড় সাধারণ নয়। দেখিলাম চড়ার পূর্ব্বাংশে দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে অসংখ্য কুঁড়েঘর রহিয়াছে। তাহাতে

মেথর ধাঙ্গড়েরা বাস করে। প্রতিদিন দু'বেলা তাহারা ২/৩ মাইল বা ততোধিক স্থানে সরু লম্বা নালা কাটিয়া রাখে। পায়াখানার পরই ময়লার উপরে ধারের বালি মাটি ফেলিয়া চাপা দেয় এবং তাহারা ধারেই আবার নূতন নালা কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখে। স্থান সর্ব্বদা এতই পরিষ্কার থাকে যে উহার খুব নিকট দিয়া চলিয়া গেলেও কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যাওয়া না। তারপরে সাধুদের প্রত্যেকটি চত্তরে সহস্র সহস্র সাধু রহিয়াছেন। উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের দারুণ সংস্কার। স্পর্শ হইলেই তাঁহারা স্নান করেন। অন্যূন ৪০/৫০টি চত্তরে ১০/১২ লক্ষ সাধুর এঁটো পাতা, আবর্জ্জনা ও ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য উদয়াস্ত বহুসংখ্যক ধাঙ্গড়, মেথর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন চত্তরে একখানা এঁটো পাতা বা কোন রাস্তায় একটি দাঁতনকাঠি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কত রাবিশের গাড়ী নিযুক্ত থাকলে, এক একটি চত্তরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার হয়, কিন্তু চড়াতে গাড়ী নাই, টুক্‌রিতে ভরিয়া ধাঙ্গড়েরা উহা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যায়। এ পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর এই কার্য্যের জন্য ১৪ হাজার ধাঙ্গড় ও মেথর নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিয়াছি প্রয়োজন হইলে আরও আনিবেন। ময়লা পরিষ্কারের এই প্রকার সুব্যবস্থা যদি সরকার বাহাদুর না করিতেন, তাহা হইলে দু'দিনও সাধু সন্ন্যাসীরা এই মেলায় থাকিতে পারিতেন না, ইহা একেবারে নিশ্চয়। তারপর আরো শুনিলাম— 'পোলের অপর পারে সমীপবর্ত্তী রাজপথের দু'ধারে অসংখ্য দোকানঘর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। চড়াবাসীদের প্রয়োজনীয় যে কোন সামগ্রী অনায়াসে তথা হইতে লইয়া আসিতে পারেন। ইহা ছাড়া ডাকঘর, ঔষধালয়ও করিয়া রাখিয়াছেন। আরও কতদিকে সরকার বাহাদুর কত কি করিয়াছেন জানি না। ঠাকুর বলিলেন— 'চড়াবাসী সাধুমহাত্মা মহাপুরুষগণ সরকার বাহাদুরের এই সকল কার্য্য দেখে পরম সন্তোষলাভ করেছেন, এবং আরও কিছুকাল এই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এ দেশে রাজত্ব করেন— আশীর্ব্বাদ করেছেন।' বেলা প্রায় ১২টার সময়ে আমরা ছাউনীতে প্রবেশ করিলাম। ভোগ রান্না হইতে বেলা প্রায় ৩টা হইল। অপরাহ্নে ঠাকুর আর কোথাও গেলেন না। তাঁবু ও ভাণ্ডারঘরের মাঝামাঝি উত্তরধারে, ঠাকুর ৪/৫ ফুট একটি বেদী অবিলম্বে প্রস্তুত করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয়ই এ কার্য্যে প্রধান উদ্‌যোগকারী। মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কল্যই বোধ হয় এখানে আনা হইবে।

ব্রজবিদেহী কাঠিয়া বাবার দর্শন।
মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

অদ্য চা সেবার পরে ঠাকুর বৈষ্ণবমণ্ডলী পরিক্রমায় বাহির হইলেন। আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ না হইলেও ঠাকুরের কমণ্ডলু নেওয়ার ভার আমার উপরে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গুরুভ্রাতারাও অনেকে ঠাকুরের পশ্চাৎগামী হইলেন। ৫/৬টি চত্তরে প্রায় মাইলাধিক স্থান বৈষ্ণবগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র এবং সনক এই চারি শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা প্রত্যেকে এক একটি চত্তর অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা ছাড়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধুনিক বৈষ্ণব-পন্থী, গৌড়িয়া, বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি আছেন তাঁহারাও

একটি চত্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আড্ডা করিয়া রহিয়াছেন। বেশ ভূষা আসন বাসস্থানের আড়ম্বর বৈষ্ণবদের নাই বলিলেই হয়। মান অভিমান শূন্য দীনহীন কাঙ্গাল ভাব এই সম্প্রদায়ে যেমন এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

ঠাকুর ঘুরিতে ঘুরিতে বৈষ্ণব শিরোমণি মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাবাজী শ্রীবৃন্দাবনবাসী, ঠাকুরের পূর্ব্ব পরিচিত। ঠাকুর বাবাজীকে প্রণাম করিতেই বাবাজী শশব্যাস্তে ঠাকুরকে প্রতিনমস্কার প্রদান পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। বাবাজী একটি বৃহৎ ছত্রের নীচে আসন করিয়াছেন; সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত ধুনি। সামান্য একখানা কম্বলাসনে উপবিষ্ট। তীব্রতপপ্রভা প্রদীপ্ত উজ্জ্বল দেহটি ভস্মাবরণে আবৃত। মস্তকের পিঙ্গলবর্ণ সরু সরু জটারাশী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। মহাত্মার পরিধানে একটি মাত্র কাঠের কৌপীন। এ জন্য লোকে ইঁহাকে 'কাঠিয়া বাবা' বলে। বৃদ্ধ হইলেও বাবাজীর তেজঃপুঞ্জ দেহের মাধুর্য্য বড়ই মনোরম। বাবাজীর মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ সুশীতল দৃষ্টিতে আমাদের শরীর প্রাণ শীতল হইয়া গেল। অবিচ্ছেদ ধ্যাননিষ্ঠ বাবাজীর দর্শনমাত্রে মনে হইল যেন আমাদের কত আপনার। শুনিলাম এবার মহাপুরুষেরা ইঁহাকে 'ব্রজবিদেহী' উপাধি দিয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের ভার ইঁহারই উপর ন্যস্ত করিলেন। যতক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ইঁহার নিকটে বসিয়া রহিলাম, আপনা আপনি 'নারদ' 'নারদ' শব্দ আমার ভিতর হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রামদাস্ কাঠিয়া বাবাকে দর্শন করিয়, ঠাকুর অন্যান্য চত্তরে প্রবেশ করিলেন। ১১টার সময়ে তাঁবুতে পঁহুছিলাম।

শ্রীনবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ডাক্তার রামযাদব বাগচি মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বেই মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর পরিক্রমায় বাহির হইলেন, পরে তিনি ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আনিয়া বেদীতে স্থাপন করিলেন। পরিক্রমার পর তাঁবুতে আসিয়া ঠাকুর উহা দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাকে একটি উপবীত গ্রন্থি দিয়া মহাপ্রভুর গলে পরাইয়া দিতে বলিলেন। আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পৈতা গ্রন্থি দিব, মহাপ্রভুর গোত্র জানি না। ঠাকুর বলিলেন,— 'শাণ্ডিল্য গোত্র'। আমি গোত্র প্রবর স্মরণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গায়ত্রী জপ করিতে করিতে উপবীতে গ্রন্থি দিলাম। তৎপরে উহা লইয়া গিয়া ঠাকুরের হাতে দিলাম। ঠাকুর উহা স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'মহাপ্রভুকে পরাইয়া দেও'। আমি উহা লইয়া গায়ত্রী জপ করিয়া মহাপ্রভুর গলে পরাইয়া দিলাম। চিত্তটি বড়ই প্রফুল্ল হইল। ফুল, তুলসী ও সুন্দর সুন্দর মালা দ্বারা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে সাজাইয়া দেওয়ায় বড়ই চমৎকা᠁ শোভা পাইল। আমাদের ৬ ফুট প্রশস্ত দরজার উপরে সুন্দর বড় বড় অক্ষরে—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।'

লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ৩টার সময়ে রান্না প্রস্তুত হইল। মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া আনন্দের সহিত সকলে প্রসাদ পাইলেন। বড়ই আনন্দে দিনটি কাটিয়া গেল।

ত্রিবেণী সঙ্গমে মকর স্নান। সাধুদের মিছিল— অপূর্ব্ব দৃশ্য।

আজ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। ত্রিবেণী সঙ্গমে মকরের স্নান। আজ চড়াবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা শেষ রাত্রিতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচান্তে আসনে আসিলেন। পরে সম্প্রদায় অনুযায়ী বেশ-ভুষা ও মালা তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা আপন আপন ইষ্ট স্মরণে নিবিষ্ট থাকিয়া স্নানকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ পূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বড়ই আনন্দ হইল। লক্ষ লক্ষ লোকের স্নানকার্য্য আজ একদিনে একই ঘাটে কি ভাবে সম্পন্ন হইবে, ভাবিতে লাগিলাম। ঠাকুর চা সেবার পর আসন হইতে উঠিলেন এবং স্নানার্থীদের দর্শনমানসে পোলের কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব এবং বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সামরিক বেশে অশ্বারোহণে পোলের উপরে ও প্রশস্ত পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। বড় রাস্তার দু'পাশে ও পোলের উপরে তাঁহারা ঘন ঘন পুলিশ সন্নিবেশ করিয়া লোকের চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে স্থানে স্থানে অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুদের স্নানযাত্রার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংস মহলে ভোঁ-ভোঁ শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। বিবিধপ্রকার বাদ্যধ্বনির সহিত ঢপাং ঢপাং ঢাকের রবে নীরস হৃদয়কেও নাচাইয়া তুলিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসজ্জনগণ ভাবোদ্দীপক কণ্ঠে আপন আপন ইষ্টদেবের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আনন্দ কোলাহলে প্রহৃষ্ট হইয়া চড়াবাসিগণ মাতিয়া উঠিল। সন্ন্যাসিগণের জনতা দেখিয়া রাজপুরুষগণ সন্ত্রস্তভাবে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা শশব্যস্তে বিশালবক্ষা খরস্রোতা গঙ্গার উপরে সংকীর্ণ নৌ-সেতু দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিগণ বহুমূল্য রেশম নির্ম্মিত ৮/১০টি উচ্চ উচ্চ নিশান তুলিয়া পুলের ধারে আসিয়া পড়িলেন। সমস্ত সন্ন্যাসী মণ্ডলী আজ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি মহাশয়কে সুসজ্জিত অশ্বারোহণে অগ্রণী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। উজ্জ্বল গৈরিক বসন পরিহিত উষ্ণীষধারী শান্ত সন্ন্যাসিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্মশ্রু গোঁপ বর্জ্জিত মুণ্ডিত মস্তক ত্রিপুণ্ড্রধারী দণ্ডিগণ দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে পশ্চাৎগামী হইলেন। তদনন্তর শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিত উপবীতধারী জটিল ব্রহ্মচারিগণ ধ্যাননিষ্ঠভাবে নতশিরে চলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ও দণ্ডিগণ ক্রমানুসারে স্নানক্রিয়া সমাপন করিলেন। তৎপরে কেল্লার অপর পার্শ্বস্থ রাজপথ দিয়া দ্বারাগঞ্জের পুল অতিক্রম পূর্ব্বক আপন আপন আসনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মচারিগণও নৌ-সেতু পার হইয়া স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন। সন্ন্যাসিগণের যাত্রা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নাগা উদাসীদের ভিতরে সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাদের অসংখ্য ভেরীর ভৈরবনাদ চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া চড়াবাসীদের চমক উৎপাদন করিল। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সুদীর্ঘ ঝাণ্ডা উড্ডীন করিয়া সদ্‌গুরুর বাণী 'গ্রন্থ সাহেবকে' লইয়া চলিলেন। সুন্দর তালবৃন্ত ও সুচারু-চামর দ্বারা উদাসিগণ চলিতে চলিতে 'গ্রন্থ সাহেবকে' ব্যজন করিতে লাগিলেন। সুনীল রেশমের সুন্দর পতাকা সকল পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। বিভূতি ভূষিত লম্বিত জটাদিগম্বর নাগাগণ যখন সদর্পে বীরপদবিক্ষেপে শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিলেন,

এক একবার মনে হইতে লাগিল, যেন রুদ্রানুচরগণ যোগীশ্বর মহাদেবের অনুগমন করিতেছেন। নাগা উদাসিগণের পশ্চাতে পশ্চাতে নির্ম্মলা, শিখ, আকালী প্রভৃতি নানকপন্থিগণ কাল ও নীল রঙ্গের বিবিধ প্রকার বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। অসি, খড়্গ, কৃপাণাদি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক হরি, বাসুদেব, গোবিন্দ ও রাম— এই চারি নাম সূচক স্বগর (ওয়াগর) বলিতে বলিতে যখন তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইল। শুধু আনন্দ কোলহলই শ্রুত হইতে লাগিল। এই প্রকার নাগাসন্ন্যাসিগণ নিজেদের প্রভাবে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া, সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক ঘাটে পঁহুছিলেন।

এইবার বৈষ্ণবগণের সহস্র সহস্র দুন্দুভি একবারে বাজিয়া উঠিল। অসংখ্য কাঁসর, ঘন্টা ও শঙ্খের মুহুর্মুহুঃধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দিকদিগন্তব্যাপী তুমুল বাদ্যধ্বনিতে সাধুরা সকলেই মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ঋষিপ্রতিম শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়া বাবাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রা করিলেন। বিবিধ শ্রেণীর কৌপীনধারী জটিল সাধুগণ পৃথক পৃথক দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সম্প্রদায় অনুরূপ মালা, তিলক ও ভস্মে বিভূষিত হইয়া পোলের দিকে অগ্রসর হইলেন; মুক্ত কণ্ঠে গদগদ ভাবে ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ভক্তের আর্ত্তনাদে ভগবানের আসন বুঝি আজ টলিল। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সহস্র সহস্র ভক্তহৃদয়ে আজ আবির্ভূত হইলেন। সকল শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই আজ ভাবাবেশে মাতিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল প্রাণে তাঁহারা গাহিতে লাগিলেন—

—"সীযারাম সীতারাম সী— য়া বররাম।
সীয়ারাম বল ভাইয়া জয় জয় রাম।।"

আবার কেহ কেহ 'জয় রাম', 'জয় রাম', কেহ কেহ বা 'রাধেশ্যাম', 'রাধেশ্যাম' বলিতে বলিতে নৃত্য করিয়া চলিলেন।

ভক্তহৃদয়ে সর্ব্বত্র আজ ভাবেব বন্যা বহিয়া চলিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্ভেদ্য বন্ধন, ভাব বন্যায় ভাঙ্গিয়া গল। অপূর্ব্ব ব্যাপার—সব একাকার। ভক্তপ্রাণ ভগবান আজ ভাবনদীতে তুফান তুলিলেন। পাষণ্ড, দুর্জ্জন, সাধু, সজ্জন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ভাসিয়া চলিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য। হরিবোল। হরিবোল! হরিবোল! ঠাকুর অবসর মত একটি দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কেল্লার কিঞ্চিৎ উত্তরে ফাঁক পাইয়া গঙ্গার ধারে নামিয়া পড়িলেন। আমরা সকলে গুরুভ্রাতাভগ্নিগণ ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিলাম। পাণ্ডা সঙ্কল্প মন্ত্র পড়াইতে জেদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কহিলেন,— "আমাদের সঙ্কল্প বিকল্প নাই। ভগবৎ প্রীতিই আমাদের স্নানের উদ্দেশ্য।" সন্ধ্যার পর আমরা সকলে তাঁবুতে আসিলাম। রাত্রিতে মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ প্রভুর আরতি কীর্ত্তনান্তে ভোগ দিয়া সকলে পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর সকলেই আরামের সহিত বিশ্রাম করিলেন।

প্রয়াগে কুম্ভমেলার উৎপত্তি।

সকালে চা সেবার পর নিয়মিত পাঠ হইল। গুরুভ্রাতারাও সকলে ঠাকুরকে মকর স্নান ও কুম্ভমেলা সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বহুক্ষণ ওসব বিষয়ে বলিলেন। শুনিলাম—পুরাকালে এই ত্রিবেণী সঙ্গমে—প্রয়াগধামে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে ভারতবর্ষের ঋষি মুনিগণ এই আশ্রমে সমবেত হইতেন এবং ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া সমস্ত মাঘ মাস নিয়ম নিষ্ঠার সহিত কল্পবাস করিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ অনুদয়ে গঙ্গাস্নান, অক্ষয় বট দর্শন ও ভগবানের পূজা অর্চ্চনা, ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। সময় সময় তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিবিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন ও ভগবদ্‌গুণা কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দে কাটাইতেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস বিশেষ পুণ্যজনক। এই কল্পবাস হইতেই সাধু সজ্জন সন্ন্যাসিগণের মহাসম্মিলন। এই মহাসম্মিলনই কুম্ভমেলা। কুম্ভমেলা ৩ বৎসর অন্তর অন্তর হরিদ্বারে, প্রয়াগে, নাসিকে ও উজ্জয়িনীতে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থিগণই এই মেলায় কুম্ভযোগে উপস্থিত হন। প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ক্রমানুসারে এই চারিটি স্থানে মেলার অধিবশেন হয়। সুতরাং ১২ বৎসর অন্তর অন্তর প্রত্যেকটি স্থানে পূর্ণকুম্ভ হইয়া থাকে। এই মেলায় সাধু সন্ন্যাসিগণের এমনই অদ্ভুত ও বিরাট সমাবেশ হয় যে, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে কল্পনা করা যায় না। এবার ৩/৪টি ঋষি-প্রতিম বহু প্রাচীন মহাপুরুষ মেলায় থাকিবেন—পূর্ব্বেই প্রচার হইয়াছিল। তাই তাঁদেরই কৃপায় মেলা এত বৃহৎ হইয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহের কথা ছাড়িয়া দিলে এরূপ জনসমাগম পৃথিবীতে অন্য কোন মেলায় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। সাধু দর্শন, ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ, সাধন-ভজন ও স্নান-তপর্ণাদিতে পুণ্য অর্জ্জনই এই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। কত ধ্যানী, কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী এবং কত সিদ্ধ-মহাসিদ্ধ, মহাত্মা-মহাপুরুষ যে এ মেলায় এবার আসিয়াছেন, বলা যায় না। তাহা ছাড়া যতপ্রকার আধুনিক ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে সে সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষগণের সাক্ষাৎকারও এই কুম্ভমেলায় লাভ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ৫/৭ হাজার লোক একটি স্থানে মিলিত হইলে তাহাদের ভিতরে কত প্রকার বাদবিসম্বাদ, অশান্তি উদ্বেগ উপস্থিত হয়। আর এই মহামেলায় বহু লক্ষ লোকের নিয়ত দীর্ঘকাল একই স্থানে থাকায় কোন প্রকার অভাব, অসুবিধা নাই, বাক্‌বিতণ্ডা নাই, গোলমাল কোলাহল নাই। ভগবৎ প্রসঙ্গে ও সাধন-ভজনে নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহারা পরমানন্দে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবন কি জানি না! তবে পৃথিবীতে এমন আনন্দের স্থান কল্পনা করা মনুষ্যজীবনে অসাধ্য। জয় গুরুদেব! তোমার ভক্তগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াই যেন এই জীবন শেষ হয়।

ছোট কাঠিয়াবাবা দর্শন।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় ঠাকুর মাসাধিককাল চড়াতে বাস করিলেন। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া সাধুদের কত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখলাম—শুনিলাম, তাহা বিস্তৃতরূপে

লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে যে সকল অসাধারণ ঘটনা আমার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহাই স্মৃতি রাখিবার জন্য দৈনিক ডায়েরী হইতে অতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি ঃ—

চড়াবাসিগণের মধ্যে সন্ন্যাসী, উদাসী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সংখ্যাও ইহাদেরই খুব বেশী। এক একটি সম্প্রদায়ের ৫/৭ টি বা ততোধিক চত্তর আছে। এই সকল চত্বরে এসকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ২০/২৫/৩০ হাজার করিয়া সাধুরা রহিয়াছেন। প্রত্যেক চত্তরবাসী সাধুদের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, সাধন-ভজন, নিয়ম-নিষ্ঠা একই প্রকার দেখা যায়। সুতরাং বাহিরের অনুষ্ঠান দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কে সাধু কে অসাধু, কে সজ্জন কে দুর্জ্জন, কে আসল কে নকল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অন্যূন ৯/১০ লক্ষ সাধুর মধ্যে কয়টি সাধুর সঙ্গ আমরা করিতে পারি? আর সঙ্গ করিয়াও তাঁহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা বুঝিবার অধিকার আমাদের কোথায়? কাজেই সাধুদের চত্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর যাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়ান, যাঁহার নিকটে গিয়া বসেন, অথবা যাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাকেই আমরা সিদ্ধ মহাত্মা বা মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি। তাঁহারই সম্বন্ধে জানিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি এবং প্রশ্নের উপরে প্রশ্ন করিয়া ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তুলি। মাঘের প্রথম হইতে মেলার শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুর প্রায় প্রতিদিনই দু'বেলা, কখন বা একবেলা সাধুদের মণ্ডলী পরিক্রমা করিতেন। একদিন ঠাকুরের সঙ্গে বৈষ্ণব ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া আমরা সহস্র সহস্র সাধু দর্শন করিতে লাগিলাম। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট সাধুদের মস্তকোপরি শত শত ছত্রাবরণ ও বস্ত্রাচ্ছাদন রহিয়াছে, দেখিলাম। উন্মুক্ত আকাশের নীচেও সহস্র সহস্র সাধু অবস্থান কবিতেছেন। সকলেই ভস্মাবৃত অঙ্গ, জটিল ও মালাতিলকধারী। পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস। শীত নিবারণের জন্য কাহারও একখানা কম্বল রহিয়াছে মাত্র। কাহারও তাহাও দেখিলাম না। চড়াতে কেহই বাজে কাজে, হাসিগল্পে বৃথা কালক্ষেপ করেন না; সকলেই ভগবৎ উপাসনায় নিরত। কোথাও তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ হইতেছে,— সাধুরা নিবিষ্ট হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন; কোথাও সাধুরা আপন আপন ঠাকুরের পূজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন; আবার কোন স্থানে সাধুরা মালাজপে—ইষ্টধ্যানে মগ্ন। এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে গঙ্গার অনতিদূরে বালির উপরে একটি সাধুর নিকটে পঁহুছিলাম। দেখিলাম সাধুর শরীরে জটা তিলক মালা প্রভৃতি ধর্ম্মের কোন প্রকার চিহ্ন নাই। গাত্রে কম্বল বা বস্ত্র নাই, পরিধানে মাত্র একটি কাঠের কৌপীন; অনাবৃত আকাশের নীচে একখানা ছেঁড়া চাটাইয়ের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন। শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, গায়ের চর্ম্ম হস্তি চর্ম্মের মত খস্‌খসে, তাহাতে অসংখ্য চক্র। সাধু অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। দরদর ধারে তাঁহার অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। সাধুর মুখশ্রী কচি ছেলের মত, দৃষ্টি এতই সরল ও স্নিগ্ধ যে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না। এমন চাহনি জীবনে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সাধু অত্যন্ত অল্পভাষী। শিশুর মত আধ আধ কথা বলিতে বলিতে মুখ দিয়া লাল পড়ে। বর্ণ শ্যাম, দেখিলে বয়স মাত্র ৩০ বৎসর বলিয়া অনুমান হয়। ঠাকুরের সঙ্গে কি কি কথা বলিলেন কিছুই বুঝিলাম না।

তাঁবুতে আসিবার সময়ে সাধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন,— 'ইনি একজন সিদ্ধ মহাত্মা—রাম উপাসক। ভরতের ভাব নিয়েই আছেন। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহ-কল্প ক'রেছিলেন সেই দেহই রয়েছে;— এর ক্ষয়ও হয় নাই, বৃদ্ধিও হয় নাই, একটি চুল পাকে নাই, একটা দাঁতও পড়ে নাই। কোন আশ্রয় নাই—অবলম্বন নাই। পাহাড়েও এই অবস্থায়ই থাকেন।'

এই সাধু প্রতিদিন আমাদের আড্ডায় ২/৩ বার করিয়া আসিতেন। ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির অপরদিকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতেন এবং ৫/৭ মিনিট করযোড়ে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। এই সাধুর একটি বিশেষত্ব এই যে ইনি গাঁজা, চরস, সুল্‌ফা, তামাকু কিছুই পান করিতেন না। প্রথম প্রথম গাঁজা খাইতেন, কিন্তু গাঁজা সংগ্রহ করিতে লোকালয়ে আসিতে হয় ও তজ্জন্য অনেক সময় নষ্ট হয় বলিয়া গাঁজা ত্যাগ করেন। প্রত্যহ আমাদের ছাউনীতে ২/৩ বার করিয়া আসেন কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,— 'হামারা রামজী তাঁবুমে রয়তে হ্যায়। যব্‌হি হাম যাতে, রামজীকা সাক্ষাৎ দর্শন মিল্‌তে।' সাধুর নাম পরিচয় কিছুই জানা না থাকায় আমরা তাঁহাকে 'ছোট কাঠিয়াবাবা' বলিতাম।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী। বিদ্যাভিমানী সন্ন্যাসীকে শাসন।

একদিন চা সেবার পর ঠাকুর কোথাও বাহির হইলেন না, আসনে বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে একটি তেজস্বী সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরকে উপদেশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী মহাপণ্ডিত, সমস্ত দর্শন ও বেদ উপনিষদাদি তাঁর কণ্ঠস্থ। ঠাকুর নিয়ত সমাধিতে থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই বোধ হয় তিনি শুনিয়াছেন। ঠাকুরের সমাধি যে শ্রেষ্ঠ সমাধি নয় তাহা তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন এবং কতপ্রকার জ্ঞানের উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ১৫/ ১৬ বৎসরের একটি হিন্দুস্থানী গৈরিক কৌপীন বহির্ব্বাসধারী বালক ঠাকুরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া শুনিয়া সন্নাসীকে ধমক দিয়া বলিলেন— 'স্বামীজী! কিস্কো শাস্ত্র বাত্‌লাতে হো? আব চুপ রহে। শাস্ত্র আপ কুছ্ নেহি জান্‌তে হ্যায়।' সন্ন্যাসী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'ক্যা কহতে? হাম শাস্ত্র নেহি জান্‌তা হ্যায় নাই? তুম্‌নে শাস্ত্র কুছ্ পড়া হ্যায়? বালক— 'ও বাত কাহে পুছ্‌তে? ক্যা, আপ দেখ্‌তা হ্যায় নাই হাম ব্রাহ্মণ হ্যায়? সর্ব্ব শাস্ত্র তো হামারা কণ্ঠস্থ্ হ্যায়।' সন্ন্যাসী তখন নিজের কথা প্রমাণের জন্য শাস্ত্রবচন আওড়াইতে লাগিলেন। বালক, সন্ন্যাসীর মুখে প্রথম চরণ উচ্চারণ শেষ হইতে না হইতেই অবজ্ঞাভরে বলিতে লাগিলেন— 'ব্যাস হো গিয়া,— আব্ য়্যায়সা বাত চিৎ করিয়ে, শাস্ত্র মাৎ কহিয়ে—উচ্চারণ নেহি হোতা হ্যায়—ছন্দ নেহি জান্‌তা হ্যায়, শাস্ত্র বাত্‌লাতে।' বালকের কথায় সন্ন্যাসী খুব অভিমানের সহিত বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন— 'তোম ক্যায়া জান্‌তা হ্যায়?' বালক তখন, 'আচ্ছা শুন্‌লেও' বলিয়া সন্ন্যাসী যে পদ বলিতেছিলেন তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরেও ৪/ ৫টি পদ ছন্দেবন্দে বলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী

৩/ ৪টি পদ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে তুলিয়া তার কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালক প্রত্যেকটি শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ধমক দিয়া 'ঠিক নেহি হোতা হ্যায়— ভুল হোতা হ্যায়' বলিয়া সে সকল বচনের আদ্যন্ত বলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী শুনিয়া নিষ্প্রভ হইলেন। তখন বালক সমাধির যতপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে শাস্ত্রাদি হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে বলিলেন,— 'ইনি যে অবস্থায় রহিয়াছেন, মনুষ্যদেহে ইঁহার উপরের অবস্থা লাভ হয় না। গোশৃঙ্গে সর্ষপ যতটুকু সময় থাকিতে পারে সেই সময়ের জন্যও ঐ সমাধিলাভ হ'লে দেহ ছুটিয়া যায়। সেই সমাধিও ইঁহার আয়ত্ত; কিন্তু দেহ থাকিবে না বলিয়া তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন না। বালকের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অবাক্! তাঁবুস্থ সকলেই স্তম্ভিত! সন্ন্যাসী বিস্ময়ের সহিত বালকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ঠাকুব বালকটিকে প্রণাম করিযা সম্মুখে বসিতে অনুরোধ করিলেন। বালকটি ধুনির সম্মুখে বসিলেন। ঠাকুর তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, বুঝিলাম না। বালক বলিল— 'আউর দুদফে হোনেসে এহি দেহ ছুট্ যায়েগা। তব্ তো আনন্দ্।' বালকেব হাত পায়েব গড়ন একটু লম্বা, তেজঃপূর্ণ কলেবর, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী প্রফুল্ল ও তেজঃপূর্ণ, চক্ষু অসাধারণ উজ্জ্বল, পরিধানে গৈরিক কৌপীন বহির্ব্বাস, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ, দর্শন বড়ই মধুর। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকটে বসিযা কত কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। আর তাহাকে চড়ায় দেখিতে পাই নাই। বালক চলিযা গেলে পরে ঠাকুরকে তাহার পবিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন,— 'ইনি কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী। মৃত একটি ব্রাহ্মণ বালকের দেহে প্রবেশ ক'রে সামান্য একটু কর্ম্ম বাকী ছিল, তা শেষ ক'রে নিচ্ছেন। এই কর্ম্মটুকু হয়ে গেলে আর থাক্‌বেন না।'

জিজ্ঞাসা করা গেল— 'কি কর্ম্ম বাকী ছিল, শেষ করিতেছেন?'

ঠাকুর— 'গঙ্গার উৎপত্তি হ'তে শেষ পর্য্যন্ত তিনবার গঙ্গা পরিক্রমা। একবার হয়েছে, আর দুবার হ'লেই হ'লো। তা'হলেই এই দেহ ধারণের প্রয়োজন শেষ।'

আমার কি দুর্ভাগ্য বালকটির অসাধারণত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াও, তাহার চরণে একবার মাথা নোয়াইবার আগ্রহ জন্মিল না।

নানকসাহীদের চত্তরে সাধু দর্শন।

কয়েকদিন ঠাকুর বৈষ্ণব সাধুদের বিস্তৃত চত্তরসকল পরিক্রমা করিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রামানুজ, মাধবাচার্য্য, শ্রী ও নিম্বাদিত্ত এই চারিটি মূল সম্প্রদায়। ইহা ছাড়া গোরখপন্থী, কবীরপন্থী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায়গুলিও ঐ চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ঠাকুর এই সকল সম্প্রদায়ের ভিতরে কত সাধু মহাত্মাদের দর্শন করিলেন, বলিতে পারি না। তৎপরে ঠাকুর নানকসাহীদের পরিবেষ্টনীর ভিতবে প্রবেশ করিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাধু-সন্ন্যাসীদের দর্শন করিতে লাগিলেন। চড়াবাসী সমস্ত সাধুদের মধ্যে নানকসাহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক মনে হয়। নানকসাহীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদাসী ও নির্ম্মলা। নানক সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদের প্রবর্ত্তিত পন্থাকে উদাসী বলে এবং দশমগুরু গোবিন্দসিংহের অনুসরণকারীদের নাম নির্ম্মলা। এতদ্ভিন্ন নানকসাহী মহাত্মাদের প্রবর্ত্তিত ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। দাদুপন্থী, গরীবদাসী, বেহার বৃন্দাবনী প্রভৃতিও নানকসাহী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইঁহারা একদিকে যেমন শিষ্টশান্ত ভজননিষ্ঠ, তেমনিই আবার অসাধারণ বীরপুরুষ। ইঁহারা প্রায় সকলেই জটা শ্মশ্রুধারী ভস্মাবৃত কলেবর। কৌপীন বহির্ব্বাস অনেকের আছে, আবার অনেকে একেবারে উলঙ্গ। দেখিলাম, অসংখ্য সাধু আপন আসনে ধ্যানে মগ্ন হইয়া আছেন, আবার বহু সাধু মণ্ডলী করিয়া নিবিষ্টমনে গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনিতেছেন। কোথাও দলে দলে সাধুরা এক এক স্থানে বসিয়া ভজনগান করিতেছেন। কোথাও বা গ্রন্থ সাহেবের সমারোহের সহিত আরতি পূজা হইতেছে। একটা স্থানে যাইয়া দেখিলাম, বিবিধপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র, খড়্গ, অসি, তরবারি, মুশল মুদগর সাজান রহিয়াছে। কোন কোন মুগুর এত ভারী যে, সাধারণ লোকে তাহা তুলিতেও পারে না। মুগুরের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য সূক্ষ্মাগ্র দেড় ইঞ্চি পরিমিত লোহার কাঁটা। সাধুরা তরবারি খেলেন, কুস্তি করেন ও ঐ সকল মুগুর ভাজেন। সামর্থ্যবান লোকে খুব সাবধানতার সহিত ঠিক কায়দায় ঐ সকল মুগুর না ভাজিলে বিষম বিপদ ঘটিতে পারে। ঠাকুর কহিলেন—'**নানকপন্থীদের ভজনের আশ্চর্য্য প্রভাব এসব সিংহতুল্য লোকগুলিকে একেবারে মেষের মত করে রেখেছে।**' শাখা ভেদে এই সকল সাধুদের মধ্যে মতের ও ভাবের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সাধারণ বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার প্রায় সকলেরই একরূপ। কিন্তু মহান্তদের চালচলন সাজসজ্জা স্বতন্ত্র প্রকার, উহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয় রাজা মহারাজাও ইঁহাদের সম্মুখীন হইতে সঙ্কোচ বোধ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রয়োজন হইলে এই সকল মহান্তেরাও আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সাধারণের মত সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। নানকসাহীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ মহান্তের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বহু সহস্র সাধু তাঁহার তাঁবুতে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন পায়। অন্যান্য চত্তরেও কেশবানন্দের সদাব্রত নিয়তই চলিতেছে। মহান্ত করণদাস আর দশজনের মত খুব সাধারণ ভাবেই থাকেন। মহান্ত বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু ইঁহার চত্তরেও প্রত্যহ বহু সহস্র সাধু প্রচুর পরিমাণে ধুনির কাঠ ও আহার পাইয়া থাকেন। নাগাসন্ন্যাসীদের চত্তরে ১০/ ১২টি বড় বড় তাঁবু খাটান রহিয়াছে দেখিলাম। ৫/ ৭ দিন আমরা নানকসাহীদের চত্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ্য সাধু দর্শন করিলাম। সকল সাধু সন্ন্যাসীরাই ঠাকুরকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করিলেন। ভগবৎ ভজনে ইঁহাদের অনুরাগ ও কঠোর বৈরাগ্য দেখিয়া নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। সদ্‌গুরুই ইঁহাদের উপাস্য; নামজপ ও গ্রন্থসাহেবের বাণীই ইঁহাদের সাধনভজন ও অবলম্বন। ঠাকুর বলিলেন— '**ধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ে যেমন জীবন্ত, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। বিষয়ের গন্ধ মাত্র থাকিতে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না। ভগবান যাহাকে দয়া করেন, তার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লন। সংসারে তার আসক্তির কিছুই রাখেন না, পথের কাঙ্গালী করেন। এ অবস্থা যার হয়, তার বড়ই সৌভাগ্য।**'

সন্ন্যাসীদের চত্তরে সাধু দর্শন—বাইনাচের তাৎপর্য্য।

এবার ঠাকুর বিরাট সন্ন্যাসীমণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীদের অধিকারে ৫/৬টি চত্তর রহিয়াছে। চত্তরগুলি প্রস্থে নাগা ও বৈষ্ণবদের চত্তরের মত হইলেও দীর্ঘে অনেক বেশী। কত লক্ষ সন্ন্যাসী যে এ সকল চত্তরে রহিয়াছেন অনুমান করা দুঃসাধ্য। সন্ন্যাসিগণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শিঙ্গারী, যোশী, গোবর্দ্ধন ও সারদা—এই মঠ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত গিরি, পুরী, ভারতী, বন, পর্ব্বত, সরস্বতী প্রভৃতি দশনামা সম্প্রদায়ভুক্ত। সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসীদের মত শিক্ষিত অন্য কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায় না। শাস্ত্র, পুরাণ ও ষড়দর্শনে পারদর্শী, উপনিষদ বেদবেদাঙ্গবেত্তা মহাজ্ঞানী অগাধ পণ্ডিতগণ—সন্ন্যাসীদের ভিতরে বহু সংখ্যক রহিয়াছেন। অশিক্ষিত মূর্খ বোকাদের স্থান দশনামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে নাই বলিলেই হয়। দণ্ডী, ব্রহ্মচারিগণও উঁহাদেরই অন্তর্গত। তাহা ছাড়া তান্ত্রিক অবধূত পরমহংস যোগী দরবেশ এবং সংসারত্যাগী বিরক্ত উদাসিগণও সন্ন্যাসীদের ভিন্ন ভিন্ন চত্তরে অবস্থান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক সন্ন্যাসী ভৈরবীগণও চত্তরাভ্যন্তরে বালির উপরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রহিয়াছেন। ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অস্ত্রশস্ত্রধারী নাগা সন্ন্যাসিগণ নিয়ত নিযুক্ত। সন্ন্যাসীদের এক একটি চত্তরে ৫/৭টি বৃহৎ তাঁবু রহিয়াছে; তাহাতে সম্ভবতঃ সন্ন্যাসীদের নেতা ও মঠাধিকারিগণ বাস করেন। সন্ন্যাসীদের অগ্নি সেবা নাই, সুতরাং ধুনিরও ব্যবস্থা নাই। অনাবৃত স্থানে শীত নিবারণার্থে দেহ রক্ষার জন্য কেহ কেহ ধুনি রাখিতে বাধ্য হন মাত্র। অন্যান্য সাধুদের অপেক্ষা সন্ন্যাসীগণ সুরূপ ও সুবেশ। পরিধানে তাঁহাদের গৈরিক রঙ্গের কৌপীন বহির্ব্বাস, মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্রের শিরস্ত্রান, ললাট বিভূতিবিলেপিত তাহাতে ত্রিপুণ্ড্র-উর্দ্ধপুণ্ড্র রহিয়াছে, বক্ষে অক্ষমালা শোভিত। রক্তাম্বরধারী জটিল তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও অবধূতগণের সংখ্যা কম নয়। একদিন সন্ন্যাসীদের একটি তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বহুমূল্য চেয়ার, কৌচ, গদি দ্বারা তাঁবুটি সুসজ্জিত। এই সাজ সজ্জার প্রয়োজন কি বুঝিলাম না। পরে শুনিলাম, রাজা মহারাজা বা খুব উচ্চপদস্থ সম্মানিত সাহেব, মেমেরা মহান্তদের দর্শন করিতে আসিলে তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইবার জন্যই ঐ সব আয়োজন রাখা হইয়াছে। ঐদিন আর একটি সুবৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। কত রঙ্গ বেরঙ্গের ঝাড়, লণ্ঠন, বেল উহাতে টাঙ্গান। মূল্যবান কার্পেটের উপরে বহুমূল্যবান সুবর্ণখচিত আস্তরণ রহিয়াছে। উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সন্ন্যাসীদের এত ঐশ্বর্য্য কেন? এযে রাজা মহারাজাদের বাইনাচের বৈঠকখানার মত। ইহার মানে কি? শুনিলাম এই স্থানেও রাত্রে বাইনাচই হইয়া থাকে।' এই বাইনাচের তাৎপর্য্য ঠাকুর অনেকক্ষণ বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু উহাতে পরিষ্কাররূপে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। মোট কথা ঠাকুর বলিলেন,— **'হরি সংকীর্ত্তন, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন কর্‌লে ভক্তের প্রাণ যেমন উথলিয়া উঠে, ভাবাবেশে মত্ত হয়ে ভক্ত যেমন অঙ্গ সঞ্চালন ক'রে বিবিধ প্রকার নৃত্য করেন, বাইনাচও সেই প্রকার। ভগবানের দরবারেও বাইনাচ হয়। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সম্মুখেও গভীর রাত্রিতে দেবদাসীরা গীতগোবিন্দ গান ও নৃত্য করেন। নৃত্য একটি উৎকৃষ্ট ভজন। ভক্ত**

ভগবানের দর্শনে অভিভূত হয়ে তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সর্ব্বাবয়ব দ্বারা ভগবানের আরতি করেন—কতপ্রকার মুদ্রাদি করে ভগবানের আরাধনা করেন একেই নৃত্য বলে। শ্রীক্ষেত্রে ছোট ছোট ছেলে—আখ্‌ড়া পিলাদের নৃত্য দেখ্‌লে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়, দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। এখন আর সে সব নাই—সে ভজন নাই। এখন ভজনের কার্য্যেও বিষম বিলাসিতা ঢুকেছে। এর আর উপায় কি?'

সাধুদের সদাব্রতে চমৎকার শৃঙ্খলা।

আজ একটি বিষয় ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। চড়াতে ১০/ ১২ লক্ষ সাধু নিয়ত বাস করিতেছেন; প্রতিদিনই উঁহাদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন কি প্রকারে সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে ভাবিয়া অবাক হইলাম। ১২/১৪ হাজার লোকের একবেলা আহার সংস্থান করিতে হইলে ১২/১৪ দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। তাহাতেও কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। আর বহুলক্ষ লোকের লুচী, কচুরী, ছোকা, ডাল, রায়তা, হালুয়া, মালপোয়া, লাড্ডু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। সহস্র সহস্র সাধুরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পঙ্গত করিলেন, পেট ভরিয়া আহার করিলেন এবং আপন আপন আসনে চলিয়া গেলেন। কোনপ্রকার অসুবিধা নাই, গোলমাল নাই, হৈ চৈ নাই অদ্ভুত ব্যাপার। সাধুরা একদিনের বস্তু পরদিনের জন্য সঞ্চিত রাখেন না। প্রতিদিন কাঁচা বস্তু আসিতেছে, প্রত্যেক চত্তরে তাহা রান্না হইতেছে, নির্ব্বিবাদে লক্ষ লক্ষ সাধু তাহা ভোজন করিতেছেন। যাঁহাদের উপরে যে কার্য্যের ভার তাঁহারা নীরবে তাহা করিয়া যাইতেছেন। কল কারখানার মত কার্য্য হইতেছে। অপরে তাহা জানিতেও পারিতেছে না। এ সকল বস্তু কোথা হইতে আসিতেছে, কাহারা দিতেছেন কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছে, জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মিল। শুনিলাম মেলাস্থলে সমবেত সাধু মণ্ডলীর আহার্য্যাদি যাবতীয় বস্তু ধনকুবের মাড়োয়াড়ীগণ এবং ভারতের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সরবরাহ করিতেছেন। তাঁহারা এজন্য শত শত লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যহ মহান্তদের নিকটে উপস্থিত হইয়া চত্তরে কি কি বস্তু কত প্রয়োজন জানিয়া পরদিন সকালে তাহা পঁহুছাইয়া দিতেছেন। মহান্তেরা জমাতের ভিতরে সাধুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য শত শত লোক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কতগুলি লোক জল টানিতেছে, কতগুলি রান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছে, কতগুলিতে রান্না করিতেছে, আবার কতগুলি লোক রান্নার পোড়া হাঁড়ি কড়া প্রভৃতি বাসন মাজিতেছে। এই প্রকার এক এক দল এক এক কার্য্যের ভার নিয়া সাধু সেবার জন্য আগ্রহের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। সুতরাং কোন দিকেই সাধুদের কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে না। দাতারা দানের শুভ সুযোগ মনে করিয়া এতদর্থে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহাদের আকাঙ্খা মিটিতেছে না। শুনিলাম দয়ার সাগর শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর নিকট সেদিন এক মাড়োয়াড়ী উপস্থিত হইয়া ৬০ হাজার টাকা সদাব্রত দিতে চাহিলেন—কত প্রকার কাকুতি মিনতি করিলেন। স্বামীজী কহিলেন— 'আমি নিতে পারি না তুমি অন্য কোন মহান্তকে গিয়া দেও। একজন মাড়োয়াড়ী চড়ায় আসামাত্রই আমাকে বলিলেন— 'এখানে

যতকাল আপনি থাকিবেন আপনার ইচ্ছামত প্রতিদিনের যাবতীয় বস্তু আমি সংগ্রহ করিয়া দিব— আমার এই আকাঙ্খা পূর্ণ করুন। আমি যদি এই ব্যয় চালাইতে না পারি তবেই আপনি অন্যের দান গ্রহণ করিবেন।' সুতরাং আমার আর কারো কিছু নেওয়ার উপায় নাই।' মাড়োয়াড়ী স্বামীজীর কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। নিজের ছাউনীর লোক ছাড়া প্রত্যহ ১০/১৫ হাজার লোকের ভোজন তথায় হইতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াও আকাঙ্খার তৃপ্তি নাই। এই প্রকার দানের কথা জীবনে কখনও শুনি নাই।

ঠাকুরকে মেলা হইতে সরাইতে ষড়যন্ত্রঃ

সমবেত সভায় মহাত্মা মহাপুরুষদের ঠাকুর সম্বন্ধে অভিমত।

আমরা চড়ায় আসিয়াছি পর আমাদেরও সদাব্রত প্রতিদিনই আসিতেছে। কোথা হইতে আসিতেছে, কে দিতেছেন, কিছুই জানি না। ঠাকুরের আদেশ— "ভগবানের কৃপায় যেদিন যাহা আসিবে, সেই দিনই তাহা ব্যয় করিবে। কোন একটি বস্তু পরদিনের জন্য ভাণ্ডারে রাখিবে না।" সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ২/৩ শত লোকের রান্না প্রত্যহ হইতেছে এবং তাহা সাধুদের ভোজন করান যাইতেছে। কোন বস্তুর অভাবও নাই, সঞ্চয়ও নাই। আজ দুই দিন যাবৎ জানি না কেন আমাদের সদাব্রত বন্ধ হইয়াছে। খবর পাইলাম, কল্য হইতে আবার সদাব্রত আসিবে। বন্ধ হওয়ার কারণ কি অনুসন্ধানে জানিলাম, আমাদের লইয়া চড়াবাসী সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী মহান্তদের ভিতরে একটা তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। তাই উহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সদাব্রত বন্ধ ছিল। শুনিলাম ঠাকুরের একটি পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধু ঠাকুরের প্রভাব দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে, সদাব্রত প্রত্যহ আসিতেছে, গৃহস্থ শিষ্যদের লইয়া তাহা তিনি ভোগ করিতেছেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানে তিনি আড্ডা গাড়িয়াছেন— ইত্যাদি দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ঠাকুরকে চড়া হইতে সরাইবার জন্য শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর একটি খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিষ্যকে সহকারী করিয়া সমস্ত সন্ন্যাসী সাধু ও বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ঘুরিতে লাগিলেন। ঠাকুরের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার ও ভজন-সাধন বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরোধী, এইরূপ দোষারোপ করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে গোঁসাই থাকিবেন, তাহারই মর্য্যাদা লাঘব হইবে। সুতরাং চড়াতে ঠাকুরকে থাকিতে দেওয়া অত্যন্ত দোষাবহ হইবে। ইহা লইয়া সমস্ত সাধু মণ্ডলীতে একটি অলোচনা হওয়া উচিৎ।

দু'দিন হয় চড়াবাসী প্রধান প্রধান সন্ন্যাসী, উদাসী ও বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া একটি বৃহৎ সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামীর ঐ শিষ্যটি ঠাকুরের চড়াবাসে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন— 'বহু কুম্ভ মেলায় আমরা আসিয়াছি, চড়ায় বাস করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ভিতরে কখনও কোন বাঙ্গালীকে ছাউনি করিতে দেখি নাই। যে বাঙ্গালী সাধু আসিয়া আমাদের ভিতরে আড্ডা গড়িয়াছেন তিনি কি সন্ন্যাসী না উদাসী জানি না; তবে বৈষ্ণব যে তিনি নন্ তাঁর বেশভূষা, আচার-ব্যবহারে তাহা পরিষ্কার দেখিতেছি। তিনি জটা শ্মশ্রু দণ্ডকমণ্ডলুধারী,

পরিধানে গৈরিক বসন, আবার তুলসী রুদ্রাক্ষ একসঙ্গে ধারণ করিতেছেন। ইহা কি বৈষ্ণবচিহ্ন বলিয়া কোন প্রামাণ্য শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে? দু'টি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাও নূতন রকমের। রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা বা বৈষ্ণবদের কোন উপাস্য দেবতা নয়। উঁহারা বলেন 'গৌর নিতাই'। গৌর নিতাইয়ের পূজা কি কোন শাস্ত্রানুমোদিত? গৌর নিতাইকে তাঁহারা কি বিষ্ণুর অবতার বলেন? এদিকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ স্ত্রীলোক, পুত্র, কন্যা, গৃহস্থবাবুরা সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত স্বেচ্ছাচারে চলিয়া মন্‌মুখী বেশ লইয়া কি প্রকারে তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীর ভিতরে থাকিবেন?'

মহাশাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী সমাজের শিরোমণি বৃদ্ধ পরমানন্দ স্বামী বলিলেন— 'বৈষ্ণবদের প্রামাণ্য গ্রন্থ পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে রহিয়াছে 'তুলসী, নলিনী, অক্ষ' ধারণ বৈষ্ণবদের বিশেষ বিধি। বৈষ্ণবদের উহা ধারণ না করাই অপরাধ।' প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী অমরেশ্বরানন্দ বলিলেন— 'গৈরিকবসন, ভগবান বস্ত্র। দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ ও ভগবান বস্ত্র পরিধান বৈষ্ণব অবধূতদের বিশেষ লক্ষণ পুরাণে নির্দ্দেশ আছে। ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নকালে আমি নবদ্বীপে ছিলাম। তথায় দেখিয়াছি বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ বলরাম অবতার বলিয়া পূজা করেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা। প্রাচীন বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ণাবতার বলিয়া পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান। শ্রীবৃন্দাবনেও এই গৌরাঙ্গ উপাসকদের বিশেষ প্রভাব।' সমস্ত সন্ন্যাসীমণ্ডলে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরির বিশেষ প্রভাব। তিনি বলিলেন-- 'পুত্র-কন্যা ত্যাগ ও স্ত্রীলোকেব সংস্রব বর্জ্জন ইহা সন্ন্যাসীদের বিধি বটে, কিন্তু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিধি নিষেধের বাহিরে। উঁহার সঙ্গ করিয়া আমি জানি, উনি সাক্ষাৎ সদাশিব আশুতোষ।' বৈষ্ণব মহাত্মাদের অগ্রণী ব্রজবিদেহী শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়াবাবাজী বলিলেন— 'গোঁসাইজী তো সাক্ষাৎ মহাদেব হ্যায়, প্রেমকা অবতার। উনকো ললাটমে হামেসা আগ ধক্ ধক্ জ্বলতা হ্যায়। আগমে যো কুছ গিরতা হ্যায় ওতো ভস্ম হো যাতা হ্যায়। য্যায়সা প্রেমিক ত্যায়সা হি সামর্থী। বৈষ্ণব লোকন্‌কা বিচ্‌মে ছাউনী কি হ্যায়, ইস্‌মে তো বৈষ্ণব লোকন্‌কা মান বাড় গিয়া হ্যায়— বৈষ্ণব লোকন্‌কা বহুত ভাগ হ্যায়।' মহাত্মাদের এ সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিরোধীগণ অবাক্ হইলেন; তাঁহারা সলজ্জভাবে আপন আপন আসনে চলিয়া গেলেন।

অদ্ভুত ভগবানের লীলা। কোন্ সূত্র ধরিয়া তিনি কি করেন একটুকু কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। ঠাকুরের ব্রাহ্ম বন্ধুটির ষড়যন্ত্রের ফলে কল্পনাতীত একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। এই চড়াবাসী লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা, মহাপুরুষদের সম্মিলন স্থলে কে কাহাকে চিনেন, কে কাহার খোঁজ নেন, অথবা কে কাহাকে দেখেন। কেবল আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা মহাপুরুষ আছেন, সম্প্রদায়ের লোকমাত্র তাঁহাদেরই জানেন, চিনেন, ও দর্শন করেন। মেলার চার আনি লোকও বোধ হয় কোন একটি মহাত্মার খবর পান না। ঠাকুরের বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টায় সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতা ও মহান্তদের যে বিরাট সভা হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মহাত্মারা যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, ঠাকুর সম্বন্ধে

যে অভিমত তাঁহাদের মুখ দিয়া প্রকাশ হইল, তাহা দশ বার লক্ষ সাধুর ভিতরে প্রচার হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তড়িৎপ্রবাহে মহাত্মাদের কথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। শত শত সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণবেরা ঠাকুরকে আসিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আমাদের জ্বলন্ত হুতাশন এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া যেন মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিলেন। এই ক্লেশ আমাদের প্রাণে বড়ই লাগিতেছিল। প্রতিদিন ঠাকুর সাধু দর্শন ছলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সহস্র সহস্র সাধুদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন বটে, কিন্তু হেলায় দর্শন এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত দর্শনে অনেক তফাৎ। আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। আমাদের ঠাকুরের মহিমা সর্ব্বত্র প্রচার হইল। জয় ভগবান! জয় ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ করি চিরকাল তুমি সুখে থাক, জয়যুক্ত হও। আমার বেশ দেখিয়াও সাধুরা অনেক সময় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু আমি জানি না বলিয়া কিছু উত্তর দিতে পারি না। আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম— সাধুরা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? ঠাকুর কহিলেন— **"নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে নামের সঙ্গে আনন্দ যোগ করে ব'লো। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিঙ্গারী মঠ আশ্রম ব্যোমবাই বলো। গুরুর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে ব'লো অচ্যুতানন্দ।"** ঠাকুরের সন্ন্যাসের নাম যে অচ্যুতানন্দ ইতি পূর্ব্বে তাহা আমরা কেহই জানিতাম না।

দয়ালদাস স্বামীর ছাউনীতে নিমন্ত্রণ।
কীর্ত্তনে মাতামাতি।

আগামী কল্য দয়ালদাস স্বামীর ছাউনীতে আমাদের নিমন্ত্রণ হইল। চড়াতে এতদিন আমরা আসিয়াছি এ পর্য্যন্ত কোন ছাউনীতে আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই। এই নিমন্ত্রণের হেতু কি, স্বামীজীই বা আমাদের পরিচয় কি প্রকারে পাইলেন, জানিতে কৌতূহল জন্মিল। অনুসন্ধানে জানিলাম ঠাকুরকে অপমানিত করিয়া চড়া হইতে সরাইবার জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছিল স্বামীজীর কোন বাঙ্গালী শিষ্য সেই কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী হইয়া যোগ দেওয়াতে স্বামীজী অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন। উহারই প্রতিকার উদ্দেশ্যে ঠাকুরকে বিশেষভাবে সম্মান দিতে ইচ্ছা করিয়া, তিনি এই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে স্বামীজীর সেই খ্যাতনামা শিষ্যটি ঠাকুরের নিকটে আসিয়া করযোড়ে বলিলেন— 'স্বামীজী করযোড়ে আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, আগামী কল্য আপনি দয়া করিয়া সশিষ্যে তাঁহার ছাউনীতে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন। সংকীর্ত্তন তিনি বড় ভালবাসেন। আপনাদের সংকীর্ত্তনের কথা তিনি শুনিয়াছেন। সেখানে আপনারা একটু সংকীর্ত্তন করিলে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইবে।' ঠাকুর খুব আনন্দের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

আজ বেলা প্রায় ১১ টার সময়ে ঠাকুর সমস্ত গুরুভ্রাতাদের লইয়া স্বামীজীর ছাউনীতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী পরম কৌতূহল প্রকাশ পূর্ব্বক করযোড়ে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া প্রণাম করিতে করিতে আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পরে একটি বড় তাঁবুর ভিতরে লইয়া গিয়া ঠাকুরকে বসাইলেন। স্বামীজীর দিবারাত্রি অবসর নাই, তিনি ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক

কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন এবং সেই বাঙ্গালী শিষ্যটিকে আমাদের পরিচর্য্যার জন্য তাঁবুতে নিযুক্ত রাখিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। পরে ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"ব্রহ্মচারী! এক অধ্যায় গীতা পাঠ করনা?"** আমি কোন্ অধ্যায় পাঠ করিব জিজ্ঞাসা করায়, ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিতে বলিলেন। উহা আমার কণ্ঠস্থ থাকায়, খুব উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পাঠ করিলাম। পরে সংকীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ২/৩ খানা খোল ও ৫/৭টি করতাল বাজিয়া উঠিল। উহার ধ্বনি এমনই বাহির হইতে লাগিল যে সংকীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বেই গুরুভ্রাতারা মাতিয়া গেলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার ভাবোদ্দীপক হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে করিতে লাফাইয়া উঠিলেন। নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে দর্শনার্থী সাধুরা আসিয়া তাঁবুটি ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাঁবুর ভিতরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দর্শকমণ্ডলী গুরুভ্রাতাদের ভাবোদ্দীপক নৃত্য বিস্মিতনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে লোক বেহুঁস হইয়া পড়িতে লাগিল। সকলেই মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিয়া স্থানটিকে কাঁপাইয়া তুলিল। এই সময়ে একজন দীর্ঘাকৃতি তিলকধারী বলিষ্ঠ সাধু একটি খোল বাজাইতে বাজাইতে সংকীর্ত্তন স্থলে প্রবেশ করিলেন। পাগলা সতীশ তাঁবুর এক কোণে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সাধুকে দেখা মাত্র একেবারে লাফাইয়া উঠিল এবং লম্ফ দিতে দিতে সাধুর সম্মুখীন হইয়া পড়িল। পরে উভয় হস্ত মুখের সামনে রাখিয়া পুনঃপুনঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সাধুকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সংকীর্ত্তনে ভাবোচ্ছ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সতীশও দক্ষিণ হস্তে পাছা চাপড়াইয়া, বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সাধুর সম্মুখে বারংবার ধরিতে লাগিল এবং নানাপ্রকার ভাব ভঙ্গিতে মুখ বিকৃতি করিয়া সাধুকে দম্ভের সহিত তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিল। সাধু নিষ্প্রভভাবে পশ্চাৎ হটিয়া দরজার ধারে খোল রাখিয়া অদৃশ্য হইল। অনেকে সতীশের এই প্রকার কার্য্য দেখিয়া অবাক্। কেহ কেহ ভাবিলেন, সতীশের আঙ্গুল নাড়াও বুঝি সংকীর্ত্তনে সাত্ত্বিক ভাবোচ্ছ্বাস বিকাশেরই একটি লক্ষণ। কতক্ষণ পরে সংকীর্ত্তন থামিয়া গেল, সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম— ভাই! ওটী কি ভাব দেখাইলি?

সতীশ বলিল— 'ভাব আর দেখাইলাম কোথায়? শালা যে উর্দ্ধশ্বাসে পালালো।'

আমি— কেন! ঐ সাধুর উপরে তোর এত আক্রোশ কেন?

সতীশ— 'আরে ওই যে আমাকে ভূতের বোঝা ঘাড়ে দিয়েছিল। মায়াচক্রে ঘুরায়েছিল। গোঁসাই এখন কাছে, তাই ওকে কলা দেখালাম। আর একটু থাক্‌লে ওকে কামড়ায়ে শেষ কর্‌তাম।' সময়ান্তরে হাসিগল্পচ্ছলে সতীশের আঙ্গুল দেখানর কথা ঠাকুরকে বলাতে ঠাকুর সতীশকে বলিলেন,— **'সতীশ! সেই সাধু এসেছিলেন, আমাকে দেখালে না? একবার দেখ্‌তাম।'**

দয়ালদাস স্বামীর অসাধারণ দয়ার কথা।

বেলা প্রায় ৩টার সময়ে বহুবিধ উপাদেয় বস্তুদ্বারা স্বামীজী আমাদের ভোজন করাইলেন। বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক এক পঙ্গতে সহস্র সহস্র সাধু ভোজন করিতে থাকেন।

স্বামীজীর সুদক্ষ শিষ্যগণ নিয়ত তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আর স্বামীজী নিজে শুধু কাঙ্গাল দুঃখী দরিদ্রদের নিয়া রহিয়াছেন। বুভুক্ষু কাঙ্গালীদের স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া না খাওয়াইলে স্বামীজীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। একটি কাঙ্গালীরও তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার না হইলে ক্লেশে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়—তিনি ছট্‌ফট্ করিয়া কাটান। আজ স্বামীজীর একটি অসাধারণ দয়ার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। অন্তরে পুনঃপুনঃ সেই কথা উঠিতেছে। ইতিমধ্যে একদিন বিশেষ কোন কারণে কাঙ্গালীদের ভোজনকালে স্বামীজী তথায় উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সর্ব্ব প্রধান প্রিয় শিষ্যকে ঐ কার্য্যের ভার দিয়া চলিয়া যান। স্বামীজী শিষ্যকে আদেশ করিয়া যান—'কাঙ্গালীদের ভোজন শেষ না হ'লে কখনও অন্যত্র যাবে না।' শিষ্যও গুরুর আদেশমত কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন করিবেন অঙ্গীকার করিয়া ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কাঙ্গালীদের পঙ্গত কালে শিষ্য খুব যত্নের সহিত তাহাদের ভোজন করাইতে লাগিলেন। অন্যদিকে ১০/১২ হাজার সাধু সন্ন্যাসী পঙ্গত করিতেছিলেন। তাঁহাদের ভোজন প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে; অকস্মাৎ রামদল আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদল সাধুগণ আপন উপাস্য দেবতার সন্তোষার্থে মহাবীর হনুমানের ভাব লইয়া উপাসনা ও ভোজনাদি সমস্ত কার্য্য করিতে ভালবাসেন। তাঁহারা পঙ্গতে না বসিয়া লুটপাট করিয়া খাইতে অধিক আনন্দ পান। কোন সদাব্রতে রামদল উপস্থিত হইলেই, তথায় লুটপাট হইবে, ইহা সকলেরই জানা আছে। রামদল আসিয়া পড়া মাত্রই ছাউনীর সর্ব্বত্র হৈ হৈ সোর পড়িয়া গেল। সাধু সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারার উপরে রামদলের ঝুঁকি পড়িল। 'সর্ব্বনাশ হইল—অর্দ্ধভুক্ত সন্ন্যাসীদের ভোজন নষ্ট হইল!' চারিদিকে এই চীৎকার উঠিল। স্বামীজীর ঐ শিষ্যটি স্থির থাকিতে না পারিয়া সন্ন্যাসীদের পঙ্গত রক্ষার্থে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাউনী উপদ্রব শূন্য হইলে যথামত সকলের পঙ্গত চলিতে লাগিল। কিন্তু রামদলের ভয়ে নিরীহ কাঙ্গালীরা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়ই পাত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের আর সংগ্রহ করিয়া ভোজন করান অসম্ভব অনুমানে সে চেষ্টা আর হইল না।

স্বামী দয়ালদাস সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাউনীতে পঁহুছিয়া সমস্ত সংবাদ পাইলেন। ক্ষুধিত আশ্রয়শূন্য কাঙ্গালীরা অর্দ্ধাহারে চলিয়া গেল আর তাদের খাওয়া হইল না মনে করিয়া স্বামীজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি প্রধান শিষ্যটিকে ডাকিয়া বলিলেন,— 'সমূহ বিপদ অনুমানে তুমি গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছ। অপরাধ সাধারণ নয়। এজন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম।' গুরুপ্রাণ শিষ্য অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল দেখিয়া গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমার এই অপরাধী দেহ আপনার সেবার যোগ্য নয়। ভালই হইল। তবে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন দেহান্তে আপনার সঙ্গ পাই।' স্বামীজী বলিলেন— 'গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে সঙ্কল্প করিয়া দেহ বিসর্জ্জন দিলে, তাহা হইতে পারে।' শিষ্য সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া চরণ ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। ধীরগম্ভীর দয়ালদাস শিষ্যকে সরাইয়া দিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'শিষ্য কোথায় গেল', 'শিষ্য কোথায় গেল' ভাবিয়া তিনি দ্রুতপদ সঞ্চারে ইতস্ততঃ

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শিষ্য কোথায় আছে, কি করিতেছে, পুনঃপুনঃ খবর লইতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্য কিঞ্চিৎ অন্তরে নির্জ্জন বালির উপরে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। গভীর নিশীথ কালে চতুর্দ্দিক ভয়ঙ্কর অন্ধকার, চড়াবাসীরা সকলে বিশ্রাম করিতেছেন, শিষ্যটি ৪/৫ হাত একগাছি লম্বা দড়ির দু'দিকে দু'টি প্রকাণ্ড কলসী বাঁধিলেন এবং তাহা হাতে লইয়া 'জয় গুরু', 'জয় গুরু', বলিতে বলিতে খরস্রোতা গঙ্গার পাড়ে উপস্থিত হইলেন। কতক্ষণ গুরুদেবকে আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিয়া গঙ্গায় নামিলেন। গলায় দড়ি জড়াইয়া দু'পাশে দু'টি কলসী রাখিয়া যেমন তিনি গঙ্গা-যমুনার স্রোতে ভাসিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি দয়ালদাস তাহাকে দু'হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং টানিয়া চড়ার উপরে নিয়া তুলিলেন। 'বাস্ হো গিয়া বাচ্চা, পুরা প্রায়শ্চিত্ত হো গিয়া, আব চলো হামারা সাথ' বলিয়া শিষ্যকে লইয়া ছাউনীতে প্রবেশ করিলেন। বুঝি আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধন্য হইল। শিষ্যের আনুগত্য, গুরুর অপার স্নেহ মমতা দেখিয়া আজ বুঝি চতুর্দ্দশ ভুবন নাচিয়া উঠিল। গুরুদেব! কবে আমাকে তোমার এরূপ অনুগত করিয়া লইবে! কবে তোমাকে আমি যথার্থ আমার বলিয়া বুঝিতে পারিব!

তাঁবুতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। গৌর নিতাইয়ের আরতি সংকীর্ত্তন শেষ হইলে গুরুভ্রাতাগণ ঠাকুরের নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রসঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলেন। দয়ালদাস স্বামীর অনেক কথা হইল। শুনিলাম একদিন কোন এক ব্যক্তি স্বামীজীকে বলিয়াছেন— 'বাবাজী! সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা অপেক্ষা সংসারের আবর্জ্জনা কতগুলি ছোটলোক কাঙ্গাল দরিদ্রের প্রতি আপনার বেশী ঝুঁকি কেন?' তাহাতে দয়ালদাস বলিলেন— 'এক এক জনার এক একটা বস্তু প্রাপ্তির অধিকার বেশী। যেমন রাজার প্রাপ্য সম্মান, মর্য্যাদা, অভ্যর্থনা, সাধুর প্রাপ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি, অভিবাদন ইত্যাদি, সেই প্রকার অন্ন কেবল ক্ষুধিত ব্যক্তিরই প্রাপ্য, তাহাতে সাধু অসাধু বিচার নাই। গৈরিকধারী সাধুসন্ন্যাসীগণকে ভোজন করাইলেই যদি সাধু ভোজনের ফল হয়, তাহা হইলে বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায় কাঙ্গালদিগকে ভোজন করাইলেও মহাদেব ভোজনের ফল হইয়া থাকে।'

মহাত্মা দয়ালদাস বাবাজীর দানের ভাব কত গভীর! এসকল কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব আনন্দ করিলেন। অধিক রাত্রে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

"এই তোমার বিলাসী সাধু!" গুরু-শিষ্যের অবস্থা।
অসাধারণ শক্তিশালী সা-সাহেব।

আজ ঠাকুর চা সেবার পর সন্ন্যাসীদের ছাউনীতে যাইবেন বলিয়া বাহির হইলেন। গঙ্গার ধারে ধারে সন্ন্যাসীদের এলাকায় পঁহুছিয়া কিঞ্চিৎ দূরে একটি খড়ের গাদা দেখিতে পাইলাম। ঠাকুর ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খড়ের ভিতরে জনমানব শূন্য স্থানে একটি পরমহংস চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর তথায় দাঁড়াইলেন এবং পরমহংসকে নমস্কার করিয়া বসিলেন। দেখিয়া চিনিলাম— চড়ায় আসার দিন এই মহাত্মাকেই রাস্তায় দেখিয়া ঠাকুর ইহাকে পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ভাবাবেশে সর্ব্বাঙ্গ ইঁহার

থর থর কাঁপিতেছিল। ঠাকুর এই মহাত্মার নিকটে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া রহিলেন। পরমহংস মৌন, কোন কথাবার্ত্তা হইল না। মহাত্মার দিকে একটু সময় তাকাইয়া থাকিয়া দেখিলাম তাঁহার গৌরবর্ণ বক্ষস্থলে কাল পাথরের মত একটি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। ছায়াটি বড়ই শীতল ও স্নিগ্ধ-কর। একটু সময় চাহিয়া থাকিতেই শরীরটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল— চিত্তে প্রফুল্ল ভাব আসিল, সজোরে নাম চলিতে লাগিল। মনে হইল ইনি অসীম অনন্ত পরব্রহ্মে নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া শান্ত সমাহিত ও মৌন হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যে এতক্ষণ তাঁহার নিকটে রহিলাম, তাহা তিনি জানিলেন কি না তাহাও বুঝিলাম না। ইনি কে, কোথায় থাকেন কোন পরিচয়ই পাইলাম না। ইনি 'মৌনীবাবা' নামে খ্যাত। গোপনে থাকার অভিপ্রায়েই এইরূপ নির্জ্জন স্থানে আসিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ঠাকুরই বা ইঁহার পরিচয় দিবেন কেন? ঠাকুর বলিলেন— **'নীরবে থাকিয়া ইনি যে উপদেশ দিচ্ছেন ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রকার উপদেশ কেউ দিচ্ছেন না।'**

মৌনী বাবার নিকট হইতে বাহির হইয়া ঠাকুর সন্ন্যাসী মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। এক একটি চত্তরে বহুসংখ্যক বড় বড় তাঁবু খাটান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। কোন কোন তাঁবুতে আসন বসন কিছুই নাই, শুধু বালি; কোনটিতে খড় বিছান; কোন কোন তাঁবুতে সতরঞ্চ গালিচা পাতা, আবার কোন কোন তাঁবুতে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া চক্ষু স্থির হইল; কোন রাজা মহারাজার বৈঠকখানাতেও এত সাজ সরঞ্জাম আছে কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা সন্ন্যাসীদের সর্ব্বপ্রধান তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তাঁবুর একধারে একখানা ছোট তক্তপোষের উপরে সুবর্ণখচিত বহুমূল্য মখ্‌মলের গদি। তাহার উপরে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে মখ্‌মলের মোটা মোটা সুচিত্র তাকিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক রঙ্গের বসন ও আল্‌খিল্লা ঝলমল করিতেছে। স্বামীজীর গলদেশে বড় বড় হীরা মুক্তা চুনী পান্না প্রভৃতি মণিগণের উজ্জ্বল মালা। প্রত্যেকটি মণি হইতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কত লক্ষ টাকা যে ঐ মালার মূল্য, অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট রঙ্গিণ রেশমের পাগ পরিয়া স্বামীজী ব্যাসাসনে বসিয়া আছেন। দেখিতে রাজা মহারাজার মত,- চেহারা সুশ্রী, তেজস্বী ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তাঁবুর ভিতরে অনেক মহাজন মাড়োয়াড়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বসিয়া রহিয়াছেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্যমুখে খুব উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে শাস্ত্র পুরাণের কথা বলিয়া উপদেশ দিতেছেন; সকলে নিবিষ্ট হইয়া শুনিতেছে। স্বামীজীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি নিষ্কিঞ্চন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একখানা জীর্ণ কম্বলের উপরে বসিয়া আছেন। তিনি সময় সময় স্বামীজীকে উৎসাহ দিতেছেন। স্বামীজীও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার পানে তাকাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কণ্ঠস্বর গদগদ হইতেছে। আমরা তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, স্বামীজী ঠাকুরকে বসিতে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সকলেই তাঁবুর ভিতরে বসিলাম। সকলেই খুব ভক্তিভাবে স্বামীজীর উপদেশ শুনিতে লাগলেন। স্বামীজীর বিলাসিতার অতিরিক্ত আড়ম্বর দেখিয়া গোড়াতেই আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল সুতরাং তাঁর উপদেশ ভাল লাগিল না; তাঁর অশ্রুজল এবং গদগদ কণ্ঠ ভাবের ভাণ মনে হইতে লাগিল। একটু পরেই ঠাকুর

মনের উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'যিনি এত বিলাসী, তিনি আবার সন্ন্যাসীদের নেতা হইলেন কিরূপে? গদগদ স্বর, অশ্রুজল যাহা দেখিলাম, তাহাও তো ভাবের ভাণ বলিয়া মনে হয়।' ঠাকুর আমার কথা শুনিয়াও কোন উত্তরই দিলেন না। তখন মনে হইল ঠাকুর আমার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন, সুতরাং কোন কথা না বলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁবুতে আসিয়া পঁহুছিলাম।

বেলা অবসানে আকাশে মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। সন্ধ্যা হইতেই ঝড়বৃষ্টি এক সঙ্গে আরম্ভ হইল। চড়ায় হাহাকার পড়িয়া গেল। সাধুদের ধুনি নির্ব্বাণ হইল। ছাউনী ছাতা পড়িয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ সাধু মাথা রাখিবার স্থান পাইলেন না। দু'দিন দু'রাত্রি ঝড়বৃষ্টি তুফানে লক্ষ লক্ষ সাধু অনাবৃত শরীরে বালির উপরে মাঘের দারুণ শীতে পড়িয়া রহিলেন। যাহাদের তাঁবু, ছাউনী বা গৃহাদি আছে, তাহাদেরও ভাণ্ডার শূন্য। এই বিষম বিপদে কে কাকে দেখে, কে কার খবর নেয়!

তৃতীয় দিনে বেলা প্রায় দশটার সময়ে গায়ের কাপড় মুড়ি ঝুড়ি দিয়া আমরা সকলে তাঁবুর ভিতরে বসিয়া আছি, বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে,—দেখিলাম একটি গৌরবর্ণ কৌপীন মাত্র পরিহিত বলিষ্ঠ সাধু অপর ১৫/২০টি সাধু সঙ্গে লইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া পড়িলেন। সমস্ত শরীর তার আছাড়ের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। কাদা মাখা চর্ম্মের উপর দিয়া স্থানে স্থানে রক্তের ধারা পড়িতেছে। সাধুটি আসিয়াই ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, এবং করযোড়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'স্বামীজী! ভাণ্ডারমে কোন্ চীজ চাহি?' ঠাকুর বিধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ভাণ্ডার শূন্য, কিছুই নাই। সাধু উহা শুনিয়া দু'টি সহচরকে দু'মন চাউল ও আটা এবং তদুপযুক্ত ডাল আলু লুন ঘৃত কাষ্ঠ প্রভৃতি অবিলম্বে আনিয়া দিতে বলিলেন। সাধু আর ক্ষণকালও না দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের সঙ্গে দৌড়িয়া চলিলেন। শুনিলাম গতকল্য অপরাহ্ন হইতে তিনি মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যেও বহু সাধু সঙ্গে লইয়া চত্তরে চত্তরে মহান্তদের নিকট উপস্থিত হইতেছেন এবং কোথায় কাহাদের কি প্রয়োজন, খবর লইয়া তাহা পঁহুছাইয়া দিতে সঙ্গীদের হুকুম করিতেছেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া খালি গায়ে যে ভাবে তিনি দারুণ মাঘের শীতে বৃষ্টিতে চড়ার উপরে ছুটাছুটি করিতেছেন, ভাবিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। সাধু আছাড়ের পর আছাড় খাইয়া যেভাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন, তাহা মনে করিয়া চক্ষে জল আসিল। ঠাকুরকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ সাধু যে চড়াতে আছে কল্পনাও করিতে পারি নাই, এই সাধুটি কে? ঠাকুর শুনিয়া ছলছল চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—**'ইনিই তোমার সেই বিলাসী সাধু।'** এই বলিয়া ঠাকুর চুপ করিলেন এবং ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে ঠাকুরের গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—**'সেদিন যাঁকে তোমরা মহারাজার মত বেশ ভূষায় সজ্জিত হ'য়ে গদির উপরে বসা দেখেছিলে, দেখ, আজ তিনি কি অবস্থায় ছুটাছুটি কর্‌ছেন। এই সন্ন্যাসীর নাম—সঙ্করারণ্য। এঁরই ডান পাশে সাধারণ আসনে কাঙ্গালের মত যে সন্ন্যাসীটি বসেছিলেন, তিনি**

এঁর গুরু। বাপ মা যেমন ছেলেকে সাজ পোষাকে সাজায়ে ছেলের শোভা দেখে আনন্দ করেন, সেইরূপ অনুগত প্রিয় শিষ্যকে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সাজায়ে তাকে দেখে গুরু আনন্দ কর্ছিলেন; শিষ্যও সেইরূপ গুরু আমাকে আদর করে মহারাজার মত গদিতে বসায়েছেন, গুরুরই কৃপাতে আমার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ হচ্ছে মনে ক'রে এক একবার গুরুর চরণের দিকে তাকাচ্ছেন, প্রণাম কর্ছেন, গুরুর স্নেহের কথা ভেবে অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছেন, সময় সময় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আস্‌ছে—ভাবের ভাণ কিছুই করেন নাই।'

রাত্রি প্রায় ১১টা। ঠাকুর জ্বলন্ত ধুনি সম্মুখে রাখিয়া আপন আসনে বসিয়া আছেন; আমরা কেহ শয়ন করিয়াছি, কেহ বসিয়া রহিয়াছি। তাঁবুর দরজার দিকে চাহিয়া দেখি, একটি লোক কোট পেন্টালুনপরা, মাথায় টুপি দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখামাত্র আসন হইতে উঠিয়া গিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং নিজ আসনে নিয়া বসাইলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। কত সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর তাঁহাদের যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়া পৃথক্ আসনে বসান। এ পর্য্যন্ত এমন একটি লোকও দেখি নাই যাহাকে ঠাকুর নিজ আসনে নিয়া বসাইয়াছেন। খুব বিস্ময়ের সহিত আমরা লোকটিকে দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে প্রায় ১৫/২০ মিনিট কথাবার্ত্তা বলিলেন। কি বলিলেন বৃষ্টির শব্দে শুনিতে পাইলাম না। যাওয়ার সময়ে আমরা ছাতা দিতে চাহিলাম, ঠাকুর নিষেধ করিলেন। লোকটি চলিয়া গেলেন পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইনি কে? ঠাকুর কহিলেন,—'ইনি সা সাহেব, জাতিতে মুসলমান—আমার গুরুভ্রাতা। এখন জাতিবুদ্ধি নাই—পরমহংস অবস্থা। ইনি ঐশ্বর্য্য পথে চ'লে সিদ্ধ হ'য়েছেন। ইঁহার শক্তি অসাধারণ। এই ঝড় বৃষ্টিতে এসেছেন—এক ফোঁটা জল গায়ে পড়ে নাই। যাওয়ার সময়েও সেই ভাবেই গেলেন। আমরা কি ভাবে আছি খবর নিতে এসেছিলেন। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন। খুব অল্প লোকই ইঁহাকে জানে।'

সাধু ভিখনদাস। ভগবানের দান প্রবাহ—স্পর্শে কৃতার্থ। মহাপুরুষ গম্ভীরানাথজী দর্শন।

আজ আকাশ পরিষ্কার হইল। সাধুদের আনন্দের আর সীমা নাই। পূর্ব্ববৎ সাধুদের থাকার সুব্যবস্থা হইল। সহস্র সহস্র ধুনি জ্বলিয়া উঠিল। ভাণ্ডারার যথামত আয়োজন চলিল। প্রলয়ের পর প্রকৃতি পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিল। সাধুরা যত্রতত্র বিচরণ করিয়া পরস্পরের খবর লইতে লাগিলেন। সকলের যেন নব জীবন লাভ হইল। এই দুই দিন ঝড়বৃষ্টিতে কোন সাধুকে দেখা যায় নাই, কিন্তু ছোট কাঠিয়াবাবা প্রত্যহ যেমন ঠাকুরের নিকট আসিয়া থাকেন, এই দুই দিনই সেই প্রকার আসিয়াছিলেন। আমাদের তাঁবুর ভিতর থাকিতে বাবাজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু বাবাজী রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন,— 'স্ত্রীর যেমন পতি, আসন, ধুনিও সাধুদের সেইরূপ। উহা ছাড়িয়া অন্যত্র কি প্রকারে থাকিব?'

আজ মহাত্মা ভিখনদাস বাবাজী ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর খুব আদর করিয়া তাঁহাকে নিজ আসনের পাশে বসাইলেন। পাটনার অনতিদূরে বাবাজীর আশ্রম। এই আশ্রমে প্রত্যহ ৫/৭ শত লোকের সেবা হয়। সময়ে সময়ে অসংখ্য সাধুদের জমাতও বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাবাজীর আকাশ-বৃত্তি। কখনও একদিনের বস্তু পরদিনের জন্য রাখেন না। যখন ভাণ্ডারায় অভাব অনুমান করেন, বাবাজী রঘুনাথজীর দরজায় ধন্না ধরিয়া পড়িয়া থাকেন। প্রয়োজনীয় বস্তু অমনি আসিয়া পড়ে। কোথা হইতে কি ভাবে আসে, কেহ তাহার উদ্দেশ পায় না। প্রতিদিনই এই অদ্ভুত ভাণ্ডারা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুর বাবাজীর আকাশ-বৃত্তি ও অদ্ভুত ভাণ্ডারার কথা তুলিয়া খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাবাজী উহা শুনিয়া বলিলেন—'মা গঙ্গা যেমন কারো অপেক্ষা না করিয়া নিজ মনে প্রবাহিত হইয়া সাগরে গিয়া পড়িয়াছেন, দান স্রোতও সেই প্রকার ভগবানের ইচ্ছায় প্রবাহিত হইতেছেন। আমি মাত্র সেই গঙ্গায় হাত নিমজ্জন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেছি। ওতে আমার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই।' বাবাজীর বয়স ৪০/৪৫ বৎসর অনুমান হয়। বেশের কোন আড়ম্বর নাই—সাধারণ কৌপীন বহির্ব্বাস, গলায় তুলসী, ললাটে ও দ্বাদশাঙ্গে গোপী চন্দনের তিলক। দেখিতে খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ—বড়ই সুন্দর প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি।

আজ ঠাকুরের সঙ্গে মহাত্মা গম্ভীরানাথজীর দর্শনে চলিলাম। দূর হইতে স্বামীজীকে দর্শন মাত্রে তাঁর অসাধারণ প্রভাব অনুভব হইতে লাগিল। প্রবল ফোয়ারার মত নামটি চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়া সতেজে ভিতর হইতে বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বাবাজী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একখানা শতছিদ্রযুক্ত মলিন বস্ত্রের খণ্ড ঠাকুরকে বসিবার জন্য পাতিয়া দিলেন। ঠাকুর উহাতে স্থির হইয়া বসিয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাবাজীও কথাবার্ত্তা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বাবাজীর তপদীপ্ত কলেবরটি অসাধারণ দীর্ঘ। পরিধানে কৌপীন। কোমরে একখানা কাল কম্বলের টুকরা জড়ান রহিয়াছে। নাসিকা উন্নত, ললাট দীর্ঘ। চক্ষু দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ। অবিশ্রান্ত তাহাতে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। শরীর একেবারে নিস্পন্দ, নিক্তির কাঁটার মত স্থির। যে আসনে বসিয়া আছেন, তাহা আসন নয় বলিলেও চলে। ছেঁড়া একখানা চাটাই ধূলা, বালি, ধুনির ভস্মে তাহা পরিপূর্ণ। বাবাজী ঠাকুরকে চা খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া সেবকদের বলিলেন। অবিলম্বে বাবাজীর ব্যবস্থামত চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। মাটির কুলিয়াতে করিয়া বাবাজী স্বহস্তে চা দিলেন। পেস্তা বাদাম আখরোট প্রভৃতি উপাদেয় কাবুলি মেওয়া দ্বারা প্রস্তুত করা চা, খাইতে যেমনই সুস্বাদু—গুণেও তেমনই গরম। খাওয়া মাত্র শরীর আগুন হইয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন— **"এমন উৎকৃষ্ট চা কখনও তিনি পান করেন নাই।"**

অনেকক্ষণ ঠাকুর গম্ভীরানাথজীর নিকটে বসিয়া তাঁবুর দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ইনি কে?' ঠাকুর বলিলেন— **'ইনি নাথ যোগীদের মহান্ত। চারিদিকে যে সকল ভয়ঙ্কর আকৃতি সাধুদের দেখ্‌লে, তারা গোরখপন্থী—কানফাট্টা যোগী। উঁহাদের ভিতরে অঘোরীও আছেন। ইনি ঐশ্বর্য্য পথে অতি কঠোর সাধন ক'রে সিদ্ধ হ'ন, পরে মহাসিদ্ধ**

অবস্থা লাভ করেন। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নাই। ইনি পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্‌তে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্য্যে একেবারে ডুবে গেছেন, ইঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বরাবর পাহাড়ে যে চারটি মহাপুরুষ দর্শন ক'রেছিলাম, তার মধ্যে ইনি একজন—গোরখপন্থী। আলেখী, কানফাট্টা, অঘোরী এঁরা সকলেই তান্ত্রিক যোগী—এঁদের সাধন বড়ই কঠিন।'

আমরা চড়াতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ দর্শন করিলাম, গম্ভীরানাথের মত কিন্তু কাহাকেও লাগিল না। গায়ে শীত লাগার মত ইঁহার প্রভাব আসিয়া দেহ মন স্পর্শ করিতে লাগিল।

ভৈরবী দর্শনঃ সত্যদাসীর পূর্ব্বজন্মের গুরু।

আজ চা সেবার পর ঠাকুর বৈষ্ণবদের একটি চত্তরের ভিতর দিয়া তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসী ও অবধূতদের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশই রক্তাম্বর পরিহিত, ভস্মাবৃত অঙ্গ, জটিল ও ত্রিশূলধারী। ললাটে তাঁহাদের সিন্দুর বা লাল রুলি। চেহারা অধিকাংশেরই তেজস্বী, দেখিয়া শক্তিশালী মনে হয়। ঠাকুর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি অবধূতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া খুব উল্লসিতভাবে 'জয় গজানন', 'জয় গজানন' বলিতে লাগিলেন। ঠাকুর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এই অবধূতের নিকটে বসিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চলিতেই অনাবৃতস্থলে বালির উপরে ধুনি জ্বালিয়া একটি তেজস্বিনী ভৈরবী বসিয়া আছেন দেখিলাম। ঠাকুর তাঁহার নিকটে পঁহুছিতেই তিনি 'আও বাবা গণেশ', 'আও বাবা গণেশ', বলিয়া, খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরকে তিনি খুব আগ্রহের সহিত ধুনির সম্মুখে একটু সময় বসিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর বসিলেন। ভৈরবী ঠাকুরকে দেখিয়া ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সাক্ষাৎ গণেশ বলিয়া, তিনি পুনঃপুনঃ ঠাকুরকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। মুখ-চোখ তাঁর যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রুজলে তাঁর গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। ভৈরবীর সর্ব্বাঙ্গ ভস্মমাখা, মস্তকে রাশীকৃত জটা, তাহাতে সমস্ত পৃষ্টদেশ ঢাকিয়া রহিয়াছে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে সিন্দুরমাখা, বর্ণ শ্যাম, আকৃতি বেঁটে এবং স্থূল। সম্পুর্ণ উলঙ্গিনী হইয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। স্থূল উরুদ্বয়ের সংযোগ হেতু নাভির নীচে আর কিছুই দেখা যায় না। দৃষ্টি এতই স্নিগ্ধ ও সুন্দর যে, চোখে চোখ পড়িলে দৃষ্টি আর ফিরাইয়া আনা যায় না। শ্যামাঙ্গী হইলেও এমন সুশ্রী স্ত্রীলোক আমি কোথাও দেখি নাই। আমরা সকলেই ভৈরবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ঠিক যেন ভগবতী তারা আবির্ভূতা হইয়াছেন! ঠাকুর উঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। যতক্ষণ দেখা যায়— ভৈরবী ঠাকুরের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

এবার আমরা তাঁবুর দিকে রওয়ানা হইলাম। ঠাকুর সোজা পথে না চলিয়া গঙ্গাতীর দিয়া চলিলেন। সেতার হাতে একটি জটাধারী, শীর্ণকায়, দীর্ঘাকৃতি সাধু ঠাকুরকে দূর হইতে দেখিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেলেন। তিনি গান করিতে করিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে

লাগিলেন। ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব-স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। কত প্রকারেই ঠাকুরের নিকট কাতরতা প্রকাশ করিয়া এক একবার ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। তাঁর নানাপ্রকার অদ্ভুত ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে ঠাকুরকে বলিলেন— 'প্রভো! আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য অনেক ঘুরিয়াছি,— বহুকাল যাবৎ আপনাকে ধ্যান করিতেছি।' ঠাকুর খুব স্নেহভাবে তাঁর পানে দৃষ্টি করিয়া ছলছল চক্ষে কহিলেন,—'আপনাকে কয়েক দিন যাবৎ আমিও মনে মনে খোঁজ করিতেছি!' কিছুক্ষণ গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর তাঁবুতে চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আর আর দিনের মত মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ প্রভুর আরতির পরে গুরুভ্রাতাদের সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই সংকীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাদের মহাভাব দেখিয়া সাধুসন্ন্যাসিগণ খুব আনন্দলাভ করিলেন। সংকীর্ত্তনের পর ঠাকুর তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন।

গুরুভ্রাতারা প্রায় সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। আমি ও অশ্বিনী মাত্র বিগ্রহদ্বয়ের নিকটে রহিলাম। এই সময়ে সদর দরজার দিকে চাহিয়া দেখি, একটি সন্ন্যাসী গৌর-নিতাইযের দিকে তাকাইয়া, করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। একটু পরেই তিনি গৌর-নিতাইকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হইল। কারণ, সন্ন্যাসীরা কেহ গৌর-নিতাইকে জানেন না,—মানেনও না। তাঁহারা অনেকে বিগ্রহদ্বয়কে গঙ্গা যমুনা বলেন। সন্ন্যাসীর আকৃতি দেখিয়া চিনিলাম। ইনিই গতকল্য ঠাকুরের নিকট আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম পূর্ব্বক ধুনির সম্মুখে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বসিয়াছিলেন; ঠাকুরের সঙ্গে একটি কথাও বলেন নাই। ঠাকুরও একেবারে চুপ করিয়াছিলেন। ইনি চলিয়া যাওয়ার সময়ে নিজের কাঠের কমণ্ডলুটি ঠাকুরের পাশে রাখিয়া, ঠাকুরের কমণ্ডলুটি নিয়া গেলেন। ঠাকুর দেখিয়াও কোন আপত্তি না করায় আমরাও বাধা দিলাম না। ঠাকুরের নিকট ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন,— '**ইনিই সত্যদাসীর পূর্ব্ব জন্মের গুরু। বদরিকাশ্রমেরও উপরে বহুদূর বরফাবৃত হিমালয়ের অতি উচ্চ শৃঙ্গে গোফার ভিতরে ইনি থাকেন। সেই স্থানকে সাধুরা 'বরফান' বলেন। ওখানে কন্দমূলই আহার। ইনি একজন বহু প্রাচীন মহাপুরুষ। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। বহুকাল পরে এবার ইনি লোকালয়ে এসেছেন।**'

মহাপুরুষকে দেখিয়া আমি অশ্বিনীকে বলিলাম,— 'ওরে, ওই দেখ্, সেই মহাপুরুষ,— সত্যদাসীর গুরু!' অশ্বিনী অমনি কুঞ্জ, সতীশ প্রভৃতিকে খবর দিতে গেল। এই অবসরে মহাত্মা সরিয়া পড়িলেন। আমি দরজার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দৃষ্টিতে রাখিতে লাগিলাম। গুরুভ্রাতারা ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাকে ধরিতে চলিলেন,—কেহ কেহ চলিতে চলিতে আছাড় খাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, ঐ সময়ে মহাপুরুষ অকস্মাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদের দিকে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে আমাদের দরজার নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই তাঁহার চরণ ধূলি নিতে লাগিলেন। সকলকেই তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পূর্ব্ব দিকের রাস্তা ধরিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

মহাপুরুষের কবচ দান।

আজ সকালে উঠিয়া আর আর দিনের মত আমরা চড়ার পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গাতীরে শৌচার্থে উপস্থিত হইলাম। মেথরদের ঘরের দ্বারে ঠাকুরের কমণ্ডলুর মত একটি কমণ্ডলু দেখিয়া ভাবিলাম, এখানে এই জিনিস কেন? একটু অনুসন্ধান করিতেই দেখি, মেথরদের ঘরের কোণে সেই মহাপুরুষ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা খুব আগ্রহের সহিত অনুনয় বিনয় করিয়া অনুরোধ করাতে তিনি আমাদের তাঁবুতে গিয়া থাকিবেন, স্বীকার করিলেন। স্নানের পর আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁবুতে আসিলাম। মহাপুরুষকে পাইয়া তাঁবুর সকলেরই খুব আনন্দ। আমার উপরে মহাপুরুষের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তিনি আমাকে বলিলেন,—'বাচ্চা যো চীজ্‌কে ওয়াস্তে তোম এত্‌না ভজন সাধন করতা হায়, ওহি চীজ তোম্‌কো হাম্ দেয়েঙ্গে। ও চীজ্ করনেছে তোমারা সর্ব্বসিধ্ লাভ হোগা।'

আমি— 'ও সিধ্‌মে হামারা ক্যা হোগা?'

মহাত্মাজী— 'মহাবীরজী কি শক্তি তোমারা ভিতর্ সঞ্চার হোগা। ঊর্দ্ধরেতা হো যাওগে, আউর গুরুজীকা উপর অনন্য ভক্তি, একান্ত নিষ্ঠা বন্ যায়েগী।' আমি শুনিয়া অবাক হইলাম। ভাবিলাম, এ বস্তুর জন্যই তো একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু, ইহা কি ঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারে? এই তো আমার গুরুদেবের একচেটিয়া সম্পত্তি। তবে, যদি দয়া করিয়া দেন,—আমার তো পরম সৌভাগ্য।

এগারটার সময় ঠাকুর পায়খানায় গেলেন; পরে মহাপুরুষ ঠাকুরের ধুনির সম্মুখে বসিয়া ধূপধুনা গুগ্‌গুল-চন্দনাদি মন্ত্রপূত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে ভূর্জ্জপত্রে অঙ্কিত মহাবীরের মূর্ত্তি আমাকে দেখাইয়া, উহা হোম-ধূমের উপরে পুনঃপুনঃ আরতি করিলেন। তৎপরে আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—'লেও ইনকো দক্ষিণ বাহুমে ধারণ করনা,—আউর পূজা কিও।'

আমি— 'মহাত্মাজী! পূজা হাম্ জানতা হ্যায় নহি, সেরেফ ধারণ করকে রেকখেঙ্গে।'

মহাত্মা— 'আচ্ছা ওয়েসেই হোগা। ফির মঙ্গলবার রোজ ধূপ, চন্দনাদিকে একদফে আরতি কিও।'

আমি মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপকা উমর কেত্‌না হ্যায়?'

মহাত্মাজী— "মই তো নাহি জানতা হ্যায়। বহুত বরষ হুয়া এক রোজ গুরুজী হামসে কহা—'আব তো তোমারা তিন শত বরষ উতার গিয়া, কভি তোমারা মন হোবে তো জনমভূম একদফে দর্শন কিও।' বহুত বরষ বাদ গুরুজীকা বাত হামারা খেয়ালমে আয়া। হাম তো জনমভূম দর্শনকো ওয়াস্তে নীচু চলা আয়া। হরিদ্বারমে আয়কে শুনা, সহর ভারত ভূম্ মে প্রবেশ কিয়া হ্যায়।' তব হাম আউর নেহি উতারা, ফিন আসন পর চলা গিয়া। এহি বরষমে হাম কুম্ভমেলামে চলা আয়া।"

শুনিলাম,— 'ইনি রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহরের সময়ে দেব-মুহূর্ত্তে মানস-সরোবরে স্নান করেন, পরে বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও মঙ্গল আরতি করিয়া

থাকেন। তৎপরে দ্বারকাতে যাইয়া শ্রীশ্রীদ্বারকানাথজীর দর্শনান্তে হোম করেন, অতঃপর প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া নিজ আসনে চলিয়া যান। ইহাই মহাত্মার নিত্যকর্ম্ম।' তাঁহার মুখে শুনিলাম,—বলিলেন,— 'এই যে ত্রিবেণী দেখিতেছ, এই প্রকারের আরও তিনটি ত্রিবেণী হিমালয়ের উপরে রহিয়াছে। মন্দাকিনী, অলকানন্দা এবং ভাগীরথী; গঙ্গার এই তিন ধারাতেই সরস্বতীর সঙ্গম আছে। হিমালয় পর্ব্বতোপরে পম্পা, মানস প্রভৃতি চারিটি সরোবর আছে। অস্ত্রে যাহাদের শরীর বিদ্ধ হয় না, আগুনেও যাহাদের শরীর পোড়ে না, যে ব্যক্তি নিজের শরীরকে এইরূপ মনে করেন, মাত্র তিনিই মানস-সরোবরে বাস করিতে পারেন এবং ঐ সকল সরোবরে স্নান করিতে পারেন। বাবা! আমি ঐ চারিটি সরোবরেই স্নান করিয়া থাকি।' ইহার পর মহাত্মাজী তাঁবু হইতে কখন কোথায় চলিয়া গেলেন—কোন খোঁজ পাইলাম না।

শৌচান্তে ঠাকুর আসনে আসিলেন; নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে সমস্ত কথা বলিলাম। মহাপুরুষ প্রদত্ত কবচ ধারণ করিব কি না ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ঠাকুর বলিলেন,— 'তুমি কি চেয়েছিলে? না, তিনি নিজ হ'তে দিলেন? আমি বলিলাম— 'আমি কিছুই তাঁর নিকটে চাই নাই,—নিজ হ'তে তিনি দিয়েছেন।' ঠাকুর কহিলেন,— 'তোমার খুব সৌভাগ্য। উনি সাধারণ নন,—বাক্‌সিদ্ধ। উনি যেমন বলেছেন সেইরূপ ধারণ কর্‌লে ঐসব অবস্থা লাভ হবে। ইচ্ছা হ'লে, আজই উহা ধারণ কর্‌তে পার।'

ঠাকুরের কথা শুনিয়াও আমার উহা ধারণ করিতে তেমন আগ্রহ জন্মিল না। আমি উহা ঝোলায় ভরিয়া রাখিয়া দিলাম।

রঙ্গিলাবাবা।

আমরা চড়ায় আসিয়াছি পর, একটি সাধু প্রায়ই ঠাকুরের নিকট আসিতেছেন। বেশভূষা দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত অনুমান করা শক্ত। মস্তকে তাঁহার জটা, ললাটে ভস্মমাখা, পরিধানে বহুরঙ্গের টুকরা বস্ত্র দ্বারা আল্‌খিল্লা. চেহারা বেঁটে, বর্ণ শ্যাম। পরিচয় না পাইয়া উহাকে আমরা 'রঙ্গিলা বাবা' বলিয়া ডাকি। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি কেবল হঠ যোগের কথা বলেন। বৈষ্ণবদের উপরে বোধ হয় তেমন প্রসন্ন নন। ঠাকুরকে তিনি বলিলেন—'তোমরা যো তিলক হ্যায় ওতো হামরা শিবজীকো টাট্টি হ্যায়। শিবজী উস্‌মে ঝারা ফিরতা হ্যায়।' ঠাকুর তাঁহার কথা শুনিয়া ছল্‌ছল্‌ চক্ষে করযোড়ে বলিলেন—'তব তো হাম ধন্য হো গিয়া।' সাধু যখন আসেন, তখনই ঠাকুরকে অনর্গল উপদেশ করিতে থাকেন। ঠাকুরের মুখের একটি কথাও আমরা শুনিতে পাই না। এজন্য সকলেই সাধুর উপরে একটু বিরক্ত। ঠাকুর কোন কথা বলিতে আরম্ভ করিলে সাধু তাহাতে কাণ দেন না। ঠাকুরের কথায় বাধা দিয়া নিজের কথাই বলিতে থাকেন। এসব দেখিয়া সতীশ ভিতরে ভিতরে গরম হইয়া উঠিল। কতক্ষণে সাধু তাঁবুর বাহিরে যান, সতীশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ সময়ে ঠাকুর সতীশকে পায়খানার জল দিতে বলিলেন। সতীশ ঐ কার্য্যে যাইতেই সাধু উঠিয়া গেলেন।

ঠাকুর শৌচে গেলেন। সতীশ আসিয়া সাধুকে তালাস করিতে লাগিল। রাস্তায় যাইয়াও একবার খুঁজিয়া আসিল। পরে আমাদিগকে বলিল- 'আজ ওকে পেলে নিশ্চয় আমি ওর কাণটি কামড়াইয়া ছিঁড়িতাম। ঠাকুরের কথায় যে বাধা দেয়, ঠাকুরের কথা যে না শুনে, তার কাণ থাকায় লাভ কি?' বোধ হয় সতীশের ভাব বুঝিয়াই ঠাকুর একটা কার্য্যের হুকুম দিয়া সতীশকে সরাইয়া নিলেন;—না হলে আজ পাগলা সতীশ নিশ্চয়ই একটা বিপদ্ ঘটাইত।

ছদ্মবেশী মহাপুরুষ।

আজ বেলা প্রায় ১টার সময়ে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখা মাত্র করযোড়ে অভিবাদন করিয়া ধুনির সম্মুখে বসাইলেন। ভদ্রলোকটির শরীরে ধর্ম্মের কোন প্রকার চিহ্ন নাই, পরিষ্কার সাদা বস্ত্র ও জামা পরিধানে। মস্তকে সুন্দর সাদা বস্ত্রের পাগড়ী, শ্মশ্রু গোঁপ পক্ক। আকৃতি সুস্থ ও সুদীর্ঘ, বর্ণ গৌর। দেখিলে খুব তেজস্বী বলিয়া বোধ হয়। লোকটিকে বড়ই আপনার বলিয়া মনে হইল। একটি কথাও না বলিয়া, ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরের পানে পুনঃপুনঃ তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুরও নির্ব্বাক্ থাকিয়া ভদ্রলোকটির পানে দু'তিন বার চাহিলেন। ভদ্রলোকটি যতক্ষণ ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলেন, তাঁবুর একটি লোকও বাহিরে গেলেন না,—কারো বাহিরে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ভদ্রলোকটি থাকিয়া, পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ভদ্রলোকটি কে? দেখতে বড় ভাল লাগলো।' ঠাকুর কহিলেন,— 'ইনি সাধারণ লোক নন্। মহাপুরুষ ছদ্মবেশে এসেছিলেন। ইহার প্রভাব অসাধারণ।'

আমি— 'ইনি তো একটি কথাও বল্লেন না?'

ঠাকুর— 'বল্বেন না কেন? ঢের ব'লেছেন। মুখে কিছু বলেন নাই বটে,—দৃষ্টিতে ব'লেছেন।'

আমি— 'এঁর কি কোন পরিচয় নাই? ইনি কে?'

ঠাকুর— 'পরিচয় যথেষ্ট আছে, তবে দশ জনের মধ্যে প্রকাশ হ'তে চান না। ইনি কর্ণেল অল্কটের গুরু—কৌথুম ঋষি।' ঠাকুরের নিকটে পরিচয় পাইয়া গুরুভ্রাতারা অনেকে অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু পাইলেন না।

শুনিলাম, ঠাকুর প্রয়াগ আসার পরে শ্রীমতী এনি বেসান্ত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পত্নী মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং মনোরমার অদ্ভুত সমাধি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। মনোরমাকে নাকি তিনি কৌথুমের ফটো দেখাইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিবার খুব আকাঙ্খা মনোরমাকে জানাইয়াছিলেন। শুনিলাম,— 'এনি বেসান্ত' সাধুদের সঙ্গে চড়ায় বাস করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ত্রিবেণী স্নানের অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চড়াবাসী সাধু-সন্ন্যাসীরা ঐ কথায় সম্মতি দেন নাই। ত্রিবেণীতে মকর সংক্রান্তির স্নান কালে এনি বেসান্ত এ দেশীয় মেয়েদের মত শাড়ী পড়িয়া স্নান করিয়াছিলেন। শুনিয়া আনন্দ হইল।

রাসায়নিক সাধু।

আজ সন্ন্যাসীদের চত্বর পরিক্রমা করিয়া নানকসাহীদের চত্বরে আসিতে, বালির উপরে অনাবৃতস্থানে একটি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। সন্ন্যাসীর মস্তকে দীর্ঘ জটা, গায়ে আল্‌খিল্লা। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিযা উঠিলেন। দূর হইতে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন না। ঠাকুর চত্বরে ঘুরিতে ঘুরিতে যে সাধুসন্ন্যাসীদের একটু বিশেষত্ব দেখেন, তাঁহারই নিকটে গিয়া বসেন; কিন্তু এই সাধুকে দেখিয়া হাসিলেন অথচ তাহার নিকটে গেলেন না,— ইহার কারণ কি, বুঝিলাম না। কয়েক পা ঠাকুরের সঙ্গে চলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— 'সাধুর কপাল তো অসাধারণ দেখিতেছি, এত বড় উন্নত ও প্রশস্ত ললাট তো জীবনে কারো দেখি নাই। ইনি কে?' ঠাকুর বলিলেন,— **'এত বড় কপাল না হ'লে কি এত বড ভাগ্য হয়? এঁদের গোপনে থাকাই মঙ্গল—প্রকাশ হ'লে মিষ্টতা থাকে না।'** ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেই ভাবিলেন— 'ঠাকুর যখন ইহাকে গোপনে রাখিতে চান, তখন নিশ্চয়ই ইনি মানস-সরোবরের পরমহংসজী হইবেন'— এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার হাতে ঠাকুরের কমণ্ডলু,— এই হাত কাহার পায়ে স্পর্শ করাইব, ভাবিয়া আমি তফাতেই রহিলাম। গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া আমাদের তাঁবুতে নিয়া চলিলেন। ঠাকুর তাঁবুতে না গিয়া বাহিরে বসিলেন। কুঞ্জ, সতীশ, ছোড়দাদা প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসীর সেবায় লাগিয়া গেলেন। কেহ হাত কেহ পা টিপিতে লাগিলেন। যাঁহারা অঙ্গ সেবার সুযোগ পাইলেন না তাঁহারা ঘনাইয়া সন্ন্যাসীর গা ঘেঁসিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়া খুব খুসী হইলেন এবং বলিলেন— 'আজ তোম লোকন্‌কো এক আচ্ছি চীজ দেখায়েঙ্গে।' এই বলিয়া একটি গুলির মত খাইলেন। সকলেই পরমহংসজী বিশেষ কৃপা করিবেন মনে করিয়া, খুব উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী গুলি খাওয়ার পরে 'ঠাণ্ডা চীজ্ কুছ্ লিয়াও, দহি লিয়াও, মিঠাই লিয়াও'—বলিয়া এক একজনকে হুকুম করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারাও 'আমার উপর পরমহংসজীর বিশেষ কৃপা হইল' মনে করিয়া সে সকল জিনিষ হাজির করিতে লাগিলেন। এগারটা হইল, ঠাকুর পায়খানায় গেলেন, সাধু ৫/৭ মিনিটের জন্য ছাউনী হইতে বাহিরে যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলকে বলিলেন—'আজ নেহি হোগা, চীজ হজম নেহি হুয়া, ও তো গির গিয়া। কাল বস্তু খায়কে হাম পেশাব করঙ্গে, ওস্‌মে তামা ভিজায়কে আগমে ছোড় দেও—৫ মিনিট পিছু উঠায়কে দেখোগে পাক্কা সুবর্ণ হো যায়েগা। আভি হামকো একঠো পয়সা দেও। মুখ্‌মে রাখ্‌কে ও চীজ হাম দে দেতে। আগ্‌মে রাখ্‌নেসে ওভি আচ্ছা সুবর্ণ হো যায়েগা। এইছা সুবর্ণ বানায়কে হাম্ নিত্ দেয়েঙ্গে, তোম লোক বাজারমে যায়কে বিক্ দেও, আউর আচ্ছা কর্‌কে ভাণ্ডারা লাগাও।' সাধু এই বলিয়া একটি পয়সা মুখে রাখিয়া দিলেন। ঠাকুর শৌচান্তে আসনে আসিলেন। সাধু তখন পয়সাটি ধুনির আগুনে ফেলিতে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং ধুনির নিকটে গিয়া বসিলেন। ঠাকুর

সাধুর ওখানে বসার হেতু কি, জিজ্ঞাসা করায় তিনি মুখের পয়সা ধুনিতে ফেলিয়া সোনা প্রস্তুত করিবেন বলায়, ঠাকুর তাহাকে খুব ধমক্ দিলেন এবং সাধুকে ছাউনী হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। বিধু অমনি সাধুকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন।

ঠাকুর বলিলেন— "ইনি রাসায়নিক বিদ্যায় পারদর্শী সাধু। শঙ্খিয়া খে'য়ে তাহা পিত্তের সঙ্গে মিলাবার প্রণালী জানেন। ওরূপ কর্‌লে সেই উদরস্থ পিত্তের এমন গুণ হয় যে উহা প্রস্রাব ক'রে তাতে তামা ভিজায়ে আগুনে ফেল্‌লেই সোনা হ'বে। তামাতে থুথু মিলায়ে তাহা অগ্নিতে পোড়ায়ে নিলেও উৎকৃষ্ট সোনা প্রস্তুত হয়। এই সাধুর ইচ্ছা ছিল তোমাদের কারোকে নিয়া এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। এ বড় বিষম। এর ভিতরে গেলে জীবনে ধর্ম্মলাভ হয় না।'

যে সকল গুরুভ্রাতারা সন্ন্যাসীকে মানস-সরোবরের পরমহংস ঠাওরাইযাছিলেন, ঠাকুরের শেষ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় লজ্জিত হইলেন। সারাদিন তাঁহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া কাটাইলাম।

অসাধারণ ক্ষ্যাপাচাঁদ।

ঠাকুরের সঙ্গে চড়াতে প্রথম যে দিন আসিয়াছিলাম, ঠাকুর এই ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া বালির উপরে একটি সাধুকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন— "ইনি অসাধারণ মহাপুরুষ। মস্তক হ'তে ইঁহার সূর্য্য রশ্মির ন্যায় শুভ্রছটা চতুর্দ্দিকে ছড়ায়ে পড়ছে।" ইহার পর চড়াতে আসিয়া দেখিতেছি এই সাধু একটি দিনও ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র থাকেন না। যতকাল ঠাকুরের সঙ্গ করিযাছি, বাহিরের লোক রাত্রিকালে ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে কখনও দেখি নাই; কিন্তু এই সাধু একটি রাত্রিও ঠাকুরের কাছ ছাড়া হয়েন নাই ইহাতে ঠাকুরও কোন আপত্তি করিতেছেন না। ঠাকুর ইঁহাকে যেরূপ আদর যত্ন করেন, তাহাতে মনে হয় ইনি ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা সকলে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত ইঁহার কোন পরিচয় পাইলাম না। অতি প্রাচীন মহাত্মা মহাপুরুষগণও কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহার থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। অন্তরের অবস্থা অন্তর্যামী জানেন; কিন্তু বাহিরে ইঁহার কোন একটা ধর্ম্মের চিহ্ন বা অনুষ্ঠান দেখিতেছি না। জটা, তিলক, মালা, বিভূতি কিছুই ইঁহার নাই। ধর্ম্মের কোন প্রকার অনুষ্ঠান না থাকিলেও, কারো কারো চেহারাতেই ধর্ম্ম জাজ্বল্যমান দেখা যায়। কিন্তু ইঁহার আকৃতি এমনই কদাকার যে নিতান্ত ইতর শ্রেণীর কুলি মজুর ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। ইঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ কাল, শরীর অতিশয় দৃঢ়—পালোয়ানের মত মনে হয়। মস্তকে কাল চুল, গোঁপ-শ্মশ্রুবর্জ্জিত, মুখশ্রী দেখলে ৪০/৫০ বৎসরের অধিক অনুমান হয় না। লোকালয়ে থাকিতে হইলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকা চলে না, তাই একখানা ছেঁড়া কম্‌ফরটারের টুক্‌রা দ্বারা কৌপীন করিয়া লইয়াছেন। সম্পত্তির মধ্যে একখানা পুরান মরিচাধরা লোহার কড়া। তাহাও কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন জানি না। তাহাতেই শৌচক্রিয়া, জলপান, আহারাদি সমস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু কখনও উহা ধুইয়া

পরিষ্কার করিয়া রাখিতে দেখি নাই। গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের বা পাহাড়বাসী মহাত্মাদেরও লোক সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার বিষয়ে একটা সাধারণ সংস্কার আছে, কিন্তু ইঁহার সে সকল সংস্কার কিছুই নাই। ঠাকুর ইঁহার বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন— "জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ।" বাস্তবিক আমরা তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার কোন আচার ব্যবহারে কারো কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ হয় না,—বরং ভালই লাগে।

ঠাকুর ইঁহার সম্বন্ধে বলিলেন— "ইনি ত্রিকালজ্ঞ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, দেহমুক্ত মহাপুরুষ। আপন ইচ্ছানুসারে ব্যোমমার্গে সশরীরে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারেন। শুধু নিজে পারেন তা' নয়, আরো দু'টি লোক দু'হাতে ধরে নিয়ে শূন্যপথে যেতে পারেন। আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন, কাশী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানে ঘুরায়ে এনেছেন। প্রেমভক্তির দিক দিয়েও এর অবস্থা অসাধাবণ, পঞ্চভাবের যে কোন ভাব ইচ্ছানুসারে বর্ত্তমান ক'রে সম্ভোগ কর্‌তে পারেন।" ইনি নানা প্রকার বিচিত্র ভাবে থাকেন বলিয়া ঠাকুর ইঁহার নাম ক্ষ্যাপাচাঁদ রাখিয়াছেন। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সবস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এই সাতটি তীর্থে প্রতিদিন শেষরাত্রে স্নান করেন। নেতি, ধৌতি ইঁহার নিত্যকর্ম্ম। পেটের ভিতরের সমস্ত নাড়িভূঁড়ি বাহির করিয়া নিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলেন।

একদিন দেখিলাম,— "পোলের বরাবর বড় রাস্তার উপরে পুলিস সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। ক্ষ্যাপাচাঁদ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া পড়িলেন এবং ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিলেন। সাহেব খুব বেগে ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু ক্ষ্যাপাচাঁদকে কিছুতেই পশ্চাতে ফেলিতে পারিলেন না। সাহেব দু'বার রাস্তার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন— কিন্তু ক্ষ্যাপাচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে। সেই সময়ে দেখিলাম, ক্ষ্যাপাচাঁদের দৌড়ান এক অদ্ভুত কাণ্ড। দৌড়াইলেই লোকের শরীর সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু ক্ষ্যাপাচাঁদের তাহা নয়,— তাঁর শরীরটি ঠিক নিক্তির কাঁটার মত সোজা,— দৌড়াইবার সময়ে পা দু'টি সোজা উঠিতেছে— নামিতেছে মাত্র। ভূমিতে কখন সংস্পর্শ হইতেছে, কখনও বা হইতেছে না,— শূন্যে যেন বায়ুর উপর দিয়া দৌড়িয়া চলিতেছেন। সাহেব ক্ষ্যাপাচাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া ঘোড়া অকস্মাৎ থামাইলেন। ক্ষ্যাপাচাঁদ অমনি সাহেবের সম্মুখীন হইয়া ঘোড়া ও সাহেবকে হস্ত দ্বারা আরতি করিতে লাগিলেন। সাহেব দু'একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ কি করিতেছে?' তাঁহারা বলিলেন— 'সাহেব! তোমার ভিতরে পরমেশ্বরের শক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহার মর্য্যাদা দিতেছেন।' সাহেব একটু সময় ক্ষ্যাপাচাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, দু'হাতে সেলাম দিতে দিতে বলিলেন— 'এ বড়া আচ্ছা মহাত্মা হ্যায়,— সাঁচ্চা সাধু হ্যায়!' আরো ২/৩ দিন ক্ষ্যাপাচাঁদের অদ্ভুত কার্য্য দেখিলাম।— তাহা আর এখন লিখিবার অবসর ঘটিল না।

সারাদিন ক্ষ্যাপাচাঁদ যেখানেই থাকুন না কেন, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হন্ না। গুরুভ্রাতারা যতক্ষণ নিদ্রিত না হ'ন্, ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির ধারে

পড়িয়া থাকেন। সকলে নিদ্রিত হইলে ক্ষ্যাপাচাঁদ উঠিয়া বসেন। তখন ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের সামনা সামনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া করযোড়ে কত কি বলিতে থাকেন। সংস্কৃত, হিন্দি ও বিবিধ অজানা ভাষায় ঠাকুরের স্তব-স্তুতি করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়েন। আবার তখনই লাফাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে করিতে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল পঞ্চপ্রদীপের ন্যায় ঠাকুরের সম্মুখে ধরিয়া, "আহা! আহা" বলিতে বলিতে আরতি করিতে থাকেন। রাত্রি ১১টা হইতে ৩।। টা পর্য্যন্ত ক্ষ্যাপাচাঁদ কখন নৃত্য, কখন ক্রন্দন, কখন বা ঠাকুরের স্তব-স্তুতি করিয়া অতিবাহিত করেন। দিনের বেলায়ও কখন কখন ক্ষ্যাপাচাঁদ বাহির হইতে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুরকে কত কি বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। একটু পরেই ক্ষ্যাপাচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে পড়িয়া যান। বৃশ্চিক দংশনে বালক যেমন পিতামাতার নিকট পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, ক্ষ্যাপাচাঁদও সেই প্রকার হাত-পা আছড়াইয়া মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উঁহার চোখ, মুখ এবং শরীরের শিরা সমস্ত ফুলিয়া যায়, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ও বুক ভাসিতে থাকে। ক্ষ্যাপাচাঁদের এ অবস্থা দেখিয়া আমরাও অস্থির হইয়া পড়ি,— চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি না। জানি না কেন ঠাকুর উঁহার ক্রন্দনে অনেক সময় ভ্রূক্ষেপই করেন না। তিনি কোন প্রকার ব্যস্ততা প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। কখন বা দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে নাড়িয়া ক্ষ্যাপাচাঁদকে স্থির হইতে বলেন। তখন ধীরে ধীরে ক্ষ্যাপাচাঁদ স্থির হইয়া পড়েন। ১৫/২০ মিনিট পরেই ক্ষ্যাপাচাঁদ আবার লাফাইয়া উঠেন, এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঠাকুরের আরতি করিতে করিতে নৃত্য করিয়া দোঁহা পড়িতে থাকেন— ঠাকুরকে ভগবানের লীলা শুনাইতে আরম্ভ করেন। 'তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া, তাতা ধাইয়া, ধাইয়া, বৃন্দাবনমে বংশী বাজে নাচে কিষণ কানহাইয়া।'— এই প্রকার দোঁহা পড়িয়া, শেষকালে 'কহে অৰ্জ্জুনা শোন ভাই সাধু'— বলিয়া প্রত্যেকটি দোঁহা সমাপন করেন। এই সকল দোঁহা পাঠকালে ক্ষ্যাপাচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেন বলিয়া অনুমান করি;— কারণ, একটি দোঁহা দু'বার বলিতে পারেন না। প্রত্যহ ১৫/২০টি দোঁহা পড়িয়া থাকেন— প্রত্যেকটি নূতন রকমের। দোঁহার শেষ ভাগে 'কহে অৰ্জ্জুনা শোন ভাই সাধু'— থাকে বলিয়া আমরা ক্ষ্যাপাচাঁদের নাম 'অৰ্জ্জুনদাস' ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। শাস্ত্র, পুরাণ ও উপনিষদাদিতে ক্ষ্যাপাচাঁদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ। কেহ কোন শাস্ত্রের একটি মাত্র চরণ পাঠ করিলে ক্ষ্যাপাচাঁদ উহার পূর্ব্বাপর ১০/১৫টি চরণ অনায়াসে পাঠ করিয়া যান। ক্ষ্যাপাচাঁদের বিষয়ে কোন কথা লিখিয়াই প্রাণে তৃপ্তি হয় না;— মনে হয়, কিছু লেখা হইল না। ক্ষ্যাপাচাঁদ যে কে, কতকালের লোক;— কিছুই জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন কালের কোন মুনি-ঋষি বলিয়া অনুমান হয়। ক্ষ্যাপাচাঁদ বলেন— 'আজকাল যো কুছ্ তাজ্জব্ আপলোক্ দেখ্‌তা হ্যায়—হামারা রামরাজ্‌মে ওসব হাম দেখা হ্যায়। রেলগাড়ী দেখা হ্যায়, হাওয়া যান দেখা হ্যায়, হাস্‌পাতাল দেখা হ্যায়, রাস্তা ইছ্‌ছেভি আচ্ছা দেখা। আউর যো সব দেখা—আংরেজ রাজমে আব্‌তক্ ওসব নেহি দেখ্ পাতা।'

গতকল্য রাত্রি প্রায় ২টার সময়ে ক্ষ্যাপাচাঁদ আকুল হইয়া ঠাকুরের নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর মর্ম্মভেদী আৰ্ত্তনাদে আমার বুক "দুর দুর" করিতে লাগিল। ক্ষ্যাপাচাঁদ এক সময় কাঁদিতে

কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলেন— 'আহা। মেরা রামজী হো। তোহার লিয়ে হাম ত্রেতা যুগসে পড়া রহা হ্যায়— তিন যুগ হামারা গুজাড়্ গিয়া। আব্‌তো কৃপা কর্‌কে তু হামকো সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া, আব হামকো কৃপা কর্।— আব্ হামকো তোহার কর্‌লে।' ইত্যাদি—ক্ষ্যাপাচাঁদের এই কথা কয়টি শুনিয়া আমি একবারে চম্‌কিয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম, ত্রেতা যুগ হইতে ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের যে কৃপালাভের জন্য পড়িয়া আছেন,— সেই কৃপা কি? যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিদেহ মহাপুরুষ,—তাঁর আর অভাব কি? কি বস্তু পাওয়ার আশায় ক্ষ্যাপাচাঁদ প্রত্যহ ঠাকুরের নিকট এত ব্যাকুলভাবে কান্নাকাটি করিতেছেন? মনে হয়, জীব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকারী হইলেও ভগবৎপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি হয় না; কারণ তাঁহাদেরও আবার পুনরাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। গীতায় আছে 'আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন। মামুপেত্যতুকৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।' তাই মনে হয়, ভগবানের নিত্য সঙ্গলাভের জন্যই ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের কৃপাভিক্ষা করিতেছেন।*

কালীকম্বলীবাবা। ছোটদাদর জন্য কাঠিয়াবাবার নিকট ঠাকুরের প্রার্থনা। ঠাকুরের অসাধারণ সহানুভূতি।

আজ ঠাকুর চা সেবার পর সাধুদের একটি চত্তরে পরিক্রমা করিয়া গঙ্গাতীরে কালীকম্বলীবাবার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি আদর করিয়া ঠাকুরকে বসিতে আসন দিলেন। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু বলিলেন না, নীরবে থাকিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারীকে দেখিতে ২৫/২৬ বৎসর অনুমান হয়; কিন্তু বয়সে ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। ১২ শত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিলাম। কায়াকল্প করাতে দেহ একই ভাবে রহিয়াছে। হিমালয়ের অতি নিভৃত স্থলে, বদরিকাশ্রম হইতে বহুদূরে বরফান্ প্রদেশে ইঁহার অবস্থিতি। নীচে যখন আসেন বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ইঁহাকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামী দেন। তাহা দ্বারা ইনি দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত করান, ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন এবং বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন। নিজের কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। সামান্য একখানা কাল কম্বল মাত্র গাত্রাবরণ রহিয়াছে। অনেক সময় মৌনই থাকেন। বাবাজীকে দেখিয়া আমরা সকলেই খুব আনন্দলাভ করিলাম।

তাঁবুতে আসিবার সময়ে ঠাকুর রামদাস কাঠিয়া বাবাব নিকট কিছুক্ষণ বসিলেন। কাঠিয়া বাবার নিকটে যাইয়াই ঠাকুর ছোড়দাদাকে দেখাইয়া বলিলেন— **"ইনি নকরি পেয়েছেন— শীঘ্রই জামালপুর যাবেন। আপনি এঁকে আশীর্ব্বাদ করুন।— এঁর উপার্জ্জিত অর্থ যেন সাধুসেবায় ব্যয় হয়।"** কাঠিয়া বাবা খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে ছোড়দাদার দিকে চাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

---

* 'ইহার পরে ক্ষ্যাপাচাঁদ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।— এ পর্য্যন্ত আর তাঁর খোঁজ পাই নাই।'

বেলা প্রায় ১১টার সময়ে আমরা তাঁবুতে ফিরিলাম। গুরুভ্রাতারা কেহ সাধু দর্শনে, কেহ স্নানে, কেহ কেহ বা অন্য প্রয়োজনে বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"কি ব্রহ্মচারী, কবচ্‌টি তুমি ধারণ কর্‌লে না? মহাপুরুষ প্রদত্ত বস্তু এম্‌নি ফেলে রাখ্‌লে? কত সাধ্য সাধনা ক'রে ওসব অবস্থা লোকের লাভ হয় না। উহা ধারণ করা মাত্র কার্য্য আরম্ভ হয়।— ধারণ ক'র্‌ছ না কেন?"**— ঠাকুরের কথা শুনিয়া কোন কথাই আমার বাহির হইল না। একটু পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, তামার মাদুলীতে উহা ধারণ করার ব্যবস্থা। এখানে মাদুলী কোথায় পাইব?—সহরে গিয়া যা' হয় ক'র্‌ব। ঠাকুর আমার পানে একটু সময় চাহিয়া রহিলেন,— আর কিছুই বলিলেন না। কবচ ধাবণ সম্বন্ধে আমার ভিতরে নানা ভাব উপস্থিত হওয়ায়, ভিতরটি তোল্‌পাড়্‌ করিয়া তুলিল। আমি ঠাকুরের নিকটে না বসিয়া, বাহিরে চলিয়া গেলাম। কল্য ছোড়দাদা জামালপুর কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইবেন। পণ্ডিত মহাশয় এবং অশ্বিনীও কলিকাতা যাইবেন, শুনিলাম। অনেক গুরুভ্রাতারাই মেলা ভঙ্গের পূর্ব্বে মেলাস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। আজ একদল আমেরিকাবাসী ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী-মহাপুরুষদের ফটো নিতে চড়ায় আসিয়াছেন। অনেক সাধু-মহাত্মার ফটো লইয়া তাঁহারা ঠাকুরের ফটো তুলিতে আমাদের তাঁবুতে আসিতেছেন, শুনিলাম। শুনিয়াই ঠাকুর পায়খানায় চলিয়া গেলেন।— বিধুকে বলিয়া গেলেন— **"এ খানে সাধুর অনুসন্ধান ক'রে ফটো নিতে চাইলে, ব্রহ্মচারীকে দাঁড় করিয়ে দিও।"** আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম।

আজ সকালবেলা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘনঘটার মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জনে চড়াবাসী সাধুদের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। শীতে আজ তাঁবু হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। ঠাকুব ফ্লানেলের আল্‌খিল্লা গায়ে দিয়া, প্রজ্জ্বলিত ধুনির সম্মুখে বসিয়া আছেন। মোটা একখানা কম্বলও মুড়ি দিয়াছেন। ইহাতেও ঠাকুরের শীত নিবারণ হইতেছে না,— 'ঠক্‌ ঠক্‌' করিয়া কাঁপিতেছেন। একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আপনি এত কাঁপিতেছেন কেন?—আপনার কি জ্বর হইল?' ঠাকুর কোন কথা না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বালির উপরে এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং নিজের গায়ের কম্বলখানা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন— **"ওকে এখানা দিয়ে এসো।"** বিধু ঘোষ কোন গুরুভ্রাতার একখানা কম্বল নিয়া লোকটির গায়ে জড়াইয়া দিয়া আসিলেন। সাধু অনাবৃত শরীরে বালির উপরে শীতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কম্বল পাইয়া তাহার শীত নিবারণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরেরও কাঁপুনি থামিল। কোন ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেখা মাত্র তাহার সমস্ত কষ্ট আপন শরীরে অনুভব করা, এ যে কি অসাধারণ দয়া তাহা কল্পনায়ও আসে না। এরূপ পরমদয়াল ঠাকুরের সঙ্গ আ বা পাইয়াছি,— আমাদের মত ভাগ্যবান সংসারে আর কে আছে? ধন্য দয়াল ঠাকুর! তোমার এই দয়াই আমাদের একমাত্র ভরসা।

এই কুম্ভমেলার প্রারম্ভ হইতেই বহু ব্যবসাদার মাড়োয়াড়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ লক্ষ লক্ষ টাকার কম্বল, তুলার জামা, শীতবস্ত্র ও জলপাত্র প্রভৃতি বড় বড় সন্ন্যাসী মহান্তদের নিকট বিতরণের জন্য আনিয়া দিতেছেন। মহান্তেরা সেই সকল বস্তু আপন ছাউনীতেই সাধারণতঃ

বিলাইয়া থাকেন। অতিরিক্ত থাকিলে অপরদের দেন। কিছুদিন যাবৎ ঠাকুরের নিকটও এই প্রকার গাঁঠরি গাঁঠরি কম্বল, জামা আসিয়া পড়িতেছে। ঠাকুর সে সকল বস্ত্র আসা মাত্র রামদাস কাঠিয়া বাবা, গম্ভীরানাথজী প্রভৃতির নিকট এবং গরীব সাধুদের মণ্ডলীতে পাঠাইয়া দিতেছেন। নিজ হাতে দান করিবার জন্য কিছুই রাখিতেছেন না। ঠাকুরের এই প্রকার কার্য্যে চড়াবাসীদের ভিতরে সর্ব্বত্র ঠাকুরের নাম মহাদাতা বলিয়া প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের ছাউনীতেও প্রার্থীদের যাতায়াতের বিরাম নাই। ভাণ্ডারাতে যতক্ষণ খাবার সামগ্রী, লাকড়ি, জলপাত্র থাকে—ততক্ষণ প্রার্থীদের দেওয়া হয়। না থাকিলেই মুস্কিল— নাই, তাহা প্রার্থীরা বুঝে না।

বাসনাহীন সাধুর ঠাকুরের হস্তে দানপ্রাপ্তির জেদ।

আজ একটি পবিত্র মূর্ত্তি সন্ন্যাসী আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,— ' স্বামীজী! আমার প্রয়োজন, আমাকে কৃপা ক'রে ১২টি টাকা দিন।' ঠাকুর মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— **'টাকা আছে কি না।'** তিনি বলিলেন— 'এক পয়সাও নাই।' ঠাকুর সন্ন্যাসীকে বলিলেন— **"আজ কিছুই নাই।"**

সন্ন্যাসী বলিলেন— "আপনার কি আছে না আছে তা জেনে আমি টাকা চাই নাই। আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই, এই জানি।— আপনি ইচ্ছা ক'র্‌লেই দিতে পারেন।"

ঠাকুর— **"আপনার প্রারব্ধে নাই, আমি কিরূপে দিব?"**

সন্ন্যাসী— 'আমার প্রারব্ধ? আপনার দর্শন পেয়েছি, এখনও আমার প্রারব্ধ? বেশ, তাহলে বলুন, আপনার দর্শনেও আমার প্রারব্ধ ক্ষয় হয় নাই—আমি চলে যাই।' ঠাকুর অমনি মহেন্দ্রবাবুকে বলিলেন— **"কারো নিকট হতে ধার ক'রে ইনি যা চান দিয়ে দিন।"**

সন্ন্যাসীকে ধার করিয়া টাকা দেওয়া হইল। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন পরে সতীশ ঠাকুরকে বলিলেন— 'ইনি সন্ন্যাসী, অথচ অর্থে তো খুব আসক্তি দেখ্‌লাম।'

ঠাকুর বলিলেন— **"ইঁহার মধ্যে বাসনার লেশমাত্র নাই। —ইনি বাসনা কামনার অনেক উপরে। তবে যে টাকার জন্য আব্‌দার কর্‌লেন—সাধুর নিকট সাধু এরূপ করে থাকেন।"** সতীশ ইঁহার বয়সের কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর তাহাতে বলিলেন— **"বয়স অনেক।"**

সতীশ বলিল— '৪০/৫০ হইবে।' ঠাকুর বলিলেন— **"আরো বেশী।"**

সতীশ বলিল— '৮০/৯০ হবে?' ঠাকুর বলিলেন— **"আরো বেশী।"**

সতীশ বলিল—'তবে ইঁহাকে এত অল্প বয়স দেখায় কেন? ২০/২৫ বৎসরের অধিক কিছুতেই তো মনে হয় না।'

ঠাকুর— **"ইনি ২০/২২ বৎসর বয়সে উর্দ্ধরেতা হ'য়েছিলেন; সেইজন্য অল্পবয়স্ক দেখায়। সাধক যে বয়সে উর্দ্ধরেতা হন, শরীর বরাবর সেইরূপ থাকে, ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না।"** ঠাকুরের কথায় বুঝিলাম টাকা পয়সার প্রয়োজন ইঁহার কিছুই নাই। ঠাকুরের হাতে কিছু পাওয়াই যেন ইঁহার ভিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই আবদার করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া নিয়া গেলেন। ঠাকুরের হাতে দান পাইয়াই যেন সন্ন্যাসী কৃতার্থ।

মহাপুরুষদের বিচরণ কাল। প্রকৃতি পূজা।

আজ অপরাহ্নে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের চত্বর ঘুরিয়া বহু ভৈরব-ভৈরবী ঠাকুরের **সঙ্গে দর্শন** করিয়া আসিলাম। রাত্রে ঠাকুর নিজ হইতে অনেক উপদেশ করিতে লাগিলেন। **রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত** জাগিয়া নাম করিতে ঠাকুর প্রায় প্রতিদিন বলিতেছেন। প্রতিদিনই চেষ্টা **করিতেছি,** কিন্তু ঠিকমত একটি দিনও পারিলাম না। আজ ঠাকুর বলিলেন— **"তোমরা সারা দিন রাত নাম নাই কর্‌লে,** কেবলমাত্র রাত্রি ১টা হ'তে ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত **যদি নাম কর্‌তে পার, তা হ'লেও বুঝতে পার** এই সাধনের ভিতরে কি আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— 'রাত্রিতে ঐ সময়টি যেমন মহাপুরুষদের ও ঋষি-মুনিদের বিচরণের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, দিনের বেলায় কি সেইরূপ একটা শুভক্ষণ নাই?'

ঠাকুর বলিলেন— "দিবাতেও আছে। **১ দণ্ড** সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব সময়,— **এক প্রহর বেলার পর ১ দণ্ডকাল।** আড়াই প্রহরের পর ১ দণ্ড, এবং সূর্য্যাস্তের **সময় এক দণ্ড। এই কয়টি সময়ও** ঐরূপ ভজন-সাধনের শুভক্ষণ।"

এই সকল কথার পর তান্ত্রিক সাধক ও ভৈরব ভৈরবীদের সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। ঠাকুর কহিলেন— "যুবতী স্ত্রীলোককে উলঙ্গ ক'রে **সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক স্ত্রী চিহ্নে ইষ্টদেব বা ভগবতীকে** আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ক'রে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর্‌তে হয়। **এইরূপ পূজার সময় কামভাব** আস্‌লে অপরাধ হয়। এজন্য এরূপ স্ত্রীলোককে **সাধকেরা বিবাহ ক'রে নেন। বিবাহ ক'রে নিলে ঐ অপরাধ হয় না।** এ স্থানে ভগবতী ভেবে মাতৃবোধে **মতি স্থির ক'রে যাঁরা পূজা কর্‌তে পারেন, তাঁরা সাধারণ নন্‌।** তাঁরা নিয়ম মত এই পূজা ক'রে **উঠ্‌তে পার্‌লে জিতকাম হন। স্ত্রীলোক দর্শন কর্‌লে তাঁদের কামভাব আর হয় না।** ঐ যোনি হ'তেই **অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে ভেবে, তাঁরা উহাতে ভগবতীর পূজা করেন।"**

আমি— 'আমাদের সাধনে এরূপ স্ত্রীলোক নিযে পূজা আছে কি?'

ঠাকুর বলিলেন— **"হাঁ, খুব আছে। তোমরা সাধন কর না!** কর্‌লেই জান্‌তে **পার কত কাণ্ড আছে।"**

জিজ্ঞাসা করিলাম— 'আমাদের পথে স্ত্রীলোক পূজা কখন?'

ঠাকুর বলিলেন— "নাম কর্‌তে কর্‌তে যখন এক একটি চক্র ভেদ হয়, তখন ঐ চক্রের মধ্যে পদ্ম প্রকাশিত হয়। ঐ পদ্মের ভিতরে এক একটি কুটীর আছে। ঐ কুটীরের প্রবেশের

দ্বারে পরম রূপলাবণ্যময়ী এক একটি দেবী থাকেন। কুটীরের দ্বারে থেকে তাঁরা প্রবেশে বাধা দিয়ে বলেন, আমার সহিত রমণ কর। তা'হলে ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে দিব। এই ব'লে ঐ দেবীরা নানা রকম হাব ভাব দ্বারা পরীক্ষা ক'রে থাকেন। যদি তাঁদের ঐ সকল ভাবভঙ্গীতে ভুলে তাঁদের সহিত রমণ করে, তবেই সে সেখানে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে। আর যদি দেবীর হাব ভাবে না ভু'লে, নানারূপে তাঁকে স্তব-স্তুতি ক'রে বলেন, 'মা, আমাকে তুমি দয়া কর, যাতে আমার প্রকৃত কল্যাণ হয়, প্রেম-ভক্তি হয়, আশীর্ব্বাদ কর। এইরূপ বল্‌লেই তিনি পথ ছেড়ে দেন। এই প্রকার এক চক্র ভেদ হ'লে অন্য চক্রে আবার ঐরূপ আবো সুন্দরী দেবী এসে আরো কঠিন পরীক্ষা করেন। এই প্রকার ক্রমে পরমাসুন্দরী দেবী সকল প্রকাশ হ'য়ে নানারূপ পরীক্ষা কর্‌তে থাকেন। সকলকেই পূজা ভক্তি নমস্কার ক'রে আশীর্ব্বাদ নিয়ে, এক একটির ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে হয়। এ সব প্রলোভন অতিক্রম করা বড় সহজ নয়, একমাত্র গুরুর কৃপায়ই হয়।"

আমি— 'এই প্রকার দেবীদের প্রলোভন কতদূর? চক্র কয়টি? সকল চক্রের দ্বারেই কি এই প্রকার প্রলোভন আছে?'

ঠাকুর বলিলেন— "সকল চক্রের দ্বারেই এইরূপ প্রলোভন আছে। চক্র ৭২ হাজার। ইহার মধ্যে দশটি প্রধান। এই দশটি ভেদ ক'রে যেতে পার্‌লে একরূপ জীবনের কাজ হয়ে যায়। ৭২ হাজার চক্র এক জীবনে ভেদ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই হয়।"

আমি— 'এ সকল চক্র ভেদ না ক'রে কি ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না? সকলকেই কি এসব চক্র ভেদ কর্‌তে হবে?'

ঠাকুর বলিলেন— "যাঁরা প্রণালী মত রাস্তা ধরে চলেন, তাঁদেরই পথে ঐ সকল পড়ে। যাঁরা ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করেন, তাঁকে পাইতে চান, তাঁদের এ সব প্রলোভনে পড়্‌তে হয় না। ভগবান্‌কে লাভ ক'রে এ সকল তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কৃপায় যাঁরা পার হন, ভগবান্ তাঁদেরও নানা অবস্থায় ফেলে পাকা করে নেন।"

ঠাকুরের কমলে কামিনী দর্শন। মৌনীবাবার চিঠি। ঠাকুরের উত্তর। মৌনীবাবার দীক্ষা-প্রার্থনা ও লাভ।

অদ্য প্রাতে ঠাকুরের চা-সেবার পর একটি শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি জটাধারী সন্ন্যাসী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণামপূর্ব্বক ধুনির পাশে বসিলেন; এবং ঠাকুরের হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিলেন, 'এই পত্রখানা মৌনীবাবা আপনাকে দিয়াছেন।' মৌনীবাবা কেমন আছেন, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায়, সন্ন্যাসী বলিলেন— 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে তাঁর কুম্ভমেলায় আস্‌বার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন তিনি পীড়িত হ'য়ে পড়াতে আস্‌তে পার্‌লেন না। তিনি বড়ই মহাত্মা। ওরূপ মহাত্মা কখনও আমি দেখি নাই। তিনি আহার প্রায় ত্যাগ ক'রেছেন, নিদ্রা জয় ক'রেছেন, একাসনে দিনরাত একভাবে ব'সে থাকেন, ইঙ্গিতেও কারো সঙ্গে আলাপ করেন না। সর্ব্বদা ধ্যানে মগ্ন।

বোধ হয় অধিক দিন আর দেহ রাখ্‌বেন না।' সন্ন্যাসী এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মৌনীবাবার পত্রখানা নিজে পড়িলেন। তিন চারখানা টুক্‌রা টুক্‌রা কাগজে পত্রখানা লেখা থাকায় পড়িতে অনেক সময় লাগিল। পড়ার পরে ঠাকুর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া আমার নিকট দিয়া বলিলেন— **"চিঠিখানা যত্ন ক'রে রেখে দেও—পরে কাজে লাগ্‌বে।"** আমি অমনি উহা ঝোলার ভিতরে রাখিয়া দিলাম।

ঠাকুর মৌনীবাবার অনেক প্রশংসা করিলেন।—ঠাকুরের কথায় জানিলাম— মৌনীবাবা সাধারণ লোক নন্। প্রচারক অবস্থায় ঠাকুর যখন হিজ্‌লী কাঁথিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী সত্যনিষ্ঠ পরমোৎসাহী যুবক প্যারীলাল ঘোষ মহাশয়ও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন। একদিন ঠাকুর ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃহৎ জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অসংখ্য লাল পদ্ম জলাশয়ের সর্ব্বত্র প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুর অনিমেষ নয়নে পদ্মের দিকে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে অনতিদূরে জলাশয়ের ভিতরে ঠাকুর কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন এবং ঐ পদ্মটিকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সাঁতার কাটিয়া পদ্মটিকে যেমন ধরিলেন, অমনি ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান বিলোপ হইল। বলিষ্ঠ প্যারীবাবু এই অবস্থা দেখিয়া জলে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরকে ধরিয়া টানিয়া পাড়ে তুলিলেন। ঠাকুর তখন সংজ্ঞাশূন্য। প্যারীবাবুর ভিতরে তখন কি এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল,—তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে উভয়েরই চৈতন্যলাভ হইল। পদ্মটি ঠাকুরের মুঠের ভিতরেই ছিল। তাহা লইয়া তিনি বাসায় আসিলেন।*

ইহার কিছুকাল পরেই প্যারীবাবুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভগবানের দর্শনলাভ আকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে না থাকিলে কঠোর তপস্যা হইবে না এবং ভগবানের উপাসনাও প্রাণ ভরিয়া করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, আজ ৭/৮ বৎসর যাবৎ তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়াছেন। অনেক পাহাড় পর্ব্বতে তীব্র সাধন-ভজন করিয়া উপস্থিত নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথে আছেন। গত ফাল্গুন মাসে প্যারীবাবু গেণ্ডারিয়াতে ঠাকুরকে একখানা পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন— 'নির্জ্জন পাহাড়-পর্ব্বতে এতকাল সাধন-ভজন, তপস্যা করিয়া কাটাইলাম। তাহাতে অনেকটা উপকার পাইয়াছি। আমি মৌন হইয়াছি; আহারের পরিমাণ—সারাদিনে আধপোয়া দুধ, নিদ্রা জয় হইয়াছে; ২৪ ঘণ্টা একাসনে বসিয়া থাকি। দয়া করিয়া শঙ্কর সময় সময় আমাকে দর্শন দেন। ব্যাসদেবও কখন কখন আসিয়া উপদেশ করেন। এসব তো হইল, কিন্তু যেজন্য আসিলাম তাহা কোথায়?— তাহার কোন সন্ধানই তো পাইলাম না। সকলেই বলেন,— সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেও, না হ'লে আর এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কি উপায়ে পিতার দর্শন পাইব, কৃপা করিয়া তাহা আমাকে আপনি উপদেশ করুন। আমার এখনও ব্রহ্মদর্শন হয় নাই।'— প্যারীবাবুর পত্র পড়িয়া ঠাকুর অমনি স্বহস্তে লিখিয়া উত্তর দিয়াছিলেন।

* এই পদ্মটি পুরীধামে ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্তুর সহিত তাঁহার ঝোলায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত চিঠি,—যথা— "বাহিরে ধর্ম্মলাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া কাঁদিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না। ঈশা জন্ দি ব্যাপটিষ্টের নিকট দীক্ষিত; শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন হয় না।

আহার যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনী হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে, উহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে চান, তবে অন্তরের সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার দূর করুন।

কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন না। এখনও পূর্ব্ব শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্ম-দর্শনে যখন প্রকৃত জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, তখন এক একটি সত্য জানিতে পারিবেন। গুরুকরণ করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই দর্শন পাওয়া যায়।

অন্তরে যে বাসনা আছে, তাহা পাইবেন; ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্ম-প্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না। যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম-সহবাস অনেক দূর। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন। এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভগবান্ সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্যজগতে কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না, ব্রহ্ম-দর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এজন্য এত লিখিলাম।"

এই চিঠি লিখিবার পর ঠাকুর মৌনীবাবার আর কোন খবর পান্ নাই। সম্প্রতি মৌনীবাবার যে পত্রখানা আসিয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য ছবি করাইয়াও এই স্থানে দেওয়া গেল,—

মৌনীবাবার পত্র।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

পূজনীয় দেব। আমি আপনার বাহিরের বাঁধা-বাঁধি অথবা আঁটা-আঁটি শিষ্য নহি, কিন্তু ভিতরে আপনার সহিত আমার কি প্রকার যোগ তাহা অন্তর্যামী পুরুষ জানেন এবং আপনিও জানেন, যেহেতু আমি স্পষ্ট তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা জানিতেছি যে, আপনি তাঁহার সহিত এক অর্থাৎ তিনিই আপনার অন্তরাত্মা। সেই পরাৎপর পরমাত্মাই আপনার এবং আমার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি। যেহেতু দয়াময় হরি অতিশয় দয়া করিয়া কঠিন আঘাতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যিনিই যত বড় না হউন কেন, তিনি ভিন্ন মানুষের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি আর দ্বিতীয় নাই। আমার বিশ্বাস যে আপনি যদিও সমস্ত জানেন, তথাপি আমি অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন— আমার মনের সন্তোষের জন্য আপনাকে লিখিতেছি, বাহিরের শিষ্য না হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই, ভিতরের বন্ধন ছিন্ন করেন এরূপ শক্তি আপনারও নাই আমারও নাই। ইহলোকে না হয় পরলোকে দেখা দিতেই হবে। আমার বিষয় শুনুন :— আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া যখন অনশুয়া মায়ের আশ্রমে বাস করিতেছিলাম, সে সময়ে একদিন—একদিন কেন অনেকদিন, হৃদয়ের শূন্যতা এবং কুৎসিত, কদাকার আত্মার আক্রমণে আমি যে কষ্ট

যে প্রকার, তাহাকে সে প্রকার পর্য্যন্তও দেখিতে পারিতাম না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সকলই অশ্লীলতাতে পরিপূর্ণ। যাহা কিছু দেখি, শুনি, বলি সকলই অশ্লীল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় বসি। অশ্লীল চেহারা সকল আমার চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়ায়; সম্পূর্ণরূপে অনাথের নাথ দীনবন্ধু ভিন্ন আমার এই সঙ্কটের সময় আর কেহই ছিল না, এবং আজ পর্য্যন্তও তাঁহার দ্বারা প্রেরিত লোক ভিন্ন, এই নির্জ্জন বনে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল কাঁদিতে কাঁদিতেই দিন অতিবাহিত হইতেছে। পিতার বড় কৃপা, তাই আমি বাঁচিয়া আছি। এই সময়ে আমি পিতার চরণে পড়িয়া যে কাঁদিব, এরূপ অবস্থাও আমার ছিল না। একদিন যখন আশ্রমের সমস্ত লোক আনন্দিত, আমি নদীতীরের একখণ্ড প্রস্তরের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে 'আমি কতকগুলি অশ্লীল ভাবপূর্ণ পাঞ্চভৌতিক শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহি।' তাহার পর একদিন প্রার্থনা করিতে পারিলাম। প্রার্থনার পর উঠিয়া যে দাঁড়াইয়াছিলাম, অমনি সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যহীন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিলাম, কতক্ষণ এই অবস্থায় পিতা রাখিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। এই দিন হইতেই আমি জানিতে আরম্ভ করিলাম যে আমি কিছুই নই। তিনিই সমস্ত। এরূপ দিন গিয়াছে যে, কে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, আমি যখন পিতার নাম করিতে গিয়াছি, আমাকে অশ্লীল ভাষা বলাইয়াছে, আমি কাঁদিতে গিয়াছি, আমার হৃদয়ে বসিয়া বিকট হাসি হাসিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে পিতা যে আমাকে কতই করুণা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। চিত্রকূটে যখন পীড়িতাবস্থায় ছিলাম, তখন পিতাকে কতবার কতভাবে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। পিতার করুণার কথা আর কি বলিব? আপনি সকলই জানিতেছেন। এখন বর্ত্তমানে তিনি আমাকে এই অবস্থায় আনিয়াছেন। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, পিতারই জ্ঞান, প্রেম এবং শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আমি আর কিছুই নই। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা, শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা, এক কথায় তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; এই জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়তর করিয়াছেন, এবং প্রতিদিনের ঘটনার দ্বারা জানাইতেছেন। আমার যশোকাঙ্খাকে চূর্ণ করিয়াছেন। তিনি নিজে অতি সুরম্য স্থান করিতেছেন, আমার জন্য তপস্যা-স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজে প্রত্যহ আমার জন্য আধসের দুধ এবং আধপোয়া চিনি আমার স্থূল শরীর রক্ষার্থে প্রেরণ করেন এবং এই আহারই আমার পক্ষে উপযুক্ত করিয়াছেন। আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিনই অপসারিত করিতেছেন। আমার নিদ্রা প্রায় পূর্ণরূপেই হরণ করিয়াছেন। চঞ্চল মনকেও ঠিক করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বদ্ধ পদ্মাসন আমার আসন করিয়া দিয়াছেন। আমার মনের উদ্বেগ আদিও নাই; কেবল ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে মাতিয়া তাঁহার নাম গান করিবার প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রবৃত্তি এবং এই পাঁচ বৎসরকাল তাঁহার যে অপূর্ব্ব করুণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিবার প্রবৃত্তি এখন আমার মনকে চঞ্চল করিয়া থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট এই জানিতে চাই যে, এক্ষণে আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হইলে আমি তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারিব। কারণ আপনি ধ্যান দ্বারা আমার মঙ্গলামঙ্গল সকলই জানিতে পারেন। আমি, আপনি ভিন্ন এ বিষয়ে আর অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। এ পর্য্যন্ত ভগবানের কৃপা ভিন্ন গুরুরূপে আর কাহাকেও গ্রহণ করি নাই এবং পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণও করিতে ইচ্ছা নাই। এই পাঁচবৎসর কাল কতদিন আপনার জন্য কাঁদিয়াছি কিন্তু কোথায়? সন্তানকে তো দেখা দিলেন না।

(অন্য কাগজে)

"ওঁ"

মূল কথা যে দেবাদিদেব ভগবান্‌কে জ্ঞানচক্ষুতে এত স্পষ্টরূপে নিজের আত্মার ভিতর তাঁহারই কৃপাবলে অনুভব করিতেছি। অথবা দেখিতেছি, সেই দেবতাকে কি হইলে ধ্যানগোচর করিতে পারিব এবং তাঁহার আদেশ শুনিতে পারিব;

পিতার আদেশ শুনিবার শক্তি আমার কি হইলে জন্মিবে। আমি সর্ব্বতোভাবেই পিতার হইয়াছি। আমি হই নাই, পিতাই করিয়া লইয়াছেন। অতি যতনে। এক্ষণে আপনার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছি, কি হইলে হৃদয়মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাইব বলিয়া দিন। ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মা এবং জ্ঞানীপুরুষগণ, যাঁহাদের নিকট নিত্য চক্ষুর জল ফেলিতেছি, তাঁহারাও কথা বলেন না, কারণ মূল প্রস্রবণ হইতে যতক্ষণ দয়ার স্রোত না আসে, ততক্ষণ সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে। আমার শারীরিক অবস্থা যে প্রকার, তাহাতে দেশে দেশে গুরু গুরু করিয়া বেড়াইতে পারিব না। বর্ত্তমান কালে সদ্গুরু মিলাও কঠিন। আমি আপনাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারিতেছি অন্য কাহাকেও সে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারি না। মূল কথা, আপনি যদি ধ্যান দ্বারা আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ না করেন, তবে এই স্থানেই দেহত্যাগ করিয়া পিতার রাজ্যে চলিয়া যাইব। পিতা এবং পিতার ভক্ত একই, এই মনে রাখিয়া আপনার যাহা ভাল হয় করুন। আমি আপনার সন্তান।

(অন্য কাগজে)

আর অধিক লেখা বাহুল্য। আপনার অনুগত সন্তান (প্যারীলাল) (মৌনীবাবা)।

মৌন ব্রত ও প্রায় ২।।বৎসর গ্রহণ করিয়াছি। গীতাজী, ব্রাহ্মধর্ম্ম, উপনিষৎ এবং বাইবেল পাঠ, একবার দুগ্ধ পান, একবার মলত্যাগ এবং শৌচাদি কর্ম্ম ভিন্ন আর কর্ম্ম নাই। শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়া পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং প্রায়ই কৃতকার্য্য হইয়াছি। সমস্তই পিতা করিতেছেন, কিন্তু যাহার জন্য এ সকল তিনি কোথায়? আপনার জ্ঞাত কারণ সমস্ত লিখিলাম।

১লা ফাল্গুন, ১৩০০।

ঠিকানা—
Mouni Baba
Bhairab ghat,
P O Moinihata,
Onkarjee Nimir.
(Khandua)

(অন্য এক টুক্‌রা কাগজে)

কোন বন্ধু দয়া করিয়া একখানা হিন্দি সঙ্গীত বহি যদি দেন চিরবাধিত থাকিব।

ঠাকুর মৌনীবাবার পত্র পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। মৌনীবাবা এখন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা-প্রার্থী। কিন্তু তিনি অতিশয় পীড়িত। ঠাকুরের নিকট আসিবার ক্ষমতা নাই। এজন্য ঠাকুর বলিলেন— **"আমাকে ওঁকারনাথে যেতে হবে।"**

এই বলিয়া কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর চোখ্ বুঝিলেন এবং অনেকক্ষণ একই অবস্থায় রহিলেন। দু'এক দিন পরে অবসর বুঝিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওঁকারনাথে আপনি কবে যাবেন? ঠাকুর ঈষৎ হাস্য-মুখে বলিলেন— **"তিনি দীক্ষা লাভ করেছেন, আর যাওয়ার প্রয়োজন নাই।"**

মহাবিষ্ণুবাবুর সংকীর্ত্তনে ভাবের তরঙ্গ। নিত্যানন্দ প্রভুর অকস্মাৎ আবির্ভাব।

আমরা চড়ায় আসিয়াছি পরে বহু গুরুভ্রাতা নানা স্থান হইতে কুম্ভমেলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার অনেকে চলিয়াও গেলেন। মেলার শেষ ভাগে মহাবিষ্ণু যতি ভাগলপুর হইতে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহার গান শুনিতে বড়ই ভালবাসেন। আজ ঠাকুর চা সেবার পর স্থির হইয়া আসনে বসিয়া আছেন। তিন দিকে গুরুভ্রাতাগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট, কেহ নাম কবিতেছেন, কেহ ধ্যানে মগ্ন, আবার কেহ কেহ অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছেন। মহাবিষ্ণুবাবু তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে স্বরচিত একটি গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

সাজ ভাই সবে মিলে আজ হরি সংকীর্ত্তনে।
মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে ।।
জীবন সফল কর ভাই হরি নামামৃত পানে।
তীর্থরাজ এই প্রয়াগধামে, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে;
শ্রীগুরুগোবিন্দ সনে, এমন সুযোগ আর পাবিনে।।
আনন্দে দু'বাহু তুলে, ডাক দীনবন্ধু ব'লে,
শুনেছি সে থাক্‌তে নারে, ডাক্‌লে তারে কাতর প্রাণে।।
নামটি হরির দীনবন্ধু, দীন-দুঃখীজনের বন্ধু,
কে আছে ভাই পাপীতাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে ।।
কোথায় কমল আঁখি ব'লে, ডেকেছিল দুধের ছেলে,
অম্‌নি কোলে নিলে তুলে, সেই সরল শিশুর কান্না শুনে ।।
আর এক ছেলে অসুর কুলে, মেতেছিল হরি ব'লে,
ম'লনা জলে অনলে, এই তারকব্রহ্ম নামের গুণে ।।
কোথায় দীনবন্ধু ব'লে, ভাস ভাই রে নয়ন জলে,
ডাক একবার হৃদয় খুলে (সেই) প্রাণের প্রাণ সাধনের ধনে ।।
অনিত্য বিষয় ত্যজ, শ্রীহরিচরণে মজ,
দেখ চেয়ে চেতন হ'য়ে, দিন ফুরাল দিনে দিনে ।।
মান অপমান দূরে থুয়ে, তৃণ হ'তে সুনীচ হ'য়ে,
মনে প্রাণে নিশিদিনে ভাস হরিদাস হরিনামে ।।

মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। গুরুভ্রাতাগণ গানের দু'একটি পদ শুনিয়াই মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে গাহিতে বিবিধ প্রকার আনন্দ ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ছাউনীর নিকটবর্ত্তী সাধু-সন্ন্যাসীরা সংকীর্ত্তনের রব শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তাঁহারা তাঁবুর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া গুরুভ্রাতাগণের বিচিত্র ভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর নিজ আসনে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। নিজ আসনে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। সময় সময় দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক **"জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন"** বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল। লম্বিত জটাভার থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রকাণ্ড শরীরটির আয়তন বৃদ্ধি হইল। তাহাতে আপাদমস্তক সাত্ত্বিক ভাবের বিবিধ প্রকার খেলা দেখিতে লাগিলাম। ভক্তপ্রবর শ্রীধর মধুর নৃত্য করিতে করিতে সুমধুর কণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল। বিধু ঘোষ ও মহেন্দ্র মিত্র মল্লবেশে বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনরবে ও আনন্দ কোলাহলে আজ সব একাকার। ঠাকুর সম্মুখের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি করিয়া মুহুর্মুহুঃ গদগদ কণ্ঠে **"অবধূত, অবধূত"** বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখি মুণ্ডিতমস্তক, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্মুখে ধুনির পাশে উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। দু'তিন মিনিট পরেই তিনি ঠাকুরের দক্ষিণ পার্শ্বের দরজা দিয়া বাহির হইলেন এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে নিত্যানন্দ বিগ্রহের গলার মালা তুলিয়া লইয়া আবার তাঁবুতে আসিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র ধুনির ধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের গলায় মালা পরাইয়া দিয়া কোন্ সময় কোন্ দিক দিয়া অদৃশ্য হইলেন কেহই বুঝিতে পারিলাম না। কীর্ত্তন কালে ঠাকুর আজ আসন হইতে নামিলেন না।

সংকীর্ত্তন শেষ হইল, পরে গুরুভ্রাতারা সকলে তাঁবুতে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকার পর যোগজীবন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সংকীর্ত্তনের সময় তুমি 'অবধূত, অবধূত' ব'লে ডাক্‌লে পরে হঠাৎ দেখ্‌লাম একটি সাধু ধুনির এপাশে তোমার দিকে হাত বাড়ায়ে দাঁড়াযে আছেন। তখনই তিনি তাঁবুর বাইরে গিয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর গলার মালা এনে তোমাকে পরায়ে দিলেন এবং সংকীর্ত্তনের ভিতরে প্রবেশ করে অকস্মাৎ অদৃশ্য হ'লেন। তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলাম না; সাধুটি কে?'

ঠাকুর— **"তাঁকে তোরা দেখেছিস্ না কি? তোরা খুব ভাগ্যবান। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু স্থূলদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাঁর সচ্চিদানন্দরূপও আমাকে দেখালেন।"**

যোগজীবন— 'তিনি ২/৩ মিনিটের বেশী রইলেন না তো?'

ঠাকুর— **"এই ঢের। অতক্ষণই তাঁরা থাকেন নাকি?"**

কুম্ভের শেষ স্নান।

আজ ২৪শে মাঘ, কুম্ভ স্নানের শেষ দিন। আজ চড়াবাসী সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, উদাসী ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থিগণ, ত্রিবেণী সঙ্গমে শেষ স্নান করিবেন। তাঁহারা প্রত্যুষে সম্প্রদায়ানুযায়ী তিলক মালা বিভূতি রুলি প্রভৃতি ধারণ করিয়া আপনাপন বেশভূষায় সজ্জিত

হইলেন। পরে হৃষ্টান্তঃকরণে ইষ্টস্মরণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে নিশান ঝাণ্ডা আশাসোটা ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তে লইয়া স্নানার্থীরা উঠিয়া পড়িলেন। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ সাধুর শঙ্খ, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতাল, সিঙ্গা, ভেরী ও জয়ঢাকের রবে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইল। চত্তরে চত্তরে সাধুদের প্রাণ আজ আনন্দ-উৎসাহে মাতিয়া গেল। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ভগবানের নামে জয়ধ্বনি করিয়া মহা আড়ম্বরে সেতুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নাগা উদাসী ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ ক্রম অনুসারে ধীর পদবিক্ষেপে পোল অতিক্রমপূর্ব্বক ত্রিবেণী স্নান সমাধা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতি কুম্ভস্নানেই কোন সম্প্রদায় অগ্রে, কাহারা পশ্চাতে স্নান করিবেন তাহা লইয়া নানা উদাসী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। মারামারি কাটাকাটিতে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর রক্তে গঙ্গার জল লাল হইয়া যাইত, কিন্তু এবার তাহা কিছু হইল না। সকলেই পরমানন্দে স্নান করিয়া আপনাপন আসনে আসিলেন। সমস্ত সাধুরা মাঘ মাস গঙ্গাগর্ভে প্রয়াগ বাস আকাঙ্খায় আরও ৫/৭ দিন চড়ায় থাকিবেন স্থির করিলেন। পরমহংসজী ঠাকুরকে মাঘ মাসে চড়া ছাড়িয়া কোথাও যাইতে নিষেধ করায়—ঠাকুর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিতে গেলেন না।

১লা ফাল্গুন, ১৩০০।

আজ ৩০শে মাঘ, মাঘী সংক্রান্তি। সূর্য্যোদয়ের পর সাধুরা সকলে ত্রিবেণী স্নান করিয়া আপনাপন চত্তরে প্রবেশ করিলেন। বেলা প্রায় দুইটার মধ্যে সাধুদের স্নানকার্য্য শেষ হইয়া গেল। আজ স্নানের পর সাধুদের আর আনন্দ স্ফূর্ত্তি নাই। তাঁহাদের সেই তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার ভাব নাই। সকলেরই মুখশ্রী মলিন ও বিষাদপূর্ণ। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া যে স্থানটাকে অহর্নিশি ভগবানের নাম, ধ্যান ও উপাসনা আরাধনায় বৈকুণ্ঠতুল্য করিয়াছিলেন, আজ তাহা শূন্য শ্মশান হইতে চলিল। পরস্পর বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধুরাও আজ পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আজ সকালবেলা সরকারের নোটিস পড়িল, তিন দিনের মধ্যে সকলকে চড়া ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সাধুরা আজ চত্তরে চত্তরে আপনাপন জমাতের নিশান, ঝাণ্ডা, আশাসোটা, তাঁবু, ছাউনী গুটাইতে লাগিলেন। আলু, চিনি, আটা, ময়দা ও ভাণ্ডারার যাবতীয় বস্তু বস্তাবন্দি করিয়া উত্তর চড়ায় চলিলেন। তথায় সাধুদের ঐ সকল জিনিষপত্র বহন করিবার জন্য উট, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি মাসাধিককাল রহিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের জমাত অদ্যই চড়া ত্যাগ করিয়া পদব্রজে প্রস্থান করিলেন। আমরাও বেলা ৯টার সময়ে ঠাকুরের সঙ্গে সহরে যাইতে উঠিয়া পড়িলাম।

তাঁবু হইতে বাহির হইয়া ঠাকুর মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন—**"মাটির বিগ্রহ সহজে অঙ্গহীন হয়ে যায়, আগে এই বিগ্রহ ত্রিবেণীতে বিসর্জ্জন দিয়ে এস।"** ঠাকুরের আদেশ মত বিগ্রহদ্বয় গঙ্গায় দেওয়া হইল। পরে আমরা চড়া ছাড়িয়া চলিলাম। দ্বারাগঞ্জ পোলের সংযোগ স্থলে পঁহুছিয়া ঠাকুর চড়ার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

চড়ার দিকে চাহিয়া আমাদের চক্ষে জল আসিল। প্রতিবারই ত্রিবেণী স্নানের পর চড়ায় আসিতে চড়াবাসী সকলের চরণস্পর্শ এই স্থানে হইয়াছে—ঠাকুর এই স্থানে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধূলার উপরে গড়াইতে লাগিলেন। আমরাও সকলে ঠাকুরের সঙ্গে সাধুদের পবিত্র চরণধূলির উপরে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলাম। পরে বেলা প্রায় ১০টার সময়ে শ্রীযুক্ত বাবু রামযাদব বাগচি মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। মধ্যাহ্ন আহার বাগচি মহাশয়ের বাসায়ই হইল। তৎপরে অপরাহ্নে ঠাকুরকে লইয়া আমরা সা-গঞ্জের বাসায় উপস্থিত হইলাম।

ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রস্থান। পাহাড়ীবাবা।

সা-গঞ্জের বাড়ীখানা ছোট বলিয়া আমরা দ্বারাগঞ্জে একখানা ভাল বড় বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া আসিয়াছি। ঠাকুরের সঙ্গে এখনও আমরা ৩০/৩৫ জন গুরুভ্রাতা রহিয়াছি। চড়া হইতে আসিবার সময়ে ক্ষ্যাপাচাঁদ হাঁটু গাড়িয়া ঠাকুরকে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেকক্ষণ স্তব-স্তুতি করিলেন। ঠাকুর ক্ষ্যাপাচাঁদকে কহিলেন—**"ক্ষ্যাপাচাঁদ! তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে যেতে পার। আমরা যা খাই, তাই খাবে, আমরা যেমন থাকি, তেমনি থাকবে।"** ক্ষ্যাপাচাঁদ ঠাকুরের কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—'আহা! আপ্‌তো হামারা মনকা বাৎ বাৎলায়া।' এই বলিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে আসিলেন। পরে কখন কোন্ দিক্ দিয়া অদৃশ্য হইলেন আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। বাসায় আসিয়া আমাদের সকলেরই ক্ষ্যাপাচাঁদের জন্য খুব কষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষ্যাপাচাঁদ আমাদের একটা দিক যেন শূন্য করিয়া গিয়াছেন।

বদরিকাশ্রম হইতে বহুশত মাইল উত্তরে বরফান্ প্রদেশবাসী অতি প্রাচীন, মহাত্মা 'পাহাড়ি বাবা' আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। যত বড় মহাত্মাই হউন না কেন তাঁহার সঙ্গে মিলিতে মিশিতে আমাদের কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না। একেবারে বালকের মত প্রকৃতি। কয়েকদিন মিষ্টান্ন, দধি, পায়সাদি খাইয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন—**"ইনি পাহাড়বাসী, কখনও এ সকল বস্তু খান নাই। ফল, মূল, কন্দ ইঁহার আহার। যাঁর যা অভ্যাস নাই তাকে তা খেতে দিতে নাই; অনিষ্ট করা হয়। পাহাড়ী বাবাকে মিষ্টান্ন পায়সাদি খেতে দিও না।"**

ঠাকুরের অভয় বাণী।

ঠাকুরের চা সেবার সময়ে ঘরে কেহ থাকে না। গুরুভ্রাতারা অন্য ঘরে বসিয়া চা পান করেন। আজ চা সেবার পর ঠাকুর আমাকে বলিলেন—**"ব্রহ্মচারী! মহাপুরুষের দেওয়া কবচটি ধারণ কর্‌লে না, ফেলে রাখ্‌লে?"**

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার ভিতরে বিষম লাগিল। আমি অমনি ঝোলা হইতে কবচটি বাহির করিয়া নিয়া ঠাকুরের সম্মুখেই রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিলাম এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলাম—'আপনি দয়া ক'রে আমাকে গ্রহণ ক'রেছেন। আমার এ দুর্ম্মতি কেন হ'লো? অন্যের

দেওয়া বস্ত্র নিয়ে আমি গুরুতর আপরাধ করেছি; এখন আমি কি করবো?' আমার কথা শুনিয়া ঠাকুরের মুখ লাল হইয়া গেল; চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। সস্নেহ-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—**"অন্য কারো দিকে তাকাতে হবে না, যাহা কিছু প্রয়োজন সব এখান থেকেই হবে।"** ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। শরীর মন হালকা বোধ হইতে লাগিল। একটা বিষম বোঝা যেন নামিয়া গেল। রক্ষা পাইলাম।

এই সময়ে গুরুভ্রাতা সকলে আসিয়া ঠাকুরের ঘরে বসিলেন, ঠাকুর কুম্ভমেলার সাধুদের সাধন-ভজন, তপস্যা ও নিয়ম নিষ্ঠার কথা বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা খুব কাতরভাবে ঠাকুরকে বলিলেন—আপনি দয়া করে আমাদের দুর্লভ সাধন দিয়েছেন কিন্তু সাধন তো আমরা কিছুই কর্‌তে পারলাম না, পাববো যে সে ভরসাও নাই—আমাদের গতি কি হবে?

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের কাতরোক্তি শুনিয়া খুব স্নেহের সহিত কহিলেন—**"তোমাদের গতি যদি তোমরাই করবে তাহ'লে চব্বিশ ঘণ্টা এ ভাবে আমি ব'সে আছি কেন? তোমরা তো রাজপুত্র, পেট ভ'রে খাবে—বন ভ'রে হাগ্‌বে, তোমাদের আর চিন্তা কি?"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতাদের কি যে অবস্থা হইল প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ঠাকুরের এই বাক্যই আমাদের অনন্তকালের জন্য একমাত্র অবলম্বন হইল। জয় গুরুদেব! আজ যে চিরকালের মত আমাদের নিশ্চিন্ত করিলে। ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম।

আজ বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকীল গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ শীল মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন,—'কুঞ্জদের দেশে নাকি বিনা আগুনে রান্না হ'য়েছে।' ঠাকুর কহিলেন—**"এ আর আশ্চর্য্য কি! পঞ্চভূত পড়েই আছে যখন যাহা দ্বারা কাজ হয়।"** ইহার পর ঠাকুর কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন— **"তোমাদের ওখানে বিনা আগুনে রান্না হ'য়েছিল, সেই ঘটনাটি কি বলত?"** কুঞ্জ তখন ঠাকুরকে সমস্ত বলিলেন। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন— **"ইহা অতি সত্য কথা। একেই সত্য বলে। এরূপ ঘটনা আতি বিরল! এই একটি ঘটনা দ্বারা পরবর্ত্তী কত লোক উদ্ধার হ'য়ে যাবে। যুগ যুগান্তরে চ'লে যাবে কিন্তু এই ঘটনা পাহাড়ে অঙ্কিত রেখার ন্যায় চিরদিন থাক্‌বে। বর্ত্তমান সময়ে এ সকল ঘটনার কেহ আদর কর্‌তে পার্‌বে না। হয়ত ব'ল্‌বে, ইহা মিথ্যা। কেহ প্রশংসার জন্য চাতুরী ক'রে এরূপ প্রকাশ ক'রেছে। যদি তোমরা ভক্তি কর্‌তে পার এবং মর্য্যাদা দেও তবে আরও আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ্‌তে পাবে।"** শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় বলিলেন— 'লোকে কি আর মর্য্যাদা দিতে পারে?" ঠাকুর কহিলেন— **"হাঁ তা পারে না।"**

কুঞ্জ কথায় কথায় ঠাকুরকে তাঁহাদের দেশের একটি গুরুভ্রাতার কথা বলিলেন— 'গুরুভ্রাতাটি' কোন এক জমিদারের কর্ম্মচারী ছিলেন। জমিদার তাহার উপর বিরক্ত হইয়া কতকগুলি দোষারোপ করিয়া আদালতে নালিস করিল। বিচারের দিন আদালতে সকলে

উপস্থিত। গুরুভ্রাতাটিকে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিবার জন্য সকলের সাম্‌নে জমিদারবাবু ঠাকুরের অযথা নিন্দা করিতে লাগিল। গুরুভ্রাতাটি জমিদারকে থামিতে বলিয়া কহিলেন— 'মিথ্যা নিন্দা কুৎসা কর্‌ছেন, আপনি সাবধান হন।' জমিদারবাবু আরো উৎসাহের সহিত নিন্দা করিতে লাগিল। দ্বিতীয়বার ও গুরুভ্রাতাটি জমিদারকে বলিলেন— 'আপনাকে যোড়হাতে বল্‌ছি আমার নিকটে আমার ঠাকুরের নিন্দা করবেন না—বিষম বিপদে পড়্‌বেন।' জমিদার তাকে আরও উত্তেজিত করিতে পুনরায় নিন্দা আরম্ভ করিল। তখন গুরুভ্রাতাটি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং সম্মুখে বাগানের বেড়া হইতে একটি বাঁশের ডগা তুলিয়া নিয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন— 'সকলে সাবধান হউন, আমার কার্য্যে যিনি বাধা দিবেন তিনি খুন হবেন।' এই বলিয়া বাঁশের ডগা দ্বারা জমিদারবাবুকে হাকিমের সাক্ষাতেই ২২ ঘা বাড়ি মারিলেন। জমিদার পড়িয়া গিয়া হাত পা আছড়াইতে লাগিল। গুরুভ্রাতাটি তখন বাঁশের ডগা ফেলিয়া দিয়া হাকিমকে বলিলেন— 'এখন আমাকে যাহা শাস্তি দিতে হয় দিন।' ইহা লইয়া ঐ হাকিমেরই নিকটে মামলা উঠিল। উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া হাকিম গুরুভ্রাতাটির ২৫ টাকা মাত্র জরিমানা করিলেন। জমিদারেরও অপরাধ সামান্য নয় বলিয়া তাহারও জরিমানা ২৫ টাকা হইল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন— **"এরূপ কর্‌লে তোমাদের জন্য আমাকে বিপদে পড়্‌তে হবে।"**

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা সংবাদ; নবদ্বীপে যাত্রা।

নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি মহাশয় বহুকাল যাবৎ এলাহাবাদে ডাক্তারী করিতেছেন। এবার কুম্ভমেলায় তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শুনিতেছি বাগচি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বাণীতোষের সহিত ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখির (কুতুর) বিবাহ হইবে। আগামী ১৫ই ফাল্গুন বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। বাঙ্গালার নানা স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র যাইতেছে। ঠাকুর আমাকে বলিলেন— **"ব্রহ্মচারী। এখন এখানে লোকের ভিড়; গোলমাল আরম্ভ হবে, তুমি নির্জ্জন-প্রিয়, এসব ভাল লাগ্‌বে না। তুমি এখন কয়েকদিন দাদার কাছে গিয়ে থাক। আমি কলিকাতা গেলে পরে আবার আমার সঙ্গে গিয়ে থেকো।"** আমি ঠাকুরের অভিপ্রায় মত দাদার নিকটে রওয়ানা হইলাম। বস্তিতে দাদার নিকট ৮/১০ দিন থাকার পর ভাগলপুর যাইতে ইচ্ছা হইল। অশ্বিনী বসু ও মহাবিষ্ণুবাবু ভাগলপুরে পুলিন পুরীতে আছেন। আমি অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। কয়েকদিন পরে একখানা ছাপান কাগজ পাইলাম। তাহাতে এই মর্ম্মে লেখা— শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হইয়াছিল। ঐ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইলে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদির ঐ সময়ে সমাবেশ হইয়াছিল, এবার ৪ শত বৎসর পরে তাহাই হইবে। মহাপ্রভু জন্মের লগ্ন ঠিক ঠিক বর্ত্তমান হইবে বলিয়া, সাধারণের সংস্কার, এবার মহাপ্রভু ঐ দিনে আবির্ভূত হইবেন। নবদ্বীপে এবার বিরাট উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। অসংখ্য লোক এখন হইতেই নবদ্বীপে থাকিয়া সংকীর্ত্তন মহোৎসবে মহাপ্রভুকে কাতর প্রাণে আহ্বান করিতেছেন। সংবাদ পাইলাম ঠাকুর

এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা পঁহুছিয়া ৫/৬ দিন বিজয়রত্ন সেন কবিরাজের বাড়ী অবস্থানের পর নবদ্বীপ চলিয়া গিয়াছেন। এই খবব পাওয়ার পর ঠাকুরের নিকট যাইতে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। দোলের সময়ে খ্রীষ্টানদের পর্ব্ব পড়ায় আফিস, আদালত অধিক দিনের জন্য ছুটি হইল। অশ্বিনী বাবু, মহাবিষ্ণু যতি ও ছোড়দাদাকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম। পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যার পর আমরা নবদ্বীপে উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় সশিষ্যে ঠাকুরকে পরম সমাদরে তাঁহার টোল বাড়ীতে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন। আমবা টোল বাড়ীতে ঝোলা ঝুলি রাখিয়া মহাপ্রভুর ঘাটে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গঙ্গার ঘাটে অপূর্ব্ব কাণ্ড!

গ্রহণ সময়ে ঠাকুরের অপূর্ব্ব নৃত্য।

আজ সমস্ত গঙ্গার তীর লোকে পরিপূর্ণ। সহস্র সহস্র লোক শত শত দলে মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিতেছেন। মহাপ্রভুর আর্বিভাবেব সময় উপস্থিত হইল ভাবিয়া তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল ভাবে মহাপ্রভুকে ডাকিতেছেন। লক্ষাধিক লোকের হরিধ্বনি, জয়ধ্বনি ও আকুল আর্ত্তনাদে মহাভাবের বন্যা বহিয়া চলিল। শত শত দলের মহাসংকীর্ত্তনে সকলেই আজ মাতোয়ারা। ঠাকুর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহস্র লোকের ভীড়ে অপ্রতিহত গতিতে তিনি গুরুভ্রাতাদের সহ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অসংখ্য সংকীর্ত্তনের দলে তিনি বিদ্যুতেব মত ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতারা মহাভাবে দিশাহারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া চলিলেন। তাঁহাদের উচ্চ হরিধ্বনি ও হুঙ্কার গর্জ্জনে সকলেরই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ঠাকুর গদগদ কণ্ঠে **'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন'** বলিয়া মহাপ্রভুকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অবির্ভাব হইল মনে করিয়া বিস্মিত নয়নে সকলে ঠাকুরের পানে তাকাইয়া রহিল। সকল দলের ভিতরে ঠাকুর আজ বর্ত্তমান। অলক্ষিত ভাবে কি যেন এক মহাশক্তি সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া পড়িল। দর্শকমণ্ডলী ভাবাবিষ্ট হইয়া স্থানে স্থানে 'জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু' বলিয়া ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে শিষ্যগণ সহিত স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গাজলের ধারে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ঠাকুর রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক চন্দ্রাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক **"ঐ দ্যাখ ঐ দ্যাখ"** বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে ধরিয়া বসাইলেন। ঠাকুর ৩ ঘণ্টা কাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। চন্দ্র রাহুমুক্ত হইলে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন ঠাকুরের সঙ্গে আমরা গঙ্গাস্নান করিলাম। ঠাকুরের গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলাম। স্নানের পরে তীবে উঠামাত্র একটি অচেনা মেয়ে ঠাকুরকে আদর করিয়া উৎকৃষ্ট সরবৎ খাওয়াইলেন। আমরাও প্রচুর পরিমাণে সরবৎ প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। তদনন্তর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরকে লইয়া টোল বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

বালক গৌরাঙ্গের নূপুরের জন্য ক্রন্দন।

নবদ্বীপ নিবাসী দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে অদ্য নব গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তথায় মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর এই উৎসবে সশিষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে ঠাকুর যখন চা-সেবা করিতেছিলেন বালক গৌরাঙ্গ ঠাকুরের নিকট প্রকাশিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— 'আমাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে— সোনার নূপুর বালা দেয় নাই।'

ঠাকুর বালককে আশ্বাস দিয়া বলিলেন— **"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—দিবে।"** চা সেবার পর ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের লইয়া হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতারা তথায় মহাপ্রভুর মন্দিরে মহা উৎসাহের সহিত হরিসংকীর্ত্তন করিলেন। এই কীর্ত্তন শেষ হইতে একটু অধিক বেলা হইল। পরে ঠাকুর সকলকে লইয়া ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় উত্তপ্ত বালির উপর দিয়া চলিয়া মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ী উৎসবস্থলে নব গৌরাঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহের পানে চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন— **"আহা! এত গরম বালির উপর দিয়া কি আমার সঙ্গে এমন ক'রে লাফায়ে লাফায়ে আস্‌তে হয়? হাপাস্‌নে, হাপাস্‌নে; চুপ কর, চুপ কর; আমি ব'লে দিব এখন, সোনার বালা নূপুর দিবে।"** এই বলিয়া ঠাকুর আবার বিগ্রহের দিকে হাত নাড়িয়া পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিলেন—**"কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, থাম্ থাম্। দিবে দিবে— বলে দিব, দিবে।"**

এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র দত্ত, স্বামীজী ও কতিপয় গুরুভ্রাতা বিগ্রহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন জীবন্ত বালকের মত বিগ্রহের অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দু'টি ছল ছল করিতেছে,— বালক কাঁদিতেছে। তার বক্ষস্থল সহিত গলার মালাগুলিও কাঁপিতেছে। বিগ্রহের এই অবস্থা দর্শন করিয়া গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর নাটমন্দিরের শোভা ও সাজসজ্জার আড়ম্বর দেখিয়া বলিলেন— **'এ সকল ঝাড়, লণ্ঠন, ফানুসের প্রয়োজন কি? যাহাকে যাহা দিয়া সাজান উচিত তাহাকে তাহা না দিয়া ঝাড় লণ্ঠন ফানুস টাঙ্গান হয়েছে। যে ছেলেকে স্থান দেওয়া হয়েছে তাঁকে সোনার বালা নূপুর না দিলে ঘরের সমস্ত হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গেচুরে জলে ভাসায়ে দিবে।"**

ঠাকুর আরো অনেক কথা বলিলেন। পরে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে ঠাকুর গরম বালির উপর দিয়া সকলের সহিত টোল বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

সিদ্ধা-গোয়ালিনী।

অতি প্রত্যুষে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম। ঠাকুরের চা পানের পর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর সংকীর্ত্তনের সহিত পদরত্ন মহাশয়ের হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ওখানে মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে একটু দৃষ্টি করিয়াই বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইলেন। সংকীর্ত্তন

শ্রী শ্রী উড়িয়াবাবার সমাধি আশ্রম, পুরী

শ্রী শ্রী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের
সমাধি আশ্রম, পুরী

ক্রমশঃ জমাট হইয়া পড়িল। স্বামীজি হরিমোহন ভাবাবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। গুরুভ্রাতাদের হরিসংকীর্ত্তনে সকলেই আজ পরমানন্দ লাভ করিলেন। ঠাকুরের সংজ্ঞালাভের পর বেলা প্রায় ১০টার সময়ে আমরা টোল বাড়ীতে আসিলাম।

১০ই চৈত্র —বৃহস্পতিবার।

এই সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এক ভাঁড় দুধ লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময়ের সহিত গুরুভ্রাতাদের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন— 'ওরে! তোরা এখানে কি ক'রে এলি, তোরা তো সব ব্রজের লোক। তোদের দেখ্‌বো ব'লে আমি কতকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ আমি তোদের দেখে ধন্য হ'লাম।' এই বলিয়া একটি পাত্রে ভাঁড় হইতে দুধ তুলিয়া নিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক এক গ্লাস দুধ ঢালিয়া নিয়া গুরুভ্রাতাদের খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন— 'পাত্র এঁটো হ'য়েছে, দুধ খাব না।' ঠাকুর অমনি বলিলেন— **"ও এঁটো নয়, প্রসাদ;—খেয়ে নিন্।"** একজন গুরুভ্রাতা গোয়ালিনীকে বলিলেন— 'পাতামোড়া ও কি রেখেছ?' গোয়ালিনী বলিল— 'ও তোমাদের দিব না— তোমরা দুধ খাও। ছেলে দু'টি ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে আসে, এই ক্ষীরটুকু তাদের জন্য রেখেছি।' গোয়ালিনী ঠাকুরকে বলিল— 'বাবা! ছেলে দু'টি তো তোমাকে দেখ্‌তে আসে, তাদের একটু সকালে পাঠায়ে দিও। দেখ, আমার বড় ছেলেটি বড় ভাল, আলা-ভোলা, ক্ষুধা সহিতে পারে না।' ঠাকুর বলিলেন— **"আচ্ছা, ব'লে দিব।"**

মধ্যাহ্নে পদরত্ন মহাশয়ের হরিসভায় আমাদের আহার হইল।

সা-সাহেবের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য। শক্তি আকর্ষণ।
রেল সংঘর্ষণে ঠাকুরের চরণে আঘাত।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর নিজ আসনে পা দু'খানা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় পদসেবা আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের দক্ষিণ পদের পাতায় টিপী দিতেই ঠাকুর 'উহু' করিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'পায়ের পাতায় কি কোন চোট্ লেগেছে?'

ঠাকুর বলিলেন,— **"এলাহাবাদ হ'তে কলিকাতা আস্‌তে পথে মগরা ষ্টেশনে আমাদের গাড়ীর সঙ্গে অন্য গাড়ীর সংঘর্ষণ হয়েছিল। তাতে পায়ের তলায় আঘাত লেগেছিল।"**

অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন— 'শুনেছি আপনি যে গাড়ীতে ব'সেছিলেন তার আগে পাছে দু'খানা গাড়ীই ভেঙ্গে চুরমার হ'য়েছিল, অথচ আপনি যে গাড়ীতে ছিলেন তার কিছুই হয় নাই—এ কথা কি সত্য?'

ঠাকুর— **"হাঁ! প্রয়াগে বাসা হ'তে আমরা ষ্টেশনে এসে একখানা গাড়ীতে উঠে ব'সে আছি, হঠাৎ সা-সাহেব এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি ঐ গাড়ী হ'তে আমাদের নাবায়ে নিয়ে পাশের গাড়ীতে বসায়ে দিয়ে বল্‌লেন— 'এই গাড়ীতেই আপনারা থাকবেন— অন্য গাড়িতে**

যাবেন না।' মগরাতে গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষণ হলে পর দেখ্‌লাম আমাদের দু'পাশের দুখানা গাড়ীই ভেঙ্গে চুরমার। একটি লোক তখনই মারা গেলেন। কিন্তু আমাদের গাড়ীতে কিছুই হয় নাই; তেমন ধাক্কাও লাগে নাই। সা সাহেবের আশ্চর্য্য শক্তি। আমার পায়ের তলায় একটু লেগেছিল। কলিকাতা এসে জ্বর হ'লো; এখনও সামান্য বেদনা আছে। একেবারে সারে নাই।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। ঠাকুরের গাড়ীর অগ্র পশ্চাতে সংলগ্ন দুইখানা গাড়ীই চূর্ণবিচূর্ণ, আরও অনেক গাড়ীই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ঠাকুরের গাড়ীতে কোন আঘাতই লাগে নাই। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঠাকুর আত্মগোপন করিতে সা সাহেবের অলৌকিক শক্তির যতই প্রশংসা করুন না কেন, এই ঘটনায় মনে হয় 'কলিসনের' অদ্যম শক্তির ধাক্কাতে গাড়ীখানা রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর পদভরে গাড়ীখানা স্থির রাখিয়া ধাক্কার সমস্ত শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন; তাহাতেই গাড়ীখানা রক্ষা পাইয়াছিল। শক্তির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঠাকুর কিঞ্চিৎ আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে এখনও ভুগিতেছেন। সা সাহেব এই সাংঘাতিক বিপদে গুরুভ্রাতাদের সহিত ঠাকুরকে রক্ষা করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবুর মুখে একটি কথা শুনিয়া তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। শুনিলাম সা-সাহেব ঠাকুরকে গাড়ীতে বসাইয়া চলিয়া যাওয়ার সময়ে ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরের পাশে ছিলেন। ঠাকুরকে চুপে চুপে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি কর্‌লেন? একেবারে সেরে দিলেন নাকি?"

ঠাকুর বলিলেন,— **"কি আর কর্‌বো? পরমহংসজী যে বল্‌লেন—ওর সমস্ত শক্তি টেনে নেও, শক্তির অপব্যয় কর্‌ছে।"** সা সাহেব ঠাকুরকে রক্ষা কর্‌বেন এই অভিমান যে বড় বিষম! কারণ গুরু এক,— পরমহংসজী। শিষ্যের এই অভিমান তিনি সইবেন কেন?

রসিকদাসের পদাবলী গানে—ঠাকুর।

মহাপ্রভুর মন্দিরে আজ তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম পদাবলী গান চলিয়াছে। দেশের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণ একের পর অন্যে গান করিয়া সমানভাবে আসর জাগাইয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীরসিকলাল দাসের আজ পদাবলী গান হইবে, শুনিলাম।

১১ই চৈত্র —শুক্রবার।

চা সেবার পর ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহকে নমস্কার করিয়া আসরে বসামাত্র রসিকদাস আসিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সংকীর্ত্তন করিবার অনুমতি চাহিলেন। ঠাকুর খুব হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠাকুরের করস্পর্শে রসিকদাস পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি মৃদঙ্গ করতালে তালি দিয়া এমনভাবে গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিলেন যে উহার করুণ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ মাত্র সভাস্থ সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ঠাকুর স্থির থাকিতে না পারিয়া 'জয় শচীনন্দন, জয় শচীনন্দন' বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে তিনি একবার মহাপ্রভুর দিকে আবার পশ্চাৎ দিকে ছুটাছুটি করিতে

লাগিলেন। পরে মহাপ্রভুর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া 'ঐ তো, ঐ তো' বলিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। পদাবলী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই মহাভাবের উচ্ছ্বাসে সকলে মত্ত হইয়া পড়িল। ভক্তপ্রবর রসিকদাস অশ্রুপূর্ণ নয়নে পরমোৎসাহে গাহিতে লাগিলেন। আসব সর্ব্বত্র নীরব নিস্তব্ধ। ঠাকুরের পাশে আমি বসিয়াছিলাম। ঠাকুর চুপে চুপে আমাকে বলিলেন— "কিছু টাকা নিয়ে এসো।" আমি তৎক্ষণাৎ টোল বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিদিমা, যোগজীবন প্রভৃতির নিকট হইতে সতেরটি টাকা লইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর প্রত্যেকটি পদাবলীর আরম্ভ ও শেষে রুমালে টাকা বান্ধিয়া রসিকদাসের দিকে ফেলিতে লাগিলেন। রসিকদাসের আনন্দ উৎসাহের সীমা নাই। তিনি অদ্বৈতপ্রভুর অসাধারণ মাহাত্ম্য গানের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের মহিমা আখরে বর্ণনা করিয়া হাপুস্ হুপুস কাঁদিতে লাগিলেন। সময় সময় তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। ঠাকুর ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদ্গমে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে শ্রোতৃমণ্ডলী ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা আকুল প্রাণে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্তব-স্তুতি গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। প্রাণ যে কেমন করিতে লাগিল বলিতে পারি না। বেলা ১১টার সময়ে কীর্ত্তন শেষ হইল। অতিকষ্টে লোকের ভিড় অতিক্রম করিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা টোল বাড়ীতে পঁহুছিলাম।

নবদ্বীপে রাইমাতা।

আজ চা সেবার পর ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের লইয়া রাইমাতার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। রাইমাতার নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। রাইমাতা ঠাকুরকে দেখিবামাত্র 'ওগো আমার বাড়ী অদ্বৈত এসেছে গো, কে কোথায় আছিস, আয় দেখে যা গো' বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর কাহারো বলার অপেক্ষা না রাখিয়া গুরুভ্রাতাদের লইয়া রাইমাতার ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় গিয়া বসিলেন। রাইমাতা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিয়া বলিলেন— 'বাবা! তোমাকে দেখতে গিয়াছিলাম। দেখ্‌লাম ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছ; আমি আর কাছে যেতে সাহস পেলাম না, দূর হ'তে দেখে চ'লে এলাম। বড় আকাঙ্খা হ'য়েছিল— ভক্তদের নিয়ে একবার আমার বাড়ী আস, প্রাণভরে একবার দেখি। বাবা! আমার আশা এবার পূর্ণ হ'লো। তিনি এখন তুমি একটু বস। আমার ছেলেরা এখনও খায় নাই; তাদের খাবার দিয়ে আসি, বেলা হ'য়েছে।' এই বলিয়া রাইমাতা ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটু পরে একথালা উৎকৃষ্ট খাবার লইয়া আসিয়া ঠাকুরের নিকটে ধরিলেন। ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে উহা আনন্দের সহিত ভোজন করিলেন। পরে রাইমাতা বলিলেন— 'বাবা! এসেছ যখন এখানে দু'টা অন্ন পেতে হবে।' ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রাইমাতা ঠাকুরের অনুমতি লইয়া রান্না করিতে গেলেন। বিবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বেলা ১২টার সময়ে ভোগ দিলেন। আমরা সকলে পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। রাইমাতা ভুক্তাবশিষ্ট সমস্ত একস্থানে সংগ্রহ করিয়া নাড়ু পাকাইলেন

এবং গৃহস্থিত সকলকে এক এক নাড়ু আগ্রহের সহিত বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট রাখিয়া দিলেন। রাইমাতার চক্ষু দু'টি উর্দ্ধটানা, সর্ব্বদাই ঢুলু ঢুলু। ছুটাছুটি করিয়া কাজকর্ম্ম করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে টস্ টস্ করিয়া চক্ষেব জল পড়িতেছে। যন্ত্রের মত শরীর দ্বারা কাজ হইতেছে, আর চিত্তটি যেন কোথায় নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এরূপটি কোথাও দেখি নাই।

অপূর্ব্ব তমাল বৃক্ষ। ভাবাবিষ্ট বালক।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আমরা পদরত্ন মহাশয়ের হরিসভায় উপস্থিত হইলাম। পদরত্ন মহাশয় ঠাকুরকে একটি তমাল গাছ দেখাইতে তাঁহাব ভিতর-বাড়ী লইয়া গেলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দেখিলাম, তমাল গাছটি বাস্তবিকই একটি দেখিবার জিনিষ। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষটি মন্দিরের মত উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে এবং তাহার ঘন শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে ছত্রাকারে বিস্তার পূর্ব্বক ভূমি সংলগ্ন হইয়াছে। বৃক্ষতলা দিবালোকেও অন্ধকার; ঠিক যেন একখানা লতার ঘর প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। স্বভাব হইতে আপনা আপনি বৃক্ষের এই প্রকার নিখুঁত অবয়ব ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। বৃক্ষটি দেখিয়া আমরা সকলেই খুব বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। এই স্থানে একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলাম।

পদরত্ন মহাশয়ের পৌত্র ৩ বৎসরের একটি বালক তমাল গাছের এক পাশে দাঁড়াইয়া কৌতুকাবিষ্ট নয়নে ঠাকুরের পানে চাহিয়া আছে। বালকটি বড়ই সুশ্রী ও সুন্দর। ঠাকুরের দৃষ্টি উহার দিকে পড়া মাত্র বালক সলজ্জভাবে দু'হাত দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। একটু পরেই আবার আড় চক্ষে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিল। বালক পুনঃপুনঃ এই প্রকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন পদরত্ন মহাশয়ের দৌহিত্রী বালকের সমবয়স্কা একটি বালিকা ধীরে ধীবে আসিয়া বালকের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা বালকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিল। বালক করযোড়ে অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। উহার ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অবিরল ধারে গণ্ড বাহিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রাণায়ামের ক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে আপনা আপনি চলিল। নানা প্রকার সাত্ত্বিক বিকারে বালকের শরীর দক্ষিণে বামে ঢলিয়া ঢলিয়া প[illegible]তে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে বালকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—**"তোমরা একে বেশ ক'রে দেখে নেও। লোকে যার জন্য ছুটাছুটি ক'রে এদিক ওদিক ঘুরছে তিনি যে কোথায় কোন গলিতে কি ভাবে লীলা করছেন, তিনি দয়া ক'রে না জানালে কেহ জানতে পারে না। একে দেখে তোমরা ধন্য হ'লে। পদরত্ন মহাশয় পণ্ডিত লোক, তাই তিনি ইহার মহালক্ষণ সমস্ত দেখতে পেয়ে আদর যত্ন করছেন।"** বালকটি এই সময় ঢুলু ঢুলু অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরের চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িল। ঠাকুর উহাকে খুব আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন— **"তুমি আর কাহাকেও নমস্কার ক'রো না।"** বালকটিকে দেখিয়া গুরুভ্রাতাদের অনেকের মধ্যে নানা ভাবের আবেশ হইতে লাগিল। * তৎপরে বেলা অবসানে আমরা টোল বাড়ীতে আসিলাম। সন্ধ্যা কীর্ত্তনের পর ঠাকুর গোয়ালিনী ও রাইমাতার অসাধারণ অবস্থার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

* এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বালকটি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

নবীনবাবুর প্রকৃতি।

আজ সুবিখ্যাত তান্ত্রিক নবীনবাবু ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহার আশ্রমে যাওয়ার পথ ভুলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন। নবীনবাবু খবর পাইয়া তাঁহার প্রকৃতির সহিত উৎকৃষ্ট খাবার লইয়া তথায় আসিলেন। সমস্ত সামগ্রী ঠাকুরকে ধরিয়া দিলেন। ঠাকুর আহার করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, প্রকৃতি ঠাকুরকে বলিলেন, 'আজ আপনাকে হাতে ধরে খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়।' ঠাকুর সম্মতি দিলেন। খাওয়াইতে খাওয়াইতে প্রকৃতি বলিলেন—'আমাকে দয়া করুন।' ঠাকুর বলিলেন-- **"মা যখন বাঘ মাথায় দিয়ে শুয়েছিলেন আপনি তখন মা'কে বাঘের নিকট হতে এনেছিলেন, আপনি তো আমার মাথা কিনে রেখেছেন আপনাকে আর কি দয়া কর্‌বো?"** আনন্দ প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া ঠাকুর টোল বাড়ী আসিলেন।

ওঁকার সাধন।

আজ ঠাকুর গুরুভ্রাতাদের লইয়া ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারবাবু ঠাকুরের পুরাণ বন্ধু। তিনি মধ্যাহ্ন সময়ে অতগুলি লোক সহিত হঠাৎ ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের সহিত ঠাকুরকে আদর করিয়া বসাইয়া তিনি সকলের জলযোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজকুমারবাবুর বৃদ্ধ মাতা আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন— **"রাজকুমারবাবুকে আমি ভাই বলিয়া মনে করি। আপনি আমার মা। মা কি ছেলেকে নমস্কার করে?"** রাজকুমারবাবুর মা বলিলেন—'বাবা! তোমাকে যে আমি মহাদেবের মত দেখ্‌ছি।' ঠাকুর কহিলেন— **"তবে আপনি মহাদেবকে নমস্কার করুন; আমি মা'কে নমস্কার করি।"**

সকলের জলযোগের পর রাজকুমারবাবু স্থির হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। রাজকুমারবাবু ঠাকুরকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন— 'আমার প্রতি যে আপনার অসাধারণ ভালবাসা তা[illegible]িচয় আমি ঢের পেয়েছি। কিন্তু আমার জীবনের দুর্দ্দশা দেখেও তো আপনি বেশ চু[illegible]াছেন; কিছু কর্‌ছেন না। আপনি আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন, যাতে ২/১ [illegible]টার জন্যও আমি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাক্‌তে পারি। কিন্তু খুব সহজ উপদেশ দিবেন— [illegible]া আমি প্রতিপালন করতে পারি। পরে আমি উপযুক্ত হ'লে দীক্ষা দিয়া আমাকে [illegible]ার্থ করবেন।' ঠাকুর রাজকুমারবাবুর কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন— **"আপনি যেমন বল্‌লেন তেমনিই একটি উপদেশ দিচ্ছি। ইহা সহজও বটে শক্তও বটে। সহজ বল্‌ছি, এই জন্য যে লোকে একটু মনোযোগ রাখ্‌লেই অনায়াসে ইহা কর্‌তে পারে। শক্ত এই জন্য যে সকলে জানে অথচ ইহা কর্‌তে কারো প্রবৃত্তি হয় না। আপনি ওঁকারের সাধন করুন। ওঁকারের অর্থ অ, উ, ম। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এখন আছে,**

পরে আবার থাকবে না। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, স্থাবর, জঙ্গম, — পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এখন আছে এবং পরে থাক্‌বে না। যাহা কিছু দেখ্‌বেন সকলেতেই এই ভাব আরোপ কর্‌বেন। ইহা ছিল না, এখন আছে, পরে আর থাক্‌বে না। ক্রমে এই ধারণা যত দৃঢ় হবে ততই সমস্ত অসার, অনিত্য, মিথ্যা মনে হবে,— কিছুতেই আর মমতা থাক্‌বে না। তখন হৃদয় শূন্য বোধ হবে। এই সময় যাহা চিরকাল থাকে, চিরস্থায়ী এমন একটি বস্তু পাইতে তীব্র ব্যাকুলতা জন্মাবে—সেই সময়ে দীক্ষা। তখন দীক্ষালাভ ক'রে কৃতার্থ হবেন।"

ইহার পর আমরা কয়দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া চৈত্রের শেষে ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইলাম।

সম্পূর্ণ